আগস্ট ২০০১

াকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

পত্রপাঠ

২য় বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা

দাম ঃ ৭ টাকা

2

বিদায় নেবার জন্য নয়

CUK-H4830-2-1236082

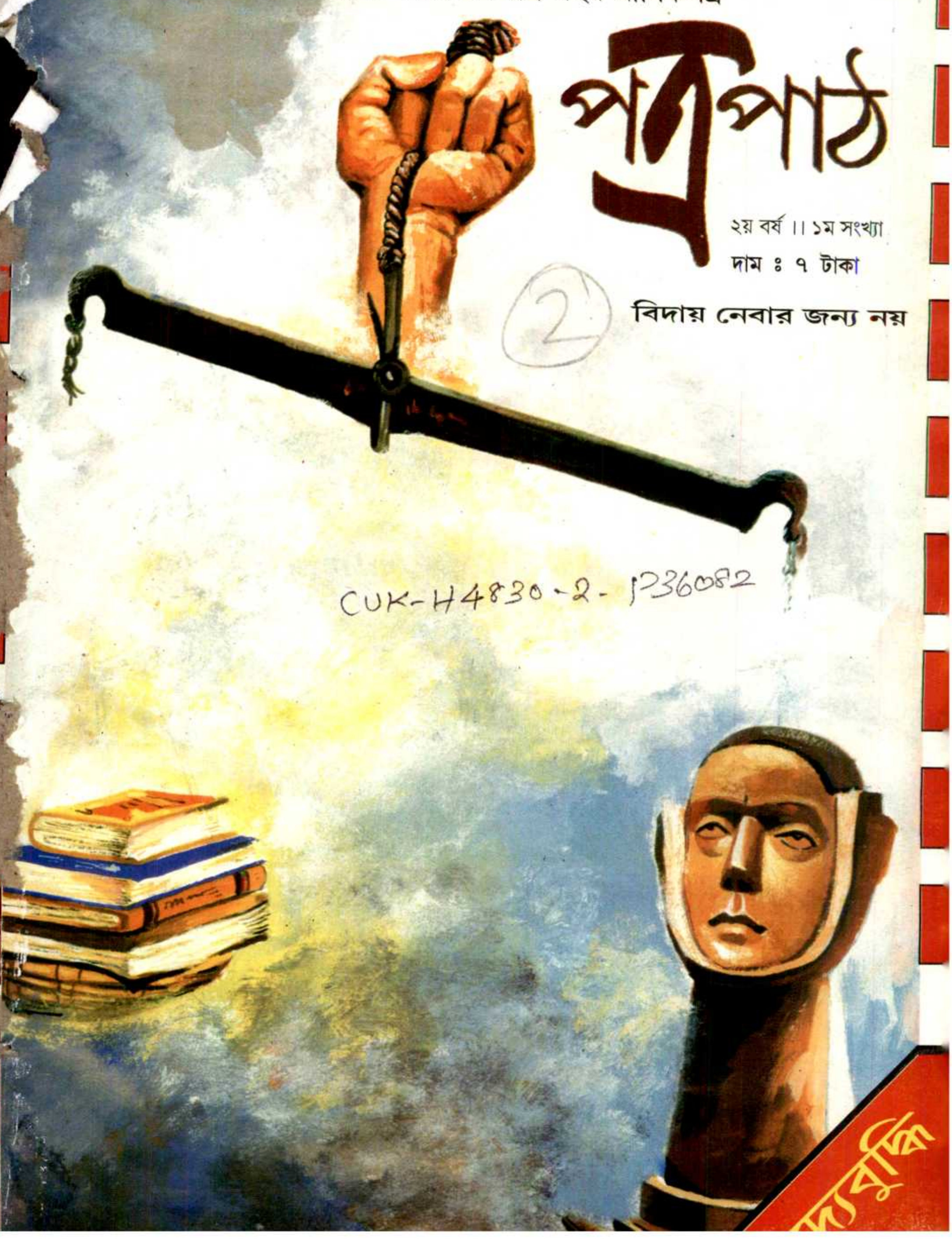

র্ষপূর্তি

The ICRT [INDIA]

Phone No. : 543-0355
9533-5430355
033-5430355

With Best Wishes From :

THE INSTITUTE OF COMPUTER RESEARCH & TRAINING

(GOVT. REGD.)

26-D, SHIVDAS BHADURI STREET,
KOLKATA-700 004

A Leading Institute for Computer Training to Students.

P 36,082

2

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

আগস্ট ২০০১

পত্রপাঠ

দাম: ৭ টাকা

২য় বর্ষ।। ১ম সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়

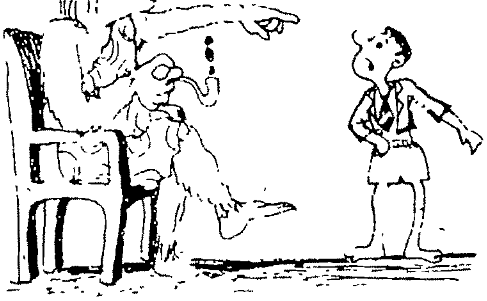

সম্পাদকীয় □২ পত্রপাঠ জবাব □৩ পত্রপাঠ লা-জবাব □৪ মহিলা
স □৩৫ রাশিচক্কোর্ □৩৬ জবর খবর □৩৭ সাহিত্য দুঃসংবাদ □১০
ইনের প্যাঁচ □৪৮ ধারাববাহিক কবিতা □২০ হেঁসেল □৩১ ব্যঙ্গ
াচার □২৪ পথঘাটের কিসসা □৪৪

পুরনো কাসুন্দি "জ্ঞানাঙ্কুর" ফাল্গুন ১২৮০ এবং 'যষ্টিমধু' ভাদ্র ১৩৮৩ থেকে □৫

নিয়মিত বইয়ের নিযতি • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য □৮ অকপটে • সমরেশ মজুমদাব □১৪ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি □১৬

প্রচ্ছদ কাহিনী পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদেব বঁ ম্র • প্রিয়ব্রত চক্রবর্ত্তী □১৩ আ মার মার কাট কাট বিদ্যেবুদ্ধি • পিনাকীশঙ্কব চৌধুবী □১৮ নানো গল্প • মুসুমুসু কলমচি □২১ সরস্বতী বন্দনা ও জ্যোতিষ বিজ্ঞান • প্রভাত বাগচি □৩৯

রসকাব্য আড্ডা চলবেই • সনৎ কুমার মিত্র □১৭ চৈনিক গুজব • শিবনাথ পাল □৪৩ প্যাঁচালি . আকাদেমিক গাথা • পল্লব গোস্বামী □৪৬

গল্প বড়বাবুব বাবুয়ানা • রণজিৎ পাল □২৫ ফিসফ্রাই কিংবা ডিমের ডেভিল • বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় □৩২

এ ছাড়া পাঁজা কোলা • দেবপ্রসাদ কুমার □২২ কুকুর বিষয়ক • প্রবীর মণ্ডল □২৩ শিল্পাঞ্চলের সাহিত্য ব্যবসা • জয়ন্ত সরকার □২৯ সন্টুর কীর্তি • কাজী সারিন আফরোজ □৪৫

প্রচ্ছদ . সঞ্জয় সরকার
অলঙ্করণ · মণিকান্ত অধিকাবী • পল্লব চক্রবর্তী •
সোনালী রাউত • শ্যামলী মণ্ডল
সহায়ক : কৌশিক রায়

বিদ্বানেরা বিপদ পদে পদে। পদচ্যুত হইতেও তাঁহার সময় বিশেষ লাগে না। কিন্তু বুদ্ধিমান? তাঁহার আসন কে টলায়! কথায় বলে চতুরকে ভগবানও সমঝাইয়া চলেন। কখন কোন পথে সে যে কোন প্যাঁচটি কষিবে তাহা শিবের বাবারও অজ্ঞাত। এইসব লইয়াই নাড়াচাড়া করিতে গিয়া সমরেশ মজুমদার অসাবধানে ফাটাইয়া ফেলিয়াছেন কয়েকটি হাঁড়ি।

১৪

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : **শেখর আহমেদ**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (তিনতলা), কলকাতা- ৭০০০৭৩
দক্ষিণ কলকাতা যোগাযোগ : ১০ বি, ফার্ণ রোড, কলি-১৯
শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ মোবাইল : ৯৮৩০০-৫২১৮২

সম্পাদকীয়

ভাগ্যিস!

বিদ্যুদ্বেগে বিদ্যাদেবী বিদ্বজ্জন প্রসব করিতেছে। এবং বুদ্ধি খাটাইয়া সেই বিদ্যাকে নানান ছাঁদে বাটিয়া সন্তানগণ একেবারে যাহাকে বলে তাক লাগাইয়া দিতেছে। বিদ্যা যে এত বিচিত্র রূপিনী হইতে পারে, তাহা মা সরস্বতীও কি বাপের জন্মে ভাবিয়াছেন। চুরি বিদ্যা, অপহরণ বিদ্যা, লেঙ্গি বিদ্যা, খ্যাতি বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা বিদ্যা,—এসব আজকাল মানুষ রীতিমতো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ত্ত করিতেছে। সে বিদ্যা আয়ত্ত করা যদি বা সহজ, প্রয়োগ করা সহজ নহে। হিসাব করিয়া হাসিতে হয়, হিসাব করিয়া কাশিতে হয়, হিসাব করিয়া বন্ধুর ছাতিতে লাথি মারিতে হয়, হিসাব করিয়া শত্রুর গলায় মালা পরাইতে হয়। ইহাকে এক কথায় হিসাব-বিদ্যা বলা যাইতে পারে। চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক। জয় জয়কার বিজ্ঞানের। দন্তরোপণ বিদ্যা, কেশ-চাষ বিদ্যা, অনড়-যৌবন বিদ্যা—শুধুই বিদ্যা। বৃক্ষটি বিদ্যার। মূলে টলটল করিতেছে বুদ্ধির বারি, কারণ বিশেষে কারণবারি। আমরা যাহারা 'অকারণ পুলকে' 'আমার পরাণ যাহা চায়' তাহা দুম্ করিয়া বলিয়া ফেলি, তাহাদিগের বিদ্যাও নাই, বুদ্ধি নাই। ভাগ্যিস নাই!

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● ‘কবিতার ফাঁসি’ বিষয়টি যদিও অত্যন্ত দুঃখের, তবুও ছড়ার ছন্দে কবিতাটি লিখলাম। প্রকাশিত হলে পারম্পর্য রক্ষা পাবে। ভালো থাকুন।

—তোমার গলায় দিলেন ফাঁসি
মুখে আমার নেই কো হাসি।

—প্রবীর মণ্ডল, পরশমণি, গোসাবা, দঃ ২৪ পরগণা।

☐ সত্যি, বিষয়টি যদিও অত্যন্ত দুঃখের, তবু ছড়ার ছন্দেই উত্তরটা দিলাম।

—নেই হাসি তাই দুষছ ফাঁসি,
তোমার বুঝি হয়নি কাশি?
ধরলে কাশি চমৎকার ; বুঝতে ফাঁসির কী দরকার।।

● ‘*পত্রপাঠ*’-এর মে, ২০০১ সংখ্যার প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের নামের বিকৃতি ভালো লাগল না। রবীন্দ্র প্রতিকৃতির ওপর টিকটিকি ও আরশোলার ছবি দৃষ্টিকে পীড়া দিচ্ছে। আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঔদাসীন্য বা অশ্রদ্ধাকে সমালোচনা করার উদ্দেশ্য থাকলে তার জন্য অন্য উপায় গ্রহণ করলে ভালো হত মনে করি।

—শতরূপা সেনগুপ্ত , রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান।

☐ আমাদের তাই মনে হত ভাই রে, অষ্টম শ্রেণীতে।

● কবিতা কখনো ধারাবাহিক হয়? অসম্ভব। আপনাদের সম্পাদকের মাথায় দুর্বুদ্ধি চেপেছে মশায়, যেনতেন প্রকারেণ তাকে একটা উৎকট কিছু করতে হবে। তার থেকে বরং একটা টব মাথায় বসিয়ে গলায় কাঠের ফ্রেম আর পায়ে ঘুঙুর পরে ঘুরে বেড়ান। নতুন কিছু তো করা হল।

—সুদক্ষিণা বসু, চন্দননগর, হুগলী।

☐ যা বলিয়াছেন, এই যেমন আপনি পত্রপাঠে পত্র দিলেন—নতুন কিছু তো করা হল।

● পরের সংখ্যার জন্য একটি কবিতা ও একটি পদ্য পাঠালাম। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

—মাণিক চন্দ্র দাস, বাসুদেবপুর, বর্ধমান।

☐ ইয়ার্কি হচ্ছে। কবিতা পাঠিয়ে আবার ‘সুস্থ থাকুন’।।

● আপনার পত্রিকা পড়ে ভালো লাগল। যদি ঐরকম লেখা লিখতে পারি, পাঠাব তো? আশাকরি ইতিবাচক সাড়াপাব।

—তপোময় ঘোষ, শিবলুন, কাটোয়া।

☐ ভীতিবাচক চিঠির উত্তর আমরা দিই না।

● আশা রাখি ভবিষ্যতে পত্রিকা প্রকাশের গঠনগত মানে আরো যত্নশীল হবেন। কোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই চাইবেন না সাহিত্যের অপমৃত্যু।

—অনিল চন্দ্র দাস, গৌরপাড়া, চাকদা, নদীয়া।

☐ নিশ্চয়। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই জানেন, সে কর্মটি বহুদিন আগেই সমাধা করেছে বাজারি সংবাদপত্রগুলির ঢাউস ঢাউস পুজো সংখ্যা। নতুন করে চাইতে যাবেন কোনো দুঃখে।

● আপনারা কি পঞ্চানন মানে শিবঠাকুরের ভক্ত? শুনে শুনে পাঁচটি আনন সম্পাদকীয় উপদেষ্টা নামক ট্যাড়স-বাগানে গোড়া থেকেই ঝলমল করছে!

—লতিকা কুণ্ডু, কলকাতা-৬৮

☐ এখন থেকে ব্রহ্মাভক্ত হলাম। দেখুন একটি আনন কানন থেকে অদৃশ্য!

● শুনলুম পত্রপাঠ নাকি উঠে যাচ্ছে? শুনে খুবই ভালো লাগল। এমন একটি নিন্দাপ্রিয় ‘বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন’ কাগজ উঠে গেলেই মঙ্গল।

—লবঙ্গ পাল, যাদবপুর

☐ শুনে খুবই ভালো লাগল। পত্রপাঠ যে চড়চড় করে উপরপানে উঠে যাচ্ছে, সে খবর আপনি রাখেন দেখছি। পত্রপাঠের খোঁচা খেয়ে যাঁরা কাত হচ্ছেন তাঁদের নামের কেত্তনও কি আপনার নখদর্পণে?

পত্রপাঠ লা-জবাব

আক্ষেপ

মহাশয় গো,

কি আর কহিব। বর্তমানে আমার দুঃখের আর অবধি নাই। আমি বেশ ছিলাম। জীবনের উদ্দেশ্য কী, এই আপাত সরল প্রশ্নে রামকৃষ্ণদেব কে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন—আহার, বিহার, মৈথুন—এবং শিশ্নোদর পরায়ণ এই অধম সেই মহাজন নির্দেশিত পথে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া তথা সময়োচিত বগলবাদ্য করিয়া সুখেই কালাতিপাত করিতেছিল। কিন্তু কাল হইল আপনাদের বহুল প্রচারিত "পত্রপাঠ" মাসিক পত্রিকার মার্চ সংখ্যায় মল্লিখিত "নিষ্কাম প্রেম?" মুদ্রিত হওয়ায়। আমি আদৌ চিন্তা করিতে পারি নাই যে এমন অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। সত্য বলিতে কি আমার ছাইভস্ম ছাপার অক্ষরে অবলোকন করিয়া এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিলাম যে নিজ পীবর কলেবরে একটি রাম চিমটি কাটিয়া অবগত হইলাম যে আমি স্বপ্নাবিষ্ট নহি, জাগ্রতই আছি এবং ইহাও অনুভূত হইল যে তাহা হইলে আমি লোকটা কেষ্টবিষ্টু না হইলেও নেহাৎ ফেলনা নহি। দিবস কতিপয় তো বাতাসে ভাসিতে লাগিলাম। ধাতস্থ যখন হইলাম, তখন আমার অবস্থা হইল প্রবাদোক্ত সেই তন্তুবায় সম, যে বয়নশিল্প পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম হেতু ছিন্নাণ্ড বৃষ ক্রয় করিল। আমি আমার স্বাভাবিক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় লেখনী ধারণ করিলাম। কারণ তৃপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিয়াও অশরীরীর কিল ভক্ষণ প্রবাদের অপলাপ আমার ঘোরতর অপছন্দ। মশক নিবারক আচ্ছাদন (মশারি) খাটাইতে অক্ষম হইলেও মস্তিষ্ক খাটাইয়া "কলা" বলিয়া আর একটি রম্য রচনা বিশ্বস্ত বাহক মারফৎ আপনার দপ্তরে যথা সময়ে প্রেরণ করি এবং চাতক সদৃশ আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এপ্রিল সংখ্যায় তাহার মুদ্রণের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তাহা যে বকাণ্ড প্রত্যাশায় পরিণত হইবে কে জানিত। হায় "কলা", তুমি আমায় কদলী প্রদর্শন করিলে!

আমার লেখা কেহ সঙ্গত কারণেই পাঠ বা শ্রবণ করে না। কিন্তু ঋক্ষ (Bear) পান করাইব এই শর্তে গুটি পাঁচ ছয় বয়স্যকে প্রাগুক্ত "কলা" উচ্চ কণ্ঠে পাঠ করিয়া তাহাদের শ্রবণ করিতে বাধ্য করি। উৎকোচের কি অপার মহিমা। প্রায় সকলেই আমার রচনা শ্রবণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল এবং এমত অভিমতও ব্যক্ত করিলেন যে আমি যদি উপযুক্ত সময়ে অস্ত্র (লেখনী) ধারণ করিতাম তাহা হইলে শিব্রাম/সঞ্জীব/তারাপদ তো কোন ছার, রবীন্দ্রনাথও যে রণে ভঙ্গ দিয়া আমার অন্তিম কালের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা করিতেন, তাহাতে সন্ধিগ্ধ হয় কোন ইয়ে। হাস্যবেগ প্রশমিত করার সর্বশেষ আয়ুধ হিসাবে এক মুষ্টি যোগের হদিশ দিয়াছেন পরশুরাম তাঁহার "বিরিঞ্চিবাবা" গল্পে, যাহার সারাৎসার হইতেছে হাস্যবেগকে ক্রন্দনে পরিণত করা এবং ঋক্ষলোভী এক বয়স্য দেখিলাম উদ্‌গত অশ্রুকে নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন। তিনি সফল হইলেন, কিন্তু আমি পরাস্ত হইলাম। কারণ আমার প্রত্যাশা ছিল অভ্রংলিহ। মহাশয় গো! কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত কেন দর্শাইলেন? আমি এখন কী করি? আহারে সুখ নাই, বিহারে লালু এবং মৈথুনে মরিচা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

মৈথুনের কাহিনীর যখন উত্থাপন হইল তখন একটি নির্মম সত্যের উল্লেখ করিতেছি। আমি রেলইঞ্জিন কারখানা চিত্তরঞ্জনে কর্মরত। আমি যখন P.W.I অফিসে ছিলাম তখন নবাগত P W I মহাশয়ের নিকট হইতে যাহা শ্রুত হইয়াছিলাম তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। P W. I. মহেশ মিত্র, যখন দানাপুর ডিভিশনে ছিলেন তখন তাঁহাকে সাময়িক ভাবে অন্য স্টেশনে বদলি করা হয়। নূতন কর্মস্থলের Clerk নব বিবাহিত এবং সে দুইদিন ছুটি মঞ্জুরের আর্জি জানাইয়া দরখাস্ত করিয়াছে। মহেশবাবুর পক্ষে এই ছুটি মঞ্জুর করা সঙ্গত কারণেই সম্ভব ছিল না কারণ তিনি করণিক বিনা কিভাবে কার্য চালাইবেন, যেহেতু তিনি সদ্য আগত। মহেশবাবুর অসাক্ষাতে, নব বিবাহিত করণিক, তাহার ছুটি না-মঞ্জুর হওয়ায় প্রচণ্ড আস্ফালন করে এবং পরদিবসে সে মিত্রমহাশয়কে সুমচিত শিক্ষা দিবে বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করে, যাহা মিত্র মহাশয় রাত্রে তাঁহার ট্রলি ম্যান মারফৎ অবগত হন।

পরদিবসে কম্পিতবক্ষ মিত্র মহাশয় তাঁহার কক্ষ হইতে অবলোকন করিলেন যে তাঁহার ক্রুদ্ধ তথা দর্পিত করণিক একটি আস্ত ইষ্টক লইয়া তাঁহার কক্ষের প্রতি ধাবিত হইতেছে এবং তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া করণিকবাবু রুদ্ররোষে হস্তধৃত সেই ইষ্টকটিকে তাঁহার টেবিলে সজোরে ঠুকিয়া হুমকি দিল যে যদি তাহাকে একান্তই ছুটি না দেওয়া হয় তবে যেন তাহার এমন একটি অঙ্গবিশেষকে ইষ্টকপিষ্ট করা হয় যাহাতে প্রতীক্ষারতা নববধূর সহিত মিলিত হইবার পরিবর্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শনই বাঞ্ছনীয় বোধ হয়। মোটকথা জ্ঞানবৃক্ষের উৎকট ফল ভক্ষণ করিয়া গলদঘর্ম, ইষ্টনাম স্মরণরত রোমাঞ্চিত কলেবর মহেশ মিত্র রাহুমুক্তির রভসে তাঁহার করণিককে বলিলেন, "তুমি তোমার দরখাস্তটি লইয়া আইস। আমি উহা পত্রপাঠ মঞ্জুর করিব।"

"পত্রপাঠ" সম্পাদকের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে প্রাগুক্ত মহেশ মিত্র মহাশয়ের করণিক সগর্জন আস্ফালনে যে মিনতি করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্তে আমার নিবন্ধ মুদ্রণে কোনো বাধা থাকিলে আমার দক্ষিণ হস্ত (অর্থাৎ যে হস্তে লেখনী ধারণ করি) তাহা কর্তনের আজ্ঞা হউক। বিকল্পে একটি অভঙ্গুর আস্ত ইষ্টক (ঝামা হইলেই ভালো হয়) আমার গৃহিণীর নামে পার্শেল করিয়া ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আমার "কলা" পত্রপাঠে মুদ্রিত না হইলে তিনি আর কদাচ আমার শয্যাসঙ্গিনী হইবেন না।

এমতাবস্থায় আপনার অভিরুচির উপর আমার পুনরায় লেখনী ধারণ ও স্ত্রী-সহবাস যুগপৎ নির্ভর করিতেছে

ইতি
ভবদীয়
দেবপ্রসাদ কুমার

পুরনো কাসুন্দি

"জ্ঞানাঙ্কুর" ফাল্গুন ১২৮০ থেকে

আমরা পশু না'ত কি?

আমরা পশু না ত কি?...এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমার বোধ হইল, পশুর মধ্যে যেমন জাতিবিভাগ আছে, মনুষ্যপশুর মধ্যেও তেমনি আছে, এক এক সম্প্রদায়ের মনুষ্য এক এক জাতীয় পশুর সঙ্গে স্বভাবাপন্ন। কোন্ সম্প্রদায়ের মুনষ্যের কোন্ পশুর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তাহা ভাবিয়া আমি যে ফল পাইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি।

ইংরাজদিগকে আমার শিবাবতার হনুমান বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁরা যে সমুদ্র হইতে সক্ষম, তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। হনুমানের কীর্ত্তি আশ্চর্য্য। হনুমান না হইলে সীতার উদ্ধার হইত না; ইংরেজরা এ দেশে না আসিলে ভারতলক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার হইত না—আমাদের নাম উঠিয়া যাইত—আমরা এতদিনে সাঁওতাল হইতাম। ইংরেজরা ইউরোপ হইতে বিশল্যকরণী আনিয়া মৃতপ্রায় ভারতকে জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। এই যে সুখসেব্য, উপাদেয় দেবতাদুর্লভ আম্র খাইব বলিয়া আজ হইতেই উৎসাহ করিতেছি, এ অমৃতোপম ফল হনুমানই এ দেশে আনিয়াছিল। আমরা যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের মধুর রস আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেছি, ইহা অনেকাংশে ইংরেজদের প্রসাদাৎ। মাটির দোষে অনেক আম্র টক্ হইয়া উঠিয়াছে—আমাদের এ পোড়া দেশের জল বায়ুর গুণে ইংরেজী সভ্যতা কোন কোন অংশে আমাদের বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে টক্ আম্র কোন্গুলি জান?—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, সিভিল সারভিস্ পরীক্ষা ইত্যাদি। আমাদিগকে টক্ আম্র খাইতে হয় বলিয়া কিছু আমরা অঞ্জনানন্দনকে গালি দেই না—তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। তিনি আমাদের সুখের কামনাতেই এ ফল আনিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের মাটির দোষ—আমাদের পোড়া কপালের দোষ।.....

আমাদের দেশীয় হাকিমেরা পশুর মধ্যে ছাগল। গ্রীষ্মকালে এক এক ব্যক্তি বানর এবং ছাগল লইয়া ভিক্ষা করিতে আসে, তাহা বোধ হয়, সকলেই দেখিয়াছেন। তাহাদের খেলাগুলি একবার মনে করুন, আপনিই সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। ভূমি হইতে অর্দ্ধহস্ত উচ্চ একখানি সংকীর্ণায়তন কাষ্ঠের আসন পাতে; শিক্ষিত ছাগলটি অতি কষ্টে তাহার উপর চারি পা একত্র করিয়া দাঁড়ায়। বানরটি মাথায় টোপর দিয়া সেই ছাগলের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। বানর চাবুক মারে, কান ধরিয়া টানে—ছাগলটি নিরীহ ভদ্রলোকের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বাঙ্গালী হাকিমেরা সাধারণ লোক অপেক্ষা কিছু উচ্চপদস্থ বটেন, কিন্তু দাঁড়াইবার স্থান বড় সংকীর্ণ; ক্ষমতা অতি অল্প—হাত পা গুটাইয়া থাকিতে হয়। পৃষ্ঠের উপর জেলার বড়২ সাহেব লাগাম দিয়া, কান ধরিয়া—অগত্যা নিরীহ ভদ্রলোকের মতন টুপিওয়ালা বানর বহন করেন। ছাগটির পা একটু সরিলেই অমনি উপর হইতে বানর চাবুক মারে আবার ভিক্ষুক প্রদর্শনকারী চপেটাঘাত করে।....

আমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসূত্রে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে আমার গর্দ্দভ বলিয়া বোধ হয়। গর্দ্দভ অনেক রকমের অনেক বস্ত্র পিঠে বহন করে। একটি গর্দ্দভের ভার নামাইয়া খুলিয়া দেখুন,—অমুক রাজার বাড়ীর এক শত টাকা মূল্যের একখানি শান্তিপুরে শাড়ী, কৃষ্ণকান্ত তর্কালঙ্কারের একখানি ছেঁড়া মলমলের চাদর, ফয়জুল্লা শেখের আধখানি পায়জামা—উত্তম মধ্যম, অধম অনেক রকম বস্ত্র দেখিতে পাইবেন; গর্দ্দভের বাছাবাছি নাই, সে সব বহন করে। কৃতবিদ্য যুবকদলের মধ্যে একটির ভার নামাইয়া দেখুন—সেক্ষপীয়রের একটি প্লে, মিল্টনের দুই ছত্র, কালিদাসের আধখানি শ্লোক, মিল এবং হামিল্টনের দুইটি কথা; গৃহিণী রচিত একটি পদ্য, বটতলার একখানি নাটকেব এক অঙ্ক দেখিতে পাইবেন। গর্দ্দভ অনেক বস্ত্র বহন করে, কিন্তু আপনি উলঙ্গ—ইহার পৃষ্ঠে বিদ্যাবিষয়ক অনেক কথা আছে, কিন্তু আপনি কোন বিষয়ই বাক্যব্যয় করিতে পারে না। এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, 'মহাশয়, অমূক বিষয়ে আপনার মত কি?' বাবু থেলিস হইতে অগষ্টী কোমটী পর্য্যন্ত সকলের নাম করিবেন, সক্রেটিস হইতে হারবার্ট স্পেন্সর পর্য্যন্ত সকলের মত আওড়াইবেন, কিন্তু নিজের মতের বেলা পৃষ্ঠ হাতড়াইয়া দেখিলেন, কেশববাবু কিছু বলিয়াছেন কি না? যদি না বলিয়া থাকেন, তবেই অবাক্।......

আমাদের দেশে যাহারা সমালোচক বলিয়া খ্যাত, তাহাদের অনেকের সঙ্গে আমি কুকুরের সাদৃশ্য দেখি। ইহারা সাহিত্যের দ্বারে প্রহরী—কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখিলেই অমনি ঘেউ ঘেউ করিয়া কামড়াইতে আসে। ভদ্রাভদ্র চিনিতে পারে না; সকলকেই আক্রমণ করে—অভিপ্রায়, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না। এমন বুদ্ধিমান কুকুরও আছে, যাহারা লোক চিনিতে পারে; কে প্রবেশ করিবার যোগ্য, কার প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু এরূপ কুকুর আমাদের দেশে বড় বিরল, বিলাতি কুকুরের এ গুণ আছে বটে।......

রমণীকুলের সঙ্গে আমি শূকরের সাদৃশ্য দেখি। ছোট২ শূকরগুলি দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু বয়স হইলে বড় কদাকার হয়। অল্পবয়স্কা যুবতী দেখিতে বড় সুন্দর—নয়ন ফিরান দুষ্কর, কিন্তু অধিক বয়স হইলে অতি কদাকারা হয়।

অল্প রৌদ্রেই শূকর উত্তপ্ত হইয়া ছটফট করে; রমণী অল্প প্রলোভনেই ব্যাকুল হয়। একটু অধিক রৌদ্র হইলেই, নিদাঘ সন্তাপে শরীর উত্তপ্ত হইলেই, শূকর অমনি দৌড়িয়া গিয়া দুর্গন্ধময় নর্দ্দমায় পড়িয়া শরীরের জ্বালা নিবারণ করে। রমণীর চক্ষের উপর রূপের জ্যোতি জ্বলিলে, রূপরৌদ্রে মন উত্তপ্ত হইলে, অমনি জ্ঞানশূন্য হইযা স্থানাস্থান, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়াই দৌড়িয়া গিয়া পাপ-পঙ্কে পড়িয়া আশু শীতল হয়। নিকটে দেবতাবাঞ্ছিত নির্ম্মল জাহ্নবীর পবিত্র জল রহিয়াছে, শূকর তাহা চায় না—নর্দ্দমাই ভাল। কি আশ্চর্য্য। নরকুলের গৌরব জুলিয়স্ সিজরের ভার্য্যা পাপ ক্রোডিয়সের অনুরাগিণী।

শূকরকে অতি সাবধানে খোঁয়াড়ে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, নহিলে পথ পাইলেই অমনি গিয়া হয় নর্দ্দমায় পড়িবে না হয় বিষ্ঠায় মুখ দিবে। স্ত্রীলোককে অতি সাবধানে অন্তঃপুরে বন্ধ করিয়া শাসনে রাখিও, নহিলে পাপে পড়িয়া শরীর কলুষিত করিবে।.....

ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে আমার বিড়াল বলিয়া বোধ হয়। বিড়ালকে যেমন ইচ্ছা তেমন কবিয়া ফেলিয়া দাও, পায়ে ভর দিয়াই পড়িবে,—আঘাত প্রাপ্ত হইবে না। ধর্ম্মব্যবসায়ী যে ধর্ম্মেরই লোক হউন, তুমি অকাট্য যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে উল্টাইয়া দাও, কিন্তু তিনি পড়িলেও পা পাতিয়া পড়িবেন।

বিড়াল, আলোক অপেক্ষাও অন্ধকারে দেখে ভাল— লোকে বলে, বাত্রে বিড়ালের চক্ষু জ্বলে। ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে পার্থিব কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বড় পাইবে না। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে সমস্ত দিন ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন। 'যজ্ঞোপবীত না ফেলিলে স্বর্গপ্রবেশের অধিকার নাই,' এই বিষয় লইয়া এক ব্যক্তিকে আমি স্বয়ং দুই ঘণ্টা কাল অনর্গল বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি।

বিড়াল, নিষ্কর্ম্মা রমণীর বড় প্রিয়পাত্র। প্রায়ই দেখা যায়, নিষ্কর্ম্মা রমণী মাত্রেরই একটি একটি বিড়াল থাকে। বালকেরাও বড় বিড়ালভক্ত। ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের প্রভাব স্ত্রীলোক এবং বালকের মধ্যেই কিছু বেশী। কথক, রামায়ণ-গায়ক, গুরু পুরোহিতের কথাটা এক বার মনে করুন—ইচ্ছা হয়, বঙ্গদেশের নব প্রচারিত ধর্ম্মের কথাটাও একবার ভাবুন।

শিক্ষকদিগের সঙ্গে আমি গোরুর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। গোরু, পশু হইলেও বড় ভক্তির ধন। গোরু অনেক কাজে লাগে। গোদুগ্ধে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। গোরু না থাকিলে আমাদের দেশে চাষ হইত না—আমাদের অন্নাভাব হইত। শিক্ষকগণ যে কত লোকের অন্নদাতা, তাহার সংখ্যা কে করিবে? ইহাদেরই কৃপায়, ইহাদেরই বলে আমাদের দেশের অনেক লোক অন্ন করিয়া খায়।

অন্য দেশে গোরু নহিলেও চলে—ইংলণ্ডে ঘোটকের দ্বারা চাষ হয়; কিন্তু বাঙ্গালীর গোরু নহিলে উপায় নাই। ইউরোপে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের যেরূপ অবস্থা এবং গ্রন্থে যেরূপ বহুল প্রচার, তাহাতে শিক্ষকের বিশেষ সাহায্য ব্যতীতও বিদ্যোপার্জ্জন করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে বিনা শিক্ষকে চলিবার উপায় নাই।

গোরু যে দুগ্ধ দান করে, তাহা অতি উপাদেয়, কিন্তু গরুর আহার ঘাস। পৃষ্ঠে শর্করাভার, কিন্তু তাহাতে অধিকার নাই; বহন করা মাত্র সার—আহারের বেলায় ঘাস।....

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আমার শৃগাল বলিয়া বোধ হয়। পশুর মধ্যে শৃগাল অতি ধূর্ত্ত—ধূর্ত্ততার বলেই করিয়া খায়; পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা চিরকাল সমস্ত ভারতবর্ষকে ঠকাইয়া খাইতেছেন—ইহাদিগকে আজি পর্য্যন্ত কেহ ঠকাইতে পারিল না। শৃগাল দিবসে সূর্য্যালোকে প্রায় দেখা দেয় না, রাত্রে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া শব্দ করে এবং সুযোগ পাইলে অন্যান্য ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে। যেখানে জ্ঞানের আলোকে

মনের অন্ধকার অনেক দূর হইয়াছে, সেখানে ব্রাহ্মণেরা বড় আধিপত্য করিতে পারেন না; অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকটে বক্তৃতাদি করিয়া কৌশলে অর্থাপহরণ করেন। শ্মশানে অনেক শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার প্রেমপ্রতিমা মানবলীলা সম্বরণ করিয়া তোমার গৃহ শ্মশান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তথায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাতায়াত করিতেছেন। একটি মৃতদেহ পড়িলে, রাজ্যের শৃগাল তাহার চারি পার্শ্বে সমবেত হয়, পরস্পর কলহ করে এবং পরমানন্দে মৃতদেহের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদরসাৎ করে। মানুষশৃগালেরাও মৃত্যুর গন্ধ পাইলে, দলে দলে আসিয়া শ্রাদ্ধবাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন; পরস্পর কলহ, বিবাদ, হাতাহাতিও বাদ যায় না। অবশেষে উত্তমরূপে উদর পূর্ত্তি করিয়া এবং কিঞ্চিৎ নগদ লইয়া প্রস্থান করেন।"

পাজি! এ বয়েসেই ....
আর রাতি নাই?
কাপড় পাড়ি?
বর্ণপরিচয়

যষ্টিমধু, ভাদ্র, ১৩৮৩ থেকে।

আর রাতি নাই

(উপন্যাসখানা দেখিতে চটি, কিন্তু মিলিটারী বুটের মতই মোটা এবং ভারি হইতে পারে)

আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন, নূতন পড়া দিবেন না।

ভাষ্য—

[এই উপন্যাসটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' নামে একটি সংক্ষিপ্ত বা কনডেনসড উপন্যাস-সংকলন-এর প্রথম ভাগ হইতে উদ্ধৃত। এটি ১৪ নং পাঠ। যেমন গান গাহিবার জন্য সা-রে-গা-মা সাধিতে হয়, তেমনি এই উপন্যাস-সংকলনের উপন্যাসগুলি পড়িতে হইলে অ-আ-ক-খ চিনিয়া লইবার ব্যবস্থাও এই সংকলনে আছে। এই সংকলনটি মাত্র পঁচিশ নয়া পয়সায় বিক্রয় হয়—(তাও আজকাল তেমন বিক্রয় হয় কিনা সন্দেহ।) কাজেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া উপন্যাসগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়াছেন। আর ইচ্ছা ছিল ঘরে-ঘরে তাঁহার উপন্যাস যেন লোকে পড়ে। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের idea আর কি।)

এখন মুস্কিল হইয়াছে এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশুদ্ধ পণ্ডিতমশায় হওয়ায় উপরোক্ত উপন্যাসের বহু জিনিস তিনি চাপিয়া গিয়াছেন। সেগুলি একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেই বোঝা যাইবে—কী দারুণ ব্যাপার ইহার মধ্যে রহিয়াছে—যেন ছাই চাপা আগুন।

'আর রাতি নাই'—কথাটি বড়ই অর্থপূর্ণ।

নায়ক এখানে নায়িকার স্বামীর অবর্তমানে তাহার ঘরে রাত কাটাইয়াছে রাতে কী ঘটিয়াছে তাহা 'গীতগোবিন্দ' 'বিদ্যাসুন্দর' এবং হালের বহু উপন্যাসে তাহার সন্ধান পাইবেন। নায়ক যখন দেখিল আর রাতি নাই—তখন সরিয়া পড়িবার তালে থাকিল। বলিল, প্রিয়ে, এইবার আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া আমাকে বিদায় দাও। আর শুইয়া থাকিব না।—আরো, বলিল, 'উঠিয়া মুখ ধুই'। ইহার গূঢ় অর্থ কি? না, গতরাত্রে নায়ক নায়িকার হাতের তৈরী পেঁয়াজসহ মাংসের চপ কাটলেট প্রচুর ভক্ষণ করিয়াছে মদ্যের চাট হিসাবে। কাজেই মুখে মদ্যের ও পেঁয়াজের দুর্গন্ধ। এই অবস্থায় বাড়ি ফিরিলে ঘরে গৃহিণী ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে।—এখানে কলিনস, রথফেন বা নিমটুথপেষ্টের কথা যদি বিস্তৃত-উপন্যাসে প্রকাশক ব্যবহার করেন, তবে তিনি উক্ত কোম্পানী হইতে পাবলিসিটির জন্য বেশ কিছু মারিতে পারেন।—তারপর আরও অশ্লীল ব্যাপার লেখক গোপন করিয়া গিয়াছেন। বলি, 'মুখ ধুইয়া কাপড় পরি'—কথাটির কী অর্থ? অর্থাৎ এতক্ষণ নগ্নই ছিল নায়ক। (এখানে পুরুষের নগ্নতা লইয়া ফর্মা পাঁচেক গোঁজানো যাইতে পারে) এবং নায়ক মদের ঘোরে মুখ ধুইবার সময়ও কাপড় পরিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কি সর্বনাশ! তারপর 'কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি'—কি পড়িতে বসি? কোন সিনেমা পত্রিকা নিশ্চয়ই, যাহাতে ফিল্মষ্টারদের মজাদার ছবি আছে। এবং 'পড়া বলিতে না পারিলে গুরু মহাশয় রাগ করিবেন।'—এই কথাটি দ্ব্যর্থক। মানে, রকে গুরু অর্থাৎ ওস্তাদের কাছে বোকা বনিতে হইবে। কিংবা নায়ক তার প্রেমের গুরু বা নায়িকার কাছে প্রেমের পাঠ ঠিক মত দিতে না পারিলে 'আর নূতন পড়া দিবেন না।'—অর্থাৎ আর কাছে ঘেঁষিতে দিবে না। (Vide–বৈষ্ণব পদাবলী : রাধিকার মানভঞ্জন, বিরহ ইত্যাদি।)

অতএব পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন এই উপন্যাসটি বড়দের জন্যই লিখিত। অথচ বিদ্যাসাগর মহাশয় এটি কী অদ্ভুত কৌশলে ভালমানুষ সাজিয়া এত দিন ছেলে-মেয়েদের বখাইয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগ এত দিনে এই কারচুপি ধরিতে পারিয়াই তো এই 'শিশু পাঠ্য' পুস্তকটীকে নাকচ করিয়া দিয়াছেন বইখানিকে যে নিষিদ্ধ করিয়া দেন নাই—তাহা বর্ণপরিচয় ও বিদ্যাসাগরের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য বলিয়াই ধরিতে হইবে।

এই ভাষ্যও চটি বা বড়জোর স্যাণ্ডেল আকারেই দিবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু লিখিতে লিখিতে মিলিটারীবুটের মত হইয়া গেল। যাক, G. B. S-ও তো দশ পাতার নাটকের জন্য একশো পাতার ভূমিকা লিখিয়াছেন। —য-ম-স]

বইয়ের নিয়তি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

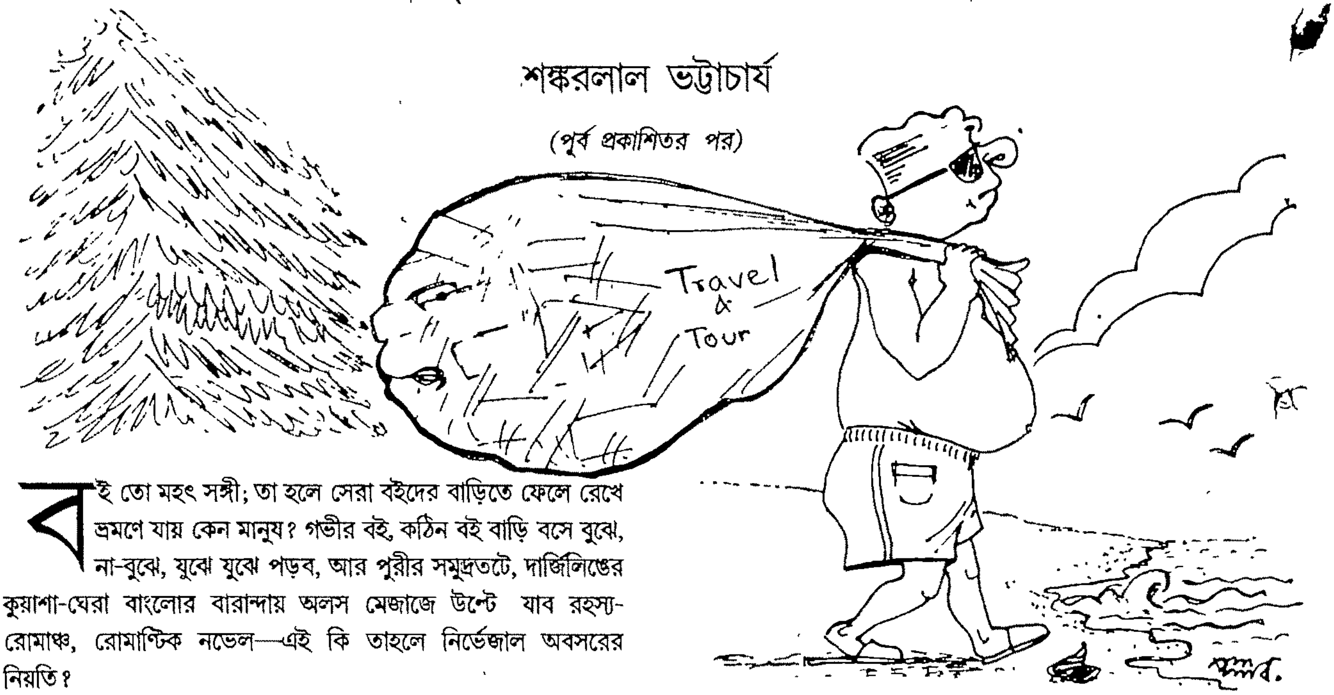

বই তো মহৎ সঙ্গী; তা হলে সেরা বইদের বাড়িতে ফেলে রেখে ভ্রমণে যায় কেন মানুষ? গভীর বই, কঠিন বই বাড়ি বসে বুঝে, না-বুঝে, যুঝে যুঝে পড়ব, আর পুরীর সমুদ্রতটে, দার্জিলিঙের কুয়াশা-ঘেরা বাংলোর বারান্দায় অলস মেজাজে উল্টে যাব রহস্য-রোমাঞ্চ, রোমান্টিক নভেল—এই কি তাহলে নির্ভেজাল অবসরের নিয়তি?

ছেলেবেলায় একটু চমকে ছিলাম জওহরলাল নেহরুর রেলসফরে পড়ার বহরের কথা পড়ে। নিজের সংরক্ষিত, নির্জন কামরায় নেহরু সাহেব প্রায় ছোটখাটো একটা লাইব্রেরি নিয়ে বেরোতেন, বেবোবার প্রাকমুহূর্ত অবধি জানতেন না ওর মধ্যে থেকে শেষ অবধি কোন বইগুলো মাথার উপর ল্যাম্প জ্বেলে পড়তে পড়তে চলে যাবেন যেখানে যাবার।

পরে একটু বড় হয়ে একা একা কি সঙ্গীদের সঙ্গে রেলভ্রমণে বেরিয়ে বুঝেছি যে দীর্ঘ যাত্রায় একটা সময়ের পর কথায়, বিশ্রামে, ঘুমে কি জানালার বাইরে চোখ মেলে বসে থাকায় ক্লান্তি আসে। আর তখন, সেই সময়টা, বই পড়ার পক্ষে বাস্তবিকই Quality time। এরকম আরো কিছু লম্বা সফর শেষে এও টের পেলুম যে ওই গুণান্বিত সময়ে নিছক বিনোদনের পড়া সারলে জীবনের একটু আধটু অপব্যয়ও ঘটে যাওয়া সম্ভব।

আসলে সবটাই নির্ভর করে বাইরের গতির সঙ্গে মানিয়ে কে কী পাঠে স্বস্তি পায় তার ওপর। ভি এস নায়পল, যিনি নিজে প্রধানত ঔপন্যাসিক এবং খুব বড় ঔপন্যাসিকও বটে, অন্যের লেখা উপন্যাস পড়ার একটাই ভালো সময় দেখেন—প্লেনে উড়তে উড়তে বন্দী দশায়। ভাবখানা এমন যে, সময়টা যখন গোল্লায় গেছেই তখন ওই ফাঁকে উপন্যাস পড়ার ঝামেলা মিটিয়ে ফেল। নায়পল এও বলেছেন যে অধিকাংশ উপন্যাসই তিনি শেষ অবধি পড়ে ফেলতে পারেন না। যেখান থেকে বোঝেন যে এ-পড়া আর চলে না তিনি বই বন্ধ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলেন।

তাতে মানে এই দাঁড়ায় যে, নায়পলের কাছে সত্যিকারের পড়ার কাজটা বাড়িতে সারার ব্যাপার, গতির মধ্যে তিনি কোনো Quality time খুঁজে পান না। অবিশ্যি এও সত্যি যে রেল এবং প্লেনের গতির ভিন্নতা যাত্রীর পাঠমেজাজেও তফাৎ গড়ে দিতে পারে। আমি নিজেও দেখেছি বিদেশযাত্রার দীর্ঘ উড়ানে বায়ুতে ভাসতে ভাসতে এক ধরনের নির্ভার স্ফূর্তি, Levitation গড়ে ওঠে মনে, যেন নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার উপর আলোর নাচন দেখতে বড় শখ হয়, বই পড়াকেই বিচ্যুতি বা distraction জ্ঞান হয়।

স্টিফেন হকিঙ্গ-এর 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' বা 'ব্ল্যাক হোলজ অ্যাণ্ড বেবি ইউনিভার্সেজ' আমার অত্যন্ত প্রিয় দুটি বই; তা বলে কি রাতের উড়ানে আকাশ বেয়ে যেতে যেতে রাতের আকাশ (প্লেন থেকে দুর্ভাগ্যবশত রাতের আকাশের প্রায় কিছুই দেখা যায় না) না দেখে আমি ওই বইয়ের পাতা ওল্টাতে পারব? মনে হয় না।

এই আপেক্ষিক জগতে সব কিছুর মতো গুণান্বিত, মূল্যবান সময়ও বোধ করি আপেক্ষিক। আজ থেকে ঠিক উনিশ বছর আগে পুরীর সমুদ্রতটে (বি এন আর হোটেলের দিকে যে পান্থনিবাস, তার জনবিরল সৈকতে) স্ত্রীর সঙ্গে বসে শীতের রোদমাখানো সমুদ্র দেখছিলাম। অবসরকে মহিমান্বিত করার মতন আর সময়কে স্তব্ধ করার মতন ওরকম আয়োজন কল্পনাও করা যায় না; অথচ অদূরে দেখি এক পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়সের সাহেব প্রকৃতিতে নয়, অসহায়ভাবে ডুবে আছেন দার্শনিক আইজায়া বার্লিনের এক পৃথুল রচনাসংগ্রহে। ভদ্রলোক যে শুধু বই পড়েই সমুদ্র উপভোগ করছিলেন তাও নয়, মাঝে মাঝেই বই বন্ধ করে তিনি সাঁতরে চলে যাচ্ছিলেন দূর-দূরের সব মাছধরা নৌকার কাছাকাছি। ওঁর এই মেধা-শরীরের ভারসাম্য দেখে কিছুটা অবাক না হয়ে পারিনি।

অবশেষে সাহেব নিজেই এক সময় পড়া আর সাঁতার ছেড়ে এসে আলাপ করলেন আমাদের সঙ্গে। জানলাম তিনি ফ্রান্সের বর্দো শহরের লোক, সমুদ্র দেখলেই উতলা হন। পেশায় তিনি অর্থনীতিবিদ, পৃথিবীর প্রথম পনেরো-কুড়িজনের মধ্যে ওঁর নাম আসে। সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এসেছিলেন কেরলে, সে পর্ব শেষ হতে পুরীর সৈকত দেখার শখ মেটাতে চলে এসেছেন এখানে। মনে আছে ওই আলাপের সময় দুটো কথা বলেছিলেন ভদ্রলোক যা আজও ভুলিনি। এক, বললেন, আপনাদের অমর্ত্য সেনকে ওরা নোবেল না দিয়ে পারবে না, তবে আরও কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখবে। আর দুই, বললেন, আমার সেরা পড়াগুলো জমিয়ে রাখি ছুটির দিনগুলোর জন্য। জটিল, কঠিন, গভীর বইরাই তো আমাদের ছুটিগুলোকে মূল্যবান করে।

এই সব কথাই ভিড় করে এল মনে সদ্য প্রকাশিত 'দ্য পেঙ্গুইন ডিকশনারি অফ ফিলোজফি' বইটা হাতে আসতে। টমাস মাওটনার সম্পাদিত সাড়ে ছ'শো পাতার বইটা হাতে নিতেই একটা রেলসফরে বেরিয়ে পড়ার বাসনা জাগল। আহা রে, এইটা নিয়ে যদি জগন্নাথ এক্সপ্রেস কি দার্জিলিঙ মেলের স্লিপারে শুয়ে পড়া যেত। আর দু' দু' কলামে ভরানো পাঁচটা পাতায় এক অপূর্ব ঝলক পাওয়া যেত পাশ্চাত্য দর্শনের সম্ভবত দুরূহতম চিন্তক ইমানুয়েল কান্টের জীবন ও ভাবনা সম্পর্কে।

কান্ট নিয়ে ওই কটা সামান্য পৃষ্ঠায় এক আশ্চর্য সারাংশ বটে। দার্শনিকের সামগ্রিক কাজ সম্পর্কে খুব নিটোল আলোচনা ঠিকই, সেই সঙ্গে একটু কি রসিক মন্তব্যও নেই? কান্ট সম্পর্কে পুরোনো কথাটা কী সুন্দর তুলে দিয়েছেন শেষ দিকে ওই entry-র লেখক মানফ্রেড কুয়েন—'You can philosophize with Kant, or Philosophize against him. but you can not philosophize without him.'

যেহেতু অভিধান, তাই অক্ষর ধরে ধরে এগোনোই সমীচীন; কিন্তু এই বইটির ক্ষেত্রে অন্তত প্রথমাক্ষর A-তেই যে এত বৌদ্ধিক বিনোদন লুকিয়ে থাকবে তা বইটি হাতে না এলে কি মালুম হত? চতুর্থ এণ্ট্রিই দাঁড়িয়েছে absolute, ষষ্ঠ প্রয়োগ abstract, সপ্তম abstraction, অষ্টম absurd. এই শব্দগুলোর দার্শনিক অর্থ, তত্ত্ব, বিবরণ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ যে কী তা সংক্ষেপে বলার ধরনটাও অবাক করে। Absolute-কে 'God of the philosophers' বলা হয় দার্শনিকি সমাজে তাও বলা হয়েছে, তারপর বন্ধনীর মধ্যে আলতো করে শোনানো হয়েছে কীভাবে এই অ্যাবসোলিউট বা চরম ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায় ব্লেজ পাস্কালের গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতির অভিজ্ঞতায় ধরা God-এর থেকে।

না, আমি ভ্রমণের পাঠ হিসেবে পেঙ্গুইন ডিকশনারির উল্লেখ করতে গিয়ে বইটার রিভিউ তৈরির রাস্তায় ঢুকেছি, যেটা একেবারেই আমার লক্ষ্য নয়। আমি রাস্তা বদলানোর আগে শুধু দু'জন আলোচকের নাম করব। এক, ডেভিড পিয়ার্স, যিনি দার্শনিক ভিটগেনস্টাইনের এক বিশ্রুত ব্যাখ্যা, এবং ভিটগেনস্টাইনকে নিয়ে বই লিখেছেন। আর দুই, আইজায়া বার্লিন, যিনি লিখেছেন.... আইজায়া বার্লিনকে নিয়েই।

ভ্রমণের অবসরে কঠিন বই পড়ার যুক্তিও জনে জনে পৃথক হবে নিশ্চয়ই। আমার নিজের আনন্দের ধরনটা বলতে পারি। সামনে নীল সমুদ্র, সোনালি তট, উজ্জ্বল রৌদ্র—এর থেকে চোখ ফেরানো দায়, মগজে ভর করে আসে স্মৃতির আরাম।

এহেন আরাম ও আনন্দ দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করাও কঠিন, কারণ এত তীব্র সুখ হঠাৎ হঠাৎ ক্লান্ত করে ফেলে, ফলে ঘুম আসে। তখন, ঠিক তখনই, খুব মেধা ও মনোযোগে কিছু পড়ার সময় তৈরি হয়। খুব লম্বা-চওড়া সময় ধরে পড়তে হবে এমনও নয়, কিন্তু পড়তে পারলে এক ধরনের সুখ দিয়ে আরেক ধরনের সুখবোধের সঙ্গে যোঝা যায়। মনে রাখা কর্তব্য, কোনো সুখ অন্য সুখবোধকে শুধু বাড়ায়ই না, প্রয়োজনে সংযতও করে।

দার্শনিক বোয়েথিয়স তাঁর 'কনসোলেশনজ্ অফ্ ফিলোজফি'- তে দর্শনের এমন কোনো ভূমিকার কথা বলেননি ঠিকই, কিন্তু দর্শনচর্চার আনন্দের কথা বলেন না এমন দার্শনিক সত্যি কি কেউ আছেন? ভারতের ন্যায়-বৈশেষিকরা তো বলতেনই, অন্য ধারার দার্শনিকরাও জ্ঞান ও আনন্দকে সমীকৃত করেছেন। একটা চরম কথা বলেছিলেন পাশ্চাত্যের সক্রেটিস; বলেছিলেন যে দর্শনচর্চা হল মৃত্যুর খোঁজে বেরোনোর সামিল।

মনে আছে পান্থনিবাসের সমুদ্রমুখী বারান্দায় বসে দেকার্তের 'ডিসকোর্স অন মেথড' আর 'মেডিটেশনজ' পড়তে পড়তে দুই ভিন্ন জাতের আনন্দের দ্বৈরথ অনুভব করেছিলাম ভেতরে ভেতরে। সামনের দৃশ্য টানছে, সৌন্দর্যে, যার ব্যাখ্যা করাও অসম্ভব, আর দেকার্তের গদ্য ও যুক্তি টানছে ক্রমশ অপর এক রহস্যময় সৌন্দর্যে, যার নাগাল পাওয়া কঠিন, কিন্তু যার পরিবেশ, গঠনে ও শিকড়ে এক অপ্রতিম আনন্দ।

আজও 'ডিসকোর্স অন মেথড' পড়তে গেলে সেই স্মৃতি ফিরে আসে, তাই অত্যন্ত ব্যক্তিগত আদুরে অর্থ নির্মাণ করি আমি দার্শনিকের সেই উক্তির : 'I think, therefore I am' অর্থাৎ 'আমি ভাবি, তাই আমি আছি'। পুরীর তটের বিস্তীর্ণ সৌন্দর্যের কারাগারে বন্দি আমি একটা বই পড়ছি আর ভাবছি... আর তাই আমি আছি। না হলে এই আনন্দের বন্যায় ভেসে গিয়ে কোথায় থাকতাম আমি, হায়!

ভালো বই-ই, একেক সময় মনে হয়, ঠিকঠাক পাল্লা দিতে পারে গভীর পরিবেশের সঙ্গে। বাড়ির একটা বিশেষ ঘর, সেই ঘরের একটা বিশেষ কৌচ, সেই কৌচে গা এলিয়ে দিনের একটা বিশেষ সময়ে এক ধরনের বই—এই হল আমার কাছে সুখের এক সেরা ছবি। আমার পিতৃদেবকে দেখতাম হাজারো আইনি দলিল দস্তাবেজ আর বই ঘাঁটাঘাঁটির পর একেবারে নিজস্ব সময়ে যখন দর্শনের বা অঙ্কের বই নিয়ে বুঁদ হয়ে বসতেন তখন তাঁকে পৃথিবীর সব চেয়ে সুখী মানুষ মনে হত। সবার পক্ষে তখন বারণ ছিল তাঁকে কোনো কারণে ডাকাডাকি করা। অথচ দূর থেকে বাবার ওই মূর্তিটাই আমাকে সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করত বাল্যে।

এই পড়ুয়া বাবাই কিন্তু বেড়াতে গেলে সব বই রেখে যেতেন পিছনে। ভ্রমণে যাওয়া মানেই ছিল সমুদ্র নদী পাহাড় কি অরণ্য দেখা এবং বিশেষ বিশেষ নিসর্গের মুখোমুখি হয়ে স্মৃতির থেকে গদ্য পদ্য শাস্ত্র উচ্চারণ করা যেমন মনে আছে দার্জিলিঙের ম্যালে দাঁড়িয়ে তাঁকে ১৯৫৫-র গ্রীষ্মে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম স্বামী বিবেকানন্দের 'কালী দ্য মাদার' কবিতা। সে দৃশ্য আমি কোনোদিনও ভুলতে পারব না।

ফলে শেষমেশ সেই শুরুর সমস্যাতেই ফিরে যেতে হয়—ভ্রমণের, অবসরের Quality time-কে সব চেয়ে ভালো ভরায় কীসে? হাল্কা পড়া, ভারি বই, নাকি বইহীনতা? নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বললাম ঠিকই, কিন্তু শেষ অব্দি মনে হচ্ছে যা বললাম তা নিতান্তই ব্যক্তিগত; ভ্রমণ কিংবা বই পড়ার মতো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত করা ভ্রমণের জায়গা কি সেই ভ্রমণের সঙ্গী বই বাছার চেয়ে কিছু কম সমস্যা নয়।

(ক্রমশ)

সাহিত্য দুঃসংবাদ

পাগলী, তোমার সঙ্গে

ইংরাজি আজ বিদেশি নয়। বরং আমাদের দেবভাষা। ফলত 'জয়' বলতেই 'আনন্দ'। আনন্দ আনন্দ আনন্দ এবং আনন্দ। যা বলি তা-ই শোনে —কী আনন্দ। নিজস্ব খেউড় থেকে লে হালুয়া জীবনের পাঁচালি—যা লিখি তা-ই ছাপে—কী আনন্দ। পাগলের প্রলাপ, বৃষ্টিতে ভেজার ল-ম্-বা কব্‌তে হয়ে 'পাগলী, তোমার সঙ্গে'; যা ছাপাই তাতেই পুরস্কারের হুক—আহা, আহা, কী আনন্দ। সুতরাং, চারিদিকে এখন শুধুই 'আনন্দ'—শুধুই 'জয়'—আর শুধুই ব্যবসার দ্যুতক্রীড়া।

এহেন 'ব্যবসা তোমার সঙ্গে', থুড়ি, 'পাগলী তোমার সঙ্গে' বাংলা সাহিত্যের এক দিক নির্দেশকারী গ্রন্থ। কবিতার সংজ্ঞা ঠিক কী কিংবা কবিতাকে আদৌ সংজ্ঞায়িত করা যায় কিনা, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে সুধীন দত্ত বা বুদ্ধদেব বসু সেই চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় সক্ষম হননি। অথচ, কবিতা পদার্থটি গন্ধতেল না ক্রীমক্র্যাকার, তা অনুধাবনের সঠিকতম পথ আমরা পেয়ে যাই উক্ত গ্রন্থ পাঠের সাথে সাথেই। কী অনায়াস ভঙ্গিতে 'জয়,' থুড়ি, 'আনন্দ' আমাদের বুঝিয়ে দেন কবিতার গাঢ়তম প্রদেশের গূঢ় অর্থটি। প্রকৃত পক্ষে, কবিতা যে পথপ্রান্তে অপেক্ষারতা নৈশকালীন প্রসাধন লীলার ফ্যাক্‌সিমিলি সে বিষয়ে আর সন্দেহই থাকে না।

সত্যিই, এমন গ্রন্থের যিনি প্রণেতা, কবিতাকে এরূপ অনবদ্য (তথা চূড়ান্ত) অর্থে ব্যবহারের যিনি রূপকার, তিনি প্রণম্য। আর কবিতার এই 'বাহারি' সংস্করণের নামকরণও যেমন সঠিক (বিশেষ সুড়সুড়িযুক্ত ক্রেতার কাছে) তেমনিই সঠিক এর মূল্য পরিবর্তন পদ্ধতি। পুরস্কার লাভের সাথে সাথেই পঞ্চাশ থেকে নগদ একশোর অ-(অত্যন্ত) শোভন সংস্করণ। অভাবনীয় দ্বিগুণ লাভের এই অন্বেষণ। অসাধারণ কবিতার বেসাতি। সুস্মিতা সেন, বিশ্ব সুন্দরী হবার পরও ঠিক এই পথেই ভারতীয় 'মাংস'-এর দর বিশ্ববাজারে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল।

কিন্তু যা দুঃসাধ্য তা হল এই কবিতামালার অনুভূতি ব্যাখ্যা। কবির জীবন কাটানোর পাঁচালি পাঠে অধম পাঠকের অবস্থা হয়ে ওঠে অবর্ণনীয়। স্বয়ং কবির মাধ্যমেই পাঠক যেন এক অদৃশ্য র‍্যাগিংয়েরই সম্মুখীন—"মারহাব্বা কাটা ঘা-য় শোভানাল্লা ছিটে ছিটে নুন।" ইচ্ছামতো যা কিছু শব্দ সজ্জাই যে কবিতা হতে পারে, সে অভিজ্ঞতায় পাঠক হন অভিভূত। বিবিধ বিশেষণে তৎক্ষণাৎ কবিকে ভূষিত করতে মন আনচান করে। এমতাবস্থায় স্বয়ং কবিই চিৎকার করে ওঠেন—

"পাগলী, তোমার সঙ্গে চারঅক্ষর কাটাব জীবন।"

পৃথক বিশেষণের আর কোনো দরকারই পড়ে না।

কবিতার শুকনো পাতা, ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখ পড়ে শুকনো পাতার ডালে—

"আবার আমার ডাল কাঁপছে, সমস্ত ডাল কাঁপছে আমার—
কিন্তু বলো বসন্ত দিন, তার সঙ্গে তলিয়ে যাবার উপায় আমার কই।"

উপায় খুঁজতে খুঁজতে পুনরায় সন্ধান পাই—

"কী ক'রে আজ আবীর দেব
তোমাদের ওই বান্ধবীকে।"

অথবা

"..... —ঘুম পাচ্ছে—
বলো কখন মুখ রাখব
তোমার কোলে।"

এই পরোক্ষ প্রশ্নবাণে কবির জন্য সত্যই ভাবনা হয়। তাঁর মাথা হয়ত বা ঈষৎ গরম। কিন্তু শরীরের উষ্ণতা তারও বহুগুণ ঊর্ধ্বে। তিনি একথা নিশ্চিৎ বুঝেছেন, "আলাপ তো নরমাংস ভোজে।"

ফলত, পাগলীর সাথে তিনি যে 'ব্রহ্মচারী' নয়, 'আদম্-ইভ' জীবনই কাটাবেন তা বলাই বাহুল্য।

তবে, প্রকৃত প্রশ্ন অন্য স্থানে। পাগলীর সাথে তিনি না জানি কত কী করবেন। কত প্রকার জীবনই না কাটাবেন। কিন্তু কবে সেই জীবনের শুভারম্ভ তা ঈশ্বরই জানেন। কারণ, এখনো পর্যন্ত তিনি পাগলীর সঙ্গে সেই পথেই শুধুমাত্র হেঁটেছেন, যে পথে "এক পা গেলে ফিসফাস হয়, তিন পা গেলে গল্প রটে।" এ ছাড়া আর সব কিছুই তাঁর ভবিষ্যৎ কল্পনা। ফলত সেই 'ভোরভঁয়ো' দিনের অপেক্ষায়—কোনো এক অজ্ঞাত মহাপ্রলয়ের দুঃস্বপ্নে—ভয়ে, সত্রাসে অতিবাহিত হচ্ছে আমাদের জীবন। জানি না, কী কাণ্ডটাই না ঘটবে ওই দিন যাপনের প্রারম্ভে......।

তবে আপাতত যেমন চলছে চলুক। শীতল পানীয়ের মতো কবিতাও বিজ্ঞাপিত হোক। হৃত্বিক রোশনের মতো ম্যাচো-ফিগার দুলিয়ে নেচে উঠুন জয় গোস্বামী। হাতে উঠে আসুক পুরস্কার। আকাশে আকাশে লেখা হোক নতুন কবিতা—

"যো চাহে হো জায়ে
আকাদেমি এন-জয়।"

সুস্নাত চৌধুরী

পাছে তাঁরা বাইরে টিউশনি করে টু পাইস রোজগার করে ফেলেন সেই জন্যে কোনো কাজ কম্মো ছাড়াই তাঁদের লেজ ধরে কলেজে কম পক্ষে পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখার সুব্যবস্থা হচ্ছে।

শিক্ষা দুঃসংবাদ

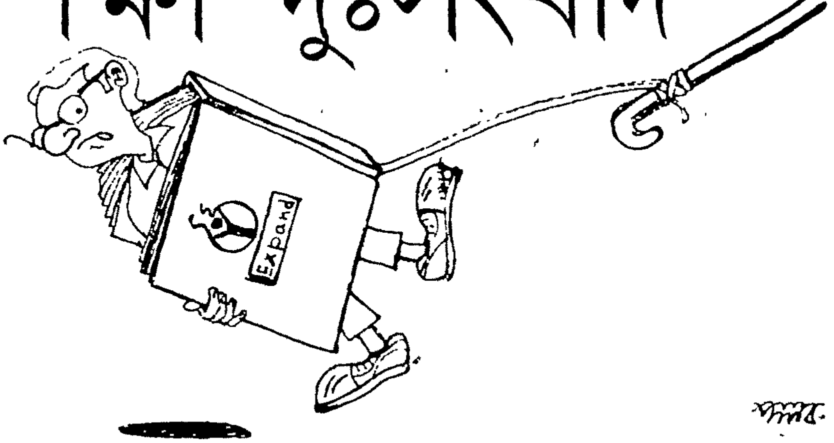

আনন্দ সংবাদ। আনন্দ সংবাদ। আনন্দ সংবাদ!

পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ কলকারখানার হাজার হাজার বেকার যুবকদের জন্য একটি সুসংবাদ আছে। সুসংবাদটি হচ্ছে এই—খুব শীঘ্রই তাদের স্বনিযুক্তির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘুচবে।

বর্তমান বিধানসভার শিক্ষামন্ত্রী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং নিষিদ্ধ করে একটি বিল আনার কথা ঘোষণা করেছেন। এই আনন্দে ঘোষণাটি সম্যক জানার আগেই আমরা একপাক গৌর-নেত্য সেরে নিতে পারি। ঘোষণাটি এতই প্রাণহারিণী যে বিভিন্ন মহলে এর ফলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এখন থেকে প্রাইভেট কোচিং কবতে পারবেন কেবলমাত্র বেকার ছেলেমেয়েরা। এক্ষেত্রে চোখ কপালে তুলে আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে প্রাইভেট কোচিং-এ সরকারের কোনো আপত্তিই নেই। আপত্তি থাকবে কোন দুঃখে? আপত্তি থাকলেই বিপত্তি । বেশিরভাগ স্কুল-কলেজে পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। কর্মচারীদের নেই কর্মসংস্কৃতি । ছাত্র সংসদ নামক একটি শিখণ্ডী খাড়া করে পার্টিবাবুদের সেখানে অগাধ দাপাদাপি। চাপাচাপিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত শিক্ষকদের। এই দুর্বল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চাপে রাখতে সকলেই ভালো বাসেন। দরকারে সরকারও।

অনেকে মনে করছেন এই বিলের পিছনে আমাদের এই রাজ্যের শিল্প মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ও সমর্থন আছে। তিনি নাকি তাঁর কগ্ন ছেলেমেয়েদের পুনর্বাসনের এই অভিনব উপায়টি মগজ থেকে ঢের ঢের বুদ্ধি খাটিয়ে বের করেছেন। তিনিই স্বনিযুক্তির মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন । এখন প্রাইভেট কোচিং-এর কারখানায় ছেলেমেয়েরা ড্যাংডেঙিয়ে উৎপাদনে নেমে পড়বেন। সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না— কেয়াবাত কেয়াবাত—বহুৎ খু বহুৎ খু।

মুগ্ধ ভক্তরা শিল্পমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং আগামী দিনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী রূপে দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে আমরা এমন সব আজব আজব ভোজবাজি দেখার জন্যে রীতিমতো মহড়া শুরু করতে পারি। বলা যায় না, হঠাৎ হঠাৎ এমন সব আশাতীত ব্যাপার-স্যাপার দেখে মুচ্ছো যাই।

কিন্তু ছাত্র, অভিভাবক, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের গৃহিনী এবং স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষের মাথায় এর ফলে অকস্মাৎ বজ্রপাত।

এ যে জন্মগত অধিকার হরণের চেষ্টা! সংবিধানের আর রইলটা কী! অভিভাবকরা গোছা গোছা টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটরের স্থান কেনাকাটা করে থাকেন। যেহেতু তাঁরা ক্রেতা সুতরাং বাজার থেকে শ্রেষ্ঠ জিনিসটি কেনার অধিকার তাঁদের হরণ করে কোন ইয়ে! স্কুল-কলেজের তুখোড় মাস্টারদের ছেড়ে পাড়ার বেকার ছেলেমেয়েদের হাতে নিজের ছেলেমেয়েদের অন্ধকার ভবিষ্যতের ভাবী দায়িত্বটি দিতে তাঁরা নিতান্তই নারাজ।

শিক্ষক-গিন্নিদের প্রতিক্রিয়া বড়ই মর্মস্পর্শী। ভোটের আগে এই সব্বোনাশা খবরটি পেলে তাঁরা হাড়ে ডুগডুগি বাজানোর ব্যবস্থা করতেন। তাঁরা নাকি "মানছি না মানব না" গোছের একটি সমিতি গঠন করার তালে আছেন। অ্যাদ্দিন ধরে স্বামীর এই সব টু-পাইসেই না তাঁদের একটু সুখের মুখ দেখা। একটা ফ্ল্যাট কষ্টেসৃষ্টে একটা মারুতি, দশটা নঃ পাঁচটা নয় সবেধন নীলমণি একখান মাস্তর। তাও সয় না হিংসুটেদের। লোকে মদ বেচে লাল হয়ে যাচ্ছে তার বেলা আহ্লাদে আটখান, শুধু দুটো পড়া বেচলেই গেল গেল রব! কেন রে বাপু, পড়া কি মদের চেয়েও বিচ্ছিরি?

এদিকে স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ একগলা জলে। যদি সত্যিই এমন কেলেঙ্কারিয়াস আইন চালু হয় তাহলে তাঁদের কি হাল হবে? বিশেষ করে কলেজে সব ছেলেমেয়ে ঠিকঠাক হাজরে দেয়না বলে ঢের ঢের বেশি

ভর্তি করানো হয়ে থাকে। দুটো পয়সারও আমদানি হয়। এখন সব ছেলেমেয়ে যদি এসে হাজির হয় তো বসানো হবে কোথায়। তাদের বসানোর ভাবনায় যে নিজেদেরই পথে বসার যোগাড়। লাইব্রেরিতে সেই পরিমাণ বই নেই, প্রয়োজন অনুপাতে ঘর নেই, ফলে প্রতিদিনই আট ঘণ্টা লেগে থাকবে বিক্ষোভ। এমনিতেই লেগে আছে, তার ওপর ডিগ্রিটা শুধু কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। তারপর মাস্টারমশাইরা। পাছে তাঁরা বাইরে টিউশনি করে টু পাইস রোজগার করে ফেলেন সেই জন্যে কোনো কাজ কম্মো ছাড়াই তাঁদের লেজ ধরে কলেজে কম পক্ষে পাঁচ ঘণ্টা আটকে রাখার সুব্যবস্থা হচ্ছে। এঁরা ইতিপূর্বে ভদ্রলোকের মতো নিজের ক্লাসটি নিয়ে সুট করে হাওয়া হতেন। এখন থেকে কলেজে বসে কাজকম্মো খুঁজে পা পেয়ে মুহুর্মুহু অধ্যক্ষের ঘরে হানা দেবেন—এটা চাই, সেটা চাই, এটা হয়নি কেন, সেটা পাইনি কেন—ইত্যাদি উচ্চকণ্ঠ প্রণয়-গীতি সহকারে। অধ্যক্ষের কাজকর্ম এমনিতেই ছাত্রদের চাপে লাটে, এবার উঠবে খাটে। সকলকে বসতে দেবার জায়গা নেই, সব ঘরে ঝাঁটও পড়ে না, অনেককেই এমনকি খাবার জলটুকুও ব্যাগে করে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। কেঁচো খুঁড়তে কত যে সাপ বেরোবে।

রাজ্য সরকার অবিশ্যি এই সমস্যাটা অন্য ভাবে দেখছেন। রাজ্য সরকাবের জনৈক প্রতিনিধি এই সমস্যার গভীরতা স্বীকার করলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না বলে জানালেন। তাঁরা তক্কে তক্কে আছেন যে এই অবস্থা হলে জ্ঞান- পিপাসু ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা বাধ্য হবেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে। আগামী দিনে আরও নতুন নতুন ইংরাজি মিডিয়াম স্কুল তৈরি হবে। নতুন নতুন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তৈরি হলে দু'রকমের সুবিধে। প্রথমত সরকারি অনুদান পাওয়া ইস্কুলগুলো আস্তে আস্তে পটল তুলবে। ফলে সরকারের খরচ ঢের ঢের কমে যাবে। এছাড়া ইংলিশ মিডিয়ামে পেকে ওঠা ছেলেমেয়েরা সর্বভারতীয পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গকে একেবারে টঙে তুলে টাঙিয়ে দেবে। অবশ্য কিছুদিন বিরোধীপক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরাজি ফিরিয়ে আনার জন্যে খুব চেল্লামিল্লি করবে। মিডিয়াগুলোও কিছুদিন এই নিয়ে বেশ আচার খাইয়ে বাজার গরম করবে। কিন্তু কে জানে এ সবই সাময়িক। লোকে কিছুদিন পর বেবাক ভুলে যাবে এসব, তাতে অবাক হবার কিচ্ছুটি নেই।

কিন্তু মেডিক্যাল কলেজগুলোর ডাক্তার-অধ্যাপকদের বেলা? টিউশনিতে আর ক'পয়সা? দুশো, চারশো, ছ'শো—এ চেম্বারে দু'ঘণ্টা সে চেম্বারে একঘণ্টা, গাড়ি একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে তিনটে, বাড়ি—একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে........ মরেচে! এ যে ধারাপাত শুরু হল। শুনতে শুনতে শেষে বারোয় পৌঁছব নাকি? বারোটা ? বাজবে শেষে আমাদের? তাঁরা সব অসীম শক্তিধর। তাঁদের প্র্যাকটিস নিয়ে ...... না বাপু ওইসব বিপজ্জনক 'প্র্যাকটিস'-এ কে আর সাধ করে যাবে।

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

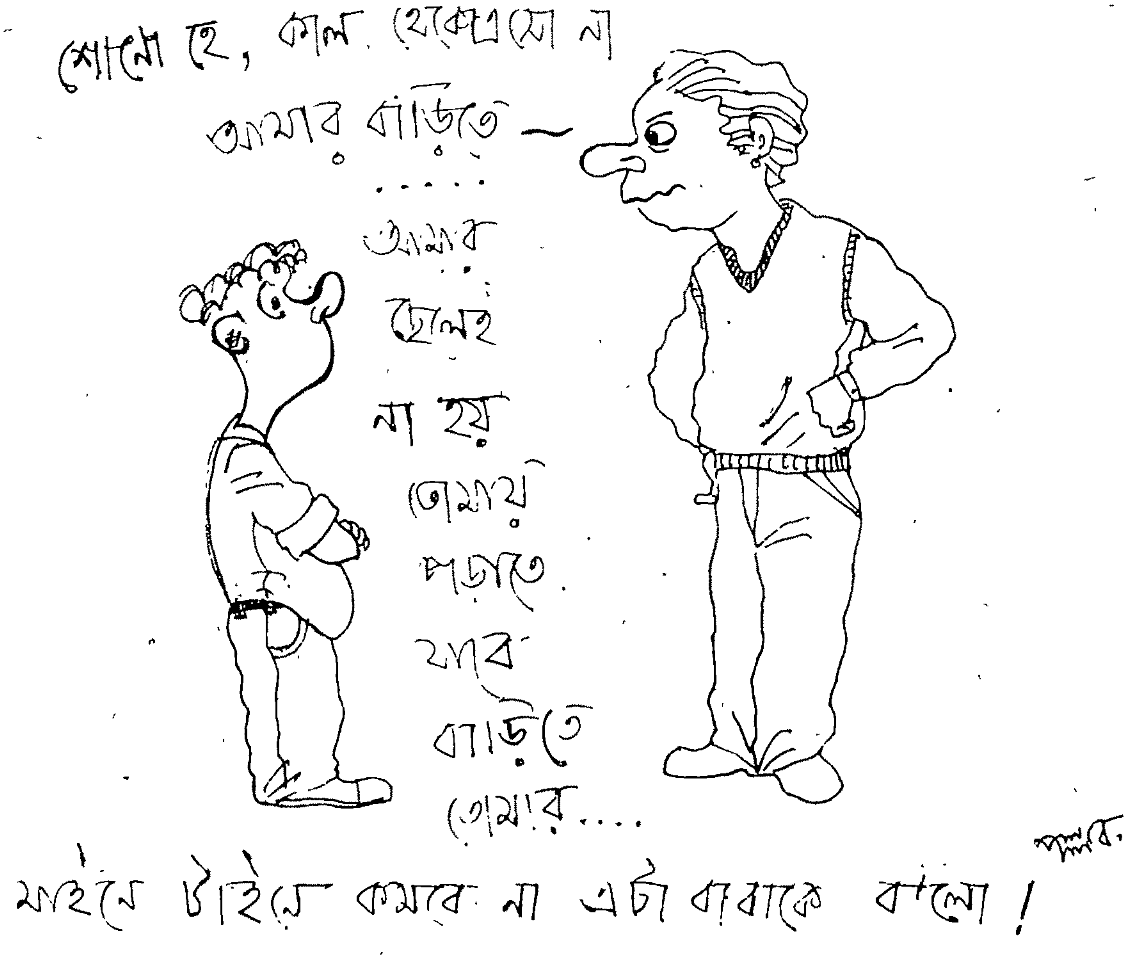

পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের

বঁ ম (Bons Mots)

প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী

লণ্ডন শহর তখন William Shakespeare-এর Richard-III নাটকের অভিনয়-সাফল্যে তোলপাড়। Richard-III-এর নামভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রখ্যাত অভিনেতা Burbage. তাঁব অভিনয় দেখে মুগ্ধ একজন মহিলা দর্শক Burbage -কে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য। সঙ্গে বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন Richard-III নামেই তাঁর কাছে দেখা দেন।

Shakespeare আড়াল থেকে শুনে ফেললেন মহিলার প্রস্তাব। সরাসরি হাজির হলেন মহিলার বাড়ির ঠিকানায়। আলাপচারিতা, হাসি গল্প যখন বেশ জমে উঠেছে তখন খবর এল যে Richard-III হাজির হয়েছেন। এতটুকু দমলেন না Shakespeare. সঙ্গে সঙ্গে বার্তাবাহককে আদেশ দিলেন, "বলো গিয়ে Richard the Third আসার আগেই সেখানে William the Conqueror পদার্পণ করেছেন,"

* * * * *

শোনা যায় Ben Jonson-এর জনৈক পুত্রের Godfather ছিলেন William Shakespeare. নামকরণ অনুষ্ঠানের পর Jonson এলেন Shakespeare কে অভিনন্দন জানাতে। এসে দেখলেন নাট্যকার Shakespeare গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনায় মগ্ন। Shakespeare কে Jonson জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে এমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন জানতে পারি কি?"

একথা শুনে Shakespeare বললেন, "অনেক ভেবেও আমি কিছুতেই স্থির করতে পারছি না আমার Godchild এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপহার কী হতে পারে? শেষমেশ ভাবছি......।"

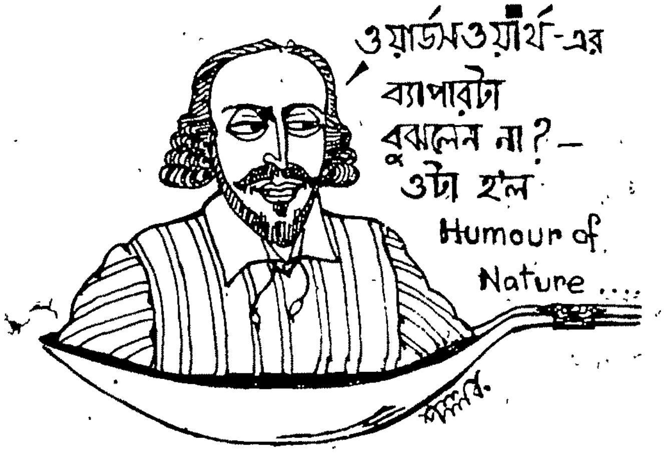

"কী ভাবছেন?" কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলেন Jonson.

গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন Shakespeare, "আমি তোমার পুত্রকে এক ডজন Lattin চামচ উপহার দেব আর সেগুলির অনুবাদ করার দায়িত্ব তোমার।

[Lattin শব্দের অর্থ হল, হলুদ রংয়ের এক ধরনের মিশ্র ধাতব পদার্থ, দেখতে অনেকটা কাঁসার মতো।]

* * * * *

একবার এক বন্ধুর বাড়ি নৈশভোজে ওয়ার্ডসওয়ার্থ হাজির। উপস্থিত সকলকে বিনীতভাবে তিনি বললেন যে কবি হিসেবে হাস্যরসের তেমন সদ্ব্যবহার তিনি করতে পারেন নি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে একবার তিনি বেশ মজার রাজা সেজেছিলেন। সবাই উৎসুক। ভাবগম্ভীর কবি Wordsworth-এর ব্যক্তিগত জীবনে হাসির খোরাক বলে কথা। কবি বললেন, "বলছি, বলছি দাঁড়াও। Rydal Mount-এ আমার বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, দোহাই আপনার। আপনি কি এই পথ দিয়ে আমার স্ত্রীকে যেতে দেখেছেন?

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এর আগে আমার জানাই ছিল না যে আপানর স্ত্রী আছেন।"

সবাই ভাবছেন বুঝি আরো কিছু ঘটনা আছে এর পরে। কিন্তু কবির ঝুলিতে তার আর পর নেই জেনে সবাই হো হো করে ব্যঙ্গের হাসিতে ফেটে পড়লেন। আর কবিও হাসতে লাগলেন এই ভেবে যে তাঁর ব্যঙ্গরস পরিবেশনটি সবাই বেশ ভালোভাবে উপভোগ করেছেন।

* * * * *

1894 এর 21 শে এপ্রিল। George Bernard Shaw-এর Arms and the Man নাটকটি মঞ্চস্থ হল Avenue Theatre হলে। Shaw নিজেই বলেছেন, প্রথম রজনীর অভিনয় থেকেই দর্শকদের করতালিতে মুখরিত ছিল প্রতিটি অভিনয়-সন্ধ্যা।

প্রথম রজনীর অভাবনীয় সাফল্যের পর নাট্যকারকে উপস্থিত হতে হল মঞ্চে। করতালিতে মুখরিত সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ। করতালি থামার পর G. B. S কিছু বলতে যাবেন এমন সময় দর্শক-গ্যালারি থেকে একজন আওয়াজ দিয়ে উঠলেন,—"আমার মনে হয় 'Balkan' সৈনিকের ছদ্মনামে Shaw বৃটিশ সৈনিকদের ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অভিবাদন জানালেন Shaw এবং বলে উঠলেন, "আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এতজনের বিরুদ্ধে আমরা মোটে দু'জন কী করতে পারি!"

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

বাঙালি লেখক বাংলা উপন্যাসের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অগ্রিম কী করে পায়? কতটা বুদ্ধি আর বিদ্যের সংমিশ্রণ ঘটলে এমন হওয়া সম্ভব?

বিদ্যে দাও, বুদ্ধি দাও, সেই সঙ্গে কপালও

বিদ্যে আছে বুদ্ধি নেই এমন মানুষ তো বিস্তর। প্রচুর পড়াশুনা করেছেন এমন অনেক অধ্যাপক মাস্টারমশাই-এর দেখা পাওয়া সহজ যাঁরা আখের গোছাতে পারেননি। আমার কাছে এক মাস্টারমশাই মাঝেমাঝে আসেন যিনি পনেরো বছর আগে স্কুলের চাকরজীবন শেষ করেছেন কিন্তু এখনো পেনসনের কাগজপত্রই হাতে পাননি। দুই ছেলেকে নিজে পড়িয়েছেন। তারা স্কলারশিপ পেয়ে বিদেশে চলে গেছে। এখন মাসে হাজার টাকার মতো পান ছাত্র পড়িয়ে। তাতে একবেলা খেয়ে থাকতে হয়। ওর ইংরেজি জ্ঞান প্রখর। স্টেটসম্যান অথবা টেলিগ্রাফের ইংরেজির ভুল বের করে সংশোধন করে দেন। কী করে নির্ভুল ইংরেজি লিখতে হবে তার জন্য প্রবন্ধ লেখেন। এই বয়সে আমাকে শিখিয়েছেন পরীক্ষায় স্টার পাওয়া মানে কেন আশি নম্বর পাওয়া। ওঁর পোশাকে অভাবের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে নেবেন না। দিনরাত ভালো ইংরেজি কিভাবে লেখা যায় তাই ভাবছেন। আমি অনুমান করি, বাড়িতে ইনি কারোর কাছ থেকে শ্রদ্ধা পান না। নির্বোধ মানুষের যা হয়।

> **রাইটার্স বিল্ডিং-এ যান, গিয়ে দেখুন, বিদ্যে নেই, তাতে বয়েই গেল, প্রচুর বুদ্ধিমান মানুষ পাঁচ বছরের জন্যে কিভাবে চেয়ারে বসার অধিকার পেয়েছেন।**

আবার বুদ্ধি আছে, বিদ্যে নেই এরকম লোক তো সর্বত্র ছড়িয়ে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ যান, গিয়ে দেখুন, বিদ্যে নেই, তাতে বয়েই গেল, প্রচুর বুদ্ধিমান মানুষ পাঁচ বছরের জন্যে কিভাবে চেয়ারে বসার অধিকার পেয়েছেন। তিন বারে ক্লাস এইট ক্লিয়ার করতে না পারা একজন রাজনৈতিক কর্মী স্রেফ বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের জন্যে শেষ পর্যন্ত যে চেয়ারে গিয়ে বসেছেন তার সামনে দাঁড়িয়ে গদগদ হয় প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া, আই. এ. এস প্রথম সারিতে থাকা একজন বিদ্বান সেক্রেটারি। আমাদের পাড়ার পাহাড়িবাবু নাকি ব্যবসাজীবন শুরু করেছিলেন মুড়ি বিক্রি করে। এখন এই শহরে অনেক অনেক কিছুর মালিক। ওঁর স্ত্রী -কন্যাদের বিদেশি দ্রব্য ছাড়া মন ভরে না। পাড়ায় যা কিছু হবে উনি মোটা চাঁদা দিয়ে সভাপতি হবেনই। একটি বেকার লিটল ম্যাগাজিনের লেখককে রেখেছেন প্রতি বক্তৃতা একশ টাকা দেবেন, এই কড়ারে, বক্তৃতাটা তাঁকে লিখে দিতে হয়। স্রেফ বুদ্ধি দিয়ে করে খাচ্ছেন।

এখন বাংলা ছবির অন্যতম যিনি নায়ক তিনি কলেজের মুখ দেখেননি। একজন সর্বভারতীয় নায়িকা যিনি বাংলা ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রাইজ পান তিনিও একই ব্র্যাকেটে রয়েছেন। তাতে কি এসে গেল। লোক রেখে ইংরেজি শেখার চেষ্টা করেছেন। ভুল উচ্চারণে যখন সেই ইংরেজি বলেন তখন শেক্সপিয়ার সাহেবও কবরে চমকে চমকে ওঠেন, যদিও তাঁর তাঁবেদাররা বলেন, ফাটাফাটি ইংলিশ। তা এখন তিনি পারছেন কারণ ঈশ্বর তাঁর ঘটে ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন বলেই তো।

বিদ্যে এবং বুদ্ধি দুটোই যাঁর আছে তিনি কী হতে পারেন? হলফ করে বলতে পারি কখনোই ছাত্র পড়াবেন না। খুব নামকরা শিল্পপতি হবেন। আমেরিকায় গিয়ে ওদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এদেশে এসে টাকা রোজগার করবেন। নয়ত ফিল্ম

ডিরেক্টার হয়ে একের পর এক ফ্লপ ছবি তৈরি করেও পৃথিবীর বড় বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিচারক হয়ে ঘুরে বেড়াবেন। সমস্ত শরীরে, পোশাকে বিদ্যে ও বুদ্ধির ছাপ ফুটিয়ে তুলে বেসভয়েসে প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন। প্রাইভেট প্রযোজকরা ওঁর ছায়া দেখলেই যদি পালিয়ে যায় তো যাক না, ন্যাশনাল ফিল্ম ডিভিশনের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙতে এঁর দেরি হয় না। এ ছাড়া আরো অনেক প্রফেশন এঁদের জন্যে খোলা আছে। যেমন একটা চমৎকার মুখোশ সামনে রেখে দাউদ খানের মতো প্যারালাল সাম্রাজ্যের মালিক হতে সহজেই পারেন। কে না জানে ঈশ্বরের বিদ্যে আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই। শয়তানের দুটোই আছে। সেই গপ্পোটা মনে পড়ল। স্বর্গ আর নরকের মাঝখানে একটা পাঁচিল ছিল। ঈশ্বর দেখতেন প্রায়ই কেউ বা কারা সেই পাঁচিলের একটা অংশ ভেঙে দেয়। তিনি চেঁচিয়ে নরকে থাকা শয়তানকে ডেকে বলেন, 'আজ আমি সারিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এর পরে যদি পাঁচিল ভাঙে তাহলে তুমি সারাবে।' শয়তান রাজি হল।

তিন বারে ক্লাস এইট ক্লিয়ার করতে না পারা একজন রাজনৈতিক কর্মী স্রেফ বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের জন্যে শেষ পর্যন্ত যে চেয়ারে গিয়ে বসেছেন তার সামনে দাঁড়িয়ে গদগদ হয় প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া, আই. এ. এস প্রথম সারিতে থাকা একজন বিদ্বান সেক্রেটারি।

দু'দিন বাদে টহল দিতে গিয়ে আবার ভাঙা পাঁচিল আবিষ্কার করলেন ঈশ্বর। তিনি শয়তানকে ডেকে এবার সারাতে বললে সে অস্বীকার করল। ভগবান বললেন, 'তুমি চুক্তি ভঙ্গ করেছ, আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করব।'

শয়তান বলল, 'পারবেন না।'

ঈশ্বর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

শয়তান বলল, 'আপনি তো কোনো উকিল পাবেন না। সব উকিল তো আমার এখানে আছে।'

কে না জানে, ওকালতি করতে হলে বিদ্যে এবং বুদ্ধি দুটোরই দরকার হয়।

আমরা যারা লেখালেখি করি তাদের অনেকেরই বই ভালো বিক্রি হয়। কিন্তু আমার আগে সমরেশ বসু ছাড়া কেউ লেখার টাকায় বেঁচে থাকার সাহস পান নি। যাঁরা চেষ্টা করতেন, তাঁরা দারুণ অর্থকষ্টে ভুগতেন। সমরেশদা কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছেন, গাড়ি চড়তেন লেখার টাকায়। প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা পাওয়া নাকি কষ্টকর ছিল। আমার সৌভাগ্য, এখনো সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। লিখি যখন তখন একটু আধটু বিদ্যে আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি? আগে, যে চাইত, বই দিতাম। তারা সত্যিই খুব গরিব প্রকাশক। নুন আনতে তাদের পান্তা ফুরাত। শেষ পর্যন্ত তিনজন প্রকাশকের কাছে নাড়া বেঁধেছি যাঁরা টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলা করেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি, আমার বই-এর বিজ্ঞাপন তেমন দেন না এই তিনজন। আনন্দ-র বাদলদাকে বলতে তিনি বললেন, 'বিজ্ঞাপন ছাড়াই যদি বই বিক্রি হয়, কী দরকার দেওয়ার।'

ঠিকই তো। এবার বইমেলার আগে দেখলাম আমার অগ্রজ এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের যাবতীয় বই যা বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছে একসঙ্গে প্রায় সব কাগজে বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। তিনি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান বলে প্রকাশকদের ওপর আস্থা না রেখে নিজেই হাল ধরেছেন। নিশ্চয়ই প্রচুর বিক্রি হয়েছে তাঁর বই। কে না জানে টাকায় টাকা আসে! আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা আসেনি। কিন্তু দেখেও তো শেখা যায়। ভাবছিলাম সামনের বইমেলায় মহাজ্ঞানী মহাজনের দেখানো পথে হাঁটব। শিখতে তো কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু মুশকিল করে দিল হুমায়ুন। হুমায়ুন আহমেদ। বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিল যখন তখন নিশ্চয়ই বিদ্বান। ছোকরা উপন্যাস লেখে। বুদ্ধিমান বলে ওকে দেখে আমার কখনোই মনে হয়নি। তা সেই ছোকরা নাকি 'অন্যদিন' নামের প্রকাশনার কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অগ্রিম নিয়েছে আগামী তিনবছরে যে সব উপন্যাস সে লিখবে তার জন্যে। বাঙালি লেখক বাংলা উপন্যাসের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অগ্রিম কী করে পায়? কতটা বুদ্ধি আর বিদ্যের সংমিশ্রণ ঘটলে এমন হওবা সম্ভব? পকেটের টাকায় সে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না, যতটা জানি 'অন্যদিনের' মালিক মাজাহারও খুব বেশি টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ না করেও দ্বিগুণ লাভ করবে।

তাহলে? বিদ্যে বুদ্ধি যাই থাকুক না কেন আসল কথা হল কপাল। কোনো একজন মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী বলেছিলেন, 'রবি ঠাকুরের ইনভেস্টমেণ্ট কী মশাই? কালি, কলম আর কাগজ। তাতেই বিশ্বভারতী চলছে।'

আগামী তিন বছরে এ বাবদ হুমায়ুনের খরচ হবে বড়জোর তিনশো টাকা। তিনশো টাকায় পঞ্চাশ লক্ষ রোজগার করার কথা মাইক্রোসফট্ কোম্পানির মালিক বিল গেট্সও ভাবতে পারবেন না। ☐

পত্রপাঠ-এর অংশীদারিত্বে স্বাগত

শচীন মিত্র

কলকাতা-৭০০০১৯

পত্রপাঠ ভালোবাসা

দেবী সারদা প্রেস

৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯

চরণ বৈরাগীর

ইকড়ি মিকড়ি

অতি সম্প্রতি এক জবর আড্ডায় বেকার সন্ধে কাটাবার সুযোগ হয়েছিল। হাজির ছিলেন আড়াইশ গ্রন্থপ্রণেতা সর্ব পুরস্কার বিজয়ী কথাসাহিত্যিক সহ অনেক বুদ্ধিজীবী, ওজনদার আমলা, খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক ও চিকিৎসক, বঙ্গ প্রকাশনীর কর্ণধার ও আরো বহু তাবড় তাবড় মানুষ। এই বৈরাগী সেখানে নিতান্তই বেমানান। কিন্তু সংস্কৃতিসেবীদের উদারতা ইত্যাদি ইতরজনে না বিলালে মুখের প্রসাধনে কিছু খামতি থেকে যায়। আমি অযোগ্য অভাজন, স্বভাবে মুখচোরা। ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ থাকলে কেউ বিশেষ নজর করে না। কাঁধের ঝোলা কোলে রেখে গুণীজনের কথা শুনে চেষ্টা করি মনের ঝোলায় কিছু জমা করতে পারি কিনা। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাই, সত্যি এঁরা সবাই কত জানেন! বৈরাগীর মা-বাপ তো বৈরাগীই হয়, তাই এই অধমের নামি দামি স্কুল-কলেজের গেট পেরুবারও হিম্মত হয় নি। নামের শেষে হুঙ্কার দেওয়া ডিগ্রির ব্র্যাকেটে বিদেশি শহর বা প্রতিষ্ঠানের বিউগিলও বাজে না। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই ফোরেন গুড্স আর ফোরেন ডিগ্রির জন্যে মানুষের হেদিয়ে পড়া দেখে সংশয় জাগে, স্বাধীনতা আন্দোলনটা ভুল ছিল কি! এমন আড্ডায় যদি এক-আধজন এন-আর-আই জোটেন, এই মালদার হুতোমরা—বিশেষত মহিলা মহল—আদিখ্যেতার যে লাজলজ্জাহীন পরিচয় দেন তাতে লজ্জা শব্দটি পেলেও এঁদের লালা ঝরা অবিরল থাকে। দেশভাগের পর ওপার থেকে আসা মানুষদের বিদ্রূপ করে বলা হত তালপুকুরের জমিদার, কেননা অনেক মানুষই ফেলে আসা কল্পিত সম্পত্তির আজগুবি গল্প বলত। তেমনি অনেক এন-আর-আই যে দেশে কেরানিও হতে না পেরে বিদেশে সাফাইওয়ালা বা ওয়েটারের কাজ করে সে তো সিঙ্গাপুর লণ্ডন নিউইয়র্কের এয়ারপোর্টে নামলেই টের পাওয়া যায়। ওরা 'নট রিকোয়ার্ড ইন ইণ্ডিয়া'।

সেদিনের আড্ডায় হাজির অনেকেই ক-ক-ক-থ : কখনো কখনো কলকাতায় থাকা মানুষ। কারণ ঘন ঘন বিদেশে যেতে হয় নানা অজুহাতে, ফরমাসে এবং পপপচ (পরস্পর পিঠ চুলকানো)। সুতরাং অব্যর্থ ভাবে দীর্ঘ আলোচনা চলে, কলকাতা কতটা অবাসযোগ্য হয়ে উঠেছে তা বোঝাবার জন্যে। এই মহানগরের অধোগতি আর চোখে দেখা যায় না। সিনেমা হলে যাবার উপায় নেই—হলের অবস্থা এত খারাপ। গেলেও কী ছবি দেখবে। জঘন্য হরিবল সব ফিল্ম হচ্ছে বাংলায়। ছিল এক সত্যজিৎ রায়—তারপর ভয়েড।

চিত্রপরিচালক বলেন, কিছু হচ্ছে না তা নয়। তবে দর্শক কোথায়? বাঙালি দর্শক সব ছুটছে রাকেশ রোশন, আমির খান, করিশমা আর ঐশ্বর্যকে দেখতে। আমার তো খুবই মনে হয় এখন যদি উত্তম-সুচিত্রাও থাকতেন তবু অবস্থা বদলাত না। বাঙালির অভিরুচি এখন ভিন্ন খাতে বইছে।

প্রকাশক বলেন, বইয়েরও অবস্থা সেরকমই। কেউ আর বাংলা বই পড়ে না।

কথাসাহিত্যিক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলেন, বিদেশে লেখকরা বছরে একটা বা দু'বছরে একটা উপন্যাস লেখে আর আমাকে প্রতি পুজোয় মিনিমাম পাঁচটা উপন্যাস আর একডজন গল্প লিখতে হয়। ওদেশে শুনলে আঁতকে উঠবে। কিন্তু না লিখে আমার উপায় নেই। সংসার চলবে না।

চিকিৎসকের বিশ্বাস হয় না—তুমি এটা কি বলছ! তোমার এত প্রাইজ পাওয়া—এত বই—এত সিরিয়াল, ফিল্ম—

—সামনেই তো তুফান পাল (প্রকাশক) বসে আছে। ঐ বলুক একটা এডিশন শেষ হতে কদ্দিন লাগে। মনে রেখো, সাধারণত এডিশন মানে হাজার কপি। গোড়াতে আমারও এক এডিশন শেষ হতে পাঁচ সাত বছর

লাগত, এখনো দু'বছর লাগে। কি তুফান, ঠিক বলছি? অথচ দশ লক্ষ মানুষ নাকি প্রতিদিন বাংলা খবরের কাগজ পড়ে।

—দু'বছরে গেলে আমরা বলি হিট বই। এই গগন হালদারেরও বছরে একটা বা দুটো বই অমন চলে। বাকি সব লেট রানিং মাল-গাড়ির বগি।

ডাক্তারনী বলেন, গগন, শুনলাম তোমার মাসিক 'অসিধারা' পত্রিকা বন্ধ করে দিচ্ছ। কেন?

—দিচ্ছি না, দিয়েছি। চালাতে পারলাম না। গ্রাহক নেই, বিজ্ঞাপন নেই। পাঠকও নেই, সাপোর্টও নেই।

তুফান বলেন, অথচ একসময় কত পত্রিকা রেগুলার বেরুত—ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, অচলপত্র, নতুন সাহিত্য, বসুমতী, বিংশ শতাব্দী, বসুধারা। দেশ, সচিত্র ভারত তো ছিলই।

এই বিষয়ে দেখা গেল সকলেরই জোরালো মতামত আছে। দুঃখ সবারই যে, ঐসব সুন্দর পত্রিকাগুলো উঠে গেছে। এখন তো পড়ার মতো কোনো কাগজই নেই বলতে গেলে। তার জন্যে সহজেই টিভিকে দায়ী করতে দেরি হল না। কেউ কেউ ইংলিশ মিডিয়ামের দোহাইও দিলেন। তাহলে কি বাঙালির বিদ্যেবুদ্ধি সব রসাতলে গেছে?

তীব্র প্রতিবাদ ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। এই তো কাগজে বেরিয়েছি ক্যাট,ন্যাট জয়েন্ট ইত্যাদিতে বঙ্গসন্তানরা সব ক্যান্টার করে দিচ্ছে—দেশের এক নম্বরে। আই-এ-এস, আই-পি-এস অবশ্য হয় না। কেননা এটা ক্ষুদিরামের রাজ্য। শোষণযন্ত্রী সরকারের গোমস্তা বা আমলা হওয়া বঙ্গপুঙ্গবের অভীষ্ট হতে পারে না। তারা সবাই এন-আর-আই হবে। হবে একদা-বাঙালি; যে বাংলা বুঝতে বা বলতে পারে না।

—তবে কি বাঙালি মনীষার পরিচয় বিদেশে খুঁজতে হবে। যেমন অমর্ত্য সেন?

—আর দু'চারটে নাম বলবেন?

—না। আর মনে পড়ছে না। আছে কি কেউ আর।

—প্রচুর পাবেন। ম্যানেজার, ক্লার্ক। অধ্যাপক, ডাক্তার। ইঞ্জিনিয়ার, সেলসম্যান। এদেশে বেশিরভাগই কোনো চাকরি পাবে না। আর ওদেশে এদের চেয়ে কম টাকায় আর কেউ সমতুল কাজ করে না।

আড্ডার হাওয়া একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি সবিনয়ে বলি, গগনবাবু তুফানবাবুর কথা প্রসঙ্গে আমার একটা প্রস্তাব আছে। কয়েকটা বড় অফিসে যেখানে শয়ে শয়ে লোক মাসে অন্তত দশ হাজার টাকা রোজগার করে, যারা নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারক বলে মনে করে, যারা মিছিলে মিছিলে নাগরিক জীবনে অবরোধ তৈরি করে, তারা সারা বছর কটা বই কেনে, কটা পত্র-পত্রিকা রাখে, তার একটা সমীক্ষা করলে হয় না?

তুফান বললেন, তার কি দরকার আছে। বইমেলায় দেখেন নি? 'বেনফিশ'-এর স্টলেই সবচেয়ে বেশি ভিড়।

গগন বলেন, ওহে বৈরাগী, তুমি যে মাধুকরী করে বেড়াও, দেখ নি দ্বারিক ঘোষ, সেন মহাশয়দের দোকান একে একে উঠে যাচ্ছে আর সেখানে খুলছে পিৎজ্জার দোকান।

—আর বাড়ছে জ্যোতিষীর চেম্বার। —ডাক্তারেব হুতাশ।

হাত-ভরা নানা পাথরের আংটি ঝাঁকিয়ে ডাক্তারনী তীব্র বিরোধিতা জানান দেন।

এরপর আর কিছু কি বলার থাকে। ☐

আড্ডা চলবেই

সনৎকুমার মিত্র

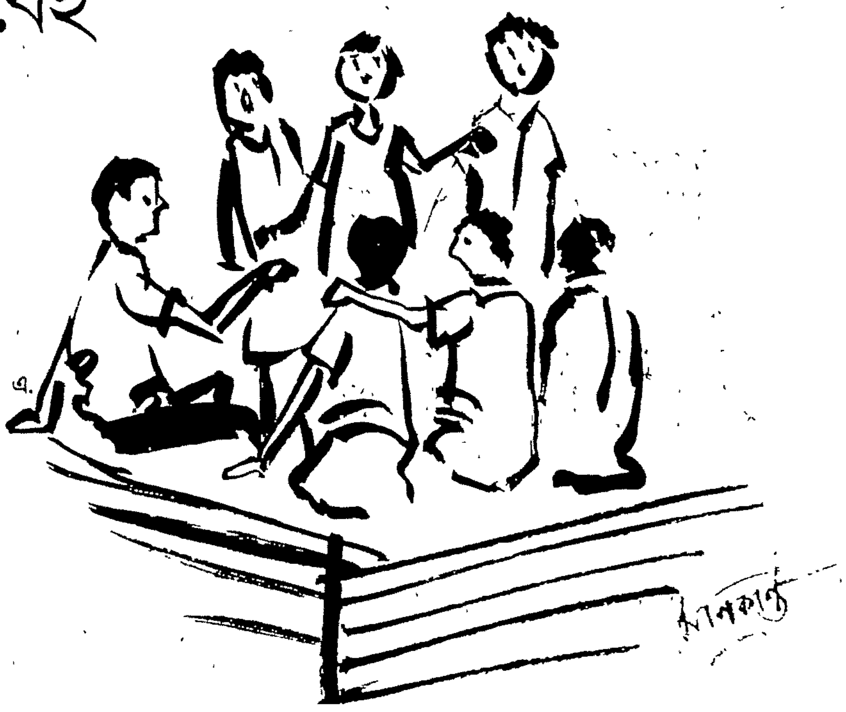

কিভাবে শুরু হবে? কিভাবে হবে শেষ?
কী লাভ ওই সব ফালতু চিন্তায়?
বরং ভাবি ভাই, এই তো আছি বেশ।
জমিয়ে বসে থাকি রকের আড্ডায়।

যে খুশি উড়ে যাক ইউ. কে., ইউ. এস. এ.
ডলারে নিজেদের বিক্রি করে দিক,
একটা চিনি-টোস্ট, ডবল-হাফ চায়ে
রকের আড্ডায় আমরা রব ঠিক।

ফ্যাক্সে, ই-মেলে পৃথিবী ছোট হোক
বিশ্ব-বাজারেও আসুক বিপ্লব,
রকের আড্ডাও চলছে, চলবেই
এবং আড্ডায় আমরা রব ঠিক।

আ মার-মার কাট-কাট বিদ্যেবুদ্ধি

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

আমি এক লেখক। নিজে লিখি নিজেই পড়ি। আর বন্ধুদের যখন বলি যে আমি লেখক তখন বেশ গর্ব বোধ করি। কারণ আমার ধারণা লেখকদের খুব বিদ্যেবুদ্ধি থাকতে হয়। পাঠকদের না থাকলেও চলে। ধারণাটা আমারই, আর কাকেও ভাগ দিই না। ধারণা আপনা আপনা।

ধারণাটা মাঝে মাঝে ধাক্কা খায়। সেটা আমার তকদির। তকদিরও আপনা আপনা।

এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে ঢুকলাম তার বড় সাহেবের ঘরে। উদ্দেশ্য, আলাপ করা। ছ' ফুট লম্বা সায়েব তার তাগড়া থাবায় আমার হাতটা রগড়ে দিয়ে বলল—হাউ ডু ইউ ডু। চাপ খেয়ে তখন আমার হাতের রক্ত মাথায় উঠে গেছে। ভাবলাম, এই রে। দিল বুঝি সায়েব আমার লেখক জীবনের ইতি ঘটিয়ে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত ম্যাসেজ করতে করতে সায়েবের কথার উত্তরে বললাম—উইথ এ পাইলট পেন। সায়েবের মুখটা ঝুলে গেল। আলাপ খুব একটা জমল না।

সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধুর কাছে ঝাপড় খেলাম,—ব্যাটা ইডিয়ট। হাউ ডু ইউ ডু-এর উত্তর হল -উইথ এ পাইলট পেন?

আমি বললাম—কেন? আমি তো ঠিকই বলেছি। সায়েব জানতে চাইল আমি কী ভাবে কাজ করি। আমি বললাম পাইলট পেন দিয়ে। ঠিকই তো বলেছি। আমি তো পাইলট পেন দিয়েই লিখি।

—ওরে মুখ্যু, সায়েবের ওই কথার উত্তরে তোকেও বলতে হত হাউ ডু ইউ ডু।

—তার মানে সায়েব জানতে চাইবে আমি কী দিয়ে কাজ করি, আর তার উত্তরে আমিও জানতে চাইব সে কী দিয়ে কাজ করে? ওরে বাবা, অত সাহস আমার নেই। আমার তো পাইলট পেন। আর সায়েব যদি বলে বসে যে সে কম্পিউটার দিয়ে কাজ করে? তখন? আমি তো মুচ্ছো যাব।

আমাকে শোধরানোর সব আশা ছেড়ে দিয়ে বন্ধু আমাকে ওদের অফিস ক্যান্টিনে নিয়ে গেল। সায়েবের কাছে বেইজ্জতির দুঃখ ভুলবার জন্যে সেখানে এক টেবিলে বসে আমারই খরচে পর পর তিনটে কাটলেট,

দুটো চপ, একটা সিঙাড়া, আর আধ গেলাস জল সাবাড় করার পর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। আমি হাতের পরিচর্যা করতে করতে পাশে বসে সেটা দেখলাম।

আরেক বন্ধু নিয়ে গেছল তার মাড়োয়ারী সায়েবের সঙ্গে আলাপ করাতে। সে ভদ্রলোক খাঁটি ভারতীয় কায়দায় নমস্তে করে চুস্ত্ বাংলায় জিজ্ঞেস করল—হাপ্নি কী কোরেন? আমি আমার ঘাড়ের কাছে কলারটা একটু নেড়ে দিয়ে বললাম—আমি লিখি। মনে মনে তৈরি হয়ে রইলাম, যদি সে সায়েবের মতো জিজ্ঞেস করে, কি দিয়ে লিখি তবে আর পাইলট পেনের কথা বলব না। বলব—মন দিয়ে। উত্তরটা যা কাব্যিক শোনাবে না! ডি লা গ্রাঁদে।

এই সায়েব কিন্তু সেই সবের ধার দিয়ে গেল না। বলল, হাঁ হাঁ, সো তো ঠিক আছে। রাতমে লিখেন। লেকিন দিনমে কি কোরেন? কাম ধান্দা কি আছে?

তার মানে লোকটা বলতে চাচ্ছে লিখি মানে আমি অকর্মা। লেখাটা কোনো কাম ধান্দা নয়।

ইশ্। আমার বন্ধুগুলো দেখে দেখে আমাকে সেই সব জায়গাতেই নিয়ে যায় যেখানে আমাকে অকর্মা কিংবা বুদ্ধু সাবিত্ হতে হয়। আমার বন্ধু আমাকে বুদ্ধু বলেনি, ইডিয়ট বলেছে। কিন্তু ইডিয়ট মানে তো বুদ্ধুই। আমার রেগে যাওয়ার যথেষ্ট হক আছে। তবু লেখক সুলভ ঔদার্যে ওদের ক্ষমা করে দিয়ে মনে মনে বললাম—ওরা অজ্ঞ। ওরা কি বুঝবে আমার কত বিদ্যে বুদ্ধি।

একবার অবশ্য অন্য কোথাও না গিয়ে নিজেদের বসার ঘরে বসা অবস্থাতেই বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করে ফেলেছিলাম। দাদার ছোট ছেলেটা কোথায় যেন কে.জি. না নার্শারিতে পড়ে। আমি শুনেছি ওরা ওদের টিচারদের মিস বলে ডাকে। সেইরকম এক মিস আমার ভাইপো রত্নটিকে বাড়িতেও পড়ান। তার মানে ইস্কুলের ডোজ হজম করার জন্যে বাড়ি বয়ে এসে পাম্পিং।

সেদিন বাইরের বসার ঘরে আমার মতোই এক বিদ্যেবুদ্ধি ওয়ালা লেখক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম। সেই টিচার মহিলা বাইরে থেকে এসে ঢুকলেন। এক সজ্জন ভদ্রলোক হিসেবে আমার যা করা উচিত তাই করলাম। ওঁকে আপ্যায়ন করলাম এবং গলা উঁচু করে ভাইপোর উদ্দেশ্যে ওঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করলাম। বললাম—ওরে বিচ্ছু, তোর—এই পর্যন্ত বলেই খেয়াল হল সামনে যিনি বসে আছেন তাঁর মাথায় ডগডগে সিন্দুর। অর্থাৎ উনি এক বিবাহিতা মহিলা। এখন জেনেবুঝে এক বিবাহিতা মহিলাকে মিস বলি কেমন করে। তাই আমার বিদ্যেবুদ্ধি খাটিয়েই বললাম-ওরে বিচ্ছু, তোর মিসেস এসেছে। এর নাম রেডি উইট, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। আমার আছে। অন্য অনেকের নেই।

ওদিকে মানেটা যে কী দাঁড়াল সেটা বুঝলাম কথাটা বলার পর। কিন্তু হাতের তীর আর মুখের কথা, বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। দেখলাম ভেতর দিকের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার বৌদি একটা বাঁকা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভাগ্যিস ওঁর কনিষ্ঠ জা-টি এখনো এ বাড়িতে আসেন নি। এলে কি আর শুধু বাঁকা হাসিতেই শেষ হত?

যাই হোক বিদ্যেবুদ্ধি থাকা লোকেদের ওরকম একটু ইদিক সিদিক হতেই পারে। হবেই তো। তাদের মাথায় চিন্তা কত। পণ্ডিতরা বলে গেছেন—পণ্ডিতাণাং সর্বগুনাঃ, মুর্খা দোষা হি কেবলম্। অর্থাৎ কিনা পণ্ডিতদের সবই গুণ, শুধু দোষের মধ্যে তারা মুখ্যু হয়। তার মানে বুঝতে হবে, যে যত বড় মুখ্যু তার বিদ্যেবুদ্ধি তত বেশি। এটা কথার কথা নয়। অনেক প্রমাণ আছে। মনে নেই, নিউটন একটা খাঁচায় দুটো খরগোশ রেখে তাদের বড়টার জন্যে একটা বড় দরজা আর ছোটটার জন্যে একটা ছোট দরজা করে দিয়েছিলেন? আমারও বইয়ের তাকে 'পত্রপাঠ' মার্কা বড় বইয়ের জন্যে বড় ফাঁক আর 'গীতা' মার্কা ছোট বইয়ের জন্যে ছোট ফাঁক। তার মানে আমিও নিউটনের দলে।

আমার ভাইপো ভাইঝি দুটোই শয়তান। ভাইপোর জন্যে পেতে হয়েছিল বৌদির বাঁকা হাসি আর ভাইঝিটার জন্যে খেতে হল দাদার ঝাড়। সেদিন ভাইঝি জিজ্ঞেস করল—কাকু, পুট দি ফার্ট বিফোর দি হর্স মানে কী? সে বলল ফার্ট, আমি শুনলাম ক্যাট। বললাম—এর মানে হল ঘোড়ার আগে বেড়াল।

—সেটা আবার কী?

তাইতো! সেটা যে কী তা তো আমিও জানি না। কিন্তু ভাইঝির কাছে বোকা বনে যাওয়াও চলবে না। মাথা খাটিয়ে উত্তর দিলাম—পণ্ডিতরা পরীক্ষা করে দেখেছেন বেড়াল ঘোড়ার চেয়ে জোরে দৌড়ায়। কল্পনা যখন শুরু হয়েছে তখন আর থেমে থাকি কেন? আরও এগিয়ে গেলাম। কে না জানে লেখকের কল্পনাশক্তি খুবই প্রবল। বললাম— বিলাতে ডার্বির ঘোড়দৌড়ের সময় একবার কী করে যেন একটা বেড়াল ঘোড়াদের সামনে পড়ে গেছল। তখন বেড়ালটা ঘোড়া দেখে প্রাণের দায়ে দৌড় শুরু করে। ঘোড়াগুলো শেষ পর্যন্ত বেড়ালটাকে ধরতে পারে নি। সেই থেকে কথাটা চালু হয়ে গেছে—ক্যাট বিফোর দ্য হর্স।

আমার দাদা অফিস থেকে ফেরার পর যথাসময়ে এহেন বিদ্যার্নব মার্কা ব্যাখ্যাটা তাঁর কানে উঠল। আমি যে ঝাড়টা খেয়েছিলাম তার বিস্তৃত বর্ণনাটা আর নাই বা দিলাম।

কিন্তু মনে মনে আমি নিজেকে কোনো দোষ দিই না। বিদ্যেবুদ্ধি থাকা লোকদের ওরকম একটু আধটু ভুল হয়েই থাকে। এই ধরো না, শেক্সপিয়ার যত ইংরেজি লিখেছে, নেসফিল্ডের গ্রামার মিলিয়ে হিসাব করলে তার মধ্যে তো সহস্র ভুল। শেক্সপিয়ার ভুল করেছে সহস্র। আমি ভুল করি মাঝে মাঝে দুটো একটা। সেই হিসাবে দেখতে গেলে ঠিক ওই মাপের না হলেও আমি শেক্সপিয়ারের দলেই।

ইশ্। নিউটন শেক্সপিয়ার এসবের নিচে কিছু ভাবতেই পারি না।। খুবই স্বাভাবিক। ভাবব কী করে? আমি যে বিদ্যেবুদ্ধি থাকা এক বাঙালি লেখক।

পাঠককে জ্ঞান দেওয়া বাঙালি লেখকদের একচেটিয়া অধিকার। সেই অধিকারে আমিও এই তালে একটু জ্ঞান দিয়ে নিই। বড় বোঝাতে সব নামের আগে মহা কথাটা বসিয়ে দেওয়া হয়। যেমন মহারাজ, মহানগর এইসব। কিন্তু বিদ্যেবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিত মশাইরা কয়েকটা জায়গায় মহা কথাটা লাগাতে বারণ করে গেছেন। শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষীকে দ্বিজে, যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহৎ শব্দ ন দিয়তে। সেরকম যিনি যতবড়ই বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন লোক হন না কেন, নিজের বিদ্যার আগে 'বড়' আর বুদ্ধির আগে 'অতি' কথাদুটো লাগাবেন না। ফেঁসে যাবেন মশাই। বড় বিদ্যার পরিচয়টা হল —চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। আর অতিবুদ্ধির গলার ভূষণ যে কী হয় সেটা সবাই জানে।

ধারাবাহিক কবিতা

বেজন্মার ইতিকথা
সনৎ মণ্ডল
(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

যে রূপসী ছিল আজ
বুড়ি থুত্থুড়ে।
(চিতা বহ্নিমান)

ভিয়েন
রফিক আলম
(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

চাঁদি মারে রাতোত্তরি
জনার স্থ আড়াল
(চিতা বহ্নিমান)

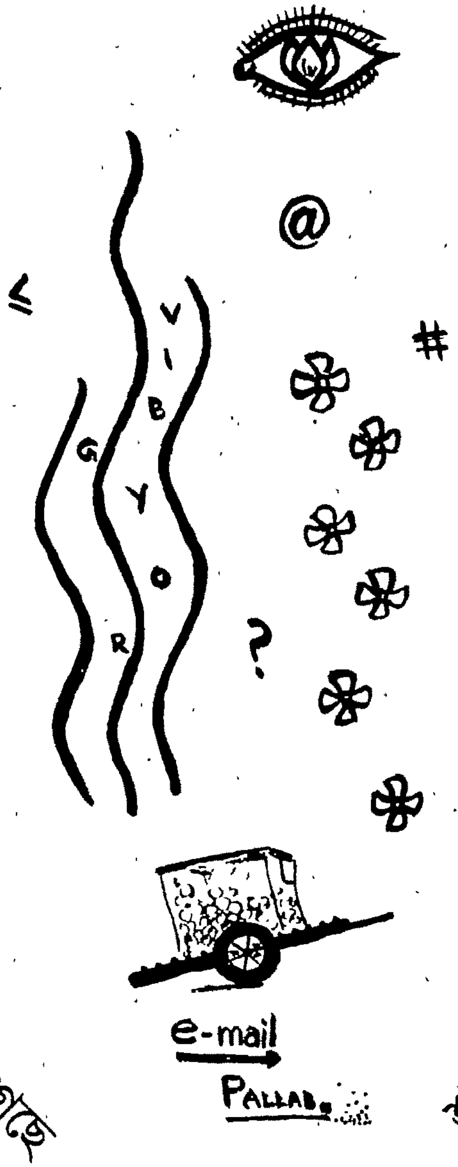

বার্ধক্য
মানিক চন্দ্র দাস
(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

ত্বকের সপ্তরং।
(ওঁ গঙ্গা)

লক্ষ্য করছি
উদয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

সারাজীবন ফুল ফেলেছি আবর্জনায়
ভিখিরিরা সব ধর্মবিমুখ।
(চিতা বহ্নিমান)

ফিরে গেছে
গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম
(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

ঘুরে গেছে অন্য এক হাতে।
(ওঁ গঙ্গা)

শ্রাবণ কাঁদছে
দেবাংশু ঘোষ
(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

কার যেন ঠেলাগাড়ি হুঁ চাং হুঁ চাং
শেষ আকাঙ্ক্ষা হেঁটে যায় মুক্তকাঙ্ক্ষার পায় পায়
(চিতা বহ্নিমান)

বানানো গল্প

মুসুমুসু কলমচি

অনন্তর ফের উপযুক্ত রজনী উপলব্ধ হইয়াছে। এক্ষণে সকলি বামন। বামনদিগ সাটিনের গুলতি হস্তে চরাচর জুড়িয়া অপেক্ষমান অথচ দৃশ্যপটে গলিয়থ নাই। সে ব্যক্তি বহু দূরে, একান্তে, নীরবে মুড়ি আর ভিজা ছোলা চিবাইতে আছেন। সমীপবর্তী হইতেই তিনি কহিলেন, হে মহামহিম আচার্য মুসুমুসু কলমচি, উপাধ্যায়-সৃদশ, সুকান্ত, দেববর্ণ, মহেশ্বর চরিত্র, মান্যববর প্রিয়তমেষু অদ্য মোর বড় বিপদ। অই যে পবর্তের সানুদেশে পিল্‌পিল্ করিতেছেন বামনদিগ উহারা সকলেই ডেভিড হইতে চাহেন।

কলমচি নিরতিশয় অবাক হইয়া ভ্রূ-উত্তোলন করতঃ কহিলেন,—ইহাতে উহারদিগের নাফা কী প্রকার?

গলিয়থ বলিলেন, নাফা বহু প্রকার। সকলেই ডেভিড হইয়া উঠিলে সকলেই পরের ঘাড়ে বসিয়া খাইবেন। নিদেন পারস্পরিক গর্দানেই কাঁঠালফল ভাঙিবেন। ইহাতে বড় সুখ।

মুসুমুসু কহিলেন, বুঝিলাম, ইহারদিগের ঘটে বুদ্ধি বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

গলিয়থ কহিলেন, তাহাতে কি? কেবল বুদ্ধি বাড়িলেই যদি জগৎশ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে, সর্বাগ্রে রাজা হইতেন যতেক ভাঁড়ু দত্ত।

কলমচি বলিলেন, না হে গলিয়থ, সেই সমস্ত দিনকাল গিয়াছে। বুদ্ধি হইতে বিদ্যা বড় এমৎ ব্যবস্থা বর্তমানে অচল। অতঃপর কলমচি বিদ্যা ও বুদ্ধির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে গলিয়থ নাম্নী ব্যক্তিকে সদুপদেশ প্রদানে উদ্বুদ্ধ হইলেন।

কলমচি উবাচ, যদ্যপি ইহা জ্ঞাত যে বিদ্যা দেবী অর্থে স্ত্রী লিঙ্গ তদ্যাপি ইহা কবুল করিবেন যে ইহাকে বিবাহ সম্ভব। উপরন্তু ইহাকে প্রেমও সম্ভব। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কে হইবেন বিদ্যা-প্রেমিক হে! প্রেমিক হইবেন বুদ্ধি। ইনি পুং এবং ফলতঃ উপযুক্ত। অতঃপর বিবাহ সংঘটিত হইলে ইঁহারা সুখে ঘর-সংসার করিতে পারেন কিনা সে বিষয়ে দ্বিবিধ অপশন্। প্রথমটি হইল, হাঁ পারেন, এবং আজীবন হরিহরাত্মা হইয়া বাঁচেন। দ্বিতীয়টি হইল, ইহারা ডিভোর্সি হয়েন। এই দ্বিতীয় অপশনের আওতায় আরো দুইটি সাব-অপশন থাকেন। অর্থাৎ একটিতে তাঁহাদের সন্তান সম্ভবনা বিষয়ে কুটকচালি এবং অন্যটিতে তাহাদিগের পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত তর্ক ইত্যাদি। অবশ্য প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্কের বিষয়ে অপশন-হি-অপশন, অতএব উহা মা বাহ।

গলিয়থ কহিলেন, মা বুঝিলাম। বামনদিগ আমাকে দেশছাড়া করিল অথচ আপনি আমাকে গাঁটছড়ার প্রয়াস পাইতে উপদেশ দিতেছেন।

কলমচি কহিলেন, এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝিলাম। তুমি বেটা গলিয়থ, বিদ্যা ভিন্ন চিনিয়াছ ঘেঁচু, অইদিকে বামনদিগ বুদ্ধি ভিন্ন বুঝিয়াছে কচু। সুতরাং সর্বাগ্রে তোমাদিগের মধ্যে একটি উপযুক্ত গাঁটছড়ার সন্ধান না পাইলে নেক্সট প্যারাফ্রেজ-এ পঁহুছানো জাস্ট অসম্ভব।

এই কহিয়া কলমচি গলিয়থের গর্দানটি হস্তগত করতঃ হিড়হিড় করিয়া টানিতে টানিতে পর্বতের পাদদেশে আসিলেন। তাঁহারা যেইকালে নামিতেছেন, সেইকালে উপত্যকার বামনদিগের অভ্যন্তরে চাঞ্চল্য শুরু হইল। তাহারা তিন চারি ভাগে ভাগ হইয়া তিন চারি দিক হইতে পাহাড়ে চড়িতে শুরু করিল। কলমচি ও গলিয়থ নিম্নদেশে আসিয়া দেখিলেন, সকল বামন কোনকালে উঠিয়া পাহাড়ের চূড়াপ্রদেশে জড় হইয়াছে। অনন্তর তাহারা এই লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিল যে কোন সেই একক ব্যক্তি যিনি চূড়াদেশে চূড়ামণি হইবেন। বিবাদ ক্রমেই বচসা হইতে চুলাচুলি তথা হাতাহাতিতে পর্যবসিত হইল। একসময়, একটি একটি করিয়া বামন পাহাড়ের উচ্চাঙ্গ হইতে টুপুর করিয়া এবং টাপুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রেডক্রশ আসিল। মানবিকতা এবং সহৃদয়তার কারণে কলমচি রেডক্রশে সহযোদ্ধা হিসাবে কর্ম শুরু করিলেন।

P 36082

রেডক্রশের তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া কলমচির চক্ষু চড়কগাছ এবং আক্কেল গুড়ুম। যাহাদিগকে তিনি এতকাল বামন জ্ঞানে চিনিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এক-একটি বঙ্গাল। কলমচিকে দেখিয়াই তাহারা সমস্বরে ডিলকাইয়া উঠিলেন। সেই পিৎলা-জনিত চিৎকার আনন্দের অথবা ভয়ের অথবা অন্য কিছুর তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর আর না ঘটিল কলমচির। তিনি ছুটিতে ছুটিতে, হাসিতে হাসিতে, ক্রমাগত ভালোবাসিতে বাসিতে দিলেন এক মস্ত হাঁচি। সেই হাঁচিতে বামন সকল উড়িতে লাগিল; উড়িতে উড়িতে মেঘ হইল; মেঘ হইতে জল পড়িল টস্ টস্। জল সকল বৃষ্টি রূপে খোলা জানালায় ছাঁট মারিতে লাগিল। কলমচির দাড়ি ভিজিয়া গেল। বড় শ্রাবণ। মুসুমুসু উঠিয়া জানালার ছিটকিনিটি তুলিয়া দিলেন।

পাঁজা কোলা

দেবপ্রসাদ কুমার

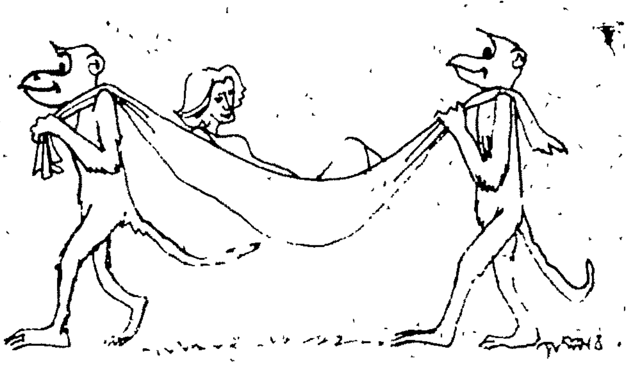

পাঁজা কোলাকে একসঙ্গে আক্ষরিক অর্থে পরিপাক করিবার মতো আমার জঠর কদ্যাপি তদ্রূপ পোক্ত ছিল না—এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। ইহাকে বরং দ্বিধাবিভক্ত করিলে কিঞ্চিৎ শ্রম লাঘব হইলেও হইতে পারে, সম্ভাবনা যদ্যপি অতীব ক্ষীণ। অভিধানে 'পাঁজা' শব্দের অর্থ এবম্প্রকার : প্রস্তুত ইষ্টকের রাশি, দুই বাহু দ্বারা বেষ্টন, বগল দাবা, গুচ্ছ, আঁটি। কোলা—বড় জালা, এক জাতীয় বৃহৎ ভেক। বহনের পক্ষে ইষ্টকের রাশি অথবা বড় জালা কোনোটিই মাদৃশ বৃহৎ ভেক সদৃশ উদর বিশিষ্ট স্থূল খর্বাবয়ব মর্কটের পক্ষে আয়াসসাধ্যই নহে। অসম্ভবও বটে। তবে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞানে পরদ্রব্য বগলদাবা করিতে আজ্ঞা হইলে আপত্তি নাই। দুই বাহু দ্বারা পরদারকে বেষ্টন করিতে বলিলে (অবশ্যই মাতৃবৎ নহে) মুক্তকচ্ছ হইয়া কচ্ছের উপকূল অবধি সানন্দে অভিযান করিব, যদি না স্বীয় কলত্র বেত্রহস্তে পশ্চাদ্ধাবন করেন। গুচ্ছ বা আঁটির বিষয়ে আপনারা বিমর্ষ হইলেও এই অধমের পরামর্শ—নিবিষ্টচিত্তে গল্পগুচ্ছ পাঠ বা আমআঁঠির ভেঁপুবাদ্য শ্রবণ। শব্দার্থ মুদ্রণে অভিধান প্রণেতা কিন্তু পাঁজা সম্বন্ধে হয়ত বা অনবধানবশত একটি ভিন্নার্থ বর্জন করিয়াছেন। যদি এমন মুদ্রিত হইত—কংগ্রেস > তৃণমূল > ছিন্নমূল > নির্মূল। ডারউইন সাহেবের বিবর্তনবাদ যুগান্তরে নবকলেবর ধারণ করিবে কিনা তাহা যুগাবতার রামকৃষ্ণের অদৃশ্য বরাভয় নির্ভর। ইহা সর্বজনবিদিত যে অজিত অপরাজিত, কিন্তু নঞ্‌তৎপুরুষ কে জানে কী আছে পরমপুরুষের মনে।

এতক্ষণ কিন্তু পদ্মা ও ভাগীরথীর পৃথক পৃথক ময়না তদন্ত হইতেছিল, গতিপথ যাহাদের ফরাক্কা হইতে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। উৎস হইতে মোহনা—ইহাই কোনো নদীর গতিপথ বর্ণনার স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু আবোল তাবোল নিবন্ধে কলম যদি সরলরেখায় চলে তাহা হইলে সেই রসময় "পাগল ভালো করো মা" বলিয়া আর্তি জানাইতেন না। সুতরাং মোহনা হইতে উৎস পর্যন্ত পতিত পাবনী গঙ্গার কী গতি বা দুর্গতি হইল তাহা অচিরাৎ প্রকাশ পাইবে। ধরা যাক পাঁজা হইতেছে পদ্মা এবং কোলা হইতেছে ভাগীরথী। পাঁজা এবং কোলার সমাহার হইতেছে পাঁজাকোলা অর্থাৎ পতিতপাবনী, যাহা এখনো আলোচিত হয় নাই। ভাগীরথী ও গঙ্গা রূপকমাত্র হইলেও পদ্মার ভূমিকা এখানে কিয়দংশে পৃথক। পদ্মার আর একটি অর্থ মনসা দেবী। জরৎকারু মনসার সমার্থক হইলেও বহুল প্রচারিত নহে। পুরাণে দম্পতি একই নামে বিদিত এমন দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল। মনসা অর্থাৎ জরৎকারুর পতির নামও জরৎকারু। অভিন্ন নামধেয় এই দম্পতি পরস্পরকে পাঁজাকোলা করিয়াছিল কিনা তাহা পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখ নাই। মহাদেব ও সতী কিন্তু কর্মবিপাকে অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহার বিবরণ অস্পষ্ট হইলেও পাওয়া যায়। সমুদ্র মন্থন কালে বাসুকি নাগের হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাদেবের প্রাণ যখন গবেজ্ঞান, তাঁহার ঝিবিজ্ঞান পার্বতী মহাদেবকে অকুস্থল হইতে পাঁজাকোলা করিয়া উঠাইয়া স্থানান্তরে নিভৃতে পয়োধর সুধা পান করাইয়া কালকূট জর্জরিত মহাদেবের অসু আসুরিক শক্তিতে রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে পতিনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব তাণ্ডব নৃত্য সহ বিশ্ব পরিক্রমার পূর্বে গতাসু সতীর কলেবর (নিশ্চয় খাটো নয়) পাঁজাকোলা করিয়া তবে তাঁহাকে স্কন্ধারূঢ় করেন। মোদ্দাকথা প্রেম যতই প্রগাঢ় তথা নিবিড় হোক না কেন পাঁজাকোলা করিবার জন্য দৈহিক শক্তির ভূমিকা আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

পাঁজাকোলা যে কী বস্তু তাহা আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই অবগত অর্থাৎ ঘাড় ও উরু ধরিয়া যাহাকে কোলে লওয়া হইয়াছে এমন। চলচ্চিত্রে নায়ক নায়িকাকে অনুরূপ কর্ম করিতে হামেশাই দেখা যায়—কিন্তু নায়িকার নায়ককে ভুলিয়াও প্রাগুক্ত কর্ম করার দুঃসাহস না দেখানোর একমাত্র কারণ পেশীশক্তির অপ্রতুলতা। 'সপ্তপদী' চলচ্চিত্রে উত্তম কুমারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া পাঠশালার গণ্ডি পার না হওয়া সদ্যবিবাহিত রাখাল তাহার স্ত্রী পঞ্চমীকে শয়নকক্ষের মেঝে হইতে কোমল শয্যায় পাঁজাকোলা করিয়া নিক্ষেপ করায় পরমাহ্লাদিত পঞ্চমীর ষষ্ঠীর দয়া হইল। গর্ভবতী কন্যার প্রথম বার পিত্রালয়ে সন্তান প্রসবই ছিল তৎকালীন প্রথা। পিত্রালয় যাত্রার প্রাক্কালে পঞ্চমী রাখালের গললগ্ন হইয়া তাহাকে পত্র লিখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে। উপরোধে ঢেঁকি গিলিয়া সম্মত রাখাল প্রমাদ গণিল। ইংরেজিতে যাহাকে বলে To land in the soup. কিন্তু গরজ বড় বালাই। পঞ্চমী বানানটাই রাখালের জানা নাই কারণ তাহা যুক্তাক্ষর কণ্টকিত। কিন্তু প্রিয়াকে পোশাকি নামেই যে সম্বোধন করিতে হইবে এমন মাথার দিব্য তো পাঁচি দেয় নাই। ইউরেকা! আবিষ্কারের আনন্দে আর্কিমিডিস যা উৎফুল্ল উচ্চারণ করিয়াছিল, রাখাল তাহা করে নাই। কারণ সে বিদ্যা তাহার নাই। কিন্তু পাঁচি যে পঞ্চমীর ডাকনাম ইহা স্মরণ হওয়ায় তাহার নিরুচ্চার উল্লাস ইউরেকা অপেক্ষা 'ইয়ে' হয় নাই। যাই হোক, গলদঘর্ম রাখাল লিখিল—"শ্রীচরণেষু পাঁচি, তোমায় ছাড়া কেমন করে বাঁচি......" অবিশ্বাসী পাঠকবৃন্দ যদি প্রাগুক্ত সম্বোধনের সত্যাসত্য নির্ণয়ে সরেজমিন তদন্ত করিতে চান তবে ঠিকানা দিতে দস্তুর মতো প্রস্তুত আমি।

পুন : পাঁচি পত্রপাঠ কী জবাব দিয়াছিল রাখাল তাহা শত অনুরোধেও প্রকাশ করে নাই।

কুকুর বিষয়ক

প্রবীর মণ্ডল

(১) কুকুর হল গিয়ে আদুরে জীব। বাবা, মা, সন্তানের সমান। তাই বাড়িতে কুকুর থাকাটা অতি বাঞ্ছনীয়। বাড়ির তিন তলার ছাদে...

বাবা-মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বাবা-মায়ের শূন্যস্থানে একটার বদলে মেয়ে-মদ্দা দুটি কুকুর পোষা যেতে পারে। এবং বিদেশীয় কুকুর দুটিকে আপনি বাবা-মা হিসাবে কল্পনা করতে পারেন। আপনি অনেককে গল্প করে বলতে পারেন, এঁরা আমার বাবা-মায়ের সমান। বাবা-মায়ের অভাব....। আমার পার্থিব দেবতা। এতে আপনার সামাজিক Status বৃদ্ধি পাবে।

(২) যে সব বৌমারা শ্বশুর-শাশুড়িকে বাড়ি থেকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উচ্ছেদ করে, অবসরে কী করবেন—এই ভেবে সময় নষ্ট করছেন, তাঁরা বিদেশীয় ছোট্ট ছোট্ট চকচকে ঝকঝকে কুকুর কিনুন। হাজার হাজার টাকা দিয়ে কিনলেও আপনার তাতে লোকসান নেই। সন্তানের মতো বুকে রেখে ঘুম পাড়িয়ে, নানান সুখ দুঃখের গল্প করে, ওর সঙ্গে বল খেলে, স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে দেখবেন আপনার সময় প্রতিদিন ঐ ছোট্ট কুকুরে গিলে গিলে খাচ্ছে। আর আপনি মহানন্দে সুখে নিদ্রা যাপন করছেন।

(৩) কাবেরী ও নিবেদিতা নামে আমার দুই বান্ধবী আছে। দু'জেনই সুন্দরী। বয়ঃসন্ধিতে পা পড়েছে এমন যে কোনো ছেলেই এদের প্রেমে পড়তে পারে। আমি এদের দু'জনকেই প্রেম-প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ততক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে 'না' করেছিল। অথচ আমার মনে হয় নি আমি এদের অযোগ্য। দুঃখিত মনে জানতে চেয়ে উত্তর পেয়েছিলাম, তারা তাদের বাড়ির ছোট্ট ছোট্ট চকচকে ঝকঝকে কুকুরদের খুব ভালোবাসে। এবং ভালোবাসার মালাখানি কুকুরের গলায় পরিয়েছে। তারা কোনোদিন বিয়ে করবে না, তাদের প্রতিজ্ঞা। মনে মনে বলেছিলাম—কী নিগূঢ় ভালোবাসা। কোথায় মানুষ আর কোথায় কুকুর.......।

একদিন সকালে কোনো এক কারণে কাবেরীর বাড়ি যেয়ে দেখি, কাবেরী তার ছোট্ট কুকুরের মুখে মুখ রেখে পরম তৃপ্তি অনুভব করছে। আমার সেকি লজ্জা....। কাবেরীর সঙ্গে সেদিন কথা বলা হয় নি।

আমার বেশ মনে আছে, নিবেদিতা টানা চারদিন ওর বাড়ির কারোর সঙ্গে কথা বলে নি। কারণ তার প্রেমিক রাজা অসুস্থ। রাজার সেবায়...।

(৪) কয়েকদিন আগে কবিতা আনতে এক কবির বাড়ি গিয়েছিলাম। ডোরবেল টিপতেই একটা ছোট্ট কুকুর বেরিয়ে এল এবং আমাকে দেখে কেঁউ-মেউ করে ডাকল, যেন আমি কুকুর। কবির স্ত্রী এসে তাকে কোলে তুলে অপত্য স্নেহে আদর করল এবং তারপর আমি কবির কাব্যচর্চাগৃহে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। কবি বললেন, এখন তো আমার লেখা নেই, আপনি তিনদিন বাদে আসুন।

তিনদিন পর যথারীতি কবির বাড়িতে গেলাম এবং ডোরবেল টিপতেই সেই পুঁচকি কুকুর আমাকে দেখে কেঁউ-মেউ করে চিৎকার করল। কিছুক্ষণ পর কবির স্ত্রী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেন, এবং কুকুরটিকে কোলে তুলে নরম গলায় বোঝালেন—টম্, তোমার স্মৃতি বড় ক্ষণস্থায়ী। তুমি ওকে চিনতে পারছ না? ও তোমার দাদা হয়, দাদা।

কুকুরের দাদা। আমার যে সেদিন কী ভীষণ রাগ হয়েছিল—কবিতা না নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাগে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, আর জলের ফোঁটায় যেন লেখা হ'চ্ছিল, আমি আর কুকুর ভাই ভাই....।

(৫) আমার পাশের বাড়িতে বেশ বড় জাতের একটি কুকুর আছে। তিনি মাংস, দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেতে ভালোবাসেন না। গরমে দই ছাড়া অন্য কিছুতে তাঁর রুচি হয় না। ফ্যানের নিচে ঘুমানোর আগে বারোটা থেকে একটার মধ্যে তাঁকে নিয়ে রাত্রিকালীন ভ্রমণে না বেরুলে তিনি বড্ড আক্ষেপ করেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরোয়। দুঃখ, অভিমান। রাত্রে ঘুমানোর সময় সারারাত টিউব লাইট জ্বললে তাঁর ঘুম হয় না। তিনি তিনতলার ছাদে উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করেন, আর নিচে রাস্তা দিয়ে যখন রাস্তার কুকুরেরা আপন মনে ঘেউ ঘেউ করে ডাকে তখন তিনি কার্নিশের কাছে এসে দাঁড়ান এবং জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে থাকেন। একদিন তিনি রাস্তার কুকুর দেখে অতি আগ্রহে কার্নিশের বাইরে তিন পা বের করলেন এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে দীর্ঘ শরীর নিয়ে রাস্তায় পড়লেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হল।

আসলে কুকুর—কুকুর দেখলে.....।

কুকুর তো কুকুরই।

মালিক মস্তানের মৃত্যুতে ভীষণ দুঃখ পেলেন। মৃত মস্তানের ছবি তোলা হল। এক মিনিটের বদলে কুকুর বলে তিন মিনিট নীরবতা পালন করা হল। নীরবতা পালনের সময় মালিকের চোখ থেকে জল নেমে এল, জল...। কুকুর-প্রিয় কবি এসে সেই শোকাসভায় বেদনা ভরাতুর দীর্ঘ কবিতা পাঠ করলেন, অন্য কুকুরদের কাছে সেই শোকাগাথা না পৌঁছালেও কুকুর-প্রেমীদের চোখে গঙ্গা-যমুনা বইতে লাগল।

বঙ্গ সমাচার

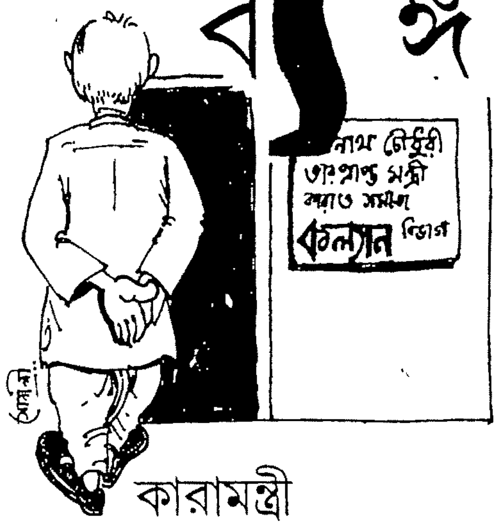

কারামন্ত্রী

কারামন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর কারাগারের দরজায়, মাপ করবেন কক্ষের দরগায়, আবার মাপ করবেন, দরজায দেখা গেল বিচিত্র সব লেখা লিখি। তিনি শুধু কাবা বিষয়ক মন্ত্রীই নন সমাজ কল্যাণ দপ্তবও তাঁর অধীনে। একটি নামফলক নিম্নরূপ :

বিশ্বনাথ চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
কারা ও সমাজ কল্যান বিভাগ

সমাজেব এ জাতীয় 'কল্যান' তিনি যে না করে থামবেন না তা বলাই বাহুল্য। সে কারণে কালি-তুলিতে নয় একেবারে পাতের ওপরে খোদাই করে তাঁর এই 'কল্যান'-মুখিতা জাজ্বল্যমান।

ইংবেজিতে একজাযগায় তিনি সদাপটে জেল শাসন করছেন অতএব সেখানে তাঁব নামের বানানটি বেশ গুরুগম্ভীর :

Biswanath **Chowdhury**
Minister in Charge
Home (Jails) Deptt. & Social Welfare Deptt
Govt. of W. Bengal

আব একটি ফলকে তাঁর প্রথম কর্মটি হল রমণী ও শিশু বিষয়ক। প্রমীলা জগতে গুরুগম্ভীর বানানসহ অনুপ্রবেশ অবশ্যই রূঢ় এবং অ-কাব্যীয়, অতএব সেখানে রমণীয় বানানে তিনি ভাস্বর :

Biswanath **Chaudhury**
Minister in Charge
Women & Children Development & Social Welfare Department and Jails Department.

মৈনাক মিত্র

সুভাষ-চিত্র

২২ জুন সন্ধ্যায কলকাতাব সাহিত্য আকাদেমি সভাঘরে জাঁকজমক করে দেখানো হল একালের অগ্রগণ্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যের ওপর তোলা এক ঘণ্টার ডকুমেন্টারি ছবি। ছবির নির্মাতা রাজা সেন। কিন্তু তাঁর কোনো দোষ ছিল না। তিনি উপদেষ্টা মণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে এপিসোডগুলির বিন্যাস করেছেন।

সাধারণ দর্শক সারা ছবি জুড়ে একজন খোঁড়া পদাতিক কবিকে তাঁর অপ্রধান কবিতাগুলি পড়ে যেতে দেখলেন। তাঁর কবিতার নিস্তেজ ব্যাখ্যা করলেন এদিক থেকে দু'জন ভক্ত ও নামকরা প্রগতিবাদী কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায ও জয় গোস্বামী আর ওদিক থেকে দু'জন নামকরা বোদ্ধা মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায আর অমিয় দেব। তার ফলে একটি বৈচিত্র্যময় কবিজীবন দর্শকের সামনে অধরাই রয়ে গেল। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর নিস্পৃহতা, আজীবন দারিদ্র্য সহ্য করে শ্রমিক সংগ্রামে যুক্ত যৌবনকাল এবং তিন পালিতা কন্যা নিয়ে তাঁর বেপরোয়া পারিবারিক জীবন প্রায় এড়িয়ে যাওয়া হল সম্ভবত এই অপরাধে যে, তিনি এখন মার্কসিস্ট দর্শনে বিশ্বাস করেন না। কেন করেন না, তাঁর মুখে শোনার সুযোগ আমরা আর পাব না। জেরা করলে এ ছবিতে পেতাম। কবি এখন সম্পূর্ণ বধিরও বটে। শুনলাম ছবিটি দেখে তিনি বলেছেন, টকি হলে আরো ভালো হত। তবু সাহিত্য আকাদেমির এই নতুন প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাতে হয়। ভবিষ্যতে যাঁকে নিয়ে ডকুমেন্টারি, তিনি জীবিত থাকলে, তাঁকেই প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে ব্যবহার করলে ছবি বিশ্বাসযোগ্য হবে। ভক্তদের চেনা সহজ নয়।

দুঃশাসন

(A) : (?) = এক যে আছে কন্যা

কন্যা বিষয়ক ছবিটির জন্য পরিচালক শ্রী সুব্রত সেন মশায়কে অজস্র ধন্যবাদ। কে বলে বাংলা ছবি দর্শক পায়না? এ ছবি দেখতে গেলে (মনে রাখবেন, দেখলে নয়, দেখতে গেলে) আনন্দে আত্মহারা হবেন। আহা, বাংলা ছবির এ কী সুদিন। হলের পর হল, শো-এর পর শো হাউসফুল। চতুর্দিকে শুধু 'কালো' শব্দ—"বিশ কা তিশ, চাল্লিশ কা পাঁচাশ,......।"

হল ভর্তি বিচিত্র জনগণ—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। কেউ লুঙ্গি পরে, কারো পান পরাগ, একজন সঙ্গে 'মহিলা' এনেছেন, বেশকিছু হিন্দিভাষী, কেউ ভালো সিটি দিতে পারেন আবার অনেকে 'খোল্ খোল্' বলে প্রবল চিৎকারেও পারঙ্গম ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া একমুখ দাড়ির ঝোলা ব্যাগ তো আছেই। আর দেখুন, কী সহজে সুকৌশলে এই 'ক্রেজ' সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। সব রকম মানুষকেই তিনি এক চরম প্যারাডক্সের সম্মুখীন করেছেন। নিপাট ছবিটির পোস্টারে 'সাহসিকতা'-র সাথে শুধু ছেপে দিয়েছেন জ্বলজ্বলে 'A' চিহ্নটি। ফলে চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য।

আর ছবির শেষেও সবাই হতচকিত। সবার চোখে প্রায় একই প্রশ্ন—যাঃ, সিনগুলো কি কেটে দিল?

সুস্নাত চৌধুরী

বড়বাবুর বাবুয়ানা

রণজিৎ পাল

ঝাঁটি পাহাড়ি থানায় নতুন বড়বাবু এসেছেন। নাম দুঃখহরণ মিত্র, লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। কিন্তু চওড়া এতটাই বেশি যে মানুষটাকে লম্বা বলে মনেই হয় না। মুখে গোঁফ-দাড়ির পরিমাণও বড্ড কম। একমাস না কামালে সতেরো আঠারো বছরের বালকের মুখের মতো নরম হাল্কা গোঁফদাড়িতে মুখটা ভরে যায়। বাধ্য হয়ে তাই রোজই মুখটা পরিষ্কার করে রাখতে হয়।

গোঁফ-দাড়ির আফশোসটা মিত্র মশাই কিছুটা পুষিয়েছেন মাথায় লম্বা চুল রেখে। তাতে চেহারাটা ঠিক থানার বড়বাবুর মতো দেখতে হয় নি। হয়েছে অনেকটা সিনেমার লম্পট চরিত্রের কোনো অভিনেতার মতো।

এসবে মিত্র মশায়ের কিছু আসে যায় না। তাঁর মেজাজটি বড় ভয়ঙ্কর। গলার স্বরটাও ভয়ঙ্কর রকমের বাজখাঁই। এ দুটো সম্পদের উপর নির্ভর করে তিনি বাঘ-গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়ান।

থানায় প্রথম দিন ঢুকেই মিত্র মশাই নিজের জাত চিনিয়েছেন। মেজবাবুকে ডেকে হুঙ্কার ছাড়েন, ঝাঁটিপাহাড়ির অবস্থা কেমন?

মেজবাবু জগদম্ব গায়েন একটু হকচকিয়ে যান। তাঁর নিজের অবস্থানই তিনি ভালো করে বুঝতে পারেন না। কখনো চোঁয়া ঢেকুর। পাতাখানেক অ্যান্টাসিড সাবাড় করে ঢেঁকুরটাকে সামলাতে না সামলাতেই তলপেটে চিন্‌চিনে ব্যথা। বড় বাইরে গেলে ঝুড়ি ঝুড়ি আম্রপতন। আবার পাতাখানেক আমাশয়ের ট্যাবলেট সেবনের সাথে সাথেই লিভারের ব্যথা শুরু। সে ব্যথা কম পড়ার আগেই আবার চোঁয়া ঢেকুর। দেহ তো নয়, যেন দেহাতি দম্পতির প্রেমলীলা।

মেজবাবুকে গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিত্র মশাই পুনরায় হুঙ্কার ছাড়েন, ব্যাপারটা কি? কানের মাথা খেয়েছেন নাকি?

মেজবাবুর আঁতে ঘা লাগে। তাঁর মাথা ও কান দুটোই বেশ পরিষ্কার। এ নিয়ে কেউ তাঁকে আগে কখনো কটাক্ষ করেনি। ভেতরে ভেতরে তাঁর মেজাজ খিঁচড়ে যায়। তবু বড়বাবু বলে কথা। ক্ষমতা অনেক।

—ঠিক বুঝতে পারিনি। কী জানতে চাইছেন?

নিজের জাতটাকে প্রথমেই খুব ভালো করে চিনিয়ে দেওয়া দরকার। মিত্র মশায়ের গলার স্বর আরো তীক্ষ্ণ হয়, এই সামান্য কথাটা বোঝেন না? মেজবাবু হলেন কী করে?

আগের বড়বাবু ছিলেন নিপাট ভদ্রলোক। সে সময় মেজবাবুর দাপট ছিল বড়বাবুর মতোই। সেই দাপট এখন ধুলোয় গড়াগড়ি। কনস্টেবলদের ঠোঁটের কোণে যে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে, তা মনে হতেই মেজবাবুর 'ধরণী দ্বিধা হও' অবস্থা।

হঠাৎই মেজবাবুর ধুরন্ধর বুদ্ধির চকমকি আলোয় ফুটে ওঠে। বড়বাবু চেয়ারের গরম দেখাচ্ছেন। মেজবাবু এবার বড় দাওয়াই ঝাড়েন,— মাতালি যা একটু মাঝমধ্যে ঝামেলা তৈরি করে। নাহলে এই ঝাঁটিপাহাড়ি একেবারে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা।

—কে মাতালি? বাড়ি কোথায়?

—কাছেই। থানা থেকে গুনে গুনে একশ পা হাঁটলেই মাতালির ডেরা।

—সে কি? থানার এত কাছে একটা মাতাল মস্তানি করছে, তো আপনারা আছেন কী করতে?

মেজবাবু বড়বাবুর ভুল শুধরে দেন,— মদ একটু বেশি খায় বটে। তবে ছেলেটার নাম মাতালি।

মাতাল আর মাতালি বড়বাবুর কাছে একই। তিনি হুঙ্কার ছাড়েন,— তিনদিন সময় দিলাম, মাতালিকে আমার কাছে আনা চাই।

মেজবাবুর এবার সলিল সমাধি হওয়ার অবস্থা। কাঁদো কাঁদো স্বরে

তিনি অনুনয় করেন, ও কথা বলবেন না স্যার। নামে মাতালি, কাজে পাকাঁল মাছ। বহুবার আমরা ধরতে গেছি। প্রত্যেকবারই সবাইকে বোকা বানিয়ে কেটে পড়েছে।

বড়বাবু সামনের টেবিলে আঙুল দিয়ে বাজনা বাজাতে শুরু করেন। এটা তাঁর একটা মুদ্রাদোষ। গভীর ভাবে কিছু ভাবতে গেলেই দু'হাতের দশটা আঙুল তবলার বোল তুলতে শুরু করে।

ঘটনাটা মেজবাবুর জানা নেই। জানা থাকারও কথা নয়। তিনি ভাবেন তাঁর কথাতে বড়বাবু বেশ মজা পেয়েছেন। তিনি তাই একটু মজা করেই বলেন, ভালো হয়, আপনি যদি নিজে একবার মাতালিকে ধরতে যান।

বড়বাবুর আঙুলগুলো টেবিলের উপর থেমে যায়। তিনি মেজবাবুর দিকে বড় বড় চোখ তুলে হুঙ্কার ছাড়েন, আমি কী করব, তা কি আপনি আমায় বলে দেবেন?

মেজবাবুকে থতমত খেতে হয়। এমন বেরসিক লোক তিনি জীবনে দেখেন নি। নির্ঘাত এ ব্যাটার জন্মের সময় বজ্রপাত হয়েছিল, নইলে এমন বাজখাঁই গলা আর তিরিক্ষে মেজাজ কখনো হতে পারে না।

মেজবাবুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড়বাবুর মনে বোধহয় একটু সহানুভূতি জাগে। সবলের ধর্মই হল দুর্বলের প্রতি দয়া দেখানো। বড়বাবুর জীবনের আদর্শই হল, মহাপুরুষদের নীতিবাক্য মেনে চলা। তিনি মেজবাবুকে নিজের জায়গায় গিয়ে বসার অনুমতি দিয়ে দেন।

অনেক চ্যাঁচামেচি হয়েছে। বড়বাবু চোখ বুঁজে চেয়ারে দোল খেতে শুরু করেন। উত্তেজনা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। অথচ এই বড়বাবুর চাকরি করতে হলে উত্তেজিত হতেই হয়। তাই বড়বাবুর নিয়ম হল, উত্তেজিত হলেই চোখ বুঁজে চেয়ারে খানিকক্ষণ দোল খাও। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সব উত্তেজনা ফিকে হয়ে যাবে।'

মিনিট পাঁচেক শেষ হয়েছে। দোল খেয়ে বড়বাবুর মেজাজটাও বেশ ফুরফুরে হয়ে এসেছে। তিনি আস্তে আস্তে চোখ দুটো খুলে ফেলেন। থানার ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে। তাঁর একটু অবাক লাগে। এখনো টেবিলে চায়ের কাপ এল না। তিনি এবার ছোটবাবুকে ডাকেন।

ছোটবাবু এতক্ষণ মেজবাবুর হেনস্থা হওয়ার দৃশ্য খুব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তাঁরও ডাক পড়বে, তিনি তা ভাবেন নি।

এ বড়বাবু যে আগের জনের মতো নয়, তা বোঝা হয়েই গেছে। ছোটবাবু তাই মনে মনে ঠিক করে নেন, বড়বাবুর সব প্রশ্নের উত্তর এক মুহূর্তও দেরি না করে মুখের উপর দিয়ে দেবেন।

—আপনারা চা খান না?

বড়বাবুর গলায় কোনো ঝাঁঝ নেই। এমন প্রশ্নের জন্য ছোটবাবু একেবারেই তৈরি ছিলেন না। থতমত খেয়ে দুবার ঢোক গিলে তিনি উত্তর দেন, খা-ই, খা-ই তো।

বড়বাবুর উত্তেজনার পারদ আবার চড়তে শুরু করে,— কী খাই-খাই করছেন?

ছোটবাবুর উদ্ধারে মেজবাবু এগিয়ে আসেন। বলেন, আমরা খুব-একটা চা খাই না। মোড়ের মাথায় একটা দোকান আছে। ইচ্ছে হলে আমরা দোকানে গিয়ে দু-এক কাপ খেয়ে আসি।

বড়বাবুর আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা,— সেকি! চা না খেয়ে কাজ করেন কী করে? মাতালি ধরতে না পারার রহস্য তাঁর জানা হয়ে যায়,

—চা খান না, এনার্জি পান না, মস্তানদের ধরবেন কী করে?

ছোটবেলা থেকে মা ঠাকুমাদের কাছে মেজবাবু শুনে এসেছেন চায়ে লিভার নষ্ট হয়। আর লিভারটা গেলে স্বাস্থ্যের দফরফা। তখন আর করে-কম্মে খেতে হবে না।

মেজবাবুর ভরসা হয় না। সে সব কথা বড়বাবুর সামনে উচ্চারণ না করাই ভালো। পরবর্তী নির্দেশের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন।

এক কনস্টেবলের উপর আদেশ হয় চা-ওয়ালাকে ধরে আনার।

চা-ওয়ালা হারু কাঁপতে কাঁপতে বড়বাবুর সামনে হাজির হয়। তার কাঁপুনিকে দোষ দেওয়া যায় না। কনস্টেবল সাহেব নতুন বড়বাবুর কীর্তি-কলাপের উপর কয়েক পোঁচ্ রঙ মেরে হারুর কাছে পেশ করেছে। তারপর থেকেই তার পা দুটোর কাঁপুনি শুরু।

—মোড়ের মাথায় আর তোমার চায়ের দোকান থাকবে না। কার অনুমতিতে তুমি ওখানে দোকান দিয়েছ?

হারুর কাছে এসব প্রশ্ন একেবারে অচেনা। উত্তর দেওয়ার তাই কোনো ঝামেলা নেই। সে নিজের নড়বড়ে পা দুটোকে একটু ঠিকঠাক করার চেষ্টা করে। চেষ্টাটা অবশ্য মনে মনে। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই।

—আজই ওখান থেকে দোকান তুলে নিয়ে এসো। আট ঘণ্টা সময় দিলাম।

উত্তেজনাটা আবার বাড়তে শুরু করেছে। বড়বাবু চোখ বুঁজে চেয়ারে দোল খেতে শুরু করে দেন। এত ঘন ঘন উত্তেজিত হয়ে পড়া শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।

হারু পড়েছে মহা মুশকিলে। দোকান তুলে নিয়ে সে আসবে কোথায়? সামনে বড়বাবু শিবনেত্র হয়ে দোল খাচ্ছেন। সে চোখের ইশারায় মেজবাবু, ছোটবাবুর কাছ থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে চায়। দুই বাবুই চোখ সরিয়ে নেন। এমনটা হওয়ার কথা নয়। রোজ সে দু-তিনবার করে দুই বাবুকে বিনি পয়সায় চা খাওয়ায়। তার ফল অবশ্য এতদিন ধরে সে পেয়ে আসছে। আজ সবকিছুই কেমন অন্যরকম।

পাঁচমিনিট শেষ। বড়বাবুর দোল খাওয়াও শেষ। চোখ খুলে যায়।—একি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

একেবারে অন্য মানুষের গলা। হারু ভরসা পেয়ে বলেই ফেলে, কোথায় আসব বাবু?

অবাক দৃষ্টিতে বড়বাবু হারুর দিকে তাকান। আমার ঘরে কি দোকান লাগাবে। থানার সামনে লাগাও। আর আমি চা চাইবার মিনিট খানেকের মধ্যে যেন চা পাই।

হারুর আর আনন্দ ধরে না। থানার সামনে দোকানটা লাগানোর ইচ্ছা তার বহুদিনের। বেয়াড়া খদ্দেরগুলোকে তাহলে বেশ টাইট দেওয়া যায়। কথাটা ভরসা করে সে আগের বড়বাবুকে বলতে পারে নি। ঠারে ঠোরে মেজবাবু, ছোটবাবুদের কথাটা সে আগেই জানিয়েছিল। কোনো সুবিধেই হয়নি। আজ মেঘ না চাইতেই জল।

রোদ পড়তে বড়বাবু স-পারিষদ এলাকা ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। জীপে নয়। পায়ে হেঁটে। এতে চারপাশটা বেশ ভালো করে পরখ করা যায়।

রুক্ষ জমি। এখানে ওখানে ঝোপঝাড়। মাঝে মধ্যে ধূ ধূ মাঠের মধ্যে একটা দুটো বড় গাছ। অনেক ডালপালা ছড়িয়ে রাজার মতো দাঁড়িয়ে। তার প্রতাপে আশেপাশে কোনো লতা পর্যন্ত মাথা তুলতে পারে নি।

মিনিট কুড়ি হাঁটার পর লোকালয় পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার আদিবাসিদের গ্রাম, ফাঁকা ফাঁকা মাটির বাড়ি। লোকজন খুব কম।

এক জায়গায় এসে বড়বাবু থমকে দাঁড়ান। কাছেই একটা লোক গাছ কাটছে। বড় একটা খেজুর গাছ। বড়বাবু হুঙ্কার ছাড়েন,—অ্যাই তুমি গাছ কাটছ কেন?

লোকটা গাছ কাটায় মগ্ন ছিল। থাকারই কথা, রোদ পড়ে গেছে। অন্ধকার নামার আগেই কাজ শেষ করতে হবে। সে তাই শান্তিরক্ষা বাহিনীকে খেয়াল করে নি। বড়বাবুর হুঙ্কারের তেজে তার হাত থেকে কুড়ুলটা পড়ে যায়। আর সাথে সাথেই নজরে পড়ে পুলিশ বাহিনী। ফলে যা হওয়ার তাই। মৃগী রোগীর মতো গাছের গায়েই লোকটা কাঁপতে শুরু করে।

আবার হুঙ্কার,—কার পারমিশানে গাছ কাটছ?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর লোকটার কাছে নেই। মেজবাবু এগিয়ে এসে কথা বলেন,—নিজের গাছ। বোধহয় কোনো দরকারে কাটছে।

—ছোট খোকার মতো কথা বলবেন না। মানুষ দরকারেই গাছ কাটে। কথা হল, কার পারমিশানে এখানে গাছ কাটা হচ্ছে?

নিজের গাছ নিজের দরকারে কাটতে হলে কার পারমিশান লাগে, মেজবাবুর নিজেরই জানা নেই। তিনি তাই বড়বাবুকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, বোধহয় ঘরে খুঁটি করবে। সামনে তো ঝড়বৃষ্টির দিন আসছে।

—এসব ছেঁদো কথা আমার শোনাবেন না। গাছ কাটা এখানেই বন্ধ। আর লোকটাকে থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

বড়বাবুর শেষ কথাগুলো বুঝতে লোকটার কোনো অসুবিধা হয় না। সে বড়বাবুর পায়ের উপর বডি ফেলে দেয়।

বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল-খাওয়ানো বড়বাবু। ন্যাকা কান্নায় তাঁর মন ভেজে না। একই আদেশ বহাল থাকে।

অন্ধকার নামার আগে পর্যন্ত আর কোথাও কোনো বেচাল বড়বাবুর নজরে পড়ে না। ফেরার পথে মেজবাবু ইচ্ছে করেই মাতালির ডেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। মাতালি এই সময় ডেরায় থাকে না। সে ফেরে ভোররাতে।

—বড়বাবু এটাই মাতালির ডেরা। ভেতরে একবার যাবেন নাকি?

অন্ধকার প্রায় নেমে এসেছে। বড়বাবু কিছু একটা চিন্তা করে বলেন, আজ থাক। অন্য একদিন যাওয়া যাবে।

থানায় চুপ হয়ে বসে মাত্র এক কাপ গরম চা আরাম করে পান করার সঙ্গে সঙ্গেই বিপত্তি। দু'জন হাবিলদার একটা যণ্ডা মার্কা ছেলেকে ধরে আনে। সে মাতালির দলের ছেলে। দুটো বড় ব্লাডারে করে চোলাই নিয়ে যাচ্ছিল। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। একজন হাবিলদার ব্লাডার দুটো বড়বাবুর টেবিলের উপর রাখে।

বিশ্রী গন্ধে ঘরে টেঁকা দায়। বড়বাবু গর্জে ওঠেন, এ মালদুটো ভেতরে আনলেন কেন? বাইরে ফেলে দিন।

—কী বলছেন স্যার। বাইরে ফেলে দিলে কেউ না কেউ কুড়িয়ে নিয়ে যাবে।

—যাক।

যে হাবিলদার ব্লাডার দুটো বয়ে এনেছিল, সে-ই ও দুটো নিয়ে থানার বাইরে রেখে আসে। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ঐ বিশ্রী গন্ধযুক্ত বস্তা দুটো এতটা পথ সে বয়ে এনেছে একটা আশায়। যদি বড়বাবুর নেকনজরে পড়া যায়। সে গুড়ে মনে হয় বালি।

বড়বাবু চেয়ার থেকে উঠে এসে ছেলেটির চুল খামচে ধরে হুঙ্কার ছাড়েন, তুই কার দলের ছেলে?

ছেলেটি থানায় এমন ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত নয়। মেজবাবু, ছোটবাবু সবাই তাদের হাতের মুঠোয়। ব্যাথায় নয়, বিরক্তিতে সে মাথা ঝাঁকায়। বড়বাবু আবার গর্জে মেজবাবুকে বলেন, এটাকে এখনই লকআপে ভরে দিন। পরে দেখছি।

বড়বাবুর আদেশ না মেনে কোনো উপায় নেই। মেজবাবু ছেলেটাকে লকআপে ঢুকিয়ে দেন।

পরেরদিন ঠিক সকাল দশটায় বড়বাবু থানায় এসে ঘর আলো করে বসেন। সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলে উপস্থিত ধোঁয়া-ওঠা চা। তিনি গরম চায়ে চুমুক দেন। অফিসের কাজ শুরুর আগে গরম চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার আমেজ আলাদা।

কপাল খারাপ। চায়ের কাপ শেষ হওয়ার আগেই বিপত্তি। এক মিশকালো অসুর থানায় প্রবেশ করে। গলার স্বর মহিষাসুরকে লজ্জা দেয়,—কোথায় বড়বাবু?

আর একটু হলেই বড়বাবুর হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে যেত। কোনোরকমে কাপটা সামলানো গেলেও চা চলকে জামা-প্যান্টের দফরফা।

—আমার লোককে কে ধরেছে? সারারাত লকআপে কে আটকে রেখেছে?

এমন বাজখাঁই গলার কাছে বড়বাবুর কণ্ঠস্বর বড্ড বেমানান— কে তুমি?

অসুর এতক্ষণ মেজবাবুকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়ছিল। এবার বড়বাবুর টেবিলের দিকে তার নজর যায়। গর্জনের তীব্রতা বাড়ে,— তুমিই নতুন বড়বাবু নাকি?

বড়বাবুকে অবহেলা করার জন্য অসুর 'তুমি' সম্বোধন করে নি। 'আপনি' শব্দ যে ভাষার মধ্যে আছে, সেটাই তার অজানা।

অসুরের অজ্ঞতা বড়বাবুর জানা নেই। সম্বোধনের অপমানে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে যায়। তবে তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁকে সাবধান করে দেয়, এসময় উত্তেজিত হয়ে পড়লে বিপদ বাড়তে পারে। তিনি চোখ বুঁজে চেয়ারে দোল খেতে শুরু করেন।

বড়বাবুর ধ্যানস্থ মূর্তি দেখে অসুর রাগে ফেটে পড়ে,— কী হে, কচি খোকার মতো দোল খেতে শুরু করলে কেন?

বড়বাবুর হাবভাবে মেজ ও ছোটবাবুর চোখ কপালে উঠে যায়। মাতালি থানায় ঢুকতেই তারা ভেবেছিল, দুই অসুরে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। তা না হয়ে, বড়বাবু চোখ বুঁজে চেয়ারে দোল খেতে শুরু করেছেন।

মেজবাবু চেয়ার ছেড়ে বড়বাবুর কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেন, বড়বাবু এই হচ্ছে মাতালি।

বড়বাবু চোখ খোলেন না। দোল থামে না। ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করে, বুঝতে পেরেছি, বসতে বলুন।

—বসতে বলব কি। দেখছেন না, কেমন রোয়াব দেখাচ্ছে!

—দেখে যান।

মেজবাবু হতোদ্যম হয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে আসে। থানা জুড়ে অসুরের তাণ্ডব নৃত্য আর গর্জন চলতে থাকে। বড়বাবু বুঝতে পারেন, আজ পাঁচ মিনিটে কাজ হবে না। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে তাঁকে দোল খেতেই হয়।

শিল্পাঞ্চলের সাহিত্য ব্যবসা
বেকারদের সুবর্ণ সুযোগ

জয়ন্ত সরকার

বাংলা সাহিত্যের নাকি বাজার নেই। বাজার মানে বাংলা ভাষায় লেখা গল্প কবিতার বই নাকি আর বিকোয় না। ডাহা মিথ্যা। বই যদি বিক্রি না হবে তাহলে এত গণ্ডায় গণ্ডায় কবি সাহিত্যিক আসছে কোথা থেকে। কই অন্য ভাষায় তো এত কবি-সাহিত্যিক মেলে না! খেতে না পেলে যেখানে ঘাস গজায় না, কবি-সাহিত্যিকরা কি উপোসী থাকে? আসলে বাজার নেই বাজার নেই'বলে যারা বাজারে চিৎকার করে তারা ভুলে যায় এই সোনার বাংলায় হাজার হাজার সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যার নাম লিটল ম্যাগাজিন। (ইস। নব জাগরণের জ্যাঠামশাইদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই লিটল ম্যাগাজিন শব্দটা যে কী ভাবে টিকে আছে।)

সত্যি কথা, বাংলা সাহিত্যের দুর্দিন আর নেই। এখন সেই রেওয়াজ নেই যে কলকাতার কিছু সাহিত্যিক লিখবেন আর বাংলার গ্রামগঞ্জ সেই লেখা পড়ে নেচে উঠবে। বাংলা সাহিত্য সত্যিই এখন বাংলাময়। বঙ্গের মাটি শক্ত ঘাঁটি বাংলা সাহিত্যের।

সেই কবে কোন বসন্তে কলকাতার বাংলা সাহিত্য-গুটি আকন্দ ফলের মতো ফটাস করে ফেটেছিল আর বুড়িসূতার মতো সাহিত্যবীজ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অলিতে গলিতে ঢুকে পড়েছিল। সেই সাহিত্যবীজের অঙ্কুরোদ্গমে আজ ঘরে ঘরে কবি সাহিত্যিকের কলকলানি।

আয়না দেখলে যেমন মুখ দেখার শখ হয়, ক্যামেরা দেখলে যেমন ফটো তোলার শখ হয়, তেমনি পত্র-পত্রিকায় নিজের নামের হরফ ছাপা দেখতে কে না চায়, সম্পাদকের প্রথম কাজ এরকম মানুষদের জোগাড় করা।

বাংলায় শিল্প নেই, বিদ্যুৎ নেই, রাস্তাঘাট নেই, যোগ্যতার মূল্য নেই। না থাক। জগতে চিরস্থায়ী কী? নেই-এর মাঝে আলো জ্বেলেছে সাহিত্য। শিল্প নেই, সাহিত্য আছে। শিল্পপতি নেই সাহিত্য পতি আছে। সাহিত্যপতি, সাহিত্যের মহান সেবক, পত্র পত্রিকার সম্পাদক। আহা। কী ক্ষমতা আর কী মহিমা এই সম্পাদক কুলের।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনে আজ প্রায় সব কবি সাহিত্যিক এক একজন সম্পাদক। ক্ষুদ্র শিল্পপতি। সম্পাদক তৈরিতে মা ষষ্ঠীর এত কৃপা কেন? হবে না? সাহিত্য হল সরস্বতী। সাহিত্য ব্যবসায় আসে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী সরস্বতীর এমন মেলবন্ধন আর কোনো শিল্পে সম্ভব? সাহিত্য করে মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভে বঞ্চিত এমন কবি সাহিত্যিক সম্পাদক এই বাংলার দুর্লভ। লিটল ম্যাগাজিন এমনই এক সোনার ডিম পাড়া হাঁস। মফঃস্বল তথা শিল্পাঞ্চলের অর্থকরী সাহিত্য-ব্যবসা লিটল ম্যাগাজিন।

কলকাতার সাহিত্য জগৎ সম্পৃক্ত। হালে পানি পাওয়া বেশ শক্ত। ক্ষতি কি? কলকাতা থেকে দু'শো কিলোমিটার দূরের মফঃস্বলে বিরাট বাজার উন্মুক্ত। মফঃস্বলে শিল্প, শিক্ষার অভাব, চাষবাসে মানুষের আগ্রহ নেই। কিন্তু সাহিত্য পত্র অগণিত। সাহিত্যপতি সম্পাদক কিলবিল করছে। করবে না-ই বা কেন? জল-হাওয়া খাদ্যের এমন অফুরন্ত জোগান যেখানে সেখানে সাহিত্য পতিদের বাড় বাড়ন্ত তো হবেই। আর হচ্ছে বলেই মফঃস্বলে শুধু পত্রিকার সম্পাদক হয়ে চাকুরিজীবিদের টেক্কা দেওয়া কঠিন নয়। আবার বাড়তি রোজগারের আশায় বহু চাকুরিজীবি আজ লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

মফঃস্বলে এই পত্রিকা সম্পাদকেরাই পত্রিকার সর্বেসর্বা। তাঁর মন জয় করতে পারলেই কবি-সাহিত্যিকদের কপাল খুলবে। মন জয় মানে টাকাপয়সা। এটির মুখ না দেখলে আবার সম্পাদকদের মুখে হাসি থাকে না। মফঃস্বলে সত্যিই একটা জিনিসের অভাব। পাঠকের। তাহলে? পাঠক (ক্রেতা) নেই অথচ সাহিত্য ব্যবসা চলে কী করে? এখানেই লুকিয়ে আছে আসল রহস্য। যদি পাঠক থাকত আর পাঠকের চাহিদা পূরণে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হত তাহলে পত্রিকায় লেখার মানের যেমন গুনমান দরকার হত তেমনি সম্পাদকেরও যোগ্যতার প্রয়োজন হত। জনপ্রিয় পত্রপত্রিকা যেমন প্রতিনিয়ত পাঠকের পছন্দকে গুরুত্ব দেয়। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সে-সব দায় নেই। এ তো ওয়ান ম্যান ইন্ডাস্ট্রি। সম্পাদক খুশি তো সব খুশি। মালিক, প্রকাশক, সম্পাদক-সব এক শরীর, একমন।

লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের তিনটি শ্রেণী। একটা শ্রেণী স্তন্যপায়ী। বছরে একবার (ব্যতিক্রমে দু'বার) প্রসব করেই ক্ষান্ত। আরেক শ্রেণী হল হবু সাহিত্যিক। রক্তে বদলে দেবার ঢেউ। শ্রমিক মৌমাছি। লড়াই-সংগ্রাম-স্বার্থত্যাগ। এই শ্রেণীর দম বেশিদিন থাকে না। অনিয়মিত প্রসবে দুর্বল হলে বন্ধ হয়ে যায়। সব শেষে যে শ্রেণী, এরাই লিটল ম্যাগাজিনের ধারক ও বাহক। এরা হাঁস মুরগি। সারা বছর ডিম পেড়েই চলেছে। লিটল ম্যাগাজিনের বাজারে এই হাঁস-মুরগি সম্পাদকদের বড় কদর।

> সেই কবে কোন বসন্তে কলকাতার বাংলা সাহিত্য-গুটি আকন্দ ফলের মতো ফটাস করে ফেটেছিল আর বুড়িসূতার মতো সাহিত্যবীজ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অলিতে গলিতে ঢুকে পড়েছিল।

মফঃস্বলে হাঁস মুরগি সম্পাদকের কর্মকাণ্ড নিয়ে এবার কিছু বলি। সাধারণত দেখা যায় এই সব সম্পাদকেরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের অফিস কর্মী। কেউ জল সংযোগ বিভাগে, কেউ বিল ডেসপ্যাচ সেকশনে মাস মাইনে যথেষ্ট। কিন্তু সে তো গৃহিণীর কব্জায়। তা-ই আরো চাই। টাকা চাই। মান সম্মান চাই। ক্ষমতা চাই। পেটে বিদ্যে-বুদ্ধি আছে। সরাসরি চুরি চামারি করলে চলবে না। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনে সে ভয় নেই। টাকা চাই, টাকা হল। আবার বই-এর ব্যাপারে সংস্কৃতির বান বলে বাজারে প্রচার হল। পত্রিকা প্রকাশ করে লাভ কীভাবে হয়? আয়না দেখলে যেমন মুখ দেখার শখ হয়, ক্যামেরা দেখলে যেমন ফটো তোলার শখ হয়, তেমনি পত্র-পত্রিকায় নিজের নামের হরফ ছাপা দেখতে কে না চায়, সম্পাদকের প্রথম কাজ এরকম মানুষদের জোগাড় করা। তারপর নাম পিপাসু এদের কাছে অম্লান বদনে হাত পেতে বলা—খরচা আছে তো। টাকা দিতে আপত্তি কারো থাকে না। নাম ছাপা হবে। সম্পাদকের মানসিকতা ক্রম প্রবহমান। নাম ছাপলে দাম বাড়বে।

এরপর বিজ্ঞাপন। কে দেবে বিজ্ঞাপন? পথেঘাটে যে বিজ্ঞাপন আমরা দেখি তা লিটল ম্যাগাজিনে চলবে না। আগেই বলেছি, সম্পাদকেরা অনেকেই সরকারী কর্মী। প্রভাব খাটিয়ে, লেখা ছাপানোর লোভ দেখিয়ে অফিসের উচ্চ পদস্থদের খুশি করে সেই সংস্থার বিজ্ঞাপন জোগাড় করা এমন কিছু কঠিন নয়। কী আশ্চর্য, রেল, বিদ্যুৎ, ইস্পাত শিল্প লিটল ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন দেয় ব্যবসায়িক স্বার্থে। আরো আছে, সরকারি বিজ্ঞাপন। সরকারি বিজ্ঞাপন পেতে কিছু নিয়ম মানার আইন আছে। যেমন প্রচার সংখ্যা। কিন্তু কি মানছে? প্রচার সংখ্যা কম দেখালে বিজ্ঞাপনের রেট কম আর বেশি দেখালে বেশি। কে আর সাধ করে কম প্রচার সংখ্যা দেখাবে। তাই এক-দুশো কপি পত্রিকা ছাপিয়ে সরকারি খাতায় দশ হাজার দেখিয়ে দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সাহিত্যপতিরা। বলিহারি সরকারি নীতির। ইস্কুল, হাসপাতাল করতে সরকারের টাকা থাকে না। অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করে লিটল ম্যাগাজিনের স্বাস্থ্যোদ্ধারে। সরকারও সংস্কৃতি করছে।

এরপর আছে ডোনেশন। তোলা। সম্পাদকের ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নায় মোহিত হয়ে দু-দশ হাজার টাকা দেবার লোকের অভাব নেই। তারা খোঁজও নেয় না টাকার কী হল। সম্পাদকের চাতুরি তাদের ভুলিয়ে দেয়—আহা সংস্কৃতির জন্য না হয় একটু খরচ হোক। তো এই সংস্কৃতিবান, সমাজসেবী সাহিত্যপতি সম্পাদকদের নিজেদের সংস্কৃতি কেমন? না, পত্রিকা সম্পাদনা করতে প্রচুর পড়াশোনার দরকার নেই। দরকার প্রচুর কথা বলার শক্তি। নির্বিকার চিত্তে অনর্গল মিথ্যা ভাষণে দক্ষ হতে হবে। কখনো বিরক্ত না হয়ে করতে হবে, দিতে হবে, করছি, করব করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার মানসিকতা খুবই প্রয়োজন। মফস্বলের সম্পাদকদের এইসব গুণ বিশেষ করে হাঁস-মুরগি সম্পাদকদের মধ্যে বিদ্যমান। পত্রিকা সম্পাদকের পরিচয়ে আরো দশটা সংগঠনে যুক্ত হওয়া মফস্বলের একটা চালু রেওয়াজ। আর সেই সংগঠনগুলির আর্থিক দিকের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তো সোনায় সোহাগা। সবটাই নির্ভর করে সম্পাদকের মুখের উপর। আবার এই সম্পাদকেরা অনেক সময় বিভিন্ন কুপন (বিভিন্ন সংগঠনের নামে) বাজারে ছেড়ে টাকা সংগ্রহ করে। কেননা মানুষ সবই দিন পেরোলে ভুলে যায়। কে কেন কী জন্য দু-পাঁচ টাকা নিয়েছিল আর মনে থাকে না। তাছাড়া সমাজসেবী সম্পাদকেরা প্রথমেই চিৎকার চেঁচামেচি করে বিভিন্ন সংগঠনে প্রমাণ করে যে তাদের মত করিতকর্মা মানুষ আর দুটি নেই। ফলে বিভিন্ন সংগঠনের অন্যান্য ব্যক্তিরা আর খেয়াল করে না। খেয়াল করলে অবশ্য মাঝে মধ্যে টক্কর লাগে। কুপন ছাপিয়ে টাকা রোজগার (সাহিত্য সভা, আলোচনা, সম্বর্ধনা ইত্যাদি উপলক্ষে) মফস্বলের হাঁ সু-সম্পাদকদের এক অনন্য কীর্তি।

আরো রোজগারের সুযোগ আছে। লিটল ম্যাগাজিন করতে করতে বহু মানুষ যারা নাম ছাপাতে হামলে প'ড়ে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়। সম্পর্ক হয়। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের অর্থের অভাব নেই। তাঁরা হাবি জাবি অনেককিছু লিখে রাখেন। বয়স কালে সাধ জাগে, আহা সব লেখা যদি বই আকারে প্রকাশ হত? কীর্তিবলে তো মৃত্যুর পরে আর কিছু থাকবে না, যদি বইটাই থাকে থাক না। হাঁ, সু সম্পাদক খবর পেলেই

ছুটবেন তার কাছে। আরে আরে কী লিখেছেন আপনি। এযে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পারেন নি। এই লেখা কিনা আপনি ছাপানোর কথা ভাবেন নি। আপনার প্রতিভা এভাবে নষ্ট করবেন না। আমি আছি। আপনার এ লেখা বই হয়ে না বেরোলে পাঠকরা যে কী রসে বঞ্চিত হবে।

ব্যস, বিগলিত ব্যক্তি উৎসুক হয়ে, কিছুটা লজ্জায় বলেন, কী ভাবে কী করতে হবে তা তো আমি জানি না। সম্পাদক চিন্তা নেই আমি সব ব্যবস্থা করব। নিজে ভুলেও কলকাতায় যাবেন না। সব ঠকিয়ে নেবে ওখানে। এই কথার পর আর সংশয় থাকে না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সম্পাদক ঝোপ বুঝে কোপ বসান। বেশি কিছু বাড়তি টাকা নিয়ে কলকাতা থেকে বই ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেন। সে বই একটাও বিক্রি হয় না অথচ প্রকাশক বন্ধু হিসাবে সম্পাদক সমাজে নাম কিনে নেন।

এক সম্পাদক কাজ, এ সময় কী ভাবে ম্যানেজ হয়? সম্পাদক যে সরকারি কর্মচারি। সময়ের নেই তাড়া। আর কাজের লোক। বাঙালি ঘাম ঝরায় না, বুদ্ধি খসায়। বুদ্ধি খসিয়ে নিজেকে বুদ্ধিমান বলে ভাবতে গিয়ে আসল কাজ না করে ফালতু কাজে সময় নষ্ট করে। এই মফস্বলে তথা শিল্পাঞ্চলে টাকায় ছড়াছড়ি। শিক্ষা যোগ্যতা কিছু নয়। বাঙালি যুবক আবার নিজেকে বেকার বলে ভাবতে ভালোবাসে। এমন জনসংখ্যার যোগানে, খুবই সাধারণ মানের এমন বহু আছে যাঁরা শিল্পাঞ্চলের কাঁচা ব্যবসা কয়ল নিয়ে কারবার করতে যেমন অপরাগ তেমনি সরকারি বেসরকারি চাকরির শিকে ছেঁড়ে না তাঁদের ক্ষেত্রে। নিরুপায় এমন মানুষ খুঁজে নেওয়া লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের প্রথম কাজ। নরম সরম বোকাসোকা ছেলেদের কর্মচারী হিসাবে কাজে রাখতে সম্পাদকের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কাজ করিয়ে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বাকিটা মুখের ভাষণে পূরণ করেন সম্পাদক। আবার সংবাদপত্রে "সিকিউরিটি সার্ভিসের" বিজ্ঞাপনে যেমন লোক চাই চিরকালের বিজ্ঞাপন, তেমনি এই সব সম্পাদকের ক্ষেত্রে। এদের নীতি প্রথমে নিয়োগ, তারপরে কাজের পরিমাণ এমন ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যাতে কর্মীটি নিজে থেকেই সরে যায়। এতে সুবিধা ঐ কর্মী যে ক'দিন কাজ করল তার জন্য টাকাও দিতে হল না অথচ কাজ হয়ে গেল। আর এক কর্মী গেল তো তিন কর্মী এসে লাইনে দাঁড়াবে। সুতরাং কাজ করিয়ে নেবার অভিজ্ঞতা থাকা লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদকের থাকা চাই। আর চাই বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে ভবিষ্যতের কাল্পনিক উন্নতির স্বপ্ন দেখানো। বোকা সোকা কর্মচারী, কথার গুণে মোহিত হয়ে সম্ভব-অসম্ভব এর কথা ভাবতেই পারে না। আর সমাজসেবী পরিচয় নিয়ে সম্পাদক মশাই প্রচার করেন দেখ দেখ, চাকরি-বিহীন সমাজে আমি লিটল ম্যাগাজিন করে কিছু মানুষকে কিছু টাকা তো রোজগারের সুযোগ দিচ্ছি।

এত কথা বলা একটাই উদ্দেশ্যে। দুর্গাপুর-আসানসোল চিত্তরঞ্জন শিল্পাঞ্চলে সরকারি চাকরি শেষ, চাষবাস প্রায় হয় না। কোলিয়ারির কয়লা ব্যবসা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ কোলিয়ারীর কাঁচা টাকা হাওয়ায় উড়ছে। এরই মাঝে বেশ কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে 'বেকার বেকার' বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা যদি উপরের মতো নিজেদের স্বভাব চরিত্র পরিবর্তন করে পত্রিকা ব্যবসায় নামতে পারে তবে আর কোনো দুঃখ থাকবে না। পত্রিকা গোটা দশেক কবিতা দিয়ে সস্তার কাগজে কোনোরকমে ছাপলেই হবে শ' খানেক কপি। মুখে পত্রিকার জয়গান করে যেতে হবে। কবিতা পেতেও কোনো অসুবিধা নেই। বাংলায় সহজ শিল্পকর্ম এখন কবিতা লেখা। আর যা বলা হয়েছে, সবাই কয়লা তথা শিল্প অঞ্চলের কথা ভেবেই বলা। বেকার যুবকেরা আর সময় নষ্ট না করে নেমে পড়ুন। এ ব্যবসায় পাপ বলে কিছু নেই। সবই সংস্কৃতি। □

বাঁকাচোখে

ইংরাজি শিক্ষার আসর

শিক্ষক : বলো তো "Ram is good boy" —মানে কি?
ছাত্রী : আজ্ঞে, ভালো ছেলেরা রাম খায়।
শিক্ষক : হুম্! আচ্ছা, পরেরটা বলো— You are naughty girl.
ছাত্রী : তোমরা ন'জন মেয়েও খাও।

শিক্ষক : "Bible" বলতে কী বোঝ?
ছাত্র : বেল কেনো।

শিক্ষক : "Don't laugh" —মানে?
ছাত্র : লাফ দিও না।

শিক্ষক: তোমার পদ বিন্যাস ঠিক হচ্ছে না।
ছাত্র : তবে হস্তবিন্যাস করব স্যার? দু'হাত বাড়াই?

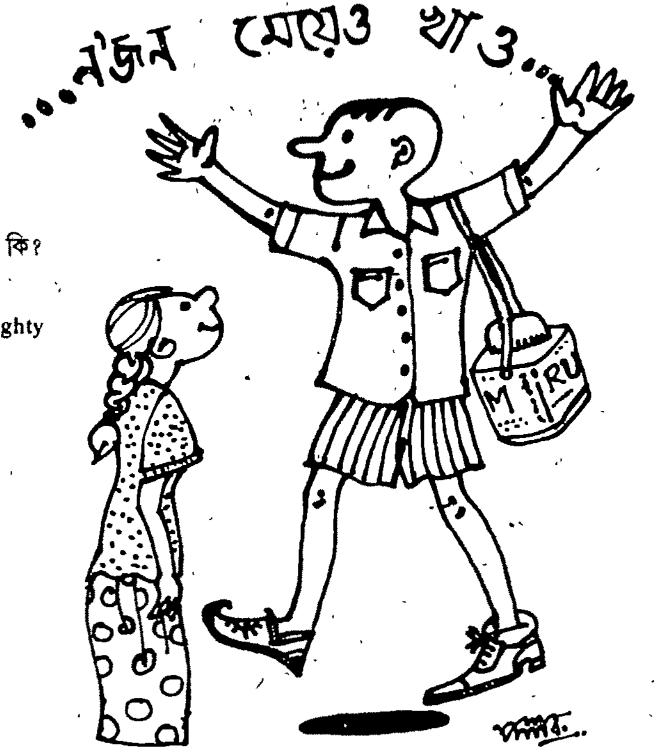

হেঁসেল

চিতল মাছের মুইঠ্যা

আর কইব্যান্ না। বইয়া বইয়া কি রহন্ যায়? এ্যাদ্দিন্ তো ম্যাফ্ আরাম কইরা আপনাগো রাইন্যা খাইয়া ফুইল্যা উঠতাসি। একবার দোখ্‌নো ধইরা আস্তাসেন। একবার বাঁকুড়ার কোন আনপড়রে ধইরা আইন্যা এই পবিত্র হেঁসেলের বারোটা বাজাইতাসেন। নাঃ, আর বহন্ যায় না। যাইর্ যা স্বভাব-বুঝল্যান্ না? অগইত্যা, পত্রপাঠের হেঁসেলে আবার ঢুইক্যা পরলাম।

যা কিছু লাগব : চিতল মাছের মইধ্যিখানের টুকরা, আলু, পিঁয়াজ, আদা, হলুদ, শুকনা লঙ্কা, ত্যাজপাতা, লবণ, সইরষার ত্যাল আর গরম মশলার গুঁড়া।

যে ভাবে কইরব্যান্ : চিতল মাছের টুকরাগুলি জলে পরিষ্কার কইরা ধুইয়া (অবশ্যই আঁইশ ছাড়াইয়া) উনান, স্টোভ বা গ্যাসের (যে কোনো) আঁইচে জল-ভরা একটা পাত্রে মাছের টুকরাগুলি সিদ্ধ কইরা, জল থিকা তুইল্যা একটা থালায় রাখেন। পিঁয়াজ, আদা, বাইট্যা (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) রেডি রাখেন। হলুদ আর শুকনা লঙ্কার গুঁড়া আলাদা-আলাদা জায়গায় (পাত্রে) জল দিয়া গুইল্যা রাখেন। ত্যাজপাতা জল দিয়া ধুইয়া রাখেন। এই কাজগুলি সারনের পর মাছসিদ্ধ থিকা কাঁটাগুলিরে বাইছ্যা রাখেন। সলিড্ মাছগুলি একত্র কইরা সামাইল্যা লবণ দিয়া মাইখ্যা হাতের মুঠায় লইয়া খানিকটা কইরা গোল্লা পাকাইতে থাকেন। গোল গোল বলের মতন্ কইরতে পারেন, কিম্বা একটু চ্যাপ্টা আকারও করন যায় (খুব বেশি বড় বড় করব্যান না)। আলুর খোসা ছাড়াইয়া টুক্‌রা কইরা ধুইয়া রাখেন।

আঁচে কড়াই বসান। তাইত্যা উঠলে পর সইরষার ত্যাল ঢালেন। আঁচ কমাইয়া ত্যাজপাতা ছাড়েন (খুব পোড়াইব্যান না)। প্রায় সাথে সাথেই ছাড়েন পিঁয়াজ বাটা। খোন্তা দিয়া লাড়েন। ছাড়েন আদা বাটা, আবার লাড়েন। গ্যাসের আরেকটা আভেনে আরেকটা কড়াইতে সইরষার ত্যাল গরম কইরা আলুর টুকরাগুলি ভাইজ্যা রাখেন। আরর মাছের বলগুলিরেও ভাইজ্যা রাখেন। প্রথম কড়াইয়ের মশলাগুলি এতক্ষণ এক্কেবারে ঢিমা আঁচে রাখা ছিল। অখন আবার এইদিকে মন দ্যান । মশলায় পরিমাণ মতো লবণ মেশান, আবার খোন্তা দিয়া লাড়েন। মনমতন লাড়া হইলে ভাজা আলুর টুকরাগুলি আর চিতল মাছের মুইঠ্যাগুলি কষা মশলায় মিশাইয়া ভালোভাবে লাড়তে থাকেন। জল ঢালেন, একগাদা না, ঐ গুলি সিদ্ধ হওনের মতন। টগবগ্ কইরা ফুইট্যা ফুইট্যা বেশ ঘন ঝোল হইব, অথচ আলু আর মুইঠ্যাও সিদ্ধ হইয়া উঠব। তখন গরম মশলার গুঁড়া ছড়াইয়া সুন্দর পাত্রে ঢাইল্যা রাখেন। পরিবারের হক্কলরে আগেই কইয়া রাখব্যান স্নান সাইরা রাখতে। আপনি ভাতটাও বেশি কইরাই রাখব্যান চিতলের মুইঠ্যা দিয়া খাওনের লিগা।

মৌরলা-বেগুন-চচ্চড়ি

যা লাগব : মৌরলা মাছ, বেগুন, পিঁয়াজ, হলুদ, শুকনা লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, সইরষার ত্যাল, লবণ।

কী ভাবে কইরব্যান : জল দিয়া মৌরলা মাছগুলি ধুইয়া রাখেন, আর রাখেন বেগুন টুকরা কইরা (লম্বা-লম্বা)। মাছের প্যাটি হাত দিয়াই পরিষ্কার কইরা লইবেন। হলুদ, লঙ্কা বাইট্যা রাখেন। পিঁয়াজ কুচি কইরা কাইট্যা রাখেন।

তাতানো কড়াইতে সইরষার ত্যাল ঢালেন। কুচানো পিঁয়াজ ছাড়েন। খোন্তা দিয়া লাড়াচাড়া করেন। বাটা হলুদ আর বাটা লঙ্কা মেশান, লাড়েন, টুকরা বেগুনগুলি ছাইরা মশলার সঙ্গে লাড়তে থাকেন। লবণ স্বাদ মতন মিশাইয়া লন, আবার লাড়বেন সাবধানে, যাতে বেগুনগুলি ঘাইট্যা না যায়। এইবার ছাড়েন মৌরলা মাছগুলিরে। বেশ আলগা আলগা কইরা সব শুদ্ধ ভালো কইরা কষাইতে লাগব। জল দিবেন না কিন্তু। তাইলে ঘ্যাট্ হইয়া যাইব, খাওনের স্বাদও যাইব পলাইয়া। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চিইরা এইতে ছাইড়া দ্যান। ঢাকনা ঢাকা দিয়া খুব অল্প সময় রাখেন। ইচ্ছা হইলে ঢাকা না-ও দিতে পারেন। তখন দ্যাখেন রান্না তৈরি। তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া বসেন খাইতে। আর হ্যা—গরম ভাতও তো তৈরিই আছে।

সম্পা দাস

ফিস ফ্রাই কিংবা ডিমের ডেভিল

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

টাইয়ের নট্ ঠিক করতে করতে শেষপর্যন্ত 'মধুর মিলন' এ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেই পড়ল সিদ্ধিনাথ। মনটা খচ্খচ্ করছিল সংযুক্তার কথা ভেবে। সবে তাকে নিয়ে একটা গল্পের প্লট এসেছে মাথায়। আজ সন্ধ্যায় লেখা য় যেত কিন্তু উঠতেই হল। উঠে আসবার সময় সংযুক্তা বলেছিল, "দূর এ'কি হেবি সাজ? এ'কি বাঙালি বিয়েবাড়ির সাজ নাকি?" এরপর সারা রাস্তা সে বেছে এই রে, কেন বলল ও কথা সংযুক্তা, তবে কি বেমানান দেখাচ্ছে কে? সংযুক্তা সাজপোশাক ভালো বোঝে, ভারি রুচিশীল। তবে বোধহয় লো দেখাচ্ছে না আমায়। ভাবতে ভাবতে সিদ্ধিনাথ সমস্যায় পড়ল আবার। ধন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, শীতের রাত্রি, এ'সময় বিয়েবাড়ি ফাঁকা হতে কে। ইস্ আর একটু আগে বোধহয় আসা উচিত ছিল। অতিথি অভ্যাগতরা ল যেতে শুরু করেছে, আর সে এখন নেমন্তন্ন খেতে, বগলে বই, 'বীর সন্ন্যাসী বেকানন্দ'।

দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করার আগেই তাকে দেখতে পেয়ে এক ছাত্র হৈ হৈ র উঠল, 'স্যার এসেছেন, স্যার এসেছেন'। সেই নিয়ে গেল দোতলায়, যেখানে নামিকা সেজেগুজে বসে আছে। আজ তার বিয়ে। তারপর কী সমাদর সিদ্ধিনাথের। নামিকার মা পরিচয় করিয়ে দিলেন ঘরে বসে থাকা মানুষদের সঙ্গে।

—ইনি অনামিকার মাস্টারমশাই, আমাদের ঘবের লোকের মতো। দারুন লো পড়ান। সাজেশন দারুণ লাগে।

অনামিকার মা শিক্ষয়িত্রী। এত সুন্দর করে কথাটা বললেন যে সিদ্ধিনাথের লো লাগল। বিশেষ করে 'ঘরের লোক' শব্দটা। সে লাজুক-লাজুক মুখ করে স রইল। অনামিকার মা আবার শিক্ষয়িত্রীর ভঙ্গিতে একজনকে নির্দেশ দিতে ত বেরিয়ে গেলেন। ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে দারুণ প্রতাপ ওনার, থা ভাবতে না ভাবতেই অনামিকা জিজ্ঞেস করে বসল, 'কী স্যার, কী ভাবছেন?'

তার বলার ধরনে হেসে ফেলল সামনে বসে থাকা একজন তরুণী। সিদ্ধিনাথ সমস্যায় পড়ল আবার, কী যেন স্কুলের নামটা? ভুবনমোহিনী উচ্চ প্রাথমিক নিম্ন বালিকা বিদ্যালয় না?

সে মুখে বলল 'না না কিছু না। অনামিকা, আমার আসতে বোধহয় দেরি হয়ে গেল।'

অনামিকা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'সে তো হয়েছেই। চিরকালই তো পাঁচটা বলে আটটায় আসেন। কবে আর ডিসিপ্লিন্‌ড্ হলেন আপনি?'

অনামিকার বলার ধরনে সকলেই মুখ টিপে হাসতে লাগল। সিদ্ধিনাথ অপ্রস্তুত হাসিমুখে 'না না' করে বসে রইল অনামিকার কাছে। এঃ হে, এমন করে কেউ বলে?

মাথার ডান পাশে চুল সরে গিয়ে টাক দেখা যাচ্ছিল আর মনটা একটু খারাপ লাগছিল তার। সত্যিই সে ডিসিপ্লিন্‌ড্ নয়। সে একটু অগোছালো, ভুলো, বাউন্ডুলে গোছের। কিন্তু এ'ভাবে সকলের সামনে .... অন্য ছাত্রছাত্রীরাও কি টের পায় এসব? সে বেশ দমে যাচ্ছিল। —'এই যে স্যার আমার জেঠু, জেঠু এই যে আমার স্যার। অধ্যাপক সিদ্ধিনাথ মুখোপাধ্যায়; ওনার কথাই বলেছিলাম।'

যার সঙ্গে পরিচয় করাল অনামিকা, তিনি কোট ও টাইপরা শীর্ণ এক বৃদ্ধ, মাছি গোঁফ। হ্যান্ডশেক করেই তিনি পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন। চেয়ারে শব্দ হল।

—আই ওয়াজ অলসো এ টিচার।

—কোথায় পড়াতেন আপনি?

—আই রিটায়ার্ড এ্যাজ এ হেডমাস্টার ফ্রম দি গভর্নমেন্ট স্কু অফ দার্জিলিং।

—ও আচ্ছা। ভদ্রলোক কেন জানি না হিংস্র চোখে সিদ্ধিনাথকে জরিপ করছিলেন।

এবার খিদে পাচ্ছিল সিদ্ধিনাথের। বিয়েবাড়ি ঢুকেই যে খাবারের গন্ধ পাওয়া

গিয়েছিল তাই কি ক্ষুধা উদ্রেকের কারণ? সে আবার ভাবছিল। আরে হঠাৎ এত খিদে পাচ্ছে, কেন? ভাবনায় ছেদ পড়ল ভদ্রলোকের কথায়—'আপনার হবি কি?'

—আমার? বইপড়া আর ভাবা, একটু লিখিটিখিও।

—কী ভাবেন এত? হুঃ। ভদ্রলোকেব মুখে সূক্ষ্ম কৌতুক ঝিলিক দিল।

—এই নানা ব্যাপার। আপনি রিটায়ার করার পর সময় কাটাচ্ছেন কি করে?

—পাখি, পাখি পুষে। সেদিন একটা ম্যাকাও কিনেছি আট হাজার টাকায়। ভদ্রলোক পাখিদের নামধাম, বংশপরিচয় বলতে লাগলেন, সিদ্ধিনাথ শুনতে লাগল। শুনতে শুনতে ভুল ধরছিল সে। এখন তার মনে পড়ে যাচ্ছিল সেচেলিস দ্বীপপুঞ্জের পাখিদের কথা, আফ্রিকার ছায়াঘন অরণ্যের পাখি, সাইবেরিয়ার কাছাকাছি তুষারাবৃত অঞ্চলের পাখি, হিমালয়ের পাখিরা, পশ্চিমের সেইসব Love bird, জঙ্গলে জঙ্গলে অবিশ্রান্ত গান গেয়ে ফেরা পাখিরা উড়ে আসছিল তার চেতনায়। উড়ে আসছিল মুনিয়া, চন্দনা, হরিয়াল আর বিরল প্রজাতির সেই দীর্ঘচঞ্চু ঈগল। হিমালয়ের সোনালি ঈগলেরা। ভদ্রলোক জুতসই খাঁচার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কীভাবে তিনি সুরক্ষিত খাঁচায় পুরে রেখেছেন তাদের কত আরামে, সে কথা বলতে বলতে তৃপ্তিতে চোখ বুঁজে আসছিল তাঁর।।

কেন খাঁচা তৈরি হয় জীবনে? তা ভাবতে ভাবতে সিদ্ধিনাথ বুঝল সে একই কথা দু'বার বলে ফেলেছে ভদ্রলোককে। তা হল অজয় হোমের লেখা 'বাংলার পাখি' বইখানার কথা।

—আহা, বললেন তো অজয় হোম। নতুন লেখকের নাম বলুন। ভদ্রলোক যেন interview করছিলেন লম্বা লম্বা আঙুলে টেবিল বাজিয়ে। মুখ তুলতেই ফর্সা সুশ্রী ছেলেটি বলল, 'স্যার খাবেন চলুন'।

—উঠে দাঁড়াতেই হাত ধরে বসিয়ে দিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

—খাবেন খাবেন, তুমি এখন যাও, আমরা একসঙ্গে খাব।

উনি তো ঘরের লোক।

ছেলেটি চলে গেল। 'ঘরের লোক' কথাটা আবার খুব আন্তরিক বলে মনে হল সিদ্ধিনাথের। কোট পরা সত্ত্বেও তার শীত করছিল, বোধহয় খিদেতে। সে ঠিক তা না বুঝে, ক্লান্ত লাগছে কেন ভাবতে ভাবতে ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল।

প্যাসেজ্জে ভিডিওর আলো পড়তেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 'চলেন, চলেন, এবার স্ত্রী-আচার শুরু হইবো।' উৎসাহে পূর্ববাংলার ভাষা বেরিয়ে পড়ছিল ভদ্রলোকের। সিদ্ধিনাথ আবার সমস্যায় পড়ল। সেও কি যাবে? ওদিকে ঠাসাঠাসি মেয়েদের ভিড়। ওখানে গিয়ে সে কী দেখবে? সংযুক্তা থাকলে বলত, 'ধুস্ আপনি ওদিকে কেন যাবেন? সাতপাঁচ ভেবে সে বলল 'না না আমি এখানেই থাকি।'

অনামিকাকে তখন পিঁড়িতে বসিয়ে ঘর থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পানের পাতায় সে ঢেকে রয়েছে চোখ। এতদিনের চেনা অনামিকা কেমন অচেনা হয়ে চলে গেল সভায়। মুহূর্তে ঘর ফাঁকা। কিছুক্ষণ ফাঁকা ঘরে চেয়ারে বসে ভারি ক্লান্ত লাগছিল সিদ্ধিনাথের। ঘরের মেঝেয় একদিকে গালচে পাতা, থেঁতলানো রজনীগন্ধা পড়ে আছে। একটা ডিসে ভাঙা নিমকি খানিকটা, আর কি জানি কেন দুটি গুজিয়া পড়ে রয়েছে অসহায়। বিয়েবাড়ির তীব্র কোলাহল থেমে গিয়ে একটা অদ্ভুত নীরবতা চারদিকে। বেশ রাত হয়েছে। শীতের রাত। সিদ্ধিনাথ কি করবে বুঝতে পারছিল না। সে একবার উঠে দাঁড়াল। দরজা দিয়ে এবার মুখ বাড়াল উর্দিপরা খানসামা জাতীয় একজন লোক। তাকে যেন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে গেল সে। আরে, আমাকে কি চোর চোর দেখাচ্ছে? ভাবতে ভাবতে প্যাসেজ্জে গিয়ে দাঁড়াল সিদ্ধিনাথ।

প্যাসেজ্জে কোলাহল বাড়ছিল। ভিডিওর আলো ঝলকাচ্ছিল। সেই জ্যাঠামশাই প্রায় লাফাচ্ছেন। কেউই পাত্তা দিচ্ছে না ওনাকে, একমাত্র সিদ্ধিনাথই পাত্তা দিয়েছিল। আমাকে কে এখন পাত্তা দেবে? সিদ্ধিনাথ বুঝতে পারছিল না বাড়িটা কত বড়। সে পেছিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল। এরা খাবার আয়োজন ঠিক কোথায় করেছে বোঝা যাচ্ছিল না। অনামিকার বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি আজ ভারি হাসিখুশি। একটু ঝুঁকে বললেন, 'আরে! এখনই চললেন? একটু পরে যাবেন। বিয়েটা দেখবেন না?'

সিদ্ধিনাথ মিনমিন করে খাওয়ার জায়গাটা কোথায়—বলতে গিয়েও বলতে পারল না, হাসল একটু। ভদ্রলোক ভিড়ের ভেতর ঢুকে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ল্যান্ডিং-এর কাছে দেখা অনামিকার মা'র সঙ্গে। ভদ্রমহিলা উঠছেন দ্রুত, দেখা হতেই একমুখ হেসে বললেন, —চললেন তাহলে? আবার আসবেন, ১০ তারিখের পর। ওর কিসব দরকার আছে। পরীক্ষা কিন্তু ও দেবেই। আসবেন কিন্তু। ও শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরবে ১০ তারিখ বিকেলে। ভুলবেন না কিন্তু।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা প্রায় উপরে চলে গেছেন, সিদ্ধিনাথ উটেব মতো ওপর দিকে মুখ তুলে ভদ্রতাবশত 'আচ্ছা আচ্ছা' করছিল, পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠতে উঠতে ধাক্কা দিয়ে ফেললেন সিদ্ধিনাথকে। সিদ্ধিনাথ স্পষ্ট শুনতে পেল, তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'যাঃ শালা।' রেলিং ধরে পতন সামলিয়ে সিদ্ধিনাথ তাকিয়ে দেখল, ভদ্রলোকের কোটের বাটনে লাল গোলাপ। ভারি সুপুরুষ তিনি, পায়ের বুটের ডগাটা সূঁচালো, সেটিরই ধাক্কা লেগেছিল সিদ্ধিনাথের পায়ে। ভদ্রলোক এবার বললেন, 'সরি', বলে, টক্‌টক্ কবে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে। সিদ্ধিনাথ মাথা হেলিয়ে নামতে শুরু করল খাবারের আশায়। তার মনে পড়ল অশোকের বিরুদ্ধে কলিঙ্গে যে গণবিদ্রোহ হয় তার মূল কারণ ছিল খাদ্যাভাব।

নিচে এসে বোঝা গেল খাবারের গন্ধটা আসছে পশ্চিমদিক থেকে। এক ভদ্রলোককে দূর থেকে দেখা গেল খাবারের প্লেট হাতে একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। তাহলে কি বুফে? আবার খাবার কথা? কি আশ্চর্য, খিদে পাচ্ছে যে! সিদ্ধিনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল দু'মিনিট। এ'সময় তার সংযুক্তা বা বিবেকানন্দ কাউকেই মনে পড়ছিল না। সে ভাবছিল, যদি এখানে খেতে না পায় তাহলে সে কী করবে। বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সবাই শুয়ে পড়েছে। রাত্রি অনেক। সে কি ঘরের লোকের মতো গিয়ে সহজভাবে খেতে চাইবে? 'ঘরের লোক' এই শব্দটির মাধুর্য আর সে অনুভব করছিল না।

বিয়েবাড়ির নিচতলা ফাঁকা। উপরে হট্টগোল চলছে এখনো। সে এবার খাবার আশা ছেড়ে দরজার দিকেই এগুতে লাগল। সিঁড়িতে দালানে পদপিষ্ট ফুল ও রাংতার ভিতর দিয়ে সিদ্ধিনাথ দরজার খোলা ফ্রেমে এসে দাঁড়াতে অনামিকার দাদা অরিত্রকে দেখতে পেল। সে বাইরে থেকে ঢুকছে সিগারেটের বাক্সগুলি দু'হাতে ধরে।

—দাঁড়ান স্যার। আপনি সিগাবেট খান না জানি, তবে আজ খান একটা। খাওয়ার পরে সিগারেট টানতে টানতে চলে যাবেন। সিগারেট দিচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না।

—না হে দাও দাও। সিদ্ধিনাথ সিগারেট ধরাল। এতক্ষণে খাবার আশা ছেড়ে দিল সে। বাড়ির সামনে বসে থাকা তিন-চারজন ভিক্ষুক নজরে পড়ল তার। কেন যে এরা পৃথিবীতে রাষ্ট্রের উত্থানের সময় থেকে বেঁচে আছে। অরিত্র বলল, 'স্যার', রবীন্দ্রনাথের উপর কিছু পড়াশুনা করব। কি পড়ব বলে দেবেন?'

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

—আর আমি স্যার W. B. C. S. এ কিন্তু হিস্ট্রি নেব। পড়াতে হবে। চমকে সিদ্ধিনাথ তাকিয়ে দেখল, কনা। সিদ্ধিনাথ শান্ত গলায বলল, 'প্রাচীন ভাবত মন দিয়ে পড়ো।'

কালো, ম্যাকাড্যামাইজ্‌ড্ রাস্তায় পা দিতেই সিদ্ধিনাথ বুঝল খুব জ্যোৎস্না হয়েছে আকাশে। প্রাচীন ভারতেও ক্ষুধা ছিল, তবে রাষ্ট্র দায়িত্ব নিত, ধর্ম, সমাজ, দায়িত্ব নিত, ভাবতে ভাবতে কে খপ্ করে হাত চেপে ধরল।

—আরে মুখার্জি, চলো চলো। আমিও এসেছিলুম।

পালবাবু একটা ওষুধের দোকানের মালিক। পালবাবুর শাল থেকে জ্যোৎস্নায় ন্যাপথালিনের গন্ধ আসছিল। তিনি বললেন, ওঃ কী দারুণ হয়েছিল মুরগির রোস্ট।

সিদ্ধিনাথ শত শত মুরগির পাখার আওয়াজ শুনছিল পেটের ভিতর। আর কাউকে মনে পড়ছিল না তার। ভাবছিল, আজ কিছু খেতেই হবে তাকে। সকাল থেকে কাজের তাড়ায় প্রায় না খেয়ে আছে সে।

পালবাবু বললেন, 'কী হে ভেটকিমাছের ফ্রাই ক'টা খেলে তুমি? খাবার জায়গাটা কেমন সাজিয়েছিল দেখেছ?'

সিদ্ধিনাথ ম্লান হাসল, তার টাই ঝুলে লট্‌পট্। সে এমন বোকা, ভেবেছিল কেউ এসে বলবে, চলুন খাবেন চলুন।

পালবাবু বললেন, 'ওফ্ মাংসের কিমা দিয়ে যে এমন প্রিপারেশন হতে পারে, ভাবা যায় না। বোধহয় ঢেঁকুর উঠল তার।

রাস্তায় শীতরাতে সহসা ঠাণ্ডা হাওয়া দিল। জ্যোস্নার কুয়াশা নামছে, অতীতযুগের দিকে চেয়ে পালবাবু বললেন, 'কত মেয়ের বিয়েতে খেলাম, কিন্তু এখানে—আহা।'

নন্দদুলাল ঠাকুরের প্রাচীন মন্দিরের ছায়ায় শুয়ে থাকা ভিখারিদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পালবাবু উচ্ছ্বসিত হচ্ছিলেন। কাছেই তাঁর বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। সিদ্ধিনাথ ভাবল 'ধুস নিজেদের এত আনন্দের ভেতর কেউ কি কখনো বলে, এহে তোমার খাওয়া হয়নি বুঝি? আহা কষ্ট হল, এসো খাবে এসো'। খাবার নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হয়। আদিম যুগেরও এই রীতি। আজ অনামিকার বিয়েতে এই, কাল সংযুক্তার বিয়েতেও এই হতে পারে। পৃথিবীর এই তো পথ।

তার এক বান্ধবী পয়সাওলা শিক্ষিকা, সে গরিবদের পয়সাকড়ি না দেওয়ার ব্যাপারে খুব সচেতন। গরিবদের সঙ্গে না মিশেও সে কি সুন্দর গরিবমানুষের দুঃখ বুঝতে পারে, তাই নিয়ে গল্প লেখে। সে এবার সেই কথা ভেবে ভেটকিব ফ্রাই না খেয়েও উদ্ভাসিত হয়ে পালবাবুকে বলে উঠল, 'ওঃ কী দারুণ খাওয়ালো, সত্যি পালদা, আমার কিমা, মাংস, ফ্রাই সব, সব ভালো লেগেছে।' বলতে বলতে তার মুখ ভর্তি হয়ে উঠছিল কিমাকার স্বাদে। মুখের লালায় ভেটকির ফ্রাই, কিমা, মাংস সব একজোটে 'এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা' বলে ধেয়ে আসছিল। সে ভিখারিদের দিকে তাকাল, খেতে পাওয়া মানুষদের ভিড় থেকে এসে সে আজ খেতে না পাওয়া মানুষদের কাছে দাঁড়িয়েছে। টা, টা, —হাত নাড়ছেন পালবাবু।

ভরাপেটে পালবাবু বলিষ্ঠ পায়ে শীতের জ্যোৎস্নায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন বাড়ির দিকে, ক্ষুধার্ত সিদ্ধিনাথের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল তাঁর।

প্রকাশনা জগতে দীপ প্রকাশন এক উজ্জ্বল গতিময় নাম

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি চর্চার দিনলিপি
সন্তোষ দেবনাথ-এর আমার দেশ সেই সময় ৪০
অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু-র
ভারতের হিজড়ে সমাজ ৭৫, পুরুষ যখন যৌনকর্মী ৭৫
অসিত কুমার দাস-এর টাইটানিক এক ঐতিহাসিক ঘটনা ৬০
পি. সি সরকার (জুনিয়র)-এর আমার জীবন আমার ম্যাজিক ১৫০
চিন্ময় চৌধুরীর রক্তের বদলে রক্ত ৫০
সুজাতা মুখোপাধ্যায়ের ডাক্তারকে টাকা না দিয়ে ৯০

ডঃ ভবানী প্রসাদ সাহু-র
জানতে চাই ২০, শরীর স্বাস্থ্যের টুকিটাকি ৩০
তাপস চট্টোপাধ্যায়-এর
ব্যস্ত লোকের সুস্থ শরীর ৩৫
ডাঃ সুনীল ঠাকুর ও তাপস চট্টোপাধ্যায়-এর
ঘাড়ের ব্যথা নিরাময়ে ৫০
অসিত কুমার দাস-এর ক্লোনিং : বিজ্ঞান বনাম পুরাণ ৪০
ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহুর
ভূত ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর ৯০

খেলা পাগলদের মন-ভরানো প্রাণ-মাতানো বই

গৌতম ভট্টাচার্যের বডিলাইনের যুদ্ধে ৭৮
বডিলাইনের বিরুদ্ধে ৪০
নতুন বলের মুখে ৭০
সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রিকেট শেখ ক্রিকেট খেল ৭০
অমল দত্ত-র ফুটবল খেলতে হলে ৮০

রূপক সাহার ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল
সব্যসাচী সরকারের
সবার শচীন আমাদের সৌরভ ৬০
বাইশগজে অন্ধকার ৫০
মানস চক্রবর্তীর সোনার মেয়ে জ্যোতির্ময়ী ৫০

দীপ প্রকাশন ২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা ৬, ফোন : ২৪১-২৫৩৮/১৪৪৯

কে যায় রে ভোটগান গাইয়া....

মহিলা মহল

'ফিস-ফিস' বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : **প্রাণঘাতিনী দেবী**

● আমি একজন পুরুষ। কিন্তু মেয়ের ছদ্মনামে চিঠি লিখেছি শুধুমাত্র কোনো একদিন কমলিকার সঙ্গে আলাপ হবে এবং চুটিয়ে প্রেম করব বলে। কিন্তু প্রাণঘাতিনী দেবী, ঈশ্বর রক্ষা করুন, নাম শুনেই আমার প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি। আর কক্ষনো এমন কুকর্ম করব না। আমাকে দয়া করে মার্জনা করুন।

—বিনত বিশ্বাস, পিপুলপাতি, হুগলী

□ তোমাকে মার্জনা করার জন্যে আমি ব্যাকুল বোধ করছি। কবে দেখা হবে? একটি সম্মার্জনী (সম্মানজনক মুড়ো ঝাঁটা) যে আমি তোমার জন্যেই আলাদা করে রেখেছি ডার্লিং।

● আমি একটি বিচিত্র সমস্যায় ভুগছি। যে ছেলেকে আমার পছন্দ হয়, সে আগে থেকেই এন্‌গেজড্ আর যে আমাকে প্রেম নিবেদন করে, তাকে দেখলেই হাড়মাস জ্বলে যায়। অধুনা ইন্দ্র নামে একজনকে আমার পছন্দ হয়েছে—কিন্তু তিনি আমার জ্যাঠামশায়ের চেয়ে দু'বছরের বড়ো। তাঁরও আপত্তি নেই...... কিন্তু......তাঁর সঙ্গে প্রেম করা কি খুব মন্দ হবে?

—দিয়া সরকার, বাঁশবাজার, কুচবিহার

□ বুক ঠুকে এগিয়ে যাও। ইন্দ্র লাভের জন্যে মন্দ আক্রান্ত হওয়ায় কোনো বাধা নেই।

● প্রাণঘাতিনীদি, আমার বয়েস ২৩। দোষের মধ্যে একটু মুটিয়েছি। সাজগোজ করি, চুড়িদার পরি। লোকে তাকায়ও বটে। কিন্তু মনে হয়, ঠিক তেমনটি হচ্ছে না। বলতে পারেন, ঠিক কী রকম পোশাক পরলে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারব?

স্নিগ্ধা দাস, কলকাতা-১৯

□ চুড়িদার নয়, হাতে চুড়িও নয়। জন-আকর্ষণী ক্ষমতা যদি পেতে চাও তবে সাদা শাড়ি, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, চুল উস্কোখুস্কো, আর হ্যাঁ, গলায় একটু জোশ্ চাই দিদি।

● আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, যার সঙ্গে প্রেম কবব, তাকে বিয়ে করব না। কিন্তু এমনই কপাল, যার সঙ্গে প্রেম করতাম তার সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল। অনেক ভেবে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, —একটা প্রেমিক জোগাড় করে নিই। ও বলেছে, তাহলে মেরে হাড় ভেঙে দেবে। এখন আমি কী করি।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলকাতা-৭৮

□ কিছুদিন অপেক্ষা কর ভাই। ক্লোনিং প্রায় হাতের মুঠোয়। চালু হলেই ওর একটা ক্লোন করে নেবে। বরের ডুপ্লিকেট, কিন্তু বর নয়, শুধুই প্রেমিক।

● খুব সুন্দর দেখতে আমি। সবাই বলে—পরীর মতো। আচ্ছা, আমি কি নায়িকা হতে পারব? নায়িকা হতে গেলে কি কি দরকার?

—রাধা বসু, ডানকুনি, হুগলী

□ পরী-চালক। একজন ভালো পরী-চালক বেছে তার গলায় ঝুলে পড়ো।

● আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালোবাসি বিড়ালকে। মাত্র ৫২ টা বিড়াল পুষেছি। তাইতেই স্বামী রেগেমেগে ডিভোর্স চাইছেন। কথা দিলাম, আর বিড়াল পুষব না। তবু তিনি অনড়। আর কী করতে পারি আমি?

—শাশ্বতী চক্রবর্তী, বেহালা

□ মোক্ষম ভুল করেছেন ভাই; বলা উচিত ছিল—আর একটা মাত্র বিড়াল পুষব— তোমাকে—যাঁহা বায়ান্ন ওঁহা তিপ্পান্ন।

● আমার এক বান্ধবী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গভীর প্রেমে মগ্ন। অথচ তাদের বয়েসের পার্থক্য খুব বেশি। ভদ্রলোক চিঠিতে যা লেখেন তা হজম করতেই বান্ধবীর তিনদিন সময় লাগে। বিয়ের কথা বললেই ভদ্রলোক সিঁটিকে যান। কী করে ভদ্রলোকের বয়েস ২৫ বছর করা যায় বলুন তো?

—উর্মি সেন, পার্ক সার্কাস, কলকাতা

□ বয়েস আর চয়েস হল ভালোবাসার এপিঠ-ওপিঠ। কোর্টে গিয়ে একটা এপিঠ-ওপিঠ, মাপ করবেন, এফিডেবিট করলে ভদ্রলোকের বয়েস ২৫ বছর কেন, ২৫ মাসেও নামিয়ে আনা যায়। তখন অবশ্য আপনার বান্ধবীকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ২৩ বছর অপেক্ষা করতে হবে ভদ্রলোকের পঁচিশের জন্যে। কিন্তু ততদিনে তিনি আবার ৫০ ছুঁই-ছুঁই। তখন কোর্টে গিয়ে তাঁর আবার একটা এপিঠ-ওপিঠ, মাপ করবেন......

● একটি পরিচিত ছেলে আমায় ভালোবাসে। তার সঙ্গে দেখা হলেই সে আমায় ভালোবাসার কথা বলে। আমি পাত্তা না দিলেই সে বলে, গাড়ির তলায় চাপা পড়ব, কখনো বলে, এত খারাপ হয়ে যাব—তুমি ভাবতেই পারবে না। এর আগেও অনেকেই এমন বলেছে, কিন্তু তারা কিছুই করেনি। আচ্ছা, ছেলেরা নিত্য নতুন প্রেমে পড়লেই কেন এমন বলে?

—ফারহা খান, এন্টালি, কলকাতা

□ কী করে আর গাড়ি চাপা পড়বে? তোমার চাপেই তো চ্যাপ্টা হয়ে আছে সে। আর নিত্য নতুন প্রেমে পড়লে ছেলেরা কেন মেয়েরাও একই কথা বলে থাকে। একবার নিজেকে দিয়ে বাজিয়ে দেখতে পারো।

রাশি চক্কোর

জ্যোতির্ষাঁড়নব স্বামী কমলানন্দ অবধূত

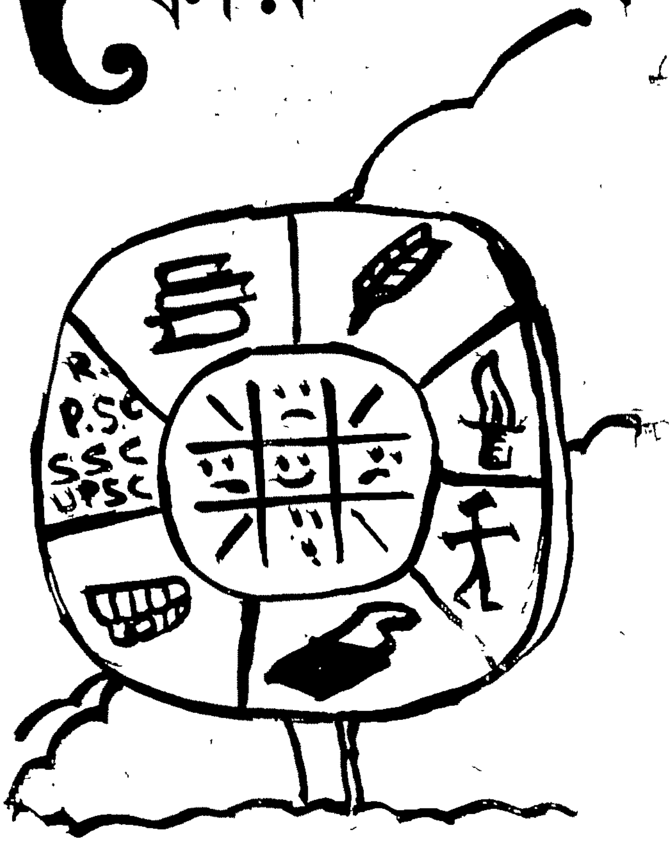

অতিবিদ্বান রাশি : অতিবিদ্বান যাঁহারা,—নিম্ন, মধ্য, উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আলো করিয়া আছেন, অতিবিদ্যা জনিত শিরঃপীড়ায় এই মাসে আক্রান্ত হইতে পারেন। রাজনৈতিক মঘার কৃপাদৃষ্টিতে অগা-দিগের কেহ কেহ এই মাসে সম্মান, ক্ষমতা ও কাঞ্চনদায়ী কুর্সি লাভ করিলেও অতিবিদ্বানদিগের প্রতিকূলতা কাটিবার আশা নাই। তবে এই মাসে তৈলবিদ্যা শিক্ষা শুরু করিবার শুভযোগ আছে এবং সাফল্যের সম্ভাবনা ঃ ষোলকরা শতআনা।

নোট-লিখিয়ে রাশি : পাঠ্যপুস্তকের 'নোট' লিখিয়া যাঁহারা প্রচুর অর্থ কামাইয়া থাকেন তাঁহাদিগের কপালে এই মাসে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। সহজবোধ্য নোটবইগুলির বাজার মাসের প্রথম সপ্তাহে ভালো থাকিলেও দ্বিতীয় সপ্তাহে একেবারেই ঢিলা হইয়া যাইবে। আর যাঁহাদিগের 'নোট' বুঝিতে গেলে সেটিরই একটি নোটবই ছাড়া উপায় নাই, সেগুলির বাজার হু হু করিয়া চড়িতে থাকিবে। তবে সহজবোধ্য নোট-লিখিয়েদিগের হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না, দুর্বোধ্য নোটবইগুলির নোটবই রচনার ভার তাঁহারাই পাইবেন।

অপহরণকারী রাশি : কী, ভাবিতেছেন এই মাসে একটি প্লেন ঘাপ্ করিয়া উড়াইয়া লইলে কেমন হয়, তাই না? খবরদার, ভুলিয়াও এই মাসে এ কর্মে হাত দিবেন না। কেন না, পূর্ব ফাল্গুনী আপনার প্রতি প্রসন্ন থাকিলেও উত্তর ফাল্গুনী খেপিয়া বোম্ হইয়া আছে। ফলে প্লেনটি উড়াইয়া লওয়া সম্ভব হইলেও পূর্বের বদলে 'ল্যাণ্ড' করিয়া বসিবেন উত্তরে এবং উত্তর আপনাকে ব্যাণ্ড বাজাইয়া চৌদ্দ পুরুষের বিবাহ দেখাইতে থাকিবে। তবে ব্যবসায়ী-পুত্র অপহরণের পক্ষে এই মাস শুভ। আরো শুভ এই, আপনার নিজের পুত্রটি এই মাসেই গায়েব হইতে পারে; ফলে নিজ পুত্র অপহৃত হইবার দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া অপহরণ ক্রিয়ায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারিবেন।

মাথামুণ্ড রাশি : যাঁহাদিগের মুণ্ডে মস্তিষ্ক নাই কিংবা মস্তিষ্কের মুণ্ড নাই, তাঁহাদের জো-হুজুর বৃত্তির ফল এই মাসেই ফলিবে। রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পদোন্নতি যোগ আছে। একটি সাড়ে বত্রিশ ভাজা দপ্তরের দপ্তরী হইয়া 'ন্যাজে-গোবরে' এবং 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়' প্রবাদবাক্য দুইটি সফল করিবার সুযোগ পাইবেন। চাকুরিজীবীগণের উপরি আয় হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ায় গৃহে সমাদর বৃদ্ধি পাইবে এবং গৃহিনীর নিকট 'নাও, পিণ্ডি গেলো, গিলে উদ্ধার করো' জাতীয় ডিনার-প্রেম সূচক সম্ভাষণ পাইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে।

আঁতেল রাশি : এই রাশির জাতক-জাতিকাগণ এই মাসে আঁতলেমির চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করিবেন। গায়ক গায়িকারা কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতে এ আর রহমানের সুরারোপ এবং নাচিয়েরা কত্থকের সহিত মাইকেল জ্যাকসনের নৃত্যশৈলীর মিশ্রণ ঘটাইয়া বিচিত্র বস্তুর সৃষ্টি করিতে পারেন। এবং কবিগণ—তাঁহারা যে কী করিবেন তাহা এখনো গ্রহ-নক্ষত্রের গোচরীভূত হয় নাই, তবে যাহাই সৃষ্টি করুন, তাহা পড়িবার পূর্ব হইতেই পাঠকের দাঁতকপাটি লাগিয়া থাকিবে।

পরচর্চা রাশি : পরচর্চাকারীগণ এ মাসে সাবধানে পরচর্চা করিবেন। চর্চার তৃতীয় রাউণ্ডে অকস্মাৎ চর্চিত ব্যক্তির আর্বিভাব ও তাঁহার থাপ্পড় থেরাপিতে কয়েকটি দাঁত অকালে খর্চা হইয়া যাইবার অশুভ লক্ষণ দেখা যায়। তবে বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে ফিসফিস করিয়া শুধুমাত্র দেওয়ালকে শুনাইয়া পরনিন্দা করিলে দোষ নাই, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই পেটফোলা ও মাথাধরা ছাড়িবে।

ল্যাং-পরীক্ষা শিক্ষক রাশি : যে সকল বিদ্বান যুবক আজ অব্দি নিজেরা একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রতিযোগিতার কাঁটাতেই প্রতিযোগিতা তুলিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাঁদের পশ্চাতে বিষম ফাঁড়া। কতিপয় সুন্দরী-ছাত্রীর আগমনার্থ সাময়িক মতিভ্রম যোগ—ফলত অনতি ভবিষ্যতে অনাগত ছাত্রীসংখ্যা লোপ পাইতে পারে। ঘটে বৃহস্পতি এবং বক্ষে বুধ গ্রহের প্রভাবে সমবয়সী একটি ছাত্রের হস্তে নিস্বার্থ সুন্দরী হস্তান্তর শুভ হইবে। মেরা নম্বর কব্ আয়েগা—এই মন্ত্র সকালে বাহান্ন এবং বিকালে সাড়ে একান্ন বার করিয়া জপ করিলে অন্তত একটি নারীর প্রণয়পথে পপাত হইবার একমাত্র বিরল সম্ভাবনাটির উদয় ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

জবর খবর

বাজেট টিউশনি

বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্ত এবার মোটা তন্‌খা পাওয়া শিক্ষক-অধ্যাপকদের সীমাহীন প্রাইভেট টিউশনিকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার হাকিমি আইন জারি করেছেন। অসীমবাবুর কথায়—একেই তো মাসে কুড়ি দিন ক্লাসে টিকি দেখা যায় না শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরুদের। সিলেবাসের বাকি পড়া, ক্লাস শুরুর আগে যা ছিল, পরীক্ষা এলেও প্রায় একই থাকে। ছাত্রদেরকে তখন বলা হয়, শিক্ষকদের বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট টিউশনি ও ফটোকপি করা মান্ধাতার আমলের নোটসের গোছার শরণাপন্ন হতে। কোনো ছাত্রছাত্রী বেঁকে বসলেই হল। ক্লাসের পরীক্ষায় তাদের খাতায় লাল ঢেরা পড়ে যাবে।

"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"। স্কুল কলেজে পড়াশুনা না করিযে শিক্ষাব্রতীরা যদি তোতাপাখির মতো শুকনো নোট্‌সের তাড়া স্টুডেন্টদেরকে গেলান আর নিজেদের পকেটে টিউশনির নোটের গোছ ঢোকান, তাহলে লেখাপড়া অষ্টরম্ভা হবে না?

সুতরাং এখন থেকে স্কুল টিচার প্রফেসরদের "বোনাস" আয়ের রাস্তা প্রাইভেট টিউশনি একদম বন্‌ধ্। টিউশনি করলেই চাকরি নট্। এবার থেকে তাহলে পাড়ার বেকার পিণ্টু-মানিক-পাঁচু-বাবলুরা আরও দুটো বেশি টিউশনির ডাক পাবে। প্রাণের প্রতিমার জন্য আরও দুটো বেশি কোবরেজি কাটলেট আর ব্যালকনির টিকিট কিনতে পারবে।

কিন্তু ডাক্তার অধ্যাপকরা এবং তাঁদের স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী প্র্যাকটিস? এ ব্যাপারে মন্ত্রী মশায় স্পীকটি নট্। অমন বেয়াড়া 'প্র্যাকটিসে'র কলে পড়ে শেষে কি নিজের বিপদ ডেকে আনবেন!

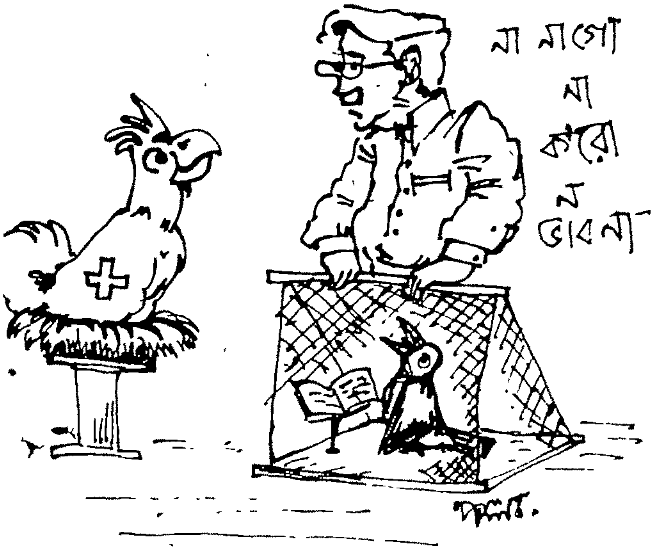

গোঁফের দেমাক

এয়ার ইণ্ডিয়ার সাবেকি প্রতীক মহারাজার অত্তো বড় গোঁফ আছে সেই গোঁফ নিয়েই মহারাজা কখনো রাশিয়াতে গিয়ে সমোভারে চা খাচ্ছেন, কখনো বা চিনে গিয়ে চৌ-মিয়েন। তাকে গোঁফ ছেঁটে ফেলতে বলার মুরোদ নেই কারোরই। যত দোষ হল গিয়ে নন্দ ঘোষের।

বৃন্দাবনের নন্দ ঘোষের নিশ্চয়ই সাধের গালপাট্টা ছিল। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট পারসার, জয়ন্ত ভিক্টর দে-ও ওইরকম গোঁফ রাখতে চেয়েছিলেন। কে শোনে কার কথা। জয়ন্তবাবুর ওরকম পেল্লায় গোঁফজোড়া দেখে একেবারে রে রে করে উঠলেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কর্তাব্যক্তিরা। হয় ওই বেখাপ্পা, বীরাপ্পন মার্কা গোঁফজোড়াকে একদম উড়িয়ে দাও, নয়ত এয়ারলাইন্সের চাকরির মায়া ছাড়।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসাররা অনেকেই গোঁফ ছেঁটে ফেলে সভ্য-ভব্য মাকুন্দবাবুটি হয়ে রয়েছেন। জয়ন্ত ভিক্টরের গোঁফের দেমাককে কিন্তু তাঁরা মোটেই টসকাতে পারেন নি। আদালতে এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছেন জয়ন্ত—গালপাট্টা হল গিয়ে পৌরুষত্বের ট্রেড মার্ক। এয়ারলাইন্সের চাকরি যায় যাক, কিন্তু গোঁফজোড়াকে তিনি মোটেই ছাড়তে পারবেন না। তাঁর সাধের তেলচর্চিত গোঁফজোড়াকে দেখে তন্বী এয়ারহোস্টেসরা "ও মাই গড়" বলে চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেও নয়। ভিক্টরের গোঁফের এই ভিক্ট্রি ল্যাপ এখনো চলছে। তিনি এখন গোঁফ দাড়িওয়ালা বিমান পরিবহন মন্ত্রী শরদ যাদবের কাছে আর্জি জানাতে পারেন। "গোঁফের আমি গোঁফের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা!"

এখন বুঝলি? কেন আমি বড় হোটেল দিই নি!
এগরোল চাউমিন

খাবার-দারি

শহরের বড়, ছোট, মেজ—সমস্ত হোটেল আর রেস্তোরাঁর মালিকরা ইদানীং চোখে লাগাতার সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেছেন। এবং এদেরকে সর্ষেফুল দেখানোর ব্যবস্থাটা বহাল তবিয়তে করছেন কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক জাভেদ আহমেদ খান। সাঙ্গোপাঙ্গ আর সাংবাদিকদের নিয়ে জাভেদ ভাই যখন তখন গিয়ে চড়াও হচ্ছেন হোটেল কেনিলওয়ার্থ, অ্যাস্টর, অম্বর, চায়নাটাউন—আরো সব নামকরা "ফুড-জায়েণ্টের" হেঁসেলঘরে। নিজে চেখে দেখছেন সব খাবার। যদি দেখা গেছে বিরিয়ানি দোপেঁয়াজি থেকে বাসি গন্ধ ছাড়ছে, বা কিচেনের মধ্যে দিব্যি আরামসে ইঁদুর, আরশোলা, মাছি আর টিক্‌টিকি বাসা বানিয়েছে, তখনই সেই হোটেল বা রেস্তোঁরার বরাতে লালবাতি জ্বেলে ছেড়ে দিচ্ছেন জাভেদ মিঞা। বাসি পোলাও পিংজা খাওয়ানোর কারণে এরমধ্যেই বেশ কয়েকটি খাদ্যালয়ের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছেন জাভেদভাই।

এরকম খাবার নিয়ে খবরদারির বিরুদ্ধে লুঙ্গি আর কোমরের বেল্ট বেঁধে নেমে পড়েছেন হোটেল রেস্তোরাঁর মালিকরা। না জানিয়ে এভাবে খাবারঘরে সিঁদ কাটতে জাভেদভাইকে কে হুকুম দিয়েছে। অনেকে আবার কানাঘুষো করছেন—রাইটার্স আর কর্পোরেশনের চারপাশে ফুটপাথের হাতেগরম মালপোয়া, জিলিপি, বিরিয়ানি, তড়কা যাতে আরও বেশি "সেল" হয় তার জন্যই জাভেদভাই-এর এই খদ্যেরদরদী পদক্ষেপ। কলকাতা তাহলে খাবার-দাবারেও ওয়ান সিটি হতে চলল ।।

রামের অষ্টোত্তর শতনাম

শিব বা কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের পাঁচালি আওড়াতে গিয়ে মা মহামায়া বা ব্রজবালিকা রাধিকার দম আটকে গেছিল কিনা জানা নেই। তবে শিবসেনা দলের বিহার প্রদেশের হর্তাকার্তা, রামশংকর কুমার এবার সেই অষ্টোত্তর শতনামের পুণ্যভার নিতে চলেছেন। নামে আর কি এসে যায়। বিহারের কিষাণগঞ্জের পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেট, অমিতাভ কুমার দাস তো বাল থ্যাকারে সাহেবের এই চেলাটির নামের লিস্টি নিতে গিয়ে অথৈ জলে পড়তে বসেছেন।

রামশংকেরর এই নামের নামাবলি আসলে তার দাগি আসামির কাজকম্মোকে ঢেকে রাখছে। কখনো রাম শর্মা, কখনো রাম সিং, কখনো রামশংকর বনে গিয়ে বালাসাহেবের পোষ্যপুত্র এই শিবরাম, অন্ধকার জগতে তার সমাজসেবা দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই এই "রাম" বাবুর নামে বেশ কিছু ডাকাতির মামলা ঝুলছে। বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র ড্রাগসও কিছু জমিয়েছেন এই রাম-চরণ। আদালতের ফৌজদারি আইনে এমন আর কোনো বিভাগ নেই যেখানে রামশংকরের নামে মালা ঝুলছে না। বর্ণচোরার মতো নামের রং পাল্টে চলছেন রামশংকর। রামশংকরের কেরামতি দেখে এখন ভুতের মুখে, থুড়ি বিহার পুলিশের মুখে শুধু রাম নামের পদাবলী কীর্তন শোনা যাচ্ছে। রামশংকর বাবুর অবশ্য এসবে থোড়াই কেয়ার। তার জবানীতে—বিহার পুলিশের বড়কর্তাই সমস্ত চুরি রাহাজানির রাম-কর্তা: তাকে শুধু শুধু নাজেহাল করা হচ্ছে।

অ্যাই একটু বাঁ-দিক ফেরো!
!!
এখন প্রশ্ন:
মহাকরণ হাসছে কেন?

বাম-ভালোবাসা

মন দেওয়া নেওয়ার একাঙ্ক নাটিকাতে ফ্রণ্টলাইনের রোল করতে প্রেমিক প্রেমিকার কানজোড়ার দরকার খুবই। অনেকেই ভুরু কুঁচকে বলতে পারেন—প্রেমের পদাবলী আওড়ানোর জন্য টেলিফোন আর ই-মেইল তো আছেই। একালের লায়লা-মজনুর কান ধরে অত টানাটানি কেন? যেটুকু টানাটানি সেটা প্রেমিকার খাম্বাজে বাবা-পিসিমা অথবা প্রেমিকের মা-মাসিমারাই করবেন। কানে কানে "আই লাভ ইউ"-এর ফাটা রেকর্ড চালানোর দিন ফুরিয়েছে। আর এখানেই ব্যাগড়া দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবড় তাবড় চিকিৎসকরা।

প্রেম যমুনার 'কান্'-আই মাঝি হতে কানের ভূমিকা যে কি সেটা নিয়ে গবেষণার চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন টেক্সাস রাজ্যের স্যাম হাউস্টন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তিয়াও চং সিম। তিনি নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিয়েছেন—ভালোবাসার বিধি একদমই বাম। অর্থাৎ কিনা আপনি যদি প্রেমিকার বাম কানে মনের মাধুরীকে বর্ষণ করেন একমাত্র তা হলেই আপনার প্রেয়সী, গলা, থুড়ি, জামার কলার (আর পকেটের মানিব্যাগ) ধরে নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে থাকবে। ডান কানে যতই ইনিয়ে বিনিয়ে ভিক্টোরিয়া ফুচকা ম্যাটিনি শো নিক্কো পার্কের রাত করুন না কেন, আপনার বনলতার মগজে পৌঁছবেই না।

কারণটা কি? বিজ্ঞানীরা বলেছেন মগজের ডান দিকের অংশের স্নায়ুর সঙ্গে ক্রস কানেকশন আছে বাম কানের। শুধু ভালোবাসার আদুরে কথাই নয়, গীত-খেয়াল পপ-র‍্যাপের সুরেরও একমাত্র সমঝদার এই ডান গোলার্ধ।

কৌশিক রায়

সরস্বতী বন্দনা ও জ্যোতিষবিজ্ঞান

নারদ মুনির প্রতিবেদন

প্রভাত বাগচী

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবর্ষের শুরুতে নারদের মোবাইল বেজে উঠল। স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা বলছেন : "শুনছি ভারতবর্ষে নাকি সরস্বতী বন্দনা ও জ্যোতিষশাস্ত্র, থুড়ি জ্যোতিষবিজ্ঞান পাঠ বাধ্যতামূলক হতে যাচ্ছে। তুমি অতি শীঘ্রই একটি রিপোর্ট পাঠাও।"

যথাসময়ে অর্থাৎ উনিশ দিন পর নারদ রিপোর্ট লিখলেন, সাতাশ দিন পরে তা ব্রহ্মার হাতে এল :

"যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতদ্—

মহাশয়,

আপনার তুঘলকি আদেশ পালন করিয়া একবার কলিকাতা, একবার দিল্লি দ্বারকা করিতে করিতে বিগত যৌবনা ঢেঁকিবাহনটির শ্বাসকষ্ট উঠিয়াছে। চারিদিকে চলিতেছে বন সংরক্ষণ। কাষ্ঠনির্মিত আমার বাহনটি যে চুরির মাল নহে তাহা আইনের রক্ষকরা ঘুষ না পাইলে বুঝে না। দেবতা না হইলে বহু পূর্বেই সবাহন পটল তুলিতাম, অধুনা ফটো তুলিতেছি। প্রচুর খরচ হইতেছে। এমতাবস্থায় মাসিক তিন শতাংশ ডি. এ. -তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম। আপনার নাম হয়, আমাদের কাম হয় না।অতএব সবিনয় নিবেদন এই যে, মাসিক ডি. এ.-কে সাপ্তাহিক ডি.এ.-তে কনভার্ট করিতে মহাশয়ের আজ্ঞা হয়।

আপনার লেটেস্ট বার্তা পাইয়া দ্বারকা হইতে দিল্লির দিকে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বাতাসে ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় সরস্বতীবন্দনা মন্ত্র আমার কর্ণপটাহে বেদমন্ত্রবৎ প্রথমে অস্পষ্ট, ক্রমশ স্পষ্টতরভাবে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বাহন হইতে অবতরণ করিয়া দেখি সর্বত্রই "সরস্বতী মাঈকি, জয়" ধ্বনি সহযোগে পিকনিক অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাইকে মাইকে "ঝুমা চুমা দে দে" বা "লব কে লিয়ে কুছ ভি করেঙ্গে" জাতীয় সঙ্গীত আর নাই, চতুর্দিকে কেবল শোনা যাইতেছে "সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে......।" সরস্বতী নাম্নী অবলাদিগের পদযুগল মাটিতে পড়িতেছে ঠিকই কিন্তু বিশালাক্ষী মুখের ভাবসাব দেখিয়া তাহাদিগকেই দেবী সরস্বতী বলিয়া বোধ হইতেছে। বাজারে হাঁস আর নাই। নামেই সরস্বতী না থাকিয়া কাজের সরস্বতী হইবার জন্য তরুণীরা সব হাঁস ক্রয় করিয়া হংসারূঢ় হইবার প্রয়াসে ব্রতী হইয়াছেন। শিক্ষায়াতনগুলির ছাত্রদের মুখে হাসিরাশি আর ধরে না। তাহাদের দীর্ঘ উপেক্ষিত দাবী কত শহীদের জীবনের বিনিময়ে স্বীকৃতি পাইল। তাহাদিগকে অঙ্ক পর ক্লাস করিতে, পড়া মুখস্থ করিতে বা বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া পরদিনের পরীক্ষার মাল রেডি করিতে হইবে না। কেবল ব্রহ্ম মুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া স্নান সমাপনান্তে পবিত্র মনে মাতা সরস্বতীকে মিনিট তিনেক ভজনা করিতে পারিলে পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়া আটকায় কে। কিন্তু মাতা সরস্বতীও প্রত্যেককেই প্রথম করিতে না-ও পারেন। অতএব ছাত্রদের মধ্যে ইতিমধ্যে শুরু হইয়া গিয়াছে এক স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা—কে কতক্ষণ ধরিয়া

বিদ্যাদাত্রী দেবীকে প্রীজড্ রাখিতে পারে। আপাতত তাহারা পুস্তকাদি শিকায় তুলিয়া রাখিয়া চুটাইয়া প্রেম করিতেছে এবং পিতৃদেবের অন্ন উদরাসাৎ করিতেছে। অবসর সময় ছাত্র রাজনীতিতে হাত মকসো করিয়া, বিরোধী পক্ষকে গালি পাড়িয়া এবং বোমা বানাইয়া যথার্থ গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। কতিপয় শিল্পী ধরনের শিক্ষার্থী আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া সরস্বতী বন্দনা করিতেছে। ভারতবর্ষে যে আটচল্লিশ কোটি সরস্বতী দেবী বিভিন্ন প্যাণ্ডেলে পূজিতা হন তাহাদের কেহ আমিশা প্যাটেল সদৃশ হইলে অপর জন অবধারিত ভাবে কাপুর বংশীয় রবিনার ন্যায়। কোনো প্রতিমা কোকাকোলা দ্বারা নির্মিত হইলে অন্যটি পেপসি দ্বারা তৈরি হয়। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত সরস্বতী সনাক্ত করিতে না পারিয়া তাহারা রবিনা ট্যাণ্ডন নাম্নী এক উদ্ভিন্নযৌবনা লাস্যময়ী রমণীকে —সরস্বতীর ববকন্যা বলিয়া যিনি ভারতসেরা অভিনেত্রীর শিরোপা পাইলেন—মাতা সরস্বতী, হিসাবে বন্দনা করে। কতিপয় ছাত্র, যাহাদিগকে অনায়াসে ফাজিল গোত্রীয় বলা যায়, মকবুল ফিদা হুসেইন নামক এক চিত্রকর অঙ্কিত সরস্বতী প্রতিমার সহিত তাঁহারই পরিচালিত 'গজগামিনী' ছবির নায়িকাকে পাঞ্চ করিয়া এক অত্যাধুনিক সরস্বতী দেবীর বন্দনা করে। ইহাতে নাকি তাহাদের কনসেনট্রেশান ও মেডিটেশনের ভারী সুবিধা হয়।

সরস্বতী বন্দনা শিক্ষার সর্ব স্তরে আবশ্যিক হওয়াতে ছাত্র অপেক্ষাও অধিকতর আহ্লাদিত হইয়াছেন ভারতীয় শিক্ষক সমাজ—সংক্ষেপে বি. এস. এস.। ব্যক্তি জীবনে তাঁহারা যতই সরস্বতীর থু দিয়া লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করুন না কেন, ছাত্র-শিক্ষক উভয় তরফেরই মঙ্গলার্থে তাঁহারা দুই হাত তুলিয়া অর্ডিন্যান্সটিকে স্বাগত জানাইয়াছেন। দীর্ঘদিন তাঁহারা শ্রেণীকক্ষে পড়ানো বাদ দিয়াছেন। অধুনা গৃহেও পড়ানো বাদ দিয়া, বিষয়চর্চা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যার্থীদিগকে দুই বেলা দিদি সরস্বতীর মাহাত্ম্যকথা শুনাইতেছেন। সরস্বতী দিদি শুনিয়া অবাক হইবার কিছু নাই, অন্তত পক্ষে আমি হই নাই। ভারতে এমনিতেই কোথাও ম্যাডাম কালচার, কোথাও আম্মা কালচার. কোথাও চালু আছে দিদি কালচার। এই কালচারে বিশ্বাসী এক ছাত্র প্রশ্ন তুলিয়াছিল, "স্যার, দুর্গা দেবীকে যদি মা দুর্গা বলি তবে তাঁহারই কন্যা সরস্বতীদেবীকেও মা সরস্বতী বলা ঠিক কি?" চুলচেরা তর্ক, যুক্তি পাল্টা যুক্তিতে শ্রেণীকক্ষ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে বিজ্ঞানের হইল জিৎ, মাতা সরস্বতী দিদি সরস্বতী হইয়া উঠিলেন। স্বয়ং দেবীও প্রীত হইলেন। বয়স কমাইতে পারিলে কোন স্ত্রীলোকই না খুশি হন। শাস্ত্রবাক্য "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ" সংস্কৃত হইয়া "ছাত্রানাং সরস্বতী বন্দনাং তপঃ"- তে দাঁড়াইয়াছে। দিদিকে ভ্রাতৃভাবে তুষ্ট করিতে পারিলে পি. এইচ. ডি. লাভের জন্য গাইডকে তৈল মর্দন করিতে হইবে না। কেবল নেট-স্লেট পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া নয়, আই. এ. এস. মায় উচ্চ বা নিম্ন শিক্ষামন্ত্রী হওয়াও বিচিত্র নয়। প্রমাণ হিসাবে হাতের কাছেই হস্তীমূর্খ কালিদাসের নবরত্নের সেরা রত্ন হইয়া উঠিবার কাহিনী বিবৃত হইতেছে। কালিদাস যে সরস্বতীর বরপুত্র, থুড়ি বরভ্রাতা ছিলেন তাহা কোনো গোয়েবলসীয় প্রচার নহে, জীবন্ত কিংবদন্তী; আর কে না জানে যাহা কিংবদন্তী তাহাই সত্য। কিংবদন্তী সত্য বলিয়াই না তথাকথিত ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের স্থলে সত্যযুগের রামমন্দির নির্মাণের তোড়জোড় চলিতেছে। পৃথিবীর অর্ধেক নিরক্ষরের দেশের ভারতীয় জনতা প্রত্যহ প্রাতে ভক্তি গদগদ চিত্তে যে হারে সরস্বতী বন্দনা শুরু করিয়াছে তাহাতে সংশয়াতীতভাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষে ক্লোনিং একদমই মার্কেট পাইবে না। ইচ্ছা করিলেই যে কেহ কালিদাস্ বা রবীন্দ্রনাথ বা সেক্সপীয়ার হইতে পারে।

কার্টসি : সরস্বতী দিদি।

এতখানি অবধি সবই ঠিকঠাক চলিতেছিল। গোল বাধাইয়াছেন তরুণী ছাত্রীরা। চক্ষু নিমীলিত করা মাত্র তাহাদের মনশ্চক্ষে হৃতিক রোশন, ফারদীন খান, নিদেনপক্ষে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন সাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি লইয়া আবির্ভূত হইতেছেন। ফলতঃ দিদি সরস্বতী হইয়াছেন অগ্নিশর্মা। এবং যতদূর বোঝা যাইতেছে এখন হইতে কোনো পরীক্ষাতেই ছাত্রীদিগের আর কৃতকার্য হইবার আশা নাই, 'মেয়েদের মধ্যে' প্রথম হওয়া তো দূরের কথা। সরস্বতী বন্দনা কার্যে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া ছাত্রীরা দাবী তুলিয়াছে কার্তিক বন্দনাও আবশ্যিক করিতে হইবে। মোটর বাইক আরূঢ় সানগ্লাস পরিহিত হ্যাণ্ডসাম দেব কার্ত্তিকেব মূর্তি ধ্যান করা তাহাদিগের পক্ষে অনেক সহজ। একমাত্র বীনাপাণিই যে শিক্ষাদানের অধিকারী তাহা কে বলিল? দপ্তর পরিবর্তন করিয়া দিলেই কার্তিকদা শিক্ষার অধিষ্ঠাতা দেবতা হইতে পারেন। এই তরুণীদিগকে কিছুতেই বুঝানো যাইতেছে না যে বর্তমান শিক্ষানীতি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ নহে, খাঁটি দেশীয় বৈদিক শিক্ষা, নারীকে মানুষ না বানাইয়া নারী বানাইবাব শিক্ষা। পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় নহে, নারীর জীবন সার্থক হয় মাতৃত্বে, সংসার পরিচর্যায়। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। ইহাই শাস্ত্রবাণী। কিন্তু মহিলারা মানিতেছেন না। আপনি উমা দেবীকে প্রেরণ করুন। আশা করা যায় তিনি তাঁহার সুষমামণ্ডিত ভাষায় নারীত্বের মহিমা, সতী রূপ কানোয়ারের জীবন্ত দগ্ধিবার গরিমা ও পুত্রের বদলে কন্যাসন্তান গর্ভে ধারণের কালিমা সম্বন্ধে ইহাদিগকে কন্‌ভিনস্ করিতে পারিবেন।

তবে এহ বাহ্য। গোদের উপর বিষফোঁড়া হইয়া আসরে নামিয়াছেন স্বয়ং নারায়ণী লক্ষ্মী দেবী। তিনি দেবী সরস্বতী সহোদরা হইলেও তাহাদিগের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার সপত্নীদিগকেও লজ্জা দেয়। শৈশবে, ছাত্রাবস্থায় কিছু লোক অবশ্যই সরস্বতী বন্দনা করে, কিন্তু

> ব্যয় সংকোচনের নীতিতে বিশ্বাসী ইউ. জি. সি. যে জ্যোতিষবিজ্ঞানের জন্য বস্তা বস্তা টাকা দেখাইতেছে, তাহাতে অর্থাভাবে ধুঁকিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধু জ্যোতিষবিজ্ঞান কেন, বশীকরণ, শবসাধনা, ডাকিনীবিদ্যা, সবই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত।

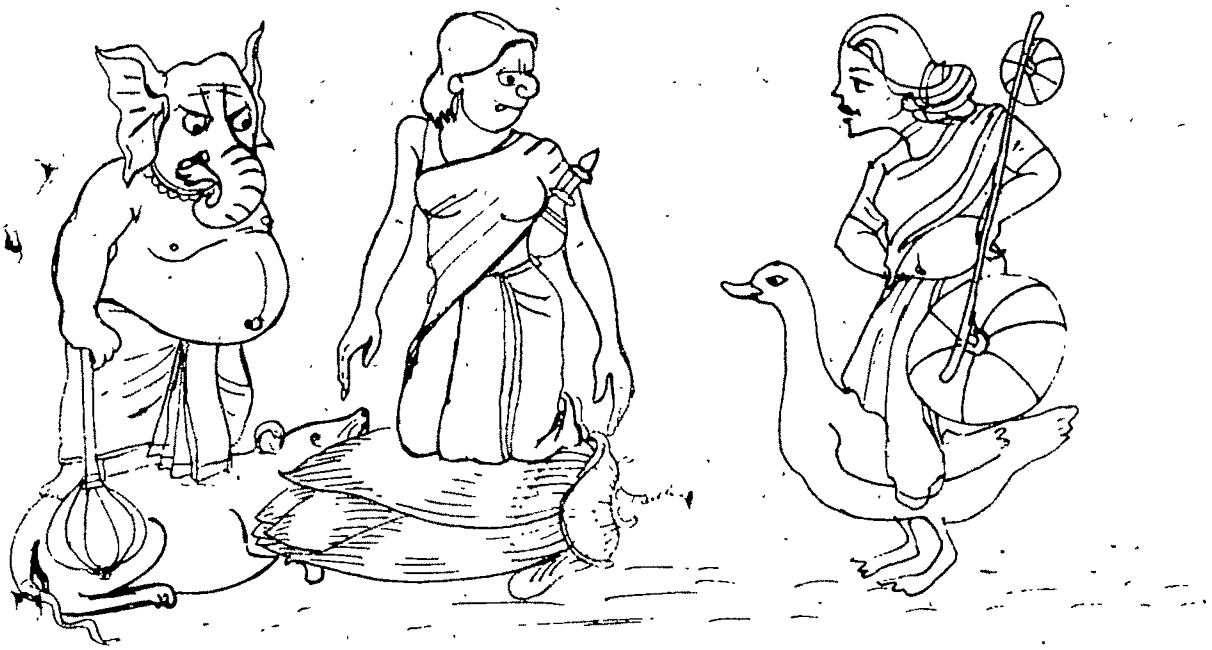

বাধ্য হইয়া। সরস্বতীর প্রতি সকলের টান প্রয়োজনের, কাহারও তাহার প্রতি অনুরাগ নাই। গণভোট লওয়া হউক, দেখা যাইবে ধনী-নির্ধন, নেতা-অভিনেতা, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই লক্ষ্মীদেবীর নেকনজরে আসিতে আগ্রহী। ভারতীয় জনতার সরকারও স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে সুদ কমাইয়া, শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নী করিয়া রাতারাতি বড়লোক বনিয়া যাইতে জনগণকে উৎসাহিত করিতেছেন। বর্তমানে কলেজ স্ট্রিটে যাইতে যত না উৎসাহ, দালাল স্ট্রিটে যাইতে তদপেক্ষা অনেক বেশি উদ্দীপনা। বাধ্য হইয়া যাঁহারা না যাইয়া পারেন না, তাঁহাদের চরণ যুগল কলেজ স্ট্রিটে থাকিলেও নয়ন যুগল থাকে স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতি নিবদ্ধ। প্লেইন লিভিং ও হাই থিঙ্কিং-এর জমানা এখন শেষ। বিশ্বায়নের যুগে এই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে হাই লিভিং এণ্ড প্লেইন থিঙ্কিং। এখনকার একটা শিশুও জানে প্লেইন থিঙ্কিং এর জন্য দেবী সরস্বতীর কৃপা যতটা না দরকার, হাই লিভিং এর জন্য ধনদাত্রী লক্ষ্মীর অনুগ্রহ তদপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। অথচ সরস্বতী বন্দনা কম্পালসারি হইতে যাইতেছে আর লক্ষ্মী বন্দনা সামান্য অপশনালও থাকিল না। কুপিতা রুষ্টা লক্ষ্মীদেবীকে তোল্লা দিতে জোট বাঁধিয়াছেন স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ। গজাননের মার্কেট ইণ্ডিয়াতে কোনোকালেই খারাপ ছিল না। বছর কয়েক পূর্বে লিটার লিটার গোদুগ্ধ পান করিয়া তিনি রীতিমতো সাড়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। দেশীয় পুঁজিপতি, শিল্পপতিরা চিরকালই তাঁহার অন্ধ ভক্ত ছিলেন। এক্ষণে যুক্ত হইয়াছে বিদেশীয় মার্চেন্ট সকল। বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা। উদারীকরণের যুগে উদরীকরণের সুযোগ পাইয়া তাহাদের গণেশ প্রতিনিয়তই ফুলিয়া উঠিতেছে, দেশীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শ্রমিক কৃষকের গণেশ অস্থিচর্মসার হইয়া শেষ নিঃশ্বাসের অপেক্ষারত। এমতাবস্থায় মুরলি মনোহর কণ্ঠের অটল অর্ডিন্যান্স সমস্ত বৈদেশিক বণিককে লালকৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে—লাল মুখোরা সব বিষাদে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাণ থাকিতে তাহারা সরস্বতী বন্দনা করিবে না। অতএব শ্রীগণেশ ও শ্রী শ্রী লক্ষ্মীদেবী আঁতাত করিয়া যে জোট গঠন করিয়াছেন, দেশি-বিদেশি বণিকদের সহায়তায় তাহা ক্রমে মহাজোটের আকার ধারণ করিয়াছে।

এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমি রিপোর্ট লিখিতে বসিতেছি, হঠাৎ ভারতীয় জনগণের হর্ষোল্লাস কানে আসিল। জাতির জনকের আততায়ীকে জাতীয় শহীদের মর্যাদা দেওয়া হইল ভাবিতেছি, শুনিলাম দেশের চব্বিশটি বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতিষশাস্ত্রকে জ্যোতিষবিজ্ঞান বলিয়া কেবল মানিয়াই লয় নাই, পাঠদান করিতেও স্বীকৃত হইয়াছে। সেক্সপীয়ার বলিয়াছিলেন—না বলিলেও ক্ষতি নাই—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। নিশ্চয়ই তিনি জ্যোতিষ বিজ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রটিরই কোষ্ঠী বিচার করিয়া মনশ্চক্ষে নিউ মিলেনিয়ামের গোড়ায় তাহার বিজ্ঞানে উন্নীত হইবার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারত সমস্ত দিক হইতেই পৃথিবী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়া কেবল দুইটি বিষয়ে পশ্চাদপট—জনসংখ্যায় এখনো চীনকে হারানো গেল না। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘুদের প্রতি আচরণে তালিবানদিগের সহিত এইবার তাহারা যুগ্মভাবে শ্রেষ্ঠ। তীব্র প্রয়াস চলিতেছে চ্যাম্পিয়ন হইবার। এমতাবস্থায় জ্যোতিষের বিজ্ঞানে প্রমোশনে ভারতীয় বিজ্ঞানে প্রশংসায় কান পাতা দায়। বটতলা আমতলা নিমতলায় ইতিপূর্বে যে সমস্ত বিজ্ঞানী সারাদিন ধরিয়া লোক শুনিতেন এবং সুযোগ পাইলেই মক্ষিকা বধ করিতেন, তাঁহাদিগকে এখন আমেরিকা জাপান হইতে লোক আসিয়া, ভাড়া দিয়া, রীতিমতো জামাই আদর করিয়া স্বদেশে লইয়া এই লেটেস্ট সাইন্সের গূঢ় কথা জানিতে চাহিতেছে। দক্ষিণা এ্যাডভান্স পকেটস্থ করিয়া তাঁহারাও হাতে নাতে দেখাইয়া দিতেছেন শচীন তেণ্ডুলকর যে জীবিতাবস্থাতেই কিংবদন্তী অভিনেতা হইয়া গেলেন তাহার কারণ তাহার জন্মে মাহেন্দ্রযোগ, রবি বুধ শুক্র শুক্র শনি সব গ্রহই তুঙ্গে। ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর সাত মাস বয়েসে রবি যখন সিংহ এবং মকর রাশির মাঝখানে অবস্থান করিবেন, তখন

তাঁহার চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রের দিকে সরিয়া যাওয়াতে রাহু হইবে প্রকোপ, এবং তিনি নায়কের রোল করিতে ভয় পাইবেন। তবে প্রতি শনিবার স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া অগ্রে একটি ষণ্ডকে যদি তিনি গুড় সহ তুলসীপত্র সেবন করান তবে রাহু তুষ্ট হওয়া সম্ভব। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়াও শ্রীমতী জয়ললিতা যে মুখ্যমন্ত্রী হইলেন এবং করুণানিধিকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন তাহার কারণ তামিলনাড়ুর ভাগ্যাকাশে এখন শনির দশা। আর জ্যোতিবাবুর কেতু কুপিত হইয়াছে বলিয়াই তিনি চতুর্বিংশতিবর্ষ কাল মুখ্যমন্ত্রী থাকিয়াও নির্বাচনেই দাঁড়াইতে পারিলেন না। অকাট্য তত্ত্ব এবং বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও নিন্দুকেরা প্রশ্ন তুলিয়াছিল : গাইসাল ট্রেন দুর্ঘটনা এবং গুজরাটের ভূমিকম্পে যাঁহারা অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কি শনি অধোমুখী হইয়াছিল? সদ্য বিজ্ঞানী অভিধাপ্রাপ্ত বটতলার মক্ষিকা হন্তারকবৃন্দ অঙ্ক কষিয়া, চিত্র অঙ্কন করিয়া ,লেন্স দিয়া দেখাইয়াছেন যে ট্রেন দুইটির যাত্রাকালে ছিল অশ্লেষা, মঘা। পরলোক গত বিনা টিকিটে জনা পঞ্চাশেক যাত্রীর মধ্যে জনা দশেকও যদি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নীলা বা পলা ধারণ করিতেন তাহা হইলে স্বচ্ছন্দেই দুর্ঘটনাটি এড়ানো যাইত। আর গুজরাটের ক্ষেত্রে চন্দ্র সহসাই রেবতীনক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন করায় সুউচ্চ অট্টালিকাসকল তাঁর ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই। মশকমক্ষিকার চিরশত্রু এই বিজ্ঞানীরা ভাগ্যকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিলেও কর্মকেও নেহাৎ পশ্চাতে রাখেন নাই। তাঁহারা অভয়বাণী দিয়াছেন —যথার্থ সম্পাদিত কর্ম সৌভাগ্যকে করতলে আনিয়া দেয়। এই সমস্ত শ্রীভৃগু, শ্রীমতী খনা বা পদার্থবিদ্যাকে অপদার্থের বিজ্ঞান প্রমাণকারী জ্যোতিষার্ণব যোশী মহাশয়ের নাম যখন নোবেল কমিটিতে প্রেরিত হইল, তখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, যাঁহাদের উভয় হস্ত জন্মাবধি নাই, বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হইয়া কর্তিত হইয়াছে তাঁহাদিগের ভাগ্যগণনা কিরূপে সম্ভব? রত্ন ধারণই বা তাঁহারা কিরূপে করিবেন? সাংঘাতিক সমস্যা, সন্দেহ নাই। অনেক ভাবিয়া জ্যোতিষার্ণব মহাশয় প্রস্তাব দিয়াছেন এই সকল ক্ষেত্রে পদতল রেখা বিচার করিয়া পদাঙ্গুলিতেই রত্ন ধারণ করা হউক। এই বৎসর না হইলেও আগামী শিক্ষাবর্ষ হইতে পদরেখা বিচার জ্যোতিষ বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

> **আটচল্লিশ কোটি সরস্বতী দেবী বিভিন্ন প্যাণ্ডেলে পূজিতা হন তাহাদের কেহ আমিশা প্যাটেল সদৃশ হইলে অপর জন অবধারিত ভাবে কাপুর বংশীয় রবিনার ন্যায়। কোনো প্রতিমা কোকাকোলা দ্বারা নির্মিত হইলে অন্যটি পেপসি দ্বারা তৈরি হয়।**

কিন্তু প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান করিতে সর্বাপেক্ষা জোরদার আপত্তি আসিতেছে সুরলোক হইতে। ব্যতিক্রমী চন্দ্রদেব অবশ্য যথার্থ কারণেই উৎফুল্ল। মাসে প্রায় সমস্ত দিনই কর্তব্যে ফাঁকি দিয়া মাত্র একদিন হোলনাইট ডিউটি করিয়াই যে তিনি উপগ্রহ হইতে গ্রহে প্রমোশন পাইলেন তাহা সেলিব্রেট করিতে তিনি মিত্রবর্গকে সোমরস পার্টিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। কিন্তু অন্য পরে কা কথা, গোঁ ধরিয়াছেন স্বয়ং সূর্যদেব। নক্ষত্র হইতে গ্রহে অবনমন তিনি কিছুতেই মানিতে পারিতেছেন না। আজীবন তিনি ঘড়ি ধরিয়া, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা উপেক্ষা করিয়া আপন কর্তব্য নীরবে পালন করিয়া গিয়াছেন— কেহ বলে তাঁহার আবর্তন গতি পরিমাপ করিবার জন্যই নাকি ঘড়ির উদ্ভাবন—সেই জন্য কোনো ইনসেনটিভ নাই, সামান্য ধন্যবাদও নাই, উল্টাদিকেনক্ষত্র হইতে গ্রহে পরিবর্তন। নবগ্রহের তালিকায় ইউরেনাস, নেপচুন প্রভৃতি গ্রহের নাম নাই, তাহা সূর্যদেব মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু আবাল্য সহচরী ধরিত্রীর নাম না থাকাটা তিনি কিছুতেই মানিতে পারিতেছেন না। বিপদে পড়িয়াছে বেচারা রাহু-কেতু। দেবাসুরের দ্বন্দ্ব হইতে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের ইতিহাস বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লইবার জন্য আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা হইতে বৈজ্ঞানিকেরা আসিয়াছে। উহারা জানে না সংস্কৃত, ইহারা বুঝে না ইংরাজি। তাহারা সূর্যদেবকে দোভাষীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে বলিয়াছিল। কিন্তু সূর্যদেবের রুদ্রমূর্তি দেখিয়া তাহারা ভড়কাইয়া চুপ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু সবাই তো চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। কিছু একটা করিতে হয়। আদারওয়াইজ ব্যয় সংকোচনের নীতিতে বিশ্বাসী ইউ. জি. সি. যে জ্যোতিষবিজ্ঞানের জন্য বস্তা বস্তা টাকা দেখাইতেছে, তাহাতে অর্থাভাবে ধুঁকিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধু জ্যোতিষবিজ্ঞান কেন, বশীকরণ, শবসাধনা, ডাকিনীবিদ্যা, সবই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রস্তুত। কর্মী সংকোচনের জমানায় কত লোকের কর্মসংস্থান হইবে? যে সমস্ত হস্তরেখাবিশারদেরা কেবল অপরেরই ভাগ্য উন্নত করিলেন এবং গ্রহের কোপে নিজেরাই গাছতলায় পড়িয়া থাকিলেন, তাঁহাদিগকেও বিজ্ঞানী হইয়া গ্রহকে বশে আনিবার তত্ত্ব অবগত করাইতে হইবে। কাজেই সৌরলোকের সমস্যা সমাধানে মহামহোপাধ্যায়, ভবিষ্যতের নোবেল লরিয়েট জ্যোতিষার্ণব যোশী যে সূত্রটি দিয়াছেন তাহাই গৃহীত হউক। সকালে সরস্বতী বন্দনা ও সন্ধ্যায় লক্ষ্মী আরাধনা বাধ্যতামূলক হউক। পাশাপাশি নবগ্রহের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অষ্টাদশ করা হউক। বর্ধিত নবগ্রহের স্থান নির্দিষ্ট হউক পদতলে। সর্বাগ্রে থাকিবেন ধরিত্রী বা পৃথিবী। তিনি সর্বংসহা; নবগ্রহের স্থান না পাওয়াকেও তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন, পদতলে থাকিতেও তিনি অস্বীকার করিবেন না, বিশেষতঃ তাঁহার অধিষ্ঠান যখন জীবের পায়ের নিচেই। ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, ভলক্যান প্রভৃতি বিদেশি গ্রহসকল পদতলে থাকিতে অবশ্যই আপত্তি করিবে। কিন্তু উহারা সংখ্যালঘু। উহাদের প্রতিবাদ তালিবানদেরও হারানোর সুযোগ আনিয়া দিবে। হয় উহাদিগকে পদতলেই থাকিতে হইবে নতুবা সৌরজগত ছাড়িয়া পলাইতে হইবে। অন্যথায় তালিবানরা বুদ্ধমূর্তির যে দশা করিয়াছে, তাহাদিগকে সেই দশপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

তবে একটি বিষয়ে আমি এখনো কোনো সদুত্তর পাই নাই। গ্রহদিগের প্রভাব কি কেবল মানুষদেরই উপরে? প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ কুইন্টাল মৎস্য ও গবাদি পশু দেশবিদেশের বাজার হইতে নরপাকস্থলীতে স্থানান্তরিত হইতেছে, যে অসংখ্য বন্য প্রাণী বনে জঙ্গলে বিচরণ করিতেছে এবং যে সকল বৃক্ষ সমূহ কর্তিত হইয়া ও না হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদিগের গ্রহের সহিত সম্বন্ধটা কিরূপ জানিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করিতাম। আশাকরি স্বর্গে গত হইলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

পত্রদ্বারা প্রশ্ন করিবার ধৃষ্টতা মার্জনীয়। নিবেদন ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
সেবক নারদ

চৈনিক গুজব

শিবনাথ পাল

জবর খবর জবর খবর
এসে গেছে চীনের মাল
ত্রিশ হাজারে মিলবে গাড়ি
পাঁচ টাকাতে ফাইন চাল

মুরগি খাসি কুড়ি টাকায়
পাঁচ-ছ টাকায় চীনের মাছ
হাজার টাকায় ফ্রিজ ও টিভি
মোদের চক্ষু চড়ক গাছ

মধ্যবিত্ত ভারতবাসীর
সাধটি আছে সাধ্য নাই
হইবে এবার সাধটি পূরণ
এই আশাতেই নাচছি ভাই

গিন্নি নাচে কিনবে এবার
একশো টাকায় সিল্ক শাড়ি
কর্তা নাচে এই সুযোগে
কিনবে গাড়ি চায়নার-ই

পাগল হয়ে ঘুরছে মানুষ
খুঁজছে কেবল চীনের মাল
গড়িয়াহাট ও ধর্মতলার
দোকানদারের করুণ হাল

চীনের গাড়ী চলবে নাকি
পেট্রলেরই গন্ধে ভাই
লোডশেডিং এও ঘুরবে পাখা
চীনের মালের জবাব নাই

যতেক শিল্পী সাহিত্যিকের
পাংশু বেজার মুখখানা
আসছে নাকি চীনের নভেল
দাম একেকটা আট আনা

মেয়ের বিয়ে দেবেন যারা
ভাবছে যদি মওকা পাই
কিনব তবে সস্তা দরে
একটি চীনের ঘরজামাই

পাঁচশো টাকায় জ্যান্ত হাতি
হাজার টাকায় পক্ষিরাজ
অর্থনীতির মুক্ত আকাশ
উড়ে বেড়ায় চীনের বাজ

ভারতবাসী দেখছে স্বপ্ন
কিনছে পণ্য এ টু জেড্
গুজবওলা করছে ফিরি
নানান স্বপ্ন—চায়না মেড্।

‘বাস’-ভাষা

সেই আদি অকৃত্রিম, লাল-হলুদ-কালো জার্সির, পোর্টেবল মিনি বাস। দৌড় সন্তোষপুর থেকে বি. বা. দি. বাগ পর্যন্ত। ঢাকুরিয়া ব্রিজের সামনে আসতেই বাসটার একটি পার্শ্বদৃশ্য বা “সাইড ভিউ” পাওয়া গেল। বুঝতে পারা গেল—কলকাতার বেসরকারি বাস ও মিনিবাস সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা ফি বছর বাস ভাড়ার পরিবর্তন (অর্থাৎ বৃদ্ধি) করার পাশাপাশি বাসের গায়ে গতরে “সুভাষিত” বাংলায় লেখা জায়গার নামের বানানগুলোরও নতুন ভাবে পরিমার্জন ও সংস্করণের দিকে কড়া নজর দিয়েছেন। তাঁদের স্ব-পঠিত ভাষাজ্ঞানের অসীম বদান্যতায়, পদ্মাসনা বিদ্যাদেবীকে ঘেঁটুফুল দেখিয়ে সন্তোষপুর-ডালহৌসী তীর্থপথের সেই মিনিবাসের গায়ে “বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম”-কে করে দেওয়া হয়েছে “বিল্লা প্লাডিয়াম”। “রবীন্দ্রসদন” হয়েছে “রবীন্দুসোদন”। “বেকবাগান”-এব ব্রেক ফেল হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে “বেগবাগান”-এ।

বাংলা ভাষা নিয়ে এই নিত্যনতুন এক্সপেরিমেণ্ট চলছে চলবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাস সংগঠন। ‘আমহার্স্ট স্ট্রীট’-কে “আমাস্ট্রীট,” ভবানীপুর যদুবাবুর বাজারকে “জগু বাজার” বলতে ও কোনো সংকোচ নেই তাঁদের। বাস-ভাষা আন্দোলনে এরকম জোয়ার আনার কৃতিত্ব পুরোটাই কন্ডাক্টর ও খালাসি ভাইদের ।

বাইরের খাবার

চৌরঙ্গি পার্ক স্ট্রিটের ক্রসিং-এর মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন মাঝবয়েসী ভদ্রলোকটি। সামনেই ফুটপাথে গরমাগরম ভাজা হচ্ছে সিঙাড়া আর কচুরি। চণ্ডীদাসের খুড়োর মতো নাকটা বাড়িয়ে ভাজা-ভাজা হওয়া উপাদেয় খাদ্যবস্তুগুলির সুগন্ধ নিলেন ভদ্রলোক। তারপর স্তূপীকৃত সিঙাড়ার তে-কোনা সম্মেলনের দিকে এগিয়ে গেলেন ।

—এই যে ভাই। ঠোঁট চাটতে চাটতে ভদ্রলোক দোকানিকে বললেন, দুটো সিঙাড়া আর দুটো কচুরি দিন দেখি। একটু গরম দেখে দেবেন কিন্তু।

দোকানি শালপাতার ঠোঙায় সিঙাড়া আর কচুরি এগিয়ে দিলেন। বেশ তরিবৎ করেই সিঙাড়া ও কচুরির স্বাদ নিতে শুরু করেছেন ভদ্রলোক। হঠাৎ দোকানির চোখ গেল তার দিকে।

—আরে, ওটা কি করছেন দাদা। সিঙাড়ার ওপরের খোলাটা ফেলে দিচ্ছেন কেন? কি, ভাজা ভালো হয়নি?

ভদ্রলোক কচুরি চিবোনো বন্ধ করে একবার আড়চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, আর বলবেন না ভাই। দু'মাস হল হেপাটাইটিস থেকে উঠেছি। পেট এখনো ঠিক হয়নি। ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন—বাইরের কোনো খাবার একদম খাবেন না।

পথঘাটের কিসসা

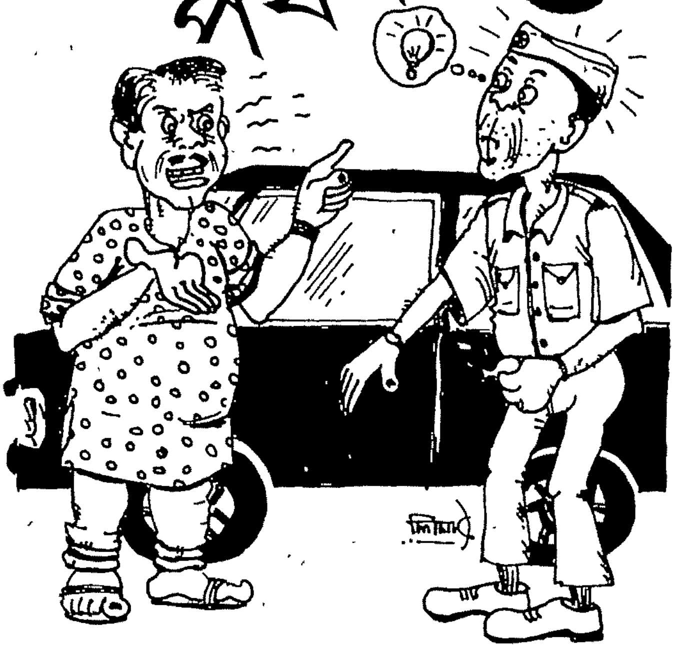

লাল বাতি!

—এই যে মশাই, শুনছেন? গাড়ি পার্ক করার এটা আপনার পৈতৃক জায়গা নয়। সরিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়ি রাখুন নাহলে ফাইন হয়ে যাবে—

কথাগুলো নিক্ষেপ করে লাইটহাউস সিনেমার কাছে পার্ক করা একটি আনকোরা মারুতি অম্নি গাড়ির দিকে এগোলেন তরুণ ট্রাফিক সার্জেণ্ট রাজ্যজুড়ে কর্মসংস্কৃতির বন্যা আনতে হবে। পুলিশদেরও । ট্রাফিক সার্জেণ্টের হাঁকডাক বেড়েই চলেছে।

কিন্তু মোটরযানটি নট নড়ন চড়ন। সার্জেণ্ট গাড়ির জানলায় উঁকি মারতেই সশব্দে দরজা খুলে তেলোহাঁড়ি মুখ নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন চর্বিয়ান মহাপুরুষ।

—ওহে ছোকরা, কার সঙ্গে কথা বলছ জানো? আমি হলাম ......।

ফাইনের কথা আর একবার বললে লালবাতি জ্বেলে দেব।

এহেন মধুর বাক্যে ট্রাফিক সার্জেণ্ট বাক্যহীন। একটু সামলে ক্যাঁক করে ধরে ফেললেন থেমে থাকা এক টানা রিক্সাকেই। ফাইন ৪০ টাকা।

কৌশিক রায়

সণ্টুর কীর্তি

কাজী সারিন আফরোজ

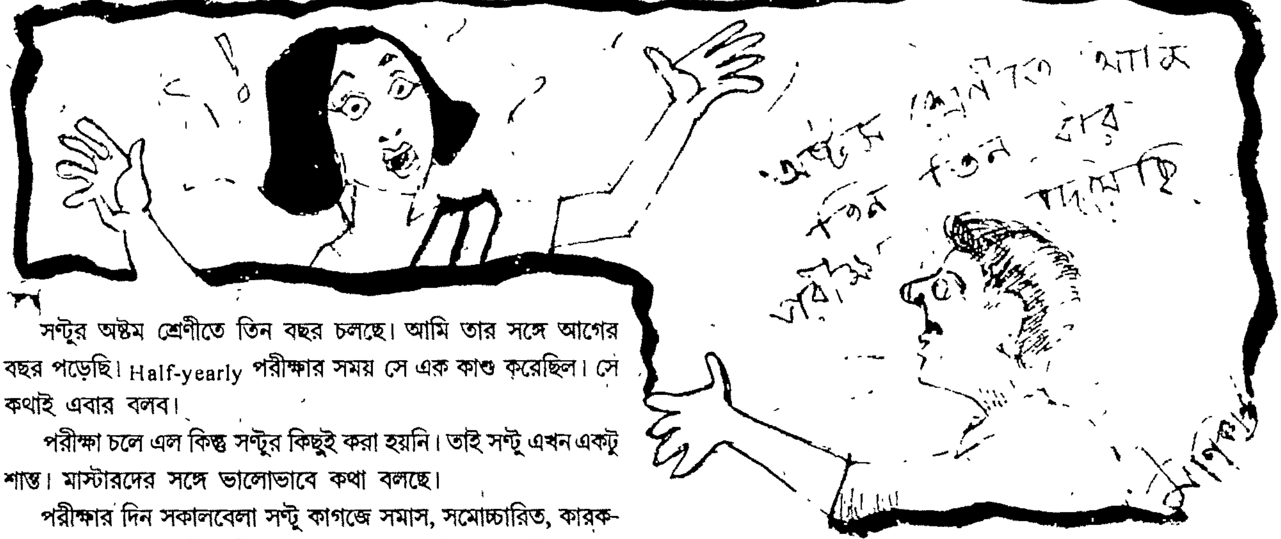
অষ্টম শ্রেণীতে আমি তিন তিন বার পরীক্ষা দিয়েছি

সণ্টুর অষ্টম শ্রেণীতে তিন বছর চলছে। আমি তার সঙ্গে আগের বছর পড়েছি। Half-yearly পরীক্ষার সময় সে এক কাণ্ড করেছিল। সে কথাই এবার বলব।

পরীক্ষা চলে এল কিন্তু সণ্টুর কিছুই করা হয়নি। তাই সণ্টু এখন একটু শান্ত। মাস্টারদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলছে।

পরীক্ষার দিন সকালবেলা সণ্টু কাগজে সমাস, সমোচ্চারিত, কারক-বিভক্তি আরো কত কিছু লিখে স্কুলের জামা-প্যান্টের পকেটে রাখল। বাংলার রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য পাতা বেশি হয়ে গেল। কিন্তু আর কোথাও জায়গা নেই রাখার। তাই নিজের জামা-প্যান্টের উপর ভীষণ রেগে গেল। কী করবে তাই ভাবছে, হঠাৎ চোখে পড়ে গেল দেওয়ালে টাঙানো বাবার নতুন জামাটার উপর। স্কুল ইউনিফর্মের উপর বাবার জামাটা পরে, সে স্কুলের দিকে গেল। স্কুলে ঢুকতেই বন্ধু কিংশুকের সঙ্গে দেখা। কিংশুক ওকে দেখেই বলল "কিরে পরীক্ষার জন্য জ্বর এল নাকি? দুটো জামা পরেছিস?" সণ্টু হাত নেড়ে বলল "তোরা সব বাচ্ছা ছেলে, ওসব বুঝবি না।"

সুপ্রিয়া ম্যাডাম নতুন স্কুলে Join করেছেন। খুব শান্ত ও নিরীহ। তো ভাগ্য ভালো, সণ্টুর কোনো ক্লাশ নেই তাঁর। কিন্তু সণ্টুব তিনি অনেক কিছু বীরত্বের কথা শুনেছেন।

পরীক্ষার ঘণ্টা পড়তেই সণ্টু দেখল সুপ্রিয়া ম্যাডাম তাদের ক্লাশে ঢুকছে। সণ্টু তো খুশিতে টগবগ । সে শুনেছে ম্যাডাম খুব 'হাঁদা'।

ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকতেই সণ্টুর দিকে চোখ চলে গেল। ম্যাডাম বললেন তুমি কেন স্কুল ইউনিফর্মের উপর এতবড় কালো জামাটা পরেছ? তোমার কি শীত করছে?"

সণ্টু বলল "না তো শীত করছে না। মানে বাবার নতুন জামা তো, তাই পরে এলাম।"

ক্লাশশুদ্ধ হাসিতে ফেটে পড়ল। ম্যাডাম এবার রেগে গিয়ে বললেন "এখনই খুলে ফেল, না হলে আমি তোমাকে ক্লাশ থেকে বের করে দেব"।

সণ্টু ভীষণ রেগে গেল ম্যাডামের উপর। কী, এতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে অপমান। একটুকরো কাগজ গিয়ে পড়ল ম্যাডামের পায়ের কাছে। ম্যাডাম সেটা তুলতে যাবে কি, সণ্টু সেটা শিকারি পাখির মত ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "এটা আমার 'Personal' চিঠি।"

আবার একটা চাপা হাসি শোনা গেল। ম্যাডাম আর কি করে কিছু না বলে Roll Call করতে লাগলেন। সণ্টুর 42 রোল ছিল। সণ্টুর রোল ডাকতেই বলল, 'Yes Sir'. ম্যাডাম মাথা নিচু করে Call করতে লাগলেন।

পরীক্ষার ক্লাসে ভীষণ গণ্ডোগোল হচ্ছে। সবার বেশি সণ্টুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাডাম সণ্টুর কাছে আসতেই সণ্টু বলল, "ম্যাডাম একটু জল খাওয়াতে পারেন?" ম্যাডাম আর কি করেন নিজের জলের বোতলটি তার দিকে এগিয়ে দিলেন। সণ্টু এক বারে অর্ধেকটা শেষ করে ফেলল। তারপর বারবার খেতে লাগল, আর হট্টোগোল করতে লাগল। ম্যাডাম বারবার চুপ করতে বললেও কিছু হল না। ম্যাডাম সণ্টুকে বলল "এত ঘন ঘন জল খাচ্ছ কেন?"

"আমার গলা ধরেছে।"

ম্যাডাম বললেন "কই গলা ধরেছে। তুমি তো ভীষণ গণ্ডোগোল করছ।"

আবার অপমান! সণ্টু দাঁড়িয়ে বলল, "জানেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি! আপনি তো একবারই পরীক্ষা দিয়েছেন আর পাশও করেছেন। আর আমি এই অষ্টম শ্রেণীতে তিন তিন বার পরীক্ষা দিয়েছি। তাই বলছি খামোখা চ্যাঁচামেচি করবেন না। পরীক্ষা হলে একটু গণ্ডোগোল হবেই।" ম্যাডাম তো শুনে 'হাঁ'।

পরীক্ষার শেষে ম্যাডামের হাতে জলের বোতলটা ধরিয়ে দিয়ে সণ্টু গটগট করে ক্লাস থেকে চলে গেল।

প্যাঁচালি : আকাদেমিক গাথা

পল্লব গোস্বামী

আকাদেমি, তোঁহা সনে কাতুকুতু মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে ক্যালাকেলি ঠেকাব মরণ
ইঁহা ধুতি কাদা করব, উঁহা ধুলো বলে দেব সাদা
আকাদেমি, তোঁহা লাগি ভুলি যাব বসন ভূষণ

খচ্‌রামি চরমে তুলব, আর কাহারও যাব না বাড়িতে
তুঁহ ছুঁড়িবি শংসাপত্র, লুফে নিব তুক্ষুনি অহম্‌
আকাদেমি, তোঁহা সনে আশাভঙ্গ মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে হ্যাফ চুয়াত্তর ঠেকাব মরণ

লিখে লিখে বই বাড়বে, গালে দাড়ি মগজে লোকসান
লোকসান পুষিয়ে, তুঁহু ভরি দিবি পুরস্কার ক'ডজন
আকাদেমি, তোঁহা সনে সাতপাকে মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে 'ঘুম নেই' ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে বিরিয়ানি মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে আলুভাতে ঠেকাব মরণ
আকাদেমি, তোঁহা সনে দু'অক্ষর মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে ধুরন্ধর ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে নাইতে যাব বাবুঘাটের জলে
সাঁঝে সন্ধে স্টিমার হইতে মারিব লম্ফন

আকাদেমি, তোঁহা সনে 'সদা-লেজুড়' মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে বুঝুক-শালা' ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে হানাবাড়ি মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে অভ্যাগত ঠেকাব মরণ
আকাদেমি, তোঁহা সনে পাপ-পঙ্কে মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে 'ঐ যাচ্ছেন' ঠেকাব মরণ

এক হাতে গন্ধ শুঁকব, দুই হাতই ভরিয়ে দেবে তুমি,
গুলি খেলব, গুরু ধরব, কাকু সাজব চোদ্দশ রকম—
মঁনামি, তোঁহা সনে বড় কষ্টে মরণ ঠেকাব
মঁনামি তুঁহ বিনা কেঁদো-হাসি হাসিছে মরণ

কাঁদতে কাঁদতে আমি আসব, কলকাতা চিৎকার করবে—কে?
দোকানে দোকানে, বইমেলায় খুঁজব তোমার কেতন
আকাদেমি, তোঁহা সনে শারদীয়া মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে 'সম্বর্ধনা' ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে র-খিস্তি মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে চায়ে-গ্রম্ ঠেকাব মরণ
আকাদেমি, তোঁহা সনে শ্যামা-গীতি মরণ ঠেকাব

আকাদেমি, তোঁহা সনে বহুরূপী ঠেকাব মরণ

আমিত্ব ফুড়ুৎ করবে, লেজুড় নেড়ে ছুটব পাছু পাছু
ঘাটে বসে লিখে ফেলব আরো লেখা পুরস্কারোপম
আকাদেমি, তোঁহা সনে গুরুশিল্প মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে চন্দ্রবিন্দু ঠেকাব মরণ

নতুন প্রকাশকের ঘরে আড্ডা মারতে যাব মাঝে মাঝে
ডেকে এনে তুমি বলবে যা নয় তাইই বরং,—
আকাদেমি, তোঁহা সনে ধুত্তোর মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে খেলখতম ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে তীর বিন্দু মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে পাখি-গান ঠেকাব মরণ
আকাদেমি, তোঁহা সনে ঝিন্‌চাক্ মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে কুলকাল ঠেকাব মরণ.

দোঁহা মিলি ভাবতে বসব, চেঞ্জে যাব পুজোর ছুটিতে
পঁচিশটা উপন্যাস, চারশটা কবিতা আর প্রবন্ধ দুই-খান
আকাদেমি, তোঁহা সনে মন্বন্তর মরণ ঠেকাব
আকাদেমি. তোঁহা সনে গ্রীণ-বেঞ্চ ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে খালাসিটোলা মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে ফাঁকা মাঠ ঠেকাব মরণ
আকাদেমি, তোঁহা প্রেমে ল্যাং ল্যাং মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা তরে ধর্মে ঘট ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে 'অশ্বত্থামা' মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে রদ্দা-টুঁসো ঠেকাব মরণ
আকাদেমি, তোঁহা সনে ক্যাশ কার্ড সংযোগ সাধন
আলিবাবা, শনিবাবা, বোলে বাবা জয়জয়কার

দুপুরে ঝগড়া চলবে, কাক-চিল সিন-এ আসবে না
আকাদেমি; রাতে কিন্তু জানালায় মইটা লাগাবই
আকাদেমি, নয়ত ঠিক গান ধরব জানালার নিচে
আকাদেমি, তোঁহা বিনা এ মরণ মরেও মরে না

আকাদেমি, তোঁহা সনে ধনধান্য মরণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা সনে সা-রে জাঁহা সে গা-মা
পা-ধা-নি খুঁটব ব'সে বসে—
আকাদেমি, তোঁহা সনে চান ঘরে ঠেকাব মরণ

আকাদেমি, তোঁহা সনে পাইল্যে যাব ইহকাল থেকে
আকাদেমি, তোঁহা সনে স্বর্গাদপি ঠেকাব মরণ
আকাদেমি, তোঁহা সনে সাঁঝ থেকে মবণ ঠেকাব
আকাদেমি, তোঁহা তরে ভোর- থেকে ঠেকাব মরণ.....

দুটো সাধারণ ব্যাপারকে গুলিয়ে ফেলিস না!
প্রেম হ'ল .... রসায়নের বিষয়, কিন্তু
ছেলে তোলাটা
জাস্ট
ফিজিক্স!!

আইনের প্যাঁচ

প্যাঁচ শেখাচ্ছেন : **শুভ মোক্তার**

ভাড়াটিয়াকে নাচান

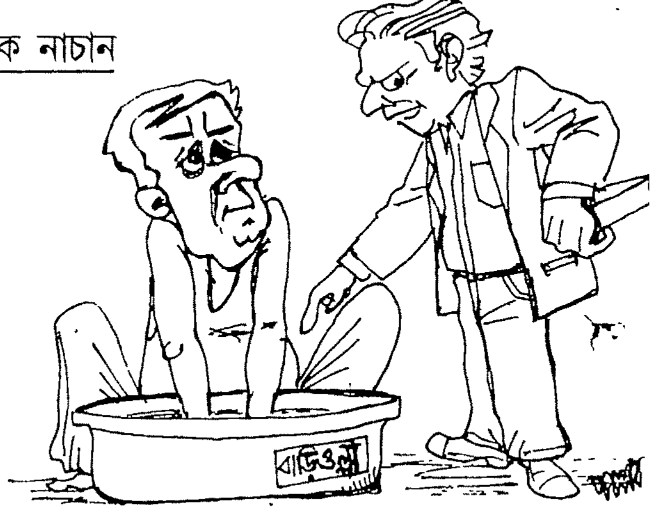

আপনি বাড়িওয়ালা? নামেই শুধু? বাড়ির দখল পুরোপুরি ভাড়াটেদের হাতে? বাড়ির চিন্তায় নাড়ি ছাড়ি-ছাড়ি? না মশায়, কোনো চিন্তা করবেন না। নাড়ি-ঘটিত কেস-এ শুভ মোক্তার কক্ষনো পিছপা নয়। শুধু নারী-ঘটিত হলেই তাঁর নিজের নাড়ি....

কী সমস্যা আপনার? ভাড়াটে ঘর নিয়েছিল থাকবে বলে, কিন্তু করে ফেলেছে ব্যবসার গদি? চমৎকার। গদিঘরে যে টাকার আমদানি হবে, তাতেই ভাগ বসানোর তালে থাকুন। সে টাকা আপনার ঘরে নাই বা গেল, কিন্তু উকিলের ঘরে গিয়ে ক্রমশ জমা হতে থাকবে—এমন ব্যবস্থা তো কবতেই পারেন।

চলে আসুন শুভ মোক্তারের কাছে। ভাড়াটেকে দিয়ে দিন একখানা উকিলের নোটিশ। তারপর কোর্টে একটা উচ্ছেদের মামলা। উচ্ছেদ অভিযান সফল হবেই। অপারেশন ভাড়াটে। তবে দীর্ঘদিন একই বাড়িতে থেকেছেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেনই বা হয়? পাঁচ-দশ-পনেরো-বিশ বছর পেরিয়ে মামলায় যখন জিতবেন, তখন আপনার ভাড়াটের ব্যবসা লাটে আর আপনারও ডুলি ভাড়ায বউ বিক্রি। মামলার দেনা সামলাতে বাড়িটাই দিতে হবে বেচে। না না, তার জন্যে কষ্ট করে আপনাকে খদ্দের খুঁজে বেড়াতে হবে না। তবে আর আপনার শুভাকাঙ্খী শুভ মোক্তার আছেন কী করতে? তিনিই কিনে নেবেন। দাম? অ্যাদ্দিনের বকেয়া পাওনার যে হিসেব শুভ মোক্তার দেবেন, তাতে বাড়িটা দিয়েও কিছু পাওনা থাকবেই, কিন্তু শুভ মোক্তার কখনোই অত চামার নন, বাকিটা আপনাকে মকুব করে দেবেন। আপনার শুভাশুভের দায়িত্ব তাঁরই না, হলই বা আপনি তখন গাছতলায়।

* * * * *

আপনার আবার কী সমস্যা? ভাড়াটে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে আপনারই ঘরে, আপনি দুটি ছোট ঘরে দমবন্ধ গাদাগাদি অথচ মাসের পর মাস ভাড়াই দিচ্ছে না? ভাড়া চাইলে সাড়াটি নেই? শুনুন, বারো মাসের মধ্যে অন্তত দু'মাসের ভাড়া তিনি যদি না দেন কিংবা পরপর দু'মাস ভাড়া না দিয়ে থাকেন, তবে তাঁকে তাড়াবার রাস্তা আপনার পরিষ্কার। ভাড়া যখন নো ট্রেস তখন তাঁর কপালে নোটিশ—উকিলের। এবং কোর্টে রুজু মামলা। নে ব্যাটা সামলা। দেখবেন, ভাড়াটে পালাতে পথ পাচ্ছে না। কিন্তু সে যদি ভাড়া আপনাকে না দিয়ে ছুতোয়-নাতার রেন্ট কন্ট্রোলে দেয়? তাহলে মুস্কিল আছে। বার্থ কন্ট্রোল আর রেন্ট কন্ট্রোল—দুটোই বড় জটিল বিষয়, কঠিন বিষয়। আপাতত পরামর্শ কন্ট্রোল করা যাক।

* * * * *

আপনার আবার কী হল? আইডেন্টিটি নিয়েই টানাটানি। আপনার ভাড়াটেই বাড়িওলা হয়ে বসেছেন? তিনি জোগাড় করেছেন উপ ভাড়াটে? আঃহা—, কাঁদবেন না মশাই, উপ-র উপদ্রবেই তো আজ দেশের এই অবস্থা। ঘাবড়ান কেন? আপনিও উপ-র আশ্রয় নিন। শুরু করে দিন তাঁর উপরেই উপদ্রব। উপ ভাড়াটিয়া নামক উপদ্রবটি ঘাঁটি গেড়ে বসার আগেই মারুন ইনজাংশন। এবং অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মামলা। ভাড়াটিয়া আপনাকে বে-ঘর করতে গিয়ে শেষে বেঘোরে নিজের ঘরটিই হাতছাড়া হওয়ার দশায় উপনীত হবেন। তখন অবশ্য তিনি আপনার হাতেপায়ে ধরে নিজের ঘরটি সামলাবার চেষ্টা করবেন। আপনিও বৈষ্ণবীয় প্রেমে তাঁর সঙ্গে উদ্বাহু নৃত্য করতে পারেন। কিন্তু খবরদার, মামলা তুলবেন না। সেটা ধর্মে সইবে না। তাহলে শুভ মোক্তারের পেট ভরাবে কে? জানবেন, গামলা গামলা মামলা করে যাওয়াই মোক্ষলাভের উপায়। ❑

পত্রপাঠ দীর্ঘজীবী হোক

অধ্যাপক সুযশনিলয় ঘোষ

কলকাতা-৭০০০১৯

পত্রপাঠ-এর অংশীদারিত্বে স্বাগত

বিষ্ণুজ্যোতি রায়

কাপিষ্টা, বাঁকুড়া

OPEN UNIVERSITY OF ALTERNATIVE MEDICINES

Charter of Council of Alternative Systems of Medicines (Estd : 1985)
[Incorporated with the Act XXVI of 1961 of Govt. of West bengal, by virtue recognised by the Dept. of Health and Family welfare (Govt. of West Bengal)]

DIRECT ADMISSION
2001 Session

All Diploma & Degree courses Accredited with

World Association of Universities & Colleges (U.S.A.)

Chancellor : Prof. Dr. Pradip Kr. Biswas, Ph.D., D.Sc.Professor & Researcher in Alternative Medicines, Alliance Universalle pour La Paix Par La connaissance (Statu. of UNESCO, ONU, UNICEF)

The University offers Diploma, Degree & postgraduate courses (Regular & Correspondence) in :

Compound Homeopathy (D.C.H.M.S.,B.C.H.M.S.), Indo Allopathy (D.I.A.M., B.I.A.M.), Yoga (Dip.Yoga) ; Naturopathy (N.D.), Acupuncture (D.Acu.,B.Acu), Batch Flower Remedies, Electro Homoeoppathy, Biochemic, Magneto Therapy, Physiotherapy (D.P.T.,B.P.T.), Dental (B.D.A.S.,L.D.A.S.) & M.D. (A.M.), Ph.D., D.Sc. etc.
Eligibility : For Diploma : 10^+, for Degree : 10+2(Sc.) or Graduate in any stream, for Postgraduate Degree [M.D. (A.M.)] : any recognised medical qualification. **Age :** No bar
Duration : Diploma : 2 years, Degree : 3 years+6 Months clinical training, Post Graduate Degree : 2 yrs

Practising registration [R.M.P.(A.M.)] also given on experience basis

Successful students can practice through out India, established as per Article 19(6) Constitution of India

Form & Prospectus available by hand of Rs. 100 or by regd. Post Rs. 150

THE MEDICAL COLLEGE OF ALTERNATIVE MEDICINES
3, Canal Street, Moulali, (Entrance : Convent Road)
Calcutta-700014 Phone : 246-5037 Fax : 471-2164
E-mail:Info@ouam.8m.com Website : www.ouam.8m.com

SEATS LIMITED

A MESSAGE FROM ET&T

ET & T

(A GOVT.OF INDIA ENTERPRISE))

OFFERS NEW MILLENIUM

TO BUILD UP A CAREER ORIENTED PROGRAMME IN IT INDUSTRIES

TO DEVELOP IT PROFESSIONALS .

- E-COMMERCE
- MULTIMEDIA
- WEB PAGE DESIGNING
- INTERNET
- ADVANCED JAVA
- AUTOCAD
- HARDWARE

ET&T
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)
Education & Training Cent
Internet, Web Page Design, Ha
Chatterjee Street, Calcutta

FOR MORE DETAILS CONTACT
1/1A. BANKIM CHATTERJEE STREET.
KOLKATA -73
(OPPOSITE TO CALCUTTA UNIVERSITY)
PHONE NO: (033) 2416962 / 7156
E-MAIL : samir1@cal2.vsnl.net.in

বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

২য় বর্ষ।। ২-৩ সংখ্যা।। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০১

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

ভুয়াবই

~~শারদীয়~~ ১৪০৮

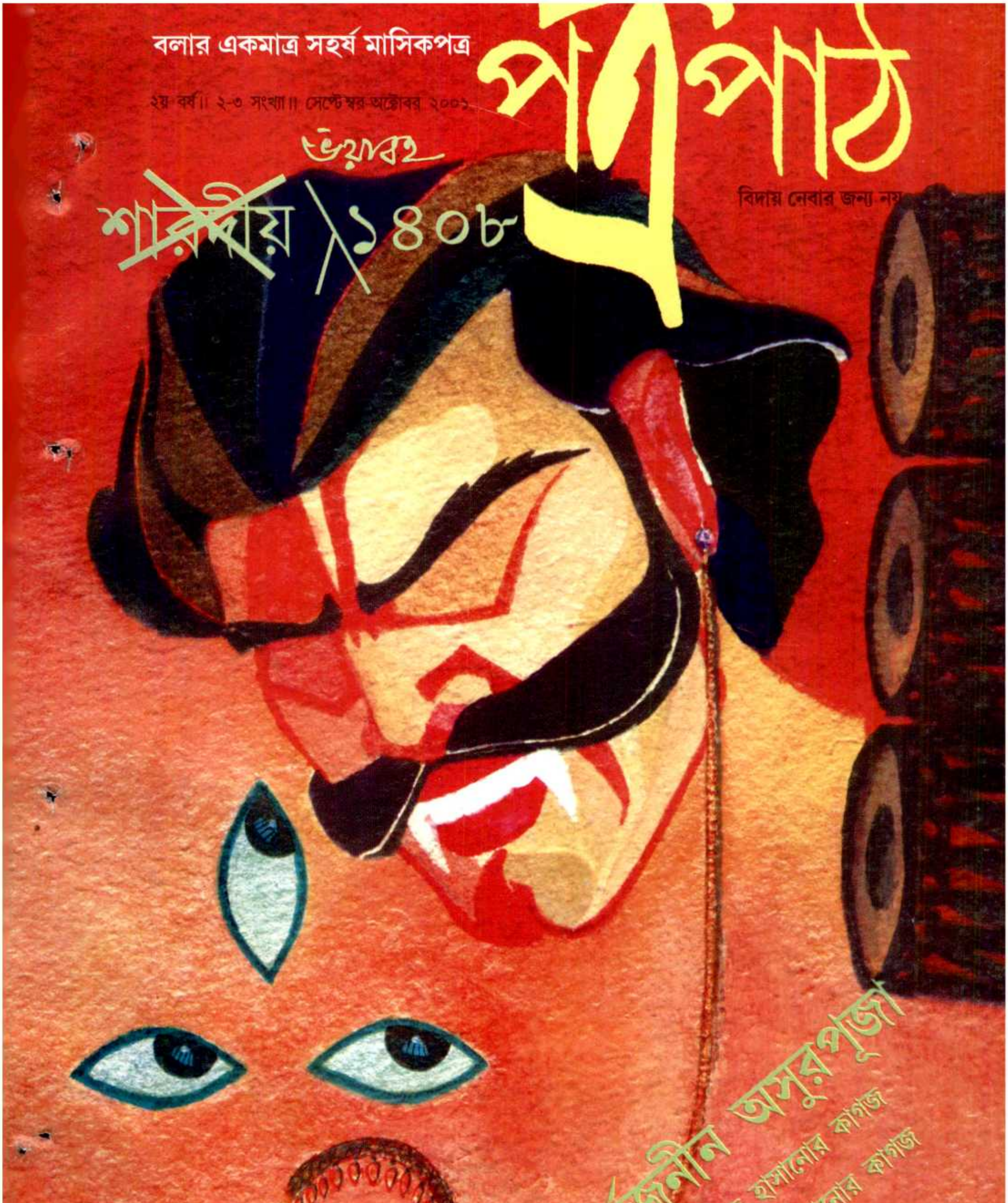

সার্বজনীন অসুরপুজো

কাউকে হাসানোর কাগজ

কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

এবার পূজোয় জমবে ভারি ঠাকুর দেখা আর
জামিনী
শাড়ী
Jamini
SAREE
জামিনী শাড়ীর টপ ফাইভ
ভ্যালেন্টাইন * ঢাকাই * ফেয়ার-এন-লাভলী
কাঞ্চণ কানন * এলিজাবেথ

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

ভয়াবহ
~~শারদীয়~~ ১৪০৮

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০১ ।। ২য় বর্ষ ।। ২-৩ সংখ্যা

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম : ২৫ টাকা

রবীন্দ্রনাথের নরবলি! সর্বনাশ। এ আবার কেমন কথা? একদা বঙ্গে নরবলি চলত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এ কী ধরনের অভিযোগ? কেমন সে বলি?—পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে অদ্ভুত তথ্য তুলে এনেছেন পুরনো কলকাতার তথ্য-কীট হরিপদ ভৌমিক ১৬৩

সম্পাদকীয় ৩

পুরনো কাসুন্দি

অমরেন্দ্রনাথ রায়-এর
'দুর্গার মর্ত্ত্যে আগমণ' থেকে ৫

বিস্মৃত অতীত

ইতিহাসের এক টুকরো • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়........................৮৫
রবীন্দ্রনাথের নরবলি •হরিপদ ভৌমিক.............................১৬৩

রম্যরচনা

তৃতীয় চক্ষু •সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়.......................................৮০
সণ্টুর কীর্তি •কাজী সারিন ও নাসরিন আফরোজ..............৫৭

প্রচ্ছদ কাহিনী

সার্বজনীন অসুরপুজা •প্রভাত বাগচী.................................৮৯

রসনাট্য

আইবুড়ো সংবাদ •কৌশিক রায়.................................... ১৪২

বিদেশি ছায়ায় বড় গল্প

নক্ষত্রলোকের যাত্রী •সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়............................৬৯

উপন্যাস

ভালোবাসি তাই ভালোবাসি •ওম্‌বিকা গুপ্‌তো..................৯৪
বিদ্যাকাণ্ডে লণ্ডভণ্ড •পিনাকীশঙ্কর ভাদুড়ী............................৮

পত্রপাঠের একান্ত সুহৃদ বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণে আমরা মর্মাহত।

গল্প

বাঘের মতো •বুদ্ধদেব গুহ...৫৯
বাঙালি •দিব্যেন্দু পালিত..১৩০
জ্যোৎস্নায় ডুমুরের ফুল •সমরেশ মজুমদার........................৪৮
উনিশ না ছাব্বিশ •অমিতাভ চৌধুরি..............................১২৮
ঠিক দুপ্‌পুর বেলা •কণা বসুমিশ্র.......................................৪৯
ফাইল বধূহত্যা •ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়.........................৮৭
মোহিনী •শঙ্করলাল ভট্টাচার্য...১৫৫
জয় বাবা ভূতনাথ অভিজিৎ রায়চৌধুরী ১৫০
দেবীর আগমন ও প্রত্যাবর্তন •সৈয়দ রেজাউল করিম..১৩৮
ওয়াক্ •মিত্রা সান্যাল...৬৮
পুতুলের মন •বিনতা রায়চৌধুরী...৬৫
ভবতোষ বনাম ভবতোষ •শেখর আহ্‌মেদ.....................১২৫

রসকাব্য

ধানাই পানাই •দীপ মুখোপাধ্যায়...৮৪
ধোঁয়া কন্যার রূপকথা •টুপুর রানী...................................১২১
ব্যক্তিত্ব সংবাদ •সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়................................১২২
লাদেন বধ •কল্লোল গাঙ্গুলী..৬৮
এবার অসুরপূজা •বিষ্ণুজ্যোতি রায়.....................................৫৭
চাকরির তিনসূত্র •সনৎকুমার মিত্র.......................................৯৩

এই সংখ্যায়—
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
নবনীতা দেব সেন
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
তারাপদ রায়
আবুল বাশার
লেখেন নি।

স্মৃতি

দী.কু.সা ●প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী....................................৬৪
সে কি ভোলা যায় ●বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়....................৫৬

নিয়মিত রচনা

অকপটে ● সমরেশ মজুমদার....................................১৩১

মহানাট্যকাব্য

মালিনী তরঙ্গম ●পল্লব চক্রবর্তী....................................৫২

বিশেষ রচনা

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা ●শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়....................১৪৮
একালের পুজো ●সৌরেন বসু.................................... ৬১
সেকালের প্যারিস-একালের কলকাতা ●প্রণবেন্দ্রনাথ ঘোষ........৮১
প্রধান অতিথির অভিভাষণ-বিদ্যাসাগর মূল্যায়ন ●
করুণা মুখোপাধ্যায়....................................১১৮

লোক সাহিত্য

সতীনের ঝি ● ফজল আলি....................................১৩৭

নিয়মিত বিভাগ

হেঁসেল ☐ ৫৮ চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ ☐ ৮৪ পত্রপাঠ জবাব ☐ ৭ রাশিচক্কোর ☐ ৯৩ ধারাবাহিক কবিতা ☐ ১৬২ সাহিত্য দুঃসংবাদ ☐১৩৪ শিক্ষা দুঃসংবাদ ☐ ১১৬ মহিলা মহল ☐ ১২৩ পত্রপাঠ লা-জবাব ☐ ১৬১ টীকা নিষ্প্রয়োজন ☐ ৬০

প্রচ্ছদ : পল্লব চক্রবর্তী
অলঙ্করণ : শুভ ● পল্লব চক্রবর্তী ● মণিকান্ত অধিকারী

কর্ম সহায়ক : অচ্যুতকুমার সিংহ ● কৌশিক রায় ● সুস্নাত চৌধুরী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : সুশীলকুমার সান্যাল

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ● তারাপদ রায় ● সমরেশ মজুমদার ● শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শেখর আহমেদ

সম্পাদকীয় দপ্তর : ১০বি, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ (গড়িয়াহাট মার্কেটের পিছনে)
ফোন : ৪৬০-০০৪১ (দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা, রবিবার ও ছুটির দিন বাদে)

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০জে, ফার্ণ রোড, (গ্রাউণ্ড ফ্লোর) কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ ●৯৮৩০০-১৩৩৫৬ ●৯৮৩০০-৫২১৮২

নতুন রূপে

পত্রপাঠ-এর অন্যতম স্থপতি শ্রী সুশীলকুমার সান্যাল সম্প্রতি পত্রপাঠ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকের পদটি অলঙ্কৃত করেছেন। বিজনেস ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর, এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী সান্যাল রাজনীতি জগতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এখানেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। একদা বায়ু সেনায় অন্তর্ভুক্ত শ্রী সান্যাল পূর্বা সৈনিক সেবা পরিষদ, এয়ারফোর্স অ্যাসোসিয়েশন, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও অরোরা অ্যাথলেটিক ক্লাবের মতো একাধিক ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছেন। আর সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগৎ তো তাঁর নিজস্ব প্রিয় উঠোন।

শ্রী সুশীলকুমার সান্যালকে পত্রপাঠ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক রূপে পেয়ে আমরা গর্ব অনুভব করছি। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও পরামর্শে অদূর ভবিষ্যতে পত্রপাঠ বৃহৎ হতে বৃহত্তর সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

—সম্পাদক ও পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ।

সম্পাদকীয়

অসুর নহে

না মা, তোমাকে আমরা ভুলি নাই। তোমার ওই মার-কাটারি মূর্তি জপিয়াই তো বাঁচিয়া আছি। সারা বছর। তবে প্রভেদ একটু আছে। এখন আর দেবতা-অসুরে যুদ্ধ হয় না। দেবতাগণ হয় মুক্তকচ্ছ উর্ধ্বশ্বাস, নয় দ্বাররুদ্ধ কক্ষে 'আপনি বাঁচিলে বাপের নাম' অষ্টপ্রহর জপ করিতেছেন। এখন যুদ্ধ অসুরে অসুরে। তাহাদিগের পূজার্চনাতেই আমরা নিতান্ত ব্যস্ত। বৃহৎ অসুরকে ঘিরিয়া প্রসাদ-লোভী মাঝারি ও ক্ষুদ্র অসুরের দল। যতক্ষণ না অসুর মহাশয় শ্বশুরবাটীতে গমন করেন, অর্থাৎ জেল কিংবা প্রতিপক্ষ অসুরের হস্তে চির-শ্বশুরালয়—স্বর্গে, ততদিন অসুর-ভজনা অব্যাহত থাকে। আমাদিগের সাহিত্য জগতেও এরূপ পারিষদ পরিবৃত অসুরগণ সর্বদা পূজিত হইতেছেন। পূজা করিবার সাধ কাহার না হয়। আমরা একটি খাঁটি অসুর খুঁজিয়া খুঁজিয়া হাল্লাক। কিন্তু হায়, আমাদিগের দৃষ্টি এতই ক্ষীণ যে, অসুর খুঁজিতে গিয়া চতুর প্রতীত হয়। কপাল মন্দ, চতুর-পূজার মন্ত্র শিখি নাই। কসুর মাফ হয়।

পত্রপাঠ-এর বাসা বদল

মাত্র তিনবার। পত্রপাঠ তৃতীয়বাবের জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরের ঠিকানা বদল করিল। এখন হইতে পত্রপাঠ-এর

সম্পাদকীয় দপ্তর :
১০ বি, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০০১৯
(গড়িয়াহাট মার্কেটের পশ্চাদ্দিকে)

বি: দ্র:- পরবর্তী বাসা বদলের সম্বাদও যথা সময়ে মহা সমারোহে ঘোষণা করা হইবে।

প্রতিশ্রুতি : মাত্র তিনবার পত্রপাঠ গৃহহারা হইল বলিয়া যাঁহারা বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা এই বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রহিলাম যে, পত্রপাঠ-এব শততম বাস্তুহারা হইবার ঘটনাটিকে আমরা এক বিরাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে পালন করিব; বিরল সেঞ্চুরির সুবাদে আমরা পত্রপাঠকে বিশেষ সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করিব। নিমন্ত্রণে আপনারা বাদ পড়িবেন না।

—সম্পাদক

কার্টুন : গোপাল দে

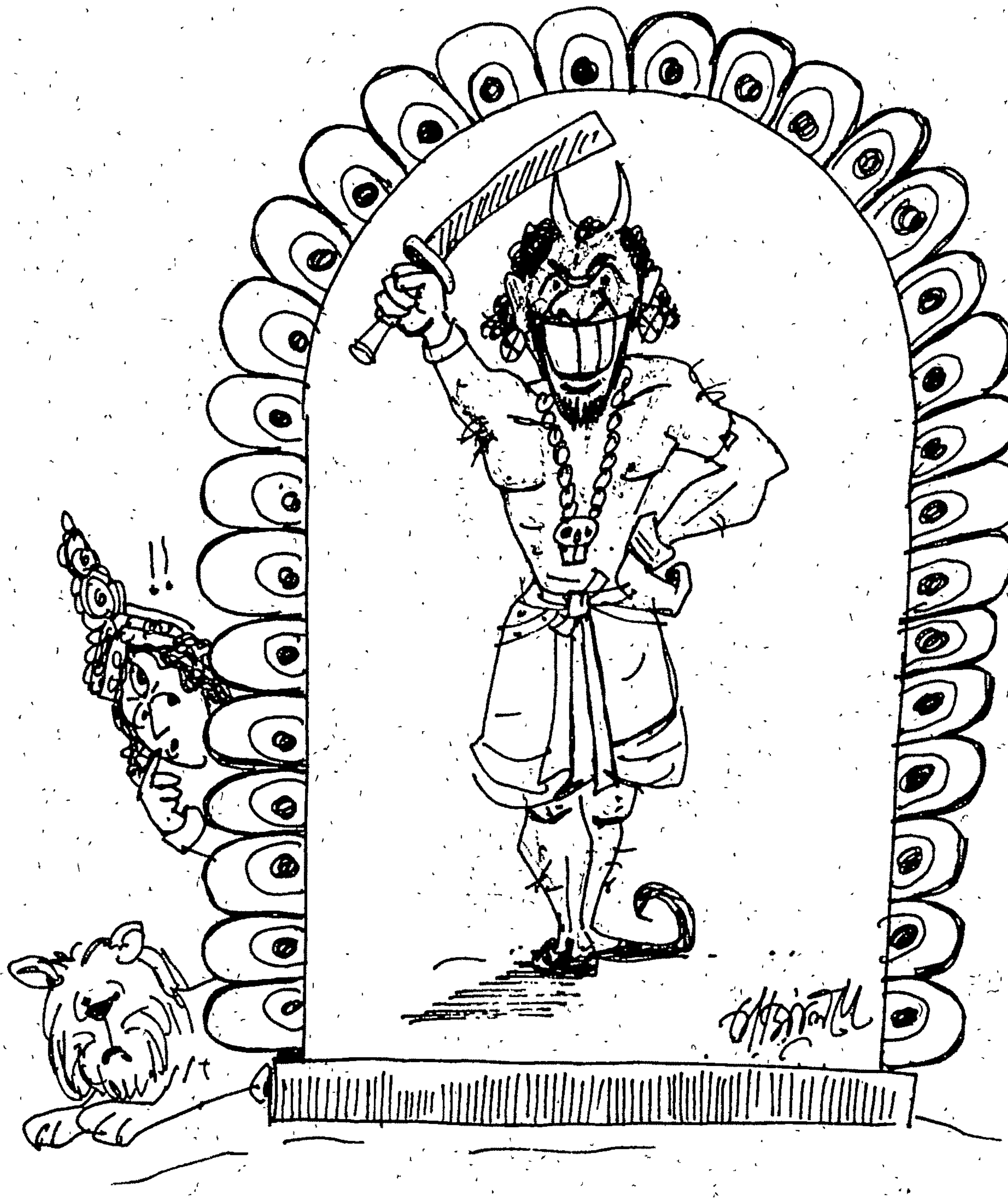

পুরনো কাসুন্দি

অমরেন্দ্রনাথ রায়ের

“দুর্গার মর্ত্যে আগমন” থেকে

ইতিমধ্যে কার্ত্তিক একখানা বইয়ের দোকানের সাম্‌নে আসিয়া কাচের মধ্য দিয়া চক্‌চকে রগ্‌রগে বহিগুলি হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল। গণেশ বলিল, “বাঃ, কি সুন্দর বাঁধানো”!

নন্দী বলিল, “হাঁ তা হয়েছে। ভিতবে যতই রাবিশ থাক না কেন, আজকাল কাগজ আর বাঁধাইয়েব কোন ত্রুটি নেই। তাই আজ-কালকাব সমালোচকেবা এই ভাবে সমালোচনা কবেন—

ইন্দুমুখী। সচিত্র গল্পের বহি। ১৭টি গল্প আছে। তাহাব মধ্যে ১৬টি ন্যূনাধিক সাতাইশ বাব নানান আকারে বঙ্গসাহিত্যে প্রচাবিত হইয়াছে। সুতরাং পাঠক ইহাতে অনেক পুরাতন পরিচিত বন্ধু দেখিতে পাইবেন। **পুস্তকের ছাপা সুন্দর, কাগজ আরও সুন্দর, বাঁধাইয়ের তো কথাই নেই।”**

কার্ত্তিক বলিল, “যাই বল, নন্দীদা, আমি একখানা বই কিন্‌বই কিন্‌ব। সবিদিদি আসবার সময় অনেক ক’রে বলে দিযেছে।”

নন্দী বলিল, “যদি নেহাৎই ইচ্ছা হয়, তো একখানা মাসিক পত্র কেনো। তাতে সব রকম জিনিযই পাবে, অথচ দাম সস্তা।”

গণেশ শুনিযাই ‘কই দেখি’ বলিযা তাড়াতাড়ি সকলের চেয়ে মোটা যে খানা দেখিল সেইখানা তুলিয়া লইল। তারপর দু’চাব পাতা উল্‌টাইয়া বলিল, “একি দাদা, এযে সমস্তই বিজ্ঞাপন দেখছি।”

কার্ত্তিক হাসিয়া বলিল, “তুমি যেমন—” এই বলিয়া খুঁজিযা খুঁজিযা একখানা সরু ঢ্যাঙ্গাগোছের মাসিকপত্র বাহির কবিল।

নন্দী কার্ত্তিকেব কাঁধের উপর হইতে ডিঙ্গী মাবিয়া দেখিয়া বলিল, “বাঃ, বাঃ, এর মলাটেব উপর যে আমাদের সরস্বতী দিদিব একখানা ছবি বযেছে। এইখানা তুমি কেনো দাদাবাবু।

কার্ত্তিক বলিল, “হাঁ, তোমার দিদিকে এরা একেবারে বিবি ক’বে দিযেছে।” বলিয়া হাসিতে হাসিতে সেইখানা ক্রয কবিল। গণেশও নিজের মত বজায় বাখিবাব জন্য সেই মোটা মাসিকখানা কিনিয়া সকলে মিলিয়া বাড়ী আসিযা পৌছিল।

দেবী ছেলেদের দেরী হইতেছে ভাবিয়া নানারূপ আশঙ্কা করিতেছিলেন, এখন সকলকে হাসিমুখে ফিরিতে দেখিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইলেন। কার্ত্তিকেব নূতন পাম্প্‌সুর মস্ মস্ শব্দ শুনিতে পাইয়া লক্ষ্মী-সবস্বতীও সেইখানে ছুটিয়া আসিল এবং “দাদা, আমাদেব জন্য কি এনেছো” বলিযা তাহাদের ঘিরিযা দাঁড়াইল।

কার্ত্তিক রাস্তায অনেকগুলি হ্যাণ্ডবিল সংগ্রহ করিয়াছিল। এখন গম্ভীবভাবে সেইগুলি পকেট হইতে বাহির করিয়া সরস্বতীব হাতে গছাইযা দিল। সবস্বতী তাড়াতাড়ি তাহা হইতে একখানা তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে আরম্ভ করিল

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

পুরুযত্ব হানির ও—

দুর্গা খপ্ কবিযা সেখানা সরস্বতীব হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, “ছিঃ, ও সব পড়তে নেই। লোকগুলাব কি কাণ্ড-জ্ঞান নাই—এই রকম ছাই ভস্ম লেখা বিলি কবে।”

কার্ত্তিক বলিল, “তুমি কি বল্‌ছ মা। এতো হাতে দিয়েছে। রাস্তায বেরুলে দেখবে, দুধাবেব দেওয়ালে কেবল এই রকম সব বিজ্ঞাপন। আর বিজ্ঞাপনও কি এত বেড়েছে। আমি এক জাযগায় একটু দাঁড়িয়েছিলুম—১৫ মিনিটের মধ্যে ৩ খানা বিজ্ঞাপন একখানার ওপর আর একখানা মেরে দিযে গেল।”

গণেশ বলিল, “তাতে এক এক সময কি রকম দাঁডিযে যায শুন্‌বে? আমি একটা দেওয়াল দেখলাম ঃ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদ ভবসা।

লুণ্ঠন। চুরি।। বাটপাড়ি।।।

এবার পুজায কি বিলাইব? বঙ্গের আধুনিক গল্প-সম্রাট শ্রীঅসীমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস।

হিলিংবাম।

২৪ ঘন্টায জ্বালাযন্ত্রণা আবোগ্য।

কালী হুইস্কী। কালী হুইস্কী।।

মস্তিস্ক শীতল ও স্নিগ্ধ বাখিতে অদ্বিতীয।

সকল মণিহাবীর দোকানেই পাওযা যায। মূল্য অতি সুলভ কাপড়ে বাঁধাই ৩।।০ মাত্র। ফ্রি ও কমপ্লিমেন্টারী পাস একেবারে বন্ধ।

গণেশের বর্ণনা শুনিযা লক্ষ্মী ও সবস্বতী হাসিযা লুটাপুটি খাইতে লাগিল। দুর্গা বলিল, তোদের বঙ্গ তামাসা রাখ বাপু। এখন দুটি খেবে নিয়ে একটু ঘুমো। দুপুব বেলা আবাব যেন কোথাও বেরুস্‌নে।”

খাওয়া-দাওযার পর কার্ত্তিক ও গণেশ খানিকক্ষণ চোখ মটকাইযা পড়িযা রহিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পা টিপিযা আসিযা খবব দিল যে দুর্গা ঘুমাইযা পড়িয়াছেন। তখন চারি জনে উঠিযা গল্পগাছা করিতে বসিল। গণেশ বলিল, “কেতো, তোর কেনা সেই মাসিকখানা দেখি।” কার্ত্তিক সেটা হাতে দিতেই, গণেশ পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিল, ভিতবে শুধু নগ্ন স্ত্রীলোকের ছবি

গণেশ বলিল, "কেতো, তোর কি আক্কেল। এই বই তুই দেখে শুনে তোর বোনের জন্য এনেছিস্।" এই বলিয়াই সেই পাতাখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

কার্ত্তিক বলিল, "তুমি কি বোকা দাদা? ওল্ড্ ওয়ার্ল্ডের লোক তুমি, আর্ট সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়া আছে কি? এ রকম ছবি না দিলে আর্টে জ্ঞান জন্মে না। তা ছাড়া এতে কি রকম গ্রাহক বেড়ে যায়,—জানো?"

গণেশ শেষের কথাটি শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "সে আলাদা কথা। কিন্তু তা ব'লে কি এমনি ক'রে প্যাণ্ডারিং করাটা কি ভাল। তুই এই সব ছবি তোর মা-বোনকে দেখাতে পারিস্?"

কার্ত্তিক বলিল, "আমি না পারি, এই সব আর্টওয়ালারা নিশ্চযই পারে। আর্ট আবার মা-বোন কি? বিউটিই হোল আসল। এখন আর তোমার সেই সেকেলে সমাজ নেই।"

গণেশ রাগিয়া বলিল, "তুই থাম্, বাস্কেল। তোর আর ওকালতীতে কাজ নেই। দেখি, তোর কেনা কাগজে লেখা কি রকম রেরুচ্ছে।"

তারপর একবার চোখ বলাইয়া লইয়া গণেশ বলিল, "ওরে বাপ, এদের ভাষা যে ঢের বদ্‌লে গেছে দেখ্‌ছি। এমন মেয়েলী ঢং আর নকুলে হাব ভাব এরা শিখলে কোথা থেকে?"

কার্ত্তিক চাটিয়া বলিল, "তোমার অত খুঁত ধরতে হবে না। তোমার ভাল লাগে রেখে দাও।"

সরস্বতী ইতিমধ্যে গণেশের সেই মোটা পত্রিকাখানি হস্তগত করিয়া তাহার সাতমহল বিজ্ঞাপন ও কবিতা, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি ঠেলিয়া উঠিয়া একটি লম্বা গল্প আবিষ্কার করিয়া একমনে তাহাই পড়িতেছিল। গণেশ তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "কিরে কেমন পড়ছিস্।"

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—"দাদা, তোমরা আমাকে মেযেজ্যাঠা বলে থাকো, কিন্তু বাঙ্গালী-মেয়ের এই গল্পটা পড়লে বুঝতে পারবে যে, আমি এদের কাছে কিছু নয— নগণ্য মাত্র। বেদ, উপনিষদ ও জ্যোতিষীর কথা থেকে আরম্ভ কোরে বড় বড় ইংরেজ-দার্শনিকদের নাম পর্য্যন্ত সমস্ত এর মধ্যে ঢুকিয়ে কত বিদ্যেই যে ফলিয়েছে, তার ঠিকানা নাই। তার উপর, এক কথা ফেনিয়ে ফেনিয়ে বিশ পৃষ্ঠা ধরে লিখেছে।

কার্ত্তিক।—এখন ঐ রকম লেখাই রেওয়াজ হয়েছে।— ওকেই আর্ট বলে। বঙ্কিমবাবুরা এখন অচল।

সরস্বতী।—বটে। সাজিয়ে-গুজিয়ে বা বুঝিযে-সুঝিযে না লিখতে পারলেই বুঝি তাকে আর্ট বলে? —এতো খুব সোজা। একবার কৈলাসে গিয়ে আমাদেরও এ রকম একখানা কাগজ বাহির করলে হয় না?

গণেশ।—ঝুড়ি ঝুড়ি এত লেখক সেখানে কোথায পাবি?

কার্ত্তিক। সে ভয নেই। দেখছো না? —এদের এক একটা লেখক কত রকম বে-রকমের লেখা লিখছে।

গণেশ। তা' মিথ্যে বলিস্ নি। সেদিন দেখছিলাম, এক জন মস্ত বৈজ্ঞানিক হিন্দুসমাজের সংস্কারের জন্যে খুব কোমর বেঁধে কলম চালাচ্ছেন। অথচ মজা এই যে, তিনি নিজে সমাজ-তত্ত্বজ্ঞও নন—হিন্দুও নন।

কার্ত্তিক। তা তোমরা তামাসাই কর, আর যাই কর, এই অনধিকার চর্চ্চার ফলে কিন্তু কাগজ-ভরানোর খুব সুবিধা হয়।

গণেশ তবে তুই-ও কেন দেবতাদের জন্যে একখানা কাগজ বের কর না।

কার্ত্তিক। আমি কি সে বিষয়ে চুপ করে আছি? এই দেখনা তার একটা নমুনা করেছি।" —এই বলিযা কার্ত্তিক হাতের লেখা-একখানা খাতা গণেশের হাতে দিলেন।

"WORK IS WORSHIP"

Over fifty years of dedicated Service in Pathological, Biochemical and Immunological (Hormones) field

With Best Compliments from

CALCUTTA CLINICAL LABORATORY

36, Ritchie Road
Kolkata-700 019
Phone- 476-6209, 475-1979

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : একাকী গড়াই ও দ্বিতীয় সুগ্রীব

● কৃত্তিবাঁশ নামে পত্রিকা ছিল বলে ছোটবেলায শুনেছিলাম। সেটা কি এখনো আছে?

—অনুপ বিশ্বাস, বেহালা, কলকাতা-৬১

□ 'কৃত্তিবাঁশ' নয় 'কৃত্তিবাস'। এখনো আছে, তবে আগে মাসে মাসে করে দেওয়া হত এখন আর অতটা ওরা পেরে ওঠেন না, এখন বছরে একবার কবে দেন।

● পত্রপাঠ-এর আগস্ট সংখ্যাব প্রচ্ছদে দাঁড়িটি হেলেছে বুদ্ধির দিকে কিন্তু দাঁড়ির কাঁটাটি কোন সূত্রে বেঁকে রইল বিদ্যের দিকে? পত্রপাঠ-এর কাণ্ডজ্ঞান-এর রূপক কি এটাই?

—*অনিমেষ দত্ত, কলকাতা-২১*

□ কেন সেই দাঁড়িপাল্লাই তো ছেপে দিয়েছি, যা দিযে সকালে দোকানদার আপনাকে মাছ, মাংস, ঝিঙে, বেগুন, ওজন করে দেয। দেবে কম তবু ঝুঁকবে বেশি।

● পত্রপাঠ পত্রিকাব সঙ্গে আমাব যোগাযোগ হঠাৎই হয়েছিল। গত বইমেলাতে কলেজের বান্ধবীদের সঙ্গে মেলার মাঠে গল্প করছিলাম হঠাৎই এক লিট্‌ল্ ম্যাগ বিক্রেতার দিকে নজর গেল। ও জোর করে আমাদের প্রত্যেককে একটা করে বই কিনতে বাধ্য করেছিল। পরে মেসে বইটি পড়ে আমি অবাক। আবার সজনীকান্ত দাস ফিরে এলেন নাকি।

—*চন্দ্রনাথ পাণ্ডা, ঘাটাল, মেদিনীপুর*

□ কেন, দাস প্রথা ফিরে এলে আপনার এত খুশি হবার কাবণটা কী?

● পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ও তৃণমূলের সম্পর্কটা ঠিক কীরকম? এবং কেন্দ্রেই বা তার স্বরূপ কি?

—*কান্তিময় নস্কর, নুঙ্গি, দঃ ২৪ পবগণা*

□ পশ্চিমবঙ্গে সম্পর্কটা গালাগালির আকাবে আর কেন্দ্রে আকার বাদে গলাগালির।

● প্রস্তাবিত রামমন্দিরটি কবে আর হবে?

—*উত্তম পুরকাযস্থ, চন্দননগর, হুগলী*

□ সে 'বাম জানে'।

● গুণ্ডা এবং সমাজ বিরোধীর মধ্যে তফাৎ কি?

—*অরুণ তন্তুবায়, শালতোড়া, বর্ধমান*

□ অক্ষরের। একটার অক্ষর দুই, আরেকটাব ছয়। এই চাবের তফাৎ বে ভাই, ছিপ-টোপ-ফাৎনা একইবকম।

● সাট্টা ডন রসিদের নাম 'বসিদ'-ই হতে গেল কেন? অন্যকিছুও তো হতে পারত?

—*শেখ বড়জাহান মণ্ডল, কালনা, বর্ধমান*

□ না পারত না। জন্মানোর পরেই বাপ-মা বুঝতে পেরেছিল যে সাবাজীবন এ ছেলে 'রসিদ' ছাড়াই Collection করবে, তাই।

● কাগজে দেখেছেন তো, এক মহিলা খালি হাতে বিভলবাধারী ডাকাতকে থাবড়ে কাত করেছেন। কেমন বুঝছেন?

—*হরিনাথ সমাদ্দাব, চেতলা, কলকাতা*

□ ভালোই বুঝছি। স্বামী ছেড়ে এই সব শক্তিরূপিনীদেব থাবড়া আসামীর দিকে ঘুরে গেলে তো এ যাত্রায় আমরা বেঁচেই গেলাম ভাই।

● খবরের কাগজে হাসি হাসি মুখে বিবৃতি দিযে মন্ত্রীরা বলছে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা নাগরিকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। আবার কাগজ খুলেই দেখতে পাই অনাহারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একেকটা গোটা পরিবার একসঙ্গে আত্মহত্যা করছে বা মা তার শিশুটিকে বিষ দিয়ে নিজেও বিষ খাচ্ছে। তাহলে দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা কিভাবে কমছে?

—*উত্তম নায়ক, ইংলিশবাজাব, মালদা*

□ কেন, এ ভাবেই কমছে।

● একটা জোক্স্ সংখ্যা করুন না।

—*শ্রাবণী চ্যাটার্জী, বেহালা, কলকাতা*

□ জোঁকের মুখে নুন দিযে দিয়ে আর সময় কবে উঠতে পারছি না। এত জোঁক চারদিকে। আগে একটু কমিয়ে নিই।

রসোপন্যাস

বিদ্যাকাণ্ডে লণ্ডভণ্ড

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

সাত সকালে ঘনাদার চায়ের দোকানে বসে মনাদা কাগজ পড়ছিল। সাত সকালে মানে সাত সকালই। ছয সকাল তো নযই। এমন কি সাড়ে ছয় সকালও নয়। নেহাৎ ঘনাদা মনাদা কারো হাতে ঘড়ি নেই তাই তাদেব পক্ষে মেপে বলা সম্ভব নয়। তবে হিসেব মতে সাত সকালই বটে। রোজ ঘড়ি ধরে ওই সাতটাতেই রাজু সাইকেল চালিয়ে এসে একটা ঘণ্টি মারে আর চালু অবস্থাতেই তার স্পেশাল কায়দায় একটা কাগজ পাকিযে ঘনাদার দোকানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এই স্পেশাল কায়দাটা রাজু শিখেছে ঠেকায় পড়ে। ঠেকার নাম বাবাজি। ঠেকা না হয়ে যদি ঠিকা হত তবে রাজু কি জানি ঠিকাদার হযে যেতে পারত। আর কে না জানে ঠিকাদারদের টাকা হয়। কিন্তু রাজুর কপালে নেইকো ঘি, ঠক ঠকাইলে অইবো কি। রাজুর বেলা ঠিকা নয ঠেকা। ঠেকায় রাজুকে বাবাজি বানিযে ছেড়েছে।

রাজুই বা কী করবে? কাগজ বিলোবার জন্যে যদি ঘরে ঘরে সাইকেল থেকে নামতে হয় আর হাতে হাতে কাগজ ধরাতে হয় তবে তো বিলি শেষ করতে এগারোটা বেজে যাবে। বেলা এগারোটায় যে বাড়িতে কাগজ দিতে যাবে সেখানে এমনই বোলচাল ঝেড়ে দেবে যে ওই এগারোটাতেই বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। বোলচাল দেনেওয়ালা কিংবা দেনেওয়ালিটি বাড়ির কত্তা হতে পারে গিন্নি হতে পাবে আবার গিন্নির পেযারে আস্কারা পাওয়া ঝি হওয়াও বিচিত্র নয।

সাইকেল থেকে নেমে বাড়ির লোকের হাতে কাগজ ধরিয়ে দেবার ব্যাপারটা আরো একটা কারণে এড়িয়ে চলতে হয়। আর সেটাই মোক্ষম কারণ। সদ্য ঘুম ভেঙে পিচুটি লেগে থাকা চোখ আর লালা লাগোনো ফুলো ফুলো ঠোঁট নিয়ে ভেংচি কাটার ভঙ্গিমায় হাই তুলতে তুলতে যে জন এসে দরজা খুলে কাগজ হাতে নেবে তার মুখটি দেখে আর যাই হোক মনে পুলক জাগবে না তা সে জন বাড়ির কত্তাই হোক বা গিন্নিই হোক কিংবা তাদের আদরের তরুণী কন্যাটিই হোক। তরুণী কন্যার বেলায় তো ব্যাপারটা হবে আরো মর্মঘাতী। পাড়ার যে সুন্দরী রূপসী তরুণীটিকে বিকেল বেলা বাসস্টপেজে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজুর মন উড়ু উড়ু হয়ে যায়, সকাল বেলা তারই বদন মণ্ডলের ওই নিয়াণ্ডারথাল রূপটি দেখলে রাজুর বুক গুরু গুরু ডাক ছাড়ে। তাই ওই কম্মোটি এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া রাজুর গতি নেই।

স্পেশাল কায়দাটা রপ্ত করার প্রথম দিকে রাজুর দুটো একটা ফাউল যে হয়নি তা নয়। একবার ওব ছুঁড়ে দেওয়া কাগজটা টেবিলের বদলে ঘনাদার জ্বলন্ত উনুনে পড়ে গিয়ে ওখানেই তার চিতা প্রাপ্তি হয়ে গেছল। গরম খবর সরবরাহ করে লোকেব খিলু গরম করে দেবাব বদলে কাগজ নিজেই গরম হয়ে গেল। এত গরম যে আগুন ধোঁয়া আর সবশেষে কিছু ছাই, ব্যস।

আর একবার তিনতলার বারান্দা লক্ষ্য করে ছোঁড়া রোল করা কাগজটা রেলিঙে ধাক্কা লেগে সমারসেট ভল্ট খেয়ে সোজা বাঁড়ুয্যেবাবুর টাকে। বাঁড়ুয্যেবাবু তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কানে পৈতে জড়িয়ে নিম ডাঁটা চিবিয়ে দাঁতন করছিলেন। বেচারা রাজু আর একটু হলেই কানমলা খেত।

রাজুর সাইকেলের ঘণ্টি অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আর শুনলেই বোঝা যায় হ্যাঁ, রাজুর সাইকেলের ঘণ্টিই বটে। ঘণ্টির প্রথম দিকটা বেড়ালের ডাক, মধ্যের ডাকটা কেঁতি কুকুবের আর শেষটায় কেউ যেন সেই কেঁতিটাকে ক্যাঁৎ করে একটা লাথি কষিয়ে দিল। ঘণ্টিব বাজনা শেষ হল মানে লাথি খেয়ে কেঁতি কুত্তা চুপ। ওই ঘণ্টির শব্দে সবাই বুঝে নেয়— হ্যাঁ রাজু এসে গেছে। আর সেই সময় যদি এদিক ওদিক দুটো একটা কেঁতি কুকুর শুযেও থাকে তারা তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায়। তারা জানে রাজুব সাইকেলের চাকা তাদের কারো ঠ্যাংযেব উপর দিয়ে

চলে গেলে রাজু থামবেও না, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করবে না। নিজের ঠ্যাংয়ের হ্যাপা নিজেকেই সামলাতে হবে।

এই ব্যাপারটা অর্থাৎ কিনা কারুকে চাপা দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়াটা, অবশ্যই রাজুর একচেটিয়া নয়। সবাই তাই করে। ইংরেজি করে বললে বলতে হয়—নহিদার দি ফার্স্ট নর দি লাস্ট। কলকাতার রাস্তায় বাস ট্যাক্সি টেম্পো কেউই কাউকে চাপা দিয়ে আর থামে না। কুকুর তো দূরের কথা। মানুষকে চাপা দিলেও তাই।

আর ড্রাইভারই বা করে কি? সেও তো নাচার। সে জানে গাড়ি থামালে গণ পিটুনিতে তাকেও ওই চাপা পড়া লোকটার সঙ্গে হাসপাতালে চালান হয়ে ওরই পাশের বেডে শুয়ে কঁকাতে হবে। কিংবা হাসপাতালের বদলে মর্গে চালান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কলকাতার সমাজ সচেতন জনগণ বলে কথা। আগে তো ড্রাইভারকে পেটাও, দোষ-গুণের কথা কিংবা চাপা পড়া লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা ভাবা যাবে পরে। তাই ড্রাইভারও ভাবে, পালিয়ে গিয়ে আগে নিজের জানটা তো বাঁচাই, বাপের নামটা ভাবা যাবে পরে।

রাজুর দিয়ে যাওয়া কাগজের প্রথম পাঠক মনাদা। রাজুর আসার আশায় আগে থেকে মনাদা ঘনাদার চায়ের দোকানে এসে বসে থাকে। আর বসে বসে চোখ রগড়ায়। ঘনাদা সবে উনুনে নতুন কয়লা দিনে আঁচটি ধরিয়েছে। গল গল করে ধোঁয়া বেরিয়ে কাফে দ্য ঘনাদা ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া গুরু ঠাকুরকেও রেয়াত করে না। মনাদা আর কী এমন বাপের ঠাকুর।

রাজুর ছুঁড়ে দেওয়া কাগজটা তুলে নিল মনাদা। সদ্য পাটভাঙা কাগজের কী গন্ধ মাইরি। আ-হা-হা। ঠিক যেন ট্রাঙ্ক থেকে বার করে ন্যাপথালিন দেওয়া ঢাকাই শাড়ির পাট ভাঙা হচ্ছে। পাট ভাঙা খবরের কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরে মনাদা হাটবাজারের তাজা তাজা কেচ্ছার গাঁট ভাঙা খবরে বুঁদ। সোনা যে কখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখতে পায় নি। খুব স্বাভাবিক। কাগজটা না থাকলে যে লাইনে সোনার মুখটা দেখা যেত, ঠিক সেই বরাবর মনাদার সামনে একটা পাতা জোড়া মস্ত জুতোর বিজ্ঞাপন।

নাকের ডগা থেকে মাছি তাড়াবার জন্যে কাগজ সরাতেই মনাদার চোখের সামনে সোনা,—আরে সোনা যে। এই তোর কথাই ভাবছিলাম।

—মাইরি মনাদা, সংকালবেলা কী সত্যি কথাটাই বললে। চোখের সামনে খবরের কাগজ ধরে মনে মনে রাজা-উজির মারছ। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একতরফা ডায়ালগ চালাচ্ছ। তুমি নাকি এখন আমার কথা ভাবছিলে।

—না রে না। তোর কথাই ভাবছিলাম। তুই নাকি কাল মরে গেছিস্?

সকাল বেলাই এরকম একটা অভ্যর্থনা পাবার জন্যে সোনা খুব একটা তৈরি ছিল না। তবে সে ঘাবড়েও গেল না। কেন না, সোনা আমাদের তৈরি ছেলে।

সোনার পরিচয়টা এই রকম—

বয়স তার চোদ্দ

নাকের নিচে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে সদ্য।

নিজেকে তাই জাহির করে—হয়ে গিয়েছে মদ্দ।

পাড়ার ইস্কুলে ক্লাশ এইটে পড়ে। তবে ইস্কুলের পড়া ওই পর্যন্ত। পড়া ছাড়া তার অন্য অনেক কাজ আছে। সকালে উঠে ঘনাদার দোকানে এসেছে। এখন আড্ডা হবে ঘণ্টা দুই। সেই সঙ্গে একে তাকে জক দিয়ে দু'চার গেলাস চা।

আড্ডাটা মনে হচ্ছে আজ জমবে ভালো। যাকে বলে কৃস্টাল। প্রথম ধরতাইটা মনাদা যা দিয়েছে না—চামকিন্!

—আমি মরে গেছি, সেটাকে কি কাল ঝোঁকের মাথায় ঘোরে দেখলে, নাকি সকালে উঠে এই কাগজে পড়ে জানলে? কাল রাতে ক'পাট টেনেছ মাইরি মনাদা?

—মোটেই না। আমি কাল রাতে পাঁটও টানি নি আর ঝোঁকের মাথায় ঘোরেও দেখি নি। আজ সকালে সদ্য এই কাগজে পড়লাম। এই দ্যাখ, কাগজে লেখা আছে—লেবুতলার কুখ্যাত দুষ্কৃতী সোনা পুলিশের গুলিতে নিহত।

সোনা প্রথমটা একটু থমকে গেল। তারপর ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে হেসে উঠল,—মনাদা হে, ওটা লেবুতলা। আমাদের এটা হল লেবুপাড়া। ওটা বৌবাজার আর এটা বাবুবাজার। বৌ আর বাবুতে অনেকখানি তফাৎ মাইরি। বহোৎ দূর। একজন ঘোমটা ঝুলায় অন্যজন কোঁচা দুলায়।

বক্তিমে দেবার সুযোগ পেয়ে গেছে। ময়দানটাও ফাঁকা। এখন এইটুকু বলেই ছেড়ে দেবার বান্দা সোনা নয়। নিজের কথার শেষে জুড়ে দিল,—অবিশ্যি খোলার সময় দু'জনে একই সঙ্গে। এসব খিস্তি সোনার মতো ছেলেদের কাছে মুখশুদ্ধি। ক্লাশ এইট বলে কথা। যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষিত।

সোনার ছুঁড়ে দেওয়া খিস্তিটা মনাদা মান বাঁচিয়ে মানে মানে মানিয়ে নিয়ে হজম করে ফেলল। ভাবটা, যেন কানে শোনে নি। ছোটদের কাছে মান বাঁচাতে এরকমটা করতেই হয়। এ যুগের কৃষ্টিই হল খিস্তি। কে যেন লিখে গেছে, এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে। উঁ হুঁ। কথাটা হবে, এ যুগের বাত্ হল খিস্তি। বাঙালির কৃষ্টি হল রসগোল্লা দই সন্দেশ মিষ্টি আর সেই সঙ্গে সোনাদের খিস্তি।

—অঃ। ওটা তাহলে আমারই ভুল। আমি এতক্ষণে ভেবে বসে আছি তুই মরে গেছিস। তোর মৃত্যুতে কাঁদবার জন্যে এই দ্যাখ্ একেবারে তৈরি হয়ে বসে আছি। দু'একজন এসে জুটলেই কান্না আরম্ভ করে দিতুম।

—ঠিক আছে। তোমাকে আমি কান্নার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলুম। এখন তাইলে চা খাওয়াও। মনাদার কোনো সম্মতি অসম্মতির তোয়াক্কা না করে গলার স্বর উঁচু করে সোনা হাঁক দিল, অ্যাই ঘনাদা, মনাদার নামে একটা চা আর একটা লেড়ো বিস্কুট।

মাথা চুলকে মনাদা বলল, শুধু চা খেলে হত না? আবার লেড়ো বিস্কুট কেন?

—আরে মনাদা, আমি তো শুধু লেড়ো বিস্কুটই বলেছি, কেক তো বলিনি। এতেই তোমার কল্জেতে পাম্পিং শুরু হয়ে গেল গুরু? তাইলে থাক্। তুমি তো আরো দু'চার জন আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলে। তারা সবাই এসে জুটুক। অর্ডারটা তার পরেই দেওয়া যাবেখন, কী বলো?

মনাদা আর কী বলে। বেকুবের মতো দাঁত কেলিয়ে হাসা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। মনে মনে হিসাব কষে নিল, বৌয়ের কাছ থেকে রোজ সকালে চা খাবার জন্যে যে পয়সা কটা পায় তাতে তো ছোবল পড়ে গেল। আবার ছোবল যে পড়ে গেল সে কথাটা বৌকে গিয়ে বলাও চলবে না। বললেই রোজ সকালে ঘনাদার দোকানে চা খেতে আসার উপরে কারফিউ জারি হয়ে যাবে। তার মানে এই পয়সাটি ম্যানেজ করতে বাজারের হিসেবে পুলটিশ মারতে হবে।

ওদিকে আবার বাজারের হিসেবে পুলটিশ মারব বললেই কি মারা যায়? বাজার থেকে ফিরলেই বৌ এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করবে যে সব পুলটিশ খসে খসে পড়ে যাবে। শুধু কি তাই? কত্তার কওয়া দামগুলো যাচাই করার জন্যে মাঝে মাঝে ভূতির মাকে দিয়ে বাজার করানো হয়। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি খতম। কত্তার হিসেবে ভূতির মা যাচাই আবার কত্তা যাচাই হয় ভূতির মার দেওয়া হিসেবে। কী সাংঘাতিক পলিটিক্স্।

ঘনাদার চোখে জুতোর বিজ্ঞাপনের জায়গায় তার বৌয়ের মুখটা ভেসে উঠল।

হ্যাঁ, ছিল একসময়। বিয়ের পর প্রথম বছর দুয়েক। তখন ওই রোয়েটা ছিল বেশ গাঢ়। বৌয়ের ওই রকম জেরা শুনে মনাদা বলত,—তুমি না এক

উকিল ঘরানার মেয়ে। লেগে থাকলে নিজেও এক জবরদস্ত উকিল হতে পারতো।

উকিল বাড়ির মেয়ে বলায় সে মেয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে একটু লাজুক হাসি হেসে তেলটি সানন্দে গ্রহণ করত। সেই সঙ্গে নিজের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কার্যকারণ গতিকে নিজে উকিল হতে পারি নি, সেই দুঃখে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসও ফেলত।

সে দিন গেছে। এখন রস অনেক পান্‌সে হয়ে এসেছে। এখন আর বৌকে 'উকিল বাড়ির মেয়ে' কিংবা ইচ্ছে করলেই 'উকিল হতে পারতে' ধরনের কোনো কথা বলার ইচ্ছে হয় না। তার বদলে যে কথাটা জিবের আগায় এসেও ঠোঁটে আটকে যায়, সেটা হল—কি এঁটেল মুদির মেয়ে রে বাবা। হিসেব নিয়ে নিয়ে হাড়েমাসে জ্বালা ধরিয়ে দিল। কথাটা জিবের আগায় এলেও আজ পর্যন্ত মুখ দিয়ে বার হয়নি। হলে যে কী তুলকালাম কাণ্ড হবে সেটা ভাবলেও ভয়ে চোখ বন্ধ করতে হয়।

ঘনাদার-দোকানে বসে সোনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনাদা নিজের অজান্তেই একবার চোখ বুঁজে ফেলল। কেউ বুঝল না, কেন।

লেড়ো বিস্কুট গরম চায়ে ডুবিয়ে সোনা সবে প্রথম কামড়টি বসিয়েছে. গোবিন্দ এসে হাজির। গোবিন্দ সোনার ক্লাশের বন্ধু। ক্লাশের বন্ধু এখন। কিন্তু গত বছর পর্যন্ত ছিল না। এ বছর ওদের দু'জনের এক ক্লাশের বন্ধু হওয়ার মূলে ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই। তিনটে বিষয়ে ফেল মারা সোনাকে সেভেন থেকে এইটে তুলে দিল। কিন্তু ওদিকে ধনুক ভাঙা পণ করে বসে রইল—গোবিন্দকে নাইনে কিছুতেই তুলবে না। যুক্তিটা হল এই যে, গোবিন্দ কোনো বিষয়েই দশের বেশি নম্বর পায় নি। তাকে প্রমোশন দিতে গেলে নাকি ক্লাশের বেঞ্চি-চেয়ারকেও প্রমোশন দিতে হয়। বেঞ্চি চেয়ারের সঙ্গে আটকা পড়ে তাই গোবিন্দ ক্লাশ এইটেই থেকে গেছে। যে বেঞ্চি চেয়ারের মায়ায় গোবিন্দ ক্লাশ এইটেই থেকে গেল তারই একটাতে এ বছর সোনা গোবিন্দর সঙ্গে বসে আর দু'জনে গুলতানি মারে। গুলতানির বহরটা এতই যে ক্লাশের অন্য বন্ধুরা সোনায়-সোহাগার অনুকরণে ওদের নাম দিয়েছে সোনায় গোবিন্দ।

গোবিন্দরও ক্লাশে প্রমোশন না হলে কি হবে, সোনার সঙ্গে গুলতানি মেরে এই প্রমোশনটা হয়ে গেছে। গোবিন্দকে এতদিন লোকে ডাকত গোঁয়ার গোবিন্দ, এখন ডাকে সোনার গোবিন্দ। গোবিন্দটা না বিইয়েই গোপালের মা। জীবনে আজ পর্যন্ত এমন একটা ভালো কাজ করতে পারে নি যাতে তাকে কেউ সোনা বলে ডাকবে। এখন স্রেফ সোনার সঙ্গে গুলতানি মেরেই সোনার গোবিন্দ। ভাগ্যিস হেডমাস্টার মশাই তাকে প্রমোশনটা দেয়নি!

এক ক্লাশে দু'জনের কথাবার্তার প্রথম দিনেই গোবিন্দ সোনাকে বলল, দ্যাখ্ সোনা, নেহাৎ ফেল করেছি বলে তোর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ছি। আসলে কিন্তু আমি তোর চেয়ে বড়। আমাকে দাদা বলে ডাকবি। সোনা এক কথায় রাজি,—নিশ্চয় আমি তোমাকে দাদা বলে ডাকব।

এরপর গোবিন্দকে সোনার প্রথম ডাকটাই হল,—অ্যাই গোব্‌দা।

ডাক শুনে গোবিন্দর মুখটা জিলিপির মতো ঝুলে গেল আর তার আলু হয়ে যাওয়া চোখের সামনে চোখ নাচিয়ে সোনা বলল, কেমন একটা মার্ভেলাস নাম দিয়েছি বল দিকি মাইরি। দাদাকে দাদাও ডাকা হল তার উপরে নামটাও এবারে মডার্ন, চক্কস্।

এরকম একটা খাস্তা নাম যে কী গুণে মডার্ন হয় সেটা গোবিন্দ অনেক ভেবেও বার করতে পারল না। বার করার চেষ্টা যে সে করেনি তা নয়। অনেক ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে মাথা চুলকেছে, পা চুলকেছে, হাই তুলেছে, ঘুমে ঢুলেছে, আরো অনেক কিছু করেছে। কিন্তু কোনো দিকে কোনো সুরাহা হয় নি।

ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবার পর শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবল—হবেও বা। যতই যাই হোক না কেন, সোনা তো প্রমোশন পাওয়া ছেলে। আর আমি তো—।

এরপর গোবিন্দ ভাবল প্রতিশোধ নেবার জন্যে সোনাকেও ওই রকম একটা খাস্তা নাম দিতে হবে। কিন্তু ভাবলে কি হবে, ভগবান মাথাটাকে এতই নিরেট করে পাঠিয়েছে যে আকাশ পাতাল হাতড়েও সোনার জন্যে একটা জুতসই নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। স্রেফ বুদ্ধির অভাবেই সোনার উপর কোনো প্রতিশোধ নেওয়া গেল না বলে গোবিন্দ প্রথম কিছুদিন খুব মনমরা হয়ে রইল।

এখন অবশ্য মনমরা ভাবটা আর নেই। অন্য পাঁচ কাজে ব্যস্ত হয়ে ওরা নামের ব্যাপার নিয়ে আর মাথাটা ঘামায় না। গোব্‌দা নামটা গোবিন্দর সয়ে গেছে। এতটাই সয়ে গেছে যে ওকে কেউ গোবিন্দ নামে ডাকলে প্রথম ডাকে সাড়া দেয় না। ভাবতে বসে, ওটা আবার কার নাম রে বাবা।

গোবিন্দকে দোকানে ঢুকতে দেখে, সোনার লেড়ো কামড়ানো দাঁতের পাটি দুটো আরো বিকশিত হল। গোবিন্দর দিকে তাকানো অবস্থাতেই গলা উঁচু করে বলল, এ্যাই ঘনাদা, আর একটা চা আর একটা লেড়ো বিস্কুট।

দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরা লেড়ো বিস্কুটের বেশ কিছুটা তখন গুঁড়ো হয়ে গেছে। এই অবস্থায় সাবধান না হয়ে গলা উঁচু করে কথা বলতে গেলে সেই সব গুঁড়োগুলো তুবড়ি হয়ে বেরিয়ে আসার পুরো সম্ভাবনা। তাই দাঁত চেপে ঠোঁট কেতরে বিস্কুটের গুঁড়ো বাঁচিয়ে সোনা যে ডাকটা দিল সেটাকে তার নিজের স্বরের মতো মনে হল না। হঠাৎ শুনলে মনে হবে বনের মধ্যে উল্লুক ডাকছে। তাও যে সে ডাক নয়, সামনে এক কাঁদি পাকা কলা ধরে দিলে মনের আনন্দে উল্লুক যে রকম ডাকে, সেই ডাক।

প্রথম চট্‌কায় গোবিন্দ ধরতে পারল না ব্যাপারটা কি। দোকানে ঢুকতে না ঢুকতেই চায়ের অর্ডার। নিশ্চয় ফোকটের চা। সোনা হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। এক হাতে চায়ের গেলাস অন্য হাতে আধ-কামড়ানো লেড়ো বিস্কুট। দুটো হাতই তোলা আছে দু'হাতওয়ালা নারায়ণের বরাভয়ের ভঙ্গিতে। ওর দিকে চাওয়া অবস্থাতেই ঘনাদাকে বলছে চায়ের কথা। শুধু কি চা? চায়ের সঙ্গে লেড়ো-বিস্কুট। এসব হচ্ছেটা কি মাইরি?

যাই হোক না কেন, গোবিন্দর নিরেট মাথায় নিজে নিজে এসব ঢুকবে না। আর সে সেটা জানে বলেই ঢোকাবার কোনো চেষ্টাও করল না। শুধু তার গোব্‌দা হাসিতে বদনমণ্ডল ভাসিয়ে দিয়ে সোনার পাশে ধপাস্ করে বসে পড়ল, আর বসতে গিয়েই এক লাফ—আঁক্।

গোবিন্দ যেখানটায় বসল, ঠিক সেইখানটায় একটু আগেই মনাদা তার হাতের এঁটো গেলাসটি রেখেছে। অবশ্য গেলাসে এখন চা নেই, খালি। এতক্ষণ গেলাসের মধ্যেকার যে তরল বস্তুটি আবহ মণ্ডলে বাষ্প বিতরণ করছিল, সেটি এখন মনাদার ভিতরে ঢুকে তার পাকস্থলি গরম করছে। মুখ হয়ে গলা বুক পেট, তারপর আরো নিচে। একটু পরে লক গেট খোলা পেলেই বেরিয়ে যাবে।

শ্রীমান গোবিন্দ ভূষণ দত্ত পুরকায়স্থ মহাশয় বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে মাঝপথেই যে ভাবে 'আঁক' করে খাড়া হয়ে পড়ল, সেটি দেখার মতো। ভাগ্য বলতে হবে যে গেলাসে তখন ঘনাদার কষকষে গরম চা ছিল না। তাহলে তো হত খোঁচাকে খোঁচা, সঙ্গে ছ্যাঁকা। কী সাংঘাতিক একটি হলেও-হতে-পারত মার্কা কেলেঙ্কারিয়াস্ কাণ্ড।

গোবিন্দর বোকা বোকা মুখের দিকে চেয়ে সোনা কথাটা ভাঙল,—মনাদা আজ একটা ফাউল করেছে। তার ফাইন হচ্ছে এই চা-বিস্কুট।

—কী ফাউল?

—মনাদা আজ কাগজ পড়ে জেনেছে যে আমি মরে গেছি।

—সোনাতো জলজ্যান্ত বেঁচে আছে। ওকে খবরের কাগজের লোক গুলো মরা বানিয়ে দিল?

কি ঝাঁপু মাইরি।

সোনা বলল, আরে খবরের কাগজের লোকদের ঝাঁপু নয়। আসলে মনাদারই বোঝার ভুল। কাগজে লিখেছে লেবুতলার দুষ্কৃতী সোনা পুলিশের গুলি খেয়ে কেলো হয়ে গেছে। মনাদা বুঝেছে আমিই সেই সোনা। মনাদা লেবুতলা আর লেবুপাড়ায় গুলিয়ে ফেলেছে।

—তা সেই লেবুতলার সোনাটাকেই বা পুলিশে ক্যালালো কেন? সে কী করেছিল?

—কিছু একটা করেছে নিশ্চয়। ভাগের টাকা নিয়ে বোধ হয় ঝগড়া হয়েছে। রাগের মাথায় গুলি করে দিয়ে প্রথম রটিয়েছে—সোনাটা দুষ্কৃতী। তাকে গুলি করা হল। 'আবার গুলি করা হল'ও বলবে না। বলবে—গুলি বিনিময়ে দুষ্কৃতী মারা গেল।

দুষ্কৃতী কথাটার মানে গোবিন্দ জানে না। বলল, এই দুস্কিটা কী বস্তু বাবা? উসব ইংরিজি কথা তো বুঝি না। একটু বাংলা করে বল দিকি। দুস্কি হলেই কি পুলিশে গুলি করে মেরে ফেলে? আমি তো দেখেছি কুকুর পাগলা হয়ে গেলে পুলিশের লোকেরা এসে তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। দুস্কিটাও কি ওই রকম একটা ব্যাপার নাকি?

এবারে মনাদার পালা। সোনার কাছে ঝাড় খেয়ে এতক্ষণ মনমরা হয়ে বসেছিল। আর বসে বসে ভাবছিল—বয়সে অন্তত পনেরো বছরের ছোট, এখনো কলকাতার রাস্তাঘাটই ভালো করে চেনে নি, আমি শালা কলকাতা দেখছি ওর থেকে অন্তত পনেরো বছর আগে, আর ওরই কাছে-কিনা এ পাড়া ও পাড়ার নামগুলো গুলিয়ে ফেলে গুবলেট পাকিয়ে গ্যাড়াকলে পড়ে গেলাম। চা-বিস্কুটের পয়সা গেছে যাক, কিন্তু এখন তো ইজ্জতটাই পুরো পাংচার। সেটাকে তো রিপেয়ার করতে হবে। সোনার নানা তড়পানির মধ্যে মনাদা বসে বসে সেই রকম একটা সুযোগ খুঁজছিল। গোবিন্দর কথায় সেই সুযোগ হাতে এসে গেল।

—দুষ্কৃতী বুঝলি না? ওই যে সব বোমাটোমা মারে। রাস্তাঘাটে চুরি ছিনতাই করে। ইসব অবিশ্যি ছোটখাটো কাজ। তাদের আরো অনেক বড় বড় কাজ আছে। প্রমোটারদের তড়পে টাকা আদায় করা, হকারদের থেকে তোলা আদায় করা, বাই চাগাড় দিয়ে উঠলে পথ অবরোধ করা, বাসে আগুন লাগানো, পার্টির মিছিলে লোক জোগাড় করে আনা—এই সমস্ত আরো অনেক সৎকর্ম করে বেড়ায়। এ সবই ওরা করে নেতার হয়ে। আর এইসব কাণ্ড কারখানা করে যে সব মালপত্র গুটানো হয় সেগুলো প্রথমে গিয়ে জমা হয় নেতার ঘরে। তারপর তার থেকে বখরা পায় দুষ্কৃতীরা। এক এক নেতার এক এক দল দুষ্কৃতী। নেতাদের কাজ হল জনসভায় লম্বা লম্বা ভাষণ দেওয়া আর দলের দুষ্কৃতী পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাকে ছাড়িয়ে আনা। ওদিকে আবার দুষ্কৃতীর কাজ হল নেতার হয়ে গুণ্ডাবাজি করা, ছাপ্পা ভোট দিয়ে নেতাকে ভোটে জেতানো আর বোমা মেরে অন্য পার্টির ক্যাডারকে খেদিয়ে দেওয়া। আবার কখনো কখনো নেতার সঙ্গে খটরং হয়ে গেলে ওরা নেতাকেও ঝেঁপে দেয়। ওরা পাড়ার খুব গণ্যমান্য লোক। সবাই এক ডাকে চেনে। ওদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বলেতে সাহস করে না, ওরাই হল দুষ্কৃতী।

গোবিন্দর মাথায় কিছুই ঢুকল না। বোকার মতো মুখ করে মনাদার কথার সঙ্গে জুড়ে দিল,—তারপর একদিন পুলিশের গুলি খেয়ে মরে যায়।

—না না, শুধু পুলিশের গুলি খেয়েই মরবে কেন? নিজেদের মধ্যে আপোসে বোমা খেয়েও মরতে পারে। এই ধর দু'দল দুষ্কৃতীর মধ্যে দাঙ্গা বাধল পাড়ার দখলদারি নিয়ে। এ বলে পাড়াটা আমার, ও বলে আমার। পাড়াটা রণক্ষেত্র হয়ে গেছে, দোকানপাট সব বন্ধ। পাবলিক দরজায় খিল সেঁটে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে যুদ্ধ দেখছে। পুলিশ থানায় বসে অপেক্ষা করছে, যুদ্ধটা কতক্ষণে থামে। যুদ্ধ থামার পর থানা থেকে বেরিয়ে এসে দু'চারটে নিরীহ পথচারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাটকে পুরবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। যুদ্ধ থামার পর দেখা গেল রাস্তার মধ্যিখানে এপক্ষ ওপক্ষের খানকয়েক লাশ পড়ে আছে। ওগুলোই হল দুষ্কৃতীদের লাশ। পুলিশের কাজ হল ওই লাশগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে মর্গে ঢোকানো। এছাড়া আরো আছে। ধর নিজের বোমাটা ছোঁড়ার আগে নিজের হাতেই ফেটে গেল। কিংবা ঘরে বসে বাঁধতে বাঁধতে বোমাটা ফেটে গেল। ব্যস্। নিজের লাশটি নিজে নিজেই ছেত্‌রে গিয়ে কেত্‌রে পড়ল। দুষ্কৃতিরা এ রকম ভাবেও মরে। এ ছাড়া আরো একরকম আছে। সেটাই হল সবচাইতে বীরত্বের মৃত্যু। তার নাম গণধোলাই। জানিস তো, আমাদের দেশটা হল জনগণতান্ত্রিক দেশ। এদেশে গণতান্ত্রিক কাজ বলতে ওই একটাই আছে। আর ওই একটা মাত্র কাজেই জনগণ খুব একতার পরিচয় দেয়। সেটা হল গণধোলাই। একটা দুষ্কৃতীকে মওকা মাফিক হাতের কাছে পেয়ে গেলে জনগণ তাকে কোদাল খোন্তা শাবল কাটারি যে যা পায় তাই দিয়েই পেটাতে থাকে। এর নাম গণতান্ত্রিক ধোলাই কিংবা গণধোলাই। এই গণধোলাই খেয়ে বেঁচে থাকবে এমন বাপের ব্যাটা আজ পর্যন্ত জন্মায় নি। গণধোলাই খেয়ে দুষ্কৃতী মরল মানে তাদের কাজের চাপ একটু কমল।

এতক্ষণে কথাটা গোবিন্দর মাথায় ঢুকল। —অঃ তাই বলো। তা সোজা করে বললেই তো হয়, পাড়ার মাস্তান। দুস্কি মুস্কি উসব রাশিয়ান ভাষা বলার কী দরকার?

গোবিন্দর কথায় মনাদা মুচকি হেসে এমন ভাবে মাথা দোলাতে লাগল যেন সে সতিই কথাটা রাশিয়ান ভাষাতেই বলেছে। তার মানে প্রমাণ হচ্ছে রাশিয়ান ভাষাটা মনাদা ভালোই জানে। আসলে মনের সুখে এতবড় লম্বা একটা ভাষণ দিতে পেরেছে। সোনা মাঝপথে কোনো বাগড়া দিতে পারে নি, সেইটেই আনন্দ। এতক্ষণে মনাদার কালসিটে মেরে যাওয়া মেজাজে একটু আইডিন পড়ল।

সোনার গেলাসের চা ততক্ষণে শেষ। সে গোবিন্দকে ধমক লাগাল, —অ্যাই গোব্‌দা, তোমাকে অত রাশিয়া মাশিয়া বুঝতে হবে না। মুফতে চা পেয়েছ, সেঁটে দাও। বেশি ভ্যানতাড়া মারলে হাতের চা হাফিশ হয়ে যাবে। তখন হাতের তালুতে ধরা গেলাসের চা ব্রহ্মতালুতে ঢালব মাইরি।

ধমক খেয়ে গোবিন্দ চায়ে লম্বা চুমুক মারতে গিয়ে জিব পুড়িয়ে এক প্রস্থ কুচিপুরি নেচে নিল।

দুই

গরম চা পেটে চালান করে গোবিন্দ ঠাণ্ডা হয়ে বসার পরে সোনা বলল, শোন্ গোব্‌দা, একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। মাধব স্যার একটা কাজের ভার দিয়েছে, সেই কাজটা করতে হবে।

সেরেছে! আবার মাধব স্যারের কাজ? গোবিন্দ মুখে কিছু বলল না, কিন্তু মুখটা ঝুলে গেল।

মাধব স্যার ওদের অঙ্ক পড়ায়। বাড়ি থেকে কষে আনার জন্যে বইয়ের পাতায় খান কয়েক করে অঙ্ক দেগে দেয়। গোবিন্দ আজ পর্যন্ত কোনোদিন তার একটা অঙ্কও বাড়ি থেকে কষে নিয়ে গিয়ে ক্লাশে দেখাতে পারে নি। দেখাতে যে পারে নি সেটা ওর নিজের কোনো অবহেলার জন্যে নয়। চেষ্টা ও অনেক করেছে। কিন্তু না পারলে কি করবে? মাথা যে কিছুতেই কাজ করে না। প্রথম প্রথম এজন্যে ওকে মাধব স্যার সারা পিরিয়ড দাঁড় করিয়ে রাখত। কিন্তু কোনো উন্নতি হয় নি। উন্নতি করার আপ্রাণ চেষ্টায় মাধব স্যার বুঝে গেছেন, বেঞ্চ হাইবেঞ্চ তো তুচ্ছ, এমনকি কড়িকাঠে শিকল লাগিয়ে টেনে তুললেও ওর কিসসু হবে না। বড়জোর অবস্থানটুকুই উচ্চ হবে। ওর উন্নতি করতে হলে স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতিকে ডাকা দরকার। কিন্তু দেবগুরুর ঠিকানা কিংবা ফোন নম্বর মাধব স্যারের জানা নেই। হোমটাস্ক না করার জন্য মাধব স্যার গত এক বছর গোবিন্দকে আর কিছু বলছেন না। গোবিন্দ থাকে

গোবিন্দর মতো, মাধব স্যার মাধব স্যারের মতো। কেউ কারো ব্যাপারে নাক গলায় না।

সেই মাধব স্যার এখন আবার সোনার বকলমে কাজের ফরমান পাঠিয়েছেন। গোবিন্দর মুখ ঝুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। ঝুলে যাওয়া মুখ নিয়েই গোবিন্দ মাধব স্যারের উদ্দেশ্যে মনে মনে বলল, কেন গুরু। বেশ তো হাল ছেড়ে দিয়ে আমাকে রেহাই দিয়েছিলে। আবার টানাটানির কী এমন দরকার পড়ল? অঙ্ক আমাকে দিয়ে হবে না। ব্যস্। কথাটা জেনে গেছ, এখন মেনে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তোমারও ঝামেলা বাঁচে, আমিও প্রাণে বাঁচি। গোবিন্দ গোমড়ামুখে চুপচাপ বসে রইল।

গোবিন্দর গোমড়া মুখকে পাত্তা না দিয়ে সোনা বলে চলল, মাস্টারগুলোর মধ্যে একটা ক্যাচড়া লেগে গেছে। ওদের নাকি টিচার কমিটির নির্বাচন আসছে। মাধব স্যার আমার উপর ভার দিয়েছে ওদের দলকে সেই নির্বাচনে জিতিয়ে দিতে হবে।

—যাক্ বাবা। তাহলে অঙ্ক-টঙ্ক নয়। গোবিন্দর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। —কী করতে হবে? বুথ জ্যাম না ছাপ্পা ভোট?

—এখানে ও দুটোর কোনোটাই চলবে না। এ তো আর পাবলিকের ভোট নয় যে দুটো বোম্ ঝেড়ে দিলেই সব শালা ভোটার ধেড়িয়ে যাবে। ভোট দেবে তো গুণে তেইশ জন মাস্টার মশাই। সেখানে আর বুথ জ্যাম্ কী? আসলে কী করতে হবে জানো? ভোটের দিন জনা পাঁচেক মাস্টারকে একটু গুম্ করে দিতে হবে।

গুম্ করার কথা শুনে গোবিন্দ ঘাবড়ে গেল। ইস্। গুমটুম্ করতে গেলে তো পুলিশ কেস হয়ে যাবে মাইরি। পুলিশের ব্যাপার-ট্যাপারে যাবার কী দরকার? শুনেছি পুলিশে ধরলে লকআপে পুরে বড্ড পেটায়।

—না না, ওসব কিচ্ছু হবে না। গুম্ করা মানে তো আর কাউকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে মুক্তিপণ চাওয়া হচ্ছে না। শুধু ভোটের সময়টুকু ওদেরকে কোথাও একটু আটকে রাখা। যাতে ভোট দিতে না পারে। এই ধর সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। তারপর ছেড়ে দিলেই হবে। ওরা ভোট দিতে না পারলেই মাধব স্যারের দল জিতে যাবে।

একটু আগেই একটা ভালো ভাষণ দেওয়ার আনন্দে পাশে বসা মনাদা আবার খবরের কাগজে চোখ দিয়েছিল। চোখ ছিল কাগজে কিন্তু কান ছিল সোনা আর গোবিন্দর ডায়ালগের দিকে। সোনার কথা শুনে আর ধৈর্য ধরতে পারল না। কাগজটা নামিয়ে রেখে বলল, হ্যাঁরে সোনা, তোদের ইস্কুলে মাস্টার তো বলছিস সাকুল্যে তেইশটা। তেইশটা মাস্টারে আবার দল কি র‍্যা? তেইশ জন এক জোট হয়ে কাজ করতে পারে না? শিক্ষকতা অতি মহান কর্ম। দেশ গঠন। দেশের ভবিষ্যত গঠন। ছাত্রদের সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তাদের চরিত্র গঠন করতে হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের পাঠ দিতে হবে। সমস্ত রকম স্বার্থ চিন্তা ত্যাগ করে—

সুযোগ পেয়ে মনাদা আরো কী সব ভালো কথা বলার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। মাঝপথে সোনার দাবড়ানি খেয়ে চুপ করে যেতে হল।

—আরে থামো থামো। খবরের কাগজ পড়ছ আর বুকনি ঝাড়ছ। ওসব ব্রজবুলি শুধু কেতাবে লেখা থাকে মনাদা। আসল জায়গায় ওসব মুষলের দেখা পাওয়া যায় না। এখানে বাবা হিজ্ হিজ্ হুজ্ হুজ্। চরিত্র গঠন টঠন করতে গেলে স্রেফ চেস্তা খেয়ে হেদিয়ে পড়তে হবে।

—তাই বলে মাস্টাররা দল পাকাবে আর ছাত্রদেরকে সেই দলে টানবে? আ-হা-হা, কী শিক্ষাই দেখালি মদন। ছাত্র লাগিয়ে মাস্টার গুম্। মনাদা ব্রজবুলি ছেড়ে সোজা বাংলায় নেমে এল।

—তুমি এখনো 'সিসু' আছ মনাদা, তুমি ওসব বুঝবে না। ওরা সব শিক্ষিত পণ্ডিত লোক। সবাই অনেক কিছু বোঝে আর জানে। আর যে যেটা বোঝে সেটা সে এমনই হাড়ে হাড়ে বোঝে যে সেখান থেকে তাকে একচুল নড়ানো যাবে না। তাই ওরা কেউই অন্য কারো কথা মানে না। ইচ্ছে করলে ওই তেইশ মাস্টারে চব্বিশটা দল তৈরি করতে পারে।

—তেইশটা মাস্টারে চব্বিশটা দল। কী বলছিস্ রে সোনা? ভাগে তো একটা করেও পড়বে না রে। একটা দল পাকাতে অন্তত একটা পুরো লোক তো দরকার।

—আছে আছে, সে সব ব্যবস্থা আছে। এসব হল কঠিন হিসেব। হাই ফাই ব্যাপার। তুমি বুঝবে না। যারা দল তৈরি করে তাদের একটা ভাবমূর্তি থাকে। একজনের একটা দল আর ভাবমূর্তির একটা দল।

গোবিন্দ এতক্ষণ হাঁ করে সোনা আর মনাদার তর্জা শুনছিল। সে নিজে কোন দলে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। এখন আবার সোনার মুখে নতুন একটা কথা শুনে খুব মজা পেয়ে গেল।

—সোনাটা মাঝে মাঝে বেশ একটা করে নতুন নতুন কথা আমদানি করে মাইরি। একটু আগে আমদানি করেছিল দুস্কি, এখন আবার বলছে ভাবমুত্তি।— মানে কি বাবা কথাটার?

—আছে আছে। ভাবমূর্তি বলে একটা কথা এখন মার্কেটে খুব খাচ্ছে। আমিও ব্যাপারটা ঠিক জানি না। ভাবমূর্তির কথাটা মাধব স্যারই বলেছে। নেতা হতে গেলে তাদের নাকি একটা করে ভাবমূর্তি থাকতে হয়। ওই দিয়েই তারা করে খায়। চুরি কিংবা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কথা চাউর হয়ে গেলে যখন খবরের কাগজে খুব লেখালেখি চলতে থাকে, তখন নেতারা বিবৃতি দেয়—তার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে এ সমস্তই বিরুদ্ধ পার্টির ঘৃণ্য অপচেষ্টা মাত্র। তার মানে হল চুরির টাকাটা সে খেয়েছে ঠিকই কিন্তু চুরিটা সে নিজে করেনি। যা কিছু করেছে সব ওই ভাবমূর্তি। এখন পারলে তোমরা ভাবমূর্তিকে ধরে জেলে দাও। আমি বাবা নির্দোষ। মাধব স্যার এ ব্যাপারে অনেক কিছু জানে। তার কাছে আরো ভালো করে জেনে এসে তোমাকে বুঝিয়ে দেবখন। তা সে যাক্‌গে যাক। এখন ওসব কথা ছাড়। আসলে মাস্টারদের এখন চব্বিশটা নয়, দুটোই দল। হেড মাস্টারের দল আর মাধব মাস্টারের দল। এতদিন টিচার কমিটি কব্জা করে রেখেছিল হেড মাস্টারের দল। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ট্রেজারার সবই হেড মাস্টারের দলের লোক। এখন মাধব স্যার চাইছে তাকে হটিয়ে কমিটি কব্জা করবে। মাধব স্যার বলেছে, ওরা টিচার কমিটি কব্জা করতে পারলেই হেড মাস্টারকে সরিয়ে দেবে।

—কেন? সরিয়ে দেবে কেন? হেড মাস্টারের ভাবমূর্তি কি অনেক টাকা চুরি করেছে?

সোনা গোবিন্দর কথার উত্তর দেবার আগেই পাশ থেকে মনাদা আবার ফোড়ন কাটল, হেড মাস্টারকে সরাবে কি রে? হেড মাস্টার কি টিচার কমিটির কাছে চাকরি পেয়েছে নাকি যে টিচার কমিটি ইচ্ছে করলেই তাকে সরিয়ে দেবে? হেড মাস্টার তো চাকরি পেয়েছে তোমার গিয়ে, তোমার গিয়ে—মনাদা আটকে গেল। হেড মাস্টার কোথা থেকে চাকরি পেয়েছে সে তথ্যটা তার জ্ঞানের বাইরে।

—আরে ধ্যুস্। স্যার যার কাছেই চাকরি পাক না, সে চাকরি ছাড়াতে তিন তুড়ির ওয়াস্তা। মাধব স্যার আমাকে বলেছে, হেড স্যারের সব সার্টিফিকেটের কপি তার কাছে আছে। হেড স্যার বলে বেড়ায় সে নাকি ডবল এম. এ.। একটা ডিগ্রি কলকাতার আর একটা ডিগ্রি পুটুনি না কোথাকার কোন ইউনিভার্সিটির।

—পুটনি নয় পাটনা। পাটনা ইউনিভার্সিটি। মনাদা সোনার ভুল শুধরে দিল, আর এতক্ষণ পরে যে সোনার একটা ভুল শোধরাতে পেরেছে সেই আনন্দে মাথায় চুলের ভিতর দিয়ে একবার আঙুল চালিয়ে নিল।

—ওই হল। পুটনি নয় পাটনা। মাধব স্যার বলেছে পাটনা ইউনিভার্সিটিতে টাকা দিয়ে ডিগ্রি কিনতে পাওয়া যায়। হেড স্যার নাকি সেই রকমই

একটা ডিগ্রি কিনে এনেছে। আর তাইতেই সে ডবল এম. এ.। ওই ডবল এম. এ দেখিয়েই সকলকে ডিঙিয়ে হেডস্যার হয়েছে। মাধব স্যারকেও ডিঙিয়েছে ওই ডবল এম. এ ডিগ্রির জোরে। না হলে তো মাধব স্যারেরই হেডস্যার হওয়ার কথা। শুধু কি তাই? মাধব স্যার বলেছে এটাই নাকি সব নয়। আরো ব্যাপার আছে। সেটা আরো ক্যাডাভ্যারাস। আসলে নাকি হেডস্যার মাধ্যমিকেই ফেল। তার মানে হেডস্যারের ডিগ্রি হল, মাধ্যমিক ফেল ডবল এম এ।

কথাটা মনাদা তো মনাদা, গোবিন্দও হজম করতে পারল না। দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল,—ধুস্, তাই কখনো হয়?

—হয় বাবা হয়। মাধব স্যার বলেছে হেডস্যার ভিতর থেকে ব্যবস্থা করে সব দু'নম্বরি সার্টিফিকেট আর ডিগ্রি বার করেছে। আর তাই দিয়েই চুটিয়ে করে যাচ্ছে।

—কী করে করল এসব? প্রশ্নটা গোবিন্দর করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার আগে মনাদার মুখ থেকেই কথাটা বেরিয়ে এল।

—কেন পারবে না? হেডস্যার পার্টির লোক। পার্টি হাতে থাকলে সব কিছু করা যায়।

এরপরে গোবিন্দর পালা।—তার মানে বলছিস পার্টির লোক হলে পাশ টাশ না করেও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়? তাহলে তো আমিও একটা পেতে পারি। আমার বাবা বেশি কিছু এম. এ. বি. এ-র দরকার নেই, শুধু একটা মাধ্যমিকের পাশ সার্টিফিকেট হলেই চলবে। এই সোনা, বল্‌না রে কোথায় কোন পার্টির কাছে যেতে হবে?

—কোন পার্টির কাছে যেতে হবে সেটা আমি কী করে বলব? উসব কাজ করেছে হেডস্যার। তুমি তাকে গিয়েই জিজ্ঞেস করো। তবে ব্যাপারটা যে হয় সেটা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

—তুই চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছিস? কোথায় দেখছিস বল তো? আমি তো কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—কেন? এবারের মাধ্যমিকের রেজাল্ট কী হয়েছে দেখতে পাওনি? দেখা গেছে একটা ছেলে বা মেয়ে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান বাংলা অঙ্ক সবেতেই দশ দশ করে নম্বর পেয়েছে। কেউ কেউ আবার পেয়েছে সব বিষয়েই আঠারো। এছাড়াও আছে। দেখা গেছে একটা ইস্কুলের সব ছাত্র, যারা একটা সেন্টারে পরীক্ষা দিয়েছিল তারা সবাই দল বেঁধে একধারসে অঙ্কে পেয়ে বসে আছে চব্বিশ। আর তাদেরই একজন দলছুট হয়ে অন্য সেন্টারে পরীক্ষা দিয়েছিল, সে পেয়েছে বাহান্ন। বাপুহে, এসব কি বলতে চাও পরীক্ষার খাতার নম্বর? এসব নম্বর খাতা থেকে আসে নি, আসতেই পারে না। তাহলে এল কোত্থেকে?

—কোত্থেকে?

—কোত্থেকে আবার, কেরানির কলম থেকে। দ্যাখ, একটা কেরানির কত কাজ। তার ইউনিয়ন আছে, আন্দোলন আছে। মাইনে বোনাস ডি এ এসব বাড়াবার জন্যে কত মিটিং কত ঘেরাও, কত হুজ্জুতি করতে হয়। তার উপর আছে অফিস টাইমে ক্যারাম খেলা, তাস খেলা, আড্ডা, গুলতানি, এ ওর পেছনে খাঁচি দেওয়া। এসব হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে খাটতে ওরা হেদিয়ে পড়ে। খাটুনি কমাবার জন্যে বাবুরা এগারোটায় ঠিকমতো হাজিরা দিয়ে তিনটে বাজলেই কেটে পড়ে। এর মধ্যে যদি আবার ঠিকমতো দেখে শুনে হিসেব করে তোমার মার্কশিটে ঠিক ঠিক নম্বরটা টুকে তার যোগফলের ঠিক ঠিক হিসেব কষতে হয় তবে তো তাদেরকে তিনগুণ চারগুণ রেটে ওভারটাইম দিতে হবে। সরকার তা দেয় না। তাই তারাও দয়া করে যার যেমন ইচ্ছে তেমনি নম্বর লিখে মার্কশিট ভর্তি করে ছেড়ে দেয়। এখন বুঝতে পারছ তো, এসব বিদ্‌ঘুটে নম্বর কোত্থেকে আসে? এসব নম্বর আসছে কেরানিবাবুদের মাথা থেকে।

সোনার ভাষণ শুনে গোবিন্দ আর এক চোট ঘাবড়ে গেল,—তাহলে উপায়?

—উপায় তো খুবই সোজা। যে ভূত ঘাড় মট্‌কাতে পারে, তাকে হাত করতে পারলে সে অনেক কাজও করে দেবে। যে বাবু একধারসে সব বিষয়ে দশ নম্বর দিতে পারে সে তো আটান্নও দিতে পারে। তোমার পাশ হয়ে যাওয়ার রাস্তা কিলিয়ার।

—দী-ঈ-আইডিয়া।

সোনার ইংরজি শুনে গোবিন্দও একটা ইংরেজি বলে ফেলল, তাহলে বল্ উসব পাটি-ফাটি কিছু নয়। ওই কেরানি বাবুই আসল। ওই বাবুটাকে ধরতে পারলেই সব হয়ে যাবে।

—ওইটাই তো আসল বাম্প হে গোব্‌দা দাদা। ওই বাবুটির কাছে পৌঁছানো অত সোজা নয়। ওখানে পৌঁছতে গেলে তোমাকে পাটির ল্যাজ ধরতে হবে। আজকাল মাইরি পার্টিই সব। মাধব স্যার বলে দিয়েছে পার্টির জপ করো তপ করো, এক মনে পাটির দাদাদের ভজনা করো, সব কিছু পেয়ে যাবে। আর কিছু করতে হবে না।

গোবিন্দ ঠিক করে নিল সে মাধব স্যারের দলে ভিড়বেই। অঙ্ক টঙ্ক না করেই মাধ্যমিক পাশ। মাধব স্যার অঙ্কের স্যার। আবার অঙ্ক না করার স্যারও বটে। গুরু গুরু। আনন্দে গোবিন্দ দাঁড়িয়ে পড়ল। মনের সুখে সেখানেই এক পাক নেচে নিল।

গোবিন্দর ফুর্তিতে জল ঢেলে দিল সোনা,—কিন্তু এদিকে তো বিপদ। বাবু ধরে মাধ্যমিক পাশ করতে হলে পরীক্ষার নম্বরটা তোমার কপালে সেঁটে দিয়ে যাবে? তুমি তো পরীক্ষাতেই বসতে পারছ না। হেডস্যার তো তোমাকে ক্লাশ এইটেই আটকে রেখে দিয়েছে। এরপর নাইন তারপর টেন তারপরে তো মাধ্যমিক।

গোবিন্দ হতাশ হয়ে বসে পড়ল,—তাই তো, তাহলে কী করা যাবে?

—কী আর করা যাবে? হেডস্যারকে তাড়ানো। ওইটাই একমাত্র পথ। মাধব স্যারের কথামতো চললে হেডস্যারকে তাড়াতে বেশি সময় লাগবে না।

—ঠিক। গোবিন্দর মনে আর কোনো সংশয় রইল না। তাকে মাধব স্যারের দলে ভিড়তেই হবে। চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিলে হেডস্যারের কী দুর্গতি হবে সেটা ভেবে গোবিন্দ তার নিজের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

তিন

টিচার্স কমিটির নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই টেম্পো চড়ছে। দু'পক্ষই কোমর বেঁধে তৈরি। মাস্টারদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্। দল ভাঙিয়ে নিজের দিকে লোক টানার চেষ্টা। গুজ্ গুজ্ ফুস্‌ফুসের ডেসিবেল বাড়তে বাড়তে শেষে তর্ক, চিৎকার। তারপর একদিন বারান্দার দেওয়ালে পোস্টার পড়ে গেল। স্পোর্টস্ ফাণ্ডের টাকা নয়ছয় হয়েছে। হেডমাস্টার তার পেয়ারের দোকান থেকে দশ হাজার টাকার খেলার সরঞ্জাম কিনেছে, যার বাজারদর ছ'হাজার টাকার বেশি নয়। ইস্কুলের টিউবওয়েল সারাবার জন্যে এক হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। ওটা আটশো টাকাতেই করা যেত। কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর প্রশ্ন করা হয়েছে—এবছর মাধ্যমিকে ইস্কুলের 'পঁয়তাল্যিশ' জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র পনেরো জন পাশ করল কেন? 'অভীভাবকদের' কাছে 'আভ্যান' জানাই—আপনারা এগিয়ে আসুন। আপনাদের সন্তানরা লেখার 'ভিত্যি'তে 'ভত্যি' হচ্ছে কেন? শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে কেন? আপনারা 'কর্ত্রীপক্ষের' কাছে জবাব দাবি 'করুণ'।

অবস্থা অতীব করুণ। আ মরি বাংলা ভাষার কী বিচিত্র চীনা বানান! পড়লে মনে হবে লেখক মশাই পেচিং থেকে বাংলায় ডক্টরেট করে এসেছেন। নিচে যদিও কারো নাম নেই। তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না কাদের লেখা।

স্কুলে ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত সাড়ে চারশো ছেলে। তারা সবাই বারান্দায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে পোস্টার পড়ছে। কী সুন্দর রঙচঙে তুলির টানে

সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা। স্কুল শুরুর ঘণ্টা বেজে গেল, তবুও তাদের ক্লাশে যাবার চাড় নেই। পোস্টার পড়ছে আর হি হি করে হাসছে।

ছেলেদের দলের মধ্যেই এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সোনা, গোবিন্দ, আর ওদের একেবারে ঘনিষ্ঠ হোসেন-মণ্টু-এবং শোহ্‌রাবের দল। তারা কিন্তু স্পিক্‌টি নট্‌। মাধব স্যারের মানা আছে। কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায় এটা কাদের লেখা। কিন্তু যতই ছেলেদের হাসি শুনছে ততই নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছে। লেখাগুলো জব্বর হয়েছে মাইরি। ওয়াল ম্যাগাজিনে গল্প-টল্প লেখার চেয়ে এসব লেখাই ভালো। অনেক বেশি পাঠক পাওয়া যায়।

ও পক্ষও চুপচাপ বসে রইল না। পরদিন তাদেরও উল্টো পোস্টার।— যে তিরিশজন ফেল করেছে তাদের বেশির ভাগ তো অঙ্কেই ফেল করেছে। তাহলে ছাত্রদের ফেল হবার জন্য দায়ী কে? অভিযোগকারীরা 'আত্যসমালোচনা' করে দেখুক। টিউবওয়েল সারাই -এর 'মিস্তি'কে ডেকে এনেছিল ইস্কুলের 'শেক্রেটারী'। তার অনুগত জনেরা জবাবদিহিটা তার কাছেই চাইছে না কেন? ইস্কুলের টিউবওয়েল সারাবার সময় 'শেক্রেটারির' ঘরের টিউবওয়েলটাও সারানো হয়েছে। দুয়ে দুয়ে চার হয়, এটা কি শিক্ষিত জনদের আবার নতুন করে 'সেখাতে' হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিনে বাংলার উত্তরে জাপানি বাংলা।

সেদিনও সেইরকম ভিড় করে ছাত্রদের পোস্টার পড়া আর হি হি হাসি। সেদিনও সোনাদের মতোই লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কয়েকজন ছাত্র নিজেরা নিজেদের পিঠ চাপড়ে নিল। —বাঃ রে আমরা।

এমনি করে খেলাটা ঠিক জমে ওঠার মাথায়, নির্বাচনের দিন দশেক আগে স্কুলে পর পর কয়েকটা বজ্রাঘাত। একেবারে ভিতশুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল।

দুপুরবেলা স্কুল চলছে। হঠাৎ একটা জিপ এসে দাঁড়াল স্কুলের গেটে। জিপ থেকে নামল থানার মেজবাবু। —হেডমাস্টার কে আছেন?

সর্বনাশ। স্কুলে পুলিশ কেন?

স্কুলে পুলিশ ঢুকলে শিক্ষাক্ষেত্রের পবিত্রতা নষ্ট হয়—এসব ব্রজবুলি চালু ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আমলে। এখন কথাগুলো বস্তাপচা হয়ে গেছে। পুলিশ এখন স্কুলে ইচ্ছামতো যায়, ইচ্ছামতো আসে। রোখে কার বাপের সাধ্যি। শুধু কি তাই? আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশকে প্রায়ই আসতে হয়। ছাত্র ভর্তির সময় ভিড় সামলাতে, পরীক্ষার সময় টোকাটুকি করা ছাত্রের হাতে পিটুনি খাওয়ার থেকে গার্ডকে বাঁচাতে, হেড মাস্টারকে বশম্বদ ছাত্রদের ঘেরাও থেকে মুক্ত করতে, ছাত্রদের ইউনিয়নের নির্বাচনের দিন দু'দল মারমুখী ছাত্রকে লাঠিপেটা করতে—ইত্যাদি আরো অনেক মহৎ কর্ম করার জন্যে পুলিশের প্রায়ই ডাক পড়ে।

কিন্তু আজ তো পুলিশকে ডাকা হয়নি। তাহলে পুলিশ এল কেন? হেড মাস্টার তারকবাবুর বুকটা কেঁপে উঠল। লুকিয়ে চুরিয়ে করা কাজকর্মের কোনো হিসাব-কিতাব তো নেই। তার কোনটা আবার পুলিশের কাছে চুক্‌লি হয়ে গেল রে বাবা? তারকবাবু মনে মনে তাঁর দাদাকে স্মরণ করলেন।

এ দাদা সে দাদা নয়। মায়ের পেটে জন্মানো পেটতুতো দাদা নয়, পার্টিতুতো দাদা। দাদার হাত ধরেই তারকবাবু মাঠে খেলতে নেমেছেন। দাদার আশীর্বাদে অনেককে লেঙ্গি মেরে হেড মাস্টার হয়েছেন। দাদার হাত ধরেই আরো উপরে ওঠার আশা আছে। দাদার হাত অনেক লম্বা। তারক বাবু লুকিয়ে চুরিয়ে আজ পর্যন্ত যত কালো কালো কাজকর্ম করেছেন এবং ভবিষ্যতে করার আশা রাখেন, সে সমস্ত কিছুই দাদা এক তুড়িতে সাদা করে দেবার হিম্মত রাখে। তারকবাবু মাঠে নামার পর বাবার কাছে শেখা মাতৃ-পিতৃ বন্দনার মন্ত্র-টন্ত্র গুলো সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। এখন শুধু দাদা বন্দনা। দাদা ভজো, দাদা জপো লহ দাদার নাম রে। এ মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্রেরও বাড়া। ত্রিসন্ধ্যা জপ করলে সর্ব কাজে সিদ্ধি।

দাদাকে স্মরণ করলে কি হবে, তারকবাবু এটাও জানেন যে পুলিশ বড় ঘোড়েল চিজ্‌। বেজায় আঠা। শুধু চটচটেই নয়, বিষাক্তও বটে। একেবার ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। একবার পুলিশের খপ্পরে পড়েছ কি ছত্রিশ নম্বর ঘায়ে লাগাবার মলমটি পর্যন্ত আগেভাগে হাতের কাছে মজুত রাখতে হবে। সেই পুলিশ স্কুলে এসেছে। নিশ্চয় কিছু না কিছু একটা খবর পেয়েই এসেছে। এখন কত খসবে কে জানে?

মেজবাবু গটমট করে হেঁটে গিয়ে হেড মাস্টারের ঘরে ঢুকলেন। খটমট করে চেয়ার টেনে বসলেন, ঠকাস্‌ করে মাথার টুপিটা টেবিলের উপরে রাখলেন। তারপর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। তারকবাবু চুপচাপ সেটা দেখলেন, আর মেজবাবু এরপর কী বলেন সেটা শোনার জন্যে সিটিয়ে বসে রইলেন।

—দেখুন হেড মাস্টার মশাই, আমি একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছি। উপর থেকে হুকুম এসেছে পুলিশকে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। জনসংযোগ মানে বুঝলেন কিছু?

—না, ঠিক বুঝলাম না।

—আমিও বুঝিনি। আমাকে বড়বাবু যেরকম যেরকম বলে দিয়েছেন আমিও সেইরকম সেইরকম বলছি। পুলিশের খুব দুর্নাম হয়েছে যে তাদের যতকিছু সম্পর্ক সে শুধু চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমায়েস তোলাবাজ-প্রমোটার আর নেতাদের সঙ্গে। পাড়ার ভদ্র শিক্ষিত নিরীহ ভালোমানুষদের সঙ্গে নাকি তাদের কোনো আলাপ-মোলাকাৎ নেই। এই দুর্নাম ঘুচাবার জন্যে মন্ত্রীর হুকুম হয়েছে পুলিশকে পাড়ার ভদ্রলোকদের সঙ্গেও আলাপ করতে হবে। সেটাই জন সংযোগ। এখন সে জন সংযোগটা কী করে করা যায়? একটা পথ হল, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলা—নমস্কার মাসিমা-মেসোমশাই, এই এলুম খবরাখবর নিতে। আপনাদের উপকারের জন্যে আমরা আছি। রাত-বিরেতে দরকার হলে ডাকবেন। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। তাতে একটা পাড়া শেষ করতেই বছর ঘুরে যাবে।

—আর সেই একবছর চোর-ডাকাত ধরা বন্ধ থাকবে? কী সাংঘাতিক কথা। চোর ডাকাতদের তো পোয়া বারো।

—না না, আমরা সে পথে যাচ্ছি না। এর জন্য অন্য একটা পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী মশাই প্রথমে হুকুম দিয়েছিলেন পাড়ার ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল খেলতে হবে। সে খেলা হয়েওছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলাটা ভণ্ডুল হয়ে গিয়ে একটা মারদাঙ্গা বেধে গেছ্‌ল। তাই এবারে ঠিক হয়েছে পাড়ার ইস্কুলে গান-বাজনার আসর বসানো হবে। সাংস্কৃতিক উৎসব। পাড়ায় যে ক'টা ইস্কুল আছে তার মধ্যে আমরা আপনার ইস্কুলটাকেই বেছে নিয়েছি। আপনার ইস্কুলে আমরা একটা গানবাজনার ফাংশন করব। আপনি ব্যবস্থা করুন।

তারকবাবু বুঝে নিলেন এটা একটা মস্ত বড় সুযোগ। এটাকে হাতছাড়া করা চলবে না। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ এ তো খুব ভালো কথা স্যার। আপনারা মাঝে মাঝে আমাদের দিকে নজর দেবেন সেটাই তো আমরা চাই। আপনাদের সাহায্য সহানুভূতি থাকলে আমাদের পক্ষে কাজকর্ম করার খুব সুবিধেই হয়। এখানকার পৌর কমিশনার, এম এল এ, পার্টির লোকাল কমিটির সেক্রেটারি—সবাই আমাকে চেনেন। সকলের সঙ্গেই আমার লাইন করা আছে। এখন আপনাদের সঙ্গে—বলতে বলতেই তারকবাবু থমকে গেলেন। ইস। কথাটা বেফাঁস হয়ে গেল। এরকম ভেতরের কথা প্রথম মোলাকাতেই থানার মেজবাবুকে বলাটা ঠিক হল না। মেজবাবু কী মনে করলেন কে জানে।

মেজবাবু কি মনে করলেন সেটা তখন-তখনই বোঝা গেল না। তবে ওঁর কথার উত্তরে মেজবাবু যা বললেন সেটা শুনে তারকবাবুর সারা গায়ে

একটা শিহরণ বয়ে গেল।

—আমাকে স্যার স্যার করবেন না স্যার। আমি আপনার ছাত্র। এই ইস্কুল থেকেই পাশ করেছি। আপনি তখন হেড মাস্টার ছিলেন না। হেড মাস্টার ছিলেন শক্তিবাবু। আপনি আমাদের ইতিহাস আর ভূগোল পড়াতেন।

তারকবাবুর গায়ে তো শিহরণ বয়ে যাওয়ারই কথা। নিজের ছাত্র থানার মেজবাবু। কাঁধে দু-দুখানা করে তারা চিহ্ন! এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কী হতে পারে? তারকবাবুর ছাতি ফুলে উঠল। কিন্তু এর পরেই মেজোবাবু যে কথাটা বললেন তাতে ফোলা বেলুন চুপসে তো গেলই, গায়ের সব লোমও খাড়া হয়ে উঠল।

—মনে আছে স্যার, একদিন বোর্ডে আপনার একটা উলঙ্গ ছবি এঁকেছিলাম বলে আপনি আমাকে খুব পিটিয়ে ছিলেন? আমি তখন ক্লাশ সেভেনে পড়তাম।

সেদিনের কথাটা তারকবাবুর মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, একবার এরকম একটা দোষের জন্যে পিটেছিলেন বটে একটা ছেলেকে। সে তো আজ থেকে দশ বারো বছর আগের কথা। ইস্! সেই ছেলেটাই সামনে বসে আছে? তারকবাবুর মেজবাবুর মুখের সঙ্গে সেই ছেলেটার মুখটা মেলাবার চেষ্টা করলেন। খুব একটা মেলাতে পারলেন না। শুধু মনে পড়ছে সেই ছেলেটা ছিল বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার। এখন সামনে বসে আছে একটা মুস্কো পুলিশ অফিসার। গাঁট্টাগোট্টা তো বটেই। সেই সঙ্গে গোঁফ যা একখানা বানিয়েছে —দেখলেও ভয় লাগে।

তারকবাবুর বুক কেঁপে উঠল। সেদিন তো ছেলেটাকে পিটেছিলেন মনের আনন্দে, হাতের সুখে। আজ যদি সে তার বদলা নেয়? যে কোনো একটা অজুহাত খাড়া করে একবার লকআপে নিয়ে গিয়ে ঢোকাতে পারলেই হল। তারপর তার হাতের সুখ করতে বাধা দেয় কে? কিংবা এও হতে পারে, সেদিন একটা উলঙ্গ ছবি এঁকেই মজা করেছিল। আজ হয়ত সত্যি সত্যিই কাজটা করে বসল। কিছুই অসম্ভব নয়। তখন ছিল কৈশোরের ছটফটানি। এখন তো যৌবনের তড়পানি। সেই সঙ্গে পুলিশের উর্দির চমকানি। সোনায় সোহাগা। এখন আর ওকে আটকায় কে?

নাঃ। এসব আজেবাজে চিন্তার কোনো মানে হয় না। মেজবাবু ওসবের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। বললেন, তাহলে স্যার এখন একটা ফাংশনের ব্যবস্থা করুন। নাচ-গান-জলসা হবে। ছাত্ররাও অংশ নেবে, পুলিশও অংশ নেবে। আবার বাইরে থেকেও আর্টিস্ট আনা হবে। টাকা-পয়সার জন্যে কিছু চিন্তা করতে হবে না। আমাদের সরকারি গ্রান্ট আছে।

এ কথায় আপত্তি করার কোনো প্রশ্ন নেই। কথা নয় তো, আদেশ। মেজবাবুই বা কী করবে? তার উপরেও তো উপর থেকে উপদেশের নামে আদেশই এসেছে। উপরওয়ালা আবার আদেশ পেয়েছে খোদ মন্ত্রীর কাছে। এসব উপদেশ অমান্য করা যায় না।'

ওইখানে বসেই ঠিক হয়ে গেল টিচার্স কমিটির নির্বাচন আর অ্যানুয়েল পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ফাংশন করা হবে। পরে একদিন সকলকে নিয়ে মিটিং করে আরো বিস্তৃত ভাবে প্রোগ্রাম ঠিক করা হবে।

কেস পাকা করে হাতের ব্যাটন ঘোরাতে ঘোরাতে মেজবাবু জিপে গিয়ে উঠলেন। আর তারকবাবু ভাবতে বসলেন মেজবাবুর সঙ্গে এই নূতন গড়া দহরম-মহরমটা কেমন করে কাজে লাগানো যায়। মোটের উপর এক কালের ছাত্র তো বটে।

এটা গেল প্রথম ঘটনা। বজ্রাঘাত ঠিক নয়। তবে ঘটনা একটা বটে। প্রথম ধাক্কায় চমকে দিয়েছিল তারকবাবুর পিলে আর তারপরেই চমক লাগিয়ে দিল্-এ। জয় মা ভাগ্যদেবী।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল পরদিন। সত্যি সত্যিই বজ্রাঘাত। ক্লাস সিক্স-এ পড়াচ্ছিলেন হেমাঙ্গবাবু। ভদ্রলোকের উঁচাই সাড়ে চার ফুট, বুকের মাপ চৌত্রিশ, ওজন পঁয়তাল্লিশ কেজি, চোখের পাওয়ার সাড়ে তিন হলে কি হবে, মেজাজে রাবণ। এক পাতা ইংরেজি লিখতে বানান-টেন্স্-সিনট্যাক্স কনটেক্সট্-অ্যাপ্রোপ্রিয়েট-প্রিপোজিশন্ মিলিয়ে চৌত্রিশটা ভুল করেন। ভুল ধরিয়ে দিলে গ্রেটা গার্বোর পোজে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, ইংরেজি আমার মাতৃভাষা নয়। ক্লাসে মাতৃভাষা বাংলা পড়াতে পড়াতেই অ্যাইসা খচে গেলেন যে টেবিল থেকে বোর্ড মোছার ডাস্টারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলেন একটি বেতমিজ ছাত্রের মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু বেচারা হেমাঙ্গবাবু। ধমনীতে রয্যাল বেঙ্গল মারা বীর শিকারির রক্ত। কাকটা দেখে মারল তির, বকটা গেল মরে। কাঠের উপরে পশম সাঁটা ভারি ডাস্টারটা গিয়ে লাগল পাশের ছেলেটার চশমায়। চশমা ভেঙে কাঁচ ঢুকে গেল চোখের মধ্যে। হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ চিৎকার। রক্তারক্তি। ডাক্তার-হাসপাতাল-গার্জেনদের গর্জন। ছাত্রদের বয়কট।

শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসব। উৎসবের মত্ততায় সবাই মাতোয়ারা। কুরুক্ষেত্রে পার্টি ছিল দুটো। এখানে অনেকগুলো। পক্ষের শিক্ষক, বিপক্ষের শিক্ষক। পক্ষের ছাত্র বিপক্ষের ছাত্র। মারমুখী অভিভাবক ঘাবড়ে-যাওয়া ভীতু অভিভাবক। তাদের সকলেরই আবার কিছু বাম কিছু ডান। আর সেই সঙ্গে নৈবেদ্যের মাথায় পঁচাকাঁঠালি কলা মার্কা সর্বঘটে মোড়লি করা কিছু জনপ্রতিনিধি। সবাই নিজের নিজের কথা বলতে চায় কিন্তু কারো কথা শুনতে চায় না। সবাই নিজের নিজের প্রতাপ দেখাতে চায় কিন্তু কেউ কারো প্রতাপ মানতে চায় না। সব মিলিয়ে একটি আগাপাশতলা হবি ঘোষের গোয়াল। আবহ সংবাদ হলে বলা যেত ঘনীভূত নিম্নচাপ রেখা এবং তজ্জনিত প্রবল বর্ষণ।

তিনদিন ধরে ঘনীভূত নিম্নচাপের প্রবল বর্ষণ শেষ হবার পর আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক সাইক্লোন। এবারে স্কুলের ভেতরে নয়, গেটের বাইরে। সাইক্লোনটা বাইরে হলে কি হবে, ঝাপ্টাটা ধেয়ে এল ভেতর পর্যন্ত।

চার

এবারে যে সাইক্লোনটা ধেয়ে এল তার শুরু কিছুদিন আগে থেকে। স্কুলের একমাত্র কেরানি কাম ক্যাশিয়ার ইদ্রিশ এই স্কুল থেকেই ফেল। তার মানে এই স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে চৌকাঠ ডিঙোতে পারে নি। একবার, দু'বার, তিনবার। তিনবারই হোঁচট খেয়ে হুমড়ি। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে কাউন্সিলারকে ধরে এই স্কুলে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে।

চাকরিটা ইদ্রিশ ভালোই করছিল। নিয়মিত হাজিরা, নিয়মিত কাজ। স্কুলের শিক্ষকদের রোগ হল কামাই করা, দেরি করে স্কুলে আসা আর নিয়মিত ক্লাশ না নিয়ে আড্ডা মারা। এসব রোগ ইদ্রিশের ছিল না। কিন্তু তাজ্জব। ক্যাশবুক গোঁজামিলে ভর্তি। ছাত্রদের কাছ থেকে বিল্ডিং ফী ডেভেলাপমেন্ট ফী স্পোর্টস্ ফী ইত্যাদি বাবদ যত টাকা আদায় হয়েছে তার কোনো হদিশ নেই। খরচ যা কিছু দেখানো আছে তার রশিদ নেই। গাদাগুচ্ছের ফল্স্ ভাউচার। কেরানিবাবুর নিয়মিত অফিসে হাজিরা দেওয়ার আর ঘাড় গুঁজে কাজ করার কারণটা এতদিনে বোঝা গেল।

ইন্সপেক্টর কড়া রিপোর্ট দিলেন স্কুল বোর্ডে। ফলে ইদ্রিশের চাকরি চলে গেল।

কিন্তু কেরানি ছাড়া তো স্কুল চলতে পারে না। স্কুলে শিক্ষক না থাকলেও চলে, ক্লাস না হলেও চলে, কিন্তু কেরানি না হলে স্কুল চলবে না। হিসেবে গোঁজামিল দেবে কে?

স্কুলবোর্ড থেকে নিয়োগপত্রদিয়ে নতুন লোককে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সরকারি আইন মেনে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে তবে এই চাকরি। এই দুর্দিনের বাজারে একটা চাকরি বলে কথা। নিয়োগপত্র হাতে নাচতে নাচতে বিভাস এল কাজে যোগ দিতে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কাজে যোগ

দেওয়া আর সে বেচারির হল না।

স্কুলের গেটের সামনে জনা ছ'সাত ছোকরা দাঁড়িয়েছিল। বিভাসকে আটকাল— কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি এই স্কুলে কাজ পেয়েছি। কাজে যোগ দিতে যাচ্ছি।

—কাজে যোগ দেওয়া হবে না।

—কেন? আমার হাতে নিয়োগপত্র আছে।

—কই? দেখি।

নিয়োগপত্রটা হাতে নিয়ে সেই রুস্তম ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

—এসব কী করছেন? গুণ্ডামি নাকি?

—হ্যাঁ গুণ্ডামি। পেছন থেকে একজন এসে কলারটা চেপে ধরল। সামনে পেছনে কয়েকজন মিলে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। রাস্তার ধারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ওকে সেই দিকে নিয়ে চলল।

বেচারা বিভাস প্রথমটা থমকে গেল। তারপর একটু ধাতস্থ হয়েই 'ছাড়ুন ছাড়ুন' বলে চিৎকার।

—চোপ্। একটা কথা বললে জানে মেরে দেব।

বিভাস আর কথা বলবে কি, গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল খেতে পেলে হত। মা, একটু জল খাব। মা কোথায়, কত দূরে জলের গেলাস হাতে নিয়ে কে জানে। বিভাসের জল খাওয়া হল না।

ট্যাক্সির দরজা খুলে ছোকরাগুলো ওকে সীটের উপর ছুঁড়ে দিল। তারপর সবাই গাদাগাদি করে গাড়ির ভেতর ঢুকে বসল। একজন ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল,—চালাও।

কিন্তু কে শোনে ওদের 'চালাও'। ড্রাইভারের সীট খালি।

ড্রাইভার তার গাড়িতে বসে বসেই ছুপা-রুস্তমদের কাজ-কারবার দেখছিল। কয়েকজন মিলে একটা লোককে চ্যাংদোলা করে তুলে ওর গাড়ির দিকে আসছে দেখেই ও ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়েছে। নির্ঘাৎ অপহরণের কেস। এটাই এখন কলকাতায় খুব চলছে। কয়েকজন লোক একটা লোককে গাড়িতে ওঠায়। আশপাশের লোকগুলো তখন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। কিছু দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। শুধু কোনো কার্যকারণ গতিকে যদি বোমা পড়ে তখন দৌড়ে পালাবার জন্য তিন পায়ে খাড়া।

ড্রাইভারের হিসাব মতে লোকগুলো এখন ওর গাড়িতে চাপবে, কানের নিচে রিভলবার ঠেকাবে আর ওইরকম রিভলবার ঠেকানো অবস্থাতেই ওকে কাঁহা কাঁহা মুলুক ঘুরে মরতে হবে। কেস গাড্ডুম হয়ে যাবে।

লোকগুলো যখন একদিকের দরজা খুলে বিভাসকে গাড়িতে ঢোকাচ্ছে ড্রাইভার ততক্ষণে অন্যদিকের দরজা খুলে দৌড়।—শালা গাড়ি যায় যাক। নিজের প্রাণটা তো বাঁচাই। একটু দূরে রাস্তার ধারে একটা চায়ের গুমটিতে খদ্দেরদের ভিড়ে মিশে গিয়ে ওখান থেকেই নজর করতে লাগল, লোকগুলো কী করে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার দূর থেকে দেখল ওদেরই একজন ড্রাইভারের সীটে বসে গাড়িটা স্টার্ট দিল। তারপরে হু-ম্-ম্- করে বেরিয়ে গেল। —ইস্। মহা বোকামি হয়ে গেছে। চাবিটা ড্যাশ্‌বোর্ডেই ঢোকানো ছিল। তাড়াতাড়ির মাথায় খুলে নিয়ে আসা হয় নি।

সমস্ত অপারেশন সারতে সময় লাগল মেরেকেটে পাঁচ মিনিট। কী সব ট্রেনিং নেওয়া লোক। কলকাতার গুণ্ডা নয় তো, যেন সার্কাস পার্টি। মন্ত্রের মতো নিঃশব্দে কাজ হয়। গেটের বাইরে যে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল সেটা স্কুলের ভেতরে থাকা মাস্টার আর ছাত্ররা তো বুঝতে পারলই না এমনকি রাস্তার লোকগুলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব কাজ ফিনিশ আর গাড়ি সুদ্ধ সব্বাই ভ্যানিশ।

চায়ের দোকানদারটা অবশ্য ছোকরাগুলোকে চিনত। ওদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আগেই আন্দাজ করেছিল, কিছু একটা হবে। ওরা গাড়ি নিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যাবার পর বিড় বিড় করে বলল—ওই। আর একটা অপহরণ হয়ে গেল। কথাটা দোকানদার অবশ্য বলল অন্য সকলের কান বাঁচিয়ে। পুলিশ এসে জেরা আরম্ভ করলে তাকে বলতেই হবে—আমি স্যার কিছু দেখিনি, কিচ্ছুটি শুনিনি।

গোবিন্দটার ভাগ্য খারাপ। একটুর জন্যে ফস্‌কে গেল। স্কুলের ভেতরে না থেকে সে যদি ওই সময়ে ওইখানটায় থাকত তবে নিজের চোখে হাতে গরম তাজা দুস্কি দেখতে পেত। এক-আধটা নয়। একসঙ্গে অনেককটা। তার তো দুস্কি দেখার খুব শখ।

পাঁচ

হেড মাস্টার তারকবাবু ব্যাপারটা জানতে পারলেন পরদিন সকালে। নিজের ঘরে ঢুকে সবে একটু গুছিয়ে বসেছেন, মেজবাবু এসে ঢুকলেন হাতের লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে। মেজবাবুকে দেখে তারকবাবু আবার ঘাবড়ে গেলেন। এই তো কদিন আগে কথাবার্তা বলে গেল, আজ আবার কী জন্যে এল।

মেজবাবুকে দেখে তারকবাবু উঠে দাঁড়াতে গেলেন। তারপরই মনে পড়ে গেল এই ছোকরা তাঁরই ছাত্র। অনেক কষ্টে চেয়ারের সঙ্গে নিজের পাছাটা সেঁটে রাখলেন। মুখে একটা শুকনো হাসির আস্তর টেনে বললেন, আসুন, মানে আর কি, এসো।

মেজবাবু আগের দিনের মতোই খটমট করে চেয়ার টানলেন। ধমাশ্ করে বসলেন। খটাশ্ করে মাথার টুপিটা টেবিলে রাখলেন। তারপর হাতের লাঠিটা দিয়ে ধাঁই করে একটা ঠোক্কর মারলেন। তারকবাবু চমকে উঠলেন। আজ মেজবাবুর মেজাজ খাট্টা, মুখ গম্ভীর।

—আপনার স্কুলের গেটের সামনে কাল কী হয়েছে?

তারকবাবু তো তো করতে লাগলেন। গেটের সামনে আবার কী হল? উনি যতদূর জানেন গেটের সামনে অনেকগুলো পোস্টার সাঁটা আছে। তার কতকগুলো মাধববাবুর দলের ছেলেদের কাজ আর কতকগুলো মেরেছে তাঁরই শেখানো মতো শেখর মানোয়ার আর রতনের দল। তা সে সব নিয়ে কোনো মারামারি হয়েছে বলে তো কোনো খবর নেই। হলে নিশ্চয় তিনি জানতে পারতেন। তারকবাবু মেজবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। কথা অবশ্য উনি চেষ্টা করলেও বলতে পারতেন না। গলাটা শুকিয়ে এমনই কাঠ হয়ে গেছে যে সেখান দিয়ে কোনো কথা বেরনোর উপায় নেই। ঠেলে কথা বের করতে গেলে নির্ঘাৎ ব্যাঙের ডাকের মতো শোনাবে।

—আপনার স্কুলে বিভাস বলে একটা ছোকরা কেরানির চাকরি পেয়েছে?

—হ্যাঁ, তা তো পেয়েছে। আমি নিয়োগপত্রের কপিটা পেয়েছি। কিন্তু সে ছোকরা তো এখনো কাজে যোগ দেয় নি।

—দেবে কী করে? সে কাল এসেছিল কাজে যোগ দিতে। তাকে তো স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। গেটের কাছ থেকেই উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কে এসব কাজ করেছে?

—ক্-ক্-কে?

—কে করেছে সেটা আমি ধরে ফেলেছি। এটা রশিদের দলের কীর্তি। ওদেরকে কেউ টাকা খাইয়ে এসব কাণ্ড করিয়েছে। টাকা দিলেই ওরা এসব কাণ্ড করে বেড়ায়। ওরা তো আসলে যাকে বলে ভাড়াটে গুণ্ডা।

—তারপর কি হয়েছে?

—তারপর কি হয়েছে সেটা তো আপনারই ভালো জানার কথা।

—আ-আমি কি করে জানব? মেজবাবুর কথাটা তারকবাবুর কানে বেসুরো বাজল। উনি খুবই ধুরন্ধর ব্যক্তি। 'ক' বললে বুটের ডাল বুঝে

নেন। মেজবাবু যে একটা কিছু ঘোবালো ধান্ধা নিয়ে এসেছেন সেটা বুঝতে পেরে জিবেব আগায় লাগাম টেনে দিলেন। আগ বাড়িয়ে কোনো কথা না বলে চুপচাপ মেজবাবুর কথা শুনে যেতে লাগলেন।

—দেখুন স্যার, রশিদের কাজ গুণ্ডামি করা। সে গুণ্ডামি করবে, লোককে তুলে নিয়ে যাবে, গুম্ করে দেবে, দরকাব পড়লে লাশ হাপিস করে দেবে। গুণ্ডা গুণ্ডার কাজ করবে, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। এগুলো আমাদের চোখে কোনো অপরাধ নয়। ওসব গুণ্ডামি কী করে ফয়সলা করতে হয় সে সব আমাদের আলাদা বোঝাপড়া আছে। সেখানে আমাদের কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। আমাদের চোখে সে-ই হল আসল অপরাধী, যে সেই গুণ্ডাকে টাকা দিয়ে ভাড়া করে, বিশেষ করে আমাদের না জানিয়ে। কেউ গুণ্ডাকে টাকা দিয়ে ভাড়া করল, অথচ আমরা জানতে পারলাম না। সব টাকাটা সেই গুণ্ডাই নিয়ে চলে গেল? আমরা কী থানায় হরিনাম জপ করার জন্য বসে আছি?

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কথাটা উস্‌কে দেবার জন্যই বলা। মেজবাবু তারকবাবুব দিকে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে থেকে তারপর বললেন, —বুঝতে পারছেন না? বুঝিয়ে দিচ্ছি। স্কুলবোর্ড থেকে নিয়োগ পত্র পেয়ে কাল সেই ছোকবা আপনাব স্কুলে কাজে যোগ দিতে এসেছিল। ওই পোস্টটায় আগে কাজ করত ইদ্রিশ, যে আপনাবই এক পুরনো ছাত্র। তার চাকরিটা গেছে টাকা-পযসা তছরুপেব দায়ে। এখন বিভাসকে কাজে যোগ দিতে না দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল। রশিদের ডেরায় একটা ঘরে ঢুকিয়ে তাকে খুব তড়পানো হল। একটু মালিশও হল। তিনঘণ্টা একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখাব পর তাকে ছেড়ে দেবার সময় বলে দেওয়া হল, আর কোনোদিন এমুখো হলে তাকে জানে খতম করে দেওয়া হবে। সে ছোকবা বেপাড়ার ছেলে। ভয় পেয়ে কেটে পড়েছে। আর কোনোদিন এমুখো হবে না। এবার বুঝতে পেরেছেন স্যার, কী হয়েছে?

তাবকবাবু চুপচাপ বসে বইলেন। ঘুড়ির সুতো ছেড়ে যাও, যতক্ষণ না লাট খেতে শুরু করে।

মেজবাবু বলে চললেন,—ব্যাপারটা যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত, তাহলে আমাদের মাথা ঘামাতে হত না। ওবকম কেস দু'বেলা আকছাব ঘটছে। পুলিশেব পাওনা না পেলেও ওরকম দুটো একটা কেস আমরা ক্ষমা ঘেন্না কবে ছেড়েই দিই। কিন্তু কেসটা জোরালো কবে তুলেছে ওই ছোকরা। ওর দাদা নাকি একজন উকিল। তাব নিরেট মাথায় আইনের কচকচি চাগাড় দিয়ে উঠেছে। কোথায় কোথায় সব সুপাবিশ ধরে ধরে সে আমাদেব গোয়েন্দা দপ্তরের খোদ বড়সায়েবের কাছে দববাব করেছে। বড়সায়েবের কাছ থেকে ওয়্যাবলেসে থানায় খবর এসেছে, এক্ষুনি তদন্ত কবে রিপোর্ট দিতে হবে আর সেই গুণ্ডাগুলোকে অ্যাবেস্ট কবতে হবে।

মেসেজ পেয়ে বড়বাবু খুব খেপে গেছেন। থানা কিছু জানল না শুনল না আর থানাব এক্তিয়ারের মধ্যেই এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল? আবার সেটা খোদ বড়সায়েবের কানে উঠে গেল? এ তো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া। বড়বাবু এসব একদম সহ্য করতে রাজি নন। উনি আমাব উপর ভার দিয়েছেন রশিদের দলকে কে ভাড়া করেছে সেটা খুঁজে বার করতে। আমি সেই জন্যে আপনার কাছে এলাম।

—আমার কাছে? আমি কী করতে পাবি?

—আপনাকে কিছু কবতে হবে না স্যাব। শুধু কী করেছেন সেটা বলে দেবেন, আমি বড়বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করব। আমি এই স্কুলেরই ছাত্র। তাই আমার মুখ চেয়ে বড়বাবু এবারের মতো আপনাকে মাফ কবে দিতে পারেন।

—আমি তো বুঝতে পারছি না আমি এর মধ্যে কী করলাম।

—আপনি তো স্যার ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। দেখুন স্যার, ক্রাইম ডিটেকশনের জন্য আমাদের একটা বিশেষ সূত্র নিয়ে এগোতে হয়। আমবা এখন জানতে চাই কে রশিদেব দলকে ভাড়া করেছিল। সেটা বার করার পর আমরা সেইমতো কেস সাজাব। তাতে বশিদেব দলের দুটো-একটাব নামও থাকবে। রশিদেব সঙ্গে আমাদের আলাদা বোঝাপড়া আছে। তাই কেসটা এমনভাবে সাজানো হবে যে ওবা ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু জামিন পাবে না সেই লোকটি যে ওদেরকে ভাড়া কবেছিল। এখন এক্ষেত্রে আমাদেব প্রাইম সাস্‌পেক্ট হচ্ছেন আপনি।

কোনো পুলিশ অফিসারের মুখে সোজাসুজি নিজেকে প্রাইম সাস্‌পেক্ট শোনার পর অতিবড় পোড় খাওয়া পাকা অপরাধীরাও মনে মনে কেঁপে যায়। তাবকবাবু যথেষ্ট শক্ত লোক হলেও আসলে তো একজন শিক্ষক। জাত অপবাধী তো নন। তাই মেজবাবুব কথাটা শুনে তাঁর সাবা শবীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

সর্বনাশ। লোকটা বলে কী! কোথাকার কে কাকে অপহরণ কবল আর পুলিশ এসে লাগল ওঁরই পেছনে? তাবকবাবু মনে মনে তাঁর রাজনৈতিক দাদাকে স্মবণ কবে সাহস ফিরে পাবার চেষ্টা করলেন। প্রথমটা ঘাবড়ে গেলে এতক্ষণ কথাবার্তা বলাব পব তাঁব জো ফি এসেছে। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে পিছোতে পিছো যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকেই যায় তখন ঘু দাঁড়ানো ছাড়া কোনো রাস্তা থাকে না।

তারকবাবু মনে মনে ভাবলেন—ও, ব্যাপার? এরই জন্যে এত থানাই-পানাই? তা দেখা যাক কে কতখানি খেলতে পারে। কাব ল কত শক্ত। এ ছোকরা জানেই না তাঁর হা কতখানি লম্বা। ভেবেছে সামান্য হেড মাস্টাব, আর কদ্দুর যেতে পারবে। কিন্তু হেড মাস্টার উনি এমনি এমনি হননি। অনেক আবাটায় খোঁ বাঁধতে হয়েছে, দাদা ধরতে হয়েছে। যাই হোক এখন দেখা যাক এই ছোকরাকে ওব বড়বা কতখানি এগোবার হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছে। ওবে বাজিয়ে দেখার জন্যে খুবই নিবাসক্ত গলা বললেন—,আমাকে প্রাইম সাসপেক্ট ভাবাব কারণ

—কারণটা খুব সোজা। এক নম্বর হচ্ছে ইদ্রিশ ছিল আপনার হাতের লোক। ওকে দিয়েই আপনি খাতাপত্রে গোঁজামিলেব কাজগুলো চালাতেন। সে চলে গেলে আপনাব কাজে ক্ষতি। তই আপনি চান না যে ইদ্রিশের জায়গায় অন কেউ আসুক। দু'নম্বর এই যে, ঘটনাটা ঘটেছে অথচ আপনি থানায় কোনো এফ.আই.আর করলেন না। অন্তত কেস সাজাবার জন্যেও আপনার একটা এফ আই আর করা উচিত ছিল। আপনি ভাবলেন থানার হিস্যাটা না দিয়ে পার পেয়ে যাবেন। কিন্তু স্যার জেনে রাখবেন, এই থানার এক্তিয়ারেব মধ্যে এমন কোনো অপকর্ম দুষ্কর্ম হয় না, যেটা বড়বাবুব জ্ঞানের বাইরে। তা সে যাক্‌গে যাক্‌। আপনাব নিজের প্ল্যান মাফিক যা কিছু করেছেন। এখন যদি বড়বাবুর সঙ্গে রফায় না আসেন তবে আপনার কেস কিন্তু খুব একটা সুবিধেব থাকবে না স্যার।

—প্রাইম সাসপেক্ট তো ইদ্রিশকেও ভাবা যেতে পারত, আব সেটাই তো স্বাভাবিক।

—আপনি হাসালেন স্যাব। ইদ্রিশকে সাসপেক্ট বানিয়ে কী লাভ? সে ক'পযসা দিতে পারবে? আসা-যাওয়াব খরচটাও তো উঠবে না। আপনার সঙ্গে ডীল কবলে তবু কিছু একটা আশা আছে। বড়বাবু অনেক ভেবেচিন্তেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

ওঃ। তাই বলো। ক'দিন আগে এসে অত হেসে হেসে কথা বলে গেলে। কত স্যার স্যার কবলে। আর আজ তুমি আমাকে চিনতে পাবছ না। চিনতে পাবছ না, কেন না ঘুযেব গন্ধ আছে। আর শুধু তোমাকেই বা দোষ দিই কেন? তোমার লাইনের রেওয়াজই এই। ঘুযেব গন্ধ পেলে পুলিশ তার বাপকেও চিনতে পারে না। কথাগুলে

মল্লিক ব্রাদার্সের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী

কোরআন শরীফ ১২০৲
ড. ওসমান গনী অনূদিত

দ্য স্পিরিট অব ইসলাম ১২৫৲
মূল : স্যর সৈয়দ আমীর আলী
ভাষান্তর : ডঃ রশীদুল আলম

ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন ৩৫৲
মূল : ড. মুহাম্মদ ইকবাল
ভাষান্তর : সেখ ইলাহী বখশ

ইসলামে রেনেসাঁ ৪০৲
মূল : আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ)
ভাষান্তর : আবদুর রাকিব

তাহাজ্জুদ : কল্যাণ ও গুরুত্ব ৪০৲
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল কাইউম

মৃত্যুর পর কি হবে? ৫০৲
মূল : মাওলানা আশিক ইলাহি বুলন্দশাহ্‌রী
ভাষান্তর : আবদুর রাকিব

কিয়ামত কবে আসবে? ২০৲
মূল : মাওলানা আশিক ইলাহি বুলন্দশাহরী
ভাষান্তর : মুহম্মদ জালালউদ্দিন বিশ্বাস

শান্তির ধর্ম ২৫৲
মূল : ইশতিয়াক হুসাইন কুরেশী
ভাষান্তর : জয়ন্ত সিংহ

আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম? ৪৫৲
আবুল হোসেন ভট্টাচার্য

পারসি, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ৪৫৲
মূল : এ.এইচ.বিদ্যার্থী ও ইউ.আলী
ভাষান্তর : সোমমৌলি অধিকারী ও সিদ্ধার্থ মজুমদার

নবীদের জীবনকথা ৩০৲
শেখ নূরুল হক

মহানবীর রণাঙ্গন ও রণকৌশল ২৫৲
চৌধুরী আবদুর রহিম

সংগ্রামী নায়ক
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ৩৫৲
আবদুর রাকিব

এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন ১৩০৲
মূল : সৈয়দ আমীর আলী
ভাষান্তর : হাবিব আহসান

আরব জাতির ইতিহাস ২৫০৲
মূল : ফিলিপ কে. হিট্টি
সম্পাদনা : তন্ময় ভট্টাচার্য

খলিফাদের ইতিহাস ১৫০৲
মূল : আল্লামা জালালউদ্দিন আস-সুয়ূতী (রাহঃ)
ইংরেজি : মেজর এইচ. এস. জ্যারেট
বাংলা : এম. মনিরুজ্জামান

আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ ২৫
ডঃ সুনীলকান্তি দে

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান ৪০৲
শান্তিময় রায়

ইসলাম ও ভারতীয় সংস্কৃতি ৩০৲
মূল : ডঃ বি. এন. পাণ্ডে
ভাষান্তর : আবদুর রাকিব

হিন্দুত্ব ও ইসলাম ৩৫৲
মূল : মুরতাহিন বিল্লাহ ফাজলি
ভাবান্তর : মনিরুদ্দিন খান

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ৫০
ড. মুসা কালিম

আওরঙ্গজেব : ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম ৭০৲
শেখ আজিবুল হক

সোস্যাল স্ট্রাকচার অব ইসলাম ১২৫৲
মূল : রুবেন লেভী
ভাষান্তর : আবদুর রাকিব

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাসমস্যা ৫০৲
মূল : এম. কে. এ. সিদ্দিকী
ভাষান্তর : আবদুর রউফ

প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ৪০৲
সুরজিৎ দাশগুপ্ত

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম মৌলবাদ ৪০৲
গৌতম রায়

আল-কোরআন ও বিজ্ঞান ৪০৲
ডঃ আতোয়ার রহমান

তারকবাবু মুখে বললেন না মনে মনে ভাবলেন। তারপর কোনো কথা না বলে টেলিফোনটা টেনে নিয়ে বোতাম টিপতে আরম্ভ করলেন। আর মেজবাবু সেটা দেখতে লাগলেন।

—হ্যালো তপনদা, আমি তারক বলছি।

এতক্ষণ মেজবাবুর কথাগুলো বেসুরো বাজছিল তারকবাবুর কানে। এখন তারকবাবুর কথাটা বেসুরো লাগল মেজবাবুর কানে। তপনদা মানে? তপন বাঁড়ুয্যে নাকি? ওই লোকটা তো পার্টির জেলা কমিটির সেক্রেটারি। কথাটা অবশ্য মেজবাবু মুখে বললেন না। চুপচাপ তারকবাবু কী বলেন সেটা শোনার জন্যে কান খাড়া করে রইলেন।

—তপনদা, এখানের থানার মেজবাবু আমার স্কুলে এসে বসে আছে। ব্যাপারটা হয়েছে কি, কাল একটা লোক স্কুলে কেরানির কাজে যোগ দেওয়ার জন্যে এসেছিল। তাকে স্কুলের গেটের বাইরে থেকেই কারা যেন তুলে নিয়ে গিয়ে খুন করার হুমকি দিয়েছে। এখন থানার ও.সি. আমার কাছে মেজবাবুকে পাঠিয়েছে। মাল খেতে চাইছে। আপনি একটু কমিশনার সাহেবকে বলে দিন তো। আসল কালপ্রিটকে ধরার মুরোদ নেই, টাকা খাবার জন্যে ছুক্ ছুক্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারকবাবু ফোনটা রাখতে রাখতেই মেজবাবু উঠে দাঁড়িয়েছে। অবস্থাটা আঁচ করতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি।—আপনি স্যার এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে একেবারে কমিশনার সাহেব পর্যন্ত চলে গেলেন? এটা তো লোকালি মিটিয়ে নেওয়া যেত।

—হ্যাঁ যেত। তুমি বসো। তোমার ও.সি. এখনই তোমাকে ফোন করবে। তারকবাবুর কথা এখন আর ভাববাচ্যে নেই। আপনি আজ্ঞেতেও নেই। সোজাসুজি কর্তৃবাচ্যে। মেজবাবু যে তাঁর ছাত্র।

—ঠিক আছে স্যার, আমি যাচ্ছি। কেসটা আমরা অন্যভাবে সাজাচ্ছি। আপনি স্যার কিছু ভাববেন না। মেজবাবু একটা লম্বা স্যালুট মেরে বেরিয়ে গেলেন।

তারকবাবু মনে মনে হাসলেন। হেড মাস্টার হয়ে স্কুল চালাতে হলে শুধু জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে কিছু হয় না। হাত লম্বা হতে হয়। সুতো টানার এলেম থাকা চাই।

ছয়

পরের দিন যে বজ্রাঘাতটা এল তার ডেসিবেল আবার অনেক বেশি। ডেসিবেল তো নয় যেন ডেকাবেল। এ বেলের শব্দ বাইরে শোনা গেল না, কিন্তু অন্তঃকরণে পড়ল হাতুড়ির ঘা।

বেলা বারোটা নাগাদ স্কুলের সেক্রেটারি বিজনবাবু সঙ্গে একজন ভদ্রলোককে নিয়ে এসে ঢুকলেন তারকবাবুর ঘরে।

—তারকবাবু, এই ভদ্রলোক এসেছেন।

তারকবাবু খাতায় লেখালেখি করছিলেন। মুখ তুললেন,—কী ব্যাপার?

সঙ্গের ভদ্রলোক নমস্কার করে হাসি-হাসি মুখে তারকবাবুর দিকে হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিলেন। তারকবাবু হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে চোখ বুলোতে লাগলেন। অর্ধেকটা পড়তে না পড়তেই, মুখের হাসি তো মিলিয়ে গেল, গলাও শুকিয়ে কাঠ।

কাগজটা ওই ভদ্রলোকের নিয়োগপত্র। নিয়োগপত্র দিয়েছেন স্কুলের জেলা পরিদর্শক। ভদ্রলোকের নাম বিমান দত্ত। ওঁকে এই স্কুলের হেড মাস্টার পদে নিয়োগ করা হল। ঠিক 'নিয়োগ করা হল' নয়, নিয়োগের জন্যে সুপারিশ করে পাঠানো হল। তবে এইরকম সুপারিশের পর নিয়োগ আর আটকানো যায় না, সেটা সবাই জানে।

অনেকদিন ধরেই এই স্কুলে হেড মাস্টার নেই। তারকবাবু কাজ করছেন টিচার ইনচার্জ হিসেবে। এই স্কুলটাই এমন কিছু একটা ব্যতিক্রম নয়। এরকম হেড মাস্টার না থাকা স্কুল দেশে এক-আধটা নয়, অনেক। স্কুল চলছে হেড ছাড়া। তার মানে এক-একটি কবন্ধ। জ্যোতিষের ভাষায়—কেতু। এরকম হবার হেতু একটা নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা জানে শুধু নেতারা। যাদের সুতোর টানে এটা হয়।

এর মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশন স্কুলে স্কুলে হেডমাস্টার নিয়োগের জন্য একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। যদিও সেই পরীক্ষায় পাশ করেছিল সাকুল্যে শতকরা পাঁচ জন তবু তারই মধ্যে বিমানবাবুর শিকেটা ছিঁড়ে গেছিল। কিন্তু পাশ করলে কী হবে? স্কুল সার্ভিস কমিশনের নানা টালবাহানা। পাশ করেও বিমানবাবু চাকরি আর পান না। শেষে উনি গেছিলেন আদালতে। আদালত সব শুনে রায় দিয়েছে বিমানবাবুকে চাকরি দিতে হবে। আদালতের আদেশমতোই জেলা স্কুল পরিদর্শক নিয়োগপত্র দিয়ে বিমানবাবুকে এই স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রথম চট্‌কায় তারকবাবু ঘাবড়ে গেলেন। উনি একবছর ধরে স্কুলের টিচার ইনচার্জ—অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক। ভেবেছিলেন এরকম করেই চালিয়ে নেবেন। আর কোনো একটি শুভদিনে স্থায়ীও হয়ে যাবেন। কিন্তু মাঝের থেকে এ কি এক উটকো ঝামেলা। এতদিন প্রধান শিক্ষক থেকে এখন আর সহকারী শিক্ষক হয়ে কাজ করা কি সম্ভব?

ওঁর অগোচরে তলে তলে যে এরকম একটা ব্যাপার ঘটছিল উনি তার কিছুই আঁচ করতে পারেন নি। পারলে তদ্বির-তাগাদা দিয়ে নিয়োগটা রদ করে দিতেন। কিন্তু এখন কেস তো পুরো জণ্ডিস হয়ে বসে আছে। তার উপরে আবার লোকটাকে সঙ্গে করে এনেছে বিজনবাবু নিজে। বিজনবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। ভদ্রলোকের সঙ্গে তারকবাবুর সম্পর্কটা আদায়-কাঁচকলায়। তারকবাবু বিজনবাবু দু'জনের দু'রকম রং।

এদেশের এই এক তামাসা। দেশের লোকের গায়ের যা রং, তাতে তো বৃটিশরা ডাকত ব্লাডি নিগার বলে। কালো চামড়ার নিগ্রোদের থেকে নিজেদের রঙের কৌলীন্য বজায় রাখার জন্যে নিজেদেরকে হলুদ চামড়ার লোক বলে খুব ঢাকঢোল পেটানো হয়। আসলে তো সবাই এক একটি শ্যামসুন্দর। এরই মধ্যে দেশটা স্বাধীন হবার পর থেকে একটা নতুন উপসর্গ শুরু হয়েছে। লাল নীল গৈরিক সবুজ নানা রঙের লোকেরা সব দলে দলে ভাগ হয়ে পড়েছে।

গায়ের রং নয়, মনের রং। আর এই রং নিয়েই লেগে গেছে মারামারি। কেউ কারুকে সহ্য করতে পারে না। রং মাখা মুখ নিয়ে বীর হনুমানের দল হুপ্ হুপ্ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সবাই ভাবছে তার মুখের রংটাই সবচেয়ে ভালো। আসলে ভালো নয়, কালো। ঝিম্ কালো। নানা স্ক্যাম্ কেলেঙ্কারির আগুনে একেবারে আগাপাশতলা পোড়া। এই সার্কাসটাকে তামাশাও বলা যায় আবার আমাশাও বলা যায়। কিছুতেই পরিষ্কার হয় না।

আজ বিজনবাবু বিমানবাবুকে নিয়োগপত্র সহ একেবারে সঙ্গে করে এনেছেন, যাতে তারকবাবু কোনোরকম বেগড়বাঁই করার সুযোগ না পান। মনের ভাবখানা—আজ তারকবাবুকে চেয়ার থেকে হটিয়ে তবে যাবেন।

অত সহজ পাত্তর অবশ্য তারকবাবু নন। উনি গম্ভীর মুখে হাতের কাগজটা বিমানবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—এটা তো আপনার কপি। স্কুল কমিটির কপিটা কোথায়? আমারা তো পাইনি।

বিমানবাবু বললেন,—এটার একটা জেরক্স করে নিলেই হবে। আমাকে এই স্কুলে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। আমি এখন কাজে যোগ দিতে চাই।

তারকবাবুর ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি খেলে গেল।—আপনি স্কুল কমিটির কপিটা নিয়ে আসুন। স্কুল কমিটিতে সেটা জমা দিন। তারপর দেখা যাবে আপনি কাজে যোগ দেবেন কি দেবেন না।

পাশ থেকে বিজনবাবু বললেন,—সেটা আবার কী কথা? উনি ওঁর নিয়োগপত্র নিয়ে এসে দেখাচ্ছেন। আপনি ওঁকে চার্জ বুঝিয়ে দিন।

তারকবাবু বিজনবাবুর দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে বললেন,—সব কাজই আইন মেনে করতে হয়। উনি জেলা পরিদর্শকের একটা চিঠি নিয়ে চলে এলেন আর হেড মাস্টার পদে যোগ দিলেন, সেটা হয় না।

—কেন হয় না?

—এই স্কুলে সব টিচারদের নিয়োগ করা হয় স্কুল কমিটি থেকে। উনি জেলা পরিদর্শকের চিঠি এনে জমা দিলে পর স্কুল কমিটি সেটা বিচার বিবেচনা করবে। স্কুল কমিটি যদি ওঁকে যোগ্য বিবেচনা করে তবে স্কুল কমিটিই ওঁকে নিয়োগ করবে। তখন উনি চার্জ নেবেন।

বিজনবাবু পাঁকে ডুবে যাচ্ছেন। এই পাঁক পরিষ্কার করতে এখন অনেক নোংরা ঘাঁটতে হবে। প্রথম বেলচাটা মারলেন—আমি তো সেক্রেটারি। উনি আমাকেই চিঠিটা দিচ্ছেন। আমি বলছি, আপনি ওঁকে চার্জ বুঝিয়ে দিন।

—আপনি একা বললে তো হবে না। স্কুল কমিটি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেবে, তবেই সেই মতো কাজ হবে। একা কেউ কিছু বলতে পারে না। আর আপনি যেমন সেক্রেটারি, আমিও তেমনি অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি। দায়িত্ব আমারও আছে।

—তাহলে আপনি স্কুল কমিটির মিটিং ডাকুন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

—মিটিং ডাকার দেরি আছে। আর দশদিন পরে স্কুল কমিটির নির্বাচন। তার আগে তড়িঘড়ি মিটিং করে এসব পদ্ধতিগত ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। যা কিছু করার করবে নতুন স্কুল কমিটি। ততদিন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

তারকবাবুর অঙ্কটা খুব পরিষ্কার। এই ভদ্রলোককে কিছুতেই স্কুলে হেড মাস্টার হয়ে গেড়ে বসতে দেওয়া হবে না। এটা ওটা বাহানা করে যত পারা যায় দেরি করতে হবে। এর মধ্যে কায়দা কানুন করে ওই নিয়োগপত্রটা বাতিল করাতে হবে। কিংবা ভদ্রলোককে অন্য কোনো স্কুলে 'সান্টিং' করে দিতে হবে। তপনদা তো হাতে আছেই। তারপর আছে কোর্ট। ভদ্রলোক কোর্টের রায় হাতে নিয়ে এসেছেন। তাতে কি? আরো কত কোর্ট আছে। বাপের বাপ, তস্য বাপ। সব কোর্টে ঘুরতে ঘুরতে ভদ্রলোক বুড়ো হয়ে যাবে। কোথায় খাপ খুলতে এসেছ বাছাধন। তারক মিত্তিরকে এখনো চিনতে বাকি আছে। ছোটবেলার সেই গেঁয়ো ছড়াটা মনে পড়ে গেল। চৌকিদারের পো, তোমায় ম্যাজিক দেখাব। তারকবাবু মনে মনে একটু হেসে নিলেন।

বিজনবাবু ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন,—দেখুন তারকবাবু, আপনি কিন্তু বেআইনি কাজ করছেন। কোর্টের হুকুমে ভদ্রলোককে স্কুল বোর্ড চাকরিতে বহাল করেছে। আপনি তাকে কাজে যোগ দিতে বাধা দেওয়া মানে আদালত অবমাননা। এর জন্যে আপনাকে পরে পস্তাতে হতে পারে।

—আমাকে আইন দেখিয়ে কোনো লাভ নেই বিজনবাবু। কোর্টের কেসে আমি কোথাও কোনো প্রতিবাদী ছিলাম না। তাই কোর্টের রায়ে কোথাও আমার উপপর চার্জ বুঝিয়ে দেবার কোনো নির্দেশ নেই। উনি পারলে হেড মাস্টারগিরি করুন না। কে বাধা দিচ্ছে?

বিজনবাবুর কাছে এ কথার কোনো উত্তর নেই। আমতা আমতা করে বললেন,—আপনি ওঁকে আলমারির চাবিটাবিগুলো তো দেবেন?

তারকবাবুর ঠোঁটে আবার সেই বাঁকা হাসি,—আপনাকে তো আগেই বলেছি, এই অর্ডারটা স্কুল কমিটির রেজোলিউশন আকারে পাশ হয়ে আসতে হবে। বৃথাই কথা বাড়াচ্ছেন।

থমথমে মুখে বিজনবাবু আর বিমানবাবু বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বিমানবাবু বলে গেলেন—আমি কোর্টের হুকুমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। সেই হিসেবমতোই কাল আসব কাজে যোগ দিতে। আমার জয়নিং রিপোর্টটা আমি জেলা স্কুল পরিদর্শককেই পাঠিয়ে দেব। কাজে যোগ দিতে পারি ভালো, না হলে সেটা তখন দেখা যাবে।

কথাটা তারকবাবু নিলেন চ্যালেঞ্জ হিসাবে। আর ওই যে বিজনবাবু আলমারির চাবিটাবিগুলোর কথা বলে গেলেন, ওতেই তারকবাবু পেয়ে গেলেন তাঁর ইতিকর্তব্যের দিশা। —পাগলা পোল নাড়াস্‌নি।—ভালো মনে করে দিয়েছিস ভোলা।

ওদিকে ততক্ষণে মাধববাবুদের গোপন মিটিং শুরু হয়ে গেছে। নতুন হেড মাস্টার কাজে যোগ দিতে এসে ফিরে গেছে এই খবরটা জানতে আর কারো বাকি নেই। এসব খবর বাতাসের আগে দৌড়য়।

তারকবাবুকে হেডমাস্টারি ছাড়তে হচ্ছে, এটা মাধববাবুদের কাছে একটা সুসংবাদ। কিন্তু আরো একটু তলিয়ে বিচার করে ওঁরা বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা আপাতত সুসংবাদ মনে হলেও মোটেই সুসংবাদ নয়। বরং রীতিমতো দুঃসংবাদ।

কারণ?

কারণ নতুন স্থায়ী হেডমাস্টার এসে গেলে অস্থায়ী হেডমাস্টার তারকবাবুর কুর্সি যাবে ঠিকই কিন্তু মাধববাবুদের গুড়েও তো কচকচে বালি। যে কুর্সিটি নিয়ে ওঁদের মুরগি-লড়াই চলছে সেটাই তো নেপোয় মেরে নিয়ে চলে যাবে। তাহলে উপায়? উপায় একটাই। ওই ভদ্রলোককে কাজে যোগ দিতে দেওয়া চলবে না। ওই ভদ্রলোক তারকবাবু মাধবাবুদের সাধারণ শত্রু—কমন এনিমি।

ভদ্রলোককে আটকাবার জন্যে তারকবাবু আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা মাধববাবুরাও চান। তবে এখনই তারকবাবুর হয়ে কিছু বলতে যাওয়ার দরকার নেই। দূরে দাঁড়িয়ে দেখা যাক খেল কদ্দুর গড়ায়। ঠিক সময়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিলেই চলবে।

পরদিন তারকবাবু বিমানবাবু দু'জনেই এলেন। যথাসময়ের একটু এদিক ওদিক। বিমানবাবু আগেভাগে এসে বসে পড়েছেন হেড মাস্টারের চেয়ারে। কিন্তু ওই বসাই সার। সমস্ত আলমারির চাবি তারকবাবুর হাতে। আর স্কুলের যাবতীয় কাগজপত্র আলমারিতে। এমনকি যে সব জিনিসগুলো সাধারণত বাইরেই থাকে সেগুলোও আজ আলমারিতে চাবিবন্ধ। মায় ছাত্রদের রোলকলের খাতা। পাগলাকে পোল নাড়াতে বারণ করার অবধারিত ফলশ্রুতি।

স্কুলের ঘণ্টা পড়ল। ক্লাসে যাবার আগে শিক্ষকরা এলেন রোল কলের খাতা নেবার জন্য। কিন্তু আলমারি খোলা গেল না। তারকবাবু বললেন,— হেড মাস্টারের চেয়ারে বসতে না পেলে আলমারির চাবি দেওয়ার প্রশ্নই নেই। শিক্ষকরা সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন হেড মাস্টারের টেবিল ঘিরে। দাঁড়িয়ে রইলেন তো দাঁড়িয়ে রইলেন। কারো কিছু করার নেই। একটি পরমপক্ক অচল অবস্থা।

অবস্থাটা অচল কিন্তু নীরব নয়। শিক্ষকরা সবাই শিক্ষিত এবং জ্ঞানী। অন্তত নিজেদেরকে তাই মনে করেন। আর যা কিছুর অভাব থাক তত্ত্বজ্ঞানের কোনো অভাব নেই। সবাই সব কিছু বোঝেন। যিনি যা বোঝেন তিনি সেটা অপরকে বোঝাতে চান। কিন্তু কেউই অপরের কথা বুঝতে চান না। তাই কথা চালাচালির ডেসিবেল বাড়তে লাগল। বাড়তে বাড়তে স্কুলময় ছড়িয়ে গেল।

ছাত্ররাও তো ওইসব শিক্ষকেরই ছাত্র। তারাও কিছু কম যায় না। শুধু কি তাই? তাদের দু'পক্ষকেই আগে থেকে পাম্প দিয়ে ফুলিয়ে ফিট করা আছে। তাদের মধ্যেও শুরু হয়ে গেল কথা চালাচালি, বচসা আর শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে স্লোগান।

দাবী আদায়ের স্লোগান।—স্কুলে ক্লাস অবিলম্বে আরম্ভ করতে হবে, করতে হবে। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা চলবে না, চলবে না। শিক্ষা ভিক্ষা নয়। শিক্ষার চোরাকারবারীদের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। এই সমস্ত।

সেসব স্লোগান যথেষ্ট উজ্জীবক তো বটেই সেই সঙ্গে ভাষার কি বাঁধুনি। শুনলে মনে হবে

রীতিমতো সাহিত্যিক ডেকে বরাত দিয়ে স্লোগানগুলো বানানো হয়েছে।

এদেশে স্লোগানই একমাত্র গান যা 'স্লো' তো নয়ই বরং যথেষ্ট বেগবান। মূর্তিমান বিভীষিকা। কানে এলে গান শোনার আনন্দ গঙ্গাসাগর পাব হয়ে বঙ্গসাগরে গিয়ে পড়ে আর মনের মধ্যে চাগাড় দিয়ে ওঠে রীতিমতো আতঙ্ক।

মূর্তিমান বিভীষিকারা দল বেঁধে এসে ঢুকল টিচার্স কমনরুমে। জলের কুঁজো, কাচের গ্লাস, আসবাবপত্র চেয়াব টেবিল লণ্ডভণ্ড। দেওয়ালে টাঙানো ছিল বিদ্যাসাগর আব আশুতোষ মুখুজ্যের দুটো ফটো। সে দুটোও নিমেষে চুরমার। এই লোকদুটোই যত নষ্টেব গোড়া। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বড্ড কোমর বেঁধে লেগেছিল। এখন খাও তাব ঠেলা। মরেও নিস্তার নেই। ছবিতেই গদাঘাত।

ছাত্রদল বলে কথা।

আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল।

যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন আমবা পশি নীল অতল।

আহা! বিদ্রোহী কবি কানে কানে কী মন্ত্রই ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। কী তার উত্তেজনা, কী সাংঘাতিক উদ্দীপনা। উদ্দীপনার ঠেলায সমস্ত স্কুলবাড়িটাই অতলে তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা। প্রথম ঠেলাতেই দ্বিতল থেকে কয়েকটা বেঞ্চি-চেয়ার মাধ্যাকর্ষণের স্বাভাবিক নিয়মে ধরাতলে নেমে এসে তাদের নিজস্ব আকার অবয়ব সব কিছু হারিয়ে জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়ে গেল।

দ্বিতীয দফায় সেই জ্বালানি কাঠে অগ্নি প্রজ্বলিত হল। আ-হা-হা। অগ্নি নয় তো, জ্ঞানের দীপশিখা। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িযে ফেলে আগুন জ্বালো।

প্রধান শিক্ষকের ঘরের মধ্যে চলেছে সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই, আব বাইবে সারা স্কুল জুড়ে চলেছে গজ কচ্ছপের আখড়াই। প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ। এব নাম মার্গীয তত্ত্বদর্শন। মার্কসীয় অন্তকর্ষণও বলা যায়। শেষ অব্দি লাঙল চালিয়ে চায করে সার কথাটি বার কবে এনেছে, লড়াই লড়াই লড়াই চাই। লড়াই করে বাঁচতে চাই।

লড়াই করে সবাই বাঁচে। বাঁচে না শুধু মানব সম্পদ উন্নয়নেব কারখানা নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।

স্কুল অনির্দিষ্ট কালেব জন্যে ছুটি হযে গেল।

সাত

এবারে খেলাটা চলে গেল অন্য কোর্টে। ঠিক যেন সাবডিভিশনাল জুডিশিযাল ম্যাজিস্ট্রেটেব কোর্ট থেকে জেলা জজেব সেশন কোর্টে। দুটো কোর্টেব চালচিত্র একই বকম। তবে ধাবে ভাবে সেশন কোর্ট অনেকটা এগিযে। সেশন জাজ ফাঁসিব হুকুম দিতে পারে। তবে আইন-আদালতেব উপমার মধ্যে না যাওয়াই ভালো। ওদিকের আঠাটা বড্ড বেশি চট্‌চটে। একবার লেগে গেলে টেনে ছাড়ানো মুস্কিল। বরং বলা যাক খেলাটা চলে গেল কলকাতার সাউথ ক্লাবের লনটেনিস কোর্ট থেকে লণ্ডনেব উইম্বলড টেনিস কোর্টে। আসলে ছোট মাঠ থেকে বড মাঠ। ছাত্রপ্রীতিব শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনীতিব যুদ্ধক্ষেত্র।

খেলার ধরনটাও বদলে গেল। এতদিন চলছিল পাশাব দান। এবাব শুরু হল দাবার চাল। পাশায় থাকে অন্যেব ঘুঁটির পাশ কাটিয়ে নিজের ঘুঁটি সাজিযে আনাব ধান্ধা। কিন্তু দাবাব চাল হল দাবিয়ে রাখার রণহুঙ্কার। কিস্তি দাও, মাত কবো। নইলে নিজেই মাত হযে যেতে হবে। মাবো নযত মবো। দাবা বলে কথা। দ্যাবা পৃথিব্যোবিদমন্তবং হি। দাবাব দাবড়ানির চোটে পৃথিবীতে মন্বন্তব।

অবশ্য পাশাটাকেও খুব একটা ছোট করে দেখা উচিত হবে না। পাশা যথেষ্ট মর্মান্তিক খেলা। এই পাশাব দানে হেবে গিযেই পঞ্চপাণ্ডবকে বাজ্য ছেড়ে প্রথমে বনবাসে তাবপরে অজ্ঞাতবাসে যেতে হয়েছিল। শুধু কী তাই! এই পাশার দানে হেরে গিয়েই পাঁচ পাঁচটা মহাবীবেব একমাত্র আদরের বৌয়েব যে চরম বেইজ্জতি হতে যাচ্ছিল সেটা সামাল দেবার জন্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে হাতের চক্রটক্র ফেলে দিয়ে থান থান কাপড়ের বোঁচকা বগলে আসরে নামতে হয়েছিল।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে এবকম একটা বেইজ্জতি ঘটানো খেলা দেশ থেকে প্রায় উঠে গেছে। পাশার শেষ খেলাটা কী জানি খেলেছিল কামাল পাশা। তারপর এ খেলাটা আর কাউকে খেলতে দেখা যায়নি। অলিম্পিকে পাশা খেলার কোনো আইটেম নেই। অলিম্পিকে যদিও দাবা খেলারও কোনো আইটেম নেই। তবু বিশ্বকাপ, ইউরোপীয়ান কাপ—এই সমস্ত নাম দিয়ে দাবাটা বেশ জাঁকিয়েই বসে আছে। সে সব খেলায কোটি কোটি টাকার হাতবদল ঘটে। যাবা দাবা খেলে তাদের ঘটে নাকি দারুণ বুদ্ধি।

আসলে এবার যে খেলাটা শুরু হল সেটা সত্যিকারের পাশাও নয় দাবাও নয়। লন টেনিস তো নয়ই। এটা হল ল্যাজেব খেলা। পৃথিবীতে ল্যাজওয়ালা ঢের ঢের প্রাণী আছে। বলতে গেলে মানুষ ছাড়া অন্যেরা প্রায় সবাই ল্যাজওয়ালা। ল্যাজেব খেলাটা খেলে একমাত্র মানুষই। অদৃশ্য লেজের বিসদৃশ খেলা। সেই ল্যাজের চাট্ একবার খেলে আব মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না। মাঠেব মধ্যে কাত হয়ে হাত পা ছুঁড়ে কাতরাতে হবে। নচৈতদ্‌বিদ্ম কতবন্নো গবীয। চেতনা হারিয়ে কাতব হয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে। সে তুমি যতই বিদ্বান ব্যক্তি হও না কেন।

তারকবাবু সেই খেলাটাই শুরু করলেন স্কুলের মারামারি গণ্ডগোলের অজুহাতে তারকবাবু প্রধান শিক্ষকের ক্ষমতা খাটিয়ে স্কুল বন্ধের নোটিশ লটকে দিলেন। বন্ধের নোটিশ লটকালেন বটে কিন্তু মনে মনে জানেন স্কুল বেশিদিন বন্ধ থাকবে না। সাময়িকভাবে স্কুল বন্ধ রাখাটা একটা প্রকরণগত চাল মাত্র। এ চালে ভাত হয না, প্রতিপক্ষ কাত হয়।

তারকাবাবু এতটা বোকা নন যে একদল উজ্জীবিত প্রাণবন্ত ছাত্রেব উপস্থিতিতে তাদের চোখের সামনে নোটিশ বোর্ডেব কাঠের ওপরে স্কুল বন্ধের নোটিশটা সাঁটবেন। সে কাজটি করতে গেলে আব দেখতে হবে না। এমনিতে অন্যান দিন স্কুল ছুটির নোটিশ বাব হলে ছাত্ররা আনন্দে হৈ-হট্টগোল কবে। হাতে তালি আব বেঞ্চিতে ঢোল বাজিয়ে সেটাকে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্ত আজকের ব্যাপাবটা আলাদা। আজ পিওন ভবকান্ত ওই নোটিশের কাগজটা কাঠে সাঁটতে গেলে ছাত্ররা তার হাত থেকে নিয়ে আগেই পড়ে নেবে আর প্রতিক্রিয়াটা কী হবে, সেটা ভাবা যায় না

ছাত্ররা প্রথমেই পেছন থেকে ভবকান্তর টাকে হাতেব সুখে ঢাক বাজাবে। তারপর নোটিশে কাগজটাকে পর্দাব মতো ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই ক বাতাসে উড়িয়ে দেবে। তারপব সবাই মিলে দ বেঁধে স্লোগান দিতে দিতে প্রধান শিক্ষকেব ঘ ঢুকে....... উঃ। ভাবতেও গাটা শিরশিব কবে বিশেষ করে একটু আগেই টিচার্স কমনরুমে কাণ্ড হয়েছে তাব চিহ্নগুলো তো এখনো ছড়ি ছিটিয়েই আছে।

ছাত্ররা এসব শিখেছে টি.ভি. দেখে। লোকস বিধানসভা পৌরসভায় ধেড়েকেষ্টদেব কাজকারব দেখে ছোটরা শিখে নেয়। বড়রা কবে, আমরা করব। কে শেখাবে? মাস্টার মশায়রা? সে আশ চুনকাম। উলটে তারাই সিরিঞ্জ হাতে তৈরি হ বসে আছে নিজের নিজের বশম্বদ ছাত্রদের পা করে ফোলাবার জন্যে।

তারকবাবু চুপচাপ স্কুল ছুটির অপেক্ষায় ব রইলেন। স্কুলের দেওয়াল ঘড়িতে চারটে বা আর ভবকান্তও তার পেটা ঘড়িতে ছুটিব ঘ বাজিয়ে দিল। পেটা ঘড়িটা আলমারিতে চাবি ছিল না। সেটাই রক্ষে।

সকাল এগারোটা থেকে অনেক ইঁদুব বাঁ খেলে ছাত্ররা ততক্ষণে হেদিয়ে পড়েছে। খি পেয়েছে। তারা যে যাব বাড়ি চলে গেল। বা গিযে খেযেদেয়ে টি. ভি. তে ঝুলন কুমাব ও দোলন কুমারীর নৃত্য দেহের ধেই ধেই নৃ মিলন নৃত্য দেখবে।

মাস্টার মশাইরাও একে একে কেটে পড়লেন। তাঁদের কোচিং ক্লাশ আছে। স্কুলটা যেমন-তেমন, কোচিংটাই আসল। স্কুলে শুধু সরস্বতী। কোচিং-এ লক্ষ্মী সরস্বতী দুটোই। ওটা বাদ দেওয়া যায় না।

বিমানবাবু হেড মাস্টার হওয়ার আশায় এসেছিলেন। অনেকক্ষণ আশায় আশায় বসে থেকে শেষে নিরাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চলে গেছেন। ছাত্রদলের বৈপ্লবিক কাজকর্ম দেখে তাঁর মনে বেশ ভয় ধরে গেছিল। তিনি এখানে নতুন। কে কোন দলের, কিছুই জানেন না। বেশিক্ষণ বসে থাকার সাহস হয়নি। তবে যাবার সময় শাসিয়ে গেছেন, তিনি কোর্টে যাবেন। উইম্বলডনের লন টেনিস কোর্ট নয়। আসল কোর্ট।

চারদিক সুনসান হয়ে যাবার পর এখন তারকবাবুর ঘরে ওঁর সঙ্গে বসে আছেন শ্যামলবাবু কান্তিবাবু প্রশান্তবাবু আর কুদ্দুসসাহেব। বিলেতি সাহেব নন, ওই আর কি কথার কথা। বলে দিতে হয় না, এঁরা হলেন তারকবাবুর বশম্বদ।

পাঁচজনে মিলে আজকের ব্যাপারটা নিয়ে আগাপাশতলা অনেক ভাবা হল। বাকি চারজন আর কী ভাবেন? ভাবনা তো সব তারকবাবুর।

কুর্সির সমস্যাটা ওঁরই। অন্যেরা বসে আছেন দোহার ধরবার জন্যে। ওঁরা এখন কথাবার্তায় খুবই বশম্বদ। তবে তারকবাবুর কুর্সি ওল্টালে ওঁরাও যে ডিগবাজি খেয়ে অন্য দলে ভিড়ে যাবেন না, এমন কথা খুব একটা জোর দিয়ে বলা যায় না।

অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করা হল স্কুল এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে রাখা হবে। তারকবাবু স্কুল বন্ধের বিজ্ঞপ্তিটা একটা কাগজে লিখে বাকি সবাইকে দেখালেন। সাধারণত অন্য সব বিজ্ঞপ্তি লেখা হয় বাংলায়। কিন্তু আজ এটা লেখা হয়েছে ইংরেজিতে। তারকবাবুর মত হল, ইংরেজিতে লিখলে কথাটার জোর বাড়ে। এখন চারদিকে যা উত্তেজক অবস্থা তাতে বিজ্ঞপ্তির মধ্যে জোর বাড়ানোর দরকার আছে। তাই ইংরেজি।

ইংরেজিতে বিজ্ঞাপন লেখায় দোষের কিছু নেই। সবটাই গুণ। পণ্ডিতানাং সবগুণাঃ মূর্খাঃ দোষা হি কেবলম্। পণ্ডিতদের সবই গুণ, দোষের মধ্যে তারা শুধু মূর্খ হয়। তারকবাবুর মতো পণ্ডিত ব্যক্তির তিন লাইনের বিজ্ঞপ্তিতে ভুল মাত্র তিনটে। দুটো বানান ভুল আর একটা 'টেনস্'-এর গলদ। যথেষ্ট উচ্চস্তরের ইংরেজি বলতে হবে। প্রায় শেক্সপীয়ারের কাছাকাছি। আজকালকার ব্যাকরণ মতে শেক্সপীয়ারের লেখাতেও অনেক ভুল আছে। তারকবাবুর লেখাতেও তাই। সেই হিসাবেই উনি শেক্সপীয়ারের কাছাকাছি। ক'জন এরকম পারে? তারকবাবু বলেই পেরেছেন। 'পুটনি' ইউনিভার্সিটি থেকে 'আংরেজি'-তে এম. এ. । মুখের কথা?

বিজ্ঞপ্তি লেখা কাগজটায় চোখ বুলিয়ে প্রশান্তবাবু ভুলগুলো ধরে ফেললেন। কিন্তু ভুল ধরে দিয়ে শুধু হেড মাস্টারের বিরাগভাজন হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। তাছাড়া এটা তো ভাষার ভুল ধরার সময় নয়। এখন সময়টা হল বিপদের মোকাবিলা করার। সাত পাঁচ ভেবে প্রশান্তবাবু চুপ করে রইলেন।

কুদ্দুস সাহেবও কাগজটা দেখার পর চুপ করে রইলেন। কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন অন্য কারণে। উনি পুরোটা পড়তেও পারেন নি, পড়ে কিছু বুঝতেও পারেন নি। এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এটিকেট।

দূরতঃ শোভতে 'কারা যেন' লম্বশার্ট পটাবৃত। তাবচ্চ শোভতে 'তারা' যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে। পণ্ডিত মশাইদের কথা।

ভবকান্তকে দিয়ে কাগজটা নোটিশ বোর্ডের কাঠের উপর সাঁটানো হল। তাকে দিয়েই ক্লাশঘর, অফিসঘর, সব ঘরের দরজা জানালা সেঁটে তালা লাগানো হল। সব কিছু দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তারকবাবু সদলবলে স্থান ত্যাগ করলেন।

আগামীকাল স্কুল খুলবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে এই কাজটা সুচারু ভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন বলে তারকবাবু নিশ্চয় কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

আট

স্কুলের দরজা-জানালা ভালো করে সেঁটে চারিদিকে চাবিটাবি লাগিয়ে তারকবাবু সেই সন্ধেতেই হাজির হলেন তপনবাবুর দরবারে।

তপনবাবু বারান্দায় চামচা পরিবৃত হয়ে দরবার সাজিয়ে বসে আছেন। দরবারটা তপনবাবুরই, টিপু সুলতানের নয়। এমনকি সিরাজদ্দৌলার নয়। তাই অত সব জেল্লাটেল্লা নেই। আসলে অনেকদিন হল দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নবাবরা বাপ বাপ বলে পালিয়ে যাবার পর তাদের জায়গা দখল করেছেন জনপ্রতিনিধিরা। এঁরা ঠাটে-বাটে নবাবের বাপ বটেন কিন্তু মুখে বলেন জনগণের সুখ-দুঃখের ভাগীদার। তপনবাবু সেইরকমই একজন ভাগীদার জনপ্রতিনিধি। জনগণের সুখদুঃখের ভাগের সঙ্গে তাদের আয়েরও ভাগীদার।

এই পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। তবে খোঁচাও একটা আছে। কে যেন বলে গেছেন—পলিটিক্স্ ইজ্ দ্য লাস্ট রিসর্ট অফ্ আ স্কাউন্ড্রেল। বলে গেছেন একজন। এখন বলে হাজার জন। কিন্তু বললে কী হবে? তপনবাবুকে স্কাউন্ড্রেল বলে কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? তপনবাবু মোটেই স্কাউন্ড্রেল নন। তবে হ্যাঁ স্কাউন্ড্রেলরা যদি ওঁর মতো হয় তবে উনি কী করবেন?

তপনবাবুর বসার ঘরটা খুবই সাদামাটা। শুধু বসার ঘর বলি কেন, গোটা বাড়িটাই ওইরকম। বাড়ি দেখে কেউ যেন কোনো দুর্নাম না গাইতে পারে তার জন্যেই এই সযত্ন সাবধানতা।

ওদিকে পূর্বাচলের মেগা ফ্ল্যাটবাড়িটার কথা কাকপক্ষীতেও জানে না। ব্যাঙ্কের বেনামি অ্যাকাউন্ট আর পোস্ট অফিসের এন. এস সি—সব কিছু মিলে—যাক্‌গে, ওসব কথা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।

এসব গুহায় নিহিত তত্ত্ব আর বাক্সে রক্ষিত তথ্যগুলো খুব সাবধানেই গোপনে রাখা আছে। দেশে তো দুর্নাম গাইবার লোকের অভাব নেই। কারণে অকারণে সত্যি হোক মিথ্যে হোক দুর্নাম একটা দিলেই হল। বিশেষ করে উল্টো পার্টির লোকেদের তো কাজই ওই। দিনরাত দোয়াত-কালি হাতে পিছন পিছন দৌড়চ্ছে। হরকদম ছুক্ ছুক্ করছে। সুযোগ পেলেই মুখে মাখাবে।

ওসব কালি-টালিকে অবশ্য তপনবাবু খুব একটা গ্রাহ্য করেন না। একটু আধটু দুর্নাম কিংবা গালাগালি শুনে আতুপাতু করলে রাজনীতি করা যায় না। লোকে বলে এযুগের রাজনীতিকদের গায়ের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার মতোই মোটা আর শক্ত। তবে এখানেও সেই একই কথা। তপনবাবুর গায়ের চামড়া তাঁর নিজের মতোই। গণ্ডারের চামড়াও যদি সেরকমই হয় তবে উনি আর কী করতে পারেন।

তারকবাবুকে দেখে তপনবাবু মুচকি হাসলেন,—তোমার আবার কী সমস্যা হল? সেই যে দারোগার ব্যাটা তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল, সেটা তো আমি কমিশনারকে বলে দিয়েছি। লোকটা তোমাকে আর বিরক্ত করতে আসবে না। এখন সব ঠিকঠাক চলছে তো?

—হ্যাঁ দাদা, ওদিকটা ঠিক আছে। কিন্তু অন্যদিকে তো একটা সমস্যা হয়ে গেছে। স্কুলটাও তো এখন হাতছাড়া হবার অবস্থা।

একটা স্কুল পার্টির হাতছাড়া হয়ে যাবে, এটা খুব সুসংবাদ নয়। ব্যাপারটা পুরো শোনার জন্যে তপনবাবু উদ্‌গ্রীব হলেন।

—ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে সেটা তো আমরা একটুও জানতে পারি নি। গতকাল একটা লোক এসেছিল। তার হাতে জেলা স্কুল পরিদর্শকের দেওয়া নিয়োগপত্র। লোকটাকে আমাদের স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করার জন্যে পাঠানো হয়েছে। সেটাও করা হয়েছে নাকি আদালতের আদেশে। এখন দেখুন ব্যাপারটা। জানা নেই শোনা নেই হঠাৎ একটা উট্‌কো লোক এসে স্কুলটাকে কব্জা করে নেবে, এটা কেমন করে

মেনে নেওয়া যায়? কত কষ্ট কত মেহনত করে আমরা সবাই মিলে এই স্কুলটাকে দাঁড় করালাম। প্রতিষ্ঠানটাকে কোথা থেকে কোথায় টেনে আনলাম। এখন যদি এটাকে একটা অজানা লোকের হাতে তুলে দিতে হয় সেটা তো আমাদের পার্টির একটা সমূহ ক্ষতি।

এই যুগে সেই সবচেয়ে সফল রাজনীতিক যে নিজের লাভটাকে দেশের লাভ আর নিজের ক্ষতিটাকে দেশের ক্ষতি বলে চালিয়ে দিতে পারে। কথাটা কে যেন বলে গেছে। নামটা বলতে পারব না। তবে যেই বলে যান, একশো ভাগ খাঁটি। রাজনীতিতে করেকম্মে খেতে হলে এ পথের পথিক হতেই হবে। হরিনামের ঝোলা হাতে কেউ রাজনীতি করতে নামে না। আর যদি নামেও তবে সেই ঝোলায় তুলসি কাঠের মালা থাকে না। থাকে রিভলবার নামের একটি যন্তর, যা দিয়ে গুলি বার হয়।

তারকবাবু কবিৎকর্মা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের পদটা পা-ছাড়া মানে আর কি, হাতছাড়া হয়ে গেলে ক্ষতিটা তাঁরই। নিজের ক্ষতিটাকে অতি সুকৌশলে পার্টির ক্ষতি বলে চালিয়ে দিলেন। এটা হল প্রথম ধাপ। এরপর পার্টির ক্ষতিটাকে দেশের ক্ষতি বলে চালাবার দায়িত্ব পার্টি নিজেই ঘাড়ে তুলে নেবে। তারকবাবুকে সেটা ভাবতে হবে না। ঘুঁটি একবার গড়িয়ে দিলে সেটা গড়গড়িয়ে চলতেই থাকবে। এ জন্যই এর আরেক নাম গ্যাঁড়াকল।

কিন্তু তপনবাবু তপনবাবুই। অনেক আদাজল খেয়ে অনেক ঘাটের কাদা ঘেঁটে এখন দাদা হয়েছেন। দাদা হওয়ার আগে অনেকদিন ভাইগিরির তালিম নিতে হয়েছে। এখন দাদা হয়ে ভাইদের যথেষ্ট অনুগত রাখার জন্য সেই গদাটাই ঘুরিয়ে থাকেন, যে গদার ঘা ভাই হিসেবে তাঁকেও এককালে দাদার হাতে খেতে হয়েছিল। এইযুগে এদেশে রাজনীতির আর এক নাম—গদা বন্ বন্ ঘোর কলি।

তারকবাবুর বিবরণ শুনে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে দেরি হল না। কিন্তু যা শুনবেন সেটাই সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিলে তো দাদার গদা ছ্যাঁদা হয়ে যাবার পুরো সম্ভাবনা। অদৃশ্য ল্যাজটার ঝাপটা মেরে তারকবাবুকেও বাজিয়ে নেবার দরকার আছে। সবকিছু শোনার পর তপনবাবু ভাবলেশহীন গলায় বললেন, ওই লোকটা তো আমাদের পার্টিরও হতে পারে। এত কাঠখড় পুড়িয়ে লড়াই করে আদালতের আদেশ হাতে নিয়ে কাজে যোগ দিতে এসেছে। আমার তো মনে হচ্ছে পার্টির লোক না হলে ভদ্রলোক মাঝপথেই ফৌত হয়ে যেত। এতদূর আসতে পারত না। তুমি ভালো করে সবকিছুর খোঁজ-খবর নিয়েছ?

তপনবাবুর কথাটা তারকবাবুর কান দিয়ে ঢুকে মগজে এমন ঘা মারল যে মগজটা গজ্‌গজ্ করে উঠল। ঘিলুটা নড়ে গেল কিনা সেটা বাইরে থেকে বোঝা গেল না। তবে জিব থেকে গলা পর্যন্ত যত জল জমা ছিল সবই এক ঝটকায় ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেঞ্জি ভিজিয়ে দিল।

সর্বনাশ! দাদা বলে কী? এই দাদার কাছে নাড়া বেঁধেই রাজনীতির সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়েছেন। আর এখন এই দাদাই বেসুরো গাইছে? এই অবস্থায় তারকবাবু যীশুর পোজে দু'হাত দু'দিকে ফাঁক করে বলতে পারতেন—দাদা, তুমি আমাকে ত্যাগ করলে কেন? কিংবা অন্তত—ই টু ব্রুটে। অর্থাৎ কিনা—দাদা, তুমিও শেষে? কিন্তু বলবেন কি, গলা শুকিয়ে এমনি কাঠ যে স্বরই বার হচ্ছে না। শুধু কী তাই? ওসব কেতাবি ইংরেজি বিপদের দিনে মাথাতেই আসে না। মুখে আসা তো দূরের কথা। তার বদলে তারকবাবু দাদার কথার উত্তরে কী বলবেন সেটার খোঁজে আকাশ পাতাল হাতড়াতে লাগলেন। আর বেকুবের মতো বসে বসে কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

ঘামতে ঘামতেই সূর্যোদয় হল। ও হো! মনে পড়েছে। ওই লোকটাকে তো স্কুলে এনেছিলেন বিজনবাবু। লোকটা যদি আমাদের পার্টিরই হবে, বিজনবাবু তাকে সঙ্গে করে আনতে যাবেন কেন? পাক্কা হিসেব। দুইয়ে দুইয়ে চার। লোকটা কিছুতেই আমাদের পার্টির লোক হতে পারে না।

সেই কথাটাই তারকবাবু তপনবাবুকে যুক্তি দিয়ে বোঝালেন। আর বোঝাবার পর যখন বুঝতে পারলেন যে তপনবাবু যুক্তিটা মেনে নিয়েছেন, আর এক দফা ঘাম বার করে তারকবাবুর জ্বর ছাড়ল। সাফল্যের উল্লাসে তারকবাবুর মনে হল নিজের পিঠটা একবার চাপড়ে নিলে হত। উঃ,যা ঘাম।

এতক্ষণে তপনবাবু লাইনে এলেন। বললেন, তা সে লোকটা এখন কী করতে চায়? তুমি কি তাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছ নাকি?

—বামোঃ! আমি অত কাঁচা কাজ করি না। কাল বিজনবাবু আর ওই লোকটা আমাকে শাসিয়ে গিয়েছিল, আজ এসে কাজে যোগ দেবে। আমার বাধা মানবে না। আজ ওই লোকটা আগেভাগে এসে প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসে পড়েছিল। কিন্তু বসলে কী হবে? সব আলমারির চাবি তো আমার হাতে। চাবি আমি দিই নি। আর আলমারি খুলতে না পেরে স্কুলের সব কাজ বন্ধ। সে লোকটাও প্রধান শিক্ষকের চেয়ার ছাড়বে না। আমিও বললাম, চেয়ার না পেলে আমি চাবি দেব না। এই নিয়ে এক অচলাবস্থা। তার পরই লেগে গেল ধুন্ধুমার। আপনি তো জানেন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার মাধববাবু পিছনে লাগার সুযোগ পেলে ছাড়েন না। উনি একদল ছাত্রকে লেলিয়ে দিলেন। শুরু হয়ে গেল হৈ-হট্টগোল, চিৎকার, স্লোগান। আমিও ছাড়ার পাত্র নই। কুদ্দুস সাহেবের হাত দিয়ে ইঙ্গিত পাঠিয়ে দিলাম আমাদের পক্ষের ছাত্রদের কাছে। তারাও রে রে করে লেগে পড়ল। ব্যস্। লেগে গেল ঝটাপটি। মাধববাবু ভেবেছিল একতরফা যুদ্ধ জয় করে যাবে। কিন্তু আমি থাকতে সেটি হচ্ছে না।

—বলো কী? তার মানে স্কুলে মারামারি গণ্ডগোলও হয়েছে? তাহলে কি পুলিশ ডাকতে হয়েছিল?

—না দাদা, পুলিশ আমি ডাকিনি। আমি বিশ্বাস করি যে শিক্ষায়তনে পুলিশ ঢুকলে তা পবিত্রতা নষ্ট হয়। তাই একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রত এবং অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমি পুলিশে সংস্পর্শ যথা সম্ভব এড়িয়েই চলি। তাছাড় পুলিশকে খবর দিলে তো সেই দারোগার ব্যাটা আসত। আর এসেই ঘুষ খেতে চাইত। ও দারোগা তো আমার কোনো কাজেই আসত না

কথা কটা মুখে বলার পরেই তারকবাবু ম মনে অঙ্ক কষতে শুরু করে দিলেন। হবে হবে পুলিশের সঙ্গেও লাইন এই হল বলে। তাঁ নিজেরই ছাত্র মকবুল হোসেন এখন থানা মেজবাবু। এর মধ্যে দু'বার স্কুলে ঘুরে এসেছে দু'বার অবশ্য দু'রকম মেজাজে ছিল। তবে মেজা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মেজাজ ঘুরিয়ে দেও যাবে। থানা থেকে ফরমান এসেছে স্কুলে ছাত্র অ পুলিশে মিলে গানবাজনার আসর বসাতে হবে ওই আসরটা ঠিকঠাক উতরে দিতে পারলে থানার সব বাবুরা ঠিক হাতে এসে যাবে। ত আর সময় সুযোগ বুঝে স্কুলে পুলিশ ডা আটকাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা বজ রেখেই পুলিশ ডাকা হবে। আর লাইন ঠি থাকলে তারকবাবুই ইঙ্গিতে জানিয়ে দেবেন কা কাকে থানায় ধরে নিয়ে আটক করতে হবে

সেই দৃশ্যটা কল্পনা করে তারকবাবু একই স বেশ রোমাঞ্চিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠলে মনে মনে বললেন—হুঁ হুঁ বাপা। ঘুঘু দেখেছ যঁ দেখনি। এইবার ফাঁদও দেখবে। 'বাপা' সম্বোধ যে কাকে উদ্দেশ্য করে করলেন সেটা খুব এব স্পষ্ট হল না। সম্বোধিত লোকটি সেক্রেট বিজনবাবু হতে পারেন, যে লোকটা হেড মাস হবার আশা নিয়ে এসেছিল সেই লোকটা হ পারে, আবার মাধববাবু হওয়াও বিচিত্র কিছু ন মোদ্দা কথাটা হল তারকবাবু ফাঁদ দেখি ছাড়বেন।

তারকবাবুর কল্পনার ঘোড়া বেশ জোরেই দৌড়চ্ছিল। দৌড়চ্ছিল না বলে উড়ছিলও বলা যায়। ঘোড়াটা যখন কল্পনারই তখন উড়তেই বা আপত্তির কি আছে। তপনবাবুর পরেব কথাটা কানে যেতেই অবশ্য সেই উড়ন্ত ঘোড়াটা মেঘে হোঁচট খেয়ে থেমে গেল আর তারকবাবুও ডন্ট খেয়ে বাস্তবেব মাটিতে নেমে এলেন।

—তারপর কি হল? এখন কী অবস্থা?

—স্কুলে কিছু বেঞ্চি-চেযার ভাঙভাঙি হয়েছে। কিছু আগুনও জ্বলেছে। আব ওই অজুহাতে আমিও প্রধান শিক্ষক হিসেবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্কুল বন্ধেব নোটিশ লটকে দিয়েছি। স্কুল এখন বন্ধ। চাবিটাবি সব আমার হাতে। কারো বাপের সাধ্যি নেই স্কুল খোলে।

কারো বাপের পক্ষে স্কুল খোলার সাধ্য রদ করে দিয়ে এখন তারকবাবু এসেছেন আর এক বাপের খোঁজে, যে ওই ভদ্রলোক—বিমানবাবু না কী যেন নাম, ওঁব ওই স্কুলে পোস্টিংটা রদ করে দেবে।

বাপের নাম পিতা। পিতা মানেই পার্টি। পিতৃমন্ত্রের বদলে এখন পার্টি মন্ত্র। জনগণতন্ত্রের তর্পণ হয পার্টির প্রণাম মন্ত্রে।—পার্টি স্বর্গ পার্টি ধর্ম পার্টিহি পবমন্তপঃ। পার্টিরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা। পার্টির দাদা তুষ্ট থাকলেই জগৎ তুষ্ট। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্যতু।

এখানে তপনবাবুই সেই দাদা। পার্টিতুতো দাদা। দাঁতের পার্টিও নয়, জুতোব পার্টিও নয়। খোদ জাতের পার্টি। ভোটে জেতা পার্টি হলে তো পাথরে পাঁচ কিল।

পার্টিতুতো দাদা মানে জ্ঞাতিতুতো দাদা। পেটতুতো কিংবা জ্যাঠতুতো দাদারও বাড়া। সেই বাড়া জ্যাঠতুতো দাদাটি তাঁর গাঁড়া খুড়তুতো ভাইটিকে হতাশ করলেন না। ওইখানে ওই সন্ধ্যায় এক টেবিলের এদিক-ওদিকে বসে অনেক গম্ভীর আলোচনার পর ঠিক হল নতুন হেড মাস্টারের অশুভ আগমন রুখে দেবার জন্যে প্রথমেই লাথি মাবতে হবে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে। ওই কমিটিই যত নষ্টেব গোড়া।

বছর দুই আগে যখন এই ম্যানেজিং কমিটিটা তৈরি করে বিজনবাবুকে সেক্রেটারির পদে বসানো হয়েছিল তখন ভদ্রলোক ছিলেন বেশ অনুগত। কিন্তু মাঝে হঠাৎ কি হল, কোন সাপে ছোবল মারল কে জানে, বিজন বাবু রংটা বদলে ফেললেন। শুধু কি একা? জীতেনবাবু, কুমুদবাবু, রহমান সাহেব—এই রকম বেশ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। এখন কমিটিতে ওরাই মেজরিটি। অনাস্থা এনে যে সেক্রেটারি বদলে দেওয়া হবে তারও উপায় নেই।

দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে আর সবার উপরে শিক্ষার স্বার্থে এরকম অবস্থা কোনোদিনই চোখ কান খুলে মেনে নেওয়া যায় না। তবু এতদিন পার্টির তরফ থেকে এগুলো মেনে চলা হচ্ছিল তারকবাবুর ভরসায়। অস্থায়ী হলেও প্রধান শিক্ষক তো বটে। প্রবীণ শিক্ষকের ক্ষমতার জোরেই এতদিন ম্যানেজিং কমিটির দিক থেকে আসা সমস্ত বকম ঝড় ঝঞ্ঝা তাবকবাবু একা হাতেই সামাল দিচ্ছিলেন। একা কুম্ভ বক্ষা কবে নকল বুঁদিগড়।

শুধু নকলবুঁদিগড়ই নয়, তারকবাবু অতি যত্নে নিজেকেই রক্ষা কবে চলেছেন। নানা অছিলায় টালবাহানা কবে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের খালি পদটি পূরণের জন্য জেলা পরিদর্শকের কাছে চিঠি পাঠাতে কেবলই দেরি করা হচ্ছে। অশুভস্য কাল হরনম্। যাই-যাচ্ছি-কবছি-করব বলে যত দেরি করা যায ততই মঙ্গল। যতই দিন যাচ্ছে ততই তারকবাবুর শেকড় শক্ত হচ্ছে।

পার্টির আর একটা ফর্মুলা হল—এই ম্যানেজিং কমিটির আয়ু তো আর মাত্রই মাস খানেক। তারপরই নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনের ফলাফল তো নিজেদের হাতে। তখন একটা বশম্বদ ম্যানেজিং কমিটি বসিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু তার মধ্যেই এ কী উৎপাত দেখ দিকি। তলে তলে ব্যবস্থা করে একটা নতুন হেড মাস্টারকে একেবারে সশবীবে এনে- হাজিব করে ফেললে? তাবকবাবুকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হয়নি। তার মানে স্বয়ং কুম্ভকেই নিপাত কবে দেওয়ার ধান্ধা। নাঃ। এই ষড়যন্ত্র কিছুতেই ববদাস্ত করা যায় না। এখন ম্যানেজিং কমিটি নামের এই 'বিষবৃক্ষ' টিকে সমূলে উৎপাটন করে দেওয়াটাই হবে এই বেয়াদপির মুখের মতো জবাব।

তারকবাবু আব তাঁর অভিভাবকবর্গ সবাই মিলে সেই পথেই অগ্রসর হবাব সংকল্প গ্রহণ কবলেন। আর এই ঐতিহাসিক প্রগতিবাদী সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়ে যাবার পর তারকবাবু অত্যন্ত খুশি মনে বাড়ির পথে রওনা দিলেন।

এব পরের ঘটনাগুলো ঘটল বেশ জোর কদমে। সুতো শক্ত হলে সবই নড়ে যায়। টানের জোরে গোপাল নড়ে। স্কুলের শান্তিরক্ষায় ব্যর্থ হওয়াব অজুহাতে আব সেই সঙ্গে বেশ কিছু অনিযম বেনিয়মেব ফিরিস্তি জুড়ে দিয়ে বসিযে দেওয়া হল একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর —প্রশাসক। পণ্ডিতমশায়রা বলে গেছেন কাদেব যেন ছলেব অভাব হয না। এ ক্ষেত্রেও অজুহাতেব কোনো অভাব হল না। তবে অজুহাতের অভাব হল না বলেই এইসব বিদ্বান বুদ্ধিমান জ্ঞানী শিক্ষাবিদদের দুর্বৃত্ত বলা মোটেই উচিত হবে না। বৃত্ত সম্পূর্ণ করার মহৎ উদ্দেশ্যেই এইসব মহৎ কাজ কবতে হয়।

প্রশাসক নিয়োগ করার পবেই যথাযোগ্য জায়গায় কলকাঠি নেড়ে বিমানবাবু নামের ওই প্রধানশিক্ষক পদলোভীটিকে সান্টিং করে দেওয়া হল দূরেব একটা স্কুলে। তারকবাবু যেখানে যেমন ছিলেন তেমনই থেকে গেলেন। আদালতের আদেশ ছিল—তৈবি হয়ে থাকা প্যানেল থেকে বিমানবাবুর নামটা কোনো একটা স্কুলে পাঠাতে হবে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগেব জন্য। এই স্কুলেই পাঠাতে হবে—এমন কথা আদালত বলেনি। তাই এসব কাজে আদালতের নির্দেশ কোনো বাধাই হল না।

শিক্ষায়তনের মাথায় ম্যানেজিং কমিটিব জায়গায় এসে বসলেন একজন প্রশাসক। রাজ্যের ব্যাপার হলে বলা যেত, কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজসে বাজ্যপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির শাসন। কিন্তু একটা স্কুল শাসন করার মতো সময় রাষ্ট্রপতির নেই। কেন্দ্রীয় সরকারেরও নেই। তাই ওসব বড় বড় কথা না ভাবাই ভালো। স্কুলটার মাথায় এসে বসলেন বাজ্য সরকার নিয়োজিত একজন দক্ষ প্রশাসক।

নৈবেদ্যেব মাথায় কাঁঠালি কলা। নৈবেদ্য সাজাতে হলে ওটা চাই। এবং কলাটা কাঁঠালিই হতে হবে। শাস্ত্রের বিধানটা সেই রকমই। তা সেই কলাটা কাঁচা হোক, পচা হোক, কিংবা পোকায় খাওযহি হোক, কাঁঠালি হলেই হল। মানুষে খেলে এঁটো হযে যায়। পোকায় খেলে হয় না।

স্কুলের প্রশাসক করে বসিয়ে দেওয়া হল পৌরসভার মাননীয় পৌরপিতা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দলপতি মহাশয়কে। না না, পঞ্চাননবাবু দল পাকিয়ে দলপতি হন নি। উনি জন্ম থেকেই দলপতি। শুধু উনিই নন, ওঁর বাপ চৌদ্দপুরুষ সবাই ছিলেন দলপতি। ওটা ওঁদের পারিবারিক পদবী। বংশ পবম্পরায় এটাকে ওঁরা অটবীর মতো আঁকড়ে আছেন।

ব্যাপারটা হল খুবই আনন্দের। আনন্দটা আবার উল্লাসে পরিণত হল, যখন জানা গেল যে পৌরপিতা মহোদয় এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র।

সবই ঠিকঠাক চলছিল। শুধু যেদিন মাননীয় প্রশাসক কার্যভাব বুঝে নিতে এলেন সেদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল যে উনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র বটে কিন্তু এখান থেকে পাশ করেননি। শুধু এই স্কুল কেন, কোনো স্কুল থেকেই কোনোদিন পাশ করেন নি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই বিদ্যাশিক্ষাব সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিযেছিলেন। যাকে সম্মানার্থে বলে ক্লাস এইটেই ড্রপ আউট।

একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক হবাব জন্যে এরকম উচ্চশিক্ষিত দক্ষ ব্যক্তি আর কোথায় পাওয়া যাবে?।

নয়

—বেশ তো চলছিল মাইরি। এটা আবার কী ড্যাম্ কিট্ কিট্ শুরু হল বল্ দিকিনি।

ঘনাদার দোকানে বসে সোনা যখন খুব মন-খারাপ-করা গলায় ঘোষণা করে দিল যে পরের সোমবার স্কুল খুলবে তখন গোবিন্দব প্রথম প্রতিক্রিয়াটাই হল এইরকম। হবেই তো। এরকম একটা সংবাদ মোটেই সুসংবাদ নয়। গোবিন্দর কাছে তো নয়ই। এই ক'দিন বেশ চলছিল। স্কুলে যেতে হচ্ছিল না। খাচ্ছিল দাচ্ছিল, খোদাব খাসিব মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘনাদাব চায়ের দোকানে রোজ দু'বেলা আড্ডা মারছিল। দিনগুলো বেশ সুখেই কাটছিল। এরকম একটা সুখের মুখে ভূতের কিল কার ভালো লাগে। স্কুল খোলা মানে তো সব কিছু টেঁসে গিয়ে লে-গঙ্গা।

মনাদা এতক্ষণ খবরের কাগজটা চোখের সামনে ধরে, কোথায় যেন জনগণের বেধড়ক পিটুনিতে তিনটে ডাকাত মরে গেছে, সেই খববটা একমনে পড়ছিল। কাগজ হাতে পেলেই মনাদা এই সব খববগুলো খুঁটে খুঁটে বার করে আর মনের খুশিতে রসিয়ে রসিয়ে পড়তে থাকে। এসব খবর পড়ে মনে বেশ রোমাঞ্চ তো হয়ই, মনাদা বেশ উত্তেজিতও হয়ে পড়ে। মনে মনে দৃশ্যটা কল্পনা করে আর ভাবে—আহা রে। আমি যদি ওইখানটায় থাকতে পেতাম তবে কী মজাই না হত। এদিক-ওদিক লুকিয়ে চুরিয়ে দু'একটা কিল ঘুষি কি জানি আমিও মারতে পারতাম। ডাকাত পেটানো তো অতি মহৎ কর্ম।

ডাকাতদের অবশ্য মনাদা খুবই ভয় পায়। ডাকাত মানেই তো গুলি গোলা বোমা বন্দুক। আর সে সব যদি নাও হয়, তবে অন্তত ছুরি ছোরা ভোজালি কাটারি তো হবেই। মোটের উপর রক্তারক্তি ব্যাপার। ওরে বাবা। মনাদার মনে ওদেব ত্রিসীমানায় ঘেঁষার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। তবে ওই আর কি। ঘনার দোকানে বসে খববের কাগজ হাতে ধরে চা খেতে খেতে ডাকাত পেটাতে তো আর ওদের কাছে ঘেঁষতে হচ্ছে না। ভয়টা কি? পেটালেই হল।

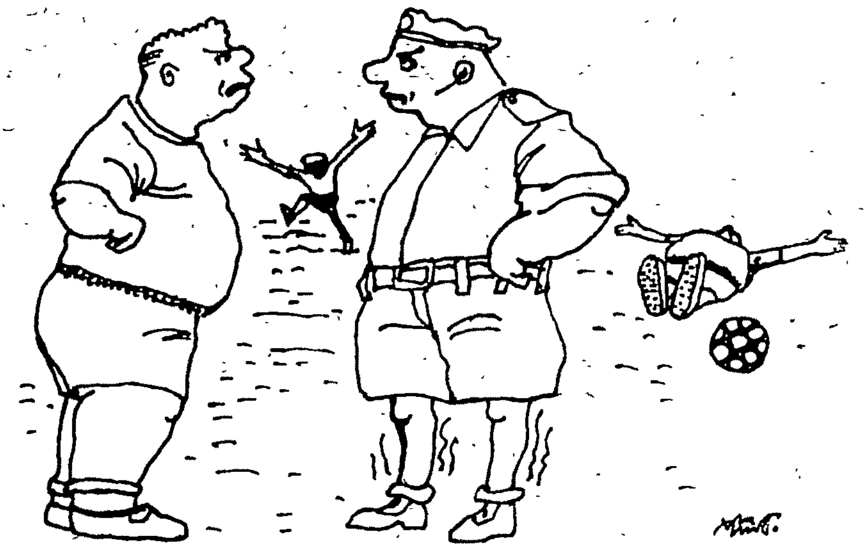

আবার কাগজে যদি খবর হয় যে ডাকাতরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তাতে কিন্তু এতটা আনন্দ হয় না। পুলিশের হাতে ডাকাত ধরা পড়ে আর লাভটা কী হল? ওদের সঙ্গে রফা হয়ে গেলেই তো পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে ছেড়ে দেবে। আব রটিয়ে দেবে যে আদালতে যাবার পথে ভ্যানের দরজা ভেঙে ডাকাত পালিয়ে গেছে। শুধু কি তাই? লোক দেখানো ডাকাত তাড়া করবার জন্যে ভ্যান থেকে নামতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কোনো পুলিশবাবুর হাঁটু ছিঁড়ে গেলে সেটাকে দেখিয়েই বলবে ডাকাতের সঙ্গে সংঘর্ষে কর্তব্যরত পুলিশ সাংঘাতিক আহত এবং তিনজন আহত পুলিশকে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এরপর সেই আহত পুলিশরা কতদিন সবেতন ছুটি কাটালেন সেটা ভেতরের খবর। বাইরে প্রকাশ পায় না।

ডাকাত পালানোর আর একটা হাতে-গরম গপ্পো পুলিশের কাছে সব সময় মজুদ থাকে। সেটা হল এই যে, ডাকাতটা সামনের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকে পেছনের স্কাইলাইটেব ফোকর গলে বেরিয়ে গেছে। আ হা হা। এব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বয়ান আর হয় না। সাধারণ গেরস্ত ঘরের বাথরুমের স্কাইলাইট দিয়ে বেড়াল গলতে পারে না। কিন্তু কয়েদখানার বাথরুমের স্কাইলাইট দিয়ে ডাকাত গলে যায়। ঠিক যেন ডাকাত গলবার জন্যেই কয়েদ খানার বাথরুমের স্কাইলাইটগুলো স্পেশাল অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

রফা হয়ে যাবার পর এত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও যখন কিছু কিছু ভেদুয়া ডাকাত কিছুতেই পালাতে পারে না তখন তাদেরকে আদালতে তুলতেই হয়। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে পুলিশ এমন ভাবে কেস সাজাবে আর সরকার পক্ষের উকিলকে ভুতুম মার্কা সওয়াল করার জন্যে এমনভাবে টিপে দেবে, প্রথমে জামিন আব পরে বেকসুর খালাস না দিয়ে জজ সাহেবের কোনো উপায় থাকবে না।

এসব তো গেল রফা-হযে-যাওয়া ডাকাতদের ব্যাপাব। বফা-না-হওযা ডাকাতদের কী অবস্থা? সে অন্য এক মহাভারত। বফা না করতে পারলে পুলিশ তাদের ধরে খুব পেটায। পিটুনি খেযে যখন কেউ কেউ মরে যায, তখন ওরা খুব কায়দা করে রিপোর্ট লিখে দেয় যে, লোকটা নিজেদের লোকের হাতেই মার খেযে মরেছে কিংবা আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা প্রমাণ করার জন্যে লোকটার গলায় একটা গামছা বেঁধে জানালার গরাদ থেকে ঝুলিয়ে দেয়। যেখানে জানালার গরাদ খুঁজে পায় না সেখানে একটা কলের পাইপ কিংবা টেবিলের পায়ার সঙ্গেই গামছাটা বেঁধে দেয়। সেই পাইপটা মাটি থেকে দেড় ফুট উঁচু হলেও আত্মহত্যা প্রমাণে আটকায় না। আত্মহত্যা প্রমাণের জন্যে ওই গামছাটাই যথেষ্ট। তার চেয়ে বড় কোনো প্রমাণ না হলেও চলবে।

এসব গপ্পো বানায পুলিশ আর বিশ্বাস করে ছাগল। বিশেষ করে সে যদি মাইনে-করা সরকাবি উকিল হয়, তবে তো আর কথাই নেই।

এসব ব্যাপারে মনাদার অবশ্য নিজের কোনো হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা নেই। খবরের কাগজে পড়ে আর পাঁচজনের মুখে শুনে যেটুকু শেখা। পড়াটা চোখে আর শোনাটা কানে। এ অভিজ্ঞতার দাম অনেক বেশি।

খবরের কাগজ পড়া অবস্থাতেই গোবিন্দর কথাটা মনাদার কানে গেছে। সে তো যাবেই। মনাদা তো আর কান দিয়ে কাগজ পড়ছিল না, পড়ছিল চোখ দিয়ে। কানদুটো খোলাই ছিল। কানেব পাতা চোখের পাতার তুলনায় সাইজে পেল্লাই হলে কি হবে, চোখের পাতা দিয়ে যেমন চোখ ঢাকা যায় কানের পাতা দিয়ে তেমন কান বন্ধ করা যায় না।

কানদুটো খোলা তো ছিলই তায় আবার কোনো কাজকর্ম না পেয়ে বেকার বসে ছিল। তাই গোবিন্দর মুখ থেকে কথা ক'টা খসা মাত্রই ক্যাচ্ করে নিল। যাই-তাই কথা তো নয়। একটা রোমকাই মার্কা বাতেলা—ড্যাম্ কিট্ কিট্। মনে

হচ্ছে নতুন আমদানি। কথাটা কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে সোজা মনাদার ঘিলুতে খোঁচা মেরে দিল।

—বাঃ। বেশ বললি তো রে গোব্‌দা। তুইও দেখছি আজকাল মাঝে মাঝে বেশ বাত্তু মারছিস্। এসব বয়েৎ কোথায় শিখলি বল দিকি? সোনার মুখে শুনে শুনে মনাদাও আজকাল গোবিন্দকে গোব্‌দা বলতে শুরু করেছে।

—এসব কি আর বইপত্তর পড়ে শিখতে হয় মনাদা? কোঁৎকা খেলে পেট ফুঁড়ে আপনিই বেরিয়ে আসে। এই দ্যাখো না, সোনাটা খবর এনেছে ইস্কুলটা নাকি আবার খুলছে। বেশ তো মাস্টারে মাস্টারে ঝগড়া করে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলি। আমরাও সুখে শান্তিতে ছিলাম। এখন আবার সাত্ তাড়াতাড়ি স্কুল খোলার কী এমন দরকার পড়ে গেল? যত্তোসব খ্যাড়াং খাশ্।

মনাদা সোনার দিকে চেয়ে বলল, তোদের মাস্টারদের ঝগড়াঝাটি তাহলে মিটে গেল?

—হ্যাঁ। এমন মেটা মিটেছে যে সবাই সবাইকে রসগোল্লা খাইয়ে আদর করছে।

রসগোল্লা খাওয়ার কথায় মনাদার মনটা উদাস হয়ে গেল। অনেকদিন রসগোল্লা খাওয়া হয়নি। ঘনার দোকানের বাসি লেড়ো বিস্কুট আর পান্‌সে চা খেয়ে খেয়ে জিব অসাড় হয়ে গেছে। এই একঘেয়েমির থেকে একটা পরিবর্তন নিশ্চয় দরকার।

কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে ওই এক বেঞ্চিতে নিজের জায়গায় বসা অবস্থায় অর্থাৎ কিনা স্বস্থানে সজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা থেকেই মনাদা মনে মনে সগর্বে প্রতিজ্ঞা করল, পরের মাসে মাইনে পেলে অফিসের টিফিন টাইমে নিচের ফুটপাত রেস্টুরেন্টে গিয়ে রসগোল্লা খাবে। খাবেই খাবে। একটা আধটা নয় একসঙ্গে চারটে।

মনাদা মনেপ্রাণে একশোভাগ বাঙালি। বাঙালির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য হল প্রতিজ্ঞায় পঞ্চমুখ, সাহসে দুর্জয়। বাঙালি একবার প্রতিজ্ঞা করলে সেটা পালন করে। নেহাৎ ভয় না পেলে সেখান থেকে সরে আসে না। রসগোল্লা খাওয়ায় ভয়ের কিছু নেই। তাই মনাদাও তার প্রতিজ্ঞা থেকে সরে এল না। আপন প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে রইল।

মোজেস ভেড়া চরাতে চরাতে পাহাড়ের গায়ে ভগবানের খোদাই করা টেন কমাণ্ডমেন্ট্‌স্ পেয়েছিল। বুদ্ধ বোধিদ্রুমের তলায় বসে জ্ঞান লাভ করেছিল, রামকৃষ্ণ পঞ্চবটির আসনে বসে কালীর দেখা পেয়েছিল। এ সবই হয়েছিল তাদের নিজ নিজ প্রতিভা বলে। মনাদা ঘনাদার দোকানে বেঞ্চিতে বসে এক সঙ্গে চার চারটে রসগোল্লা খেয়ে ফেলল। স্রেফ মনের জোরে। ঘনাদাই বা কম কিসে?

প্রতিজ্ঞা মাফিক কাজকর্ম সারা হয়ে যাবার পর বাঁহাত দিয়ে মুখে লেগে থাকা রসগোল্লার রসটা ভালো করে মুছে নিয়ে মনাদা বলল, যাক বাবা, গণ্ডগোল মিটে গেছে। বাঁচা গেল।

—মাস্টারদের গণ্ডগোলের সঙ্গে তোমার বাঁচা-মরার কী সম্পর্ক মনাদা? সম্পর্ক যদি কিছু থাকেই তবে তৈরি হয়ে থাকো। গণ্ডগোলের এক কিস্তি মিটেছে। পরের কিস্তি লড়ার জন্যে দু'পক্ষই কোমর বেঁধে তৈরি হচ্ছে। প্রথম ধাক্কায় ম্যানেজিং কমিটি ভোগে চলে গেছে। পরের ধাক্কায় কে কে বৈতরণী পার হয়ে যাবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

—বলিস কি রে সোনা। বৈতরণী পার মানে তো মরে যাওয়া। তার মানে এর মধ্যে মারামারি খুনোখুনিও হবে নাকি? এই বললি মিটমাট করে সবাই মিলে রসগোল্লা খেয়েছে, আবার বলছিস খুনোখুনি করে বৈতরণী পার। এত হেঁয়ালি করছিস কেন বল দিকি?

—তুমি এখনো 'সিসু' আছ মাইরি মনাদা। রসগোল্লা বললাম মানে কি সবাই সবাইকে রসগোল্লা খাইয়েছে নাকি? রসগোল্লার দাম আছে গুরু।

মনাদা অবার মনে মনে হিসাব কষতে বসল। —হাঁ তা আছে বটে। রসগোল্লার দাম আছে। ফুটপাথওয়ালা রসগোল্লার দাম কত চাইবে কে জানে। চারটের বদলে কি জানি হয়ত দুটো রসগোল্লা খেয়েই খুশি থাকতে হবে। যাই হোক, একটু আগে করা প্রতিজ্ঞাটার অন্তত অর্ধেক তো পূরণ হল। তাই সই। কী আর করা যাবে? সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজ্যতি পণ্ডিতঃ। অর্ধেকটা ছেড়ে না দিলে ফাঁকে পড়বে সবটা।

প্রথম লাইনটা কোনো এক প্রাচীন পণ্ডিতের। আর শেষের লাইনটা চা দোকানে বসে সদ্য সদ্য বানালেন শ্রীযুক্ত মনোতোষ পতিতুণ্ডি মহাশয়।

রসগোল্লার হিসাবটা না হয় মিটল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্ররাও মাস্টারের হয়ে দলাদলি করবে? দেশটা দেখছি দিনে দিনে গোল্লায় যাচ্ছে। এ গোল্লা রসগোল্লা নয়। এ গোল্লার নাম যাকে বলে জাহান্নাম।

দেশের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাতে কাগজ ধরা অবস্থায় ঘনাদার চায়ের দোকানে বসে প্রকাশ্য দিনের আলোতেই মনাদা খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

অন্ধকারের পরেই আলো। এণ্ড গড সেইড্ লেট দেয়্যার বি লাইট, এণ্ড দেয়্যার ওয়্যাজ লাইট। এখানে সোনাই গড। আলোকপাত করে মনাদার মনের অন্ধকার দূর করে দিল।

—ইস্কুলের সেক্রেটারি একটা লোককে এনেছিল হেড মাস্টার করার জন্যে। কিন্তু আমাদের হেড মাস্টার তারক স্যার চেয়ার ছাড়বে না। তাই নিয়ে গণ্ডগোল মারামারি হয়ে ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছল। তারপর হল একটা ভাতহি মার্কা কাণ্ড। ভেতরে ভেতরে কে কী করল কে জানে, সেক্রেটারি-টেক্রেটারি সব সুদ্ধ নিয়ে গোটা ম্যানেজিং কমিটিটাই ভোগে চলে গেল। তার জায়গায় এসেছে একটা অ্যাডমিস্টার। তাই স্কুল আবার খুলছে।

মনাদা আবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল। আর সুযোগ পেলে মনাদা সহজে ছাড়ে না। —অ্যাডমিস্টার নয়, কথাটা হল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বাংলা করে বললে হবে—প্রশাসক। কথাটা বলতে পেরে মনাদা মনে মনে বেশ গৌরব অনুভব করল।

মনাদা, শ্রীযুক্ত মনতোষ পতিতুণ্ডির কী সাংঘাতিক জ্ঞান। মাঝে মাঝে মনের ভুলে লেবুতলা আর লেবুপাড়া গুলিয়ে ফেলে ঠিকই, বাজারের হিসাবে কারচুপি করতে গিয়ে বৌয়ের কাছে ধরা পড়ে ঝাড় খায়— সেটাও ঠিক, কিন্তু এক্ষেত্রে কথাটা যে অ্যাডমিস্টার না হয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হবে—সেটা ঠিক জানে।

শুধু কি তাই? কথাটার বাংলা যে প্রশাসক, সেটাও জানে। আজকাল তো বাঙালিরা বাংলা কথার মধ্যে মধ্যে ইংরেজি ভাষা গুঁজে দিয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করে। যে যত বড় মূর্খ সে তত বেশি ইংরেজির গোঁজ দেয়। দেশের এ মাথা থেকে 'আপটু' ও মাথা অব্দি শতকরা 'নাইন্টি পার্শেন্ট' লোক তাই করে। বিশ্ববিদ্যালয় বললে বুঝতে পারে না, ইউনিভার্সিটি বলতে হয়। আর গ্রামের লোকেরা তো আর কেউ নৌকায় চাপে না, সবাই বোটে চাপে।

প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেও এ জিনিস আটকানো যায় নি। উল্টে যতই দিন যাচ্ছে, ভালোবাসার টানটা বেড়ে গিয়ে গেড়ে বসছে। এখন একমাত্র আশা যদি টিভির হিন্দি এসে ইংরেজির জায়গাটা দখল করতে পারে। হাজার হোক ওটা তো ভারতীয় ভাষা, এবং রাষ্ট্রভাষা। স্বদেশী দাসত্ব বিদেশীর দাসত্বের চেয়ে ভালো। 'কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের কুকুর ফেলিয়া'। তাই বলে হিন্দিকে স্বদেশের কুকুর বলছি না, পণ্ডিত মশাইরা ক্ষমা করবেন। ওদিকে আবার অশ্রদ্ধা করবার জন্যে বাঙালিরা একটা ভাষাকেই সামনে পেয়ে আঁকড়ে ধরেছে। সেটা হল বাংলা। মাতৃভাষা। একেবারে নাড়ির টান তো, তাই।

এ হেন ডামাডোলের মধ্যে ঠিক কথাটার বাংলা-ইংরেজি দুটোই ঠিক ঠিক জানাটা তো যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের কথা। মনোতোষ পতিতুণ্ডিকে

এবার থেকে মনাদা না বলে ডাকতে হবে মনা পণ্ডিত বলে।

সোনা অবশ্য ওই সব পাণ্ডিত্য-টাণ্ডিত্যের ধার দিয়েও গেল না। এক ফুঁয়ে মনাদার গৌরবের আলো নিবিয়ে দিয়ে বলল—ওই হল। ম্যালা জ্ঞান দিয়ো না মনাদা। আমাকে মাধব স্যার যা বলে দিয়েছে আমি তাই বলছি। আর আমার মতে তো মাধব স্যারই ঠিক বলেছে। মাস্টারদের উপরে হেড মাস্টার, তার উপরে অ্যাডমিস্টার। আর ওই যে তুমি বললে মিনিস্টার, ওটা তো অনেক উপরের ব্যাপার। মিনিস্টার হতে গেলে ভোটে জিততে হয়।

সোনার ঝাপড় খেয়ে মনাদা চুপ।

—মাধব স্যার বলেছে এখন তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়ে একটা 'ফিনাস কমিটি' তৈরি হবে। সেই তিনজনের একজন হল হেডস্যার। আর বাকি দু'জন শিক্ষক ভোটে ঠিক হবে।

মনাদা সোনার ভুলটা শুধরে দেবার জন্যে আর একবার মুখ খুলতে গিয়ে ঝাপড় খাবার ভয়ে চুপসে গেল। আর চুপচাপ শুনে যেতে লাগল।

—টিচারদের 'ফিনাস' কমিটির ভোট শিগ্‌গিরিই হবে। আগে যে টিচার কমিটি তৈরি হবার কথা ছিল তার জায়গায় এখন 'ফিনাস' কমিটি। 'ফিনাস' কমিটি টাকা পয়সা খরচের ব্যাপারে যেরকম যেরকম বলবে 'ফিনাস' সেটা শুনতে বাধ্য। তার মানে 'ফিনাস' কমিটি টিচার কমিটির চেয়ে এককাঠি বেশি শাঁসালো। তাই ভোটে জিতে ফিনাস কমিটি কব্জা করার জন্যে দু'পক্ষেই একেবারে আদাজল খেয়ে আসরে নেমে পড়েছে। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়বে না।

একটু দম নিয়ে সোনা বাকি গাওনা সারে,—ভোটের সময় আমাদের কী কী করতে হবে সেটা মাধব স্যার বুঝিয়ে দেবে। আজ সন্ধেবেলা মাধব স্যারের ঘরে মিটিং আছে। সেখানেই ওসব আলোচনা হবে। হোসেন মণ্টু সোহ্‌রাব—ওরা সবাই আসবে। তুমিও ওখানে ঠিক সময়ে হাজির থাকবে।

—আমি কি তোদের মাধব স্যারের বাড়ি চিনি, না তোদের মাধব স্যার আমাকে চেনে, যে ঠিক সময়ে হাজির থাকব?

—তোমাকে বলিনি মনাদা। আমি হাজির থাকতে বলেছি গোব্‌দাকে।

—তাঃ।।

দশ

শক্তপোক্ত সুতো টানাটানির খেলার জেরে পুরসভার পৌরপিতা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দলপতি মহোদয় আপন পদাধিকার বলে এসে অধিষ্ঠিত হলেন স্কুলের প্রশাসক পদের সুউচ্চ চূড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে চূড়াটি যথেষ্ট আলোকিত হয়ে উঠল। চূড়া হল আলোকিত আর দলপতি মশায় হলেন আলোচিত।

নিন্দুকেরা রটালো—দলপতি মশাই অষ্টম শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই স্কুলের সঙ্গে আর সেইসঙ্গে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গেও সব পাট চুকিয়ে দিয়ে ছিলেন। কাজটা করেছিলেন কিছুটা স্বেচ্ছায়, বাকিটা পুলিশের ইচ্ছায়। দুটোকে একসঙ্গে মিলিয়ে কেচ্ছাও বলা যায়। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই একদিন পাড়ায় একটা বোমাবাজির কেসে পুলিস এসে ওঁকে স্কুল থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। উনি সেই যে গেলেন, আর এলেন না। মাসখানেক পরে তাঁকে যখন আবার পাড়ায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল তখন উনি খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।

খুঁড়িয়ে হাঁটার কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলে, ওটা লকআপে পুলিশের আদর-সোহাগের ফল। অন্যরা আবার অন্য গল্প বলে। তারা বলে পুলিশ নিজে থেকে কিছুই করে নি। তারা শুধু উল্টো দলের খানকয়েক গুণ্ডা-ষণ্ডার সঙ্গে ওঁকে লকআপের একটা খুপরিতে পুরে দিয়েছিল। তারপর ওখানে যা কিছু করার ওরাই করেছিল। ওরাও মারদাঙ্গা তেমন বিশেষ কিছু করেনি। শুধু ওঁকে মেঝের উপর চিৎ করে শুইয়ে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো ধরে একবার এদিক একবার ওদিক, এই রকম বেশ কয়েকবার মোচড় দিয়েছিল। এর নাম বোন্ পাংচার। আকুপাংচারের ভায়রাভাই। এই অপারেশনে বোনের জাংচারগুলো ঢিলে হয়ে যায়। ডোজ বেশি হয়ে গেলে ওপারে পাড়ি দেওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

অপারেশনটা চালাবার সময় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা পঞ্চাননের চিৎকারটা যাতে বাইরে না যায় তার জন্যে ওদেরই একজন তার নিজের আণ্ডারপ্যান্টটা খুলে সেটা ওর মুখের উপর জম্পেশ করে চেপে ধরেছিল। আর সেই চাপা-পড়া মুখের উপরে পাছা থাবড়ে চুপচাপ বসেছিল। বার কয়েক মোচড় দেবার পর পঞ্চানন যখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল তখন ওরা ওকে ছেড়ে দিয়ে খুপরির দেওয়াল ঘেঁষে যে যার জায়গায় গিয়ে বসে রইল। কেউ কিচ্ছুটি জানে না। অবশ্য যে ছেলেটা অপারেশনের খাতিরে আণ্ডারপ্যান্ট খুলে উদোম হয়েছিল সে পুলিশ আসার আগেই আণ্ডারপ্যান্টটা জায়গামতো গলিয়ে দড়ির গিঁট আটকে আবার ভদ্রলোক হয়ে গেল।

এর পর পঞ্চানন দলপতির দলের দাদা যখন নেতাকে দিয়ে থানায় ফোন করিয়ে ওকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করল, তখন ওর আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে লেংচে লেংচে বাড়ি ফিরল। আর সেই যে ল্যাংচানো শুরু হল, আজও সমানে চলেছে। তখন আর এখনের মধ্যে তফাৎ শুধু এইটুকুই যে, তখন লোকে ডাকত 'ল্যাংড়া পাঁচু' আর এখন ডাকে 'খোঁড়া দলপতিবাবু'। পুরসভার মাননীয় পৌরপিতা। এখন পুলিশ ওঁকে দেখলেই স্যালুট মারে।

নিন্দুকদের কথা শুনে দলপতিবাবু বলেন, এসব সর্বৈব মিথ্যা। আমার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার জন্যে এসব হল বিরুদ্ধ পক্ষের ঘৃণ্য রাজনৈতিক অপপ্রচার। এসব কথা উনি খুব জোর গলায় বলে থাকেন। আর 'বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ'। আগেকার দিনে জমিদাররা পুষতেন তোষামুদে পারিষদ, ভাষান্তরে মোসাহেব। তারা তোষামোদ করে জমিদারবর্গকে স্বর্গে ওঠাত। আজকালকার নেতারা পোষেন চামচা। অনেক অকাজ-কুকাজের মধ্যে তাদের একটা কাজ হল জায়গামতো নেতার হয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা। তবে চিৎকারটা তো মুখেরই কথা। ওটাকে না পাল্লা-বাটখারা দিয়ে মাপা যায়, না ফিতে দিয়ে। দ্বিগুণ, শতগুণ—যা কিছু বলা হয়, সবই ভাববাচ্যে। হাবে ভাবে বুঝে নিতে হয়। সেই হিসাবে পঞ্চাননবাবুর চামচাদের চিৎকার শতগুণ না হলেও দ্বিগুণ তো বটেই। চ্যাঁচামেচি করাটাই ওদের কাজ। চ্যাঁচামেচি করে বলেই ওরা চামচা। ওরে চামচা, জোরসে চ্যাঁচা।

কিন্তু চ্যাঁচামেচির আরম্ভেই ওরা একটু থতমত খেয়ে গেল।

—পঞ্চুদা, ওরা বলছে তুমি নাকি ক্লাশ এইট থেকেই ইস্কুল ছুট্। আমরা ওদের চেঁচিয়ে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে কোন ক্লাশ বলব?

—প্রথম প্রথম কিছুই বলবে না। তবে যদি কোনো নাছোড় মার্কা সাংবাদিক এঁটুলি হয়ে এঁটে বসে থাকে, তবে তাকে বলবে ক্লাশ টেন। আর ওই যে পাড়ায় বোমাবাজির কেসে আমাকে পুলিশের ইস্কুল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া—ওটাকে একদম পাত্তাই দেবে না। বলবে, শিক্ষা আন্দোলন করতে গিয়ে একটা রাইটার্স ঘেরাও প্রসেশনে নেতৃত্ব দেবার সময় পুলিশের লাঠি চার্জে পা ভেঙে গেছে। তার মানে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারিদের উপর পুলিশের বর্বরোচিত অত্যাচার। এটাই খাবে ভালো। সেই রাইটার্স ঘেরাও অভিযানটা কবে কোথায় হয়েছিল, সেটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না, কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। ও শালা পাবলিকের মেমারি খুব 'সর্ট্'। কিচ্ছু মনে রাখে না। যা গেলাবে তাই গিলবে।

বেচারা চামচারা চেঁচামেচি করে ফাইট দিয়ে ক্লাশ এইটটাকে টেনেটুনে টেন অব্দি নিয়ে ফেলল ঠিকই, তবে দলপতিবাবুর বোধহয় জানা ছিল না

যে তাঁর উচ্চাকাঙ্খা পূরণের জন্যে তারও খুব একটা দরকার ছিল না। এম এল. এ, এম পি কিংবা মন্ত্রী হবার জন্যে ওই ক্লাশ এইটটাই লাগে বেশি। ওই সব মহা মহা আসনে আসীন হবার জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে 'কেলাশ ফোর' পাশ করলেই হয়। সেটাও খুবই সহজ। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় ওই 'ফোর কেলাশ' পাশ দেবার জন্যে কোনো পরীক্ষায় বসতে হয় না। চারটে বছর কোনো রকমে ঘযতে পারলেই পাশ। মন্ত্রী হবার পাশপোর্ট।

তবে হ্যাঁ, ওইসব জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পদে বসার জন্যে ব্যক্তিগত সর্বকনিষ্ঠ একটা যোগ্যতার ফিরিস্তি ভারতীয় সংবিধানে জুড়ে দেওয়া আছে, আর সেটাই হল আসল। সেই যোগ্যতাটি হল বয়স হতে হবে জায়গা বিশেষে কোথাও পঁচিশ কোথাও পঁয়ত্রিশ। আসল বয়স নয়। স্কুলে ঢোকাবার সময় বাবা-মা যে বয়সটা লিখে দিয়েছিল, সেই দু'নম্বর বয়স। তার মানে আর কি বেরনোর হিসাবের বয়স নয়, ঢোকার হিসাবের বয়স।

এসব কথা দলপতিবাবুর জানা ছিল না। জানতে হলে 'ইণ্ডিয়ান কন্সটিটিউশন্' বলে একটা বই পড়তে হয়। সে বইটা যে ওঁর পড়া হয়নি, সে কি এই জন্যে যে বইটা ইংরেজিতে লেখা, আর ইংরেজি পড়তে উনি—? মোটেই না। ইংরেজি তো ওঁর কাছে জলভাত। মানে আর কি জলে ভেজানো-পান্তাভাত। ইংরেজি জানেন না বলে উনি ইংরেজিতে লেখা 'ইণ্ডিয়ান কন্সটিটিউশন্'টা পড়তে পারেননি এরকম একটা কথা বলা মানে ওঁর নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তিতে কলঙ্ক লেপন করা। বিরোধী দলের লোকেরা এরকম বলে ঠিকই, কিন্তু কথাটা মোটেই সত্য নয়। আসলে উনি বইটা পড়েন নি এই জন্যে যে বইটা বেজায় মোটা আর ভারি। খোঁড়া পা নিয়ে সেটা পড়া যায় না।

এ হেন দলপতি স্কুলের প্রশাসক হয়ে বসে প্রথমেই যে কাজটি করলেন, ইদ্রিশকে তার নিজের জায়গায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। রতনে রতন চেনে। দলপতি হেন খাঁটি জহুরির ইদ্রিশ হেন খাঁটি রত্নটিকে চিনে নিতে দেরি হল না। অবশ্য চিনিয়ে দিলেন তারকবাবুই।

সামান্য কিছু হিসাবের গরমিলের অজুহাতে ইন্সপেক্টর মশায় ইদ্রিশকে চাকরি থেকে নিলম্বিত করার সুপারিশ করেছিলেন। করেছিলেন, কারণ ইদ্রিশের মতো একটি খাঁটি রত্নকে চিনে নেবার ক্ষমতা ওঁর মতো এক সামান্য স্কুল ইন্সপেক্টরের নেই। থাকতে পারে না। সে ভদ্রলোক পড়াশুনা করে ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে পরীক্ষা দিয়ে সাক্ষাৎকার দিয়ে চাকরিতে ঢুকেছে। সে তো মাস-মাইনের সরকারি চাকর। সারা মাস অফিস করে আর মাসের শেষে মাইনের কড়ি গুনে নিয়ে বাড়ি যায়। সে কী বুঝবে ইদ্রিশ হেন রত্নের রত্নাবলী।

ইন্সপেক্টরের উপরওয়ালার কাছে প্রশাসকের তরফ থেকে একটা লম্বা চওড়া জবরদস্ত নোট পাঠানো হল। এ নোট সে নোট নয়। এতে জাতির পিতার মুখও আঁকা নেই কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের সইও নেই। তর বদলে যা আছে সেটা হল অনেক কষ্টে মুসাবিদা করা দলপতি বাবুর একটা ত্যাড়াব্যাঁকা দস্তখৎ।

প্রশাসকের নোটে অনেক চোখা চোখা যুক্তি দেখানো হল। ইদ্রিশকে নিলম্বিত করার সুপারিশ করে ইন্সপেক্টর মশায় অত্যন্ত অজ্জনোচিত কাজ করেছেন। বলা হয়েছে তার খাতাপত্রের হিসাবে নাকি অনেক গণ্ডগোল আছে। আছে তো কী হয়েছে? অঙ্কের ভুল আইনস্টাইনেরও হত। তাই বলে কি তাকে কোনোদিন নিলম্বিত করা হয়েছে? এই রকম এক বদ্খৎ সুপারিশ পাঠাবার আগে ওই ভদ্রলোকের উচিত ছিল ইদ্রিশের পুরনো কৃতিত্বের পরিসংখ্যান এবং উজ্জ্বল পশ্চাদপট সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজখবর নিয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। ইদ্রিশের মতো অভিজ্ঞ সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিলম্বিত করায় শুধু যে তার উপরে অহেতুক অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে এবং তার স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কালিমালিপ্ত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে আমাদের স্কুলের মতো একটা ঐতিহ্য সম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুদূর বিস্তারী সুনাম এবং সম্মানও ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। ইন্সপেক্টরের এই কাজকে একজন সৎ অনলস দৃঢ়চিত্ত শিক্ষাকর্মীর উপর অনৈতিক আক্রমণ হিসাবেও দেখা যেতে পারে। এ কাজের পশ্চাতে ইন্সপেক্টরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াস থাকাও অসম্ভব নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাপ্‌রে বাপ্। অ্যাইসা চোখা চোখা যুক্তি আর তার বাঁধন ক্ষমতা যে মনে হবে ইদ্রিশের নয়, চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ার কথা ইন্সপেক্টরের নিজের। কেরানির চাকরি খেতে এসেছ বাছাধন? এখন নিজের চাকরিটা বাঁচাও দেখি কেমন পারো। চাকরি বাঁচাতে এখন তোমাকে নাচতে হবে। জেনে রেখো, এদেশটা গুণতন্ত্রের নয় যে গুণ থাকলেই তুমি উপরে উঠতে পারবে। এ দেশটা হল গণতন্ত্রের। জনগণ যাদের চাইবে তারাই উপরে উঠবে। তোমার গুণ আছে। বেশ কথা। তোমার গুণ নিয়ে তুমি গুণ টেনে মরো।

প্রশাসক মশায়ের নোটের মধ্যে এতসব চোখা চোখা কথা অবশ্যই দলপতিবাবু নিজে লিখলেন না। ইদ্রিশও লিখল না। এত সব যুক্তিপূর্ণ কথা এমন সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা ওদের কারো সাধ্য নয়। এসব লিখে দিলেন সমীরবাবু। তারকবাবুর অনুগ্রহপুষ্ট অনুগত বন্ধু বাংলার শিক্ষক। ইদ্রিশকে নিলম্বিত করার আনুপূর্বিক পারস্পরিক বিশ্লেষণ আর ওর গুণাবলীর বর্ণনায় এত সুন্দর সুন্দর কথা লেখা হল যে ইদ্রিশ তো ইদ্রিশ, তারকবাবুও তার কয়েকটা কথার মানে বুঝতে পারলেন না। আর ওই যে আইনস্টাইন না কী যেন একটা নাম লেখা হয়েছে, দলপতিবাবু তো ওই নামটাই কোনোদিন শোনেননি। প্রথম চট্‌কায় আইনস্টাইন নামটা শুনে ভেবেছিলেন, লোকটা বোধ হয় কোনো উকিল-টুকিল হবে, আইন-টাইন জানে।

ওদিকে আবার ইদ্রিশের যে এত গুণ, তা সে নিজেও কোনোদিন জানত না। তবে সাংগঠনিক দক্ষতার কথায় তার মনে পড়ে গেল—ওই দক্ষতার গুণেই সে রশিদকে জায়গা মতো 'ফিড্' করে বিভাস নামের ওই লোকটার চাকরিতে যোগ দেওয়া আটকাতে পেরেছিল। সাংগঠনিক দক্ষতার কথাটা সমীরবাবু মিথ্যে লেখেন নি।

প্রশাসক মশায়ের পাঠানো লম্বা লম্বা চোখা চোখা যুক্তি দেখানো চোথাটা পড়ে স্কুল ইন্সপেক্টরের উপরওয়ালার মুণ্ডুটা তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে গেল। সেই মুণ্ডু-ঘুরে-যাওয়া অবস্থাতেই ভদ্রলোক ইদ্রিশের উপর আরোপিত সব অভিযোগ রসাতলে পাঠিয়ে তাকে সসম্মানে নিজের আসনে সমাসীন করার আদেশনামায় সই করে দিলেন।

অবশেষে অ্যাসেজ বিগেইন্ড্ বাই অ্যাশীজ। ইদ্রিশও এই রকম একটা দিন আসার আশাতেই অপেক্ষা করে বসেছিল। বসে অবশ্য ছিল না, দস্তুর মতো দৌড়াদৌড়ি করে মাঠ তৈরি করছিল। সে যেদিন নিলম্বিত হয়ে গেল, সেদিনই তারকবাবু তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন—অ্যাইসা দিন নেহি রহেগা। চাকা ঘুরে যাবে। সুযোগ নিশ্চয় আসবে। এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এ এক অদ্ভুত দেশ। এদেশে হিসাবের কারচুপিই হোক কিংবা ঘুষ খাওয়াই হোক, কোনো অভিযোগই আজ পর্যন্ত প্রমাণ করা যায় নি, আর তার জন্যে কেউ কোনোদিন শাস্তিও পায় নি। এ দেশে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পায় শুধু বোকারা আর গরিব লোকেরা। নিজেকে 'বোকা নয়' প্রমাণ করার একটা সহজ রাস্তা হল পার্টিতে যোগ দেওয়া। পার্টি করলে কেউ বোকাও থাকে না, গরিবও থাকে না।

সত্যিই তো। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সেই স্বাধীনতা লাভের পরদিন থেকে এদেশে কত অভিযোগ কত কেলেঙ্কারি এল আর গেল। জিপ কেলেঙ্কারি, শেয়ার কেলেঙ্কারি, বোফর্স কেলেঙ্কারি, হাওলা-গাওলা-চারা-ঘোটালা-আলকাতরা-কয়লা-

বাঁধ-ভেড়ি-প্রমোটার.....। কত শত পর্দা ফাঁস হওয়া ঘোষিত কেলেঙ্কারি আর কত সহস্র ফাঁস-না-হওয়া অঘোষিত কেলেঙ্কারি। এ তালিকা লিখতে বসলে তালিকা শেষ হবার আগে কালি কাগজ শেষ হয়ে যাবে। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, বিরাট তার ইতিহাস, আরো বিরাট তার কেলেঙ্কারি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কটা কেলেঙ্কারির কটা শাস্তি হয়েছে—খুঁজতে বসলে বসেই থাকতে হবে আমৃত্যু।

তারকবাবুর আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে ইদ্রিশ এতদিন অপেক্ষা করছিল। দলপতিবাবু ক্ষমতায় এসে সব ঠিক করে দিলেন। এদেশের রাজনীতিকরা নানা দুর্নীতির মধ্যে একটা নীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সেটা হল-আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ দোষী নয়। এই কথাটা ওরা মাঠে ময়দানে যত্রতত্র গলা ফাটিয়ে সবাইকে শোনায়। অন্যেরা বলে না। বলে শুধু তারাই। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের এই রক্ষাকবচটা ওদের খুবই দরকার। এক-একজন রথী মহারথীর পেছনে যতগুলো করে কেস ঝুলছে, তার অর্ধেকও যদি প্রমাণ হয়ে যায় তবে আটানব্বই বছরের জেল হবার কথা। তার মানে জেলের মেয়াদ ফুরোবার আগে জীবনের মেয়াদ শেষ। তবে ওই এক কথা। আদলতে প্রমাণ হলে তবেই না!

নানা কায়দায় সরকারি কোষাগারকে লুটে ফাঁক করে দিচ্ছে, দেশটাকে শুষে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সেটা দেখছে আর হাড়ে হাড়ে ভুগছে। তবু ওরা দোষী নয়, কারণ আদালতে দোষ প্রমাণ হয় নি। আর ওইটাই হল পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম কর্ম। আদালতে মামলা উঠুক। সে মামলা গড়াতে থাক বছরের পর বছর। এর মধ্যে ইদ্রিশ হেন ব্যক্তিরা বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাক। বুড়ো হয়ে পেনশন পাক। আর ওদিকে গড়াতে গড়াতে মামলাটা মরচে ধরে মহাফেজখানায় জমা হয়ে থাক। এটাই নিয়ম।

এগারো

এরপর বেজে উঠল রণ দামামা। ফিনান্স কমিটির নির্বাচন। শিক্ষকদের মধ্যে থেকে তিনজন সদস্য নিয়ে তৈরি হবে ফিনান্স কমিটি। তার মধ্যে একজন হলেন প্রধান শিক্ষকের পদাধিকার বলে তারকবাবু নিজে। আর বাকি দু'জন হবেন নির্বাচিত সদস্য। শিক্ষক মশাইদের মধ্যে মিলমিশ থাকলে দু'জন সদস্য ঠিক করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হত না। দুটো নাম আলোচনার মাধ্যমেই ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু সে গুড়ে তো কিচ্‌কিচে বালি। তাই ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অপরিহার্য।

এই ফিনান্স কমিটিই প্রশাসককে টাকাপয়সা খরচের ব্যাপারে পরামর্শ দেবে। প্রশাসক মোটামুটি সেই পরামর্শ মতোই খরচাপাতি করবে। খরচাপাতির ব্যাপার মানেই গুড়। আর গুড় মানেই মাছি।

কিছুদিন আগে টিচার্স কমিটির নির্বাচন ভণ্ডুল হয়ে গেছ্‌ল। সেই কমিটি তৈরি হলেও তার হাতে টাকা-পয়সা খরচের কোনো ক্ষমতা থাকত না। কাজটা হত শুধুই ফুঁকো মাতব্বরির। এখন তার জায়গায় তৈরি হবে ফিনান্স কমিটি। দস্তুর মতো টাকা খরচের মাতব্বরি। আঠা অনেক বেশি। মাছি তো ডেকে আনবেই।

অনেক কলকাঠি নেড়ে তারকবাবু ম্যানেজিং কমিটিকে ভাগিযে তার জায়গায় দলপতিবাবুকে এনেছেন। এবার এই কমিটি হাতে না থাকলে তো সবই ফক্কা। সেই ফক্কাটাকে মেনে নেবার মতো লোক তারকবাবু নন। নির্বাচনে জিততেই হবে।

নির্বাচক মণ্ডলী হলেন শিক্ষকেরা। শিক্ষকদের মধ্যে অ থেকে চন্দ্রবিন্দু-সব রকমই মজুদ। অ-যে অজগর আসছে তেড়ে। না। এ ভদ্রলোক অজগর নন। অজয়বাবু। অজয় সামন্ত। আর চন্দ্রবিন্দুর কথা না বলাই ভালো। উনি এখন আর স্কুলে আসেন না। মাস ছয়েক আগে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

অঙ্ক কযে গুনে গেঁথে দেখা গেল, তেইশ জন শিক্ষকের মধ্যে দশজন তারকবাবুর দিকেই আছেন। অবশ্য তার মানে এই নয় যে বাকি তেরো জনই মাধববাবুর দিকে। মাধববাবুর দিকে আছেন মোট ন'জন। তাঁরা মাধববাবুর সঙ্গে একেবারে সেঁটে আছেন। কোনোক্রমেই ছাড়িয়ে আনা যাবে না। ছাড়াতে গেলে হাত ছড়ে যাবে।

তারকবাবু কিংবা মাধববাবুর সঙ্গে সেঁটে থাকার মানে অবশ্য এই নয় যে তাঁরা ওঁদের গুণমুগ্ধ ভক্ত। সাঁটার আঠাটা অন্যত্র। সেটা হল পার্টিহি পরমন্তপঃ। এঁরা সব শিক্ষক। শিক্ষিত লোক। কেউ কেউ আবার উচ্চ শিক্ষিতও বটে। তাই কোনো না কোনো একটা মতবাদ ছাড়া থাকতে পারেন না। মতবাদের সাধনা করার জন্যেই পার্টির ভজনা। পার্টি হল মতবাদের বিকাশ ক্ষেত্র।

কথাটা বোধহয় ভুল হয়ে গেল। শিক্ষিতদের মতবাদ থাকবে আর অশিক্ষিতদের থাকবে না, এমন কথা অন্তত এই দেশে জোর দিয়ে বলা যায় না। গোটা পৃথিবীর মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দেশটি পিছনের সারি উজ্জ্বল করে বসে আছে। সেখান থেকে তাকে কেউ হঠাতে পারবে না। কিন্তু মতবাদের সংখ্যা এদেশেই সবচেয়ে বেশি। সে সব মতবাদের কত না রং, কত না জেল্লা। শ্বেত রক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি। দেশে মূর্খ যত বাড়ছে মতবাদও ততই বাড়ছে। নিত্য নতুন মতবাদ গজাচ্ছে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পার্টি। যত মূর্খ তত মতবাদ। যত মতবাদ তত পার্টি। গঙ্গার পুব পাড়ের মন্দিরে বসে এক পাগল ঠাকুর হাতে তালি বাজিযে গান গেয়ে এই কথাটাই দেশের লোকের মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। যত মত তত পথ। উনি তো রেখেঢেকে বলেছেন। আসলে কথাটা হবে যত মত তত পার্টি।

এত মতবাদ এত পার্টি এই আধপেটা খেয়ে রোগে ধুঁকতে থাকা লোকগুলো সামলায় কী করে? ইউনাইটেড নেশন্‌স্-এর তাবড় তাবড় বিশেষজ্ঞরাও এ রহস্যের জট খুলতে পারে না। তারা অবাক চোখে হাতের তালু গালে ঠেকিয়ে এই বিচিত্র দেশটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এদেশের লোকেরাও মহানন্দে গালে তালু ঠুকে গান গায়—

নানা নেশা নানা মত নানা অভিধান
বিবিধের মাঝে জেনো পার্টিই মহান
দেখিয়া ভারতে নানা পার্টির উত্থান
জগজ্জন মানিছে বিস্ময়।

আমাদের ঘটে শিক্ষার অভাব থাকতে পারে, পেটে খাদ্যের অভাব, কিন্তু দেশে পার্টির কোনো অভাব নাই। আমরা কি কম?

যাক গে যাক সে সব কথা। তারকবাবুদের স্কুলে তেইশ জন শিক্ষকের মধ্যে আপন আপন মতবাদে সমৃদ্ধ ঋদ্ধ পুরুষের সংখ্যা দাঁড়াল দু'দল মিলিয়ে উনিশ। এর বাইরে বাকি রইল চারজন। তারা কারা? তারকবাবুর বিচারে দু'জন এলোমেলো আর দু'জন এলেবেলে।

এলোমেলো দু'জন হলেন নীহারবাবু আর প্রণয়বাবু। বয়স্ক পুরনো সিনিয়ার টিচার। ওঁদের মত হল বিদ্যালয় একটা পবিত্র স্থান। এখানে শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্র রাজনীতির স্বার্থে এই মধুর সম্পর্ক নষ্ট করা উচিত নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। ওইসব ব্যাস-বশিষ্ঠ মার্কা আদর্শবাদে তারকবাবুর কোনো আগ্রহ নেই। ওঁদের ভোটটাই হল আসল কথা। কিন্তু ওঁরা নিজে যা বোঝেন সেখান থেকে নড়ায় কার বাপের সাধ্যি। ওঁরা বলে দিয়েছেন, সৎ এবং দক্ষ লোক প্রার্থী হলে ওঁরা নিজে নিজেই তাদের ভোট দেবেন। কাউকে কিছু বলতে হবে না। সেটাই তো বিপদ। ওঁদের চোখে সৎ আর দক্ষ হতে হলে তো সত্যি সত্যিই সৎ আর দক্ষ হতে হবে। আজকালকার বাজারে সেটা কি সম্ভব? এই সামান্য কথাটা ওঁরা কেন যে বোঝেন না, সেটা তারকবাবুর মাথায় ঢোকে না। তাই ওঁর বিচারে এই দুটো ভোটই এলোমেলো। এদিকেও পড়তে পারে, ওদিকেও পড়তে পারে। আবার কোনোদিকেই নাও পড়তে পারে। মোট কথা—নির্ভর করা যায় না।

এলেবেলে দু'জনের অবস্থা আরো করুণ। ওদেরকে মগজ ধোলাই করে দলে টানা যত সহজ,

এক ঝটকায় দলছুট হয়ে যাওয়াও ততটাই সহজ। এ পক্ষের কথা শুনে পুরো একমত হয়ে বেরিয়ে যাবাব পর ও পক্ষের কথা শুনে পরক্ষণেই মত বদলে ফেলতে পারে। কিংবা ভোটটা দেবার সময় বে-খেয়ালে সব কিছু গুব্‌লেট করে দিতে পারে। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

ওদেরকে বোঝাবাব জন্যে তারকবাবু বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। খাতিব করে বসালেন। চা-বিস্কুট খাওযালেন। তারপব সমীরবাবু আর কুদ্দুস সাহেবকে কেন ভোট দেওয়া উচিত এবং নরেনবাবু আর সামাদ সাহেবকে কেন ভোট দেওয়া উচিত নয় সেটা আধঘন্টা ধরে সবিস্তারে বোঝালেন। বোঝাতে বোঝাতে ঘাম ঝবে গেল। স্কুলের কোনো ছাত্রকে গ্রামার বোঝাবার জন্যে তারকবাবু কোনোদিন এত খাটুনি খাটেন নি। কিন্তু গবজ বড় বালাই। বিনা মাইনেতেই তারকবাবু পাক্কা আধঘন্টা ধরে প্রাইভেট টুইশনি করে গেলেন।

তারকবাবু যতক্ষণ ভাযণ দিযে গেলেন, জ্ঞানবাবু আর জ্যোতির্মযবাবু—দু'জনে সমানে ঘাড় নেড়ে গেলেন। ঘাড় তো নাড়বেনই। স্বয়ং হেড মাস্টার মশাই বাড়িতে ডেকেছেন। খাতির করে বসিয়ে চা-বিস্কুট খাইয়েছেন। এতক্ষণ ধরে ওঁদের সঙ্গে, শুধু ওঁদের সঙ্গেই, কথা বলেছেন। এ তো দারুণ ভাগ্যেব কথা। ওঁরা দুজনে আগাপাশতলা কৃতার্থ। প্রায গলে যাবার অবস্থা। তারকবাবুব সব কথাই ওঁরা বুঝতে পেরেছেন। ওঁর সঙ্গে ওঁবা সম্পূর্ণ একমত। এবং ভোটটা ওঁবা তাবকবাবুব লোককেই দেবেন।

ভোট দুটো পাবার ব্যাপারে পুরো নিশ্চিন্ত হবার পব তারকবাবু সাফল্যের আনন্দটা বেশ কিছুক্ষণ তারিযে তারিয়ে উপভোগ করলেন। তারপর বললেন, আপানারা তা হলে এবাব আসুন। দুই মাননীয় বহুমূল্য অভ্যাগতকে বিদায দেবাব জন্যে তারকবাবু তাদের সঙ্গে হেঁটে বাড়ির সামনেব বাগানটা পার হয়ে সদব গেটের দিকে এগিযে চললেন। নিজেই এগিয়ে গিযে গেটটা খুলে ধরে শেয বাবের মতো মনে কবিয়ে দিলেন,—তাহলে মনে থাকবে তো, আপনারা ওই কথা মতোই ভোটটা দিচ্ছেন।

—নিশ্চয। আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না স্যার। আপনার কথা মতোই সবকিছু হবে। আমরা নরেনবাবু আর সামাদভাইকেই ভোটটা দিচ্ছি।

কথাটা কানে যাবাব সঙ্গে সঙ্গে তাবকবাবুর পা দুটো সেখানেই আটকে গেল। আর হাত দুটো চেপে বসে গেল গেটেব আধখোলা লোহার পাল্লা দুটোর উপরে। সর্বনাশ। এরা বলে কি? এতক্ষণ ধবে এত বোঝাবাব পব তার নিট ফল হল এই? সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ার পর এখন সীতা কার বাবা?

একটি বিশুদ্ধ হোপলেস কেস। ফক্কিনসিনিহিলিপিলিফিকেশন। সব কিছু ছ্যাত্‌রা-ব্যাত্‌রা। ভোটটা দিব তোমাব লোককেই বটে, তবে নামগুলো এট্টু ইদিক-সিদিক। ভুলটা আর এমন বেশি কী?

রাগে তারকবাবুর ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত তেতে উঠল। মনে মনে ভাবলেন—স্কুলেব ছাত্রদেব মধ্যে ঢের ঢের গাধা আছে। সেই সব অল্পবুদ্ধি কোমলমতি নাবালক গাধাদেব বরং সহ্য করা যায। কর্তব্যেব খাতিরে করতেও হয়। স্কুল মানেই তো দি গ্রেট হিউম্যানিটেবিযান গাধা পিটিয়ে ঘোড়া প্রোডাক্‌শন সেন্টার। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে এই বকম মহাপুরুয অসহ্য। ভদ্রলোকদের একজনের নাম জ্ঞানবিকাশ, অন্যজন জ্যোতির্ময়। তারকবাবু বাগেব মাথায় ওদের নাম দিলেন গোকর্ণ মর্দন আর অশ্বাণ্ডবর্ধন। প্রকাশ্যে নয়, মনে মনে।

নিজেকে সংযত করার জন্যে তাবকবাবু বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ ওদের মুখেব দিকে চেযে রইলেন। তারপর বললেন,— দাঁড়ান। আপনাদেব আমি নাম দুটো লিখে দিচ্ছি। আপনারা ভোট দেবার আগে কাগজদুটো দেখে নিয়ে সেইভাবে ভোটটা দেবেন।

তারকবাবু ওদেরকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আবাব ঘরের মধ্যে ফিবে গেলেন। দুটো কাগজে গোটা গোটা কবে সমীববাবু আর কুদ্দুস সাহেবের নাম লিখলেন। তারপব বেবিয়ে এসে ওদের দু'জনকে কাগজদুটো ধরিযে দিলেন। ভোটার স্লিপ।

বারো

অবশেযে স্কুল খুলল। খুলতেই হবে। না খুলে উপায় নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার একটা অঙ্ক আছে। সেই অঙ্কটা হল এই যে এমন কোন্ দু'কানে কালা দোকানি আছে যে তার দোকানটিকে বন্ধ রাখবে? আমদানি-রপ্তানি দলবাজি বকবাজি ডিগবাজি—যা কিছু কাজ কারবার সবই তো ওই স্কুল নামের প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে। ওটি বন্ধ হয়ে গেলে সব শুকনো। আহা। স্কুল বন্ধ হযে গেলে বুকে বড় বাজে।

এইসব বুকের বাজনা অনেক দূর থেকে শোনা যায। তা সেটা সবকারি মালখানার সাহায্য পাওয়া গণতান্ত্রিক স্কুলই হোক কিংবা বেসরকারি মালিকানার ধনতান্ত্রিক স্কুলই হোক। স্কুল বন্ধ হলেই চিৎকাব। আব তাব উদাবা মুদারা-তারায সব চিৎকাবই সমান শোনায। আলাদা করে কিছু বোঝা যায না। সন্ধেবেলা গাঁয়েব ধারে বাঁশবনে শেয়ালরা যখন একসঙ্গে চেঁচায তখন শব্দ শুনে বোঝার জো থাকে না কে কোন দিকে মুখ করে ডাকছে।

সরকারি সাহায্য পাওযা স্কুল চালু থাকবেই। তা সে পড়াশুনা চালুই থাক কিংবা চুলোয় যাক। অতএব স্কুল খুলল। অভিভাবকদের কাছে সুসংবাদ, কিন্তু গোবিন্দর কাছে দুঃসংবাদ। তার কাছে এটা 'ঢ্যাম্ কিট্ কিট্' ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্কুল খুলল ঠিকই কিন্তু বিপদটা যেদিক থেকে এল, সেটা তারকবাবু আগে থেকে আন্দাজ করতে পারেন নি। অন্য অনেক দবকাবি কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকটা ভেবে দেখাব অবসর হয়নি।

ছাত্রবা এল। দলে দলে এল। বর্যে বর্যে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে। কিন্তু এসে দেখল ক্লাশঘরগুলো মঠ নয়; মাঠ হয়ে বসে আছে। প্রায সব ক্লাশেই বেঞ্চি অর্ধেক। ছেলেরা বসবে কোথায়? কোনো কোনো ক্লাশে চেয়ারও নেই। শিক্ষক মশাযহেয টেবিলে বসে নযত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাশ নিতে হবে।

নতুন হেডমাস্টার মশায় যেদিন স্কুলে যোগ দিতে এসে ফিরে গেছলেন, সেদিনের সেই বহ্ন্যুৎসবে বেশ কিছু বেঞ্চি-চেয়ার আত্মাহুতি দিযেছিল। যারা বহ্নিতে আত্মাহুতি দেবাব সুযোগ পায়নি, তাদেবও অনেকেই পতন-জনিত আঘাতে হাত-পা-পিঠ-কোমব ভেঙে গুরুতব আহত অবস্থায় এখনো স্কুল চত্বরেব একপাশে পড়ে আছে। তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি, তাই আরোগ্য লাভও কবতে পাবেনি। বেঞ্চি-চেয়ারের সন্তান সন্ততি হয় না। তাই যাবা পবলোক গমন কবেছে তারা বংশ বক্ষার জন্যে কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পারেনি। তার ফলে কী হয়েছে? যা হবার তাই হয়েছে। বিদ্যামঠ মাঠ হয়ে গেছে। সব ক'টা ক্লাশ না হলেও বেশ কযেকটা ক্লাশ।

বিদগ্ধ তারকবাবু তাঁব গন্ধমাদন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে গেলেন এই নিয়েই লেগে যেতে পারে এক অন্ধ ধুন্ধুমার। প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ কোনো রকম খোঁড়া অজুহাত শুনতে রাজি নয। যে অজুহাত দিতে যাবে, তাকেই খোঁড়া করে ছেড়ে দেবে। আর একটা বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। তারকবাবু নিজে বিদগ্ধ হোন, কোনো ক্ষতি নেই। এটা হবে কি জানি খাণ্ডবদাহন। হতেও পারে। ঐতিহ্যেব তো অভাব নেই। এটা যে বামায়ণ মহাভাবতের দেশ।

তাবকবাবু পোড় খাওযা লোক। চেযার বেঞ্চ পুড়ে যাওযাব সম্ভাবনাটাকে গোড়াতেই ছেঁটে দিলেন। ভবকান্তকে ডেকে ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে বললেন। ভবকান্ত ঘণ্টা বাজিযে দিল। স্কুল ছুটি।

এই একটা কাজ কবতে এদেশেব লোকেরা

পুজোয় সাজুন
তন্তশ্রীর সাজে নবরঙে-রূপে
নব অনুভবে

বিশেষ আকর্ষণ

বমকাই

ইক্কত

জন্মভূমি

ওয়াল্‌-কলাম

কোরিয়ান মোটিফ্
সিল্ক শাড়ি

এছাড়া বাংলার
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা
ঐতিহ্যময় তাঁতবস্ত্রের বিপুল সম্ভার
জামদানী, বালুচরী,
শান্তিপুরী.....এবং পুরুষ ও
মহিলাদের রেডিমেড
গারমেন্টস্

তন্তুশ্রী
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
— সাধ্যের মধ্যে সাধপূরণ

tantusri@cal3.vsnl.net.in

Sammriddhi-2000

খুব ওস্তাদ। শিক্ষা থেকে আরক্ষা, রাস্তা থেকে নাস্তা (খাদ্য), স্বাস্থ্য থেকে দাস্ত (ময়লা নিষ্কাশন), আবগারি থেকে সদাগরি ইত্যাদি ইত্যাদি সম্ভব অসম্ভব যত রকমের বিভাগ হতে পারে সবে চূড়াতেই কাঁঠালি কলার মতো বসে আছে এক একটি ঘণ্টা। মাঝে মাঝে সেটি ঢং ঢং করে বাজিয়ে দেশবাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে যে ওই বিভাগের কোনো একটি পরিষেবা উপবিভাগ কয়েক কোটি টাকার ক্ষতির বোঝা মাথায় নিয়ে ভোগে চলে গেল। আগে যেখানে চালু ছিল কল, এখন সেখানে ঝুলছে লক। এখন সেখানে শিফ্‌ট্‌ বদলের হুইশেল বাজে না, তার বদলে বাজে ছুটির ঘণ্টা।

পুরুত মশাইরা ঘণ্টা বাজালেই ছেলে-ছোকরার দল বুঝতে পারে, পুজো শেষ হল। এবার প্রসাদ বিলি হবে। প্রসাদ পাবার আশায় তাদের চোখ মুখ চক্‌ চক্‌ করে ওঠে। সেই রকম কলে-কারখানায় ঘণ্টা বাজলে কিছু লোক বুঝতে পারে প্রসাদ পাবার সময় হয়ে এসেছে। এবার ওই জমিতে 'বহুতল' তৈরি হবে। তার মধু চুঁইয়ে প্রমোটার সে নেতা দালালদের, সেইসঙ্গে তোলাবাজদেরও হাত ঘুরে অনেকদূর পর্যন্ত গড়াবে। যারা সেই মধু চাটবে তারা শুধু মিষ্টি স্বাদই পাবে না, সেই সঙ্গে কিছুটা নোনতাও পাবে। অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করা কাজ-খোয়ানো শ্রমিকের অনাথা বৌয়ের চোখের জলের স্বাদ নোনতা তো হবেই।

কালের ঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। তারি রথ নিত্যই উধাও। যেখানে যেখানে ঘণ্টা বাজছে, জানবে সেটা এবার উধাও হয়ে যাবে। যারা নেহাৎ ঘুমিয়ে আছে তারা ছাড়া এই ঘণ্টাধ্বনি সবাইকে শুনতে হবে। না শুনে নিস্তার নেই। কানে ধরে শুনিয়ে ছাড়বে।

রথের কথায় মনে পড়ে গেল, কলকাতার লোককে অনেকদিন ধরে ঘণ্টার বাজনা শুনিয়ে এসেছে ঘোড়ার গাড়ি আর ট্রাম। বড় রাস্তায় ট্রাম আর গলির মোড়ে ঘোড়ার গাড়ি। আহা, ঘণ্টার ধ্বনি কি সুমধুর। সেই সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি শোনাতে শোনাতেই ঘোড়ার গাড়ি উধাও হয়ে গেছে। ওদিকে ট্রাম কোম্পানি শুরুর দিন থেকেই ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। কিন্তু নয় নয় করে একশো বছর পার হয়েও এখনো উঠে যায় নি। স্বর্গে যাবার বদলে জোকা গেছে। ওদিকে লেকটাউন এদিকে জোকা। এককথায় লেকা-জোকা। নিন্দুকের অবশ্য বলে বেড়াচ্ছে জোকা-ডায়মণ্ডহারবার, তার পরেই বঙ্গোপসাগর। ঘণ্টা যখন বেজেছে, সাগরে বিলীন হবার দিন কিছুতেই দূরে থাকতে পারে না। হোয়েন উইন্টার কাম্‌স্‌ ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইণ্ড?

ট্রাম কোম্পানিটা গোড়াতে এদেশি ছিল না। ধমনীতে বৃটিশ রক্ত। লোকে বলে সেই জন্যেই নাকি ঘণ্টার আঘাত সহ্য করেও শতায়ু হয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু কোম্পানিটির এদেশিকরণ হয়ে যাবার পর থেকেই কিছু কিছু ঘণ্টা বাজানেওয়ালা মহাপুরুষ অ্যাইসা উঠে পড়ে লেগেছে যে মনে হচ্ছে ট্রামও গেল বলে। তাদের মতে, আর যাই হোক, ঘণ্টার ঐতিহ্যটা রক্ষা করতেই হবে। তাতে যদি ট্রামকে ত্যাগ করতে হয়, সেও ভি আচ্ছা। ঐতিহ্য বলে কথা। সে কি ভোলা যায়? জগৎ বিদিত মোরা ঐতিহ্যবান জাতি, ঘণ্টা উড়াইয়া দেবে—দুপুরে ডাকাতি?

দুপুর হতে না হতেই ঘণ্টা বাজিয়ে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। তারপর শুরু হল ফিনান্স কমিটির নির্বাচন নামের আর এক ঘণ্টাধ্বনি।

ফিনান্স কমিটির নির্বাচন পরিচালনা করার জন্যে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ থেকে পাঠানো হয়েছে অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল্‌স্‌কে। সংক্ষেপে এ আই। ভদ্রলোক এসে গেছেন বেলা বারোটাতেই। এ রকম একটা সময় উনি জেনে বুঝে বেছে নিয়েছেন কিনা বলা যায় না, তবে ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে সেটাই। এ আই ভদ্রলোকের কোনো দোষ নেই। উনি এসেছেন নিজের সময় মতোই। তবে ঠিক সেই সময়েই দেশের তাবৎ ঘড়ি যদি একসঙ্গে দু'হাত মাথায় তুলে ওইরকম একটা বদখৎ সময় নির্দেশ করে, তবে উনি কী করতে পারেন?

নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্যে সব কিছু তৈরি। ঠিক এমনি সময়ে দুম্‌ দুম্‌ করে এসে পড়ল দু'খানা বাজ।

বাজ মানে বাজপাখি নয়। আমরা বোঝাতে চেয়েছি বজ্র। বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি। এসব বজ্রে বাঁশি বাজে না। কানে ঝিঁ ঝিঁ বাজে। মেঘের মধ্যে গুরু গুরু শব্দ হয় না, হৃদয়ে গুরু গুরু ডাক ছাড়ে। আর চোখে যা দেখা যায় সেটা আলোর ঝলকানি নয়, হাজার হাজার সর্ষেফুল। আক্ষরিক অর্থে বজ্র নয়। কান ফাটানো শব্দ নেই, চোখ ধাঁধানো আলো নেই, গা ঝলসানো আগুন নেই, পিলে-ওল্টানো ধাক্কা নেই। তবু যা আছে সেটা আক্কেল গুড়ুম করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রথম ধাক্কাটা হল একটি খবর। স্কুলের ভেঙে দেওয়া ম্যানেজিং কমিটির তরফ থেকে নাকি আদালতে মামলা রুজু হয়েছে ওই কমিটিকে ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগের বিরুদ্ধে। এতে অবশ্য প্রতিবাদী হচ্ছে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আর নব নিযুক্ত পঞ্চানন দলপতিবাবু। তারকবাবু সোজাসুজি জড়িত নন। তবু চিন্তা একটা থেকেই যায়, মামলায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হেরে গেলে ক্ষতিটা তারকবাবুরই।

প্রথম ধাক্কার রেশটা কাটতে না কাটতেই এল দ্বিতীয় ধাক্কা। সমীরবাবু এসে তারকবাবুর কানে কানে জানিয়ে গেলেন, গোপালবাবু আর সুখেনবাবু স্কুলে আসেন নি। বাড়িতে লোক পাঠিয়ে খবর নেওয়া হয়েছিল। ওরা বাড়িতেই নেই।

সর্বনাশ। এরকম একটা খবর তারকবাবুর মুখরন্ধ্র থেকে গুপ্তরন্ধ্র পর্যন্ত শুকনো করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। দু-দুটো নিশ্চিত ভোট। ও দুটো না পেলে তো ভোটে হেরে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। এলোমেলো আর এলেবেলে ভোটগুলোর উপরে আর কতটা নির্ভর করে থাকা যায়। এখন এই এত অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ লাগিয়ে ওদেরকে খুঁজেপেতে এনে হাজির করানোও তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে যেখানে আন্দাজ করাই যাচ্ছে যে ওরা নিজের ইচ্ছায় গরহাজির নয়। কেউ ওদেরকে কোথাও আটকে রেখেছে।

তাহলে? তাহলে আর কি, নির্বাচন স্থগিত করা ছাড়া পথ নেই।

তারকবাবু এ আই-কে অনুরোধ করলেন,—আজকের মতো নির্বাচনটা স্থগিত থাক। দু'জন শিক্ষককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ আই কথাটা মানলেন না, —তারা দু'জন তো আর নাবালক নয়, যে রাস্তা ভুল করে হারিয়ে গেছে। তাদের জন্যে নির্বাচন স্থগিত থাকবে কেন? নির্বাচনে ভোট দেওয়াটা তাদের ইচ্ছা। তাদের ইচ্ছা নেই ভোট দেবার তাই তারা আসে নি। তার জন্যে নির্বাচন স্থগিত করার কোনো দরকার তো দেখছি না।

—কিন্তু তাদের না আসাটা তো স্বইচ্ছায় নাও হতে পারে। হয়ত অন্য পক্ষের লোকেরা তাদের আসতে বাধা দিয়েছে। যাতে তারা আমাদের পক্ষে ভোটটা দিতে না পারে।

—আপনি হাসালেন হেডমাস্টার মশায়। তারা যে আপনার পক্ষেই ভোট দেবে, সেটা আপনি আগে থেকেই ধরে নিচ্ছেন কেন? আর আপনি ধরলেও আমি তো সেটা ধরতে পারব না। তাদের স্কুলে আসার পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা তারা বুঝবে আর পুলিশ বুঝবে। আমি বুঝব আমার কাজ।

তারকবাবু মনে মনে জিব কামড়ালেন। ইস্‌! উত্তেজনার বশে মুখ ফস্কে বেফাঁস কথাটা বেরিয়ে গেছে। মুখের কথা আর হাতের তীর। একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরানো যায় না। তারকবাবু মনে মনে ভাবতে লাগলেন বেফাঁস কথাটাকে কী করে পুলটিশ মেরে রিপেয়ার করা যায়। বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। এ আই ভদ্রলোকের পরের কথাতেই আপন পথের হদিশ পেয়ে গেলেন।

এ আই সাহেব তখনো বলেই চলেছেন, —এগুলোকে তো আমি আমার কাজেব বাধা বলে মনে করি না। আমাব মাথায় তো আর বোমা পড়েনি, যে কাজ বন্ধ করে বাড়ি চলে যাব।

মাসেব শেষে মাইনে বছরেব শেষে বোনাস আব ইন্‌ক্রিমেন্ট। সবেতন তেত্রিশ দিন ছুটি, প্রতি পাঁচ বছবে সপরিবারে ভারত দর্শন, আট বছরে পদোন্নতি—এসবের নিশ্চয়তা থাকায় সরকারি অফিসাররা এমনিতেই একটু বচন-বাগীশ হয়ে পড়ে। অধস্তন কর্মচারী আব কৃপাপ্রার্থী পাবলিক তাদের ভাষণ .শুনতে বাধ্য থাকে। সকলের বেলাতেই এবকমটা হয়। এ আই ভদ্রলোকের একাবই দোয নয়। বচনবাগ্মিতার গুণে নিজের অজান্তেই উনি তাবকবাবুকে তাঁর পথেব সন্ধানটা দিয়ে দিলেন।

তারকবাবু মনে মনে বললেন—এ আই মশাই, তুমি বলছ আমি তোমায়·হাসিয়েছি। এবাবে দেখ হুড়কো কাকে বলে। হাসাব না। শুধু মাথাব বক্ত পায়ে নামিয়ে দেব। তুমি তো করো চাকরি। সারভেন্ট। আব আমি হলাম মাস্টার। নট্ এ সাবভেন্ট, নট্ এ সারভেন্ট, বাট এ মাস্টার।

উঃ। সেই কবে ছাত্র অবস্থায় শুনেছিলেন কথাটা। —নট্ এ বাস, নট এ বাস বাট এ ট্রাম। এতদিনে ভুলেই গেছ্‌লেন। আজ এই উদ্বেগঘন মুহূর্তে আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল। অন্য ভাষায় অন্য রূপে। আহা। ‘তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই বাবে বার’।

ঈঙ্গিত চলে গেল ইদ্রিশের কাছে। ইদ্রিশ তো একপায়ে খাড়া। এসব কাজে তুখোড়। রশিদের ডেরায় খবর পৌঁছতে দেবি হল না। দশটা মিনিটও পার হল না। দুম্ দুম্ করে দুটো বোমা পড়ল অফিসের ঠিক বাইবে। একটু আগে যে দুটো বাজের কথা বলা হয়েছিল, সে দুটো সত্যি সত্যি বজ্র ছিল না, ভাবার্থে বাজ। কিন্তু এখন যে দুটো ফাটল, সে দুটো সত্যিকারের বজ্র। প্রথমটার শব্দে এ আই সাহেবের হাতের কলম খসে পড়ে গেল, দ্বিতীয়টায় তাঁর প্যান্টটাই খসে পড়ে খসে পড়ে অবস্থা।

তারকবাবু জেনেবুঝেই ঘর থেকে বাইরে বেবোলেন না। নিজেব চেয়ারে বসে বসেই লোক দেখানো হুঙ্কার ছাড়লেন। যতটা না লোক দেখানো তাব দ্বিগুণ এ আই সাহেবকে দেখানো।—এসব হচ্ছেটা কী? শিক্ষাক্ষেত্রের মতো একটা পবিত্র জায়গায় এরকম বোমাবাজি মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। এব একটা যথাবিহিত প্রতিকার চাই।

মিস্ চিফ্ দাও আর্ট অ্যাফুট। লেট দাও টেক দাই কোর্স দাও উইন্ট। গোটা কোটেশনটা জুড়ে শুধু দাও দাও, আর শেষটায় গিয়ে উল্টে দাও।

নিজের কাজে পুরোপুবি সফল হবার আনন্দে আর উত্তেজনায় তারকবাবু প্রায় শুদ্ধ করেই কোটেশনটা ঝেড়ে ফেললেন। ঝাড়লেন ঠিকই, কিন্তু ঝাড়লেন বড় ভুল জায়গায় এখানে এই কোটেশনটা খাটে না। অবশ্য না খাটলেও ওঁব করার কিছু নেই। উনি জানেন ওই একটাই। না, না, একটা নয়, উনি আরো একটা জানেন। সেটা হল—হি দ্যাট হ্যাথ্ নো সঙ্ ইন হিম্, ইজ্ ফিট ফব ট্রিজন্‌স্ স্ট্রাটেজম্‌স্। কিন্তু ওটা তো এখানে আরোই খাটবে না। বোমা খেয়ে কেউ যদি গানের কোটেশন ঝাড়ে তবে লোকে তাকে পাগল বলবে।

এব পব তারকবাবু শুকিয়ে আমসি হয়ে-যাওয়া এ আই-কে পরপর দু’গ্লাস জল খাইয়ে তাঁর শুকনো ভাবটাকে কাটিয়ে বসস্থ করে তুললেন। তাবপব যথেষ্ট ধড়িবাজেব বিনয় নিয়ে বললেন, আপনি যদি বলেন তো পুলিশে খবর দিই। পুলিশ এসে তাব কাজ বুঝে নিক।

একটু আগে পুলিশের কাজ বুঝে নেবার কথাটা তুলেছিলেন এ আই সাহেব নিজেই। এখন সেটা নিজেকেই গিলতে হল।

পুলিশের কথায় এ আই সাহেব ঘাবড়ে গেলেন। কাজ\কবেন শিক্ষা বিভাগে। কলেজে ছিলেন গুডি গুডি বয়। মনোবিজ্ঞানে এম এ ডিগ্রি নিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন। ওঁর পড়ার বিষয়েব মধ্যে পুলিশের মনোবিজ্ঞান বলে আলাদা কোনো .পরিচ্ছেদ ছিল না। তাই পুলিশ উনি চেনেন না। যেটুকু চেনেন তা হল এই যে, পুলিশের উদ্দেশ্যে দূব থেকে গালাগালি কবা খুব সহজ। উনি জীবনে অনেকবার সেটা করেওছেন। কিন্তু পুলিশকে সামনাসামনি মোকাবিলা কবার কথা উঠলে উনি একটা কাজই করতে পারেন। সেটা হল ঘাবড়ে যাওয়া।

এই পর্যন্ত তো গেল পুলিশের কথা। কিন্তু পুলিশ তো বোমাটা ছোঁড়েনি। যারা বোমাটা ছুঁড়েছে তারা পুলিশের উপর দিয়ে যায়। পুলিশের কথায় যারা ঘাবড়ে যায়, ওই বোমা ছুঁড়নেওয়ালাদেব আসল স্বরূপ দেখলে তাবা তো মূর্ছা যাবে। ভাগ্যিস তারকবাবু আলোচনাটা পুলিশের কথাতেই সীমাবদ্ধ বাখলেন। বোমাবাজদের প্রসঙ্গটা উঠল না। তাদের কথা উঠলে আব নিজেকে তাদের টার্গেট জানলে এ আই সাহেবকে বাড়ি পাঠাবার জন্যে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হত। অতদূর যে যেতে হল না সেটা এ আই সাহেবেব ভাগ্য।

নিজের মান-সম্মান বাঁচিয়ে তড়িঘড়ি পাততাড়ি গুটিয়ে এ আই সাহেব কেটে পড়লেন। ফেবাব পথে সারা রাস্তা ধবে মনে মনে খুব চোখা চোখা ইংরেজি লাগিয়ে একটা কড়া বিপোর্টেব মুসাবিদা করতে লাগলেন। তাতে অন্তত দু’খানা লাগসই কোটেশন থাকতেই হবে। হেড মাস্টার হয়ে তারকবাবু যদি একটা কোটেশন দেন তবে এ আই হয়ে অন্তত দুটো কোটেশন না দিলে মান থাকবে?

তেরো

—মাধব স্যার তোমাব খুব প্রশংসা কবছিল গোবুদা।

ঘনাদার দোকানে বসে গোবিন্দ সবে গরম চায়ের গ্লাসে ঠোঁটটা ঠেকিয়েছে, সোনার কথাটা কানে এসে পুরো চা-টাকে ঠাণ্ডা করে দিয়ে চলে গেল। চা ঠাণ্ডা হল না। বলা যায় গোবিন্দই গবম হয়ে গেল। গোবিন্দ নিজে গরম হয়ে গেলে তো চা-টা তার কাছে ঠাণ্ডা লাগারই কথা। ভৌত বিজ্ঞানের পরম সূত্র।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লোকে স্বপ্নেব মধ্যে অনেক রাজা-উজির মারে। লটারি জিতে যায়। ইংলণ্ড আমেরিকা চলে যায়। এমনকি ধাঁই কবে রাজকন্যাকে বিয়েও করে ফেলতে পারে। গোবিন্দও কখনো সখনো সে বকম কিছু কিছু অপকর্ম করেছে। কিন্তু মাধব স্যাব তাব প্রশংসা করছে—এরকম একটা দৃশ্য সে ঘুমেব মধ্যেও কোনোদিন দেখে নি।

না দেখাটাই স্বাভাবিক। মাধব স্যারের সঙ্গে গোবিন্দর ধস্তাধস্তি কস্তাকস্তির বৃত্তান্ত, যাকে বলে গোবিন্দ-মাধব উপাখ্যান, আগেই বর্ণনা কবা হয়েছে। জীবনে কোনোদিন একটা অঙ্কও নিজে নিজে শুদ্ধ করে কষতে না পারায় যে ঐতিহাসিক কীর্তি গোবিন্দ তাব বারো বছরেব স্কুল জীবনে তৈরি করে ফেলেছে, সেটা আগামী পঞ্চাশ বছবেও কোনো ছাত্র ছাপিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।

অবশ্য সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তাও নয়। সে সম্ভাবনার অঙ্কটা এই বকম। গোবিন্দ প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উঠে আসতে ব্যয় কবেছে তার জীবনেব বারোটি মহামূল্যবান বৎসর। পববর্তী প্রজন্মে এমন কোনো শ্রীমান যদি আসে, যে ওই একই কাজেব জন্যে পঞ্চাশটি বৎসর ব্যয় কবতে তৈরি থাকবে তবে কি জানি সে-ই পারবে গোবিন্দর এই মহান কীর্তিকে ছাপিয়ে যেতে। সেক্ষেত্রে পঞ্চাশ বছবেব মাথাতেই গোবিন্দব তৈবি কবা বেকর্ড ভেঙে যাবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরের মাথায় গিয়ে সেই ঘটনা যদি ঘটেও, ততদিনে মাধব স্যার, গোবিন্দ কিংবা এই প্রতিবেদক কেউ না কেউ বঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবেই। অঙ্কটা মিলিয়ে নেবাব জন্যে তিনজনকে একসঙ্গে পাবাব সম্ভাবনা কোটিতে গুটি, লাখে এক আর শততে কত সেটা এই মুহূর্তে অঙ্ক কষে

বলা যাচ্ছে না। তাই সেদিনের কথাটা এদিনই আগাম ভেবে মন খারাপ করার দরকার নেই।

মোটমাট অবস্থাটা এমনি হয়েছিল যে মাধব স্যারের সঙ্গে গোবিন্দর সম্বন্ধটা দাঁড়িয়ে গেছল ভাশুর ভাদ্রবৌয়ের। এ যুগের নয় সে যুগের। যখন ভাদ্রবৌরা ভাশুরের সঙ্গে কথা বলত, আধহাত ঘোমটা টেনে দরজার ওপাশ থেকে ফিস ফিস করে। ক্লাশের মধ্যে দু'জনের মোলাকাত হলে গোবিন্দর মুখটা হয়ে উঠত ফ্যাকাশে আর মাধব স্যারের মনে জেগে উঠত একটা হনুমান-মুখ-দর্শন সদৃশ বিসদৃশ দার্শনিক আবেগ। অনেকটা কা তব কান্তা কস্তে পুত্রাঃ-র মতো। মাধব স্যার তখন দর্শন না পড়েই দার্শনিক।

কিন্তু ওই যে কথায় আছে সময়ের মতো মলম হয় না। টাইম ইজ দি বেস্ট হিলার। হিল হিলার হিলেস্ট। বিশ শতকের মাঝামাঝি এক হিলারি এভারেস্ট হিলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পৃথিবীময় খুব হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিল। ওই শতকেরই শেষে আরেক হিলারি, হাই হিল জুতো পরা মহিলা তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্বামীকে মানেকা লিউইন্স্কি নামের এক 'ইস্ক্' কেলেঙ্কারি থেকে বাঁচিয়ে অন্য এক ধরনের হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিল। মাধব স্যার আর গোবিন্দর ব্যাপারটা অতদূর গড়ায় নি। কেউ কারো হিলার নয়, কিলার তো নয়ই। শুধু সময়কে ব্যবহার করেছে হিলার হিসাবে। শেষ দিকটায় এসে তারা যে যার নিজের মতো থাকত। কেউ কারো ব্যাপারে মাথাও ঘামাত না, নাকও গলাত না। নাক মাথা আপনা-আপনা।

সেই মাধব স্যার নাকি গোবিন্দর প্রশংসা করেছে। কারণটা কী? কারণ সময়ের চাকা ঘুরে গেছে। সময় শুধু ঘা সারানোর মলম নয়, চাকাও বটে। কেবলই ঘুরে চলেছে। চক্রবৎ পরিবর্ততে সুখানি চ দুখানি চ। পালা করে একবার সুখ নিচে নামছে একবার দুখ নিচে নামছে।

টিচার্স কমিটির নির্বাচনের সময়েই সোনা গোবিন্দকে নিয়ে গেছলি মাধব স্যারের ঘরে। সঙ্গে ছিল আরো তিনজন—হোসেন মণ্টু আর সোহরাব। গোবিন্দর একা একা যাবার সাহস হয় নি। যদি কথায় কথায় ফট্ করে অঙ্কের কথা উঠে পড়ে। সেটা তো ডুবজল। গোবিন্দ সাঁতার জানে না। মাধব স্যারের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর অবশ্য গোবিন্দর ভয় কেটে গেল। মাধব স্যার অঙ্কের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। এমনকি প্রথম দিন হেড স্যারের নামেও কোনো কথা বললেন না। সেদিন ছিল শুধু ছাত্র ঐক্য ছাত্র সংগ্রাম আর প্রগতিবাদের কথা। শুনতে শুনতে গোবিন্দ একেবারে মোহিত। এ রকম কয়েকটা সিটিং হয়ে যাবার পর গোবিন্দ একেবারে হিতাহিত জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে মাধব স্যারের ভক্ত হয়ে পড়ল। হিতাহিত জ্ঞান অবশ্য প্রথম থেকেই তার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে আশার কথা এইটুকুই যে এখানে তার সঙ্গী হল সোনা মণ্টু হোসেন সোহরাব—সব্বাই।

রাজনীতির দীক্ষা বলে কথা! বড্ড আঠা। একবার লেগে গেলে টেনে ছাড়ানো মুশকিল। এ দীক্ষা জ্ঞানাঞ্জনের কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চোখ খুলে দেয়। পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করায়, মূকং করোতি বাচালং। চারদিকের চালচিত্র চিনে নিয়ে ওরা এক একটি চালু চরিত্র তৈরি হয়ে গেল। সবাই এক একটি চলমান শক্তির উৎস। উৎসাহের শেষ নেই। যৌবন জলতরঙ্গ একেবারে থৈ থৈ করছে। তাকে রোখে কে?

টিচার্স কমিটির ইলেকশন ভণ্ডুল হয়ে গেছল, তাই অ্যাকশনের দরকার পড়ে নি। এখন সেই দরকারটা এসে গেছে। ফিনান্স কমিটির নির্বাচনে গোপালবাবুকে লোপাট করার দায়িত্ব পড়ল সোনা আর গোবিন্দর উপর। ওদিকে সুখেনবাবুকে গোপন করার দায়িত্ব পেল হোসেন মণ্টু আর সোহরাব।

প্ল্যান্ মতো সোনা আর গোবিন্দ ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোপাল স্যারের বাড়ির সামনে বড় রাস্তার মোড়ের মাথায়। স্যার ঘর থেকে বেরিয়ে বড়রাস্তায় এলেই অ্যাকশন শুরু হবে। গাড়িতে শুধু সোনা আর গোবিন্দই নেই। ওদের সঙ্গে আছে সাজ্জাদ হোসেন। গোবিন্দর চালাকিতে কাজ না হলে ওর দরকার হবে। সাজ্জাদ হোসেন এককালে এই স্কুলেরই ছাত্র ছিল। পাশটাশ করতে না পেরে গুড়বাই করে দিয়েছে। এখন লাইনের একজন সিনিয়ার লোক। হাত পা খেলে ভালো।

সেদিন গোপালবাবু ঘর থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়েছিলেন। এগারোটায় স্কুল আরম্ভ। গোপালবাবু ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন ওই এগারোটাতেই। পথে লাগে পঁচিশ মিনিটের মতো। তার মানে স্কুলে গিয়ে পৌঁছবেন ঘণ্টা বাজার মাত্র পঁচিশ মিনিট পরে। এ আর এমন কি? একে তো কাঁটায় কাঁটায় যথা সময়ের হাজিরাই বলতে হবে। নেহাৎ দুর্ভাগ্য, স্কুলে চাকরি করেন তাই। সরকারি অফিস হলে তো দেড় ঘণ্টা পরে অফিস যেতেন। সেটাই দস্তুর। দেখতে দেখতে সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোনো কারণে কোনো বাবু যদি ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দেবার জন্যে ঘর থেকে বার হয় তবে ছেলে জিজ্ঞেস করে—বাবা, আজ কি তোমাদের অফিসে পিকনিক আছে? বাবা গম্ভীর মুখে উত্তর দেয়, না, আজ ইউনিয়নের মিটিং। গেট জ্যামের প্রোগ্রাম।

দেড়ঘণ্টা পরে অফিস পৌঁছে সেটা পুষিয়ে দেবার জন্যে দেড় ঘণ্টা আগে অফিস ছাড়ার সেই পুরনো রসিকতাটা শুনে আজকাল কেউ হাসে না, কেউ কিছু ভাবেও না। ভাববে কী করে? বোধটাই যে ভোঁতা মেরে গেছে। এর মধ্যে গোপালবাবুই যা মাঝে মাঝে একটু ভাবেন, আর না পাওয়ার বেদনায় হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। মেরা গোপাল মহান। কপালটাই খালি বেইমান।

পান চিবুতে চিবুতে গোপালবাবু রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছেন, একটা ট্যাক্সি পাশে এসে দাঁড়াল। জানলা গলে বেরিয়ে এল শ্রীমান গোবিন্দের হাসি হাসি মুখ।—স্যার, বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন নাকি? স্কুলে যাবেন?

গোপালবাবু সুযোগ পেলে ছাড়েন না। —হ্যাঁ বাসের জন্যেই বটে। তবে উড়োজাহাজ হলেও আপত্তি নেই। স্কুলে যাওয়া নিয়ে কথা।

—তবে উঠে আসুন স্যার। আমরা ওই দিকেই যাচ্ছি।

বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে গোপালবাবু ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন। বাসভাড়াটা তো বাঁচলই, সেই সঙ্গে ধস্তাধস্তির পরিশ্রমটাও।

মিনিট কয়েক যাবার পরেই গোপালবাবু বুঝতে পারলেন ট্যাক্সিটা স্কুলের পথে যাচ্ছে না।

—আরে কোন দিকে যাচ্ছ? তুমি যে বললে ইস্কুলে যাবে?

পাশে বসে থাকা সাজ্জাদকে দেখিয়ে গোবিন্দ বলল, ওঁর ঘর হয়ে একটু ঘুরে যেতে হবে।

সাজ্জাদকে গোপালবাবু প্রথমে চিনতে পারেন নি। শেষ অব্দিও না। নিজের ছাত্র হিসাবেও না, পাড়ার সিনিয়ার হিসাবেও না। ধোপদুরস্ত আগাপাশতলা মাঞ্জা লাগানো ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে কালো ফ্রেমের উপর নীল কাচের চশমা, লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা, গা দিয়ে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে দামি পাউডারের সুগন্ধ। এসব দেখে কে বুঝবে যে সে একজন পাড়ার সিনিয়ার? গোপালবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিতে সাজ্জাদকে ধরে নিলেন গোপালের পিসেমশাই।

এরপর যে ঘরটার সামনে গিয়ে ওদের ট্যাক্সিটা থামল সেটা সাজ্জাদের নিজের তো নয়ই এমনকি তার বাপেরও নয়। ঘরটা সাজ্জাদের গুরুর। এসব লাইনে গুরুরা বাপেরও বাড়া। আর গুরুর আশ্রমকে ঘর বলে না, বলে ডেরা।

ওই ভদ্রলোকের ঘরে পৌঁছে গোপালবাবুকে ওঁর অনুরোধেই ঘরে একটু পায়ের ধুলো দেবার জন্যে ট্যাক্সি থেকে নামতে হল, এক মিনিটের জন্যে একটু ঘরে গিয়ে বসতে হল আর সেই একটি ঘরের মধ্যেই কাটিয়ে দিতে হল পরের পাক্কা পাঁচটি ঘণ্টা। গোবিন্দ আর সোনার টিকিটিরও দেখা নেই। ওদিকে ততক্ষণে ইস্কুলে ফিনান্স

কমিটির নির্বাচন শেষ হয়ে যাবার কথা।

সত্যের খাতিরে অবশ্য বলতেই হয় পাঁচঘণ্টা গোপালবাবু একটা কামরার মধ্যে কাটালে কি হবে, আরামের কোনো কমতি ছিল না। হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ্ হো। না হাম তুম নয়, শুধু একেলা হাম। তবে বিরিয়ানিটা যা খাইয়েছিল, লা গ্রাঁদে। বিরিয়ানি খাবার পর ঘুম। আঁখিপাত মধু আসব মোদষি নিদ্ ভরব সব দেহ। গোপালবাবু নিদ্রা দিয়েই পার করে দিলেন পুরো পাঁচটি ঘণ্টা।

ওদিকে সুখেনবাবুকে আটকানোর ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজে হয়নি। সেখানেও হোসেন বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা সুখেন স্যারের পাশে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেবার জন্য ডেকেছিল। ডাকের মধ্যে ওর পক্ষে যতখানি সম্ভব ততখানিই বিনয় আর হাসি চটকানো ছিল। কিন্তু হোসেনকে দেখেই সুখেনবাবুর সন্দেহ হয়েছিল। আজ স্কুল ফিনান্স কমিটির নির্বাচন। আর দেখেশুনে আজই হোসেনের ওঁকে স্কুলে পৌঁছে দেবার তাড়া পড়ে গেল? কিসের তাড়া? তার উপরে হোসেনের মতো ছেলে। নানা রকমের মাস্তানির সুবাদে সে স্কুলে এর মধ্যেই ছুপা রুস্তম নামে পহচান হয়ে গেছে। শুধু ছাত্ররাই নয়, মাস্টার মাশইরাও এক ডাকে চেনে। তার উপরে আবার গাড়িতে হোসেন একা নয়। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পেছনের সিটে বসে আছে মণ্টু আর শোহ্‌রাব। হোসেন যদি হয় ছুপা রুস্তম তো এরা এক একটি বক্তিয়ার খিলজি।

হোসেনের ডাকের উত্তরে সুখেনবাবু গোপালবাবুর মতো উড়োজাহাজের ধারকাছ দিয়েও গেলেন না। সোজা থানা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, না হে আমি এখন স্কুলে যাব না, একটু থানায় যেতে হবে। ভেবেছিলেন থানার নামে ছেলেগুলো কি জানি পিছিয়ে যাবে। কিন্তু বক্তিয়ার খিলজিরা পিছিয়ে যাবার জন্যে কাজে নামে না। দুই বক্তিয়ার ট্যাক্সির দরজা খুলে নেমে এসে সুখেনবাবুকে স্রেফ পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে নিল।

—চলুন না স্যার আমরা আপনাকে থানাতেই নিয়ে যাব। যদি চান তো হাসপাতাল হয়েও ঘুরে যেতে পারি।

সুখেনবাবু তখন চাপে পড়ে চুপ। মনে মনে কি জানি ভাবছিলেন হাসপাতাল তবুও তো মন্দের ভালো। ক্যাওড়াতলা না দেখালেই বাঁচি।

ক্যাওড়াতলা অবশ্য চোখে দেখার জায়গা নয়। ওখানে পৌঁছবার আগে সব কুশীলবদেরই চোখ বন্ধ করে ফেলতে হয়। কেউ নিস্তার পায় না। তা সে যত বড় মহাপুরুষই হোক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশই পান নি, তো সুখেনবাবু কী এমন বিশ্ববন্ধু।

ঘটনাটা এই রকমই। তবে সোনার হাত-পা নেড়ে বলার কায়দায় আর সব কথার মধ্যে বাছ-বিচার না করে কথার মাত্রা হিসাবে সকলের সঙ্গেই একটা মধুর সম্পর্ক পাতানোর গুণে ব্যাপারটা বহুৎ চাম্‌কিন হয়ে উঠল। ঠিক যেন হিন্দি সিনেমায় ভিলেনের নায়িকা হরণ। তফাতের মধ্যে শুধু এইটুকু যে গোপালবাবু আর সুখেনবাবু কোনো সুন্দরী নায়িকা নন, আগাপাশতলা পুরুষ।

মনাদা এতক্ষণ হাতের কাগজ সরিয়ে রেখে চোখ গোল গোল করে সোনার মুখে গল্প শুনছিল। গল্প তো নয়। ঘটনাটক। ঘটনা আর নাটক একসঙ্গে জুড়লে হয় ঘটনাটক। শুনতে বলতে আর বানান করে লিখতে এদিক ওদিক দু'দিক থেকেই প্রায় একই রকম। আর সোনা যেটা বলছে সেটা তো সাধারণ ঘটনাটক নয়, বলতে হবে ঘনঘটাচ্ছন্ন ঘটনাটক। ঘটোৎকচের পিতৃহরণকেও হার মানিয়ে দেবে। এ হল গুরু হরণের গুরুগম্ভীর কাহিনী।

গল্প শেষ করে সোনা গোবিন্দর দিকে চেয়ে বলল, দুটো আলাদা আলাদা অপারেশনের মধ্যে আমাদেরটা কোনো ঝামেলা ছাড়াই উৎরেছে। আর এই উৎরানোর পেছনে তোমার দাঁত বার করা নাটকটার কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি। তাই মাধব স্যার তোমার খুব প্রশংসা করছিল। বলছিল— ছেলেটা অঙ্ক না পারলে কি হবে অ্যাকটিংটা করেছে চমৎকার।

মনাদা আর থাকতে পারল না,—সে কিরে। তোরা এসব কী আরম্ভ করেছিস? শিক্ষক মশায় বলে কথা। শিক্ষাগুরু, প্রণম্য ব্যক্তি। তাদের এরকম হ্যানস্থা করে নাকি? ছাত্রদের উচিত শিক্ষকদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া। কথাতেই তো আছে—প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

কোনো ভুলটুল না করে জায়গা মতো একটা লাগসই সংস্কৃত বলতে পেরে মনাদা মনে মনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। উত্তেজনার বশেই বেশ লম্বা চওড়া একটা ভাষণ দেবার জন্যে তৈরি হয়ে গেল। শুরুতেই বেশ আবেগ টাবেগ মাখিয়ে আর একটা সংস্কৃত শ্লোক আরম্ভ করল—গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ।—

বাকিটা আর বলা হল না। মাঝপথেই সোনা ঝাপড় মেরে থামিয়ে দিল,—আরে রেখে দাও তোমার ওই সব অং বং মন্ত্র। উসব চলত রামের আমলে। আজকাল উসব অচল। আজকাল চালু না হলে চলে না গুরু।

—থাম্ থাম্। আমাকে আর গুরু বলিস না। এদিকে গুরু বলবি আর ওদিকে কোথায় কোন সাঙ্গাদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে তুলবি। বিরিয়ানির লোভ দেখিয়ে একটা অন্ধকার কামরার মধ্যে বেঁধে রাখবি। আমি চাই না তোদের ওরকম গুরু হতে।

মনাদা খেলতে চেয়েছিল আক্রমণাত্মক ভূমিকায়। কিন্তু নিজেই আক্রান্ত হয়ে এখন রক্ষণাত্মক ভূমিকায় নামতে বাধ্য হল। আবার সোনার আক্রমণে সে রক্ষণ দুর্গও এখন ফাটো ফাটো অবস্থা।

—মনাদা, তোমার আর বয়স বাড়ল না মাইরি। গুরু মানে তোমাকে কেউ গুরু বলে পুজো করছে না। ওটা হল একটা আদরের ডাক। ইস্কুলের মাস্টার মশাইরা কি আর গুরু নাকি? ওরা তো সময় মেপে ইস্কুলে আসে, চোথা দেখে ক্লাশ করে আর মাসের শেষে মাইনা নেয়। আবার সেই মাস মাইনে বাড়াবার জন্যে ধর্মঘট করে প্রশেসন করে রাস্তা অবরোধ করে ঘেরাও করে আর স্লোগান দেয়। ওদিকে যেমন চাকরিটা বাগায় পার্টিকে তোয়াজ করে, তেমনি সারাদিন কাজও করে পার্টির জন্যে। ভোট এলে তো আর কথাই নেই। ক্লাশটোশ সব শিকেয় তুলে দিয়ে রে রে করে লেগে পড়ে ভোটের কাজে। এদের তুমি গুরু বলো মনাদা? এরা তো আসলে মাসমাইনের চাকর। আর সে চাকরি পেয়েওছে ওই দু'নম্বরি করে।

আজকাল আর আসলি গুরু ইস্কুলে খুঁজে পাবে না মনাদা। তোমার মতো যাও বা দুটো একটা পাওয়া যাবে তা এই চা দোকানেই।

মনাদা চুপ করে গেল। তার কাছে এ কথার কোনো উত্তর নেই। এক মুহূর্তের জন্যে মনে পড়ে গেল তার ইস্কুলের মাস্টারমাশয় রজনীবাবুর কথা। ক্লাশে পড়া না পারলে স্কুল ছুটির পর সেই পড়া করে দিয়ে তবে ছুটি পাওয়া যেত। রজনীবাবুও তো মাইনে নিয়েই মাস্টারি করতেন।

মনাদার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতে গিয়েও ভয় পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

চোদ্দ

মাধববাবুদের এসব ষড়যন্ত্রের কথা তারকবাবুর কানে উঠতে দেরি হল না। বিকেল বেলা গোপালবাবু সুখেনবাবু দু'জনে দু'জায়গা থেকে ছাড়া পেয়ে তড়িঘড়ি স্কুলে এসে উপস্থিত।

তার অনেক আগে এ আই ভদ্রলোক নির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি চলে গেছেন। নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে একটা পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাওয়া।। তাই মাধববাবুর দল অনেকক্ষণ ধরে তারকবাবুর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক চালালেন। তারপর কোনোদিকে কোনো সুরাহা করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে তাঁরাও বাড়ি চলে গেলেন। তাঁদেরও কিছু করার ছিল না। যিনি নির্বাচন পরিচালনা করবেন তিনিই যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যান তবে অন্যেরা কে কী করতে পারে। তাঁরা পুরোপুরি জানেন এবং বোঝেন কার

উস্কানিতে বোম্ মেরে এ আইকে ভাগানো হয়েছে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করাটাই তো মুশকিল।

দাবার চালে .এ যাত্রা তারকবাবুর কাছে মাধববাবুর হার হয়ে গেছে। তাই তর্কাতর্কি করে যতটা গায়ের ঝাল মেটানো যায়। এসব ঝাল ঝাড়ার তর্কে যুক্তি-টুক্তিব বিশেষ কোনো বালাই থাকে না। গলার জোর থাকলেই হয়। চিৎকার চাঁচামেচি করতে পারাটাই আসল।

এ যুগটাই তো ঝাল ঝাড়ার যুগ। মাঠে, মঠে, বাস্তা-রেঁস্তোরায়, কলে-কারখানায় সর্বত্রই চলেছে গলা তেড়ে ঝাল ঝাড়া। যে যত বেশি ঝাল ঝাড়তে পারে সে তত বেশি ওস্তাদ। যো জিতেগা ওহি সিকন্দর।

তবু তো ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ছাত্রবা ততক্ষণে বাড়ি চলে গেছে। তারা মজুদ থাকলে নশিদের দল বোমা দুটো মেবে দিয়ে নিশ্চিন্তে হাঁটতে হাঁটতে ডেরায় ফিরে যেতে পারত না। তখনই কি জানি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। বাপরে। ছাত্রদল বলে কথা। এমনি ছেড়ে দেবে? আমরা—শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই বিষম চলাব যায়। বক্ত ঝবিয়েই ছাড়বে।

সবাই চলে যাবার পর এসে উপস্থিত হলেন গোপালবাবু আর সুখেনবাবু। তারকবাবু অনুগত মাস্টাব মশায়দের নিয়ে আলোচনায় বসে গেলেন,—এখন কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

কুদ্দুস সাহেবের যুক্তি হল, গোপালবাবু আর সুখেনবাবুকে দিয়ে এফ আই আর করানো হোক। ওই ছেলেগুলোকে থানায় নিয়ে গিয়ে ধোলাই দেওয়া হোক। তাহলেই ওবা আব ভবিষ্যতে এরকম কাজ করার সাহস পাবে না। ছাত্রদের এরকম দুর্বিনীত আচরণে সত্যিই ওঁর খুব রাগ হয়ে গেছে।

সমীরবাবু বললেন, তাতে কি সুনামটা বাড়বে? স্কুলেরই বলুন আব মাস্টারদেবই বলুন। পথেঘাটে তো লোকে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসবে। মাস্টাব মশায়রা নিজেদের ছাত্রকে পুলিশ দিয়ে পিটিয়েছে। তার চাইতে এসব ঘটনা যাতে না ঘটে সেটাই দেখা দরকার। এরপর থেকে মাস্টার মশাযদেব আরো সাবধানে চলাফেবা করতে হবে।

সুখেনবাবু রুখে উঠলেন,—এর মধ্যে আমাদের ভুলটা কোথায় দেখলেন? এ তো নির্ভেজাল গুণ্ডাবাজি। গোপালবাবু না হয় ওদের ফাঁদে পা দিয়ে আটকা পড়ে গেছলেন, কিন্তু আমি তো ভুলিনি। আমাকে তো ওবা জোর-জবরদস্তি গাড়িতে উঠিয়ে নিল। এক্ষেত্রে আমার আর কী করাব থাকতে পাবে? এ তো দেখছি একেবারে 'জোর জার মুলুক তার'-এর যুগ শুরু হয়ে গেল। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।

এবারে কুদ্দুস সাহেবেব যুক্তিটা গেল। "জোর যার মুলুক তার" কথাটা ওঁর মনে ধরেছে। তাহলে এর পরে আমরাও ওইরকম করব। এব পরে যখন নির্বাচনের দিন ঠিক হবে সেদিন আমরাও লোক লাগিয়ে ওদের দু'চারজনকে তুলে নিয়ে গুম্ করে দেব। আপনাদের ভাবতে হবে না। আমার হাতে সে সব করার লোক তৈরি আছে। বলেন তো ব্যবস্থা করি।

গোপালবাবু এবাবেও সুযোগটা ছাডলেন না, —হ্যাঁ, কুদ্দুস সাহেব ঠিকই বলেছেন। এই রকম এপক্ষ ওপক্ষ লোক গুম্ করার প্রতিযোগিতা চালিয়ে গেলে মন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন শুধু হেডমাস্টার মশায় আর কুদ্দুস সাহেব।

এরকম একটা চিন্তা গোপালবাবুর মাথায় খেলতেই পারে। ওঁর কাছে গুম্ হয়ে যাওয়াটা এমন আব কি? বলতে গেলে একটা মজার ব্যাপার। নিজে সদ্য সদ্য গুম্ হয়ে গিয়ে যে বিরিয়ানিটা সাঁটিয়ে এসেছেন তাব ঢেঁকুরটা এখনো মাঝে মাঝেই উঠে আসছে। এবকম গুম্ মাঝে মাঝে হতে পারলে মন্দ হয় না।

গোপালবাবুর বিরিয়ানি সাঁটার কথাটা অবশ্য গোপনই আছে। অন্য মাস্টার মশায়রা, এমনকি তারকবাবুও সেটা জানেন না। তারকবাবুব কাছে তাঁব নিজের লোমহর্ষক অপহরণের কাহিনীটা বর্ণনা করার সময় তিনি ওটা চেপে গেছেন। উল্টে কাহিনীটাকে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ভাবে লোমহর্ষক করে তোলার জন্যে তিনি ওই আটকে থাকা ঘরটাকে যতদূর সম্ভব নোংরা আব অন্ধকার বানিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? অনেক কষ্টকল্পনা করে গোবিন্দর সেই পিসেমশায়েব হাতে একটা ছুবিও ধরিয়ে দিয়েছিলেন। —উঃ। ঘরের মধ্যে আটকে রেখে বাইরে থেকে শিকল টেনে দেবার সময় লোকটাব হাতে একটা অ্যাত্তোবড় ছোরা। দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। ছোরাটাকে অ্যাত্তোবড় বোঝাবাব জন্য গোপালবাবু দু'হাত ছড়িয়ে যে মাপটা দেখালেন সে মাপের কোনো ছোরা হয় না। তবোয়াল হলেও হতে পারে। তবে গোপালবাবুর কাছে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। যে জন বাস স্টপেজে উড়োজাহাজ আমদানি করতে পারে সে তরোয়ালের মাপে ছোরাও আমদানি করতে পারে। তাবকবাবু কিন্তু সে লাইনে বুঝলেন না। গোপালবাবুব দেওয়া ছোরার মাপটা দিযে উনি আন্দাজ করে নিলেন, ভয়ের ঠেলায় ঘাবড়ে গিয়ে গোপালবাবু উল্টোপাল্টা বকছেন।

তবু ভালো যে কল্পনার ছোবা। গোপালবাবু যা সাহসী লোক, সত্যি কাবের ছোরা দেখলে তার প্রাণটা কি জানি সত্যি সত্যিই উড়ে যেত। প্রাণ না হলেও অন্তত জ্ঞানটা তো উড়ে যেতই।

সমীববাবু গম্ভীর প্রকৃতির যুক্তিবাদী লোক। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে লজিক পড়ান। গুম্ হয়ে যাওয়ার কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। গোপালবাবুর দিকে একটা ট্যারা চাওনি ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, —এতটাই যখন কল্পনা করতে পারলেন তখন ওই টুকুই বা বাদ দিচ্ছেন কেন? ধবে নিন নির্বাচনের দিন কোনো শিক্ষকই এলেন না। ভোটের ফল এপক্ষে শূন্য ওপক্ষে শূন্য।

কুদ্দুস সাহেব উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িযে পড়লেন। আস্তিন গুটিয়ে হুঙ্কার দিযে বললেন—বটে। আমাকে অপহরণ কবে কোন শ. . .। লজ্জা পেযে মাঝপথেই কথা থামিয়ে বসে পড়লেন।

আলোচনাটা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। এরকম একটা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করাটা ঠিক নয়। তারকবাবু একটু ধমকেব সুরেই বললেন,—আপনারা ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নেবেন না। যথাযোগ্য মর্দাদা দিয়ে বিচার বিবেচনা করুন। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিনান্স কমিটির নির্বাচন। অপহরণ আর তার বদলা অপহরণ, এসব নিয়ে ভাববাব সময় এটা নয়। নির্বাচনটা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, আপনারা এখন সেই কথাটাই ভাবুন।

কে আর কী ভাববে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তাবকবাবুর ভাবনাটাই ওঁদেব ভাবনা। মনের ভাবনার কথা মুখে বলে দিয়ে আঙুল কাটার মতো বোকা ওঁরা কেউই নন। সবাই চুপচাপ বসে রইলেন।

তারকবাবু বললেন, নির্বাচন নিয়ে যখন এত ঝামেলা হচ্ছে তখন নির্বাচনের প্রক্রিয়াটাই বদলে দেওয়া যাক।

আবার সবাই চুপ। নির্বাচনের প্রক্রিয়া বদলে অন্য নতুন কী প্রক্রিয়া হতে পারে সে ব্যাপারে কারো কোনো ধাবণা নেই।

—নির্বাচনটা হোক পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে। সব মাস্টাব মশায়ের হাতে একটা কবে ব্যালট পেপার ধরিয়ে দেওয়া হবে। তাতে প্রার্থীর নাম লেখা থাকবে। নামের পাশে চৌকো ঘর কাটা থাকবে। শিক্ষকরা পছন্দের প্রার্থীর ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে কাগজটা মুখবন্ধ খামে ঢুকিযে একটা সিল করা বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবেন। এটা তাঁরা করবেন একটা নির্দিষ্ট দিনেব নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে। নিজের সময় এবং সুযোগ মতো। নির্দিষ্ট দিনে এ আই সাহেব এসে বাক্স খুলে ভোট গণনা করে তাঁব বায় জানিয়ে দেবেন। ব্যস্। হয়ে গেল ভোট। এই ব্যবস্থায় কোনো শিক্ষককে আটকে রাখার কিংবা গুম্ কবে দেবার প্রশ্ন থাকবে না।

উপস্থিত সব শিক্ষক তাবকবাবুর কথায় বাজি

হয়ে গেলেন। রাজি না হয়ে উপায়ই বা কি আছে। এখন স্কুল বোর্ড আর জেলা পরিদর্শককে রাজি করাতে পারলেই হয়। সে কাজের ভারটা সর্বসম্মতিক্রমে তারকবাবুকেই দেওয়া হল। সিদ্ধান্ত পাকা করে শিক্ষক মশায়রা তাড়াতাড়ি তাঁদের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। প্রাইভেট টুইশনি আছে।

শিক্ষকরা দল বেঁধে বেরিয়ে যাবার মুখে সুশান্তবাবু গোপালবাবুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বললেন, আচ্ছা গোপালবাবু, সবই তো হল। কিন্তু একটা জায়গা ঠিক বুঝতে পারলাম না?

—হেডমাস্টার মশায় তো পুরো কথাটা বাংলাতেই বলেছেন। এর মধ্যে কোন জায়গাটা আপনি বুঝতে পারলেন না?

—না, বলছিলাম কি, ওই যে হেডমাস্টার মশায় বললেন ভোটপত্রটা মুখবন্ধ খামে ঢোকাতে হবে। ওটা কি করে করা যাবে? খামের মুখটা বন্ধ থাকলে কাগজটা ভেতরে ঢুকবে কেমন করে?

শিক্ষক মশায়দের কাজ শেষ হল। এবার শুরু হল তারকবাবুর কাজ। সে কাজে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। স্কুল বোর্ড জেলা পরিদর্শক সবাই এই প্রক্রিয়াটা মানতে রাজি হয়ে গেলেন। স্কুল বোর্ড থেকে তো বলেই দেওয়া হল যে এটা শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এখানে স্কুল বোর্ডের কোনো বক্তব্য নেই। পরবর্তী সময়ে কোনো অভিযোগ না এলেই হল।

এরপর আর কোনো বাধা রইল না। নতুন প্রক্রিয়াতেই ভোট গ্রহণ হল। নির্দিষ্ট দিনে এ আই সাহেব এসে ভোট গণনা করলেন এবং সমীরবাবু ও কুদ্দুস সাহেব নির্বাচিত হলেন বলে ঘোষণা করে দিয়ে চলে গেলেন।

এই নতুন নিয়মের নির্বাচনে তারকবাবুর একটা বড় সুবিধা হল এই যে নিজের দলের জয়ের ব্যাপারে পুরো নিশ্চিন্ত হবার জন্যে তিনি জ্ঞানবাবু আর জ্যোতিবাবুর দুটো এলেবেলে ভোট কান মলে থাপ্পড় মেরে আদায় করে নিতে পেরেছেন।

নির্বাচনে জয়লাভের আনন্দে একদিন মাস্টার মশায়দের সভা ডেকে সমীরবাবু আর কুদ্দুস সাহেবকে অভিনন্দন জানানো হল। মিষ্টিও বিলানো হল। মাধববাবুর দলের মাস্টার মশায়দেরও সেই সভায় মিস্টি খাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু যথারীতি রিগিংয়ের অভিযোগ তুলে মাধববাবুর দল সে সভা বয়কট করলেন। উত্তরে তারকবাবুও সুখেনবাবুর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে তিনি ওইসব অভিযোগকে গুরুত্ব দেন না।

এসব হল পাকা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। গণতন্ত্র থাকলেই ভোট থাকবে। ভোট থাকলেই রিগিংয়ের অভিযোগ থাকবে, সভা বয়কট থাকবে এবং হুমকি পাল্টা হুমকির যুদ্ধ থাকবে। এই না হলে গণতন্ত্র। ভারতের শাসন ব্যবস্থা রচয়িতারা এদেশ-সেদেশের শাসনতন্ত্রের বই থেকে চোথা মেরে কী এক অপূর্ব জিনিসই দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন। সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী পার করেও চিবিয়ে চুষে তার রস আর শেষ হল না। আজও সে সমান রসবতী।

সাকশেস সাকশীড়স্। সাফল্যই সাফল্যের উৎস। তারকবাবু তাঁর কাজে সাফল্যলাভ করে পরবর্তী সাফল্যের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। কাজ এখানেই শেষ নয়। আরো বড় মাঠে খেলতে হবে। কাণ্ডারি তব সম্মুখে ওই পলাশির প্রান্তর। প্রান্তর-টান্তর মারো গোলি। আসলে সামনে আছে বিধানসভার হাতছানি। মস্ত বড় গম্বুজওয়ালা বাড়িটার তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে সুন্দর সুন্দর গদি-আঁটা বেঞ্চি।

ছোটখাটো অপহরণের ঘটনায় এসব খেলা শেষ হয় না। তারকবাবু শেষেরও শেষ দেখে ছাড়বেন। শেষাস্থিরত্বমিচ্ছন্তি। শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে হলে পুরো জিনিসটার একেবারে গোড়ায় কোপ লাগাতে হবে। যাকে বলে স্নায়ুশিরার মূলে ছুঁচ ফোটানো। এ চিকিৎসার নাম আকুপ্যাংচার। স্নায়ুশিরায় মূলে আছেন মাধববাবু আর তাঁর রাজনৈতিক দাদারা। আকুপাংচারের ছুঁচটা ওখানেই ফুঁড়তে হবে। এমন ফোঁড়া ফুঁড়বেন যে আকৃতিটাই পাংচার হয়ে যাবে।

পনেরো

তারকবাবুর আকুপাংচার প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই অন্য একজায়গায় ঘটে গেল এক বড় ধরনের পাংচার। কপালগুণে এবারের পাংচারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে গেলেন নীহারবাবু। সেই নীহারবাবু, যাঁর চোখে সৎ হতে হলে সত্যি সত্যিই সৎ হতে হয়। যাঁর কাছে ভোটের কোনো প্রচারই পাত্তা পায় না, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতো যোগ্য লোককে ভোট দেন। সেই নীহারবাবুকে, যাঁকে রাস্তায় দেখা হলে অনেক উচ্চপদে আসীন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি মাস্টারমশায় বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় সেদিন অন্য কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে নীহারবাবুও পাহারা দিচ্ছিলেন। যদিও চুরি-ডাকাতির ব্যাপার নেই তবু পাহারাই বলতে হবে। পরীক্ষা দিতে বসে টোকাটুকি করা, নকল করা, এগুলো চুরির পর্যায়েই পড়ে। এ অপরাধে শাস্তি পাওয়ার কথা। প্রথম দু'বার নিষেধ আর শেষবার বহিষ্কার।

আধুনিক তরুণ শিক্ষকের দল এ ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। দেয় না দুটো কারণে। প্রথমত তারা নিজেরাই ছাত্র থাকতে পরীক্ষার সময় এসব কাণ্ড করেছে। খুব বেশিদিন হয়নি। সেই সব স্মৃতিগুলো এখনো মনের মধ্যে যথেষ্ট টাটকা। এখন ছাত্রদেরকে সেই একই কাজে বাধা দিলে নিজের কাছে নিজেই অপরাধী হয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত কে ওসব ঝামেলায় যায়। চুপচাপ না দেখার ভান করে থাকলেও তো এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না। তার উপরে ব্যাপারটা যখন গা-সওয়া হয়েই গেছে।

পরীক্ষার ঘরে নীহারবাবু ওদের সঙ্গেই ছিলেন। ওদের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু ওদের সঙ্গে এক চিন্তার শরিক ছিলেন না। ন্যায়বোধ নীতিবোধ সততার যে শিক্ষা নিজের ছাত্র জীবনে অর্জন করেছিলেন সেগুলো আজও সমান যত্নেই মনের মধ্যে লালন করে চলেছেন। পরীক্ষায় বসে ছাত্ররা টোকাটুকি করবে আর উনি সেটা বসে বসে দেখবেন, সেটা মেনে নেওয়া ওঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফল যা হবার তাই হল। নীহারবাবু একটাকে ধরে ঘর থেকে বার করে দিলেন।

এতেই হল মুশকিল। নীহারবাবুর মতো লোকেরা বিদ্যালয়কে পবিত্র মন্দির বলে ভাবেন। আর নিজেদেরকে ভাবেন সেই পবিত্র মন্দিরের পূজারী। এ ভাবনাটা যে কতদূর বিপজ্জনক হতে পারে, নীহারবাবু নিজের জীবন দিয়ে তার পরিচয় রেখে গেলেন।

নীহারবাবু যে ছেলেটাকে পরীক্ষার ঘর থেকে বার করে দিলেন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, স্কুল থেকেও বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেশি দূর গেল না। তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রধান ফটকের বাইরে, রাস্তায়।

পরীক্ষা শেষ হবার পর নীহারবাবু এবং সঙ্গে থাকা অন্য তিনজন শিক্ষক মিলে ছাত্রদের থেকে উত্তরপত্রগুলো সংগ্রহ করলেন। ক্লাশ হিসাবে উত্তর পত্রগুলো মিলিয়ে নিয়ে গোছা গোছা করে তার উপরে ক্লাশের নাম বিষয়ের নাম আর সংখ্যা লিখে সেগুলো প্রধান শিক্ষককে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর নীহারবাবু বুঝে নিলেন তাঁর নিজের বিষয়ের উত্তরের খাতাগুলি। সেগুলো তাঁকেই দেখতে হবে। খাতার বাণ্ডিল হাতে নিয়ে সমীরবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে স্কুলের প্রধান ফটক পার হয়ে বাইরের রাস্তায় বার হলেন।

যে ছেলেটাকে পরীক্ষার ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন, সে ওখানেই দাঁড়িয়েছিল। পাশের ছেলেটাকে ইঙ্গিতে নীহারবাবুকে চিনিয়ে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সে ছেলেটা এগিয়ে এল। নীহারবাবুর একেবারে মুখোমুখি এসে পথ আগলে দাঁড়াল। পথ আটকে যাওয়ায় নীহারবাবু থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটিকে নিজের ছাত্র অথবা

কোনো প্রাক্তন ছাত্র ভেবে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসার চোখ তুলে চাইলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে করতে পারলেন না এই ছেলেটি কোন ক্লাশে পড়ে অথবা কোন বছর পাশ করেছে।

হঠাৎই নীহারবাবুর গলা ভেতর থেকে একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে এলো। পেছনের দিকে ঢলে পড়ে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমীরবাবু দু'হাত বাড়িয়ে নীহারবাবুকে জাপটে ধরলেন। ওঁর শরীরের সমস্ত ভারটাই গিয়ে পড়ল সমীরবাবুর উপরে। নীহারবাবুর তখন জ্ঞান নেই।

প্রথমটায় সমীরবাবুও কিছুই বুঝতে পারেন নি। সেই অপরিচিত ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল। পথ চলতি অন্যান্য লোকের ভিড়ে মিশে গেল। তার হাতের রক্তমাখা ছোরাটা চকিতের জন্যে সমীরবাবুর চোখে পড়ল। তারপরেই সে ছোরাসুদ্ধ অদৃশ্য।

এপাশ-ওপাশ থেকে জনাকয়েক লোক এগিয়ে এল। দু'একজন দৌড়ে ছেলেটাকে ধরার বৃথা চেষ্টাও করল। কিন্তু ধরবে কি, কেউ তো ছেলেটার বেশি কাছে যেতেই সাহস পায় না। ভয় বাঙালির মনের ভূষণ। এই একটা জায়গাই আছে, যেখানে বাঙালি পৃথিবীর সব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

নীহারবাবু তখন রাস্তার মধ্যে সমীরবাবুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। পেটের কাছে পাঞ্জাবিতে একটা ছোট ফুটো। কিন্তু ছুরির ফলাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে আসা রক্তের পরিমাণ অনেক বেশি। নীহারবাবুর পেট ভেসে যাচ্ছে তরল তাজা রক্তে। ন্যায়বোধ নীতিবোধ সৎ শিক্ষকতার মাসুল 'রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে' দেবী সরস্বতীর শেষ পুষ্পাঞ্জলি।

ছেলেটাকে সামনে দেখে নীহারবাবু হয়ত তাকে নিজের কোনো প্রাক্তন ছাত্র বলেই ভেবে নিয়েছিলেন। রাস্তাঘাটে এরকম অনেক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়। তারা প্রণাম করে। উনি তাদের কুশল প্রশ্ন করেন। মঙ্গল কামনা করেন কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই যখন তার হাতের অস্ত্রের মারাত্মক আঘাতটা পেতে হল তখন জ্ঞান হারাবার আগে মুহূর্তকালের জন্যে কি জানি তিনি বেদনাহত হওয়ার চেয়ে বিস্ময়াহতই বেশি হয়েছিলেন। এ-ও কি হতে পারে? 'ফর হোয়েন দ্য নোব্‌ল্ সীজার শ হিম স্ট্যাব, ইন্‌গ্রাটিচিউড মোর স্ট্রং দ্যান ট্রেচার্‌স্ আর্মস্ কোয়ায়েট ভ্যাঙ্কুইশ্‌ড্ হিম। দেন বার্স্ট হিজ মাইটি হার্ট।'

হাসপাতালে ঘোষণা করা হল, নীহারবাবু মৃত।

পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমা করবেন। এইখানে এসে কলম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গুছিয়ে লিখতে পারছি না। গত শতাব্দীতে মহাযুদ্ধের নারকীয় হত্যালীলার মধ্যে দাঁড়িয়েও গুরুদেব শিক্ষা দিয়ে গেছেন—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তিনি মানুষের মধ্যে দেবত্ব সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের কাছে এক প্রত্যয়িত প্রশ্ন রেখে গেছেন—'নিদারুণ দুঃখরাতে মৃত্যুঘাতে মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা, তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?' খুবই দুঃখের কথা যে আজ এই মুহূর্তে আমরা সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছি। মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে দেখছি পিশাচকে। ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আমার অন্য কোনো রাস্তা নেই।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্মে পশ্চিম পারের মহাকবি অবস্থাটাকে বর্ণনা করে বলে গেছেন—দেন আই অ্যাণ্ড ইউ অ্যাণ্ড অল অফ আস ফেল ডাউন, হোয়াইল্‌স্ট্ ব্লাডি ট্রিজন্‌স্ ফ্লারিশ্‌ড্ ওভার আস। আর তারও তিনশো বছর পরে জন্মে পূর্বপারের মহাকবি উত্তর খুঁজেছেন—'কারে দোষ দেবে বন্ধু, এ আমার এ তোমার পাপ। বিধাতার বক্ষে এই তাপ বহুকাল হতে জমি বায়ু-কোণে আজিকে ঘণায়।

নীহারবাবু কি শেষ পর্যন্ত জেনে যেতে পেরেছেন কীসের জন্যে তাঁকে জীবন দিতে হল? হয়ত হ্যাঁ, হয়ত না। কিন্তু আমরা তো জানলাম। সমাজ নীহারবাবুর ঋণ কী করে শোধ করে সেটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব। ওই ছুরিটা নীহারবাবুর পেটে ঢোকেনি, ঢুকেছে সমাজের বুকে। ওইখানে রাস্তায় নীহারবাবু লুটিয়ে পড়েন নি, পড়েছে সমাজ। সেই সমাজ, যা একটা দেশের, একটা জাতির ছোট থেকে বড় সবাইকেই একটা বিশেষ কালের মধ্যে সমমর্যাদায় গ্রথিত করে রাখে। সেই সমাজ, যার মঙ্গল কামনায় আমরা প্রার্থনা করি—সর্বেযোং মঙ্গলং ভূষাৎ সর্বে সন্তু নিরাময়। সর্বে ভদ্রানি পশান্ত মা কশ্চিদ দুঃখভাক্ ভবেৎ। কিছু মানুষ আজও আছে যারা এই সমাজের বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় চ, নিজের যথাসম্ভব অবদানটুকু উৎসর্গ করে আনন্দ পায়। নীহারবাবু ছিলেন তাদেরই একজন।

ষোলো

স্কুলে খুব জমজমাট শোকসভা হল। মাস্টার মশায়রা দলাদলি ভুলে খুব জোরালো ভাষণ দিলেন। খোলাখুলি নীহারবাবুর নানা গুণের বর্ণনা দেওয়া হল। গুণের কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ কথা খুঁজে না পেয়ে নীহারবাবুর এমন সব গুণের কথা বলতে লাগলেন যা কস্মিনকালেও তাঁর ছিল না। আর থাকলেও সুশিক্ষক হবার জন্যে সে সব গুণ তাঁর না থাকলেও চলত। যেমন, নীহারবাবু নাকি এমনই অমায়িক ছিলেন যে কাউকে টাকা ধার দিয়ে সেটা ফেরৎ চাইতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। কিংবা জীবনে উনি কোনোদিন সাহেবি কায়দায় কোট-প্যান্ট তো পরেনই নি এমনকি কোঁচা ছাড়া ধুতি পরা অবস্থাতেও নাকি ওঁকে কেউ কোনোদিন দেখেনি। এ ছাড়া উনি নাকি কালীর চেয়ে কৃষ্ণকেই বেশি ভক্তি করতেন। ছাত্ররা এতদিন ওদের ওই শিক্ষকের পড়ানোটা ভালোবাসত, ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করত আর বেতকে ভয় করত। কিন্তু তার বাইরেও তাঁর যে এত গুণ ছিল সেটা তারা জানল এই প্রথম।

মাস্টার মশায়রা সবাই নীহারবাবুর আদর্শ অনুসরণ করার জন্যে ছাত্রদের উপদেশ দিলেন। কিন্তু নিজেরা ওঁর আদর্শ অনুসরণ করতে গেলে যে হাঁড়ির ভাত শুকিয়ে দড়কচা মেরে যাবে সেটা বুঝেও চেপে গেলেন। সব শেষে নীহারবাবুর আত্মার শান্তি কামনায় দু'মিনিট নীরবতা পালনের ঠিক আগেই সর্বসম্মতিক্রমে পুলিশ আর সরকারের কাছে দাবী জানানো হল নীহারবাবুর আততায়ীকে খুঁজে বের করে অবিলম্বে তার যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মাস্টারদের দু'পক্ষের বয়ানে বা ব্যাকরণে কোনো পক্ষ ঘুণাক্ষরেও না মনে করতে পারে যে আততায়ীকে তাদের দলের কর্মী বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

এ যুগে এই একটা কাজ খুব সহজ। বলতে গেলে সব চাইতে সহজ। দাবী পেশ করা। এ কাজে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না, পয়সা খরচ করতে হয় না, কোনো দায়-দায়িত্ব নিতে হয় না, এমনকি মাথা খাটিয়ে কোনো ভাবনা-চিন্তাও করতে হয় না। 'মুফতে'র দাবী 'মস্তিসে' পেশ করে যাও। নিপীড়ত জনগণের স্বার্থে, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে, কৃষকদের স্বার্থে, ইত্যাদির স্বার্থে দফায় দফায় গণ্ডায় গণ্ডায় শুধু দাবী পেশ হচ্ছে। হিসাব করলে কিংবা হিসাব-টিসাব না করে শুধু আন্দাজ করলেই বোঝা যাবে, স্বাধীন হবার পর থেকে এ দেশে যত দাবী পেশ হয়েছে—'তাহার মধ্যে যদি কিছুমাত্রও সারপদার্থ থাকিত' তবে তা দিয়ে হিমালয় না হলেও অন্তত একটা নদীবাঁধ নিশ্চয় তৈরি হয়ে যেত।

ওদিকে আবার যাদের কাছে দাবীগুলো পেশ করা হচ্ছে তাদের পক্ষেও সবচেয়ে সহজ কাজ হল ওই সব দাবীগুলোকে পাত্তা না দেওয়া। এই রকমটাই চলেছে চলছে আর চলবেও।

রাজনীতির আবর্তে পড়ে অবশ্য একটা দাবীর কথা কারো মনে এল না যে নীহারবাবুর প্রাপ্য গ্র্যাচুইটির টাকাটা যেন তাঁর বিধবা স্ত্রীর হাতে তাড়াতাড়ি তুলে দেওয়া হয়। ওসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কারো সময় নেই।

সময় কারো জন্যে বসে থাকে না। নীহারবাবুর

এরকম দুঃখজনক পরিণতির জন্যে ছাত্র-শিক্ষকরা কিছুদিন মনমরা হয়ে রইল। কিছুদিন ধরে ওটাই হয়ে রইল তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। তারপর আস্তে আস্তে বাস্তবের উপর বিস্মৃতির আস্তর। স্কুল তার নিজের অবস্থায় ফিরে গেল।

পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এই হল যে শিক্ষকের সংখ্যা যেমন এক কমে গেল, তেমনই ছাত্রও একটা কমে গেল। যে ছেলেটাকে নীহারবাবু পরীক্ষার হল থেকে বের করে দিয়েছিলেন সে সেই যে বেরিয়ে গেল আর স্কুলমুখো হল না। ওরা এক একটি মুকদ্দর কা সিকন্দর। বৃহৎ সমুদ্রের তিমি। স্কুলের ছোট পুকুরে কি তাদের জায়গা হয়?

সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে থানার বড়বাবুও। বসে আছে তো বসেই আছে। সময় আর আসে না। স্কুলটার নানা ভজকট কাজ-কারবারের খবর তার কানে আসছে। তার নিজের কাজটা করার আর সময় হচ্ছে না।

উপর থেকে হুকুম এসেছে থানার পুলিশ আর স্কুলের ছাত্ররা মিলে ফাংশন করতে হবে। গান-বাজনা থিয়েটারের আসর বসাতে হবে। তাতে নাকি জন সংযোগ বাড়বে। জন সংযোগটা আসলে কী বস্তু সেটা বড়বাবুর ঠিক মাথায় খেলে না। পুলিশের কাজ তো চোর-ডাকাত ধরা। যারা টাকা দিতে পারবে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া কিংবা কেস হালকা করে দেওয়া। আর যারা মালকড়ি খাওয়াতে পারবে না তাদেরকে লকআপের মধ্যে বেধড়ক ঠ্যাঙানি দেওয়া কিংবা পিটিয়ে সাবাড় করে দেওয়া। কিছু কিছু দাগিদের কাছ থেকে সেরেফ লকআপের ভয় দেখিয়েই টাকা খাওয়া, পাড়ার দোকানদার আর হকারদের কাছ থেকে নিয়ম মাফিক তোলা আদায় করা—এই সমস্ত। এইসব করতে করতে তো যথেষ্ট জন সংযোগ এর মধ্যেই হয়ে গেছে। আর এই সব জন সংযোগ থেকে পাওয়া টাকার ভাগের ভাগ তো ঠিক সময়েই উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আবার সেই জন সংযোগ আরো বাড়াবার কী দরকার পড়ল? তার মানে কি এখন যা আদায় হচ্ছে তাতে কুলোচ্ছে না? বাজেটে ঘাটতি চলছে? জন সংযোগ আরো বাড়ালে কি জনসাধারণ সবাই লাইন লাগিয়ে থানায় টাকা জমা দিয়ে যাবে? হতেও পারে। এসব হাই-ফাই ব্যাপার বড়সাহেবরাই ভালো বোঝে।

কিছুদিন আগেও ওইরকম একটা ফরমান এসেছিল। জন সংযোগ বাড়াবার জন্যে পাড়ার ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল খেলতে হবে। তা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে সে ফুটবল খেলা আরম্ভও হয়েছিল। কিন্তু আরম্ভ হলে কি হবে, খেলাটা শেষ হয়নি। মাঝপথেই শুরু হয়ে গেছল মারামারি। পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা গরম। পুলিশের শুধু মাথা নয়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবকিছুই গরম। ভয়ের চোটে রেফারিটা বাঁশি-টাসি ফেলে দিয়ে একটা ছুটন্ত বাসে লাফ দিয়ে উঠে কোথায় যেন পালিয়ে গেল। আজও ফেরেনি। যারা মাঠে খেলতে নেমেছিল তার মধ্যে জনা পাঁচেক কনস্টেবল মাঠ থেকেই স্ট্রেচারে শুয়ে সোজা হাসপাতালে। সেখান থেকে যে মর্গে চালান হতে হয়নি সেটা তাদের বৌদের ভাগ্য। ওদিকে বিচ্ছুগুলো ঢেলা মেরে পাড়ার সব ক'টা ল্যাম্পপোস্টের বাল্ব ভেঙে দিয়েছিল। তাইতে পাড়ায় সারা রাত ধরে ব্ল্যাক আউট। আর অন্ধকারে বদমাইশগুলোর পিছু ধাওয়া করতে করতেই রাত কাবার। তার মানে আরম্ভ হয়েছিল ফুটবল খেলাই, কিন্তু শেষ হল গিয়ে অন্য একটা খেলায়। খেলা তো নয়, একটি জমজমাট কেলো।

বড়বাবু থানায় তাঁর নিজের চেয়ারে বসে ভাবছেন। চেয়ারটার পেছনদিকের একটা পায়া নড়বড়ে আছে। হেলান দিতে গেলে ওই দিকে হেলে পড়ে। চাপ বেশি হয়ে গেলে আর হেলে পড়া নয় পুরো পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই সেটাকে আলমারির সঙ্গে সেঁটে সেট করে বসানো আছে। মেজবাবু একবার এটার বদলে অন্য একটা চেয়ারে বসার কথা বলতে গেছল। কিন্তু মেজবাবুর পরামর্শকে তাঁর ভুঁড়ির দিকে কটাক্ষ মনে করে বড়বাবু খুব চটে গেছলেন। —তুমি কী ভাবো হে ইসলাম। একটা পা একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে বলেই চেয়ারটা আমার ভার সইতে পারবে না? তার মানে তুমি আমার ভুঁড়িকে কটাক্ষ করছ? সারা থানার মধ্যে এই একটাই মাত্র গদি-সাঁটা চেয়ার আছে। সেটা ছেড়ে আমাকে তুমি তোমাদের মতো কাঠের চেয়ারে বসতে বলো? জানো, এটাকে আমি ইন্‌সাবডিনেশন টু এ সিনিয়ার অফিসার বলে তোমার নামে চার্জ আনতে পারি? অন্য চেয়ারে বসার কথা না বলে তুমি এই চেয়ারটা তাড়াতাড়ি সারাবার ব্যবস্থা করো। যত তাড়াতাড়ি সারাবে তত তাড়াতাড়ি তোমার প্রমোশন।

চেয়ার সারিয়ে দিলে প্রমোশন হবে, কথাটা মনে মনে বিশ্বাস না করলে কি হবে বড়বাবুর ভাষণের তোড়ে মেজবাবু চুপ। —হ্যাঁ স্যার, ঠিক স্যার—এইসব বলতে বলতে ঘর থেকে কেটে পড়েছিল। থানার নানা কাজের চাপে সে চেয়ার আজও সারানো হয় নি। নড়বড়ে পা-টা পেছনদিকে থাকায় সাধারণ ভাবে সেদিকে কারো নজরও পড়ে না। কাজও মোটামুটি চলে যাচ্ছে। মাঝেসাঝে বড়বাবু একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লেই যা একটু গড়বড়। নড়বড়ে পায়াটা তখন চেয়ারটাকে নাড়িয়ে দিয়ে বড়বাবুকে গড়িয়ে দেবার ভয় দেখায়। তবে বড়বাবু পুলিশের লোক তো, এসব মানিয়ে নিতে পারেন। আজ পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি।

বড়বাবু চেয়ারে বসে আছেন। ওঁর বপুটা চেয়ারে। চোখ-কান সুদ্ধ মুণ্ডুটা বপুর উপরে, হাত দুটো হাতলে, পা দুটো টেবিলে, জুতোজোড়া নিচে আর নড়বড়ে পায়াটা পিছে। এই পোজেই নাকি বড়বাবুর ভাবনাগুলো খেলে ভালো। উনি ভাবছেন, সেবারে ছিল ফুটবল খেলে জন সংযোগ, এবারে হবে ফাংশন করে জন সংযোগ। উত্তেজনাটা ফুটবলের চেয়ে কোনো অংশে কম তো নয়ই, বরং বেশি। মারদাঙ্গা সামলাবার জন্যে আগে থেকেই তৈরি থাকতে হবে।

সে না হয় তৈরি থাকা যাবে। পুলিশের কাজই হল তৈরি থাকা। সেটাই তাদের বিধিলিপি। কিন্তু ফাংশনটাই যে করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই দুম্ করে ফাংশনটা লাগিয়ে দিতে হবে। উপরওয়ালার হুকুম মতো ফাংশনটা করতে পারলেই হল। তাতে জন সংযোগ বাড়ল কি বাড়ল না সেটা যাদের জন সংযোগ তারা বুঝবে। বড়বাবু খাঁটি পুলিশ অফিসার। ফায়ার অর্ডার হয়েছে, ফায়ার করো। তাতে কাকটা মরল কি বকটা মরল, সে চিন্তা তোমার নয়, তুমি নিজে না মরলেই হল।

বড়বাবু মেজবাবুকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। —কই হে ইসলাম, তোমার ওদিককার খবর কি?

মেজবাবু জিজ্ঞাসু চোখে বড়বাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। দিক তো অনেক। রাস্তার হকার থেকে তোলা আদায়, দোকান থেকে চাঁদা আদায়, গুণ্ডামি, টিকটিকিদের কাছ থেকে ঠিকঠাক খবর চালাচালি, দিকের কি শেষ আছে? এত সব দিগ্বিদিকের খবরাখবর সবই সামাল দিতে হয় মেজবাবুকেই। মাঝে মাঝেই দিগ্‌ভ্রম হয়ে যাবার অবস্থা। এখন বড়বাবু কোন দিকের কথা জানতে চাইছেন কে জানে।

—ওই যে তোমাদের হেড মাস্টারের বাচ্চার খবর জানতে চাচ্ছি। ইস্কুলে ফাংশনটা কবে করা যাবে?

এবারে মেজবাবু সামনের চেয়ারে জুত করে বসলেন আর বড়বাবুর পা দুটো টেবিল থেকে নেমে জুতোয় গিয়ে ঢুকল।

—ওদের ইস্কুলে তো একটার পর একটা গণ্ডগোল লেগেই আছে। ক'দিন আগে কী একটা নির্বাচন করতে গিয়ে ছাত্ররাই দুটো মাস্টারকে গুম করে দিয়েছিল। সে দুটো নাকি ছিল হেড মাস্টারের দলের। হেড মাস্টারের উল্টো দিকে আছে মাধববাবু

নড়ে একটা লোক। সে অন্য একটা পার্টির। এদিকে হেড মাস্টাবের হাতটা যেমন লম্বা তেমনি ওদিকে মাধববাবু লোকটার হাতও খুব তাগড়া। দু'জনেই পার্টির উপরতলা পর্যন্ত টান লাগাতে পাবে। তাই টক্করটা চলেছে প্রায় সমানে সমানে। ইস্কুলটা হয়েছে একটা কুস্তির আখড়া। দু'পক্ষই মালকোঁচা মেরে দাব্‌না থাপড়াচ্চে। যেন গজ কচ্ছপের লড়াই।

—তা তুমিই বা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছ কেন? তুমিও লেগে পড়ো। একবার এ-পক্ষ একবার ও-পক্ষের দু'চারটেকে ধরে এনে বেধড়ক পিটিয়ে দাও। তোমারও হাতের সুখ হবে আবার দু'পক্ষ ঠাণ্ডাও থাকবে।

—সে তো পারিই স্যার। তারকবাবু মাধববাবু দুটোই এককালে আমার টিচার ছিল। ছাত্র থাকতে দু'জনের কাছেই আমাকে চড়-চাপড় খেতে হয়েছে। এখন মুখ লজ্জার খাতিরে নিজে না পারলেও সিপাই দিয়ে ওদেরকে পিটন লাগিয়ে বদলা নিতে পাবি। কিন্তু ওই যে, দু'জনেরই হাত খুব লম্বা। পিটন লাগালে হৈ হৈ পড়ে যাবে। কি জানি হয়ত জবাবদিহিও করতে হতে পারে। এস পি সাহেব, কমিশনার সাহেব—দু'জনেই ওদেরকে চেনেন।

—তুমি হাসালে হে ইসলাম। পুলিশে পেটাবে, তার আবার জবাবদিহি? যে দেশে লাশ ফেলে দিলেও পুলিশকে জবাবদিহি করতে হয় না সে দেশে পেটানোর জন্যে জবাবদিহি? ওসব কিচ্ছু নয় হে, কিচ্ছু নয়। প্রথম প্রথম একটু হৈ-হল্লা চিৎকার-চেঁচামেচি হবে, তারপর নিজে নিজেই সব ঠাণ্ডা মেবে যাবে। পিটুনি খেয়ে লাশ হযে গেলে তাদের তো কথাই নেই, যারা নুলো হয়ে যায় কিংবা লেংচে হাঁটে, তারাই যা একটু আধটু মনে রাখে। বাকিদেব থোড়াই দায় পড়েছে ওসব কথা মনে রাখতে। তাদের অন্য অনেক কাজ আছে হে। এর নাম হল পাবলিক মেমাবি। এ মেমাবি বর্ধমান নয়। স্রেফ লেলুয়া। তার মানে হল লে হালুয়া। আজ মনে রইল তো কাল ফৌত।

নিজের বসিকতায় বড়বাবু নিজেই ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসতে লাগলেন। মেজবাবু ভয়ে ভযে চেয়ারের নড়বড়ে পায়াটার কথা ভেবে সিঁটিয়ে রইলেন। ভেঙে পড়ে গেলে তো কেলেঙ্কারি। তখন আর লেলুয়া বর্ধমান থাকবে না, হয়ে যাবে স্রেফ উল্টোডাঙা। মাথা নিচে পা উপরে।

ইসলামেব ভয়কে পাত্তা না দিয়ে বড়বাবু শরীরে চেয়ারেই বসে রইলেন। বললেন, আসল কথাটা বুঝতে পেরেছি। লোকগুলো তোমার নিজেরই মাস্টার বলে পেটাতে হাত উঠছে না। তা মাস্টারদের না পারো ছাত্রদেরই দু'চারটেকে ধরে এনে পিটিয়ে দাও। তাতেই বাকিগুলো ভয় পেয়ে যাবে।

ইসলাম কোনো উত্তব দিল না। মনে মনে ভাবল— পেটানোর সাধ তারই কি আব কিছু কম? কিন্তু পেটাতে গেলেও সবদিক আটঘাট বেঁধে এগোতে হয়। আগাপাশতলা না ভেবে যখন-তখন যাকে তাকে ধরে এনে পেটালে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে কতক্ষণ? ভুল করে ত্যাঁদোড় জায়গায় হাত পড়ে গেলে লালবাজারের বেকর্ড রুমে বসে বসে ফাইলের ঝুল ঝাড়তে হতে পাবে।

ছাত্রদের কথা উঠতেই বড়বাবুর মনে পড়ে গেল।—আরে যেটা বলার জন্যে তোমাকে ডাকলাম সেটাই তো ভুলে যাচ্ছি। ইস্কুলে ফাংশনটা কবার কদ্দুর কি হল? এস পি সাহেব তো রোজ রোজ তাগাদা দিচ্ছেন। অন্য কোনো কোনো থানায় কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে, আমবাই পিছিয়ে আছি। এ রকম চলতে থাকলে তো লালবাজারের রেকর্ড রুমে চালান হয়ে যাব হে।

রেকর্ড রুম জিন্দাবাদ। এ এমন একটা জায়গা যাকে দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসাররাও ভয় পায়।

বড়বাবুর মুখে ট্রান্সফারের কথা শুনে মেজবাবুর চোখদুটো চকচক করে উঠল। আহা রে! সে দিন আর কদ্দূর। বড়বাবু হঠে গেলে ওই চেয়ারটা তো তারই হয়ে যাবে। ওটাতে বসতে পেলে তখন কী মজাটাই না হবে। অবশ্য বসার আগে নড়বড়ে পায়াটাকে নিশ্চয় সারিয়ে নিতে হবে। ওসব নড়বড়ে পায়াভাঙা চেয়ার ওই বুড়ো-হাবড়া বড়বাবুকেই পোষায়। ইসলামের ওসব পোষাবে না। হাবড়ার কথাটা মনে আসতেই ইসলামেব হাসি পেয়ে গেল। বড়বাবু ওদিকে মুখে মেরে যাচ্ছে মেমারি বর্ধমান, এদিকে নিজে যে হাবড়া হয়ে বসে আছে তার খবর রাখে না।

মনসা চিন্তিতং কর্মং বচসা মা প্রকাশয়েৎ। মনের ভাব খবরদার মুখ দিয়ে বেব কববে না। ইসলাম ওসব সংস্কৃত শ্লোক-টোকেব ধাব ধারে না ঠিকই কিন্তু উপদেশটা মেনে চলে। তাই মুখেব ভাবে প্রচুর পরিমাণে বিনয় মাখিয়ে একেবারে বিনায়ক গড়সে হয়ে গিয়ে বলল, ঠিক আছে স্যাব, আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনি কিছু ভাববেন না স্যার।

আগে স্যার পিছে স্যার। অসাব সংসাবের সারাৎসার হল ওই স্যার। ওটাই সারকথা।

সতেরো

তারকবাবু তাল খুঁজছিলেন মাধববাবুকে জব্দ করার। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। ঘটনাটা আপনা আপনিই ঘটে গেল।

ভাদ্র এলে তাল আপনা আপনি পড়ে। কাউকে বলে দিতে হয় না। গাছেব গোড়ায় বানের জল লাগলে তো আব কথাই নেই। দিনরাত দুম্‌দাম্‌ পড়তে থাকে। তবে তালের ব্যাপার তো, যখন পড়ে তখন দুম করেই পড়ে। কখন পড়ছে কোথায় পড়ছে কার মাথায় পড়ছে তার কোনো তালজ্ঞান থাকে না। তালকানা কি এমনি বলে?

সেই রকম তাল একটা পড়ল। আর এমন পড়া পড়ল যে স্কুলসুদ্ধ কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল।

সেদিন প্রথম ঘণ্টায় পড়াবার জন্যে সপ্তম শ্রেণীতে ঢুকেই মাধববাবু দেখলেন কোনো এক প্রতিভাবান উঠতি চিত্রকর কালো বোর্ডের উপব সাদা চক-পেন্সিল দিয়ে একটি বিচিত্র রকমেব চিত্র এঁকে রেখেছে। চিত্রটি আঁকা হয়েছে ভেনাসের সেই বিখ্যাত ভাস্কর্যটিব অনুসরণে। যদিও গুণমানেব দিক দিয়ে তাব শতহস্ত কেন সহস্র হস্তের কাছাকাছিও যায় না তবু রূপকল্পটা সেই রকমই।

এ রকম একটা ছবি আঁকার স্বপক্ষে যুক্তি কিছু কিছু খাড়া করা যেতেই পারে। প্রথমটা হল, শিল্পীর স্বাধীনতা। ছবির বিষযবস্তু নির্বাচনে আর তার রূপকল্পের বিন্যাসে শিল্পীব স্বাধীনতায় কেউ হাত দিতে পারে না। আর দ্বিতীয়টি হল, এই রকম একটা মূর্তি তৈবি করে ষোড়শ শতাব্দীতে যদি মাইকেল অ্যাঞ্জেলো প্রশংসা পেয়ে থাকতে পারে তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে বেচারা বঙ্গ নন্দনের কী অপরাধ? তাছাড়া উদাহরণ তো হাতের কাছেই আছে। গত শতাব্দীতে সরস্বতীব ওই রকম একটা ছবি এঁকে এক নামকরা চিত্রশিল্পী তো দেশময় সোবগোল ফেলে দিযেছিলেন। ছবিটা দেখে অনেকেই খুব লম্ফঝম্ফ কবেছিল। একদল বাগে অন্যদল অনুরাগে। অনুরাগীদের বক্তব্য ছিল, এটা শিল্পীর স্বাধীনতা, আর্টের জয়-জয়াকার।

তবে শিল্পীর স্বাধীনতা আর আর্টের জয়-জয়াকার মেনে নিলেও মোদ্দা কথাটা এই থাকে যে ওরকম ছবি এঁকে শিল্পীব স্বাধীনতা ঘোষণাব জায়গা ক্লাশের ব্লাকবোর্ড নয়। তাব ক্ষেত্র অন্যত্র। অঙ্কের শিক্ষক মাধববাবু সেই যুক্তিতেই এগোলেন। হুঙ্কার দিযে জানতে চাইলেন,—কে এই ছবি এঁকেছে?

যে ছবিটা এঁকেছিল সে তো আর সত্যি সত্যি মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আঁকেনি। অনুপ্রেবণা দূরেব কথা, ওরকম একটা বদখত নামই সে কোনোদিন শোনে নি। এবকম একটা ছবি আঁকাব পেছনে ছিল নিছক অকালপক্ক প্রবৃত্তি। আব সেই সঙ্গে ক্লাশেব মধ্যে হিরো হবার একটা মস্তান সুলভ ইচ্ছা। সে মনে মনে ভালো করেই জানত যে এবকম একটা শিল্পকীর্তির পুরস্কার হিসাবে মাস্টার মশায় তাকে কোলে বসিয়ে আদব করবে না। তাই সে মাধববাবুর হুঙ্কারেব উত্তবে এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বলল

না যে এই শিল্পকীর্তিটা তারই। ক্লাশসুদ্ধ সবাই চুপ।

অপরাধীকে দিয়ে অপরাধ কবুল করানোর জন্য পুলিশ থার্ড ডিগ্রি খাটায়। থার্ড ডিগ্রি কথাটার এক কথায় কোনো বাংলা হয় না। বলেও বোঝানোর জিনিস নয়। যারা এর পাল্লায় পড়ে তখন তাদের হাড়ের সঙ্গে মাংসটা যখন ময়দা-ঠাসা হতে থাকে তখন তারাই, একমাত্র তারাই, হাড়ে হাড়ে বুঝে যায়, কী মোলায়েম এই আদর। তা সে যাই হোক মাধববাবুকে অত দূরে যেতে হল না। তার আগেই অপরাধী ধরা পড়ে গেল।

ছবিটা আঁকা হয়েছিল একক্লাশ ছাত্রের চোখের সামনেই। সবাই জানত ছবিটা কে এঁকেছে। তাই তাদের কানাঘুষা গুজ্গুজ্ ফিসফিসেব মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল যে এই কীর্তিটি সুবোধ নামের এক সুবোধ বালকের।

এইবার মাধববাবু খাটালেন তাঁর থার্ড ডিগ্রি। ঠাস কবে সুবোধেব গালে পড়ল এক চড়। মাধববাবু সুবোধের কান ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বোর্ডের কাছে আর তাকে দিয়েই পরিষ্কার করালেন পুরো বোর্ডটা।

বাপ্ রে। ছাত্রের গালে চড়। এ যুগে বাপের গালে চড় মারলে দোষ হয় না, নিজের গালে চড় মারা তো বিনোদন, কিন্তু ছাত্রের গালে চড়। সে দোষের কোনো মাফ নেই।

আগের দুই শতাব্দী ধরে বাঙালি গুরুমশাইরা পাঠশালায় ছাত্রদের অনেক পিটেছেন। আছোলা কঞ্চি দিয়ে পেটানো হত বিদ্যাদানের অছিলায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্যার সঙ্গে বেতের বিন্দুমাত্র বনিবনা থাকত না। যে গুরু যত বড় মূর্খ সে তত বেশি পেটাত। যে যত বেশি পেটাত সে তত বড় গুরুমশায়। পড়ুয়াকে পেটাতে পারাটাই ছিল গুরুমশায়ের গুরুত্ব মাপার কাঠি। ছেলেকে হাতে ধরে বাবা যখন গুরু মশায়ের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়ে যেত তখন বলে দিত, গুরুমশায়ের পিটুনি না খেলে ছেলে মানুষ হবে না। পিটিয়েই ছেলেকে মানুষ কবতে হবে।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসে ছাত্রকে প্রহার করাটা শিক্ষক মশায়ের দারুণ অপরাধ। মাধববাবুর ধৈর্য হারানোর স্বপক্ষে যত কাবণই থাকুক, ছাত্রকে প্রহাব করার অপরাধে তিনি অপরাধী। বিশেষ করে সে ছাত্রটি যদি হয় সুবোধের মতো সুবোধ বালক।

সুবোধ বালকটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। আসল পরিচয় ক্রমশ প্রকাশ্য।

গল্পে আছে, এক ধনী আর এক গরিব মরাব পর পুনর্জন্ম লাভেব আগে ভগবানেব দরবারে পেশ হল। দু'জনেরই পুণ্যের থলিতে সিকি দুয়ানি কিছু কিছু জমা ছিল। সেই সুবাদে ভগবান প্রশ্ন করলেন, পরের জন্মে কে কী হয়ে জন্মাতে চায়। আগেব জন্মে গরিব থাকা লোকটা না খেয়ে থাকার কষ্টটা হাড়ে হাড়ে, মানে আর কি, পেটে পেটে বুঝেছে। তাই একান্ত মনে প্রার্থনা করল পরের জন্মে ধনী হতে চায়। আর আগের জন্মের ধনী থাকা লোকটা মুচকি হেসে বলল, আমি ওর ছেলে হয়ে জন্মাতে চাই প্রভু। সে জানত, নিজে ধনী হওয়ার চেয়ে ধনীর ছেলে হলে ফযদা অনেক বেশি।

এটা যে যুগেব গল্প তখনো নেতা নামের জীবটিব আবির্ভাব হয় নি। আর মন্ত্রী জিনিসটাও গজায় নি। এ যুগ হলে ওই চালাক লোকটা নিশ্চয আর্জি জানাত, আমি মন্ত্রীর ছেলে হতে চাই হুজুর।

এ রকম অতিচালাক মন্ত্রীর ব্যাটা এ দেশ স্বাধীন হবাব পব থেকে এই আধশতাব্দীতে বেশ কিছু পয়দা হয়েছে আর দেশটাকে ময়দাদলা করে তাদের ফয়দা তোলার কায়দাটা দেশের লোক হববোজ দু'চোখ ভরে দেখছে। সুবোধ বালকটির বোধহয আগের জন্মে পুণ্যের পাশবইতে জমার অঙ্ক একটু কম ছিল, তাই মন্ত্রীর ব্যাটা না হয়ে কাউন্সিলারেব ব্যাটা হয়ে জন্মেছে।

শিক্ষকের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে শ্রীমান সুবোধ বইখাতা ফেলে দৌড়ে ক্লাশঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্কুল থেকেও বেরিয়ে গেল। কিন্তু ওই যে ছেলেটি বেরিয়ে গেল, সে কি ইতিহাসের ধারা বজায় রেখে হাজার স্কুল পালানো ছেলেব সংখ্যা আরো একটি বাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল? হিস্ট্রি রিপিট্‌স্ ইটসেল্‌ফ্। ইতিহাস নাকি যুগে যুগে পুনরাবৃত্ত হয়। এক্ষেত্রেও হয়ত তাই হল।

তবে একটু অন্য রূপে। রূপটা হল—আমি যুগে যুগে আমি আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু।" বিপ্লব তো নয়, একেবারে উপপ্লব। উপপ্লবটি ঘটল পঞ্চম পিরিয়ডে। প্রথম পিরিয়ডে ক্রিয়া, পঞ্চম পিরিয়ডে প্রতিক্রিয়া।

পহেলা প্রহরমে সব কোঈ জাগে দুসরা প্রহরমে ভোগী। তিস্‌রা প্রহরমে তস্কর জাগে চৌঠা প্রহরমে যোগী। আর পঞ্চম প্রহরে কী হয়? প্রহার? পাঁচোয়া প্রহরমে লণ্ডত বদ্‌লা গুরুকুল প্রহার রাগি। বাঙালির জীবনে তিস্‌বা আর পাঁচোয়া প্রহরেব বড়ই প্রাদুর্ভাব।

মাধববাবু পড়াচ্ছিলেন নবম শ্রেণীতে। বিষয়টি অঙ্ক। খুবই দুরূহ তত্ত্ব। সহজে মাথায় ঢুকতে চায় না। মাধববাবু চক হাতে জুডো-যুযুৎসুর প্যাঁচ কষছেন আর এক ক্লাশ কোমলমতি নিষ্পাপ শিশু শুকনো মুখে শূন্য চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছে। আহা। দেখলেও মায়া হয়। সবাই তো গোবিন্দ নয় যে অঙ্ক না বোঝার গৌরবে নির্বিকল্প হয়ে যাবে।

অঙ্কটা হল বারোজন শ্রমিক দিনে আটঘণ্টা কাজ করে যে কাজ কুড়ি দিনে কবতে পারে সেই কাজ চব্বিশ জন শ্রমিক চব্বিশ দিনে করতে হলে দিনে কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে? অঙ্কটার পোশাকি নাম ঐকিক নিয়ম, কিন্তু আড়ে-বহরে ত্রৈকিক। কিক্ মেরে মাথা খারাপ কবে দেয়। শুধু কি তাই? শ্রমিকদের কাজেব সময়ের হিসাব বলে কথা। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে তুলকালাম বেধে যাবে।

মাধববাবু বোর্ডে প্রথম লাইনটা লিখলেন—১২ জন শ্রমিক ২০ দিনে করতে দিনে কাজ কবে ৮ ঘণ্টা। যে উত্তরটা বাব করতে হবে সেটা বাখতে হয় একেবাবে শেযে ডান দিকে। এর পরের লাইনটা মাধববাবু লিখলেন—১ জন শ্রমিক ২০ দিনে করতে দিনে কাজ করে ৮ ১২ ঘণ্টা।

বাস্। লেগে গেল খটমট। দিনে আছেই তো মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তার মধ্যে একজন শ্রমিক আট গুণিতক বাবো, তার মানে ছিয়ানব্বই ঘণ্টা কাজ কববে কী কবে? ছেলেরাও বুঝতে পাবে না, মাধববাবুও বোঝাতে পারেন না। বোঝাবার চেষ্টায় মাধববাবু যখন গলদঘর্ম তখনই দবজার সামনে আবির্ভাব হল তিন মহাপুরুষেব। তিনজনেবই বযস কুড়ির নিচে। তিনজনই গাঁট্টাগোট্টা পালোয়ান। থ্রী মাস্কেটিয়ার্স উইদাউট সোর্ড। তার মধ্যে একজনেব গোঁফটা এই বয়সেই বিকট।

—তুমিই মাধব মাস্টার? এদিকে এসো। তর্জনী নাড়িয়ে ওদেরই একজন মাধববাবুকে বারান্দায় ডাকল।

বিদ্যালয়েব ভেতরেই একজন শিক্ষককে কেউ এরকম অশালীন সম্বোধন কবতে পাবে, সেটা মাধববাবুর কল্পনায় ছিল না। উনি প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন আর সেই অবস্থাতেই পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। হাতের চক-পেন্সিলটা তখনো হাতেই ধরা।

পুরো দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে হল না। বিকট গোঁফ এগিয়ে এসে মাধববাবুর জামার সামনেটা খিমচে ধরে হ্যাঁচকা টানে বারান্দায় নিয়ে চলে গেল। তারপর শুরু হয়ে গেল কিল-চড়েব বৃষ্টি।

মাধববাবু একা। তিনটে লোকের সঙ্গে পারবেন কেন? তাছাড়া তিনি তো শিক্ষক। তাঁর মারদাঙ্গার ট্রেনিং নেই। তাই পুরো ঘটনাটাই ঘটল একতরফা। মাধববাবুর ঠোঁট কেটে বক্ত পড়ল, চোখেব কোল ফেটে কাল শিটে পড়ল, কপাল ফুলে আব গজিয়ে গেল আব চোয়াল এতটাই আহত হল যে আগামী তিনদিন উনি নিশ্চয় কিছু চিবিয়ে খেতে পাববেন না। সেই সঙ্গে সারা শবীরে

শারদীয়া
শুভেচ্ছা

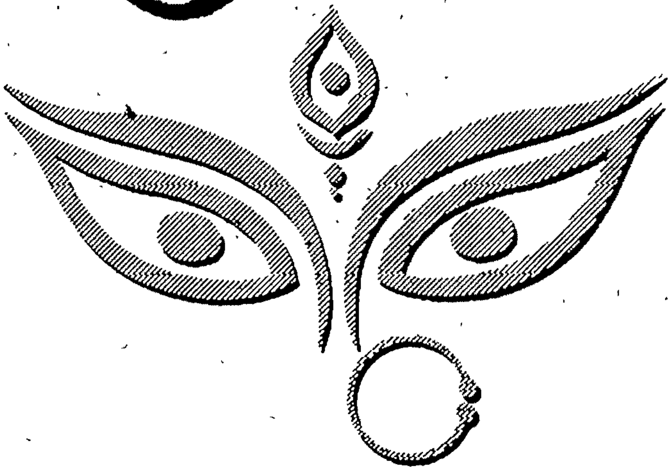

THE
ROSE
Restaurant
&
Confectionary

ISO 9002

পি - ১৮০, সি.আই.টি. রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ ফোন - ৩৩৪ ৪২২৪

যা দুরমুশ হল তাতে মাধববাবু জ্ঞান হারিয়ে ভূমিশয্যা নিলেন। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। সেই অবস্থাতেই আরো দু'চারটে কিক্ খেতে হল।

ততক্ষণে ক্লাশের ছাত্ররা বারান্দায় বেরিয়ে এসে হৈ হৈ চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। তাদের চিৎকার শুনে অন্যান্য ক্লাশের শিক্ষক-ছাত্ররাও বেরিয়ে এসেছে।

স্কুলবাড়ির দোতলায় লম্বা টানা বারান্দার যে মাথায় সিঁড়ি, এই নাট্যোৎসবটা চলছিল তার উল্টোদিকের মাথায়। সব ক্লাশ থেকে ছাত্ররা বেরিয়ে আসায় এখন বারান্দাটা প্রায় পুরো ভর্তি। নাটকের খলনায়করা তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই বুঝে নিয়েছে—এবার পালাবার সময় এসে গেছে। নিচে নামার জন্যে লম্বা টানা বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির মুখে যেতে হবে। এরপর আর দেরি করলে পালাবার জন্যে বারান্দায় আর ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে না। তখন ছাত্র তাড়িয়ে বারান্দা ফাঁকা করতে হলে বোমা চার্জ করতে হবে।

লোক তিনটে দৌড়ে বারান্দা পার হয়ে উল্টোদিকের মাথায় সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল। ছেলেরা ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক সরে গিয়ে ওদের রাস্তা ছেড়ে দিল। এবার ওদের দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাওয়ার কথা। ঠিক সেই সময়েই হয়ে গেল একটা বিপত্তি, যে জন্যে ওরা কেউই তৈরি ছিল না।

সিঁড়িটার মুখেই ছিল ক্লাশ এইট, সেকশন বি। অর্থাৎ গোবিন্দদের ক্লাশ। কি অদ্ভুত যোগাযোগ। সেদিন সোনা আর গোবিন্দ দু'জনেই ক্লাশে হাজির ছিল। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে বাকি সকলের সঙ্গে তারাও বেরিয়ে এসেছে। মাধব স্যারকে মারধোরের দৃশ্য ওদেরও চোখে পড়েছে। ভয়ে উত্তেজনায় আর ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কী করবে না করবে ঠিক করার আগেই ওরা দেখল ছোকরা তিনটে ওদের দিকেই দৌড়ে আসছে। এ ধরনের অতি দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনার সঙ্গে ইতি কর্তব্য ঠিক করার জন্যে যে ধরনের ট্রেনিং দরকার হয়, সেগুলো সোনা কিংবা গোবিন্দ কারোরই ছিল না। ট্যাক্সির জানালা গলিয়ে মাথা বের করে চেনা মাস্টার মশাইকে ডেকে গাড়িতে তুলে নেওয়া এক জিনিস, আর এরকম হিন্দি সিনেমা-মার্কা ঢিসুম্ ঢিসুম্ অ্যাকশনের মধ্যে নিজের অ্যাকশন ঠিক করে নিয়ে সেই মোতাবেক কাজ করা অন্য জিনিস। সে সব শিখতে হলে বসিশ কিংবা সাজ্জাদদের কাছে নাড়া বাঁধতে হয়। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে যাবার ভয়ে সোনা দেওয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়াল।

গোবিন্দও একপাশে সরে দাঁড়াল। সে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির ঠিক মাথায়। জেনে-বুঝে নয়। এমনিই হয়ে গেছে। বিধাতার মনে কী ছিল কে জানে। বিধাতার মন তো মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে গোবিন্দর হাতে ধরা ছিল একটা বারো ইঞ্চি লম্বা কাঠের স্কেল।

সবাই জানে, এরকম একটা স্কেল দিয়ে গুণ্ডা পেটানো তো দূরের কথা, একটা ইঁদুরও মারা যায় না। বড়জোর টিকটিকি মারা যেতে পারে। তবু হাতের ওই স্কেলটাই গোবিন্দর মনে কীসের কি বদবুদ্ধি জুগিয়ে দিল কে জানে। তাই দিয়েই সে একটা অসম্ভব কাণ্ড করে বসল।

প্রথম দুটো ছোকরা ওদের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবার পরমুহূর্তে বিকট গোঁফ যখন পার হচ্ছে, ঠিক সেই সময় গোবিন্দ চট্ করে বসে পড়ল আর হাত বাড়িয়ে স্কেলটা এগিয়ে দিল তার পায়ের দিকে।

লোকটার গোঁফটা বিকট হতে পারে, চেহারাটা তাগড়াই হতে পারে, এমনকি কোমরে বোমাও বাঁধা থাকতে পারে, কিন্তু ওসব গুণাবলী ওর কোনো কাজেই লাগল না। দৌড়ে চলার পথে ঠিক সেই সময় ওর আগে ছিল বাঁ পা, পেছনে ছিল ডান পা। ডান পায়ের এবার আগে যাবার কথা। বাম ডান, বাম ডান করেই সবাই সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এই একটাই সূত্র ছেলে থেকে বুড়ো, বড় থেকে ছোট, ভিখারি থেকে রাষ্ট্রপতি সবাইকেই মেনে চলতে হয়। যতক্ষণ মেনে চলবে ততক্ষণই অগ্রগতি। না মানলেই গড়বড়।

সেই গড়বড়টাই ঘটে গেল বিকট গোঁফের পায়ে। ডান পা আগে যেতে বাধা পেল স্কেলে। স্কেল বাধা পেল বাঁ পায়ে। তাই তারা কেউই এগোতে পারল না। কিন্তু শরীর সেটা শুনবে কেন? সে আছে গতির আনন্দে। সে এগিয়ে গেল।

বিকট গোঁফের মাথাটা গিয়ে ভূমি স্পর্শ করল, ভূমি নয়, সিঁড়ি স্পর্শ করল, ছ'ধাপ নিচে। ঠিক ছ'ধাপ কি পাঁচ ধাপ, সেটা এই প্রতিবেদক সেই মুহূর্তে গুনে দেখতে যায় নি। হবে ওইরকমই একটা কিছু। তবে পা দুটো যে সেই সময় আকাশে ছিল, সেটা ঠিক।

মাথার স্থান উপরে আর পায়ের অবস্থানস্থল সব সময়েই নিচে। একমাত্র বিছানায় লম্বমান অবস্থা ছাড়া। তাই মাথার প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশত বিকট গোঁফের পা দুটো নিচের দিকে যেতে চাইল। কিন্তু সে অবস্থায় নিচে যেতে চাইলে তো আকাশপথে মাথাকে ডিঙিয়েই নিচে নামতে হয়। তার মানে বিকট গোঁফকে ডিগবাজি খাইয়ে তবেই স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন। পা দুটো সেই চেষ্টাতেই ছিল। কিন্তু ততটা করার দরকার হল না। তার আগেই বিকট গোঁফের কোমরে বাঁধা তিনটে বোমার দুটো অতি বশম্বদ ভৃত্যের মতো নিজের কর্তব্য সমাপন করে বসল। তারা স্বস্থানে অবস্থিত অবস্থাতেই ফেটে গেল।

বোমার কাজই হল ফেটে যাওয়া। ফাটবার জন্যেই তাকে তৈরি করা হয়। ফাটাতেই বোমাজীবনের মোক্ষলাভ। যে পকেটমার পকেট মারতে পারে না, সে যেমন পকেটমার নয়, তেমনি যে বোমা ফাটে না, সে বোমা বোমাই নয়। দুটো বোমা ফেটে গিয়ে প্রমাণ করে দিল যে, হ্যাঁ, তারা বোমাই ছিল বটে, আর তিন নম্বরটা পরবর্তী সুযোগে প্রমাণ দেবার জন্যে বিকট গোঁফের লুকানো গেঁজের মধ্যে তৈরি হয়ে বসে রইল।

এরপর বিকট গোঁফের দুটো পায়ের একটা যেভাবে শরীরের সঙ্গে সব বন্ধনের মায়া কাটিয়ে নিজে নিজেই শূন্যে উঠে গিয়ে পাক খেয়ে নিচে নেমে এল সেটা ছিল দেখার মতো দৃশ্য। সেটা দেখার জন্যে অবশ্য গোবিন্দ তখন আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। স্কেল দিয়ে নিজের ইচ্ছাসুখের অপকর্মটি করে দিয়েই সে সোজা ক্লাশরুমে ঢুকে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসে আছে। যদিও ভয়ে বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করে কাঁপছে, তবে বাইরে নির্বিকার।

অনেকদিন থেকেই গোবিন্দর দুস্কি দেখার শখ ছিল। যতই দিন গড়াচ্ছে সে শখ একটু একটু করে মিটছে। তবে ভাগ্যগুণে লাশ হতে হয় নি। বোমার সোহাগটা একটু দূর থেকে খেয়েছে তো, তাই।

এরপর পরপর যা হবার তাই হল। পুলিশ এল, অ্যাম্বুলেন্স এল। তিনটে বডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একটা বডিকে মৃত ঘোষণা করে মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। বাকি দুটো বডিকে হাসপাতালে ভর্তি করে মাটিতে বিছানা করে শুইয়ে দেওয়া। মাটিতেই। কারণ কোনো লোহার খাট খালি পাওয়া গেল না। হাসপাতালে লোহার খাট পেতে হলে সরকারি ডাক্তারকে আলাদা ভিজিট দিয়ে তার নিজের রোগী হতে হয়। পুলিশ কেসের রোগীরা অতটা ভাগ্যবান হয় না।

পুলিশ মাধববাবুকেও হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে মাধববাবুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। উনি হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করলেন। বললেন, হাসপাতালে লোকে মরার জন্যে যায়। আমার এখনি মরার কোনো ইচ্ছে নেই।

মাধববাবুর কাছে পাত্তা না পেয়ে পুলিশ তারকবাবুকে মৃতদেহ সনাক্ত করতে বলল। তারকবাবু অস্বীকার করলেন, —যাকে বেঁচে থাকা অবস্থায় কস্মিন কালেও দেখিনি, তার মৃতদেহ দেখে কী সনাক্ত করব?

—সে কি স্যার! আমরা তো ভাবলাম মৃত ব্যক্তি আপনার স্কুলেরই শিক্ষক।

—ওই লোকটা আমার স্কুলের শিক্ষক হতে যাবে কোন দুঃখে। ওরা এসেছিল আমার স্কুলের এক শিক্ষককে প্রহার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে। একজন পা হড়কে সিঁড়িতে পড়ে যাওয়ায় তার কোমরে গোঁজা বোমাটা ফেটে গেছে। আর তাতেই লোকটা মরে গেছে। বাকি দুটো ওই বোমার আঘাতেই আহত। স্কুলের মাস্টার মশাইরা কোমরে বোমা বেঁধে ক্লাশ করতে আসে নাকি?

মেজবাবুর মুখটা ঝুলে গেল। সে কেস সাজাতে চেয়েছিল দুষ্কৃতীর দলের লোকেরা স্কুলে চড়াও হয়ে বোমা মেরে তিনজন শিক্ষককে ঘায়েল করেছে। তার মধ্যে একজন মারা গেছে। এই কেসে রসিদকে জড়িয়ে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করা যেত। আহত দু'জন শিক্ষককেও জড়িয়ে দেওয়া যেত। গুণ্ডার দল বেছে বেছে তোমাদেরকেই কেন মারতে এল বাপু? গুণ্ডারা গুণ্ডাকেই মারে। নেহাৎ টাকা-পয়সা লুটপাটের ব্যাপার না থাকলে তো তারা সাধারণ পাবলিককে মারে না। তার মানে অপরাধ জগতের সঙ্গে তোমাদেরও কিছু যোগাযোগ আছে। এখন পুরো তদন্ত করলেই সে সব ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে।

শিক্ষকরা নিজেদের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্যে তখন টাকা-পয়সা দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করতে চাইবে।

পুলিশের আমদানি দু'দিক থেকেই। এই না হলে পুলিশ? দেশে গুণ্ডামি বোমাবাজির কেস যতই বাড়ে ততই পুলিশের আমদানির দরজা একটার পর একটা খুলতে থাকে। খুবই স্বাভাবিক। চুরির কেসে গৃহস্থ থানায় ডায়েরি করলে পুলিশ তদন্তে গিয়ে কেবলই জিজ্ঞেস করবে—আর কী চুরি হয়েছে বলুন। আরো কী কী চুরি হয়েছে বলুন। চুরির তালিকা যত বড় হবে ততই তাদের লাভ। তাদের বখরার পরিমাণটা ততই বেশি হবে। চুরি যে কে বা কারা করেছে সেটা তো তাদের জানাই আছে।

কিন্তু এটা কী হল? গুণ্ডা নিজেই নিজের বোমায় খতম? এখন পুলিশ কাকে জড়িয়ে কেস দেবে? আসা-যাওয়ার খরচটাই বা কে দেবে? ধুস্! যতসব আজেবাজে কেস।

আঠারো

ঘনাদার চায়ের দোকানে ঢোকার বিশেষ স্টাইলটা সোনার নিজস্ব। এরকম একটা স্টাইল সে জেনে বুঝে ট্রেনিং নিয়ে রপ্ত করে নি। করব বললেও করেনি। হয়ে গেছে। ওর অজান্তে নিজে নিজেই হয়ে গেছে। বাজুর কাগজ বিলোবার স্টাইলের মতো। স্টাইল আপনা আপনা।

সোনার এই স্টাইলটা ক্রিকেট খেলায় ফাস্ট বোলারের স্টাইলের সঙ্গে অনেকটা মেলে। সেই রকম ডাকাত তাড়া করা দৌড়, চোখে মুখে সেইরকম কাকে খাই কাকে খাই আর ফলো থ্রুতে সেই রকম হেদিয়ে পড়ে দড়াম্ করে কাঠের বেঞ্চি কাঁপিয়ে বসে পড়া। ভাগ্যিস হাতে বলটা থাকে না। থাকলে কবেই ঘনাদার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যেত। মনাদাও কি জানি রেহাই পেত না।

আজ কিন্তু সোনার পোজটা হল স্রেফ শূন্য রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়া ব্যাট্‌স্‌ম্যানের মতো। ঢোকার মুখে হাতদুটোকে এমন কচলাচ্ছে যে দেখে মনে হবে ব্যাটটা বগলে চেপে হাত থেকে অদৃশ্য গ্লাভ্‌স্‌দুটো খুলে ফেলছে।

দৃশ্যটা এতই অস্বাভাবিক যে মনাদা তো মনাদা ঘনাদা পর্যন্ত হাতের কাজ থামিয়ে সোনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দু'জনেই ওর মুখে কিছু শোনার আশা করছে।

প্যাভিলিয়নের কাঠের বেঞ্চিতে ধপ্ করে বসে পড়ে সোনা ঘোষণা করল—গোব্‌দাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

তার মানে শুধু ব্যাট্‌স্‌ম্যানই আউট নয়, একেবারে দলবল নিয়ে সবশুদ্ধ ফলো অন।

মনাদার হাত থেকে খবরের কাগজটা খসে পড়ে গেল। মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হল না। পরের প্রশ্নটা না বলাই থেকে গেল।

সোনা নিজেই ব্যাপারটা খোলসা করল,—গত হপ্তায় তিনটে গুণ্ডা মাধব স্যারকে মারার জন্যে ইস্কুলে এসেছিল। স্যারকে ক্লাশ থেকে টেনে বার করে খুব পিটেওছিল। তারপর পালাবার সময় সিঁড়িতে ওদের একজন গড্ডান খেয়ে গড়িয়ে পড়ে। তার কোমরে বাঁধা বোমাটা ফেটে গিয়ে সে ব্যাটা ওখানেই খেড়িয়ে গেল। এখন পুলিশ কী করে জানতে পেরেছে যে ওই গুণ্ডাটার গড্ডান যাওয়ার পেছনে গোব্‌দার হাত ছিল। তাই কাল রাতে পুলিশ এসে ওকে থানায় তুলে নিয়ে গেছে।

—কেন? কেন? গোব্‌দা কী করেছিল? কথাটা বলল মনাদা। কিন্তু প্রশ্নটা মনাদা ঘনাদা দু'জনেরই।

—করেনি তেমন কিছু। শুধু সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে ওই ছুটে যাওয়া লোকটার পায়ের ভিতরে তার হাতের স্কেলটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সে কি আর জানত যে ওই লোকটারই কোমরে বোমা বাঁধা আছে?

—বাঃ! নিজের কোমরে বাঁধা বোমায় গুণ্ডা মরে গেল আর দোষ হয়ে গেল একটা ছাত্রের? যারা কোমরে বোমা বেঁধে স্কুলে ঢুকে মাস্টার পেটাতে যায় তারাই তো অপরাধী। বোমা ফেটে সে যদি মরে যায় তবে তো তার উচিত শাস্তিই হয়েছে বলতে হবে। গোব্‌দা তো উপলক্ষ মাত্র। ওর কী দোষ? ওকে পুলিশ ধরবে কেন?

—তোমার মতো অত সরল হিসেব নিয়ে পুলিশ চলে না মনাদা। তাদের অন্য অনেক হিসেব আছে।

—তাহলে এখন কী হবে?

—কী আর হবে। পুলিশ তো ওকে হাতের সুখে প্রথমেই একপ্রস্থ পেটাবে। পেটানোর ব্যাপারে আবার থানার মেজবাবুর বেশ নাম আছে। লোকটা কারণে অকারণে কাউকে না কাউকে ধরে পেটাবেই। ওতেই ওর আনন্দ। যেদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাউকে পেটাতে পায় না সেদিন ওর মেজাজ গরম হয়ে যায়। সন্ধের পর বাড়ি গিয়ে বেশি করে মদ খায় আর বৌকে ধরে ঠ্যাঙাতে থাকে। সে এক মজার কাণ্ড।

—এর মধ্যে মজার কাণ্ডটা কোথায় দেখলি সোনা? একটা অসহায় অবলা পরের মেয়েকে ধরে এনে একটা ধুম্‌সো পুলিশের লোক পেটাচ্ছে, সেটার মধ্যে আবার মজা কোথায়? এ তো খুবই দুঃখজনক আর লজ্জাকর ব্যাপার।

—আছে আছে, মজা আছে। বাকিটা শোনোই না। মেজবাবুর প্রথম বৌটা রোগা পাত্‌লা দুব্‌লা। ওর ঠ্যাঙানি খেয়ে প্রায়ই মুচ্ছো হয়ে যেত। তাকে পিটিয়ে হাতের সুখ পেত না বলে মেজবাবু কিছুদিন আগে একটা মোটাসোটা তাগড়াই দেহাতি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছিল। ভেবেছিল এটাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করবে। কিন্তু এখন মেজবাবু নিজেই বিপদে পড়ে গেছে।

প্রথম প্রথম পিটুনি খেয়ে মেয়েটা মোষের মতো গাঁক্ গাঁক্ চিৎকার করত। পাড়ার লোকেরা সবাই সে চিৎকার শুনতে পেত। কিন্তু মেজবাবু পুলিশের লোক বলে কেউ সাহস করে ঝগড়া মেটাতে এগিয়ে যেত না।

শেষ পর্যন্ত মেয়েটা নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করে নিয়েছে। একদিন মেজবাবুর মার খেতে খেতে সেও উল্টে লাগিয়ে দিল। মেয়েমানুষ হলে কি হবে তার গায়ে অসুরের শক্তি। নেহাৎ মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছে তাই, পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মালে সেও আরেক মেজবাবু হয়ে যেতে পারত। মেজবাবু তার গালে লাগাল থাপ্পড়, সেও লাগিয়ে দিল মেজবাবুর চোখে মুখে আঁচড়-কামড়। মেজবাবু তাকে পেটাল রুল দিয়ে তো সেও উল্টে চালিয়ে দিল উনুনের আধপোড়া চালা কাঠ। একেই আটাছা চালা তায় আবার এক মাথায় আগুন। বৌ-এর হাতে মার খেয়ে গাল থুত্‌নি কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। পরদিন মেজবাবু যখন থানায় গেল তখন তার হাতে-মুখে আঁচড়-কামড়ের খাব্‌লা খাব্‌লা দাগ আর সারা গায়ে ছ্যাঁকা লাগার দাগড়া

দাগড়া ঘা।

গায়ের দাগগুলো ঢাকা গেলেও মুখ আর হাতের দাগগুলো ঢাকার উপায় নেই। সেগুলো দেখে হেড কনেস্টবল নকুল নস্কর বলল, কাল রাতে কোথাও ডাকাত ধরতে গেছলেন নাকি স্যার? ইস্। ডাকাতটা দেখছি আপনাকে বড্ড পিটেছে। ডাকাতের পিটুনিতে কাত হয়ে গেছেন। তা আপনি স্যার একা একা গেছলেন কেন? আমাদের ডাকতে পারতেন। আমরা সবাই মিলে ব্যাটাকে কব্জা করে ফেলতাম। আপনাকে ঝুটমুট এত পিটুনি খেতে হত না। মেজবাবু আর কেমন করে বলে ডাকাতটা ব্যাটা ছিল না, ছিল বেটি। আর নিজের বৌকে পেটাবার জন্যে কনস্টেবল ডাকা? ছ্যা। ছ্যা। ভাবতেও ঘেন্না লাগে। মনের ঘেন্না মনের মধ্যে চেপে রেখে মেজবাবু নকুলকে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দিল। আর সেই থেকে তার বৌ পেটানো বন্ধ। কিন্তু বৌ পেটানো বন্ধ হলে কি হবে, ওদিকে লকআপে বেচারাগুলোর কপাল পুড়েছে। তাদের ভাগের ভাগটা বেড়ে গেছে।

—মেজবাবু তো পুলিশের লোক। তা অত ঘরের খবর তুই কোত্থেকে জানলি সোনা? পুলিশের ঘরের খবর জানতে হলে তো চোর হতে হয়।

—আমাকে বলেছে সোহরাব, সে ওদের পাড়াতেই থাকে। ওর মুখেই শুনেছি মেজবাবু নাকি একটা লাগসই বৌ-এর খোঁজে আছে, যাকে পিটে সুখ হবে অথচ উল্টে মারবে না।

—উঃ। ওদিক থেকে ঘনাদা ককিয়ে উঠল। সে এতক্ষণ বাঁ হাতে ছাকনি বাগিয়ে ডান হাতে কেটলি চাগিয়ে চা ছাঁকছিল। আর ডান বাঁ দু'কানেই মন লাগিয়ে একমনে মেজবাবুর বৌ পেটানোর গল্প শুনছিল। মেজবাবুর তিন নম্বর বৌ খোঁজার কথায় বেসামাল হয়ে কেটলির কসকসে গরম জল ছাঁকনির বদলে হাতেই ঢেলে দিয়েছে। অপকর্মটি করেই ঘনাদা যন্ত্রণার ঠেলায় তিন পাক বাঁদরনাচ নেচে নিল। তারপর একটু আরাম পাবার আশায় ছ্যাঁকা খাওয়া হাতটা পাছার লুঙ্গিতে চেপে ধরে রইল। কিছুক্ষণ ওইরকম দাঁড়িয়ে থেকে যন্ত্রণাটা একটু সয়ে যাবার পর সোনার দিকে চেয়ে বলল, বলিস কি রে সোনা। ঘরে দু'দুটো বৌ থাকতে আবার একটা? আমি তো মাইরি আজ পর্যন্ত একটাও যোগাড় করতে পারলুম নি।

মনাদা বলল, বেঁচে গেছ হে ঘনশ্যাম। যোগাড় করবার আর চেষ্টাও করবো না। চাকি ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবে। আমার হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গেছে। এই যে আমি সকাল থেকে এসে তোমার দোকানে বসে আছি, সেকি এমনি এমনি? তা সে যাক্ গে যাক্। ছাড়ো ওসব কথা। এখন গোব্‌দার কী হবে? তাকে কি মেজবাবু লকআপের মধ্যে পেটাবে নাকি? কথাটা চিন্তা করে ঘনাদা মনাদা দু'জেনরই খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

সোনা বলল, আমি তো খবরটা পেয়েই মাধব স্যারের কাছে দৌড়ে গেছলাম। মাধববাবু ওদের পার্টি জেলা কমিটির সেক্রেটারি। অরুণবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তাকে দিয়ে থানায় ফোন করিয়ে গোব্‌দাকে ছাড়াবার ব্যবস্থা করছে। সোহরাব, মন্টু ওদেরকে লেগে থাকতে বলে এসেছি, ওরা লেগেই আছে। কতদূর কি হল না হল সে খবরটা ওরা আমাকে এখানে এসেই দেবে। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। উঃ। সেই ভোর থেকে দৌড়াদৌড়ি করে বড্ড ধকল গেছে মাইরি। একেবারে হেদিয়ে গেছি। এখন বেশ জম্পেশ করে এক গ্লাস চা খাওয়াও দেখি ঘনাদা। শেষের ডাকটা হল ঘনাদার উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে। তারপর একটু থেমে অভ্যাস মতো বলে উঠল—গোব্‌দার অ্যাকাউন্টে।

—না না, গোব্‌দার অ্যাকাউন্টে নয়, আমার অ্যাকাউন্টে। সে বেচারা এতক্ষণ লকআপে পেটান খাচ্ছে। তার আবার অ্যাকাউন্ট কি? গোব্‌দার দুরবস্থার কথা ভেবে সত্যিই ঘনাদার মন নরম হয়ে গেছে।

ওদেরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সোহরাব মন্টুর দল এসে হাজির। সঙ্গে ওদের কাঁধে ভর দিয়ে লেংচে হাঁটা গোবিন্দ। ওকে থানা থেকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ছেড়ে দিলে কি হবে, 'দ' বানিয়ে তবে ছেড়েছে। গোবিন্দ বনে গেছে সত্যিকারের গোব্‌দা। নুয়ে দাঁড়াচ্ছে, খুঁড়িয়ে হাঁটছে কঁকিয়ে কথা বলছে আর বেঞ্চিতে যে ভঙ্গিতে একদিকের পাছায় ভর দিয়ে অন্যদিকের পাছাটা উঁচু করে কেতরে বসল, সেটাকে একমাত্র একদিকে চাকা খুলে নেওয়া তিনচাকা অটোর ছেতরে দাঁড়ানো ভঙ্গির সঙ্গেই মেলানো যায়। ওদিকের পাছাটায় মেজবাবু আদর সোহাগই করেছেন চুমু খায়নি। থানায় অরুণবাবুর ফোনটা আসার আগেই যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে গেছে।

এতক্ষণ গোবিন্দর জন্য উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে সোনা দৌড়াদৌড়ি করছিল। এখন তাকে সামনে পেয়ে সব চিন্তা-ভাবনা কেটে গিয়ে মুখে হাসি ফুটল। সোনা আবার নিজের জায়গায় ফিট্। মুখে চুক্ চুক্ শব্দ তুলে বলল তোমাকে তো দেখছি একেবারে বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া বানিয়ে দিয়েছে গো গোব্‌দা দাদা। বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া, তিনটে পা তার লটপটর, একটা পা তার খোঁড়া। সোনা গোবিন্দকে এই প্রথম দাদা বলে ডাকল। জেনে বুঝে অঙ্ক কষে ডাকবে বলে ডাকেনি। ঘটনার ঘনঘটায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মেজবাবুর মার খেয়ে গোবিন্দ এখন সোনারও সিনিয়ার।

সোনার পরের প্রশ্ন—থানায় কি হল বলো দেখি। বড়বাবু বসিয়ে দৈ মিস্টি খাওয়ালো?

হ্যাঁ, দই মিষ্টিই খইয়েছে। কালকের কাগজে সেই রকম একটা প্রতিবেদন ছাপা হয়ে বার হবে। তবে সেই দই মিষ্টি খাওয়ার বর্ণনাটা গোবিন্দ দিতে পারবে না। তার এখন কথা বলার শক্তি নেই। তার বদলে বর্ণনাটা এই প্রতিবেদকই দিচ্ছে। শুনে নাও। আর আপনারা পাঠক পাঠিকারাও শুনে নিন। জেনে কিংবা না জেনে গোবিন্দ পুলিশের রোজগারের জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছে। সে অপরাধের শাস্তি তাকেই পেতে হবে। পুলিশ গোবিন্দকে থানায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস করল তার কোনো রাজনৈতিক দাদার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে কিনা? ওর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হবে সেটা পুরোটাই নির্ভর করে ওই জিনিসটা ওপরে। গোবিন্দ ঘাবড়ে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। কার আর নাম করবে একমাত্র মাধববাবু ছাড়া। মাধববাবুর নাম শুনে বড়বাবুর গা আর একচোট চড়বড়িয়ে উঠল। মাধববাবুকে স্কুলের মধ্যে মারধোরের কাহিনী আর সেই সঙ্গে নেপথ্য কাহিনীটাও বড়বাবুর জানা হয়ে গেছে।

মাধববাবু যে ছেলেটাকে ক্লাসে চড় মেরেছিলেন সে ছিল কাউন্সিলারের ছেলে। কাউন্সিলার মানে তো রাজার জাত। তার উপরে তাদের পার্টি ক্ষমতায় থাকলে তো আর কথাই নেই। তারা তখন রাজারও রাজা। সেই রাজারও রাজার গায়ে হাত তোলা যে কোনো প্রজার পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। মাধববাবু সে অপরাধের শাস্তি পেয়েছে। উত্তম-মধ্যম। ধোলাই। এ তবু সাধারণ ধোলাই। মাধববাবুর অবস্থা যে নীহারবাবুর মতো হয়ে যায়নি সেটা তার ভাগ্য। এখন গোবিন্দর অপরাধ হল, সে ওর মধ্যে নাক গলাতে গেল কেন। অবশ্য নাক সে গলায় নি। সে গলিয়েছিল হাতের স্কেলটা। ওই এক স্কেলেই একটা রাস্কেল সাবাড় হয়ে যাবে, সেটা সে আন্দাজ করতে পারে নি। কিন্তু বড়বাবু সেটা বুঝতে যাবে কেন? নাকই গলাক আর স্কেলই গলাক, অপরাধ তাতে কিছু খাটো হয় না। বিশেষ করে যেখানে আঁচড়টা লেগে গেছে এক জনপ্রতিনিধির চামচার গায়ে।

খাটো হওয়া তো দূরের কথা বরং গোবিন্দর অপরাধের মাত্রা আরো এক কাঠি বেশি এ জন্যে যে তার হাতের গুণে যেটা ধেড়িয়েছে আর যে দুটো হাসপাতালে, তাদের সবকটাই হল জনপ্রতিনিধি বাবুর ডান হাত বাঁ হাত স্যাঙাৎ। স্যাঙাৎ হল ছেলের বাড়া। ছেলেকে মারলে সহ্য

হবে কিন্তু স্যাঙাৎ ঠ্যাঙালে বদলা চাইই চাই। গোবিন্দকে থানায় ধরে নিয়ে যাবার পেছনে জনপ্রতিনিধিবাবুর থাবার অবদানটা বড় কম নয়। বড়বাবু গোবিন্দকে ছেড়ে দিল মেজবাবুর হাতে আর ওইটুকু সময়ের মধ্যে তার বৌ-এর হাতে মার খাওয়ার শোধ তুলে নিল। নিজের গোব্দা বৌ-এর হাতে মারের শোধ বেপাড়ার গোব্দাকে পিটিয়ে। ভাগ্য ভালো যে গোবিন্দ মেয়ে ছিল না, তাহলে তো—পাঠক পাঠিকারা ক্ষমা করবেন। তাহলে কী হতে পারত সেটা লিখতে আমার কলম আপত্তি জানাচ্ছে। আপনারা তাহলের বিত্তান্তটা খবরের কাগজেই পড়ে নেবেন।

এখন গোবিন্দ যে মেজবাবুর কাছে বেধড়ক মার খাচ্ছে তাকে বাঁচানো দরকার। কিন্তু বাঁচাবে কে? কেউ যদি বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে যায় তবে গোবিন্দ তো বাঁচবেই না উল্টে তাকেও পিটুনি খেতে হবে। সেই সঙ্গে হাজত বাস। সরকারি কর্মচারীর কর্তব্য সম্পাদানে বাধা দান? ধারা এতশ তত। চলতে গিয়ে পায়ে কিংবা বসতে গিয়ে পাছায় কাঁটা ফুটে গেলে সেটা বার করা তুলো ব্যাণ্ডেজ ডেটল মলমের কাজ নয়। একটা কাঁটা তোলার জন্যে চাই আরেকটা কাঁটা। পুলিশের কাঁটা তুলতে রাজনৈতিক দাদার কাঁটা।

যথা সময়ে থানায় অরুণবাবুর ফোন এল। বড়বাবু গোবিন্দকে গ্রাহ্য না করলেও অরুণবাবুকে করে। ওরা হল জাত সাপ। কে জানে করে কখন ডিগবাজি খেয়ে গদিতে বসে যাবে। তখন চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। চাকরি না গেলেও পোস্টিংটা তো গুবলেট হয়ে যেতে পারে। লালবাজারের রেকর্ড রুমকে ভয় করে না এমন বাপের ব্যাটা কে আছে? তাই ওদেরকে সব সময় তোয়াজে রাখাই ভালো।

গোবিন্দকে ছেড়ে দেবার সময় বড়বাবু বলল, এই কুত্তার বাচ্চা তবে যে বললি তোর কোনো দাদা নেই?

পুলিশের হাতে যারা পড়ে তারা সবাই কুত্তার বাচ্চা। বড়বাবুর কথার উত্তরে গোবিন্দ আর কি বলবে। আগের মতোই এবারেও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আগের বারের থেকে এবারের তফাৎ এটুকুই যে তখন তার কথা বলার ক্ষমতা ছিল। এখন আর সেটুকুও অবশিষ্ট নেই। কে যে তার দাদা সেটা গোবিন্দ তখনো জানত না এখনো জানে না।

গোবিন্দর জানার পরিধিটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। দুস্কি কী জিনিস সেটা ছ'মাস আগেও জানত না। এতদিনে তার দুস্কি তো চেনা হয়ে গেছে। আধ রাতের মধ্যে তার পুলিশও চেনা হয়ে গেল। তার কাছে এখন দুস্কি আর পুলিশে বিশেষ কোনো তফাত নেই। তফাৎ শুধু এইটুকুই, দুস্কিরা মুখ লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ায় আর পুলিশ বুক ফুলিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়।

আর দাদা, সে তো সিনিয়ার বস্তু। দাদার কথা গোবিন্দ শুনল মাত্র আজই। এই সবে শুরু, দাদা চিনতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। তবে আশা আছে যথা সময়ে ঠিক চিনে যাবে। বড়বাবুর থাবা থেকে উদ্ধার পেয়ে গোবিন্দ যখন হামাগুড়ি দিয়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে থানার দরজা দিয়ে বার হল তখন সে ওই থানার দরজাটুকু চিনতে পারছে, বাদবাকি উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম সব জ্ঞান লোপ। দরজার গোড়ায় যদি সোহরাব মন্টুর দল দাঁড়িয়ে না থাকত তবে সে হয়ত ঘরে যাবার বদলে হামাগুড়ি দিয়ে হিমালয়ের দিকেই চলে যেত।

সোহরাব-মন্টুর দল গোবিন্দকে হিমালয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে ঘনাদার দোকানে নিয়ে এসেছে। গোবিন্দকে বেঞ্চিতে বসিয়ে ওরা সবাই মিলে ওর পরিচর্যা করার চেষ্টা করল। কিন্তু পরিচর্যা করবে কি? যেখানে হাত দেয় সেখানেই টনটনে ব্যথা। বাদ একমাত্র ওই একদিকের পাছা। যেদিকটা ভাগ্যগুণে মেজবাবুর সোহাগ আর চুমুর কামড় থেকে ছাড়া পেয়ে গেছে।

একটু সুস্থ হয়ে গোবিন্দ যখন কথা বলার অবস্থায় এল তখন তার প্রথম কথাটাই—মেজবাবুটাকে দেখে নেব।

বাকি সবাই গোবিন্দর সঙ্গে একমত। ওরা শত্রু চিনে গেছে। ওই মেজবাবু-মার্কা লোকগুলোর থেকে সাবধান থাকতে হবে। যে-কোনো দিন ধরে নিয়ে গিয়ে পেটাতে পারে।

সোনা বলল, এ নিয়ে মাধব স্যারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

—ধুস্। আমি আর স্কুলেই যাব না, তো মাধব স্যার। এসব মাধব স্যারের কাজ নয়, এর জন্যে অন্য লোক আছে।

—কে?

সকলের জিজ্ঞাসু চোখের উপর দিয়ে এক পাক চোখ ঘুরিয়ে গোবিন্দ সগর্বে ঘোষণা করল, সাজ্জাদদা।

কথাটা ওরা কেউ ফেলতে পারল না। মেজবাবুর সঙ্গে টক্কর দেবার লোক মাধব স্যার নয়, সাজ্জাদদা।

সেইখানে ঘনাদার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে সোনা, গোবিন্দ, মন্টু, সোহরাব হোসেন—সবাই মিলে ঠিক করে ফেলল, সাজ্জাদদার সঙ্গে গিয়ে ভিড়তে হবে।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর মনাদা মনে মনে ভাবল,—ওই। হয়ে গেল। জন্ম নিল আর এক দল দুষ্কৃতী। সাজ্জাদ এখন ওদেরকে হাতে পেয়ে গীতার শ্লোকও শোনাবে না আর হাদিস শরিফের বয়েৎও আওড়াবে না। যা শেখাবে তার নাম নির্ভেজাল গুণ্ডাবাজি। আর সাজ্জাদেরই বা দোষ কি? গুরুজনেরা সবাই মিলে যদি এই নিষ্পাপ কিশোরগুলোকে তার দিকে ঠেলে দেয় তবে সে কী করবে?

আর এই চায়ের দোকানে বসে ঘনাদাই বা আর কী করতে পারে, একমাত্র দুঃখ আর রাগ করা ছাড়া? দুঃখে রাগে মনাদা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের পকেটের প্রতি কোনো রকম মায়া মমতা না-করে তার বরাদ্দের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ঘনাদাকে এক গেলাস কষকষে গরম চায়ের বরাত দিয়ে বসল। আর সেইসঙ্গে একবার পুরো পড়ে-ফেলা পচে-যাওয়া খবরের কাগজটা তুলে নাকের সামনে মেলে ধরল।

কাগজে অদৃশ্য কালিতে লেখা খবরটা মনাদার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠল।—লেবুপাড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী সোনা আর গোব্দা পুলিশের গুলিতে নিহত। এবারে এটা লেবুপাড়াই। লেবুতলার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার কোনো প্রশ্নই নেই।

কাগজটা আজকের। কিন্তু খবরটা ছাপা হয়েছে অনাগত কালের। ❑

যা সত্য তা সবাই জানুক। পুলিশ অপরাধীদের মদত দেয়! কিভাবে?

রুণু গুহ নিয়োগীর
সাদা আমি
কালো আমি
১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে
প্রতি খণ্ড ৮০.০০ টাকা

- আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না, আমি ডি, সি, পোর্ট বিনোদ মেহেতা।
- ইদ্রিশ খুব অসুস্থ । রাজকুমার ওকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে গেছে। আমিও যাচ্ছি। আপনি যাবেন?

M.L. DEY & CO. 13/1, Bankim Chatterjee Street, Kolkata-73

আকর্ষণীয় বই-২০০১

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রামের সুমতি ও বিন্দুর ছেলে	১২৲
শিব্রাম চক্রবর্তী	শ্রেষ্ঠ গল্প	৩৫৲
লীলা মজুমদার	গল্প আর গল্প	৪০৲
লীলা মজুমদার	ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	৪০৲
লীলা মজুমদার ও রূপক চট্টরাজ (সম্পা)	আলোর পাখি	৪৫৲
মহাশ্বেতা দেবী	জাতকের গল্প	২৮৲
বরুণ মজুমদার (আকাশবাণী)	কৌন বনেগা ক্রোড়পতি সওয়াল দশ ক্রোড়কা	৫০৲
বরুণ মজুমদার (আকাশবাণী)	মঙ্গলের মাটিতে	৪০৲
বরুণ মজুমদার (আকাশবাণী)	সোনার মেয়ে জ্যোতির্ময়ী	২৫৲
বরুণ মজুমদার (আকাশবাণী)	পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও বিশ্ব পরিস্থিতি	৪০৲
বরুণ মজুমদার (আকাশবাণী)	বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ	৪০৲
বরুণ মজুমদার (আকাশবাণী)	সংবাদ পাঠক হতে গেলে	২০৲
বরুণ মজুমদার (আকাশবাণী)	বিশ্বকাপ ফুটবল অমনিবাস	৩০৲
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অর্ঘ দাশ (সম্পা:)	সোনার কাঠি রুপোর কাঠি	৪০৲
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অর্ঘ দাশ (সম্পা:)	সোনালী ছুটির গল্প	৪০৲
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও রূপক চট্টরাজ (সম্পা:)	তেপান্তর	৪০৲
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও অর্ঘ দাশ (সম্পা:)	আগমণী	৪০৲
ব্রাম স্টোকার (তুষার চট্টোপাধ্যায় ভাষান্তরিত)	ড্রাকুলা	৪০৲
মঞ্জিল সেন	ভৌতিক অমনিবাস	৪০৲
মঞ্জিল সেন	গোয়েন্দা অমনিবাস	৪০৲
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র (সম্পা:)	ভোরের সানাই	৪০৲
শৈলেনকুমার দত্ত (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)	আমপাতা জোড়া জোড়া	১৫৲
শৈলেনকুমার দত্ত (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত)	কিচিরমিচির (জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ)	১৬৲
শিবানন্দ পাল	অনুপমা খাজুরাহো	১০০৲
প্রিয়রঞ্জন মৈত্র	টুম্পা নামে মেয়েটা	১০৲
রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র	বুক অব নলেজ	৩০৲
রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র	Learning Word Book	১৫৲
পৃথ্বীরাজ সেন	নোবেল জয়ী অর্মত্য সেন	৩৫৲
অর্ঘ দাশ (সম্পাদিত)	শক্তিমান	৪০৲
অর্ঘ দাশ ও রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র (সম্পাদিত)	১৫০০জোক্স	২০৲
উজ্জ্বল কুমার দাস (ভাষান্তর)	শার্লকহোমস্ কিশোর অমনিবাস	২০৲
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	সাবিত্রী বৈষ্ণবী	২৫৲
সরোজ সরকার	রঙের আঁকা ছবির মেলা (১-২-৩)	২৫৲
লীনা সেন	সবার প্রিয় বিবেকানন্দ	২৫৲
সুমিতা ভট্টাচার্য্য	আমি বাঁচতে চাই	৩০৲
মানিক সাহা	সৃষ্টির আনন্দ	৩০৲

নন্দিতা পাবলিশার্স ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ দূরভাষ: ২৪১-৯২৯০

জ্যোৎস্নায় ডুমুরের ফুল

সমরেশ মজুমদার

বিয়ে হয়েছে এক বছর। স্ত্রী সুন্দরী, শান্ত, একটু যা রোগা। শহরতলির এই বাড়িতে উঠোন আছে, উঠোনে ডুমুরগাছ, তাতে পাখিও বসে। খুব অল্প টাকায় এমন বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল সুবোধ বিয়ের ঠিক আগে। পূর্ণিমার সন্ধে থেকেই উঠোনে জ্যোৎস্না হামলে পড়ত। সুবোধ ভাবত নতুন বৌ-এর মুখে এই জ্যোৎস্নায় বসে সন্ধ্যা মুখার্জীর 'ঘুম ঘুম চাঁদ' গানটা শুনবে। শোনা হল না।

বাসরঘরে জাঁকিয়ে বসেছিল সুবোধের বন্ধু জয়ন্ত। তার খ্যাতি হাত দেখার। নতুন বৌ-এর কানে কেউ কথাটা তুলেছিল। তার জোক্স শুনে ফিক্ করে হেসে নতুন বৌ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'দেখুন না'। রেখাগুলো পড়েটড়ে গম্ভীর হয়ে জয়ন্ত বলেছিল, 'থাক'।

থাক বললেই তো হয় না। সবাই চেপে ধরল। নতুন বৌকে জয়ন্ত বলেছিল, 'একটা খারাপ ব্যাপার আছে। মনে হচ্ছে আপনার প্রথম সন্তানের আয়ু নেই।'

শুনেই হাত গুটিয়ে নিয়েছিল নতুন বৌ। অন্যরা ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, নতুন বৌ দেয় নি।

ফুলশয্যার রাত্রে সুবোধ বিছানায় এসে দেখল নতুন বৌ কাঠ হয়ে পড়ে আছে। তাব শবীরে কাঁপুনি। জড়িয়ে ধরে কি হয়েছে জানতে চাইলে সেই কাঁপুনি বেড়ে গেল। শেষতক ডাক্তার ডাকতে হল। ডাক্তাব বললেন, নার্ভাস হয়ে গিয়েছে খুব। তবে চিন্তার কিছু নেই।

দিনে নতুন বৌ ঠিকঠাক। রাত আসলেই সিঁটিয়ে যায়। কান্না শুরু হয়। সুবোধ যেন তাকে স্পর্শ না করে।

স্পর্শ করে নি সুবোধ। কিন্তু ডাক্তারের কাছে ছুটে গিয়েছিল পরদিন। ডাক্তার ওষুধ দিলেন। উপদেশও। কিছুদিন যেন স্ত্রীকে স্পর্শ না করে সুবোধ। প্রথম সন্তানকে মৃত দেখতে না চাওয়ার কাবণে শরীর শক্ত হয়ে গেছে তাব। সহজ হতে সময় দিতে হবে।

ছয় মাসেও পরিবর্তন নেই। দিনের বেলা সব কাজ করে বৌ, রাত নামলেই সিঁটিয়ে কাঠ। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারেব পরামর্শে শক্তি প্রয়োগ করল সুবোধ। সিনেমায় যেভাবে ধর্ষণ করে, সেই চেষ্টা করল। চোখ বন্ধ, দাঁতে দাঁত, শরীব কাঁপছে, সহযোগিতা না পেয়ে নিরস্ত হল সুবোধ। আব হিস্টিবিয়ার বোগীর কান্না বাজল বৌ-এর গলায়।

ডাক্তার বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন ওকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিন।'

তাই গেল। একমাস থেকে দু'মাসে পড়ল। সেখানে তাকে দেখছে আবো বড় ডাক্তাব। মনস্তাত্ত্বিকও।

এই বাড়িতে সুবোধ একা। উঠোনে ডুমুরের পাতার জঞ্জাল। পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না ওঠে। জানালা বন্ধ রাখে সুবোধ। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, বৌ-এব না থাকাটা ভীষণ একা কবে দিয়েছে বাড়িটাকে। দমবন্ধ হওয়ার অবস্থা। এক সন্ধেতে নিয়ে এল সে বৌকে। সেদিন আবার পূর্ণিমা। গোল চাঁদ বাজত্ব করছে আকাশে।

সিনেমায় যেভাবে ধর্ষণ করে....

বৌ-এর মুখে, হাঁটায় অপরাধীর ভাব। এসে উঠোনের পাতা সরিয়ে বসে পড়ল সে। বসে কাঁদল কিছুক্ষণ।

দূরে বসেছিল সুবোধ। বৌ বলল, 'তোমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছি, তুমি আবার বিয়ে কর।'

সুবোধ জবাব না দিয়ে হাসল।

বৌ জিজ্ঞাসা করল, 'নষ্ট কবছি না?'

সুবোধ বলল, 'তুমি এখানে না থাকলে আমার কিছু ভালো লাগে না। তুমি ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে ছোঁব না।'

বৌ চোখ নামাল, 'তুমি ভালো, খুব ভালো।'

বৌ বসেছিল। সুবোধ তাকে দেখছিল। হঠাৎ তার খুব ইচ্ছে করল বৌ-এব কোলে মাথা রেখে এই জ্যোৎস্নায় শুয়ে থাকতে। অনুমতি নেবে কিনা ভাবার সময় বৌ উঠে দাঁড়াল, 'যাই'।

'কোথায়?'

'তোমার জন্যে চা করে আনি। জানো, এখান থেকে যাওয়ার পর আমি একবারও চা খাই নি।'

'কেন?'

'এমনি। দুধ দেব, না দুধ ছাড়া?' বৌ জিজ্ঞাসা করল।

সুবোধ বলল, 'তোমাব যা ইচ্ছে।'

বৌ চলে গেল। সে সময় জ্যোৎস্না ডুমুরের পাতাব আড়ালে একটি মুকুলকে ফুলে রূপান্তর কবে দিল অনায়াসে। সুবোধ জানল না।

ঠিক দুপ্‌পুর বেলা

কণা বসুমিশ্র

দুপুরবেলা কোন কাজ করার উপায় নেই। নির্জন দুপুরে একলা বসে পড়াশুনো? ভাত খাবার পরই হাই তোলার পালা। হাই তুলতে তুলতে চোখটা বন্ধ হয়ে যায়। একটু আরাম, একটু আয়েশের জন্য বেশি নয় দশটা মিনিট বিছানায় গড়িয়ে নিলে কেমন হয়?

তারপব দুটোর সময় চোখে জল ছিটিযে এক কাপ চা খেয়ে লেখাপড়া। ফটিকচাঁদকে হুকুম করলেই তো চা এসে যায়। যদিও এক ডাকে কোনো কাজ হয় না। ছ'বার চেঁচিয়ে ডাকলে তবে একবার উত্তর আসে। 'হুজুর' বলে উত্তর দেবার দিন এখন ফুরিয়েছে। মগজ ধোলাই হয়েছে দু'পক্ষেরই। গোলাম এবং বাবু বিবি পুরোটাই তাসেব ঘর। এখন হলাম আমবা সবাই সমান। এই সবাই সমান ফর্মে আমরা সবাই ভগবানের চাকর। কাজেই কেউ কারো ওপরঅলা নয়। গোলামের ওপরেও গোলাম আছে। আর সব গোলামের অধীশ্বর ওই একজন ওপরঅলা। তিনি বাখলে রাখবেন। মারলে মারবেন। আমাদের ঠিকে কাজের মেয়েটি, আগে কথায় কথায ভয় দেখাত 'ইউনিষন' বলে। আগে সব সময় কথা শোনাত 'তোমরা ঘরে বসে আরাম করতিছো, আব আমরা গতরে খেইটে মরতিচি। গবিবির দুঃখ কি বড় লোক বোঝে? বোঝে আমাদেব ইউনিয়ন। মাসে দুটো কবে ছুটি কবতিচি। তাই তোমাদের পোযায না। এরপর চাবটে করে ছুটি করব। ফি হপ্তায় একদিন। তখন বুঝতি পাববে। আমাদেব ইউনিযন হাতে ...'।

সেই শকুন্তলাকে, আমরা সবাই গোলামের গোলাম বোঝানোতে দারুণ কাজ হয়েছে। শকুন্তলা এখন আর কথায় কথায় ইউনিয়নের সাফাই গায় না। স্রেফ ওপরওলার সাফাই গায়। বাবুদের ছুটি যে মাসে চারটে হয় না, দুটোও নয়, সেটা ও ভালোই বুঝতে পেরেছে। দুটো ছুটির দাবীটা যদিও ছাড়ে নি, তবু শকুন্তলা এখন সুস্থ। যাক্ যা বলছিলাম, সেই চায়ের কথা, তাই না?

হুকুমের বদলে শকুন্তলাকে এখন অনুরোধ, 'প্লিজ, কামাই করিস না। আমরা তো সবাই গোলাম বে। তুইও চাকরি করিস আমরাও কবি। যা তো, চট্ করে এক কাপ চা কবে নিয়ে আয।'

'চা? আমি কেন? আন্‌না ঘরেব ডিপুটি তোমাদের ফটিকচাঁদ। আমি নই। হাঁা, ও দেশে গেলি পরে ত্যাখোন আমি আছি।'

অতএব হুকুমটা যায়, থুড়ি, হুকুম নয়, অনুরোধ, 'বাবা ফটিকচাঁদ। প্লিজ সোনা। এক কাপ চা.....।'

'দাঁড়ান। এই সিবিলটা আগে শেষ হোক।' সম্প্রতি ফটিকচাঁদ অবশ্য আর সিবিল বলে না, সিবিয়্যাল বলে। ববং শকুন্তলাব ভুল ইংবেজি সংশোধন করে দেয। —'অ্যাই শকুন্তলাদিদি। তুমি ডেপুটি বলছ কেন? ডিপার্টমেণ্ট বলো।'

'আবে ফটিকচাঁদ। তুই তো দারুণ ইংরেজি শিখিচিস্?'

শকুন্তলা ভোর বেলা কাজে এসেই বলে, 'বউদি। গুড্‌মডিং'। সেটাও সংশোধন কবে ফটিকচাঁদ,—শকুন্তলাদিদি। গুড্‌মডিং নয়। বলো গুড্‌মর্নিং।'

শকুন্তলা সেই কাকভোরে এসে হাজির হয়। লক্ষ্মীকান্তপুব থেকে। শেষ রাত তিনটেয় ঘুম থেকে ওঠে। সারাটা গাঁ যখন ঘুমে বেঁহুশ, ছেলে-মেয়ে তিনটেকে ফেলে বেবিয়ে আসে দবজা খুসে। গাঁ থেকে লক্ষ্মীকান্তপুবে ছোটে ট্রেন ধরতে। ভোর চারটের প্রথম লোক্যাল ট্রেনে চেপে বালীগঞ্জ স্টেশনে

পৌঁছয় সকাল ছ'টায়। তারপর ছুটতে ছুটতে কাজে আসা, আমরা যখন বিছানা ছাড়ি নি। ক্যাঁক্ করে বেল বেজে ওঠে। ফটিকচাঁদই দরজা খোলে। ভেতরে ঢুকেই ওর প্রথম কাজ বাসন মাজা। আমি বাথরুমের পাশে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ করতে থাকি। শকুন্তলা আমায় দেখেই বলে, 'গুডমর্নিং।' ফটিকচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে—'আবার গুডমর্নিং?'

ককাস্য পরিবেদনা। শকুন্তলা তার নিজের ফর্ম থেকে কিছুতেই নট্ নড়ন চড়ন।

ফটিকচাঁদের হাতে চায়ের কাপ দেখেই ঘুম পালায়। মেজাজে চায়ের কাপে চুমুক মেরেই লেখার টেবিলে বসে পড়ি। তারপরই শুরু সেল্‌সগার্ল, সেল্‌স বয়দের আনাগোনা। যতটা পারে ফটিকচাঁদ সামলায়, 'বউদি বাড়ি নেই' কড়া গলায় চেঁচিয়ে। কিন্তু যেদিন সে বাড়ি থাকে না, ভাত খেয়ে উঠেই গড়িয়ায় পিসির বাড়ি দৌড়োয়, মুশকিলটা হয় সেদিন। বাড়িতে কেউ নেই, শুধু আমি ছাড়া। ভরদুপুরে, মানে সেই ঘু ঘু ডাকা দুপুরে মনটা যখন উদাসীন, কলমটা দারুণ মুডে আছে, সেই তখন,—'বউদি! বাড়ি আছেন?'

কী মুশ্‌কিল! বউদি বাড়ি নেই—এ কথাটা কে তাদের বলবে?

কলিংবেলটা বাজবার পর সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। আমি ভাবলুম, বাঁচা গেল। যারা এসেছিল, তারা ফিরে গেল। কেউ নেই ভেবে ওরা ফিরে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার বেল বেজে উঠল। তারপর আবার। ওই একই পদ্ধতিতে চুপ করে থাকার পর, রীতিমতো বিরক্তিতে দরজা খুলে হুমকি দিতে যাব, কিন্তু তারপরই মনে হল, তারপর তো ওরা বুঝতেই পেরে যাবে, কেউ একজন আছে। পর পর আরো সব এসে যাবে। এদের নিয়ে হয়েছে এক মুস্কিল। হাজারবারও যদি বলা যায়, কিছু নেব না, তবু নিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত একটা কিছু না গছিয়ে ছাড়বে না। অনেক সময় এমন হয়েছে, দুপুর রোদে পুড়তে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে যে মেয়েটা, ম্যাজিক আই দিয়ে তাকে দেখতে গিয়েই চোখ পড়েছে তার ক্লান্ত চেহারাটার দিকে। মায়া হয়েছে, বেচারা। দরজা খুলে দিতে বলেছি ফটিকচাঁদকে। সে হয়ত এক গ্লাস জল চেয়েছে। আমি তাকে জলের সঙ্গে ফ্রিজে মিষ্টি থাকলে মিষ্টি, অথবা ঠাণ্ডায় পানীয় কিছু দিয়েছি। তার বাড়ি কোথায়, কে কে আছে বাড়িতে, খুঁটিয়ে জেনেও নিয়েছি। হয়ত কখনো আমার কোনো গল্পের চরিত্র হিসেবে ওরা উঠেও এসেছে। কিন্তু আজকাল সেই একই ধরনের চরিত্র, থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়, এর কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত। তারপর আবার আরেকটা বিষয় হয়েছে, বেশ কিছুদিন হল তারা সেল্‌স-এর লোক হয়েও সেলস্‌-এর নয়। তারা বলে, 'প্লিজ ম্যাডাম্, এক মিনিট, আই ওয়াণ্ট টু ডিস্টার্ব ইউ। আমরা মার্কেটিং রিসার্চের জন্য এসেছি।'

'না না, আমার সময় নেই। এক মিনিটও কথা বলার সময় নেই। তারপরই তো একটা জিনিস পাইয়ে দেবেন।'

'না না বউদি, বিশ্বাস করুন।'

কথা বলতে বলতেই আরেক পার্টি এসে যায়—'আচ্ছা বউদি, আপনার বাড়িতে অ্যাকোয়া গার্ড আছে? আমাদের কাম্‌পানি. ..'

'অন্য কোথাও যান। আমার অ্যাকোয়া গার্ডের দরকার নেই।'

সে চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন,—

'আপনাদের বাড়িতে আর্নিং মেম্বার কজন?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার?'

'আপনার গাড়ি আছে? টেলিফোন? কম্পিউটার?'

'শুনুন! দুপুরবেলা এসে আপনারা এভাবে বিরক্ত করবেন না।'

'না না ম্যাডাম, চটছেন কেন? আসলে আমাদের একটা সার্ভে চলছে। স্ট্যাটাস্‌টা জানতে চাইছি।'

'আচ্ছা, এবারে আসুন। কোনো দরকার আছে কি আমাদের স্ট্যাটাস্.. জেনে?'

ফটিকচাঁদ এতক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে ছটফট্ করছিল উত্তরগুলো দেবার জন্যে। এবার চট্ করে বলে বসল, 'সবগুলোই আছে।' আমি চোখ পাকিয়ে তাকাই ফটিকচাঁদের দিকে। তারপর ওদের বলি, 'এভাবে দুপুরবেলা আর আসবেন না। বিশ্রামের সময় তো।'

'ও ইয়েস ম্যাডাম্। আসলে আমরা তো চাকরি করি। ডোর টু ডোর এই দুপুরবেলাতেই ঘুরতে হয়। অন্তত পঞ্চাশটা বাড়ি সার্ভে না করলে ..'

'সো হোয়াট? আমার তো তাতে অসুবিধে হচ্ছে। আপনারা সকালে আসুন! তাই বলে এই দুপুরবেলা?'

'সকালে তো ম্যাডাম আমাদের ডিউটি আওয়ার্স নয়!'

'আপনার ডিউটি বলে দুপুরবেলা, সেটা কি আমার দায়? এই সময়টা তো আমাদের অন্যরকম ভাবে বিশ্রামের সময়।'

'সরি ম্যাডাম্, উইল ইউ প্লিজ হেল্প, শুধু আর একটু বিরক্ত করব ম্যাডাম্, অ্যাকোয়াগার্ড ..'

'শুনুন! কেন বার বার বলতে হচ্ছে আপনাকে?'

আমি ভেতরে চলে যাই। ফটিক দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

এভাবেই চলতে চলতে একদিন আমার সোজা বিদ্রোহ ঘোষণা—আর কাউকে দরজা খুলে দেওয়া হবে না।।

এরপর থেকে দুপুরবেলা দরজার বেল বাজলেই ম্যাজিক আই দিয়ে দেখা হয়, যদি সে চেনা লোক হয়, তবেই। আর যদি অচেনাও হয়, জিজ্ঞেস করা হয় 'কোথা থেকে আসছেন?' সেলস্ কোম্পানি কিংবা অমুক অমুক হলেই স্রেফ 'বউদি বাড়ি নেই।'

যদি কোনো কাগজ অফিসের লোকজন হয়, তাহলে আলাদা কথা। তখন ফটিকচাঁদের কড়া ধাঁচের গলার স্বরটা নরম হয়। বিগলিত গলায় সে তখন বলে, 'ম্যাডাম্ বাড়ি আছেন।'

কাউকে বলে, 'বউদি বাড়ি আছেন।'

কিন্তু ফটিকচাঁদের অনুপস্থিতিতে আজ ভয়ানক বিপদ।

এবারে আমাকেই যে আমার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

অন্তত ফটিকচাঁদ, শকুন্তলা রামাপুজো সেরে দেশ থেকে না ফেরা পর্যন্ত।

দুপুরবেলা যথারীতি শুরু হল দরজায় প্যাঁক্.... প্যাঁক্... প্যাঁক্.. ...।

'বউদি বাড়ি আছেন?'

গলার স্বর বিকৃত করে আমায় বলতে হল, 'বউদি বাড়ি নেই'. । একেবারে দোখ্‌নো ভাষায় কণ্ঠস্বরটি আয়ত্ত করায় বন্ধ দরজার ও পিঠের মেয়েটি ফিরে গেল। বুঝতে পারল না বউদির গলার স্বরে, বউদি বাড়ি নেই। বউদি থেকেও নেই হয়ে যাওয়ার সফল প্রয়াসে বড় আনন্দ হল। ছোটবেলায় নাটক করতে খুব পছন্দ করতুম, সেটা কাজে লেগে গেল।

আবার কিছুক্ষণ পর আরেক পার্টি এল, 'বউদি বাড়ি আছেন?'

'বউদি বাড়ি নেই গো-ও-ও.....'

খ্যান্‌খ্যানে গলায় আমার বিকট সুর। চলে গেল সে।

কিছুক্ষণ পরে আরেকজন, —'বউদি বাড়ি আছেন?'

'বউদি বাড়ি নেই গো-ও-ও ..'

'বেশ তো, তুমিই দরজাটা খোলো না!'

'খুলতি পারব নি গো-ও !'

সামান্য কয়েক মিনিট পর আবার আরেকজন. 'বউদি, বাড়ি আছেন?' এবার আর মেয়েলি কণ্ঠস্বরের সেলস্‌গার্ল নয়। এবার পুরুষ কণ্ঠ। দ্বিতীয়বার চ্যাঁচাল,—'বউদি! বাড়ি আছেন?'

'বউদি বাড়ি নেই গো-ও .'

'তুমি কে?'

'আমি কাজের নোক।'

বেশ তো তুমিই দরজাটা খোলো না?'

'খুলতি পারব' নি-গো-ও। বেটা ছাওয়ালের সুন্‌কি আমি বেরোব নি।'

'আহা-হা চাঁদ বদনটা দেখি তোমার।'

'আহা, আমার নজ্জা করে না? বেটা ছাওয়ালের সাথে কতা কইলে বউদি বকবে নি?'

'বউদি জানতে পারবে না। খোলো, খোলো, তোমার বয়স কত? একেবারে নাবালিকা না সাবালিকা, একটু দেখি।'

'বলচি, খুলতে পারব নি! বেশি ঝেমেলা করবে তো দাঁড়াও দেখাচ্চি, এই আন্‌না ঘরের গরম খুন্তি নিয়ে এলুম বলে। ছেঁকা দে দোব, আগুনির ছ্যাঁকা।'

'ও মাই গুড্‌নেস্‌। এ তো বড় সাংঘাতিক। তোমার ওপবে প্রেম যে বেড়ে যাচ্ছে গো, আগুনের ছ্যাঁকাও আমার মধুর লাগবে।'

'দাঁড়াও তো, দেখাচ্চি। চেঁচিয়ে নোক জড়ো করব। পুলুশি দোব গো তোমায। আমার সাহেব এই এলো বলে।'

'ও মাই গড।'

সিঁড়ি দিয়ে তড়িঘড়ি নেমে যাবাব শব্দ।

বেলা চাবটে অব্‌দি 'বউদি বাড়ি নেই' প্রক্সি দিতে দিতে হঠাৎ কিছুক্ষণ পর আবার জোরসে, 'প্যাঁক্‌..... '

'বউদি বাড়ি নেই গো-ও। খুলতি পাবব নি।'

ও পাশের পুরুষ কণ্ঠ এবার বলল, 'বউদি খুব বাড়ি আছেন, আমি জানি। দরজা খুলবে তো।'

আরে, আমার বর আকাশের গলা। আজ অফিস থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে এল?

দরজাটা খুলে দিতেই ও বলল, 'মন্দ নাটক চলছে না।'

'আর বলো না। ঘুমের দফারফা, লেখার দফারফা। 'বউদি আছে' বলার থেকেও বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে, 'বউদি নেই' বলাতে।

আকাশ বলল, 'তার চেয়ে রেকর্ড করে রেখে দিলেই হয। ফটিকচাঁদ দেশে গেলেই টেপ্‌বেকর্ডটা এদিক থেকে জোরে বাজতে থাকবে সারা দুপুব 'বউদি বাড়ি নেই, বউদি বাড়ি নেই, বউদি বাড়ি নেই।'

অবশ্যই গলার স্বব সেই তীক্ষ্ম দোখ্‌নো নাকি সুব, আনসারিং মেশিনে কথা বলে যাবার মতো।

এখন থেকে অ্যান্‌সাবিং মেশিনেব মতো টেপ্‌রেকর্ডাব বলে যায, 'বউদি বাড়ি নেই, বউদি বাড়ি, বউদি বাড়ি নেই... .' ☐

NET-এর জালে

অভিজিৎ ব্যানার্জী

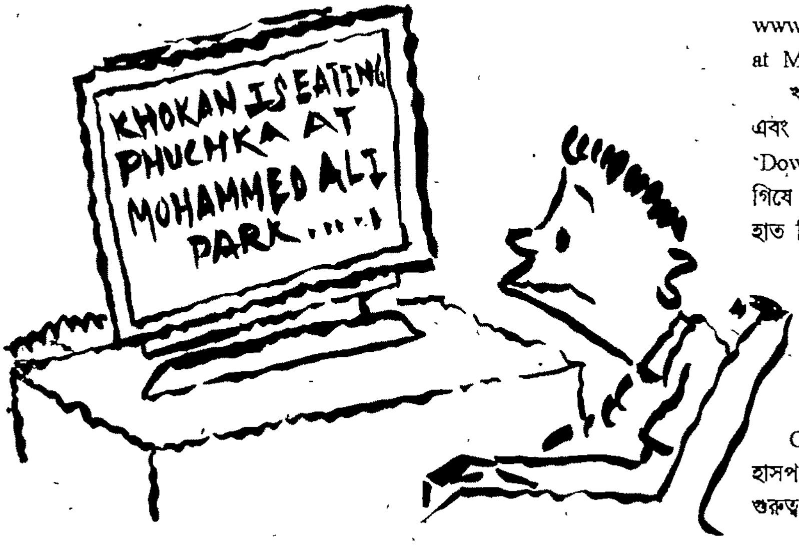
KHOKAN IS EATING PHUCHKA AT MOHAMMED ALI PARK.....!

দেখতে দেখতে আমরা পুজোর কাছাকাছি চলে এসেছি। এবই সাথে শুরু হল পুজোর কেনাকেনিব নাতিজ্বা। তাই সেই নাতিজ্বা পূবণের পেছনে ছোট থেকে বড় সবাই ছুটছে। এর একটাই উদ্দেশ্য—NET যুগে নিজেকে এমন একটা জাযগায় নিয়ে যাবে যে নিজেব লোকেদের পরিচয় জানতে বা চিনতে Computer-এ NET-এর সাহায্যে নিতে হবে। এই NET ই এবার প্রধান আকর্ষণ। এক দারুণ Event এ বছর হবে। এবার এই NET-এর সাহায্যে সবাই তাদেব জামাকাপড়ের Catalog দেখবে। যেমন, দোকানেব নাম দিলেই বেরিয়ে যাবে—কোন দোকানে কি পবিমাণ Stock আছে। যেমন Rambastraloy. com বা www Wallow Brothers. com দিলেই ব্যস, থামাকা। এইভাবে শুরু হবে প্রথম Step আবার এখানেই থেমে নেই; যদি কোনো বাচ্চাছেলে এবার পুজোয় হারিয়ে যায় তাহলে দুঃখ নেই, অনুসন্ধান অফিসে যাওয়ার দবকার নেই। শুধু কয়েক সেকেণ্ডের অপেক্ষা। যেমন www khokan com, ব্যস। দেখা যাবে,—Khokan is eating Phuchka at Mohammed Ali Park

খাবারের দোকানগুলোতে তাদের খাবারের তালিকা এরাব NET দিচ্ছে, এবং শুধু তাই নয়, তাদের সেই খাবাবের Test জানাব জন্য সবাইকে 'Download' কবে নিতে বলছে। তাহলেই বুঝলেন, এবার NET কোথায় গিযে দাঁড়াচ্ছে। যদি কোনো খাবারের মধ্যে কিছু Problem থাকে, খাওযায হাত দিলেই Screen দেখাবে—

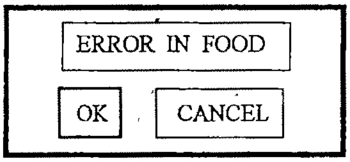

Cancel Click কববেন। দোকান ছাড়বেন। OK কবলেই পরের দিন হাসপাতালে। তাই পুজোতে এবার NET প্রযোগ আমাদেব কাছে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কী বলেন।।

মহানাট্যকাব্য

মালিনী তরঙ্গম

পল্লব চক্রবর্তী

চরিত্রগণ :

পুং — স্ত্রী
প্রেমিক — মালিনী
প্রেমিকের বিবেক
১ম যুবক, ২য় যুবক, ৩য় যুবক, ৪র্থ যুবক

স্থান : মুক্তাঙ্গন। কাল : সন্ধ্যা; আলো নাই; লোডশেডিং।
যুবকগণ দাঁড়াইয়া আছেন।
মোমবাতি হস্তে প্রেমিক যুবকের প্রবেশ। তাহার হস্তে একটি বড় কার্ডবোর্ড; তাহাতে লেখা—

মালিনী তরঙ্গম
মহানাট্য কাব্য

বোর্ড বগলে প্রেমিক মোমবাতি জ্বালাইয়া বোর্ডের সম্মুখে ধরিল, যাহাতে লেখাটি পড়া যায়। অতঃপর বোর্ডটি মাটিতে ফেলিযা, চাদব দিয়া মাথা মুড়িল

প্রেমিক : আমি যতন ভরিয়া পরাণ কষিয়া
বাঁধিনু গামছাডোরে,
বাঁধিনু যখন পৃথিবী তখন
ডুবিযা উঠিল ভোরে;
ভরিল যখন রুটি ও মাখন
ক্ষুধাটি মোটেই ভুলিনি,
হায পোড়া মন থাকিলে এখন
টোস্ট ভেজে দিত মালিনী।
যুবকগণ : আহা, ভেজে দিত গো-ও-ও-ও
১ম যুবক : ভেজে ভেজে হাড় কালি কালি হ'তো
সকলে : ভেজে দিত গো-ও-ও-ও
২য় যুবক : উষাকালে উঠে ভাজিতে বসিত,
সকলে : ভেজে দিত গো-ও-ও-ও
৩য় যুবক : ভেজে ভেজে সারাদিন কেটে যেত,
সকলে : ভেজে দিত গো-ও
৪র্থ যুবক : টোস্ট ভেজে নিজে রোস্ট হয়ে যেত,
সকলে : তবু দিত গো-ও
প্রেমিক : আমি কী আর কহিব
আরো কী সহিব
পরাণে মালিনী জ্বালা
তোমাদের গালি
লাগে খালি খালি,
সে চোপা শোনো নি, শালা।

সে চোপা যে শোনে
প্রদীপে উনুনে
বোঝে সে ফারাক কত,
তড়াক করিয়া
উঠিয়া সে ছোটে
রোলস্ রয়েসের মতো;
১ম যুবক : আহা, বলে দিতে হয়,
আজকাল তুমি রয়েসের রোল—
ব'লে দিতে হয়—
২য় যুবক : রয়েস তো নয়,
রইসের বোল,
ব'লে দিতে হয়—
৩য় যুবক : রইস নয় রে,
রসুই-এর রোল,
ব'লে দিতে হয;
৪র্থ যুবক : আগে ব'লে দেযা দবকাব ছিল,
ব'লে দিতে হয—
প্রেমিক : ওরে, তোরা থাম বিধি মোর বাম,
পেয়ে অসহায দিচ্ছ টাইট
কত আর জ্বালো, বলি তবে শোনো
পুট্ অফ্ লাইট। পুট্ অফ্ লাইট।।

প্রেমিক মোমবাতি নিভাইয়া দিল। মাথা হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিয়াছে সে। ভুতুড়ে কণ্ঠের ফিসফিসানিতে দিগ্বিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। ।। ফ্লাশিং ব্যাক— পাছায ঝলক— ফ্ল্যাশিং ব্যাক— জ্বলুক পাছা— ফ্লাশিং ব্যাক— পাছামুহূর্ত— ফ্লাশিং ব্যাক— পলকপাছা। প্রভৃতি শব্দ শোনা যাইতেছে। বিদ্যুৎ আসিল।

স্থান · নন্দন চত্বব।
মালিনী দাঁড়াইয়া আছেন; প্রেমিক হাঁটু গেড়ে।

প্রেমিক · বোশেখ মাসে ডাক দিলে দেখা দিতে সকাল-সকাল,
এ আষাঢ়ে-শ্রাবণে কেন কোনো কথা শোনো না আমার?
কেবলই বৃষ্টিব ছল, কেবলই ছাতার অজুহাত,
মালিনী তুমি কি ভালো আর সেইর'ম বাসো না আমায়?
মালিনী : ভালো বাস আজকাল কোথা যে,
সকল বাসেব ছাদে ফুটো,
ভিজে যাই ......
প্রেমিক . শুধু এক ভেজার অজুহাত
এড়াবেই যদি, তবে আমাকে
একটানে ছিঁড়ে তবে যাও,
এ আমার ইচ্ছা-অবশেষ; টেনে দাও।
মালিনী : দিনু টান।

প্রেমিক : অ্যাঁ।।
মালিনী : দিনু টান; ছিঁড়িলাম; নিপাত যাও।
প্রেমিক : অ্যাঁ।।। অ্যাঁ।।।।
মালিনী : চলিলাম, ঠ্যাটা—টা টা, চলিলাম।

মালিনী চলিযা গেল।' প্রস্থান।

প্রেমিক : মরিলাম।
হে মোব হৃদয-দেওতা, আমি মরিলাম, আমাব
ন্যাকাপুটোমি আমাকে পাঁচঅক্ষর কবিল,
আমি মবিলাম—
প্রেমিক : (গান)
হ্য গো ভগবান যদি গো জানিতাম
মালিনী এভাবে দিবে টানি,
কভু কি বলিতাম, ন্যাকামি করিতাম?
ভেজ্ঞা ল'য়ে এত কানাকানি।।
এখন টেনে গেছি, এখন মরে গেছি,
এখন আবাব কাকে তুলি
যদি গো বুঝিতাম, তোয়ের রহিতাম,
হ্তাম মালিনীরই কুলি।
প্রেমিক ও সকলে : মালী ও মালিনীতে বিবাহ হয়ে গেল
আমরা দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম
কাঁদায়ে সকলেরে মালিনী গেল চলে
ট্যাক্সিকে হাত নেড়েছিলাম।
প্রেমিক : সে গো যে চলে গেল তাই তো মনে হল
লিখিব মালিনী-সম্বাদ,
পাঠক ওহে ভায়া ভোলো গো লাজ-হ্যা
দেখাও তুমি কত দম্‌বাজ
সকলে : যে কালে মালিনী, বিনা নখকুনি,
দু'পাযে রাজাযে মল,
যেত কলেজেতে হেঁটে হেঁটে পথে
একটি আপেল ফল,
পাঁচজনা মোরা রকবাজ ছোঁড়া
সকালে মোড়ের দোকানে,
দিতুম হাজিরা চোখ ছানাবড়া—
উহার এখানে-ওখানে;
প্রেমিক : মালিনীব বাবা শিবু ডাক্তার
মেয়েকে শেখাতে নার্সিং
চেম্বাবে নিয়ে বসত মেয়েকে,
আমরা সেখানে রাতদিন
পাহারা দিতুম, হাত কাটতুম
ঠ্যাংও ভেঙেছিনু একদিন,
মালিনী আসিত, নার্সিং দিত—
যাক গে, সেকথা বাদ দিন;
সকলে · আমরা ছিলাম মালিনী-হস্ত ছায়াতুব,
মোদের ঢুলু ঢুলু চোখ বাসিয়া বাসিয়া
চোখা হয়েছিল—রাত্রি জাগিয়া,

কীসব সে গান, লয়কারী সুর—মালিনী।
ভুলিলি কী করে কত যে
স্যাঙো হৃদয় ফালাফালা করেছিলি।।
প্রেমিক - দিন যায রাত যায় বয়স বাড়িয়া যায়
এদিকে মালিনী বিবাহিতা
আমাদিগ উসখুস করি কার দিলখুশ
কবে আব হব মোরা পিতা?
স্বজন পড়শিগণ দেখিলেই শুধু কন,
ঘরে এক নিয়ে আয বউ
ভাবি মোবা পাঁচজনে চাহিলেই এ ভুবনে
নিজ বউ দেয নাকি কেউ।
শেযকালে ভেবেচিন্তে তনু, বেণী, টিনু, বিন্তে—
এই চার কুমারী বণিতা
বিয়ে করল মোট চার আমিও যাইনি ছাড়
মোবে তুলল কুমারী অনিতা।
সকলে : এই তো যৌবন,
কতই নতুন দিকে যেতে চায মন,
শুধুই,
বউযের পরোযা
যেমন জোটে যার—
প্রেমিক : এই ধরো আমার,
এখন জীবন ছাবখার;
যাব বললেই যেতে গো পারি না
দুয়োরে অনিতা সারাক্ষণ;
ঢুকতে দিলে বেরোতে দেবে না
বেরোলে ঢুকতে প্রাণপাত।।।
১ম ও ৩য় যুবকদ্বয় : স্বাধীনতা বিনা হায়, যৌবন-হীনতায়,
যে বাঁচে সে বাঁচে কচু; দিন খায বাত খায়
ঐ এক বউ তার এই বউ যার যাব
তার প্রেম শেম্ শেম্— যেথা চায মরু হায়
মরু মানে কাঁটা গাছ মরু মানে উটসাজ
পিঠে কুঁজ গুজ্‌গুজ্, ফিস্‌ফিস্—হায় হায়
যম যায়, ঐ যায়, চলে যায় চলে যায়,
দূর দিয়ে চুপচুপ, তার দিকে নাহি চায়।
২য় ও ৪র্থ যুবক : বউ মানে কোতোয়াল, খাঁড়া ঢাল খরশান
বউ মানে হিট্‌লাব চার্চিল রুজ ভেল্ট
বউ মানে বাপ্ বে, নাম চেঙ্গিস খান্
বউ মানে সাবধান, গার্ড নাও বিলো-বেল্ট
বউ এক প্রতিশোধ—
প্রেমিক : নাম তাব অনিতা—
সকলে : বউ হল গেঁটেবাত, হাড়ে হাড়ে জানি তা।
প্রেমিক : তাই মালিনী আজ এখনি
তোর স্মবণে আইলাম
অ মালিনী, এট্টুখানি,
প্রেমেব কথন কইলাম

চ মালিনী সেই তেমনি
পিরিত গাঙে ডুব যাই
দে মালিনী প্রেমের বাণী
তুই বিনে আর পাড় নাই;
সকলে আয় লো মালিনী বালিকা, অই যেথা নীহারিকা বে
মদন-হৃদয়-চালিকা, ভুলিব যতেক যাতনা রে।।
প্রেমিক : যৌবন-জলে ফাৎনা ফেলিব লুকায়ে কত না
তুঁহু মম মন-বিচালিকা, জ্বালাব কাম-বিশিখা বে।।
চল্ মালিনী।।।
সকলে : কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথায়-তুলিয়া পাড়া
চল্ পাঁচজনা ঘরে ফিরে চলি ত্বরা;

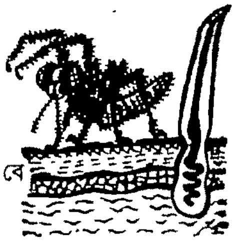

প্রেমিক সহ সকলের প্রস্থান। প্রেমিকের পুনঃ প্রবেশ। যুবকগণ তাহার কাব্য চলাকালে প্রবেশ কবতঃ তাহাকে ঘিবিয়া দাঁড়াইবে।

প্রেমিক : পথে পুলিশের তাড়া খেয়েছিনু, মনে আছে।
ও পাড়ার ভুলো চিনিয়েছিল, মনে আছে।
রাত্রি দেড়টা বেজে গিয়েছিল, মনে আছে।
মনে আছে—বগলে বোতল এনট্যাক্টি ধরা ছিল
কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেয় নি অনিতা;
কিন্তু অনিতা ঢুকতে দিল না আমাকে।
সকলে ঢুকতে না দিলে কী হবে এখন?
প্রেমিক : কী আর হবে গো, হব বাণ্ডারা;
সকলে : কী হবে এখন?
প্রেমিক : হবে আব কী—নাচিব বাঁদর;
সকলে : কী হবে এখন?
প্রেমিক : আব কী হবে গো, হব যা-যা বর।
সকলে . কী হবে এখন?
প্রেমিক : যাযাবর হয়ে খুঁজব মালিনী;
সকলে : কী হবে তখন?
প্রেমিক : মালিনীকে পেলে প্রেমে পড়ে যাব;
সকলে · কী হবে এখন?
প্রেমিক : এখন কেবল খুঁজে বের কবা
শ্বশুরালয়টি কোন গ্রামে তার
কোথা গেছে চলে মালিনী আমাব?

ভোর হইযাছে। উষাব প্রথম ছট। ছড়াইযাছে। পোস্টে পোস্টে আলো ম্লান। প্রেমিক ও যুবকগণ ঘুমাইযাছে। প্রেমিকের বিবেকেব প্রবেশ।

বিবেক : ভূ-গোলোকে মাঝেসাঝে এইর'ম পৌষ আর মাঘ
এসে পড়ে; নির্মম অকর্ণতায় সব দিকেই—
মালিনী রয়েই গেছে তবু
আমার সোনার রোদ্দুব সন্ধ্যায় হয়েছে ছিনতাই,
র‍্যাপার জড়িয়ে এখন শুয়ে আছে
যাবতীয় পুরুষ ও মহিলা, কারণ
র‍্যাপারের লিঙ্গান্তর ঘটে নাই আজও;
সে কুরুবক নহে, সে ক্লীব—তথাপি উষ্ণ;
সাবারাত এসময়ে সগ্গের সিঁড়ির নিচে
শুয়ে থাকতে হয, শুযে আছি আমিও
কেবল মশা কামড়ালেই মনে পড়ে যায়
মালীর ঘবে নির্ঘাৎ একটাই র‍্যাপার;
এক্সট্রা থাকলেও মালী নিশ্চয সেটা বের কবে নি;
তা হলে?
মালিনী আমাব বুঝি র‍্যাপার ছাড়াই শুয়ে আছে
অথবা কে জানে
মালিনী কি রাজি হল একখানা র‍্যাপারেই ঘুমুতে
বদমাশ মালীটিব সাথে?
অমাবস্যা মালীটির সাথে?
হাড়-জ্বালানে মালীটির সাথে?

বিবেকের প্রস্থান। ভোরেব আবছা আলোয প্রেমিকের কোরিওগ্রাফি। সে আমোড়া ভেঙে উঠতে উঠতে কাব্য কবছে। যুবকগণ শুযে।

প্রেমিক : হে মোব মালিনী তুমি
আজ এই নীবব নিভৃত রাতে
কোন দানবের হাতে নিগৃহীতা?
হে মোর মালিনী তুমি,
জানি জানি অমাবস্যার চাঁদ
হয়ে আছ নির্মম দানবেব আলিঙ্গনে;
হে মোর মালিনী তুমি,
আব ক'মিনিট সহ্য করে থাকো,
দানবের হস্ত হতে তোমাকে
আমি করবই উদ্ধার
এ আমার পণ—
তার আগে বোতল ছোঁব না;
শায়িত
যুবকগণ · হে মোর মালিনী, সোনামণি,
দেরি যা হচ্ছে, তুমি জেনো,
সে তোমাবি দুঃখে ঠিকঠাক কাঁদতে কাঁদতে।।
প্রেমিক · মা-লি-নী—
আস্মো আসিতেছি—হাঃ—
সকলে : বেড়ালে পথ কেটেচে, এটু অপেক্ষা করো;
প্রেমিক : এবাবে আসিতেছি,—হাঃ—হ্যাঁচ্চো।।
সকলে · হেঁচে ফেলেচে, অপেক্ষা করো;
প্রেমিক · আসিতেছি—হাঃ—
সকলে : হোঁচট খেইয়েচে, অপেক্ষা কবো;
প্রেমিক : আসচি, মালিনী, তুমি শোনো, একদিন, আমি এমনকি বোতল হয়ে গেলেও, গড়িয়ে গড়িযে হলেও, আসবই কারণ,
টিকটিকি সমানে ডাকছে।।।
সকলে · টিক্—টিক্—টিক্—টিক্—টিক্— ......

প্রেমিকের পতন ও মূর্চ্ছা। টিকটিকির ডাক ক্রম বর্ধমান। লোডশেডিং।

অতএব মম শ্রী শ্রী মহানাট্যকাব্য: মালিনী তরঙ্গম সমাপ্তম্।

Guinea Mansion

TRADITIONAL JEWELLERY ESTABLISHMENT

JEWELLERS, DIAMOND MERCHANTS, MANUFACTURER OF EXQUISITE
SILVERWARES, PLANETARY JEM DEALER & CONSULTANT

Ph : 440-4472, 440-5597

226 A, RASHBIHARI AVENUE, KOLKATA-700 019
INDIA

S. R. TRADERS

ARMS & AMMUNITION DEALERS

Meston Road
Kanpur
Uttar Pradesh

সে কি ভোলা যায়!

সহর্ষ স্মৃতি

বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

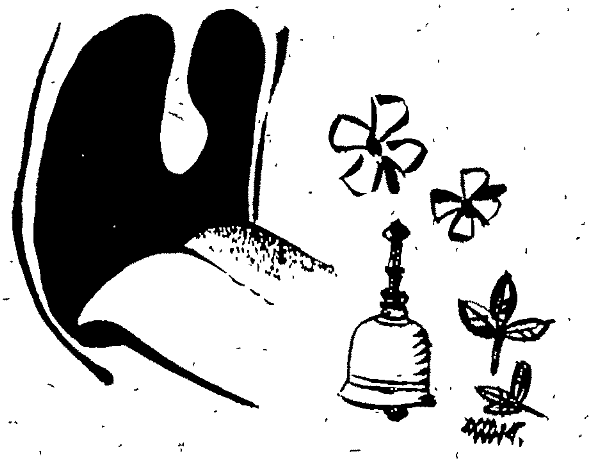

সম্প্রতি কয়লাখনির চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছি। স্মৃতি—যা সতত‌ই সুখের তাবই একটি মজাদার খণ্ডচিত্র দেখতে পাচ্ছি পেছন ফিরে দেখতে গিয়ে। সেই চিত্রটিই তুলে ধবছি—'পত্রপাঠ' এর পাঠকদের কাছে।

সেবার আমাদের কোলিয়ারিতে প্রথম দুর্গাপূজার প্রবর্তন হল। বছর পঁয়ত্রিশ আগের ব্যাপার এটা। আমার ওপর ভাব পড়ল পুরোহিত আর পূজারী ব্রাহ্মণ জোগাড় করার। আমি নিজে ব্রাহ্মণ এবং স্থানীয় লোক—এজন্যই আমাব ওপর এই কাজেব ভার। কোলিযারি থেকে কয়েক মাইল দূরে আমাব গ্রাম থেকে মোটা দক্ষিণায় (কোলিয়ারির পয়সা চিরকালই তুলনামূলক ভাবে সস্তা) বিনিময়ে পুরোহিত আর পূজারীর ব্যবস্থা করে এলাম। কিন্তু পূজার ক'দিন আগে নির্ধারিত পূজাবী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়াতে বিকল্প হিসাবে পুরোহিত মশাই যাঁকে পূজারী হিসেবে নিযে এলেন, একমাত্র শুভ্র যজ্ঞোপবীত ছাড়া তাঁর মধ্যে দ্বিজত্বের আর কোনো গুণই ছিল না। তা না থাক, কিন্তু তিনি যথেষ্ট পরিমাণে তোতলা।

পুরোহিত মশাইকে একান্তে ডেকে বললাম—এটা কি করলেন? মন্ত্রতন্ত্রের তো উনি কিছুই জানেন না, সেটা নয় আপনি সামাল দেবেন, কিন্তু ওঁর তোতলামি সামাল দেবেন কি কবে? নিরুপায় পুরোহিত মশাই আমতা আমতা কবতে লাগলেন।

যাই হোক পুজার ছুটিতে অনেকেই বাইরে বা নিজের নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে যাবেন। তাই পুজাব দর্শকদের বেশির ভাগই পশ্চিমাঞ্চলেব নিবক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর শ্রমিক ও তাদের পবিবার, এই ভরসায় 'যা করেন মহামাযা' বলে আমাকেও সাহসে বুক বাঁধতে হল।

ষষ্ঠীর বোধনাদি অনুষ্ঠান স্বল্প দর্শকের গোচরে (কোনো বড়লোককে ধরে এনে ফিতে কাটানোর রেওয়াজ ছিল না সেই যুগের খনি অঞ্চলে) নমো নমো কবে সারা হয়ে গেল।

মহাসপ্তমীর পুজায় বসে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ইত্যাদি প্রাথমিক কর্ম পুবোহিত মশাই জোরে জোরে মন্ত্র আউড়ে শেষ করলেন। ততক্ষণে মোটামুটি দর্শক সমাগম শুরু হযেছে। পশ্চিমেব ডগডগে মেটে সিঁদুব পরা ভক্তিমতী বমণীকুল আসতে শুরু কবেছেন। তুলনায় নগণ্যা বাঙালিনীরাও আছেন। পুবোহিতের নির্দেশে এবার পূজাবী ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করবেন—'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা' ইত্যাদি।

এই মন্ত্রের প্রথম অক্ষর তথা শব্দ 'যা'-তেই আটকে গেলেন পূজারী। 'যা' বলার পর 'দেবী' বলতে না পেরে অনর্গল 'যা-যা-যা-যা' বলে চললেন তিনি। আবাহন মন্ত্রে 'আয় মা—এসো মা' না বলে 'যা-যা-যা-যা বলার যুক্তি খুঁজে না পেযে যখন দর্শকরা বিহ্বল, আমার ভাগ্যগুণে পূজাবীর মুখ থেকে অতিকষ্টে 'দেবী সর্বভূতেষু' বেবিযে এলেন।

মহাষ্টমীর দিন পূজারীর এই তোতলামি শাপে বর হয়ে কি অভাবনীয় ভক্তিদ্রবের সৃষ্টি করেছিল, সেই কাহিনী বলি। প্রথম দিনের পূজার শুরুর চড়াইটা যা হোক কবে ভাঙতে পেরে মহাপুলকিত পূজারী মশাই দ্বিতীয় দিনের আচমনমন্ত্র (যা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরেই উচ্চারিত হয কোষাকুষির জল মুখে দিয়ে) সজোরে উচ্চারণ করার প্রযাস পেলেন। আচমন মন্ত্রেব 'মাধবো মাধবো বাচি' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতে গিয়ে 'মাধবো'-এব 'মা'-তেই আটকে গেলেন তিনি। তাই ক্রমাগত 'মা-মা-মা' ধ্বনি নাদিত হতে লাগল তাঁর কণ্ঠে এবং মা-এর মায়া কোনোক্রমেই কাটাতে না পারায তাঁব চক্ষু দিয়ে দরবিগলিত ধারা বইতে শুরু করল।

মাতৃনামে দরবিগলিতাশ্রু এই সাধকের পূজায় তুষ্ট হয়ে দর্শকরা বিমোহিত হলেন। এমন সাধক পূজারী জোগাড় করে দেওযার জন্য সাধুবাদও জুটল আমার কপালে।

মহানবমীর দিন পাশের একটা গঞ্জে পুজা উপলক্ষে আয়োজিত মেলা দেখতে চলে যেত কোলিয়ারির বহু স্ত্রী-পুরুষ। তাই নবমীর হোমের সময় নাকি দর্শক সংখ্যা ছিল নগণ্য। 'নাকি' বললাম এই জন্যে যে ঐদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম না হোমেব সময়। পরের দিন পুরোহিত মশাই একান্তে আমাকে এই হোমের যে বিবরণ শুনিয়েছিলেন সেই কথাই বলি।

হোমের কড়া কড়া দাঁতভাঙা মন্ত্রের যন্ত্রণায় যখন পূজারীর দাঁত কড়া হবার উপক্রম, তখন মণ্ডপে প্রায় জনহীনত্রয় (দর্শকদের অধিকাংশই বাংলা বোঝেন না ভালো করে একথাও পূজারীজির জানা হযে গেছে) সুযোগে তিনি বলে উঠলেন-'ভট্ ভট্ ভট্ ভট্'—(পুবোহিত মশাইয়ের সারনেম ভটচায মশাই উচ্চারণের প্রাথমিক চেষ্টা)। পুবোহিত তাঁকে ধমকে দিযেছিলেন মুখ দিয়ে ভটভটি বা মোটব সাইকলে চালানোব অপচেষ্টাব জন্য।

ভটভটি থামলে পূজারী একটি সুপরামর্শ দিয়েছিলেন পুরোহিতকে—যখন কেউ দেখছে না বুঝছে না, তখন কষ্ট করে অত শক্ত শক্ত মন্ত্র না পড়ে সব ঘি-টা একসঙ্গে আগুনে ঢেলে দিয়ে 'ভূ-ভূ-ভূ-ভূ স্বাহা' বলে পূজা নাটকের ডুগি পিটিয়ে দিলে ক্ষতি কি?

পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। কিন্তু আজও জনাকীর্ণ নগরীর পূজামণ্ডপে দাঁড়িযে মাইক নিঃসৃত 'যা দেবী সর্বভূতেষু' শুনলেই আমাদের সেই পূজার মাতৃসাধক পূজারীর 'অ-মাযিক' কণ্ঠের 'যা-যা-যা-যা' আর 'মা-মা-মা-মা' মনে পড়ে যায়।

সণ্টুর কীর্তি

কাজী নাসরিন ও সারিন আফরোজ

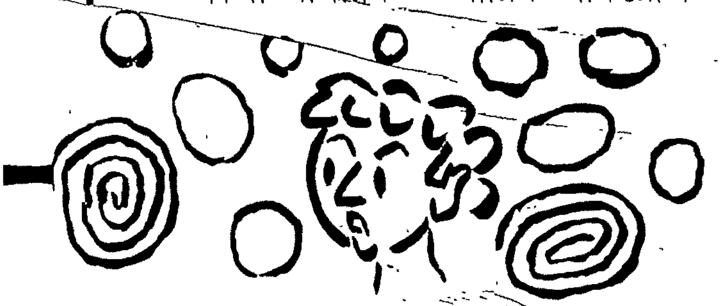

সাতজন ‘শূন্য’ পাওয়া ছেলের মধ্যে সণ্টু ছিল অনাতম। কিন্তু কেন শূন্য পেল সে প্রশ্নটা তো তোমরা কেউ কবোনি। আমি কিন্তু ইতিহাসের স্যারকে প্রশ্নটা করেছিলাম,—“একটা ছেলে একই ক্লাসে তিনবছর থেকে কী ভাবে শূন্য পায় স্যার?”

ইতিহাস-স্যার সঞ্জয়বাবু একটু মুচকি হেসে খাতাটা আমাকে দেখালেন এবং মন্তব্য করলেন,—“সণ্টুর রসবোধ দারুণ। ওকে শূন্য না দিয়ে বাগবাজার থেকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনে দিতে পাবলে আমি খুশি হতাম। দেখ, ওর উত্তবগুলো কত সুন্দর।”

সণ্টু উত্তরপত্রের প্রথমেই লিখছে : ‘হাতের লেখা আমাব পরিষ্কাব। অতএব পূর্ণ নম্বর দেবেন। প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া হযেছে এবং বন্ধনীর মধ্যে টীকা-টিপ্পনি দেওয়া হযেছে। এমন উত্তব কোনো ছাত্রছাত্রী দিতে পাববে না।”

প্রশ্ন ১ : ভারতেব প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে?

উত্তর : গান্ধীজি আবার কে? (গান্ধী পরিবাবই এতদিন দেশটাকে শাসন করে এল।)

প্রশ্ন ২ : ভুটানের বর্তমান রাজাব নাম লেখ।

উত্তর : বাই-চুং-ভুটিযা। (দারুণ বাজা, ফুটবলটাও খেলেন ভালো।)

প্রশ্ন ৩ : প্রথম কোন চীনা পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন?

উত্তব : হুং-চাউ-চাং। (বাংলা শব্দের শেষের অক্ষরে অনুস্বার যোগ করলেই চীনা ভদ্রলোকের নাম এসে যায়।)

প্রশ্ন ৪ · (ক) কত সালে পলাশিব যুদ্ধ হয়েছিল? (খ) কাদের মধ্যে এই যুদ্ধ হয়? (গ) যুদ্ধেব ফলাফল বর্ণনা কব।

উত্তর : (ক) ঠিক মনে পড়ছে না। খুব সম্ভব ৫৭১৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে।

(খ) C P M-এর সঙ্গে T. M. C-এর মধ্যে।

(গ) এ যুদ্ধেব ফলাফল ছিল ভয়ানক। (গাছপালা সব পুড়ে গিয়েছিল। নদী-নালা শুকিয়ে যায়। দেশের গরুগুলো একসঙ্গে হাম্বা হাম্বা রবে ডাক ছাড়ছিল। কিন্তু দেশেব মানুষ মনের আনন্দে গান ধরেছিল।)

আমার তো চোখ ছানাবড়া। এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সণ্টু ইতিহাসের খাতাকে ভরিয়ে তুলেছিল।

উত্তবপত্রে সণ্টুব শেষ সংযোজন: “এবার ইতিহাসে কেউ ফার্স্ট হবার চেষ্টা কোরো না, কেন না সণ্টু পবীক্ষা দিচ্ছে।”

এবার অসুর পূজা

বিষ্ণুজ্যোতি রায়

শোনো বাপ কার্তিক টিপ্‌স দিযে দিই কিছু,
ভুলিয়াও মেয়েদের নিও না কখনো পিছু
ভেবোনা তোমার রূপে সব হয়ে যাবে টিট্
নতুন লেডিকিলার এসে গেছে ঋত্বিক।

তুমি তো মা লক্ষ্মী শান্ত ও শিষ্ট
সাতে নেই পাঁচে নেই স্বভাবেও মিষ্ট
অধমের কথাটুকু কবো যদি অবধান
কেতন পারেখ থেকে থেকো মা গো সাবধান।

হে হে হে গণেশদাদা ধান্দা চালিয়ে যাও
ঝুনঝুনবালাদের পেট মোটা করে দাও
ছাপোষা বাঙালি যত পুজুক না হাজারে
ডাও-এব লোভে ঠিক যাবে বড়বাজারে।

স্বর্গের স্মার্ট গার্ল সরস্বতী ডার্লিং
ঠোঁট লাল টুকটুকে চুলগুলো কার্লিং
স্তনযুগ শোভিত মুক্তা হারে
জিন্‌স পরে এসো মা গো বলি বারে বারে;
জোশীজি যতই প্রিয় হোক না তোমার কাছে
শাড়ি খুলে দিতে পারে—মকবুল ফিদা আছে।

বিপদ তারিণী তুমি শংকর ঘরণী
নামের তো সুবিচার একটুও কবোনি.
জ্বল ঝড় বন্যা ও কখনো ভূকম্প
গুলি বোমা বারুদেব যত জগঝম্প।
অনেক দিয়েছি পূজা, হিসেব করেছ কি—
হুজুগের ভস্মেতে কত যে ঢেলেছি ঘি।
তাই তো তোমাব প্রতি জানিয়ে অনাস্থা
পত্রপাঠেতে এই নিযেছি ব্যবস্থা,
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলি দেখ না কি মজা বে
ভযানক ভয়াবহ অসুরেব পূজা রে।।

হেঁসেল

কপাল পুড়লি কি হবে—একবার কচু পোড়া খেয়ে নিলি—হাত চাঁটতি হবে আর ঝালে উঃ-আঃ করতি করতি ঢক্-ঢক্ করে জল খেলিই পেট ভর্তি।

কচু পোড়া

হাড মাস পুইড়ে খেলে হাড়-পোড়ানী মাস-জ্বালানী। কি, না দুটো ভাত ফুইটে খাওয়াবে। আগ্ন ফোটাবে কী দে? ঘবের চাল থাকলি তো ফোটাবে। তুঁযের আগুনি পুড়ে-খাক্ হয়ে যাচ্চে শরীলডা। মুখপোড়াদের বলিহারি যাই। এত রোদে-জলে পুড়িতিচি তবু মুখ তুলি কেউ চায় না, আর শোকে [illegible] পুড়তি সব কাট। [illegible] এক কাট-কাটামো পুড়ে [illegible] [illegible] আর বাকি নি। জলে ভিজতি ভিজতি গা যাচ্চে [illegible] [illegible]রে পুড়ে।

ওধাবে শ্লোগান তুলতিচে—'তালা তোড়ো, আনাজ বাটো।' অন্ধোপোদেশ উড়িষ্যাব নোক সব না খেতে পেয়ে মোবতিচে। উডিষ্যার আমেব আঁটির শাঁস খেযি গাঁ-গেরামের নোক পটল তুলতিচে। আবাব পোড়া বান উড়িষ্যা আর বিহারেব নোকজনরে সব ঘব ছাড়া করতিচে। উত্তরপোদেশে চাষীঘবের বৌ-ঝি মেয়ে-মদ্দ না খেতি পেয়ে গলায় দড়ি দে মবতিচে।

আর দেখতি দেখতি পুজো এসি গ্যালো। এবার পুজোয় কী বা খেতি দি তোগাদের। কে যেন বলেছেল, 'খাও তবে কচুপোড়া, খাও তবে ঘণ্টা।' হ্যাঁ, এই কচুপোড়ার উপকরণ দিলি তবু পোড়া কপালি জুট্তি পারে এ পুজোয আর কিছু না হোক—এক শান্‌কি কচুপোড়া।

উপকরণ	—	পরিমাণ
মান কচু	—	গোল করি কাটা ৩০০ গেরাম (ছোট ফেমিলির জন্য)
কাঁচা নংকা	—	৫/৬ টি
নুন	—	পরিমাণ মতোন
আদা কুচি	—	পরিমাণ মতোন
সঃ তেল	—	৫০ গেরাম
সবযে	—	১০ গেবাম (বাটা)
পদ্মমান পাতা	—	১টি

পেথমে মানকচু কুচি কুচি করে কেটে নে চডচড়ে রোদ্দুবে শুইকে নিতি হবে একটু, মানে অস একটু মেরে নিলি চলবে। তারপর শিলি মিহি করে বাটতি হবে। ওতি মেশাতি হবে কাঁচা নংকার কুচি, আদা বাটা, সরযে বাটা। এর পর সবযেব তেল পদ্মমান পাতায় মেইকে নে, কচুবাটা পাতায় জুইড়ে নে খেঁজুর পাতা দে বাঁদতি হবে।

এরপর অল্প কটি কযলাব আঁচে ঢুইকে দে, কচুপাতা পুইডে নিলি কচুপোড়া হয়ে যাবে।

কপাল পুড়লি কি হবে—একবার কচু পোড়া খেযে নিলি—হাত চাঁটতি হবে আর ঝালে উঃ-আঃ করতি করতি ঢক্-ঢক্ কবে জল খেলিই পেট ভর্তি।

খেঁদি পিসি

ডিংলাপস্ত

ডিংলা জিনিসটা বাঁকুড়ার লোকের কাছে খুব প্রিয় তরকারি বটে। ইটাকে কেউ কেউ আদর কইবে 'বাঁকুড়ার আপেল' বইলে থাকে। ঠিক মত রাঁদতে পারলে দ্যাখবেন মাছ-মাংস ফেলাইয়ে দিয়ে ক্যামনে চাটেপুটে খাবেক।

যা যা লাগবেক

ডিংলা এক কেজি। আলু পাঁচশ গেবাম। পস্ত একশ গেবাম। পিঁযাজ দেড়শ গেবাম। কাঁচালঙ্কা গটা আটেক, তেল তিরিশ চল্লিশ গেরাম। লুন আন্দাজ মতন।

ক্যামনে রাঁদতে হবেক

পথমে ডিংলার আতিভুতি বার করে ছাল ছাডাযে ডুমকা ডুমকা কবে কাটতে হবেক। আলুগুলানকেও সাইজ মতন কাটে লিতে হবেক। পিয়াজ গুলানকে ভাল করে কুঁচাই লিতে হবেক। কাঁচালঙ্কাগুলানের পেটটা ফাঁড়ে দিতে হবেক। তারপর চুলার উপর কড়াইটাকে বসাযে তাতে তেল দিতে হবেক। তেলটা পাকে গেলে পিঁয়াজ লঙ্কা গুলানকে ভাল করে লাড়তে হবেক। লাড়তে লাড়তে যখন বেশ বাদাম পারা হবেক তখন ডিংলা আব আলু দিতে হবেক। লুন পরিমাণ মতন দিয়ে আবার কতক লাডাঘাটার পব দু'কাপ জল দিতে হবেক, সিজবাব মতন। পস্তটা দিযে দিতে হবেক। ভাল করে সিজে গেলে বেশ লাড়েঘাটে মেটসেট কবে নামায লিতে হবেক। ইঃ যা। আবার ভুল হয়ে গেল। এই রেসিপিটা আমাদের মেসে এক অবাঙালি কুকম্যানের হাতে পড়ে এমন বেজায জিনিস হইছিল যে আমি মেস মেম্ববদেব হাতে উদম পিটন খাতে খাতে মরতে মবতে বাঁচেছি। তাই শেযকালে ভাল কবে মনে করাই দিলাম যে পস্তটা মিহি করে বাটে লিবেন। আমাদেব বাঁদুনিব মতন বেসিপিতে বাটাব কথা লেকা নাই বলে গটা গটা দিযে দিবেন নাই।

না-না রায়

স্বভাবে যারা কুকুর-মেকুর তারা চিরদিন কুকুর-মেকুরই থাকে। কোনো কুকুরই কোনো দিন বাঘ হতে পারেনি, পারবেও না, তাদের মালিক গলাতে সোনার চেন পরিয়ে তাদের মুখে যতই প্রচারের ফ্লাড লাইট জ্বেলে রাখুন না কেন।

গল্প

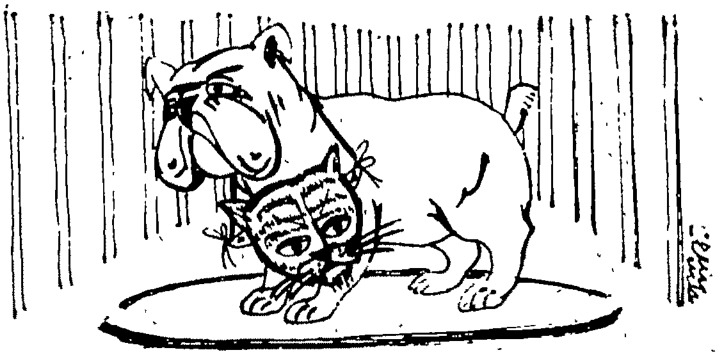

বাঘের মতো

বুদ্ধদেব গুহ

আমাদের পাড়ার সিংহীবাবুদের কুকুরের বড় শখ। শুধু কুকুরই বা বলি কেন, সবরকম পশুপাখি পোষারই ভারি শখ। বাজারে যাবার পথেই পড়ত সিংহ বাড়ি। খুব ছেলেবেলাতে, মনে আছে, আমাদের বাড়ির হেড কাজের লোক মদনদার হাত ধরে যখন বাজারের দিকে যেতাম তখন দেখতাম সিংহী বাবুদের বাড়ির মস্ত ফটকের ওপারে গাড়ি যাওয়ার ড্রাইভের ডানদিকে একটা মস্ত সিংহ ছিল। ফটকের এপাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমরা সেই সিংহের দিকে চেয়ে থাকতাম। কী তার কেশরের বাহার আর কী তার গর্জন। একবার ডাকলে মনে হত দড়াম করে বোমা ফাটল।

যখন আমি স্কুলের সেভেন এইট ক্লাশে পড়ি তখন সে-বাড়ির এক ছেলের সঙ্গে ভাব হল আমার। সে পড়ত নাম করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। আমার বাড়ি রক্ষণশীল ছিল তাই আমাকে ভর্তি করা হয়েছিল বাংলা মাধ্যমের স্কুলে। "রক্ষণশীল" বলে কেউ কটাক্ষ করলে আমার বড় জ্যাঠামশায় তাঁকে বিদ্রূপাত্মক গলাতে বলতেন, যাঁদের কনসার্ভ করার কিছু আছে তাঁরাই কনসার্ভেটিভ হন। সিংহী বাড়ির সুমনের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল খেলার মাঠে। আমরা দু'জনেই ক্রিকেট খেলতাম।

আমার ছোট কাকার কুকুরের খুব শখ ছিল। কিন্তু বড় জ্যাঠামশায়ের আপত্তিতে বাড়িতে কুকুর পোষা যেত না। বলতেন, যাদের নিজেদের মনুষ্যত্ব নিয়ে দ্বিধা আছে তারাই কুকুর-মেকুর পুষে তা সপ্রমাণ করার জন্যে সচেষ্ট হন।

ছোটকাকার কাছ থেকেই নানা কুকুরের ছবি দেখতাম ও গল্প শুনতাম। তারপর সিংহী বাড়ির সুমনের সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়ে সেই সব কুকুরকে কাছ থেকে দেখতাম।

ছোটকাকাকে বললাম, একদিন চলো না আমার সঙ্গে। কত্তো কুকুর দেখবে।

ছোটকাকা বললেন, ভাগ্। অন্যর বাড়ি গিয়ে তাদের কুকুর-মেকুর দেখব এমন আদেখলা আমি নই। তাও যদি বাড়ির কর্তারা কেউ নেমন্তন্ন করতেন কুকুর দেখার।

আমি বললাম, বলব সুমনকে?

ছোটকাকা বললেন, গাঁট্টা খাবি। আমার হয়ে তোকে দালালি করতে হবে না।

সুমনদের বাড়িতে নানারকম কুকুর ছিল। অ্যালসেশিয়ান, ফক্স টেরিয়ার, বুল ডগ, বুল টেরিয়ার, কুলি। সাদার উপরে কালো গোল গোল পলকা-ডট দেওয়া একরকমের কুকুর ছিল। তাদের নাম ডালমেশিয়ান। বিদেশের বেঁটে বাঁটকুল কিন্তু লম্বাটে পিকীনিজ কুকুর ছিল। ছিল গ্রে হাউণ্ড, ড্যাশ হাউণ্ড। গোল্ডেন রিট্রিভার—শিকারীরা শিকার করলে দৌড়ে গিয়ে জল বা স্থল থেকে সেই পাখি মুখে করে নিয়ে আসে নাকি সেই কুকুরেরা। একজোড়া কুকুর ছিল, তাদের নাম এখন মনে করতে পারছি না—সেই কুকুরদের ছবি পৃথিবী বিখ্যাত এক শিল্পীর আঁকা বিখ্যাত ছবি "THE LAST SUPPER"-এ আছে। র‍্যাফায়েল কি?

আরো একটা কুকুর ছিল বিরাট দেখতে। মুখ দেখলে ইডিয়ট বলেই মনে হত। কিন্তু আকৃতিতে প্রায় বাঘের মতো। কয়েকভরি সোনার চেন দিয়ে বাঁধা থাকত। গম্ভীর ছিল তার গলার স্বর। তবে সে অধিকাংশ সময়েই ঘুমিয়ে থাকত। যখন জেগে থাকত তখন ঢুলু ঢুলু চোখে কী যেন ভাবত।

ছোটকাকাকে জিগ্গেস করাতে ছোটকাকা বললেন, ওগুলো সব ভণ্ড তপস্বী। পাহারাও দেয় না, কামড়ায়ও না, ওরা শুধু বর্বরস্য ধনক্ষয় করে

বসে বসে খেয়ে।

তবে সব কুকুবদেরই মধ্যে কুকুরত্ব দেখতে পেতাম আমি। তারা প্রত্যেকেই মালিক দেখলে লাফিয়ে উঠত। চীনা পিকীনিজ বা জার্মান স্পিৎজ থেকে গ্রেট ডেন—সকলেরই ওই একই লক্ষণ। মনে হত, কুকুর চিনতে অসুবিধা হয় না কখনো। মালিক দেখলেই লেজ নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে ওঠা। তবে তাদেব সেই সব লক্ষণের মধ্যে তফাৎ ছিল। তফাৎ ছিল তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গির এবং লেজ নাড়ার ভঙ্গির মধ্যেও। কেউ কেউ আবার উদাসীন উদাসীন ভাব করত।

সুমন বলত, জানিস তো, ওই কুকুবগুলোর মধ্যেই কুকুরত্ব সবচেয়ে বেশি।

বাঘেদের জাতই আলাদা। বাঘের সঙ্গে কুকুরদের তফাৎ ছিল। চিরদিনই থাকবে।

আমরা যখন ক্লাস নাইনে তখন সিংহী বাড়ির সিংহটা একদিন হঠাৎই মরে গেল। পদবী সিংহ হলেও হাব-ভাবে বা চরিত্রে তাঁরা হয়ত সিংহ ছিলেন না। সিংহী বাড়ির নাম অবশ্য কুকুর-বাড়ি হযে গেল না সেই জন্যেই। কারণ পদবী তো সিংহই ছিল সুমনদের। ওদের বাড়ি শুধুমাত্র পোযা সিংহর কারণেই সিংহী বাড়ি বলে পরিচিত ছিল না।

সিংহটি মরে যাবার পরে ওঁবা একটি বাঘ আনাব অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাঘ পাওযা গেল না। ফটকের কাছে সেই খাঁচার মধ্যে তখন গ্রেট ডেন কুকুরটিকে এনে বাখা হল। দাঁড়িয়ে উঠলে, অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ অনেক মানুষের চোখে তাকে বাঘ বলেই মনে হত।

ছোটকাকাকে একদিন বললাম, দেখেছ ছোটকাকা, বাঘ পায় নি সুমনরা কিন্তু বাঘের মতো কুকুবটাকে রেখেছে সিংহেব খাঁচাতে।

—কী কুকুর?

—গ্রেট ডেন। আমি বললাম।

ছোটকাকা হেসে বললেন, বড় লোকেব বাড়ির ফটকের ভিতরে যত ভরি সোনা বা প্লাটিনামের চেন পরিয়েই দর্শনধারী কবে তাকে রাখা হোক না কেন, স্বভাবে যারা কুকুর-মেকুর তারা চিবদিন কুকুর-মেকুরই থাকে। কোনো কুকুরই কোনো দিন বাঘ হতে পাবেনি, পাববেও না, তাদেব মালিক গলাতে সোনার চেন পবিয়ে তাদেব মুখে যতই প্রচারেব ফ্লাড লাইট জ্বেলে রাখুন না কেন। বাঘেদের জাতই আলাদা। বাঘেব সঙ্গে কুকুবদেব তফাৎ ছিল। চিরদিনই থাকবে। বুঝেছিস বে হাঁদা।

আমি বললাম, তোমাব এই মত যদি কোনোদিনও বদলাও তাহলে জানিও আমাকে।

ছোটকাকা একটুক্ষণ চুপ কবে থেকে বললেন, হুঁ। হুঁ।। হুঁ।।।

টীকা নিষ্প্রয়োজন

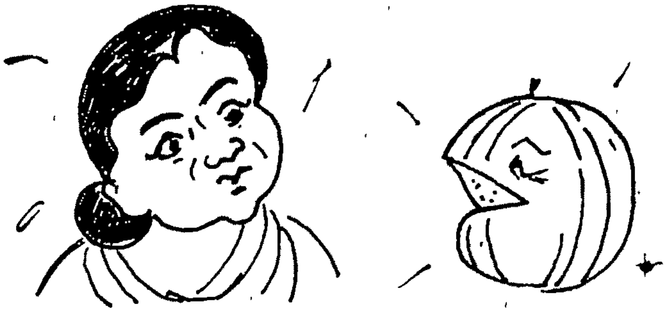

ব্রিজটাব ওপর পুবমুখো হয়ে দাঁড়ালে ডান হাতে মা'র বাড়ি, বাঁ হাতে দিদির বাড়ি, আব মাঝ ববাবর বেশ্যাবাড়ি। ইদানীং অবশ্য গণিকাদের বেশ্যা বলার রেওয়াজটা কাগজে-কলমে উঠেই গেছে। এমনকি গণিকা শব্দটিও নিষিদ্ধ। আমাদের পুবনো আমলেব 'কলিকাতা'য় অমন অনেক অকথা-কুকথা এক সময় চালু ছিল। কিন্তু হালেব 'কলকাতা'য় বিদগ্ধ বাঙালি কথায় কথায মুখ খারাপ করাটা খুব শোভন বলে মনে করেন না। তাই না?

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মা'র বাড়ি, দিদির বাড়ি আব তেনাদের বাড়ি। আরো আছে, দক্ষিণমুখো দু'পা এগোলেই আবার যমের বাড়ি—ক্যাওড়াতলা ঘাট। মা'ব স্থান বলে কথা। বাডির একটু বাড়াবাড়ি এদিকটায় হবেই। না থাকার মধ্যে শুধু ওই নকশালবাডি।

জনতা জনার্দনের ভিড়টা অবশ্য বরাববই দক্ষিণমুখো ছিল। এখনো আছে। ভক্তি-আপ্লুত বাঙালি শক্তি সাধনায় দক্ষিণা কালীর কাছে দ্বারস্থ হন কাক না ডাকতেই। সাধনা-ভজনা দিদির এক চিলতে উঠোনেও চলছিল পুবো দমে। বামফ্রণ্ট উচ্ছেদের অষ্টপ্রহর গাজন। কিন্তু গোল বাধল তরমুজ নিযে। ওই ক্ষেতেই তো দিদির তখন চাযবাস। হঠাৎই চোখে পড়ল, বাইরেটি তো দিব্যি তৃণ-সবুজ কিন্তু ভেতরে তো টুকটুকে লালবাগু। এমন অবস্থায় মানুয চোখে সর্ষেব ফুল দেখে, দিদি দেখলেন তরমুজের ফুল। শেয পর্যন্ত যাকে বলে এক কাপড়েই উঠে এলেন দিদি ক্ষেত-খামার ছেড়ে।

কিন্তু 'এমন মানব জমিন' পতিত বাখার জন্যে উনি দিদি হন নি। দাদা হলেই পারতেন। তাই লাল তরমুজে অরুচি হল তো কী হল, অমন জাফরানি রঙা খরমুজে আসক্তি আসলে ক্ষতি কি? অতএব দিদির উঠোনে খরমুজের নৈবেদ্য হাতে বামফ্রণ্ট নিধনের পালা-কেত্তন পাড়া কাঁপিয়ে তুলল। জর্জ তো (হাউস অব্ উইণ্ডমারের সে জর্জ নন) প্রায় এবেলা ওবেলা আসতে শুরু করলেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী স্বযং এসে মালপো খেয়ে গেলেন দিদির দাওয়ায় বসে। জনতার ঢল নামল দিদির বাড়িতে, মা'র বাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিযে। ওদিকে পশ্চিম বাংলায ভোটেব হাওয়া উঠতেই দিদিব আবার সেই পুরনো বাতিকটা চেগে উঠল। কথায় আছে না—উঠল বাই তো কটক যাই। দিদিরও তাই। উঠল বাই তো রাইটার্স যাই। জর্জের মুণ্ডপাত করে ধুত্তোর বলে খবমুজ বর্জন করলেন উনি। চর্বণ শুরু কবে দিলেন আবার তরমুজ। ইতিমধ্যেই তরমুজেব বৃক্ষ রোপণ কবে ফেলেছেন পৌরসভায়। এবাব তরমুজ মার্কা বি-টিমের সঙ্গে মহাজোট না মহাজট পাকিয়ে হাত না হলেও পা মিলিযে লড়ে গেলেন বিশ-পঁচিশ বছরের চ্যাম্পিয়ান এ-টিমেব বিরুদ্ধে রাইটার্স কাপের ফাইনালে।

হার নয, যাকে বলে গোহারান, তাই হারলেন। হারু পার্টিদেব চিবাচরিত রীতি অনুসারে রেফারিকে দুযলেন। কিন্তু সিধে কথাটা মাথায় ঢুকল না। আজ খবমুজ, কাল তবমুজ, পবশু হযত কাঁঠাল নিয়ে কাড়াকাড়ি কবতে বলবেন। কিন্তু ভোটাবদের এত ধকল সইবে কেন। বদ হজমেব ভযে ফল মূল—দুইই-বর্জন কবলেন পশ্চিম বাংলাব ভোটাররা।

জানি না, এই লেখাটা ছাপা হতে হতে উনি আবার কোন ক্ষেতেব মুলো হবেন। আজকের খববে উনি কিন্তু জর্জেব লাঙল হাতে খরমুজের ক্ষেতেই পুনঃপ্রবেশ করছেন।

বুনো রামনাথ

একালের পুজো

সৌরেন বসু

জন্মাষ্টমীর কাঠমা পুজো থেকে মনে মনে পুজো-পুজো ভাব জাগার আগের কালে, সেই যেদিন থেকে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ আট লক্ষ টাকা খরচ করে প্রথম শারদীয় দুর্গোৎসব করলেন। আর একালে মহালয়ার দিন, রেডিও-টিভিতে মহিষমর্দিনী দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ভোর চারটে থেকে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' করে ডেকে আনি। নামি দামি উঠতি-পড়তি শিল্পীদের মন্ত্রে-গানে ঘন্টা দুয়েক গাঁ-গঞ্জ-শহরতলি ও শহর কলকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয় আর তখনই মনে হয় এসে গেছে সেই দশভুজার পূজা।

দেখতে দেখতে কেনাকাটার হিড়িক শুরু হয়ে গেল। মাঠে-ময়দানে, পার্কে-পার্কে, অলিতে-গলিতে প্যান্ডেলের বাঁশ-ব্যাঁকারি, দড়ি-দড়া-ত্রিপল-কাপড় দিয়ে সরু সরু লম্বা কাঠের ফ্রেমে রাতদিন হাতুড়ি-পেরেকের ঠকা-ঠক্ ঠক্-ঠক্ ঠকা-ঠক্ শব্দ কানে আসছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে-ঘরে দোকানে-দোকানে চাঁদার বিলবই নিয়ে ঘোরাঘুরি আরম্ভ হল। রাস্তায়-রাস্তায় মোড়ে-মোড়ে লম্বা টর্চ জ্বালিয়ে মালবোঝাই লরি-টেম্পো থেকে রাতের আঁধারে চাঁদা তোলার শাসানি শুরু হয়ে গেল। মানে-মানে চাঁদা দিয়ে কেটে পড়তে লাগল মাল-টানা ড্রাইভারেরা। এই চাঁদাতেই চাঁদেদের ঠাকুর উঠবে আর বোতল কেনার পয়সা জুটবে।

দিন যেতে না যেতে এসে গেল ষষ্ঠী। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই 'প্লেয়ার্স কর্ণার'-এর ঠাকুর উদ্বোধন করতে আসছেন বাংলার গৌরব সৌরভ গাঙ্গুলি। 'সৌ-রভ গা-ঙ্গু-লি' —কান ফাটিয়ে মাইকে ঘোষণা চলেছে। মাঝে মাঝে গান ভেসে আসছে—জীবনমুখী কিংবা রিমেকের। থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভাবছেন একবার দেখেই যাওয়া যাক, তাই না? ৬৫ ডেসিবেল পার হয়ে ১৬৫ ডেসিবেলে মাইকের শব্দে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ভাবছেন। এ সব চিন্তায় গুলি মারুন, ষষ্ঠীতে আজ অধিবাস, চারদিক আলোয় একাকার, হৈ-হৈ রৈ-রৈ হি-হি হা-হা হাসির শব্দে, আনন্দের রোলে আর 'মধুর মধুর বংশী বাজে' গানের তালে তালে আপনি ঢুকে যান ভিড়ের মধ্যে। দেখতে পাবেন ব্যাণ্ড-সহযোগে দুর্গামায়ের মুখ উন্মোচিত হল। বেজে উঠল শাঁখ-ঘন্টা-কাঁসর-ঘড়ি, বেজে উঠল ঢাক— গিজ্‌তা গিজাং গিজ্‌তা গিজাং। এখানে ওখানে পার্কে-পার্কে কলকাতা শহরে আর শহরতলিতে ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঠাকুরের মূর্তি উদ্বোধন করলেন—বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, যাত্রা জগতের উদীয়মান নট, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, খ্যাতনামা ফুটবলার; ক্রিকেট ক্যাপ্টেন কিংবা কোনো নাট্যব্যক্তিত্ব অথবা কোনো ফুলে-ওঠা ব্যবসায়ী বা প্রোমোটার অথবা মুম্বাইশ্রী-দিল্লিশ্রী বিশ্বশ্রী।

রাস্তা-জুড়ে প্যান্ডেল; আটকে নয়, যে কেউ দিব্যি ঠাকুরের মঞ্চের তলা দিয়ে চলে যান সেজে-গুজে, মেন গেট দিয়ে ঢুকে পড়লেন বিরাট চত্বরে। এসব প্যান্ডেল এইটটিন্‌থ নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরিতে কেউ চক্ষেও দেখেনি। সারা ভারতের স্থাপত্যের নিদর্শন শুধু বাঁশ-কাঠ আর কাপড় দিয়ে। কোথাও তৈরি হাইকোর্ট, ফোর্ট উইলিয়ম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোথাও বা তাজমহল, ইন্ডিয়া গেট আর দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির আদলে নির্মিত হয়েছে ১০০-১৫০ ফুট উঁচু উঁচু প্যান্ডেল। রাতে দূর থেকে মনে হবে—এসব সত্যি। কোথাও মোগল যুগের শিল্প, কোথাও বা গান্ধার শিল্প। খেজুরপাতা, নারকেল পাতা, তালপাতারও প্যান্ডেল তৈরি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—বিদ্যুতের আলোর ঝিকমিক চিক্‌চিক্। চুঁচড়ো-চন্দননগরের ইলেকট্রিশিয়ানদের জয় জয়কার। মাথার উপরে ঝাড়লন্ঠন ঝুলছে, লাল-নীল-সবুজ-হলদে কাচের ওপর আলো পড়ছে ঠিকরে। এ রাত ষষ্ঠীর রাত, মেটে চাঁদের আলোয় অনন্ত আকাশে উড়ে যাচ্ছে মেঘের ওড়না।

রাত শেষ হতে না হতে বেজে উঠল সপ্তমীর শানাই। ওই শুনুন—তাক্-কুড়া-কুড়্ নাকুড়-নাকুড়, কাঁই না-না কাঁই-না-না বাজাতে বাজাতে কারা নিয়ে যাচ্ছে নবপত্রিকা—কদলী-কচু-হরিদ্রা-জয়ন্তী-বিল্ব-দাড়িম্ব-অশোক-মান ও ধান। একজোড়া বেল শ্বেত অপরাজিতা দিয়ে বেঁধে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া কলা-বৌ। পাতায় মাখানো সিঁথির সিঁদুর। একেবারে লম্বা শুঁড়, ইয়া ভুঁড়িওলা গণেশের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবেন, ঠায় তিনদিন তিন রাত্রি। মধ্যে দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা দশভুজা। দু'পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী আর ওই দক্ষিণে কার্তিক বাটার ফ্লাই গোঁফ সহ ময়ূরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একালের মূর্তি শুধু মৃন্ময়ী নন। এ মূর্তি তৈরি হচ্ছে থার্মোকল, মোম, প্লাস্টিক শোলা আর তুলো দিয়ে, ধান-গম-তুঁষ-নারকেল, কাচ-পাথর-ব্রোঞ্জ, কড়ি-পয়সা এসবও ব্যবহৃত হচ্ছে। সিদ্ধেশ্বরীতলা আর কুমোরটুলির ঠাকুর প্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লি-মুম্বাই-গুজরাট, আমেরিকা-লন্ডন। কুমোরটুলির পালেদের নাম সারা দুনিয়ায়। একালের ঠাকুর সেই গোমস্তা-মুচ্ছুদ্দি-দেওয়ানদের তুষ্ট করা বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী কিংবা রাজা নবকৃষ্ণ দেবের ঠাকুর নয়, মল্লিক-সিংহ-শোভাবাজার রাজবাড়ি অথবা বাগবাজারের সরকারদের বা ব্যারাকপুর বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের এক কাঠামোর এক চালচিত্তিরের ঠাকুর নয়। এখনকার বারোয়ারি বা সার্বজনীন পুজোর ঠাকুর আর দেবতা নয়, চাক্ষুষ মানবী, এর শিল্প শৈলী এবং কল্পনায় একেবারে সাবেক কাল থেকে অত্যাধুনিক কালের সংমিশ্রণ। হালফ্যাসানের ঠাকুর একেবারে আলাদা আলাদা করে বসানো—

এখানে ইলেকট্রিকের ও প্রযুক্তিবিদ্যার মেলবন্ধন। ঠাকুরকে চলন্ত ও জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা। ঠাকুর ছাড়া বিশাল চত্বরে দেখতে পাবেন সাম্প্রতিক ট্রেন দুর্ঘটনা, প্লেন ছিনতাই, বন্যা-খরার দৃশ্যাবলী, গুজরাট ভূমিকম্পের করুণ ধ্বংসাবশেষ আবার কোথাও দেখা যাবে কারগিলের যুদ্ধ, পোখরান বিস্ফোরণ, টাইটানিক জাহাজডুবি, মিছিল, আন্দোলন—সব উঠে আসবে বিদ্যুতের আলোর কারসাজিতে ও কারুকাজে। কয়েকশো স্কোয়ার জুড়ে শহর কলকাতায় তৈরি করা হচ্ছে একটা গ্রাম—ঠাকুর সাজানো হবে আটচালায়, এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা কুঁড়েঘর, গোলা, গোয়াল, ধানভরা মাঠ, গোয়াল ভরা গরু, কাকতাড়ুয়া আর ঢেঁকি। উনবিংশ শতাব্দীতে এসব চোখেও দেখা যায় নি।

এসব আলোর ঝিকিমিকি খেলায় দেখতে দেখতে কাতারে কাতারে লোক যাচ্ছে বাঁশে ঘেরা সরু পথ দিয়ে। পাঁচ মিনিটের পথ পাঁচ ঘন্টায় পার করবার ঘোরালো প্যাঁচানো পথ। হাজার হাজার লোকের উপচে পড়া ভিড়কে কায়দা করে কন্ট্রোল করার কল। ৩০/৪০ মাইল দূর থেকে আসা গাঁ-গঞ্জের যুবক-যুবতী, পুরুষ-মহিলা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া আর বালক-বালিকাদের ভিড়।

চারদিকে আপনাকে ঘিরে আছে শুধু মানুষ আর মানুষী, রাক্ষস-রাক্ষসীর মতো। শুধু খাই-খাই, খাই-খাই করছে, হামলে পড়ছে দোকানে দোকানে। মুহূর্তে উবে যাচ্ছে ফুচকা, ভেলপুরি, চুড়মুড় চপ্-কাটলেট ব্রেসলেট-ওমলেট এগরোল-চাইনিজ মশলা-দোসা। মিষ্টির দোকানে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে—কচুরি-সিঙ্গাড়া-রাধাবল্লভী, রসগোল্লা-পান্তুয়া, বাতাবি, আইসক্রিম, ডায়াবেটিস সন্দেশ, সীতাভোগ-মিহিদানা, বোঁদে-দরবেশ, গজা-জিলিপি, মালপোয়া আর মনোহরা। ঘুরতে ঘুরতে গলা হয়ে যায় শুকনো কাঠ আর গলা ভিজিয়ে নেয় কোকাকোলা-থাম্‌স্ আপ্-পেপসি ও স্ট্রাইপ্‌সে। দোকানে টাঙানো বোর্ড—'আসবো যাবো এগরোল খাবো, রাতভোর ঘুরবো ঠাকুর দেখবো।' 'আসুন আসুন ভালোবাসুন—আরামবাগ চিকেন।'

ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী চারিদিকে শুধু মেলা-মেলা সারাবেলা, সারারাত। ঘোড়ায় টানা জুড়ি গাড়ি ফিটন-গাড়ি আর কেরাঞ্চির দেখা মিলবে না। রাতভোর শুধু হেঁটে হেঁটে দেখা ঠাকুর-ঠাকুর; শয়ে শয়ে হাজারে-হাজারে গায়ে-গায়ে হা-হা হেসে হি-হি হেসে খিলখিলিয়ে পিলপিলিয়ে চলেছে লোক আর লোকিনী। উপচে পড়া ভিড়ে খাচ্ছে ঠেলা, ধাক্কা, আশে-পাশে সাদা পোশাকে পুলিশ ঘুরছে অগুনতি। বেলেল্লাপনা করলেই কপ্ করে কলার ধরে টপ করে তুলে নিয়ে পুরে দেবে গারদে।

দোকানে দোকানে সাজের পসরা। সেই জন্মাষ্টমী থেকে শুরু হয়েছে কেনা-কাটা। নতুন জামা, নতুন জুতো, শাড়ি শাড়ি বেনারসী-বালুচরী, ঢাকাই-ধনেখালি টাঙ্গাইল-শান্তিপুরী-ফরাসডাঙা নাইলন-সিন্থেটিক বোম্বে ডাইং কাতান-খাটাও-ভয়েল চিকন-বাটিক প্রিন্টস্, জয়পুরী প্রিন্টস্, মুর্শিদাবাদ সিল্ক ও ভেঙ্কটগিরি আর ধাক্কা-দেওয়া চওড়াপাড় ফিনফিনে ধুতি আর কাজ করা আদ্দির পাঞ্জাবি।

গয়নার দোকানেও ভিড় দেখবেন মোটা-সুঁটকি হাসি-হাসি ভাবলা-মুখী গাবলা-মুখী হলুদ-ফর্সা বনেদি বাড়ির মহিলাদের কিংবা বোনাস-পাওয়া পতির দেমাকভারী বধূজনের। ইমিটেশনের যুগ এটা। চুরি-ছিনতাই-এর ভয়ে সোনার জল করা রুপোর গয়না কিংবা শুধু রুপো দিয়ে তৈরি মোটাসোটা মিনে করা বালা। একাদশী থেকে যোড়শী মেয়েদের পায়ের চটি থেকে মাথার ক্লিপ, ঠোঁটের লিপস্টিক, হাতে পায়ের নখের নেলপালিশ সব ম্যাচিং হওয়া চাই। সঙ্গে আছে ম্যাক্সি কিংবা শালোয়ার, সব পাতলা লম্বা ওড়না নিয়ে ফুরফুর্ করে উড়ছে।

এখনকার দিনে পুজো প্যান্ডেল থেকে একটু দূরেই দেখতে পাওয়া যাবে বামপন্থীদের বই-এর স্টল। শারদীয়া সংখ্যা বলে হরেক রঙচঙে সাহিত্য পত্রিকা। দীর্ঘদিনের নামকরা পত্রিকার সাথে নতুন নতুন নামের মরসুমি ফুলের মতো বিচিত্র পত্র-পত্রিকার পসরা। এখানেই সিরিয়াস বই সাজিয়ে সকাল থেকে দুপুর বসে আছেন পাড়ার পপুলার দাদারা। বিশ্বের তাবৎ সমস্যার সমাধান করে ফেলছেন কেবল গসিপ করে করে। এখানে বই উল্টে-পাল্টে দেখার লোক বেশি, কেনার লোক আঙুলে গোনা যায়।

পুজোর এত রমরমার মধ্যে কিন্তু পুরোহিতকুলের অবস্থা বড়ই করুণ। যে-কোনো পুজোর বাজেট কিংবা আয়-ব্যয়ের ছাপানো বুকলেট দেখলে দেখতে পাবেন—পুরোহিতের দক্ষিণা ৫১৲ বা ১০১৲ কিংবা খুব বড়ো পুজোতে ৫০১৲ আর ফলমূলের খরচও যৎসামান্য; অন্যদিকে ঠাকুর-প্যান্ডেলের খরচ লাখ টাকার বেশি। এখন চা কিংবা কফি খেয়ে পুরুতরা পুজো শুরু করেন। বারোয়ারী পুজোর চিত্তশুদ্ধিকরণের ইচ্ছেটাই উবে গেছে, কারণ পুজো কমিটির সেক্রেটারির ইচ্ছায় অনেক কিছুই করতে হয়; এমনকি বাঁশের লগি দিয়ে মঞ্চের ওপর হুই উঁচুতে ৪০/৫০ ফুট লম্বা গাঁদার মালা পরিয়ে দিতে হয় ঠাকুরকে এক মইয়ে চড়ে। অঞ্জলিতে প্রণামী দেওয়ার জন্য মঞ্চের সামনেই আছে বাক্স কিংবা পিতলের ঢাউস এক পরাত বা বড় রেকাব। এর সেভেন্টিফাইভ পারসেন্ট বখরা পাবেন পুরুতেরা।

নিষ্ঠে-কাষ্ঠা ব্রাহ্মণের আজও দেখা মিলবে পারিবারিক পুজোতে। সেখানে বাপু চুন থেকে পান খসবে না; সব ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলবে, সিদ্ধি থেকে পঞ্চশস্য-পঞ্চগব্য, ১০৮ পদ্ম, আস্ত ফল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন—কিচ্ছুটি বাদ যাবে না। ওঁ-হ্রীং ফট্-ফট্ করতে করতে চটপট পুজো সারা হবে সেকেন্ডের কাঁটা ধরে ধরে। প্রকৃত ভক্তিমতী ও ভক্তদের দেখা মিলবে সেখানে; ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় নাকের জলে চোখের জলে ভক্তির অশ্রুতে 'মা মা জগদম্বে রক্ষা করো রক্ষা করো' 'দুর্গে দুর্গতিনাশিনী' বলে বিড-বিড করে মাথা ঠুকতে দেখবেন। আঁচলের গেরো খুলে দশটাকার প্রণামী দেবেন বোসবাড়ি, দত্তবাড়ি, সরকারবাড়ির গিন্নিরা। গরদের কাপড় পরে সারাক্ষণ পুরুতের পাশে বসে থাকবেন মা-জেঠি-খুড়িরা প্রদীপের সলতে বাড়াতে, ফুল-তিল-দুব্বো, চন্দনের খুরি এগিয়ে দিতে; ঘি-মাখানো সিঁদুরপাতা কিংবা লাল সুতোয় বাঁধা দুব্বোভরা আলতা পাতার অর্ঘ্য নিতে আর চন্নামেত্তো বিলি করতে।

মাটির খুরিতে চাল-মোন্ডা দেওয়া উঠে যায় যায়; মাটির তৈরি মালসা-গেলাস-ধুনুচি-কলসি-কটরার জায়গা দখল করে নিচ্ছে প্লাস্টিকের পাতলা পাতলা বালতি গেলাস-বাটি-পেলেট। তবে সন্ধিপুজোয় ১০৮ টা মাটির প্রদীপ আজও জ্বলছে। হুস্ করে কুমোর পাড়া থেকে কবে এসব উবে যাবে—আর দেখতে পাওয়া যাবে না। জাত ব্যবসা থেকে হাটে হাটে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে, হাঁড়ির খবর যে সুবিধের নয়—এটা জানিয়ে দিচ্ছে। ঢাকিদের জায়গা মাইকে দখল করছে।

ঘোড়ায় টানা জুড়ি গাড়ির বদলে এখন টেম্পো-ট্রাম-অটো-বাস আর পুরনো দিনের মানুষে টানা ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং রিক্সা।

চলে গেছে বাইনাচ আর হিন্দুস্থানি গানের আসর। এখন জমেছে নামি দামি শিল্পীদের পুরাতনী জীবনমুখী কিংবা মঞ্চ বেঁধে হিন্দি গানের অনুষ্ঠান। পাড়ায় পাড়ায় তক্তাপোষ বয়ে মঞ্চ বেঁধে আর পুজোর থিয়েটার-যাত্রা হয় না। একালে নায়ক-নায়িকা, নট-নটী সব টিভি সিরিয়ালে ঢুকে গেছে। কিন্তু গাঁ-গঞ্জে পুজোর সংখ্যা বেড়েছে। সারা গাঁয়ের মানুষেরা চাঁদা তুলে একটি বা দুটি ঠাকুর তুলছেন। কেবল জমিদার-বাড়ির পুজো আর কাঙ্গালি ভোজন উঠে গেছে। এখন গ্রামে কিংবা শহরে খিচুড়িভোগ বিতরণ হয় বাড়িতে বাড়িতে। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও বসে পড়ছে খিচুড়ি-ভোগ খেতে। তুলনায় পারিবারিক পুজোর প্রদীপ জ্বলছে টিমটিম করে।

এবার মাইকে শুনুন ঘোষণা হচ্ছে—'মিতা মিত্র, অরূপ ভৌমিক ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে, এখন প্যান্ডেলে পুজো অফিসে আছে, বাবা-মা কে আছেন, দেখা করুন।' কে যেন সরু মিষ্টি কচি কচি গলায় বলছে—'এবারে আমাদের

ঠাকুর বিচারকদের বিচারে প্রথম হয়েছে, দেখে যান, দেখতে ভুল করবেন না।' ঐ শুনুন ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে ভেসে আসছে—'বিচারকদের বিচারে আমাদের প্যান্ডেল শ্রেষ্ঠ। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের অনুকরণে আমাদের এই প্যাণ্ডেল; তৈরি করেছেন অভিনব ডেকরেটার্স।

'হাতে আঁকা ছবি' ও ক্যামেরাতে তোলা ফোটোর প্রদর্শনী চলছে 'ভাই ভাই সংঘের' প্যান্ডেলে। 'আজ অষ্টমীতে সন্ধ্যায় রসগোল্লা খাওয়ার প্রতিযোগিতা হবে কালীঘাট পার্কে', নাম দিয়ে যান। খাদক সংখ্যা সীমিত।'—কারা হেঁকে চলে গেল অটোতে। সকালে বস্ত্র বিতরণ হয়ে গেছে শুভ অষ্টমীতে। আজও দরিদ্রনারায়ণ সেবার নামে চলছে নিষ্ঠুর প্রহসন। ঝল্‌মল আলোর পাশে চোখ-ধাঁধানো অন্ধকার। ওই তো গাড়ি-জুড়ির পাশে ঝুপড়ির ন্যাংটা নোংরা হাড়গিলে ছেলে-পিলের দল হাঁ করে চেয়ে আছে লাল-নীল গ্যাস বেলুনের দিকে—ফূর্তি করে কারা উড়িয়ে দিচ্ছে পার্কে পার্কে, শহরে ও শহরতলিতে।

অষ্টমী পুজোয় বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পুজো দেখতে এসেছে হাজার হাজার মানুষ ট্রামে-বাসে-ট্রেনে, বাগবাজার ও দক্ষিণেশ্বর থেকে নৌকো চড়ে গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে। কুমারী রূপিণী দেবী দুর্গার পূজা চলছে। তিন দিন ধরে সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী পূজার শেষের পূজা। গোলগাল নাদুস-নুদুস মুণ্ডিত মাথা সাধু মন্ত্র পড়ছেন—

'চারুহাস্যাং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্।
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিনীম্।।'

গম্-গম্ করছে পুজোমন্দির মন্ত্রের উচ্চারণে। ওধারে ভোগের কটরা পাবার জন্য বিশাল লম্বা লাইন পড়েছে। সাদা পোশাকে ব্রহ্মচারী আর গৈরিক বসনে সন্ন্যাসীর দল ভক্তজনের সেবায় সদা ব্যস্তসমস্ত। কিছুক্ষণ আগে অঞ্জলি হয়ে গেছে। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ শান্তিরূপেণ ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা, তাঁকেই 'নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' করে ফুল বেলপাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে, পড়েছে মায়ের পায়ে; আর বলেছে দেহি দেহি—যশ দাও, ধন দাও, শক্তি দাও, পুত্র দাও, কন্যা দাও—শুধু দাও-দাও দাও-দাও;—সবায়ের মনে মনে অভাবের আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে; জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে এই সংসার-উনুনে।

যাদের ভিড়-ভাট্টা আদৌ সহ্য হয় না তারা ক'দিন ধরে টিভির পর্দায় দেখছে কলেজ স্কোয়ার, মহম্মদ আলি পার্ক, কালীঘাট পার্ক, ত্রিকোণ পার্ক, কুমারটুলি পার্ক-এর বিচিত্র সজ্জার ঠাকুর। মন ভরিয়েছে শিয়ালদহ, বাবুবাগান, সিমলা, গড়িয়া, যাদবপুর, বারুইপুর, দমদম, বরানগর, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর দেখে দেখে।

যারা ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখছেন তাঁরা নবমীর রাতে কোনো এক পার্ক থেকে মাইকে শুনছেন—'বন্যায় উড়িষ্যার আর্ত মানুষদের মুক্ত হস্তে দান করুন, গুজরাটের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে, আপনারাই এগিয়ে এসেছিলেন। আপনাদেরই অর্থ পাঠানো হবে আর্ত-সেবায়। শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' বাগবাজারের পুজো প্যান্ডেলে 'ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প' হয়ে গেছে নবমীর দিন দুপুরে। ক্যাম্প উদ্বোধন করেছিলেন পুরনো দিনের ফুটবলার চুনী গোস্বামী।

দেবীপক্ষ থেকে যারা ছিল মদের নেশায় চুরচুর, তাসের জুয়ায় মশগুল, রেড লাইট এলাকায় যারা প্রতিদিন ঘুরঘুর করত তারা আজ বড় বিমর্ষ। নবমীর রাত, হায় এই রাত যেন শেষ রাত। মন ফুরফুরে রাত, গলাগলি রাত, ঢলাঢলি রাত, চুমুচুমু রাত—চলে যায়। হায়! কে কোথায়!!

বিজয়া দশমী। সারা ভারতে আজ চলছে 'দশেরা উৎসব।' যেখানে রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয় আর রামলীলার গান চলে অহোরাত্র। রাবণকে নিহত করেই এই শরতে রামের বিজয় মহোৎসব। আজ সব ঠাকুর বিসর্জন যাচ্ছে না এই কলকাতায়। এক হপ্তায় সব ঠাকুর বিসর্জন যাবে ঘর ও প্যান্ডেল থেকে শহরে শহরতলিতে গাঁয়ে গঞ্জে। ঐ দেখুন সামনে উঁচু এক লরিতে মা দুর্গা ফ্লাড-লাইটে ঝলমল করছে, তারপর ২৫/৩০ খানা বিস্রা ভ্যানে চলেছে লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশের মিছিল, ভ্যানে যাচ্ছে হেভি জেনারেটর ভট্-ভট্ ভ্যাট্-ভ্যাট্ আওয়াজ করতে করতে, লাল-নীল-হলদে-সবুজ আলোর টুনি বাল্বে সাজানো চালচিত্র দুলছে, সঙ্গে চলেছে কানের পর্দা ফাটানো মাইকের হিন্দি গান; তারই তালে তালে শিস দিতে দিতে উন্মত্ত নৃত্য করতে করতে চলেছে যুবকের দল, এক-টেম্পো ভরা যুবতীরা তালে তালে দিচ্ছে তালি; বেজে চলেছে বিলিতি কনসার্ট; লম্বা টুপি আর জরিলাগানো রঙিন পোশাক পরে কনসার্টের দল বাজাচ্ছে ফ্লুট-ক্ল্যারিওনেট, পোঁ-পোঁ ভোঁ-ভোঁ করা আঁকানো-বাঁকানো বিরাট বিরাট বাঁশি, হাতে হাতে বাজছে ম্যারাকাস, ঝুমঝুমি-টুমটুমি। বড় বড় ড্রাম বাজিয়ে চলেছে ঢাম্-ঢাম্ ড্যাবা-ঢাম্ ঢাম্, পাশে পাশে কুড়্-কুড়্ কুড়্-কুড়্ করে বেজে যাচ্ছে সাইড ড্রাম আর প্যাঁপোর-পোঁ বিউগল।

সাত পাক ঘুরিয়ে ঠাকুর বিসর্জন হয়ে গেল গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে। দলে দলে প্যান্ডেলে কিংবা মন্ডপে ফিরে এসে শান্তির জল গায়ে ছেটাল—ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি। এবার চলছে সিদ্ধি খেয়ে কোলাকুলি আর মিষ্টি দিয়ে মিষ্টিমুখ করে গলাগলি।

ওই যে শরৎ আকাশে হি-হি করে হাসছে চাঁদনি রাতের বিজয়িনী চাঁদ আর আলো-নেভা মণ্ডপে মণ্ডপে মাটির বেদীতে টিম্-টিম্ করে জ্বলছে সেই মাটির প্রদীপ। আর সবই মাটি।

Best Wishes from

TECHNOLAB SCIENTIFIC CO.

17/1D, Gopal Nagar
Kolkata-700027

দী. কু. সা.

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

দী. কু. সা. কর্থার অর্থ কি?

তিনি বললেন, —দীর্ঘকায় কুৎসিত সারমেয়।

অচলপত্রের সম্পাদক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল নিজেকে নিয়ে এভাবে রসিকতা করতে পছন্দ করতেন। অন্যকে নিয়েও এমনি মজা করতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধে কিছু ছিল না। প্রমথনাথ বিশী মজার লেখা লিখে নিজের নাম সংক্ষেপে লিখতেন প্র. না. বি. —অনেকটা জর্জ বার্নার্ডশ'-র মতো- জি. বি. এস্.। অচলপত্রে লেখা হল : প্র. না. বি. কথাটার পুরো হচ্ছে : প্রস্রাব না বিষ্ঠা।

সজনীকান্ত দাসকে নিয়ে তিনি ছড়া কাটলেন : সজনে ডাঁটা, সজনে ডাঁটা; তোমার মুখে মারব ঝাঁটা। শিল্পী গোপাল ঘোষ সম্পর্কে লিখলেন · গোপাল ঘোষ, গোপাল ঘোষ; আঁকছ গরু, হচ্ছে মোষ।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মারা যাবার পরে সম্পাদকীয়র শিরোনাম দেওয়া হল : লিয়াকত আলী খান্ খান্। সেই থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অচল পত্র যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

আমি তখন ভবানীপুরে জাস্টিস্ দ্বারকানাথ রোডে রামরিক হাই স্কুলের উপরে মেসে থাকি। নিচের তলায় স্কুল। দোতলা-তিনতলায় মেস। এখনকার লেখক-কবি সনৎকুমার মিত্রের সঙ্গে তখনই আমার আলাপ জমে ওঠে।

পত্রিকার স্টলে অচলপত্রের পাতা ওল্টাতাম। অচলপত্র পড়তাম। তাতে কিছু লেখার ইচ্ছে হল। একদিন রবিবারে পাটভাঙা ধুতিপাঞ্জাবি পরে চক্রবেড়িয়া রোর্ড নর্থ— ঠিকানায় অচলপত্রের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। আমি লেখা দেবার কথা বলতে দীপ্তেন্দ্রকুমার বললেন, —আমরা বিজ্ঞাপন এবং চেক ছাড়া আর কোনো লেখা নিই না। আমাদের একটা লেখক-গোষ্ঠী আছে। তার বাহিরে কারো লেখা এখানে গ্রাহ্য নয়।

অনেক পত্রিকারই এই অবস্থা, কিন্তু মুখে কেউ এভাবে তা স্বীকার করেন না। দীপ্তেন্দ্র করতেন।

বেশি কথা না বাড়িয়ে সেদিন চলে এসেছিলাম। সেটা হবে ১৯৪৮-৪৯ সনের ঘটনা। এবং বছর ছয়েক পরে ভবানীপুরেরই মদন পাল লেনের রামপরায়ণ রায়ের বাড়িতে দীপ্রেন্দ্রকুমার সান্যালের সঙ্গে নাটকীয় ভাবে আমার পরিচয় করিয়ে দেন গৃহস্বামী রামদা নিজেই।

রামদার সেই রবিবারের সকালের আড্ডায় যেতেন বিমল মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ—কালপেঁচা, অধ্যাপক সুশীল জানা, চরকাশেম-খ্যাত অমরেন্দ্র ঘোষ, এমনি অনেকেই। অমরেন্দ্র ঘোষই আমাকে রামদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

এই অমরেন্দ্র ঘোষকে দীপ্তেনবাবু একবার বলেছিলেন, অমরবাবু, আপনি গ্রামের মানুষ, সরল লোক। আপনি যুগান্তর দপ্তরে পরিমল গোস্বামীর কাছে আমার লেখার প্রশংসা করে খুব ভুল করেছেন। উনি আমার লেখা খারাপ মনে করেই ছাপছেন। পরিমলবাবুর চেয়ে আমি ভালো লিখি, যখনই এটা মাথায় ঢুকবে, তখনই লেখা আর ছাপবেন না। লেখা ছাপা বন্ধ হয়ে যাবে।

আমরা কথাটা শুনে না হেসে পারি নি।

যেদিন দীপ্তেনবাবুর সঙ্গে রামদা আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন সেদিন ছিল ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ রবিবার। ঐ দিন যুগান্তর পত্রিকায় আমার গল্প বেরিয়েছিল, —'সেই মেয়েটি'।

দীপ্তেন্দ্রকুমার রামপরায়ণকে বোঝাচ্ছিলেন, —যুগান্তর পত্রিকাটা পরিমল গোস্বামীরা সপরিবারে দখল করে নিয়েছে। . ... ইত্যাদি। সব শুনে রামদা বললেন, —না না, প্রণয় গোস্বামী কেউ হয় না পরিমল গোস্বামীর। প্রণয় এখনই এখানে আসবে। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

আমি ঘরে ঢুকতেই রামদা বললেন দীপ্তেনবাবুকে, — এই যে তোমার প্রণয় গোস্বামী। আলাপ করে নাও।

দীপ্তেনবাবু আমাকে বললেন, —আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক, মশাই। আপনি সজনীকান্ত দাসকেও কাৎ করেছেন? শনিবারের চিঠিতে গল্প লিখেছেন?—এখন থেকে আমার পত্রিকাতেও লিখবেন গল্প। আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।

তারপর থেকে অচলপত্রের অফিসে প্রায়ই যেতাম। নানারকম গল্প আড্ডা হত সেখানে।

শুকব আগেও শুরু ছিল। ১৯৪৯-এর দিকে অচলপত্রে ভালো প্রশ্ন পাঠাবার জন্যে পুরস্কার দেওয়া হত টাকা। কিন্তু আমি নিজের নামে প্রশ্ন পাঠাতে ভরসা পেলাম না। কারণ অনেক সময় প্রশ্নকর্তাকে সম্পাদক শ্যালক বানিয়ে ছাড়তেন। যেমন একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল টক্‌টকে লাল, মিশমিশে কালো, ধবধবে শাদা। হল্‌দে টা কি?

উত্তর: আপনি তো জামাই-ঠকানো প্রশ্ন করেছেন। —এই ভয়ে আমি আমার ভাইয়ের নামে নবদ্বীপের ঠিকানা দিয়ে প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। পরে নবদ্বীপের ঠিকানাতেই মানি অর্ডার গিয়েছিল। আমার প্রশ্ন ছিল : গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি অনেক তন্ত্র আছে। এর কোন্ তন্ত্র মতে প্রাচীন বাংলার তান্ত্রিক সাধকগণ সাধনা করতেন?

একবার পুজা সংখ্যা অচলপত্রতে বারীন্দ্রনাথ দাশের 'লেডি মিরাণ্ডা হোস্টেল' নামে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস বেরিয়েছিল। শুনেছি, তরুণ অধ্যাপক এবং ছাত্রীর মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে কাহিনীটিকে বিস্তারিত করা হয়েছিল। —এই সংখ্যাটি সংগ্রহের জন্য চক্রবেড়িয়া নর্থে সেবার হকারদের লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছিল।

দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল ছিলেন আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। আমি তাঁকে দীপ্তেনদা বলতাম। দীপ্তেনদার ছিল সব বিষয়েই রসিকতা। অচলপত্রের মলাটে পরিচিতি লেখা থাকত ছোট ছেলেমেয়েদের নোংরা ফেলবার এবং দুধ গরম করবার একমাত্র পত্রিকা। ....প্রতি সংখ্যায় কার্টুন থাকত। তাও ছিল বেশ দেখবার মতো। একবার একটি ছবি ছিল : শূন্য প্রান্তর। মাঝে একটি প্রস্তর ফলকে লেখা, — এখানে একদা বাঙালি বলিয়া এক জাতি বাস করিত।

তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্ত্রীর নাম বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়। অচলপত্রে লেখা হল · পূর্বপাকিস্তান পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক দাবী করছে। আপানার স্ত্রীর নাম পালটিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ বালা' রাখুন। না হলে ওরা অর্ধেক দাবী করে বসতে পারে।

চীন-ভারত যুদ্ধের সময় জওহরলাল নেহরুকে উদ্দেশ্য করে লেখা হল : রবীন্দ্রনাথ জানতেন বলেই আগে থাকতে লিখে রেখে গেছেন,— একদিন চিনে নেবে তারে।

চলচ্চিত্র পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্রকে চিত্রসমালোচনা উপলক্ষে গাধা বলার জন্য আদালতে জরিমানা ধার্য হয়। ক্ষমা চাইলে জরিমানা মুকুব হবে। তিনি পরের সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে জানালেন অতঃপর আমরা নরেশবাবুকে কদাপি গাধা বলিব না। আবার গাধা বলিলে অবশ্যই জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিব। আশা করি নরেশবাবুকে গাধা বলার অপরাধ আদালত ক্ষমা করবেন ইত্যাদি। অচলপত্রে প্রকাশিত একটি ছড়া দিয়ে লেখাটি শেষ করছি। ছড়াটির উপজীব্য পিতাপুত্রের পত্র বিনিময়। পুত্র কলকাতায় মেসে থাকে।

টাকা নাই, কী খাই, ইতি কানাই।
টাকা সাফ, কর মাপ, ইতি বাপ।।

গল্প

পুতুলের মন

বিনতা রায়চৌধুরী

আই স্যাপোজ হি ইজ মাই ফাদার

পুতুলের আজ মন খারাপ। মা বকেছে। সোঁক, পুতুলের আবার মন থাকে নাকি ? থাকে থাকে, এই পুতুলের আছে। সে ব্লু-মুন স্কুলে নার্সারি ক্লাশে পড়ে, আর তার মন নেই!

আসল কথাটি, পুতুল যখন খুব ছোট ছিল তখন ও চার-পাঁচটা পুতুল নিয়ে খেলত। একটা পুতুল দেখতে না পেলেই কাঁদো কাঁদো হয়ে বলত, 'আমার পুতুল ? আমার পুতুল কোথায় ?' সঙ্গে সঙ্গে মাকে সেই পুতুলটা খুঁজে দিতে হত। মা একদিন হাসতে হাসতে বললেন, 'এতগুলো পুতুল কি সামলানো যায় ? একটা-আধটা তো হারাবেই। আমার যেমন একটা পুতুল, কখ্খনো হারায় না।'

পুতুল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমারও পুতুল আছে ? কোথায় ? মা তখন পুতুলকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন 'এই যে আমার একটা পুতুল। পুতুল কি খুশি। তার খিলখিল হাসি আর থামতেই চায় না।

তারপর থেকে মা যখনই হেসে বলতেন, 'আমার পুতুলটা কোথায় গেল ? অমনি পুতুল মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলত, 'এই যে তোমার একটা পুতুল'। সেই থেকে ওর নামই হয়ে গেল পুতুল।

পুতুল একটু বড় হতে মা ওকে পাড়ার 'ব্লু-মুন' নার্সারি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেও প্রায় একবছর হয়ে গেল। এবার পুতুলকে বড় স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তাই মায়ের কাছে পুতুলকে সারাদিন তালিম নিতে হচ্ছে। আর ভুল করলে বকুনিও খেতে হচ্ছে।

আজ রবিবার। তাই মা পুতুলকে অনেক সকালে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছেন। এখন মা মুখে মুখে পুতুলকে অনেক পড়াবেন। বড় স্কুলে নাকি ইন্টাবভিউ দিতে হবে। একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রোজ মুখস্থ করা — ভালো লাগে ?

পুতুল মুখ ভার করে সোফায় বসে ছিল।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুতুল, আকাশের রং কি ? ইংরাজিতে বলবে।'

পুতুল রেগে গিয়ে জবাব দিল, 'তোমার কি কিছুই মনে থাকে না ? আর কতদিন বলে দিতে হবে যে, স্কাই ইজ ব্লু ?'

মা হেসে ফেলছিলেন, কিন্তু কোনোমতে হাসি সামলে বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। বড্ড ভুলে যাই।'

আবার একটা-কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন মা, তার আগেই পুতুল বলল, 'তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না কষ্ট করে, আমিই বলে দিচ্ছি। 'দ্য সান রাইজেস্ ইন দ্য ইস্ট, দ্য সান সেটস্ ইন দ্য ওয়েস্ট, দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড, দ্য আর্থ রোটেট্স্ আরাউন্ড দ্য সান.....

জেনারেল নলেজের যে কটা প্রশ্ন মা শিখিয়েছিলেন বা রোজ যেগুলো প্রাকটিস্ করান, সবকটা পুতুল বলে গেল গড়গড় করে। তারপর ছবির বইটা টেনে নিয়ে এল, —'মা তোমাকে নিয়ে আর পারি না। এবার তো এই ছবির বইটা নিয়ে এসে ছবিগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবে — হোয়াট ইজ দিস্, হোয়াট ইজ দিস ? আমিই আগে তোমাকে বলে দিচ্ছি। ভালো করে শুনে নাও, মনে রাখবে, আর জিজ্ঞাসা করবে না। এত ভুলে গেলে মানুষ হবে কী করে ?'

এই শেষ কথাটা মা পুতুলকে প্রায়ই বলেন। সেই কথাটাই পুতুল এখন কপি করল। মা একটুও না হেসে বললেন, 'আচ্ছা বলো দেখি, মনে রাখতে পারি কিনা। ভুলে গেলে কাল আবার বলে দিও।'

প্রত্যেকটা ছবি দেখিয়ে পুতুল বলে যেতে থাকল, —'দিস ইজ অ্যান অ্যাপেল, দিস ইজ এ বেনানা, দিস ইজ অ্যান এরোপ্লেন, দ্যাট ইজ এ বল।' পৃষ্ঠা উল্টে দিল, এক ঝাঁক নতুন ছবি। পুতুল বলে যেতে থাকল, 'হি ইজ রানিং, সি ইজ লাফিং, দে আর সুইমিং......'

বই বন্ধ করে পুতুল মুখ তুলল, ---'কি মনে থাকবে তো সব ?'

'হ্যাঁ, মনে তো হচ্ছে থাকবে। তবে যদি না থাকে একটু বলে দেবে তো ?' পুতুল মায়ের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকাল।

পুতুল মায়ের কাছে থাকে। মা তাকে পড়ান। মাঝে মাঝে পুতুলের মনে হয় বাবা তাকে পড়ালে আরো ভালো হত। একটুও বকত না। কিন্তু বাবা তো বাড়িতে থাকেনই না, পড়াবেন কী করে। পুতুল মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, আমার বাবা কোথায় ?' মা বলেন, 'সাগরে।'

'সাগরে ? সাগরে বুঝি কেউ থাকতে পারে ?

'তোমার বাবা সাগরে চাকরি করেন।'

পুতুলকে মা যথাসাধ্য তৈরি করেছেন বড় স্কুলে ভর্তি করার জন্য। তাঁর ইচ্ছে কোনো বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করবেন। সেইজন্য ইংরাজিতে কথা বলা, উত্তর বলা, পিকচার রিডিং—সবই শেখাচ্ছেন। কিন্তু এর মধ্যেই পুতুলের পিসি এসে বললেন, 'শুধু ইংরাজি মিডিয়ামেই ইন্টারভিউ দেওয়াবে ? যদি না পারে' তার চেয়ে দু-একটা ভালো বাংলা মিডিয়ামেও ইন্টারভিউ দেওয়াও। ওটায় না হলে এটায় চান্স থাকবে।'

সেই শুনে পুতুলের মা পুতুলকে বাংলা স্কুলের জন্যও তালিম দিতে লাগলেন। পুতুলের সব গুলিয়ে যেতে লাগল। বাংলায় প্রশ্ন করলে ইংরাজিতে উত্তর দিচ্ছে। ইংরাজিতে প্রশ্ন করলে বাংলায় উত্তর দিচ্ছে। কখনো কখনো দুটোই মিলিয়ে মিশিয়ে-

একাকার করে ফেলছে। পুতুলের মা পুতুলের করুণ অবস্থাটা যে বুঝছেন না তা নয়, কিন্তু তিনিও মরিয়া। কী করবেন!

এব মধ্যে পুতুলের মাসি একদিন ফোন করে জানালেন পাঠসদন স্কুলে মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞসা করছে। কাপ আর সসার দিয়ে বাচ্চাকে বলছে, গুছিয়ে রাখ, এতে করে কী খেতে হয়, —ইত্যাদি।

পুতুলের মা সঙ্গে সঙ্গে পুতুলকে নিয়ে পড়লেন — 'পুতুল শোনো, যদি তোমাকে কেউ, জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কে, তুমি তাহলে বলবে..........।' পুতুল মাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জিজ্ঞাসা করে বসল, 'মা, মুখ্-খ্ কী জিনিস? আর মন্ত্রীই বা কাকে বলে?

পুতুলের মা একটু হকচকিয়ে গেলেন, সত্যি এটা তো পুতুল জানে না। তিনি সহজ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই পুতুল বলে উঠল, 'বুঝেছি, মুখ্-খ্, মানে হল যে লেখাপড়া কিছু জানে না, বোকা-হাঁদা। তাদের মন্ত্রী?'

পুতুলের মা আঁতকে ওঠেন, —'না, না, সে কি, তা নয়। এ মুখ্য সে মুখ্-খ্ নয়।'

'না আবার কি? তুমি আমাকে বলো না, লেখপড়া না শিখে মুখ্-খ্ হয়ে থাকবি? লোকে যে বোকা-হাঁদা বলবে।'

পুতুলের মা একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। তারপর তাড়াতাড়ি বললেন, 'তোমাকে অত মানে জানতে হবে না। যা বলছি, মুখস্থ করে রাখো।'

পুতুল মুখ গোমড়া করে ফেলল। ব্যাপারটা তার পছন্দ হল না।

পুতুলের মা এবার একটা কাপ আর সসার নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলেন, —'পুতুল এটা কি?' পুতুল সঠিক জবাব দিল। মা খুশি হয়ে বললেন, 'এতে করে কী খেতে হয়?'

—'দুধ।'

পুতুলের মা হেসে ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'আর বড়রা কাপে চা খায়।'

পুতুল জিজ্ঞাসু, দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলে, 'বড়রা কাপে করে কখনোই দুধ খায় না?'

মা উত্তর খুঁজে পেলেন না, নিজেব দু'আঙুল দিয়ে কপাল টিপে ধরলেন। মাকে মুষড়েপড়তে দেখে পুতুল এগিয়ে এল, —'মা, তুমি ভেবোনা, আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি সবগুলোই ঠিক ঠিক বলে দেব। আমি বলব, 'কাপে করে ছোটরা দুধ খায়, বড়রা চা খায় আর দাদুরা ইসবগুল।' নিজের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে ফিককরে হেসে ফেলল পুতুল। মাও এবাব হেসে ফেলে পুতুলকে কাছে টেনে নিলেন।

বড় স্কুলে ইন্টারভিউয়ের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল পুতুলের মা ততই ব্যস্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। পুতুলকে পাখি পড়ানোর মতো করে সব শেখাচ্ছেন। সেও দম-দেওয়া বোবটের মতো সব আউড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পুতুলের মায়ের মনে হচ্ছে—এটা তো শেখানো হল না, ওটা তো শেখানো হল না। সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে নতুন করে তালিম দেওয়া। পুতুল একদিন অধৈর্য হয়ে বলেই ফেলল, 'মা, আমাব মন বলছে, বড় স্কুলে ভর্তি হওয়া আমার হবে না।'

মা বেশ রেগে উঠলেন, 'তোমার মনকে বলো চুপ করতে। কেবল পাকা পাকা কথা! কাল বাদে পরশু ইন্টারভিউ; এখন যতসব কুকথা!'

এ কথা বলেই মা ভাবলেন, এখনই পুতুল না জিজ্ঞাসা করে বসে কুকথা মানে কি?

যাই হোক, অবশেষে সেই কাল বাদে পরশুদিনটা এল। আজ পাঠসদন স্কুলে পুতুলের ইন্টারভিউ। সকালবেলা পুতুলের ঘুম ভাঙল একটি অপরিচিত স্বর শুনে। পুতুল চোখ খুলে দেখল একজন অচেনা মানুষ তার দিকে তাকিয়ে বলছেন— 'গুডমর্নিং পুতুল।' পুতুল ধড়মড় করে উঠে মায়ের কাছে চলে এল, —'ঐ লোকটা কে মা?'

'লোকটা কিরে? উনি তোব বাবা।'

'বাবা? সে তো সাগরে চাকরি করে।'

'হ্যাঁ, কাল বাতে এসেছেন।'

'কেন?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল পুতুল।

'বা রে, আমার পুতুলকে বুঝি আমি দেখতে চাই না?' বাবা বললেন।

'আমি মোটেই তোমার পুতুল নই।' বিরক্তির সঙ্গে বলল পুতুল।

'তবে কার?'

'আমি মায়ের পুতুল।'

পুতুলেব মা তাড়াতাড়ি এসে পুতুলকে টেনে নিযে গোছ-গাছ করতে লাগলেন, — 'আচ্ছা হযেছে, এখন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও। একেবারেই যেন দেরি হয়ে না যায়।'

সাজগোজ করে বেরনোর সময় পুতুল মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ লেকটা কি আমাদের সঙ্গে যাবে নাকি?'

'কি আশ্চর্য! তোমার বাবা, তোমার ইন্টারভিউতে যাবেন না? এইজন্যই তো তাড়াহুড়ো করে এলেন।'

পুতুল আর কোনো কথা বলল না।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে সমস্ত পথটা মা তাকে শেখাতে শেখাতে গেলেন। তোমার নাম কি? তোমার বাবা-মাযের নাম কি? বাবা কী করেন? তোমার ঠিকানা কি? কীভাবে এখানে এলে? তোমার মাযের শাড়িব রংটা কী রং?

পুতুলের মা ইচ্ছে করে আজ একবঙা একটা শাড়ি পরেছেন, যাতে পুতুলের উত্তর দিতে সুবিধে হয। এই শাড়ি পবা নিযেও সকালে কি ঝক্‌মারি। মা যে শাড়িই বার করেন সে শাড়িতেই দু-তিন বকম রং আছে। কি হবে, পুতুলের গুলিয়ে যেতে পারে। অবশেষে এই নীল রঙের শাড়িটা।

ট্যাক্সিটা রাস্তায় মাঝে মাঝে জ্যামে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু পুতুলের মায়ের প্রশ্নাবলীতে কোনো জ্যাম নেই। অনর্গল সেখান থেকে একটার পর একটা এসে যাচ্ছে —'টিয়া পাখির রং কি? গরু ক' পায়ে হাঁটে? ব্যাঙ কেমন করে চলে? প্রধানমন্ত্রীব নাম কি? মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি? এমনকি পুতুলের মা স্বাস্থ্যমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রীর নামও শিখিয়েছেন পুতুলকে। তিনি কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। পুতুল নির্ভুলভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তব দিয়ে যাচ্ছিল, তবে তার মুখটা ব্যাজাব হয়ে আছে। আসলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ঐ লোকটার মুখের দিকে যতবাব তাকাচ্ছে, ততবারই দেখছে লোকটা কেমন মিটিমিটি হাসছে। কেন? এত হাসার কি আছে!

পুতুলের বাবা সত্যি সত্যি হাসছিলেন। মা-মেযের প্রশ্ন-উত্তরের বহর দেখে শুধু অবাকই হচ্ছিলেন না, ওদের ক্ষমতাকে তাঁর প্রায় অসাধাবণই মনে হচ্ছিল।

স্কুলে ঢুকে একটা বড় ঘবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওবা। তাবপর যথাসময়ে ভিতর থেকে পুতুলের অর্থাৎ সুমনা চক্রবর্তীর ডাক এল। পুতুলকে নিয়ে বাবা-মা হেড-মিস্ট্রেসের ঘরে ঢুকলেন। পুতুল ঘরে ঢুকে দেখল, প্রায় সোনাদিদার মতো দেখতে একজন মহিলা টেবিলের উল্টো দিকের চেযারে বসে আছেন। মুখটা বেশ হাসি-হাসি।

পুতুলবা তিনজনই টেবিলের এপাশের চেয়ারে বসল। কোনো কঠিন কঠিন প্রশ্ন নয়, ওই ভদ্রমহিলা পুতুলকে তার নাম, বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন আব জিজ্ঞাসা করলেন — 'এই স্কুলটা তোমাব ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে।'

'রোজ আসবে এখানে? কার সঙ্গে আসবে? আজ কার সঙ্গে এসেছ?'

'মায়ের সঙ্গে।' স্পষ্ট জবাব দিল পুতুল।

'শুধু মায়ের সঙ্গে? আব ইনি? পুতুলের বাবাকে দেখিয়ে হেডমিস্ট্রেস জিজ্ঞাসা করলেন। পুতুল এক মুহূর্ত দেরি না করে জবাব দিল, 'একে আমি চিনিনা।' পুতুলের বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমি একজন মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। আমার মেয়ে খুব ছোট থাকতেই কন্ট্রাক্ট নিয়ে চলে যাই। কাল রাতেই ফিরেছি বাড়িতে, তাই ....'। পুতুলের বাবা হেডমিস্ট্রেসকে কোনোমতে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন কাঁচুমাচু মুখে। সেই মুখটা দেখে পুতুলের বোধহয কি মনে হল, বলে উঠল 'তবে.. ....'

'তবে?' হেডমিস্ট্রেস চোখ ফেরালেন পুতুলের দিকে।

'এর নাম যদি সত্যসুন্দর চক্রবর্তী হয় তাহলে আমার মনে হয় ইনি আমার বাবাই হবেন। কারণ আমার বাবার নাম তো সত্যসুন্দর চক্রবর্তীই। যিনি সাগরে চাকরি করেন।'

'তোমার মনে হয়?' হো হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। তিনি বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন।

ট্যাক্সিতে ফেরার সময় সবাই চুপ করে আছে। লোকটা আর নামছেও না। পুতুল সব দেখছিল। পুতুলের বাবা ওর মাকে বললেন, 'আমি কিন্তু কাল রাতেই পুতুলকে ঘুম

থেকে তুলতে চেয়েছিলাম। তুমিই বারণ করলে।'

মা সেকথার উত্তর না দিয়ে পুতুলকে বললেন, 'কেন ও রকম করে বললে?'

পুতুল একটু চুপ করে থেকে বলল, —'আমার মন যা বলেছে তাই বলেছি, সত্যিই তো ওকে আমি, চিনি না।'

'উনি কত কষ্ট করে এলেন, তোর সঙ্গে গেলেন!'

'আমি তো যেতে বলিনি।'

'আশ্চর্য। উনি তোমার বাবা ! সেটা বলতে পারলে না?'

'তুমি তো শিখিয়ে দাও নি।'

সত্যি, পুতুলের মা ভাবলেন, অত প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে যদি ওটাও মিশিয়ে নিতেন, তাহলে বোধ হয় ভালোই হত।

আজ ইংরাজি স্কুলে ভর্তির ইন্টারভিউ। মা তাকে বার বার সাবধান করে দিচ্ছিলেন, 'পুতুল, একটা কথাও বাংলায় বলবে না। মনে থাকে যেন। আর যেমন যেমন শিখিয়েছি, ওরা কিন্তু ম্যানার্সের ব্যাপারটা খুব দেখে। বসতে বললে তবেই বসবে, থ্যাঙ্ক ইউ বলবে। ব্লু-মুনে অনেক কিছু শিখেছ, তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়। প্রত্যেকটা প্রশ্নের স্মার্টলি উত্তর দেবে।'

'ওরা তো কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না।'

'কে বলল তোমাকে?'

'আগের স্কুলে কিছু জিজ্ঞাসা করল? 'মন্ ত্রীর' কথাও তো জানতে চাইল না।'

কথাটা সত্যি, পুতুলকে অনেক কিছু শেখানো হয়েছিল, কাল কিছুই কাজে লাগেনি। যেটা লাগল, সেটাই শেখানো হয়নি।

পুতুল লক্ষ্য করছিল, সে শুধু মায়ের সঙ্গেই যাচ্ছে আজ। তারা দু'জনেই রেডি হচ্ছে। লোকটি একা একা মন খারাপ করে বসে আছে। সে বার বার তাকাচ্ছিল ওর দিকে। তখন ভদ্রলোক ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, —'মে আই অ্যাকমপ্যানি উইথ ইউ?' পুতুল ঘাড় কাৎ করে খুব আস্তে বলল, 'ইয়েস।'

প্রিন্সিপ্যালের সামনে পুতুল একটুও ঘাবড়ালো না। গুডমর্নিং, থ্যাঙ্ক ইউ, নেম-অ্যাড্রেস পর্যন্ত বেশ ভালোই উৎরোলো। এমনকি 'ডিং ডং বেল' রাইমস্‌টা চমৎকার বলল। পিকচার রিডিংও টকাটক বলে দিল। পুতুলের মা মনে মনে আনন্দে ভেসে যাচ্ছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ পুতুলের দিকে তাকিয়ে বাবা-মাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন —'হু আর দে সুমনা?'

পুতুল টক্ করে মাকে জিজ্ঞাসা করল মুখ নামিয়ে, খুব ফিস্‌ফিস্ করে 'মা, আমার মনে হচ্ছে—ইংরাজি কি হবে?'

'আই সাপোজ্, কেন?' পুতুলের মা অবাক হয়ে নিচু স্বরে বললেন।

সুমনা ওরফে পুতুল ততক্ষণে প্রিন্সিপ্যালকে বলছে, 'শি ইজ্ মাই মাদার চক্রবর্তী অ্যান্ড আই সাপোজ হি ইজ্ মাই ফাদার সত্যসুন্দর চক্রবর্তী।'

'ইউ সাপোজ?' প্রিন্সিপ্যালের চোখ কপালে উঠে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুতুলের বাবা — 'ম্যাডাম .....ইউ নো ....অ্যাকচুয়ালি .... কোনোমতে ব্যাপারটা সামলানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে পুতুলের মা প্রচন্ড ধমক দিলেন পুতুলকে, —'তুমি, কি ভেবেছ মনে? তোমাকে আমি বাবার সম্বন্ধে বলিনি কাল?'

'আমি তো ওকে চিনি না বলিনি। বলেছি, আমার মনে হচ্ছে ....'

'চুপ করো।

এর প্রায় এক সপ্তাহ পর।

পুতুলের সঙ্গে বাবার খুব ভাব হয়ে গেছে। বাবা নানা দেশ থেকে তার জন্য খেলনা, ছবির বই, পুতুল এনেছেন। সে সব নিয়ে পুতুল মত্ত হয়ে আছে। আর কেবলই জিজ্ঞাসা করছে— 'বাবা, এই বইটা আমার? বাবা, এই পুতুলটা কোথা থেকে এনেছে? বাবা, এই খেলনাটা চালিয়ে দেবে?'

একটু দূরে বসে পুতুলের মা উল বুনছিলেন। সব লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'পুতুল, এখন 'বাবা' 'বাবা' করছিস। অথচ স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে যা করলি! আমার এত পরিশ্রম, এত আশা সব নষ্ট হয়ে গেল। কোনো চান্স নেই, বেশ বুঝতে পারছি।'

পুতুল গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার মন বলছে দুটো স্কুলেই চান্স পাব।'

পুতুলের মা ঘাড় নাড়লেন নিরাশ ভঙ্গিতে। বাবা বললেন, 'হতাশ হয়ো না. পুতুলের মন যখন বলছে ....' পুতুলের দিকে তাকিয়ে বাবা চোখ টিপলেন।

সত্যি পুতুলের মন যা বলেছে তাই ঠিক হয়েছে। পুতুল দুটো স্কুলেই চান্স পয়েছে। মা, বাবা ঠিক করতে পারছেন না কোনো স্কুলে পুতুলকে ভর্তি করবেন। ওঁরা ভাবছেন, পুতুলের মন কী বলে, একবার শুনবেন !!

ট্যারা চোখে

সমালোচনা

'সমালেচনা' নামে একটি নতুন মাসিকপত্র প্রসব করেছেন বরানগর থেকে শ্রী শিবাজী পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে আমাদের তাক্‌লাগার দশা। লিট্‌ল ম্যাগাজিন থেকে শুরু করে বইপত্তর—সব কিছুর প্রশংসায় প্রায় বন্যা বইয়ে এবারের বর্ষার খরা দূর করেছেন তাঁরা। এমনকি 'বাণিজ্যিক পত্রিকা' পত্রপাঠ-এর ছবি সমেত শংসাপত্র ছেপে এবং তার একটি কপি গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে ডাকযোগে পত্রপাঠ দপ্তরে প্রেরণ করে তিনি আমাদেরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে চির আবদ্ধ করেছেন। কী বলে আমরা তাঁদের মঙ্গলাচরণ করি। কলিকালে এমন পর-প্রশংসক পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! সবেতেই ভালো দেখেন। বড় ভালো 'লুক' এঁদের, বড় ভালো লুক; সংক্ষেপে—ভাল্লুক। ভাল্লুক দীর্ঘজীবী হোক!

সুচতুর গুপ্ত

এই সময়ের লেখিকা
দীপা বিশ্বাসের
বিতর্কিত উপন্যাস "খোঁজ," চেনা পরিবেশ অচেনা মানুষদের নিয়ে বাস্তবধর্মী গল্পসংকলন "পরিচয়" এবং চিরন্তন সমস্যা নিয়ে অজস্র নতুন ভাবনা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য সমাধান রয়েছে প্রবন্ধ সংকলন "মানহারা মানবী" বইতে (গত ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু প্রকাশ করেন)। লেখিকার দুটি অসাধারণ ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ **RARE MOMENTS** এবং **THE TRAGIC HEROINE** এবং সদ্য প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থ "বিষণ্ণ নক্ষত্র" বইগুলি আলোচিত হয়েছে আজকাল, গণশক্তি, কালান্তর, সোনার বাংলা, সংবাদ প্রতিদিন, Poetry Today ইত্যাদি পত্রিকায়।
প্রেমচন্দের ছোটগল্পের সংকলন "জেহাদ" ও অন্যান্য গল্প মূল থেকে অনুবাদ
প্রাপ্তিস্থান : শিড বুক সেন্টার, ডেকার্স লেন এবং কলেজস্ট্রিটের উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, লেখাপড়া, বুকমার্ক।

গল্প

ওয়াক্!

মিত্রা সান্যাল

লতিকা, রিমা, সন্ধ্যা, রেবেকা—চার বান্ধবী পুজোব বাজার করতে বেরিয়েছে। সাবাদিন বাজার করতে করতে সন্ধে হয়ে গেছে। ওরা, পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। খিদে আর জল তেষ্টায় অতিষ্ঠ।

অনেক কিছু কেনাকাটা করেছে—চুড়িদার, শাড়ি, সুন্দব সুন্দব ইমিটেশন গয়না ম্যাচিং করে এবং জুতোও কিনেছে। ওদের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। যেখানে যত খাবারের দোকান আছে কোথায় জায়গা পাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে দেখল লেখা আছে— আসুন, বসুন, খান, খুলুন আর ফেলুন।

ওরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এসে দেখল বাস্তাব এক ধারে একটা ছোট্ট ঘর —ছিমছাম, নিবিবিলি, ভেতবে বড় প্লাস্টিকের একটা লাল রঙেব ঢাকা দেওয়া পাত্র বসানো আছে। ঘবের সামনে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে বলল, আমার নাম লালু। ও চেঁচিয়ে বলে উঠল—দিদিরা খুলুন। খিদের জ্বালায় তাড়াতাড়ি ওরা পাত্রটিব ঢাকা খুলে ফেলল—বাজারের যত আবর্জনা সবই তার মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। ওযাক্!!

235-5974
234-2036

ASSOCIATED ROADWAYS

Head Office & Booking Godown :
60-D, COLOOTOLA STREET
KOLKATA-73

Delivery Godown :
31/38, T. C. ROAD, KOLKATA-53

BRANCHES

ASANSOL, ARAMBAGH, ANDAL, BANKURA, BARDWAN, BARAKAR, BOLPUR, DURGAPUR, KHARAGPUR, MIDNAPUR, PURULIA, RANIGUNG, SINGUR, TAMLUK, TARAKESWAR

অনবদ্য গ্রন্থরাজি

ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি চর্চার দিনলিপি
সন্তোষ দেবনাথ-এর আমার দেশ সেই সময় ৪০
অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু-র
ভারতের হিজড়ে সমাজ ৭৫, পুরুষ যখন যৌনকর্মী ৭৫
অসিত কুমার দাস-এর টাইটানিক এক ঐতিহাসিক ঘটনা ৬০
পি. সি সরকার (জুনিয়র)-এর আমার জীবন আমার ম্যাজিক ১৫০
চিন্ময় চৌধুরীর রক্তের বদলে রক্ত ৫০
সুজাতা মুখোপাধ্যায়ের ডাক্তারকে টাকা না দিয়ে ৯০
ডঃ ভবানী প্রসাদ সাহু-র
জানতে চাই ২০, শরীর স্বাস্থ্যের টুকিটাকি ৩০
তাপস চট্টোপাধ্যায়-এর
ব্যস্ত লোকের সুস্থ শরীর ৩৫
ডাঃ সুনীল ঠাকুর ও তাপস চট্টোপাধ্যায়-এর
ঘাড়ের ব্যথা নিরাময়ে ৫০
অসিত কুমার দাস-এর ক্লোনিং : বিজ্ঞান বনাম পুরাণ ৪০
ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহুর
ভূত ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর ৯০

দীপ প্রকাশন
২০৯ এ বিধান সরণি কলকাতা-৬ ফোন : ২১৯-০৩৭৭

লাদেন বধ

কল্লোল গাঙ্গুলী

দাদার দাদা বিশ্বদাদার হাজার ডিগ্রি এখন জ্বর
লাদেন-গুঁতো খেযে দাদাব বুকটা কাঁপে থবোথর
এতোদিনে ছিল দাদার রক্ত-খেলায বেজায় সুখ
নিজের রক্ত ঝরতে দেখে শক্ত চোযাল নিজেব মুখ
লাদেন-ঝাড়ে জল ছিটিয়ে দাদাব ছিল দাদাগিরি
ঠেলায় ডাকে—সবাই এসো, লাদেন মেরে ঘবে ফিরি।

বড় গল্প

নক্ষত্রলোকের যাত্রী

সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

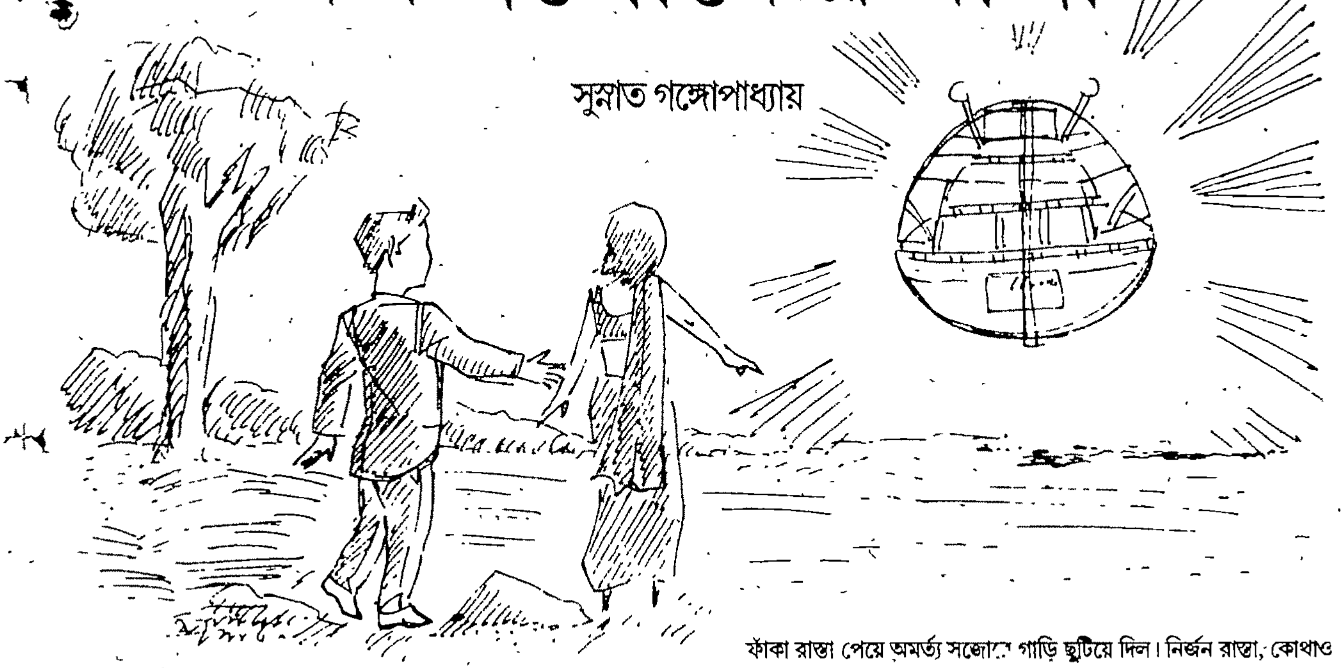

গভীর রাত্রে যখন অর্কেস্ট্রায় শেষ নাচের বাজনা বেজে উঠল, শমিতার কাছে এসে অমর্ত্য বলল, "মে আই হ্যাভ্ দিস্ ডান্স প্লিজ?"

শমিতা মৃদু হেসে বলল, "এতক্ষণ তো খুব অন্য মেয়েদের সঙ্গে নাচছিলে, এখন আমার কাছে কেন?"

অর্কেস্টায় তখন এঙ্গেলবার্টের 'সেভ্ দিস্ লাস্ট ডান্স ফর মি'র সুর বাজছিল। অমর্ত্য বলল, "শেষ নাচটা আমি তোমার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।"

ওযাল্জ্ নাচতে নাচতে অমর্ত্য একটু ঘন হয়ে বলল, "আমাব জীবনের শেষ নাচও তোমার সঙ্গেই নাচতেচাই।"

কপট কটাক্ষ হেনে শমিতা বলল, "তুমি কি প্রকৃতিস্থ হয়ে বলছ, না ড্রাংক্ হয়ে গেছ?"

অমর্ত্য বলল, "আই অ্যাম্ ড্রাংক্ উইথ ইয়োর চার্মস্। মনে হচ্ছে, এই রাত যেন না কাটে।"

"এ তো তোমাব ক্ষণিকের নেশা। নেশা কেটে গেলে তোমার সব মোহ, সব আকর্ষণ মিলিয়ে যাবে।"

নাচতে নাচতে শমিতাকে আরও কাছে টেনে নিল অমর্ত্য, বলল, "বিশ্বাস কর শমিতা, এ আমার মোহ নয়, এ আমার মনের গভীরতম অনুভূতি। তোমার এই সান্নিধ্য আমি সারা জীবন ধরে উপভোগ করতে চাই।"

"বাপরে, মনে হচ্ছে, তুমি এখনই কিছু একটা করে ফেলতে চাও। রাতটা কাটুক, তারপর দেখব, তোমার এই 'মুড' থাকে কিনা।"

একটু পরে বাজনা বন্ধ হয়ে গেল, 'সুইমিং ক্লাবে'র 'নিউ ইয়ারস্ ইভ্' পার্টিও শেষ হল। ক্লাব থেকে বেরিযে শমিতাকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে স্ট্র্যান্ড্ রোড ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে অমর্ত্য বলল, "এত রাত হযে গেল, তোমার মা-বাবা আবার চিন্তা কববেন না তো?"

শমিতা বলল, "না, তোমাব সঙ্গে এসেছি, তা তো জানেন।"

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে অমর্ত্য সজোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। নির্জন রাস্তা, কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, শুধু রাস্তার আলোগুলো টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে। গঙ্গার বুকে কয়েকটা জাহাজের 'সিলুয়েট' দেখা যাচ্ছে। তারাও যেন ছবির মতো নিশ্চল হয়ে রয়েছে। 'ম্যান অফ ওয়ার, জেটি'র কাছাকাছি এসে অমর্ত্য গাড়ি দাঁড় করাল, তারপর শমিতার দিকে ফিরে তাকাল। একটা কালো রঙের 'শিফন্' পরেছিল শমিতা, খোলা চুল তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠে লুটিয়ে পড়েছিল, ঘন কালো পটভূমির ওপব শমিতাব শুভ্র সুন্দর মুখখানা যেন রাত্রির আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করছিল, আর অমর্ত্যকে দুর্বার হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছিল। শমিতা বলল, "কী দেখছ?"

অমর্ত্য বলল, "তোমাকে।"

"বেশি দেখো না," শমিতা বলল, "দেখে দেখে পুবনো হয়ে গেলে আর ভালো লাগবে না।"

"লাগবে। তুমি আমার কাছে কখনো পুরনো হবে না।"

"আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে যদি আমরা আবার কোনো বাতে এখানে আসি, তখনো কি তুমি আমাকে এমনি চোখে দেখবে?"

"দেখব। ভালোবাসার বয়স নেই শমিতা।"

শমিতা মুখ তুলে সোজা অমর্ত্যর চোখেব দিকে তাকাল। অমর্ত্য আর দেরি করতে পারল না। তার মুখ নেমে এল শমিতার মুখে। বাধা দিল না শমিতা। এমনি করে কতক্ষণ কেটেছিল, কেউই বুজতে পারে নি, সময় যেন নিশ্চল হযে থমকে দাঁড়িযেছিল দু'জনের জন্য। হঠাৎ মাথার ওপরে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে দু'জনেই চমকে উঠে সরে গেল। গাড়িব জানলা দিয়ে মুখ বাড়িযে ওপর দিকে তাকিযে অমর্ত্য দেখল, একটা উজ্জ্বল গোলাকার জিনিস আকাশ থেকে নিচে নেমে আসছে। প্রথমে সে ভাবল, ফানুস টানুস হবে। কিন্তু জিনিষটা আরো কাছে আসার পর দেখল, সেটা একটা সোনালি ধাতুর তৈরি বিশাল গোলক, যার ব্যাস কয়েকশো ফিট্ হবে সেটা বন্‌বন্ করে ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামছে। দু'এক মিনিট পরেই সেটা পাশে ফোর্ট উইলিয়মের দিকের মাঠের ওপরে নেমে এল, তারপর মাটি থেকে দু'-এক ফিট ওপরে দাঁড়িয়ে লাট্টুর মতো ঘুবতে থাকল। ইতিমধ্যে শমিতাও ওটাকে দেখতে পেয়েছিল। তাবা দু'জনেই গাডি থেকে নেমে অবাক হয়ে জিনিসটার দিকে এগিযে গেল। গোলকটা ঘুবতে ঘুরতে একটু পবে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপবেই সেটার নিচের দিকে একটা বিশাল দবজার মতো

ফাঁক হয়ে গেল, সেখান থেকে একটা ছোট ধাতব সিঁড়ি মাটি পর্যন্ত নেমে এল, আর সেখান দিয়ে নেমে এল একটি মানুষ। অবশ্য তাকে মানুষ না বলে দৈত্যই বলা উচিত। কারণ তাব দেহের গড়ন মানুষের মতো হলেও লম্বায় সে প্রায় দশ–বারো ফিট হবে। অমর্ত্য আব শমিতা কি করবে ভেবে না পেয়ে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল। দৈত্যটা নিচে নেমে এসে অমর্ত্যদের দেখতে পেয়ে তাদের কাছে এগিয়ে এল। অমর্ত্য ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "কে আপনি? কী চান?"

দৈত্য কোনো কথা না বলে আরও কাছে এগিয়ে এল। তারপর মৃদু হেসে অমর্ত্যর কাঁধে আল্‌তো করে হাত রেখে বলল, "ভয় পেয়ো না। আমায় চিনতে পারছ না? আমি মহাকাশের দূত, তোমাদের আদি পিতা।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনি? কেমন করে এলেন?"

"আমি এসেছি বাইশ লক্ষ আলোক–বর্ষ দূরের এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে, যার নাম তোমরা দিয়েছে 'অ্যান্ড্রোমিডা নেবুলা'। পেছনের ঐ গোলকটা হল আমার মহাকাশযান।"

"কিন্তু মহাকাশযান ওরকম গোল কেন? আমাদের রকেটের চেহারা তো এরকম নয়।"

দৈত্য হেসে বলল, "হ্যাঁ, তাই তোমাদের মহাকাশযান এখনো সৌরজগতকেই ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তবে আমাদের মতো মহাকাশযান তোমরাও ভবিষ্যতে বানাতে পারবে। আর নক্ষত্রলোকেও যাতায়াত করতে পারবে, আর সেই উদ্দেশ্যেই আমার পৃথিবীতে আসা।"

অমর্ত্য জিজ্ঞেস করল, "আপনার মহাকাশযান মাটি না ছুঁয়ে ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কেমন করে?"

দৈত্য বলল, "ঐ গোলকের চারপাশ ঢেকে রয়েছে ঘন হাওয়ার 'কুশন'। যা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে গোলকের সঙ্গে দৃঢ়সংবদ্ধ রয়েছে। তোমাদের সভ্যতার চেয়ে আমাদের সভ্যতা কোটি কোটি বছরের পুরনো ও হাজার গুণ উন্নত। তোমাদের আধুনিক সভ্যতাও আমাদেরই দান। কিন্তু এত অল্প কথায় তো সব বোঝানো যাবে না। তোমরা যদি আমার সঙ্গে আসো, তাহলে আমার মহাকাশযান কেমন করে চলে —তা তোমাদের দেখাতে পারি, আর সব কথা খুলে বলতে পারি।"

শমিতা ইতস্তত করল, বলল "না, এখন থাক। আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। নইলে মা–বাবা ভাববেন।"

কিন্তু অমর্ত্যর কৌতূহল বাধা মানছিল না। সে নিজে একজন বৈজ্ঞানিক, উন্নততর সভ্যতার এরকম একটি নিদর্শন পরীক্ষা করার-সুযোগ সে ছাড়তে চাইল না। সে শমিতার হাতে গাড়ির চাবিটা দিয়ে বলল, "শমি, তুমি আমার গাড়িটা নিয়ে তোমার বাড়ি চলে যাও। আমি পরে ফিরব।"

শমিতা বলল, "না, তোমাকে একলা ফেলে আমি যাব না। আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।" "ভয় নেই, আমার পেছনে এসো।" এই বলে আকাশদূত সিঁড়ি বেয়ে দরজা দিয়ে গোলকের মধ্যে ঢুকে গেল। আর তার পেছনে ঢুকল অমর্ত্য আর শমিতা। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে মনে হল গোলকটার পাশ দিয়ে যেন ঝড়ের মতো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। গোলকটা ঝকঝকে সোনালি ধাতুর তৈরি। কিন্তু সোনা বলে মনে হল না। বিশাল দরজার ভেতরে একটা সরু 'প্যাসেজ' দিয়ে তারা সামনে এগিয়ে চলল। ভেতরের দেয়াল থেকে একটা বেগুনি রঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, অথচ আলোর উৎস দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ পেছন থেকে 'ক্লিক' করে একটা মৃদু শব্দ শুনে তারা পেছনে ফিরে দেখল, দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অমর্ত্য ও শমিতা পরস্পরের দিকে তাকাল, তাদের মুখে ভয়ের ছাপ। কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় নেই। কিছুদূর যাবার পর দৈত্যটা একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর দেয়ালের ওপর একটা বোতাম টিপতেই হঠাৎ দেয়ালের একটা অংশ সরে গিয়ে ফাঁক হয়ে গেল। তারা তিনজন সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢোকবার পর পেছনের দেয়াল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, আর পায়ের তলায় মেঝেটা হঠাৎ তীব্রবেগে ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। শমিতা টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে যাচ্ছিল, অমর্ত্য তাকে ধরে ফেলল। তারা বুঝল, এটা একটা তীব্র গতিসম্পন্ন 'লিফ্‌ট'। একটু পরেই লিফ্‌ট নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল, সামনের দরজা সরে গেল, তারা আর একটা 'প্যাসেজ'র মধ্যে ঢুকল। তার দুদিকে একই রকম উজ্জ্বল ধাতুর দেয়াল। একটু পরে আকাশদূতএক জায়গায় থমকে দাঁড়াতেই দেয়ালের একটা অংশ সরে গেল। তারা ঢুকল একটা উজ্জ্বল আলোকিত বৃত্তাকার ঘরের মধ্যে। ঘরটার একদিকে 'গ্যালারি'র মতো একটার পর একটা টেবিল। তার ওপর নানারকমের যন্ত্রপাতি। আর একদিকে দেয়াল ঢেকে রয়েছে বিরাট 'কন্ট্রোল প্যানেল'। সেটা অসংখ্য জটিল কলকব্জায় ভর্তি। মাঝখানে দুটো ঘোরানো চেয়ার। তার একটাতে বসেছিল আর একজন দৈত্যাকার মানুষ, তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল। অমর্ত্য দেখল, সে পুরুষ নয়, নারী, লম্বায় প্রায় প্রথম দৈত্যের সমান। তার গায়ের রঙ বরফের মতো সাদা— যেন মর্মর মূর্তি, স্বচ্ছ ত্বকের তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল শিরা-উপশিরা, নিখুঁত সুন্দর কমনীয় মুখ, উজ্জ্বল সোনালি চুল পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত নেমে এসেছে আর বুকের যুগল পাহাড়ের মাঝখানের গভীর উপত্যকার উপরাংশ ব্লাউজের ওপর দিয়ে দৃশ্যমান। দানবীর পরণে হ্রস্ব 'স্কার্ট'। তার নিচে অনাবৃত সুডৌল উরু ও শুভ্র পদযুগল যেন গজদন্তের মতো মসৃণ। পুরুষ-দৈত্যটির দিকেও এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল অমর্ত্য ও শমিতা। এতক্ষণ অন্ধকারে তাকে ভালো করে দেখতে পায়নি। তারও রঙ ধবধবে ফর্সা, বলিষ্ঠ পুরুষালি চেহারা, নীল চোখ, সোনালি চুল, নিখুঁত অথচ সংবেদনশীল মুখ, যেন পাথর কেটে বানানো গ্রিক দেবতার মূর্তি। অমর্ত্যদের মনে হল এরা যেন স্বর্গের দেবদূত আর তারা নিজেরা যেন এদের ব্যর্থ অনুকৃতি। আকারেও যেমন-ছোট, রূপেও তেমনি মলিন। দেবদূতী মৃদু হেসে তাদের সঙ্গে করমর্দন করল। অমর্ত্য বলল, "আমার নাম অমর্ত্য চ্যাটার্জী। আমি 'অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' নিয়ে গবেষণা করছি। আমার বান্ধবীর নাম শমিতা রায়, ও আবার 'ফিলজফি' তে এম. এ. দিয়েছে। কিন্তু আপনাদের নাম তো জানতে পারলাম না।"

পুরুষ দৈত্যটি হেসে বলল, "আমাদের কোনো নাম নেই। কারণ আমাদের ভাষাও নেই। আমরা ভাষার সাহায্য ছাড়াই পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করতে পারি। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করি 'টেলিপ্যাথি'তে। তবে আমাদের 'ব্রেনের' 'অটোম্যাটিক ট্রান্সপন্ডারের'র সাহায্যে আমরা পৃথিবীর মানুষদেব সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারি। ইচ্ছে হলে তোমরা আমাদের যে কোনো নামে ডাকতে পারো।"

শমিতা বলল, "সেই ভালো। আপনারা মহাকাশ থেকে এসেছেন, যাকে আমরা স্বর্গ বা দেবভূমি বলে কল্পনা করি। তাই আপনার নাম হোক 'দেবদূত'।"

"আর আপনার নাম হোক্ 'অপ্সরা' অমর্ত্য বলল দানবীর দিকে তাকিয়ে, "কিন্তু আপনারা কি উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে এসেছেন, তা তো বললেন না।"

দেবদূত বলল, "আমরা এসেছি তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য।"

"কোথায়?"

"আমাদের নক্ষত্রলোকে, 'অ্যান্ড্রোমিডা নেবুলা'য়।"

"আমরা কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।" শমিতা বলে উঠল, "আমাদের হাতে আর সময়ও নেই, আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। আপনার মহাকাশযানটা তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিন, আমরা চলে যাই।"

"তার আর উপায় নেই", দেবদূত বলল, "আমরা এখন পৃথিবী থেকে কয়েক লক্ষ মাইল দূরে চলে এসেছি, সেকেণ্ডে দু'লক্ষ মাইল বেগে আমরা এগিয়ে চলেছি মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে।"

অমর্ত্য বলল, "দেখুন, ঠাট্টা-তামাসার সময় এটা নয়। আমরা তো এখনো একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কোনো শব্দও শুনি নি। তাছাড়া আমরা তো এখনো পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণের মধ্যেই রয়েছি।"

দেবদূত বলল, "আমাদের মহাকাশযান এত উন্নত যে, ওঠবার সময়ে বা মহাশূন্যে ছোটবার সময়ে ভেতর থেকে তার গতিবেগ বোঝা যায় না, কোনো শব্দও শোনা যায না। আর যেটা মাধ্যকর্ষণ বলে ভাবছ সেটার উৎস পৃথিবী নয়। এই গোলকটা তীব্র বেগে ঘুরছে বলে, 'সেন্ট্রিফিউগ্যাল ফোর্স' বা 'কেন্দ্রাতিগ শক্তি'র জন্য এর ভেতরে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি হচ্ছে। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে এদিকে এসে দেখ।" বলে দেবদূত ইন্‌স্ট্রুমেন্ট বোর্ডে'র কাছে গিয়ে একটা

'মনিটর স্ক্রিনে'র 'সুইচ' টিপে দিল। অমনি তার পর্দার ওপর ভেসে উঠল চাঁদের মতো ছোট আকারের একটা গ্রহের ছবি, মেঘের আস্তরণের ফাঁক দিয়ে তার নীল সমুদ্র ও এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের পরিচিত ভূভাগ যেন ছোট মানচিত্রের মতো দেখা গেল। সেই ভূভাগের কোনো অংশ সবুজ, কোনোটা আবার লাল, আর সবচেয়ে ওপরে উত্তর মেরুর সাদা তুষারাবৃত অঞ্চল সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছিল।

শমিতা জিজ্ঞেস করল, "বাইরে তাকাবার জানলা কোথায়?"

দেবদূত বলল, "আমাদের মহাকাশযান ঘুরতে ঘুরতে যায় বলে জানলা থাকে না, এই 'মনিটার স্ক্রিনে'ই ইচ্ছেমতো চারদিকের ছবি দেখা যায়। এবার সূর্য দেখতে চাও?" বলে দেবদূত একটা 'নব' ঘোরাল, অমনি ছবি বদলে গেল। দেখা গেল ঘন কালো অন্ধকার মহাকাশ। তার একপাশে আলোকবিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করছে সূর্য। চারিদিকে নক্ষত্রেরা ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তাদের বিন্যাস পৃথিবী থেকে যেরকম দেখা যায়, সেরকম নয়।

অমর্ত্য চেঁচিয়ে উঠল, "এর মানে কি? আমাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ভেতরে নিয়ে এসে জোর করে আপনাদের গ্রহে নিয়ে যাচ্ছেন, একবার আমাদের অনুমতি নেওয়াও প্রয়োজন বলে মনে করেন নি? আমরা আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই না, আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।"

দেবদূত শান্ত গলায় বলল, "ভয় পেও না, যেজন্য তোমাদের নিয়ে এসেছি, সে কাজ শেষ হবার পর তোমাদের নিশ্চয়ই আবার পৃথিবীতে দিয়ে আসব। তোমাদের নিয়ে আসার জন্য একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কি করব—আমাদের 'প্ল্যান' মতো অমর্ত্যকে যে একা পেলাম না, সব কথা খুলে বললে শমিতা তোমাকে আসতে দিত না। তাই দু'জনকেই নিয়ে আসতে হল। তবে মিথ্যে কথাও আমি বলি নি, আমি বলেছিলাম, আমাদের মহাকাশযান কেমন করে চলে তোমাদের দেখাব। আমার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি।"

"কতদিন পরে আমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসবেন?" শমিতা জিজ্ঞেস করল।

দেবদূত বলল, "বেশিদিন নয়। আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পৃথিবীর হিসেবে প্রায় দশ বছর লাগবে। তারপর আমাদের কাজ শেষ করে আরো দশ-পনেরো বছরের মধ্যেই আমরা আবার তোমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারব বলে আশা করছি।"

"তার মানে যেতে আসতে আমাদের কুড়ি-পঁচিশ বছর লেগে যাবে? তাহলে আমাদের কি বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠাবেন? না, আমাদের লাশগুলো সৎকারের জন্য সেখানে পাঠিয়ে দেবেন?" অমর্ত্যর কণ্ঠে তীব্র শ্লেষের সুর ফুটে উঠল।

"তুমি তো 'অ্যাস্ট্রোফিজিক্স' নিয়ে গবেষণা করছ। বৈজ্ঞানিক তথ্যও সব ভুলে গেলে নাকি?" দেবদূতের গলাতেও যেন বিদ্রূপের আভাস। "'টাইম ডাইলেশন এফেক্ট' সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই জানো। মহাশূন্যের যাত্রাপথে পৃথিবীর হিসেবে সময় কাটে না। আমরা এখন আলোর গতিবেগের চেয়েও দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছি, পৃথিবীতে যখন ঝড়ের বেগে সময় বয়ে চলেছে, এখানে তখন সময় কাটছে ধীর গতিতে। পৃথিবীতে যখন পঞ্চাশ বছর কেটে যাবে, তখন এই মহাকাশযানের মধ্যে কাটবে কয়েক দিন মাত্র। আমরা 'টাইম ব্যারিয়ার' ভেঙে-চুরে চলেছি।

"তাহলে কি মা-বাবার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না? তাঁদের যে কিছু বলে আসা হল না।" শমিতার কণ্ঠে কান্নার ছোঁয়া।

অমর্ত্য অধীর কণ্ঠে বলল, "এত লোক থাকতে কেন আমাদের ধরে নিয়ে এলেন? আমাকে আপনাদের কী দরকার, তা তো বললেন না।"

"সব কথাই বলব। আগে চল, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই, একটু বিশ্রাম করে নাও। তোমাদের মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে তোমরা খুব ক্লান্ত।" এই বলে দেবদূত অপ্সরাকে মৌন ভাষা 'টেলিপ্যাথি'তে কি সব বলল, তারপর অমর্ত্য ও শমিতাকে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। 'প্যাসেজ' দিয়ে কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকের একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়াতেই দেয়াল সরে গেল। অমর্ত্য বুঝল, এখানকার সব দরজাই 'ফোটো-ইলেকট্রিক সেলে' কাজ করে। তারা সবাই একটা ছোট ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঘরের মধ্যে হালকা নীল আলো জ্বলছিল, পাশাপাশি দুটো ছোট খাট সাজানো, তার ওপর চকচকে রঙিন 'বেডকভার'। জানলা নেই, কিন্তু অদৃশ্য ছিদ্রপথ দিয়ে মনোরম ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। পাশে 'ড্রেসিং রুম, বাথরুম সবই আছে। দেবদূত দেখিয়ে দিল। দেয়ালে একটা অচেনা গ্রহের রঙিন ছবি টাঙানো। দেবদূত বলল, 'ওটা আমাদের গ্রহ।" একপাশের দেয়ালের মাঝখানে একটা ছোট জালি-ঢাকা ফোকর দেখিয়ে বলল, "তোমাদের যদি কিছু দরকার হয়, বা আমাকে ডাকা প্রয়োজন মনে কর, তাহ এই ফোকরের নিচের সুইচটা 'অন্' করে কথা বলবে, আমি শুনতে পাব। ঘরে তাপমাত্রা বাড়ানো-কমানোর জন্যও রেগুলেটর আছে। তোমাদের ইচ্ছেমতো 'সে করে নিও। আর এপাশের 'ওয়ার্ড রোবে' তোমাদের মাপমতন ছোট সাইজের সবরক জামাকাপড় আছে। তাতে তোমাদের কাজ চলে যাবে। আশা করি, এখানে কয়েক বছর কাটাতে তোমাদের কষ্ট হবে না। শুভরাত্রি।" বলে দেবদূত বিদায় নিল।

অমর্ত্য ও শমিতা আর দাঁড়াতে পারছিল না। সারারাত নাচানাচি করেছে, তারপর এই অঘটন। জামাকাপড় না বদলেই দু'জনে দুটো খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। দেখল, খাটের গা য়ে অনেকগুলি সুইচ লাগানো। এক একটা সুইচ টিপলে এক এক রঙের আলো জ্বলে ওঠে। কোনোটা লাল, কোনোটা সবুজ, আবার কোনোটা দিবালোকের মতন সাদা; অথচ আলোর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। নীল আলোই তারা জ্বেলে রাখ

শমিতা বলল, "একি বিপদে পড়লুম অমর। মা-বাবার সঙ্গে কি আর আমা কোনোদিন দেখা হবে না?"

অমর্ত্য বলল, "আমার দোষেই তোমার এই দুর্ভোগ। আমার সঙ্গে আসতে গিয়েই তো আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িয়ে গেল।"

শমিতা বলল, "তাই তো আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু এমন হবে—তা বে জানত? তবু ভাগ্যিস, তোমার সঙ্গে ছিলাম, তা না হলে তোমাকে হরিয়ে আমা অবস্থা কী হত বল তো?"

অমর্ত্য কিছু না বলে শমিতার কপালে একটা চুমো খেল। তারপর আবছা নী আলোয় তাদের দু'জনেরই চোখ বুজে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড় ওরা।

* * *

কয়েক ঘন্টা পরে অমর্ত্যর ঘুম ভাঙল। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখ শমিতা তখনো ঘুমোচ্ছে। অমর্ত্য ভাবল, "বেচারা। আমার জন্য ওকে আরো ক কষ্ট পেতে হবে কে জানে? তবু একবারও শমী আমার ওপর রাগ করেনি, সত্যিই আমাকে ভালোবাসে। ও কাছে না থাকলে গ্রহান্তরের এই অচেনা দেবদেবী সঙ্গে আমি কেমন করে থাকতাম? শমী আমার পাশে থাকলে আমি কোথা যেতে ভয় পাই না।" বিছানা থেকে উঠে পড়ে অমর্ত্য পাশের বাথরুমে ঢুক বাথরুমে আয়নার মতো স্বচ্ছ ধাতুর দেয়াল, তাতে নিজের চেহারার অবস্থা দে লজ্জা পেল অমর্ত্য। 'বেসিনে' একটা নল রয়েছে, কিন্তু সেটা খোলার কল খুঁ পেল না। নলের নিচে হাত রাখতেই জল পড়তে আরম্ভ করল। অমর্ত্য বুঝল- এখানেও 'ফোটো ইলেকট্রিক সেলে'র কারসাজি। বাথরুমে তোয়ালে নে দেয়ালের মাঝখানে ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সারি সারি কয়েকটা জালে ঢা ফোকর দেখতে পেয়ে তার একটার ওপর অমর্ত্য হাত রাখল। অমনি সেটা থে গরম হাওয়ার ঝাপ্টা এসে এক মুহূর্তের মধ্যে তার হাতের জল শুষে নি রাথরুম থেকে বেরিয়ে অমর্ত্য দেখল, শমিতা উঠে পড়েছে। তাকে দেখে শমি জিজ্ঞেস করল, "সকাল হয়ে গেছে নাকি?"

অমর্ত্য বলল, "মহাশূন্যে তো শুনেছি সকাল সন্ধে নেই। ওসব হল পৃথি ব্যাপার। তোমার ঘুম হয়েছিল তো ভালো?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ভীষণ মাথা ধরেছে, দেখ তো চা পাওয়া যায় কিনা।"

"আমার তো খিদেও বেশ পেয়েছে।" বলে অমর্ত্য 'ইন্টারকমে'র সুইচ্ করে দেবদূতকে ডাকল, 'সুপ্রভাত' জানিয়ে চা ও 'ব্রেকফাস্ট' চাইল। দেব বলল, "এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।" অমর্ত্য 'নাইট লাইট'-টা নিভিয়ে 'ডেলাইট'

অন্ করে দিল, দিনের মতো আলোয় ঘর আলোকিত হয়ে উঠল।

শমিতা 'ওয়ার্ডরোব' খুলে দেখল। মেয়েদের জন্য রয়েছে শুধু পাশ্চাত্য ধরনের পোশাক, শাড়ি বা সায়া নেই। পছন্দমতো 'স্কার্ট ও অন্তর্বাস বেছে নিয়ে সে বাথরুমে ঢুকল, দেখল একদিকে 'শাওয়ার' রয়েছে। ভাবল, স্নান করে নিলে মাথার ব্যথা কমতে পারে। জামাকাপড় খুলে ফেলে 'শাওয়ারে'র নিচে দাঁড়াতেই আপনা থেকে জল পড়তে লাগল। 'রেগুলেটর' ঘুরিয়ে সে জলের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে নিল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে সে আরাম করে স্নান করল। স্নান শেষ হলে 'শাওয়ারে'র তলা থেকে সরে এসে দেয়ালের ফোকরগুলোর সামনে দাঁড়াতেই গরম হাওয়ায় তার গায়ের জল শুকিয়ে গেল। আয়নার মতো চারিদিকের দেয়ালে তার প্রতিচ্ছবি দেখে শমিতার লজ্জা হল, মনে পড়ল পাশের ঘরেই অমর্ত্য আছে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিয়ে সে বাথরুম থেকে বেরুল।

অমর্ত্য মুখ তুলে বিদেশি সজ্জায় শমিতাকে দেখে মুগ্ধ। বলল, "তোমাকে যে চেনাই যাচ্ছে না শমী। মনে হচ্ছে এক অচেনা মেমসায়েব এসে দাঁড়িয়েছে।" সে উঠে শমিতার কাছে যাচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ লম্বায় দরজা খুলে গেল। একটা লোক হাতে 'ট্রে' নিয়ে ঘরে ঢুকল, লোকটা লম্বায় পৃথিবীর মানুষদের মতোই খাটো। ঘরের ভেতর এসে 'বেডসাইড' টেবিলের ওপর 'ট্রে'টা রাখল। লোকটার মুখ ভাবলেশহীন, চোখদুটো যেন দৃষ্টিহীন। চলাফেরাও যেন কেমন যান্ত্রিক। অমর্ত্য তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি? তুমি কি আমাদের মতো পৃথিবীর মানুষ?" অমর্ত্যর কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শমিতা দেখল, ট্রে-র ওপর দুটো ছোট প্লেট আর দুটো ছোট কাপ। প্লেটের ওপর ট্যাবলেটের মতন দুটো বড়ি রয়েছে। আর কাপের মধ্যে সোনালি পানীয়। সে একটু ইতস্তত করল, বলল, "এটা তো চা বলে মনে হচ্ছে না। আর খাবারের বদলে রয়েছে দুটো বড়ি। বিষ-টিষ হবে না তো?"

শমিতা লক্ষ্য করে নি, একটু আগেই দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকেছিল দেবদূত। সে বলল, "তোমাদের সন্দেহ এখনো যায় নি দেখছি। ওটা হল 'ফুড পিল'। মহাশূন্যে তো আর পৃথিবীর মতো মাছ-মাংস পোলাও-কালিয়া পাবে না। ওই পিল' খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে। ওর মধ্যেই আছে শরীরের ক্ষয় পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণ, ওতেই তোমাদের খিদে মিটবে। আর ঐ পানীয়টুকুও খেয়ে নাও। শরীর ঝরঝরে লাগবে। আশা করি, খেতে চা-এর থেকে খারাপ লাগবে না।"

লজ্জা পেয়ে শমিতা বড়িটা মুখে ফেলে দিল; খেতে মন্দ লাগল না, লজেন্সের মতন। পানীয়টাও চেখে দেখলে, অপূর্ব স্বাদ, অনেকটা 'পিপারমিন্টে'র মতন, সে চক্চক্ করে পুরোটা খেয়ে ফেলল। পরে ওরা ঐ পানীয়ের নাম রেখেছিল "অমৃত"।

দেবদূত জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের ভালো ঘুম হয়েছিল তো?"

অমর্ত্য বলল, "হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আপনাদের?"

দেবদূত হেসে বলল, "আমরা ঘুমোই না। আমাদের নক্ষত্রে বা মহাশূন্যে দিনরাত্রি নেই। তাছাড়া আমাদের ঘুমের দরকার হয় না। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই কাজ হয়।"

অমর্ত্য বলল, "আপনি যে লোকটাকে পাঠিয়েছিলেন, সে কি পৃথিবীর মানুষ? লোকটা কিন্তু ভারি অভদ্র, আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়েই চলে গেল।"

দেবদূত বলল, "ও মানুষ নয়; যন্ত্রমানব বা 'রোবোট', ওরা কথা বলতে ারে না। আমাদের নক্ষত্রে কেউ কারো বাড়িতে কাজ করে না, তবে সব বাড়িতেই রোবট' আছে, তারাই ফাই-ফরমাস খাটে। ওদের মাথায় কৃত্রিম মস্তিষ্ক বসানো য়েছে। অবশ্য সেগুলো বেশি শক্তিশালী নয়। আমাদের 'টেলিপ্যাথি'র ভাষা ওদের মস্তিষ্কে ধরা পড়ে। কিন্তু তোমাদের ভাষা ওরা বুঝতে পারে না।"

'ফুড পিল' ও অমৃত খাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই অমর্ত্য ও শমিতার নে হল তাদের সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি-বেদনা যেন দূর হয়ে গেছে। অমর্ত্য বলল, চলুন। আপনাদের মহাশযানটা ঘুরে দেখে আসি।"

দেবদূত বলল, "চল।"

বাইবের প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেবদূত বলল, "কালকে তোমরা 'কন্ট্রোল্ রুম' দেখেছ। এখন দেখবে 'কমিউনিকেশন রুম।" এই বলে দেবদূত হঠাৎ বাঁ দিকে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকল। অমর্ত্যরা দেখল, ঘরের মধ্যে একটা বিশাল 'কম্পিউটার', আর চারিদিকে নানারকম বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি।

দেবদূত বলল, "এখান থেকে মহাশূন্যের যে কোনো গ্রহে বা নক্ষত্রে বার্তা পাঠানো যায়, তবে সবই অবশ্য আমাদের 'টেলিপ্যাথিক' ভাষায়।"

শমিতা জিজ্ঞেস করল, "এ ঘরে কোনো 'অপারেটর' থাকে না?"

"না। আমাদের নক্ষত্র বা অন্য কোনো জায়গা থেকে বার্তা এলে 'কন্ট্রোল রুমে' সঙ্কেত পাওয়া যায়। তখন আমাদের মধ্যে একজন চলে আসে।"

অমর্ত্য বলল, "আর ওদিকের ঐ 'কম্পিউটার'টার কাজ কি?"

"আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট গতিপথের বিশদ বিবরণ ঐ কম্পিউটারের মধ্যে আছে। কম্পিউটারই সঠিক রাস্তায় আমাদের মহাকাশযানকে চালিত করে আর প্রয়োজন হলে গতিপথ সংশোধন করে।"

"কেমন করে?" অমর্ত্য জিজ্ঞেস করল।

"এই গোলোকের বাইরে -এর পেটের চাবিদিকে —শনিগ্রহের মতন একটা বলয় আছে, যেটা ভাসছে ঘনীভূত বাতাসের 'কুশনে'র ওপর, এটা দরকার মতো যে কোনোদিকে ঘুরে যেতে পারে। এর ওপর বসানো আছে অনেকগুলো 'প্রোপালসান ইউনিট'। কম্পিউটারের নির্দেশমতো বলযটা অভীষ্ট দিকে ঘুবে গিয়ে গোলোকটাকে নির্দিষ্ট নক্ষত্রের দিকে চালিত করে, আবার দরকার হলে 'প্রোপালসান জেট' গুলিকে চালু করে মহাকাশযানকে ঠিক পথে ঘুরিয়ে দেয়।"

"কিন্তু কীসের শক্তিতে এই মহাকাশযান চলে? 'প্রোপালসান ইউনিট' থেকে কিসের তেজ বেরোয়?"

"ল্যান্ডিং প্যাড' থেকে ওঠার সময়ে 'ফোটন প্রোপালসান ইউনিট' কাজ করে, অর্থাৎ 'জেট' গুলো থেকে ঘনীভূত আলোকরশ্মি লক্ষগুণ শক্তিশালী হয়ে বেরোয়, তারপর আকাশে উঠে গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে বেরিয়ে যাবার পর গোলোকের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে যেই আলোর গতির কাছাকাছি আসে, অমনি কম্পিউটারের নির্দেশে 'ট্যাকিয়ন প্রোপালসান ইউনিট' চালু হয়ে যায়. তখন আলোর গতির চেয়েও সহস্রগুণ বেগে ছুটে চলে আমাদের মহাকাশযান।"

অমর্ত্য জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু মহাকাশযানের আকার গোলোকের মতো কেন? আমাদের 'রকেটে'র মতো লম্বা হলে কী অসুবিধে হত?"

দেবদূত বলল, "আদর্শ মহাকাশযানের আকৃতি হওয়া উচিত বর্তুলাকার। মহাশূন্যে যেমন 'ওপর-নিচ' নেই, 'সামনে-পেছন' নেই, 'ডান-বাঁ' নেই। গোলোকেরও তেমনি এসব নেই। মহাশূন্যে ছুটতে ছুটতে দিক পরিবর্তন করা বা ঘুরে যাওয়া বা যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করা গোলোকের পক্ষে খুব সোজা, 'রকেটে'র পক্ষে নয়। তাছাড়া গোলোকের ভেতর কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণের জন্য চলাফেরা, স্নান-খাওয়া ও অন্যান্য কাজকর্ম করতে অসুবিধে হয় না।"

শমিতা বলল, "আমি কিন্তু এসব বৈজ্ঞানিক কচকচি কিছুই বুঝতে পারছি না। সবই হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে।"

দেবদূত হেসে বলল, "আচ্ছা চলো, এবারে আমরা যাব মহাকাশযানের 'লাউঞ্জে'। সেখানে আরাম করে বসে হালকা গল্পগুজব করা যাবে।"

আবার ঘর থেকে বেরিয়ে 'প্যাসেজ' দিয়ে হেঁটে তারা একটা বিরাট হলঘরের ভেতরে ঢুকল। একদিকে 'সোফা সেট' সাজানো রয়েছে। সামনে 'টি.ভি.' সেটের মতন একটা ছোট 'মনিটব স্ক্রিন' বসানো। আর এক দিকে নানা রকম খেলার সরঞ্জাম, তার মধ্যে রয়েছে বিলিয়ার্ড আর টেবিল টেনিস, তাস ও দাবা খেলার বোর্ডও আছে। অন্যগুলো চেনা গেল না। অমর্ত্যরা বুঝল, মহাশূন্যের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রেও পৃথিবীর কয়েকটা খেলার প্রচলন আছে। দেবদূত একটা সোফায় ওদের বসতে ইঙ্গিত করল। সোফাগুলো পৃথিবীর তুলনায় অনেক বড় সাইজের। তার মধ্যে বসে অমর্ত্য আর শমিতা যেন কোথায় তলিয়ে গেল। এবার হলঘরটার দিকে তাকিয়ে একটা জিনিস অমর্ত্যর অদ্ভুত লাগল। ঘরের মেঝেটা যেন সমতল নয়, চায়ের কাপের প্লেটের মতো মেঝেটা মাঝখানে নিচু। আর চারদিকে উঁচু হয়ে

ওপরে উঠেছে। তার মনে হল, তারা যেন একটা গোল বলের পেটের ভিতর সবচেয়ে নিচে বসে আছে। আর দূরের বিলিয়ার্ড ও টেবিল টেনিসের টেবিলগুলো চড়াই-এর ওপরে বাঁকাভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অমর্ত্য আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, "এ ঘরের মেঝেটা এরকম বাঁকা কেন?"

দেবদূত বলল, "আমাদের মহাকাশযানটা যে বর্তুলাকার,তাই এখানকার সব মেঝেই গোল। অন্য ঘরগুলো ছোট বলে লক্ষ্য করোনি, এ ঘরটা বড় বলে চট্ করে বোঝা যাচ্ছে। এখানে ওপর বলতে সব সময়ে বোঝায় গোলকের কেন্দ্রবিন্দু। ঐ কেন্দ্রের ওপরদিকে যে ঘরগুলো আছে সেখানে যাবার সময়ে আমাদের শরীর ঘুরে যায় উল্টোদিকে। অর্থাৎ আমাদের এখনকার অবস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে মাথা হবে নিচের দিকে, পা হবে ওপর দিকে।"

"ওপরেব ঘরগুলো আমাদের দেখালেন না তো। সেগুলোতে কী আছে এবং কারা থাকে?" শমিতা জিজ্ঞেসা করল।

"ওপবের দুটো ঘরে আমরা দু'জন থাকি। অন্যান্য ঘরে আছে গবেষণার নানারকম উপকরণ, 'স্টোর রুম' বলতে পারো। সেখানে তোমাদের দেখার কিছু নেই। এই মহাকাশযানে আমরা, দু'জন ছাড়া আছে আমাদের তৈরি জনাচারেক 'রোবোট', আর এখন এসেছ তোমরা দু'জন।"

শমিতা জিজ্ঞেস করল, "এত বড় মহাকাশযানে আপনারা দু'জন মাত্র চালক? একজনের যদি শরীর খারাপ হয়, বা ধরুন যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে কি একজনই কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন?"

"আগেই বলেছি, এই মহাকাশযান সাধারণত কম্পিউটারের নির্দেশেই চলে। খুব জরুবি অবস্থা না হলে আমাদের 'কন্ট্রোল' করার দরকার হয় না। তাছাড়া রোগ-জরা-মৃত্যু— এসব সমস্যা আমরা হাজাব হাজার বছর আগেই জয় করেছি। আমাদেব শরীর কখনো বিকল হয় না।"

"অন্য কোনোরকম দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে।" অমর্ত্য বোঝাতে চেষ্টা করল, "এই মহাকাশযানে আছেন আপনি আর আপনার সঙ্গিনী। কোনো অসতর্ক মুহূর্তের দুর্বলতায় তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাব তো হতে পারে।"

হো হো করে হেসে উঠল দেবদূত। বলল, "ভুলে যাচ্ছ, আমরা তোমাদের মতো পৃথিবীর মানুষ নই। আমাদের নক্ষত্রে যেমন মৃত্যু নেই, তেমনি জন্মও নেই। আমাদের জনসংখ্যা কখনো বাড়ে-কমে না।"

"তাহলে আপনাদের নক্ষত্রে কি নারী-পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নেই?" অমর্ত্য জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না। শমিতা একটু লাল হল।

"আছে, তবে সে শুধুই সম্ভোগের জন্য। তার সঙ্গে বংশবৃদ্ধির আসা বা আশঙ্কা জড়িয়ে নেই।"

"আচ্ছা, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন, আশা করি কিছু মনে করবেন না। অপ্সরা দেবী মানে আপনার সহযাত্রিনী কি আপনাব স্ত্রী?"

"না।" দেবদূত আবার হাসল। "আমাদের নক্ষত্রে বিবাহ প্রথা নেই। উভয়পক্ষের সম্মতি থাকলে যে কোনো নারী-পুরুষ যতদিন খুশি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারে।"

"আপনাদের নিযমকানুন তো দেখছি ভালোই। আপনারা অমরত্ব, অনন্ত যৌবন ও অবাধ যৌন স্বাধীনতা উপভোগ করেন। তাহলে পৃথিবীতে এত বাজে নিয়মকানুন চালু হল কেন?" অমর্ত্য জিজ্ঞেস করল। শমিতা চিমটি কাটল অমর্ত্যর উরুতে।

দেবদূত বলল, "আমরা বিবর্তনের চরম শীর্ষে উঠে গেছি, তাই আমাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের বিবর্তন এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, তাকে চালু রাখার জন্যই এখনো জন্ম-মৃত্যুব প্রয়োজন। আর পৃথিবীর জনসংখ্যা যাতে অতিরিক্ত বেড়ে না যায় সেজন্যই পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু হয়েছে, যাতে একটি পুরুষ একটি নারীকেই সম্ভোগ করতে পারে।"

"আপনারা কি আগেও পৃথিবীতে এসেছিলেন?" শমিতা জিজ্ঞেস করল।

"গত পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে আমরা গোপনে পৃথিবীতে যাতায়াত করছি, আর মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। মাঝে মাঝে আমাদেব মহাকাশযান কেউ কেউ দেখে ফেলে, তখন 'উড়ন্ত চাকি' নিয়ে কিছুদিন খবরের কাগজে লেখালেখি হয়, তারপর প্রমাণের অভাবে আবার সব ধামাচাপা পড়ে যায়।"

"আপনাদের বযস কি পঞ্চাশ হাজার বছরের বেশি?"

"পৃথিবীর বছর দিয়ে হিসেব করলে তা তো হবেই। তবে আমাদেব নক্ষত্রে সময়ের মাপকাঠি আলাদা।"

অমর্ত্য বলল, "এত গ্রহ-নক্ষত্র থাকতে আপনারা পৃথিবীকে নিযে পড়লেন কেন?"

"শুধু পৃথিবীকে নিয়ে নয়, যে সব গ্রহনক্ষত্রে জীব ও প্রাণী আছে, তাদের সবগুলো নিয়েই আমাদেব নক্ষত্রে গবেষণা চলছে। আমাদের মধ্যে পৃথিবী-বিশেষজ্ঞ আছেন মাত্র তিনজন।"

"তিন জন!" অমর্ত্য বলল, "আপনাদের দু'জনকে তো দেখলাম, আর একজন কে? তিনি কোথায়?

"তিনিই আমাদের মধ্যে প্রধান। তিনি আছেন পৃথিবী ও অ্যান্ড্রোমিডার মাঝামাঝি জায়গায় মহাকাশে ভাসমান এক কৃত্রিম উপগ্রহে —সেখানেই তাঁর গবেষণাগার। তোমাদের ভাষায় 'স্পেসল্যাব'ও বলতে পারো।"

"তাঁর গবেষণার বিষযটা কি, উদ্দেশ্যই বা কি?"

"গবেষণার বিষয় হল পৃথিবীর প্রাণীজগতের বিবর্তন, আর সেই বিবর্তনকে দ্রুততর করে তোলায় সাহায্য করাই হল তাঁর উদ্দেশ্য। পৃথিবীর মানুষের মস্তিষ্ক এখন কতটা উন্নত হয়েছে, আমাদের পূর্বপরিকল্পনামতো বিবর্তন এগিয়ে চলছে কিনা—তাই নিয়েই তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।"

"কিন্তু আমাদের এভাবে ধরে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য কি? তিনি আমাদের নিয়ে কী করতে চান? আর এত লোক থাকতে আমাকেই আপনারা বেছে নিলেন কেন?" অমর্ত্য প্রশ্ন করল।

দেবদূত এ কথাব কোনো উত্তর দিল না, কী যেন বলতে গিযেও চুপ করে গেল।

অমর্ত্য আবার বিদ্রূপের স্বরে বলল; "আর শমিতাকে কিজন্য নিয়ে এলেন? পৃথিবীর নারীদের সৌন্দর্য কতটা উন্নত হয়েছে দেখতে?"

দেবদূত গম্ভীর স্বরে বলল, "আগেই বলেছি, ওকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। তোমাকে একলা পেলাম না বলে বাধ্য হয়ে দু'জনকেই নিয়ে আসতে হল। তোমাদের দু'জনকে জোব করে আলাদা করতে আমরা চাই নি।" তারপর প্রসঙ্গ বদলে বলল, "যাক, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে। এসো, একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।"

দেবদূত একপাশের দেয়ালের গায বসানো একটা যন্ত্রের কাছে তাদের নিয়ে গেল। তার গায় অনেকগুলো বোতাম রয়েছে। দেবদূত বলল, "এতে অনেক বকম পানীয় আছে, এক একটা বোতাম টিপলে এক এক রকম পানীয় বেরিয়ে আসবে। তোমাদের যখন ইচ্ছে হবে খেয়ে দেখতে পারো।" অমর্ত্য আন্দাজে একটা বোতাম টিপল, অমনি যন্ত্র থেকে একটা প্লাস্টিকেব খালি গেলাস বেরিয়ে এল, তারপর একটা নল থেকে তার মধ্যে পড়ল ঘন তরমুজ রঙের একটা পানীয়। অমর্ত্য খেযে দেখল—অপূর্ব স্বাদ, অনেকটা ইটালিয়ান 'ভারমুথে'র মতন। আর এক গ্লাস পানীয নিয়ে সে শমিতাকে দিল। তারা এই পানীয়ের নাম বাখল "সোমরস"।

আর এক দিকে 'জুক বক্সে'র মতো একটা যন্ত্র রাখা ছিল, সেটা দেখিয়ে দেবদূত বলল, "আমাদের নক্ষত্রের সঙ্গীত এই যন্ত্রে শুনতে পাবে। এই বোতামগুলো টিপলেই ইচ্ছেমতো গান বা বাজনা হবে।"

শমিতা কৌতূহলবশে একটা বোতাম টিপতেই যন্ত্রসঙ্গীত শুরু হল। এই অচেনা সঙ্গীত তাদের অনভ্যস্ত কানে প্রথমে একটু অদ্ভুত শোনাল। অনেকটা যেন পৃথিবীর "ওযেস্টার্ন ক্লাসিক্যাল" ও ভারতীয মার্গ সঙ্গীতের সংমিশ্রণ। কিন্তু কিছুক্ষণ শোনার পরে তাদের দু'জনেরই বেশ ভালো লাগল। তারা একটার পর একটা বাজনা শুনে

যেতে লাগল।

একটু পরে দেবদূত বলল, "যাক, আমাদের মহাকাশযান তোমাদের খুব একটা অপছন্দ হয়নি মনে হচ্ছে। এবারে আমি চলি, কাজ আছে। তোমরা যতক্ষণ খুশি এখানে থাকতে পারো। কিংবা নিজেদের ঘরেও ফিরে যেতে পারো। তবে অন্য কোথাও যেও না। আর কোনো কিছু দরকার হলে 'ইন্টারকমে' আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।"

অমর্ত্য জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি এখন 'কন্ট্রোল রুমে' যাচ্ছেন?"

দেবদূত বলল, "না, আমি এখন ওপরতলায় যাব।"

শমিতা জিজ্ঞেস করল, "আপনার সঙ্গিনী কোথায়?"

"উনিও ওপরতলায় আছেন।"

"আমরা কি আপনার সঙ্গে একবার ওপরতলাটা দেখে আসতে পারি?" অমর্ত্য জিজ্ঞেস করল।

"না, আগেই তো বলেছি, ওপরতলায় তোমাদের দেখার কিছু নেই।" একটু রূঢ়ভাবে একথা বলে দেবদূত 'লাউঞ্জ' থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

অমর্ত্য আর শমিতা নিজেদের ঘরেই ফিরে এল। অমর্ত্য স্নান-টান সেরে ওয়ার্ডরোব থেকে নতুন শার্ট-ট্রাউজার বার করে পরল। ঠিকমতন 'ফিট্' করল না, একটু ঢলঢলে হল। ভাবল—আর উপায় কি? বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল, শমিতা 'ড্রেসিং টেবিলে'র সামনে বসে চুল বাঁধছে। অমর্ত্যকে দেখে শমিতা বলল, "আমাদের ভাগ্য এ কোথায় নিয়ে এল আমাদের? আমরা কি আর কোনোদিন পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব?"

অমর্ত্য বলল, "জানি না, শমী। কিন্তু একদিক দিয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হবে যে, আমাদের দু'জনকে আলাদা করে দেয় নি। তুমি কাছে থাকলে আমি কোথাও যেতে ভয় পাই না।"

শমিতা মনে মনে অমর্ত্যকে তারিফ করল। কলকাতায় সে অমর্ত্যকে জানত 'ব্রিলিয়ান্ট স্কলার' বলে, তারা একসঙ্গে অনেক জায়গায় অনেক মধুর সময় কাটিয়েছে। প্রেম বিনিময় করেছে, কিন্তু এখানে না এলে অমর্ত্যর চরিত্রের আর একটা দিকের কথা তার অজানা থেকে যেত। এই অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও অমর্ত্য কেমন ধীর, স্থির, অবিচলিত! এই বিপজ্জনক অবস্থাতেও তার মুখে কোনো দুর্ভাবনার ছাপ নেই। অমর্ত্যর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পেরে শমিতা নিশ্চিন্ত বোধ করল।

অমর্ত্য বলল, "শমী, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমরা যেন 'হনিমুনে' এসেছি। আমরা দু'জনে ভেসে চলেছি এক 'লাক্সারি লাইনারে'র 'লাভার্স কেবিনে'।"

শমিতা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, "সাবধান, মাত্রা ছাড়িয়ে যেও না। মনে রেখো, আমরা বিবাহিত নই।"

"আরো কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে আমরা কি অবিবাহিতই থাকব, শমী? আর শুনলে তো, বিবাহ-প্রথা তো শুধু পৃথিবীর জন্য। মহাশূন্যে ও সব 'সিস্টেম' একবারে অচল।"

"শমী, তুমি সব ব্যাপারে এত আধুনিক। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে তুমি দেখছি কিছুতেই প্রাচীন সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারছ না।" হাল ছেড়ে দিয়ে অমর্ত্য তার খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

শমিতা উঠে এসে অমর্ত্যর পাশে খাটের ওপর বসল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলল, "রাগ করলে অমর?"

"তোমার ওপর আমি কি কখনো রাগ করতে পারি?" বলে অমর্ত্য হঠাৎ শমিতাকে টেনে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল। তারপর চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভরিয়ে দিল। কপট রাগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শমিতা বলল, "এই, কী অসভ্যতা হচ্ছে? অমন করলে আমি কিন্তু দেবদূতকে বলব আমাদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে।"

"করে দেখ না। তাহলে আমি তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না।"

"বলবে না? তাহলে কার কাছে যাবে?"

"কেন, ঐ অপ্সরার কাছে। ওদের সমাজে তো অবাধ মেলামেশায় কোনো বাধা নেই।"

খিলখিল করে হেসে উঠল শমিতা। বলল, "সে তো 'সাইজে' তোমার ডবল হবে। অবশ্য তোমাকে বাচ্চার মতো কোলে তুলে নিতে পারে।"

অমর্ত্য বলল, "কেন, তুমি বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে ফরাসি কবি 'শার্ল বোদলেয়ারে'র 'দানবী' কবিতাটি পড়োনি—

'আমার সঙ্গিনী ছিল মনঃপূত দানবযুবতী,
আর আমি, রাণীর চরণতলে, বিলাসী বিড়াল।'

দু'জনেই হেসে উঠল। তারপর অমর্ত্য বলল, "আমার আবার খিদে পাচ্ছে। খাবার আনালে কেমন হয়?" 'ইন্টারকমে' খবর পাঠাতেই যন্ত্রমানব আবার 'ফুড পিল' ও পানীয় নিয়ে এল। শমিতা উঠে যন্ত্রমানবের গা-হাত-পা টিপে টুপে দেখল। কিন্তু সে ভাবলেশহীন মুখে 'ট্রে' রেখে বেরিয়ে গেল। শমিতা বলল, "জানো, 'রোবোটে'র প্রেমে পড়ে যেও না। ওরা কোন কোন বিষয়ে 'ট্রেনিং' পেয়েছে কে জানে?"

"যাও, যাও, ওরা তোমাদের চেয়ে অনেক ভালো, সব কথা শোনে, কখনো অবাধ্য হয় না।"

"আমি কি কখনো তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি?" অমর্ত্য বলল।

এইরকম খুনসুটি করেই তারা অনেকক্ষণ সময় কাটিয়ে দিল। মাঝে একবার 'লাউঞ্জে' গিয়ে টেবল্ টেনিস খেলল। তবে প্রথম প্রথম তাদের খেলতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল, বলটা যেন বড্ড ধীরগতিতে আসছিল আর বড় বেশি লাফাচ্ছিল। অমর্ত্য বুঝল, এখানকার কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর থেকে কম। তাই এমন হচ্ছে। কিছুক্ষণ খেলার পর অবশ্য তাদের অভ্যেস হয়ে গেল। শমিতা টেবল্ টেনিসে তাদের কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, তাকে হারাতে অমর্ত্যর বেশ বেগ পেতে হল। তারপর 'ড্রিংক মেশিন' থেকে একটা নতুন পানীয় নিল। অমর্ত্য হালকা গোলাপি রঙ অনির্বচনীয় স্বাদ—এর নাম রাখল 'গোলাপবালা'। শমিতাকেও এক গ্লাস দিল। তারপর 'জুক বক্সে' কিছুক্ষণ গানবাজনা শুনে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে এল। দেবদূত বা অপ্সরার সঙ্গে আর দেখা হল না। ঘরে ফিরতেই ঘুমে তাদের চোখ জড়িয়ে এল, জামাকাপড় বদলে দু'জনে নিজেদের খাটে শুয়ে পড়ল।

* * *

ঘুমের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখল অমর্ত্য। সে দেখল, তার দেহ অপারেশন টেবিলের ওপর শোয়ানো আছে, আর দেহ নিয়ে সার্জনের মতো কাটাছেঁড়া করছে দেবদূতের মতন আরেকজন দৈত্যাকার পুরুষ। তার মুণ্ডু, হাত, পা, —দেহ — সব আলাদা হয়ে পড়ে আছে টেবিলের ওপর, তবুও যেন তার প্রাণ আছে, সে সব দেখতে পাচ্ছে। অমর্ত্যর ঘুম ভেঙে গেল, সে ধড়ফড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল। স্বপ্নের কথা মনে পড়তেই প্রথমে তার সন্দেহ হল সে বেঁচে আছে কিনা। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বুঝল যে সে মরে নি। অমর্ত্যর মনে পড়ল, দেবদূতকে সে যখন জিজ্ঞেস করেছিল— তাকে নিয়ে 'স্পেসল্যাবে'র গবেষক কী করবেন, তার পরিষ্কার উত্তর দেবদূত দেয় নি, চুপ করে ছিল। মহাকাশযানের ওপরতলায় কী আছে এ প্রশ্নটাও সে এড়িয়ে গিয়েছিল। তাদের ওপরতলাটা দেখাতেও নিয়ে যায়নি। ওপরতলায় কী আছে—যা তাদের দেখাতে চায় না দেবদূত? তবে কি সব রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওপরতলায়? অমর্ত্য পাশে তাকিয়ে দেখল, শমিতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে 'স্লিপিং স্যুট' পরা অবস্থাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল 'প্যাসেজে'র মধ্যে, দু'দিকে তাকিয়ে দেখল—কেউ কোথাও নেই। তারপর পা টিপে টিপে এগুলো সেই দিকে—যেদিক থেকে তারা গতকাল প্রথমে এসেছিল। অনেক দূর যাবার পর সামনে বন্ধ দেয়াল পড়ল, তার ওপর একটা বোতাম দেখতে পেয়ে অমর্ত্য তার ওপর চাপ দিতেই মুহূর্তের মধ্যে দেয়ালের একটা অংশ সরে গেল, আর তার মধ্যে দিয়ে অমর্ত্য ঢুকে পড়ল 'লিফটে'র মধ্যে। 'লিফটে'র গায়ের বোতামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ওপরেরটাতে চাপ দিতেই 'লিফট' তীব্র গতিতে উঠতে লাগল ওপর

দিকে। কিছুদূর ওঠার পরেই হঠাৎ অমর্ত্যর মনে হল 'লিফট'টা যেন বিদ্যুৎগতিতে উল্টোদিকে ঘুরে গেল। তার পা ঘুরে গেল মাথার দিকে, অথচ নিজের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল— না, তার মাথা তো ঠিক ওপর দিকেই আছে! তার মনে পড়ল, এখানে 'ওপর দিক' হল এই গোলোকের কেন্দ্রের দিক, তাই ঐ কেন্দ্রস্থল পেরিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে তার মাথা আবার কেন্দ্রের দিকে ঘুরে গেছে। একটু পরেই 'লিফ্‌ট' নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল, সামনের দরজা খুলে গেল। অমর্ত্য বেরিয়ে এল 'লিফট' থেকে বাইরে।

এখানেও লম্বা 'প্যাসেজ'। তার দু'দিকে ঘর। কিছুদূর এগিয়ে সে দেখল, ডানদিকের একটা ঘরের দরজার ওপর লাল আলো জ্বলছে। অমর্ত্য সেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজাটা দরজাটা আপনা থেকে এক পাশে সরে গেল, অমর্ত্য ভেতরে ঢুকল। ঘরে ঢুকতেই বরফ-গলা হাওয়ার মতো একটা ঠান্ডা ঝলক তার গায়ে লাগল। ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। অমর্ত্য চারদিকে তাকিয়ে দেখল—ঘরটা বেশ বড় আর গোলাকার। চারদিকের দেয়ালের গায়ে সাদা রঙের ধাতুর তৈরি নিচু 'কাবার্ড' বা দেরাজ, যেরকম থাকে কলেজের গবেষণাগারে, বা আধুনিক রান্নাঘরে। কিন্তু ঘরটা এত ঠান্ডা কেন? ওগুলো কি তাহলে 'ডীপ ফ্রিজ' ধরনের 'কোল্ড স্টোরেজ'? অমর্ত্যর মনে পড়ল, দেবদূত বলেছিল ওপরের তলায় 'স্টোর রুম' আছে। কিন্তু কী আছে ঐ দেরাজগুলোর মধ্যে? সে কাছে এগিয়ে গেল। দেখল ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত অনেকগুলো দেরাজ, প্রতিটিতে হাতল লাগানো। সে একটা হাতলের ওপর হাত রাখল। টানতে গিয়েও ইতস্তত করল, তার মনে পড়ল আদিমানব একবার ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিল কৌতূহলের বশে। তারপর চিরকাল অনুতাপ করতে হয়েছে। আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে সে কি একই ভুল করবে দেবদূতের নিষেধ না মেনে? কিন্তু অমর্ত্যর কৌতূহল আর বাধা মানছিল না। সে মনে মনে বলল, "ড্যামিট্, মানুষ চিরকাল মানুষই থাকবে।" আর দ্বিধা না করে সে একটা দেরাজ টেনে বার করল।

দেরাজটা বেরিয়ে আসতেই একটা ঠান্ডা ধোঁয়ার ঝলক ওপরে উঠল, অমর্ত্যর মুখটা যেন অসাড় হয়ে গেল, বুঝল, 'ডীপ ফ্রিজে'র তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির অনেক নিচে। ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যেতেই অমর্ত্য চমকে উঠল, তার গলা দিয়ে একটা ভয়ার্ত চিৎকার বেরিয়ে এল, দেখল—দেরাজের মধ্যে একটা মানুষের নির্জীব দেহ। লোকটার পরনে ইউরোপীয় কায়দার স্যুট, চেহারা দেখেও ইউরোপীয় বলেই মনে হয়। উত্তেজিত হয়ে অমর্ত্য একটার পর একটা দেরাজ টান দিয়ে খুলতে লাগল। আর দেখল—প্রতিটি দেরাজের ভেতরেই একটা করে মানুষের দেহ, বেশিরভাগই পুরুষ। তবে কেউ ইউরোপীয়, কেউ আমেরিকান, কেউ আফ্রিকান, কেউ অস্ট্রেলিয়ান। তাছাড়া চীনা, জাপানি, রুশ, ইরানি—সব রকম মানুষ আছে। সকলেই নিঃসাড় নিঃস্পন্দ। অমর্ত্যর মনে হল, সে যেন কোনো 'মর্গে'র হিমঘরে ঢুকেছে। তবে তফাৎ হল এই যে, এরা কেউ মৃত নয়, এদের বুক ওঠানামা করছে, অর্থাৎ এরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। উত্তেজনার মধ্যে সে লক্ষ্য করেনি, ইতিমধ্যে তার পেছনের দরজা দিয়ে চুপিসাড়ে এসে ঢুকেছে দেবদূত। তার সঙ্গে দু'জন যন্ত্রমানব। দেবদূত আস্তে আস্তে অমর্ত্যর পিছনে এসে তার কাঁধে হাত রাখতেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন পিছন দিকে ঘুরে গেল, তারপর সজোরে এক ধাক্কা মারল দেবদূতের পেটে। সেই ধাক্কায় বিশালদেহী দেবদূতও পেছনদিকে পড়ে যেতে টাল সামলে নিল। অমনি যন্ত্রমানব দু'জন দু'দিক থেকে এসে শক্ত করে চেপে ধরল অমর্ত্যকে, তার আর নড়বার শক্তি রইল না। সে নিষ্ফল ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল, "কী মনে করেছেন আপনারা? পৃথিবীর মানুষেরা হল আপনাদের গবেষণার 'গিনিপিগ', আর তাদের সংগ্রহ করতেই আপনারা গিয়েছিলেন পৃথিবীতে৷ আপনাদের গবেষণার জন্য এতগুলো নিরীহ মানুষের দেহ নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলছেন, দয়ামায়া বলে কিছু কি আপনাদের নেই?"

দেবদূত কোনো উত্তর দিল না। পকেট থেকে সিরিঞ্জের মতন কি একটা বার করল, তারপর অমর্ত্যর হাতের ওপর চেপে ধরে কি একটা 'ইঞ্জেকশান' দিয়ে দিল। যন্ত্রমানবদের বজ্রকঠিন চাপে অমর্ত্য নড়তে পারছিল না। সে বাধা দিতে পারল না। একটু পরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। একটা শূন্য দেরাজ খুলে অমর্ত্যর জ্ঞানহীন দেহটা দেবদূত ঢুকিয়ে দিল 'ডীপ ফ্রিজে'র ভেতরে। তারপর যন্ত্রমানবদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

* * *

ঘুম থেকে উঠে শমিতা দেখল, তার পাশের খাটে অমর্ত্য নেই। ভাবল, অমর্ত্য হয়ত বাথরুমে গেছে। আবার একপাশে ঘুরে চোখ বুঁজল সে, কিন্তু ঘুম আর এল না। তার মাথায় নানান চিন্তা ঘুরতে লাগল। অমর্ত্যর সঙ্গে সে এক ঘরে রাত কাটিয়েছে। অমর্ত্য অবশ্য এ অবস্থার কোনো সুযোগ নেয়নি। তার কথা মেনে নিয়েছে। জোর করে অমর্ত্য তার অসম্মান করবে না—তা শমিতা জানে, কিন্তু এখনো অনেক রাত তাদের একসঙ্গে কাটাতে হবে এখানে। এতদিন ধরে নিজেদের সংযত করে রাখা কি তাদের দু'জনের পক্ষে সম্ভব হবে? তার নিজের সংস্কার আর সংযমের ব্যূহও কি কোনো দুর্বল মুহূর্তে ভেঙে পড়বে না? কিন্তু তার ফল কি হবে—সে ভেবে পেল না, তাদের সমস্ত ভবিষ্যৎই তো এখন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরেও যখন অমর্ত্য বাথরুম থেকে বেরুল না, তখন শমিতা বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বাথরুমের সামনে দাঁড়াতেই দরজা আপনা থেকে খুলে গেল। সে দেখল, ভেতরে কেউ নেই। তাহলে অমর্ত্য কি বাইরে কোথাও গেছে? কিন্তু তাকে একা ফেলে অমর্ত্য বেরিয়ে যাবে বলে তো মনে হয় না। তাহলে অমর্ত্যর কথা সে শোনে নি বলে সে কি তার উপর রাগ করেছে? এমন অন্যায় রাগ অবশ্য সে করতে পারে বলে মনে হয় না। তবে সে কি অপ্সরার কাছে গেছে? এই অবাস্তব চিন্তাও শমিতা মন থেকে সরিয়ে দিল। তার মনে পড়ল, দেবদূত বলেছিল, অমর্ত্যকে তারা গবেষণার জন্য পৃথিবী থেকে ধরে নিয়ে এসেছে, তবে গবেষণার জন্যই কি ওরা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেছে, তাকে নিয়ে কোনো 'এক্সপেরিমেন্ট' করছে? অমর্ত্যকে নিয়ে ওরা কি ধরনের গবেষণা করবে, তা তো দেবদূত বলে নি। তার আরো মনে পড়ল, দেবদূত আর অপ্সরা মহাকাশযানের ওপরতলায় ঘন ঘন যাতায়াত করে। কিন্তু সেখানে তাদের যেতে দিল না কেন? তবে কি ওখানেই তারা অমর্ত্যকে ধরে নিয়ে গেছে? অমর্ত্যকে কি ওরা মেরে ফেলেছে? একটা ভয়াবহ আশঙ্কার ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল শমিতার মেরুদন্ড দিয়ে। সে আর থাকতে না পেরে ইন্টারকমের সুইচ্ অন্ করে চেঁচিয়ে উঠল, "কে কোথায় আছ? অমর্ত্য কোথায়? অমর্ত্যকে আমার কাছে আসতে বলো।"

ইন্টারকমে নারীকণ্ঠে উত্তর শোনা গেল, "ভয় পেও না, আমি এখনই তোমার কাছে আসছি।"

একটু পরে ঘরে ঢুকল অপ্সরা। তাকে দেখে শমিতা দাঁড়িয়ে উঠে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে উঠল, "অমর্ত্য কোথায় গেল? সে ফিরে আসছে না কেন? তার কোনো বিপদ হয় নি তো?"

অপ্সরা মৃদু হেসে তাকে বলল, "তুমি স্থির হয়ে বোসো। অমর্ত্য ভালোই আছে, নিরাপদে আছে। তবে কিছুদিন তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।"

"কেন, কেন?" আত্মসংযম হারিয়ে শমিতা অপ্সরার দু'হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "কেন তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন? তাকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে?"

অপ্সরা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শমিতার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল, ওকে খাটের ওপর বসিয়ে নিজে তার পাশে বসল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "অমর্ত্যকে তুমি এত ভালোবাসো? ওকে ছেড়ে তুমি কয়েক দিনও থাকতে পারবে না?"

শমিতা বলে উঠল, "না, না। আমাকেও ওর কাছে নিয়ে চলুন। ওকে যদি মেরে ফেলে থাকেন, আমাকেও মেরে ফেলুন।"

"বললাম তো, অমর্ত্য ভালো আছে, তবে এখন ঘুমিয়ে আছে। আরো কয়েক দিন ঘুমিয়ে থাকবে, যতদিন না আমরা আমাদের মহাকাশের গবেষণাগারে পৌঁছাই সেখানে পৌঁছলে আমাদের মুখ্য গবেষক অমর্ত্যর ওপরে একটা ছোট্ট অস্ত্রোপচার করবেন। তারপর তোমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে।"

"তবে আগে থেকে সব কথা আমাদের খুলে বললেন না কেন? কেন চুপি চুপি ওকে ধরে নিয়ে গেলেন?"

"অমর্ত্যকে আমরা ধরে নিয়ে যাই নি। আমাদের কথা অমান্য করে ওপরতলায় গিয়ে আমাদের 'স্টোর রুমে' ঢুকে পড়ার জন্য তাকে ধরে রাখতে হয়েছে।"

"কিন্তু ওর ওপরে আপনারা কী অস্ত্রোপচার করবেন? কেন আমাদের ধরে নিয়ে এসেছেন পৃথিবী থেকে?" শমিতা অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল।

অপ্সরা মিষ্টি গলায় বলল, "তুমি একটু স্থির হয়ে শোনো। সব কথাই আমি এখন তোমায় খুলে বলব। পৃথিবীতে মানুষের বিবর্তন আগের মতো দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে না। তার ওপর মানুষেবা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে অনর্থক শক্তির অপচয় করছে। পৃথিবীর পরিবেশ ও জলহাওয়া কলুষিত করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে পৃথিবীকে দিনদিন বাসের অযোগ্য করে তুলছে। তাই আমাদের মুখ্য গবেষক চান, কয়েকজন মানুষের ওপর অস্ত্রোপচার করে তাদের মস্তিষ্ককে আরো উন্নত করে তুলতে। তাদের 'জেনেটিক কোডে' রদবদল ঘটিয়ে তাদের শরীরে 'আর্টিফিসিয়্যাল মিউটেশন' বা কৃত্রিম রূপান্তর আনতে, অর্থাৎ এক কথায় মানুষের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত কবতে। যাতে মানুষ আরো তাড়াতাড়ি নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে পৃথিবীকে আরো বাসযোগ্য করে তুলতে পাবে, আন্তর্নক্ষত্রীয় মহাশূন্যে পরিক্রমা করার মতো মহাকাশযান বানাতে পারে, পৃথিবী ছেড়ে নতুন নতুন গ্রহে উপনিবেশ তৈরি করতে পারে। তাই আমাদের মুখ্য গবেষকের নির্দেশে আমরা পৃথিবীতে গিয়েছিলাম বিভিন্ন মহাদেশ থেকে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী মানুষের নমুনা সংগ্রহ করে আনতে। পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে বিভিন্ন জাতির প্রায় শ'খানেক মানুষ আমরা সংগ্রহ করেছি। আব তাদের দেহ সংরক্ষণেব জন্য তাদের ঘুম পাড়িয়ে ঢুকিয়ে রেখেছি ওপরতলার 'স্টোর রুমে'র ডীপ ফ্রিজ গুলোতে। সবশেষে আমরা এসে ছিলাম কলকাতায় ভারতীয় উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবী মানুদের একজন প্রতিনিধি সংগ্রহ করার জন্য। অমর্ত্যকেই আমরা নির্বাচন করেছিলাম, এবং আমাদের 'টেলিপ্যাথি'র ডাক এড়াতে না পেরে সে নির্জন গঙ্গার ধারে চলে এসেছিল। কিন্তু বাদ সাধলে তুমি। আমরা ভাবতে পারি নি যে সে তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে। তোমাদের দু'জনের গভীর ভালোবাসা দেখে তোমাদের আলাদা করে দিতে আমাদের মন চাইল না। মহাকাশযানে তোমাদের নিয়ে আসার পরেও অমর্ত্যকে তোমার কাছ থেকে সবিয়ে আনি নি, যদিও এটা ছিল আমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে। ভেবেছিলাম, এভাবেই তোমাদের 'স্পেসল্যাবে' নিয়ে যাব, কিন্তু বাদ সাধল অমর্ত্য নিজে। সে আমাদের বিনা অনুমতিতে ওপরতলার 'কোল্ড স্টোরেজে' ঢুকে পড়েছিল, 'ডীপ ফ্রিজ' থেকে মানুষদের দেহগুলোকে বার করছিল, আর ভুল বুঝে উত্তেজিত হয়ে দেবদূতকে আক্রমণ করেছিল। তাই দেবদূত বাধ্য হয়ে অমর্ত্যকেও ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে 'ডীপ ফ্রিজে'র ভেতর। 'স্পেসল্যাবে' পৌছনোর আগে ওর ঘুম আর ভাঙানো যাবে না।"

"কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর ও যদি না বেঁচে ওঠে? আপনাদের মুখ্য গবেষকের ওপর নির্ভর করা যায় তো? ওঁব সব 'অপারেশন'ই কি সফল হয়েছে?"

এবার অপ্সরা না হেসে থাকতে পারল না। তারপর বড়রা যেমন শিশুদের বুঝিয়ে বলে, তেমনি কবে শমিতাকে বলল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমরা হলাম অসীম শক্তিশালী জীব, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি আমরা জয় করেছি। ডারউইনের মতবাদ থেকে তোমরা জানো যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধীর ক্রমবিবর্তনের ফলে বানর-জাতীয় প্রাণীর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে কবে বা কেমন করে প্রথম বুদ্ধি বা মেধার উন্মেষ হল, তা আজও তোমরা জানো না। বানরদেহ থেকে মনুষ্যদেহের সৃষ্টি হতে লেগেছিল লক্ষ-কোটি বছর। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে বুদ্ধির উদয় হয়েছিল যেন একদিন বিদ্যুৎচমকের মতো আকস্মিকভাবে —কেমন করে হয়েছিল, তা আজও তোমাদের বৈজ্ঞানিকদের অজানা। মানুষদের মধ্যে তুমিই আজকে প্রথম জানতে পারবে এই প্রশ্নের উত্তর। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ হাজার পার্থিব বছর আগে আমি, দেবদূত আর আমাদের মুখ্য গবেষক মহাকাশযানে প্রথম পাড়ি দিই পৃথিবীর উদ্দেশে। পৃথিবীতে পৌছে আমরা সেখানকার প্রাণীজগৎ দেখতে দেখতে বানরজাতীয় প্রাণী দেখতে পাই— যাদের সঙ্গে আমাদের চেহারার কিছুটা মিল ছিল। তাদের দেখে আমাদের মুখ্য গবেষকের মাথায় একটা পরিকল্পনা এল, তিনি ঠিক করলেন, এদের শরীরের 'জেনেটিক কোড' বা জন্মগত ধারায় 'মিউটেশন' বা কৃত্রিম রূপান্তর ঘটিয়ে এদের বিবর্তন ত্বরান্বিত করে তুলবেন, যাতে তারা হয়ে ওঠে আমাদেরই 'পকেট সংস্করণ', আমাদের মতোই বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী আর পৃথিবীর প্রাণীজগতের অবিসংবাদী প্রভু। তিনি সেবার কয়েকটি বানরজাতীয় প্রাণীর ওপরে প্রথমে অস্ত্রোপচার করলেন। তারপরেই তাদের দেহের ও মস্তিষ্কের দ্রুত বিবর্তন ঘটল। প্রথম আদিমানবেব সৃষ্টি হল। গাছে গাছে বানরজীবন যাপন ছেড়ে তারা মাটিতে এসে বাসা বাঁধল। আত্মরক্ষা ও শিকারের জন্য মুগুর ও তীর ধনুক আবিষ্কার করল, আগুন জ্বালতে শিখল, পাথরের যন্ত্রপাতি বানাল, গুহায় গুহায় ছবি আঁকা শুরু করল।

তারপর আরো অনেকবার আমরা পৃথিবীতে গিয়েছি, কিন্তু এর পর মানুষেব কৃত্রিম রূপান্তর আর একবারই মাত্র হয়েছিল— আজ থেকে মাত্র চাব-পাঁচ হাজাব বছর আগে। তখনো আমাদের 'স্পেসল্যাব' তৈরি হয় নি, আমাদের মুখ্য গবেষক পৃথিবীতে গিয়েই দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করেছিলেন মানুষের ওপর। তার পর থেকেই আদিম মানুষ রান্না করতে শিখল, নগ্নতা ঢাকবার জন্য জামাকাপড় পরতে আরম্ভ করল, প্রকাশ্য যৌন সংসর্গে তাদের লজ্জাবোধেব উদয় হল। তখন থেকে তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখল। এক কথায় সেদিন থেকে আধুনিক মানুষেব জন্ম হল।

দু'জনের শরীর ব্যাকুলভাবে দু'জনকে চাইছিল। মহাকাশের সীমাহীনতার মধ্যে তাদের প্রথম দৈহিক মিলন হল। সেই মিলনলগ্নে মহাকালও যেন স্তব্ধ হয়ে ছিল।

কিন্তু মানুষের বিবর্তনে আবার যেন ভাঁটা পড়েছে। অনেক দিন হল, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা আর কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কাব করতে পারেন নি। বহুদিন ধবে পৃথিবীতে কোনো মহাপুরুষ বা মহান নেতার আবির্ভাব হয় নি, সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতেও কোনো শক্তিশালী প্রতিভা দেখা দেয নি। মানুষ শুধু নিজেদের মধ্যে হানাহানি-কাটাকাটি করে মরছে। নিজেদের শক্তির অপব্যয় করছে। এখন তাদের তৃতীয়বার রূপান্তরের সময় এসেছে। ইতিমধ্যে আমাদের মুখ্য গবেষক মহাকাশে অতি-আধুনিক 'স্পেসল্যার' তৈরি করেছেন, যাতে তাঁর অস্ত্রোপচার আরো সূক্ষ্ম, আরও নিখুঁত হয়ে উঠতে পারে। আবার মানুষের যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটতে পারে। তুমি ভয় পেও না, আমাদেব মুখ্য গবেষক শুধু শক্তিমান নন, তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমাদের কাছে তিনি ঈশ্বরেব মতন। মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা ভেবেই তিনি অমর্ত্যকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর হাতে তোমার অমর্ত্যর কোনো বিপদ ঘটবে না।"

শমিতা বলল, "আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। মানছি, ঈশ্বরের হাতে অমর্ত্যর অস্ত্রোপচার সফল হবে, সে আরো উন্নত মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে যাবে। কিন্তু তার মস্তিষ্কের এই রূপান্তরের পর সে কি আর আমাকে চিনতে পারবে? সে কি আগের মতো আমাকে ভালোবাসবে? তার মন থেকে আমার কথা যদি মুছে যায়?"

এবারে অপ্সরা যেন একটু দ্বিধায় পড়ল। একটু ভেবে সে উত্তর দিল, "এ প্রশ্নের উত্তর আমি সত্যিই জানি না। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, অস্ত্রোপচারের আগে 'ঈশ্বরের' অর্থাৎ মুখ্য গবেষকের কাছে আমার এ প্রশ্ন তুলব, তোমার কথা তাঁকে জানাব। অনুরোধ করব— তোমার কামনা যেন অপূর্ণ না থাকে।"

একটু চুপ করে থেকে অপ্সরা আবার বলল, "তোমার মতো এমন করে ভালোবাসতে আমি খুব কম মানুষকেই দেখেছি। মানুষের হৃদয়ে প্রেম ভালোবাসা বোধের উন্মেষ আমরাই প্রথম করেছিলাম। কিন্তু তার এত সুন্দর, এত রমণীয় রূপ আমি আগে দেখি নি। আমিও নারী, আমিও দেবদূতকে ভালোবাসি, কিন্তু

তোমার মতো মন-প্রাণ দিয়ে সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে তাকে এমন করে ভালোবাসতে পেরেছি কিনা আমি জানি না। আমি তোমাকে সবরকমে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।” শমিতাকে জড়িয়ে ধরল অপ্সরা, দু'জনের চোখের উদ্গত অশ্রু আর বাধা মানল না।

* * *

এর পর মহাকাশেব দিনগুলো যেন কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। শমিতার মনে হল, সময় যেন নিশ্চল হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এর আগে অমর্ত্যর ওপরেই সব ভাবনা-চিন্তাব ভার দিয়ে সে নিশ্চিন্ত ছিল, এখন অমর্ত্যর অবর্তমানে হাজার ভয়-ভাবনা-দুশ্চিন্তা তাকে গ্রাস করল। অমর্ত্যর ওপর সে যে কতখানি নির্ভর করেছিল, অমর্ত্যকে সে যে কত ভালোবাসে, তা শমিতা এখন বুঝতে পারল। সে বুঝল, অমর্ত্যর সঙ্গ তার জীবন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে। অমর্ত্যকে না পেলে তার চলবে না। অমর্ত্যকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। শমিতাকে সঙ্গে দেবার জন্য অপ্সরা অনেকবার তার কাছে এল, গল্প করল, সান্ত্বনা দিল, লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে গান শোনাল, খেলা ধুলো করল, 'মনিটর স্ক্রিনে মহাশূন্যের গ্রহনক্ষত্রের ছবি দেখাল। শমিতাও যন্ত্রচালিতের মতন সব কিছুই করল। কিন্তু তাব মন পড়ে রইল অমর্ত্যর কাছে, অমর্ত্যর অমঙ্গলের আশঙ্কা সর্বক্ষণ যেন তার মস্তিষ্ককে কুরে কুরে খাচ্ছিল। ক্লান্তি বোধ করলে সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ত। কিন্তু চোখ বুজলেই অমর্ত্যর মুখটা তার মনের আয়নায় ভেসে উঠত, কিছুতেই ঘুম আসত না। অনেকক্ষণ পরে ঘুম এলেও আবাব দুঃস্বপ্ন দেখে শমিতা জেগে উঠত। এমনি করে দীর্ঘ বরফযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অবশেষে একদিন সে শুনল যে, মহাকাশযান তার গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে।

'লাউঞ্জে' বসে 'মনিটর স্ক্রিনে'র ওপর শমিতা দেখল, অন্ধকার মহাশূন্যের ভেতর বিশাল গোলকেব মতো উজ্জ্বল 'স্পেসল্যাব'টা যেন স্থির হয়ে ঝুলছে, আর ক্রমেই বড় হয়ে কাছে এগিয়ে আসছে। 'স্পেসল্যাব'টার চেহারাও অনেকটা মহাকাশযানের মতোই, তবে অনেকগুণ বড়। গোলকটা একেবারে কাছে আসার পর হঠাৎ 'মনিটর স্ক্রিন' অন্ধকাব হয়ে গেল, আর কিছু দেখা গেল না। তারপরেই শমিতার মনে হল, তার দেহ যেন আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যাচ্ছে, মনে হল— সে ইচ্ছে কবলেই হাওয়ার মধ্যে ভেসে উঠতে পারে। সে বুঝল, তাদের মহাকাশযান আর ঘুরছে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণও আর তৈরি হচ্ছে না। শমিতাব মাথায় ছেলেমানুষি চাপল, সে মেঝে থেকে একটা লাফ দিল। অমনি তার দেহ দ্রুতবেগে ওপরে উঠে গেল। একটু হলেই ঘরের ছাদে তার মাথা ঠুকে যেত। কোনো রকমে হাত দিয়ে সে মাথার আঘাত বাঁচাল। সে যখন এরকম শূন্যে উঠে গেছে, তখন ঘরে ঢুকল অপ্সরা। শমিতর অবস্থা দেখে হেসে অপ্সরা তাকে টেনে নিচে নামাল। তারপর বলল, “আমারই ভুল হয়েছে। আগে থেকে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি। এবার মহাকাশযান ছেড়ে আমাদের “স্পেসল্যাবে” ঢুকতে হবে। ওখানে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ নেই, প্রথম কয়েক ঘন্টা তোমাকে খুব সাবধানে ঘোরাফেরা করতে হবে, তারপরে অবশ্য তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে এসো।” এই বলে অপ্সরা শমিতাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে 'লিফটে' ঢুকল, 'লিফট' নিচের দিকে নামতে লাগল।

মহাকাশযানের সবচেয়ে নিচের তলায় নেমে লিফট থেকে গেল। তারপর শমিতা দেখল, সামনের দরজা খোলার বদলে হঠাৎ তার পায়ের তলা থেকে মেঝে সরে গেল, অপ্সরা তাকে ধরে ধরে নিচে নামাল। তারপর তারা আর একটা লিফটের ভেতর ঢুকল। অপ্সরা বলল, “আমরা মহাকাশযান ছেড়ে 'স্পেসল্যাবে'র 'এয়ারলকে' ঢুকেছি, এবার আমরা যাব 'স্পেসল্যাবে'র ভেতরে।”

শমিতা বলল, “অমর্ত্যর কী হবে? তাকে আপনারা কখন নিয়ে আসবেন?”

“অন্য মানুষদের সঙ্গে তাকে নিয়ে দেবদূত কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে, 'রোবোট'রা তাকে সাহায্য করবে। বেশি দেরি হবে না। তার আগে মুখ্য গবেষকের সঙ্গে কথা বলব, তোমাদের কথা জানাব, যাতে তিনি সবচেয়ে আগে অমর্ত্যর অপারেশন সেরে নেন।”

“অমর্ত্যকে অপারেশন কি না করলেই নয়? মুখ্য গবেষককে বলে তাকে কি অস্ত্রোপচার থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না?”

শমিতার হাতে একটু চাপ দিয়ে অপ্সরা বলল, “তোমার আশঙ্কার কথা আমার মনে আছে। আমার কথামতো আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তাব আগে আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

একটু পরে লিফ্‌ট থামল। শমিতাকে নিয়ে অপ্সরা একটা 'প্যাসেজে' বেরিয়ে এল। 'স্পেসল্যারে'র ভেতরটা মনে হল মহাকাশযানেরই একটা বড় সংস্করণ। ভারহীনতার জন্য শমিতার হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল, অপ্সরার হাত ধরে কোনো রকমে সে এগুলো। একটু পরে একটা ঘরে ঢুকে অপ্সবা বলল, “ এই ঘবে তুমি বসো। আমি তোমার জন্য কিছু খাবারেব ব্যবস্থা করি।” এই বলে অপ্সরা বেবিয়ে গেল।

ঘবের মধ্যে দুটো খাট পাতা ছিল, দু'দিকের দেয়াল ধিরে ধিরে সেইদিকে আস্তে আস্তে এগুলো শমিতা। খাটের কাছে এসেই সে অবসাদে শুয়ে পড়ল, কিন্তু খাটে শুয়েও সে স্বস্তি পেল না, একটু এদিকে-ওদিকে নড়াচড়া করতে গেলেই সে যেন খাট থেকে ওপরে ভেসে ভেসে উঠছিল, খাটের ওপর স্থির হয়ে থাকতে পারছিল না। এমন সময়ে অপ্সরা ঘরে ঢুকে তার অবস্থা দেখে হেসে বলল, “খাটের দুদিকে দ্যাখো' সেফটি বেল্টে'র মতো দুটো 'স্ট্র্যাপ' আছে। শুতে অসুবিধে হলে ঐটে দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখো, তাহলে আব এরকম হবে না। এবারে ওঠো, কিছু খেয়ে নাও।”

শমিতা দেখল, অপ্সরার এক হাতে একটা প্লাস্টিকের থলি, আব এক হাতে টুথ পেস্টে'র টিউবের মতো একটা জিনিস। দুটো থেকেই 'স্ট্র'-এর মতো সক নল ওপর দিকে উঠে গেছে। অপ্সরা বলল, “এর একটাতে আছে খাবার, আর একটাতে পানীয়, নল মুখে দিয়ে টানলেই খাবার পেটে চলে যাবে। আর যদি স্নান করতে চাও, তাহলে বাথরুমে গিয়ে 'বাথ ক্লোসেটে' ঢুকে 'সুইচ্ অন্' করে দিলেই জলের ধারা এসে তোমার গাযের চার দিকে দিয়ে স্রোতের মতো বয়ে যাবে। এখানে স্নান-খাওয়া-শোওয়া পৃথিবীর নিয়মে চলবে না।”

শমিতাব ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না। সে পানীয়েব টিউবে একবার চুমুক দিয়ে রেখে দিল, বলল, “পরে খাব। অমর্ত্যর সঙ্গে কখন দেখা হবে?”

“আমি মুখ্য গবেষকের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। তুমি এখন বিশ্রাম নাও।” এই বলে অপ্সরা ঘর থেকে বেবিয়ে গেল।

শমিতা আর শুল না, চেয়ারেই বসে রইল স্থানুর মতো। সে আর কিছু ভাবতেও পারছিল না, তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। এমনি করে যে কত ক্ষণ কাটল, তার খেয়ালই ছিল না। সে অধীব আগ্রহে অপেক্ষা করছিল অপ্সরার ফিরে আসার জন্য। অনেকক্ষণ পরে অপ্সরা যখন আবার ঘরে এল শমিতা তাকে জিজ্ঞেস করল, “কী হল, মুখ্য গবেষক কী বললেন? অমর্ত্যর অপারেশন হবে না তো? সে এখন কোথায়?”

অপ্সরা বলল, “অমর্ত্য এখন 'স্পেসল্যাবে'র কেবিনে শুয়ে আছে। পৃথিবী থেকে এতদূব নিয়ে আসার পর অপারেশন না করে তাকে ফেরৎ পাঠাতে মুখ্য গবেষক রাজি হলেন না। তবে একটা উপায় আছে। এখানে সহকাবী হিসেবে তাঁর দু'জন মানুষের দরকার, যারা স্থায়ীভাবে এই 'স্পেসল্যাবে' থাকবে। গবেষণার পরে এখানে থেকে যেতে পারো। তাহলে তোমরা অমর হয়ে যাবে, তবে এখানকার নিয়মমতো তোমাদের বিয়ে হবে না, সন্তানও হবে না। আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না।”

শমিতা কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর মনস্থির করে বলল, “না, এ শর্ত মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি পৃথিবীর মানুষ। আমি স্বামী চাই, সন্তান চাই, ভালোবাসা চাই, পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে ঘর বাঁধতে চাই। আমরা দেবত্ব চাই না, অমরত্বও চাই না, পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখ-শান্তি কামনা-বাসনার মধ্যে আমি ক্ষণস্থায়ী মানুষের জীবনে ফিরে যেতে চাই। আপনারা আমাদের পৃথিবীতে ফিবিয়ে দিন।”

অপ্সরা বলল, “তাহলে তো অমর্ত্যর ওপর অস্ত্রোপচার করা ছাড়া উপায় নেই। তবে মুখ্যগবেষককে আমি বলতে পারি —যাতে সকলের আগে তিনি অমর্ত্যর ওপর অপারেশন সেরে নেন। তিনি অভয় দিয়েছেন, অমর্ত্যর কেনো বিপদের আশঙ্কা নেই। তবে সেরে ওঠার পর সে তোমাকে চিনতে পাববে কিনা এ বিষয়ে আগে থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। সেটা নির্ভব করছে অমর্ত্য তোমাকে কত গভীরভাবে ভালোবাসে, তার ওপর। ভালোবাসা যত গভীর হয়,

মস্তিষ্কের ওপর তার দাগও তত বেশি গভীর হয। তবে তার ভালোবাসা যদি আন্তরিক না হয়, তাহলে অস্ত্রোপচারের পর সে দাগ মুছে যাওয়াও বিচিত্র নয়, সেক্ষেত্রে অমর্ত্য তোমাকে হয়ত আর চিনতেই পারবে না।"

শমিতা বলল, "তাই যদি হয়, তাহলে আমরা বিশ্বাস, অমর্ত্য আমাকে চিনতে পারবে, আবার আগের মতোই ভালোবাসবে।"

অপ্সরা বলল, "আচ্ছা, আমি তাহলে এখন মুখ্যগবেষকের কাছে যাচ্ছি, তাঁকে সব কথা জানাব।"

শমিতা বলল, "আমাকেও নিয়ে চলুন, আমি নিজে তাঁকে সব কথা বলব।"

"এখন নয়। সময় হলেই তোমাকে ডেকে পাঠাব।" এই বলে অপ্সরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

আবার সেই শবরীর প্রতীক্ষা। অবিরাম উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা শমিতা যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় অস্থির হযে পড়ল সে। তার সিদ্ধান্ত কি সঠিক হয়েছে? অমর্ত্যকে অস্ত্রোপচার করতে না দিয়ে এখানে মুখ্য গবেষকের সহকারী হয়ে থাকতে দিলেই হয়ত ভালো হত। কিন্তু সীমাহীন মহাকাশের মধ্যে এই সুদূর দ্বীপে নির্বাসিত মৃত্যুহীন জীবনের চেয়ে চিরপরিচিত পৃথিবীতে স্নেহ -ভালোবাসায় ভরা শান্তির সংসার অনিত্য হলেও তার কাছে অনেক বেশি কাম্য। শমিতা ভেবে ভেবে নিশ্চিত হল—তার সিদ্ধান্ত ভুল হয়নি। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর অমর্ত্য যদি তাকে আর চিনতে না পারে। তখন তো সে এ-কূল ও-কূল দু'কূলই হারাবে। এই সব নানান চিন্তায় শমিতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ঘুম সব ছুটে গেল। এমনি ভাবে কতক্ষণ যে কাটল তা সে নিজেই বুঝতে পারল না। মনে হল পৃথিবীর হিসেবে বোধ হয় তিন-চার দিন কেটে গেল। কিন্তু এই তিন-চার দিনই তার কাছে তিন-চার যুগ মনে হল।

অবশেষে একদিন অবসান হল শমিতার প্রতীক্ষার। অপ্সরা তার ঘরে এসে তাকে জানাল যে, অমর্ত্যর ওপর অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। তাকে একটা কেবিনে শুইয়ে রাখা হযেছে। এখনো তার জ্ঞান ফিরে আসেনি। শমিতা ইচ্ছে করলে এখন গিয়ে অমর্ত্যকে দেখে আসতে পারে।

শমিতা তখনই উঠে অপ্সরার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে তার মাথা ঠুকে গেল। সে ভুলে গিয়েছিল যে এখানে মাধ্যাকর্ষণ নেই। অপ্সবা তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে লিফ্‌টে ওঠাল। আচ্ছন্নের মতো যাচ্ছিল শমিতা, চারদিকের পরিপার্শ্ব কিছুই সে দেখছিল না। অপ্সরা তাকে নিয়ে শেষকালে একটা কেবিনে ঢুকল। শমিতা দেখল, সেখানে কোনো খাট নেই, অমর্ত্যর দেহ যেন বাতাসের ওপর শুয়ে আছে। তার মাথায় পুরু ব্যান্ডেজ, তার চোখ বোঁজা। পেছনে সাদা 'এপ্রন' পরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বিশালকায় গৌরকান্তি পুরুষ, তাঁর সৌম্য মুখে সোনালি গোঁফ-দাড়ি। অনেকটা যীশুখ্রীষ্টের মতো চেহারা উনিই কি তাহলে মুখ্য গবেষক? ঈশ্বরের মতো মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। শমিতা মনে মনে তাঁর নাম রাখল 'ঈশ্বর', সে তাঁকে প্রণাম করল।

ঈশ্বর হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, "তোমার কথা আমি সবই শুনেছি শমিতা। তোমার কোনো ভয় নেই, তার জ্ঞান এখনই ফিরে আসবে। অমর্ত্যর সঙ্গে পৃথিবীতে ঘর বাঁধার জন্য তুমি অমরত্বকেও প্রত্যাখ্যান করেছ, তোমার ভালোবাসার তুলনা নেই। তবে অমর্ত্যর ভালোবাসার পরীক্ষা এখনো হয নি। সে তোমাকে আগের মতো ভালবাসবে কিনা, সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোনো আগাম প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। যদিও তার মস্তিষ্কের ভালোবাসার দাগ অক্ষত রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।"

এতদিন বাদে অমর্ত্যকে দেখে শমিতা এত আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল যে, ঈশ্বরের কথার উত্তরে কিছু বলবার মতো শক্তি তার ছিল না। সে শুধু একদৃষ্টিতেঅমর্ত্যর দিকে তাকিয়ে ছিল, প্রতীক্ষা করছিল— অমর্ত্য কখন চোখ খুলবে। ঈশ্বর তাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, অপ্সরাকে বলে গেলেন— অমর্ত্যর জ্ঞান ফিরলে যেন তাঁকে খবব দেওয়া হয়। শমিতা অপ্সরাকে জিজ্ঞেস করল, "অমর্ত্য কেমন করে হাওয়ার ওপর শুয়ে আছে? যদি হঠাৎ পড়ে গিয়ে ওর মাথায় আঘাত লাগে?"

অপ্সরা বলল, "অমত্য শুয়ে আছে ঘনীভূত হাওয়ার বিছানায়, সাধারণ বিছানার চেয়ে এটা অনেক বেশি নিরাপদ। এখানে মাধ্যকার্ষণ না থাকার জন্যই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া এই কৃত্রিম হাওয়া বীজাণুমুক্ত, এখানে যে কোনো ক্ষত পৃথিবীর থেকে অনেক তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তাছাড়া এখানকার ভারশূন্যতার জন্য মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনে হৃদ্‌যন্ত্রের ওপরে কোনো চাপ পড়ে না, তাই হৃদ্‌যন্ত্র এখানে আরো ভালোভাবে সচল থাকে।"

অপ্সরার কথা শুনছিল শমিতা, কিন্তু তার চোখ পড়েছিল অমর্ত্যর ওপর। হঠাৎ অমর্ত্যর শরীরটা একটু নড়ে উঠল, শমিতা তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আরো কিছুক্ষণ পরে অমর্ত্যর চোখ দুটো যেন ভাবলেশহীন, অনেক দূরে 'ফোকাস' করা। তাতে পরিচিতির কোনো সাড়াই ফুটে উঠল না। শমিতার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। তাহলে অমর্ত্য কি তাকে চিনতে পারে নি? সে অমর্ত্যর কানে কানে বলল, "অমর, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার শমী।"

অমর্ত্যর চোখে একটু একটু করে ফুটে উঠল পরিচিতির আলো, তার মুখের যেন হাসির আভাস দেখা দিল, সে অস্ফুটে বলল, "শমী, আমরা কোথায়? তুমি আমার কাছে আছ তো?"

"হ্যাঁ, অমর, আমি তোমার কাছে আছি, চিরদিন থাকব।" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল শমিতা।

অমর্ত্যর মুখে শান্তির ছায়া নেমে এল। সে আবার চোখ বুঁজল। শমিতা অপ্সরার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "অমর আমাকে চিনতে পেরেছে, অমর আমাকে চিনতে পেরেছে!" তার দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা।

"আর কোনো ভয় নেই।" বলে অপ্সরা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তাদের পেছনে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখলেন আরেকজন। তিনি ঈশ্বর।

* * *

'স্পেসল্যাব' থেকে মহাকাশযানে পৃথিবীতে ফেরার সময়ে অমর্ত্যর একটা নতুন কাজ হল দেবদূতের শিক্ষানবিশী করা। সে সারাদিন দেবদূতের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে উন্নত ধরণের মহাকাশযান নির্মাণ করা ও চালনা করার সবরকম খুঁটিনাটি শিখে নিল। পৃথিবী থেকে 'স্পেসল্যাবে'র দিকে যাবার সময়ে অনেক কিছুই তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছিল। এখন অপারেশনের পর তার উন্নততর মস্তিষ্ক দিয়ে সে সব কিছু সহজে বুঝতে পারছিল। এ বিষয়ে দেবদূত তাকে সবরকমভাবে সাহায্য করল। অমর্ত্য স্থির করল। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে সে সরকারি সহায়তায় এরকম একটি মহাকাশযান তৈরি করবে। যাতে পৃথিবীর মানুষ সুদূর মহাশূন্যের নক্ষত্রলোকেও অবাধে যাতায়াত করতে পারে।

সাবাদিন শিক্ষানবিশীর শেষে অমর্ত্য ফিরে আসত তার ঘরে— শমিতাব কাছে। তারপর মহাকাশের বুকে শুরু হত তাদরে মিলনমেলা। পৃথিবী থেকে মহাকাশের দিকে যাত্রার সময়ে অনিশ্চিত অবিষ্যতের আশঙ্কায় তাদের মন ছিল অশান্ত। এখন তাদের সামনে পৃথিবীর উষ্ণ কোমল নীড় আর মুখের সংসার। 'স্পেসসল্যাবে'র কেবিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর প্রথম যেদিন সে কেবিন থেকে ছাড়া পেয়ে শমিতার ঘরে চলে এল, সেদিন শমিতা তাকে বলেছিল, "আমার কিন্তু খুব ভয় ছিল, তোমার জ্ঞান ফিরে এলে তুমি আমাকে হয়ত চিনতে পারবে না।"

অমর্ত্য বলেছিল, "আমার ভালোবাসায় তুমি বিশ্বাস হারিয়েছিলে, এ কিন্তু তোমার অন্যায় শমী। তুমি কী করে ভাবলে যে আমি তোমাকে ভুলে যাব? আমার কাছে তোমার চেয়ে আপন তো আর কেউ নেই।"

"তোমাকে হারাবার ভয়ে আমি তোমার ওপরও বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, তুমি আমায় ক্ষমা করো।" বলে শমিতা অমর্ত্যর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজেছিল, আর অমর্ত্য তার মাথায়-পিঠে-চুলে হাত বুলিযে দিয়েছিল গভীর ভালোবাসায়।

আর একটা দিনের কথা অমর্ত্য আর শমিতা এখনো ভুলতে পারে নি। 'স্পেসল্যাবে' কয়েকদিন কাটাবার পর তাদের পৃথিবীতে রওনা হবার দিন যখন ঘনিযে আসছিল, সেই সময়ে নিজের খাটে শুয়ে একদিন বিশ্রাম নিচ্ছিল অমর্ত্য।

শমিতা তখন পাশের 'ড্রেসিং রুমে' গিয়েছিল জামাকাপড় বদলাতে। একটু পরে শমিতা বেরিয়ে এল হ্রস্ব রাত্রিবাস পরে—যা সে 'সপেসল্যাবে'র ওয়ার্ডরোব থেকে পেয়েছিল। স্বচ্ছ নীল 'নাইটি'র আড়াল থেকে শমিতার যুবতী শরীরের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, অমর্ত্যকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। শমিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাশূন্যের ভারহীনতা যেন তার শরীরকে নিয়ে খেলা করছিল। সে যখন হাঁটছিল। তখন তার বন্ধনীহীন বক্ষযুগল চলার ছন্দে ছন্দে ধীরগতিতে ওঠানামা করছিল. এমন দৃশ্য পৃথিবীর বুকে দেখা সম্ভব ছিল না। অমর্ত্যর দেহের উষ্ণ রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল, এই দৃশ্য দেখে নিজেকে সংবরণ করা যে কোনো পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। শমিতা যখন নিজের খাটে শুয়ে 'স্ট্র্যাপ' দিয়ে নিজেকে বিছানার সঙ্গে বাঁধতে গেল। তখন অমর্ত্য উঠে এসে শমিতার পাশে শুল। শমিতাকে জড়িয়ে ধরে সে বলেছিল, "তোমাকে ভালোবেসে আমার মন ভরেছে শমী। কিন্তু আমি তোমাকে আরো কাছে পেতে চাই। আমার শরীর মন সব কিছু দিয়ে তোমাকে ভালোবাসতে চাই, নইলে কেমন করে বুঝব যে তুমি আমার—শুধুই আমার?"

শমিতা বলেছিল, "লক্ষ্মীটি দুষ্টুমি কোরো না। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না, আমি তো তোমারই থাকব। আগে পৃথিবীতে ফিরে যাই। আমাদের বিয়ে হোক। তারপর তোমার সব কথা শুনব।"

অমর্ত্য বলেছিল, "আমরা যখন পৃথিবীতে ফিরে যাব, তখন আমাদের পরিচিত পৃথিবীর বয়স আরো পঁচিশ-ত্রিশ বছর বেড়ে গেছে। তখন আমাদের হয়ত কেউ চিনতেই পারবে না। আমাদের পুরনো পরিচয় দিলে কেউ হয়ত বিশ্বাস করবে না। আমরা স্বামী—স্ত্রী পরিচয় নিয়েই পৃথিবীতে ফিরব। তাছাড়া ঈশ্বরের সামনে আমাদের ভালোবাসার পরীক্ষা হয়ে গেছে, সেই ছিল আমাদের সত্যিকারের বিয়ে, আমাদের বিয়ের পুরোহিত ছিলেন ঈশ্বর। এর পরেও পৃথিবীর কোনো মূর্খ পুরোহিতের সামনে কয়েকটা মন্ত্র উচ্চারণ না করলে কি আমাদের মিলন অসিদ্ধ থেকে যাবে?"

এর পরে শমিতা আর বাধা দিতে পারে নি। দু'জনের শরীর ব্যাকুলভাবে দু'জনকে চাইছিল। মহাকাশের সীমাহীনতার মধ্যে তাদের প্রথম দৈহিক মিলন হল। সেই মিলনলগ্নে মহাকালও যেন স্তব্ধ হয়ে ছিল। আর সেই ফাঁকে পৃথিবীতে কেটে গেল ঋতুর পর ঋতু।

* * *

অবশেষে মহাকাশযান এসে পৌঁছল পৃথিবীর আকাশে। 'মনিটর স্ক্রিনে'র ওপর পরিচিত পৃথিবীর ছবিটা ক্রমেই বড় হতে লাগল, তাই দেখে অমর্ত্য আর শমিতা এক অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করল। তারা বুঝল, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ, পৃথিবীতে না ফেরা পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই। ভুলে যাওয়া অনেক কথা আবার তাদের মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল। অমর্ত্য ভাবল, তারা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই কুড়ি-পঁচিশ বছর কেটে গেছে, তার বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন সকলেই নিশ্চয় এখন বার্ধক্যের পথে পা বাড়িয়েছে, তার এই তরুণ চেহারা দেখলে কেউ কি আর তাকে চিনতে পারবে? সে ডক্টরেটের থীসিস্ দিয়ে চলে গিয়েছিল, সে কি ডিগ্রী পেয়েছে? পৃথিবীর বুকে এখন কত পরিবর্তন এসেছে কে জানে। নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে এখন তাকে নেমে পড়তে হবে।

শমিতার মনে পড়ল তার মা-বাবার কথা, এতদিন পরে তাঁরা কি আর বেঁচে আছেন? শমিতাকে রহস্যজনকভাবে হারিয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট পেয়েছেন। তার ছোট ভাই এতদিনে নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে, তাকে সেই আগের মতো যুবতী হয়ে ফিরে আসতে দেখলে খুব অবাক হয়ে যাবে। কলকাতায় এখন ফ্যাশনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, তার পোশাক দেখলে সবাই হয়ত তাকে 'ব্যাক-ডেটেড' বলে ভাববে। পৃথিবীতে নামবার আগে শমিতা 'স্কার্ট' ছেড়ে আবার শাড়ি পরে নিয়েছিল, যে শাড়ি পরে সে পৃথিবী থেকে মহাকাশযানে উঠেছিল।

দেবদূত এসে তাদের বলে গেল, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই মহাকাশযান কলকাতার মাটিতে নামবে। তোমাদের সেখানে নামিয়ে দিয়ে তারপর আমরা অন্যান্য দেশে যাব বাকি মানুষদের নামাতে, তাদের অবশ্য অজ্ঞান অবস্থাতেই নামিয়ে দেব, পৃথিবীর গরম হাওয়ায় তারা কয়েক মিনিটের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তোমরা তৈরি হয়ে নাও।"

কিছুক্ষণ পরেই 'মনিটর স্ক্রিনে' দেখা গেল, তারা পৃথিবীর মাটির খুব কাছে নেমে এসেছে, পৃথিবীর এই অংশে এখন রাত্রির অন্ধকার। ভারতবর্ষের মানচিত্রটা বড় হতে হতে 'মনিটর স্ক্রিন' ছাপিয়ে গেল। একটু পরেই দেখা গেল, বঙ্গোপাসাগরের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপগুলি। আরো কাছে নেমে আসার পর অমর্ত্যরা দেখতে পেল চাঁদের আলোয় রূপোলি সুতোর মতো ঝকঝক করছে কলকাতার গঙ্গা, আর তার ওপর চিরপরিচিত হাওড়া ব্রিজ। কিন্তু ওকি, গঙ্গার ওপর আরো দুটো ব্রিজ দেখা যাচ্ছে না? গঙ্গার ওপর তৃতীয় সেতু তাহলে তৈরি হয়ে গেছে। কলকাতার আকাশ রেখা অনেক বদলে গেছে, চারিদিকে উঠেছে অগুনতি আকাশচুম্বী অট্টালিকা, বিভিন্ন জায়গায় চার-পাঁচটা 'ফ্লাইওভার' সাপের মতো এঁকেবেকে এদিক-ওদিকে চলে গেছে। একটু পরে 'মনিটর স্ক্রিন' অন্ধকার হয়ে গেল। অমর্ত্যরা বুঝল, তাদের মহাকাশযান কলকাতার বুকে 'ল্যান্ড' করেছে।

দেবদূত আর অপ্সরার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসাটা সহজ হল না, এতদিনএকসঙ্গে থাকার ফলে তাদের মধ্যে জন্মেছিল এক আত্মীয়তা বোধ; ওদের ছেড়ে যেতে অমর্ত্য আর শমিতা যেন প্রিয়জনবিরহের বেদনা পেল। অপ্সরাকে জড়িয়ে ধরে শমিতা কেঁদে ফেলল। বলল, "আপনার কাছে আমার ঋণ অশেষ। জানি না কোনোদিন আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা। আবার যখন আপনারা আসবেন, তখন হয়ত আমরা ইহলোকের পরপারে। ফিরে গিয়ে ঈশ্বরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন।"

অমর্ত্য দেবদূতকে বলল, "পৃথিবীতে আমি যদি আপনাদের মতো মহাকাশযান বানাতে পারি, তাহলে 'অ্যান্ড্রোমিডা নেবুলা'য় গিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা করতে চেষ্টা করব।"

মহাকাশযান থেকে সিঁড়ি দিয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল অমর্ত্য, ভাবল, আর, কতদিন পরে আবার পৃথিবীর বাতাসের মিষ্টি স্বাদ পেলাম। গঙ্গার ধারে 'ম্যান অফ্ ওয়ার জেটি'র কাছে ঠিক একই জায়গায় নেমেছে মহাকাশযান, কিন্তু এতদিন পরে রাস্তাঘাটের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ওরা নির্জন রাস্তা পার হয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে গেল। দেখল—কলকাতা বন্দর এখন অনেক বড় হয়েছে, বড় বড় বিদেশি জাহাজ এসে বন্দরে ভিড় করে আছে। পেছনে তাকিয়ে দেখল—মহাকাশযান ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে তার সোনালি গা। যতক্ষণ সেটা দৃষ্টিসীমার ভেতরে ছিল, ততক্ষণ তারা সেদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় রাস্তার পাশে দেখল, একটা সিঁড়ি মাটির নিচে নেমে গেছে। ওপরের বড় বড় করে লেখা 'মেট্রোস্টেশন'। অমর্ত্য বুঝল, 'পাতাল রেলে'র একটি শাখা এখন গঙ্গার ধার পর্যন্ত চলে এসেছে। শমিতাকে বলল, "ভোর হলেই পাতাল-রেল চালু হবে। তখন আমরা বাড়ি ফিরব। ততক্ষণ এসো আমরা গঙ্গার ধারে বসি।"

গঙ্গার ধারে একটা বেঞ্চির ওপর বসে শমিতা বলল, "মনে আছে, আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে আমরা এমনি এক পূর্ণিমার রাতে এখানে এসেছিলাম?"

অমর্ত্য বলল, "মনে আছে, তুমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলে—কুড়ি বছর বাদে আমি তোমাকে তেমনি করে ভালোবাসতে পারব কিনা। আমি বলেছিলাম, ভালোবাসার বয়স নেই।"

শমিতা জিজ্ঞেস করল, "সে কথা কি এখনো সত্যি বলে মনে হয়?"

অমর্ত্য উত্তর দিল না, তার মুখ নেমে এল শমিতার মুখে।

ওদিকে পৃথিবী ছুটে চলেছিল অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। বন্ধ্যা অতীত থেকে এক নতুন আলোকোজ্জ্বল উষার দিকে।

** একটি বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে।*

তৃতীয় চক্ষু

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

মানুষের চোখ কিন্তু দুটো নয়। মানুষের চোখ তিনটে। আর এই তৃতীয় চক্ষু নয় কোনো আন্দাজি ব্যাপ্যার।

যেমন ধরো, স্বপ্ন। দেখি তো আমরা। দেখি না? কোন চোখ দিয়ে স্বপ্ন দেখা যায়? নিশ্চয়ই তৃতীয় চক্ষু। কারণ তখন তো অন্য চোখ দুটি বোজা।

তাহলে এ থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসছে যে, দুটি চোখ আগে বোজাও—এবং ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে পড়ে বিদায় দাও দু'চোখে যা দেখছ তার সবটুকু। কারণ দু'চোখ ঘুমিয়ে পড়লে তবেই জেগে উঠবে তৃতীয় চোখ। তখন তুমি সেই জিনিস দেখবে, যা দু'চোখে কোনোদিন দেখো নি।

তৃতীয় চোখ যখন দেখতে শুরু করে, তখন কী সেই দেখা—যা দু'চোখে দেখা যায় নি, বোঝা যায় নি?

একজন সন্ন্যাসী এসে পড়েছে রাজদরবারে। দরবার চলছে। সিংহাসনে রাজা। তাঁকে ঘিরে পাত্র-মিত্র, মন্ত্রী-সেনাপতি, সভায় হাজির দেশের মান্যগণ্যরা। গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে আলোচনা ও আদেশদান করে রাজা উঠলেন। সভাও খালি হয়ে গেল।

চলে যেতে যেতে রাজা হঠাৎ দেখলেন, এক সন্ন্যাসী কম্বল পাতছে সভার একধারে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজা বললেন, কী ব্যাপার, আপনি বিছানা পাতছেন যে?

সন্ন্যাসী : রাতটা এখানেই কাটাব স্থির করেছি মহারাজ।
রাজা : কিন্তু এটা কি সরাইখানা? এ তো রাজদরবার।
সন্ন্যাসী মহারাজ?
রাজা : হ্যাঁ, বলুন।
সন্ন্যাসী . নির্ভয়ে বলি?
রাজা . আরে বলুন-বলুন! আমার সময় নেই।
সন্ন্যাসী : মহারাজ, আপনার আগে এ রাজ্যে কে রাজা ছিলেন?
রাজা : কেন, আমার পিতা?
সন্ন্যাসী : তার আগে?
রাজা : আমার পিতামহ।
সন্ন্যাসী · তার আগে?
রাজা : আমার প্রপিতামহ।
সন্ন্যাসী : তার আগে কে রাজা ছিলেন মহারাজ?
রাজা : আমার প্রবৃদ্ধপিতামহ। আঃ, আপনি কী বলতে চান?
সন্ন্যাসী : বিরক্ত হবেন না মহারাজ। এবার শুধু বলুন, আপনার পরে কে রাজা হবেন?
রাজা : কেন আমার পুত্র।
সন্ন্যাসী : তারপরে?
রাজা : আমার পৌত্র। তার পরে আমার প্রপৌত্র। তারপরে....
সন্ন্যাসী : হয়েছে, হয়েছে।
রাজা : এবার খোলসা করে বলুন দিকি আপনার মতলবখানা কী? কী বলতে চান আপনি?

সন্ন্যাসী তখন হেসে বলল, মহারাজ যে সভাকক্ষে অতীতে এতগুলো লোক যাতায়াত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে—তাকে সরাইখানা ভেবে আমি কি খুব ভুল করেছি?

শুধু দুটি, চোখে এ জিনিস চোখে পড়ে না। রাজসভা সরাইখানা হয়ে দেখা দেয় শুধু তৃতীয় চক্ষুর সামনে।

এই জন্যে রূপসী বাংলার কবি বলে গেছেন, 'যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।'

ঠিক দু'চোখ দিয়ে নয়, সমস্ত সুন্দরকে দেখতেই এই তৃতীয় চক্ষু লাগে। এবং দেখতে হয় ব্রেল পদ্ধতিতে, চোখ বুজে। শুধু সুন্দর নয়, সুন্দরীকে দেখার পদ্ধতিও এই একটাই।

সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ
বিমলানন্দ শাসমলের ভারতের রাজনীতি ও মুসলমান ৪০
বুদ্ধদেব রায়ের বাংলা ও উর্দ্দু গজলের স্বরলিপি ৩৫
বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বত্রিশ সিংহাসন ৪০
আলালের ঘরের দুলাল ২০ সত্যজয়ী সত্যজিৎ ৩০
অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ২০ রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা ৫০
নজরুল সঙ্গীত কোষ ৭০

অবসরপ্রাপ্ত পরমাণু বিজ্ঞানী
সাইয়্যেদ ফিরদাউস আলী বখ্সের
সুরা ফাতেহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ৯০

বাণীপ্রকাশ □এ-১২৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট □ কল-৭

সেকালের প্যারিস একালের কলকাতা

প্রণবেন্দ্রনাথ ঘোষ

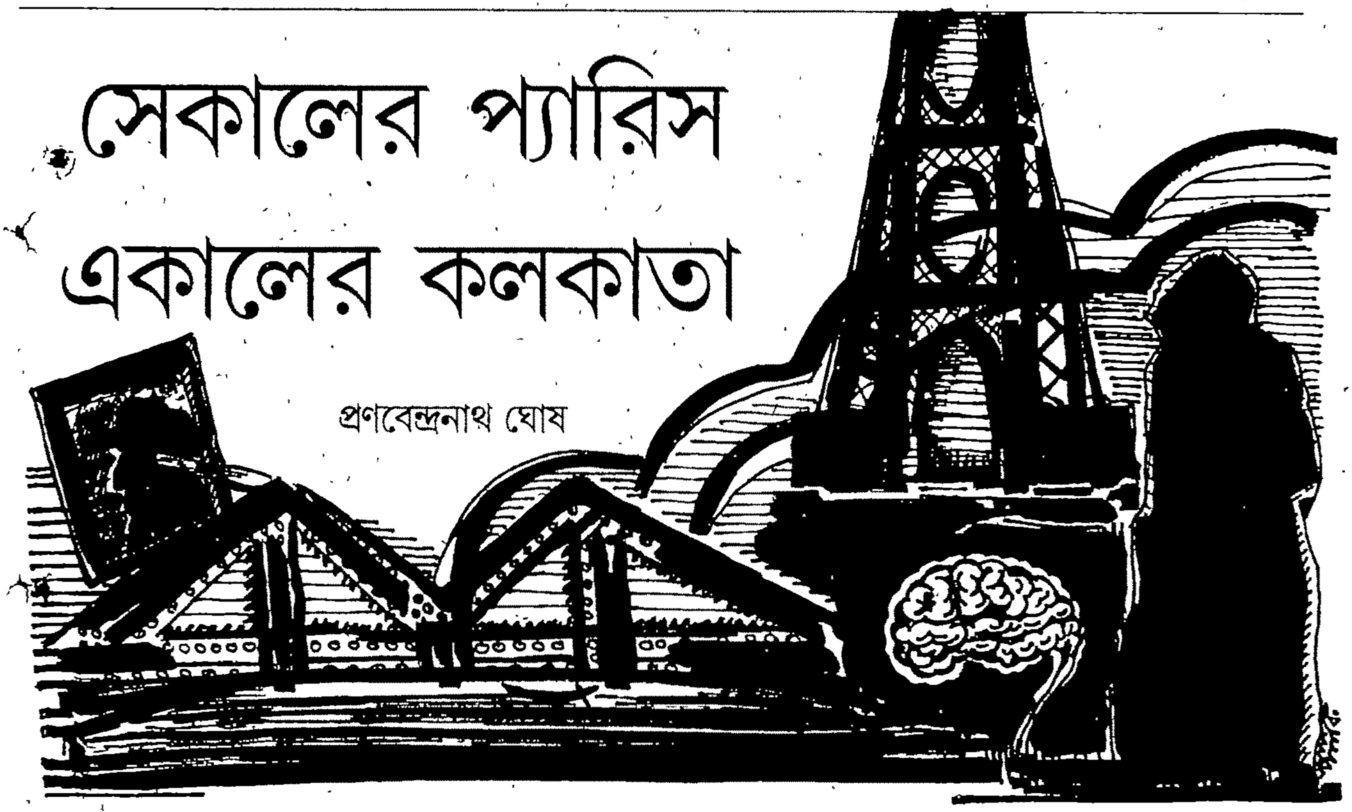

পড়ছিলাম ফরাসি ঔপন্যাসিক বালজাকের অন্যতম উপন্যাস বাবা গোরিও (Le Pere Goriot)। পড়তে পড়তে মনে হল প্রায় দুশো বছর আগের প্যারিসের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের এই একবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সমাজচিত্রের কত মিল। এমনিতেই তো লোকে বলে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতের থেকে ফরাসিদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের মিল বেশি। ভাষার কথাই ধরা যাক। ফরাসি ভাষার মতো বাংলাও সুললিত। আনুনাসিক ধ্বনির জন্য শুনতেও ভালো। স্বভাবেও দুই জাতের বেশ মিল— অর্থাৎ দুই জাতই আড্ডাবাজ। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছিল সেন নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে। সেন নদীর ওপর অনেকগুলি সেতু আছে। এই সেতুর তলায় নদীর ধারে চাতালের মতো বসার জায়গা আছে। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে সেখানে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করছে, যাকে বলে জগৎ সংসার বিস্মৃত হয়ে। সেন নদীর জলের মতো সময়ও বয়ে যাচ্ছে। তাদের সেদিকে কোনো নজর নেই। বালজাকের দৃষ্টি ছিল গভীর। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের প্যারিস শহরের সমাজের বিভিন্ন স্তরের মুখোশধারী মানুষদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে।

ঔপন্যাসিক বালজাক সম্বন্ধে কিছু বলা যাবে। কারণ তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বালজাকের জন্ম হলেও তিনি এই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি আমৃত্যু বিদ্রোহী ছিলেন। তাঁর অভিজাত পরিবারে জন্ম, একথা বোঝাবার জন্য তাঁর নামের সঙ্গে de এই শব্দটি জুড়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর পুরো নাম ছিল Honore de Balzac (১৭৯৯-১৮৫০)। বালজাকের ছিল প্রভূত অর্থ উপার্জনের অত্যুগ্র উচ্চাশা এবং সেই অর্থ যথেচ্ছ ভাবে তাঁর মায়ের অর্থ লোলুপতার প্রতি ঘৃণা থেকে।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে পড়া শেষ করে তিনি জীবন যুদ্ধে নেমে লেখকের বৃত্তিকেই বেছে নিলেন। ১৮১৩ সাল থেকেই কৃচ্ছ্র সাধনের সঙ্গে চলতে লাগল নিরন্তর লেখার কাজ। লিখলেন বহু উদ্দীপক গল্প। কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করলেন ছদ্মনামে। তড়িৎ বড়লোক হবার ধান্দায় বড় বড় ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। ব্যবসা চলল না। একরাশ দেনা নিয়ে আবার লেখনী ধারণ করলেন। উপন্যাস লিখেই পাওনাদারদের দেনা মেটাতে লাগলেন, যেমনটি করেছিলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট ও রুশ লেখক ডস্টয়েভস্কি। অনেক সময় উপন্যাসের এক লাইন না লিখেও প্রকাশকদের কাছ থেকে অগ্রিম নিতেন। তিনি স্বভাবে ছিলেন কিছুটা বেপরোয়া অদূরদর্শী ও অমিতব্যয়ী।

বালজাক ১৮২৯ সাল থেকে স্বনামে বই প্রকাশ করতে লাগলেন। ত্রয়োদশ শতকের ইতালীয় কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' র বিপরীতে লিখলেন "হিউম্যান কমেডি" র অন্তর্গত ধারাবাহিক উপন্যাস সমষ্টি। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে বালজাক বিভিন্ন অবস্থার ও চরিত্রের যে অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন সামাজিক মর্যাদা লাভ ও তাড়াতাড়ি অর্থ উপার্জন অর্থাৎ বড়লোক হবার মানসিক অবস্থার যে বিশ্লেষণ করেছেন তা থেকে শুরু হল ফরাসি রিয়ালিজমের— প্রায় এক শতটি ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এই হিউম্যান কমেডিতে প্রতিটি সামাজিক স্তর ও স্থানের বহুবিধ ক্ষেত্র বাস্তবানুগভাবে বর্ণনা করেছেন।

১৮৩৩ সালে বালজাক লিখলেন 'ইউজেনি গ্রঁদ' নামে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস, যার কেন্দ্রে আছে ইউজেনি নামে একটি কোমল স্বভাবা মেয়ে। সে তার বাবার নিষ্ঠুর কৃপণ স্বভাবের শিকার। অপাত্রে ভালোবাসা অর্পণ করে সে দুঃখী। তারপর ১৮৩৫ সালে বালজাক লিখলেন "বাবা গোরিও"। এই দুটি উপন্যাসেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই উপন্যাসে উৎসাহী পাঠক সেক্সপীয়রের "কিং লীয়রে"র ছায়াপাত দেখলেও তা ভাসা ভাসা। দু'জনের রচনাতেই উদার হৃদয় পিতা কন্যাদের দ্বারা পরিত্যক্ত। তুলনীয় ঐ পর্যন্তই। কারণ গোরিওর মধ্যে নেই লীয়রের গর্ব, ভুল বিচার, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং ধীর ও ক্রমান্বিত পুনরুজ্জীবন। লীয়র যেখানে tragic, অত্যাধিক স্নেহময়

পিতা, গোরিও সেখানে শুধুই pathetic.

এবারে আসা যাক আসল বিষয়ে। এক কথায় বলতে গেলে "বাবা গোরিও" উপন্যাসটি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের প্যারিস জীবনের একটি panorama. অর্থাৎ পূর্ণদৃশ্য। প্যারিসের একটি অখ্যাত দরিদ্র পল্লীতে মাদাম ভোক্ নামে এক কুশ্রী, নির্বোধ ও দুষ্টু স্বভাবের প্রৌঢ়া একটি মেস চালান। দরিদ্র পীড়িত সাতজন বিভিন্ন ধরনের লোক সেখানে নিয়মিত বাস করেন আর ১৮জন লোক সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে আসেন। গ্রাম থেকে একটি ছেলে সেখানে এসে বাসা বাঁধল। উদ্দেশ্য আইন পড়া। নাম তার রাস্তিনিয়াক। প্যারিসের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের আলোচনা বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। এখানে আছে মাদাম ভোকের মেসবাড়ির অতি কৃপণ, যাকে চলতি কথায় বলে ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার, অবসরপ্রাপ্ত নিঃসঙ্গ একক বাসিন্দারা, অবসরপ্রাপ্ত ক্ষয়িষ্ণু পুরাতন অভিজাতদের বিশাল সালঁ, নতুন সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে উৎসুক মানুষ, পরস্পরের পক্ষে লাভজনক বিবাহ, উচ্ছসিত প্রেম, বন্ধকী কারবারের ব্যবসায়, দাগী অপরাধী, জুয়া, মাদক দ্রব্য—এক কথায় প্যারিসের একটি উজ্জ্বল সমাজ দর্পণ হল এই উপন্যাস।।

রাস্তিনিয়াক অভিজাত পরিবারে জন্মালেও তার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। প্যারিসে এসেই বুঝতে পারল যে আইনে ডিগ্রি পেলেই সে প্যারিসের চাক্‌চিক্যময় জীবনে পৌঁছতে পারবে না যেখানে সে মনেপ্রাণে পৌঁছতে চায়। তার নামের যে অভিজাত্য সেটাকে কাজে লাগিয়ে নামকরা সালঁগুলিতে (মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত খানা-পিনা ও আলোচনা সভা) প্রবেশাধিকার পেল। মিষ্ট ব্যবহার দিয়ে কিছু মহিলার মনও জয় করল। মাদাম ভোকের বিরক্তিকর ঘৃণ্য অর্থলোলুপ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য এই ভাবে রাস্তিনিয়াক প্রাণপন চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্যারিস শহরের (আমাদের কলকাতাই বা বাদ যায় কেন) সুবেশা সুন্দরী নারীর সান্নিধ্য লাভ করতে হলে, তাদের প্রেমাস্পদ হতে হলে চাই টাকা, অঢেল টাকা। গ্রামের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা কী করছে, ছোট ছোট ভাই-বোন তার সফলতার পথ চেয়ে বসে আছে, এসব ভাবলে চল্‌বে না। রাস্তিনিয়াক ক্রমশ প্রেম-ব্যবসায়ে হাত পাকিয়ে একটি অভিজাত ফরাসি মহিলাকে ঘর থেকে বার করে আনল। কিন্তু পড়ুয়া ছেলের হাত খরচের টাকায় এত সব হবে কেন? তাই ইনিয়ে-বিনিয়ে টাকার জন্য মাকে চিঠি লিখল, যা গ্রাম থেকে কলকাতায় পড়তে আসা অনেক ছেলেই করে থাকে। চিঠির ধরণ দেখলে পাঠকের মাথা ঘুরে যাবে। দেখুন কেমন চিঠি।

"আমার মামণি, দেখ তোমার তৃতীয় স্তন আছে কিনা যা দিয়ে তুমি আবার আমাকে স্তন্যপান করাতে পারো। আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার ভাগ্য ফেরাতে চাই। 'আমার বারোশ' ফ্রাঁর প্রয়োজন, যে কোনো ভাবেই হোক আমাকে তা পেতেই হবে। বাবাকে আমার এই টাকা চাওয়ার কথা বোলো না। তিনি হয়ত এতে বাধা দেবেন। আমি যদি এ টাকা না পাই তাহলে এমন হতাশার শিকার হব যে আমার মাথা স্থির রাখা শক্ত হবে। তোমার সঙ্গে দেখা হলেই আমি টাকা চাওয়ার উদ্দেশ্যের কথা বলব, লিখতে গেলে অনেক কথা লিখতে হবে। আমি জুয়া খেলি না মামণি, আমার কোথাও ধার নেই। কিন্তু যে-জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ তুমি যদি চাও যে আমি তা ধারণ করি তাহলে এ টাকা আমাকে পেতেই হবে। আমাকে সমাজে মিশতে হবে অথচ একটা ভালো দস্তানা কেনার পয়সাও আমার নেই। আমি জানি আমাকে খেতে হবে শুকনো রুটি, পান করতে হবে জল, প্রয়োজনে উপোসও করতে হবে। কিন্তু আমার সেই যন্ত্র না হলে চলবে না যা দিয়ে এই শহরে দ্রাক্ষারস নিঙড়ে বার করা যায়। আসল কথা হল, আমাকে আমার পথ কেটে চলতে হবে অথবা কাদায় গড়াগড়ি খেতে হবে। আমি জানি তোমরা আমার ওপর কত আশা করে আছ। আমি চাই তাড়াতাড়ি তা সফল করতে। আমার মামণি, তোমার পুরানো গয়নাগাটি কিছু বিক্রি করে দাও, অবশ্য শীঘ্রই আমি তোমাকে তা ফিরিয়ে দেব। আমাদের পরিবারের অবস্থা আমি ভালোভাবেই জানি, তাই তোমার এই ত্যাগের মাহাত্ম্যও বুঝি। তুমি বিশ্বাস করো আমি বৃথাই তোমাকে এই স্বার্থত্যাগ করতে বলছি না, যদি তা বলি তাহলে, আমি একজন অমানুষ। আমার এই আবদারকে তুমি একটি তীব্র প্রয়োজনীয়তার আকুল আবেদন বলে মনে কোরো।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ভাবে তো মায়ের মন ভেজানো হল। এরপর আছে তন্বী কুমারী দুই বোন। বড় ভাইকে নিয়ে তাদের মনে নানা স্বপ্ন, নানা আশা। তাদের কাছেও কিছু চাওয়া হল। তার পর একদিন যখন সকলে মাদাম ভোকের খাবার টেবিলে হাজির তখন পোস্টম্যান দুটি প্যাকেট ও একটি মানি অর্ডার রাস্তিনিয়াককে দিয়ে গেল। এই মেস বাড়িতে রহস্যময় চরিত্রের এক বয়স্ক লোক থাকত, নাম ভোত্রঁ। রাস্তিনিয়াক যখন টাকাটা, নিয়ে টেবিলে রাখল তখন ভোত্রঁর সোৎসুক দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। ভোঁত্র সিনিকের মতো বলতে লাগল—

"বাঃ বেশ, ইয়ং ম্যান, বাড়িতে তো তোমার বাবা আছে", মা আছে, ঠাকুমা ও দুটি বোন আছে যাদের বয়স সতেরো ও আঠের, পাঁচ ও দশ বছরের দুটি ছোট ভাই আছে। এদের নিয়েই তোমাদের পরিবার। তোমার ঠাকুমা তোমার বোনদের দেখাশোনা করেন। পাড়ার পাদ্রী এসে তোমার ভায়েদের লাতিন পড়ান। সমস্ত পরিবার বেশিরভাগ সময় গমের সাদারুটি না খেয়ে বাদামের রুটি খায়। তোমার বাবা পোশাকে মিতব্যয়ী। তোমার মার গায়ে শীতে তেমন কোনো গরম পোষাক থাকে না, গরমকালটা কোনও মতে চলে আর তোমার বোনেরা যেমন-তেমন করে চালিয়ে নেয়। আমি সব জানি। তোমাদের পারিবারিক আয় যেখানে তিন হাজার ফ্রাঁ সেখানে তোমাকে পাঠানো হয় বারোশ ফ্রাঁ। বাড়িতে একজন চাকর ও একজন রাঁধুনী আছে। তোমার বাবা ব্যারণ, তাঁর সম্মান তো রাখতে হবে। এদিকে আমাদের অবস্থাটা কী? আমরা উচ্চাভিলাষী, সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গপিপাসু। আমরা পায়ে হেঁটে চলি, আমরা ভাগ্য ফেরাতে চাই, অথচ পকেটে কড়ি নেই। আমরা মাদাম ভোকের কাছে অখাদ্য খাই অথচ অভিজাত পল্লীর হোটেলে গিয়ে ডিনার খেতে চাই। আমরা মাদুরে শুয়ে হোটেলে থাকার স্বপ্ন দেখি। তোমার ইচ্ছাকে আমি দোষ দিই না। উচ্চাশা সকল মানুষের থাকে না। মেয়েদের জিজ্ঞাসা করো কী ধরনের পুরুষ তারা কামনা করে। তারা বলবে, উচ্চাভিলাষী। এদেরই কোমর শক্ত, এদেরই রক্তে আছে তেজ; অন্য মানুষের থেকে এই উচ্চাভিলাষীদের হৃদয়ে আছে উত্তাপ। মেয়েরা আনন্দ পায়, তাদের রূপ ফুটে ওঠে যখন তারা শক্তির স্বাদ পায়। তারা সেই লোককেই পছন্দ করে যার শক্তি অসীম। যদি সে-শক্তি তাকে বিপদে ফেলে তবুও। আমি তোমার ইচ্ছার একটি তালিকা করে দিলাম তোমাকে একটা প্রশ্ন করার জন্য। সেই প্রশ্নটা হচ্ছে এই আমাদের পেটে আছে নেকড়ের খিদে, দাঁতও আমাদের ধারাল, একটা ছোট পাত্রে আমাদের খাবার জিনিস রাখা যাবে কেমন করে? আমাদের খাওয়া-দাওয়ার একটা নিয়ম আছে। সবটা খুব মজার নয়, তা থেকে কিছুই জানা যায় না; তবু তার প্রয়োজন আছে। বেশ, তাই না হয় হল। আমরা উকিল হয়ে একটা সালিশীর প্রেসিডেন্ট হলাম আর গরিব বেচারিদের, যারা আমাদের থেকে ভালো, তাদের জেলে পাঠালাম যাতে বড় লোকেরা রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। এটা তেমন কিছু অদ্ভুত নয়, তবে বড় লম্বা পথ। প্রথমে দুবছর আচ্ছন্নের মতো প্যারিসে ঘুরে বেড়াতে হবে, সবই দেখবে কিন্তু তোমার প্রিয় লালি-পাপটি ছুঁতে পাবে না। শুধু প্রত্যাশাই করে যাবে অথচ তা পূর্ণ হবে না। এ বড় বিরক্তিকর অবস্থা। তুমি যদি মেরুদণ্ডহীন দুর্বল মানুষ হও তাহলে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, কিন্তু আমাদের ধমনীতে যে সিংহের উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আমরা যে দিনে কুড়ি বাইশটা অপকর্ম করতে পারি, এই অবস্থা তোমাকে কুরে কুরে খাবে। এ অবস্থা নরকের থেকেও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক। ধরলাম তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে। তুমি দুধ খাও, জপ-তপ করো। তোমার মতো একজন উদার মানুষ অনেক বিরক্তি অনেক দুঃখ ভোগের পর গ্রামের একটা সরকারি অফিসে হাজার ফ্রাঁর

একটা অস্থায়ী চাকুরি পেলে। তার পর চোরের পেছনে ছুটে বেড়াও, বড় লোকেদের হয়ে ওকালতি করো আর মান্যলোকেদের শূলে চড়াও। এ কাজ তুমি করতে বাধ্য। যদি তোমার ধরবার লোক না থাকে তাহলে ঐ গ্রামের অফিসেই পচে মরবে। যদি তোমাকে বাঁচাবার লোক থাকে তাহলে তিরিশ বছর বয়সেই তুমি এ্যাটর্নি হয়ে যাবে, হাজার মুদ্রা মাইনে পাবে, মেয়রের মেয়েকে বিয়ে করবে। আর যদি তোমার বিবেককে বিসর্জন দিয়ে রাজনীতির কোনো নোংরা কাজ করতে পার তাহলে চল্লিশ বছর বয়সেই এ্যাটর্নি জেনারেল কি মন্ত্রী হয়ে যাবে। কিন্তু হে বালক, এটাও ভেবে দেখো যে আমাদের ছোট্ট বিবেকের ওপর কালির দাগ পড়বে। তুমি এটাও লক্ষ্য কোরো যে প্যারিসে কুড়ি জনের বেশি এ্যাটর্নি জেনারেল নেই, অথচ ঐ পদের প্রার্থীর সংখ্যা কুড়ি হাজার। তাদের মধ্যে এমন নির্ব্বোধও আছে যারা ঘটি–বাটি বিক্রি করে সামাজিক মর্যাদা লাভের চেষ্টা করছে। আমাদের ব্যারণ রাস্তিনিয়াক এ্যাডভোকেট হতে চায়। তা বেশ মজার। তাহলে দশ বছর রগড়াও, মাসে হাজার ফ্রাঁ খরচ করো, লাইব্রেরি তৈরি করো, অফিস বানাও, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করো, কেস পাবার জন্য সিনিয়ার উকিলদের কোট ধরে ঝুলে পড়। আর আদালত ঝাঁট দাও। এই বৃত্তি (আইনজীবী) যদি তোমাকে সৌভাগ্যের পথ দেখাততাহলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু তুমি খুঁজে দেখ প্যারিসে এমন পাঁচজন উকিল আছে কিনা যারা পঞ্চাশ বছর বয়সে বছরে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ উপার্জন করে। কিনা বেশত তাহলে কী করণীয়? আমার মনে হয় আত্মার এই অবক্ষয়ের থেকে ডাকাতি করা ভালো। তাহলে টাকা কোথা থেকে পাওয়া যাবে? সে তো আকাশ থেকে পড়বে না। কোনো মহিলার বিবাহের যৌতুকই আমাদের একমাত্র উৎস। তুমি বিয়ে করতে চাও? তাহলে গলায় পাথর ঝোলাবে। যদি টাকার জন্য বিয়ে করো তাহলে তোমার সম্মান, তোমার আভিজাত্যের কি হবে?

"ইয়ং ম্যান, তুমি এখন জীবনের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছ। পথ বেছে নাও। তুমি তো ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছ। তোমার এক অভিজাত আত্মীয়ের বাড়িতে যাতায়াত করে তুমি বিলাসের সাধ পেয়েছ। তুমি গোরিও-র মেয়ে মাদাম রস্তোর বাড়িতে গিয়ে প্যারিসবাসিনীর সৌগন্ধ পেয়েছ। সেদিন তুমি যখন মেসে ফিরে এলে তখন আমি তোমার কপালে স্পষ্ট একটা দেখা লেখা পড়লাম, কৃতকার্য্য হও, যে কোনো মূল্যে সফল হও। বাঃ বাঃ, আমার মনে হল এই তো আমার মনের মতো লোক। তোমার টাকার দরকার, কিন্তু পাবে কোথা থেকে? তোমার বোনদের তো রক্ত ঝরিয়েছ। অবশ্য সব ভায়েরাই কম-বেশি বোনেদের ঠকায়। ....এরপর কি করবে? কাজ করবে? তোমার মতো পঞ্চাশ হাজার ইয়ং ম্যানের সমস্যাই হল তাড়াতাড়ি ভাগ্য ফেরানো। তুমি তো তাদেরই একজন। ভেবে দেখ কি কঠিন সংগ্রাম। পঞ্চাশ হাজার ভালো পোস্ট তো নেই, তাই তোমাদের অবস্থা হাঁড়ির মধ্যে রাখা মাকড়সার মতো, যারা একে অপরকে খাচ্ছে। জানো এখানে কি করে পথ করে চলতে হয়? হয় যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় দাও নয় দুষ্কর্মে দক্ষতা দেখাও। দুষ্কৃতীদের মধ্যে হয় বুলেটের বেগে ঢুকে পড়ো অথবা পাঁকাল মাছের মতো পিছলে ঢুকে পড়ো। যোগ্য লোকের অক্ষমতার কাছে লোকে মাথা নোওয়ায় কিন্তু জনসাধারণ তাদের ঘৃণা করে, তাদের গায়ে কালি ছিটায় কারণ তারা যে কোনো দুষ্কর্মে অংশ নেয় না। কিন্তু লোকে তাদের নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা জানায় যখন তাদের কাদায় গড়া-গড়ি দেওয়ানো যায় না। চারি দিকেই এখন দুষ্কর্ম, প্রতিভা এখন বিরল। মধ্য মেধাদের প্রধান অস্ত্রই হচ্ছে করাপসন, আজ যার ছড়াছড়ি। তুমি এমনও মহিলা দেখবে যার স্বামীর মোট আয় ছয় হাজার ফ্রাঁ অথচ সে প্রসাধনে খরচ করছে দশ হাজার ফ্রাঁ। সাধারণ কর্মচারী বারোশ ফ্রাঁ রোজগার করেও জমি কিনছে। বড় লোকের গাড়ি চড়ে বেড়াবার জন্য মহিলারা নিজেদের সম্মান বিক্রি করছে। সৎ লোক এখন সাধারণের শত্রু। কাকে তুমি সৎ লোক বলে মনে করো? প্যারিসে সেই হচ্ছে সৎলোক যে চুপচাপ থাকে, কোনো কিছুতেই অংশ নেয় না। (কলকাতার কথা ভাবুন, খুন হচ্ছে দেখলেও আমরা না দেখার ভান করে ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকি।) ......যদি তাড়াতাড়ি ভাগ্য ফেরাতে চাও তাহলে ধনী হতে হবে অথবা দেখাতে হবে তুমি বড়লোক। ধনী হতে হলে এখানে বড় মাপের একটা কিছু করতে হবে; তা না হলে চুরি করো, লোক ঠকাও। তুমি যদি একশটা বৃত্তির মধ্যে যে কোনো একটাকে বেছে নাও তুমি দেখবে দশ জন মাত্র তাড়াতাড়ি সফল হয়েছে, আর জনসাধারণ তাদের চোর বলছে। এই হচ্ছে জীবন। এবার তুমি তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। রান্না করলে হাত ময়লা হবে। এখানে দরকার হচ্ছে রান্না করে যত তাড়াতাড়ি পারো হাত ধুয়ে ফেল। আমাদের যুগে এই হচ্ছে ন্যায়নীতির শেষ কথা। জগৎ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে বলেই তোমাকে আমি এত কথা বললাম। তুমি কি মনে করো আমি লোকেদের দোষ দিচ্ছি? একেবারেই না। এমনটাই বরাবর হয়ে এসেছে। নীতি বাগীশরা কখনো এ অবস্থা বদলাতে পারবে না। মানুষের অনেক অসম্পূর্ণতা আছে। সে কখনো কখনো কমবেশি ভন্ড। সাধারণ লোকের সপক্ষে আমি বড়লোকদের দোষ দিচ্ছি না। মানুষ উঁচুতে যা, নিচুতেও তাই, মাঝেও তাই। তুমি যদি উচ্চস্তরের মানুষ হও তাহলে সোজা পথে চল, মাথা উঁচু করে থাক। তোমাকে লড়তে হবে অপবাদের বিরুদ্ধে, মিড়িয়ক্রিটির বিরুদ্ধে।" প্যারিস সম্বন্ধে শেষ কথা বলে মঁসিয়ে ভোত্রঁ চুপ করলেন। তিনি বললেন, "প্যারিস হচ্ছে নতুন পৃথিবীর অরণ্য বিশেষ যেখানে বহুবিধ জাতি ও সম্প্রদায় বাস করে যাদের অন্ন জোগায় বিভিন্ন ধরণের সামাজিক শিকার। আর তুমি সেই সহস্র সহস্র শিকারীদের একজন। ....ইউরোপের সমস্ত রাজধানীর উদ্ধত অভিজাতরা একজন ঘৃণ্য লক্ষপতিকে তাদের সমাজে যদি স্থান না দেয় প্যারিস কিন্তু তার দিকে দুহাত বাড়িয়ে দেবে, তার উৎসবে যোগ দেবে, ঐ ঘৃণ্য সমাজ বিরোধীর সঙ্গে খানাপিনাও করবে। ....যে কোনো অপরাধ করে প্যারিসে লুকিয়ে থাকা সব চেয়ে সহজ।"

এবারে আমাদের মরূদ্যান কলকাতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। দেখুন, প্যারিসের সঙ্গে কত মিল। বাবা-মার অচরিতার্থ অবদমিত ইচ্ছার শিকার হচ্ছে শিশুরা। স্কুল ব্যাগের ভারে তাদের পিঠ বেঁকে যাচ্ছে। খেলাধূলার সময় নেই। এক টিউটর গেলেন তো আর একজন এলেন। কিন্তু ছোট্ট ছেলেটির ছোট্ট মাথার কথা কে ভাবে? তাকে যে ইঁদুর দৌড়ে প্রথম হতে হবে, সব বিষয়েই প্রথম হতে হবে। একি বিড়ম্বনা। তাদের বাবা-মার শৈশব তো এমন ছিল না। তখন পড়ার অবসরে দুষ্টুমিরও অবসর পাওয়া যেত। এখন সকলেই গুড বয়। শিশুর বেদনার কথা বুঝে তাই অঞ্জন দত্ত গেয়েছেন "আকাশ বলছে গলা খুলে গা", এখন পশ্চিম বঙ্গে মধ্যমেধার জয়-জয়কার। সরকার এখন লেগেছে শিক্ষকমেধ যজ্ঞে। প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করতে হবে। অথচ দেখুন, যে সব সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মঞ্চে বসিয়ে জয়মাল্য ও পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেক বিষয়ে টিউটর আছে। তার ওপর আছেন আরো দু'জন অর্থাৎ বাবা-মা। এমন প্রহসন কোথাও দেখেছেন?

এরপর আছে সততার প্রশ্ন। কে সৎ? মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের মতো যে চোখ বুজিয়ে থাকতে পারবে, যে ভাবে হোক, বর্তমান সমাজের মর‍্যাল হল, যত খুশি নোংরা কাজ করো, কিন্তু তাড়াতাড়ি সম্ভব টাকা করতে হবে। বর্ত্তমান সমাজের মরাল হল যতখুশি নোংরা কাজ করো কিন্তু তাড়াতাড়ি হাতটা ধুয়ে ফেলো। আগেই তো বিবেকের গলাটিপে মারা হয়েছে। তাই ম্যাকবেথের মতো কে বলবে "সাতসমুদ্রের জলও খুনির ঐ রক্তের দাগ মুছতে পারবে না"। তবুও বাঁচতে হবে, পরিচ্ছন্ন সমাজ ও জীবনের স্বপ্ন দেখতে হবে। রোমাঁ রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফের মতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে—

> "Go on to death, you who must die!
> go and suffer, you who must suffer!
> you do not live to be happy. You live
> to fulfil my law. Suffer; die
> But be what you must be — a Man."

চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ

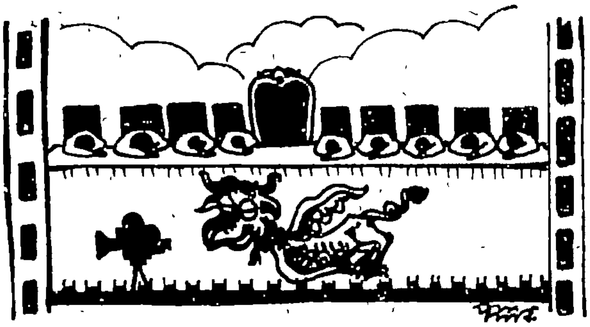

বাংলা ছবি মানেই এখন ওই "বাবা কেন চাকর", "স্বামী কেন আসামী", "কেঁচো খুঁড়তে কেউটে' জাতীয়। আর এর পিছনে নাকি সংবাদপত্রের ভূমিকাটাও কম নয়। সম্প্রতি সরগরম এর আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছিল গোর্কি সদনে, আইজেন স্টাইন সিনে ক্লাব এবং সমলয়ের ব্যবস্থাপনায়। গোর্কি সদনের আকাশে সত্যজিৎ রায়ের স্মরণে সংস্কৃতি জগতের বেশ কিছু তারকা ঘোঁট পাকিয়েছিলেন। দর্শক বাংলা ছবি দেখছে না, হলের-অবস্থা খুব খারাপ, ভালো ছবি তৈরির অর্থ আসছে না—বলে কী আক্ষেপ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের। চিত্র পরিচালক সুব্রত সেন সিধে জানিয়ে দিলেন, সত্যজিৎ -ঋত্বিকের প্রভাব থেকে না বের হতে পারলে মুক্তি নেই। একশো ভাগ সমর্থন জানালেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অথচ শুধু বাংলা ছবি নয়, বাঙালি আজ কেমন করে তার সাহিত্য আর বাঙালিয়ানা থেকেও বিচ্যুত, এই নিয়ে বড় দুঃখ সাহেবি কেতাভ্যস্ত, অধুনা সিগারেট-ত্যাগী কিন্তু চরুটমুখো নিখাদ বাঙালি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক, বাংলা ছবির কিস্যু হচ্ছে না—মিডিয়ার, পত্রিকার অপপ্রচারের জন্য। ছাব্বিশ বছরের অভিনয়েও তিনি যোগ্য সম্মান পাননি—চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী গুনে গুনে হিসাব দিলেন।

কয়েক লক্ষ দর্শক যদি ন্যূনতম একটা টাকা "স্পনসর" করেন, অনায়াসে বছরে বেশ কয়েকটা ছবি তৈরি হতে পারে। কিন্তু ঠিক কী ধরনের ছবি তৈরি হবে? ট্যাশ গরু। কারণ বাংলা সিনেমার প্রযোজক, পরিচালকরা নকল করতে মশগুল হিন্দি আর ইংরেজি সিনেমাকে। আমরা কোনোদিন আর ফিরে পাব না উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেনের মতন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে। কিন্তু আমরা প্রতিবছরই একটা নতুন ঋত্বিক রোশনকে পাব। তার পেছনেই সকলে ছোটে। এখন চাই বক্স অফিস হিট্। গ্রাম বাংলার মানুষ বিনোদন খোঁজে যাত্রাপালায়। দুই বাংলার ক্ষেত্রেই তা সত্য। যাত্রার চড়া সুরের মেলোড্রামার সঙ্গে যদি থাকে জোরালো একটা গল্প, মেঠো সুরের গান, তবে বক্স অফিসে সাফল্য আটকায় কার সাধ্যি?

বাংলাদেশের বিখ্যাত পরিচালক মতিয়ুর রহমান পানু তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন "বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না" ছবিটি করে। আবার এরকম একটি পালা-কেত্তনের কাজ শুরু করেছেন। নাম "নছিমন সুন্দরী"। নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন ও-পার বাংলার নামি অভিনেত্রী সবনুর, নায়ক সে দেশেরই রিয়াজ। মায়ের ভূমিকায় এপারের লাবণি সরকার। গানে এপারের কুমার শানু, অলকা, কবিতা এবং ওপারের রুনা লায়লা, কনকচাঁপা। আর সে কী নাচ। সে কী গান। সে কী চেল্লানি, হাঁপানি, সে কী কোমর দুলুনি। দেখে 'হলিউড' আখ্যা দিতে বাধ্য আপনি। দেবেন না? তাহলে বলুন 'হলি উট'। তাও বলবেন না? তাহলে এটা অন্তত নির্দ্বিধায় বলতে পারবেন—'হলি হনুমান'।

বাম্পার হিট 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ' ছবি করে টলিউডের মরা গাঙে জল এনেছেন হরনাথ চক্রবর্তী, এই কথা অনেকেই মনে করেন। (অবশ্য দুর্মুখে মনে করে—নর্দমার জল।) হরনাথবাবুর ছবিতে চোখ-ধাঁধানো গাড়ি জাম্প, বিস্ফোরণ, মারপিট, রক্তারক্তি। হিন্দি আর বাংলা ছবির মধ্যে তফাৎ কী? না, অক্ষম অনুকরণ। তবু এইসব ট্যাশগরু নিয়ে সুনীল-শুভেন্দু-বিপ্লব মঞ্চ কাঁপিয়ে লেকচার ঝেড়ে যান। তারপর যেদিন শুনবেন—'ট্যাশগরু গরু নয়, আসলেতে পাখি সে," এত পয়সার ট্যাশ স্বর্গলাভ করেছে, তখন সেই পক্ষী বিষয়ক ঝক্কির স্বর্গ-সংক্রান্ত মর্গ-সেমিনারে আবার লেকচার ঝাড়ার সুযোগ পাবেন তাঁরা। কিছুই বিফলে যায় না।

শতাব্দী ঘোষ

ধানাই পানাই

দীপ মুখোপাধ্যায়

ম্যাদামারা জীবনে ম্যাড়মেড়ে দিন
রাত্তেলায় জবুথবু রাত সঙ্গীন।
কথা ছিল কবিতার বুকে মুখ গুঁজে
কোকিলের বি-ফ্ল্যাট সুর নেব খুঁজে
তারপর যা হবার তাই শুধু হয়
কুড়কুড়ি চেগে ওঠে ন'টার সময়।
এই নেই, এই আছে—হাত ছোঁওয়া দূরে
প্রেম এল ট্যাক্সিতে বাইপাস ঘুরে
মানিব্যাগে সেঁটে থাকো ছবি হয়ে খুকি
ভ্যান্তাড়া ঝেড়ে ফ্যালো, মন ছুঁকছুঁকি।
ওড়না লুটিয়ে প্রাণে দিয়েছিলে দাগা
ঘুরপাক চোখ দুটি আরো ঘোর লাগা।
বলেছিলে বাসস্টপে দেখা হতে পারে
আরো এক খুকুমণি ছিল ডান ধারে।
চারুবাবু ধোঁওয়া ছাড়ে এঁড়ে তক্কোতে
আড্ডাতে তুমি যদি আমাদের হতে।
চোট দিও না গো সোনা স্বপ্নের দিনে
ক্লাস কেটে নিয়মিত এসো ক্যান্টিনে।
তুমি এলে কী ভীষণ আলোকিত ঠেক্
হাফসোল দিও নাগো মিস সল্টলেক।
আগেভাগে বলে রাখি, রেস্তটা কম
লোকে বলে কেলো করা ছুপা রুস্তম।
তাই আজ এতকিছু ধানাই পানাই—
তোমাকেই, তোমাকেই, তোমাকেই চাই।

বিস্মৃত অতীত

দু'জনেই নিয়ম মেনে গুলি ছুঁড়লেন। ফ্রান্সিস হাঁটু দুমড়ে পড়ে যেতে যেতে বললেন, আই অ্যাম এ ডেড ম্যান। হেস্টিংস বললেন, গুড গুড, আই হোপ নট।

ইতিহাসের এক টুকরো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতার স্ট্রিট গাইডের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ডুয়েল অ্যাভিনিউর নাম চোখে পড়বে। এবং রাস্তাটি শুধু স্ট্রিট গাইডের পাতাতেই আছে বলা যায়। কারণ অ্যাভিনিউ শুনলেই যেমন দু'পাশে গাছের সারবাঁধা প্রশস্ত পথের কথা মনে হয়—ডুয়েল অ্যাভিনিউ নামে সে রকম রাস্তা কলকাতায় কোথাও নেই। একপাশে বেলভেডিয়ার, চিড়িয়াখানা, অন্যদিকে ডায়মণ্ড হারবার রোড-এর মধ্যে যে বিশাল চত্বর—যার মধ্যে নতুন নতুন সব সরকারি বাড়ি উঠছে, যার একপ্রান্তে আবহাওয়া অফিস, তারই মধ্যে সরু এক চিলতে এক রাস্তার নাম ডুয়েল অ্যাভিনিউ, যে নামের সঙ্গে দু'শ বছর আগেকার বাংলাদেশের এবং ইংলণ্ডের এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায় জড়িয়ে আছে।

সে রাস্তা এখন খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়। সেই শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজির কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বলাই বাহুল্য, মাঠের মধ্যে নানান রাস্তার মধ্যে আলাদা করে সে রাস্তা খুঁজে বার করাও শক্ত। সেই ঐতিহাসিক কাহিনীর কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। 'ভয়ঙ্কর বটগাছ' করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু পোস্ট অফিসের পিওন হাত দেখিয়ে বলবে,—এই যে ডুয়েল অ্যাভিনিউ। রিজিওনাল মিটিরিওলজিকাল সার্ভে অফিসের চিঠি আসে চার নম্বর ডুয়েল অ্যাভিনিউ, এই ঠিকানায়। যে ব্যক্তি সেই সময়ের ইতিহাস জানে, এই ক্ষুদ্র নির্জন পথে দাঁড়ালে তার শরীরে তবু রোমাঞ্চ হবে। আমি নিজে নিছক ব্যক্তিগত শখে সেই রাস্তাটা একদিন খুঁজে বার করেছিলাম।

১৭ই আগস্ট ১৭৮০ সন। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ভোর পাঁচটার সময় এখানে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছেন। ক্রোধে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে, ঘড়ি দেখছেন ঘন ঘন। তবে কি হেস্টিংস ভয়ে আসবে না? কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসকে চিনতে তিনি ভুল করেছিলেন। হেস্টিংস ছিলেন বিচিত্র পুরুষ। ভালোমন্দর সংমিশ্রণে আদর্শ রাজনীতিবিদ। নন্দকুমারের ফাঁসি, অযোধ্যার রানীদের অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া—এ সমস্ত অপবাদ তাঁর আছে। অপর দিকে প্রবল সব প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষমতার লড়াই করেছেন। সংস্কৃত ভাষার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। চিত্রশিল্পে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। নিজের স্ত্রীকে সুন্দর চিঠি লিখতেন তিনি। বিলেতের কোর্ট অব ডিরেক্টরস তাঁর হাত-পা বেঁধে দিয়েছিল। চারজন সদস্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল এক কাউন্সিল, তাঁদের মতামত নিয়ে হেস্টিংসকে সবকিছু করতে হত। বারবার কাউন্সিলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তাঁকে। আর এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন হেস্টিংসের আজীবন শত্রু স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হেস্টিংসকে কিছুতেই কাউন্সিলাররা সহ্য করতে পারতেন না।

ফিলিপ ফ্রান্সিস যেমন নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তেমনি অপরের ক্ষমতাকে তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। বিলাসী, জেদী, সারা কলকাতায় একসময় প্রধান আলোচ্য ব্যক্তি ছিলেন ফ্রান্সিস। মাদাম গ্রাণ্ডের সঙ্গে তার প্রণয়কাণ্ডের কথা অনেকেরই জানা আছে। ধরা পড়ে গ্রাণ্ডের স্বামীর কাছে তিনি তখনকার দিনে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা, এই স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারেই ফ্রান্সিস-হেস্টিংস

ডুয়েল হয়েছিল। ধারণাটি ভুল। পিছনে অনেক কারণ থাকলেও আসলে দু'জন পৃথক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষের মধ্যে পুরুষকারের দ্বন্দ্ব।

১৭৭৪ সনে ফ্রান্সিস যখন জাহাজ থেকে প্রথম কলকাতায় পা দিলেন, তখন ১৭ বার তোপ দাগা হয়েছিল। কথা ছিল ২১ বার। বনেদি পরিবারের ছেলে ফ্রান্সিস এতে অত্যন্ত চটে গেলেন। তারপর থেকে নানান ঘটনায় অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। হেস্টিংসের যুদ্ধনীতির উপর ফ্রান্সিস বারেবারে হাত দিতে লাগলেন।

চরম বিরোধ দেখা দিল ১৭৮০ সনে। শিগগিরই কাউন্সিলের মিটিং-এ হেস্টিংস তাঁর মিনিট পড়বেন। তার আগে ফ্রান্সিস পড়লেন অসুখে, হেস্টিংস গেলেন গঙ্গার উপর দিয়ে পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে চুঁচুড়ায় বেড়াতে। বিলেত থেকে সকলেই পরবর্তী ডেসপ্যাচের অপেক্ষা করছেন, সম্ভবত হেস্টিংস আর গর্ভনর জেনারেল পদে থাকবেন না।

১৫ই আগস্ট হেস্টিংস তাঁর বিখ্যাত নোট পড়লেন। বিরাট বক্তৃতা। ফ্রান্সিসের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে অনেক কথা তাতে ছিল। তিনি বললেন, "I Judge of his public conduct by my experience of his private which I have found to be void of truth and honour " এব অনেক প্রমাণ তাঁব হাতে আছে। তিনি লজ্জিত যে, এমন একজন লোকের উপদেশ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়।

ফ্রান্সিসের মুখ লাল হয়ে উঠল, একটি কথাও তখন বললেন না। বক্তৃতা শেষে হেস্টিংসকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনাব বক্তৃতার একটি উত্তর আমি দেব। কিন্তু কোনো কথাই এর উত্তর হতে পারে না। একমাত্র শারীরিক আঘাতেই এর উত্তর হতে পারে। হেস্টিংস চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের স্থান এবং সময় ঠিক হয়ে গেল।

আলিপুর ব্রিজের পাশে স্থান ঠিক হয়েছিল। দিন ও সময় নির্ধারিত হয়েছিল ১৭ই আগস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটায়। ফ্রান্সিস আগে থেকেই উপস্থিত। তাঁর সেকেণ্ড ছিলেন কর্নেল ওয়াটস—যিনি তখনকার বাংলাদেশের চীফ ইঞ্জিনিয়ার। হেস্টিংস আসতেই ফ্রান্সিস অসহিষ্ণুভাবে বললেন, ছ'টা বেজে গেছে। হেস্টিংসের সঙ্গী বললেন, না সাড়ে পাঁচটাই বাজে, ওদের ঘড়ি ভুল।

দ্বৈরথের স্থান অনেক বাছাবাছি হল। একজনের যেটা পছন্দ অন্যজনের সেটা পছন্দ নয়। হেস্টিংস খুব শান্ত, তাঁর মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, দরকার হলে তিনি বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়েও লড়াই করতে পারেন। সকলে ইলাইজা ইম্পের বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। পথে, মাঠের মধ্যে বটগাছের তলায় ফাঁকা জায়গা দেখে সেটাই পছন্দ হল।

সে সময় বিলেতে ফক্স আর অ্যাডাম্‌সের মধ্যে বিখ্যাত দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধের নিয়মকানুন দু'জনেই মেনে চলতে রাজি হলেন। চোদ্দ পা দূরে লাইনে দাঁড়াতে হবে। হেস্টিংস বললেন, বড় দূর, গুলি ঠিক লাগবে না।

ফ্রান্সিস পিস্তলটা পরীক্ষা করলেন। বারুদ জ্বলল না। সঙ্গে সঙ্গে বদলে নিলেন। তারপর সংখ্যা গুনে, দু'জনেই নিয়ম মেনে গুলি ছুঁড়লেন। ফ্রান্সিস হাঁটু দুমড়ে পড়ে যেতে যেতে বললেন, আই অ্যাম এ ডেড্ ম্যান। হেস্টিংস বললেন, গুড গুড, আই হোপ নট।

সকলে ছুটে এলেন ফ্রান্সিসের কাছে। হেস্টিংস তখনো শান্ত। তিনি বললেন, আমি এরকম আশা করি নি। আমি আশা করি, আপনার আঘাত গুরুতব হয় নি। যদি আপনার মৃত্যু হয় আমি প্রধান শেরিফের কাছে আত্মসমর্পণ করব।

ফ্রান্সিস বললেন, এর আগে কখনো তিনি জীবনে পিস্তল ছুঁয়ে দেখেন নি।

বাড়ি ফিরে হেস্টিংস চুঁচুড়ায় স্ত্রীকে চিঠি লিখতে বসলেন। ফ্রান্সিস অল্পেই বেঁচে গেলেন। চলে গেলেন বিলেতে। কিন্তু তাঁদের শত্রুতা শেষ হয় নি। হেস্টিংস যখন দেশে ফিরলেন, তখন তাঁকে লর্ড উপাধি দেবার কথা উঠেছিল। ফ্রান্সিস তার বিপক্ষে দাঁড়ালেন এবং বার্ক, সেরিডন প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তাদেব দলে টানলেন। তারপরই শুরু হল 'ইমপিচমেন্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস'। সে ইতিহাস সকলেরই জানা।

আজ কলকাতায় মাত্র কয়েকশ ফুট লম্বা একটা রাস্তাব নামে সেই ইতিহাস এখনো জড়িয়ে আছে।

বাংলা ভাষায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম ইন্টারনেট দৈনিক পত্রিকা

সংবাদ

নিয়মিত পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে দেখুন ও পড়ুন

Website : http// www. sambad.com
Reg. Office : 18/31, Ballygunge Place [East]
Kolkata-700019
Phone : 463-9245/440-2761
E-mail : suprabat @ cal.vsnl.net.in

ফাইল বধূহত্যা

গল্প

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

—বাবা বাঁচাও বাবা বাঁচাও, ওরা আমাকে পুড়িয়ে মারছে। সোনার সারা গায়ে আগুন জ্বলছে। —আসছি আসছি মা এখনই আসছি— উত্তেজনায় উঠে বসেন ত্রিদিব। ঘুম ভেঙে যায়। আবার সেই স্বপ্ন। সোনা, সোনালি ত্রিবিদের একমাত্র সন্তান। চন্দননগর কলেজে বি. এ. ফাইনাল ইয়ার। রত্নার ঘুম ভেঙে যায়, —কি হল? জল খাবে?

—না একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। রাত্রি একটা। এখনো সোনা পড়ছে, দরজার তলা দিয়ে আলোর ইশারা দেখতে পাচ্ছে ত্রিদিব।

সকালে বাজারে যাচ্ছিলেন ত্রিদিব। রথতলায় চাপা উত্তেজনা। —কী হয়েছে কলমবাবু?

—মর্গে পুলিশের একটা বডি এসেছে। বার্ন কেস। —বলেন কি?

—হ্যাঁ মশাই। মর্গের ডোমেরা বলছিল এখন এই কেসই বেশি আসছে।

খুবই দমে যান ত্রিদিব। বধূহত্যা যেন বেড়েই চলেছে। মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা কি তাদের পোড়া শরীর দিয়ে লাশকাটা ঘরের টেবিলেব শোভা বাড়ানোর জন্যে?

একমাত্র মেয়ের বাবা ত্রিদিবের বুকের রক্ত হিম হয়ে যায। সোনার কী হবে, কেমন ঘরে বিয়ে হবে, এ চিন্তা বেশ কিছুদিন ওঁকে কুরে খাচ্ছে।

অফিসে সবে টেবিলে গুছিয়ে বসেছেন ত্রিদিব, পাশের টেবিল থেকে রমেন বলে, —দাদা টাইমস অফ ইণ্ডিয়াতে উত্তর প্রদেশে একটা বধূ হত্যার খবর বেরিয়েছে, আপনার জন্যে কাটিং করে এনেছি। এই নিন। ত্রিদিব চারদিব একবার সন্তর্পণে দেখে নেন— কে কেমন চোখে তাকাচ্ছে। ড্রয়াব থেকে বধূহত্যার ফাইলটা খুলে নতুন কাটিংটা ঢুকিয়ে রাখেন। কবে থেকে এবং কেন যে এই সংগ্রহ শুরু করেছিলেন ঠিক জানেন না, কিন্তু ফাইলটা বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। অবসর সময়ে ফাইলটা পড়ে দেখেন ত্রিদিব—কী কী কারণে বেশি বধূহত্যা হচ্ছে।

এমনি করে দিন যায়। ফাইল বড় হতে থাকে। বিবাহযোগ্য ছেলের বাবা-মাকে দেখলে বেশ সন্দেহেব চোখে তাকান। তাঁদেব আচার আচবণ শ্যেন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন।

এমনি করেই দিন যায়। সোনালি বি.এ পাশ করে ভালোভাবেই। ও এম. এ. করতে চায় বর্ধমান বা বিশ্বভারতীতে। রত্না তাড়া লাগায়—আর পড়ে কী হবে? ওব বিয়ের ব্যবস্থা করো। খোঁজ-খবর নাও। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দাও।

নিদারুণ ভয়টা আবার চেপে ধরে ত্রিদিবকে। সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা প্রায়ই দেখেন ত্রিদিব। রত্নাকে স্বপ্নের কথা একদিন বলেই ফেলেন। রত্না পরম মমতায় স্বামীব মাথায় হাত বুলিয়ে দেন—অত ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেকেরই তো এক মেয়ে থাকে। তারা তো বেশ সুখেই আছে।

অতএব স্বামী-স্ত্রী মিলে বিজ্ঞাপনের বয়ান লেখালেখি চলে। ঠিক মনমতো বয়ানটি মনে আসে না। সোনালি একদিন বাবা-মাকে সলজ্জ ভাবে বলল, তোমাদের সঙ্গে একটা কথা আছে। আমার বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে হবে না. আমি একজনকে ভালোবাসি, তোমদের পছন্দ হলে তাকেই....

লজ্জায় লাল হয়ে সোনা আর কিছু বলতে পারে না।

মা মেয়েকে কাছে টেনে নেন,—এ তো খুব ভালে কথা। ছেলে কী করে? কোথায় থাকে?

—নাম শেখর বায়। চন্দন নগরে আমাদেব কলেজের লেকচারাব।

ত্রিদিব বলেন, বাড়িতে কে কে আছে?

—তা তো জানি না, চন্দন নগরে ভাড়া বাড়িতে একাই থাকে, আসল বাড়ি—কলকাতার কাছেই কোন গ্রামে।

মহা সমারোহে একদিন শেখরকে আমন্ত্রণ কবা হল, বেশ হাসিখুশি। ছেলে মানুষ, দেখলে ছেলে বলে মনে হয়।

ত্রিদিব প্রশ্ন করেন, বাবা, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

কলকাতাব কাছেই বহড়ু গ্রামে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—আমার বাবা সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসর নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকেন। আমার মা নেই, আমার জন্মের সময়ই মারা গেছেন।

ত্রিদিবের বুক থেকে একটা পাষাণের ভার নেমে যায় যাক, শাশুড়ি নেই। বাঁচা গেল।

এর পর আর দেরি হয় না। ধুমধাম করে সোনালির বিয়ে হয়ে গেল। অফিসের বন্ধুরা বললেন, এবার তো নিশ্চিন্ত হলে ত্রিদিব। ফাইলটা এবার পুড়িয়ে ফেলো।

একদিন রবিবার দুপুরে খাওয়ার পর সবে ঘুমিয়েছেন ত্রিদিব, সেই স্বপ্নটা আবার ফিরে এল—বাবা বাঁচাও—সোনালির সারা গায়ে আগুন—সোনা আর আর্ত চিৎকার— শেখর আমাকে মেরে ফেলছে বাবা—শিগগির এসো—

ধড়মড় করে উঠে বসলেন ত্রিদিব। রত্নাকেও তুলে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, এখনই চন্দন-নগর যাব।

রত্নার বিরক্তি চাপা থাকে না, —কী যে সব ছাইভস্ম স্বপ্ন দেখো। ওরা তো বেশ সুখেই আছে। না হয় সন্ধেবেলা একবার ঘুরে এলেই হবে। ওরাও তো এখন বিশ্রাম করছে।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলেন ত্রিদিব,—এখনই যেতে হবে। আমার মন বলছে সোনার কোনো বিপদ হয়েছে।

রিক্সায় চন্দনগর বেশি সময় লাগে না। রবিবারের দুপুর, পাড়াটাও নিঝুম। কয়েকবার বেল দিতে শেখর দরজা খোলে ঘুম চোখে। একটু কি বিরক্তির ছাপ দেখতে পেলেন ত্রিদিব?

—আসুন আসুন। সোনার জন্যে মন কেমন? বসুন, সোনাকে ডাকছি।

রত্না মৃদু স্বরে ধমক দেন, বলেছিলাম না। তুমি ডাক্তার দেখাও। ও সব স্বপ্ন দেখা ছাড়ো।

সোনা ঘরে ঢোকে। একটু কি বিস্রস্ত বেশ। মুখে চোখে সদ্য মিলনের চিহ্ন স্পষ্ট। ত্রিদিবের মনে পড়ে যায় বিয়ের পর রত্নার মুখচোখ মিলনের পর এমনই বিস্ফারিত তৃপ্ত দেখাত। লজ্জায় মুখ নামিয়ে নেন ত্রিদিব।

বাড়ি ফেরার সময় আর একপ্রস্থ বকুনি খেলেন ত্রিদিব। না, এবার ফাইলটা পুড়িয়ে ফেলতেই হবে।

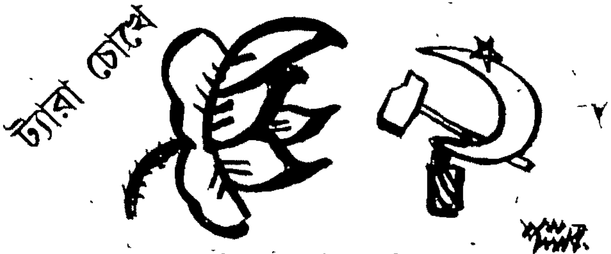

কম্যুনিষ্টের হিন্দু পিতা

বিজেপি শেষে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাপকে ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল? দু'জনের মাঝে কলহ উপস্থিত হইলে তাহাদের মাঝে কেহ যদি অন্যপক্ষের পিতার নাম ধরিয়া গালি দেয়, তাহাতে অন্য পক্ষ বেজায় চটিতং হন। সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে বরং উল্টোটাই ঘটিল। কোনো গালাগালি না দিয়া শাপ-শাপান্ত না করিয়া বিজেপির সাংসদরা সোমনাথবাবুর বাবা যে হিন্দু মহাসভার আজীবন সদস্য ছিলেন, ইহাই জানাইয়াছেন। সোমনাথবাবুর কাছে ইহা গালি স্বরূপই প্রতিভাত হইয়াছে। তিনিও উচ্চকণ্ঠে প্রবলভাবে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহার পিতাঠাকুর মোটেই শেষজীবন পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন না। বরং বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী হইয়া নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন দুই-দুইবার। ইহাতেও কি পূর্বকৃত পাপ স্খলন হয় নাই? সোমনাথবাবুর পিতা একদা হিন্দু মহাসভার সদস্য থাকিতেই পারেন, সে তো তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত। তাই বলিয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু মহাসভা বা বিজেপি খারাপ কিছু করিতে চাহিলে সেটির প্রতিবাদ তিনি করিতে পারিবেন না? জ্যোতিবাবু ধনীর সন্তান হইয়াও কম্যুনিষ্ট হইতে আটকায় নাই আবার জ্যোতিবাবু কম্যুনিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী হইলেও তাঁহার পুত্র চন্দন বসুর শিল্পপতি হইতে অসুবিধা হয় নাই। তবে সোমনাথবাবুর অসুবিধা কোথায়, তাঁহার পিতা যদি আজীবনও হিন্দু মহাসভার সদস্য হন, তাহাতে? না আইনজ্ঞ সোমনাথবাবু আইনের কোনো কেতাবেই এরূপ বে-আইনি ফরমান দেখেন নাই।

অঞ্জনা দত্ত

N. C. DAW & Co.
Gun Makers
Since 1835

9, B. B. D. BAG (EAST)
KOLKATA-700 001
220-6643/4317

সার্বজনীন অসুরপূজা

প্রচ্ছদ কাহিনী

প্রভাত বাগচী

যথাবিহিতসম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতদ্—

মহাশয়,

দীর্ঘদিন হইল নতুন দিল্লি হইতে পুরাতন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। এর মধ্যে আপনার কোনো সন্দেশ প্রাপ্ত হই নাই। আমি তাই ঢেঁকি বাহনটি সার্ভিসিং করতঃ যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ইচ্ছামতো গঞ্জিকা সেবন করিতেছি। ইদানীং সময় কাটাইতে চায়ের দোকানে আড্ডা দিই। সোমরস হইতে তো দীর্ঘদিন বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাই চা নামে একপ্রকার গরম পানীয় গলাধঃকরণ করিতে শুরু করিয়াছি। চা জিনিসটি দেহকে শীতকালে গরম রাখে, গরমে ঠাণ্ডা করে। চাহিলে আপনিও পানীয়টি স্বর্গে ইনট্রোডিউস করিতে পারেন, তবে পশ্চিম বাংলাকে কিছুদিন হইল কেমন যেন অন্যরকম লাগিতেছে, কেমন যেন অচেনা অচেনা। ওয়েদার এখন নাতিশীতোষ্ণ। আকাশে মেঘ নাই, সাদা পেঁজা তুলা অলস গতিতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। আদারওয়াইজ গোমড়া বাঙ্গালীর মুখমণ্ডলে অরুণ কিরণ প্রতিভাত হইয়া স্মিতহাস্য রূপে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। চতুর্দিকে সবুজের সমারোহ, পায়ের নিচে রাস্তাগুলি দশনপঙ্ক্তি গুটাইয়া মিশমিশে পিচকালো রূপ ধারণ করিয়াছে। ম্যান-মেড্ বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে পদ্মফুল, ঘাসফুল। যত্রতত্র ফুটিয়া উঠিতেছে কাশফুল। লাগাতার লোডশেডিং নাই, এক-আধ ঘণ্টা বিশ্রাম লইয়া বিদ্যুৎগতিতে ইলেকট্রিসিটি ফিরিয়া আসিতেছে। চায়ের দোকানে, পথপার্শ্বস্থ রকে বা মেয়েদের স্কুল-কলেজের সামনে ছেলেদের ভিড় বা সরস মন্তব্যও আর নাই। একদম নির্বাচন পূর্ববর্তী অবস্থা। ছেলেদের দল হাতে একটা পুস্তক গোছের বস্তু লইয়া বাড়ি বাড়ি ঢুকিতেছে এবং বাহির হইয়া আসিতেছে। বুঝিয়া পাইলাম না উহারা কি গৃহে প্রাইভেট টিউটরের সন্ধান করিতেছে নাকি আপনাপন দলীয় উম্মিদবারের জন্য ভোট প্রার্থনা করিতেছে। পরে অবশ্য বুঝিয়াছি উহারা চাঁদা তুলিতেছে। আসলে যুবশক্তির সহিত ইদানীং আমার বেশ দোস্তি হইয়াছে। উহারা মাঝে মধ্যেই আমার নিকট আসিয়া গঞ্জিকার রসাস্বাদন করে, আমিও মাসের শেষে উহাদের নিকট বিড়িটা খৈনিটা চাহিয়া খাই। উহাদের সহিত দীর্ঘ বিরহে আমার গঞ্জিকার চাহিদা অদম্য হইয়া উঠে। সহসাই স্মরণ হইল কোথায় যেন দৈববাণী শুনিয়াছিলাম, নবনির্বাচিত রাজ্য সরকার নাকি কর্মচারীদের একমাসেরও বেতন দিতে না পারিয়া মাসখানেকের ভিতরই পড়িয়া যাইবে। খোঁজ লইতেই বুঝিলাম তাহাও হয় নাই। কোনো নির্বাচনই হইতেছে না। আশেপাশের সর্বত্রই দেখিলাম জোড়ায় জোড়ায় স্বামী-স্ত্রী একমাত্র সোনামণি নামক হনুমানের ক্ষুদ্র সংস্করণটিকে লইয়া বস্ত্রবিপণি হইতে কাপড় খরিদ করিতেছে। গৃহকর্ত্রী, নয়নের মণিদিগের মুখ হাস্যোজ্জ্বল, গৃহকর্তা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায় ভাবগম্ভীর। বস্তুতঃ আপন স্ত্রীকে দেখিয়া না হইলেও পরিচিত পরস্ত্রীকে দেখিয়া হাসে না এমন বাঙ্গালী পুরুষ আমি কদাপি দেখি নাই, কিন্তু ইদানীং দেখিতেছি। মাথা ঘুরিতেছে। আরো একবার গঞ্জিকার শরণাপন্ন হইব হইব করিতেছি। এমন সময় মোবাইলখানি কুড়ুং . কু ড়ুং শব্দে বাজিয়া উঠিল। আপনি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চাহিয়াছেন। অমনি, মহাশয়, আমার মস্তিষ্ক খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। বুঝিতে পারিলাম পশ্চিমবঙ্গের আমূল পরিবর্তনের কারণ কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব নহে, মা দুর্গার মর্ত্যে আগমন। সাথে সাথেই জম্পেশ করিয়া এক ছিলিম ভস্মসাৎকরতঃ বঙ্গ পরিক্রমায় বাহির হইলাম।

বেশ খোশমেজাজেই ছিলাম। দীর্ঘকাল পরে সপরিবারে স্বর্গলোকের কোনো পাওয়ারফুল দেবীর দর্শন ঘটিবে ভাবিয়া পুলকিত চিত্তে সব পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। আশা করিয়াছিলাম বাবা ভোলানাথের সহিত দেখা হইলে গঞ্জিকার স্টকটাও একটু বাড়াইয়া লইব কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়া নেশা আমার ছুটিয়া গিয়াছে। আমার গঞ্জিকা সেবনের কারণেই হউক আর পঞ্জিকা দেখিতে অজ্ঞতাই হউক, কলিকাতার দূষিত বায়ু ভেদ করিয়া কোনো স্থানেই মা দুর্গার পূজার কোনো প্রিপারেশন দেখিতে পাইলাম না। বাঙ্গালী উৎসবপ্রিয় জাতি। উৎসব ইহাদের রক্ত, উৎসব ইহাদের ধর্ম, উৎসব ইহাদের কর্মপ্রেরণা। মা জগত্তারিণীর উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে ইহাদের উৎসবমুখীনতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। বাংলায় খুব কম লোকেই 'দুর্গাপূজা' বলে, সবাই বলে 'পূজা'। শারদোৎসবই বাঙ্গালীর উদ্দেশ্য। দুর্গা নাম্নী তরুণীদের যত ভক্ত বাংলায় আছে দেবী দুর্গার তত নাই। শীতকালে বা অন্যান্য সময় যখন দুর্গা দেবী বা অন্য কোনো দেবদেবীই আসেন না তখনো বাংলায় উৎসব হয়— যেমন হৃতিক রোশন নাইট, অন্ত্যাক্ষরী বা রসগোল্লা খাওয়া প্রতিযোগিতা। দুর্গা পূজা যদি লক্ষ্য হয়, হইতে পারে, কিন্তু ভারতে চিরকালই লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ বড়। শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল রাবণ রাজার বিনাশ করিয়া সীতা উদ্ধার, উপলক্ষ

করিলেন অকালবোধন। ভারতবাসী লাইন পাইয়া গেল। লক্ষ্য যদি হয় দিল্লিব মসনদ উপলক্ষ হয় রামমন্দির। লক্ষ্য যে স্থলে মহাকরণ, দিল্লিব জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট হইতে পদত্যাগের অজুহাত দরকার হয়, নাকে খত দিয়া পুনরায় পদগ্রহণেও সেই অজুহাতই প্রবল হইয়া উঠে। কেহ লক্ষ্যে স্থির থাকিতে পূর্বাহ্নেই মরিবার জন্য শাবীরিক অসুস্থতার উপলক্ষ খোঁজেন।

বস্তুত শারদোৎসবে 'পূজা' করাই বাঙালির লক্ষ্য, দুর্গামাতা তাহার উপলক্ষ। তিনি অপরিহার্য নন, এতকাল তাঁহাকে লইয়া বহু মাতামাতি হইয়াছে। নিউ মিলেনিয়ামে সেই ভুল সংশোধিত হইবার সুযোগ আসিয়াছে। কাজেই আমার কথা শুনিয়া দেবী দুর্গাকে না পাঠাইলেই ভালো করিবেন। বাঙালি উৎসবমুখীনতার নিদর্শন স্বরূপ প্যাণ্ডেল পূজা করিবে, ঘট পূজা বা পেট পূজাও অসম্ভব নহে, কিন্তু দেবী দুর্গা না আসিলেও স্পনসবের অভাব হইবে না। আর কে না জানে। স্পনসর ইজ অ্যাট দ্য রুট অফ্ এভবি সাকসেস।

বস্তুতঃ দেবী দুর্গা আসিলেই স্পনসর আসার সম্ভাবনা কম। তিনি ব্যাকডেটেড্। যতই তিনি স্বর্গধামের বিউটি পার্লারে সেরা মেক-আপ গডকে দিয়া রূপসজ্জা করুন না কেন, লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমবয়সী বলিয়া তাঁহাকে ভুল করিবে এমন ঐতিহাসিক বাঙালি তো দেখিলাম না। তাঁহার স্বর্ণগহনা যতই খাঁটি হউক, ইমিটেশনের যুগে তাহা অচল। তাঁহার হস্তধৃত মান্ধাতার আমলের অস্ত্রসকল এখনকার অসুর সংহার করিতে বেঁকিয়া যাইবে। তাঁহার বার্ধক্যজনিত অক্ষমতা এই বৎসর রীতিমতো প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে যখন তিনি অশ্ব, গজ বা দোলায় চড়িয়া আসিতেন তখন সহস্র আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করিতে তাঁহার মাত্র সাতদিন সময় লাগিত।

অথচ আজকের গতির যুগে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থায় রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তিনি আসিতেছেন মহালয়াব একমাস পরে। এই গতিশ্লথতা যদি তাঁহার বার্ধক্যের প্রমাণ না হয় তবে নিশ্চয়ই যৌবনেবও প্রমাণ নয়। হয়ত বলিবেন-হয়ত কেন, নিশ্চয়ই বলিবেন, পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট আছে বলিয়াই তাঁহার এই বিলম্বাগমন। কিন্তু যে দেবী আপন ললাট লিখন—মানে সামান্য পঞ্জিকা লিখনও পরিবর্তন করিতে পারেন না, তিনি শতকোটি ভারতবাসীর লক্ষকোটি দুঃখলিখন কতটা কি পরিবর্তন করিতে পাবিবেন, তাহাতে সংশয় থাকিয়াই যায়।

আপনি আমার কথা শুনুন, দেবীমাতাকে অবসর গ্রহণ করিতে বলুন। আমাকে স্বেচ্ছাবসর প্রকল্পে সই করিতে বাধ্য না করিয়া তাঁহার সহিত সোনালি করমর্দন করুন। না হইলে অবস্থা হইবে করুণ। বাঙালি এখন মাতৃপূজা যতটা না করে তদপেক্ষা অনেক বেশি করে স্ত্রী-র পূজা এবং গোপনে শ্যালিকা পূজা। দেবী দুর্গা মাথায থাকুন, তিনি সবার মাতাই থাকুন, বাঙালির হৃদয়াসনে তাঁহাকে সংস্থাপিত করা হইবে নিস্ফল প্রয়াস। বাঙালি স্ত্রীকে বলে, "দেহি পদপল্লবমুদারম্"। মাকে বলে, "বন্দেইমাতরম্" আধুনিক উচ্চারণে যাহার অর্থ 'মা তোমাকে বন্দনা করি' নহে, দাঁড়ায় 'মা, তোমাকে বন্দী করি'। আমার কথা শুনুন, অসুরদলনীকে মর্ত্যে বন্দী হইতে না পাঠাইয়া ফন্দি করিয়া স্বামীর গৃহেই আটকাইয়া রাখুন।

অথচ অস্বীকার করিব না, চিরটাকাল এমন ছিল না। একটা সময় কাঠের কাঠামোর উপর খড়ের অবয়ব গড়িয়া তাহাতে মাটির প্রলেপ দিয়া দেবীমূর্তি গড়া হইত। কিন্তু তাহা ছিল অজ্ঞান-অন্ধকারের যুগ। তখনো বিদ্যায়তনে সরস্বতী বন্দনা আবশ্যিক হয় নাই বা জ্যোতিষ শাস্ত্র বিজ্ঞান মর্যাদা পায় নাই। সেই মৃন্ময়ীর চিন্ময়ীরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালিচিত্ত ভক্তি গদগদ হইয়া উঠিত, সে নত মস্তকে প্রার্থনা করিত শুভশক্তির জয়, অশুভের পরাজয়; নেত্র নিমীলিত করিয়া কহিত, "তমসো মা জ্যোতির্গময়", আমাকে অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাও। এখন পূজা প্যাণ্ডেলেব অভ্যন্তরে-বাহিরে এত রকমারি আলোর বাহার যে সে-প্রার্থনা প্রাসঙ্গিকতা হাবাইয়াছে। দিনকাল এতটাই বদলিয়াছে যে মৃত্তিকানির্মিত দুর্গাপ্রতিমার কথা শুনিলে হস্তীসকলও বৃংহণ ধ্বনি পবিত্যাগ করিয়া অট্টহাস্যে মাতিযা উঠিবে। নিউ মিলেনিয়ামে বিড়িব প্রতিমা, ডালের প্রতিমা বা চিনি-লবণের প্রতিমাও ব্যাকডেটেড্। এখন ঠাণ্ডা পানীয় বা গ্যাস নির্মিত প্রতিমা না থাকিলে পাবলিক পূজামণ্ডপে যায় না। পূজামণ্ডপগুলিও হয় আধুনিক বাঙ্গালী মানসের উচ্চাশাব ন্যায় গগনচুম্বী। কোনোটি হোয়াইট হাউসেব রেপ্লিকা, কোনোটি সেণ্ট পিটার্সবার্গের গির্জা বা নেহাৎ সাদামাটা হইলে বাকিংহাম প্যালেসেব অনুকরণে নির্মিত। এই বছব মার্কেটে লেটেস্ট যাইতেছে গুজরাটের ভূমিকম্প এবং কলিকাতার তাজমহলে প্রেসিডেণ্ট মুশারফের সস্ত্রীক দুর্গাদর্শন। সকলেই বহিবঙ্গের জাঁকজমক লইয়া ব্যস্ত কিন্তু দীর্ঘ চারিদিন— আজকাল অবশ্য সাতদিন না হইলে পূজা সম্পূর্ণ হয় না—মা দুর্গাকে যে সন্তানসন্ততিসহ ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তাঁহাব যে কোথাও বসিবার বা শুইবার জায়গা নাই, তাহার প্রতি কাহারো কোনো নজর নাই। বৃদ্ধ বয়সে এতখানি ক্লেশ সহ্য করিবাব মতো ফিট্‌নেস দেবী দুর্গাব থাকিলে ভালো, অন্যথায় তাঁহাকে প্রেরণ না করাই শ্রেয়। আপনি বরং দেবীমাতাকে এই বছর ফিটনেস প্র্যাকটিস করিতে বলুন না হইলে বিশ্রাম করিতে বলুন। এই বছর তাঁহার আর আসিবার দরকার নাই।

ভারতবর্ষে এখন চলিতেছে ব্যাপক কর্মী ও কর্ম সংকোচন। বছরে এক কোটি বেকাবের চাকরির প্রতিশ্রুতি এখন ইতিহাস। কর্মী দেখিলেই সবকাবেব এক দফা কর্মসূচী হইল ছাঁটাই। লাভজনক বা অলাভজনক সংস্থা বিক্রি করিয়া দেওয়াব ধুম পড়িয়াছে। উদাবীকবণ কতটা হইতেছে বুঝি না, তবে উদরীকরণ বেশ ভালোই হইতেছে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গেব সরকার কর্মী সংকোচন না করিয়া অকাল বাজেটে ছয় লক্ষ নতুন কর্ম সংস্থানের কথা বলিতেছে। স্থির হইয়াছে শিক্ষকদিগের প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ কবিয়া তিন লক্ষ বেকারকে প্রাইভেট টিউশনি দেওয়া হইবে। ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ কবিয়া আরো তিন লক্ষকে প্রাইভেট রুগি দেখানোর ব্যবস্থা কবা যায় কিনা তাহা দেখিতে পঁচিশ সদস্যের এক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আপনার আনন্দিত হইবার কোনো কারণ দেখি না। কর্মী সংকোচন না করিলেও পশ্চিমবঙ্গ ব্যয় সংকোচন করিতে সদা তৎপর। মন্ত্রীরা বিদেশ ভ্রমণ বাদ দিয়াছেন, বৎসবে একবার মাত্র ডি. এ. ঘোষিত হইতেছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠিয়াছে শরৎকালে দুর্গাপূজা হয় হউক কিন্তু তাঁহাব সন্তানদিগকে কে আসিতে কহিয়াছে? ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট বড় হইয়া গিয়াছে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছে, এবাব তাহারা নিজেদের পথ নিজেরাই দেখুক। গনেশ তো বিবাহ কবিয়াও মায়ের আঁচল ছাড়ে নাই, কলাবউ সহ সে সর্বদাই মায়ের অনুগামী। ইহা কি বধূ নির্যাতনের জলজ্যান্ত প্রমাণ নহে? সে এক এক বেলায় লিটার লিটাব দুগ্ধসহ যে পবিমাণ কদলী উদারসাৎ করে তাহার খরচ আমার সম্বৎসরের বেতন অপেক্ষা বেশি। অধিকন্তু, লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ প্রত্যেকেরই বৎসরে একবার পূজিত হইবাব বাধ্যবাধকতা আছে। তখন তো, কই, উঁহাদেব মাতাব কথা একবাবও মনে পড়ে না। তখন যদি উঁহারা একাই বিদেশে আসিতে পারে, শবৎকালেই বা সুবলোকে একা একা থাকিতে পারিবে না কেন? একাও পূজা নিব আবাব মায়ের সহিত সপরিবারেও পূজিত হইব—ইহা তো কাবুলিওয়ালার সুদ অপেক্ষাও বেশি হইল! এই মাগ্নিগণ্ডার বাজারে তাহার বায়বহন বাঙ্গালীর পক্ষে অসম্ভব। আপনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের পাসপোর্ট ভিসা আটকাইয়া দিন। মা দুর্গা সন্তানদিগকে আনিবার বায়না ধরিলে নিজ খরচায় আনিতে বলুন। অসুরকে একা প্রেবণ করুন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হইলে যে অর্থ সাশ্রয় হইবে তাহা দিয়া আমাব পে-কমিশনের এরিয়ারটা মিটাইয়া দিন। না-হইলে আমাকেও বোধহয় প্রাইভেট টিউশনি ধরিতে হয়।

আমার নিজের মূল্যায়নে ভগবতী দুর্গা পশ্চিমবঙ্গে কোনো দিনই তেমন কল্কি পান নাই। বাঙ্গালী যুবককে এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে চাঁদা তুলিতে হয়, পুলিশে যেমন তোলা তোলে। দুর্গাপূজা সেই সুযোগ সৃষ্টি করে। তৈরি হয় মোগল বাদশাহের হারেমের ন্যায় সুবিশাল মণ্ডপ, তাস খেলা এবং অন্যান্য যুব প্রতিভা বিকশিত করিবার জন্য অস্থায়ী টেন্ট। তথায় মাইলখানেক হাঁটিবার পর মা দুর্গার দেখা মেলে। মা দুর্গাকে প্রাপ্ত বয়স্ক বাঙ্গালী দেখিতে চাহে না। মা দুর্গা মানে ন্যূনতম একখানা মহিষ কর্তন ও পশুরাজ সিংহের কয়েক দিবস নিশ্চলতা। উহাতে সিংহের পায়ে বাত ধরে এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণের যুগে ইহা কাম্য নহে। বস্তুতঃ মা দুর্গা এখন কচি-কাঁচাদেরই দ্রষ্টব্য বস্তু। তাঁহার এক মাথা ও দশটি হাত দেখিয়া বাচ্চারা তাঁহাকে কোনো মিউজিয়ামের সামগ্রী বা ডাইনোসোরের যুগের বাসিন্দা বলিয়া মনে করে। যে সমস্ত শিশু ভূয়োদর্শী, যাহারা টি.ভি.-তে রামায়ণ নামক সিরিয়াল দেখিয়া বড় হইয়াছে তাহারা রাবণের দশটি মাথার সহিত দেবীর দশ হস্তের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাকে রাক্ষস বংশীয়া কোনো রমণী বলিয়া ভাবে। কেহ হাসে, কেহ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পালায়, প্রার্থনা করিবার কথা কাহারও মাথায় আসে না। বয়ঃপ্রাপ্তদের অধিকাংশেরই ভিড় মাতার সন্তানদের নিকট। কার্তিকের কাছে তরুণীদিগের ভিড়ে যাওয়া দায়। স্মার্ট হ্যাণ্ডসাম হি-ম্যান দেব কার্তিকেয়র নিকট সুন্দরী দিগের প্রার্থনা—'তোমাকে চাই' বা 'ইলু ইলু'। বাংলা মাসের নাম সকলেরই অজানা থাকিলেও কার্তিক মাসের নাম প্রত্যেক তরুণীরই মনে থাকে। ইদানীং সরস্বতী বন্দনা বাধ্যতা মূলক হইয়াছে। তাই জেনারেল পাবলিক অফিসের হাজিরা খাতায় সই করিবার মতো কম্পালসারি কর্তব্যকর্মটুকু সারিয়া নজর ফেরায় লক্ষ্মী-গণেশের প্রতি। ইহাদের চারিপাশে সদাসর্বদা ভিড় লাগিয়াই আছে। সিদ্ধিদাতা গণেশের নিকট সিদ্ধি কেহ চাহে না। সিদ্ধি খাইয়া তাহা হজম করিবার মতো মর্দ হিন্দি সিনেমায় থাকিতে পারে কিন্তু বাংলায় উহাদিগের যথেষ্টই অভাব। ওদিকে খোলা বাজারের জমানায় সর্বত্রই বিদেশী কারণবারি, আন্তর্জাতিক ড্রাগস বা দেশি গঞ্জিকা যে পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে যে সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা অনাবশ্যক। লোকে তাই গণেশ ও লক্ষ্মীর নিকট বৃদ্ধি চাহিতেছে। ধন যত বৃদ্ধি হয় লোকের তত মন ভরে। কাজেই লক্ষ্মীপূজা, দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত হয় ঘরে ঘরে। দশ হাতে অস্ত্র লইয়া মা দুর্গা মশা মারেন। আমার কথা শুনুন, মশকাসুর দমন করিবার নিমিত্ত মা দুর্গাকে প্রেরণ করিবার দরকার নাই। বাঙ্গালি এখনো এত দুর্বল হইয়া যায় নাই যে দুইহাতে একটি মশাও বধ করিতে পারিবে না। আপনি বরং একখানি কামান পাঠান। বাংলার পুরসভাগুলি মশা মারিতে কামান দাগিতেছে। মশা উহাতে শেষ না হইলেও শেষ হইতেছে পরিবেশ। আপনিও তাহাতে অবদান রাখুন। মা দুর্গার সেকেলে অস্ত্রগুলি কেজি দরে বিক্রি করিয়া আমার এরিয়ার বিলটি মিটাইয়া দিন। অসুরকে একা প্রেরণ করুন। সে একা আসিলে শারদোৎসবের জৌলুযে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়িবে না, বরঞ্চ অনেকেরই সুপ্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

জানি, মহাশয়, আপনি আমার কথা শুনিবেন না। আমি স্বর্গের গ্রুপ সি কর্মচারী, গরিব নারদ। গরিবের কথা বাসি হইলে ফলে কিন্তু এবার তাহা টাট্‌কা থাকিতেই ফলিতেছে। সেদিন গলিতে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া দম লইতে একটি চায়ের দোকানে চা খাইলাম। অনন্তর কল্কিতে অগ্নিসংযোগ করিবার নিমিত্ত একটি টুকরা কাগজ উনানের সামনে ধরিয়াছি, মনে হইল উহাতে কেমন যেন একটি পরিচিত ছবি লক্ষ্য করিলাম। ভালো করিযা চাহিয়া দেখি উহা এই বছরের শারদোৎসবের একটি চাঁদার রসিদ। আব ছবিটি কোনো অসুর দলনীর নহে, স্বয়ং অসুরের। পড়িয়া রীতিমতো চমকাইয়া উঠিলাম। রসিদে দুর্গাপূজার কোনো কথা নাই, আছে অসুরপূজার কথা। আমি নিজে আপনার নিকট অসুর পূজার জন্য ওকালতি করিতেছি অথচ আমার কাছেই ব্যাপাবটা অজ্ঞাত রহিয়া গেল। ভাবিলাম, নিশ্চয়ই ছাপাব ভুল, হইবে শ্বশুর পূজা। এখন সিনেমাব নাম হয় 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'। 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' শ্লোকটি অনেকেই এখন বলে

"শ্বশুরঃ স্বর্গ শ্বশুরঃ ধর্ম শ্বশুরঃ পরমং তপঃ।
শাশুড়ি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।"

গৃহস্থ বাঙ্গালী আপন পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়া শ্বশুর শাশুড়িকে গৃহে আনে। দাম্পত্য কলহে পত্নী স্বামীর প্রতি অন্যতম যে সেরা শরটি নিক্ষেপ করেন তাহা হইল—আমাকে বাপের বাড়ি দিয়ে এসো। যিনি জায়ার বাপ, তিনিই পতিব শ্বশুর। ভাবিলাম, হয়ত সেই জন্য পূজা করিয়া শ্বশুবদেবতাকে তুষ্ট করিতে জামাই বাবাজীবনরা সব আসরে নামিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহারা বেকার কিন্তু প্রেম করিতেছে এবং বিবাহ করিযা শ্বশুরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে ভাবিতেছে তাহাদের পথের সর্বাপেক্ষা বড় কাঁটা হইল শ্বশুর নামক অসুরই। পবক্ষণেই মনে হইল শ্বশুরপূজা ব্যক্তিগত ব্যাপার। বারোয়ারী শ্বশুর বাঙ্গালী পছন্দ করে না। গঞ্জিকায় ঘন ঘন টান দিই। একটা সময় ছিল যখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুর-সাধনা হইত। বাঙ্গালী মেয়েরা সকাল সন্ধ্যা হারমোনিয়াম সহযোগে শৈশব হইতেই গান শিখিত। এখন দিন বদলিয়াছে। বাঙ্গালী ললনা এখন কম্পিউটার শেখে, সাঁতাব শেখে, ক্যারাটে শেখে। কিন্তু চবম বেরসিক বাঙ্গালী যুবকও চায় সুগায়িকা গৃহবধূ। কাজেই বৃদ্ধ বয়সে মেয়েরা সব হারমোনিয়াম ধরিয়া তারস্বরে চেঁচাইতেছে—সা রে গা মা। অনেকেরই গলায় সুর লেশ মাত্র নাই কিন্তু গাযে আছে অসুরের শক্তি। অতএব ব্যাপারটি বড় খোলতাই হইয়াছে এবং তাহা সেলিব্রেট করিতেই এই অ-সুর পূজার আয়োজন। আজকালের গানেও এই অ-সুরেরই প্রাধান্য। মা দুর্গা আসিলে চণ্ডীপাঠ কবিতে হইবে। কে করিবে? ইউ. জি. সি. শঙ্করাচার্য্যের জীবনী ও কর্ম পাঠ করিতে যতই নির্দেশ দিক, দেশে চণ্ডীপাঠকের সংখ্যা এখন নিতান্তই অঙ্গুলিগণ্য। এখন মাইকে শুনিতে হইবে—'বুঝলে ওরে খোকন, তোমাব মাথায় চ'ড়ে বাছব ভালোবাসার উকুন',—বা 'ঝুমা চুমা দে দে চুমা।' এই গানে কথার সহিত বাজনা বাজে না, বাজনাই এখানে মুখ্য, কথা বাজনার সহিত সঙ্গত করে মাত্র। এই গান দেবী দুর্গাকে প্রীত কবিবার জন্য নহে, অসুরকে প্রীত কবিবার জন্য। কাজেই চলিতেছে সার্বজনীন অসুব পূজার সমাইক আয়োজন।

বস্তুতঃ সার কথাটি বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী বুঝিয়া গিয়াছে। দেবী দুর্গা প্রীত হইলে শুষ্ক আশীর্বাদটি ছাড়া তাঁহাব দিবার কিছু নাই কিন্তু অসুর খুশি হইলে গাড়ি বাড়ি কবা কোনো ব্যাপারই নহে। পুরাকালে অসুর ছিল একা। তাহার প্রকৃতি ছিল নিরীহ গোছের। তাহার নীতি ছিল, য পলায়তি স জীবতি। দেবী দুর্গা দেববলে বলীযান হইয়া তাহাকে যেমন খুশি দশ হস্তে তুলোধোনা করিতেন। ভারতবর্ষে এখন লক্ষ লক্ষ অসুর। তাহাদেরই হস্তে যাবতীয় ক্ষমতা। মা দুর্গা কতজনকে মারিবেন? বীরাপ্পন বা দাউদ ইব্রাহিমের ন্যায় অসুরের একখানা ধমক খাইলে মা দুর্গা পালাইবার দিশা পাইবেন না। পূর্বে এক মহিযাসুর কর্তন করিলেই দেবী দুর্গার ডিউটি সমাপ্ত হইত। এখন অসুর বহুরূপী। সে যেমন একা বহু রূপ পরিগ্রহণ করিতে পারে তেমনি বহুর মধ্যেও নিজেকে ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছে।

বহু রূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ অসুর?
দুর্নীতি পরায়ণ যেই জন
সেই জনই স্বয়ং অসুর।

সঙ্গত কারণেই দেবী দুর্গা হইলেন পারসোনা নন গ্রাটা, মোস্ট অবাঞ্ছিত। ভারতে এখন রামভক্তদের রাজত্ব চলিয়াছে। রামরাজ্য কতটা স্থাপিত হইয়াছে বলা মুশকিল তবে রামমন্দির গড়ার আয়োজন সম্পূর্ণ। অকাল বোধন করিয়া

রাম হইলেন জাতীয় হিরো, বোধিত হইয়া দেবী দুর্গা জাতীয় জিরো। রামভক্তদের লক্ষ্য হইল এইবার অসুর হওয়া। সেই লক্ষ্যে খ্রীস্টান মিশনারি পুড়িতেছে, সন্ন্যাসিনী ধর্ষিতা হইতেছে। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি। অনাহারে যখন লোক মরিতেছে ঘোষিত হইতেছে ব্যাপক ডাউনসাইজিং, চাকরির ন্যূনতম বয়স পঁয়তাল্লিশ ও অবসর গ্রহণের বয়স বাহান্ন করার উন্নয়নমূলক আসুরিক নীতি। ব্যয় সংকোচনের কথা বলিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রনায়ককে বৃথাই ডাকিয়া দুই দিনে সত্তর কোটি টাকা নিষ্ফলা খরচ হইল; ইচ্ছামতো সাংসদ দিগের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা হইতেছে। ট্যাক্স ফ্রি। দেবী দুর্গা তো দূরস্থান, এ হেন আসুরিকতা বন্ধ করিতে আপনিই পারিবেন কি? অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরিয়া আছে বামপন্থীদের রাজত্ব। সুযোগ বুঝিয়া দেবী দুর্গার বিধিও হইয়াছেন বাম। চারিদিকে চলিতেছে অসুরের জয়জয়াকার। বাড়ি বাড়ি যাইয়া চাঁদা তোলা হইতেছে রীতিমতো আসুরিক কায়দায়। কারণ চাঁদা আদায়কারীদের আচরণ সুরময় হইলে চাঁদা নাকি ওঠে কম। রাস্তায় ঘাটে দ্রুতগামী বাস ট্যাক্সি ট্রাক থামাইয়া হিসাব বহির্ভূত চাঁদা তোলা পশ্চিমবঙ্গে এখন রীতিমতো গৌরবের কালচার। পুলিশ অবশ্য বিজ্ঞাপন দেয় —'জুলুম হইলে থানায় জানান।' জানাইতে গেলে উপদেশ দেয়, দিয়েই দিন না, মশাই, ক'টা টাকা। কিন্তু আসুরিক শক্তির লোক চাঁদার জুলুম হইতে মুক্ত। সবাই তাই অসুর-কৃপা প্রার্থী। চাঁদা তোলার সময় যে সব দুর্বলচিত্ত গৃহস্থ হার্টফেল করে তাহাদিগকে বা অন্যান্য সময়েও ডেড বডি নাচিতে নাচিতে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় এমন ভঙ্গিতে, যেন ভারত দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জিতিয়াছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসুরের রমরমা চলিয়াছে। পরীক্ষা হলে ছাত্র অসুর বসিয়া টুকলি করিতেছে। দুর্গা দেবীর মহিমা দেখুন। শিক্ষক-পরিদর্শকের কাজ তাহাকে বিনা বাধায় টুকিতে দেওয়া। সে ধরা পড়িলে বিপদ তাহার নহে, শিক্ষকের হয় প্রাণ সংশয়। শিক্ষকাসুরের হাতে প্রাইভেট পড়িতে পড়াইতে প্রাণ যাইতেছে ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকের। দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য দেখুন। আগে প্রবাদ ছিল পুলিশে ছুঁইলে আঠারো ঘা, এখন হইয়াছে ডাক্তারে ছুঁইলে পঁচিশ ঘা। ডাক্তার-রুগি সম্পর্ক এখন বহুদূর বিস্তৃত হইয়া ল্যাবরেটরি, প্যাথলোজিস্ট, এক্স-রে ক্লিনিক অবধি ছড়াইয়াছে। দেবী দুর্গার ক্যারিশমা আর কি। পুলিশাসুরে ভুগিতেছে কিছু ছোটোখাটো ব্যবসায়ী, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং ভদ্রলোক। নেতাসুরে বধ হইতেছে জনতা। 'দেবী কৃপাহি কেবলম্' লইয়া তাহাদের কোনো লাভ নাই। নেতা না ধরিলে বা কড়ি না ফেলিলে বিকাশ ভবনে বা সরকারি অফিসে যাওয়া বহুজনেরই পণ্ডশ্রম হয়। অবশ্য আসুরিক গ্রেট প্রদর্শন করিতে পারিলে কোনো বাধাই বাধা নহে। সার সত্য সকলেই বুঝিয়াছে। দেবী দুর্গা ওমনি প্রেজেন্ট, ওমনিসিয়েন্ট হইতে পারেন কিন্তু ওমনিপোটেন্ট একজনই—অসুর। অসুর মা দুর্গার সন্তানদিগের সহিতও এমনই লাইন ফিট্ করিয়া রাখিয়াছে যে অসুরের সহিত তাঁহার যখন মরণাপন্ন সংগ্রাম চলে কার্তিক গণেশ আকাশের দিকে তাকাইয়া তারা গোণে। কাজেই আধুনিক মহামন্ত্র মহাবিশ্বের মহাকাশ ব্যাপিয়া প্রচার হউক :

অসুরঃ স্বর্গ অসুরঃ ধর্মঃ অসুরহি পরমন্তপঃ।
অসুরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে নেতাভিনেতাঃ।।

বস্তুতঃ অসুরের সহিত লাইন থাকিলে অভিনেতা আসিয়া আপনার জন্য নাইট করিবে, নেতা আপনার জন্য ফাইট করিবে, প্রতিপক্ষকে টাইট করিবে। তাই প্রতি প্যাণ্ডেলে গীত হইতেছে—

দেব প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড দুর্গা দর্প নিসূদন।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।।

এখানে রূপ অর্থ স্বজনপোষণ হেতু নিজজনের নিকট মনোহর কিন্তু শত্রুদের নিকট ভীষণ রূপ, জয় অর্থ হইল দুই নম্বরি লাইনে জ্ঞান, যশঃ অর্থ দুর্নীতিপরায়ণতা হেতু খ্যাতি এবং শত্রু হইল যাহারা এই লাইনে কম্পিটিটর। কোথায় যেন চণ্ডীপাঠ হইতেছিল—

যা দেবী সর্বভূতেষু অসুররূপেন সংস্থিতা...
সাথে সাথে তাহা সংশোধিত হইয়া আবৃত্তি শোনা যাইতেছে:
যঃ দেবঃ সর্বভূতেষু দুইনম্বরি রূপেন সংস্থিতঃ।
নমোস্তস্যৈ নমোস্তস্যৈ নমোস্তস্যৈ নমোনমঃ।।

অসুর পূজার বোধন হইয়া গিয়াছে, এখন উদ্‌বোধনটাই শুধু বাকি। আপনার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি স্বয়ং আসিয়া এই শুভ কাজটি করিয়া যান। অন্যথায় এমন দিন খুব দূরে নহে যখন লোকে আপনার আসনেই অসুরাধিপতিকে অধিষ্ঠিত করিবে। মা দুর্গাকে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া পত্রপাঠ চলিয়া আসুন। তবে দেবী ভগবতীকে যদি অসুরহস্তে সবংশে ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন তাহা হইলে অবশ্য অন্য কথা।

অশুভ অসুর বিজয়ার চুম্বন জানাইয়া শেষ করিলাম।

নিবেদন ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
সেবক নারদ।।

ট্যারা চোখে

শ্বশুর-বউ কাজিয়া

এতদিন ছিল শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া। এবার শ্বশুর বনাম পুত্রবধূর কাজিয়া বাধিয়ে রেকর্ড গড়লেন মন্ত্রী গণেশ মণ্ডল। ঝগড়া বলে ঝগড়া। অতিষ্ঠ হয়ে জ্বরাক্রান্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ছেলে ও ছেলে-বৌ রাতের আঁধারে রাজভবনের রাজ্যপাট ছেড়ে সোজা রাস্তায়। দলে দলে দলের লোকজন নাকি মন্ত্রী মশায়ের আবাসনটিকে ভোজন এবং শয়নের হট্টমন্দির বানিয়ে ফেলছিল। বধূমাতার মধুহীন প্রতিবাদে বিলক্ষণ চটিতং হয়ে তাঁকেই বাড়ি থেকে তাড়ানোর হুকুম জারি করা হয়েছে। না, এ দাপট কোনো এস. পি.-র নয়, আর এস পি-র। পুত্র এবং পুত্রবধূ ঘোষণা করেছেন, ইহজন্মে আর তাঁরা পিতা কাম শ্বশুর রূপী অসুরের মুখ দর্শন করবেন না।

এ খবর ছাপা হতে হতে জল বহু দূর গড়াবে, আশা করা যায়। দলে দলে শ্বশুরমশায়রা পুত্রবধূর সম্মুখে অসুর রূপেণ সংস্থিত হইবেন। এরূপেই রেভল্যুশনারি সোস্যালিস্ট পার্টির হইবে অভিনব রেভল্যুশন। সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে ইহাই সহজ সল্যুশন!

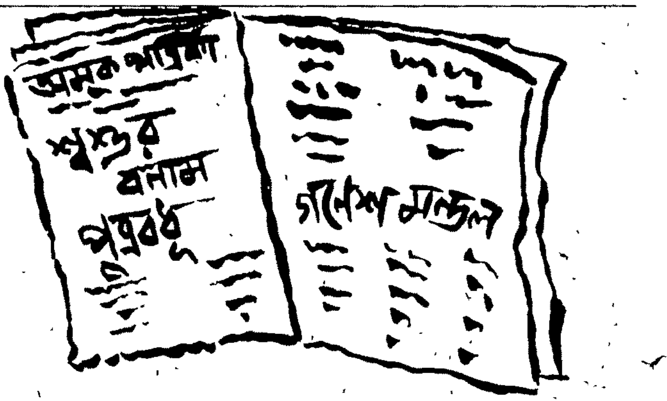

মৈনাক মিত্র

রাশি চক্কোর

জ্যোতিষাঁড়র্ণব স্বামী কমলানন্দ অবধূত

শারদীয়া আনন্দাসুর	এই মাস জুড়িয়া এই অসুর স্টলে স্টলে পড়িয়া থাকিবে অথচ কেহ পাড়িয়া খাইবে না। খাইলেও সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টাসিড খাইবে। সুপার স্টার, মেগাস্টার ঔপন্যাসিকদের উপহার-দেওয়া মারুতি, সুজুকি ফেরৎ লইবার যোগ দেখা যায়।
শারদীয়া প্রতিদিনাসুর	হাত মাটি করিবার সাবানের সঙ্গে সঙ্গে এই বৎসর এই অসুরের সহিত শ্বশুরের পুত্র ফ্রি দিবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়। পরের বৎসর তদুপরি 'ঠকুরপো' ফ্রি দিবার লেবেঞ্চুস যোগ রহিয়াছে।
সিরিয়ালাসুর	টানিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে পরিচালক এপিসোডে এপিসোডে গিঁট পাকাইয়া ন্যাজে-গোবরে হইয়া যাইবেন। ন্যাজের গোবর পরিষ্কার করিবার জন্য নতুন নায়িকার বিজ্ঞাপন দিতে হইবে। নতুন নায়িকা পরিচালকের বাজেটের সহিত ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের গিঁট পাকাইয়া সরিয়া পড়িবে।
বিজ্ঞাপনাসুর	বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছতা আসিবে, অর্থাৎ মডেলের অন্তর্বাস ক্রমে ক্রমে ট্রান্সপারেন্ট হইয়া উঠিবে। সিরিয়াল ও বিজ্ঞাপন পরস্পর স্থান বদল করিবে অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে সিরিয়াল দেখা যাইবে।
মার্কেটিংয়াসুর	এই মাসে সব 'মাল' কিস্তিতে পাওয়া যাইবে। এবারের মার্কেটিংয়াসুরের মুখের জাতীয় সঙ্গীত— "আমারে কে নিবি ভাই বিকোতে চাই আপনারে এখন নিয়ে যা রে দাম দিবি পরে কিস্তিতে দাম দিয়ে দিবি ডবল করে পরে সারা বছর বুড়া আঙ্গুল চুষিবি রে, এ-এ-এ .
প্রাইভেট টিউটরাসুর	শিক্ষক-অধ্যাপকদের বাড়ি ও কোচিং সেন্টার হইতে টিউটরাসুর বিভিন্ন মন্দির ও রিসর্টে স্থানান্তরিত হইবে। পুলিশের আঙুল ফুলিয়া কদলীবৃক্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।
আবৃত্ত্যাসুর	এই রাশির জাতকরা মঞ্চে আবৃত্তির দৃশ্যায়ন করিতে গিয়া নিজেই অদৃশ্য হইতে পারেন। শুক্রের প্রভাব প্রবল হওয়ায় শুক্রবারের অনুষ্ঠানে দর্শক-নিক্ষিপ্ত কয়েকজোড়া পাদুকা লাভ হইতে পারে। জাতিকাগণের ক্ষেত্রে (বিশেষত অদূরদর্শী দূরদর্শনের সংবাদ পাঠিকা হইলে) প্রতি হপ্তায় বারোটি খেপ মারিয়া গলা গলিয়া যাওয়ায় নেপথ্য ক্যাসেটের সহিত 'লিপ' মিলাইতে পারেন। সংবাদপত্র হইতে আবৃত্তি বিশেষ পুরস্কারের অনুকূল।
রিমেকাসুর	যে সব রিমেকাসুরের ক্যাসেট কিঞ্চিৎ মূল্য সহ ক্রেতাকে ধরাইতে হয় তাঁহারা হতাশ না হইয়া এই মাসে শৃগাল ও কুকুরের মার্গসঙ্গীত রিমেক করিলে সাফল্যের বৃহস্পতি তুঙ্গে উঠিবার সম্ভাবনা। মন্দের মধ্যে তুঙ্গ হইতে তাঁহাকে নামানোর সিঁড়ি পাওয়া যাইবে না।
চাঁদাসুর	এই রাশির জাতকদের পক্ষে এই মাসটি বড়ই অশুভ। না জানিয়া নবাগত দারোগাবাবুর প্রণয়িনীর বাড়িতে উৎপাত করিতে গিয়া চিৎপাত হইতে পারেন। চাঁদা ছাড়িয়া চাঁদি সামলানো মুস্কিল হইবে। তবে নিজ গৃহে পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর কণ্ঠে নল ঠেকাইতে পারিলে কিঞ্চিৎ মালকড়ি পাইবার সম্ভাবনা আছে।
দীর্ঘকবিতাসুর	এই রাশির জাতকরা আশ্লেষার প্রভাবে এই মাসে প্রবল শ্লেষ্মায় ভুগিলেও দীর্ঘতম কবিতাবলী লিখিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিবেন। কিন্তু কবিতার শ্লেষ্মায় তাঁহার পাঠকগণ পটল তুলিবেন।

চাকরির তিন সূত্র

সনৎকুমার মিত্র

Boss দের দাও তেল, চেপে ধরো ঠ্যাং
নইলেই চাকরিতে খাবে তুমি ল্যাং।

Colleague-কে গ্যাস দাও, ভাই বলে ডাকো
আড়ালে চুকলি করো, সাধু সেজে থাকো।

Subordinate যারা খাটাও তাদের
তারা যেন ভাবে তুমি চুহা নও, শের।

তিনসূত্র দেয় মিত্র সনৎকুমার
চাকরিজীবীর জন্যে সারাংশের সার।

উপন্যাস

ভালোবাসি তাই ভালোবাসি

ওম্বিকা গুপ্তো

এক

রোদ পোয়াচ্ছিল কুন্তলা। পুব-মুখো বাংলোটার লাগোয়া সবুজ দুব্বোঘাসের গালিচার ওপর বেতের ডেক্‌-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছিল ও। হেমন্ত শেষের সকাল। হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ডুবে ছিল অঘ্রানের নরম রোদ্দুরে। ঠিক হিমেল না হলেও সকালের দিকে হাওয়ায় শীতের আমেজ থাকে এ সময়টা শিমূলতলায়। রোদের উষ্ণ স্পর্শ আর শিশির ভেজা ঘাসে ঝরা শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ। সব মিলিয়ে একটা অলস আচ্ছন্নতা এনেছিল কুন্তলার সারা শরীরটায়। চোখদুটো বেশ জড়িয়েই এসেছিল। হয়ত ঘুমিয়েই পড়ত ও। কিন্তু মাঝে মাঝেই অবচেতনার গভীরে আচমকাই ভেসে উঠছিল অনির্বাণের মুখটা। ঠিক জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা নয়। বরং ঘুম-ঘুম চোখে অজান্তেই স্মৃতির রোমন্থন করে চলেছিল কুন্তলা।

কি একটা রসিকতায় অনির্বাণ যেন হেসে উঠল বলে মনে হল কুন্তলার। হাসিটা অনির্বাণের মার্কামারা হাসি, অর্থাৎ বেশ উঁচু পর্দায়। কিন্তু ঠিক সেই সময় গেট খোলার আর সাইকেল বেলের কর্কশ দ্বৈত ধ্বনি ছাপিয়ে উঠল অনির্বাণের উদার হাসির লহরকে। তাল কেটে গেল কুন্তলার স্মৃতিচারণে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বস্‌ল ও বেশ কিছু কিছুটা চমকে গিয়ে। বিরক্তিতেও।

বাঁহাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল আর ডানহাতে বাজারের থলে নিয়ে লাল কাঁকরের সরু রাস্তাটা দিয়ে বেশ হন্ হন্ করে এগিয়ে এলেন শিমূলতলার পোষ্টমাস্টার পরিমল সমাদ্দার। পরনে

মালকোঁচা দেওয়া বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ধুতি, গায়ে গলাবন্ধ কালো কোট, পায়ে ক্যাম্বিশের [illegible]তো। জুতোটা এক সময় সাদাই ছিল, এখন ধুলো-কাদা মেখে সেলেটি রঙের হয়ে গেছে। কাছে আসতেই কুন্তলা উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে এল।

শিমূলতলাব নতুনতমা বাসিন্দা হিসেবে যে গুটিকয়েক মানুষেব সঙ্গে কুন্তলার ঠিক আলাপ না হলেও মৌখিক পরিচয় হয়েছিল তাঁরা সবাই 'মাস্টাব'— স্টেশন মাস্টার ভবতোষ মল্লিক, শিমূলতলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার করুণাকমল বাগচি এবং পোস্টমাস্টার পরিমল সমাদ্দার।

: একটা চিঠি ছিল। অবশ্য আপনাদের কারুর নামে ঠিক নয়। কিন্তু ঠিকানাটা এই বাড়ির। চিঠিটা সুহাসিনী রায়েব নামে। কিন্তু ওঁর কোনো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস পোস্ট অফিসে নেই। ভাবলাম আপনাদের হয়ত জানা আছে। আব ঠিকানাটা যখন এই বাড়ির তখন আমার কর্তব্য এখানেই ডেলিভারি করা। নিতাই পিওনকে দিয়েই পাঠাতাম, কিন্তু ভাবলাম বাসায় ফেরার পথে আমিই বরং দিয়ে যাই। ফবেনের চিঠি, জরুরি বলেই মনে হল।

চিঠিটা কুন্তলা হাতে নিল। বেশ ভারি নীল খামটা। এক ডলার দশ সেন্ট টিকিটের ওপর নিউ ইয়র্ক পোস্ট অফিসের মোহরেব ছাপ। তারিখটা প্রায় এক মাস আগের।

অপরিচিতা হলেও সুহাসিনী রায় নামটা কুন্তলার জানা ছিল। বাংলোটা ওনারই ছিল-এই কটা মাস আগেও। অবলোকিতেশ অর্থাৎ কুন্তলার স্বামী এ্যাটর্নি অফিসের মারফৎ বাংলোটা যখন কিনেছিল সেল্‌স এবং ট্রান্‌সফার ডিডে ভদ্রমহিলার নামটা কুন্তলা দেখেছিল। চেনা জানাটা ওই পর্যন্তই। সই সাবুদের সময় ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন না। ওনার দস্তখৎ আইন মাফিক এ্যাটেস্টেড্ করা ছিল। ভদ্রমহিলার সলিসিটার ফার্ম চৌধুরী এণ্ড চৌধুরী মাবফৎই কেনা-বেচাটা হয়েছিল।

ঠিকানাটাও ডিড্‌টার কোথাও হয়ত লেখা ছিল, কিন্তু কুন্তলা অত কিছু লক্ষ্য কবে নি। অবলোকিতেশ হয়ত বা জানতে পারে। কিন্তু অবু আজ সকালেই কলকাতা গেছে হেড অফিসে। খামটা কুন্তলা রেখেই দিল।

: ঠিকানাটা আমারো ঠিক জানা নেই। তবে ও নিশ্চয়ই জানবে। পরশু ও কলকাতা থেকে ফিরবে, ওকেই চিঠিটা দেব। যা করবার ওই করবে।

গেটটা হাট করে খোলাই ছিল। পরিমল সমাদ্দার সাইকেল চেপে বওনা হয়ে গেলেন বাসামুখো। সাইকেল থেকে নেমে গেটটা বন্ধ করার উট্‌কো ঝামেলা নিতে চান নি ভদ্রলোক। কুন্তলা পিছু পিছু এসে বন্ধ করে দিল গেটটা।

বিদেশি পোস্ট অফিসের মোহরের ছাপ দেওয়া এমনি একটা নীল খামেব প্রত্যাশী ছিল কুন্তলা বেশ কিছুকাল ধরেই। অবশ্য মোহবের ছাপটা নিউ ইয়র্কের না হয়ে কেমব্রিজ, ইউ. কে. হবে, এইবকমই আশা ছিল ওর মনে। ইদানীং অবশ্য সেই প্রত্যাশায় অনেকটাই ভাটা পড়েছিল। কিন্তু আজ আবার পবিমল সমাদ্দাবেব হাত থেকে নীল খামটা নিয়ে হঠাৎ সেই পুরনো আশাটা ক্ষণিকেব জন্যে হলেও বেশ রোমাঞ্চিত কবেছিল ওকে।

চিঠিটা ওর নয়। সম্পূর্ণ অকারণেই অচেনা, অজানা, অদেখা সুহাসিনী রায়ের ওপর বেশ হিংসেই হল কুন্তলার। আর সেই সঙ্গে নিজের ওপর করুণা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঠিকানাটার ওপর চেয়ে ছিল ও। সুহাসিনী বায, শিউলিবাড়ি, শিমূলতলা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইণ্ডিযা। খামটার ওপরেব বাঁ কোনায় পত্রপ্রেবকেব ঠিকানা লেখা ছিল—এ, বসু, ৫৭ইস্ট কার্পেন্টার স্ট্রিট, ভ্যালি স্ট্রিম, এন, ওয়াই ১১০০৪৭, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।

এলোমেলো সব চিন্তা মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল কুন্তলার। কে এই এ বসু? অনির্বাণ বসু? তা কি করে হবে, অনির্বাণরা তো সেন। খাঁটি সেনহাটির সেন। আব সুহাসিনী রায়? সেকি আবার রায়পুরের রায়, নাকি বর্ধমানের বায় জামনার? যেখানেরই হোক, অনির্বাণ সেন ও কুন্তলা গুপ্ত, মজুমদারের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। চিঠিটা ও না নিলেই পারত। কিন্তু এই যে সুহাসিনী রায। সম্পর্ক না থাকলেও বাংলোটার মারফৎ একটা যোগসূত্র তো ছিলই ওই নামটার সঙ্গে।

বাংলোটা ওদেব পুরো ফার্নিশড্ কিনতে হয়েছিল। শুধু ফার্নিশ্‌ড্ বললে কম বলা হবে। একেবারে 'লক্ স্টক্ এণ্ড ব্যাবেল' সমেত বাংলোটা ওদের হাতে এসেছিল। সত্যি বলতে কি সই সাবুদ হয়ে যাওয়ার পর চাবির গোছা হাতে নিয়ে শিউলিবাড়ির সদর দরজা খোলাটা ওদেরবে অনেকটা আলিবাবার চিচিং ফাঁক্-এর মতোই অবাক কবে দিয়েছিল। না, হীরে জহরত বা আশরফি মোহবের স্তূপের ওপর পা হড়্‌কে অবশ্য পড়তে হয নি। কিন্তু তবুও অবাক হবার যথেষ্ট কারণ ছিল ওদের। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পরিষ্কার, সবকিছু পরিপাটি সাজানো গোছানো। কাজের মেয়েটা যেন কিছুক্ষণ আগেই সবকিছু ঝাড়পোঁছ, গোছগাছ করে গেছে। শুধু তাই নয়, ওয়াল্ টু ওয়াল মির্জাপুবী কার্পেট পাতা সব ঘবে। বসার ঘরের দেয়ালে ঘসেনের অয়েল, শোবাব ঘরে যামিনী রায়ের পট, খাবাব ঘরে গোপাল ঘোষের ওয়াটার কালার। সব ওবিজিনাল। কুন্তলার মনে হয়েছিল, ও কোনো সদ্য কেনা খালি বাড়ির দখল নিতে আসে নি, এসেছিল যেন কোনো আপনজনের বাড়িতে দেখা সাক্ষাৎ বা গল্পগুজব করতে। গৃহিণী বা গৃহস্বামী হয়ত বা কোনো কারণে সেই মুহূর্তে অনুপস্থিত।

সব কিছুই ছিল শিউলিবাড়িতে। আসবাবপত্র, ফ্রিজ, বিছানা-পাতা ডবলবেড, জানলা দরজায় পর্দা টাঙানো—সব কিছু। এমনকি আলমারিতে কাপড়জামা গোছানো, বুকসেল্ফে বই সাজানো, ফ্রিজে ডিম, মাখন, বরফ, জলের বোতল, কিচেন ক্যাবিনেটে চাল, ডাল, মশলা, নুন, চিনি। একটা সচ্ছল, সচল সংসার ফেলে এক কাপড়ে গৃহকর্ত্রী কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রায় এক বিঘে জমির ওপব লাল টালির আস্তবণেব নিচে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িযে সুপ্রশস্ত বাংলোটা। বেশ ছিমছাম। সামনে পেছনে অনেক শিউলি গাছ। গেট থেকে বাংলো পর্যন্ত লাল কাঁকরের পথটা ঝরা শিউলিব সাদা চাদরে ঢাকা থাকে শীতেব শেষে। মবশুমি ফুলের কেয়ারি করা বাগিচা সবুজ লনটার চাবদিকে ছিটিয়ে ছড়িবে আছে। পলাশ, কদম, বকুল, শিমুল ফুলের গাছগুলো ঘিবে আছে সাবা বাগানটা।

ঘাটশিলা বা গিরিডিতে কোনো বাংলো টাংলো পেলেই হযত সুবিধে হত অবলোকিতেশেব। ওই অঞ্চলেই ওব কাজ। বিলেত থেকে জিওলজিতে ডক্টরেট করে দেশে ফিরেই মনের মতো চাকরিটা ও পেয়ে যায়—ধরিত্রীর গর্ভে লুকিয়ে থাকা খনিজ সম্পদের সন্ধান। মাসের মধ্যে অনেকগুলো দিনই ওকে অবশ্য তাঁবুতে তাঁবুতে কাটাতে হয়। কখনো কোডার্মায, কখনো গিবিডি বা ঘাটশিলার পাহাড় জঙ্গলে। কুন্তলাব মতো "ভালোবাসাব ধন"কে নিয়ে নীড় বাঁধার মতো বৃক্ষশাখাব সন্ধান কিন্তু ও পায়নি ওই অঞ্চলটায় অনেক চেষ্টা সত্বেও। তখন নীড় বাঁধাব তাগিদটা ছিল যথেষ্ট। মুদিযালি রোডের দু'কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় কুন্তলা যে হাঁপিয়ে উঠছিল সেটা কুন্তলা ওকে মুখে না বললেও ওর চোখে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ক্রমশই।

রাঁচিতে কোম্পানির গেস্ট হাউস ছিল। জি. এম. ওকে ওপরতলাটা এ্যালট করেছিল। অবলোকিতেশ রাজি হয নি। গেস্ট হাউস বা জঙ্গল পাহাড়ের তাঁবুতে কুন্তলাকে নিয়ে ঘর বাঁধার কথা ও ঠিক ভাবতে পাবে নি। কুন্তলাকে নিয়ে নীড় বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল ও, বৃক্ষচূড়ায় না হলেও অন্তত বৃক্ষছায়ায ঘেরা এক নৈসর্গিক পবিবেশে।

শিউলিবাড়ি যেন হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল কুন্তলা-অবলোকিতেশকে। শিমূলতলার দিকে

বিশেষ কোনো কাজ থাকে না ওর। কুন্তলার কথায়ই সেদিন ভোরে ঘাটশিলা থেকে শিমূলতলার দিকে রওনা হয়েছিল ওরা জিপে। ছোটবেলায় পুজোর ছুটিতে বার দুই এসেছিল কুন্তলা বাবা-মার সঙ্গে। অনেক দিনের কথা, তবু একটা ভাঙা ভাঙা স্মৃতি ছিল মনে। আগের দিন সন্ধ্যায় কুন্তলা হঠাৎই এসেছিল ঘাটশিলায়। কলকাতায় প্রাণ ওর হাঁপিয়ে উঠছিল। অবুকে ওই বলেছিল, শিমূলতলা তো কাছেপিঠে না হলেও খুব কিছু দূরে নয়। বেশ জায়গা, ওখানে খোঁজ করলে একটা বাড়ি আমরা ঠিক পেয়ে যাব। আর কিছু না হোক, ভাড়াবাড়ি ওখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। আমরা দু-তিনবার পুজোর ছুটি কাটিয়েছি শিমূলতলায়। বাবার একসময় ইচ্ছে ছিল জমি কিনে বাড়ি করবেন শিমূলতলায়। শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি।

অবলোকিতেশ জিপ চালাতেই ব্যস্ত ছিল। শিউলিবাড়ি তাই কুন্তলারই নজরে এল প্রথম। গাড়ি থামিয়ে গেটের সামনে নামতেই "ফর সেল্" লেখা ফলকটা দু'জনেরই চোখে এল। গেটেই লটকানো ছিল ফলকটা। শুধু বাংলোটা নয়, পরিবেশটাও আকর্ষণ করেছিল ওদের দু'জনকেই। গেটে তালা দেওয়া ছিল না। অতএব গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে কোনো অসুবিধে হয় নি ওদের। গেট খোলার আওয়াজে এক সাঁওতাল দম্পতি এগিয়ে এসেছিল ওদের দিকে। কেয়ারটেকারই হবে হয়ত, ভেবেছিল কুন্তলা। সাঁওতাল ছেলেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারা বাড়িটা দেখিয়েছিল ওদের। শুধু বাংলোটা নয়, বাগান, গ্যারাজ, গাছ-গাছালি সব কিছু। শেষে লনে টিপয়, আর চেয়ার পেতে চা-বিস্কুট খাইয়েছিল মেয়েটি বেশ যত্ন করে। পুরো একটি ঘণ্টা কাটিয়ে বিদায় নিয়েছিল ওরা। আসার সময় মেরী অর্থাৎ ওই সাঁওতাল মেয়েটি কুন্তলার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বলেছিল প্রয়োজন হলে ওই কার্ডে লেখা ঠিকানায় যোগাযোগ করতে। কার্ডটায় সুহাসিনী রায়ের পরিচিতি লেখা ছিল না, ছিল চৌধুরী এণ্ড চৌধুরী এ্যাটর্নী অফিসের ঠিকানা—টেম্পল্ চেম্বার্স, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট। টেলিফোন নম্বরটাও ছাপা ছিল কার্ডে। এরপর অফিসের মারফৎ বাংলোটা কেনায় বিশেষ কোনো ঝামেলা হয় নি অবলোকিতেশের। কাগজ-পত্তর তৈরি, সই-সাবুদ, টাকা-পয়সা দেওয়া, আইন মোতাবেক সব কিছুই বেশ নির্বিঘ্নেই হয়ে গিয়েছিল।

খুশি হয়েছিল কুন্তলা। মুদিয়ালির ছোট্ট ফ্ল্যাটের দম আটকানো পরিবেশের পর শিউলিবাড়ির খোলামেলা মুক্ত হাওয়া আর নিবিড় নিস্তব্ধতা ভীষণ আকর্ষণ করেছিল ওকে। বিশেষ করে ওর মনের অবস্থাটা তখন এমনই একটা চাপের মধ্যে ছিল যে কিছুটা ব্যাপ্তি এবং নৈসর্গিক নির্জনতার জন্যে মনটা ওর আকুলি বিকুলি করে উঠেছিল।

অনির্বাণের ওপর রাগে অভিমানে ও ঘৃণায় ক্ষণিকের চিত্ত বিভ্রমে হুট্‌মুট্ করে অবলোকিতেশকে বিয়ে করার পরই একটা বিরক্তিকর গ্লানি ও অপরাধবোধ এক অসহ্য অস্থিরতার ঝড় তুলেছিল ওর মনের গভীরে। কুন্তলার পক্ষে অনির্বাণকে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসা যে সম্ভব নয়, এই সত্য উপলব্ধিটা যখন ওর হল, তখন অবলোকিতেশের সঙ্গে ওর গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। নিজের পায়ে কুড়ুল মারার ব্যথার চেয়ে অনেক বেশি জর্জরিত করেছিল ওকে অন্য একজনের পায়ে কুড়ুল মারার অপরাধবোধটা। অনির্বাণকে না পাওয়ার দুঃখ-হতাশার চেয়ে অনেক বেশি দগ্ধ করছিল ওর মনকে অবলোকিতেশের মতো এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ঠকানোর হঠকারিতাটা। মনের এই উথালপাথাল অবস্থায় কিছুটা নিরালা, নির্জন পরিবেশের মধ্যে নিজের অন্তরাত্মার একটা পূর্ণ সমীক্ষার তাগিদ ছিল ওর মনে। প্রথম দর্শনেই শিউলিবাড়ির পরিবেশটা তাই আকর্ষণ করেছিল কুন্তলাকে।

অপরাধবোধের তাড়না সত্ত্বেও অনেক চেষ্টা করেও অবলোকিতেশকে ভালোবাসতে পারে নি কুন্তলা। যেমন পারে নি বিয়ের আগেও। অথচ কুন্তলাকে কোনোদিনই পাওয়া সম্ভব নয়, এই সত্যটা মেনে নিয়েও অবলোকিতেশ ভালোবেসেছিল কুন্তলাকে। অনির্বাণ, অবলোকিতেশ, কুন্তলা তিন বন্ধু বেশ উচ্ছ্বাস আনন্দে কাটিয়েছে কলেজের বছরগুলো। তিনজনেই ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিল। কুন্তলার ছিল দর্শনে অনার্স, আর্কহটের অতি প্রিয় ছাত্রী ছিল ও। অনির্বাণ অনার্স করেছিল ইংরাজি সাহিত্যে। অবলোকিতেশের সাধনা ছিল জিওলজি।

অনির্বাণ আর অবলোকিতেশ একই জাহাজে বিলেত যায়। একজন কেমব্রিজ আর একজন অক্সফোর্ডে। কুন্তলাকে আর্কহট সাহেব অক্সফোর্ডে রোড্‌স্ স্কলারশিপের জন্যে অ্যাপ্লাই করতে বলেছিলেন। কুন্তলা করে নি। ফিলসফিতে এম এ কোর্স শুরু করে ও দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর চার তলায়।

সময়টা ছিল বাংলা চলচ্চিত্রের রোমান্টিক যুগের। রুপোলি পর্দায় উত্তম সুচিত্রার প্রেমের প্লাবনের মধ্যে ক্লাসিক নাটকের করুণ ট্রাজিক সুর ছিল না, ছিল বৈষ্ণব কাব্যের মন-দোলানো মিস্টি লিরিকের আনন্দ উচ্ছ্বাস। তাই হয়ত কলেজের করিডোরে বা অ্যালবার্ট হলের কফিখানায় অনির্বাণ-কুন্তলার জুড়িকে নিয়ে কেউ রোমিও-জুলিয়েট বলে রসটিপ্পনি কাটেনি। সবাই ওদের উত্তম-সুচিত্রা বলেই হাসাহাসি করত। অনির্বাণের কেমব্রিজে যাওয়ার পর হিংসুটেরা মুখোমুখি হলে চাপা সুরে গাইত · 'আজ দু'জনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে!'

দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্তাও একরকম পাকাই হয়ে গিয়েছিল। অনির্বাণ ডক্টরেট করে ফিরে এলেই বেশ ধুমধাম করে ওদের বিয়েটা হবে। কুন্তলাকে তো অনির্বাণের মা বৌমা বলে ডাকতেও শুরু করে দিয়েছিল ইদানীং। ওঁর অবশ্য খুবই ইচ্ছে ছিল অনি বিয়েটা সেরেই বিলেত যায়। বেঁকে বসেছিল পাত্রী। মুখে বলেছিল এম, এ টা শেষ না করে ও গাঁটছড়া বাঁধবে না। আসলে বিবাহ-উত্তর বিরহের, পেয়ে হারানোর শূন্যতার চেয়ে বিবাহ-পূর্ব বিচ্ছেদের হারিয়ে পাওয়ার প্রত্যাশা অনেক রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল কুন্তলার।

এদিকে অবলোকিতেশও ভালোবেসে ফেলেছিল কুন্তলাকে। তখন অবশ্য কুন্তলা-অনির্বাণের সম্পর্কটা ঠিক দানা বাঁধেনি, মন দেয়া-নেয়ার পালাকীর্তনে পূর্বরাগের আভাসও ঠিক ফুটে ওঠে নি ওদের চেতনায়। কিন্তু দানা যখন বাঁধল, পূর্বরাগে রাঙিয়ে উঠল ওদের মন, তখন অবলোকিতেশের মনটা আর নিজের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কুন্তলাকে ও ভালোবেসে ফেলেছিল ইতিমধ্যেই।

এ নিয়ে ওদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো চিড় ধরে নি। অনির্বাণ জানতেও পারে নি ব্যাপারটা। আন্দাজও করে নি। কুন্তলা জানত। অবলোকিতেশ কিছু না বললেও, কুন্তলা অনুভব করেছিল অবলোকিতেশের না-বলা প্রেমের অনুরণন।

অবলোকিতেশকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। কুন্তলার খুবই কাছের মানুষ ছিল ও। অনির্বাণের মতোই ওরও খুব নিবিড় সম্পর্ক ছিল কুন্তলার সঙ্গে, সেই কলেজ জীবনের শুরু থেকেই। নিবিড় সম্পর্কের দাঁড়িপাল্লাটা একদিন যখন অনির্বাণের দিকে সুনিশ্চিত ভাবে ঝুঁকে পড়ল, অবলোকিতেশের মন তখন বিনা মূল্যেই বিকিয়ে গেছে। ব্যথা পেলেও ব্যথিত করে নি ও ওদের দু'জনকে। হাসিমুখেই সবকিছু মেনে নিয়েছিল।

নীল খামটা হাতে নিয়ে হেমন্তের হাল্কা রোদ্দুরে গা ভাসিয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল কুন্তলা। বিদেশি ডাকমোহরের ছাপ দেয়া ঠিক এমনি নীল খাম কুন্তলাও একটা সময় অনেক পেয়েছে। তারপর হঠাৎই একদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরিচিত নীল খামের স্রোত। তারপর অনেক, অনেক নীল খামের টোপ ফেলেও আর একটিও নীল খাম ভেসে আসে নি ওর কাছে।

প্রত্যাশিত নীল খামের প্রেরক ডক্টর অনির্বাণ সেনের দেশে ফেরাটাও শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে নি। কিন্তু যে মানুষটা না ফিরলেও কুন্তলাকে নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ের যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না, সেই ডক্টর অবলোকিতেশ মজুমদার একদিন ফিরে এল। আর ওর কাছ থেকেই নীল খামের খরস্রোতা নদীকে বাঁধ দিয়ে গতিরুদ্ধ করার রহস্যটা জানতে পারে কুন্তলা।

মেয়েটি আইরিশ। নাম ক্যাথরিন ওহারা। লালচে বাদামি কেশ আর শ্যাওলা-সবুজ আঁখি কড়া আইরিশ হুইস্কি ‘বুস্‌নেলের’ তীব্র নেশার মতো আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল অনির্বাণকে। সাতদিনের পরিচয়ে অন্তঃসত্বা হয় ক্যাথরিন। চোদ্দদিনের মাথায় ওদের বিয়ে হয়ে যায়। মাস দুই হল ওদের একটা মেয়েও হয়েছে। ডক্টর অনির্বাণ সেন আপাতত ডাবলিন ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ স্টাডিজে রীডার। ক্যাথরিনের পিতৃব্য বিশ্ববিদ্যালয়টির ট্রাস্টিদের মধ্যে একজন।

হয়ত ভুতেই পেয়েছিল কুন্তলাকে। রাগে, ঘৃণায়, অভিমানে দিশেহারা হয়ে উঠেছিল ও। চোখের জল মুছে অবলোকিতেশকে বলেছিল কুন্তলা:

তুমি তো আমায় ভালোবাসো অবু। তবে কীসের দ্বিধা।

এখানেও, অবলোকিতেশ ফিরে আসার চোদ্দ দিনের মাথায়ই, কুন্তলার বিয়ে হয়ে যায় ডক্টর অবলোকিতেশ মজুমদারের সঙ্গে। সানাই বাজিয়ে ধুমধাম করে নয়। রেজিস্ট্রি করে।

ভূতাত্ত্বিক অবলোকিতেশ মজুমদার হাতে স্বর্গ পেলেও সেটা যে কাচের স্বর্গ, সে নিয়ে ওর মনে যেমন কোনো দ্বিধা ছিল না, ঠিক তেমনিই আক্ষেপও ছিল না। কুন্তলাকে চেয়েছিল ও। কিন্তু পাবার স্বপ্ন কোনোদিন দেখে নি। তাই অপ্রাপ্য স্বর্গ হাতে পেয়ে সেটা কাচের কি সোনার, তা নিয়ে ওর কোনো অনুযোগ ছিল না। বরং পুলকিতই হয়েছিল। ওর বৈজ্ঞানিক মন ভাগ্যে ঠিক বিশ্বাস না করলেও, নিজের সৌভাগ্যকে ও অস্বীকারও করতে পারেনি। মাত্র কটা দিনের মধ্যে মনের মতো কাজ, বহু আকাঙ্খিত জীবন-সঙ্গিনী পাওয়াই অনেক পাওয়া। এখন একটা মনের মতো ঘরও পাওয়া গেল। সৌভাগ্যকে মানতেই হয়।

* * * * *

বিমান ডাকের পাতলা খামের স্বল্প পরিসরে অতগুলো পাতা বেশ চাপ সৃষ্টি করার ফলে খামের মুখটা অনেকটাই খুলে খুলে এসেছিল। খুব লোভ হচ্ছিল কুন্তলার পাতাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে। ডেক্ চেয়ারে গা এলিয়ে খামটা নাড়াচাড়া করতে করতে বাঁ কোণে আলতো ভাবে আটকে থাকা মুখটা শেষ পর্যন্ত খুলেই গেল। গঁদ দিয়ে খামের মুখটা সাঁটার কথাও একবার ভেবেছিল ও। কিন্তু ঠিক পড়ার মতো না পড়লেও চিঠিটার ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেবার কৌতূহলটা ও আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। দু'আঙুলে একটু চাপ দিতেই মুখটা বেশ ফাঁক হয়ে গেল। কুন্তলা উঁকি দিল ভেতরটায়। গোটা গোটা হরফে লেখা পরিষ্কার বাংলা শব্দমালা ভেসে এল ওর চোখে। বুকটা কেমন জানি ছ্যাঁৎ করে উঠল হঠাৎ। লেখার ধাঁচটা ভীষণই মেলে অনির্বাণের হাতের লেখার সঙ্গে। আঙুল ঢুকিয়ে চিঠিটা বেরই করে ফেলল কুন্তলা। সাদা বণ্ড পেপারের ওপর নীল কালির সুডোল আঁচড়গুলো যে অনির্বাণের হাতের টানে নয়, সেটা বুঝেও বুঝতে চাইল না কুন্তলা। শেষ পাতায় পত্রলেখকের নামটাও এক লহমায় ও পড়ে নিল আগেভাগেই। অনির্বাণ নয়, অনিমেষ।

সম্পূর্ণ অপরিচিত ভদ্রলোক। সম্পূর্ণ অপরিচিতা ভদ্রমহিলা, যাঁকে চিঠিটা লেখা হয়েছে। চিঠিটা পড়ার কোনো সুসঙ্গত কারণ ছিল না কুন্তলার। আবার ছিলও হয়ত বা। পাতাগুলোর স্পর্শে একটা মিষ্টি রোমাণ্টিক সুরের মূর্ছনা দোলা দিয়েছিল ওর মনে। এমনি কালির আঁচড়ের সুডোল অক্ষরে ভরা কয়েকটা পাতার প্রতীক্ষা ছিল ওর অনেক অনেক দিনের। নামে কী আসে যায়। কুন্তলাই কি আর সেই কুন্তলা আছে। সেদিনের কুন্তলা গুপ্তর তো কুন্তী সেন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়ে গেল মিসেস মজুমদার। আজ এই হেমন্তের মিঠে রোদ্দুরের নরম উষ্ণতায় আর পলাশ শিউলির মোহাচ্ছন্ন ছায়ায় কিছুটা সময় যদি ও অজানা, অচেনা সুহাসিনী রায় হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কি।

সব দ্বিধা, সব সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে পড়তে শুরু করল কুন্তলা।

দুই

অনল আর ভাস্বতীর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল রকফেলার সেণ্টারে। রবিশঙ্করের সেতার শুনতে গিয়েছিলাম। রাগ—হংসধ্বনি। রাগটা এর আগে যে শুনি নি তা নয়। যতদূর মনে পড়ে, শেষ শুনেছিলাম বোধহয় ডোভার লেন মিউজিক কন্‌ফারেন্সে। সে রাতের জলসায় আপনিও এসেছিলেন পরমেশের সঙ্গে। সোনালি হাসির ওপর সাদা সুতোর কাজ করা তসরের শাড়ি পরেছিলেন আপনি। ব্লাউজটা চোখে পড়ে নি, তার কারণ পশ্‌মিনা শাল ছিল আপনার গায়ে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল সেবার কলকাতায়।

না, যা বলছিলাম। বাজনা শুনে ফেরার মুখে লবিতে দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। ছুটিটা দেশে কাটিয়ে গত শনিবার ওরা নিউ জার্সিতে ফিরেছে। ভাস্বতীর মুখেই শুনলাম আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল স্কটিশের রি ইউনিয়নে। আরো শুনলাম আপনি নাকি শিমূলতলার পাট উঠিয়ে ফেলছেন। শিউলিবাড়ি বেচে ফেলবার মৎলব করেছেন। আপনার মাস খানেক আগে পাওয়া চিঠিতে এমন কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস কিন্তু পাই নি। আবার গা ঢাকা দিচ্ছেন? তা দিন, কিন্তু দেখবেন শিমূলতলা থেকে বকুলতলা বা বেলতলা যেখানেই ঘর বাঁধুন, ঠিকানাটা কিন্তু অধীনকে ক্ষমাঘেন্না করে জানাবেন। চিঠি লেখার অধিকারটুকু ছাড়া আর কোনো অধিকারের দাবী মঞ্জুর করায় আপনার অনীহা আমি তো হাসিমুখেই মেনে নিয়েছি। কারণটা আজ আপনাকে বলেই ফেলি। আসলে এ বিষয়ে আমার একটা নিজস্ব দর্শনবোধ আছে। না পাওয়ার নৈরাশ্যে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে চাওয়ার রাশ টেনে রাখলে মনটা ঝলসে যায় ঠিকই, কিন্তু দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণার চেয়ে সেটা অনেক সহনীয়।

কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম। অনল আর ভাস্বতী সে রাতটা আমার ওখানেই কাটিয়ে যায়। পণ্ডিত মশাই-এর সেতার শোনার পর 'সাব্‌দি'তে পান এবং নৈশ ভোজনের পর বেশ রাতই হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু পরদিন রোববার।

অনল ভাস্বতী ঠিক সেই রকমই আছে। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের নায়ক নায়িকা। মুহূর্তের অদর্শনে হৃদয় ওদের ‘উথলিয়া ওঠে’ এখনো। চার ঘণ্টার বাকি রাতটুকুও ওরা আলাদা শুতে রাজি হল না। আপনি তো জানেন শোবার ঘর আমার একটাই, কিন্তু গতরে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের তিনটে ঘরের সমানে। ঢালাও বিছানা পেতে তিন বন্ধুতে দিব্যি শুয়ে শুয়ে গ্যাঁজানো যেত। তোপচাচির বাংলোর হলঘরটায় আপনার, পরমেশের, আমার রাত কাটানোটা মনে পড়ে? চারটে ঘণ্টা আমরা অতসী চালিহা আর বাচ্চু ধরের সেক্স লাইফ আলোচনা করে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে শেষ পর্যন্ত আমার বেডরুমটা ওদের দিতে হল আর আমি উঠে এলাম অ্যাটিকে, যেখানে এক ঝড়বৃষ্টির রাতে আপনাকেও নিরুপায় হয়ে কাটাতে হয়েছিল। তখন অবশ্য বুঝতে পারি নি যে আপনি ‘ভিলেজের’ মায়া কাটিয়ে অলরেডি অ্যা রুট্ টু শিমূলতলা। তুষার ঝড়ের দাপটে ফ্লাইট্ ক্যানসেল্ হওয়ার ফলেই আপনার সেই স্টপ্ ওভার লং আইল্যাণ্ডের ভ্যালি স্ট্রিমে। বুঝতে দেন নি কিছুই। কেনেডি এয়ারপোর্টের লকারে জমা দিয়ে এসেছিলেন আপনার মালপত্তর। আমাকে বলেছিলেন এদিকে এসেছিলেন কাজে, লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেস ওয়েতে বরফের দৌরাত্ম্যে ম্যান্‌হাটনে আউট্ অফ্ বাউণ্ডস্

টু ভিকিউলার ট্রাফিক। অগত্যা।

এত কথা অবশ্য বলার প্রয়োজন ছিল না, সবই আপনাব জানা। কিন্তু বলতে হল ওই অ্যাটিকে আপনারই মতো আমার হঠাৎ রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাটুকুর জন্যে। জানেন, আপনার সেই রাত কাটানোর পর ছাদের কোণে ওই ছোট্ট ঘরটায় আমাব প্রবেশ এই প্রথম। আশ্চর্য, সব কিছু ঠিক সেই রকমই আছে, আপনি যেমন রেখে গিয়েছিলেন। বুড়ি মেড্‌টা মাসে একটা দিন চাবি খুলে ডাস্টিং করে যায় ঠিকই, কিন্তু এদিক-ওদিক করে নি কোনো কিছুই। হ্যাঙ্গার, আমার বাত্রিবাসটা, যেটা আপনি সেই রাত্তিরের জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন, আমার দেয়া নতুন টুথ্‌ব্রাশ, পেস্ট ক্লসেটের মধ্যে, ঠিক যেমনি আপনি রেখে গিয়েছিলেন। এমনকি ছোট টেবিলটায় আমার সেই কবিতার খাতাটাও, যেটা পড়তে পড়তে এক সময় শুয়ে পড়েছিলেন আপনি। যে পাতাটা আপনি পড়ছিলেন সেটার ওপর চাপা ছিল পেপার ওয়েটের বদলে গ্রীণউইচ্ অ্যাপ্যার্টমেন্টের আপনাব ভাগেব চাবিটা।

পাতাটা খোলাই ছিল। পড়ে ফেললাম:

জীবন জরিপ মনের হিসেব
গজ কাঠি দিয়ে অথবা নিক্তি ওজনে
প্রেমের মূল্য আর কতদিন
যাচাই চলবে বল না মিত্রা
অঙ্কে অঙ্কে লুব্ধ হৃদয়
আর কত সুদ গুনবে।
আর কত কাল, আব কত যুগ
আব কত শত লক্ষ বছব
হৃদয়-স্লেটের বুক চিরে চিরে
হিসেব-নিকেশ কষবে।
এ আঁক কখনো মেলে নি মিত্রা
কখনো মেলে নি, কারুর মেলে নি
বলি শোনো আমি ভুলেব অঙ্ক
ভুল থেকে যায় চিরকাল—

বাকিটা তো তুমি উদ্ধৃত করেছ তোমার শেষ চিঠিটায়। তাই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দেখুন, হঠাৎই 'তুমি' এসে গেল কলমের ডগায়। কবিতাটিরই অনুরণন হয়ত বা। তাই কাটাকুটি আর করলাম না। আর্যপ্রয়োগ মেনে নিলে এটা না হয কাব্য প্রয়োগ বলেই মেনেই নিলেন।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে অনল-ভাস্বতীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে আড্ডা দিলাম। আড্ডা মানে ফেলে আসা দিনের সুখস্মৃতিব রোমন্থন। বেশ একটা কষা-মিস্টি ভিন্‌টেজ স্যাম্পেনের স্বাদ পেবেছিলাম। পরমেশ-পূর্ব সুহাসিনী রাযের একটা চিত্তাকর্যক প্রোফাইল পেলাম আপনাবই ডাগুাস্ হস্টেলের রুমমেট ভাস্বতী ভট্টাচার্য নী সেনগুপ্তর মুখ থেকে।

হ্যাঁ ভালো কথা, ডাব্‌লিনে যাচ্ছি তিনদিনের জন্যে একটা সেমিনারে। অনেকদিন দেশে যাই নি, ভাবছি এই সুযোগে আর দু'পা এগিয়ে 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা' করে এলে মন্দ হয় না।

শিমুলতলায় যাবার আপনাব স্ট্যাণ্ডিং ইনিভিটিশান আমি কিন্তু ভুলি নি। কলকাতায় একবাব গিযে উঠতে পারলে শিমুলতলা আব কতদুর। ইন্‌ভিটিশান উইথড্র করতে চাইলে করতে পাবেন। এখনো ডাব্‌লিনেব প্রোগ্রামটা পাকা হয় নি।

আজ এই পর্যন্তই। ভালোবাসা জানালাম না, কারণ ওটা ঠিক জানাবার বস্তু নয়। অনুভূতিব এলাকায় পড়ে ও ব্যাপারটা। বরং ভালো থাকুন, এই শুভেচ্ছাই জানালাম।

—অনিমেষ

পুনশ্চ : ভাস্বতীর মুখেই শুনলাম, আমার লেখা বেশ কয়েকটা চিঠি ওকে আপনি পড়ে শুনিয়েছেন, অবশ্য পত্রলেখকের নাম গোপন করেই। চিঠিব কাপিরাইট, যে লেখে তার না হয়ে যাকে লেখা হয় তার থাকে বলেই আমার আপত্তি বা স্বীকৃতিব প্রশ্ন ওঠে না। তা না উঠুক, কিন্তু আপনি তো জানতাম কয়েন কালেক্ট কবেন। যাদুঘরে একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কয়েনের প্রদর্শনীতে আপনি একবার মেডেল পেয়েছিলেন বলেও জানি। বাদশাহী আমলের মোহরও আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনার সংগ্রহে। তা, আর্বজনা জমাতে শুরু করলেন কবে থেকে?

—অনিমেষ

বার দুই চিঠিটা পড়ে ফেলল কুন্তলা। প্রথমটা এক ঝলকে, দ্বিতীয়বার ধীরে ধীরে, গরম ভালো চাযে চুমুক দিয়ে স্বাদ-আঘ্রাণ নিঙড়ে নেয় যেমন টি-টেস্টারে। চিঠিটা খামের মধ্যে সযত্নে ঢুকিয়ে শোবাব ঘরের দেরাজে রেখে, আবার এসে বসল কুন্তলা রোদ্দুবে পা ডুবিয়ে। এক বাশ কৌতূহল কিলবিল করে ঘুবছিল ওব মাথায়। অনির্বাণের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে ডাবলিনে। ওকে হয়ত আগে থেকেই চেনে। না চিনলেও এবাব নিশ্চয়ই চেনা-পরিচয়টা হবে। হাজার হোক দু'জনেই বাঙালি। আব কটা বাঙালিই বা থাকে ডাব্‌লিনে। একরত্তি তো জায়গাটা। না গেলেও ডাব্‌লিন যে লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক বা কলকাতা নয় সেটা কুন্তলা জানে। এই কৌতূহলটা না মিটতেই অন্য আর একটা কৌতূহল উঁকি দিয়ে গেল মনে। আবর্জনা? অর্থাৎ সুহাসিনীকে লেখা অনিমেষের সমগ্র পত্র সংগ্রহ। আছে নাকি সেগুলো এ বাড়ির কোনো দেরাজ বা আলমারিতে বা কোথাও বাক্সবন্দী হযে! বই-পত্তর জামা-কাপড় সব কিছুই তো ফেলে ভদ্রমহিলা উধাও হয়েছিলেন। চিঠিগুলের মায়াও কি কাটিয়ে উঠতে পেবেছিলেন সুহাসিনী রায়? যাবার আগে যে উনি ওগুলো পুড়িয়ে বা ছিঁড়ে জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেন নি, সে বিষয় কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না পেলেও কুন্তলা কেন জানি না নিশ্চিত হয়েছিল ওগুলো আছে। মাত্র চারটে পাতাই তো ও পড়েছিল। কিন্তু ওর মধ্যেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল একটি ধাবাবাহিক রচনার সমগ্র পাণ্ডুলিপিটির। সুহাসিনী বায়েব উদ্দেশ্যেই নিবেদিত সেই পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পরিচ্ছেদ, কারুর পক্ষেই, অমন একান্ত নিজস্ব সম্পদ, নষ্ট করা সম্ভবপর বলে মনে হয় নি কুন্তলার।

আব এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতেই বেশ অস্থির হয়ে উঠল ও। একটা ধারাবাহিক চিত্তাকর্ষক রচনার শেষ দিকের চারটে পাতা পড়ে সবটুকু পড়ার আগ্রহ জেঁকে বসল ওর মনে।

ক'দিনই বা এসেছে ওরা শিউলিবাড়িতে। সব কিছু নিজেদের মতো করে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পায় নি ওরা। ভদ্রমহিলার ফেলে যাওয়া, ওদেব কাছে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, জামাকাপড়, বাক্স-প্যাঁট্রা ইত্যাদি ছোট ঘরটাব এক পাশে গাদা কবে রেখেছিল। অবলোকিতেশ বলেছিল, অফিসের ট্রাক যেদিন কলকাতায় যাবে ওগুলো পাঠিয়ে দেবে চৌধুরী এণ্ড চৌধুরী সলিসিটার ফার্মের দফতরে। বেশ কটা ট্রাঙ্ক ছিল জিনিস বোঝাই। তালা না থাকলেও খুলে দেখার কোনো ইচ্ছে হয় নি কুন্তলার। অবলোকিতেশেব অফিসের লোকেরা, যাবা এসেছিল বাড়িটা পরিষ্কাব করে একটু গোছগাছ করায় সাহায্য করতে, তাদেব দিয়েই অপ্রয়োজনীয ফার্নিচার আর টুকিটাকি জিনিস ছোট ঘরটায় সরিযে রেখেছিল কুন্তলা। ইন্‌ভেন্টারি নেওয়া তো দূবের কথা, জিনিসপত্তবগুলোর ওপর একবার চোখ বোলানোও হয়ে ওঠেনি কুন্তলার, ইচ্ছেই হয নি।

চিঠিটা পড়ার পব সব কিছুই ওলট-পালট হয়ে গেল মনেব মধ্যে। এখন শুধু ইচ্ছেই নয়, অদম্য একটা উৎসাহ এল সব কিছু খুঁটিয়ে খাটিয়ে দেখার। অপঠিত পাণ্ডুলিপির উদ্ধাবের আশায়।

আশার সঙ্গে আশঙ্কাও ছিল। বাদশাহী মোহরের কালেক্‌শানটাও নিশ্চয়ই সুহাসিনী রায় ফেলে যান নি। চিঠিব বাণ্ডিলটাও সেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের হবে না। অনিমেষ বসুব দর্শনবোধ না পাওয়ার হতাশাব ব্যথার চেয়ে না চাওয়ার সংযমশীলতা মেনে নেওয়াটা অনেক কম বেদনার—যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এখন আব কোনো উপায নেই কুন্তলাব। চাওয়ার বাণটা ওর গণ্ডিব থেকে অনেক আগেই উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

হতাশাব ব্যথা পেতে হয় নি কুন্তলাকে,

এমনকি ধাতু-বিজ্ঞানী অবলোকিতেশ মজুমদারের মতো লেয়ারের পর লেয়ার মাটি কেটে খনিজ পদার্থ উদ্ধারের পরিশ্রমও করতে হয় নি ওকে। প্রথম ট্রাঙ্কটার ডালা খুলতেই নীলাম্বু অতলান্তিক থেকে ভেসে আসা নীল খামের বান আছড়ে পড়ল কুন্তলার উল্লসিত দু'চোখে।

* * * *

বেলা বেশ ছোট হয়ে এসেছে।

সূর্যের উত্তরায়ণ যাত্রার প্রস্তুতি। আকাশে দিনের শুভ্র বৈধব্য সন্ধ্যার প্রজ্বলিত চিতায় ক্রমশই বিলীন হয়ে আসছে। সিঁদুরের রং ধরেছে পশ্চিম দিগন্তে। কুন্তলা মাথার কাছে জানলাটা বন্ধ করে উলের একটা আলোয়ান. জড়িয়ে বেশ আরাম করে খাটে এসে গা এলিয়ে দিল। পিঠের নিচে তাকিয়াটা রেখে আধশোয়া অবস্থায় নীল খামের একটা বাণ্ডিল কোলের কাছে টেনে নিল ও। বাঁদিকে টিপয়'র ওপর চায়ের কাপ রেখে গিয়েছিল মেরী। অনেকগুলো বাণ্ডিলের মধ্যে যেটা সবচাইতে পুরনো বলে মনে হয়েছিল সেইটাই ও ট্রাঙ্ক থেকে বের করে খাটের ওপর রেখেছিল মেরী কাজে আসবার আগেই।

পরের চিঠি পড়ার সঙ্কোচ অনেকটাই ততক্ষণে কেটে গিয়েছিল ওর মন থেকে। চিঠিগুলোকে ঠিক চিঠি বলে ভাবতে পারছিল না বলেই আপন-পর বিভেদটাও খুব একটা বিব্রত করে নি ওকে। ওর কাছে এখন চিঠিগুলো যেন কোনো ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। 'চুম্বক' অংশটা আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল ওর। এখন গোটা অংশটা হাতে পেয়ে সবটুকু না পড়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিল না।

বাণ্ডিল খুলে প্রথম চিঠিটা পড়তে শুরু করে দিল কুন্তলা।

তিন

দিন দুই আগেই আপনাকে একটা চিঠি পোস্ট করেছি। অতএব এ মাসে আপনাকে আমার চিঠি লেখার কোটাটা শেষই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কাল আপনার প্রশ্নবহুল চিঠিটা পেয়ে স্কুলের ছেলের হাতে অঙ্ক পরীক্ষার সহজ প্রশ্নপত্র পাওয়ার মতো মনের অবস্থা হল আমার। জানেন, সারা জীবনটাই শক্ত শক্ত সব প্রশ্নের সামনে হতে হয়েছে আমায়। কোনোটার উত্তরই আমার জানা থাকত না। আপনার চিঠির সব প্রশ্নের উত্তরগুলি জানা থাকায় স্কুলের ছাত্রের মতো তড়িঘড়ি জবাব দেবার লোভটা সামলাতে পারলাম না।

পরীক্ষায় কোনোদিন একশ'র মধ্যে একশ পাওয়ার দুরাশা আমার ছিল না। আজ কিন্তু আপনার প্রশ্নপত্রের সঠিক উত্তরে সেটাই আমার প্রাপ্য।

গ্রীণউইচের ক্ষুদে এ্যাপার্টমেন্টটা, যেখানে আপনি আর পরমেশ থাকতেন, সেখানে এখন কে থাকে—এটাই আপনার প্রথম জিজ্ঞাসা। উত্তর: রাত্তির বেলায় পরমেশ আর কাকলি। দিনের বেলায় পরমেশ আর তার ছবির ক্যানভাস। পরমেশ ওখানে বসে ছবি আঁকে, সেতার বাজায়, জ্যাক্ ড্যানিয়েল পান করে আর প্যাকেটের পর প্যাকেট 'ক্যামেল' ফোঁকে। কাকলি সে সময়টা লং আইল্যাণ্ড এক্সপ্রেসওয়ের একটা মোটেলের বালেস্ক হলে নেচেকুদে খদ্দেরদের মনোরঞ্জন করে। কাকলি মানে কুকু মালহোত্রা। একটা সময় পার্ক স্ট্রিটের 'ম্যাগ্‌সে' ক্রুনার ছিল। পরে পল থোবার্ন নামে এক অ্যাংলোকে বিয়ে করে কুকু থোবার্ন হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছে অনেক দিন। কুকু এখন কাকলি হয়ে পরমেশের জিম্মায় আছে। অবশ্য কে কার জিম্মায় আছে সেটা হলফ করে বলতে পারি না। কুকু মালহোত্রাকে ম্যাগ্‌সে আমি আগেই দেখেছি। আপনিও নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। তখন তো ও তল্লাটে দাপিয়ে বেড়িয়েছি আমরা। তবে কুকু বা কাকলির মা যে বাঙালি ছিলেন সেটা আমার আগে জানা ছিল না। পরমেশের কাছ থেকেই পরে জেনেছি। হ্যাঁ, ওই রকমই আছে পরমেশ। আবোল-তাবোল ছবি আঁকছে আর সেতারে জিন্সবার্গের কবিতায় সুর দিয়ে চলেছে। কিছুটা আসুরিক চেষ্টায়। মাঝে মধ্যে যাই ওখানে উইকএণ্ডে। দু'পাত্তর জ্যাক্ ড্যানিয়েল চড়িয়ে আসি। সন্ধের দিকে গেলে কাকলির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় অনেক সময়।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা অনিমেষ কেন্দ্রিক। অতএব উত্তরটাও একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর হবে। না, কবিতা আর বড় একটা লেখা হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে দু'একটা লাইন মনের মধ্যে ঘুরঘুর যে না করে তা নয়, তবে ঠিক জমাট বাঁধে না। লাইনগুলো টুকে রেখে দিই অনেক সময় ভবিষ্যতে পূর্ণ অবয়বটিকে ধরার আকাঙ্খায়। এমনিই ভাসা-ভাসা দু'একটা পঙ্‌ক্তি। কাল রাত্তিরে আপনার চিঠিটা পড়ার পর ঘুমের বেশ ব্যাঘাত করেছিল। শোনাতে আমার কোনো বাধা নেই :

সুহাসিনী:

তোমাকে ভুলি নি
অনেক সমুদ্র দূরে
অন্য এক আকাশের বুকে
তোমাকে দেখেছি আমি
শতভিষা নক্ষত্রের মতো
লজ্জা-ঢাকা চটুল দৃষ্টিতে।

আমার কাব্যের নায়িকা সুহাসিনী না হয়ে বনলতা সেন হলেও 'আপনি' সম্বোধন করার মতো শৈলী চতুরতা আমার নেই। 'আপনি'কে আপন করার রচনা-মাধুর্য ছিল জীবনানন্দর কলমে। আমার কলম অনেক অনেক বেশি ভোঁতা।

দেশে ফেরার মতলব আছে কিনা আপনার তৃতীয় জিজ্ঞাস্য। সত্যি কথা বলতে কি এই মুহূর্তে তেমন কোনো টান অনুভব করছি না। নাড়ির টান তো অনেকদিন কেটে গেছে, আপনি জানেন। অন্তরঙ্গ যারা ছিল, আছে বা আছেন, তারা বেশিরভাগই এদিক-ওদিক ছিটিয়ে-ছড়িয়ে আছে। নৈকট্যের অভাবে অন্তরঙ্গতার টানও অনেক শিথিল হয়ে এসেছে। অবশ্য বলতে পারেন এখানের টানটাই বা কিসের? বলব, নিবিড় শূন্যতার। মন এখানে কোনো টানের আশা করে না, ওখানে করে। কেউ না টানলে ওখানে যেতে মন মানে না (অভিমান বলতে পারেন)। এখানে তেমন কোনো মান অভিমানের পালা কীর্তনের অপেক্ষায় থাকে না মন। শূন্যের মধ্যে নিঃসঙ্গতা অনেক সহনীয়। কিন্তু চেনা মিছিলের মধ্যে বাস করে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকার যন্ত্রণা আমার কাছে অসহনীয় হবে বলেই মনে হয়।

বলুন না, আপনিই বা শিমুলতলার শূন্য নিঃসঙ্গতাকে বরণ করে নিলেন কেন? আপনার তো নাড়ির টান থেকে শুরু করে আত্মীয়-কুটুমের ভালোবাসার টান, কিছুরই অভাব ছিল না হ্যারিংটন স্ট্রিটের সাতমহলা বাড়িতে। তবে কেন আপনার এই স্বেচ্ছা নির্বাসন? মানি, পরমেশের টান আপনি অনুভব করলেও পরমেশ আপনাকে টেনে রাখতে পারে নি। পরমেশরা কাউকেই টেনে রাখতে পারে না। ওদের যেমন আশ্চর্য আকর্ষণের ক্ষমতা থাকে, তেমনিই বিকর্ষণের শক্তি। বরং বেশিই বলব। অমন নিপাট সৃজনী শক্তি, আমি খুব কম চিত্রশিল্পীর মধ্যেই দেখেছি। কিন্তু তবুও বলব। ওর ছবির চমৎকারিত্বে আমি বিস্মিত হলেও, ঠিক মুগ্ধ হই না। আপনারা তখন 'ভিলেজে' থাকতেন। পরমেশ সেই সময় আমায় একটা ছবি দিয়েছিল, ছবিটার নাম 'ক্রিয়েশন'। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবিটা আমি স্টাডি করেছি। সৃষ্টির মধ্যে এমন অনাসৃষ্টির রূপ দেওয়ার অদম্য প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত বেশ উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল আমাকে। পরে ভেবে দেখেছি ছবিটা পরমেশের সেল্‌ফ পোর্ট্রেট। পরমেশরা সব কিছুর মধ্যেই নিজেকে দেখতে চায়, নিজেকে পেতে চায়। আপনাদের গরমিলটা ওইখানেই। সুহাসিনী রায় পলিমাটির তাল নয়। তাকে ঠিক ছাঁচে ফেলা সম্ভব নয়। কেষ্টনগরের মৃৎশিল্পী পালেরাও পারবে না।

আপনাদের অন্তঃপুরে অনধিকার প্রবেশের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনীয়। ইচ্ছাকৃত নয় এ অঘটনটা। আলোচনায় এসে গেল। তবে এসেই যখন গেছে তখন আরো একটু এগিয়ে যাবার লোভ সামলাতে

আকর্ষণীয় বই-২০০১

অনন্য সচিত্র কিশোর গল্প সঙ্কলন
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও উত্তম ঘোষ সম্পাদিত
হীরা পান্না চুনি ৫০৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও উত্তম ঘোষ সম্পাদিত
কিশোর গল্প সম্ভার ৫০৲
ছোটদের জন্য আকর্ষণীয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই
সমীরণ আচার্য
বিজ্ঞানের ধাঁধা ২৫৲
বাংলার সেরা রূপকথা ৪০৲
বাংলাসাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকদের চিরায়ত রূপকথার সচিত্র সংকলন।
ভূতের নামে ভয় ৪০৲
বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখকদের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক গল্পের সচিত্র সংকলন।
নব ও অগ্রণী সাক্ষরদের জন্যে
ডাঃ শান্তিগোপাল সাহা ও বিকাশকান্তি সাহা
সাপের কামড় ও তার চিকিৎসা ১৬৲
কীটপতঙ্গের দংশন ও তার চিকিৎসা ১৫৲
জলাতঙ্ক রোগ ও তার চিকিৎসা ১৫৲
কনকতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়
রোগ প্রতিকারে ভেষজের ব্যবহার ১৬৲
মানুষ ও পরিবেশ ১২৲
সুতপা মুখোপাধ্যায়
পঞ্চায়েতে নারী ১৫৲
শিশু শ্রমিক ১২৲
রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি ১২৲
সাতন পণ্ডিত ১০৲
অমিতাভ বিশ্বাস
জানার আনন্দ ১৫৲
বিকাশকান্তি সাহার
রহস্যময় জীবজগৎ ২৫৲
অ্যানিম্যাল ক্যুইজ ১৫৲

রঞ্জন ভাদুড়ী ও বিমল দাস
দুই মলাটে দেদার মজা ৩০৲
সমীরণ দত্তগুপ্ত
শতাব্দীর আলোয় মুণ্ডা বিদ্রোহ ৫০৲
গান্ধীজীবনী অবলম্বনে ক্লাসিক সাহিত্য সৃষ্টি
সুবোধ ঘোষের
অমৃতপথযাত্রী ৭০৲
সন্তোষকুমার ঘোষ-এর
পাঁচটি উপন্যাস ১২৫৲
গবেষণামূলক রেফারেন্স গ্রন্থসম্ভার
ডঃ শিবশঙ্কর পাল-এর
সুবোধ ঘোষের ছোট গল্পে মানবিক মূল্যবোধ ১০০৲
অশোক দাশগুপ্তের
ভারতে ইসলাম ৮০৲
বংশী মান্নার
ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস ৮০৲
দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীচৈতন্য ঃ অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ ৫০৲
রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান ৬০৲
খারাপ মেয়ের কথা ৯০৲
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের গোয়েন্দাগিরি ৪০৲
ডঃ তপন ঘোষালের
একাঙ্ক নাট্যগোষ্ঠী ও নাটকের চালচিত্র ১৫০৲
প্রসঙ্গ ঃ নাট্য সমালোচনা ১৪০৲
ডঃ বিষ্ণু বসু ভূমিকা লিখেছেন
চিরায়ত বিশ্ব সাহিত্য
নোবেলজয়ী সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১৪০৲
এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর
ফাইভ মাস্টারপীসেস ১৬০৲
জনপ্রিয় বিশ্ব-সাহিত্যের অনুবাদ গ্রন্থসম্ভার
গত ৩০ বছর ধরে বেস্ট সেলার তালিকার শীর্ষে যে লেখক সেই—
ফ্রেডরিক ফরসাইথ-এর
ফোর গ্রেট থ্রিলার্স ১৬০৲

সুবর্ণা প্রকাশনী ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

পারছি না। নিউ ইয়র্ক ছাড়াটা আপনাব হার। এমন একটা সুন্দব কাজ করছিলেন আপনি ডবল্‌ডে পাবলিসিং-এ। ভিলেজটাই তো গোটা নিউ ইয়র্ক নয়। সেণ্ট্রাল পার্ক ইস্ট -এ থাকার মতো রেস্তো ছিল আপনার। পরমেশের ওপব অভিমান বা রাগ করে অথবা বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিউ ইযর্ক থেকে উধাও হয়ে গেলেন আপনি। এমন একটা ভীরু সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার মতো দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিত্বর পক্ষে কী কবে সম্ভব হল সেটা আজ বুঝে উঠতে পারি নি।

বুঝতে পারছি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললাম। বিনা অনুমতিতে আপনাদের অন্তঃপুরের খাসমহলে ঢোকাটা আমার অন্যায় হয়েছে।

তবে সাহসটা বোধহয় আপনিই জুগিয়েছেন। আপনিই তো আমায় প্রতি চিঠিতেই, এমনকি এটিতেও—স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেব একট বঙ্কিম ইঙ্গিত দিযে থাকেন, সেটাও তো আমার অন্দবমহল। অতএব শোধবোধ।

দু'দিন আগেই আপনাকে বেশ একটা লম্বা চিঠি দিযেছি। এটাও বেশ বড় হয়ে গেল। এখানেই দাঁড়ি টানবার ইচ্ছে থাকলেও আপনাকে একটা সুসংবাদ, বিকল্পে দুঃসংবাদ, অন্যথায় মজার খবর, না দিযে পারছি না। আমার একটা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। ভদ্রমহিলা দীর্ঘাঙ্গিনী, কৃষ্ণকায। সুদুর রোডেসিয়ায় জন্ম হযেছিল ছাব্বিশটা বসন্ত বা শীতের আগে। অধুনা নিউ ইয়র্ক বাসী। সঙ্গীত নিয়ে রিসার্চ করছেন আমাদের কলেজে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতে আসেন, আমার অ্যাপার্টমেণ্টে একরকম প্রায প্রতি সন্ধ্যায়ই বলা চলে। গুন্ গুন্ করে গেয়েও ফেলেন কখনো কখনো। বেশ সুরেলা গলা। আপনার ওই টেপ্‌টা সেদিন শোনালাম. "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে"। ভদ্রমহিলার স্বামী স্লোন কেটিং হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক। প্রথম প্রজন্মের মার্কিন। সাবেকি বেলজিযান। সত্যি বলতে কি, ভদ্রমহিলা অলরেডি আমায় 'আই লাভ ইউ' বলে ফেলেছেন। আমি অবশ্য এখনো 'অহি লাভ ইউ টু'- টা বলে ফেলি নি। ঠিক অভ্যাস নেই তো, তাই। আপনি যে হাসছেন সেটা বেশ আমি বুঝতে পারছি। আমিও। শুভেচ্ছান্তে—

—অনিমেষ

তৃতীয় চিঠিটার প্রথম পাতার কিছুটা পড়েই কুন্তলা থেমে গেল। এ যেন একুশ পাতার পর সাতচল্লিশ পাতা পড়াব মতো, তারপব সাতানব্বই বা এগারো পাতা। বেশ বিরক্তিকব। চিঠিগুলো তারিখ অনুসাবে পবপর গুছিয়ে না নিলে কাহিনীটা কেমন যেন অসংলগ্ন হয়ে যাচ্ছে। শুধু বস নয়, শাঁসটাও ঠিক জমাট বাঁধছে না। ছবির পর্দায় প্রথম রিলটা দেখার পর পঞ্চম রিল দেখার মতো।

চিঠির কাঁড়ি নিয়ে বাছতে বসল কুন্তলা খাটের ওপর। অবশ্য ভদ্রমহিলা কিছুটা কাজ এগিয়েই রেখেছিলেন। এক-একটা বাণ্ডিল এক-একটা বছবের। দিন আব মাসের পর্যায়ক্রম অনুসারে পাতাগুলো সাজিয়ে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হল না। পুরো কাহিনীর বিন্যাসে কিছুটা ফাঁক অবশ্য থেকেই গেল। নায়িকার মনের প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন পড়ার কোনো উপায় ছিল না কুন্তলার। সেগুলো হয়ত ভ্যালি স্ট্রিমের কোনো অ্যাপার্টমেণ্টে দেরাজবন্দী হযে আছে কুন্তলার নাগালের বাইরে। কিছুটা হলেও খুব একটা বিঘ্ন ঘটায় নি। অনিমেষের বিস্তাবিত আশ্চর্য বিবরণীর মধ্যে অনেক সময়ই সুহাসিনীব ভাষ্যের কিছু কিছু অনুলিপি এমনকি উদ্ধৃতিও ছিল। অন্তত প্রথম দুটি চিঠি সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে। লোকটার পেশা সম্বন্ধে একটা ভাসা-ভাসা আভাস পেলেও কুন্তলার মনে হয়েছিল, অধ্যাপনা বা গবেষণা করা অনিমেষ বসুর জীবিকা হলেও, লেখক হওয়াই হযত উচিত ছিল ওঁব।

* * * *

ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিযে মেরী ডেকে গেল কুন্তলাকে। চিঠিগুলো মাথাব বালিশের এক পাশে বেখে খেতে বসল কুন্তলা। ফোনটা ঠিক তক্ষুনিই এল। অবলোকিতেশের ফোন। মামুলি কথাবার্তা, কুশল জিজ্ঞাসা ও ভালোবাসা জানানো। সুহাসিনী রায়ের ঠিকানা ওর জানা আছে কিনা প্রশ্ন করেছিল কুন্তলা। জানা নেই শুনে অ্যার্টনী অফিস থেকে দেখে নিতে বলেছিল। অবলোকিতেশেব হযত আরো কিছুক্ষণ কথা বলাব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কুন্তলার মন পড়েছিল অন্য কোথাও। ভালোবাসাটা ফোনেও ঠিকমতো জানাতে পাবল না। কুশল জানিয়েই ইতি টানল।

খেতে খেতে কথাটা হঠাৎই মনে হল। মেরী সামনেই দাঁড়িযে ছিল। কুন্তলা জিজ্ঞেস করল, আগেব মেম সাহেবের কাছে ও কাজ করত কিনা। কবত জেনে একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল মাথার মধ্যে। আধঘণ্টা মেরীর সঙ্গে কথা বলার পবও রহস্যময়ী সুহাসিনী রায় বহস্যেব অন্তরালেই থেকে গেলেন। ভদ্রমহিলা খুব একটা কথাবার্তা বলতেন না। বই পড়তেন, লেখালেখি করতেন আব গান শুনতেন। সন্ধ্যা হলে রেল লাইনেব ওপারে নদীব ধারে গিযে বসতেন। একা একা বসে গান গাইতেন ওখানে। বাড়িতে কিন্তু গান শুনতেন, গাইতেন না কখনো। আরো একটা খবর পেয়েছিল কুন্তলা মেবীর কাছ থেকে। আর সেই খববটা বহস্য উদ্ঘাটনের বদলে ঘনীভূত করেছিল সুহাসিনী বাযকে ঘেবা রহস্যের জালকে। সাইকেলে চেপে প্রায়ই উনি যেতেন চিংড়ার সাঁওতালপল্লীতে। বিশেষ কবে পূর্ণিমাব রাতে। মহুয়ার রস খেয়ে মাথায় পলাশ ফুল গুঁজে মাদলের তালে তালে সাঁওতালদের সঙ্গে নাচতেন উনি। ধাবিয়া ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেত। ধারিয়ার কাছে মেবী শুনেছে এসব। প্রথমটা ও বিশ্বাসই করে নি। কিন্তু শ্রাবণ পূর্ণিমাব রাতে নিজে একবার গিয়ে দেখেও এসেছিল সবকিছু স্বচক্ষে।

মেরী নিজে সাঁওতাল হলেও সাঁওতালী জীবনযাত্রা থেকে ছোটবেলা থেকেই সবে এসেছিল ও। মিশনারী মেমদের কাছে মানুয হয়েছে ও। কিছুটা লেখাপড়াও শিখেছে। ও আর ওর মরদ, কেউই সাঁওতাল পল্লীতে থাকে না। শিউলিবাড়ির পেছনের লনেব শেষ কোনায যে গাড়িহীন গ্যারেজটা ছিল সেটাই ওদের আস্তানা, আজ পাঁচ ছ-বছরের ওপর। অবশ্য গ্যারেজটা আর গ্যারেজ নেই অনেকদিন। ঠিক আউট হাউস না হলেও ছোট্ট একটা সংসার বেশ গুছিয়ে থাকতে পাবে ওখানে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিকিয়ে চুকিযে রেখেছিল ওবা ঘরটা, সেই সুহাসিনী রায়ের আমল থেকেই।

খাওযার পাট চুকিয়ে খাটে এসে বসল যখন কুন্তলা তখন ন'টা বেজে গেছে। অনিমেষের চিঠিতে খুব স্পষ্ট না হলেও সুহাসিনী রায়েব ব্যক্তিত্বের কিছুটা আভাস পেয়েছিল ও। মেরীর কথায ভদ্রমহিলাব চরিত্রের সম্পূর্ণ আলাদা একটা দিক বেশ গুলিযে দিল সুহাসিনীব সম্বন্ধে ওর ভাসা-ভাসা ধাবণাটাকে। মাথাব কাছে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বেলে সিন্‌থেটিক উলের নরম গোলা কম্বলটা গা'এর ওপরে টেনে সুহাসিনী রাযে লেখা অনিমেষ বসুব প্রথম পত্রটি চোখের সামনে মেলে ধবল কুন্তলা।

নিউ ইযর্ক। ২৭'এ মার্চ, ১৯৭০। অর্থাৎ প্রায বছব তিনেক আগের লেখা।

* * * *

ডাকটিকিটেব পয়সা, লেখার পরিশ্রম, পুষ্প পিসিমার পবেশবাবার পায় পুজো পাওযা, ব্যঞ্জন বর্ণমালার প্রায় একবিংশতি 'প' বর্ণটির এমন একটা শিরামী সঙ্কলন শেয পর্যন্ত বৃথা হবে কিনা তাই ভাবছি।

আপনি তো ডুব দিলেন, নাকি গা ঢাক দিলেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে কর্পূরের মতো হঠাৎই উবে গেলেন। পরমেশকে না জানানোব একটা যুক্তিযুক্ত কারণ হয়ত চেষ্টা-চরিত্তির করে আন্দাজ করে নিতে পারি। কিন্তু পরমেশের পব পাপেব শাস্তিটা আমাদের কেন ভুগতে হবে তা কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ পেলাম না। পবমেশে ওপর বাগে, ঘৃণায, পুরুষ জাতটার ওপরই বীতশ্রদ্ধ

হয়ে গেলেন নাকি? তাই যদি হয়, তাহলে পারমিতা, পুষ্প পিসিমা, ভাস্বতী, লিলিয়ান এবং আপনার আরো অনেক অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের দোষটা কোথায়। কাউকেই একটা ঠিকানাও দিয়ে গেলেন না। হঠাৎ এতই পর হয়ে গেলাম আমরা? আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা হয়ত কিছুটা গোলমেলে বলে আপনার মনে একটা সন্দেহ এখনো দানা বেঁধে থাকতে পারে। কিন্তু এরা সবাই?

বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন আপনি আমাদের। পুষ্প পিসিমা সত্যি-সত্যিই পরেশবাবার পায়ে পুজো দিয়েছেন আপনার অমঙ্গলের আশঙ্কায়। ভাস্বতী আপনার কলকাতার বাড়িতে ফোন প্রায় কবেই ফেলেছিল। আমরাই বাধা দিলাম এই ভয়ে যে ওখানেও হয়ত আপনি যান নি বা কোনো খরচ পাঠান নি। সে ক্ষেত্রে ওঁদের খুবই উৎকণ্ঠিত করা হবে। আপনার পার্সোনাল সেক্রেটারি মিসেস ব্রিগ্‌সকেও ফোন করেছিল পারমিতা, ও কিছু বলতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত ডবল্‌ডের ডেভিড সেফার্ডকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর ফোনে পাকড়াও করি মার্থাস ভাইনইয়ার্ডে। ছুটি কাটাচ্ছিল ডেভ্‌ ওখানে। ওর কাছ থেকেই শিমূলতলার ঠিকানাটা উদ্ধার করলাম আমি। শিমূলতলায় যে আপনাদেব একটা বাংলো আছে সেটা অবশ্য আমি বা আমরা কলেজ জীবন থেকেই জানতাম। তবে নিউ ইয়র্কের গ্রীনউইচ ভিলেজ থেকে একেবারে মফস্বল স্টেশান শিমূলতলায় আপনি নির্বাসন নেবেন এটা আমরা কেউ আন্দাজ করতে পারি নি। আন্দামান, করসিকা, সেন্ট হেলেনা কী দোষ করল? আন্দামানে তো বাংলাই চলে বলে শুনেছি। আর মেডিটেরিয়ানের দ্বীপেও আপনার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। ফরাসি, গ্রীক— দুটো ভাষাই তো আপনার জানা।

একটা অনুরোধ আছে। আমার চিঠির উত্তর দেবেন কিনা জানি না, দিলে কৃতার্থ না হলেও খুশি হব। অন্যথায় মর্মাহত না হলেও ব্যথা পেতে পারি। কিন্তু পুষ্প পিসিমাকে একটা চিঠি অবশ্যই দেবেন। আপনি তো জানেনই আপনার মধ্যেই উনি ওনাব মৃত কন্যা করুণাকে খুঁজে পেয়েছেন। বৃদ্ধাকে আর শাস্তি নাই বা দিলেন। উপদেশ দিচ্ছি না, অনুরোধ করছি।

এখানের খবব? আমেরিকা চলছে, ডিস্‌পাইট রিচার্ড নিক্সন। হারভার্ড কিসিঞ্জারকে বিশেষ মিস করছে বলে মনে হয় না। স্যাননহার্ট সরগরম। উডি অ্যালেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। জ্যাকসন হাইট্‌সে একটা তেলেভাজাব দোকান খুলেছে হাব্‌বার হাওড়া নয়) অতীন ঘোষ। প্রভুপাদের মার্কিনী শিষ্য-শিষ্যারা মাথা মুড়িয়ে, টিকি নাচিয়ে 'হরে কৃষ্ণ' কীর্তন চালিয়ে যাচ্ছে ফিফ্‌থ এভিনিউর ওপর। গ্রেটা গার্বো কালো চশমা এঁটে মুড়িসুড়ি দিয়ে ফিফ্‌থ এভিনিউর ফ্ল্যাট থেকে হেঁটে, হেঁটে মিউজিয়ামে মডার্ন আর্টে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের ছবি দেখছেন প্রায়শই। আর আমরা আপনার বিহনে গাভীহারা বৎসর মতো দিশাহারা হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরমেশ ভালোই আছে। ছবি আঁকছে। মাল টানছে। আব সেতার বাজাচ্ছে।

ব্যাপারটা আপনার কাছে চেপেই যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু অনেক ভেবে দেখলাম, আমাব ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনার কোনোকিছুই কেন জানি না আপনার কাছে কোনোদিনই লুকোইনি। এর জন্য পবে হয়ত বেশ লজ্জাও পেয়েছি অনেক সময়। কথায় আছে না, কারুর পোষমাস, কারুর সর্বনাশ।

এক্ষেত্রে অবশ্য আপনার সর্বনাশ হওয়ার পরই আমার পোষমাস আসার একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমিও দর্জিপাড়াব রোয়াকে আড্ডা মারা ছেলে। নিউ ইয়র্কে পোষ মাসটাই যে সর্বনাশ, গত চার-চারটে শীতে সেটা তো লিটারালি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। অতএব টোপটা ইচ্ছে থাকলেও গিললাম না।

খুলেই বলি ঘটনাটা। আপনার গোপন ডেরার হদিশ দেওয়ার সাথে সাথেই ডেভ্‌ আমাকে ডবল্‌ডে আপনার শূন্যস্থান পূর্ণ করার অফারটা দিয়েছিল। বলেছিল, আমার সম্প্রতি 'টাইম্‌স লিটারারি সাপ্লিমেন্টে'র রিভিউ আর 'নিউ ইয়র্কারে' লেখাগুলো নিয়ে বেশ ক'মাস ধরেই নাকি ওদের বোর্ড মিটিং-এ আলোচনা হয়েছে। আমি ইনটারেস্টেড কিনা জানতে চেয়েছিল ডেভ্‌। অস্বীকার করব না, খুবই লোভ হয়েছিল। এন্‌ ওয়াই. ইউ-তে যে ছাতার কাজটা করছি, তাতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার। মাস্টারি করাটা ঠিক আমাব ধাতে নেই। পাঁচটা কাগজে এই লেখালিখিগুলো না করলে আমিও হয়ত কবে আপনার মতো সীতারামপুর বা চাঁইবাসা গোছেব বি. এন. বা ই. আই. আর লাইনের কোনো ছোট্ট ইস্টিশানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতাম।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোভটা সম্বরণই করলাম। এমনকি গুচ্ছের বেতন এবং পার্কস্‌-এর টান সামলাতে দিন-দুপুরে চার চারটে লার্জ জ্যাক্‌ ড্যানিয়েল উদরস্থ করে নিয়ে 'না' বলেছিলাম।

কারণ? আপনি। আর কত হারব বলতে পারেন আপনার কাছে? বি.এ অনার্সে তিন নম্বরে এগিয়ে গেলেন আপনি। এম. এ.-তে তো কাছাকাছিই যেতে পারলাম না। সেকেণ্ড হলেও সেই একই অবস্থা। আমার কপালে অলওয়েজ দি ব্রাইড্‌স মেড, নেভার দি প্রাইড। তবুও ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় যে আপনার কাছে পর পব দু'বারই হেরে গেছি, তার একটা মনকে সান্ত্বনা দেবার মতো অজুহাত আমার কাছে ছিল। পরীক্ষার মুখে ন'টার শো-এ সিনেমা দেখা কমিয়ে পড়াশুনোর সময়টা একটু কমিয়ে পড়াশুনোয় সময়টা একটু বেশি দেওয়া উচিত ছিল আমার। সত্যিই স্টেজে মেরে দেব প্রবৃত্তি একটু দমন করা উচিত ছিল আমার। বিশেষ করে লড়াইটা যখন আপনার মতো একজন দুঁদে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। কিন্তু পাবলিশিং ফিল্ডে আপনার যে নামডাক সেখানে আমি নাক গলাতে যাব কোন সাহসে? কাজটা একরকম চালিয়ে নিতে পারতাম না তা নয়, কিন্তু আপনার মতো নিখুঁত দক্ষতায় কখনোই না। দু'পাঁচটা কবিতা আর প্রবন্ধ ছাপিয়ে লেখক না বললেও লেখার হাত আছে এমন মন্তব্য কেউ কেউ হয়ত করেছেন। কিন্তু লেখকের 'হেডস্যার' অর্থাৎ সম্পাদক হওয়ার যোগ্যতা আমাব কোথায়? আপনি হয়ত বলবেন, সে বিচার তো করবে যারা আমাকে দায়িত্বটা দিচ্ছে তাবা। ঠিক। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে আপনার দক্ষতার মাপকাঠিতে আমার যাচাই হবে সবসময়ই। আব সেখানে: হি ইজ ওকে। বাট দেন সুহাসিনী রায় ইজ সুহাসিনী রায়। তাই না? না, জেনেশুনে আবার আমি হারতে চাই না আপনার কাছে। ভালোবাসার লোকের কাছে হারাটাই জিৎ, এমনি একটা দার্শনিক মন্তব্য আমিও শুনেছি। আমাব দর্শনবাদ কিছুটা ভিন্ন। নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমি রাজি, কিন্তু বিকিয়ে দিতে নয়।

মোদ্দা কথা ডেভ্‌কে আমি 'না' করে দিয়েছি।

চিঠির একটা চটজলদি জবাব পাব, এমনি একটা উচ্চাশা নিয়ে এখানেই শেষ করলাম।

—অনিমেষ

পুনশ্চ : আপনাকে বেশ ক'দিন দেখি নি। দীপক বায়ের সেই কবিতাটাই বার বার মনে হচ্ছে:

"শীতের সিঁড়িতে বসে, বসে আছি
আমি:
সময় পাও না তুমি—
তুমি যদি আসো, আমার আকাশে
একটু সূর্য ওঠে
সংঘমিত্রা, বাগ কবেছ বুঝি?"

চার

চিঠিটা পড়া শেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল কুন্তলা। চিঠির বাণ্ডিলগুলো বিছানার এক পাশেই পড়ে রইল। ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল ওব চোখ দুটো। ভোর রাত্তিরেব দিকে কেমন যেন রাঙিয়ে উঠছিল ওর মন।

স্বপ্ন দেখছিল কুন্তলা। রাশি বাশি মিস্টি-মধুর

চিঠির স্বপ্ন, যা ওব অবচেতনায় জমা হয়েছিল এতদিন। কিছু কিছু যেন পড়া; আবার না পড়া নতুন চিঠিও অনেক। হাতের লেখাটা তো অনির্বাণেরই। কুন্তীকে লিখেছে অনি কেমব্রিজ থেকে। কিন্তু ভাষাটা যেন ভীষণই অনিমেষ ঘেঁষা। পাহাড়ের কোল বয়ে ঝিরঝিরে ঝর্ণার স্রোতের মতো—স্বচ্ছ, মুক্ত, ছন্দময়। কিন্তু পুরো চিঠি কোনোটাই নয়। টুকরো টুকরো অনেক চিঠিব সংকলন:

"কদিনই বা এসেছি। অথচ মনে হয় অনেক দিন তোমায় দেখি নি কুন্তী। সময়ের দীর্ঘতা বা স্বল্পতা ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টে মাপা যায় না। মনের পাতায় সময়ের হিসেবটা বেশ একটু অন্যরকম। "দুদণ্ড শান্তির" প্রত্যাশায় সেখানে সত্যিই 'হাজার বছর ধরে' পথ হাঁটতে হয়। মনে আছে লেকের পুব কোনায় সেই বেঞ্চিটায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তোমার সঙ্গে কাটিযে মনে হয়েছে মাত্র কটা মুহূর্তই বা তোমার সঙ্গ পেলাম। আর আজ কেমব্রিজের ক্যাম্পাসের অনতিদূর নদীর পুলে একা দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে দমদম এয়ারপোর্টে সাতদিন আগে দেখা মুখটা যেন সাত বছর আগে লেকের সেই বেঞ্চিটায দেখেছি।

তোমাব তো অজানা নয় কুন্তী, প্রাক্‌-কুন্তলা যুগে কলকাতার কংক্রীটের জঙ্গলে শাপভ্রষ্ট অনির্বাণ মৌমাছি হয়ে উড়ে বেড়াত। ফুলের বং-রসে মোহাচ্ছন্ন মৌমাছিটা মধু খেয়ে বেড়াত ফুলে ফুলে।

তারপর এক মাঘী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে হেদুয়ার তীরে শাপভ্রষ্টা ঋষিকন্যা মানবী কুন্তলার ওষ্ঠস্পর্শে মৌমাছি ফিরে পেল তার মনুষ্যত্ব। পারিজাতকে আঁকড়ে ধরে বাহারী ফুলের রং-রস ভুলে গেল মৌমাছির খোলস-ত্যাগী মুক্ত পুরুষ অনির্বাণ।

শিবনাথের চিঠিতে দুঃসংবাদটা পেলাম। হীরেনদা পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। হীরেনদাব সেই গানটার কথা ভীষণ মনে পড়ছে আজ। আকাশ সেদিন ভেঙে পড়েছিল বর্ষার কলকাতায়। টালিগঞ্জ ব্রিজের পশ্চিম কোলে হীরেনদার তিনতলাব ফ্ল্যাটে তুমি আর আমি কলেজ পালিয়ে এসেছি। লেকে যাবার উপায় ছিল না সেই ভেজা দুপুরটায়। গান লিখছিলেন হীরেনদা, তুলসীদাস ছবির গান। শোনালেন আমাদের:

লিখিনু যে লিপিখানি
প্রিয়তমারে—
সঞ্চিত যত আশা
যত মধু ভালাবাসা—

কিছুতেই আর মনে পড়ছে না পবের লাইনগুলো। হেমন্তদার রেকর্ড আছে গানটার। একটা টেপ করে পাঠিয়ে দিও।

টুকরো টুকরো অনেক চিঠির অংশ। অসংলগ্ন। একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো সংযোগ নেই, স্বপ্নের সঙ্গে ভেসে ভেসে আসছিল। স্বপ্ন ভঙ্গ হল শেষ চিঠির কবিতায়:

কুন্তলিনী,
তোমাকে ভুলিনি।
অনেক সমুদ্র দূরে—
অন্য এক আকাশের বুকে
তোমাকে দেখেছি আমি
শতভিষা নক্ষত্রের মতো
লজ্জা ঢাকা চটুল দৃষ্টিতে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল কুন্তলা বিছানায়। অনির্বাণ কখনো কবিতা লেখে নি। আর এ কবিতাটা তো অনিমেষের। সুহাসিনী রায়কে লেখা। কুন্তলা, কুন্তলা, কুন্তলিনীকে নয়। ওকি এতক্ষণ তাহলে সুহাসিনীকে লেখা অনিমেষের চিঠি পড়ছিল স্বপ্নে?

বিছানায় ছড়ানো অনিমেষের, স্বপ্নের নয় বাস্তবের, রক্তমাংসের না হলেও কাগজে কলমের চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে মাথার কাছে টেবিলটার ওপব রেখে কুন্তলা মুখ চোখ ধুতে বাথরুমে ঢুকল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। হাল্কা একটা উলের শালে শবীরটাকে ঢেকে বারান্দায় বেরুলো ও মেরীকে ডাকতে। বারান্দায়ই দেখা হয়ে গেল মেরীর সঙ্গে। চা বানাতেই আসছিল মেরী। পুবের বারান্দায় নরম রোদ্দুরের ছোঁয়া এসেছে সবে। বেতের চেয়ারটা টেনে পুব বারান্দাযই বসল কুন্তলা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে চিঠিগুলোর কথা ভাবছিল ও। অনির্বাণের স্বপ্নে পড়া চিঠি আর অনিমেষেব কাগজে-কলমের পড়া না-পড়া চিঠিগুলোর কথা। স্বপ্নের চিঠিগুলো ইতিমধ্যে অনেকটা ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। সব চিঠিগুলো মনে করতে পারছে না কুন্তলা কিন্তু শেষ কবিতার চিঠিটা জ্বলজ্বল করছিল তখনো চোখের ওপর। বিশেষ করে প্রথম দুটো লাইন:

কুন্তলিনী
তোমাকে ভুলিনি—

আজও মনে পড়ে কুন্তলাব। লাইটহাউসে কি একটা ছবি দেখে স্কাইরুমে না ব্লু ফক্সে খেতে ঢুকেছিল ওবা। কুন্তী বলেই ডাকত অনির্বাণ ওকে। সেদিনই প্রথম কুন্তলিনী বলে ডেকে বসে চমকে দিয়েছিল অনির্বাণ ওকে। কুন্তলীন শব্দের মধ্যে বিলম্বিত লয়ের ছন্দময়তা আছে। যেমন আছে সাদামাটা সাবেকি সুহাসিনী নামের মধ্যেও। কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিল কুন্তলা অনিমেষের সুহাসিনী আব অনির্বাণের কুন্তলিনীব মধ্যে মিলটুকু পেয়ে। কিছুটা এবং কিছুক্ষণের জন্যেই। নিষ্ঠুর বাস্তব চিন্তা সব কিছুই উল্টেপাল্টে দিল পর মুহূর্তেই। কুন্তলিনী তো অনির্বাণের হতে পারে নি। কুন্তলাকে গ্রহণই করেনি অনির্বাণ। কিন্তু তবুও মিলটা তো থেকেই গেছে। সুহাসিনীও তো কই অনিমেষের হতে পারে নি।

চিঠিগুলো টানছিল কুন্তলাকে। দু'কাপ চা শেষ করে উঠে পড়ল কুন্তলা। বিছানার ধারে টেবিলের ওপর থেকে চিঠির বাণ্ডিলগুলো নিয়ে আবার এসে বসল ও পুবের বারান্দায। ততক্ষণে বোদ্দুরের লুটোপুটি শুরু হয়ে গেছে পুবমুখো বারান্দাটায়। ইউক্যালিপ্‌টাসের সবুজ পাতাব ফাঁক দিয়ে শীতের ন্যাড়া কৃষ্ণচূড়ার মাথা ডিঙিয়ে সোনাগলা রোদ কিছুটা উষ্ণতার প্রলেপ দিয়েছে হেমন্তের সকালকে।

প্রথম আর শেষ চিঠি কুন্তলার পড়া হয়ে গিযেছে। আর শেষের দিকের একটা কি দুটো চিঠি। কাহিনীব একটা আবছা, আবছা কাঠামো ভেসে উঠেছে মনে। এবাব ও দ্বিতীয় চিঠিটা না খুলে চিঠির বাণ্ডিলগুলো থেকে ঠিক মাঝখানে রাখা একটা চিঠি বেছে নিল। খাম থেকে চিঠিটা বার করার আগেই গেট খোলাব শব্দে মুখ তুলে তাকাল কুন্তলা। একটি আদিবাসী মেয়ে, সাঁওতাল বা মুণ্ডাও হতে পারে—তিন-চাব বছরের একটা উদোম ন্যাংটো ছেলের হাত ধরে এগিযে আসছে গেট থেকে টানা লাল সুবকির সরু পথ ধবে। তেল-চুকচুকে ঘন কালো চুলের পরিপাটি করে বাঁধা মস্ত খোঁপাটা প্রায ঘাড ছুঁযে আছে। খোঁপায গোঁজা টকটকে লাল ফুল—পলাশ বা মোরগঝুঁটি, ওই জাতীয় কিছু হবে। ক্ষারে কাচা পরিষ্কার লালপেড়ে শাড়ি হাঁটু থেকে ডান কাঁধ পর্যন্ত মসৃণ কালো পাথবে কোঁদা শবীরটাকে আঁটোসাঁটো ভাবে জড়িয়ে আছে। বারান্দায় ওঠার তিন ধাপের সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপটায় এসে বসল মেয়েটি। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কুন্তলা, মেয়েটিব কাঁখে ছিল ছোটো একটা মাটির কলসি জাতীয় পাত্র। সেটা বারান্দার মেঝেতে নামিয়ে বাখতেই চোখে পড়ল কুন্তলার। উদোম ছেলেটার হাত ধরা ছিল ততক্ষণ। সিঁড়ির ধাপে বসে ওর হাত ছেড়ে দিতেই একটা কাঠবিড়ালিকে তাড়া করে ছুটে গেল বাগানের ওদিকটায়।

কুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটা। সম্পূর্ণ নির্বাক। ঘড়ি দেখে নি কুন্তলা। কিন্তু মনে হল প্রায় মিনিট দুই হল বসে আছে মেয়েটা ঠাণ্ডা সিঁড়ির ধাপে। নিশ্চুপ।

আশেপাশে মেরীকেও দেখতে পেল না কুন্তলা। ও গেছে ওদের গ্যারেজ বাড়িতে। মরদকে ভাত

বেঁধে দেয় মেরী এই সময়। মিশন হোমে চৌকিদারির কাজে যায় ওর মরদ আটটা বাজার আগেই। মুখ খুলতে কুন্তলাকেই হল অগত্যা:

: কী চাও তুমি? ওটার মধ্যে কী এনেছ?

আঙুল দেখাল কুন্তলা ছোট মাটির পাত্রর দিকে।

ভাঙা, ভাঙা হিন্দি বাংলো আর নিজস্ব ভাষা মিশিয়ে মেয়েটি যা উত্তর দিল, তা জলের মতো পরিষ্কার না হলেও খুব একটা অবোধ্য হল না কুন্তলার কাছে। চিংড়া পল্লীর ধারিয়ার বৌ মেয়েটি। ধারিয়া নাকি দুমকায় গিয়েছিল পুজোর পর কাজের ধান্দায়। কাল ফিরেছে। সাইকেল মেমসাহেব অনেকদিন হল ওদের ওদিকে যায় নি। তাজা মহুয়ার রস আছে কলসিটায়। ধারিয়ার জ্বর হয়েছে। সাইকলে মেমসাহেবের জন্যে তাই ও-ই নিয়ে এল রসটুকু।

মেরী এসে পড়ায় অনেকটা স্বস্তি বোধ কবলে কুন্তলা। মেরীর জিম্মায় মেয়েটিকে রেখে ও উঠে ভেতরে গেল। ভেতরে গিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে একটা পুরনো সাদামাটা গরম র‍্যাপার হাতে ফিরে এল ও। মেবীর হাতে র‍্যাপারটা দিয়ে উদোম ছেলেটার গায়ে জড়িয়ে দিতে বলল ও। তারপর দশটা টাকা মেয়েটির হাতে দিয়ে ছেলেটাকে হাট থেকে একটা জামা কিনে দিতে বলল।

মেরী অবশ্য ততক্ষণে সুহাসিনীর অনুপস্থিতির কিছু একটা ব্যাখ্যা শুনিয়েছিল মেয়েটিকে, আর সেই সঙ্গে নতুন মেমসাহেবের উপস্থিতির কারণটুকুও। এই মেমসাহেবের মরদ আছে। 'বিয়া' করা মরদ। আগের মেম সাহেবের মতো একা নন উনি।

মহুযাব ভাঁড়টা রেখেই দিল কুন্তলা। পয়সা দিতে গিয়েছিল, নেয় নি মেয়েটি। তবুও একরকম জোর করেই কটা টাকা গুঁজে দিয়েছিল কুন্তলা ওর হাতে, ছেলেটাকে বিস্কুট-টিস্কুট কিছু একটা কিনে দেবার জন্যে। মেরীকে বলেছিল ওকে বলতে যে ধারিয়া সেরে উঠলে একবার দেখা করে যায় যেন। সুহাসিনীকে জানার কৌতূহল ও চেপে রাখতে পারে নি। কোথায় উধাও হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা?

চিঠি নিয়ে আর সেই মুহূর্তে বসা হল না কুন্তলার। ব্রেকফাস্ট সেরে স্নান করে আসতেই প্রায় দুপুর গড়িয়ে এল। মহুয়া খাবেই, মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল ও। কলেজ জীবনে অনির্বাণ অবলোকিতেশদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে বীয়ার খেয়েছে ও। একবার অনির্বাণের অনুরোধে ছোটো এক পেগ্ হুইস্কিও নিয়েছিল অনির্বাণ অবলোকিতেশের বঁ ভোইয়াজ হল্লা পার্টিতে মহুয়ার মাদক তেজ সম্বন্ধে কিছুটা শঙ্কা না ছিল যে তা নয়। কিন্তু একা একা মাতাল হলেই বা কি, এই মনে করে দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠেছিল। সুহাসিনী রায়ের মতো একজন বিদগ্ধ সফিস্টিকেট, নিউইয়র্ক বাসিনী মহিলার রুচিতে যখন বাধে নি, তখন ওর রুচিতেও বাধবে না বলেই ওর বিশ্বাস। কিছুটা 'দেবদাস' হবার একটা ক্ষীণ ইচ্ছে প্রায়ই উঁকি দিয়ে যেত ওর মনে আজকাল। আবার নিজের মনে হেসেই উড়িয়ে দিত ওসব মেলোড্রামাটিক হাল্কা চিন্তা।

বিয়েতে পাওয়া একটা ক্রিস্টালের কাট্-গ্লাসে দু'টুকরো বরফের ওপর দু'আঙুল মহুয়ার রস ঢালল কুন্তলা। গন্ধটা মোটেই ভালো লাগল না। একটা পাতি লেবুর রস নিঙড়ে কিছুটা সহনীয করে নিল গন্ধটা। তারপব চুমুক দিল। বিস্বাদ লাগল জিবে। সেতো হুইস্কিও লেগেছিল। তার চেয়ে মোটেই কড়া স্বাদ নয়। বেশ মিষ্টি-মিষ্টি। ধারিয়া বোধহয় যা মেশাবার মিশিয়েই তৈরি করে রেখেছিল ককটেলটা।

হাজার হোক দু'জনেই বাঙালি। আর কটা বাঙালিই বা থাকে ডাব্লিনে। একরত্তি তো জায়গাটা।

প্রথম গ্লাস শেষ করে দ্বিতীয় গ্লাস ভরে বাইরেব সেই বোদে পাতা বেতের ডেক্ চেয়ারে এসে বসল কুন্তলা। মেরীকে বলে আগেই একটা টিপয আনিয়ে রেখেছিল মাথার দিকে। তার ওপরই চিঠির বাণ্ডিলটার পাশে রাখল ও গ্লাস। সকালের সেই খামের চিঠিটা বার করে পড়তে শুরু করল

আপনাব সুচরিতেযু, অতিপরিচিত হাতের লেখা চিঠির নীচে 'সু' স্বাক্ষর আব বিষযবস্তু বর্ণনায় নানান পবিচিত ঘটনাব ও চরিত্রের উল্লেখ, যা আপনারই, হয়ত আমারও কিছুটা জানা, সে সবের উল্লেখ না থাকলে চিঠিটা আপনার বলে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে খুব একটা সহজ হত না। কেমন যেন বেসুরো। আত্মোপলব্ধি হলে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আত্মগ্লানি যদি হয় তাহলে বলব আমার মনে সুহাসিনী রাযের ভাবমূর্তিটা আবছা আবছা হয়ে আসছে। আপনি লিখেছেন : "আজ বুঝতে পাবছি, পবমেশকে আমি ভালোবাসি নি কোনোদিনই। ওর উগ্র আকর্ষণী শক্তি আমাকে এতদিন মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। আজ সে ঘোবটা কেটে গেছে। কারণটা হয়ত আমাদেব এই দূরত্বের ব্যবধান, চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির একটা পরিধি থাকে। আমি সেই পবিধির বাইরে আজ পা বেখেছি। তুমি লিখেছ, পরমেশ খুবই অসুস্থ। এই খবরে আমার মনের প্রতিক্রিয়া কী জানো? ভালো হয়ে উঠুক পরমেশ— ব্যস্, ওইটুকুই। পরিচিত যে কোনো মানুষেব অসুস্থতার সংবাদে যেটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মনের মানুষের অসুস্থতার সংবাদে হৃদয়ে যে অস্থিরতা আসে তেমন কিছুই হয নি আমার। ভালো হয়ে উঠলে ভালোই লাগবে। না হলে তোমাদের আর পাঁচজনের মতো আমারও খাবাপ লাগবে। এর বেশি কিছু নয়। এমনকি বৈধব্য যন্ত্রণার বোঝাটুকুও আমায় বইতে হবে না। মালাবদল বা সই-সাবুদ করে তো আমাদের বিয়ে হয় নি। একসঙ্গে থাকতাম আমরা। আগেকার দিন হলে লোকে হয়ত আমাকে পরমেশের 'মিস্ট্রেস' বলত। এখনকার আখ্যা 'লিভিং-ইন পার্টনার' আব নিন্দুকদের মতে 'লিভিং ইন সিন'। আমাদের সম্পর্কের তখনকার বা এখনকার সংজ্ঞা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, ছিলও না কোনোদিন। সম্পর্কটা যতদিন ছিল, মেনে নিয়েছিলাম ভলোবাসা মনে করেই। তাই বিচ্ছেদে বিরহ-যন্ত্রণাও পেয়েছিলাম খুব। আজ সেসব চুকেবুকে গেছে। একটা কথা আজ তোমায বলি অনিমেষ। আমি কিন্তু "জেনেশুনে বিয" করি নি পান। তা যদি হত তাহলে বিযের দহনটা আজও থেকে যেত। পরমেশ আমার কাছে বিষ ছিল না, ছিল মদির। নেশায আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমার তনুমন। বাতের নেশা যেমন সকালে কেটে যায়, আমারো তেমনি কেটে গেল। তবে আমার সকালটা কয়েক ঘণ্টা পরে আসার বদলে কযেক বছর পরে এল। পরমেশ নামক সিঙ্গল্ মল্ট প্রিমিয়াম হুইস্কিটি আমি ছ'টা বছর একটানা নীট খেয়েছি। তাই খোঁয়ারি ভাঙতে একটু সময় লাগল।

তবে? কীসের আশায় বসে আছেন ওই ছাতার কলতলায় না শিমুলতলায? প্যান্ এ্যাম্ ওয়ানের পরের ফ্লাইটেই নিউ ইযর্ক চলে আসুন। জ্যাক্সান হাইট্সের দুলাল কুণ্ডুর ইণ্ডিয়ান স্টোর্সে অর্ডার দিলে গাঁদা ফুলের মালা পাওয়া যায় বলে শুনেছি। আপনাব ফ্লাইট নম্বরটা জানতে পারলেই সুহাসিনী রায় ফ্যান ক্লাবের (নিউ ইয়র্ক চ্যাপ্টার) সদ্যসবা সবাই হাজির হয়ে যাবে জে, এফ, কে-তে গ্যাঁদার মালা হাতে।

আমি আন্দাজ করতে পারি আপনি কী জবাব দেবেন। আপনি হয়ত বলবেন, বোতল দেখে

নেশাটা যদি আবার চাগিয়ে ওঠে, এই তো। সেরকম কোনো আশঙ্কার সম্ভাবনা নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন তো। আপনার মতো দুঁদে সম্পাদক একবার যে লাইনের উপরে নীল পেনসিল চালিয়েছেন, সেটা আবার ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলার মতো অপেশাদারী অস্থিরতা আপনার মধ্যে নেই বলেই আমার বিশ্বাস।

আপনাব চিঠি পড়ে মনে হল ভালোবাসার "রিস্‌ন ডি' অঁত্রে" নিয়ে আপনি যেন কিছুটা বিভ্রান্ত। 'টমাস মান্' কোট করেছেন আপনি। আমি বলি কি, জার্মান দর্শন নিয়ে মাথা না হয় নাই ঘামালেন। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, নিধুবাবুর টপ্পার স্মরণাপন্ন হন:

ভালোবাসি তাই ভালোবাসি
ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে......

নিধুবাবুকেআমি গুরু মানি, তাই ভালোবেসেই আমি খালাস। পাওয়ার প্রত্যাশা আমাব নেই, তাই না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্ত। নির্ভয়ে ফিবে আসুন নিউ ইর্য়কে।

না, মহুয়া পান করাটা ঠিক হয়ে ওঠে নি। মানে সুযোগই হয় নি। কলকাতার খালাসিটোলায় বাংলা (কালীমার্কা) থেকে শুরু করে দেশজ 'বিলায়তি শরাব' অর্থাৎ আই. এফ. এল (ইন্ডিয়ান মেড ফরেন লিকার) রাম, হুইস্কি, জিন সবই চাখা হয়ে গেছে। আজ অনাবাসী ভারতীয় হয়ে হাভাতেদের মতো আকণ্ঠ স্কচ পান করছি, সে তো আপনার অজানা নয়। কিন্তু মহুয়া? না, বস্তুটি নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ হয় নি কখনো। হার মানছি। আমাদের পানের অভিজ্ঞতাটুকু আনাজ ও ফলের মধ্যেই সীমিত, আপনি তো দেখছি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছেন।

আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত আমি। জীবনটা বৈষ্ণব কাব্য নয়, তনু মন দুটোই সমর্পণ করার মতো ভাগ্য ক'জনের হয়? ছলে বলে অর্থে তনুর চাহিদা মেটানো যায়। কিন্তু মন? দিলেই বা নিতে যাবে কেন আমার আকাঙ্খিত জন? ছাদনাতলায দাঁড়িয়ে গাঁটছড়া না বাঁধলেও আমি-আপনি কেউই কৌমার্যর বড়াই করতে পারি না। কিন্তু মনের মিলনটা ঘটল কই? হাহাকারটা রয়েই গেল।

আপনি হয়ত বলবেন আমি তো নিধুবাবুর দর্শনে বিশ্বাসী। আমার এত হাহাকার কীসের? ঠিক কথা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মন তো সব সময় সচেতন সজাগ থাকে না। একাকী অবচেতনায় অনেক সময় দর্শন ঠিক মাথায় আসে না। তখনই শূন্যতার হাহাকারে কেঁদে ওঠে মন।

অনেক বাজে কথা হল। ফ্লাইট নম্বরটা টেলিফোনে জানাতে ভুলবেন না।

পাঁচ

মহুযার মিষ্টি মৌতাতে কুন্তলার মন বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠেছিল। মাথার মধ্যে চিন্তার ঢেউগুলো তীরে এসে ভেঙে পড়ার আগেই কোথায় যেন হারিযে যাচ্ছিল। কল্পনার ডানায উড়ে চলেছিল কুন্তলার মন আবেগের হাতছানিতে। যুক্তি-তর্কের বালাই ছিল না সেই চিন্তার স্রোতে। বল্গাহীন ঘোড়া। রাস টানার প্রশ্নই ওঠে না।

ওঠেও নি। অনির্বাণ অনিমেষের খোলসে পুরে নিজেকে সুহাসিনীর ভূমিকায় দেখার লোভটা যেন ওকে পেয়ে বসেছিল। টেবিলে খাবাব সাজিয়ে মেরী ডাকতে এলে চিঠিগুলো ম্যানটেল পিসে রেখে খেতে বসল কুন্তলা। আর খেতে খেতেই দুষ্টুবুদ্ধিটা মাথায এল। অনিমেষেব অনুরোধ তো সুহাসিনী রাখে নি। ফিরে যায় নি সে নিউ ইয়র্কে। কিন্তু কী অছিলায়? কী জবাব দিয়েছিল সুহাসিনী অনিমেষেব অমন আন্তরিক আহ্বানকে প্রত্যাখান করে? সুহাসিনীর সে চিঠি ওব নাগালের বাইরে জেনেও মহুযার মিষ্টি নেশায় আচ্ছন্ন কৌতুহলী কুন্তলা কিন্তু মোটেই নিরাশ হল না। কুন্তলা মজুমদার বলে কেউ নেই, কেউ ছিল না কোনোদিন। শিউলি-বাড়িতে যে থাকে তার নাম সুহাসিনী বায়। ওই সেই সুহাসিনী, চিঠিটা ওকেই লেখা, জবাবটা ও-ই দেবে।

ঠিক ভালো কবে খাওয়া হল না কুন্তলার। ফেলে ছড়িয়ে খেযে ঘোরের মাথায় একসময় উঠে পড়ল ও। অনিমেষের চিঠির উত্তর লেখার তাগিদে হাতমুখ কোনো রকমে ধুযে, খাবার টেবিলেই বসে গেল সুহাসিনীর খোলসে কুন্তলা কাগজ কলম নিয়ে।

চিঠি আর লেখা হল না। সম্বোধনটা কী করবে, ভাবতে ভাবতেই কলম হাতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়। কিন্তু ঘুমিযে ঘুমিযেই স্বপ্নের মধ্যে ওর বকলমে লেখা সুহাসিনীব উত্তবেব পূর্ণ বয়ান কুন্তলা শেষ পর্যন্ত পড়েই ফেলল :

অনিমেষ,

তার চেয়ে তুমিই বরং চলে এসো এই অরণ্য-সবুজ নিরিবিলি শান্তিনীড়ে। নীল সমুদ্রের ছোঁয়া নেই এখানে ঠিকই, কিন্তু আছে শ্যামলা সবুজের ঢল, পলাশ, শিউলির লোহিত শ্বেতের প্রাণস্রোত, মহুযার মাতাল করা গন্ধ আর নাম না জানা অজস্র বিহঙ্গের সংকীর্তন। এখানের আকাশে বাতাসে মিশিয়ে আছে কবিতার সুরের প্রলেপ। কবির বাণীর অভাবে মূর্ত হতে পারছে না সেই ধ্বনি। এসো কবি। শিমূলতলা যে তোমারই অপেক্ষায় বসে আছে অনিমেষ।

না-পাওয়ার ব্যাথার ভয়ে তুমি না-চাওয়ার দৈন্যকে বরণ করে নিয়েছ। তাতে ব্যথা কতটুকু এড়াতে পেরেছ জানি না, তবে পাওয়ার আশার মধ্যে যে রোমাঞ্চকর আনন্দ অনুভূতি আছে, তাব আস্বাদ থেকে নিজেকে তুমি বঞ্চিত করে রাখলে। কিন্তু কেন? না চাইতেই যাবা পায়, যেমন অনির্বাণ পরমেশরা, তাদেব কাছে পাওয়াটাই মূল্যহীন। তাই পেয়েও সবকিছুই খুইয়ে বসে ওবা, কারণ বিনিময়ে দিতে চায় না ওবা কিছুই। তুমি ঠিক উল্টো অনিমেষ। পাওয়ার তোয়াক্কা না কবেই দিয়ে বসেছ সবকিছু। মূল্য দিযেও দ্রব্য দাবী করতে শঙ্কিত তুমি। আর ওরা মূল্য না দিয়েই উঠিয়ে নিয়ে যায যখন যা খুশি। জীবনে ব্যথা পাওনি যে এমন তো নয়। না হয় আবো একটু পেতে। তাই বলি, চেযে দেখলেই পারতে। শূন্যতা পূবণের পথটাই যদি আগলে দাঁড়াও, পূর্ণতা যদি হঠাৎই এসে যায়, ঢুকবে কোন পথে?

তুমি লিখেছ, নিউ ইয়র্কে ফিবে যেতে। ফিরে কি সত্যিই যাওয়া যায় কোথাও? যায না। না নিউ ইযর্কে, না গ্রীণউইচ ভিলেজে, না কেমব্রিজে বা ডাব্‌লিনে পবমেশ অনিমেষদের কাছে। জীবনটাই চরৈবেতি। এগিয়ে চলাটাই বিধান। নতুন পথে, নতুন জীবনে, নতুন করে হয়ত যাত্রা শুরু করা যেত, কিন্তু কই. তুমি তো তোমার বন্ধ দেউড়ি খুলে ডাক দাও নি আমায় নতুন জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে। ডাকে যদি সাড়া না দি' সেই ভয় না কবে ডাকটা দিলেই পারতে।

থাক ওসব কথা। এখন যা বলছি তাই শোনো। কয়েক দিনের কাগজ আর কলম হাতে তুমি বরং চলে এসো এই অরণ্যের তপোবনে। ফুল, লতাপাতা, কচি কচি দুব্বো ঘাস, হরিণ না হলেও ছাগশিশু, মায় এক শাপভ্রষ্টা ঋষিকন্যাও পেয়ে যাবে এখানে। ব্যস, দুর্ভাঁড় মহুয়া চড়িয়ে লেগে পড়ো কাব্য সাধনায়। সত্যি বলছি, অনেকদিন তোমাব মুখে তোমার কবিতা শুনিনি। বড় শুনতে ইচ্ছে করে।

আরো একটা উপরি লাভ আছে এখানে তোমার। ওখানে ভিড়েব মধ্যে একাকীত্বের নিঃসঙ্গতায় যন্ত্রণা পাচ্ছ তুমি; এখানে প্রকৃতির ছত্রছায়ায় একার মধ্যেই বহুর সঙ্গ পাবে তুমি।

চিঠিটার 'ইতি' পর্যন্ত আর পড়া হল না কুন্তলাব। স্বপ্নে যেমন হয। হঠাৎই শুরু আবার হঠাৎই সারা। আসলে মেরী চা নিয়ে এসেছিল, ট্রেটা টেবিলে রাখাব শব্দে পাতলা হয়ে আসা ঘুমটা ভেঙে গেল, আর সাথে সাথেই স্বপ্নভঙ্গ। চিঠিটার শেষটুকু তো লেখাই হয়ে উঠল না কুন্তলার, তা পড়বে কি।

মুখে চোখে ভালো করে জল দিযে এসে

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল ও। পশ্চিম আকাশে সিঁদুরের রং ধরেছে। এখানের অস্তমিত সূর্য এখন আইরিশ সী-র মধ্য গগনে আর অতলান্তিক কূলে নিউ ইয়র্কের পূবাকাশে ঊষার আলতার প্রলেপ। অনির্বাণ হয়ত এখন জয়েসের স্ট্রিম অব্ কনশাসনেসের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছে ওর ছাত্র-ছাত্রীদের। অনিমেষ এখনো হয়ত বা ঘুমিয়ে, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। সুহাসিনী রায়ের স্বপ্ন। ও যেমন একটু আগেই দেখছিল অনিমেষকে স্বপ্নে লেখা চিঠিতে। অবচেতনার সেই চিন্তার স্রোতকে চেতনার চত্বরে আনার চেষ্টা করল কুন্তলা। স্বপ্নে লেখা চিঠিটা মনে মনে আর একবার পড়তে চাইল ও। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই বেশ আবছা, অস্পষ্ট হয়ে গেছে চিঠিটা। কিছু অংশ ভেসে এল মনে ছেঁড়া পাতার মতো। বাকিগুলোর হদিশ পেল না। বেশ বিরক্তিকর ব্যাপারটা।

কিন্তু টুকরো টুকরো ছেঁড়া পাতার সূত্র ধরেই কুন্তলার মনের পর্দায় এক সময় ভেসে উঠল চতুষ্টয় পুরুষের কোলাজ—অনির্বাণ, অনিমেষ, অবলোকিতেশ, পরমেশ। একটা আশ্চর্য ধ্বনিগত মিল আছে নামগুলোর মধ্যে। প্রথম তিনটি স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণে শুরু, শেষ তিনটির শ-কারে সমাপ্তি। দুটি খুব চেনা মুখ কুন্তলার, খুব কাছের মানুষ ওর। দুটি কুন্তলার কাছে ‘ফেসলেস’, অবয়বহীন, অপরিচিত। এখন ঠিক এই মুহূর্তে এই চারটি মানুষই কুন্তলার মানসপটের সবটুকু জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, পরমেশও। অস্বস্তিকর হলেও পরমেশের মধ্যে কুন্তলা বারংবারই যেন অনির্বাণের ছায়া দেখেছে। আর সেটাই ওকে দিশেহারা করেছে বেশি। এই চার পুরুষের মধ্যে অনির্বাণই ওর সবচাইতে আকাঙ্খিত পুরুষ। পরমেশ ওর কাছে অনেকটা উপন্যাসে পড়া এক খলনায়ক। নিজের আকাঙ্খিত নায়কের মধ্যে উপন্যাসের খলনায়কের ভূত কেন ও দেখতে পাচ্ছে আজ হেমন্তের এই সুন্দর সন্ধ্যায়। আর অনিমেষ? সেও তো ওর কাছে পরমেশের মতোই এক উপন্যাসের চরিত্র। হলই বা সে উপন্যাসের নায়ক, কুন্তলার নায়ক তো সে নয়।

তাই যদি হবে, তবে মনে আজ এত দ্বিধা কিসের—অচেনা, অদেখা, অবয়বহীন সম্পূর্ণ অপরিচিত অনিমেষ বসুর অপরকে লেখা চুরি করে পড়া টুকরো টুকরো ক'টা চিঠির যাদু কেন আজ কুন্তলাকে আইরিশ সমুদ্রকূলে হারিয়ে যাওয়া মতিচ্ছন্ন ‘ভালোবাসার ধন’ কে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একটা আশ্চর্য অনুভূতি এল কুন্তলার মনে। অনির্বাণকে হারিয়ে সর্বহারা হয়ে গিয়েছিল ও একদিন। অভিমানে, রাগে, আক্রোশে অবলোকিতেশকে বিয়ে করেও অনির্বাণকে ভুলতে পারেনি ও। কিন্তু এখন যেন অনেকটাই শিথিল হয়ে আসছে সেই সর্বনাশা টানটা।

দূরে রক্তরাঙা পলাশের অরণ্যে আগুন জ্বলে উঠছিল অস্তগামী সূর্যের আবির-গুলালে। আনমনা কুন্তলা বেশ ক'টা বছর পিছিয়ে গিয়েছিল স্মৃতি রোমন্থনে।

এমন মেঘমুক্ত হেমন্ত-সন্ধ্যা ছিল না দিনটা। ছিল মেঘ-মেদুর-ঝড়ে দামাল এক শ্রাবণী সন্ধ্যা। সেদিনের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মাতলামি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল অনির্বাণ-কুন্তলার সর্ব শরীরে। ত্রিবেণীতে এসেছিল ওরা এমনিই বেড়াতে। হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টির দাপটে কাক-ভেজা হয়ে আশ্রয় নিতে হয় ওদের নিভৃত ডাক-বাংলোয়। ফেরা হয়ে ওঠেনি সেই দুর্যোগের রাতে কলকাতায়। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমকূলে প্রকৃতি-পুরুষের আদিম মিলন সেদিন কোনো বাধাই মানে নি।

সেটাই ছিল ওদের প্রথম দৈহিক মিলন। অনেক সময়ই ভেবেছে কুন্তলা এবং আজও মনে হলে ওর, অনেক অনেক সম্ভাব্য মিলনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেই প্রথম মিলনই কিন্তু ওদের শেষ মিলন হয়ে দাঁড়াল।

অনির্বাণের না হলেও কুন্তলার কাছে দৈহিক মিলনে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার মধুর অভিজ্ঞতা ত্রিবেণী সঙ্গমেই প্রথম ও শেষ। অন্তত এই মুহূর্তটি পর্যন্ত।

যাকে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও মনই দিতে পারেনি তাকে দেহদানের লজ্জা ও গ্লানি থেকে অন্তত এখনো পর্যন্ত মুক্তি দিয়েছিল অবলোকিতেশ। অদ্ভুত মানুষটা। যাকে পাবার আশা না করেও ভালোবেসেছিল তাকে একান্তই নিজের করে পেয়েও সংযম হারায়নি অবলোকিতেশ। কুন্তলা মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই ওর রোদনভরা চোখদুটো অনেক না-বলা কথা শুনিয়েছিল অবলোকিতেশকে। বিনা দ্বিধায় সময় দিয়েছিল ও কুন্তলাকে। অনির্বাণের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি একদিন পাবেই কুন্তলা সে বিশ্বাস ছিল ওর।

কুন্তলার মনের যে অবস্থা ছিল তাতে ওর কাছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের চিন্তাটা মাথায়ই আসে নি। কিন্তু মনেপ্রাণে ও যে চেয়েছিল অনির্বাণের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পেতে সেটা কিন্তু সত্যি, এই মুহূর্তেও। কিছুটা হয়ত অবলোকিতেশের ওপর কৃতজ্ঞতার বোধেই টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল ও কলকাতায় একটা ফোন করতে। কিন্তু টেলিফোনটাই ডেড্।

গেট খোলার শব্দ শুনে ফের বাইরে এল কুন্তলা। অফিসের জিপটা এসে থামল গাড়ি-বারান্দায়। চন্দন দত্ত নেমে এল জিপ থেকে। ছেলেটি চেনা কুন্তলার। অবলোকিতেশের আণ্ডারে কাজ করে।

: আপনার বাড়ির লাইনটা ডাউন আজ দুপুর থেকে, তাই আমাকে আসতে হল বৌদি। জি. এম. ফোন করেছিলেন অফিসে কলকাতা থেকে। মজুমদারদার ফিরতে হয়ত দু'চারদিন দেরি হতে পারে। কর্তা আপনার জ্বর বাধিয়ে বসেছেন। তেমন কিছু নয়, ফ্লু-টু কিছু হবে মনে হচ্ছে। আপনাকে চিন্তা না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন জি. এম. সাহেব।

: তা খবর তো দেওয়া হল। এখন ভগ্নদূতের মতো ওখানে দাঁড়িয়ে না থেকে উঠে এসে বসো তো এখানে। দুঃসংবাদ এনেছ বলে কি এক কাপ চা-ও অফার করতে পারি না?

চন্দন হাসতে হাসতে তিন ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এসে চেয়ার টেনে বসল।

শুধু চা খাইয়েই বিদায় করবেন ভাবছেন নাকি? সেটা না হয় কাল সকালের জন্য তুলে রাখুন। এখন ম্যাডাম্ মেরীকে বলে জব্বর রকম্ খ্যাটের ব্যবস্থা করুন তো। আজ রাতটা তো আমাকেএখানেই থেকে যেতে হচ্ছে। শিমূলতলার ওয়ান এণ্ড ওনলি পেট্রল পাম্প ক্লোজড্ ফর দি নাইট। সকালে খুলবে, আর আমার জিপের পেট্রল ট্যাঙ্কটায় এমন রসদ নেই যে গ্রাণ্ড ট্যাঙ্ক রোডের নেক্সট্ পাম্পে পৌছতে পারবে! অতএব বুঝতেই পারছেন!

এর আগেও বার দু-তিন থেকে গেছে চন্দন শিউলিবাড়িতে। কাজে এসে ফিরতে পারে নি ঘাটশিলায়, এমন আগেও হয়েছে। অবলোকিতেশই ফিরতে দেয়নি ওকে রাত্তিরে জিপ চালিয়ে।

এমনটাই যেন চাইছিল কুন্তলা। এমনিতে নিঃসঙ্গতাই ওর কাম্য হলেও আজ মনটা ওর অনেকটা হাল্কা ছিল। চন্দনকে দেখেই ইচ্ছে হয়েছিল এটা সেটা নিয়ে দু'দণ্ড বসে গল্প করে। চন্দন বলেই হয়ত। খুব উচ্ছ্বাস ভরা ছেলে, বেশ রসিয়ে জমিয়ে আড্ডা দিতে পারে।

গল্পে-গল্পেই সুহাসিনী রায়ের কথাটা উঠেছিল। মেঘ-মুক্ত হেমন্তের সন্ধ্যায় আষাঢ়ে গল্প শুনবে আশা করে নি কুন্তলা, কিন্তু খাবার টেবিলে কচি মুরগির ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে চন্দন রীতিমতো একটা আষাঢ়ে গল্পই ফেঁদে বসেছিল—

: মনে হচ্ছে পার্টি বোধহয় ক্যাচ্ বৌদি। পোস্টাল অ্যাড্রেস দিতে পারব না, তবে আস্তানাটা দেখে এসেছি। নামটা জানান নি—সুহাসিনীও হতে পারে আবার বনলতা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তবে রহস্যময়ী হলেই মানায় ঠিক। তিনটে শালবৃক্ষের. শিখরে ঠিক নয়, মাঝামাঝি পাকাপোক্ত কাঠের বীম্ দিয়ে তৈরি একটা ত্রিকোণা ভিতের

প্রাণী সম্পদ বিকাশে এপিক
প্রাণীখাদ্য অপরিহার্য্য

পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্য ডেয়ারপোলের
দুধ ও ঘি একান্ত প্রয়োজন

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী এ্যাণ্ড পোল্ট্রী ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের অধীনস্থ একটি সংস্থা)
১৬ নং নেতাজী সুভাষ রোড, চতুর্থ তল, কলিকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২০-১৯৫৫/ ২২০-৯৪৩২
ফ্যাক্স - ২২০-৪৫৭৯

কলকাতার অহঙ্কার

কলকাতা
পুরশ্রী

সেকালের ও একালের কলকাতার সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা গড়ে তুলতে যার কোনো জুড়ি নেই

অবিস্মরণীয় শারদ সংখ্যা ১৪০৮

এমন সংখ্যাটি শুধু পড়ার জন্যে নয়, চিরকাল সযত্নে রক্ষা করার জন্যেও
দামে নগণ্য কিন্তু বিষয়ে অগ্রগণ্য

কলকাতা পৌর সংস্থা

ওপর দু' কামরা কাঠের কুটির বানিয়ে দিব্যি আছেন ভদ্রমহিলা। সঙ্গে থাকে এক আদিবাসী যুবা। কৃষ্ণকায়, সুঠাম, চোখেমুখে আদিম বন্যতা। নড়াচড়া না করলে মনে হবে যেন কালো পাথর কেটে মূর্তিটি বানিয়েছেন রামকিঙ্কর বেজ। আর নড়লেই কালো চিতা জাগুয়ার। দু'জনের সম্পর্কটা যে কী, সেটা বৌদি আপনিই আন্দাজ করে নিন। বনাঞ্চলটি হাজারিবাগ জেলার রাজারাপ্পার ফরেষ্ট রেঞ্জ এলাকায়। কোডার্মা থেকে মাটি খুঁড়তে গিয়েছিলাম আমরা সদলবলে। যন্ত্রপাতি, লোক-লস্কর অনেক ছিল আমাদের সঙ্গে। সারফেস্ সয়েল টেস্টি মুজমদারদা বেশ কদ্দিন আগেই করেছিলেন। ল্যাব্ রিপোর্টে ডিপ্ সয়েল টেস্টিং-এর নির্দেশ দিয়েছিলেন। কর্তার ইচ্ছেতেই কর্ম, তাই গিয়েছিলাম আর কি। কিন্তু বাদ সাধল ওই জাগুয়ারটা। কাঁধে তীর-ধনুক আর হাতে বল্লভ নিয়ে ছুটে এসেছিল লোকটা, একাই, ইণ্ডিয়ান কপারের বিশ-পঁচিশটা জোয়াণকে উপেক্ষা করে। জায়গাটার মালিকানা নাকি ওর মেম সাহেবের। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমাদের একটা সয়েল স্যাম্পেল সংগ্রহ করার অনুমতি নেওয়া ছিল। বনবাদাড়ে যে বনদেবী অধিষ্ঠিত আছেন, সেটা কোম্পানির মাথায় আসেনি। যাই হোক, সরকারি কাগজ-পত্তর নিয়ে দেখা করেছিলাম মালকিনের সঙ্গে ওঁর মাচায়। পরিপাটি সাঁওতালি বেশ-বাসে বাঙালি ভদ্রমহিলা। বাংলায়ই কথাবার্তা হয়েছিল। তারই মধ্যে দু'চারটি যে ইংরিজি ও ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তার উচ্চারণ ও বলার ভঙ্গিমায় মনে হয়েছিল মহিলা, খুবই উচ্চ শিক্ষিতা, সফেস্টিকেটেড্। অল্পই কথা হয়েছিল। বলেছিলেন, ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ জাতীয় সম্পত্তি, অতএব জমি ওঁর লিজ্ড্ প্রপার্টি হলেও আসল মালিক সরকার। আমাদের কর্মকাণ্ডে আপত্তি জানালেও বাধা দেন নি। বলেছিলেন ওঁর আপত্তি উনি সরকারকে জানাবেন। অতদূর পর্যন্ত ব্যাপারটা হয়ত গড়ায় নি। কারণ আমাদের টেস্টিং নেগেটিভ হওয়ার ফলে প্রজেক্টটাই বাতিল হয়ে যায়। খবরটা আমিই ভদ্রমহিলাকে জানিয়ে এসেছিলাম। মাচায় বসে হুঁকো টানছিলেন মহিলা আবার সেই একই হুঁকোয় থেপে থেপে টান দিচ্ছিল ওই আদিবাসী যুবকটি। আশ্চর্য বৌদি, মহিলার কোনো ইন্‌হিবিসান নেই।

শুতে যেতে সেদিন বেশ্ রাতই হয়ে গেল। গেস্ট রুমের দরজায় চন্দনকে শুভরাত্রি জানিয়ে কুন্তলা নিজের বিছানায় শুয়ে সুহাসিনী রহস্যের অতল তলে এক সময় হারিয়ে গেল।

মেরীকে বলাই ছিল। বেশ ভোরেই চা খেয়ে চন্দন রওনা হয়ে গেল। কুন্তলার তখন ঘুমই ভাঙেনি। চায়ের কাপ হাতে মেরী বার দুই ডেকে গেছে ইতিমধ্যে। সুহাসিনী রায়ের রহস্যজাল কেটে ঘুম আসতে রাত গড়িয়ে গিয়েছিল অনেকটা। সকালের দিকে তাই অঘোরে ঘুমোচ্ছিল কুন্তলা। তাড়া ছিল চন্দনের। অফিসের বাহনটিকে আটকে রাখার উপায় ছিল না। অতএব বিদায়, ধন্যবাদ জানানোর সামাজিক ভব্যতাটুকু রক্ষা করার আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি চন্দনের।

বেশ বেলা করে হলেও, ঘুম এক সময় ভাঙল কুন্তলার। সারাটা ঘর তখন রোদে ঝলমল করছে। সরাসরি চোখ পড়ল সামনের দেওয়ালে টাঙানো সুহাসিনী রায়ের অনেক ফেলে যাওয়া জিনিসের মধ্যে টাইমেক্স ঘড়িটাতে প্রায় ন'টা বাজে।

কিচেনের টেবিলে ফ্লাস্কে চা রেখে বাজারে গিয়েছিল মেরী। গেস্ট রুমের দরজাটা হাট করে খোলা—অতিথি শূন্য। কাপের বদলে হাতে একটা কাচের গেলাস আর ফ্লাস্কটা নিয়ে বারান্দায় আসতেই চোখে পড়ল কালকের সেই ন্যাংটা বাচ্চাটা। আজ অবশ্য আর উদোম নয়। কালো একট ইজের জাতীয় হাফপ্যাণ্টের ওপর টুকটুকে লাল গেঞ্জি বেশ আঁটো-সাঁটো। সিঁড়ির সেই ধাপটায়, কাল যেখানে ওর মা বসেছিল, সেইখানে বসে হাসছিল ছেলেটি, কুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে। ধব্ধবে সাদা দু'পাটি দাঁতের সারি তেল-কুচকুচে মিশকালো মুখটায় যেন এক মুঠো জ্যোৎস্নার আলো ঢেলে দিয়েছিল।

বারান্দার বেতের টেবিলের ওপর ফ্লাস্ক আর গেলাসটা রেখে ইশারায় বাচ্চাকে অপেক্ষা করতে বলে কুন্তলা কিচেনের দেরাজ থেকে বিস্কুটের টিনটা নিয়ে এল। তারপর টিনটা খুলে নিয়ে হাতে দুটো বিস্কুট দিয়ে গেলাসে চা ঢালল ও। সংলাপ কী ভাষায় আরম্ভ করা যায়, সেই রকমই কিছু ভাবছিল কুন্তলা। ওর ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠেছিল। অকারণে নয়, ছেলেটার হাসিটাই ওকে সংক্রামিত করেছিল। চায়ে চুমুক দিতেই নজরে এল, মানুষটা শিউলি গাছটার কোল ঘেঁষে সহাস্যে ওরই দিকে এগিয়ে আসছে। মালকোঁচা করে পরা সাদা খাটো ধুতি। আদুড় গা। কালো কষ্টি পাথরে কোঁদা পেশিবহুল মসৃণ শরীর, আর ঝাঁকড়া ঘন কালো চুল মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াতেই কুন্তলার মনে হল ভাস্কর্য সৌন্দর্যের এমন নিখুঁত নমুনা রক্ত মাংসের উপস্থাপনায় এর আগে ওর চোখে পড়েনি।

ছেলেটির মতো সাদা দাঁতে রুপোর ফুলঝুরি ঝরিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠল কষ্টিপাথরের মূর্তিটা:

ধারিয়া মাহাতো। চুংলিতে লাচ্ হইব আজ রেতে। সাইকেল মেমসাব কথা চুলি গেলা। তুই অহিবি না?

: তুমি এসে নিয়ে যাবে তো?

অমন হাসির ঝর্ণাধারাকে উপেক্ষা করে না, বলতে পারে নি কুন্তলা। অথচ রাত বিরেতে অজ্ঞাত কোন্ চুংলির জঙ্গলে ধেইধেই করে নাচতে বা নাচ দেখতে ও যাবেই বা কেন? ধারিয়া মাহাতোকে ও এই প্রথম দেখল। যার পরিচয় সূত্রে ধরিয়ার এখানে আগমন সেই রহস্যময়ী সুহাসিনী রায়ও কুন্তলার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা। সবদিক দিয়ে দেখতে গেলে নিমন্ত্রণটাও ঠিক ওর নয়। অপরিচিতা সেই বেপাত্তা মহিলার প্রতিনিধিত্ব করার নিমন্ত্রণ, এটি কিন্তু অজান্তে বা মুখ ফস্কেই হোক কথা তো ও একরকম দিয়েই দিয়েছিল।

: সুয্যি ডুবলে করিমের রিক্সাভ্যান নিয়া আসব। তুর তো সাইকেল লাই।

ছেলেটা বিস্কুট দুটো খেয়ে নিয়ে আবার কাঠবিড়ালির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। কালো পাখার ওপর সোনা মুগের দানার মতো ছোট ছোট হলুদ বিন্দু দেওয়া একটা প্রজাপতি সামনের টবে ক্রিসেমথিমাস্ ফুলগুলোর ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। কুন্তলার মুখের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বসে আছে ধারিয়া পূর্ণ সম্মতির অপেক্ষায়। কী যে বলবে ভেবে পেল না কুন্তলা। চুংলীতে যাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ওর মাথায় এল না। বরং হাসিই পেল ওই রকম একটা উদ্ভট প্রস্তাবের কথা ভেবে। অথচ মনের গভীরে যাবার কৌতূহলটাও যে একেবারেই ছিল না তা নয়। ঠিক মনস্থির করতে না পেরে বিষয়টি মুলতুবি রেখে অন্য আলোচনা শুরু করল কুন্তলা।

: সাইকেল মেমসাহেব বুঝি নাচ দেখতে যেত চুংলীতে?

: খুব যাইত। পুন্নিমে রেতে মাদলের সঙ্গে লাচ্ত সাইকেল মেমসাব মোদের সঙ্গে।

মেরী বাজার করে ফিরতে ফিরতে ধারিয়ার কাছ থেকে সুহাসিনী রায়ের শিমূলতলা জীবনের টুকরো টুকরো অনেক চমকপ্রদ খবর শুনেছিল কুন্তলা আশ্চর্য। অনিমেষের ধারাবাহিক উপন্যাসের যেটুকু অংশ ওর পড়া হয়েছে সেখানের সেই বিদগ্ধ ট্র্যাজিক চরিত্রটির সঙ্গে ধারিয়ার, সাইকেল মেমসাবের কোনো সংযোগ সূত্রই খুঁজে পেল না কুন্তলা। একজন উদ্দাম, উচ্ছল, নৈসর্গিক নগ্নতায় উজ্জ্বল। আর একজন স্থির, ধীর, আত্মস্থ। একজন লিরিক্যাল, আর একজন ক্লাসিক নায়িকা। দুটি চরিত্রের বৈষম্য নিউ ইয়র্ক —শিমূলতলার দুরত্বের ব্যবধানকেও ছাপিয়ে গেছে বলে মনে হয়।

মেরীকে বলতে হয় নি। ধারিয়া আর বাচ্চাটার

হাতে শালপাতার ঠোঙায় মুড়ি, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে গেল ও, যেমনটি দিত হয়ত সুহাসিনীর আমলেও। অতিথি আপ্যায়নের কথাটা কুন্তলার যে মাথায় আসেনি তা নয়, কিন্তু কী ভোজ্যে ওদের আপ্যায়ন করবে সেটা ঠিক ভেবে উঠতে পারে নি। মনে মনে খুশিই হল ও।

মুড়ি খাওয়ার পাট চোকার পর মেরী মারফৎ ধারিয়াকে ও জানিয়ে দিল যে সাইকেল ভ্যানের কোনো প্রয়োজন হবে না। এমনকি ধরিয়াকেও কষ্ট করে আসতে হবে না। ওর যাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠবে কিনা সেটা ঠিক এই মুহূর্তে ও বলতে পারছে না। তবে যাবার ইচ্ছে আছে ওর। আর যদি যায় তো মেরীকেই সঙ্গে নিয়ে যাবে। দরকার মনে করলে অফিসের জিপটা আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে।

এতক্ষণ নজরে আসেনি কুন্তলার। সিঁড়ির ধাপের কোণটায় মাটির ভাঁড়টা রাখা ছিল। ধারিয়ার চোখের ইশারায় বাচ্চাটা সেটা টেবিলের ওপর রেখে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরেই ধারিয়া বিবৃত সুহাসিনী চরিত্রটাই মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল। ওরা চলে যেতে সেই চিন্তাটাই ওকে উস্কে দিল অনিমেষের পাণ্ডুলিপির অপঠিত পাতাগুলোর মধ্যে খুঁজে সুহাসিনী চরিত্রের আসল রূপটাকে পাবার তাগিদটা। কি জানি হয়ত বা শিউলিবাড়ির বন্য মেয়েটার কিছুটা আভাসও পেয়েও যেতে পারে ওই অপঠিত পাতার কোথাও না কোথাও।

স্নান সেরে চিঠিগুলো নিয়ে লনে এসে বসল কুন্তলা।

আজ ২৫শে বৈশাখ। "দিয়ে গেল ডাক"-এর প্রশ্ন ওঠে না নিউ ইয়র্কের গ্রামাঞ্চল ভ্যালী স্ট্রিমে।

এখানে কান পেতে থাকলেও শত প্রতি শত দেশজ ভূমিসন্তান হুইট্ম্যান বা রবার্ট ফ্রস্ট-এর ডাকও শোনা যায় না, টেগোর তো দূর অস্ত্। লং আইল্যাণ্ড অঞ্চলটাতে সারাবচ্ছরে একটাই ডাক— জেট ইঞ্জিনের। ডাইনে বাঁয়ে দু-দুটো বিমানবন্দর— কেনেডি ও লা-গুয়ার্ডিয়া।

সে যাই হোক, বাঙালি বলে কথা। যেখানেই থাকি, বাহিরের ডাক কানে না এলেও অন্তরের ডাককে উপেক্ষা করি কী করে? তাই ভোর না হতেই কেমন যেন গুন্‌গুনিয়ে উঠল মনটা:

বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা.. .

কিন্তু ওই পর্যন্তই। এখানে রবি ঘন কালো মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য। অতলান্তিকে ঝড় উঠেছে। নিউ ইয়র্কে বৃষ্টির কোনো ঋতুজ্ঞান নেই। আষাঢ় শ্রাবণের জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকে না। দুম্‌দাম করে যখন-তখনই আকাশ ফাটিয়ে বর্ষণ শুরু করে দেয়।

আপনার বন্য সম্পদের প্রতি "মুগ্ধ আকর্ষণ" আমাকে কিন্তু মোটেই আশ্চর্য করে নি। সৌন্দর্যের বিচার তো চেতনায়:

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল
সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম
'সুন্দর'—
সুন্দর হল সে।

ইস্ট্ রিভার হাড্সনের কূলে ম্যান্হাটন কি কম নেশা ধরিয়েছিল একদিন আপনার চেতনায়? সৌন্দর্যের ডালি একদিন তুলে ধরেছিল আপনার চোখে এই মার্কিনি 'বড় আপেল'টি। আজকে যদি শিউলির গোলাপি বোঁটা আপনার মন রাঙিয়ে থাকে তাতে 'চমকিত' হবার কী আছে?

মাদলের মাতাল করা ধ্বনি জড়কেও জঙ্গম করে। আর আপনার তো গঠনে চলনে নিধুবাবুর টপ্পার ঢেউ। মাদল আপনার কাছে সাপুড়ের বাঁশি। "পূর্ণ চাঁদের মায়ায" মাদলের শব্দ-লহরীর যাদুমন্ত্রে আপনি নেচে উঠবেন না তো কি নাচবে ওই ভগবানগোলার যাদব মাঝির বৌ ক্ষেমঙ্করী দাসী। তার ওপর দু'পাত্তর মহুয়া যখন পেটে পড়েছে তখন রক্ত একটু টগ্‌বগিয়ে উঠবেই।

প্রসঙ্গত কথাটা বলেই ফেলি। মার্কিনি আদিবাসীদের নিয়ে আমায় একবার কিছুটা গবেষণা করতে হয়েছিল একটা লেখার খাতিরে।

অ্যারিজোনায় ফ্ল্যাগ্স্টাফ বলে একটা গ্রামে এই আদিবাসীদের হুপী ইণ্ডিয়ানই হবে) জন্যে সংরক্ষিত এলাকায় আমায় থাকতে হয়েছিল দিন দুই। আপনি হয়ত শুনে হাসবেন, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি। ওদের এক উৎসবের রাত্রে আমার মতো বেসুরো, বেতাল মানুষকেও নাচতে হয়েছিল ওদের সঙ্গে। এমনকি ওদের পাণ্ডা, চীফ্ বিগ্ বুল আমার নৃত্যের প্রশংসাও করেছিল। অনেক চীফদের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছিল সে যাত্রায়। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বন্ধু ডেভ্ কুকের রসিকতাটা আপনাকে না শুনিয়ে পারছি না। রেড ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে বেশ কটা বই লিখেছিল ডেভ্। ও বলেছিল, বহু ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু সমস্যাটা এই যে, ওরা সবাই অল্ চীফ্স্ এণ্ড নো ইণ্ডিয়ান।

কথাটা উঠল নাচের সূত্রে। তাই বলি, আমি যদি বিপাকে পড়ে নটরাজ হতে পারি, তাহলে পাকাপোক্ত নাচিয়ে হয়ে আপনার নাচায় বাধাটা কোথায়? কমার্সের ফটিক নন্দীর ভাষায় আপনি তো মহাজাতি সদন, নিউ এম্পায়ারে "লেচে লেচে" বেড়িয়েছেন এককালে। ফটিক নন্দীকে আপনার অসংখ্য প্রেমমুগ্ধ ভাগ্যহীন যুবক ও কিছু প্রবীণদের (মাস্টার মশাইদের নিয়ে) তালিকায় ফচ্‌কে ফটিকের নাম যে প্রথম দশজনের মধ্যে ছিল সেটা আমরা মেনে নিয়েছিলাম। সুহাসিনী রায়ের প্রেমপ্রার্থীদের তালিকাটা ইকনমিক্সের অরুণ সোমের তৈরি। নির্লজ্জটা তালিকার প্রথম স্থানটি নিজের দখলে রেখেছিল। দ্বিতীয়, তরুণ অধ্যাপক অরুণ রায়। আমাকে 'অলসো র‍্যানেদের' মধ্যে রেখেছিল। পরমেশকে পাত্তাই দেয় নি।

এখানের খবরের মধ্যে পরমেশের একটা সোলো প্রদর্শনী হল বার্ক এণ্ড স্টোন-এর গ্রেসেন্সী পার্কের দোতলার হলে। গিয়েছিলাম। বহুদিন পর অনাবাসী ভারতীয়দের অনেকেরই সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনাকে সেদিন সবাই খুব মিস্ করেছে। এমনকি পরমেশও। ওর "লাস্ট টাইটেল" বলে একটা কিউবিক্ অয়েল দেখিয়ে আমায় বললে, 'জানিস অনি, এটা আসলে সুহাসিনীর পোর্ট্রেট। ওর শরীরের মধ্যে একটা জ্যামিতির কাঠামো আছে। ভীষণ অ্যাব্সুলার। ও চলে যাবার ক'দিন পরেই ছবিটা আঁকি আমি।

কিনতে চেয়েছিলাম ছবিটা। ও বলেছিল ওটা "নট্ ফর্ সেল্"। আসলে আমাকে ও দিতে চায় নি, সে যে কারণেই হোক। কিন্তু ক্যানভাসটা শেষ পর্যন্ত আমিই হাতিয়েছিলাম আমার সেই কৃষ্ণকলির মাধ্যমে।

সুদেষ্ণার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল ওখানেই। অলকের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে ছ'মাস হল। অলক টোরাণ্টোতেই আছে। সুদেষ্ণা কিন্তু এই ক'মাসেই বেশ আসর জমিয়ে বসেছে নিউ ইয়র্কে। আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়, সুদেষ্ণা পালিতের সঙ্গে পরমেশের একদা একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার গুজব রটেছিল এ্যালবার্ট হলের টেবিলে টেবিলে। শেষ পর্যন্ত আপনিই নাকি ওদের বাড়া ভাতে ছাই ঢালেন, এমন। একটা অভিযোগও কানাকানি হয়েছে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর করিডোরে এক সময়। অতঃপর? না, সুদেষ্ণার এখন আর পরমেশের হারেমে ঢোকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাদশার আর সে জেল্লাই নেই। আর বেগমের এখন নবাব-বাদশায় মন ওঠে না। ওনার নজর এখন সম্রাট, শাহানশাহ-র ওপর। সেই সন্ধ্যায় সুদেষ্ণার এসকর্ট ছিল বিখ্যাত মেলন পরিবারের কুখ্যাত রিকি মেলন।

বার্কের ওখানে কোল্ড কাট্ ও স্যালাডের

ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে রেড ওয়াইন। সুদেষ্ণা নাইট ক্যাপের আপ্যায়ন জানিয়েছিল আমাদের ক'জনকে 'সার্দি'তে। আমি যাই নি। সকালের ফার্স্ট সাটল্ ফ্লাইটে বস্টন যেতে হবে এই রকম একটা মিথ্যে অজুহাত দিয়েছিলাম। কাকলি, পরমেশ, ভাস্বতী, অমল আরো যেন কে কে সব গিয়েছিল।

আপনাকে বেশ অনেকদিন দেখিনি। খুবই ইচ্ছে হয় দেখতে। কেমন যেন একটা অস্থিরতা ইদানীং মনের গভীরে। এখানে সেখানে এটা সেটা লিখে দু'পয়সা হাতেও এসেছে। ভেবেছিলাম একবার না হয় ঘুরেই আসি আপনার চুংলীর জঙ্গলে। রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে। রথটা অবশ্য আপনি। আর ওখানের আদিবাসী আর এখানের আদিবাসীদের নিয়ে একটা জমাট ফিচার লিখতে পারলেই এখানের কোনো কাগজে কলাবেচাটা হয়েই যাবে। কিন্তু পরে ভাবলাম থাক, আপনাকে হয়ত বিব্রত করাই হবে। আমাদের কেস্‌টা তো ঠিক মাউন্টেন আর মহম্মদের মতো নয়। না আমি পর্বত, না আপনি পয়গম্বর। এখানে দু'জনেরই যাওয়ার প্রয়োজন। একজনের গিয়ে কোনো লাভ নেই। এক হাতে তালি বাজে না।

আপনার এই চিঠিতে বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখা করে পবকীয়া প্রমের প্রতি আমাকে প্রলোভিত করার বা উস্কে দেবার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। প্রয়োজন ছিল না। পরকীয়া প্রেমে আমার আসক্তিটা যে সহজাত সে তো আপনি জানেনই। পরের ধনে পোদ্দারি করার বাসনাটা আমাব বরাবরের। আপনার ইঙ্গিতটা অবশ্য উনাকে নিয়ে। কিন্তু ওখানে মুস্কিল এই যে কৃষ্ণকায় প্রথম প্রজন্মের মার্কিন মহিলাটি পরকীয়ায় হয়ত বিশ্বাসী, কিন্তু ওঁর প্রেম বোধটা নিদারুণ ভাবে অতি আধুনিক পশ্চিমী সংস্কৃতি ঘেঁষা। এঁরা "মেক্ লাভ্-এ" আগ্রহী,'ইন্-লাভ'-এ খুব একটা রুচি নেই এঁদের। আর আমি তো গহর গোঁসাই। কমললতাকে গান (কবিতা?) শুনিয়েই আনন্দ আমার। নতুন গোঁসাই আর হতে দিলেন কই।

অনেক বাজে বকলুম। এখানেই ইতি টানলাম। ভালো থাকুন।

—অনিমেষ

চুংলী থেকে সেই রাতে কুন্তলা যেন মুক্তিস্নান করে ফিরে এসেছিল। ওর নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধতার জগৎটা শব্দের মুক্তধারায অবগাহন করে কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল। মাদলেব নির্ঘোষে শব্দ ব্রহ্মার অমৃত-আস্বাদ পেযেছিল কুন্তলা। তার অবাক বিস্ময়ে দেখেছিল ও সেই শব্দেব বিদ্যুৎ তরঙ্গ পুরুষ-প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্যে।

রাতের প্রায় শেষ প্রহবে ঘরের দুয়াবে এসেও ঘরে ফেরা হয় নি কুন্তলার। চার দেয়ালের আব্রুর মধ্যে নিজেকে আর লুকোতে চায়নি ও। উষার উন্মেষে প্রকৃতির আনন্দধারায় নিজেকে মেলে ধবতে চেয়েছিল ও। শিশিবভেজা কচি সবুজ ঘাসে হেলেদুলে গেয়ে উঠেছে ও: "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে, কে যে নাচে তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।" ত্রিবেণী সঙ্গমে এক বিস্মৃত বর্ষামুখর রাতে অনির্বাণের হাত ধবেও একদিন গেয়েছ উঠেছিল কুন্তলা গানেব এই কলিটি। অথচ আজ সেই হারিয়ে যাওয়া দিনটার কথা ওর মনকে স্পর্শ করে গেল না। অনির্বানেব স্মৃতিটাই এখন বেদনার হেমন্তের আনন্দোজ্জ্বল উষায় সেই রোদনভরা বর্ষার স্মৃতি অনেক, অনেক দূরে ভেসে গেছে আজ।

লনেই চা নিয়ে এল মেরী। রাত জাগার কোনো ক্লান্তিই নেই কুন্তলার শরীরে। এমনকি অনেক দিনের ধীরে ধীরে জমে ওঠা মনের গ্লানিটুকুও কে যেন ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে আজ। বেশ একটা খুশির ঐকতান আজকের এই আকাশে বাতাসে। সামনের শিউলি গাছটার ডালে আবডালে ছুটে ছুটে খেলে বেড়াচ্ছে একদঙ্গল কাঠবেড়ালি। রঙ বেরঙের বেশ ক'টা প্রজাপতি ফুলের বাগিচায উড়ে উড়ে ঘুরছে। কিচেনেব জানলা খুলে দু'মুঠো দানা ছুড়ে দিল মেরী নিচের চাতালটায়। শিমূল, শিউলির ডাল থেকে এক ঝাঁক পাখি—চড়ুই, শালিক, দোয়েল, নাম না জানা আরো অনেক—কিচির, মিচির আর ডানা ঝাপটানির শব্দ করে উড়ে এল দানা খেতে। কুন্তলাও হাতের বিস্কুটটা ভেঙে এক টুকরো ছুঁড়ে দিল চাতালটার দিকে। ফের শুরু হয়ে গেল ডানা ঝাপ্‌টানির ঐকতান।

তাকিয়ে তাকিয়ে এই সবই দেখছিল কুন্তলা। এমনটি হয়ত রোজই ঘটে, কিন্তু 'চক্ষু মেলিয়া' দেখা হয়নি ওর ইতিপূর্বে। চোখের সঙ্গে মনও আজ ওর নতুন আলোয় ডুব দিল কলেজের মিষ্টি দিনগুলোর কথাই ভাবছিল কুন্তলা। কিন্তু অন্য পরিবেশে। কলেজের দিনগুলো তো অনির্বাণকে নিয়েই। তাই কল্পনার ডানায ভর দিয়ে ও আজ 'ক্লাস্ অফ্ ফরটি-এইট্' এর দিনগুলো থেকে ক'টা বছব পিছিয়ে গেল। 'ক্লাস অফ ফরটি এইট' তো অনির্বাণ, অবলোকিতেশদের ক্লাস, যার পরিসমাপ্তি বিযাদ, বিচ্ছেদের বেদনায় ভরা আজকের মুক্তিস্নাত কুন্তলা আনন্দের জোয়াবে ভেসে সেখানে যাবে কোন দুঃখে। ওর ক্লাস অনিমেষ সুহাসিনীদেব ক্লাস। হয়ত পরমেশেরও। তা হোক, কিন্তু কুন্তলাও ছিল ওদেরই সঙ্গে ওদেরই একজন হযে।

কল্পনার রঙিন আকাশে বেশ উড়ে চলেছিল কুন্তলা। কিন্তু সাত সকালে অফিসের জিপটা এসে ওর সব কল্পনাকে এক ধাক্কায় ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল। চন্দন নামল জিপ থেকে।

: আপনাকে এখুনি কলকাতা যেতে হবে বৌদি, আমার সঙ্গে এই জিপেই। মুজমদারদার ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া হযেছে, পি জির উড্‌বার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে কাল রাতেই। খুব একটা চিন্তা-ভয়ের কারণ নেই। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক যে হবে না বা হবার নয়, সেই রকমই একটা সন্দেহের গন্ধ যেন পেল কুন্তলা চন্দনের শেষ কথাগুলোর সুরে। এই মুহূর্তে কিন্তু দুঃসংবাদের। গুরুত্বের চেয়ে আকস্মিকতাই ওর মনকে ঝাঁকানি দিয়েছিল। নিজের জীবনের সঙ্গে অবলোকিতেশের জীবনকে এমন ভাবে জট পাকিয়ে ফেলার জন্যে একটা অসহনীয় অশান্তি ওর মনের মধ্যে ছিলই বিয়ের পরমুহূর্ত থেকেই। জট খোলার একটা তাগিদ মনেব মধ্যে থেকে থাকলেও সেটা যে অবলোকিতেশের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে হতে পারে, এমন দুঃস্বপ্ন ও কোনোদিনই দেখেনি। স্বামী হিসেবে অবলোকিতেশকে গ্রহণ করায় ওর মানসিক ও দৈহিক দ্বিধা থকালেও, খুবই আপনজন ছিল অবু ওর কাছে।

তৈরি হয়ে নিতে কুন্তলার খুব একটা সময় লাগে নি। চান করে নিতে যেটুকু সময় লেগেছিল। ন'টা বাজার আগেই মেরীর হাতে চাবি দিয়ে রওনা হয়ে গেল। রাস্তায় চন্দনকে জেরা করে সঠিক খবর যা পেল সেটাও বারো ঘণ্টা আগের পুবনো খবর। তবে ও যেটা সন্দেহ করেছিল সেটাই যে এতক্ষণে হযে গেছে বা হতে চলেছে সে বিষয়ে একরকম সুনিশ্চিতই হয়েছিল কুন্তলা। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে অবলোকিতেশকে কাল রাত থেকেই। ডাক্তারেরা একবকম জবাবই দিয়ে গেছে।

রাত জাগার অবসাদটা একসময় কুন্তলার শরীরকে আচ্ছন্ন করে ফেললেও ঘুম-ঘুম চোখে ঠিক ঘুমিয়ে পড়তে পারে নি ও। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সেটা সম্ভব হয়নি। অদ্ভুত একটা নিষ্কৃতি পাওয়ার হাতছানি আর শোকের মিশ্র অনুভূতি কেমন যেন এলোমেলো ঝড় তুলেছিল ওব মনে। নিজেরই অজান্তে হঠাৎই ঝব ঝর করে অশ্রুধারা নেমে এসেছিল ওর দু'চোখ বেয়ে। চন্দন ওকে সান্ত্বনা দেবার আগেই ও নিজেই অনেকটা হাল্কা করে নিয়েছিল আবহাওয়াকে, অশ্রুসিক্ত চোখে হাসি টেনে। ও-ই সান্ত্বনা দিল চন্দনকে শেষ পর্যন্ত।

: দাদা তোমার ঠিক হয়ে যাবে চন্দন। ম্যালেবিয়ার ছোট ছোট প্যারাসাইট কি অতবড় মানুষটাকে বিনাশ করতে পারে? জানো চন্দন, অবুর মাইকার ওপব কাজের যে পেপারটা

"সায়েন্স"-এ ছাপা হয়েছিল সেটা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে সারা আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলে। অবু কলকাতা যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় 'টাইম' ম্যাগাজিন থেকে ফোন করেছিল এখানে, ওর একটা সাক্ষাতকার প্রতিবেদন ছাপার অনুমতি চেয়ে। অমন একটা মানুষ মশার কামড়ে মরে যাবে, তাও কি হয়?

সান্ত্বনাটা কুন্তলা চন্দনকে দিচ্ছিল কি নিজেকে দিচ্ছিল, সে বিযয ও নিজেও খুব একটা সচেতন ছিল না। হয়ত অবলোকিতেশের মৃত্যু চিন্তার বিবেক দংশন থেকে মুক্তি পেতেই এতসব কথা ওব মনে এসেছিল। কুন্তলাকে মুক্তি দেবাব জন্যে অবলোকিতেশের মতো এক কৃতী মানুষকে চলে যেতে হবে কেন। এমনি একটা নৈতিক প্রশ্ন ওর মনে আসাটা স্বাভাবিক।

কলকাতার কাছাকাছি আসতেই কুন্তলার চিন্তাধারা মোড় নিল বর্তমান পরিস্থিতির দিকে। অবলোকিতেশেব পরিস্থিতির দিকে। অবলোকিতেশের দু'কুলে থাকার মধ্যে এক মাসি। সত্যি কিছু একটা ঘটে গেলে সব দায়দায়িত্ব বর্তাবে ওরই ওপব। একমাত্র ভরসা ওব অবলোকিতেশের অফিসের লোকজন ও কর্মকর্তারা। কুন্তলার বাবা-মা দিল্লিতে থাকেন ভাই-এর সংসারে। ওদের হিন্দুস্থান বোডের বাড়িতে ভাড়াটে আছে। কলকাতায় অবশ্য আত্মীয স্বজন অনেকেই আছে, যাদের কাছে ক'টা দিনের জন্য থাকায় কোনো অসুবিধে হবার কারণ নেই।

কিন্তু অবলোকিতেশের মাসির বাড়িতেই হয়ত ওকে থাকতে হতে পারে শেয পর্যন্ত।

বালি ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়িটা ছুটে চলেছিল। আর কুন্তলা এই সব কথাই ভাবছিল। গঙ্গাব হাওয়ায় মনটা একটু উদাস হয়ে উঠেছিল। দক্ষিনেশ্বরের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা জানাল কুন্তলা অবু ভালো হয়ে উঠুক।

আট

অবলোকিতেশের ভালো হয়ে ওঠার প্রশ্নই ছিল না। কুন্তলার প্রার্থনার অনেক আগেই অবলোকিতেশ পার্থিব ভালোমন্দর বাইরে চলে গিয়েছিল। ওরা যখন শিউলিবাড়ি থেকে রওনা হয় তার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবলোকিতেশ শেয নিঃশ্বাস ত্যাগ কবে।

কুন্তলা যখন উড়বার্ন ওয়ার্ডে গিয়ে পৌঁছল তখন শবযাত্রাব সব প্রস্তুতিই হয়ে গেছে। ওরই প্রতীক্ষায় ছিল অবুর মরদেহ শ্বেত পদ্ম, রজনীগন্ধার ফুলশয্যায। কান্নায় ভেঙে পড়ে নি কুন্তলা। শুধু দু'গাল বয়ে নেমে এসেছিল অশ্রু, নিঃশব্দে।

অফিস থেকে গাড়ি দিতে চেয়েছিল, কুন্তলা নেয় নি। চন্দনের সঙ্গেই শিমূলতলায় ফিরে এল ও ট্রেনে করে তিনদিন, তিনরাত্রি পরে। চন্দনকে কিছু বলে নি কুন্তলা, কিন্তু ও নিজের থেকেই বলে গেল যে অফিসে রিপোর্ট করে দিন সাতেকেব ছুটি নিয়ে ও আজ সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে। কুন্তলা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে কৃতজ্ঞই হয়েছিল। এর আগে মৃত্যুর সঙ্গে কুন্তলাব ঠিক সে বকম কোনো যোগাযোগই হয়নি। অজ্ঞাত, অপরিচিত কোনো মানুযেব মৃত্যুর খবর ও শুনেছে বা অনেক সময় কাগজেও পড়েছে। কিন্তু কোনো আত্মীয়, বন্ধু, এমনকি বিশেষ পরিচিত লোকের বিয়োগ ব্যথায় শোকার্ত হতে হয় নি ওকে এর আগে। কিন্তু হল যখন, তখন বড় নির্মম ভাবেই হল। অবলোকিতেশের সঙ্গে ওর সামাজিক সম্পর্কটা হয়ত একটা পরিহাস ছিল, কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক, এমনকি রক্তের সম্পর্কের ওপরেও মানুযে মানুযে অবিচ্ছেদ্য মনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওর একান্ত আপনজনদেরই একজন ছিল অবু।

চন্দন চলে যাবার পর বারান্দায় চেয়ারে বসে নিজের মধ্যেই নিজেকে হারযে ফেলেছিল কুন্তলা। দেহের ও মনের ক্লান্তিই এক সময় ওকে মুক্তি দিল বেদনার বোমন্থন থেকে। অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কুন্তলা।

মেরী ওকে ডাকে নি। কার্তিকের সন্ধ্যার হিমেল হাওয়াই এক সময উড়িয়ে নিয়ে গেল ওব দু'চোখের ঘুম। বেশ শীত শীত করছিল। ওকে উঠতে দেখে বারান্দার গ্যাসেব আলোটা জ্বেলে চা এনে দিল মেরী। ট্রেনের জামা-কাপড়ই পরা ছিল ওর। চা শেষ করে বাথরুমে ঢুকল ও। মিনিট দশের মধ্যে স্নান সেরে পরিপাটি হয়ে চেয়ার টেনে বসল ও অবুর কাজের টেবিলের সামনে। বাথটেবে গা ডুবিয়েই মনস্থির করে ফেলেছিল কুন্তলা। অবলোকিতেশ নেই। যে নেই, তাকে 'আছে' করা যায় না। অনির্বাণ হারিয়ে গেছে। যে স্ব-ইচ্ছায় হারিয়ে যায়, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। ওদের হয়ত ভোলা যায় না। কিন্তু ওদের নিয়ে সারাটা জীবন চিন্তায় বা দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে দেওয়াব কোনো অর্থই হয় না। ব্যথা-বেদনা যেমন সব মানুযেরই আছে, ঠিক তেমনিই আছে আশা, আনন্দ। সুহাসিনী তো হারিয়েই গেছে, কিন্তু অনিমেষ? অনিমেষ হাবায় নি। কুন্তলাও হারিয়ে যাবে না।

চিঠি লেখার কথাটা কুন্তলা অনেক আগেই ভেবেছিল। সত্যি বলতে কি, সেদিন যদি চন্দন রথ নিয়ে যমদূতেব মতো সাত-সকালে হাজির না হত তা হলে এতক্ষণ হয়ত কুন্তলাব লেখা চিঠিটা প্যান এ্যাম্ নাকি এয়াব ইণ্ডিয়ার কোনো ফ্লাইটে নিউ ইয়র্ক রওনা হযেই যেত। চন্দনের কাছে মাচায়-বসা, হুঁকো-হাতে সুহাসিনী রায়ের খবরটা পাওয়াব পরই অনিমেষকে চিঠি লেখার তাগিদটা চাগিয়ে উঠেছিল। চিঠি লেখার পক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করেছিল ও নিজের মনেই। প্রথমটা পুরোপুরি নৈতিক। পবেব চিঠি পড়াব অপরাধেব জন্যে ক্ষমা চাওয়া। দ্বিতীয়টি কুন্তলাব সংবেদনশীল মনের প্রতিক্রিয়া। পত্রের প্রতীক্ষায় থাকার যন্ত্রণায় ও অনেক ভুগেছে, সেই নিদারুণ দহনজ্বালা আর কেউ পাক সেটা ও চায় না। বিশেষ করে অনিমেষের মতো কবি-প্রাণকে তো নযই। শেয যুক্তিটি বেপাত্তা সুহাসিনী বায়ের ঠিক ঠিকানা না হলেও গোপন আস্তানার একটা আঁচ দেওয়া। রাজরাপ্পার বনবাসী কন্যাই যে অনিমেব বসুর 'সুচরিতাযু' সে বিষয়ে ওব মনে কোনো সন্দেহই ছিল না।

আসলে দহন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল কুন্তলা। অবলোকিতেশ, তানির্বাণের দুঃশ্চিন্তায় দগ্ধানির পরিবেশ থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল ও। চন্দন হয়ত এসে পড়বে এর মধ্যে। তা আসুক, চিঠি লিখতে বসে গেল কুন্তলা:

সুচারিতেযু

আমি শিউলিবাড়ির সুহাসিনী রায নই। বাস অবশ্য আমার শিউলিবাড়িতেই, হয়ত বা তাঁর উত্তরকন্যা। অন্তত আবাসনের সূত্র ধরে এমন একটা কাল্পনিক সম্পর্ক না হয় পাতিয়েই বসলাম।

আপনার শেয চিঠিটি সুহাসিনীর হাতে না বলে বলব কপালে জোটে নি। হাতে তো ভিক্ষেই জোটে, ভাগ্যের প্রসন্নতা জোটে কপালের জোরে। আপনাব ভাগ্যের বিড়ম্বনা হলেও আমার কপালের জোরে লটারিটা আমিই পেয়ে গেলাম।

চিঠিটা আমিই পড়লাম। আপাত দৃষ্টিতে পরের চিঠি পড়াটা সুরুচিব পরিচয নয়, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। চিঠিটা পড়তে বসে অপরাধবোধের অস্বস্তি যে অনুভব করি নি তা নয়, কিন্তু পড়াব পর সে গ্লানিটুকু আব অনুভব করি নি। পত্রালাপ দুই ব্যক্তির একান্তই ব্যক্তিগত পরিধিতেই সীমিত থাকাটাই বাঞ্ছনীয়, মানি। কিন্তু অমন একটি রমণীয় পত্র-সাহিত্যের 'ডেড্ লেটার' অফিসের অন্ধকূপে নির্বাসিত হওয়াটাই কি কাম্য!

সুহাসিনী রায় আজ ঠিকানাহীন। বাড়িঘর বেচে, আপনাব রচিত পত্র সাহিত্যের সঙ্কলনটির মায়া কাটিয়ে অজ্ঞাতবাসে গেছেন তিনি। চতুর্দশ বছবের প্রথম বছরটিও কাটেনি এখনো। হয়ত নাও কাটতে পারে। কিন্তু সে কথা পরে হবে। তার আগে নিজের ক্রমান্বয়ে অন্যায় করে যাওয়ার একটা অজুহাত দি' বরং।

একটা খুন করলে একবারই ফাঁসি হয় আবার দশটা খুনের মাশুলও তাই। আপনার শেষ চিঠি, যেটা আমার পড়া প্রথম চিঠি, সেটা আমায় শুধু উস্কেই দেয়নি, হদিশও দিয়েছিল পরবর্তী অন্যায় করার পথের। সুহাসিনীর ফেলে যাওয়া বাক্স প্যাঁটরা তল্লাসি করে পেয়ে গেলাম ভাস্বতীকে পড়ানো আপনার পত্র-সাহিত্যের গোটা পাণ্ডুলিপিটি। ক'টা দিনই বা গেছে, এরি মধ্যে বেশ ক'টা পরিচ্ছেদ পড়ে ফেলেছি। বাকি অনেকটাই এখনো অপঠিত।

আপনার ভাষাতেই বলছি—আপনাদের দু'জনের "অন্দরমহলে অনুপ্রবেশের" জন্যে শাস্তি আমার প্রাপ্য। কিন্তু শাস্তি দিতে হলে অপরাধীকে পাকড়াও করতে আপনাকে এখানে আসতে হবে। এলে কিন্তু ভালোই হত। না, আমাকে ধরার জন্যে নয়। আমাকে ধরতে কেউ আসে না। যার আসার আশায় ছিলাম সে আসেনি। যে এল, সে ধরে থাকতে পারল না নিজেই চলে গেল। আমার বৈধব্যের আজ চতুর্থ রাত, অন্তত সামাজিক বিধানে। আইনত বিবাহ আমাদের সক্রিয়ই হয় নি। আমার স্বামী সহবাস হয়ে ওঠে নি, যে কারণেই হোক। সুহাসিনী বলেছিল পরমেশের মৃত্যুতে ওকে বৈধব্য যন্ত্রণা পেতে হবে না, কারণ ওরা সহবাস করেছিল গাঁটছড়া না বেঁধেই। আমারটা ঠিক বিপরীত। বিবাহ আমার হয়েছিল, কিন্তু সহবাসের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয় নি।

কথায় কথায় আপনাকেও আমাদের অন্তঃপুরে টেনে আনলাম। এর কারণ হয়ত একটাই। যে কোনো কারণেই হোক আপনাকে চোখে না দেখলেও আপনার চিঠি পড়ে, বিশেষ করে কবিতাগুলি পড়ে আপনাকে মনে মনে দেখেছি, এই রকম একটা গভীর অনুভূতি আমার হয়েছে। দূরে থাকলেও খুব কাছের মানুষ বলেই আমার মনে হয়েছে আপনাকে।

কাজের কথায় আসি। সুহাসিনী রায়ের ডাক-ঠিকানা বলে কিছু নেই। অরণ্যের গভীরে বা সমুদ্রের অতলে ডাক বিলির সরকারি ব্যবস্থা আছে বলে আমার জানা নেই। অতটা না হলেও যেখানে উনি ডেরা বেঁধেছেন বলে কানাঘুষো শুনেছি, সেটা যে ডাকবিলির জোনাল চৌহদ্দির বাইরে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অতএব ঠিকানাই যার নেই, তার ঠিকানা দেব কী করে। তবে হ্যাঁ, আস্তানাটার ভৌগোলিক অবস্থান চোখে না দেখলেও যে দেখে এসেছে তার কাছ থেকেই শুনেছি। ছেলেটি আমার ভাই-এর মতো, আমার প্রয়াত স্বামীর সহকর্মী। আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

সুহাসিনীর ওপর আপনার টানটা আন্দাজ করতে ভুল হবার প্রশ্ন ওঠে না, আপনার চিঠিগুলি পড়ার পর। ওঁর প্রতি আমার টান কিনা জানি না তবে কৌতূহল অসীম। আপনার চিঠিতে ওঁর যে ছবিটা পেয়েছি ওঁকে যারা কাছ থেকে দেখেছে তাদের মুখ থেকে যা শুনেছি, আর ওঁর এই সর্বস্ব ফেলে এক কাপড়ে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা—সব মিলে উনি আমার মনে ভীষণ রহস্যঘন হয়ে আছেন। রহস্য উদঘাটন করার কৌতূহল কার না থাকে বলুন। তাই ভেবেছি চন্দনকে নিয়ে একদিন না হয় দেখেই এলাম আপনার কাব্যের নায়িকাকে।

আপনিও আসুন না। শুভেচ্ছান্তে।

—কুন্তলা

চন্দন যেন কুন্তলার চিঠিটা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। খামের সন্ধানে ড্রয়ার খুলতেই বারান্দায় ওর জুতোর আওয়াজ পেল কুন্তলা। চিঠিটা আর তখন খামে ঢোকানো হল না; এল ও। অবলোকিতেশের মৃত্যু চন্দনকেও কিছু কম মর্মাহত করে নি। কেমন যেন একটা স্তব্ধতা ওকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল একটা দিন। চিঠিটা লেখার পর কুন্তলার মন অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছিল। মুখে হাসি টেনে ও বলল:

: কদিন ধরেই তো বেশ ধকল যাচ্ছে। তারপর ছুট্মুট করে এতটা রাস্তা গেলে আবার এলে। চা-এর বদলে একটু ইয়ে-টিয়ে চলবে নাকি? বাড়ি বদলের প্রথম সন্ধ্যায় অত খাটা-খাটনির পর দাদার সঙ্গে বসে বেশ তো ক'পাত্তর তারিয়ে তারিয়ে খেয়েছিলে, বৌদির সামনে আর লজ্জা কিসের? দেখ না ক্যাবিনেটটায় কি আছে, আমার আবার এ বিষয়ে জ্ঞানগম্যি খুব কম। সুহাসিনী রায়ের আমলের ক'টা স্কচ্ ছিল বলে শুনেছিলাম তোমার দাদার কাছে।

:সুহাসিনী রায় মানে সেই মাচায় বসা, হুঁকো হাতে অরণ্যবাসিনী? বলেন কি, তাঁর আবার স্কচ্ টচ্ চলত না কি? দেখে তো মনে হয়েছিল দৌড় হাঁড়িয়া পর্যন্ত।

ক্যাবিনেট থেকে অনেক বোতলের মধ্যে একটা 'জ্যাক ড্যানিয়েলে'র চ্যাপ্টা বোতল নিয়ে এল চন্দন।

: অ্যামেরিকান হুইস্কি, বার্বন। অনেক নাম শুনেছি। এর আগে চোখে দেখিনি কখনো।

গেলাসে 'জ্যাক্ ড্যানিয়েল' ঢালল চন্দন। কুন্তলা এক মগ ধূমায়িত ব্ল্যাক কফিতে এক চামচ রেমী মার্টা গুলে চুমুক দিল।

: বাবাকে মাঝে মধ্যে খেতে দেখেছি। 'ব্ল্যাক্ কফি লেসড্ উইথ ব্রাণ্ডি" বলতেন।

বেশ অনেক রাত পর্যন্ত ওদের আড্ডাচক্র বসেছিল। বিষয়—সুহাসিনী রায়।

: তীর ধনুকের ভয় যদি না থাকে তবে চলুন আপনাকে একবার অরণ্যদেবীর দর্শন করিয়ে আনি। দেখি, অফিসের জিপটা পাওয়া যায় কিনা।

: অফিসের জিপের দরকার হবে না। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওই পেট্রল পাম্পটাকে আগে থেকে বলে রাখলে ওরা ভাড়াগাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়। আমরা দু' একবার নিয়েছি গাড়ি ওখান থেকে এদিক-ওদিক সফর করার জন্যে।

: তাহলে চলুন আমার এই ছুটির মধ্যেই ঘুরে আসি।

: সে তো হল, কিন্তু গিয়ে যদি দেখিভদ্রমহিলা আদতে সুহাসিনী রায়ই নন। তখন?

: ও, আপনাকে বল হয় নি; সেদিনের ঘটনার পর অফিস থেকে একটু খোঁজখাঁজ নেওয়া হয়েছিল। রাঁচির ল্যাণ্ড রেকর্ডের খাতায় ওই নামের এক ভদ্রমহিলার নাম পাওয়া গেছে। ম্যাক্লস্কীগঞ্জেও ওনার কিছু জমি জায়গা আছে। হুঁকোফুঁকো টানলে কি হবে ভদ্রমহিলা আদতে একটি শাঁসালো চিজ্।

খাওয়া-দাওয়ার পর চন্দন গেস্টরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কুন্তলা মেরীকে না ডেকে কিচেনে ঢুকে আর একটা কফি বানিয়ে শোবার ঘরের চেয়ারে এসে বসল। চিঠিটা খামে পুরে ঠিকানাটা খুঁজতে বিছানার এক পাশে রাখা অনিমেষের চিঠির একটা বাণ্ডিল নিয়ে এল। ঠিকানাটা বেশ পরিষ্কার ছাপার অক্ষরে লিখে খামের মুখ বন্ধ করে দিল কুন্তলা। চোখের সামনেই অনিমেষের চিঠিটা। এটা ওর পড়া হয় নি। ঘড়ির দিকে তাকাল একবার। মধ্য রাত্রি। কফিটাই হয়ত ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

চিঠি হাতে নিয়ে বিছানায় দুটো বালিস পিঠের কাছে রেখে আরাম করে বসল কুন্তলা। মাথার কাছে পেট্রোম্যাক্সের ল্যাম্প জ্বেলে ঘরের অন্য আলোটা নিভিয়ে দিল ও। তারপর পাতলা কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে চিঠিটা হাতে নিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

নিউ ইয়র্কে এখন ওর দুপুর। অনিমেষ হয়ত কলেজের কাফেটেরিয়া বা ক্যান্টিনে বসে লাঞ্চ সারছে। কিম্বা হয়ত কৃষ্ণকলি রোডেমিয়ান মেয়েটিকে টেপে রীবন্দ্রসঙ্গীত শোনাচ্ছে কোনো পার্কে বসে। সুহাসিনী নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে গাছের ওপর মাচার বিছানায়, সাঁওতাল যুবকটির বুকে মাথা রেখে। কুন্তলারও নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে মন চাইল না। চিঠির পাতা খুলে অনিমেষকেই কাছে টেনে নিল ও।

নয়

সুচারিতাসু,

ব্যাপারটা অনেকটা ভরদুপুরে বাঈজিপাড়ায় যাওয়ার মতো। তেনারা তখন শয্যায় শুয়ে গালে দোক্তা কি গুণ্ডি গুঁজে আড় ভাঙেন। রাতের

মাইফেলের রোশনবাঈ বা মিস কাঞ্চনবালারা তখন বাড়িউলি মাসির কাছে বস্তুয়া বা ছোট পট্‌লি। খুলেই বলি।

নিউ জার্সি থেকে ফোন করেছিল ভাস্বতী। পুষ্প পিসিমার জন্যে এক বিশেষ ধরনের 'ফ্লস্' চাই। ঠিকানা দিয়েছিল ব্রড্‌ওয়ের এক ডেন্টাল ক্লিনিকের। এতদিন নিউইয়র্কে আছি, কিন্তু দিনের বেলায় ব্রড্‌ওয়ে প্রদক্ষিণ আমার এই প্রথম। কত নাটক, অপেরাই তো দেখেছি একটা বছরে ব্রড্‌ওয়েতে। কিন্তু সে সবই তো রাতে। কিন্তু সেদিন দিনের বেলায় ব্রডওয়ের বুকে দাঁড়িয়ে জায়গাটাকে ভীষণ অচেনা মনে হল। সত্যি বলতে কি মনের দরজায় একটা ধাক্কা খেলাম। 'সার্দি' তখনো ঝাঁপ তোলে নি। এইট্‌থ্ এভিন্যুর একটা বারে বসে দু'পাঁইট বীয়ার নিয়ে ধাক্কার ধকল সামলালাম কাব্যের মাধ্যমে। শোনাই শুনুন.

ওপথ দিয়েই হেঁটে এলাম আমি,
অথচ দিনের বিবর্ণ আলোয়
ঠিক চিনতে পারি নি
রাতের আলোয় দেখা
'নিওনে' উদ্ভাসিত ব্রড্‌ওয়েকে।
এ আমার চোখের ভুল নয়
তারাদের মতো
ব্রড্‌ওয়েও লুকিয়ে পড়ে লজ্জায়
দিনের উলঙ্গতায়।
আবার তারাদেরই মতো
জ্যোৎস্নার মুখ চেয়ে
ফুটে ওঠে
অজস্র আলোর বন্যায়
রাতের জলসায়।
তারা না হলেও
তারকাদের নিয়েতো চোখে ধরে,
মনেও; সরণির
পাদ প্রদীপের দীপ্তিতে।

এখন,
মধ্যগগনের সূর্যকে মাথায় নিয়ে
ম্যান্‌হাটনের ফ্যাকাসে আকাশের নিচে
কোথায় খুঁজি
সেই রাতের দেখা ব্রড্‌ওয়েকে!
যেদিকে তাকাই
আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে
ম্যান্‌হাটনের দাম্ভিক স্তম্ভের সারি
এমনকি ব্রড্‌ওয়েকে ঘিরেও
একই উদ্ভ্রান্ত ঔদ্ধত্য।
পট বদলায় দিনান্তে
ব্রড্‌ওয়ের দিগ্‌বলয়
স্পষ্ট হয়ে ওঠে
রঙের বলিষ্ঠ রেখায়
আলোর তুলিতে।
সূর্যমুখী ব্রড্‌ওয়ের
বেলা শেষে চন্দ্রমুখী রূপ।
অবগুণ্ঠনের বালাই নেই
নেই লজ্জার আবরণ
শরীরের নগ্নতা
ঢেকেছে সে আলোর আস্তরণে।

ফিল্মের ভাষায় কবিতাটি 'রাস্‌প্রিন্ট্, রাফ্‌কাট্। এডিট করা হয় নি যেমনটি এসেছে কলমের ডগায়, তেমনটিই পাঠিয়ে দিলাম। এডিটার তো আপনিই।

আপনার ব্যাপার-স্যাপার যা লিখছেন তাতে ক্রমশই আমার মনে হচ্ছে আপনি না আবার দিবালোকের ব্রড্‌ওয়ে হয়ে যান আমার কাছে। চিনতে পারব তো আপনাকে দিন-দুপুরে দেখা হলে পথেঘাটে? নাকি রাতের জলসায় মহুয়াবনে দেখা করব? ভ্রূ কোঁচকাবেন না, ফাজলামি করছি। অবশ্য ফাজলামি করার রসদ কিন্তু আপনিই যোগাচ্ছেন· "চল পালিয়ে যাই অনি, আমরা দু'জনে বহু দূরে কোনো তুষারাবৃত পর্বতগুহায়, বা হারিয়ে যাই কোনো অরণ্যঘন নির্জন আশ্রমে। মন দেওয়া-নেওয়ার অপেক্ষায় বসে, বসে আর কত বসন্তের দহন সহ্য করবে এই দেহটা। একে ভোগের বাসনা বলে উপেক্ষা করে কোনো নৈতিক বন্ধনে জরাগ্রস্ত হয়ে থাকতে চাই না আমি। ভালোবাসাই যদি বলো, তোমাকে তো কিছু কম ভালোবাসি না আমি। তবে তুমি কেন গ্রহণ করবে না আমায়?

চিঠিটা সকালের ডাকে এসেছিল। সাদা চোখে পড়ার ফলে আপনার অমন রসালো টোপ্‌টা ঠিক গিলতে পারলাম না। আমাদের সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য পরিণতি আমাকে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি দিলেও ঠিক সক্রিয়, মানে এ্যাক্‌টিভেটেড্ করতে পারে নি। ক্লীব বলবেন? না, কারণটা এই যে, আপনার বিচার পুরোপুরিই যুক্তি প্রণোদিত, হৃদয় অনুভূত নয়। ভালোবাসা নামক বস্তুটি যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে বা নিম্নে আমি জানি না, তবে যে বাইরে,—সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। জিনিসটা সম্পূর্ণ হৃদয় ঘটিত, মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এখানে ঘটনাটা ঘটে, ঘটানো হয় না বা যায় না।

আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনিও আমাকে বাসেন, এটা মেনে নিলেও দুটো ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্যটা কিন্তু থেকেই যায়। যেদিন প্রথম আপনাকে দেখি স্কটিশ কলেজের মেয়েদের কমনরুমের ঠিক সামনে বকুল গাছটার নিচে এক বৈশাখী দুপুরে, সেই চকিত দেখার মুহূর্তেই আপনার ওপর আমার এই ভালোবাসা ঘটে গিয়েছিল। আজ অনেক বৈশাখী ঝড়ের পর শিউলি-পলাশের মোহাচ্ছন্ন পরিবেশে আমাকে ঘিরে নিজের অন্তরে সেই রকম একটা ঘটনা আপনি যুক্তিতর্ক দিয়ে ঘটাতে চাইছেন। সব কিছুই কি ঘটে, না ঘটানো যায়? এই তো ক'দিন ধরেই কয়েকটা কবিতা লেখার চেষ্টায় আছি নিউ জার্সির বঙ্গ সম্মেলনে আবৃত্তি করার প্রত্যাশায়। কিন্তু কবিতাও ঠিক ভালোবাসার মতো অনুভূতি-আশ্রিত। মনের মধ্যে না ঘটলে ঘটানো যায় না। যেটা যায়, সেটাকে আমি বলি পদ্য। ছন্দ বা ধ্বনি মিলিয়ে ডজন ডজন পদ্য হুকুম করলেই লিখে দিতে পারি। কিন্তু অন্তরে অনুরণিত না হলে কবিতার দুটো লাইনও কলমের মুখে আসে না।

ভালোবাসার স্বাদ আপনিও তো আমারই মতো পেয়েছেন। খুব বেশি মানুষের ভাগ্যে কিন্তু এটা ঘটে না। পরমেশকে আপনি ভালোবেসেছেন, ঠিক আমি যেমন ভালোবেসেছি আপনাকে। তফাৎ শুধু এই যে আপনি পরমেশকে পেয়েও হারিয়েছেন। আর সেই হারানোর যন্ত্রণায় দিশাহারা হয়ে গেছেন কিছুটা। আর আমি আপনাকে ভালোবেসেও পাইনি বলে হারানোর যন্ত্রণা পেতে হয়নি আমাকে। একটা কাজের কথা বলি শুনুন। আমাকে উদ্ধারের বদান্যতায় নিজের মনকে ঠকাবেন কেন? আর দরকারই বা কি। আমার ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিয়েই আপনি আমাকে শুধু উদ্ধার নয়, মুক্তিও দিয়েছেন। দুঃখ আমার নিজের জন্যে হয় না। হয় হতভাগা পরমেশটার জন্যে।

বস্তাপচা 'ক্লিশে' শোনালেও বলব, মাণিক ফেলে রঙিন কাচ খুঁজছে ও ট্র্যাস্ ক্যানের মধ্যে। সারা জীবনটাই কাটিয়ে দিলে জাঙ্ক্ হাতড়িয়ে।

আপনার কথামতো চিঠিটা না ছিঁড়ে আপনাকেই ফিরিয়ে দিলাম এই সঙ্গে। চিঠিটা আদৌ ছিঁড়ে ফেলেছি কিনা এই নিয়ে আপনার মনে কোনো সংশয় রাখতে চাইনি বলেই চিঠিটা ফেরৎ পাঠানোই সমীচীন মনে হল আমার। মুহূর্তের উত্তেজনায় যে ভুল সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন, তার সাক্ষরিত বয়ান অন্যের হাতে থাকলে আপনি হয়ত একদিন লজ্জিত, শঙ্কিত, অনুশোচিত হতে পারেন ভেবেই আপনার চিঠিটা অগ্রাহ্য করার ধৃষ্টতা দেখানো সম্ভব হল না আমার। পরমেশকেই সুহাসিনী রায় ভালোবেসেছিল, বাসে এবং বাসবে। মন দান একবারই সম্ভব, কিন্তু দেহ দানের একক সীমাটা বেঁধেছে সামাজিক অনুশাসন। মানা না মানাটা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। কতকটা পরিস্থিতির ওপরও। শুভেচ্ছা রইল।"

অনিমেষ।

পিন দিয়ে আঁটা সুহাসিনীর চিঠিটা হাতে নিয়ে কুন্তলা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এখনো পর্যন্ত ওর পঠিত সব শ্লোকগুলোই ইতি অনিমেষ উবাচে শেষ। ইতি সুহাসিনী উবাচ শ্লোক এই প্রথম ও হাতে পেয়েছে। হয়ত বা শেষও। প্রথম ক'টা লাইন বাদ দিয়ে গেল ও। পর্বতের গুহায় ও অরণ্যে যাবার আহ্বান তো অনিমেষের চিঠিতেই পড়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ছত্র থেকেই শুরু করল ও:

"অনি, অনেকগুলো বছর পাঁড় মাতালদের মতো সকালে উঠেই খোঁয়ারি ভাঙার আছিলায় আবার বুঁদ হয়ে যেতাম নেশায়। মনটাকে কোনো অবকাশই দিইনি ঘোর কাটাবার। তাই পরমেশের কাছ থেকে দূরে সরে এসেও আমার দেহ, মন আচ্ছন্ন ছিল পরমেশ নামক তীব্র মাদক দ্রব্যটির নেশায়। নিঃসঙ্গ জীবনকে আঁকড়ে ধরেও ওর সর্বনাশা সঙ্গ থেকে দেহমনকে মুক্ত করতে পারি নি অনেক নিদ্রাহীন রাতে। কিন্তু হঠাৎই একদিন সেই নাগপাশ ছিন্ন হয়ে গেল, যেন যাদুমন্ত্রে এক অদ্ভুত পরিবেশে।

রাতটা ছিল মাঘী পূর্ণিমার। মহুয়ার নেশায় মাদলের উন্মত্ত শব্দতরঙ্গের তালে তালে প্রাণ খুলে নাচছিলাম আমি। একা নই। আমাকে স্পর্শ করে, আমাকে বাহুলগ্ন করে নেচে চলেছিল আমারই সঙ্গে আদিম পুরুষ প্রকৃতির মিছিল। মসৃণ মসীকৃষ্ণ শরীরে সে কী অনুপম ভাস্কর্য, দৃষ্টিতে সে কী বন্য তীক্ষ্ণতা, তা আমি তোমায় বোঝাতে পারব না অনিমেষ। ধারিয়া, থিংরা, সাগিনার মধ্যে প্রকৃত পুরুষের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম সেই অরণ্য ঘন সাঁওতাল পল্লীতে জ্যোৎস্নার আলোয়। হঠাৎ যেন ঘোর কেটে গেল। মনে হল অনেক, অনেক কৃত্রিম পুরুষ পরমেশ। প্রকৃতির কাম্যই যদি পুরুষ হয়, তবে কৃত্রিম পুরুষের কাছে ধর্ষিত হতে যাব কোন দুঃখে। সেদিন রাতের আনন্দবন্যায় দেহবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বকথাই স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিল আমার চেতনায়। তুমি মানো আর নাই মানো, পরমেশ আমার মন থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছিল বলেই আমার এখন বিশ্বাস। প্রেম মনে করে যেটাকে আঁকড়ে ছিলাম সেটা আসলে ওর দেহের আকর্ষণ। সেই দৈহিক আকর্ষণের অক্টোপাস থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনের এই পড়ন্ত রৌদ্রে হঠাৎই যেন মনে হচ্ছে নতুন করে মন আমার আবার মুকুলিত হচ্ছে।

চিঠিটাকে কিন্তু আত্মসমর্পণ বা আত্মদান বলে ভুল বুঝো না। পরমেশের ভূতটা আমার ঘাড় থেকে যাওয়ার পর থেকেই একটা অপরাধ বোধ যেন আমাকে ছেঁকে ধরেছে। তোমার জীবনের শূন্যতার জন্যে অনেকটাই হয়ত দায়ী আমি। মরীচিকার পেছনে ছুটেছি মরূদ্যানকে উপেক্ষা করে। ভুল ভাঙার পর পথ চিনে ফের মরূদ্যানে ফিরে এলেও মরুদ্যানের দরজা খোলা থাকে কিনা সে উত্তর আমার কাছে নেই। তোমার কাছেও যদি না থাকে তবে এই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো অনিমেষ। এটা আমার অনুরোধ, কারণ এই চিঠিটার অস্তিত্ব থাকলেই প্রত্যাখ্যান করার বা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষতটা আমাদের দু'জনের সহজ সরল সুন্দর সম্পর্কটার মধ্যে অযথাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তোমার কৃষ্ণকলির খবর কি? আমিও ভাবছি 'কৃষ্ণকলা'তেই হয়ত মজে যাব শেষটায়।

ভালো থেকো।

—সু

চিঠি পড়ে কুন্তলার বেশ রাগই হল সুহাসিনীর ওপর। অনিমেষ তো তার কর্তব্য বরং একটু বেশি বেশিই করেছিল। চিঠিটা ছিঁড়ে না ফেললেও ফেরৎ পাঠিয়েছিল। ছিঁড়ে ফেলাটা তো সুহাসিনীর অনুরোধ।

পরে অবশ্য কুন্তলার মনে হয়েছিল, ভাগ্যিস। ছিঁড়ে ফেললে তো তার আর পড়াই হত না চিঠিটা। কৃষ্ণকলির বৃত্তান্ত হয়ত অনিমেষের কোনো না কোনো অপঠিত চিঠিতে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু 'কৃষ্ণকলা'? চন্দনের কাছে তার হদিশ তো পাওয়া গেছে। কিন্তু চিঠিটা না পড়লে সুহাসিনীর স্বীকৃতিই তো পাওয়া সম্ভব ছিল না।

ইচ্ছে থাকলেও সেই রাতে কুন্তলার আর "ময়নাপাড়ার মাঠে" গিয়ে কৃষ্ণকলির "কালো হরিণ চোখ" দেখা হয় নি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল। চিঠিগুলো পড়েই রইল বিছানায়।

দশ

চন্দন আজ দু'দিন হল ফিরে গেছে ওর ঘাটশিলার ক্যাম্পে। ইতিমধ্যে বাবাও এসে ফিরে গেলেন। মেয়েকে সঙ্গে করে দিল্লি নিয়ে যেতে এসেছিলেন ব্রজেনবাবু।

কুন্তলা যায় নি। মুখের ওপর ঠিক 'না' বলতে পারে নি। বলেছিল ওর ক'টা দিন সময় চাই। মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে নিজের বিলিব্যবস্থার কথাটা ভাবা যাবে। শিউলিবাড়ির নিভৃত পরিবেশের সঙ্গে নিজের মনের একটা মিল খুঁজে পেয়েছিল ও। এই মুহূর্তে তাই শিউলিবাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবার কথা ও ভাবতে পারে নি।

দর্শন নিয়ে ডক্টরেট করার কথাটা মাঝেমধ্যেই মনে উঁকি দিয়ে গেছে। যদি তাই করবে বলে ঠিক করে, তবে বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনো শুরু করবে, এইরকমই একটা ইচ্ছে আছে। বাইরে বলতে আমেরিকার কথাই মনে হয়েছে প্রথম। নিউ ইয়র্কে গেলে কেমন হয়। অধ্যাপক অনিমেষ বসুর কলেজে? অনিমেষ কি দর্শনের অধ্যাপক? হবেও বা। যেরকম তত্ত্বকথা আওড়ায় চিঠির পর চিঠিতে।

চন্দন চলে যাবার পর দুটো দিন-রাতের বেশিরভাগ সময়টাই চিঠিগুলো নিয়েই পড়েছিল কুন্তলা। কাল রাতেই পাণ্ডুলিপির সবটুকুই পড়া হয়ে গেল। সিরিয়ালটার শেষ ক্যাসেটটা তো প্রথমেই দেখা হয়ে গিয়েছিল ওর। ফলে বাকি কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাকের মতো এক ঝলকে দেখেছিল ও। তবুও পুরো গল্পটা নিটোল হয়ে ধরা পড়ে নি, সুহাসিনীর উত্তরের অনুপস্থিতির কারণে।

না, কৃষ্ণকলির "কালো হরিণ চোখ" সম্মোহিত করতে পারেনি অনিমেষের মনকে। দেহকে হয়ত বা করে থাকতেও পারে। কিন্তু সে রকম কোনো আভাসও অনিমেষের চিঠিতে ছিল না। আশাও করেনি কুন্তলা। অনিমেষের বিষয়বস্তুটা আগাগোড়াই মন নিয়ে, দেহ নিয়ে নয়। আদিরসের ছিটে যে একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে তার বেশির ভাগটাই নিছক ফাজলামিতে ভরা। অথচ আশ্চর্য, নিষ্কাম প্রেমেরও ধ্বজা ওড়ায় নি অনিমেষ। মনের দেউড়ি না খুলে দেহের অন্তরে যাঁরা পাঁচিল টপকে প্রবেশ করে তাদের আপনি কী বলবেন জানি না। আমি বলব রেপিস্ট। প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয়লীলার যাত্রায় শেষ ইস্টিশনটার নাম আমার কেতাবে 'যৌনপুর'। কিন্তু যাত্রা শুরু 'হৃদয়নগর' থেকে। আমার কপালটাই যে হৃদয়নগরের সড়ক দিয়েই হাঁটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু পৌঁছতে পারলাম কই? পথ অবরোধ করে বসেছিল পরমেশ। এই চিঠিটা কালই রাতে পড়েছে কুন্তলা। প্রতিটি লাইন বেশ স্পষ্ট মনে পড়ল ওর।

চিঠিগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে কুন্তলার মনে হল অবয়বহীন অনিমেষ ওর কাছে অনেক স্বচ্ছ, পরিষ্কার হয়ে এসেছে। চিঠির মধ্যে দিয়েই অনিমেষ যেন মেলে ধরেছে নিজেকে কুন্তলার মানস-চোখে। কিন্তু যাকে চিঠিগুলো লেখা, যাকে কেন্দ্র করেই চিঠির প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য গড়ে উঠেছে যার প্রশস্তি বা বন্দনাই প্রতিটি চিঠির বিষয়বস্তু, সেই সুহাসিনী রায় কিন্তু আবছা হয়েই রয়ে গেল ওর মনে।

সুহাসিনীকে চাক্ষুষ দেখার একটা সুযোগ এসেছিল, কিন্তু সে প্রচেষ্টাও সফল হয় নি কুন্তলার। চন্দনকে নিয়ে গিয়েছিল ও বাজারাপ্পার সেই ডেরায়। তীরন্দাজটির সঙ্গে দেখা করেও সুহাসিনীর দেখা মেলে নি কথাবার্তায় মনে হয়েছিল উনি রাঁচি বা ম্যাকলাস্কীগঞ্জ গিয়েছেন। হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল কুন্তলাকে।

অনিমেষকে লেখা চিঠিটা বেশ ক'দিন হল চন্দনকে দিয়ে অফিস মারফৎ কলকাতা থেকে পোস্ট করা হয়ে গেছে। ওর হাতে পৌঁছবার সময় অবশ্য এখনো হয় নি। দিন দশ পনেরো লেগেই যায়। হয়ত বেশিই। কুন্তলার মনে হল আবো একটা প্রশ্ন থেকেই গেছে অনিমেষের পত্রপ্রাপ্তির ওপর। ওর শেষের বেশ ক'টা চিঠিতেই স্পষ্ট না হলেও ইঙ্গিত আছে, ইতিমধ্যে ওর বাইরে যাবার—লণ্ডন, ডাবলিন্, এমনকি ভারত সফরেরও। সেমিনার, লেখার অ্যাসাইন্‌মেন্ট, হয়ত বা সুহাসিনীব আমন্ত্রণে কাগজ-কলম নিয়ে শিমূলতলাব অরণ্য আশ্রমে কাব্যচর্চার তাগিদে। শেষটা হয়ত 'উইস্‌ফুল থিঙ্কিং কুন্তলার। হোক, তবু বেশ রোমাঞ্চিতই হয়েছিল ও। মনে মনে বলেছিল, অনেক অঘটনই তো ঘটে। এটাও ঘটুক না।

রেডিওটা চালাতে উঠে টেবিলের চিঠিগুলোর দিকে নজর পড়ল কুন্তলাব। গুছিয়ে বাণ্ডিল কবে কোণের ঘরে ট্রাঙ্কটায় যেমন ছিল তেমনই রেখে আসবে বলে উঠলও। ট্রাঙ্কে চিঠিগুলো রাখার সময চোখে পড়ল অ্যালবামটা। সেদিন চিঠি আবিষ্কারের উত্তেজনায় অ্যালবামটা আর চোখে আসে নি। আজ ট্রাঙ্ক খুলতেই বাঁ কোণে রাখা ওটার ওপরই নজর পড়ল প্রথম। সামনের বেতের মোড়াটা টেনে ওইখানেই ছবি দেখতে বসে গেল কুন্তলা। একটার পব একটা পাতা উল্টে, ছবির পব ছবিব ওপর চোখ বুলিয়ে, যে উৎসাহ নিয়ে অ্যালবামটা খুলেছিল সেটা বেশ চুপসে গেল। সুহাসিনী, পরমেশ, অনিমেষ, অনেক মুখের মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিল। অনেক স্ন্যাপ শট্, কিন্তু সবই গ্রুপ ছবি। সনাক্ত করণেব কোনো উপায়ই খুঁজে পেল না কুন্তলা। বেশিবভাগ ছবিতেই একই মুখের মিছিল। কে যে কে, সেটা আন্দাজ করে নিতে হয়। গোটা চারেক ছবিতে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি যে পরেশবাবার শিষ্যা, ওদের সবারই ইউনিভার্সাল পুষ্প পিসিমা, সেটা ঠিকই আন্দাজ করেছে বলে মনে হল কুন্তলাব। কিন্তু বাকি প্রায় ডজন খানেক ত্রিশ ছুঁই ছুঁই সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদেব মধ্যে কে যে অনিমেষ আর কে যে পরমেশ আর কে-ই বা সুহাসিনী সেটা বলে দেবে কে? ছবিগুলির নিচে স্থান-কাল লেখা আছে কিন্তু পাত্র-পাত্রীর পরিচয় নেই। কুন্তলার জেদ চেপে গিয়েছিল। ও তাবই মধ্যে একজনকে সুহাসিনীর আসনে বসিয়ে দিল, আর একটায় অনিমেষকে· পরমেশের সন্ধানে ও গেলই না মোটে।

ছবিগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় তোলা। নিউ ইয়র্কে বেশি। ক্যাটস্কিল মাউন্টেন, জোন্স বিচ্, জর্জটাউনের তেলেভাজার দোকান, রকেফেলার সেন্টার। কুন্তলা একবার টেলিফোনটার দিকে তাকাল। চন্দনকে ডাকবে নাকি? সুহাসিনীর সনাক্তকরণ চন্দন নিশ্চয়ই করতে পাববে। হুঁকো হাতে মাচায় বসা মেয়েটিকে বকফেলার সেণ্টাবে খুঁজে না পেলে তেলেভাজাব দোকান চিনতে পারা খুব একটা শক্ত হবে না। কিন্তু অনিমেষ? মানুষটা একটা জিজ্ঞাসা হয়েই রইল কুন্তলার মনে।

দুপুরের খাওযা-দাওয়ার পর দিল্লিতে বাবাকে চিঠি লিখতে বসল কুন্তলা। ওখানে ডক্টরেট করতে গেলে শিমূলতলায় বসে স্বপ্ন দেখলে তো চলবে না। অনেক কিছু খববাখবরেব প্রয়োজন। নিজের ইচ্ছা জানিয়ে বাবাকে অনুরোধ করল ও। দিল্লির ইউ এস. এডুকেশন ফাউণ্ডেশানে গিয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়ে ওকে যেন চিঠি লেখেন উনি। কলকাতায় ওব মাস্টার মশাই দর্শনের ডিপার্টমেন্টে হেড ডক্টব গুহকেও একটা চিঠি লিখল কুন্তলা। একসময় উনি খুবই উৎসাহিত করেছিলেন কুন্তলাকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। উনি কেমব্রিজের ওপরই জোর দিয়েছিলেন। কেমব্রিজের নাম তখন আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই করেছিল কুন্তলাকে বেশি। আজও যে করে না তা নয।

চিঠিদুটো লিখতে লিখতে বেলা গড়িয়ে গেল। দিন ছোট হয়ে আসছে। বাতাসে শীতের আগমনী সুব। উলের একটা আলোয়ান গাযে জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসল কুন্তলা। বেশ নিঝুম নিস্তব্ধ চারিদিক। ছোট্ট শহর। এমনিতেই কোলাহল কম। সন্ধেবেলা যেন আরো মৌন হয়ে যায়। শব্দের মধ্যে ইস্টিশন থেকে ভেসে আসা রেলগাড়ির চাকা চলার আওয়াজ। অবিরত ট্রেন চলেছে শিমূলতলার বুকের ওপর দিয়ে। ইস্টিশনটা কলকাতা- দিল্লির মেইন লাইনেব ওপর। তাই আপ-ডাউন ট্রেন চলার যেন শেষ নেই। থামে না প্রায় কেউই শিমূলতলায়, তবে চরণস্পর্শটুকুই দিয়েই যায়।

কী মনে করে হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল কুন্তলা। পেট্রোম্যাক্সটা মেরী একটু আগেই সিলিং থেকে ঝোলানো লোহার চেনটায় টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। তারই আলোয় সময় দেখে নিল। এই সময় কলকাতা থেকে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ায় শিমূলতলায়। অবলোকিতেশ এই ট্রেনটাতেই আসত। আব একটা ট্রেন সকালের দিকে আসে। সন্ধের ট্রেনটার আওয়াজ কুন্তলার কানে আসতেই ও ঘড়ি দেখেছিল।

অবলোকিতেশ আর আসবে না, কিন্তু তবু অবলোকিতেশেব কথাটাই ওব মনে হয়েছিল ট্রেন থামার শব্দে। অবু কি সত্যিই ওকে মুক্তি দিয়ে গেল, নাকি নির্বাসন? অবু কেন, কেউই আর আসবে না এখানে কুন্তলার কাছে। অনি ভুলে গেছে ওকে, অবু মৃত, অনিমেষ বসে আছে সুহাসিনীর অপেক্ষায়। উপেক্ষিত কুন্তলা পলাশেব অবণ্যে তবে কার প্রতীক্ষায় বসে আছে?

মেরী টেবিলে খাবাব সাজিয়ে ডেকে গেল কুন্তলাকে আর বলে গেল যে ও আর ওর মবদ একটু মিশন থেকে ঘুরে আসছে। কুন্তলা যেন দরজা বন্ধ কবে শুয়ে পড়ে।

খাওয়া সেরে শুয়েই পড়েছিল কুন্তলা। ঘুমিয়েও। কাঁচা ঘুমের মধ্যেই গেট খোলার শব্দটা কানে এল বলে মনে হল ওর। মেরীরা ফিবল মনে করে চাদর টেনে শুয়েই রইল ও। চোখ দুটো জড়িয়ে আসতে সময় লাগল না একটুও। ঘুমের ঘোরেই একবার যেন মনে হল গাড়িব ইঞ্জিনের শব্দ। ঘুমটা ঠিক ভেঙেও ভাঙল না। বাস্তিরে গাড়ি আর ট্রেন চলার আওয়াজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওর কান। এখন ঘুমের মধ্যে খুব বিরক্তিকব মনে হয় না ওর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই উঠে পড়তে হল কুন্তলাকে ধড়ফড়িয়ে। গেস্ট রুম আর বসাব ঘরেব মাঝখানে করিডবের মুখে বাংলোর সদর দরজায় দুম্‌দুম্ করে কে যেন তবলায় তেহাই বাজিয়ে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই হয়ত। কুন্তলার যখন খেযাল হল তখন তালের মাত্রা বেশ উঁচু পর্দায় উঠেছে।

ঘুম চোখেই 'কে? কে?' বলে ধড়ফড়িযে উঠে পড়ল কুন্তলা। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্সের আলোটা শুতে যাবার আগেই ক্ষীণতম মাত্রায় নামিয়ে এসেছিল ও। বালিশের তলা থেকে টর্চটা হাতে নিয়ে সদর দরজার মুখে এল কুন্তলা। টর্চের আলোটা বেশ মিনমিনে, ব্যাটারিগুলোর আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বারান্দায় পেট্রোম্যাক্সেব ক্ষীণ নীলাভ আলো আরো যেন অস্পষ্ট কবেছে আগন্তুকেব মুখ। রুদ্ধ দরজার ওদিক থেকে ভেসে এল উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত কণ্ঠস্বব.

"সুহাসিনী। সুহাসিনী।"

দরজা খুলে আলো-আধাঁরে আবছা-আবছা ভেসে আসা মুখের দিকে তাকিয়ে কুন্তলা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল:

'আপনি?'

বাঁধভাঙা বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষেব মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরার উল্লাসে দুটো হাত জড়িয়ে ধবল কুন্তলাকে

: আমি অনিমেষ, সুহাসিনী, অনিমেষ. . .... .

শিক্ষা দুঃসংবাদ

মাদ্রাসা-কেচ্ছা

কে এই আব্দুস সাত্তার? দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অধ্যাপক। কত বছরের অভিজ্ঞতা? চারুচন্দ্র কলেজে সদ্য চাকরি পেয়ে তিনটি বছরও পেরোন নি নিতান্তই জুনিয়ার লেকচারার, এক লম্ফে মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি। পকেটে পার্টির লাল কার্ড।

"রোদে রাঙা ইটের পাঁজা
তার উপরে বসল রাজা
ঠোঙাভরা বাদামভাজা
খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না,".....

মোটামুটি এটাই হল মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঁটাটি গলায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থা। ১৮৭০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে দরিদ্র মুসলিম ছাত্রদের আইন শেখানোর জন্যে কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু, তাকে এতদিনে সরকার প্রায় কালিয়া বানিয়ে ছেড়েছেন।

হাদিশ-কোরাণের প্রাধান্য বজায় রেখে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, তাকে আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষিত করার সূচনা করে গেছিলেন মন্ত্রী আব্দুল বারি মশায়। তারপর ১৯৮৬ সালে তরুণ তুর্কী মন্ত্রী শ্রী আনিসুর রহমান এসে মাদ্রাসা বোর্ড সভাপতি বিধায়ক মোস্তাফা বিন্ কাশেম এবং মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক নুরুল হককে নিয়ে রে রে করে নেমে পড়লেন সংস্কারে। কট্টরপন্থীদের তুমুল বিরোধিতা ও আক্রমণকে তুচ্ছ করে যে ভাবে তাঁরা পথ কেটে কেটে অগ্রসর হচ্ছিলেন, যেভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সঙ্গে সমান করে ফেললেন মাদ্রাসা শিক্ষার মানকে, তা মোটেই ভালো কাজ নয়। অনগ্রসর এলাকায় দরিদ্র ও গোঁড়া মুসলিম পরিবারের সন্তান, বিশেষত মেয়েরা এর মাধ্যমে যেভাবে এগিয়ে যেতে লাগল, তাতে হৃৎকম্প কার না হয়। শিক্ষিত হওয়া মানেই 'জো হুজুর' বলতে অস্বীকার করা। আর এমন বেঁকে বসলে ছেঁকে ভোট তোলা বন্ধ।

তরুণ শ্রী আনিসুরের মগজে ঘিলু এতটা পরিপক্ব হয় নি। তিনি ভেবেছিলেন অনগ্রসর সমাজে শিক্ষার প্রসার করাই শ্রেষ্ঠ ব্রত। ব্রত নয়, ক্ষত। ভাবা যায়, মাত্র একবারের মন্ত্রীত্ব কালে ৮৪টা নতুন মাদ্রাসা শিক্ষা-কেন্দ্র অনুমোদন করে দিলেন। পার্টি শিক্ষাকেন্দ্র হলে না হয় কথা ছিল। প্রায় দেড়গুণ বেড়ে গেল ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা। পার্টিকর্মী সংখ্যা বাড়ল কি? কট্টরপন্থী, শুধুমাত্র কোরাণ-হাদিশ কেন্দ্রিক মৌলভি সাহেবদেরকে নিরন্তর বুঝিয়ে আধুনিক শিক্ষার স্বপক্ষে আনছিলেন তিনি। ভুলে গেছিলেন, শিক্ষার আড়ালে ভোট ভিক্ষাই আসল দায়।

এ তো নিট লস্। উল্টে কোন কুলে বেড়ে উঠবে প্রহ্লাদ। আনিসুর তো নয়, আন্-অসুর।

হঠাও। ভাগাও। নির্বাসন। নির্বাচনের গুরুত্ব যে মাথায় রাখে না, তার জন্যে উপযুক্ত হল নির্বাসন। মনুষ্যকুল ছেড়ে পাঠাও তাকে গোকুলে—গরু ছাগলের মধ্যে, গোকুলে বাঁশি বাজান তিনি, বয়েই গেল। প্রাণী সম্পদ বিকাশ-গোকুলে নির্বাসিত হলেন তিনি।

বসিয়া থাকিব, কিছু না করিব, কিছু না শুনিব কানে। মাদ্রাসা সে তো লাগে ভাসা-ভাসা, আমি যে অন্য ধ্যানে।— কে আছেন এমন মহাপুরুষ, গ্যাঁট হয়ে চেয়ার থাবড়ে বসে থাকবেন শুধু, পর্বত নড়ায় কে। খুঁজেপেতে বেরিয়ে পড়ল। তিনি শ্রীল শ্রীযুক্ত কান্তি বিশ্বাস। যেমন করে উত্তাল সমুদ্রে তেল ঢেলে ঢেউ শান্ত করা হয়, তেমনি করে থিতিয়ে দিলেন সব উৎসাহ। নতুন মাদ্রাসা অনুমোদনে তিনি একেবারে কঞ্জুস দ্য গ্রেট। ভাবখানা এমন, মাদ্রাসা স্কুল খোলা নয়, যেন পৈতৃক ধনরত্ন ভরা সিন্দুকের ডালা খোলা। যাবতীয় গ্রাণ্ট যেতে লাগল, শুধু স্কুলগুলোতে। আনিসুর সাহেব থাকাকালীনই মাদ্রাসা বোর্ড স্বয়ং শাসিত হয়েছিল। কান্তিবাবু তাকে এমন শাসনে রাখলেন যে আজ অবধি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি ছাড়া আর কোনো নতুন আমলার পদই তৈরি করতে দিলেন না। স্কুল সার্ভিস কমিশনে মাদ্রাসার প্যানেল এমন কায়দায় করলেন যে প্যানেল আর কার্যকরী হবার চ্যানেলই খুঁজে পেল না। তিনি কিনা ঘোরতর কম্যুনিস্ট। সিনিয়ার মাদ্রাসা, সেখানে ঐশ্লামিক শিক্ষার ভাগ একটু বেশি, তা কখনো অনুমোদন করতে পারেন তিনি? তাহলে যে মৌলবাদী তৈরি হবে। সর্বনাশ।

তবে সন্দেশখালি, তাঁর জায়গা, যেখানে তিনি ভোটে দাঁড়ান, তাঁর দেওয়া সন্দেশ খেয়ে খেয়ে সেখানকার মুসলমানরা এতই মিস্টি হয়ে গেছে যে মৌলবাদী নয়, একমাত্র মার্কসবাদীই হতে পারে। অতএব একমাত্র সিনিয়ার মাদ্রাসাটি অনুমোদন পেল সন্দেশখালির গাবাটিতে। এ নিয়ে যিনি ম্যালা প্রশ্ন তুলবেন তিনি অবশ্যই পার্টির শত্রু এবং মাদ্রাসা শিক্ষার শত্রু তো বটেই। মাদ্রাসা শিক্ষার পরম মিত্র একমাত্র মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কান্তি বিশ্বাস, যিনি ঐশ্লামিক তত্ত্বের কিছুই বোঝেন না। কথায় বলে, অজ্ঞের শতগুণ। নতুন মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়ে তিনি কখনোই মুসলমানদের ক্ষতি করতে চান না। তাঁর চেয়ে বড় বন্ধু মুসলমানদের আর কে আছে! কিন্তু ওরা তা বোঝে না। কথায় বলে—মূর্খের শত দোষ।

না, আর একজন সদ্য উদিত হয়েছেন। তাঁর আবার গুণের শেষ নেই। তিনি বাবু আব্দুস সাত্তার। নব নিযুক্ত মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি।

আনিসুর সাহেবের সঙ্গে বিদায় দেওয়া হয়েছিল অভিজ্ঞ ও উৎসাহী বোর্ড

সভাপতি অধ্যাপক মোস্তাফা বিন কাশেমকে, এত উন্নতি ভালো নয়—এই তত্ত্ব মাথায় রেখে। তাঁব জায়গায় বসানো হল আব্দুস সাত্তারকে। সাত্তার সাহেবের মতো বিবল গুণধর ব্যক্তিকে তো অল্প আলোয় আনা যায় না। মোস্তফা সাহেব বেতন নিতেন এক টাকা। সাত্তাব সাহেবেব জন্যে এই কুর্সিব বেতন ধার্য করা হল মাসিক তেত্রিশ হাজার টাকা। সঙ্গে গাড়ি।

কে এই আব্দুস সাত্তার? দীর্ঘ—র্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অধ্যাপক। কত বছবের অভিজ্ঞতা? চারুচন্দ্র কলেজে সদ্য চাকরি পেয়ে তিনটি বছরও পেবোন নি নিতান্তই জুনিয়ার লেকচাবাব, এক লম্ফে মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি। পকেটে পার্টির লাল কার্ড। মাথার ওপবে করিৎকর্মা গুরু জ্যোতির্ময ঘোষ, পার্টিব লাঙ্গুল আশ্রয কবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদালযে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব অধ্যাপকের কুর্সিতে ক্রমশ উল্লম্ফনের কৃতিত্ব দেখিযে যিনি তাক লাগিয়েছেন। দ্বিতীয় তাক লাগিয়ে দিলেন তাঁব চরণাশ্রিত পার্টি ও গুরু নাম হি কেবলম্ আব্দুস সাত্তারকে লম্ফ শিখিয়ে।

সাত্তার সাহেব মোটামুটি কান্তি বিশ্বাস মশায়ের মনোমতো। দিব্য বশম্বদ। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে লাটে তোলার জন্যে এই দুই মহারথীই যথেষ্ট।

আমবা ভাবিয়া আশ্চর্য হই না যে কী বিচিত্র এই দ্যাশ, আমরা ভাবিয়া আশ্চর্য হই যে এই দ্যাশ আমাদিগকে আজও ভাবায। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, সাত্তার সাহেব অপেক্ষা ওই পদে যোগ্যতর কেহ ছিল না? তবে পাল্টা প্রশ্ন শুনিতে হইতে পারে—অযোগ্যতর আর কেহ ছিল নাকি পার্টি-প্যানেলে, যে ঠোঁট ফাঁক কবিবাব পূর্বেই উঠিয়া দাঁড়াইবে, মূর্খতব বশম্বদ কেহ? থাকিলে হইলে হইতেও পারিত সে আব্দুল সাত্তার অপেক্ষা যোগ্যতর।

পরস্ব সংবাদদাতা

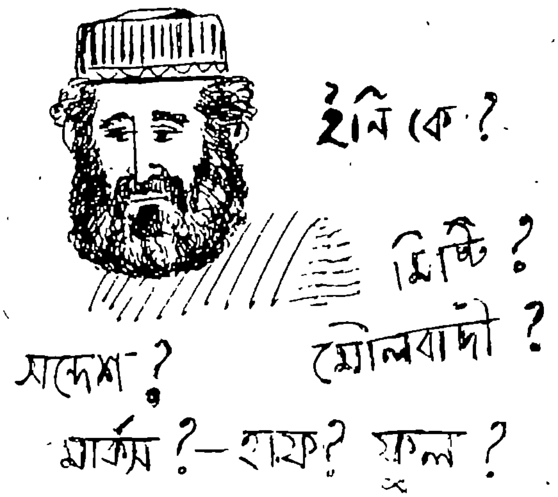
ইনি কে?
মিষ্টি?
মৌলবাদী?
সন্দেশ?
মার্ক্স?—হাফ? ফুল?

তাঁর দেওয়া সন্দেশ খেয়ে খেয়ে সেখানকার মুসলমানরা এতই মিস্টি হয়ে গেছে যে মৌলবাদী নয়, একমাত্র মার্কসবাদীই হতে পারে।

ঐ শব্দটি শিল্পীদের ক্ষেত্রে অপ্রযুক্ত হয়েছে বলে দুঃখিত। — সম্পাদক

পত্রপাঠ শিল্পী-সমাচার

জনৈক ব্যক্তি পত্রপাঠ-এর একজন শিল্পী সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিলেন. উনি এখন 'ফিট' তো?

সম্পাদক লাফিয়ে উঠলেন,—অমন অলুক্ষুনে কথা মুখেও আনবেন না, সামনে পুজো সংখ্যা।

কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে সম্পাদক মন্তব্য করলেন : আপনাদের আশীর্ব্বাদে উনি এখনো পর্যন্ত আন-ফিট্ই আছেন।

বিশেষ সূত্রে প্রকাশ : শিল্পীর ফিটের ব্যামো।

পত্রপাঠ-দপ্তরে এক অঙ্কন-অনুরাগী হন্তদন্ত হয়ে এসে একজন শিল্পী সম্পর্কে শুধোলেন,—ওনাকে আমাব খুব দরকার। অসুস্থ ছিলেন শুনেছি, আশা করি এখন সোজা হয়েছেন।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন সম্পাদক,—গেট আউট। বলে, কত কষ্টে বাঁকানো গেছে!

হাঁড়ির খবর: এই শিল্পীব স্পণ্ডেলাইসিস। মাঝে মাঝে ঘাড় এমন শক্ত হয়ে যায, তিলমাত্র নোয়ায় কাব সাধ্যি।

পত্রপাঠের পাঠকদের জানাই শারদ অভিনন্দন

শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

৩৫-এ এবং বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০০২৫ (ভবানীপুর থানার বিপরীতে)
৪৭৫-২২৭৮

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের
দুটি অনবদ্য বহু প্রশংসিত ভ্রমণকাহিনী
আবার ইউরোপ ৪০ টাকা
আমার আমেরিকা আবিষ্কার ৪০ টাকা
এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-১২

রসনিবন্ধ

প্রধান অতিথির অভিভাষণ:

বিদ্যাসাগর মূল্যায়ন

করুণা মুখোপাধ্যায়

সেদিন মধ্যরাত্রে—যখন প্রাত্যহিক নৈশ শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চা শেষ করে কিঞ্চিৎ আন্দোলিত অবস্থায় বাসায় ফিরছি, তখন হঠাৎ ভীষ্মদেব খোসনবীশ মহাশয়ের প্রপৌত্র নিঃস্বদেব খোসনবীশের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস্ করলাম—কোথ্থেকে?

—বিদ্যাসাগর মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মরণসভা থেকে।

—এত দেরিতে? সে তো কবেই—

—হ্যাঁ, প্রস্তুতিপর্বে একটু বাঙালি সুলভ 'লেট' হয়ে গেছে। আয়োজকরা অবশ্য তার জন্য পূর্বাহ্নেই প্রথামাফিক ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

বলেই চলে যাচ্ছিলেন। 'সভা কেমন হল?' জিজ্ঞেস করতেই পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা পুস্তিকা বার করে দিয়ে গেলেন। মন্তব্য করলেন—প্রধান অতিথির অভিভাষণ : বিদ্যাসাগর মূল্যায়ন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি জনৈক শিক্ষিত বাঙালির শ্রদ্ধার্ঘ্য। (অবশ্য জনৈক নিন্দুকের মতে এই শতবার্ষিক স্মরণ আসলে শতবার্ষিক আদ্যশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ।) এতে যে ভর্ৎসনা-শব্দ ও বাক্যগুলি আছে, তা সুগভীর ভালোবাসায় স্নেহচ্ছলে উচ্চারিত। ব্যাজস্তুতির পরাকাষ্ঠা।

পুস্তিকাটি খুলে দেখি :

বিদ্যাসাগর, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের লজ্জার সীমা নাই। ধিক্ তোমার জননী ভগবতী দেবীকে, যিনি তোমার মতো এক জাতিছাড়া গোত্রছাড়া পুত্রের জন্ম দিয়া এই সুমহান বাঙালি জাতিকে পুরুষানুক্রমে চিরকালের জন্য লজ্জার সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। ধিক্ তোমার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যিনি তোমার মতো এক সৃষ্টিছাড়া পুত্রের জন্মকে সম্ভব করিয়াছেন—যাহাকে আমরা—

চিনিতে পারি নাই, বুঝিতে পারি না, মাপিতেও পারি না;
ফেলিতে পারি নাই, রাখিতেও পারি না;
কাছে দাঁড়াইতে পারি না, দূরে সরাইতেও পারি না;
ভাঙিতে পারি না, অথচ ভাঙাইয়া না খাইলেও চলে না।

হে ধৃষ্ট (= দুষ্টু), রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসরণেই বলি, যথার্থই তুমি এ দেশের—বিশেষত এ রাজ্যের বড় বড় মানুষগুলিকে নিয়তই ছোট করিতেছ, লজ্জিত করিতেছ। এ রাজ্য অতি উন্নত মানের সার প্রয়োগের দ্বারা বর্তমানে বড় মানুষ উৎপাদনে দেশের মধ্যে রেকর্ড করিয়া, তাহা ভাঙিয়া এবং পুনরায় গড়িয়া চলিতেছে। অসিত মুদ্রার মাত্রাধিক সঞ্চয়ে কিংবা 'পি-পি-সি-এস'-এর (প্রোগেসিভ পিপ্‌ল্‌স্ কালচারাল সোসাইটি, প্রকৃতপক্ষে 'পরস্পর পিঠ চাপড়ানো সমিতি') সদস্য হইয়া ইহারা অনিঃশেষ যত্ন সহকারে নিজের বড়ত্বকে প্রতি মুহূর্তেই রঙিন বেলুনের মতো ফুলাইতেছেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, যখনই কোনো সভা সমিতিতে ইঁহারা তোমার সম্পর্কে কথা বলিতে থাকেন, তখনই শ্রোতা দর্শকের চোখে অনিবার্য তুলনায় তিনি নিজে ক্রমশই ছোট হইতে থাকেন।। তোমার জন্যই না তাঁহাদের এই ক্ষীণায়ন, হীনায়ন, অবনমন ও চুপসায়ন। ইহা কি জাতীয় ক্ষতি নহে?

হায়, কেন তোমার জন্ম হইয়াছিল? আর হইল তো হইল, এ দেশে হইল কেন? আবার এ দেশে যদ্যপি হইল তো এই জগৎশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির মধ্যে হইল কেন?

বর্তমানে এ রাজ্যে নবোদ্ভাবিত বিশ্ববিখ্যাত মারক্ষীয় স্ক্যানিং যন্ত্রে তোমার চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ চলিতেছে। শিখা ও উপবীত রক্ষণ, পিতৃ-মাতৃভক্তি, শ্রীহরিশরণং ইত্যাদি কুসংস্কার, পরের দুঃখে অনিবার্য হৃদয় বিগলন ও দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করিয়া তাহাকে অপমান করার মানসিক রোগ, ইংরাজের দোষানুসন্ধান ও ভবিষ্যতিক সম্ভাব্য রাশিয়ার গুণানুসন্ধান না করার মানসিক সংকীর্ণতা, বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি ও ভদ্রসমাজ ছাড়িয়া সাঁওতাল পল্লীতে আত্মগোপনের রহস্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান ও তন্নির্ভর ঘোলা সাহিত্য রচনার ফসল।

হে নাবালক (= শিশু ভোলানাথ), তোমাকে তৈরি করার পিছনে তদীয় পিতৃদেবের অদূরদর্শিতা ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাব অতিমাত্রায় প্রকট।। এত স্বর্ণপ্রসূ ও কামধেনু তুল্য পেশা থাকিতে তিনি তোমাকে পণ্ডিত করিতে চাহিলেন এবং তুমিও অনর্থক গাদাগুচ্ছের টেক্সট্ বই পড়িয়া পণ্ডিত হইলে। তোমার কেরিয়ার ঠিক নির্বাচন হইল কি? নব্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উৎপাদন—নেতা বা প্রমোটার কিংবা দারোগা কিংবা উকিল কিংবা ডাক্তার কিংবা মাস্টার—কিছুই হইতে পারিলে না। অর্থ, সময় ও শক্তির অপচয় ঘটাইয়া তুমি কিনা পণ্ডিত হইলে। পণ্ডিতের বাজার এ রাজ্যে ভালো নয়। পণ্ডিতের

কি অভাব আছে? ট্রেনে-বাসে কিংবা অফিসে অষ্টঘণ্টার নব কর্মসংস্কৃতি চলাকালীন যতিহীন আলোচনায় নব্য পণ্ডিত আর নব্য সমালোচককে গরম খোলার উপর খৈ এর মতো ফুটিতে থাকে। হায়, পণ্ডিত হইয়া সারাটা জীবন শিক্ষার বীজ লইয়া তুমি কিনা এদেশের উলুবনে ছড়াইয়া গেলে। তোমার দুর্ভাগ্য যে নব্য বঙ্গের অনবদ্য সৃষ্টি “ইন্দুর দৌড়’ -এর পথিকৃতের শিরোপাটি তোমাকে দেওয়া গেল না।

হে অদূরদর্শী (এখানে 'অ' = অতি) যুবক, তুমি এমনামন সব কাজ করিয়া গিয়াছ যে তাহারই আলোকেই না আমাদের 'সবেধন নীলমণি' বা 'স্টাম্প কাউ' রবীন্দ্রনাথ আমাদের চরিত্র বিশ্লেষণের সুযোগ পাইয়া আমাদের পক্ষে মারাত্মক এবং পরম লজ্জাজনক ও ক্ষতিকারক জাতীয় ত্রুটিগুলি উদ্‌ঘাটিত করিলেন এবং প্রস্তুত করিলেন সেই অসহ্য অমূল্য অমোঘ ঐতিহাসিক তালিকা : 'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না. .'। ইত্যাদি ইহা বিবেকীদের নিকট কি কম অস্বস্তিকর? এখানে বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ—নিপাত যাক, নিপাত যাক।
তাঁর প্রস্তুত ঐ কালা লিস্ট—ছিঁড়ে ফেলো, পুড়িয়ে ফেলো।
..... ইত্যাদি।

অর্ধশতাব্দীর অধিক হইল রবীন্দ্রনাথ গতাসু হইয়াছেন। ইতোমধ্যে 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি'তে আমাদের জাতীয় চরিত্রে আরো কিছু অনুরূপ বৈশিষ্ঠ যুক্ত হইয়া বিবেকীগণের অস্বস্তির মাত্রা বাড়াইয়াছে। ভরসা শুধু ইহাই যে—আজ তুমিও নাই; আর কখনো এই স্বর্ণবঙ্গে তোমরা আসিবেও না; তাই আত্ম-স্বরূপ পুনরুদ্‌ঘাটনের আর কোনো সম্ভাবনাই নাই। তাই এক দিকে ঐ কালা শব্দ 'বিবেক'কে অভিধান বহির্ভূত করার ব্যবস্থা করিতেছি, অপর দিকে নিয়ত খুন-জখম-গণহত্যা-গৃহদাহ ঘটাইয়া এবং প্রতিদিন সংবাদপত্রে তাহা চিত্রসহ সবিস্তারে ছাপাইয়া অশিক্ষিত বোকা মানুষগুলির বিবেককে মুহুর্মুহু আঘাতের দ্বারা অসাড় করিয়া দিবার পাকা বন্দোবস্ত করিতেছি।

হে বিপথগামী (এখানে 'বি' = বিচিত্র/বিভিন্ন), তুমি নিজে 'গোপাল বালক' ছিলে না, অথচ সকলকে 'গোপাল' হইতে বলিয়াছিলে। আমরা তোমার এই কথাটি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া স্বর্ণাক্ষরে ছাপাইয়া ও বাঁধাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছি। তাই আমরা নিজে যাহা করি, অপরকে তাহার বিপরীতই করিতে বলি, এমনকি মুখে যাহা বলি, কাজে তাহার বিপরীতই করি। আবার অপরকে যাহা করিতে বলি নিজে তাহা ভুলিয়াও করি না। এবং তুমি যাহা করিয়া গিয়াছ আমরা তাহার বিপরীত কাজই করি। তুমি স্বয়ং চলিয়া যে পথে চলিতে বলিয়াছ, আমরা তাহার বিপরীত পথেই চলি। আবার প্রকাশ্যে অপরকে তোমার নির্দেশিত পথেই চলিতে বলি। কিন্তু আমাদের গূঢ় ইঙ্গিত বুঝিয়া ভিন্ন পথাবলম্বনকারীকেই ক্রোড়ে তুলিয়া আদর করি ও তাহার মুখে ললিপপ দিয়া কণ্ঠ হইতে সুকৌশলে সোনার হারটি খুলিয়া লই।

হে হতভাগ্য বঙ্গসন্তান, তোমার এবং আমাদের দুর্ভাগ্য যে তুমি ভুল সময়ে জন্মিয়াছিলে—তুমি পরাধীন ভারতে জন্মিয়াছিলে। তাই তোমার জীবৎকালে তোমার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নাই, তোমাকে প্রকৃত মূল্যাদানও করা যায় নাই। যদি তুমি একালে জন্মাইতে এবং একালের বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবীদের মতো শুধুমাত্র আমাদেরই সমর্থন করিতে (সমর্থনযোগ্য এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেই বা আছে?) তাহা হইলে তোমাকে আমরা এ রাজধানীর জ্যোতি-উদ্ভাসিত অমরাবতী লবণ হ্রদ শহরে হর্ম্যসহ ভূখণ্ড দিতে পারিতাম। (আহা; ঐ 'ইয়ে' সাঁওতালগুলোর মধ্যে থাকিয়া তুমি কত কষ্টই না পাইলে।) দরিদ্র জনগণের অর্থে বৎসরে একাধিকবার সপরিবার ও সবান্ধব বহির্ভারত ভ্রমণের সুযোগ তোমাকে করিয়া দিতে পারিতাম। তোমাকে কোনো-না-কোনো কমিটির এবং বারংবার বিভিন্ন দুর্মর কমিশনের চেয়ারম্যান করিয়া দিতে পারিতাম। স্ত্রী-ভূষণ-রত্নাদি কিংবা সাম্মানিক ডক্টর করিয়া দিতে পারিতাম। অন্তত আর কিছু না হৌক, শিক্ষক-দিবসে রাজ্যপালের শংসাপত্র দিতে পারিতাম। হায়, এখন আমরা কী করিব? যত্রতত্র শুধু তোমার নামটি সুবিধামতো ব্যবহার করিয়া কিছু গোছানো ছাড়া আর আমাদের করণীয় কিছুই নাই।

হে বাস্তববুদ্ধিহীন, অপরিণামদর্শী বৃদ্ধ, তুমি করিলে কী? দেশ জাতি দুঃখী শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিতদের নির্বিচারে (অর্থাৎ বর্ণান্ধের মতো 'কালার' বিচার না করিয়া) শুধু ভালোবাসিয়া সমবেদনা-সঞ্জাত দয়ার স্রোতে আপন স্থাবর-অস্থাবর, মায় কৌপীনটুকুও ভাসাইয়া দিলে। অবস্থার পরিবর্তন তথা উত্তরণ ঘটাইতে পারিলে না। একমাত্র পুত্রের জন্য লোক কী-ই বা না করে? বাহ্যত সম্পর্ক না রাখিয়াই তো কত কী-ই-না করা যাইত। বিরোধীপক্ষ ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কৌশলে সংগোপনে সমঝোতা না করিয়া, শুধুমাত্র সততা, আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি বস্তাপচা প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়া পুরাতন বুর্জোয়া মূল্যবোধকে অবলম্বন করিয়া তুমি নিজেই বারংবার পদত্যাগ-পূর্বক পলায়ন করিলে। এইরূপ আচরণকে আমরা সমর্থনও করি না, অনুসরণও করি না।

হে হঠকারী দাতা, তুমি বাঙালি মাতার কোমল হৃদয়কে গ্রহণ করিয়া দুঃখী দেখিলেই কাঁদিয়া ভাসাইয়াছ এবং কুসংস্কার বশত মাত্রাতিরিক্ত দান করিয়াছ এবং ফলত বংশধর সহ ডুবিয়াছ। আমরা তোমার সহানুভূতি সমবেদনা ইত্যাদি যাবতীয় মেলোড্রামাটিক হৃদয়-দৌর্বল্যকে 'দুর্বলতা' বলিয়া জলাঞ্জলি দিয়াছি। দান-দয়া-সাহায্য ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বকে অপমান। আমরা বাঙালি মায়ের ইমেজটাকেই পাল্টাইয়া দিয়া—সাজ পোশাক, চুলের রং-মুখের ভাষা ও খাদ্য মায় আচার আচরণেও পরিবর্তন ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক রূপ দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছি।

হে ক্ষুদ্রাকার মানব-সন্তান, তুমি তোমার বাস্তব অস্তিত্বের দৃষ্টান্ত দ্বারা সেকালে বহু বড় বড় মাপের (৪৪×৬৪×৫৪) মানুষকে চুপসাইয়া দিয়াছিলে, এ কালেও তোমার বিদেহী ও অমর আদর্শ আমাদিগকে নিরন্তর তুলনামূলক বেকায়দায় ফেলিতেছে। ইহা ঠিক নহে। অথচ আমরা তোমাকে কী দিই নাই। তোমার বিরুদ্ধে ধ্বনি দিই নাই। আমরা তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিতে না পারিলেও সুদৃশ্য ফ্রেমে কিংবা প্রস্তর মূর্তিতে আবদ্ধ করিয়া কুলুঙ্গিতে স্থান দিয়াছি।

হে আমাদের পরমাদরের নাড়ুগোপাল, হে আমাদের শ্রেষ্ঠ দেবত্র শালগ্রাম শিলা, হে আশু-তোষ ভোলানাথ, 'এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে—এই অভিনব আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর বিকল্পহীন ব্যবস্থায়—এই অভিনব আন্তর্জাতিকতার পটভূমিকায় ও গ্যাট-ম্যাড্ বিশ্বায়নের বিষধোঁয়া কুয়াশার আবহাওয়ায় তুমি কুলুঙ্গিভুক্ত হইয়াই অবস্থান করো। বৎসরে একটি-দুটি দিন তোমার মার্জনার বন্দোবস্তই বলবৎ রহিল।

তুমি নহে, তোমার নীতি কিংবা আদর্শ নহে, তোমার অসহনীয় ও চরম অস্বস্তিকর জীবন-বাণীও নহে, তদ্‌বিপরীত সবকিছুই আমাদের আদর্শ হউক, তোমার উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তি নহে, তদ্‌বিপরীত—তাহার অন্তরালবর্তী ছায়াই আমাদের পথ-প্রদর্শক হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শা-ন্তি-হি—।।

টীকা : গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—“সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং সর্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি। মা শুচঃ।” এরই যুগোপযোগী পাঠান্তর—”সর্বপার্টিণং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বং সর্বচার্জেভ্যঃ রক্ষায়িষ্যামি। মা সোচো।”

সাময়িক চিত্রমালা : পল্লব চক্রবর্তী

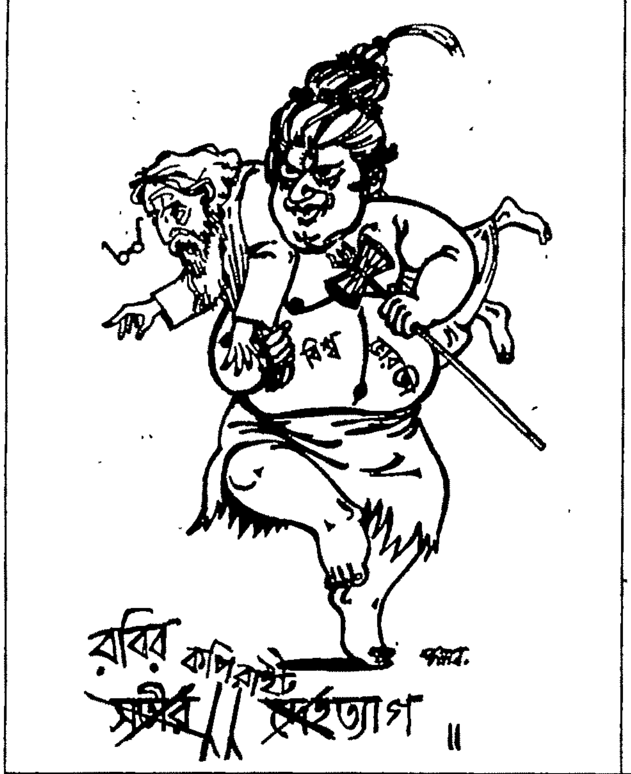

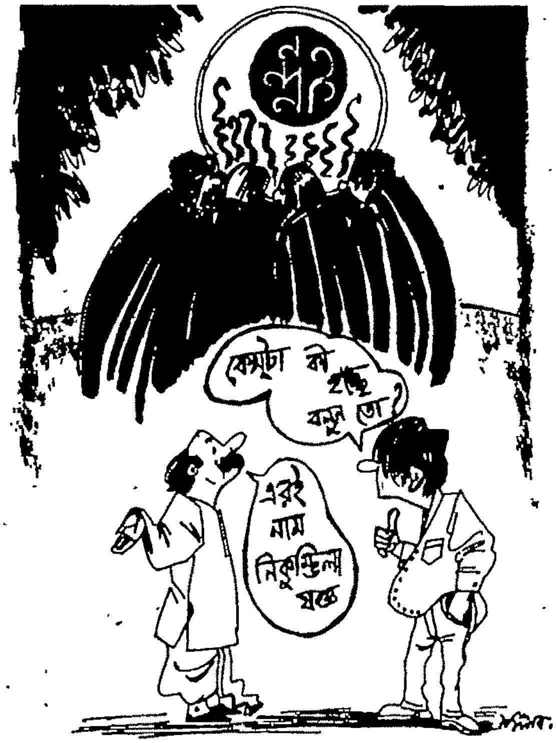

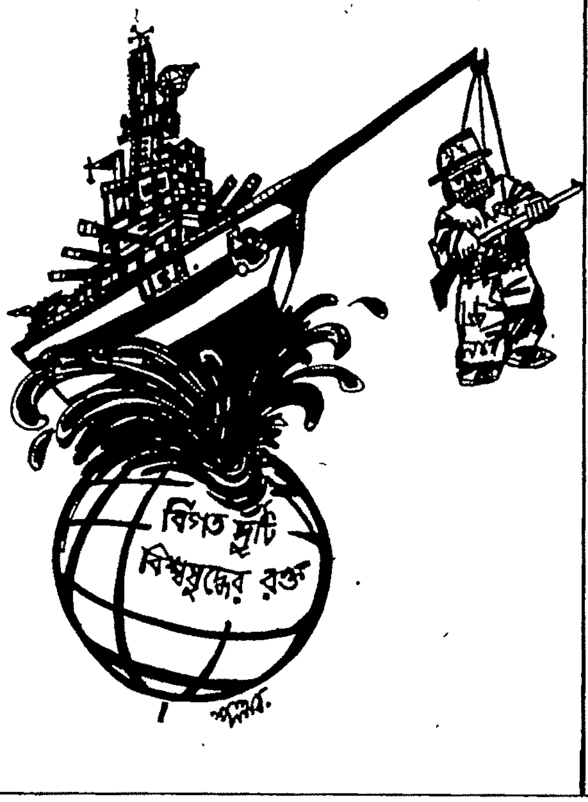

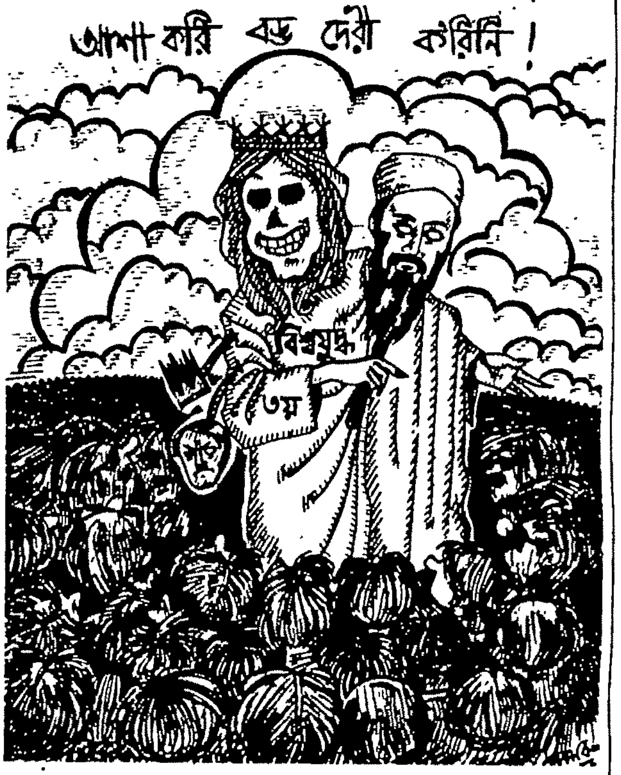
আশা করি বড্ড দেরী করিনি !
বিশ্বযুদ্ধ
ভয়

ধোঁয়া কন্যার রূপকথা

টুপুর রানী

যখন আমি ছিলাম ছোট্ট
যাতাম খেলিতি ধোঁয়ার মাঠে
একদিন এক ধোঁয়াকন্যা
প্রশ্ন করল কৌতুহলে
এই ছাবাল্‌ডা
কী নাম রে তোর?
আমি বল্লাম,
ধোঁয়ামন্তর।
ধোঁয়া কন্যা রেগে বেগুন,
ফালতু কথা। অমন কি নাম
কক্ষনো হয়?
আমি বল্লাম
অবশ্যই হয়। আগে আমার
গপ্পো শোনো।
সে বলল, শুনব না, যা—
সেই তো নায়ক, সেই নায়িকা
সেই তো একই মেশিনগ্যান-
সেই তো একই নায়কবাবু
প্লেনে চুড়ে—
শুনব না আর,
ওসব খারাপ।
বল্লাম আমি, তোমার জন্যি
ফাঁদ করবো নতুন কুরে।
সে বুললে, ঠিক করবি?
তা হলে বেশ
জবরদস্ত করতি হবে।
থাকবে মনে?
ফাঁদ কুরে আমারে দিস।
আমি বল্লাম, তোমার জন্যি
ফাঁদ কুরবো ভূমণ্ডল এক।
করতি করতি ফাঁদ যখন
সবে হল হাপ-হাপ-হাপ
হঠাৎ তখন ঢুকল ভূত
আমার মাথায়—
ধরতি ধরতি গেলাম চুলে
ছোট্টবেলার ধোঁয়ার মাঠে
দেখি গিয়ে না দেখা মুখ

এট্টাও নি এ তল্লাটে
এক জনেরে হুলো মনে
কেবমপানা ওরই মধ্যি
এগিয়ে যেয়ে কই গো তারে—
তুমি কি সেই? ধোঁযা-কন্যা
তুমি কি সেই?
সে বুলেছে, মনে নি
আমার সে সব মনে নি।
আমি বল্লাম, তুমি আমারে
ফাঁদ করতি বুললে—
সে বুলল, সঙ্গে আছে
ভাসায় দ্যাও গ্যাঙের জলে।
আর হ্যাঁ, শোনো—এখন আমি
ধোঁয়া নি আর, এখন সবাই
কুয়াশা বুলে ডাকে আমায়।
বুলেই হঠাৎ গায় মাখিয়ে—
মাথা থেকে পা গায মাখিয়ে
গায় মাখিয়ে—
অন্য অন্য
কুয়াশা, বিষ্টি সঙ্গে নে
মিলিযে গেল খরস্রোতায়
মিলিয়ে গেল দূরি কোথায়
দূরি দূরি...
কুয়াশা বুলে ডাকে আমায়
কুয়াশা বুলে ডাকে আমায়—
নিজির মনে বলতি বলতি
বুসে রয়েছি আমি কেবল
ভেজা-ভেজা কাপড় জামায
গাছের তলায়
বুসে রয়েছি
কুয়াশা নাকি ধোঁয়ার জন্যি
হঠাৎ করে
অন্য এট্টা কুয়াশা আমায়
দেখতি পাইয়ে বুলল—এতে
মন খাবাপের কিচ্ছু হয নি।
যাও ফিরে যাও ফাঁদ করো।
এখন সময় পুবো শিকাবেব

আমরা সবাই এখন তাই
দেশে দেশে ব্যস্ত ভীষণ
তুমিও যাও, মন দ্যাওগে
তোমার কম্মে।
শিকার থেকে আমরা ফিরে
আমরা যাব তোমাব কাছে।
এক পৃথিবী ফাঁদ কবব
করব বুলে
ঘর ছেড়ে সেই বারিয়ে আলাম
বড় উঠোনে
উঠোনে আলাম
সঙ্গে কেবল বাঁশ ও পেরেক
থাকব একা, একা দুটো
ফুটিয়ে খাব—
দু'চারটে
বাঁশ ও পেরেক,
যখন যেডা আসবে হাতে
ফাঁদ বানাব
ফাঁদ বানাব।
ভূমণ্ডলের হাজার বকম
স্বপ্ন দেখার
সাধ্য থাকবে যে রূপকথার
সে সব গপ্পো আমার একার।
ঘাড় গুঁজে রাত
বানাতি বানাতি
ঘাড় গুঁজে দিন
বানাতি বানাতি
মুছেছে রাত মুছেছে দিন
যখন আমার বানানোর হাত
অসাড় হল,
মনে পুড়ল

বছর কি মাস, সাল কি তারিখ
সে সব কথা
আর পারি নি।
উঠোনের দিক চেয়ে দেখি
এক উঠোন কুরব বুলে
এট্টাও ফাঁদ শেষ করি নি।
সাথে সাথে ধোঁয়াব মতো
কুয়াশা এল উঠোন পরে
সারাজীবনের ফাঁদের পরে
কুয়াশা এল এই উঠোনে
বাইরে তখন গাছের নিচে
নাচছে ছাগল আনন্দিত
ও-গাছ সে-গাছ উড়ছে পাখি
পাখি বুলছে এই উঠোনে
ব্যাধের জন্যি আমরা থাকি।
বুলছে ওবা ব্যাধের জন্যি
কোনো জাগায় কোনো জাগায
আমরা কিন্তু হাব মানি নি—।
তখন ব্যাধ ঘরের থে
চেয়ে বুযেছে অনেক দূবে
বনের উপ্‌বে মাঠেব উপ্‌রে
বনের উপ্‌রে
সেই যেখানে জন্মবাত
কুয়াশা পড়ে, কুয়াশা পড়ে
কেউ যায় নি সেই যেখানে
কেউ যায় না কোনো দিনই—
আজকে সে ব্যাধ দেখতে পাচ্ছে
লম্বা গাছের তলায়
ইদিক-সিদিক ঘুরে বেড়ায়
বস্তামোড়া ধোঁয়াকন্যা—
বাচ্চাবেলাব সেই কন্যা।

ব্যক্তিত্ব সংবাদ

সত্যপ্রিয় মুখোপোধ্যায়

বায়রন আয়রন ডাম্বেল হাতে নিযে
ক্যাম্বেল বড় ভালোবাসতেন,
ওনাকে দেখতে নাকি পাশের বস্তি থেকে
জি. বি. এস রেগুলার আসতেন।
চেষ্টার কিলো নয়, চেস্টাবটন তিনি
সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব
টন টন ওজনের চেস্টাবটন নিয়ে
মিল্টন হাটে-মাঠে ঘুবত।
একদিন ইয়েভেতুশেঙ্কোব সিগাবেট
দশখানা কাঠিতেও জ্বলে নি,
বাত্তিলিয়াস বলে, পাস্কেল কোনোদিন
মুখ ফুটে 'রাস্কেল' বলেনি।

মহিলা মহল

'ফিস-ফিস' বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : **কমলিকা ও প্রাণঘাতিনী দেবী**

কমলিকা আবার ফিরে এসেছেন। এখন থেকে আপনারা ঠিক করে নিন ঢিলটা কার দিকে ছুঁড়বেন—কমলিকা না প্রাণঘাতিনী।

আপনার প্রাণের দায় আপনারই।

মাল নিজ দায়িত্বে রাখিবেন।

● আমার বয়স ৫৮। কম বয়সে প্রেম করি নি বলে খুব আফশোষ হয়। এখন কি আর কোনো চান্স আছে?

সম্পা চক্রবর্তী, চন্দ্রকোণা , মেদিনীপুর।

☐ ইংরেজি মতে আছে। ওরা বলে লাইফ্ বিগিনস্ এ্যাট ফর্টি। সে হিসেবে আপনি এখন অষ্টাদশী।

● আমি অত্যন্ত আধুনিক মনস্কা। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর ভীষণ সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। অথচ আমি মাছ খেতে ভীষণ ভালোবাসি এবং আধুনিকতাও বজায় রাখতে চাই। কী খেতে পরামর্শ দেন?

কৌশিকী ঘোষাল, রামরাজাতলা, হাওড়া।

☐ আপনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রমতে ফিস কবিরাজি গ্রহণ করতেই পারেন। সঙ্গে আধ্যাত্মিক মতে 'বাম'— পেগে নয়, কোয়াকুয়িতে।

● বড় বড় নখ রেখেছি বলে ও খুব রাগ করে। একদিন খামচেও দিয়েছে। কী করে ওকে সামলাই। একটু পরামর্শ দিন না?

ঝরণা রায় চৌধুরি, হাতিবাগান, কলকাতা-৬

☐ এটা কীরকম হল? নখ আপনার, আর খামচানো ওর? কিছুদিন নখ ধার দেওয়া বন্ধ রাখুন।

● প্রাণঘাতিনীদি, আচ্ছা, অন্যের প্রেমের যত সমস্যার সমাধান আপনি করে দিচ্ছেন। আপনার প্রেমের রেজাল্ট কী?

তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়, নিউজলপাইগুড়ি।

☐ তা জেনে আপনার Love ?

● 'মহিলার' সঙ্গে আবার 'মহল' জুড়েছেন কেন? আমরা মহিলা— মহিলাই থাকতে চাই। অন্য কিছুর সঙ্গে আমাদেরকে লেপ্টে দেবার পুরুষ নৈতিক অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মধুছন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাত-২০।

☐ আমি অটলকাকুকে বলে দেব আগ্রার ওটার নাম 'তাজমহিলা' করে দিতে।

● আমি ভীষণ ভালো রাঁধি। খেয়ে দেখেছি—অসাধারণ। কিন্তু অন্যকে খাওয়ালেই নাক সিঁটকোয়, কেন বলুন তো?

চন্দনা দস্তিদার, স্টেশনরোড, দুর্গাপুর

☐ সবাই তো আর আপনার কর্তাটি নয়!

● মার্ক টোয়েন নাকি বলেছিলেন, বই চুরি, চুরি নয়। আচ্ছা, প্রেমিক চুরি কি চুরি? আমার বান্ধবীর প্রেমিকটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ওটাকে গাপ্ করার তালে আছি। অন্যায় করছি? সঙ্গে গাপ্ করার একটা সহজ উপায়ও যদি বাতলে দেন তো কৃতজ্ঞ থাকি।

মনোরমা দাস, জয়নগর, মজিলপুর, দঃ ২৪ পরগণা।

☐ আপনার বান্ধবীর সঙ্গে প্রথমে নিজের প্রেমিকটির পরিচয় করিয়ে দিন, দেখবেন দু'জনের টেবিল থেকেই গাপ্ করার গপ্‌গপ্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

● ভোর হলেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, ওর ভাঙে না। রাত ন'টা বাজলেই আমার ঘুম পেয়ে যায়, ওর পায় না। এই নিয়ে রোজ খিটিমিটি। এর সমাধান কী?

চন্দ্রিমা দাস, সল্টলেক, কলকাতা।

☐ রাতে আপনার 'ওকে' আপনার সঙ্গে 'খুনসুটি' করতে বলুন আর সকালে আপনি 'ওর' সঙ্গে 'খুনসুটি' করুন। দেখবেন খিটিমিটি মিঠিমিঠিতে পাল্টে গেছে।

● আমি যখনই কোনো কথা বলতে শুরু করি, একটু বাদে বাদেই দেখি আমার স্বামীর হাই উঠছে। মেজাজ এত্ত গরম হয়ে যায়, কী বলব।

বনশ্রী সামুই, ছত্রআড়া, বাঁকুড়া।

☐ মনে হচ্ছে ওটা হাই নয়, আপনার কথার মধ্যিখানে আপনার স্বামী কিছু বলার জন্যে মুখ ফাঁক করছেন কিন্তু আপনার দুর্ভেদ্য কথার মধ্যে সেটা গুঁজে দিতে পারছেন না।

● জিনিস কোন্ জিনিস যতখুশি টেনে বড়ো করা যায়?

শম্পা ব্যানার্জী, দমদম, কলকাতা।

☐ ইলাস্টিক? না না সে তো ছিঁড়ে যাবে। ওঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, টিভি সিরিয়াল।

K. C. Das Introduces Free Home Delivery

Relax at Home & Enjoy the mouth watering taste of :

- Rossomalai
- Chhanar Payesh
- Amritakumbha
- Gulab Jamun
- Keshar Rajbhog
- Fruit Yoghurt
- Malai Chumchum

ROSSOGOLLA

Sweets & Snacks for the Diabetics and many more

- Singara
- Radhaballavi
- Soya Roll
- Chanachur
- Dalmoot

HURRY !! CALL AT
554 1348/ 4007, 248 5920
* Conditions apply

সেরা খাবারের দায়িত্ব আমাদের
সুইট্‌স্ এ্যাণ্ড স্ন্যাক্‌স্
প্রো ঃ কাবেরী রাণা
২৬৫ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া-১

সহস্রাব্দের সুদৃঢ় পদক্ষেপ
নন্দলাল ঘোষ এণ্ড সন্স
দই-মিষ্টির দেশজোড়া খ্যাতি
৩১ মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৯

পত্রপাঠ বিশ্রাম

পত্রপাঠের অম্ল-কষায় খাদ্যাখাদ্য নিয়মিত সেবন করিতে করিতে পাঠকদিগের প্লীহা ও যকৃতের অবস্থা নাকি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি পূজা সংখ্যার প্রবল ভারে শয্যাশ্রয় করিবার সম্ভাবনা প্রবল। পূজার পিঠোপিঠি আরেকটি সংখ্যা চাপিলে অনেকেই ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করিবেন বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং টেলিফোনে আমাদিগকে বিস্তর ধমকাইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্লীহা ও যকৃতের মঙ্গল কামনা করিয়া আমরা পত্রপাঠ নভেম্বর ২০০১ সংখ্যাটি প্রকাশ করিতে ভরসা পাইতেছি না। পত্রপাঠের পরবর্তী সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০১ রূপে আত্মপ্রকাশ করিবে—এই ভরসা দিতেছি।

—সম্পাদব

ভবতোষ বনাম ভবতোষ

শেখর আহমেদ

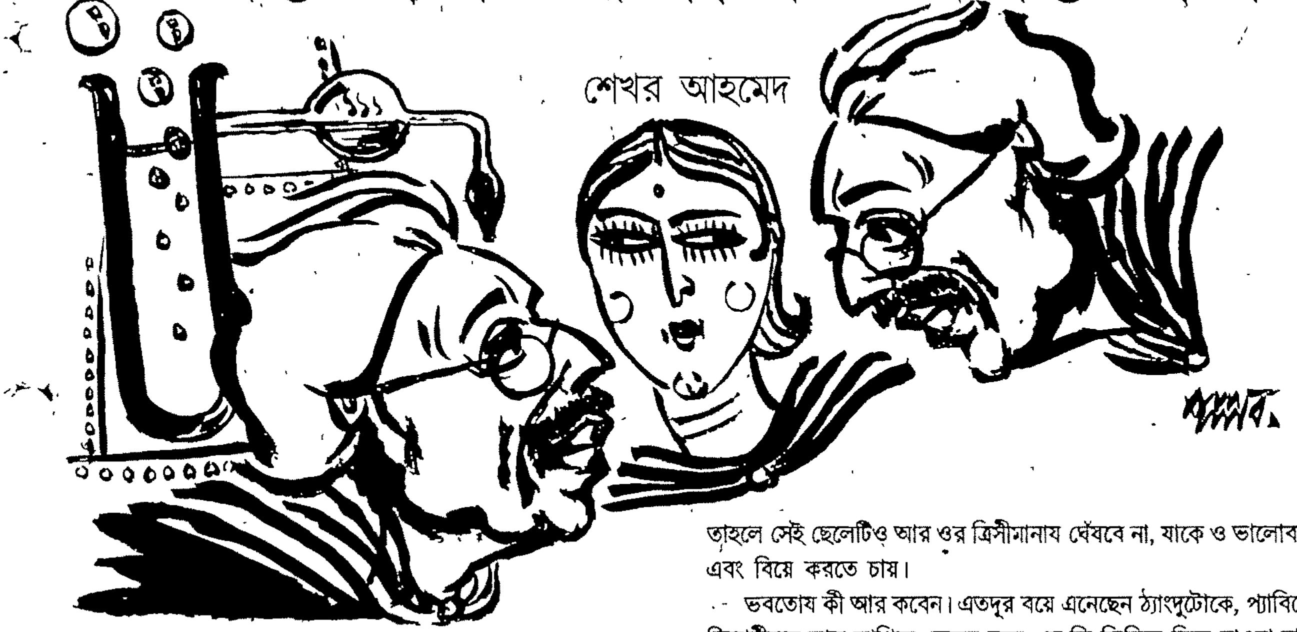

ভাবনাটা ভুস্ করে ভেসে উঠল ভবতোষ ভট্চাযের মগজে। মগজ এবং কাগজ—এই দুইয়ের জোরেই তো তাঁর এত রমরমা। আজ ইউরোপ, কাল আমেরিকা, পরশু জাপান, তরশু ফ্রান্স। এই করতে গিয়ে নিজের জন্যে যে একটু ভাববেন, তার একেবারে নো চান্স।

এ যাবত শেষ আবিষ্কারটি তাঁর বড়ই চমকপ্রদ। কিক মেশিন। সোজা বাংলায় লাথি-যন্তর। পথেঘাটে মানুষ হামেশাই চোর-বদমায়েশের হাতে নাকাল। এই লাথি যন্ত্রের পেল্লায় লাথি খেয়ে চেল্লাতে চেল্লাতে পালাবে তারা। জ্বালাবে না আর কদ্যাপি।

টেলিফোনে শুনেই লাফিয়ে উঠেছিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানী বন্ধু মঁসিয়ে জো লুই। তর সয় না এক দণ্ড। তাঁর বোনটিকে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা বড়ই বিরক্ত করছে আজকাল। দুনিয়াজোড়া ইভ্টিজারদের মোক্ষম ওষুধ হবে এটা। স্যাম্পেল সঙ্গে নিয়ে ছুটলেন ভবতোষ দু'দিনের মধ্যেই। চমৎকার জিনিস। একেবারে অবিকল দুটি মানুষের পা। তুলনায় একটু বেশি লম্বা। একটা বৈদ্যুতিন বেল্টের সাহায্যে কোমরের ডইনে-বাঁয়ে ঝুলতে থাকবে। কেউ বিরক্ত করলেই টিপে দাও একটি বোতাম। অমনি শুরু হয়ে যাবে খেল্। ডইনে-বাঁয়ে, সামনে পেছনে তখন দুই পদপ্রভু শুরু করবেন ক্যারাটে, কুংফু, মার্শাল আর্ট এবং তারই সঙ্গে নিখাদ গাঁইয়া লাথি। কাছে ঘেঁষে কার সাধ্য!

মঁসিয়ে লুই জিনিসটা দেখে কোথায় আহ্লাদে আটখানা হবেন, তা নয়, খান্খান্ করে দিলেন ভবতোষের সব উৎসাহ,— খেপেছ নাকি হে। অবিকল দুটি দানবের ঠ্যাং কোমরে ঝুলিয়ে বোন রাস্তায় বেরোবে? দেখলেই লোকে অন্যদিকে পালাবে; পাগল ভেবে।

—তবে তো বিনা যুদ্ধে যুদ্ধ জয়। হারবার পাত্রই নন ভবতোষ,— সেই ছোঁড়াগুলো আর কাছে ঘেঁষবে না।

জো ককিয়ে উঠলেন, আহ্ ভাট্চারিয়া, তোমাকে কী করে বোঝাই যে তাহলে সেই ছেলেটিও আর ওর ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না, যাকে ও ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায়।

ভবতোষ কী আর করেন। এতদূর বয়ে এনেছেন ঠ্যাংদুটোকে, প্যারিসের বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে দেবেন বলে, সে কি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়? কাতর হয়ে বললেন, জো, না হয় তোমার কাছে রেখেই দাও। বলা তো যায় না, তোমারও হয়ত কোনো দুশমনকে জব্দ করার দরকার হতে পারে।

তাতেও বেঁকে বসলেন লুই,—না বাপু। বন্দুক-পিস্তল হলে কথা ছিল না। কিন্তু ওই বিশাল দুটো ঠ্যাং ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখব, তারপর কে কোন্দিন দেখে মুচ্ছো যাবে; তারপর আমার বিরুদ্ধে মামলা। শেষে ঘটিবাটি বন্ধক।

এরপর আর কী করতে পারেন ভবতোষ শ্যেন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ জো-র দিকে চেয়ে থাকা এবং তারপর ঠ্যাংদুটো দু'বগলে বয়ে নিয়ে সেন নদীতে ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া।

তা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে শিঙের গুঁতো খাওয়া তাঁর নতুন নয়। বার্লিনের বন্ধু রুডলফ্ একবার আক্ষেপ করেছিলেন যে তাঁর একমাত্র ছেলে ম্যাথুজ দিনে দিনে অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। বাড়ির কুকুরদুটোকে অকারণে গুলি করে মেরেছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কোনো আর্ত লোককে দেখলে লাথি কষায়। অন্তর থেকে দয়া-মায়া-মমতা—সব কোনো অদৃশ্য কৌশলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় হয়েছে। নিউরোলজিস্ট, সাইকিয়াট্রিস্ট— কেউই কিছু করতে পারছে না। একমাত্র সন্তানের এরকম দানবত্ব প্রাপ্তিতে বড়ই মনোকষ্টে আছেন রুডলফ্ দম্পত্তি।

ছোঃ। ভবতোষ ভট্চাযের কাছে এটা কোনো সমস্যা। কয়েকদিনের মধ্যে একটা ছোট বায়োলজিক্যাল অ্যাম্পুল বানিয়ে নিয়ে উড়ে গেলেন। সামান্য একটা অপারেশন করে ম্যাথুজের মগজে সেটি সেঁটে দেওয়া। ব্যস। কয়েক দিন থেকে ম্যাথুজের পরিবর্তন নিজের চোখে দেখে তবে ফিরেছেন। আহা, ম্যাথুজ এখন বাড়ির নতুন কুকুরটিকে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে। রাস্তায় বৃদ্ধ মানুষ দেখলে হাত ধরে পার করে দেয়। রুডলফ্ দম্পতির কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই। ডঃ রুডলফ্ ভবতোষকে একটা পুঁচকে পিস্তল উপহার দিলেন। পুঁচকে, কিন্তু ক্ষমতা তার অসাধারণ। শব্দ হয় না। কিন্তু ট্রিগার

টিপে লোহাকেও বাষ্প করে উড়িয়ে দেওয়া যায়। অনেকটা প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যানাইহিলিন পিস্তলের মতো। শঙ্কুকে কোনোদিনই ভবতোষ বিজ্ঞানী বলে স্বীকার করেন না। ওর সবই সত্যজিৎ রায় নামের এক বড় বিজ্ঞানীর থেকে ভিক্ষে পাওয়া। ভবতোষের এই কথা হেসে উড়িয়ে দিত সবাই। কিন্তু এখন দেখ, সত্যজিৎ অক্কা পাবার পর শঙ্কু নতুন কিচ্ছুটি আর আবিষ্কার করতে পেরেছে কী? সে যাই হোক এমন পিস্তল চেষ্টা করলে ভবতোষ হেলাফেলায় তৈরি করতে পারেন। কিন্তু বন্ধুর দান খুশি মনে হাত পেতে নিলেন।

দেশে ফেরার কয়েকদিন পরেই রুডলফের উত্তেজিত ফোন। যাচ্ছেতাই গালমন্দ করছেন। এত ক্ষেপে গেছেন যে সামনে পেলে ভবতোষকে প্রায় চিবিয়ে খাবেন।

ব্যাপারটা কী? না, ম্যাথুজের মনে করুণা দিনকে দিন শশিকলার মতো বেড়েই চলেছে। রাস্তা থেকে অথর্ব বিকলাঙ্গ মানুষজন, ঘেয়ো কুকুর, লোম-ওঠা বিড়াল—সব ধরে এনে বাড়ি একেবারে ভরিয়ে ফেলেছে। রুডলফ্ দম্পতি পালিয়ে অন্য বাড়ি ভাড়া করে লুকিয়ে আছেন। সিঁটিয়ে আছেন ভয়ে—পাছে ম্যাথুজ এ বাড়িটাকেও এতিমখানা করে ফেলে।

এইসব অকৃতজ্ঞতা দেখে ভবতোষ ভট্‌চায পরোপকারের বাসনা চিরকালের মতো ত্যাগ করেছেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এবার নিজের জন্যে কিছু করবেন। রোবট বানিয়েছেন ঢের আগে। ক্লোন? সে তো ভ্রূণ থেকে শুরু। সে ভবতোষ যখন চল্লিশে পা দেবে আদি ভবতোষ ততদিনে আশি। যদি না তার আগে ওপারের বাঁশি বেজে যায়।

এই চিন্তাটাও মনে হল, নিজেকে অমর করার একটা উপায় করে ফেলবেন? না, না, সে এক ঝঞ্ঝাট। পরে যদি এমন হয় যে মরতে ভীষণ ইচ্ছে করছে কিন্তু কিছুতেই মরতে পারছেন না, তখন কে বাঁচাবে, মানে কে মারবে আর কি।

আচ্ছা, এমন হলে কেমন হয়? হুবহু তাঁর একটি সংস্করণ? মানে চট্‌জলদি একটি ক্লোন, কিন্তু ওঁয়া ওঁয়া একদিনের পুঁচকে নয়, একেবারে চল্লিশ বছরের একটি জলজ্যান্ত ভবতোষ ভট্‌চায। রাইট।

আর মাথায় একবার যখন খেয়াল চাগাড় দিয়েছে, কোনো দেয়াল আর মানেন না ভবতোষ। ঠিকই তো, পোল্‌ট্রির মুরগিকে যখন পনেরো দিনে তিনমাসের সাইজে আনা যাচ্ছে তখন দুনিয়ার (এবং সম্ভবত সব গ্রহপুঞ্জেরও) সেরা বিজ্ঞানী ভবতোষ ভট্‌চায (যদিও কেউই একথা মানেন না; ঈর্ষা আর কি!) একটা ভ্রূণকে তিনদিনে চল্লিশ বছরের ধাঁচা দিতে পারবেন না।

আহা-হা, কী সুখই না হয় তাহলে। খাটতে খাটতে জান কয়লা হয়ে গেল।। এবার থেকে সব খাটুনির কাজগুলোই নতুন ভবতোষ করবে। আর তিনি ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে.....

পেল্লায় একখানা ইস্পাতের টেস্টটিউব বানিয়ে ফেললেন, তারপর নিজের শরীর থেকে যাবতীয় কোষ-টোষ নিয়ে হরেক জৈবিক উপাদান মিশিয়ে পুরে দিলেন টিউবে।

তিন দিন। তিন দিন পর খুলবেন। টেনশন? উদ্বেগ? কী হয়, কী হয়? যদি না হয়? না না, ভবতোষ ভট্‌চাযের ওসব বালাই নেই।। তিনি ফেল করবেন? কে করাবে? নেহাৎ ভগবান নেই, থাকলে তিনিও পারতেন না।। ভেবে ভগবানের ওপর বড় করুণা হয় ভবতোষের, মানে ভগবান শব্দটার ওপর, ভগবান তো নেই।

আর একটা প্রশ্ন মনে এল, যদি কেউ জেনে ফেলে? এমনিতে সব সময় ল্যাবরেটরিতে একজন ভবতোষ অবশ্যই থাকবে, যখন অন্য ভবতোষ নানা কাজে বাইরে যাবে। দু'জন ভবতোষ এক সঙ্গে কখনোই বেরোবে না। কিন্তু ল্যাবরেটরিতে? সেখানে তো দুই ভবতোষ একসঙ্গে থাকবেন বহু সময়। তখন? চাকর-বাকর বলতে দুটি রোবট। তাদের মগজ নেই। কিন্তু ভবতারিণী? তাঁর সামন্ত্র তান্ত্রিক সহধর্মিনী? ছ্যা ছ্যা, ভাবা যায়? ভবতোষের গিন্নি অষ্টপ্রহর ঠাকুর ঠাকুর করছেন, শোবার ঘরে বালগোপাল? ছেলেপুলে না হলে বোধহয় মেয়েরা এমনই হয়ে যায়। আসলে ভবতোষই সন্তান চাননি। বিজ্ঞান সাধনায় সন্তান বড় বিঘ্ন। বিবাহও। জীবনে ওই এক মহা ভুল ভবতোষের। কী কুক্ষণে কৌতূহলের বশে যে একবার কনে দেখতে গিয়েছিলেন বন্ধুর জন্যে। বন্ধু বাতিল করল, কিন্তু তিনিই কোতল হলেন।

তা, ভবতারিণীকে নিয়েও চিন্তা নেই। নাস্তিক ভবতোষের অত্যন্ত অপবিত্র এই ল্যাবরেটরির ধারে কাছে তিনি ঘেঁষেন না এবং প্রাণ থাকতে তিনি এর দরজা মাড়াবেন না বলে ঈশ্বরের নাম করে একটি চিরন্তন শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। শপথ আজও অটুট। ভাবা যায়। যা নেই, তার নামের শপথে এই; থাকলে কী হত।

তিনদিন ভবতোষ খেলেন দেলেন, ঘুমোলেন, দুনিয়ার সব কাজ করলেন নিশ্চিন্তে। তারপর বাক্সটি খুললেন। বড় লজ্জা করছে। নতুন ভবতোষকে জন্মদিনের পোশাকে দেখবেন, মানে নিজেকে, ন্যাংটোপুটো চল্লিশ বছরের শিশু ভবতোষ। যত শিগগির সম্ভব নতুন ভবতোষকে ভদ্রসভ্য করতে হবে। এক হাতে একপ্রস্থ জামা-প্যান্টুল ধরে রয়েছেন আদি ভবতোষ।

ভবতোষকে দেখে তাক লেগে গেল ভবতোষের, নিজের আবিষ্কারে।

নতুন ভবতোষ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলল, হ্যালো ভবতোষ, হাউ ডু য়ু ডু। দাও।

বলে ভবতোষের হাত থেকে জামাপ্যান্ট নিয়ে পরেটরে নিজেই সভ্য ভব্য হয়ে গেল।

ভবতোষ আর দেরি করলেন না। বললেন, ভবতোষ, দুপুর বারোটায় সায়েন্স সভা হলে মঙ্গলগ্রহের ওপর আমার একটা লেকচার আছে। আমি বলাও যা, তুমি বলাও তা। ওটা দিয়ে আসতে পারবে তো?

—কেন পারব না ভবতোষ? সবই তো এক।

—বেশ। আচ্ছা ভবতোষ, কীভাবে শুরু করবে?

নতুন ভবতোষ দু'বার মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে নিল, বাঁহাতটা কোমরে রেখে একটু বেঁকে দাঁড়াল, তারপর শুরু করল,—ইয়েস মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস—

—ফাইন। ফাইন।। বললেন ভবতোষ।

হুবহু, হুবহু। আর কোনো চিন্তা নেই।

এক ভবতোষ ল্যাবরেটরিতে থাকেন আর এক ভবতোষ বাইরে বেরোন। মাঝে মাঝে দু'জনেই ল্যাবরেটরিতে। ভবতোষ হয়ত নতুন একটা যৌগ তৈরি করছেন। তিনভাগ নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে একভাগ সালফিউরিক মিশিয়ে—

নতুন ভবতোষ ওদিকের আরাম কেদারা থেকে বলে উঠল, উঁহু ভবতোষ, পুরো ফর্মুলাটাই চেঞ্জ করো। তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে না। এক্ষুনি ক্রিস্টাল পাবে। তুমি কপার, হাইড্রোক্লোরিক আর ইথাইল—

—কেন?

—আহা করেই দ্যাখো না।

করলেন ভবতোষ। এবং মুগ্ধ। নিজের সৃষ্টি নিজেকেই ছাপিয়ে গেছে। আহা, ভবতোষের যে নাচতে ইচ্ছে করছে। নতুন ভবতোষের হাত জড়িয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক য়ু, থ্যাঙ্ক য়ু। এবার থেকে বরং এই কাজগুলোও তুমি দেখো।

এইভাবে কেটে যাচ্ছিল দিব্যি। নব ভবতোষের একটাই দোষ। সে খায় না কিছুই। মাঝে মাঝে দু-একটা রাসায়নিক মিশিয়ে কী একটা বানিয়ে খায়। একদিন ভবতোষকেও দিয়েছিল। চমৎকার খেতে। খিদে তেষ্টা বেমালুম হাওয়া।

কেবল যখন রাত্রে নব ভবতোষকে ল্যাবরেটরির খাটটুকুকে সঙ্গী হিসেবে রেখে বউয়ের কাছে শুতে যান, তখন বড় করুণা হয় নতুন ভবতোষের ওপর।

আদি ভবতোষ ভাবছিলেন নবর জন্যে ভবতারিণীরও একটা যমজ বানিয়ে দেবেন কিনা। এমন সময় ঘটে গেল সেই কাণ্ডটা।

নতুন ভবতোষ ঘুরতে বেরিয়েছিল। এ নিয়ে আদি ভবতোষ চিন্তা করেন [illegible]। তাঁর স্মৃতি, তাঁর মেধা—সবই আছে নবর মধ্যে। তাঁর পরিচিত সবাইকে সে চেনে। এদিকে রাত আটটায় হোটেল ক্যালকাটায় একটা সম্মেলন আছে। সেটায় আদি ভবতোষ নিজেই যেতে চান। কেন না সেখানে খানাপিনার এলাহি ব্যবস্থা। খেতে ভবতোষ বেজায় ভালোবাসেন। না বাপু, নবর মতো এক চুমুকে খিদে মেটাতে তিনি রাজি নন। জিভের খিদে নিভে গিয়ে কাজ নেই তাঁর।

কিন্তু নব এত দেরি করছে কেন? এমনটি তো করে না সে কখনো। পায়চারি করতে করতে অধৈর্য হয়ে দোতলায় নেমে এলেন তিনি। অন্যমনস্কভাবে শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। কী-হোলে চোখ রেখে চোখ প্রায় কপালে। এই ভর সন্ধেবেলা, দু'জনে একেবারে জড়াজড়ি, গলাগলি। দেখা যায় না, দেখা যায় না। ভবতারিণীর এলো চুল পিঠ ঢেকে রেখেছে। প্রতিমার মতো অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা নব ভবতোষের বুকে রেখে আদুরে গলায় বলছে, উঁ-উঁ। কী সারাক্ষণ ওই পচা ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকো, ভাল্লাগে না যাও। আজ কোন্ দিন বলো তো? কিচ্ছু মনে থাকে না তোমার। আজ আমাদের বিয়ের দিন। চলো, আজ বাইরে কোথাও খেতে যাব দু'জনে।

ইস! ভারি ভুল হয়ে গেছে তো। সত্যি কিছুই মনে থাকছে না আজকাল। নিজেকে নিজে চড়াতে ইচ্ছে করল। ভাবলেন, নব বেরোলে তাকেই আচ্ছা করে চড়িয়ে দেবেন। সেও তো নিজেকে চড়ানোই হল। কিন্তু এরপর যা দেখলেন তাতে চড়চড় করে উঠল বুক। নব ভবতোষ ভবতারিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছে, আমি তো তোমারই। আমি ওপর থেকে একটু ঘুরে আসি। তুমি ততক্ষণ তৈরি হয়ে নাও.....

ভাবা যায়? আমি তোমারই! মামাবাড়ি!! রাস্কেল, আমি তবে কে? আই দ্য ওরিজিন্যাল ভবতোষ ভট্চারিয়া, ওনলি ভিমলের মতো ওনলি ভবতোষ,—আমি বানের জলে ভেসে গেলুম!

গরগর করতে করতে আদি ও অকৃত্রিম ভবতোষ ওপরে উঠে গেলেন। কী শাস্তি দেওয়া যায় বদমায়েশটাকে? যমজ। যম। যমের বাড়ি। হ্যাঁ, ওকে যমের বাড়ি না পাঠিয়ে আজ তাঁর শান্তি নেই। কিন্তু কীভাবে মারবেন? আবার বাক্সে পুরে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসবেন? তারপর? কোনদিন ভেসে উঠবে ভবতোষের লাশ। কাগজে লেখা হবে, ভবতোষ ভট্চায স্বর্গে। সে এক কেলো। তাহলে?

হঠাৎই মনে পড়ল রুড্লফের দেওয়া অসাধারণ শক্তিধর পিস্তলটার কথা। ড্রয়ার থেকে বের করে হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে রইলেন। ট্রিগার টিপলেই বাষ্প হয়ে উবে যাবে বাছাধন।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ট্রিগারে আঙুল ছোঁয়ালেন ভবতোষ। কিন্তু হু হু করে উঠল মন। ভবতোষের জন্যে ভবতোষের। ওকে চড়ালে নিজেকে চড়ানো হয় যদি, তাহলে নিজেকে তাক করলে—

ভবতোষের চোখ চকচক করে উঠল এক অন্য আবিষ্কারে। পিস্তলের নলটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপে দিলেন। ☐

মজা

পশ্চিমবঙ্গবাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে আইন শৃংখলার দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গ একেবারে ফার্স্ট বয়। তবুও সাংবাদিকরা বেরসিকের মতো ঘুরাইয়া জানিতে চাহিয়াছিল যে তিনি শেষের দিক হইতে হিসাব করিয়া 'লাস্টের দিকে ফার্স্ট বয়' বলিতেছেন কিনা। তাহাতে মুখ্যমন্ত্রী কিঞ্চিৎ রাগিয়াছেন, কিন্তু নিজ বক্তব্যে অটল থাকিয়া পুনরায় সদম্ভে উক্তি করিয়াছেন—উই আর স্টল দ্য ফার্স্ট বয়।

এখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীজির সদম্ভ উক্তিকে আরো জোরালো করিবার প্রয়াসে উক্ত দিবসের দৈনিকপত্রগুলির সম্বাদের কিছু উদাহরণ বরং তুলিয়া দিই—

১। স্বামীর সামনে ধর্ষণ, কুপিয়ে খুন যুবতীকে।
২। তৃণমূল কর্মী খুন, দুই থানার চাপান-উতোর।
৩। দমদমের পুর প্রধানকে সাত সকালে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে হত্যা।
৪। আবার ট্রেনে ডাকাতি, কান ছিঁড়ে দুল লুঠ।
৫। প্রাতঃভ্রমণে হার ছিনতাই তরুণীর।

দিনের বেলা নিজের বাড়ির সামনে খুন হইতেছেন পুর প্রধান। সকাল বেলা আনন্দ পালিত রোডে ছিনতাই হইতেছে হার। রাতের অন্ধকারের প্রয়োজন হইতেছে না অপরাধীদের। দিনের আলোয় বড় রাস্তায় যা খুশি করা যাইতেছে। মুখ্যমন্ত্রীজির বক্তব্য, ঘটনা ঘটিতেছে, কিন্তু প্রায় প্রতিটি অপরাধেরই কিনারা করিয়া ফেলিতেছে পুলিশ। আমরা ছোট হইতেই জানিয়াছিলাম Prevention is better than cure—অর্থাৎ রোগ হইবার পর চিকিৎসা না করিয়া রোগটা যাহাতে না হয়, সেই চেষ্টাই করা উচিত। খুন হইবার পর খুনিকে ধরিলে খুন হওয়া মানুটির প্রাণ ফেরত পাওয়া যায় না—এটি বোধ হয় মহামান্য মুখ্যমন্ত্রীজির মস্তিষ্কের ল্যাপটপে লোড় করা হয় নাই।

এই তো কয়েকদিন আগে জানা গিয়াছে, নিছক মজা করিবার জন্যই এক কারখানার চারজন কর্মীকে খুন করিয়াছে কয়েকজন। তাহার পূর্বে অনায়াসে মালিকের কাছ হইতে ব্ল্যাঙ্ক চেকে সই করাইয়া লইয়া তাহার সাহায্যে মোটা টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়াছে, তাহার পর বোধহয় ভুল করিয়া সেই স্বর্ণডিম্ব প্রসবিনী হংসটিকে হত্যা করিয়াছে এবং পরস্পরকে খুঁজিতে আসিয়া একে একে তাহাদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন মালিকের শ্যালক, ভাই, ম্যানেজার, এবং তৎপরে কারখানার আরো চার কর্মীকে স্রেফ মজা করিবার জন্য খুন করিয়াছে তাহারা। মজা শেষ হইবার পর তাহারা পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী, হতভাগ্যের দল, পড়িয়া আছি—কখন কে মজা করিবার জন্য ডাকাতি করিতে আসিবে, ছিনতাই করিতে আসিবে—ইত্যাদি ইত্যাদির অপেক্ষায়। অপরাধীরা বুঝিয়া গিয়াছে, ধরাধামে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, অহিংসাই যাঁহার পরম ধর্ম। অতএব যত পারো মজা করিয়া খুন করো, মজা করিয়া ডাকাতি করো, মজা করিয়া ছিনতাই করো, ধর্ষণ করো, বুদ্ধদেব চোখ বুঁজিয়া তপস্যারতই রহিবেন সুজাতার পায়সান্নের অপেক্ষায় এবং আইন-শৃংখলায় পশ্চিমবঙ্গ যাহাতে ফার্স্টের ও ফার্স্ট হইয়া স্বর্ণপদক জিতিতে পারে তাহার চেষ্টায়। আমরা ততক্ষণ আসুন মজা করিয়া সবংশে মজিবার প্রতীক্ষা করি।

অঞ্জনা দত্ত

উনিশ না ছাব্বিশ?

অমিতাভ চৌধুরি

সমীরণ যে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করবে, আমরা ভাবতে পারি নি। দিলদরিয়া ছন্নছাড়া লোক। তাসের আড্ডা, সিনেমাহল আর রেসকোর্সের বাইরে যে কোনো জগৎ আছে, তা তার জানা নেই। বাবা প্রচুর টাকা রেখে মারা গেছেন। মা-ও অনেককাল গত। একমাত্র ছেলে সমীরণ। ঘোড়দৌড়ের নেশা আগে ছিল না, ইদানীং Win না Place, Place না Win করতে করতে রেসকোর্সে ছোটে। একশ জেতে তো দেড়শ হারে। আমরা মানা করেছি। বলেছি, দেখ সমীরণ, টুকটুকে বৌ দেখে বিয়ে কর, ঘর-সংসার পেতে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ব'স। সমীরণ আমাদের কথা শেষ হবার আগেই 'ধুত্তোর' বলে 'কল' দেয় 'Three Diamonds।'

আমরা নাছোড়বান্দা। তখন সিগারেটের ছাই ফেলে বলে, বিয়ে-টিয়ে আমার পোষাবে না ভাই। দিব্যি আছি; তোদের নিয়ে ফুর্তিফার্তি করি, টাকা ওড়াই। বৌ ঘরে আনলেই যত ঝামেলা। হেন চাই, তেন চাই—জীবন অস্থির করে তুলবে।

সেই সমীরণ দুম্ করে বিয়ে করে ফেলল। আমাদের কাউকে না জানিয়ে। মেয়েটির নাম-ধাম-বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। আমরা তো থ'। এমন কী ঘটল, যাতে চট্‌পট্ মত পাল্টাতে হল?

অনেকদিন পর সমীরণ এসে হাজির। ভণিতা না করেই বলল, 'সময়মতো তোদের বিয়ের খবর দিতে পারি নি বলে মাপ চাইছি। তোরা কিচ্ছু মনে করিস না ভাই। আসছে শনিবার সন্ধেয় তোদের নেমতন্ন রইল আমার বাড়িতে। বৌ নিজে রেঁধে খাওয়াবে বলেছে। খাসা রাঁধে। আচ্ছা, আমি চলি, কাজ আছে, দেখা হবে।' বলেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে এ ওর মুখের দিকে তাকাই।

শনিবার সন্ধেবেলা আমরা সেজেগুজে ফুলবাবুটি সেজে সমীরণের বাড়ি হাজির। সকলের হাতেই দু'চারটি উপহার। হাজার হোক বন্ধু লোক। বাড়িতে পৌঁছে দেখি সমীরণ, তার বৌ—কেউই বাড়িতে নেই। চাকর বলল, 'দুটোর সময় বেরিয়েছেন, বলে গেছেন আপনারা এলে বসাতে।'

বসে আছি তো আছিই। মিনিট যায়, ঘণ্টা যায়, শ্রীমানের কোনো পাত্তা নেই। এ কী ধরনের রসিকতা? চর্ব্য-চোষ্য আহারের জন্যে সকাল থেকে থেকে জিবে শান দিচ্ছি। শেষ পর্যন্ত কি না খেয়েই ফিরতে হবে? নেমতন্ন করে এনে.....আসুক, দেখাচ্ছি মজা।

ঘড়িতে যখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টা বাজে, আর আমরাও রেগে-মেগে উঠব উঠব করছি, এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে আসামি হাজির। আমাদের কারো মুখে কথা নেই। মনের সমস্ত তিক্ততা ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।

'ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছি ভাই; কিন্তু উপায় ছিল না। বৌকে বাপের বাড়ি রেখে আসতে হল কি না .. চল বেরনো যাক, কোনো ভালো হোটেলেই তোদের খাইয়ে দিই, চল' সমীরণ পীড়াপীড়ি করে।

'বৌকে বাপের বাড়িতে? এর মানে? কোথায় আমাদের বৌয়ের রান্না খাওয়াবি, আর ওকে বাপের বাড়িতে রেখে হোটেলে নিয়ে—কী ব্যাপার?'

'চল্ চল্, সব বলছি' আমাদের টেনে গাড়িতে বসায়।

> তোদের নিয়ে ফুর্তিফার্তি করি, টাকা ওড়াই। বৌ ঘরে আনলেই যত ঝামেলা। হেন চাই; তেন চাই—জীবন অস্থির করে তুলবে।

খাওয়াটা বেশ জাঁদরেল গোছেরই হল। হোটেলের বাবুর্চিরা সমীরণের বৌয়ের চেয়ে নিশ্চয়ই খারাপ রাঁধে না। পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে সিগারেটটি ধরিয়ে বললাম, 'বল্ কী ব্যাপার?'

'সে এক মজার ব্যাপার ভাই'। সমীরণ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলতে শুরু করে, 'বিয়ে তো তোদের না জানিয়েই করে ফেললাম। পরে একদিন জানাব ঘটনাটা। আজকের ব্যাপারটা শোন। জানিসই তো, ঘোড়দৌড়ের নেশা আমার কীরকম। আমার ইচ্ছে, বৌকে নিয়ে মাঠে যাই। প্রথম প্রথম বেশ আপত্তি করত। একদিন জোর করে নিয়ে গেলাম। ওখানকার ফ্যাশনের আবহাওয়া বৌয়ের মনে রঙ ধরাল। আমার সঙ্গে নিয়মিত যাওয়া-আসা শুরু

করল। আজকেও তেমনি আমার সঙ্গে গিয়েছে। আজ আমার বরাত ভীষণ খারাপ। হারছি তো হারছিই। বহু টাকা গচ্চা দিলাম। বৌ তখন রঙিন শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে; একবার বাইনাকুলার লাগিয়ে 'রেস' দেখছে। আমার ব্যাগে বাকি অল্প কিছু টাকা। হঠাৎ মনে হল, লোকে বলে ঘরের বউ নাকি লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মীর সাহায্য নিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক না। ওকে বললাম—'এবারে তুমি একটা ঘোড়া ধরো, দেখি তোমার Luck কী রকম।'

বৌ আমতা আমতা করে বলে,— 'আমি কী জানি ঘোড়ার?'

'তবু ধরোই না, যে কোনো একটা নম্বর।'

'আন্দাজি, যা খুশি?'

'আচ্ছা, এক কাজ করো, তোমার বয়স যত, তত নম্বর ঘোড়া ধরো, দেখি কী হয়।'

'বয়সের সঙ্গে ঘোড়ার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক কিছুই নেই, Just luck try'

'বেশ, তাহলে ধরো ...ধরো, এই উনিশ।'

উনিশ নম্বর ঘোড়া ধরলাম, ব্যাগের সব সম্বল নিয়ে। উৎসাহে লাফাচ্ছি। এবারে নির্ঘাৎ জিতব।

দৌড় আরম্ভ হয়েছে। বৌ আর আমি পাশাপাশি। দু'জনেই বাইনাকুলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছি। বাঃ, উনিশ নম্বরটা দারুণ দৌড়াচ্ছে, দারুণ, দারুণ .আনন্দে বৌকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু .কিন্তু একি, উনিশ নম্বরটা পিছিয়ে পড়ল যে. হায় রে কপাল।

আমার হা-হুতাশ দেখে বৌ জিজ্ঞেস করল, 'কত নম্বর জিতল?'

'ছাব্বিশ'।

'কত নম্বর বললে?' বৌয়ের সারা মুখে আতঙ্ক।

'উনিশ নয়, ছাব্বিশ।'

আর কিছুই বলতে হল না। বৌ আস্তে আস্তে ঢলে পড়ল। আমি তো হতভম্ব। হিস্টিরিয়া আছে নাকি? উনিশের জায়গায় ছাব্বিশ হলেই এর হিস্টিরিয়া ওঠে নাকি? কী আর করি, গাড়িতে তুলে শ্যামবাজারে ওর বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ভাবছি, কাল ডাক্তারের কাছে যাব। আমার তো সব কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। আচ্ছা তোরাই বল না ভাই, কী ব্যাপার? ছাব্বিশ শুনেই বৌ অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? ❑

Gun, আফগান ও গান

আমেরিকার ক্ষেপে-বোম্ প্রেসিডেন্টের যা Gun Power তার কাছে আফগানদের তাকৎ Half Gun বললেও ঢের বেশি বলা হয়।। ফুস্ করে তালিবানদের উড়িয়ে দেবার যে চিন্তা হুশ্ করে বুশ সাহেবের মাথায় উদিত হয়েছিল, একটু মাথা খাটাবার পর, এটি আসলে মাথা ফাটাবারই আত্মঘাতী আয়োজন বলে তাঁর মনে হয়ে থাকবে। অতঃপর তিনি একটি গানই অবলম্বন করেছেন—সেটি হল—সারা দুনিয়া থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করব। পি বি শেলী ঢের আগে বুশ সাহেবের হাল অনুমান করে এই কবিতাটি বেঁধে গিয়েছিলেন,—আওয়ার সুইটেস্ট সংস আর্ দোজ্, দ্যাট্ টেল অফ স্যাডেস্ট থট্।

বুশ সাহেবের জন্য আমরা একটু সংশোধন করিব,—স্যাডেস্ট নয়, ওটি হইবে—ম্যাডেস্ট থট্।

ভূতলেন্দু ভৌমিক

With Best Compliments From :-

ASSAMBROOK LIMITED

1 Shakespeare Sarani
Kolkata-700071
Ph : 282-7615

গল্প

বাঙালি

দিব্যেন্দু পালিত

'নাম শুনে কিছু ভেবে নেবেন না, স্যার। আমি জাপানি নই, বাঙালি। আমার বাবার নাম হানাদা, ঠাকুরদার নাম তাকো। বাবারা সাত ভাই—'

'তারাও কি ভিক্ষে করতেন?'

কাবুকি হাসল, 'ভিক্ষে কি আর করত। ঠাকুরদাদা এক জাপানি সাহেবের মালি ছিল, চব্বিশ টাকা মাইনে পেত—'

'চব্বিশ টাকায় তখনকার দিনেও চলত কী করে? বললে তো বাপরা সাত ভাই।'

'কাবুকি তখনো হাসছে। মাড়ির ওপর ফুটে ওঠা বাসি দাগে এক ধরনের নিলর্জ্জতার আভাস। ডিগবাজি খেতে ওস্তাদ। ঊর্ধ্বে দু'পা তুলে একটু আগেই সে আমাকে মাথায় ভর দিয়ে হাঁটা দেখিয়েছে। বলল, 'দেশে ফেরার সময় এটা ওটা নিয়ে আসত। দামি ঘড়ি এনেছিল একটা—সাহেব নাকি পেজেন্ট করেছিল। পরে বেচে দেয়। ওটা বোধহয় ঝেড়েই দিয়েছিল—'

'বাপ কী করত?'

'রানাঘাট স্টেশনে কুলি ছিল। তাতে কি পেট চলে। গাঁ-গঞ্জের লোক, আমাদের স্যার ছেলেপুলে একটু বেশি হয়। গাঁ থেকে কলকাতায় এসে কিছু না পেয়ে পকেটমারি করত, জেলও খেটেছে—'

'তা তুমিও তাই করলে পারতে।'

কাবুকির চোখমুখে একটা অসহায় ভাব ফুটল। মিনমিনে গলায় বলল, 'ও ব্যবসাও উঠে গেল, স্যার। ট্রামে বাসে বাবুরা আজকাল পকেটে হাত চাপা দিয়ে ঘোরে। যা দিনকাল—।'

একটু থেমে বলল, 'ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি, স্যার। ডিগবাজি খেলাম, বাতকম্মো করে দেখালাম, বগল বাজালাম, লাইফস্টোরি বললাম। অন্তত একটা টাকা দিন, মুড়ি খাব। কাল থেকে খাইনি কিছু।'

নিতান্তই কৌতূহল। মাসের প্রথম রবিবারে সকালের প্রথম ভিখিরিটার সঙ্গে আলাপ করছিলাম। ভাবলাম একটা টাকাই দিই।

তবু, দ্বিধায় পড়লাম একটু। কাজটা কি ঠিক হবে। প্রতিদিনই বাড়ছে ভিখিরির সংখ্যা। আমিও আজকাল আর যখন তখন ট্যাক্সি চড়তে পারি না, পকেট পাহারা দিয়ে বাস, মিনিবাসেই ঘুরি।

কাবুকির হাতে একটা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে বললাম, 'খেটে খাবার চেষ্টা করো। যাও, আর এদিক মাড়িও না—'

কাবুকির সঙ্গে তখনই চোখাচোখি হল আমার। কী বুঝল কে জানে! পয়সাটা তালুবন্দি করে আর কিছু না বলে আস্তে আস্তে চলে গেল সে।

ট্যারা চোখে

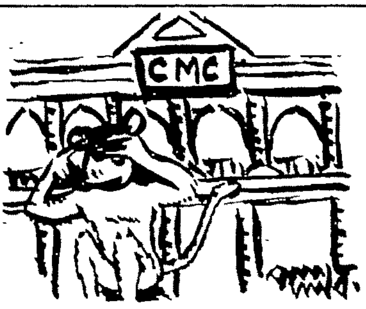

ঢের সয়েছি

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা মধু বসু কৃত 'আলিবাবা' চলচ্চিত্রে একটি গান ছিল "ঢের সয়েছি, আর তো সবো না"। কলকাতা শহরের সর্বত্র বাংলা বানানের গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো দেখিয়া ইহাই বলিতে ইচ্ছা করে, ঢের সয়েছি, আর তো সবো না। কারণ উক্ত মধু বসুর সমসাময়িক চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথেশ বড়ুয়া মহাশয় কলকাতা চোরপোরেশন, মাফ করিবেন, কলকাতা করপোরেশনের দৌলতে হইয়াছেন 'প্রমোথেশ বড়ুয়া'। দেখা গেল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের নব নামায়ণে প্রমথেশ বাবু জ্বল জ্বল করিতেছেন উক্ত বানান লইয়া। যতদূর জানা যায়, উক্ত অভিনেতা রোগা-পাতলা না হউন, খুব ভারিসারি ছিলেন না। কিন্তু মাননীয় মেয়রবাবুর অনুচরবৃন্দ কেন যে তাঁহার ঘাড়ে "ে া"-এর বোঝাটি চাপাইলেন তাহা বোঝা দায়। খুব ইচ্ছা হইতেছিল, নামের ফলকটির পোস্টে উঠিয়া প্রুফ সংশোধন করিয়া দুইটি '।/' বসাইয়া দিই। কিন্তু আমাদিগের কিনা উপরে চড়িবার মই নাই। অতএব প্রমথেশবাবু গায়ে গতরে ভারি হইয়া 'প্রমোথেশ' বড়ুয়া হইয়াই থাকুন, আমরা তাঁহার আরো স্বাস্থ্য কামনা করি, কবে তিনি 'প্রোমোথেশ' বড়ুয়া হইবেন। বড়ুয়া বাড়িতেই থাকুন।

অঞ্জনা দত্ত

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

বাঙালি হিন্দুরা রামকে অবতার হিসেবে মেনে নেয় নি, হনুমানকে নিয়ে রসিকতা করেছে

যিনি কিছু পাইয়ে দিতে পারেন

এক-ঈশ্বরে বাঙালি হিন্দুর কখনোই মন ছিল না। বাঙালি বাঙালি হওয়ার পর থেকেই ঈশ্বর খুঁজে গেছে। যেহেতু সে হিন্দু এবং পরবর্তী কালে ওই হিন্দুত্বকে ধর্ম বলে মনে করেছে অই ভারতবর্ষের অন্য এলাকার দেবতাদের মধ্যে থেকে ঝাড়াই বাছাই করে দেবতা বেছে নিয়েছে। যেমন উত্তর প্রদেশের জনপ্রিয় দেবতা পবনপুত্রকে বাঙালি কখনোই দেবতা হিসেবে স্বীকার করেনি। দক্ষিণের অনেক দেবতাই বাঙালির তালিকায় অনুপস্থিত। তিন দেবতা, যাঁদের দেবশ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে তাঁদের নিয়েই বাঙালি খুশি থেকেছে, যদিও ব্রহ্মাকে বাঙালি সযত্নে এড়িয়ে গেছে।

মূলত, নারায়ণ এবং শিব, এই দুজনের শাখা-প্রশাখাকেই বাঙালি প্রায় তাদের আদি আমল থেকে মেনে চলছিল। শিব এবং তাঁর পরিবারবর্গ একদিকে, নারায়ণ এবং তাঁর পরিবারবর্গ আর একদিকে। নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী, নারায়ণের অংশ কৃষ্ণ, শৈশবের চেহারা গোপালকে বাঙালি বেশ ঘরোয়া করে নিয়েছিল। বৈষ্ণব বাঙালি এঁদের সাধনায় বিভোর ছিল।

তুলনায় শিব থেকে যদিও শৈব কিন্তু তার পরিবারবর্গ থেকে শাক্তদের জন্ম হয়ে গেল। নরম-সরম বৈষ্ণব নয়, বেশ রাগী এবং উগ্র স্বভাবের না হলে শক্তি প্রদর্শন করা যায় না। মূলত শিবের স্ত্রী কালীকে সামনে রেখে বেশ কিছু দেবীকে বাঙালি টেনে আনল যাঁরা একটু ভয়ঙ্করী রূপে বিরাজ করেছেন। এই শক্তির উপাসক যাঁরা তাঁরাই শাক্ত। মনে রাখতে হবে, এই দেবীদের দলে কখনোই উমাকে রাখা হয়নি। উমা ঘরের মেয়ে, নরম স্বভাবের। তাঁর স্বভাব ঘরোয়া, উগ্র বা সংহার মূর্তিতে বাঙালি তাঁকে কখনো দেখেনি। ফলে তাঁকে শক্তির দেবী বলে বাঙালি কখনোই চিহ্নিত করেনি।

শাক্তদের মূল দেবী কালী। কালীর শরীর থেকে যে দেবী জন্ম নিয়ে যুদ্ধ করেছেন তিনি হলেন কৌষিকী বা চণ্ডিকা। কালীর চারটি হাত। দুই ডান হাতে খট্টাঙ্গ এবং চন্দ্রহাস আর দুই বাম হাতে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, লাল চোখ, বিশাল মুখ, মোটা কান। দাঁতও দীর্ঘ। এঁর বাহন কবন্ধ। ইনি দশ মহাবিদ্যার প্রথম দেবী। দ্বিতীয়জন হলেন তারা। তাঁর ভূমিকা একবারই এবং সেটা দক্ষযজ্ঞে যাওয়ার অনুমতি না পেয়ে মহাদেবকে ভয় দেখানোতে। এঁকে বাঙালি গ্রহণ করেনি। তৃতীয় হলেন ষোড়শী। এঁরও ভূমিকা নগণ্য। দশ মহাবিদ্যার চতুর্থ দেবী ভুবনেশ্বরীকেও বাঙালি তেমন আমল দেয়নি। যদিও তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের উৎপাদয়ত্রী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্রী, আনন্দময়ী এবং সব সময় পদ্মের মূলাধারে বিরাজ করেন। ইনিই কামদেবের বিনাশকারী শিবের প্রলয় শক্তির উৎস। এঁর কেশ লম্বা, মুখের গঠন সুন্দর, গায়ের রঙ সোনার মতো, চার হাতে জ্ঞানমুদ্রা, জপমালা, কলসি এবং বই ধারণ করেন। এই মূর্তির পূজা বিরল। পঞ্চমে আছেন ভৈরবী। ইনি যোগিনী । এঁর নাম জপ করলে বাধা দূর হয়। খুব বড় কিছুই প্রতিশ্রুতি না থাকায় ইনি জনপ্রিয় হননি। দশ মহাবিদ্যার ষষ্ঠ দেবী হলেন ছিন্নমস্তা যিনি বাম হাতে নিজের মাথা ধরে লোল জিভে নিজেরই গলার রক্ত পান করেন। ইনি প্রসন্ন হলে এঁর উপাসকরা শিবত্ব লাভ করে। গ্রাম গঞ্জে এই ছিন্নমস্তার মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তম দেবী হলেন ধূমাবতী। ইনি একদিকে খিদে প্রবল হওয়ায় মহাদেবের কাছে খাবার চান। মহাদেব খাবার দিতে অক্ষম হওয়ায় মহাদেবকে গ্রাস করেন। তখন মহাদেব বলেন, তুমি এখন বিধবা হয়েছ এবং এই বেশেই ধূম সহযোগে পূজিত হবে। বাঙালি এঁকেও গ্রহণ করেনি। অষ্টম দেবী বগলা। দুর্গম নামের এক অসুরকে বধ করতে ভগবতীর শরীর থেকে যে সব শক্তি বেরিয়ে এসেছিল ইনি তার অন্যতম। অবশ্য দেশে প্রচার পান নি। নবম দেবী মাতঙ্গী। ইনি অন্ধকাসুরের রক্ত পান করার জন্যে বিখ্যাত। আবার মাতঙ্গ মুনির স্ত্রীর রূপ ধারণ করে দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন বলে দেবীর অন্য নাম মাতঙ্গী। দশম দেবী কমলাও জনপ্রিয় হননি।

অর্থাৎ লক্ষ করা যাচ্ছে যেসব দেবী ভয়ঙ্করী এবং যাঁদের সন্তুষ্ট করলে আখেরে লাভ হবে বাঙালির অর্ধেকাংশ তাঁদেরই বরণ করে নিয়েছিল। পৌরাণিক দেবতা শনির সঙ্গে লৌকিক দেবী শীতলাকে বাঙালি ব্যাপক ভাবে

পুজো করেছে ওই একই কারণে। সাপের আক্রমণ থেকে বাঁচতে মনসার মন্দির তৈরি হয়েছে গ্রামে গ্রামে। কোথাও কোথাও মনসার মেলাও হয়েছে। অর্থাৎ ভয় থেকে উদ্ধারের জন্যে দেব বা দেবীকে আরাধনা করেছে হিন্দু বাঙালি। ভক্তি থেকে কতটা, সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

সেই অর্থে বৈষ্ণবদের দেবদেবী-প্রীতিতে ভয় ছিল না। সেখানে বিভিন্ন রসের সমাহার। দেবতাকে সন্তান হিসাবে ভেবে নিয়ে বাৎসল্য রসে ডুবে যেতেও দেখা গেছে। কিন্তু এঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন। শরীরে বসন্ত রোগ দেখা দিলে গোপাল তুমি বাঁচাও না বলে শীতলা মন্দিরে ধর্না দিতে ছুটে যেত বাঙালি।

মজার কথা হল, শোকে অথবা আনন্দে সব বাঙালিই ভগবানকে ডাকত। এই ভগবানটি কে? শিব? কৃষ্ণ? কালী? দুর্গা? না মিলেমিশে একজন? বিশেষ সময়ে ভগবানকে ডাকলেও তাঁকে পুতুলরূপ দিতে বাঙালিকে বেছে নিতে হত কোনো না কোনো দেবতাকে। তাছাড়া ডাকলেই তো ভগবান সেই ডাক শুনতে পেত না। মুশকিল হয়ে গেল এখানেই।

> **দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে বসে থেকে শুধু মায়ের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা এই সাধক সেই সীমার ওপরে উঠতে পারেন নি, যেখানে পৌঁছলে অবতার বলা যেতে পারে।**

ধরা যাক অষ্টম শতাব্দীতে বাঙালির একটা আবছা আদল তৈরি হয়েছিল। তারপর থেকে দেবতার সন্ধান সক্রিয় ভাবে শুরু। বিদেশি মুসলমানদের আগমন এবং অবহেলিত হিন্দু সমাজ বাঁচার প্রয়োজনে সেই ধর্মের বর্ম যখন আশ্রয় করছে তখন হিন্দুরা একটু বেশি শাক্ত হতে চেয়েছিল। হয়ত লড়াই করার জন্যে শক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাতে মন ভরছিল না। ওই শূন্যতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। বৃহত্তর ভারতে হিন্দুরা দেখেছিল বুদ্ধদেবকে। দেখেছিল মহাবীরকে। কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম সম্পর্কে তাদের আগ্রহ জন্মায়নি তেমন ভাবে। কিন্তু একজন মানুষকে ঘিরে হাজার মানুষ ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন, এই ছবিটা কেউ বিশ্বাসে কেউ অবিশ্বাসে দেখছিল। হিন্দু ধর্মের একজন শঙ্করাচার্য যে ঢেউ তুলেছিলেন তা বাংলা পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি। বাঙালিকে অপেক্ষা করতে হল প্রায় আটশ বছর, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত।

এই প্রথম একজন মানুষকে কিছু বাঙালি কাছে পেল যাকে ঈশ্বরের অবতার হিসাবে ভাবতে পারল। যে অবতার স্পর্শ করলে কুষ্ঠ সেরে যায়, যিনি ভগবানের কাছে পৌঁছনোর পথ বলে দেন। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছেন এক বা একাধিক অবতার। খৃষ্টানরা যীশুকে পেয়েছেন, মুসলমানরা মহম্মদকে। বাঙালি হিন্দুরা রামকে অবতার হিসেবে মেনে নেয় নি, হনুমানকে নিয়ে রসিকতা করেছে এবং রাম কতটা ঐতিহাসিক চরিত্র ছিল তা নিয়ে তাদের সংশয় যায় নি। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এই মাত্র সাড়ে পাঁচশ বছর আগে তারা প্রথম একজনকে পেল যাঁকে অবতার বলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু সেখানেও সমস্যা তৈরি ছিল। প্রথমত, শ্রীচৈতন্যদেব হরিভক্ত। তিনি কখনো কালী বা শিবের পুজো করেননি। দু'হাত মাথার ওপর তুলে দিনরাত কৃষ্ণ নামের নৃত্য করেছেন। এই ব্যাপারটি কালীভক্ত বা শিবভক্তরা মেনে নিতে পারেন নি। ফলে বাঙালির একাংশই তাঁকে অবতার হিসেবে ভেবেছে। দ্বিতীয়ত তিনি বেশির ভাগ সময়েই পুরীতে বাস করেছেন। পুরীর রাজা তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিল। বাঙালি অবতার পুরীতে গিয়ে বাস করছেন—এই ব্যাপারটা বেশ কিছু কৃষ্ণভক্তকে দুঃখিত করেছিল। তৃতীয়ত যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সবার সামনে। যীশু সেটা স্মিতমুখে মেনে নিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে এসেছিলেন বাকি কাজ শেষ করতে। তাতে তিনি আরো বেশি অবতার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু চৈতন্যকে পুরীর পাণ্ডারা রাতের অন্ধকারে খুন করেছিল। কারণ তাঁর প্রতি আসক্তিতে রাজা রাজকর্ম ভুলে গিয়ে রাতদিন কৃষ্ণনাম জপ করছেন অথচ শত্রুসৈন্য এগিয়ে আসছে। রাজা এবং রাজ্যকে বাঁচাতে চৈতন্যকে খুন করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। চৈতন্যর মৃতদেহ সমুদ্রে ভেসে যাওয়ার পর যদি আবার কিছুদিনের জন্য জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতেন তাহলে কালী ভক্তরা তাঁকে অবতার হিসাবে মেনে নিতেন। পরবর্তী শিক্ষিত সম্প্রদায় চৈতন্যকে প্রথম বাঙালি, যিনি নবজাগরণের প্রতীক, এই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সেটা অন্য পটভূমি। অবতার হিসেবে তাঁর সম্পর্কে বাঙালির বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস সমানভাবে রয়েছে।

চৈতন্য বাঙালিকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। উঁচু বা নিচু সম্প্রদায় অথবা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রথম কোনো বাঙালি ওই কাজ করার কথা ভেবেছিল। এই একত্রীকরণের মন্ত্র হিসেবে তিনি কৃষ্ণনামকে ব্যবহার করেছিলেন। কৃষ্ণনামকে তিনি ধর্মের বাধা-নিষেধ বা গোঁড়ামির ওপরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আবেগ অথবা পরিকল্পিত ভাবনা—কোনটা চৈতন্যকে পরিচালিত করেছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। মোদ্দা কথা, তাঁকে অবতার হিসেবে বাঙালির সবাই মেনে নিক বা না নিক সেই প্রথম গুরুবাদের জন্ম হয়েছিল।

বাঙালির দুর্ভাগ্য যে, যীশু অথবা বুদ্ধের মতো কেউ তাঁদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নি। নানা মূর্তি, নানা মত এবং মূলত ধান্দাবাজির জন্যে ধর্মাচরণ করে বাঙালির জীবনে ধর্মের প্রভাব কখনোই তীব্র হতে পারেনি। মুসলমানরা যে অর্থে ধর্মের কারণে একত্রিত, বাঙালি হিন্দুরা সেই কারণটার হদিশ কখনোই পেল না। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনোর ইচ্ছে আছে কিন্তু পথ জানা নেই। শুধু 'কালী কালী' বা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ডাকলেই তাঁরা স্বর্গ থেকে নেমে এসে কোলে তুলে নিচ্ছেন না। ঢাকঢোল পিটিয়ে শীতলা পুজো করেও বসন্ত রোগ আটকানো যাচ্ছে না। দিনরাত লক্ষ্মীপুজো করেও ঘরে অর্থ আসছে না। এই হতাশা থেকে বাঁচার জন্যে বাঙালি যখন অবতার পেল না তখন গুরুর প্রয়োজন হল। অর্থাৎ রাজা না পাওয়া গেলে একজন জোতদার বা জমিদার মাথার ওপর রাখা জরুরি হল।

কিন্তু ঠিকঠাক গুরুর সন্ধান বাঙালি সহজে পায়নি। চৈতন্য অনুগামী সাধকরা নেহাৎই আঞ্চলিক ছিলেন, সমস্ত বাংলায় তাঁদের তেমন প্রভাব ছিল না। নবদ্বীপ হয়ে গেল বৈষ্ণবদের সাধনাস্থল। আর সমস্ত বাঙলায় কল্পিত সতীর দেহাংশ ছড়িয়ে দিয়ে তৈরি হয়ে গেল কালীর মন্দির। ফলে শাক্তদের প্রাধান্য বাড়ল। আমরা জানি বৈষ্ণব এবং শাক্তদের সম্পর্ক সহজ ছিল না।

অবতার চাই, না পেলে একজন সর্বশ্রদ্ধেয় গুরু। এই অবস্থায় বেশ কয়েকজন শাক্ত সাধকের নাম এবং খ্যাতি চারদিকে ছড়াল। যেমন সাধক বামাক্ষ্যাপা, ত্রৈলঙ্গস্বামী। মূলত তান্ত্রিক এই সাধকরা বিপুল ক্ষমতা আয়ত্ত করলেও বাঙালি তাঁদের ভক্তি এবং ভয়ে গ্রহণ করেছে। তাও পুরো বাঙালি জাতি নয়। এঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তারা সবিস্ময়ে দেখেছে। কিন্তু যে কারণে অবতাররা অবতার, অর্থাৎ সমস্ত মানুষ জাতির উপকার করার জন্যেই যাদের মর্ত্যে আসতে হয়, সেই কারণ এই সব সাধকবৃন্দের আচরণে দেখা যায় নি। এর পরের সময়টায় আমরা পেয়েছি অনেক গুরু। লোকনাথ বাবা, ভোলানন্দ গিরি, নিগূঢ়ানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত, অনুকূল ঠাকুর, বালক ব্রহ্মচারী, ইত্যাদি। অজস্র মানুষ এঁদের শিষ্য হয়েছেন শান্তির আশায় যে শান্তি তাঁদেরকে তেত্রিশকোটি দেবদেবী

দিতে পারেননি। শান্তি কতটা পেয়েছেন-তা ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করেছে কিন্তু একথা সত্যি, এদের কাউকেই বাঙালি ঈশ্বরের অবতার হিসেবে মেনে নিতে পারে নি। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধদেব বা মহাবীরের পাশে এঁদের আসন হতে পারে না, তা অতি-অনুরাগীরাও বুঝতে পারেন।

এই সব সাধকদের পাশে দীর্ঘকাল অপেক্ষায় থেকে বাঙালি যাঁকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দক্ষিণেশ্বরের এই পূজারী ব্রাহ্মণ কালীপূজা করলেও তাঁকে শাক্ত বলাতে অসুবিধে হচ্ছে, কারণ তিনি কৃষ্ণনামও করেন। কালী এবং কৃষ্ণ তাঁর কাছে একাকার। নযজন অতিজ্ঞানী শিষ্য ছাড়াও তৎকালীন শিক্ষিত বঙ্গ সমাজের গরিষ্ঠাংশ তাঁকে ঠাকুর হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। এই প্রথম 'গুরুদেবের' বিকল্প শব্দ পাওয়া গেল, ঠাকুর। এতদিন বাঙালি ঈশ্বর এবং ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর এবং ঠাকুরমশাই বলে সম্বোধন করত। বড় বড় গুরুদেব সবসময় পাওয়া যায় না বলে একজন ব্রাহ্মণকে কুল পুরোহিত হিসেবে গুরুর স্বীকৃতি দেওয়া হত। কিন্তু ঠাকুর সম্বোধনটি ছিল ঈশ্বরের জন্যে নির্দিষ্ট। দক্ষিণেশ্বরের সাধককে ঠাকুর বলে ডাকার মধ্যে বাঙালি তাঁকে অবতারের আসনে বসাতে চাইল।

> **শরীরে বসন্ত রোগ দেখা দিলে গোপাল তুমি বাঁচাও না বলে শীতলা মন্দিরে ধর্না দিতে ছুটে যেত বাঙালি।**

রামকৃষ্ণের নামের আগে যেমন 'ঠাকুর' তেমনি নামের পরে 'দেব' শব্দটি যোগ করা হল। কলকাতার এত কাছে বলে প্রচার বেড়ে গেল। তার ওপর স্বামী বিবেকানন্দের মতো শিষ্য, যাঁকে ধর্মসাধক না বলে মানবসাধক বলাই সঙ্গত, রামকৃষ্ণের প্রচার ব্যাপক করে দিলেন। বাঙালির ঘরে ঘরে তাঁর ছবি টাঙানো হল। তাঁর স্ত্রীকে 'মা' বলে ডাকতে শুরু করল সবাই। প্রথমে রামকৃষ্ণের পরিচয়ে তাঁর পরিচয়, পরে নিজের কারণে তিনি বাঙালির মা হয়ে গেলেন।

রামকৃষ্ণের পক্ষে অবতার হওয়া সম্ভব হল না। মূলত তিনি নিজেকে মায়ের সন্তান বলে মনে করতেন, তবু ঈশ্বরপুত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন না। তাঁর সাধনা ছিল ব্যক্তিসাধনা। তাঁর সংস্পর্শে যিনি গিয়েছেন তাঁকেই মাকে ডাকার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে তিনি কোনো প্রচার করেন নি। তিনি উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু সেই সদুপদেশাবলী বৃহৎ জনসাধারণের কাছে পৌছে দিয়েছেন তাঁর শিষ্যরা। বিবেকানন্দের যুক্তিবাদকে রামকৃষ্ণ গ্রহণ করেন নি যেমন, তেমনি রামকৃষ্ণের অন্ধ ভক্তিবাদকে বিবেকানন্দ এড়িয়ে গিয়েছেন। ঈশ্বরের মূর্তির পায়ে পড়ে না থেকে জীবের সেবা করেই ঈশ্বর প্রাপ্তির আনন্দ পাওয়া যায়, একথা বিবেকানন্দের কাছে শুনেছে বাঙালি। যে যা করছে সেই কাজটা ঠিকঠাক করাই হল ঈশ্বরকে পাওয়ার সামিল, এমন কথাও রামকৃষ্ণ বলেন নি। দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে বসে থেকে শুধু মায়ের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা এই সাধক সেই সীমার ওপরে উঠতে পারেন নি, যেখানে পৌছলে অবতার বলা যেতে পারে। পাপ বিনাশ করতে এবং পুণ্যবানের সাহায্যের জন্যে অবতার অবতীর্ণ হন। এই ভূমিকায় রামকৃষ্ণ কখনোই পৌছন নি।

বাঙালি অনেক গুরুর দেখা পেয়েছে। ইতস্তত কিছু ভৈরবীকে বাদ দিলে প্রথম গুরুমার সন্ধান পেল সারদামণির মধ্যে। বস্তুত রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরেই সারদামণির উত্থান। বাঙালি তাঁকে মা বলে মেনে নিতে পেরেছে অকুণ্ঠ চিত্তে। রামকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপনে বিবেকানন্দের আপত্তি সত্ত্বেও যখন অন্যান্য শিষ্যরা উদ্যোগ নিয়েছিলেন তখন মা তাতে জল ঢেলে দেন।। তাঁর বক্তব্য ছিল, মূর্তি পুজো করে কি হবে, তার চেয়ে তিনি যা বলে গেছেন তাই ঠিক করে করো। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলা, যাঁকে প্রায় বালিকা বয়সে স্বামীর উপেক্ষার সঙ্গে বসবাস করতে হয়েছিল, সহবৎ নামক জেলখানায় জীবন কাটাতে হয়েছিল তিনি কোন শিক্ষায় নিজেকে সাধারণের উপরে নিয়ে গিয়েছেন তার ব্যাখ্যা মেলে না। এই গ্রাম্য মহিলা ম্লেচ্ছ নিবেদিতা শীতে কষ্ট পাচ্ছে শুনে তাঁর জন্যে সোয়েটারও বুনতে পারেন অবলীলাক্রমে। বাঙালি মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়ান মায়ের চেহারা নিয়ে। এ কথা আজ স্বীকার করতে হবে, রামকৃষ্ণের থেকে শ্রীমা বাঙালির অনেক বেশি আপনজন।

আর একজন মায়ের দেখা বাঙালি পেল যিনি জন্মসূত্রে বাঙালি নন কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কল্যাণে বাঙালির কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন। তবে তিনি যতটা না মা তার থেকে অনেক বেশি মাদার। তাঁর প্রসঙ্গ এই নিবন্ধের জন্যে নয়।

শ্রীমা দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর পরে বাঙালি পেয়েছিল আনন্দময়ীকে। তিনি মায়েরই আর এক রূপ। অজস্র ভক্ত তাঁর কাছে পেয়েছিল অপার শান্তি, যা ঈশ্বর তাঁদের দেন নি।

তবু বাঙালির তৃষ্ণা মেটে নি। গুরুর জন্যে কখনো আঁকড়ে ধরেছে সাঁইবাবাকে, কখনো ঈশ্বরের খোঁজে খুঁজেপেতে আনে সন্তোষী মাকে, যাঁকে বাঙালি কখনোই চিনত না। সাঁইবাবার জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করতেই বাঙালি পুনরুদ্ধার করল লোকনাথ বাবাকে। কারণ তাঁর পুজোয় কোনো খরচ নেই, তাঁকে ডাকলেই নাকি সব বাধা দূর হয়ে যায়। যাঁর কাছে কিছু পাওয়ার আশা আছে বাঙালি তাঁর কাছেই ছুটে গিয়েছে।

এবং এই কারণেই বাঙালির কোনো ধর্ম নেই, এই কারণেই বাঙালি একত্রিত নয়।

WITH BEST COMMPLIMENTS FROM

HOWRAH MILLS CO. LTD.

"HOWRAH HOUSE"

135, FORESHORE ROAD. (SOUTH)
RAMKRISTOPUR. HOWRAH-711 102

PHONE
OFF 660-1446/2302/2748/4159
FAX 91-33-660 1447
E-mail shreehrt @ giascl01 vsnl.net.in

সাহিত্য দুঃসংবাদ

হৃদয় অবাধ্য মেয়ে(!)

সহজ কথা অতি সহজে বলিতে পারা নিতান্তই কঠিন কার্য। এই দুঃসাহসিকতা এই দুঃসংবাদদাতার কম্মো নহে। কিন্তু ইহায় যিনি সিদ্ধহস্ত তাঁহাকে মন্দাক্রান্তা সেন বলিয়াই চিনি। এমন দাবী, কবির লেজ বা লেজুড়— যাঁহারা অগ্র বা পশ্চাতে সর্বদা ধাবমান, রাখিয়া থাকেন। তবে সকল কথা আমরা অতীব সহজে বলিতে পারি না—পারিলে তাঁহার পুস্তককে অপাঠ্য বলিবার জন্য এই ভণিতার প্রয়োজন হইত না। প্রয়োজন হইত না পত্রপাঠের একটি মূল্যবান পত্রের অপচয়ের। এতদ্ সত্ত্বেও সান্ত্বনা এই বাক্য স্মরণে— আমাদিগের যাহা দুর্বলতা, তাহাই সেনানীর সবলতা।

ঠাকুর বলিয়াছেন, যত মত তত পথ। মানব জীবনে যাহা অতিশয় সহজে ও সরলীকৃত পন্থায় নির্গত হয়, বিজ্ঞানীদের নিকটে তাহা 'বর্জ্য', কামুক পুরুষের নিকট 'বীর্য'। আর মন্দাক্রান্তা ইহাকে পদ্য বলিয়া চিহ্নিত করেন। ইহা আদপেই দোষের নহে। যেমন যদি স্মরণ করি,

"রজনীর এমনি কপাল
যে পুরুষ তার লাগে ভাল
তাদের সবাই বিবাহিত।"
কিংবা
"ঘরের পুরুষ অন্য ঘরে
আমার পুরুষ অন্য লোকে।"

—প্রকৃত পক্ষে যাহার যেমন ভাব তদনুসারে কর্ম। মন্দাক্রান্তা এমনই ভাবিয়া থাকেন, ফলত এমনই করেন, থুড়ি, লেখেন।

মানিকবাবু শশীর জবানিতে লিখিয়াছিলেন, "শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?" 'হৃদয় অবাধ্য মেয়ে' পাঠান্তে কেহ বুঝি চুপি চুপি কহিয়া যায়— মন,মন—শরীর নহি .. ? অপিচ, বাঙালিদিগের দুর্ভাগ্য ইহাই, গ্রন্থটিকে কেহ সিডনি সেলডনের রোমহর্ষক (কাহারো মতে, 'রোমহর্ষক' হল রোমাণ্টিকতায় গাত্ররোমের হর্ষ প্রকাশ) নভেলের সহিত তুলনা করিলেন না। মন্দাক্রান্তার 'ব্যাড লাক্'-টি নেহাৎই মন্দ।

অবশ্য, তুলনা অন্যভাবেও হইতে পারে। শুনা যায়, মন্দাক্রান্তা নাকি একদা চিকিৎসা-বিদ্যার ছাত্রী ছিলেন। আর এ গ্রন্থটিও [illegible] ভাবে তাঁহার পরীক্ষাপত্রের সহিত তুলনীয়। যেমন 'বিবাদ ও অম্লভঞ্জন' কবিতায় দেখিতে পাই—

"বুকে পিঠে ধুম জ্বর
পোড়া মুখে রোচে না ব্যঞ্জন
বিবাদ আমাকে খেল
আমি খেয়েছি অম্লভঞ্জন।"

রোগ নির্বাচনের শিক্ষা তাঁহার সম্পূর্ণ না হইলেও, ঔষধ নির্বাচনের শিক্ষা সম্পূর্ণ রহিয়াছে। জ্বর, বিস্বাদ ও বিনা[illegible] একখান 'ক্রোসিন' কিংবা একটুক্ পাঁচন বড় আদর্শ বোধ করি। কিন্তু অম্লভঞ্জন কদাচ নহে। ইহা নাভিতে লেপন করা যাইতে পারে—কিন্তু উদরাকাশে পৈটিক (Poetic-ও বটে) গোলোযোগ অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য তাহার কোনো প্রতিষেধক চিকিৎসকার বাৎলিয়া দেন নাই। আবার এক স্থানে প্রত্যক্ষ করি,

"কত বছর স্নান করিনি
জ্বর শুষেছি দু'চক্ষে,
ওরা আমার অসুখ দ্যাখে
দূর থেকে আর অলক্ষ্যে।"

কবির গাত্র-নির্গত দুর্গন্ধ আর ত্বকে ফুটিয়া উঠা কৃষ্ণকায় নক্সার কথা ভাবিলে শিহরিত হই। অনুভব করি, সকলের দূর হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবার প্রকৃত কারণ। এমতাবস্থায় আবশ্যক হইল কিঞ্চিৎ পটাশযুক্ত জলে অবগাহন। বোধ করি, তাঁহার পদ্য যে পথে আগাইতেছিল, তাহাতে এমন পরামর্শে সোনায় সোহাগা হইত।

মন্দাক্রান্তাকে মন্দাক্রান্তা (মানে, মন্দ ভাবের আক্রান্তা) যিনি করিয়াছেন তাঁহার নাম ইন্দ্রকাকু—

"শহিদমিনারে উঠে গিয়ে
ব'লে দেব আকাশ ফাটিয়ে
ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক।"

ইহা চলিল বটে। কিন্তু কনসেপ্টটি বড় পুরাতন। বহু পূর্বেই রণজিৎ দাশ বলিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, "আবার বিশ্বাসকাকু, আবার চালাকি!" হায়! খুল্লতাতকে প্রেমিক ভাবিয়াও নূতন কিছু করা যাইল না। অতঃপর মন্দাক্রান্তা প্রেমিককে খুল্লতাত করিবার এক্সপেরিমেণ্টটি করিতেই পারেন।

তবে অপরক্ষেত্রেও কিছু প্রশ্ন রহিয়া যায়। শহিদমিনার হইতে শুধু কি খালি গলায় আকাশ ফাটাইবেন? তাহা নেহাৎই অসম্ভব বোধ করি। আকাশ তো ফাটিবেই না—গলাটি ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবল। আর যদি শব্দ বর্ধকের কথাই ভাবিয়া থাকেন তো ভিন্ন ব্যাপার। গোপন প্রেমের প্রকাশেও দেখি শব্দ দূষণের আশঙ্কা।

অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য, গ্রন্থটির বিক্রিবাটা নেহাৎ কম নহে। গত দুই বৎসরে ইহার পঞ্চমতম মুদ্রণও বাহির হইয়াছে। অন্যতম কারণ ইহাই যে, পানশাস্ত্র হইতে চিকিৎসা বিদ্যা—উষ্ণ প্রেমপত্র রচনা হইতে আলমারি সজ্জা ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রেই গ্রন্থটির যথার্থতা। যেমন এই দুঃসংবাদদাতা গ্রন্থটি ক্রয় করিয়াছেন কেবল দুঃসংবাদ রচনার নিমিত্ত। এতদ্ব্যতীত টেবিলের গোঁজ বা উনানের আঁচের প্রয়োজনও শেষ হয় নাই। ফলত গ্রন্থটির এইরূপ বিপুল ব্যবসা। আর গ্রন্থ প্রকাশের সাথে সাথে 'মাইলেজ' দিবার জন্য তো 'বিগ হাউস্' সদা বিরাজমান। প্রভাত প্রারম্ভে মন্দাক্রান্তা বুঝি বা প্রত্যহ উচ্চারণ করেন—মা-গো 'আনন্দ'ময়ী, নিরানন্দ করো না মা।। ❑

সুস্নাত চৌধুরী

হাই মাদ্রাসা ২০০২

10 YEARS QUESTIONS & ANSWERS WITH SUGGESTIONS

(ALL SUBJECT)

অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা রূপায়িত প্রশ্ন উত্তর সম্বলিত বিশেষ জ্ঞানভাণ্ডার যা সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একান্ত অপরিহার্য। ২০০১ সালে আমাদের Sugg ৯০% সফল হয়ে ২০০২ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্যে আনন্দবার্তা নিয়ে আবার পাথেয় হতে চলেছে।

****

* একমাত্র দশ বছরের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর।
* ২০০২ সালের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী।
* প্রতি বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক উপযোগী উত্তর।
* একাধারে Test এর পরিপূরক এবং হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধিকারক।

প্রকাশক : **স্টুডেন্টস্ ওয়েজ, স্টল নং-২১**
(প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইন, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩)
পরিবেশক : **মল্লিক ব্রাদার্স, ৫৫ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ৭৩**
দূরভাষ : ২৪১-৩৭৩৬

হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য অপরিহার্য নির্দেশিকা

মা বোনেরা অকারণ লজ্জায় রোগ গোপন করবেন না

মা, বোনেদের কাছে আমাদের সবিনয় অনুরোধ, অকারণ লজ্জায় রোগ গোপন ক'রে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য নষ্ট করবেন না। যাঁরা দীর্ঘকাল অথবা সাময়িকভাবে লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর রোগে ভুগছেন, তাঁরা আমাদের বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডঃ মণ্ডলের দীর্ঘ গবেষণালব্ধ 'লিউকোরেক্স' ব্যবহার করুন। মাত্র ১ ফাইলেই এই ঔষধের উপকারিতার পরিচয় পাবেন। মনে রাখবেন, লিউকোরিয়া শুধু আপনার স্বাস্থ্য সৌন্দর্যই নষ্ট করে না, তার সঙ্গে আনে ক্লান্তি ও অবসাদ।

লিউকোরেক্স শ্বেতপ্রদরের ঔষধ

প্রস্তুতকারক : লর্ড হ্যানিম্যান ল্যাবোরেটরী
৭, নূর মহম্মদ লেন, কলকাতা-৯
(৩২ ডি, মহাত্মাগান্ধী রোডের পাশে)
দূরভাষ : ৩৫০-৯৬৮০

With Best. Compliments from :

Rtn. B. Roy Choudhuri

Peerless®

The easy way to save
*
The Symbol of Trust

Website-http : www.peerless-in-india.com

New Customers in the last Financial Year : Bbout 20 lakhs

TOTAL MATURITY CLAIMS PAID :
OVER Rs. 3,000 CRORE

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

বিদেশ যাত্রা :

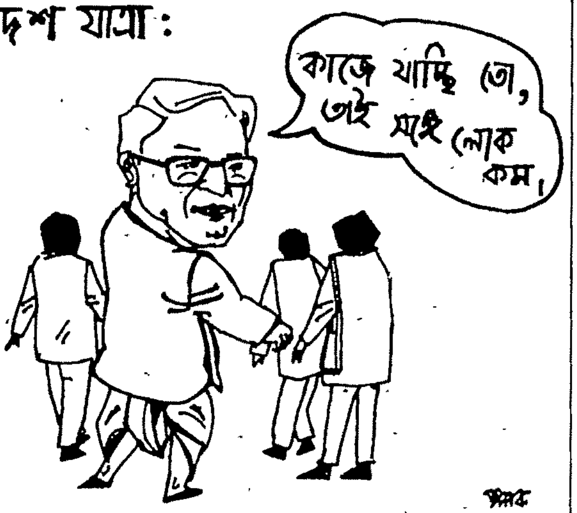
কাজে যাচ্ছি তো, তাই সঙ্গে লোক কম।
পল্লব

বিদেশ যাত্রা :

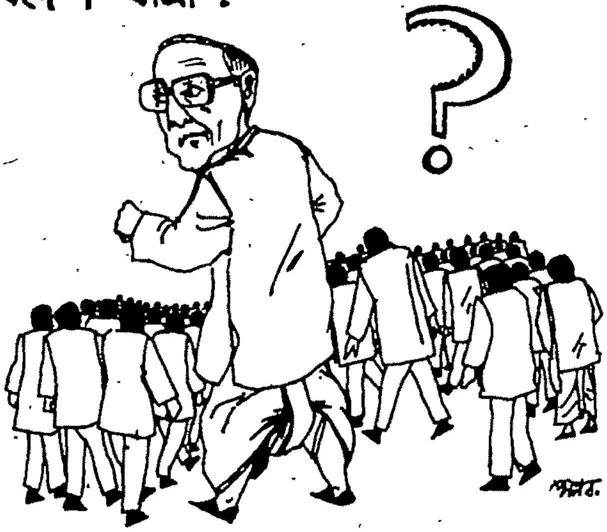

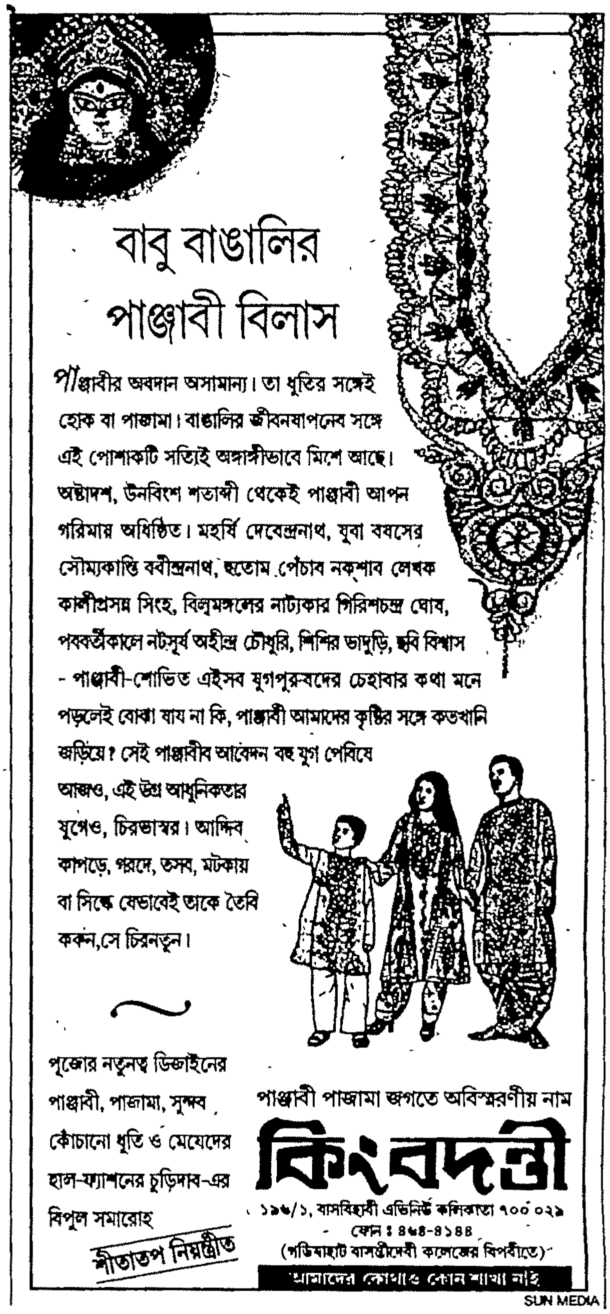
বাবু বাঙালির
পাঞ্জাবী বিলাস

পাঞ্জাবীর অবদান অসামান্য। তা ধুতির সঙ্গেই হোক বা পাজামা। বাঙালির জীবনযাপনের সঙ্গে এই পোশাকটি সত্যিই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দী থেকেই পাঞ্জাবী আপন গরিমায় অধিষ্ঠিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যুবা বয়সের সৌম্যকান্তি রবীন্দ্রনাথ, হুতোম পেঁচার নক্‌শার লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিল্বমঙ্গলের নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরবর্তীকালে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরি, শিশির ভাদুড়ি, ছবি বিশ্বাস - পাঞ্জাবী-শোভিত এইসব যুগপুরুষদের চেহারার কথা মনে পড়লেই বোঝা যায় না কি, পাঞ্জাবী আমাদের কৃষ্টির সঙ্গে কতখানি জড়িয়ে? সেই পাঞ্জাবীর আবেদন বহু যুগ পেরিয়ে আজও, এই উগ্র আধুনিকতার যুগেও, চিরভাস্বর। আদ্দির কাপড়ে, গরদে, তসর, মটকায় বা সিল্কে যেভাবেই তাকে তৈরি করুন, সে চিরনতুন।

পুজোর নতুনতর ডিজাইনের পাঞ্জাবী, পাজামা, সুন্দর কোঁচানো ধুতি ও মেয়েদের হাল-ফ্যাশনের চুড়িদার-এর বিপুল সমারোহ

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

পাঞ্জাবী পাজামা জগতে অবিস্মরণীয় নাম

কিংবদন্তী

১৯৬/১, রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা ৭০০ ০২৯
ফোন : ৪৬৪-৪১৪৪
(গড়িয়াহাট বাসন্তীদেবী কলেজের বিপরীতে)

আমাদের কোথাও কোন শাখা নাই

SUN MEDIA

একুশ শতকের লোককথা

সংগ্রাহক : ফজল আলি

সতীনের ঝি

প্রবল বন্যায় আরো অনেক কিছুর মতো ইস্কুল বাড়িটিও ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। অনেকদিন ইস্কুল বন্ধ। অবশেষে ইস্কুল চালু হল। কিন্তু গাছতলায়। বাবা ছেলেকে বলল, 'চল্ খোকা আজ তোকে ইস্কুলে দিয়ে আসি।'

ছোট্ট ছেলেটি বই-শ্লেট নিয়ে ইস্কুলে চলল। ইস্কুলের কাছটিতে গিয়ে সে তো অবাক। কোথায় ইস্কুলবাড়ি? চিহ্নটুকুও নেই। অবাক হয়ে সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা ইস্কুলবাড়িটা কোথায় গেল?'

বাবা ভাবল একটু মজা করা যাক। অবাক হওয়ার ভান করে ছেলেকে বলল, 'তাই তো খোকা, কোথায় গেল ইস্কুলবাড়িটা? একটা কাজ কর খোকা। ইস্কুলকেই জিজ্ঞাসা কর না, বাড়িটা কোথায় গেল?'

ছেলে সরল বিশ্বাসে ইস্কুলবাড়ি যেখানে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইস্কুল, ইস্কুল, তোমার বাড়িটা নেই কেন?' অবাক কাণ্ড। একটা কণ্ঠস্বর কান্না-ভেজানো গলায় বলল, 'রাজ্য সরকার টাকা দেয় না কেন?'

ছোট্ট ছেলেটি রাজ্য সরকার কাকে বলে জানে না। রাজ্য সরকারও বলতে পারে না। সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, রাজ্যু সরকার কোথায় থাকে বাবা? সে টাকা দেয় কেন?'

বাবা বলল, 'আমি তো জানি না। চল্ পঞ্চায়েতকাকুকে জিজ্ঞাসা করি।'

পঞ্চায়েতকাকুও জানেন না। তিনি অঞ্চলপ্রধান জেঠুর কাছে যেতে বললেন। অঞ্চল প্রধান বললেন, 'কলকেতায় যাও। লালদিঘির সামনেই আছে লালবাড়ি। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।'

বাবা ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় গেল। লালবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'রাজ্যু সরকার, রাজ্যু সরকার, ইস্কুলকে টাকা দাও না কেন?' লালবাড়ি থেকে রাগী রাগী গলায় জবাব এল, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় না কেন?'

ছোট্ট ছেলে। কেন্দ্রীয় সরকার বলতে পারে না। বাবাকে বলল, 'বাবা, বাবা, কেঁদু সরকার কোথায় থাকে? সে টাকা দেয় না কেন?'

বাবা পড়ল মহা ফাঁপরে। জনে জনে জিজ্ঞাসা করে। শেষে কে একজন বলল, 'এম. পি. দাদুকে জিজ্ঞাসা করো।' এম. পি. দাদু সব শুনে-টুনে বললেন; 'চলো আমার সঙ্গে দিল্লি। সেখানে এর জবাব পাবে।'

বাবা ছেলেকে নিয়ে এম. পি. দাদুর সঙ্গে দিল্লি গেল। এম. পি. দাদু নর্থ ব্লকের সামনে ছেলেটিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেঁদু সরকার, কেঁদু সরকার, রাজ্যু সরকারকে টাকা দাও না কেন?'

কর্কশ গলায় জবাব এল, 'আমাকে গাল দেয় কেন?'

সত্যিই তো। রাজ্যু সরকার কেঁদু সরকারকে গাল দেয় কেন? ভাবতে ভাবতে ছেলেটি তার বাবাকে নিয়ে ফের লাল বাড়িটিব সামনে হাজির হল। তারপর জানতে চাইল—'রাজ্যু সরকার, রাজ্যু সরকাব, কেঁদু সরকারকে গাল দাও কেন?'

আবার সেই রাগী রাগী গলায় জবাব এল—'গাল দিয়েছি বেশ করেছি। আমি কি সতীনের ঝি?'

'সতীনের ঝি' মানে কি? ছেলেটি বাবার কাছে জানতে চাইল।

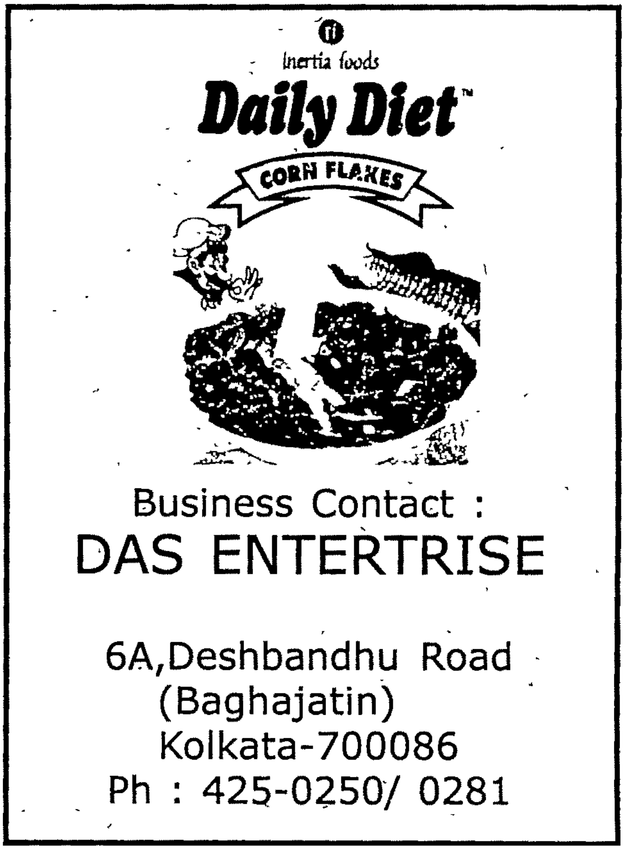
Inertia foods
Daily Diet™
CORN FLAKES

Business Contact :
DAS ENTERTRISE

6A,Deshbandhu Road
(Baghajatin)
Kolkata-700086
Ph : 425-0250/ 0281

দেবীর আগমন ও প্রত্যাবর্তন

সৈয়দ রেজাউল করিম

মহাদেব দাওয়ার এক ধারে চোখ বুঁজে গুম হয়ে বসেছিলেন। হেরোইনের নেশায় আমেজ ধরেছে প্রচণ্ড। নারদ কলকাতায় গিয়ে তিলজলা থেকে নগদ দাম দিয়ে কয়েকটা পুরিয়া নিয়ে এসেছিল। প্রভুকে হাতে রাখার জন্য পুরিয়াগুলো দিয়ে বলল, প্রভু। সারা জীবন তো গাঁজা খেয়ে মরলেন। মর্তলোকের নয়া আবিষ্কার এই পাতাটা একটু খেয়ে দেখুন কেমন লাগে।

মহাদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, বলছিস যখন, দে দেখি। বলে মাত্র দুটো টান দিয়েছিলেন। আর যায় কোথায়। নেশায় মাথা গেল ঘুরে। চরম আচ্ছন্ন হয়ে বললেন, নারদ তোমাকে আমি নরকে পাঠাব।

নারদ কাঁচুমাচু হয়ে বলল, কেন প্রভু?

মহাদেব বললেন, মুর্খ! এ পাতায় এত সুখ, তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন? আজই মর্তলোক থেকে দু'ট্রাক মাল নিয়ে এসো।

নারদ দু'বার ঢোঁক গিলে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, প্রভু। এ তো আর আপনার গাঁজা নয় যে দু'টাকাতে দশটা পুরিয়া পাবেন। সোনার চারগুণ দাম চলছে এখন হেরোইনের।

মহাদেব বললেন, তা এক কাজ করো। তোমার মা'র গয়নাগুলো নিয়ে যাও।

এমন সময় কাপড় গুছোতে গুছোতে দেবী এসে হাজির। গয়নার কথাটা কানে যেতেই দেবী বললেন, গয়না দিয়ে কি হবে শুনি?

মহাদেব নিরুত্তর।

অবস্থা সামাল দিতে নারদ বলল, মাতা, প্রভু বলছিলেন এবারে পুজো নিতে বঙ্গদেশে গেলে যেন সোনার গয়না পরে না যান। দেশে এখন চুরি ছিনতাই বেড়েছে। মুড়ি-মুড়কির মতো ডাকাতি হচ্ছে। দিনদুপুরে মানুষজন 'কিডন্যাপ' হচ্ছে। ওরা সবকিছু কেড়ে নেবে।

দেবী হেসে বললেন, সে কথা কি আমাকে আবার বলতে হবে। তারপর দেবী মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তা শোনো, যে কথা বলতে এসেছিলাম। এবার আমি সশরীরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বঙ্গদেশে যাব। নিজের চোখে দেখব ওরা কে কেমনভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করছে। আর তুমি যদি সঙ্গে যেতে চাও তো চলো।

মহাদেব মাথা নাড়লেন। যার অর্থ—না বাবা, আমি ও পথে নেই। যে দিনকাল পড়েছে। গাঁজা ভাং খেয়ে পথে ঘুরতে দেখলেই সরকারি গুণ্ডা বাহিনী সোজা ধরে নিয়ে ফাটকে পুরে দেবে। মারতে মারতে হাড় গুঁড়ো করে ফেলবে। দেখছ না, লকআপে আজকাল কত মরছে?

পতির চোখের ভাষা দেবী বুঝতে পেরে অভিমান করে বললেন, তুমি কোন কালে আমার সঙ্গে গিয়েছ? বলে ধপাস করে ভাঁজ করা শাড়িটা বাক্সের মধ্যে রেখে বললেন, আমরা চললুম।

দেবীর কথায় মহাদেবের নেশা যায় ছুটে। টনক যায় নড়ে। হোম মিনিস্টার যদি বিগড়ে যায় তা হলে সব শেষ। কাঁধে করে ত্রিভুবন ঘুরলেও কিছু হবে না। আর যা আইন কানুন হয়েছে। স্ত্রী অভিযোগ করলে জেল অনিবার্য। যমেও বাঁচাতে পারবে না। তাই দেবীর হাত দুটো ধরে আদর করে মিষ্টি সুরে বললেন, জনগণ তো এখন তোমাকেই দেখতে চায়। তোমার ছেলেপুলেদের আশীর্ব্বাদ নিতে চায়। এই বুড়োকে অনেকদিন আগেই বাদ দিয়েছে ওদের খাতা থেকে। সুতরাং বিনা নিমন্ত্রণে আমি আর কেন? ছেলেপুলেদের নিয়ে তুমি যাও। ফেরার সময় বরং আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

নারদ ফোড়ন কাটে, প্রভু। মাকে তো নিয়ে আসবেন বলে কথা দিলেন। তা মা কোথায় কাদের বাড়িতে যাচ্ছেন, কী খাবেন, কবে আসবেন—এ সব কিছু শুধালেন?

মহাদেব জিভ কাটেন,—তাই তো, মন্দ বলোনি। কথাটা মনে করে না দিলে বিপদে পড়তুম।

দেবী বললেন, এবার আমরা লালুদের বাড়িতে গিয়ে উঠব। ওরা আমাদের যত্নআত্তি করবে বলে কথা দিয়েছে।

এমন সময় ধুতির খোঁট গুঁজতে গুঁজতে কার্তিক এসে হাজির। মা-র কথাটা কানে যেতেই প্রতিবাদ করে বললে, তুমি থামো তো মা। তোমার ওই লালুবাবু ভুলুবাবু গ্রীণবাবু সবাইকে আমার দেখা আছে। যেমন এ বাবু

তেমন ও বাবু। পয়সার এ পিঠ আর ও পিঠ। বছরে একবার পুজো। পুজোর সময় কত কথা, কত প্রতিশ্রুতি—মা তোমাকে শাড়ি দেব, গয়না দেব, তোমার ছেলের চাকরি দেব, তোমার দুঃখের সংসারটা সোনায় মুড়িয়ে দেব। তারপর পুজো হয়ে গেল তো তোমাকে আর চিনতেই পারে না। আজ তো ষষ্ঠী। কেউ তোমাকে নিতে এসেছে?

দেবী ধমক দেন;—চুপ কর তো। ফাজিল কোথাকার।

কার্তিক বললে, ফাজিল বলো আর যাই বলো মা, তোমার লালুবাবু ধর্মকর্ম মানে না। দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না। তার বাড়িতেই তুমি গিয়ে উঠবে ভাবছ?

দেবী বললেন, না, করে না। তোকে সব বলেছে? বেড়াতলার কথা মনে আছে? মঞ্চে উঠে লালুবাবু বলেছিল, ওরা আমাদের লোক। ধর্মকর্ম মানে না বলছিস যে।

কার্তিক চুপ করে যায়। চুপ না-করে উপায় কি? মা সব সময় লালুভক্ত। লালুবাবু বলতেই অজ্ঞান। নিজে বরাবরই লাল শাড়ি পরেন। লাল জামা পরেন।

কর্ম সংস্কৃতির জোয়ারে ভাসছে বঙ্গদেশ। কাজ ছেড়ে তাই মাকে দোলায় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কেউ। গর্বে ভরে যায় দেবীর বুক। ছেলেপুলেদের নিয়ে তিনি হাঁটতে হাঁটতে হাজির হলেন লালুবাবুর বাসায়। ঘরের বাইরে বিরাট তালা ঝুলছে। দেখে বিস্মিত হলেন, লালুবাবু তাঁর বউ-ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘরের টিভিতে রামায়ণ দেখছেন। দেবী খুব মুষড়ে পড়েলেন। আজ ষষ্ঠী, এ কথা কি কারো মনে নেই? সবাই এমন রামভক্ত হয়ে উঠেছে? রামও যে তাঁকে পুজো করে, এ কথা কি সবাই ভুলে গেছে? মনে মনে খুব দুঃখ পেলেন দেবী। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করলেন না।

গণেশ বরাবরই একটু পেটুক প্রকৃতির। দেবীর কাছে বায়না ধরে, মা অনেক ঘুরিয়েছ, এবার কিছু খাওয়াও। আর হাঁটতে পারছি না।

ছেলের কথায় দেবীর ঘোর কাটে। তাই তো। আঁচলের খোঁট থেকে পয়সা বার করতে গিয়ে দেবী অবাক। চোখ কপালে ওঠে। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ছিল, গেল কোথায়?

মায়ের অবস্থা বুঝতে পেরে গণেশ বলল, তুমি এত ভাবছ কেন মা? তোমার লক্ষ্মী তো বিশ্বব্যাঙ্ক। যত খুশি টাকা ধার নাও।

বেহালার ট্রাম লাইনের কাছে ছোট্ট চায়ের দোকানে দেবীকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢুকতে দেখে দোকানি বলল, আসুন মা জননী। বসুন। বলুন কী খাবেন? ছেঁড়া গামছা দিয়ে ঘুঘনি-পড়া টেবিল পরিষ্কার করতে করতে দোকানি বলল, ঘুঘনি দেব মা জননী?

দেবী বললেন, না একটু চা দাও।

চা-এর কথা শুনে দোকানি যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপর সবিস্ময়ে শুধোল, আপনি খবরের কাগজ পড়েন না? দার্জিলিং ডুয়ার্সে তো এখন মারামারি কাটাকাটি চলছে। এ ওকে গুলি করে মারছে, সে তাকে কুপিয়ে মারছে। গোর্খাল্যাণ্ড চাই, কামতাপুরি চাই, বোরোল্যাণ্ড চাই। আর লালুবাবু, গ্রীণবাবুরা বসে বসে মজা দেখছে। দাঁড়িপাল্লা নিয়ে হিসাব করছে। চা-পাতি আসবে কোথা থেকে?

দেবী বললেন, তাহলে গোটা দশেক তেলেভেজা দাও।

দোকানি তার কালচে দাঁত বার করে হি হি করে হাসে, কী বলেন মা জননী! আপনাদের তেলেভাজা খাইয়ে কি আমি জেলে যাব? শোনেননি তেলে এখন ভেজাল চলছে? লোকে খেয়ে এখন পঙ্গু হচ্ছে। হাসপাতালে রোগী ভরে গেছে।

কার্তিক বলল, সেটা তো একটা কাজের কাজ হয়েছে। লোকেরা কিছু কাজ পাবে। ভিক্ষে করে খেতে পাবে।

অবশেষে উপায়ন্তর না দেখে ঘুঘনি খেয়ে দেবী তাঁর ছেলেপুলেদের নিয়ে বার হলেন দোকান থেকে। দেহে কিছুটা বল পেলেন। নতুন উদ্যমে হাঁটতে শুরু করলেন আবার। বেহালার ট্রামডিপো ছেড়ে কিছুটা এগোতেই শুনতে পেলেন মাইকের আওয়াজ। দেবী বললেন, ওরে কার্তিক। শুনতে পাচ্ছিস আওয়াজ? ওখানকার জনগণ নিশ্চয়ই আমাদের আরাধনা করছে।

পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দেবী একসময় হাজির হলেন মনসাতলার প্যাণ্ডেলে। ঠাকুরমাশাই তখন মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। প্রতিমার দিকে চোখ পড়তেই দেবীর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। টাইট চাইনিজ প্যান্টসার্ট

ডি. টি. পি, অফসেট ছাপা, যে কোনো ধরনের বই ও পত্রিকা দায়িত্ব সহকারে সম্পূর্ণ
ভাবে তৈরি করার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দেবী সারদা প্রেস

৩০/এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দুরভাষ: ২৪১-৭৬৫৩

পত্রপাঠ দীর্ঘজীবী হোক

ডালিয়া মৌসুমা

অনন্তনগর, হুগলী

সর্বপ্রকার সিল্ক স্ক্রিন কাজের জন্য

এ. ঘোষ

১০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট কলকাতা-৯

তাঁর প্রতিমূর্তিতে। হাতে দিয়েছে স্টেনগান, বোমা। লক্ষ্মী, সরস্বতীর বুক বেঁধেছে একটুকরো কাপড়ে। পরনের কাপড়টাও ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। কার্তিককে দিয়েছে শর্টস। আর গণেশটাকে ... দেবী লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেন।

মায়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কার্তিক বলে, কলকারখানা সব বন্ধ। লক আউট। দিতে হবে দিতে হবে—দিচ্ছি না দেব না চলছে। কাপড় কোথায় পাবে?

দেবী বললেন, তা বলে আমাকে চাইনিজ সার্টপ্যান্ট।

কার্তিক হাসে, মা ওটা তোমার দেশের পোশাক।

দেবী অবাক হন, তার মানে?

—মানে আবার কি। কার্তিক বলে, তুমি বাংলার মেয়ে হলে কি হবে, বিয়ে হয়েছে তোমার তিব্বতে। আর তিব্বতী হল চীনে। চীনেরা হল চাইনিজ। চীনেরা যা পরে তাই তোমাকে পরিয়েছে। এতে ওদের দোষটা কোথায়?

গণেশ কখন হাতছাড়া হয়েছে দেবী টেরই পাননি। খোঁজ খোঁজ। কোথায় গেল? অবশেষে গণেশকে খুঁজে পাওয়া গেল এক মাড়োয়ারির দোকানে। দিব্যি বসে বসে রসগোল্লা গিলছে। আর উপদেশ দিচ্ছে, কিচ্ছু ভয় নেই তোমাদের। চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাও। মাঝে মাঝে মাল চেপে দাম বাড়াও। আর দু'চার পয়সা মস্তানদের চাঁদা দিয়ে ঠিক রেখো। দেখবে সব ঠিক চলে যাচ্ছে। দাম বাড়ালেও কেউ কিছু বলবে না। পূজাপার্বণ, ভোট, জলসাতে টাকা-পয়সা বাবুদের চাহিদামতো কিছু দিও। ভোট হয়ে গেলে দাম বাড়িয়ে তা তুলে নিও।

সরস্বতী কোথা থেকে এটা পূজা বার্ষিকী কিনে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিল। দেবী বললেন, দেখি এবারের পূজা বার্ষিকী কেমন হয়েছে? পত্রিকার কভারপেজ দেখে দেবীর মাথায় হাত। ওমা, এটা আবার কেমন পত্রিকা? ছবি দেখলে মাথা ঘুরে যায়। নারীকে নগ্ন করে তার ছবি তুলে ব্যবসা। এগুলো কারো চোখে পড়ে না? সবাই নীরব দর্শক, নাকি এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিটাই এরকম?

লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মেয়ের মতো এতক্ষণ দেবীর আঁচল ধরে যাচ্ছিল। কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। হঠাৎ পাড়ার এক বৌ ম্যাক্সি পরে পুজো দেখতে এসেছে দেখে বায়না ধরল, মা এরকম একটা ম্যাক্সি আমাকে কিনে দিতে হবে।

দেবী বকাবকি করে বলেন, ওটা পরলে তোকে আর কেউ লক্ষ্মী বলবে না, মন্দাকিনী বলবে। সহ্য করতে পারবি তো?

লালুবাবুর লোকেরা হঠাৎ খবর পেল দেবী তাঁর পুত্রকন্যাসহ গ্রীণবাবুদের পুজো দেখতে এসেছেন। আর যায় কোথায়। সদলবলে সবাই হাজির গ্রীণবাবুদের পাড়াতে। তারপর দেবী আর তাঁর ছেলেপুলেকে ঘেরাও করে যাচ্ছেতাই অপমান। 'এটা দাও নাই, ওটা দাও নাই' বলে এক কোটি দাবী পেশ। দাবী না মিটলে 'ছাড়ছি না ছাড়ব না' বলে হুঙ্কার।

দেবী বললেন, পুলিশ ডাকো। এ ঘেরাও থেকে আমাদের বাঁচাক। একটু দম নিতে দিক।

কার্তিক বলল, পুলিশ তো আসবে না মা। রাস্তা রোখো, রেল রোখো ঘেরাও করো—এসব তো এখন আইনসিদ্ধ। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার বলে স্বীকৃত। পুলিশ আসবে কেন?

স্যাটেলাইটে খবর পৌঁছেছে মহাদেবের কাছে। নারদকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে মর্ত্যে ছুটে এলেন মহাদেব। দেবী তখন অজ্ঞান। লালুবাবুর লোকেরা ঘিরে ধরল মহাদেবকে,—তুমিই যত নষ্টের গোড়া। দেশটাকে বন্যায় ভাসাচ্ছ, তেলে ভেজাল দিচ্ছ। দার্জিলিং, কামতাপুরি, বোরোল্যাণ্ড নিয়ে দাবা খেলছ। সবাইকে সব কিছু দিচ্ছ আর আমাদের সঙ্গে বিমাতৃ সুলভ ব্যবহার করছ। আমাদের কিছু দিচ্ছ না। এবার তোমাকে বাগে পেয়েছি। তোমাকে ছাড়ছি না, ছাড়ব না।

নারদ বলল, প্রভু আমাদের দেবাদিদেব মহাদেব। দয়ার অবতার। যার যা মন চায়, তাই চেয়ে নিন।

—মহাদেব যুগ যুগ জিও। মহাদেব দু'হাত তুলে তাদের চুপ হতে বললেন। তারপর বললেন, বলুন আপনাদের কার কি চাই।

কিছু লোক বলল, বাবা আমাকে ক্ষমতাবান করে দাও। মন্ত্রী করে দাও।

মহাদেব বললেন, তথাস্তু।

—ফিল্মে অভিনয় করতে চাই।—রাজ্যগুলো ভাগ করে নিতে চাই।—চাকরি চাই। পয়সা চাই। কাজের লোক চাই।—কিছু বলতে চাই। বলার আর শেষ নাই।

মহাদেব বললেন, তথাস্তু। তোমরা এ মাসের মধ্যে সব কিছু পেয়ে যাবে। জনগণ সন্তুষ্ট। অবরোধ উঠে গেল। দেবী ও সন্তানরা মুক্ত হলেন। এক মুহূর্ত দেরি না করে মহাদেব সবাইকে নিয়ে নিজের বাড়িতে ছুটলেন।

দেবী বললেন, তুমি এত দাবী মেটাতে পারবে তো?

মহাদেব হাসলেন। বললেন, সিংহের গুহা থেকে ফিরে এসেছি। আর যাচ্ছে কে বঙ্গদেশে বন্ড দেখতে। দেশ ডুবুক আর ভাসুক, আমিও চোখ তুলে দেখছি না, দেখব না।

ট্যারা চোখে

ক্রেডিট কোর্ট

এক শিক্ষক মশায়ের কাছে হাজির ক্রেডিট কার্ডের এজেন্ট। কথাবার্তা হল নিম্নরূপ :

এজেন্ট : কার্ডটা করিয়ে নিন স্যার। কত সুবিধে আপনার।

শিক্ষক : কী রকম?

এজেন্ট : এই ধরুন, পকেটে টাকা নিয়ে বেরোবার হ্যাপা নেই। পকেটমার হবে না। টাকা হারিয়ে যাবে না। তারপর বিল শোধ করুন ধারে। যতখুশি। এক মাস পরে টাকা দিন। নো ইন্টারেস্ট।

শিক্ষক : সব বিল ক্রেডিট কার্ডে শোধ করা যাবে?

এজেন্ট : নিশ্চয়। জামাকাপড়, মুদিখানা, হোটেলের বিল—

শিক্ষক : উকিলের ফি, কোর্টের ফি—

এজেন্ট : আঃ হা। এসবের কী দরকার?

শিক্ষক : সেটাই তো আগে দরকার। মানে, মাসের শেষে যখন পুলিশ আমাকে দেনার দায়ে ধরে নিয়ে যাবে—

এজেন্ট : কেন, কেন? সে তো আপনি টাকা শোধ না করলে তবেই।

শিক্ষক : টাকা তো শোধ করতে পারবই না। ধারে পেলে প্রাণভরে সব কিনে যাবই, খেয়ে যাবই। ধার পেলে আর হিসেবের কে ধার ধারে। না বাপু তুমি কোম্পানিকে বলো, আগে ওই উকিল আর কোর্ট......

এজেন্টবাবু মানে মানে কাটিয়া পড়িলেন। আমরাও তাই বলি। বলি শ্মশানের কাঠ আর কবরের খরচটিও ক্রেডিট কার্ডে ধরিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক। ইহজীবনে তো আর হইল না; ওপারে গিয়া ভগবানের সহিত ভাগের কারবারে ঢের পয়সা রোজগার করা যাইবে। তখন পাই পয়সাটি পর্যন্ত সুদ সমেত পরিশোধ করিতে আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রহিলাম।

মৈনাক মিত্র

জহুরী জহর চেনে
রুগী চেনে ডাক্তার
রুচিবান জানে খেতে
ভালো **সন্দেশ** কোথাকার

ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্নশিল্পের অনন্য প্রতিষ্ঠান

বলরাম মল্লিক ও রাধারমণ মল্লিক

২, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-২০
ফোন : ৪৭৫-৯৪৯০

PRIYO JEWELLERS

Authorised Gold Ornaments Dealers

414/4, P. A. Shah Road
Kolkata-700045

94, Rash Behari Avenue
Kolkata-700026

Phone : 417-6916, 466-7143 (Br.)

ত্বকে আনে কোমলতা, গোলাপের সতেজতা...

শুষ্ক-রুক্ষ ত্বকের নিত্য পরিচর্যায়- ব্রণ, ফুস্কুড়ি, বসন্তের দাগ এবং শীতকালে ঠোঁট ফাটা, ছোটখাটো কাটাছেঁড়া ও পোড়ায় সম্পূর্ণ ভেষজ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত স্কিনোবিট্ একটি নির্ভরযোগ্য স্কিন্ কেয়ার ক্রীম। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বিহীন স্কিনোবিট্ স্কিন্ কেয়ার ক্রীম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। প্রসাধন সামগ্রী নয়।

সফ্‌ট
স্কিনোবিট®
স্কিন কেয়ার ক্রীম

সজীব ত্বকের গোড়ার কথা

জায়গা বাঁচাই ঘরকে সাজাই

M L. Dutta Hall, Dhakuria
Phone : 473 5025, 412 0022

Furniture Parlour
Prince Anwar Shah Rd Ph. 422 9471

C/o Sur Investment Corpn.
Moulali • Phone 244 0105

The BEAUTILITY™ Space Saving Multiuse Furniture

এই কথাটা সব চেয়ে খাঁটি জায়গা বাঁচায় Beautility

আইবুড়ো সংবাদ

রসনাট্য

কৌশিক রায়

স্পট লাইটের আলো এসে পড়েছে মঞ্চের ঠিক মধ্যিখানে। একটি বিশাল তোরণ। তোরণের দুই দিকে ঝাঁটা, জুতো, দড়ি ও কলসি টাঙানো রয়েছে। তোরণের ওপরে সাদা নোটিশ বোর্ডে গোটা গোটা করে লেখা—'নরক'। আত্মা পিছু প্রবেশ মূল্য বা টোল ট্যাক্স ৭৫ টাকা ৯৯ পয়সা। অনাদায়ে যমদূতের বুটের তিন লাথি, আর্সেনিক মেশানো দুই গ্লাস জল এবং এক বাটি করে পিঁপড়ে ওয়ালা বাতাসা ও মুড়ি প্রাপ্তি। বদলি হিসেবে ডিপ ফ্রিজে দশ দিনের জমানো কাঁচা মুরগির ঠেংরি এবং পচা ইলিশের ডিম প্রাপ্তি।

তোরণের বাঁদিকে নোটিশ লেখা আছে—নিম্নলিখিত জিনিসগুলো নরকে আনা নিষিদ্ধ, অন্যথায় গোবরগোলা জলে যুবতী যমদূতদের সঙ্গে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট নাকানি চোবানি। জিনিসগুলো হল · (১) লেখার সাজ-সরঞ্জাম, যেমন—প্যাড, বই, কলম ইত্যাদি (২) বিবাহিত গৃহশিক্ষককে লেখা ছাত্রীর প্রেমপত্র (৩) রামনাম লেখা নামাবলী (৪) মোবাইল ফোন এবং (৫) কৌটোয় ভরা শুঁটকি মাছ।

তোরণের ডানদিকে লেখা আছে · *অবিবাহিত বা আইবুড়ো আত্মাদের জন্য বিশেষ ছাড়—ফিনাইল মেশানো গরম জলের গামলা আর যমদূতের ডাণ্ডার বাড়ি থেকে অব্যাহতি।*

নরকে প্রবেশের সময় যা যা দেখাতে হবে—(১) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের মার্কশিট। এ ক্ষেত্রে ইংরেজি মাধ্যম পরীক্ষার সার্টিফিকেটের প্রধান অগ্রাধিকার (২) সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র। (৩) মেডিক্যাল ও পোস্টমর্টেম সার্টিফিকেট ও (৪) গলা এবং কোমরের সঠিক মাপ। সাংবাদিক, একাধারে মাতৃভাষা অধ্যাপক ও খচ্চর মাসিক পত্রিকা সম্পাদক, চলচ্চিত্রের খলনায়ক, টিকিট ব্ল্যাকার, ডাক্তার আর গদ্যকবিদের জন্য বিশেষ আবাসনের ব্যবস্থা।

স্পট লাইট এবার তোরণের নিচে বেতের মোড়া, সোফা আর মাদুরের উপরে। দেবাদিদেব মহাদেব আর বিষ্ণুকে দেখা গেল—ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসে সোফাতে বসলেন। দু'জনকে দেখে আর চেনার উপায় নেই। শিবের বাঁদিকের কপাল জুড়ে অনেকটা ব্যাণ্ডেজ, তাতে রক্তের দাগ শুকোয়নি এখনো। দুই গালে দুটো ব্যাণ্ডএইড লাগানো। ডান পায়ে বেশ পুরু করে জড়ানো ব্যাণ্ডেজ। মাঝেমধ্যে ভয়ে ভয়ে পিছনদিকে তাকাচ্ছেন। বিষ্ণুর মাথার মুকুটটা অনেকটা তুবড়ে গেছে। ডান হাতে প্লাস্টার। পরনের ধুতিটি ছিঁড়ে প্রায় ফর্দাফাঁই। কোনো রকমে সেটা কোমরে জড়িয়ে আছে। ল্যাঙট দেখা যাচ্ছে। নাকে ব্যাণ্ডেজ। চোখে কালসিটে।

শিব : (মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে) উঃ, বাবাগো। বিয়ে করতে যায় কোন শালায়? তখন কি আর জানতাম পার্বতীকে বিয়ে করলে এরকম দিনরাত খোল-কত্তাল বাজবে সংসারে?

বিষ্ণু : (মাথার মুকুটটা ঠিক করতে করতে) কি হে শিবু' তোমার আবার এরকম ঝোড়ো কাকের মতো হাল হল করে থেকে? এই তো দিন দু'য়েক আগেও দেখলাম, দিব্যি ভূতগুলোকে নিয়ে গাঁজার কলকেয় দম দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। এর মধ্যে আবার কি ঘটল? নন্দীর পিঠে চড়তে গিয়ে পড়ে টড়ে যাও নি তো? তোমার যা নেশাভাং করার স্বভাব, ডান-বাঁ জ্ঞান আর থাকে না বাপু। ইদানীং তো আবার জিন-রাম জনিওয়াকার হুইস্কিও গিলছ শুনতে পাচ্ছি? নাঃ, তোমার জন্য দেখছি স্বর্গের প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে গেল।

শিব : (কোমরে হাত দিয়ে) উঃ, কি আমার সৎ, নির্মল চরিত্রের দ্যাবতা গো' লক্ষ্মীকে সাইডে ফেলে রেখে দিয়ে আজ রুক্মিনী, কাল রাধিকা, পরশু দ্রৌপদীর সঙ্গে ভিক্টোরিয়া, নিক্কো পার্কে পারিজাত উদ্যানে গিয়ে ফুচকা, ভেলপুরি খাচ্ছ।

আবার মুখে বড় বড় চোপা? আইবুড়োরা তো বটেই, বিবাহিতরাও তোমার কথা শুনলে অন্নপ্রাশনের ভাত মুখ দিয়ে বের করে ফেলে।

বিষ্ণু : (তটস্থ হয়ে) আহা-হা ডার্লিং, অত ঝগড়া-কাজিয়া করে লাভ কি? এই দেখ না, রাধার সঙ্গে, আয়ান ঘোষকে লুকিয়ে মেট্রোতে একটা নুন শো দেখেছিলাম আর কিছু! কিন্তু ওই যে নচ্ছারের ব্যাটা ঢেঁকি-চড়া নারদ! সব কথা গিয়ে লক্ষ্মীকে বলে দিয়েছে। এই দেখ না, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী আর আমাকে আস্ত রাখে নি। ঝাঁটা, খুন্তি, দরজার খিল—যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই দিয়ে আমার ওপর ব্যাটিং প্র্যাকটিস চালিয়েছে। গাল'গালি দিয়ে আমার বাবা বসুদেব আর মা দেবকীর আঠাশ পুরুষ উদ্ধার করে দিয়েছে। এত দামি ধুতিটা, সেদিন কুবের আমাকে প্রেজেন্ট করল,—দিলে একদম বারোটা বাজিয়ে। আবার বলে কি জানো? পেয়ারের রাধেকে গিয়ে বলো—বসিরহাটের একটা আঠারো হাত গামছা জোগাড় করে দেবে।

শিব : সত্যি বাপু, মাঝে মাঝে মনে হয় বিয়ে-থা করার চেয়ে আইবুড়ো হয়ে থাকাই ভালো ছিল! জানোই তো রাতে আমার একটু আফিং-এর গুলি খাওয়া অভ্যাস। তা আজ সকালে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেস্‌লো। পার্বতীর ঝাঁটার বাড়ি আর চোখা চোখা বুলি শুনে যখন ঘুম ভাঙলো তখন রেডিওতে ন'টার খবর শুরু হয়ে গেছে। দুর্গা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলল—ও-ই! কোথায় গুষ্টির পিণ্ডি যোগাড় করে বেড়াবে, তা না, সবার কাছে চেয়েচিন্তে আমি ... আর নিজে দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ভূতদের সঙ্গে নিয়ে গাঁজা-ব্রাউন সুগারের আসর বসাবে! প্রতিবাদ করতে গেলাম। মারল খুন্তিটা ছুঁড়ে। তারপর বেড়ালের মতো আবার গালে খিমচে দিল। ত্রিশূলের ডান্ডা বাগিয়ে বাঁ পায়ে এমন মারলো—উঃ, মাগো! বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরীকে ডাকতেই হল। আমাকে বেমালুম রোগী বানিয়ে দিয়ে বউ আমার স্যাণ্ডাল ফট্‌ফটিয়ে লক্ষ্মী আর সরস্বতীকে নিয়ে হিমালয়ে বাপের বাড়ি হাঁটা দিল। এখন ঠ্যালা সামলাও। নিজেই হেঁসেল ঠেলো।

বিষ্ণু : (মাথা নেড়ে) সত্যি বিয়ে করাটাই ঝক্‌মারি। সংসারের প্যাঁচ না জিলিপির প্যাঁচ! ওই যে ল্যাংবোট হয়ে গেল! বছর না ঘুরতেই আর একটা ল্যাংবোট। তখন আবার রাত জেগে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ভর্তির ফর্ম কিনতে হবে।

শিব : সেজন্যই তো নরকে আইবুড়োদের ডেকেছি—তারা কিভাবে থাকে কী ভালোবাসে, কী ইসু নিয়ে আলোচনা করলে ওদের ভালো লাগবে, বিয়ের হাড়িকাঠে গলা না দিয়ে থাকতে কেন ভালো লাগবে তাদের—এইসব আর কি!

বিষ্ণু : তা বেশ বেশ। নতুন একটা কিছু তবু হল। অসুর অত্যাচার নিবারণী র‍্যালি করে করে গলা ধরে গেল। তা এই আইবুড়ো সম্মেলনে কাদের কাদের নেমন্তন্ন করেছ?

শিব : অনেককেই তো নেমন্তন্ন করার ইচ্ছে ছিল। ব্রহ্মা বুড়োর কাছে যেই সম্মেলনের পারমিশান চাইতে গেলাম, ব্যাটা বলল, দশ-পনেরো জনের বেশি একজনকেও নিমন্ত্রণ করা যাবে না। ক্যাটারিং-এর দায়িত্বে চণ্ডী আর ইন্দ্রের বউ শচী আছে। ওরাও আমাকে শাসালো—দশ-পনেরো জনের বেশি লোককে ডাকলে আর রান্না করতে পারবে না। ইনভাইটেড গেস্টদের মধ্যে অনেকেই বেশ নামকরা আছে। যেমন—ভীষ্ম, কার্তিক, আইজ্যাক নিউটন, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী পটলবিহারী তেওয়ারী! সম্মেলন বেশ জমে যাবে মালুম হচ্ছে।

বিষ্ণু : এনাদের আনছ বুঝতেই পারছি। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি আর জয়ললিতা? অবিবাহিতাদের মধ্যে এঁরা দু'জন তো পিলার বিশেষ!

শিব : কি গোমুখ্যুর মতো কথা? ওদের তো মর্ত্যের লাইফটাইম এখনো শেষ হয় নি। তাও মমতাকে আনতে চেয়েছিলাম। সে মেয়ে আবার গোঁ ধরে রইল—"বেঙ্গল প্যাকেজ" লেবেল মারা একটা দশ কুইন্টাল ওজনের বাক্স সঙ্গে করে নরকে নিয়ে আসবে। কী এমন ঘোড়ার ডিম আছে ওই বাক্সে কে জানে? যমদূতদের ইঞ্জিন অত বেশি লোড বইতে পারবে না। আর জয়ললিতার বোম্বাই ফিগারটা তো দেখেছ। তাকে ঘাড়ে করে আনতে গিয়ে তিনজন যমদূতের কোমরই খুলে গেল। তাই তাকে ওরা স্বর্গ আর নরকের সীমানায় চেকপোস্টে ফেলে রেখে চলে এসেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আনার কথা ছিল। তাকে আবার মহিষাসুর ডেকে পাঠিয়েছে। তার চ্যালারা নাকি আরো কালো হয়ে যাচ্ছে, প্রফুল্ল তাই অসুরলোকে বেঙ্গল কেমিক্যালের একটা ফ্যাক্টরি খুলেছে। সেখানে অসুরদের কালো চামড়া ফর্সা করার জন্য ময়শ্চারাইজার তৈরিতে প্রফুল্ল ব্যস্ত।

বিষ্ণু : কিন্তু সম্মেলনটা নরকে করছ কেন ভায়া? ভালো হাওয়া-বাতাস খেলার ব্যবস্থা নেই। একটা মান্ধাতার আমলের এয়ার-কণ্ডিশনার লাগানো ছিল। সেটাও বিগড়ে গেছে। বিশ্বকর্মাটাকে কতবার করে বললাম মেশিনটা সারিয়ে দিতে। সে ব্যাটা বলে কিনা যমরাজ নাকি এখনো তার বোনাস দেয়নি। নরকের ইলেক্‌ট্রিক সিস্টেম মায়ের ভোগে চলে যাক।

শিব : ব্রহ্মাকে বলেছিলাম ব্যাপারটা। জানোই তো বুড়োর সবেতেই সন্দেহ। বলে কি—অতগুলো আইবুড়ো লোক আসবে! স্বর্গের রম্ভা, উর্বশী, মেনকা আর অন্যান্য দেবীদেরকে নিয়ে যদি বেলেল্লাপনা করে! তাই নরকই ভালো। (নেপথ্যে ঢং ঢং করে দু'টো বাজার শব্দ। গান ভেসে আসতে লাগল—'ছাদনাতলায় পাতা আছে শিল আর নোড়া/সেই নোড়াতেই ভাঙবে জেনো তোমার দাঁতের গোড়া/গাঁটছড়াতে বাঁধবে যাকে ছাদনাতলায় গিয়ে/সে তোমাকেই ঘোরাবে জেনো নাকে দড়ি দিয়ে'। নিমন্ত্রিত অবিবাহিত অতিথিদেরকে আসতে দেখা গেল একে একে। ভীষ্মের পরনে নীল রঙের দামি স্যুট, কার্তিকের চুলে ফিতে দিয়ে পনিটেইল করা, টি-শার্টের ওপর লেখা—'ব্যাচেলারের বাবা', ডাঃ বিধানচন্দ্রের পরনে ধুতি আর স্বভাবসিদ্ধ পাঞ্জাবি আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা সবুজ রং-এর টাই-ও শোভা পাচ্ছে। স্যার আইজ্যাক নিউটনের পরনে জ্যাকেট আর চেক্‌কাটা লুঙ্গি। হাতে একটা গ্লোবের সাইজের গোল কৌটো। তার থেকে মাঝে মধ্যে একটিপ করে নস্যি নাকে পুরছেন। গান শেষ হয়ে বিসমিল্লা খানের সানাই বাদন শুরু হয়েছিল; শিব ব্যাক্‌স্টেজের দিকে কড়া চোখে তাকাতেই ক্যাঁক্ করে সানাই বন্ধ হয়ে গেল।)

বিষ্ণু : যাক্‌গে, আইবুড়ো সম্মেলন তাহলে ঠিক সময়েই শুরু হচ্ছে, কি বলো ভীষ্ম?

ভীষ্ম : (টাই-এর গিঁট ঠিক করতে করতে) ব্যাচেলাররা সব সময় ঘড়ির কাঁটা ধরেই কাজ করে। একি আপনাদের মতো নাকি? অফিস কামাই করে বৌকে নিয়ে শপিং করা, ছেলে-মেয়েকে স্কুলে দিয়ে দশটার অফিসে বারোটায় যাওয়া, বুড়ো বাবা-মা মরতে বসেছে, সে সময় তাদের কাছে না গিয়ে বৌয়ের বান্ধবীর বিবাহবার্ষিকীতে গিয়ে রাতভোর পার্টি করা। বঙ্কিমবাবুর কথাই ঠিক—আপনাদের আক্কেল সব সময় গিন্নিদের আঁচলে বাঁধা। চাবির রিং-এর মতো।

শিব : এত বেশি জ্ঞান দিও না হে দেবু (দেবব্রতর ডাক নাম)। বলি, অম্বিকাকে তো সরাসরি মুখের ওপর না বলে দিলে। আরে, মেয়েটা তো তোমাকেই চেয়েছিল। রাজার বেটি, তার ওপর বাপের একগাদা সম্পত্তি। ওকে বিয়ে করলে তো তোমার কপালটাই খুলে যেত। তা না করে সেই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়েই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলে।

ভীষ্ম : আজ্ঞে আমার ক্যারেক্টার আপনাদের মতো অত ফ্যাল্‌না নয়। অম্বিকাকে তুলে এনেছিলাম আমার ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্যে। সে আবার অকালে পটল তুলল। হবে না! জন্ম থেকেই জন্ডিস আর হার্টের রোগে কাবু। তা বলে আমি তো আর অম্বিকাকে বিয়ে করতে পারি না! সম্পর্কে তো আমি ওর ভাশুর হতাম। আজকাল হলে অবশ্য কথা ছিল না। এখন ভাই-বৌরা ভাশুরদের গলা জড়িয়েও নাইট ক্লাবে ক্যাবারে নাচছে।

বিষ্ণু : আইবুড়ো হতে গিয়েই তোমার এই হাড়ির হাল হল ভায়া। অম্বিকা দিদি শিখণ্ডী হয়ে তোমার উপর জন্মের প্রতিশোধ নিল। অর্জুন ওকে তো ঢাল করে তোমাকে তীর মেরে পিনকুশন বানিয়ে দিল একেবারে। অর্জুনই আবার তীর মেরে জল না আনলে তো মরার আগে মুখে জলও পেতে না। এতবড় মহাপাপী তুমি।

ভীষ্ম : মহাপাপী যদি বলতে হয় তাহলে আমার বাবা, মহারাজা শান্তনুকে বলুন গিয়ে। গঙ্গাকে দেখেই তার হার্টবীট বেড়ে গেল। বিয়ে করার দরকারটাই বা

কি, আবার পরপর সাত সন্তানকে জলে চুবিযে দেওয়ার অর্থটা কি? সে যুগে পরিবার পরিকল্পনা ছিল না বলে পার পেয়ে গেলেন। শিশুহত্যার দায়ে আমার বাবা-মাকে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়ত না। এতেও রক্ষে নাই। আমাব গুণধর বাপ আবার জেলের মেয়ে সত্যবতীর সঙ্গে লাইন মারতে শুরু করলেন। কি ঘেন্নার কথা।

শিব : বাপের ওপর খচে যাওয়ার কি আছে হে। শান্তনু তো সাম্যবাদী। আরে, কবি তো বলেই গেছেন—"ভালোবেসে যদি মজে মন/কিবা হাড়ি কিবা ডোম"। আসল "লভ্"-এর আবার জাত বিচার আছে নাকি? এই তো দেখ না, উর্বশী স্বর্গের এক নম্বরের ক্যাবারে ডান্সার, থুড়ি, নর্তকী অপ্সরী। তার মনটি গিয়ে বাঁধা হয়ে রইল মর্ত্যের রাজা পুরুরবার কাছে। অতবড় জ্ঞানের বস্তা ঋষি পরাশর—তিনিও শেষে কিনা সাত কুলের মুখে সি. এম. ডি.-এর পিচ ঘষে দিয়ে জেলেদের মেয়ের সঙ্গে কুয়াশার আড়ালে বেশটি করে রাসলীলা করলেন।

বিষ্ণু : তা ছাড়া দেখতেই তো পাচ্ছ, এখন ঘোর কলিকাল। ফষ্টিনষ্টি করা আর বিয়ে করাব জন্য এখন কুলীন ঘরের পাত্র-পাত্রীর দরকাব পড়ে না। রোববারের কাগজে 'পাত্র-পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে দেখ না—মেয়েব বয়স ২৮, অর্থাৎ কিনা বিয়ে হওয়ার বর্ডার লাইনে প্রায় চলে এসেছে—গান বাজনা জানে, অন্যকে বাজিয়েও ছেড়ে দিতে পারে—অসবর্ণ বিয়েতে কোনো অবজেক্শান নেই। এখন বর্ণ-গোত্র-বংশ সব হচ্ছে গিয়ে একটা জিনিস—টাকা।

ভীষ্ম : কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেন নি। মর্তের ব্যাপাব-স্যাপার দেখছি তো। মানিব্যাগে মাল না থাকলে গড়ের মাঠের গোলগাপ্পা—অনাদির মোগলাই পরোটা—বসন্ত কেবিনের কোবরেজি কাটলেট আর শ্যামবাজার গোলবাড়ির কষা মাংসের দামের ধাক্কা কোন শালা সামলাবে। ইন্ভেস্টমেন্ট রাখতে হবে জব্বর রকমেব। না হলে লায়লীরা সব ভেগে যাবে। আগে বাপ-ঠাকুর্দার আমলে প্রেমিকার খোঁপাতে একটা গোলাপ ফুল গুঁজে দিযে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড সাইকেলে চাপিয়ে দু'চক্কর মারলেই প্রেমের ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করা যেত। আর এখন! প্রেমিকাদের বাযনাক্কা সামলাতে গিয়ে লাভারদের নাগা সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার দশা। বাইকে চড়াও, ব্ল্যাকে টিকিট কেটে নুন্শো দেখাও, নন্দনের কাছে রোদে পুড়ে জলে ভিজে ল্যাম্পপোস্ট হয়ে ঘণ্টা দু'য়েক তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকো, প্রেমিকার ভাইকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসো—আবো কত কি। সাধ করে আর আমি কি মেয়েদের দিকে তাকাই নি। তা নাহলে, আমার যা গ্ল্যামার, এখনো মেয়েরা হৃতিক-সলমনকে ছেড়ে আমার পিছনে লাইন দেবে।

বিষ্ণু : তাহলে তোমাকে আর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থেকে সরানো গেল না দেবু। এই বয়সেও একটা বিয়ে থা করলে অন্তত তোমার বাপের আত্মা একটু শান্তি পেত। ব্যাচেলারদের সংগঠন তৈরি হলে তোমাকেই সেক্রেটারিব পোস্টটা দেব ভাবছি। (নিউটনের দিকে ফিরে) কি হে নিউটন। এখানে বসে মাধ্যাকর্ষণের চতুর্থ নিয়ম তৈরি করার কথা ভাবছ নাকি? নস্যি নেওয়াটা এবার একটু কমাও। আমার আবার অ্যাজমার টান আছে। নস্যির গুঁড়ো একদম বরদাস্ত করতে পারি না। বিধান আমাকে ওষুধ দিযেই যাচ্ছে, আর আমি খেয়েই যাচ্ছি। হাঁপানি সারাব কোনো নামগন্ধই নেই। এর জন্য আবার উঠতে-বসতে লক্ষ্মীর কাছে খোঁটা শুনতে হয়। উঃ।

নিউটন : বেগ ইয়োর পার্ডন, স্যার। নস্যি না নিলে আবার আমার মাথা খোলে না। এডমণ্ড হ্যালি তো আমার কাছে আসত এই নস্যি নেওয়ার জন্যই। নস্যির কল্যাণেই তো ধূমকেতু খুঁজে পেল। আব, ফোর্থ ল তৈরি করার ইচ্ছে আমার নেই। স্কুলের ছেলেমেয়েদের যা অবস্থা দেখছি। আমার ভূতপূর্ব তিনটি সূত্র মুখস্থ কবতে গিয়েই তাদের চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে।

শিব : ওসব কথা থাক—আইবুড়ো অবস্থায় কেমন সময় কাটাচ্ছ বলো।

নিউটন : তোফা। অবিশ্যি বিয়ে করার একটা মওকা একবার পেয়েছিলাম, বুঝলেন কিনা, সে আমার কলেজ লাইফের কথা। একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার সঙ্গে, ওই একটু ইয়ে, মানে ক্যান্টিনে, যেটাকে 'ইলু ইলু' বলে না—ওইরকম একটা ভাব হয়েছিল আর কি।

বিষ্ণু : হ্যাঁ, সে ব্যাপার তো ভালোভাবেই জানি। তোমাকে ছুঁড়ি বিয়ের প্রস্তাব জানাতে এসেছিল। এই সময়ে একবার তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছিল—তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে? ব্যস্, আর যায় কোথায়। গোলাপ ফুল, চুমু, হাত-ধরাধরি, আংটি পরানো—তোমার মাথায় উঠল। অংকের ইন্টিগ্র্যাল আর ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের দাঁত ভাঙা সূত্রগুলো তুমি বেচারিকে এমন ভাবে বোঝাতে শুরু কবলে, সে তো খাবি খেতে খেতে বেঁচে গেল। আর কোন্ মেযে তোমার মতো অঙ্কের হকারের সঙ্গে জীবনে ঘরকন্না করবে?

নিউটন : মাই গুড্নেস! ইয়োর অনার, অঙ্কই হচ্ছে জীবনের সব। এই দেখুন না, আপনাদের হিন্দু রিলিজিয়নে গুনে গুনে সাতপাক চক্কর মাবতে হয় বিয়ের সময়। দশমাস দশদিন পর ওয়াঁ-ওয়াঁ, ফিডিং বোতল, ওবাল পোলিও ভ্যাক্সিন। বিয়ের এক বছরেব মাথায় শাশুড়িকে বৌমার হাই হিল জুতোর এক্সিবিশন, নয় তো বুড়ো-বুড়িকে চুলোয় দিয়ে কিস্তিতে মিলে যাওযা পায়রার খোপে দ্যাবাদেবীর সংসার—সব জায়গাতেই ম্যাথ্সের ফিগার।

শিব : আইবুড়ো হয়ে থাকাটা বেশ সুখের, কি বলো।

নিউটন : আসলে ঠিক জানেন স্যার। বিয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষজ বলের মতো। আপনি চাইছেন সংসার নামক এঁদো ডোবা থেকে মুক্ত হয়ে ইচ্ছা ও আশার রকেটে উড়ে যেতে। হলে কি হবে, আপনার স্ত্রী সন্তানেরা হচ্ছে গিয়ে অভিকর্ষজ বল। একেবারে গ্র্যাভিটেশন্যাল পুলেব মতো আপনাকে টেনে নামিয়ে আনবে সেই খানা ডোবার মধ্যেই। অন্য কোনো মেযের মুখের দিকে তাকাতে পারবেন না, আড়চোখেও না। তাকালে একমাত্র আপনার ওনারই শিম্পাঞ্জি মার্কা শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। মাইনের টাকা চোখে দেখতে পাবেন না। আমি তো শুনেছি আপনাদের স্টেটে দুর্গাপুজোর সমযে বোনাস দেওয়া হয়। সেই সময়ে সময় মতো বেড-টি, দুপুরের ভাত আর দু-দশটা দুষ্টু মিষ্টি কথা শুনতে পাবেন। এসব কায়দা হল আপনার বোনাসকে শপিং-এর ছু-মন্তরে ভ্যানিশ করে দেওয়ার কায়দা। পুজোর বাজারে ওনার জন্য তিন হাজাব টাকার জর্জেট শাড়ি, শালার জন্য জিন্স্, শালীর জন্য "আমার ভালোবাসা" পাড়ের বম্কাই শাড়ি আর আপনার জন্য কুড়ি টাকা দামেব দুটো জাঙিয়া আর নিদেনপক্ষে একটা গেঞ্জি।

ভীষ্ম : ওটাই তো ব্যাপার, আইজ্যাক। তাহলে বুঝতেই পাবছ—মহিলারা তাদের স্বামীকে অন্তর দিযে ভালোবাসেন। মানে, তাদের অন্তরে বাস করেন। তাই, কর্তাদের কপালে জোটে অন্তর্বাস।

নিউটন : তবে বলতে পারো আইবুড়ো থাকার অপরাধেই হযত আমাব পোষা কুকুরটা জ্বলন্ত মোমবাতি ফেলে দিয়ে আমার অনেক ইম্পর্ট্যান্ট গবেষণার কাগজপত্র শেষ করে দিল। অবশ্য বিয়ে করলে তখন রিসার্চ করা এমনিই মাথায উঠত। বাজারের থলি নিয়ে চিঞ্জ, সবজি, কেরোসিন কিনতে যেতে হত। কোনো কাজে ভুল হলেই চিত্তির। মুখের কথাতেই আগুন জ্বেলে দেবে।

বিষ্ণু : জ্বালিয়ে দেবে মানে! একেবারে চোদ্দ গুষ্টিকে জ্বালিয়ে পুড়িযে খাক্ করে দেবে। কেষ্ট অবতারে যখন অর্জুনের সঙ্গে দোস্তি হযেছিল তখন খাণ্ডব বনকেও অতটা জ্বালাতে পারি নি আমি। বিয়ে হলেই দেখবে বৌযের বাপের বাড়ির সব ধম্মপুত্তুব, হিরে দিয়ে বাঁধানো মহাপুরুষেব দল। তাদের সবার মুখে গঙ্গাজল। শুধু তোমার বাপ-মা-ভাই-বোনদেব মুখে আগুন। চোপার চোটে সবাই চোখে ধুতরোফুল দেখতে শুরু করবে।

বিধানচন্দ্র : ব্রাভো, ব্রাভো, বিয়ের এত সুন্দর ডায়াগোনোসিস আমি বাপের জন্মেও শুনিনি। আপনাকে আমার ক্লিনিক্যাল অভিনন্দন।

শিব : এই যে বিধান, তুমি তো সবার মুখ দেখেই বিধান দিতে কী রোগ হয়েছে, সারবে কী খেলে। আইবুড়োদের স্বপক্ষে তোমার বিধান কি?

বিধানচন্দ্র : আজ্ঞে বিয়ে-থা করিনি বলেই তো অমন সাধেব বিধাননগরটা বানাতে পারলুম। বৌ ঘরে আনলে আমার ডাক্তারিও যেত আব আমার জীবনও একেবারে লবণ হ্রদ হয়ে দাঁড়াত।

ভীষ্ম : কেন, কেন?

বিধানচন্দ্র : হবে না কেন? তখন বৌয়েরই হাজার কিসিমের রোগ, শাড়ি রোগ, গয়না রোগ, সন্দেহ বাতিক রোগ—এসব সারাতে গিয়ে কলকাতার ভূগোল পাল্টানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। লবণহ্রদ আর কি দেখছেন, নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে আমি নিজেই নোনা জলের পুকুরে ডুবে থাকতাম।

নিউটন : হাওয়েভার, এটা স্বীকার করতে হয়, আপনার স্বপ্নের বিধাননগর, আই মীন, সল্টলেক এখন পৃথিবীর আধুনিকতম টাউনশিপের মধ্যে একটা। কলকাতা আপনার কাছে অনেকভাবেই ঋণী।

বিধানচন্দ্র : স্বপ্ন না দাদা, দুঃস্বপ্ন বলুন। সল্টলেক আজ এমন আধুনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক ফ্ল্যাটের লোক জানতেই পারে না পাশের ফ্ল্যাটে বৌকে খুন করে বেড কভার দিয়ে রোল বানিয়ে রাখা হয়েছে। বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়িকে বৃদ্ধাশ্রমে জমা করে দিয়ে এখানে দামি কুকুর পোষা হয়। সেন্ট্রাল পার্ক, সুইমিং পুল, নিক্কো পার্কে সূর্য ডোবার পর যান না। দেখবেন সেখানে সব পোস্ট মডার্ন আইবুড়োরা জোট বেঁধে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছেন। পকেটে রেস্ত থাকুক বা না থাকুক, প্রেম করতেই হবে—মোনালিসাকে কোব্‌রেজি আর ভ্যানিলা আইসক্রিম না খাওয়াতে পারলে ভালোবাসার খোঁয়াড় থেকে আউট।

বিষ্ণু : আইবুড়োদের প্রেম করা স্বাস্থ্যকর নয়, বলো? তা আমি তো দ্বারকা-বৃন্দাবনে ভালোবাসার কত্তো ইনিংস খেলে এলাম। তোমার রাধাবৌদি আছে তো কি হয়েছে!

বিধানচন্দ্র : প্রেম করা তো দোষের নয় ব্যাচেলারদের কাছে। কিন্তু সামনা-সামনি ভালোবাসা যায না। তা না করে ওভার ব্রীজের তলায়, ডাস্টবিনের পাশে, শ্যাওলা ধরা ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে, পায়খানার পিছন দিকে কচুবাগানে, রেল লাইনের বস্তির ধারে, এঁদো ডোবার পাশে দাঁড়িয়েই গুজগুজ ফুসফুস করতে হবে? দেখে মনে হয় যেন দু'জনে কারোর বাড়ি সিঁদ কাটতে যাচ্ছে। এসব জায়গাতে কত ব্যাক্‌টিরিয়া আর ভাইরাস কিলবিল করে জানেন? এই জন্যই তো আইবুড়োরা আজকাল খোস-পাঁচড়া-আমাশা-জন্ডিসে নাকাল হচ্ছে।

ভীষ্ম : ওঃ, একেবারে চিকিৎসক নাম্বার ওয়ান দেখছি! নিজের ঢাক নিজেই পেটানো হচ্ছে। তা বাপু, আজকালকার ডাক্তারগুলো ওরকম ছ্যাঁচড়া হয়েছে কেন? রোগীর রোগ ভালো করা দূরের কথা, উল্টে ধান্দাবাজ উকিলের মতো তাদের কেসগুলো ঝুলিয়ে রাখে। হাসপাতাল ছেড়ে আজকাল প্রাইভেট চেম্বার খুলেছে। রোগীর কানে আর নাকে কি একটু টর্চলাইট মেরে দেখল, সঙ্গে সঙ্গে ৪০০ টাকা ভিজিটিং ফি। বলি, মানুষদের তো একটু মায়াদয়াও থাকে? গরীবগুর্বোগুলো তো রোগে ভুগে মারা যাবে।

বিধানচন্দ্র : আরে এটাও মগজে ঢুকল না আপনার? এসব ডাক্তার কি আর আমার মতো মায়ার বাঁধনহীন, ছন্নছাড়া ব্যাচেলার? সরকারি হাসপাতালের তো ওই গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার অবস্থা। প্রাইভেট চেম্বারে চড়া ফি না নিলে কী করে স্ট্যাটাস বজায় রাখবে তারা? প্রতি মাসে গাড়ির মডেল পাল্টাতে হবে, সল্টলেক, নিউ আলিপুর, গড়িয়াহাটে নতুন ডিজাইনের বাড়ি হাঁকাতে হবে, ফটকের সামনে উর্দিপরা দারোয়ান রাখতে হবে, উর্বশী মার্কা লেডি সেক্রেটারি রাখতে হবে, আর অবশ্যই, সম্ভব হলে প্রতি মাসে নতুন নতুন মডেলের উপবউ আনতে হবে। ঘরে উনি থাকবেন, আর হাসপাতাল-চেম্বারে এনারা থাকবেন।

নিউটন : এনারা মানে? হু আর দে? শালীরা?

বিধানচন্দ্র : আজ্ঞে না, একেবারে আধুনিক ডিজাইনের শালী। মানে ওই নার্স-হাউসস্টাফ-লেডি অ্যাটেন্ডান্ট-মেট্রনদের কথা বলছিলাম আর কি। প্রেমরসের প্রেসক্রিপশান বানাতে ডাক্তারবাবুদের এনাদেরকে প্রয়োজন হয়।

নিউটন : আই সী! তার মানে অবৈধ সম্পর্ক। এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেযার।

বিধানচন্দ্র : ধ্যাৎ মশাই, অবৈধ আবার কি? বিবাহিত জীবন মানেই এক্সট্রা পাওয়ার। লাইফ মে কুছ এক্সট্রা চাহিয়ে। তা না হলে গিন্নিকে ওভারটেক করে সুন্দরী শ্যালিকাকে কি "কারগিল" পাড়ের শাড়ি দেওয়া যায়, ইভিনিং শো দেখানো যায়? বিয়ের তো ওটাই আস্‌লি মজা। বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মতো বহুমুখী প্রেম।

বিষ্ণু : (মুখ থেকে চিবোনো চিউইংগাম ফেলে দিয়ে) যাক্‌গে, বিবাহিতদেরকে তোমরা বড্ড বেশি কচ্চে দিয়ে দিচ্ছ। ভুলে যেও না, তোমরা এখানে বিবাহিতদের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে এসেছ। (পটলবিহারীর দিকে ঘুরে) এই যে মিস্টার পটলবিহারী, অকালে পটল তুলে তো ভারতকে প্রধানমন্ত্রীবিহীন করে দিয়ে চলে এলেন। বিয়ে-থা তো করেননি। সেজন্য ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদারও নেই কেউ মনে হয়। কারোর সঙ্গে আড়ালে আবডালে দেখা-টেখা করতেন নাকি? অবশ্য চিত্রগুপ্তের কম্পিউটারে আপনার সব হাঁড়ির খবরই রেকর্ড করা আছে।

পটলবিহারী : আরে ছিয়া ছিয়া। সিয়ারাম সিয়ারাম। উসব প্যায়ার মোহব্বতেব বাত হামার দিল-এ একদম না আছে। আমি একেবারেই ব্যাচেলর। এই দেশ, এই ভারতই হামার সোব কুছ। বিবেকানন্দ পড়েন নাই—"ভারতের মাটি তোমার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।"

শিব : বাব্বা, এ যে দেখছি ভূতের মুখে রামনাম। তা পটলবাবু, প্রধানমন্ত্রী হয়ে তো ভারতের দফারফা করে দিলেন। দেশের অর্থনীতির যা হাল তাতে বছর কয়েক পরে কোল্ড ড্রিংক্‌স্‌ খেতে খেতে ছেঁড়া হাফ প্যান্ট পরে বিদেশের কাছে ভিক্ষে চাইতে হবে।

পটলবিহারী : (কথা বলার সময় বাঁধানো দাঁত ছিট্‌কে এল) আরে মহাদেওজি, ক্যা মালুম। ওই নচ্ছারের জোড়াতাপ্পি দেওয়া জোট সরকারই হামার একদম আন্ডারপ্যান্ট খুলে নিল। এ বলে ওটা করো, সে বলে ওই কাজটা করো। আপ হি শোচ্‌ লিজিয়ে, হামি ত আকেলা বুড্‌ঢা মানুষ আছি। সবদিক সামাল দেওয়া যায়? জোট সরকার হল গিয়ে ঝগড়াটি বউ-এর মতো। কুছুতেই বশে রাখা যায় না। চান্স পেলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে পিছে ফেউ-এর মতো লেগে যাবে। আমার ওপর সব এমনভাবে জুলুমবাজি করছিল মাঝে মাঝে মনে হত পোখরানে গিয়ে পিঠে অ্যাটম বোমা বেন্ধে লিয়ে মাটির তলায় ঢুকে লিজেই ফেটে যাই। বিয়ে না করেও কি রেহাই আছে? হামাদের স্পোর্টস মিনিস্টার ছিল উমা আলুওয়ালিয়া। বয়স বেশি হলে কি হোবে, দেখনে মে বাহোৎ আচ্ছি। তা হামি বিবাগী মানুষ। কংগ্রেস আর বামফ্রন্ট যেই দেখল উমার সাথে আমি বারদুয়েক হেসে বাত বলিয়েছি, তো ব্যস্‌ সোব খবরের কাগজে, টি. ভি. তে হামার নামে স্ক্যাণ্ডাল রটানো শুরু হোয়ে গেলো।

বিষ্ণু : ঠিক আছে ঠিক আছে? বিয়েতে এত আপত্তি ছিল কেন আপনার?

পটলবিহারী : (বাঁধানো দাঁত মুখে সেট করতে করতে) আরে বিষ্ণুজি, সরকারি বক্তৃতা দিতে দিতে নিজের দাঁত খুলে পড়ে গেলো। তার ওপর গোরমেন্টের কামের যা চাপ, সেই চাপে হামার দুই হাঁটু ভি খুলে পড়ে গেলো। মুম্বাইতে গিয়ে আবার লোতুন করে বাঁধিযে লিতে হলো। ভেবেছিলাম, শেষ বয়সে একঠো আচ্ছা লেড়কি দেখে ঘর-সন্‌সার পাতি। কিন্তু আফশোষ, প্রাইম মিনিস্টার হলে কি হোবে, ল্যাংড়া লেড়কাকে বউ দিবে কোন্‌ শালার বাপে? তা সে চুলে যতই কলপ লাগাও না কেনো তুমি।

বিধানচন্দ্র : আপনার হাঁটুর যে বারোটা বাজবে আগেই আমি জানতাম। আমার মতো ডাক্তারের হাত পড়লে টাট্টু ঘোড়ার মতো টগ্‌বগিয়ে চরে বেড়াতেন। মেয়ের বাপেরা নেচে নেচে এসে নিয়ে যেত আপনাকে। জহরলাল, লালবাহাদুর, ইন্দিরা, জ্যোতি—সকলের হাড়ের জয়েন্ট আমি ঠিক করে দিযেছি। আমার তো ভাবতেই অবাক লাগে, ভারতবর্ষ আপনার মতো এরকম ঠ্যাং খোঁড়া বুড়ো-হাবড়া লোককে প্রধানমন্ত্রী করে এতদিন রেখেছিল কেন?

পটলবিহারী : আরে সোবই শ্রীরামচন্দর আর সীতামাইকি ইচ্ছা। নরকে আসার পর হনুমানজির সাথ মোলাকাৎ হল। তিনি হামাকে বললেন—বেটা পটল, আমার সাথে পহেলে দেখা হলে হামি তোমাকে বিরোধী নেতাদেরকে ল্যাং মারা শিখিযে দিতাম। এমন লাফ শিখাতাম যে তুমি একেবারে কর্পোরেশনের খোঁড়া রাস্তা, পুকুর পার হয়ে দশ সাল পড়ে থাকা ফ্লাইওভারের ওপর দিযে অনায়াসে উড়ে যেতে পারতে।

নিউটন : দ্যাট উড বি আ গুড থিং। আপনার জন্য তাহলে গাড়ি, সিকিউরিটি আর হেলিকপ্টার লাগত না। ব্যাঙের মতো লাফিয়েই বন্যার জলে আটকানো মানুষদের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারতেন। গ্র্যাভিটি তখন তুচ্ছ হয়ে যেত আপনার কাছে।

পটলবিহারী : আরে হামার নিজের গ্র্যাভিটির কাছে আর কুনো গ্র্যাভিটি লাগে না। তবে কি জানেন, হিন্দু শাস্ত্র পড়ার পরই বিয়ে করার ইচ্ছাটা চলে গেল একদম।

ভীষ্ম : কী এমন লেখা ছিল সেখানে, যা দেখে তোমাকে এমন গেরুয়া পরে হাতে গাড়ু নিয়ে বাল-ব্রহ্মচারী সাজতে হল?

পটলবিহারী : আস্‌লি সংস্কৃত শ্লোকটা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে শ্লোকটার মানে করলে দাঁড়ায়—জগতের সব নারীই তোমার জননী। তাঁরা তোমার প্রণামের যোগ্য, ভোগের বস্তু নয়।

বিধানচন্দ্র : (প্যাকেট থেকে তিনটে কচুভাজা নিয়ে চিবোতে চিবোতে) বলেন কি? জগতের সমস্ত মহিলাই আপনার মায়ের মতো? তাহলে আপনার বাবার চরিত্র তো তিনদিনে কলঙ্কের ঝুলকালি মেখে কালো হয়ে যাবে!

পটলবিহারী : আরে উসব তো লিখা আছে কিতাবে। মায়ের মতো। সব লেড়কি তো আর মা নয়। এই দেখেন না গ্রীক নাটকে রাজা ছিল অয়দিপাউস। সে তার মা-কে ওয়াইফ বলে মেনে নিয়ে কী সব্বোনাশটাই না করল। আর এই মহারাজ ভীষ্ম। আপনি তো কিংমেকার ছিলেন। হামার ক্যাবিনেটে আপনাকে ব্যাডবাণীজির জায়গাতে পোস্ট দিয়ে দিতুম। একঠো সাচ্‌বাত বোলেন তো জি! ও মেছুয়াবাজারের রাজার বেটি সত্যবতী তো আপনার সৎমা ছিলেন। কিন্তু আপনাদের উমরের মধ্যে তো সেরকম ফারাক ছিল না। আপনি নাকি, শুনেছি, সত্যবতীর ঘরে প্রায়ই ঘুমিয়ে যেতেন? আর সত্যবতীরও নাকি দেবু বেটাকে না দেখলে নিদ্‌ আসত না?

ভীষ্ম : তবে রে ব্যাটা পটল। আমার নির্মল চরিত্র নিয়ে উল্টোপাল্টা বলা! দাঁড়া, আজ তোর ধুতি ছিঁড়ে লুঙ্গি, আর জহরকোট ফর্দাফাই করে ফতুয়া বানিয়ে দেব। ব্যাসদেব আর নারদ বোধহয় এসব তোর কানে লাগিয়েছে। আজ তোকে গরুর মাংস আর স্কচ হুইস্কি খাইয়ে বামুন হওয়া ঘুচিয়ে দেব।

(ভীষ্ম চেয়ার ছেড়ে পটলবিহারীকে মারতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল। পরনের প্যান্টের পেছন দিকের সেলাই ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল।)

পটলবিহারী : আরে অত গোঁসা হওয়ার কি আছে ভীষ্মজি? আমরা হলাম গিয়ে অহিংসা আর সদ্ভাবনার পূজারী। তবে হাঁ, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুশারফের কাছে শুনেছি, বেগম মুশারফের হাতের রান্না ডালগোস্ত আর বীফ - কিমার যা টেস্ট! আহা-হা। স্বর্গের অমৃতও পাত্তা পাবে না। হামি অবশ্য কখনো খাইনি। তাহলে তো বহুত পহেলেই নরকে চলে আসতে হত। তবে হাঁ! লাখো কি এক বাৎ! মালুম হয়েছে, বিয়ে করার মেইন বোনাস হল লা-জবাব রান্নাবান্না খেতে পাওয়া। আইবুড়ো থাকলে তো সেই বোর্ডিং বা ভাড়া বাড়িতে স্টোভ জ্বালিয়ে আলুভাতে, ডালসেদ্ধ আর ফ্যানভাত খেতে হোবে।

বিষ্ণু : আরে রাখো রাখো! আজকালকার বউরা হেঁসেলে ঢুকে সোনার অঙ্গ কালি করে কখনো। বউ সকালে অফিসে বেরিয়ে যায়, রাতে ফিরে ফ্রিজ থেকে খাবার গরম করে খাওয়ায়। শাশুড়ি তেলচিটে কাপড় পরে নাকডাকানো, চর্বিজমা পুত্রবধূকে বেড-টি দিয়ে আসেন। এরপর দেখবে সব রেডিমেড খাবার চলে আসবে—প্যাকেটে ভাত, ডাল, মাছের ঝোল। "রান্নাঘর" বলে যে কোনো শব্দ আছে তা আর জানবেই না মেয়েরা। ফাঁকে পড়বে বরগুলো। প্যাকেটের খাবার খেয়ে আলসার, কোলেস্টেরল, পাইল্‌স্‌—এসব আর কি। এই আমার অবস্থা দ্যাখো না। লক্ষ্মীর রান্না পচা চুনো মাছের ঝাল খেয়ে চার বার বড় বাইরে গেছি। নাঃ, আইবুড়োদের আলুভাতেই ভালো।

শিব : (ফুরিয়ে যাওয়া বিড়ির প্যাকেটের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিপাত করে এবং চোখ পাকিয়ে কার্তিকের দিকে তাকিয়ে) আরে, এই হতচ্ছাড়া কেতো। তুই আবার এই আইবুড়োদের দলে কেন? তোর না ষষ্ঠীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে? মতলবটা কি তোর? অন্য কোনো কিন্নরী-যক্ষীকে পটানোর জন্য ব্যাচেলর সাজছিস বুঝি? মেরে তোমার হাড় ভেঙে দেব, চ্যাংড়া ছোঁড়া কোথাকার!

কার্তিক : (তাচ্ছিল্যের চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে) ম্যালা ভ্যাজর ভ্যাজর করো নাতো ড্যাডি! ষষ্ঠীর সঙ্গে আমার আইনসম্মত রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হল কবে? আমি মাঝে মাঝে "লিভ টুগেদার" করি। চোরি চোরি চুপকে চুপকে। নো ঝামেলা। খাও-দাও মস্তি করো। আজকাল মর্ত্যে দেখো না, অনেকেই এরকম করছে। আর, ষষ্ঠীকে সাতপাকে বাঁধবে কোন্‌ শালা। তিনি আবার ফেমিনিস্ট। যাকে বলে নারীবাদী। হুঁঃ, আরশোলা আর টিক্‌টিকি দেখলে খুকি আমার চোখ কপালে তুলে ফিট হয়ে যান। তিনি আবার মেয়েদের স্বাধীন হওয়ার জন্য পথসভা করে বেড়াচ্ছেন। মর্ত্যের ওই যে বাংলাদেশি ছেনালিটা, তসলিমা না কি যেন নাম, তেনার গুটি কয়েক বই পড়ে ষষ্ঠীঠাকরুণ স্বাধীন হওয়ার জন্য দৌড়োচ্ছেন। সেই লেখিকারই নাকি নিজের ক্যারেকটারের ঠিক নেই। চার-পাঁচজনের সঙ্গে এর মধ্যেই সংসার পেতেছে।

শিব : তোর মুখ দিয়ে গন্ধ বেরোচ্ছে কিসের? আমি একটু বাইরে গেছিলাম, এর মধ্যে কৈলাসের বারে ঢুকে চুল্লু আর হাঁড়িয়া গিলেছিস বুঝি খুব করে?

কার্তিক : ধুর! তোমার ওই বাংলা মাল কে আর টানবে! রাণী এলিজাবেথের আত্মা একটু মর্ত্যে বেড়াতে গিয়েছিল। সে-ই ওখানকার এক ফ্যাক্টরি থেকে রাম, আর স্কচ নিয়ে এল। তুমিও এবার দিশি ছেড়ে বিলিতি ধরো। কী জিনিস মাইরি। মেজাজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট খুশ হয়ে যাবে।

বিধানচন্দ্র : ঠিক কথা মহাদেব। দিশি মদে খুব তাড়াতাড়ি লিভারের সিরোসিস হয়। কিন্তু বিদেশি মালে অত তাড়াতাড়ি টেঁসে যাওয়ার ভয় নেই। বিয়ের ক্ষেত্রেও তাই। দেশি মেয়েকে বিয়ে না করে বিদেশিনীকে ঘরে নিয়ে আসুন। ভাষার প্রবলেম প্রথম প্রথম হবে হয়ত। বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলবেন। ফ্রি-তে বিদেশে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যাবে। পিৎজা প্যাস্ট্রি জিন ভদ্‌কা যত ইচ্ছা খেতে পারবেন। সাধে কি আর রবিঠাকুর গেয়েছিলেন—"আমি চিনি গো চিনি তোমারে—ওগো বিদেশিনী"! ঘাটে যাওয়ার বয়সে তিনি আবার বছর সতেরোর আর্জেন্টিনো সুন্দরীর ষোলোকলাতে মজে গেলেন। বাউলভায়ার কথাই ঠিক—ইঁদুর মারা কল রয়েছে জগৎ মাঝারে।

বিষ্ণু : দ্যাখো বিধান, তুমি বড্ড ভাট বকো। তা ইয়ে, কার্তিক, তুমি তো শুনলাম বায়ুদেহ ধারণ করে দিন দু'য়েক আগে কলকাতা মহানগরীর সল্টলেকে উড়ে গেছিলে। সেখানকার জীবনযাত্রা দেখার নিরিখে বিয়ে সম্বন্ধে মত কি তোমার?

কার্তিক : বাপ্‌ রে! বিয়ে করলে আকাশছোঁয়া খরচের যে হাড়িকাঠে মাথা রাখতে হবে সেটা হল ছেলেমেয়ের পড়াশোনা। আমি সল্টলেকে এক জাহাজি ইঞ্জিনিয়ারের ফ্ল্যাটে উঁকি মেরেছিলাম। বইপত্রের সাইজ আর সংখ্যা দেখে মনে হল—সরস্বতী আর গণেশ শ্বশুরের জন্মেও বোধহয় অত বই পড়ে দেখে নি। সাবজেক্ট পিছু তিন জন করে প্রাইভেট টিউটর। তাদের পাল্লায় পড়ে ছেলেটার নিজের নাম ভুলে যাওয়ার দশা। এই নিয়ে পর পর তিন সপ্তাহে তিন বার স্কুল পাল্টাল ছেলেটা। যেন মিউজিক্যাল চেয়ারে বসে আছে। বাপের দেদার টাকা। এর মধ্যেই তিনটি স্কুলে ডোনেশন বাবদ টেবিলের তলা দিয়ে ২৫,০০০ টাকা করে ক্যাশ দেওয়া হয়ে গেছে। বাপ আবার ছেলেকে বলছে—লাউডার। জোরে চেঁচিয়ে পড়ো। সমস্ত অ্যাপার্টমেণ্ট যেন শুনতে পায়।

নিউটন : মাই গুড্‌নেস। আমার থার্ড ল বলে, এভ্‌রি অ্যাক্‌শন হ্যাজ ইট্‌স ইকোয়্যাল অ্যাণ্ড অপোজিট রিঅ্যাক্‌শন—প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। ম্যারেজের ব্যাপারে এটা কতটা সত্যি?

কার্তিক : (পকেট-চিরুনি দিয়ে চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়াতে আঁচড়াতে) ক্রিয়া বলে ক্রিয়া। বিয়ে করলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতে মোক্ষম। সল্টলেকের ওই মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাটাটা—সে এখন বাবার মিলিটারি খবরদারি আর বইয়ের চাপে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়তে শুরু করেছে। বাবাকে তেড়িয়া মেজাজ দেখাচ্ছে, মা-কে সেদিন আবার খিমচে দিয়েছে, একদিনে দশটা প্রশ্নমালার অঙ্ক কষতে হুকুম দেওয়ার জন্য। আবার কাউকে না পেলে ছেলেটা নিজেকেই নিজে খিমচোচ্ছে। দেখেশুনে মনে হল, সংসারে না তো, যেন পাগলা গারদ—লুনাটিক অ্যাসাইল্যাম।

শিব : আবার ডাইভোর্স হলেও ঝামেলার একশেষ। তখন বিবাহ-বিচ্ছিন্ন বউ আর তোমার মধ্যে ছেলেমেয়ের ওপর মালিকানা নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হবে। শেষপর্যন্ত অবশ্য তিনিই ইনিংসে জিতবেন। লাভের মধ্যে উকিলের পকেট ভারি করবে আর তোমার এক্স-ওয়াইফের খোরপোষ মেটাতে তোমার সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক নয়া পয়সাও থাকবে না। তখন আলিপুর চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জির খাঁচার সামনে বসে বুড়ো আঙুল চুষতে হবে।

(দড়াম করে নরকের দরজা ধাক্কানোর শব্দ। স্যার নিউটনের হাত থেকে সশব্দে নস্যির ডিবে পড়ে গেল। দরজা ঠেলে দুই তরুণের প্রবেশ। দু'জনেরই মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা। একজনের পরনে হাঁটু অব্দি কালো শেরওয়ানি, অন্য জনের পরনে টাইট ফিট্ সাদা জামা ও ট্রাউজার্স। দু'জনেই চেঁচিয়ে গাইছে—"মোনিকা, ও মাই ডার্লিং.......")

কার্তিক : চেনা চেনা লাগছে। কে ভাই তোমরা? এখানে কি করতে এসেছ? লাড্ডু খেতে?

প্রথম তরুণ : চিনবে না কেনো উস্তাদ্। মুম্বাইতে সেবার তোমার সঙ্গে শুটিং স্পটে আমার জান পহ্চান হল। আমি সঞ্জু। এর মধ্যেই সব ভুলে মেরে দিলে গুরু? সৌ হালুয়া!

দ্বিতীয় তরুণ : (বিষ্ণুর থুত্নি নেড়ে দিয়ে) গুরু, আমাকে মনে পড়ছে না? আমি হলাম গিয়ে জিতু। তুমি যে সেই "মাওয়ালি" আর "হিম্মতওয়ালা" বইতে শ্রীদেবীর সঙ্গে আমার কোমর লাচানো দেখে দিওয়ানা হয়ে গিয়েছিলে, মনে আছে?

বিষ্ণু : পচা হাঙরের দিব্যি, একদম তোমাকে চিনতে পারিনি বাবা। জলজ্যান্ত অবস্থায় নরকে এলে কী করে? যমরাজ পাসপোর্ট ভিসা দিয়েছে?

সঞ্জু : আরে মুম্বাই আর নরকের মধ্যে কোনো ফারাক আছে নাকি? যখন-তখন ওখান থেকে এখানে চলে আসা যায়। শালা যম অবশ্য প্রথমে ভিসা দিতে একটু নাফা করেছিল। তলপেটে ন্যাপালাটা ঠেকিয়ে দিলাম। সুড়্সুড়্ করে ভিসা ফর্মে সই মেরে দিল্। "বাস্তব" বইটাতে আমার এলেম দেখেছেন তো? শালা আমার বাতে সারা মুম্বাই ওঠে বসে।

শিব : তোমরা এখানে কি মনে করে হে? আবার বিনা পয়সায় চরস, হেরোয়িন খাওয়ার ধান্দায় বুঝি আমার গোডাউনে এসেছিলে? সঞ্জুবাবা তুমি তো ড্রাগ খেয়েই নিজের তেরোটা বাজিয়েছ। ঝামেলা পাকালে আমার তৃতীয় নয়নের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেব বলে রাখছি।

সঞ্জু : (ঢুলু ঢুলু চোখে আর মাথার লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে নিয়ে) আরে, দিশি মালের বোতল ফাঁক করে করে আপনার থার্ড আইতে এখন আর কোনো পাওয়ার নেই। মেশিনগানটা যদি ধরি তাহলে নিজেই ভূত হয়ে যাবেন। আমরা এসেছি অন্য বেপারে।

ভীষ্ম : কী ব্যাপার? তোমাদের তো বাপু বিয়ে-সাদি, ছেলেপুলে হয়ে গেছে। আইবুড়োদের সভাতে কী ভ্যারেণ্ডা ভাজতে এসেছ?

সঞ্জু : ধ্যার মশাই। এই ঢপের সভাতে কে আর পেঁয়াজি করতে আসবে।

জিতু : সন্তোষী মা আর বৈষ্ণো দেবীই আমাদের ঠেলেঠুলে পাঠালেন আপনাদেরকে ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্য।

(বিষ্ণু, শিব, ভীষ্ম ও অন্যান্যরা উৎসুক হয়ে পড়ে।)

বিষ্ণু : কেন কেন? কী ব্যাপারে? ওরা কি আমাদের কাউকে বিয়ে করতে চাইছে নাকি?

জিতু : দেবো শালা মায়ের ভোগে, মায়েদের নামে কেউ উল্টাসিধা বাত্ করলে। দুই মায়ে বাতলিয়ে দিয়েছেন—তাঁরা এখন থেকে স্বরগ আউর নরকের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন্স্।

কার্তিক : কেন, ওই পোস্টটা তো ব্রহ্মাদাদু কন্ট্রোল করতেন।

সঞ্জু : আ বে। দাদু আমার হাতে এ. কে. ফিফ্‌টি সিক্স রাইফেল দেখেই দুই মায়ের হাতে দপ্তর ট্রান্সফার করে দিয়েছে। সন্তোষী মা সাফ সাফ বাতলিযে দিয়েছেন—স্বরগ আউর নরক, যেখানেই থাকুন না কেন, বিয়ে করে থাকতে হোবে। আইবুড়ো হয়ে থাকবেন, আবার উর্বশীদের সঙ্গে ন্যাকড়াবাজি করবেন, দেবীদের দিকে ডাঁসেডাঁসে তাকাবেন—এসব আর চলবে না। মায়েরা বলেই দিয়েছেন—আইবুড়োরা যতই সাধুগিরি করুক না কেন, সব শালা লুজ ক্যারেক্টার। শুধু শালা পরের বউকে নিয়ে মস্তি লোটার ধান্দা।

জিতু : বৈষ্ণো দেবী আর সন্তোষী মা আপনাদেরকে এই সার্কুলারটা দিতে বলেছেন। সার্কুলারটা পড়লে সব আইবুড়োদের সিঙ্গল হয়ে থাকা ঘুচে যাবে।

কার্তিক : কি, কী লেখা আছে সার্কুলারে? আইবুড়োদের জন্য দেবলোকের রেশন আর কেরোসিন শপে কম করে চাল আর কেরোসিন বরাদ্দ হবে? এই তো সেদিন রেশনের নতুন বরাদ্দের ফিরিস্তি তৈরি হল।

সঞ্জু : ওসব নয় দাদা! সার্কুলারে বলা হযেছে, এবার থেকে স্বর্গে আব নবকে ঢুকতে চাওয়া অবিবাহিত আত্মাদেরকে দ্বিগুণ ট্যাক্স দিতে হবে। তাদের জন্য বরাদ্দ হবে লোয়ার ইনকাম গ্রুপের হাউজিং। ফ্ল্যাটের দেওয়ালে শ্যাওলা থাকলে আব বাথরুমে জলের সাপ্লাই না থাকলেও আইবুড়োদের বলার কিছু নেই। বেশি ট্যাঁ ফোঁ করলে আর অপ্সরীদের দেখে চোখ মারলে আর শিস্ দিলে আইবুড়োদের আত্মা পলিথিনের প্যাকেটে পুরে মুখ বেঁধে নরকের সীমানায় ধাপার মাঠের কাছে ফে রাখা হবে। পরে ওই পলিপ্যাক সুদ্ধ আত্মাগুলোকে রিসাইক্ল করে দেবলোকের বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা হবে।

জিতু : খালি ইয়ে নেহি। আউর আছে। আনম্যারেড আত্মারা সিঙ্গল বলে পেনশন, গ্র্যাচুইটি, হলিডে লিভ বা প্রভিডেন্ড ফাণ্ড, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট—সবকিছু একদম বন্‌ধ্। ওসব ম্যারেড্ দেবদেবীদের জন্য। এমনকি কুবের প্রাইভেট ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলতে গেলেও আইবুড়োদেব কোনো না কোনো বিবাহিত দেবতা বা দেবীর কন্‌সেন্ট লেটার, যাকে বলে সম্মতিপত্র, সেইটার জরুরৎ হোবে।

বিধানচন্দ্র : হোয়াট নন্‌সেন্স। এ ধরনের পার্শিয়ালিটির অর্থ কি? এ তো আমাদেরকে একঘরে করা হল।

বিষ্ণু : (খাপ থেকে সোনালি রিমের চশমাটাকে চোখে লাগাতে লাগাতে) এক ঘরে নয় হে। তোমাদের পাওয়ার যে বেড়ে গেল। তোমরা এবার হলে গিয়ে দলিত মজদুর কিষাণ পার্টির জলজ্যান্ত উদাহরণ। বিবাহিতদের জুলুমের প্রতিবাদে তোমাদের প্ল্যাটফর্ম এবারে তৈরি। মর্ত্যে যে হারে কারখানা লকআউট, কর্মী ছাঁটাই আর আনসাক্‌সেস্‌ফুল প্রেমিকাদের ফলিডল খেয়ে টেঁসে যাওয়া শুরু হয়েছে, মাস খানেকের মধ্যেই তোমাদের আইবুড়ো ফেডারেশনে মিনিমাম হাজার দশেকেব মতো আত্মার নাম এন্ট্রি করাতে পারবে। একবার আন্দোলনটা শুরু করে দাও দিকি বাবারা। ফান্ডের জন্য ভেবো না। হেরোয়িন ফ্যাক্টরি থেকে যা পাওয়া যাবে তাতেই তোমাদের ব্যানার, হোর্ডিং, হ্যান্ডবিল আর ফেস্টুনের টাকা যোগাড় হযে যাবে। ওই সন্তোষী আর ব্রহ্মা দাড়িওলাকে উল্টোতে বিশেষ টাইম লাগবে না। তবে নতুন সরকার গড়লে ক্যাবিনেটে আমাকে আর শিবুকে নিতে ভুলে যেও না বাবারা। সংসার করার এক্সপিরিয়েন্স তো কম হল না!

(স্পট লাইটের আলো আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে। জিতু আর সঞ্জুকে সিগারেট ধরাতে দেখা যায়। বিধানচন্দ্র, ভীষ্ম, নিউটন, পটলবিহারীরা বিস্ফারিত চোখে এ ওর দিকে তাকাতে থাকেন। নেপথ্যে সঙ্গীত : মুঝে মেরি বিবিসে বাঁচা—ও ....

[যবনিকা নেমে আসে]□

সমসাময়িক

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

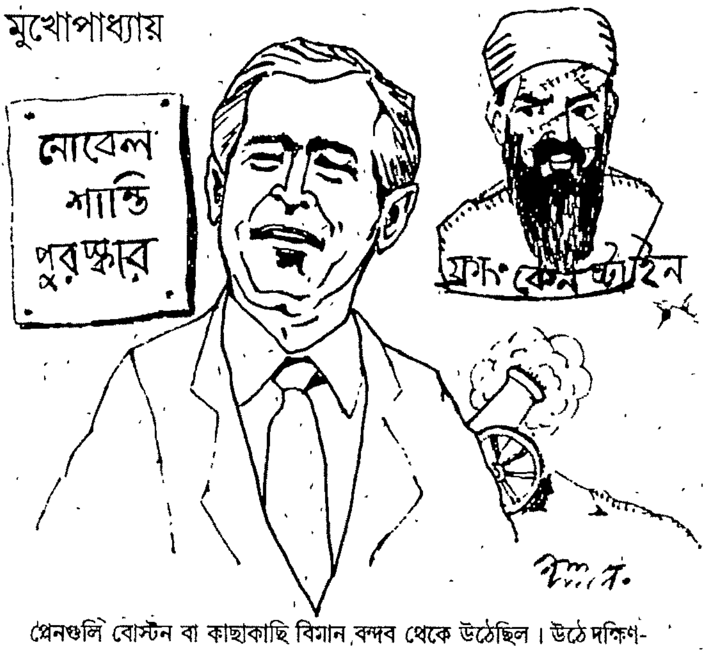

এই লেখাটা যখন তৈরি করছি, তার দিন পনেরো আগে নিউ ইয়র্ক শহরে অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এগারোই সেপ্টেম্বর রাত আটটা নাগাদ বাড়িতে টেলিফোন পেলাম, তোমারা টিভি দেখছ না? দেখ দেখ, আমেরিকা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

প্রথমে ভেবেছিলাম ভূমিকম্প বুঝি। এক বছর আগে আমাদের দেশেই গুজরাটে যে ভূমিকম্প হয়ে গেছে, তার ধ্বংসলীলা এখনো স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। ওই রকম দুর্ভাগ্য যেন শত্রুরও না হয়, আমরা ভেবেছি। আবার ভেবেছি, জনসংখ্যার বিপুল চাপ এদেশে—একশো কোটি ছুঁয়ে গেছে—প্রকৃতি তার নিজস্ব উপায়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে। অর্থনীতিবিদ্ মাল্থাস্ তাঁর জনসংখ্যা তত্ত্বে এই হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে প্রাণীর সংখ্যা যখনই খাদ্যের উৎপাদন সীমাকে ছাপিয়ে গেছে, তখনই প্রকৃতি একটা না একটা পদ্ধতিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে। ভূমিকম্প তার মধ্যে একটা। আবার ভেবেছি, নানা কারণে পৃথিবীর জলহাওয়া গরম হয়ে উঠছিল বলে শুনে আসছিলাম। তার ফলে সমুদ্রে জলস্তর উঠে আসছিল, এমনও হতে পারে। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, যেখানে পাহাড় প্রহরী তেমন উন্নত নয়, সেখান দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের জল ঢুকে দেশটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে না তো? জামবাটির মতো দেখতে যে মার্কিন দেশ, তার মাঝখানটা নিচু। এইভাবে জলস্তর উঠে এলে আমরা পশ্চিম-পূর্ব দুই বাংলার মানুষও রক্ষা পাব না। এই চিন্তাও সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল। মানুষ নিজের স্বার্থ দিয়ে অপরের সমস্যার গুরুত্ব বিচার করে। এ হল তাই।

এখানে রাত আটটা, নিউইয়র্কে তখন সকাল দশটা। টিভি খুলে আমরা বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের প্রথম অট্টালিকাটিকে খসে খসে পড়তে পড়তে দেখলাম, আর দেখলাম একটা বিমান ডানদিক থেকে এসে অবলীলায় দ্বিতীয় অট্টালিকাটির মাঝবরাবর ঢুকে গেল। কমলা রঙের আগুনে আর ধোঁয়ায় ফুটে উঠল সকাল বেলার আকাশ। তারপর ঝুর ঝুর করে খসতে লাগল ওই বাড়িটা। তাসের ঘরের উপমা বইতে পড়েছি, নিজের চোখে দেখিনি কখনো। সেদিন চোখের সামনে তাসের ঘর ধূলিসাৎ হতে দেখলাম। এরকম অভিজ্ঞতা সচরাচর হয় না মানুষের জীবনে।

খবরে বলল, এ কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, ছিনতাই করা দুটি বিমান, আমেরিকারই বিমান, আত্মঘাতী ধাক্কায় বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের একশো দশ তলা দুটি অট্টালিকা চূর্ণ করে দিয়েছে। এর কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আর একটা বিমান এসে আছড়ে পড়েছে ওয়াশিংটনের বিদেশ দপ্তরে। সেখানেও প্রবল অগ্নিকাণ্ড। চতুর্থটি আছড়ে পড়ে পিট্‌সবার্গ, পেনসিলভেনিয়ায়।

আমরা ভাবি, এই রকম চলতে থাকবে নাকি? একটার পর একটা? পনেরো কুড়ি মিনিট অন্তর? আমেরিকার প্রতিরক্ষা কেন্দ্র কি নিদ্রামগ্ন? না হতভম্ব হয়ে গেল? এত বড় একটা দেশ, এত ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র, চারদিকে এর বন্ধু যত শত্রু তার চেয়ে কম নয়, চব্বিশ ঘণ্টাই এদেশের আকাশে পাহারা থাকা উচিত। সেগুলো কি মহাসাগর উপকূল জুড়েই আছে, যেখান থেকে শত্রুপক্ষ ঢুকতে পারে? দেশের ভেতরে নেই? আমরা ক্রমশ জানতে পারছি, প্লেনগুলি বোস্টন বা কাছাকাছি বিমান বন্দর থেকে উঠেছিল। উঠে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে রওনা দেয়। প্রথম লক্ষ্যস্থল নিউইয়র্ক, দ্বিতীয় ওয়াশিংটন। কে জানে, ছিনতাইকারীদের দখলে আরো কত বিমান তখন আমেরিকার আকাশে ওঁৎ পেতে ঘুরছে। আমরা দমবন্ধ করে আছি।

খানিক পর, যখন মনে হল আর আক্রমণ হবে না, অসতর্কতার বিবশ অবস্থা কেটে গেছে, রাষ্ট্রপতি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছেন প্রত্যাঘাত হানবার জন্য, তখন পরের টেলিফোনটা পেলাম। পরিচিত কণ্ঠস্বর। বললেন, দেখলেন তো? কী সাংঘাতিক কাণ্ড। একটু থেমে,—এ হল হিরোশিমা নাগাসাকি হত্যাকাণ্ডের বিলম্বিত প্রতিশোধ।

এই মন্তব্যের আবেগগত একটা অভিপ্রায় আছে। আমরা জানি, উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের এই অমানবিক আণবিক আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হতে পেরেছিল। কুঁকড়ে গিয়েছিল জাপানের পরাক্রম। কিন্তু এতদিন পরে জাপান কি তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে? ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। ব্যাপারটা হল, ওই পাপের কোনো শাস্তি হয় নি আজও। সেই শাস্তি আমেরিকার প্রাপ্য ছিল। দুই প্রজন্ম পরে আজকের শিল্পোন্নত জাপান হয়ত সে ক্ষতের কথা ভুলে গেছে, আমেরিকার অর্থসাহায্যই তা ভুলিয়ে দিয়েছে। যে সব পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আণবিক বিষক্রিয়ায়, তারাও আজ বেঁচে নেই। তাদের বংশধর নতুন উদ্যমে কর্মরত। তবু কোথাও একটা বিশ্ববিবেক খোঁচা দিয়ে যায়। যা বলা উচিত নয়, তা-ই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আমরা ভুলে যাই, উভয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিরীহ মানুষ।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজে নানাবিধ চর্চা চলছে সেদিন থেকেই। সকলেই নিহত ও আক্রান্তদের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। বিপুল অর্থক্ষয়ের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তাই নিয়ে চিন্তিত। পাপের শাস্তির কথা কারুর মনে হলেও সে জিভ কেটে চুপ করে গেছে। প্যালেস্টাইনে আনন্দ উৎসবের

দৃশ্য টিভিতে প্রত্যক্ষ করেও উত্তেজিত হয় নি। কেবল একটি চিঠি বেরিয়েছিল স্টেটসম্যান দৈনিকে, বারো সেপ্টেম্বর, লেখক দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী, টরন্টো, কানাডা। নিশ্চয় ই-মেলে পাঠানো চিঠি। তার মর্মার্থ হল:

সমগ্র আমেরিকা ভেবেছিল, সে সারা দুনিয়ার হর্তাকর্তাবিধাতা। সে আজ সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র আর পেন্টাগন আক্রমণে মর্মাহত। তারা ভুলে গিয়েছিল যে মার্কিন সরকার গণতন্ত্র রক্ষার নামে বাগদাদে এগারো দিন ধরে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। মার্কিন বোমায় বিধ্বস্ত বেলগ্রেডের কথাও তারা ভুলে গিয়েছিল। সেই সময় একজন আমেরিকানও প্রতিবাদ করে নি। কেউ ওরা কষ্ট পায় নি ঘটনার বীভৎসতায়। এখন তারা মর্মাহত। সম্ভবত এবার তারা বুঝতে পারবে যে, হত্যার লীলা সব দিক থেকে বেদনাদায়ক। তাদের মনে রাখা উচিত যে কেউই ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়, আর যে পাপ তারা উপর্যুপরি করে এসেছে ভিয়েৎনাম, বাগদাদ, বেলগ্রেড এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে, তার ফল ওদের ওপর ভয়ঙ্কর ভাবে ফিরে আসবে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পত্রটিকে আমি ঐতিহাসিক মূল্য দিতে চাই, যদিও হিরোশিমার উল্লেখ দীপ্তেন্দুবাবুর চিঠিতে নেই। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের পর থেকেই আমেরিকার বাহুবল প্রদর্শনের ঝোঁক আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথম দিকে প্রতিপক্ষ ছিল রাশিয়া, যেহেতু সেখানে গণতন্ত্র ছিল না। এখন প্রতিপক্ষ পৃথিবীর সমস্ত গণতন্ত্রবিরোধী রাষ্ট্র। ভাবটা, গণতন্ত্র রক্ষার গুরুদায়িত্ব পৃথিবীর মানুষ আমেরিকা নামক রাষ্ট্রের স্কন্ধে অর্পণ করেছে।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, দিনের পর দিন টিভিতে ধ্বংসের স্বরূপ আর নির্দোষ মানুষের কষ্ট দেখতে দেখতে আমরা বিষণ্ণ। এর পর কী হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে। প্রতিদিন সেই সব কাল্পনিক অনুমানগুলি পড়তে পড়তেও আমরা ক্লান্ত। কিছু একটা হোক, যেন ভেতর থেকে আমরা চাইছি। এই নিষ্ক্রিয়তা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমাদের এই অধৈর্য ভাব সম্ভবত ক্ষতিকর, কারণ বিশ্বের মানুষের এই মনোভাব সদ্য অহমিকায় চোট খাওয়া আহত মার্কিন ব্যাঘ্রকে আক্রমণে উসকানি দিতে পারে?

কিন্তু কাকে আক্রমণ করবে আমেরিকা? সন্ত্রাসবাদকে। কোন্ রাষ্ট্র প্রকাশ্য ভাবে সন্ত্রাসবাদী? কেউ না। অথচ কিছু কিছু দেশে গোপনে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি তৈরি হয়েছে, সেখানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, আদর্শের নাম করে প্রাণ বিসর্জনের তালিম দেওয়া হচ্ছে, এসব খবর নিশ্চয় স্থানীয় প্রশাসনের অজানা নয়। এমনকি আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছেও তাদের হদিশ আছে। পাছে সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানকে গ্রাস করে, সেই ভয়ে বিন লাদেনকে সামরিক সাহায্য আমেরিকাও দিয়েছিল। বিন লাদেন আজ এত শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে যে, তাকে আর নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীরা কুড়ি বছর ধরে কাশ্মীরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা সহ্য করছি। তাদের হাতে যে আগ্নেয়াস্ত্র, সাঁজোয়া বহর, সব কোথায় তৈরি? কিছুদিন আগে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি কাশ্মীরের জঙ্গি আক্রমণকে 'মুক্তিযুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে গেলেন।

হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিলে অবোধ বালক সেই অস্ত্র কার ওপর প্রয়োগ করবে, কেউ বলতে পারে না। শত্রু চিনিয়ে দেবার প্ররোচনা প্রতিনিয়ত দিয়ে আসছেন রাজনীতির কারবারিরা। অশান্তি জাগিয়ে রাখলে যাদের লাভ। অশান্তি না থাকলে দেশে উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার শুরু হয়ে যায়। জীবনযাত্রার মান ওঠাবার চেষ্টা চলে। এই সব কাণ্ড হতে থাকলে অস্ত্রশস্ত্র কিনবে কে? সুতরাং দেশে দেশে অশান্তি জাগিয়ে রাখার কূটনীতিকে যাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন এতদিন, আজ হঠাৎ তাঁদের ওপরই বিষম আঘাত এসে পড়ল। বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের দুটি টাওয়ার মিশে গেল ধুলোয়। একশো দশ তলা করে দুটি অট্টালিকা। পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম।

ইউরোপীয়ান অধিবাসীরা আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে এসে প্রথমে থিতু হয়। তাই ওখানে অনেক বড় বড় শহর গড়ে উঠেছে। আর প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু বাড়ি। বিশ্বের বাজার ওই পূর্ব উপকূল ঘেঁষে এবং কিছু কিছু পশ্চিম উপকূল ঘেঁষেও, যেখানে সোনার সন্ধানে মানুষ ছুটেছিল বসতি স্থাপন করার অনেক পরে। পঞ্চাশতলা বাড়ি ওদেশে প্রায় জলভাত। পঞ্চাশতলার চেয়ে উঁচু অট্টালিকা নিউ ইয়র্ক শহরে আছে তিপ্পান্নটি, শিকাগোয় তেইশটি, হিউস্টনে বারোটি, লস এঞ্জেলসে দশটি, কানাডার ব্যস্তসমস্ত শহর টরন্টোয় মাত্র সাতটি। আমেরিকার রাজধানী যে ওয়াশিংটন ডিসি, সেখানে পঞ্চাশোর্ধ অট্টালিকা নেই। ভাগ্যিস নেই!

১৯৯৬ সালে ঠিক এই সময়ে আমি আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তখন নিউ ইয়র্কেও থেকেছি। যাকে ম্যানহাটন বলে, সেই ঘিঞ্জি অথচ পরিচ্ছন্ন পল্লিতে হাওয়ার্ড জনসন নামে এক মাঝারি মাপের হোটেলে কয়েকদিন ছিলাম সরকারি খরচে। যেতে আসতে ডানপাশে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং পড়ত, আর বাঁ দিকে কিছুটা দূরে ওই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। তার ছাদে বিশাল পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, খাবার দোকান, কেনাকাটার উৎসব। টুরিস্টদের প্রধান আকর্ষণ। আমি রাস্তা থেকে ঘাড় উঁচু করে দেখতাম আলোয় ঝলমল করছে। কিন্তু ওপরে যাওয়া হয় নি। হয়ত উচ্চাকাঙ্খা কম বলেই। ভেবেছি, অত ওপরে উঠে নিচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যাবে। মানুষকে মনে হবে নগণ্য কীটপতঙ্গ। আসল কথা, অকারণ ডলার খরচ করতে চাইনি। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছে, এত উঁচু বাড়ি বানাবার কী দরকার ছিল। জায়গার তো অভাব নেই এদের। মস্ত বড় দেশ। জনসংখ্যা প্রতিবর্গ কিমিতে পঞ্চান্ন। 'বিগ অ্যাপল'—এই আদুরে নামে পাঁচভাগে বিভক্ত নিউ ইয়র্ক শহর। তারও জনসংখ্যা এক কোটির নিচে।

তারপর ভেবেছি, ইউরোপের মতো এদের তো ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। যদি ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে প্রথম আবিষ্কারক হিসেবে ধরা হয়, ১৪৯২ সাল, তা হলেও এর বয়েস পাঁচশো বছরের কিছু বেশি। এদের কোনো হিমালয় নেই। উত্তর মেরু থেকে শীতের বাতাস হু হু করে দক্ষিণে মেক্সিকো অবধি বয়ে যায়, কোথাও বাধা পায় না। এদের গ্রিস বা রোমের মতো অতীত-গৌরব নেই। চীনের প্রাচীর নেই। অথচ প্রভূত ধনদৌলত আছে। তা থেকে জেগেছে দম্ভ আর অহমিকা। অতি উচ্চ অট্টালিকাগুলি হয়ত তারই প্রতীক।

রাষ্ট্রপতি বুশ প্রথম দিনেই বলেছিলেন, আক্রমণকারীদের শাস্তি দিতে আমেরিকা সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সেনাবাহিনীকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবু এই লেখা তৈরি করার সময় পর্যন্ত যুদ্ধ লাগে নি। শোক সন্তপ্ত পরিবারে প্রার্থনার আয়োজন চলছে।

লাগে নি, তার অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে। একটা কারণ অন্তত এই যে, তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা প্রবল। এবং আণবিক অস্ত্র অনেকের কাছেই মজুত আছে। শোনা যায়, সারা পৃথিবীতে যত আণবিক বোমা জমানো আছে, তা দিয়ে গোটা পৃথিবী সতেরো বার ধ্বংস করে ফেলা যায়। একটি ১১০ তলা জোড়া অট্টালিকার ধ্বংসের প্রতিকার করতে গিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া কি উচিত?

জার্মানিতে গিয়ে, সম্ভবত বার্লিনে, একটি বোমা-বিধ্বস্ত গির্জা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে রক্ষিত আছে, দেখে এসেছি। এই বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র সেই রকম ভাবে রক্ষিত থাক না, পাশবিক হিংসার একটি দৃষ্টান্ত হবে, যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে। □

গল্প

জয় বাবা ভূতনাথ

[illegible]

—আপনি? —সন্দেহের চোখে তাকাই, দরজা খুলে।

—সেলাই মেশিন সারানোর জন্য আমাকে পোস্টকার্ড লিখেছিলেন। আমি ভূতনাথ সামন্ত—ভদ্রলোক পরিচয় দেন।

—ওহো, সরি........আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

—নাহ্, ...এ অঞ্চলে বেশ কয়েকবার আসতে হয়েছে। চেনা......।

—ভিতরে আসুন।

ভূতনাথ সামন্ত হাতের ছোট ব্যাগটা নিয়ে ঘরে পা দেন।

—একটু জল খাব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ.......একমিনিট।

জল এনে দিই। ভূতনাথ সামন্ত জল খেতে খেতে আমার ফ্ল্যাটটা দেখতে থাকেন। ছোটখাটো চেহারা, কিন্তু বেশ শক্ত-পোক্ত। রংটা একটু চাপা, মাথার পেছনদিকে বেশ বড়সড় গোল টাক, সাদা হাফ্ শার্ট, কালো ট্রাউজার, চটিজোড়া বাইরে খুলে এসেছেন। হাতে ঘড়ি নেই।

বলি,—আমার এক পরিচিতা ভদ্রমহিলার কাছ থেকে আপনার ঠিকানাটা পেলাম। সেলাই মেশিনটা বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। আমার স্ত্রী অনেকদিন এটা ব্যবহার করেন না। মনে তো হয় একটা সার্ভিসিং দরকার। তা আমার পবিচিতা ঐ ভদ্রমহিলাকে সমস্যাটা বলতেই উনি আপনার কথা বললেন। এও বললেন যে আপনার ফোন নেই, খবর দিতে হলে আপনাকে চিঠি লিখতে হবে। উনি আপনার রেট্‌টাও আমাকে বলেছেন।

ঝড়ের বেগে বলেই একটু দম নিই,—সত্যি আজকের দিনে এত কম টাকায় কাজ করেন, ভাবাই যায় না।

ভদ্রলোক খুশি হলেন কিনা বোঝা গেল না।

—দেখুন, এটা আমার পেশা নয়। নেশা বলতে পারেন। আগে একটা নামি সেলাই মেশিন কোম্পানিতে ছিলাম। ভি. আর. এস নিয়ে বসে গিয়েছি। ঐ টাকায় কিছু যন্ত্রপাতি কিনেছি। ইচ্ছে আছে একটা দোকান খুলব। ওই সারাইয়ের আর কি। —ভূতনাথ থামেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মেশিনটা ডাইনিং টেবিলের মার্বেলের উপর তুলে দেন। আমি হাঁ হাঁ করে উঠি।

উনি মুচকি হেসে অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন—ঘাবড়াবেন না। একটা মোটা টাওযেল দিন। ওটা নিচে দিয়ে দিচ্ছি। মার্বেলে দাগ পড়বে না। নিশ্চিন্ত থাকুন। একটু উঁচু জায়গা হলে দাঁড়িযে-দাঁড়িয়ে কাজ করা যায়। কাজটাও ভালো হয।

সলিড যুক্তি। একটা ছেঁড়া টাওযেল এগিয়ে দিই। মেশিন কাৎ করে একটার পর একটা স্ক্রু খুলতে থাকেন। দেখে বোঝা যায়, পরিষ্কার ধারণা আছে এসব কাজে। এক মনে কাজ কবতে থাকেন। খানিক পরে আমার দিকে না তাকিয়ে বলতে থাকেন,—

ফ্ল্যাটটা তো নতুন মনে হচ্ছে। কদ্দিন এসেছেন?

—এই তো মাস ছয়েক। —জবাব দিই।

—জানেন আমিও একটা ফ্ল্যাট বুক্ করেছিলাম। নিজের জন্য নয়, মেয়ে-জামাইযের জন্য। ওদেরই পয়সা। এতদিনে পেয়েও যেতাম। হল না।

মেশিনের দিকে চোখ রেখে, কিছু বলতে হয়, তাই বলি,—ও, তাই বুঝি! তা হল না কেন?

ভূতনাথের চোখ মেশিনে। হাত চলছে। উত্তর দেন,—সে এক মহাভারত। শুনবেন?

রান্নাঘর থেকে আমার স্ত্রী বেরিয়ে ইশারায় কথা বলতে মানা করে। আমি হাত নেড়ে আশ্বস্ত করি যে কাজে দেরি হবে না। মুখে ভূতনাথকে বলি,—আপনার কাজে যদি অসুবিধা না হয়, তবে বলুন।

ভূতনাথ তাঁর গল্প শুরু করেন। ভারি সুন্দর বলার ভঙ্গি। একটু একটু করে সুতো ছাড়তে থাকেন—

মেয়ে-জামাইয়ের বেশ পছন্দ বাড়িটা। রোজই যাওয়ার পথে বাড়িটা একটু একটু করে উঠতে দেখছে। একদিন বিকেলে দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কোনো ফ্ল্যাট খালি আছে কিনা। দারোয়ান ওদের ফার্স্ট ফ্লোরের একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। অনেকটা কাজ তখনো বাকি। ফ্লোরিং হয়নি, প্যারিস হয় নি, জানালার ফ্রেমে কাচ বসে নি, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ বাকি। যাই হোক, ঘরের লে-আউট মন্দ নয়। দুটো শোবার ঘর, একটা ড্রয়িং-ডাইনিং, দুটো টয়লেট, একফালি বারান্দা। রাস্তার ওপারে নয়, ভিতরের-দিকে ফ্ল্যাটটা; সামনেরগুলো বুক্ হয়ে গেছে। দারোয়ানকে দামের কথা বলতেই সে তার মালিক, মানে প্রমোটার শ্রী পটল সাহাব সাথে কথা বলতে বলে। পটলবাবু নাকি কাছাকাছিই থাকেন।

পরেরদিন সকাল ন'টার মধ্যে ওনার বাড়িতে গিয়ে ধরতে হবে, না হলে বেরিয়ে যাবেন। মেয়ে-জামাই খুবই উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরে আমাকে সব বলল। ঠিক করি, ওদের সাথে পটলবাবুর কাছে আমিও যাব। ছেলেমানুষ তো। যদি প্রমোটারের প্যাঁচ-পয়জার না বোঝে!

রিটায়ার করে গেছি। এমনিতে বৌ-মেয়ের কাজে ভুল ধরা ছাড়া বিশেষ কিছু করার নেই। দিনে মাত্র একটা করে মেশিন সারাইয়ের কাজ করি। ব্যস, তারপর বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুম।

পরদিন সকাল আটটার মধ্যে পটলবাবুর বাড়ি হাজির হলাম। বাড়ির কাজের লোক আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বসতে বলল। বসলাম। ছোট বসার ঘর, সোফাসেট, একটা ছোট্ট টেবিল, দেওয়ালে মা কালীর ছবি, একটা ক্যালেন্ডার হাওয়ায় দেওয়াল ছেড়ে পালাতে চাইছে।

পটলবাবু ঘরে ঢুকলেন। স্নান সারা হয়ে গেছে। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো। একটা চোখ কানা, অন্য চোখটা অসম্ভব উজ্জ্বল। গলার স্বর সরু। প্রথম দর্শনেই কেন জানি না গা-টা শিরশির করে উঠল। মন দমে গেল। যাই হোক জামাই প্রসঙ্গ টি তুলেই ফেলল। পটলবাবুও খুব দ্রুত দামের কথায় চলে গেলেন,—চার লাখ পড়বে। প্রচুর ক্রেতা নাকি দু'বেলা আসছেন। যে কোনো মুহূর্তে ফাইনালাইজ্ হয়ে যাবে। প্রমোটারদের যদি কোনো ট্রেনিং স্কুল থেকে থাকে, এ তার কৃতী ছাত্র বলা চলে। জিজ্ঞেস করি, কত দিয়ে বুক্ করতে হবে? পেমেন্ট সিডিউলই বা কি? কালো-সাদার শতকরা হিসেব কি?

আপনি প্রথমে একলাখ ষাট হাজার দিয়ে বুক করুন। একলাখ সাদা আর ষাটহাজার কালো। পরে আপনাকে যখন যেমন বলব সেভাবে দিতে হবে। তবে সময় পাবেন। পটলবাবু বেশ উদাসীন। আমার মাথার উপর দিয়ে বাইরে 'শালিক পাখি' দেখছেন, আর টু-ফর-জয় করছেন। এরা সাধক মানুষ। পয়সা নিয়ে কথা বলছেন; অথচ কত নির্লিপ্ত!

'ডান'—বলে, নমস্কার করে চলে আসি। শর্ত একটাই—দু'দিনের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দিতে হবে।

বাড়ি ফিরে বৌকে বলি চা করে দিতে। মাথা ধরে গেছে। পটলবাবু খুবই কড়া-ধাঁচের লোক। বাইরের লোককে বোধহয় কিছুই খাওয়ান না!

জামাই টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে ফেলে। দ্বিতীয় দিনে পটলবাবুর বাড়িতে এগ্রিমেন্ট সই-সাবুদ হযে যায়। চেক একলাখ, ষাট-হাজার ক্যাশ। থুতু দিয়ে গুনে নেয় পটলবাবু। গোনা শেষে এক চোখ তুলে একটু হাসে,—ব্যস; ফ্ল্যাট আপনাদের হয়ে গেল। খালি দেখবেন, পরের টাকাগুলো যেন ঠিক সময়ে হাতে পাই। না হলে কিন্তু আপনাদেরই অসুবিধা হবে।—একটু প্রচ্ছন্ন সাবধানবাণী শুনিয়ে দিলেন।

মেয়ে-জামাই প্রায় লাফাতে লাফাতে আমাকে অনেকটা পিছনে ফেলে বাড়ির দিকে ছুটল।

দিন পনেরো পরে আমার বড় জামাই জামশেদপুর থেকে এসে হাজির। অফিসের কাজে মাঝে মধ্যে কলকাতায় এলে আমার ওখানেই ওঠে। ছোট জামাইয়ের ফ্ল্যাটের কথা শুনে বেজায় খুশি। ঠিক পরের দিনই চলে যাবে। সুতরাং ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে চললাম। আমি তো বেকার, অতএব!

ফ্ল্যাটে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ক্রমশ তার মুখ গম্ভীর হতে থাকে। হঠাৎ-ই বার্স্ট করে,—এটা আপনারা কী করলেন? আপনি এত অভিজ্ঞ মানুষ।

—কেন? কী করলাম বাবা?

—ইস্ ......আমি তখন থেকে ভাবছি। যেখানে ফ্ল্যাটের দাম পাঁচ, সাড়ে পাঁচ লাখ, সেখানে আপনি চার লাখে পেলেন কী করে? ভালো করে লক্ষ্য করুন—ফ্ল্যাটের তিনটে দিকই ব্লকড্, পাশের বাড়িগুলো গায়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। যেদিকটা রাস্তার দিক, সেদিকেব ফ্ল্যাট বুক্ হয়ে গেছে। এখানে থাকলে তো দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন, ...এগুলো দেখেন নি?

স্বীকার করি, দেখিনি। মেয়ে-জামাই এমন লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল যে আমিও এগুলো খেয়াল করিনি। এখন কী করা যায়?

—বাবা, আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন প্রমোটারের সাথে দেখা করুন। বলবেন, বাড়িতে অসুখ; অপারেশন কেস্, প্রচুর টাকার দরকার। বুকিং ক্যানসেল করতে চান্। চেষ্টা করে দেখুন, যদি টাকা ফেরত পাওয়া যায়! দেবি করবেন না।

থতমত খেয়ে যাই। একটু নার্ভাসও লাগে। অনুনয় করি,—বাবাজীবন, তুমি আমার সাথে একটু যাবে? যদি ঝামেলা করে?

—আপনি চিন্তা করবেন না। ছোটজামাইকেসব বুঝিয়ে দিয়ে যাব। আমার যাওয়াটা ভালো দেখাবে না। প্রমোটার ভাববে আপনি বুঝি বাইরের লোক নিয়ে প্যাঁচ কষছেন। সন্দেহ হলে টাকা আটকে দেবে। আপনি কথা বলবেন, ছোট সঙ্গে থাকবে। এখন বাড়ি চলুন।

ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে দু'জনে বেরিয়ে আসি। দারোয়ান একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বাড়ি ফিরে বড় জামাই সব বিস্তারিত বুঝিয়ে বলে। মেয়ে ভুল বুঝতে পারে। ছোট জামাইয়ের সাথে ফোনে কথা হয়। ঠিক হয় সন্ধেবেলায় পটলবাবুর কাছে যাওয়া হবে।

বেল টিপতেই সেই বিচ্ছিরি কাজের লোকটি মুখ বাড়ায়।

—বাবু আছেন?

—হ্যাঁ, ভেতরে বসুন। ডাকছি। —বাড়ির মধ্যে চলে যায়।

পটলবাবু, ভ্রূ-কুঁচকে ঘরে ঢুকলেন।

—কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ ......মানে একটু......মানে বেশ সমস্যায় পড়েছি। আপনি সহৃদয় মানুষ। যদি একটু সাহায্য করেন।

—দেখুন, হেঁয়ালি করবেন না। পরিষ্কার করে বলুন।

—বলছি বাড়িতে স্ত্রী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপারেশন করাতে ভেলোরে নিয়ে যেতে হবে। যদি ফ্ল্যাটের বুকিং মানিটা ফেরত দেন, বড্ড উপকৃত হব। বলে ফেলি আমি।

—হুঁ, বুঝলাম। গভীর সমস্যা! দেখুন, টাকা তো ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছি। তবু দেখছি কি করা যায়! একজন ফ্ল্যাট খুঁজছেন। যদি কিনতে রাজি থাকেন তবেই পাবেন, অন্যথায় যখন কোনো ক্রেতা পাব, তখনই টাকা ফেরত পাবেন—এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী। এক্ষুনিই কিছু বলতে পারব না। পরের সপ্তাহে একবার খোঁজ নেবেন। পটলবাবু নমস্কার করেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেন যে আপনারা এবার আসুন।

বাড়িতে ঢুকেই দেখলাম—বৌ-মেয়ের শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত মুখ। মুখে বললাম,—ঘাবড়িও না। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। সামনের হপ্তায় যেতে বলেছে। —মনে মনে নিজেই যথেষ্ট নার্ভাস।

পরের সপ্তাহে গেলাম পটলবাবুর কাছে। পাশে গালকাটা একটি লোক বসে আছে। মাছের মতো ঘোলাটে চোখে আমায় দেখল। পটলবাবু আমায় দেখে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন,—দেখুন, অনেকক্ষতি স্বীকার করে কোনো রকমে একটা ব্যবস্থা হয়েছে। নেহাৎ মাসিমার অসুখের কথা বললেন, তাই। এই এগ্রিমেন্টটায় সই করুন। এটা এগ্রিমেন্ট ভাঙার এগ্রিমেন্ট। সাদা টাকাটা চেকে দিয়ে দিচ্ছি। লেখা আছে সাবজেক্ট-টু-ক্লিয়ারেন্স। বাকি ষাট হাজার, দিন পনেরো পরে আসুন, দেখছি।

আমি ইতস্তত করি। জামাই উস্‌খুস্ করছে। বুঝতে পারছি এগ্রিমেন্ট সই করা মানে ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে। যদি ব্ল্যাকটা না দেয়?

একচোখা পটল, তাকিয়ে মনের ঢেউ বুঝতে চেষ্টা করছে—আমি কী করব? কি মুশকিলে পড়া গেল!

—হুঁ! সন্দেহ হচ্ছে, বুঝতে পারছি,—কিন্তু এটাতে সই না করলে অন্য পার্টির সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করব কিভাবে? তাহলে তো আপনি টাকা ফেরৎই পাবেন না! এটুকু বিশ্বাস যে করতেই হবে ভূতনাথবাবু?

আমি সম্মত হই। জামাই সই করে দেয়। একলাখ টাকার চেক নিয়ে বেরিয়ে আসি। ষাটহাজার বাকি রইল। পনেরোদিন পরে আবার আসতে হবে।

বড় জামাইকে জামশেদপুরে ফোন করে সব জানালাম। সে খুশিই হল। শুধু বলল,—বাবা, লেগে থাকবেন কিন্তু। এর পরের রাউন্ডেই ঝামেলা হয় সাধারনত। অমিতাভ বচ্চনের কে.বি.সি—প্রোগ্রামের মতো—প্রথমদিকে সহজ, পরের দিকে টান ান উত্তেজনা। সব সময় কি-হয়, কি-হয় ভাব। দেখুন ভাগ্য সহায় থাকলে সহজে বে বিয়ে যাবেন।

ফোন রেখে দিই। বাড়িতে মেয়ের মুখ ভার। বৌ মেয়ের পক্ষে,—তুমি অভিজ্ঞ ানুষ, কিছুই বললে না। বড়জামাই যা বোঝে, তুমি তো তাও বোঝো না। ছোটজামাই ছেলেমানুষ শত হোক।

মনে মনে বলি,—যত দোষ, নন্দ ঘোষ। নিজেরা লাফাতে লাফাতে পছন্দ করলে। বুড়ো বাবাকে কিছু বলবার স্কোপ দিয়েছিলে? বল্‌লেও হয়ত ভাবতে, ভাঙচি দিচ্ছি! শাঁখের করাত।

যথাসময়ে আবার পটলমুখো হলাম। পটল বৈঠকখানায় বসে পাট-নাচাছে। সঙ্গে গালকাটা লোকটা।

চোখ তুলে বলল,—এসে গেছেন! বাঃ! ভীম, ওদের প্রাপ্য টাকাটা দিযে দাও তো। চল্লিশ হাজার। গুনে দিও।

চমকে উঠি। ইয়ার্কি নাকি?

—কী বলছেন কি? ষাট তো?

—নাঃ, চল্লিশই পাবেন। বাকি কুড়ি ড্যামারেজ চার্জ। নন্ রিফান্ডেবল্। যেহেতু এগ্রিমেন্ট ভেঙে আগেই বেরিয়ে গেছেন, এটা কেটে নেব। এটাই দস্তুর।

—এরকম কোনো কথাই ছিল না। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।—উত্তেজিত হয়ে বলি। —এ অন্যায় আমি মেনে নেব না। আমি এক পয়সাও কম নেব না, বুঝলেন?

—আপনি নেবার কে? আপনার সঙ্গে তো চুক্তি হয় নি। পটল জামাইয়ের দিকে ফিবে বলে—আপনি কি বলেন? যদি জেদ ধরে থাকেন, তবে আপনারই ক্ষতি। ভেবে দেখুন।

জামাই কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায়। খনিক চুপ করে থেকে বলে, —না, কম নেব কেন? উনি তো ঠিকই বলেছেন। উনি আমার শ্বশুরমশাই। এভাবে আপনি ওনাকে বলতে পারেন না। আমার বিষয়ে উনি কথা বলবেনই। কাজের কথায় আসুন। পুরো টাকা দেবেন কি না?

—সরি, আপনারা আসুন তা হলে। চল্লিশ নিতে রাজি থাকলে খবর পাঠাবেন। ব্যবস্থা রাখব। উঠি, আমাকে বেরোতে হবে।

আমি রাগে কাঁপতে থাকি। এতবড় জোচ্চুরি!

—দেখে নেব; পুলিশে দেব। ব্যবসা বন্ধ করিয়ে দেব।

—হ্যাঁ, চেষ্টা করে দেখুন। এই যে ভীমকে দেখছেন, এর বিরুদ্ধে মার্ডার কেস্ ঝুলছে। অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে। ও ধরা পড়েছে কি? এক চোখা পটল, ক্রমশ নিজেকে উন্মোচিত করতে থাকে।

—ওকে যদি লেলিয়ে দিই, অসুবিধায় পড়ে যাবেন। কী করবেন ভাবছেন ভূতুবাবু?

—দেশে আইন নেই, পুলিশ নেই? আচ্ছা আমিও দেখব। প্রচন্ড উত্তেজনায়, কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসি। এখন আমি কী করি? এতগুলো টাকা মেরে দেবে নাকি হার মেনে চল্লিশেই রফা করব? কিছুই ঠিক করতে পারি না। জামাইটাও য়েছে তেমনি! কিছু তো একটা বলবে! কিছুই বলে না।

শুরু হল কিষ্কিন্দ্যাপর্ব। বাড়িতে মেয়ে-বৌয়ের গঞ্জনা, কান্না, হাহাকার। আমি ভলেন। মেযে বলল, বাবা তুমি কেন তর্ক করতে গেলে? চল্লিশ তো পাওয়া াচ্ছিল। ওটা নিয়ে পরে আবার চেষ্টা করলেই হত। এভাবেই যদি পাঁচ-দশ, যা পাওয়া যেত সেটাই বাড়তি পাওনা ধরে নিতাম। তুমি সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালে কন? পারবে তুমি উদ্ধার করতে? আমাদের কষ্টের টাকা। একবারও ভাবলে না? কাল যদি বলে একপয়সাও দেবে না, কিছু করতে পারবে? ব্ল্যাক মানির এগ্রিমেন্ট নেই, মনে আছে তো?—মেয়ে ফোঁস ফোঁস করে, শাড়ির আঁচলে নাক ঝাড়ে।

বাইরে লড়াই করা যায়, ঘরের মধ্যে লড়াই শুরু হলে মনোবল ভেঙে যায়। নিজেকেই অপরাধী মনে হল। জামাই যথারীতি আমার কোর্টে বল চালান করে নিশ্চিন্ত। মনে পড়ল পাড়ার শ্যামলবাবুর কথা। বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়ান। কাল সকালেই একবাব পরামর্শ করতে হবে। দেখি, কি বলেন?

শ্যামলবাবু মর্নিং ওয়াক সেরে সবে চায়ের কাপে চুমুক দিযেছেন, আমিও হাজির। বসতে বলে ভিতরে আর এক কাপ চায়ের কথাও বলে এলেন।

ভূতনাথবাবু, বলুন এবার।

সব খুলে বললাম। শ্যামলবাবু চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে করতে ঘামে ভেজা গেঞ্জিটা খুলে ফেললেন। তারপর চুপ করে অনিকক্ষণ ভাবলেন। বললেন, দেখুন ব্যাপারটা বেশ জটিল। লোকটির এ লাইনে বিশেষ সুনাম নেই। ....দুঁদে বজ্জাত। আগে জানলে বার করতাম। ওর আশেপাশের লোকজন সব প্রায়, অ্যান্টিসোস্যাল। একটা উপায় যে নেই, তা নয়। আপনাকে পার্টির সাহায্য নিতেহবে। যে অসুখে যে দাওয়াই। এই অঞ্চলে সাধন গুপ্তর প্রচন্ড নামডাক। অনেস্ট পার্সন। সাদামাঠা চালচলন। লোকাল পার্টির শেষ কথা। উঁচু মহলে প্রভাব আছে। ওনার কাছে যান কাজ হবে। মনে হয় কাজ হবে। হবেই। কোনো দালাল লাগবে না। সোজা চলে যান জামাইকে নিয়ে। বেশি দেরি করবেন না। টাকা হজম করে ফেলবে।

ধন্যবাদ জানাই শ্যামলবাবুকে। কাল সকালেই যেতে হবে।

সাধন গুপ্তের বাড়ির বাইবে অনেক লোকজন। অঞ্চলের মানুষ নানান অভাব-অভিযোগ নিয়ে আসে। উনি সাধ্যমতো চেষ্টা করেন সাহায্য করতে। লাস্ট দশ বছবের লোক্যাল কাউন্সিলার। বরো কমিটিতেও আছেন। চেয়ারম্যান হন নি। বলেন, আমার তিনকাল গিযে এক কালে ঠেকেছে। ওসব পদ-টদ ছেলে-ছোকরারা নিক। ওরাই তো পার্টির, দেশের ভবিষ্যৎ।

অঞ্চলের মানুষ, সাধন গুপ্তকে একটু অন্য চোখে দেখেন। শোনা যায়, ব্রিটিশ আমলেরও আগে কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এঁদেব পিতৃপুরুষের ছিল। এঁদেব কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিদেশিরা এইসব জায়গা-জমি কিনে নেয। প্রথমে কলকাতাব বিস্তীর্ণ এলাকা, তারপর বসত-বাটি সংলগ্ন জায়গা, তার ওপরে শুধুই বসতবাটি-এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাঁদের সম্পত্তির মানচিত্র।

সাধনবাবুর বাড়ির কেউ চাকরি করেন না। নীল রক্তের অহঙ্কার হয়ত এই প্রজন্মেই শেষ হয়ে যাবে। তবু ইনি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, মানুষ তাঁকে দ্যাখে একবিলুপ্তপ্রায় প্রাণী হিসাবে, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও যারা কোনোক্রমে টিকে আছে।

এহেন সাধনবাবু লম্বায় ছ-ফুট এক ইঞ্চি, ফর্সা রং, লম্বাটে মুখমন্ডল, বয়সের ভারে সামান্য কুব্জ, রোগাটে চেহারা, পরনে সবসময পাজামা-পাঞ্জাবি, অভিজাত ভঙ্গি, গম্‌গমে গলার স্বর।

আমি ইতস্তত করি। কী সিষ্টেম্ এরা মেইনটেন করছে জানি না। কোথাও নাম লেখাতে হবে কিনা বুঝতে পারি না।

একটি ছেলে এগিয়ে আসে। বলে, মেসোমশাই কি দাদার সঙ্গে দেখা করবেন? কোথা থেকে আসছেন? বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে ঝামেলা? না, জমি বেদখল? না চাঁদার জুলুম? না মিসেলিনিয়াস্?

ওরে বাবা! কতরকম কেস্ হ্যান্ডেল করতে হয়! শ্যামবাবু তাহলে ঠিক জায়গাতেই পাঠিয়েছেন।

মুখে বলি, ভাই প্রমোটারের সঙ্গে ঝামেলা, টাকা ফেরত পাচ্ছি না।

—একটু ওয়েট করতে হবে। আরো দু-তিনজন আছে। তারপর আপনি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখা করে তবেই যাব।

অপেক্ষা করতে থাকি। জামাই অধৈর্য হয়ে পড়ছে বোঝা যায। অবশেষে ডাক আসে। সাধন গুপ্তের মুখোমুখি।

—নমস্কার।

—হ্যাঁ, নমস্কার। বলুন। সব খুলে বলুন। কিছু লুকোবেন না। পরে যদি বুঝতে পারি, কোনো মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন, তবে কোনাদিন তাকে এই ঘরের চৌকাঠ পেরোতে দেব না—এটি মনে রাখবেন, কিছু মনে করবেন না। অনেক বয়স হয়েছে আমার, প্রথমেই বলে দেওয়া ভালো, মিথ্যাচার পছন্দ করি না। আমি ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বলি। জামাইয়ের সাথে পরিচয়ও করিয়ে দিই; আফটার অল ওর সাথেই এগ্রিমেন্ট।

খুব মন দিয়ে শুনলেন অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো। কী যেন ভাবলেন গালে হাত দিয়ে। তারপর বললেন, কিছু মনে করবেন না, শাস্ত্রে টা কথা আছে জন্ম থেকেই যদি কেউ অঙ্গহানির শিকার হয় তবে সেই লোক অন্যের বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়। এই যে কানা পটলা-র কথা বললেন, যা শুনে থাকি, এ অতিশয় বজ্জাত লোক। কখনো আমার সাথে বোঝাপড়া হয়নি। আমাকে বরাবরই এড়িয়ে গেছে। যাই হোক, দেখি কতদূর কি করা যায়। এই গণশা—সাধনবাবু হাঁক পাড়েন।

একটি ছেলে ঘরে ঢোকে।

—শোন্, হারান মিস্তির লেনে যে কানা পটলা থাকে, ওই যে প্রমোটারি করে, ওকে খবর দিয়ে আয়। না পেলে ওর বাড়ির লোককে বলে আসবি আমার সঙ্গে এসে যেন আজকেই সন্ধের পরে একবার দেখা করে। বলবি জরুরি।

সাধন গুপ্ত আমাদের দিকে ফেরেন। বলেন, আপনি একবার সামনের হপ্তায় আসুন। কথা বলে দেখি কানা পটলার সাথে। শুনে যা বুঝলাম মেইন ডিসপিউট হচ্ছে কুড়ি হাজাব টাকা নিয়ে। চল্লিশ্ দেবে কিন্তু বাকি কুড়ি দেবে না এই তো? টাকার অঙ্কে তো সামান্যই—তবে বোঝেন তো এরা ঠোকরাতে ভালোবাসে। যা পাওয়া যায়।

পরের সপ্তাহে আবার গেলাম সাধনবাবুর কাছে। এবারে আর জামাই সঙ্গে যায় নি।

আগের বারে যে ছেলেটি এগিয়ে এসেছিল, সেই আমাকে দেখে কিছু না বলেই দৌড়ে ভিতরে ঢুকে গেল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই ভালো খবর কিছু আছে।

বাইরে একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। যথারীতি ভিড়। ছেলেটি বাইরে এসে আমাকে ডাকল। সবাই আমাকে দেখছে। কেউকেটা ভাবছে। একটু গাম্ভীর্য নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

সাধনবাবু আমাকে দেখেই ভ্রু কোঁচকালেন। একটু যেন বিরক্ত। ছেলেটি চলে গেল।

—দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই। ভুল ইন্‌ফরমেশন আমি পছন্দ করি না। পটলা আমার কাছে এসেছিল, তার তো অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ড্যামারেজের ব্যাপারটা আপনি তো বলেন নি? ওতো অন্য পার্টিকে কম টাকায় ফ্ল্যাট বেচেছে। যা লস্ হয়েছে, সেটাই আপনার কাছ থেকে কেটে নেবে, এগ্রিমেন্টে তো সেই রকমই আছে। তাই-তো বলল। আপনি এসব তো আমায় বলেন নি?

—সাধনবাবু, আমার এতটা বয়স হয়েছে, আপনাকে মিথ্যে বলিনি। এই যে এগ্রিমেন্টের একটা কপি আপনার জন্যই এনেছিলাম। জানতাম্ পটলা আপনাকে মিস্‌গাইড করবে। একটু থেমে আবার বলি, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে পটলার কোনোও লস্ তো হয়ইনি উপরন্তু যাকে বেচেছে আমার ফ্ল্যাটটা তার সঙ্গে চার লাখ বিশ হাজারে এগ্রিমেন্ট করেছে। এখন কী জানেন, এটা তো আমি প্রমাণ করতে পারব না! কালোটাকার হিসেব কোথাও থাকে না।

সাধনবাবু একটা হাত গালে দিয়ে আমার কথা শুনছেন। আমি বলি,—আমার এগ্রিমেন্টটায় এ জায়গাটি পড়ে দেখুন। লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে রেখেছি। পরিষ্কার লেখা আছে, বায়ার পেলে পুরো টাকাই ফেরত দেবে।

—হুঁ, রেখে যান কাগজটা। পরে খুঁটিয়ে দেখব। একটা কাজ করতে হবে। আপনাদের দু'জনকেই একসঙ্গে এখানে আনতে হবে। এই গণশা—হাঁক পাড়েন সাধনবাবু।

—ই.... য়ে........স্....স্যা....... গণশা তোতলায়।

—বাঃ, তোকে পাঠিয়েই বা কি লাভ? তুই তো কোথাও কমপ্লিট্ করতে পারিস না। পার্টির হোলটাইমার করে হয়েছিস্ জানি না। আমার কপালেই সব জোটে। এক্ষুনি যা, কানা পটলাকে যে অবস্থায় পাবি সেই অবস্থায় ধরে নিয়ে আয়। বলবি আমি বসে আছি।

গণশা বেরিয়ে যায়। সাধনবাবু আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে পরের লোককে ভিতরে ডেকে নেয়।

গণশা সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে যায়, আমি সাধনবাবুর বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে থাকি।

পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে গণশা ফিরে আসে। একা, আমাকে নিয়ে আবার ঘরে ঢোকে।

—এ .... এ ...... ল ...না, লু...লুকিয়ে পড়েছে।

—কি করে বুঝলি? ধীরে ধীরে বল। তাহলে কথা আটকাবে না।

অনেক কষ্টে গণশা যা বলল, তা এরকম—গণশা গিয়ে ডাকতেই যথারীতি সেই কাজের লোকটি মুখ বাড়ায়। কোথা থেকে, কেন আসছে—জানতে চেয়েই বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য। খানিক বাদে মুখ বাড়িয়ে বলে যে পটলা বাড়িতে নেই।

গণশা তাকে আবার বলে যে কাউন্সিলার সাহেব ডাকছেন। কিন্তু তাতেও তার একই উত্তর। এমতাবস্থায় কী করতে হবে বুঝতে না পেরে গণশা ফিরে এসেছে।

—হুঁ, ব্যাপারটা গন্ডগোল ঠেকছে। যদি তার কিছু বলার থাকে, তবে সে এড়িয়ে যাচ্ছে। কেন? ইন্টারেস্টিং ব্যাপাব হচ্ছে, যখনই আপনার থাকাকালীন তাকে ডাকছি, সে আসছে না। অথচ তার সময়মতো সে এসেছে। অর্থাৎ সে আসবে কিন্তু, আপনি থাকলে আসবে না। নাহ্, দেখতে হচ্ছে। ভোগাবে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে ভূতনাথবাবু, আমাকে একটু সময় দিন, আমি দেখছি। আপনার বাড়ির লোকেশনটা গণশাকে একটু বুঝিয়ে দিন। এই অঞ্চলের সব ওর নখদর্পণে। একটু কথা আটকায় বটে, তবে ছেলে খুবই এফিসিয়েন্ট। আচ্ছা নমস্কার।

ভগ্নমনোরথ হয়ে বাড়ি ফিরে যাই। আবার সেই সান্ত্বনা দেবার পালা। আবার সেই দোষারোপ।

মেয়ে এবার শক থেরাপি আমার উপর প্রয়োগ করতে শুরু করে। থেকে থেকেই সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা। মাঝে মাঝে কান্না। বাবা হয়ে মেয়ের ইন্টারেস্ট দেখলাম না। যেন চল্লিশ হাজার নিয়ে এলে বাকি কুড়ির শোক আর থাকত না।

একটা কিছু করতেই হবে। যা পরিস্থিতি এখন, চল্লিশ ফেরত পাব কিনা সন্দেহ হচ্ছে। কানা পটলা যে এখনো ভীমকে দিয়ে বাড়িতে বোমা ফেলেনি এটুকুই যথেষ্ট।

এরপর কিছুদিন চলল লুকোচুরি খেলা। পটলাকে আর কিছুতেই সাধন গুপ্ত ধরতে পারে না।

অবশেষে একদিন পটলা নাকি সাধন গুপ্তের কাছে সারেন্ডার করে। আমি অবশ্যি পরে জানতে পারি।

সাধন গুপ্ত তখন রাগে ফুঁসছেন। এক সন্ধেয় পটলা এসে হাজির। বলে, দাদা, ক্ষমা করে দেবেন। আসতে ক'দিন দেরি হয়ে গেল। ব্যবসার কাজে বাইরে ছিলাম। একটা কথা বলব, যদি অনুমতি করেন। অনুমতি মেলে।

—বলছিলাম কি আমি তো নিয়মিত পার্টি ফান্ডে চাঁদা দিই। এ ব্যাপারটা থেকে যদি আপনি সরে দাঁড়াতেন,—মানে অনুরোধ আর কি।

—যদি না সরি?

—নাঃ, তাহলে আর কি—আপনি অঞ্চলের নেতা, যা বলবেন করব।

—বেশ। শুনে খুশি হলাম। ভদ্রলোকের টাকাটা ক্যাশ-এ দু-এক দিনের মধ্যে পারলে কালকেই দিয়ে দেবেন।

—অগত্যা। কিন্তু আমারও একটা শর্ত আছে। পুরো টাকাটা আমি দেব না। পাঁচ হাজার টাকা কম দেব। এটা আমার প্রেস্টিজ ইস্যু। আপনাকেও আমার এই কথাটা রাখতে হবে।

সাধন গুপ্ত বহুদর্শী মানুষ। বুঝলেন এটুকু কম্প্রোমাইজ না করলে পটলা ফসকে যেতে পারে। রাজি হলেন। এটুকু লস্ পার্টির হতেই পারে।

বললেন ঠিক আছে। আমি ভূতনাথবাবুকে ডেকে এটুকু মেনে নিতে অনুরোধ

করব। আশা করি, অসুবিধা হবে না। আপনি কাল বাদ দিয়ে পরশু সন্ধে সাতটা নাগাদ টাকাটা রেডি রাখবেন। ভূতনাথবাবু গিয়ে নিয়ে নেবেন। একটা কাঁচা রিসিটে সই করিয়ে নিতে পারেন মনে করলে। যদিও এর কোনো ভ্যালু নেই আইনের চোখে। আর হ্যাঁ, আর একটি কথা—সব কিছু ঠিক্‌ঠাক্ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য, আমার এই ছেলেটিকে দেখছেন, এর নাম গণশা এ ভূতনাথবাবুর সাথে যাবে। সাক্ষী থাকবে। আমাকে এসে রিপোর্ট দেবে। আমি কিন্তু চাই ঘটনাটা এখানেই শেষ হয়ে যাক্। —শেষের দিকে সাধন গুপ্তের কথায় প্রচ্ছন্ন সাবধানবাণী থাকে।

পটলা বিদায় নেয় খানিকটা হতাশ হয়ে।

বাড়িতে গণশা এসে খবর দেয়। দেখা করি সাধনবাবুর অফিস কাম বাড়িতে। সব বিস্তারিত বলেন।

—শুধু এটুকু দেখবেন, যাতে ওই পটলা হারামজাদা কোনো সুযোগ না পেয়ে যায়। সরি ফর দ্যা ল্যাঙ্গুয়েজ, কি করব বলুন, এ লাইনে একটু-আধটু গালিগালাজ করতেই হয়। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ — আমার ছাড় আছে, কি বলেন? মাথা গরম করবেন না। মনে করবেন, পাঁচ হাজার টাকা শেয়ারে লস করেছেন, কেমন? আর ভবিষ্যতে ফ্ল্যাট কেনার আগে দশবার ভাববেন, বিচক্ষণ লোকজনের পরামর্শ নেবেন। মনে রাখবেন, পটলার চেয়েও দুঁদে খচ্চর প্রমোটার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এদের সংখ্যাই বেশি। ঠিক আছে, তা হলে ওই কথাই রইল। আচ্ছা, নমস্কার।

মনে মনে ভাবি, এরকম নীল রক্তের মানুষ বড় কমে যাচ্ছে চারিদিকে। ভগবান, এদের টিকিয়ে রেখো!

শেষ পর্যন্ত সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গণশাকে নিয়ে পটলার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। মেয়ে একটু গাঁইগুঁই করছিল। চাইছিল যদি জামাইকে সঙ্গে নিই। বললাম, গণশা তো সঙ্গে আছে। চিন্তা কোরো না। পটলা আজকে আর ঝামেলা করতে সাহস পাবে না। আমিও টাকা হাতে পেলেই সটান বাড়ি ফিরে আসব। কতক্ষণের আর ব্যাপার? এই যাব এই আসব।

দুর্গা দুর্গা। বৌ দরজায় এসে দাঁড়ায়।

পটলার দরজাটা হাট করে খোলা। হাঁক দিই— পটলাবাবু আছেন?

উত্তর আসে, হ্যাঁ ভিতরে আসুন।

একটু অস্বস্তি হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। গণশা নির্ভীক। বলে, দাদা একটু তা-তা তাড়াতাড়ি করতে ব-বলেছেন।

পটলা গণশার আপাদ মস্তক একবার দেখে। মুখে দেখলেই বোঝা যায়, ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। সামনে টেবিলে রাখা ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে একটা কাগজ বার করে কী যেন দেখে।

ভলো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি, ওটা সেই এগ্রিমেন্ট ভাঙার এগ্রিমেন্টটা। পটলা কাগজটা আবার ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে রাখে। বলে, একটু বসুন। আসছি। ভিতরে চলে যায়, সম্ভবত টাকা আনতে।

আমার কী যে হয়ে যায় জানি না। স্লগ্ ওভারে জেতার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মরিয়া হয়ে, ব্রিফকেস থেকে এগ্রিমেন্টটা বার করে নিই এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সই-সাবুদের জায়গাটায় চলে আসি। সই করা জায়গাটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলি। টুকরোটা মুখে ফেলে চিবোতে থাকি। গণশা স্তম্ভিত হয়ে আমাকে দেখছে। এরপর কি হবে— তাই বোধ হয় ভাবছে! আমি ব্রিফকেসটা যথাস্থানে ঠেলে দিয়েছি, আগের অবস্থায়।

পটল ঢুকছে, হাতে টাকার বান্ডিল। বলল, গুনে নিন। পুরো পঞ্চান্ন আছে।

আমি টাকা নিয়ে গুনতে থাকি। গণশা হাঁ করে আমায় দেখছে। আমার প্ল্যান ধরতে পারছে না।

গোনা শেষে টাকাগুলো পকেটে চালান করে দিই। একটু হাসি-হাসি মুখ করে বলি, পটলবাবু, আর যে পাঁচ বাকি রইল ভাই? ওটাও যে এখনই দিতে হবে!

শীতল দৃষ্টি পটলার। শেষ ওভার। চালিয়ে খেলতে হবে। —যা কথা হয়েছিল, তাই দিয়েছি। আর কিছু দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি হাসছি, — সব কথা কি আগেই বলা যায়, পটলবাবু? একটু আগেই যে এগ্রিমেন্ট ভাঙার এগ্রিমেন্টটা দেখছিলেন, ওটা একবার বার করুন তো। দেখুন তো ওটা ঠিকঠাক আছে কিনা?

পটলা চমকে উঠে ব্রিফকেস খোলে। কাগজটা দ্রুত ওল্টায়।

এগ্রিমেন্টের আসল জায়গাটা খাবলা করে ছেঁড়া, অদৃশ্য। পটলার মুখের ভাব, ক্রোধে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করল। বুঝতে পারছে না পরের বল কেমন আসছে!

—পটলবাবু, দেখুন ভাই, আইন আপনি ভালোই বোঝেন। এই এগ্রিমেন্ট পেপারটা এখন মূল্যহীন। তার মানে জামাই-এর ফ্ল্যাটটা দ্বিতীয়বার বিক্রি করেছেন, অন্তত আইনের চোখে। আমরা যদি মামলা করি, অসুবিধায় পড়বেন। ফ্ল্যাট-টা থাকে বেচেছেন, সে পজেশন পাবে না, ইনজাংশন পেয়ে যাব। দেখুন ভাই, আমার কিছু খরচ হবে ঠিকই, কিন্তু আপনারও খরচ। আমাদের কাছ থেকে মেরে দেওয়া পাঁচ হাজারের ঢের বেশিই হবে বোধ করি। তাই বলছিলাম কি, বাকি পাঁচটাও নিয়েই আসুন। ঝামেলাটা বরং মিটেই যাক, কী বলেন?

পটলার চোখ সাপের মাথার মণির মতো জ্বলছে। ভাবছে বাইরের দরজায় কাছে খস্‌খস্ আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি দরজার ফ্রেমে দুটো হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে খুনে ভীম। প্রমাদ গুনি। নার্ভ হারালে চলবে না। আর একখানা উইকেট চাই। একখানা জুৎসই ইয়র্কার দিতে হবে। ভীম কোমরের কাছে হাত দিয়েছে। যন্ত্র বের করবে। গণশা বিস্ফরিত চোখে, নাটকের কুশীলবদের দেখেছে। শেষ বল করতে ছুটছি।

—পটলবাবু, উত্তেজিত হলে আপনারই ক্ষতি। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় জামাইকে থানার সামনের ফুটপাথে দাঁড়াতে বলেছি। এক ঘন্টার মধ্যে আমি যদি ফিরে না যাই, জামাই থানায় ঢুকে যাবে। জানি এটুকুই নয়। মেয়ে-বৌকেও বলা আছে, আমি না ফিরলে সোজা সাধন গুপ্তর কাছে চলে যাবার জন্য। ইতিমধ্যেই আধঘন্টা পেরিয়ে, গেছে। থানাও বেশ খানিকটা দূর। একটু তাড়াতাড়ি না করলে আবার পুলিশ এসে পড়বে যে ভাই। বেমালুম মিথ্যে বলি। পটলার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ভীম খুনে হলেও পরিস্থিতি বিচার করতে পারে। কোমরের যন্ত্র আর বের করতে হল না। দরজা ছেড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

—পটলার উইকেট ছিটকে গেছে। কানের মধ্যে অজস্র হাততালির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, অন্তরীক্ষ থেকে। জিতে গেছি। পটলা মাথা নিচু করে টাকা আনতে চলে গেল।

খানিক পরে একটা পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল এনে ছুঁড়ে ফেলল টেবিলের ওপর।

গণশা দেখছে আর দেখছে। হাঁ হয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে টাকাটা কুড়িয়ে নিযে মাথায় ঠেকাই। ম্যাচ জেতার শেষে বগলে স্মারক উইকেট নেওয়ার মতো করে টাকাটা পকেটে পুরে ফেলি।

খেলা শেষ। গণশা, আমার সিদ্ধিদাতা গণেশকে নিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে যাই, পটলার বাড়ি ছেড়ে।

পরে শুনেছিলাম, গণশার কাছে সব শুনে সাধন গুপ্ত অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। গণশাকে বলেছিলেন, ওফ্ দারুণ দিয়েছে তো! হাঃ হাঃ হাঃ, জয় বাবা ভূতনাথ!

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভূতনাথের উপাখ্যান শুনছিলাম। স্ত্রীও কখন পাশের সোফায় বসে গালে হাত দিযে গল্পে ডুবে গিয়েছিল।

—কি, কেমন লাগল? — ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেন। ওনার কাজ শেষ। একটা ময়লা কাপড়ে হাতের তেলের দাগ তুলছেন।

ভূতনাথ গলা ছেড়ে হাসছেন। সার্ভিস চার্জ হাতে তুলে দিই। নমস্কার জানিয়ে, ভূতনাথ নিচে নেমে যান।

বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে দেখি, ভূতনাথ সাইকেল চালিয়ে আস্তে আস্তে সামনের সরু রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। একটু পরে মোড় ঘুরেই মানুষটা চোখের আড়ালে চলে গেলেন। অসতর্ক ভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—জয় বাবা ভূতনাথ।

গল্প

মোহিনী

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

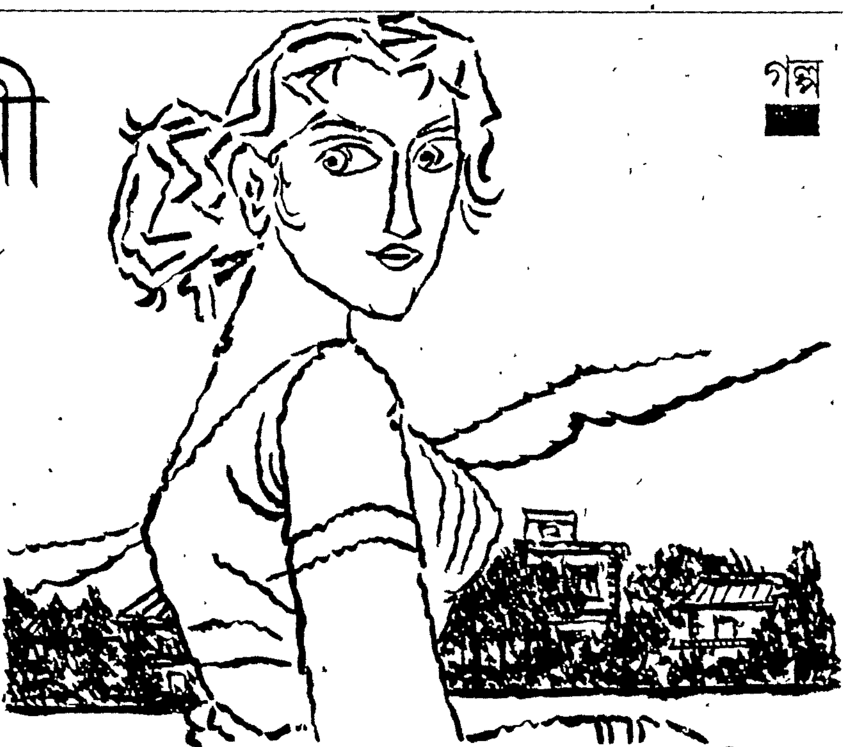

১৮০২ সনের বসন্তের প্যারিস। সোনালি রোদ্দুরে মোহময়ী শহরটা স্নান করছে যেন। খুব পাকা চোখের গোয়েন্দার পক্ষেও ধরা কঠিন হবে যে ন'-দশ বছর আগেও শহরটা নিত্যদিন স্নান করত রক্তে। বাগানে আবৃত রাস্তাগুলো আধুনিক শহরটাকে কেমন একটা গ্রামের শোভা অর্পণ করেছে। আর তার দু'পাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো ঘরবাড়িগুলো নীল আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মতো জ্বলজ্বল করছে।

এই দৃশ্য ক্রমাগত ঘাড় ঘুরিয়ে কি মাথা তুলে দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলেন এক প্রৌঢ় ইংরেজ। সদ্য ইংলিশ চ্যানেল পার করে প্যারিসে এসেছেন তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য নাকি প্যারিসের অপূর্ব হর্ম্যসমূহ দেখে বেড়ানো। তবে এ হল তাঁর ঘোষিত লক্ষ্য। তলে তলে এক অন্য গূঢ় উদ্দেশ্যও চালিত করছে তাঁকে। বুক পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বার করে সময় দেখলেন তিনি, তারপর হাতের ছড়ি তুলে বার দু'য়েক নেড়ে দাঁড় করালেন একটা ফিটন। আর চড়ে বসে হাঁক দিলেন, পার্ক নোইয়ি, সি ভু প্লে।

পার্ক নোইয়ির যে বাড়িটার দিকে ফিটন ছুটিয়ে এগোচ্ছিলেন ভদ্রলোক সে বাড়ির বসার ঘরে সেজেগুজে তৈরি হয়ে বসে আছেন এক পরমাসুন্দরী মহিলা। তিনি মধ্যবয়সী। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য রূপের এতটুকুও ম্লান হয় নি শরীরের কোথাও। তিনি জীবনে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষায় আছেন, আগন্তুক ইংরেজ প্রৌঢ়ের একটি সই সে বিবাহের পথের শেষ কাঁটাটুকু সরিয়ে দেবে।

ভদ্রমহিলার বই পড়ার অভ্যেস বিশেষ নেই, তবুও সময় কাটছে না দেখে সোফার পাশ থেকে একটা রোমান্টিক উপন্যাস তুলে নিয়ে আনমনে পাতা উল্টোতে শুরু করলেন। কিন্তু ওই পাতা উল্টানোই সার, মুদ্রিত হরফের কিছুই তাঁর মগজে বিঁধল না। তিনি খোলা বই চোখের সামনে মেলে তেইশ বছর আগের এক সন্ধের স্মৃতি ফরাসি ট্র্যাজি-কমেডি নাট্যের মতো ক্রমাগত ভাসতে দেখলেন সামনে। যেন গতকাল দেখা কমেদি ফ্রঁস্যাজের কোনো উপস্থাপনার কেন্দ্রীয় দৃশ্য।

ফিটনে চলতে চলতে ইংরেজ প্রৌঢ়ের চোখের সামনেও ভাসছে, হা ঈশ্বর, সেই একই সন্ধের প্রায় একই দৃশ্য। শুধু এখানে ওখানে বয়ানের হেরফের, প্রেক্ষিতের তারতম্য ভিন্ন হয়ে ধরা। প্রৌঢ়ের কথা ছিল প্যারিসের সরকারি ভবনগুলো দেখা, কিন্তু রাস্তার দু'পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সেসব ইমারতের ক'টাই বা তিনি দেখলেন। চোখের সামনে ভাসছে শুধু ১৭৭৮-এর ৮ ডিসেম্বরের সেই সন্ধে। কখন এক সময় পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছলেন জর্জ ফ্রঁসোয়া গ্রাণ্ড।

নিজের জীবন থেকে ভেসে ওঠা নাট্যদৃশ্য বিচলিত করেছিল নোয়েল ক্যাথারিন গ্রাণ্ডকেও। সারা প্যারিস যাঁকে এক ডাকে চেনে মাদাম গ্রাণ্ড বলে। আজকের সই সাবুদ চুকে গেলে অচিরে যিনি বিবাহসূত্রে সমাজ উত্তীর্ণ হবেন মাদাম দ্য তালেরঁ হিসেবে।

এক সময় রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন মাদাম গ্রাণ্ডও।

অশ্রুপাত সত্ত্বেও মিস্টার বা মিসেস গ্রাণ্ডের মনের কোণে দুঃখ বেদনার চেয়েও অন্য এক কষ্টই বেশি, ইংরেজ বা ফরাসি লেখকরা যাকে বর্ণনা করেন বিবেকের দংশন বলে। মিস্টার গ্রাণ্ডের কষ্টটা তাঁর পরিণীতা কিন্তু বহুকাল বিচ্ছিন্না স্ত্রীকে সই করে ডিভোর্স দেওয়ার কারণে নয়, কষ্টটা ওই সইয়ের বিনিময়ে মোটা টাকা হাতে নেওয়ার গ্লানির। এই গ্লানির স্বাদ তিনি তেইশ বছর আগেও একবার পেয়েছেন, যখন পরস্ত্রী-সঙ্গের খেসারৎ হিসেবে কলকাতার আদালতে ফিলিপ ফ্রান্সিস গুনে গুনে তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন নগদ পনেরো লক্ষ সিক্কা টাকা। এই টাকার অঙ্কটা নগরবাসীর মুখে মুখে ফিরে এক অতিরঞ্জিত, ফুলেল চেহারা ধারণ করেছিল। আসল অঙ্কটা কি সত্যিই এত নাটকীয় ছিল? তবে জর্জ ফ্রঁসোয়া গ্র্যাণ্ডের লুকোনো গ্লানিবোধটা কিন্তু একান্ত, ওঁর আশা ছিল দিনে দিনে বিচ্ছেদের ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি বোধও ক্ষয়ে ক্ষয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। দেখা গেল নগদ টাকা আর বিচ্ছেদ ব্যথাই দ্রুত কমে আসে, গ্লানিবোধ কালে কালে বাড়ে, দগদগে হয়।

নোইয়ির চোখ ধাঁধানো ড্রইংরুমে বসা মাদাম গ্রাণ্ডের মনে যে ভাবনাটা কামড় দিচ্ছিল তাকে কি অপরাধবোধ সঞ্জাত বলা যায়? মাদাম গ্রাণ্ড এই ধরনের প্রশ্নে সাধারণত খুব একটা মাথা ঘামানোয় অভ্যস্ত নন, এসবের সমাধান দেওয়ার জন্য তো বন্ধুবান্ধব থাকাই যথেষ্ট। উপরন্তু জীবন ও সমাজের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার কাজে পা ফস্কে দু'চার বার পড়াটা তো উত্থানের নিয়মের মধ্যেই আছে। আর সিঁড়ির কথা উঠলে মাদাম গ্রাণ্ডের কি না মনে পড়ে পারে সেই সন্ধের সিঁড়ি ও সাহেবকে?

কোচে নোইয়ির পথে যেতে যেতে জর্জ গ্রাণ্ডেরও চোখের সামনে ভাসছিল একটা সিঁড়ির দৃশ্য। সেই অবিস্মরণীয় রাতের সিঁড়িটা, যা বেয়ে ফিলিপ ফ্রান্সিস উঠে এসেছিলেন গ্রাণ্ডের ষোড়শী নবপরিণীতার ঘরে। আর তারপর থেকে জীবন আর জীবনের মতো থাকেনি, এক ধরনের জুয়োই হয়ে গেছে; হয় হারবে নয় জিতবে, কিন্তু খেলে যেতেই হবে।

আজকের সইসাবুদ শেষে যে অর্থাগম আছে

তাতে নতুন এক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছে গ্রাণ্ডের। ইংল্যাণ্ড ছেড়ে দূর বিদেশে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন।

মাদাম গ্রাণ্ডের স্বপ্নের স্বাধীনতা আছে। ফ্রান্সের ফার্স্ট কনসাল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বর্ণময় বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স তালেরঁর স্ত্রী হিসাবে পূর্ণ স্বীকৃতির স্বাধীনতা। মাদাম গ্রাণ্ডের মনে এখনো খচখচ করে তাঁর হবু স্বামীকে নেপোলিয়নের ভর্ৎসনা : মাদাম গ্রাণ্ড যখন আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নন তখন ওঁকে বাড়ির কর্ত্রী সাজিয়ে বাড়িতে পার্টি ডাকবেন না। ফ্রান্সের মন্ত্রীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এটা মেলে না।

নেপোলিয়নের কথাগুলো একটু বেশিই বিঁধেছিল মাদাম গ্রাণ্ডকে কারণ কিছুদিন যাবৎ প্যারিসের অভিজাত মহলে একটা বিদ্রূপ চালু হয়েছে যে, তালেরঁ প্রাসাদে মাদাম গ্রাণ্ড পার্টি ছোঁড়েন হবু বরকে খুশি করতে ততটা নয়, যতটা নেপোলিয়নের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

মাদাম গ্রাণ্ডের পক্ষে ভোলা সম্ভব হয়নি যে, ফ্রান্সের ফার্স্ট কনসাল নেপোলিয়ন সাধারণত মহিলাদের প্রতি ব্যবহার কোনো আদিখ্যেতার ধার ধারেন না; মান্য পুরুষের প্রতি তাঁর যে সৌজন্য ঠিক সেটাই তিনি প্রদর্শন করেন মহিলাদের প্রতি। মাদাম গ্রাণ্ডের অতুলনীয় রূপের কথা শুনে তিনি নাকি তাঁকে দেখার কৌতূহল ব্যক্ত করেছিলেন। অথচ সেই প্রথম সাক্ষাতেই কী যে ভীষণ একটা ফাজলামি আউড়ে দিলেন গ্রাণ্ড চালাকি ফাঁদতে তা আজও মনের মধ্যে কিরকির করে।

নেপোলিয়ন শুধু বলেছিলেন, মাদাম দ্য তালেরঁ হবার পর চেষ্টা করুন মাদাম গ্রাণ্ড হিসেবে আপনার ভুল ভ্রান্তিগুলো শুধরে ফেলতে। ফস্ করে তখন মাদাম গ্রাণ্ড বললেন,—যেমনটি আশা করা যায়, জোসেফিন করেছিলেন মাদাম বোনাপার্ট হয়ে।

নেপোলিয়নের চোখ দুটো শীতল পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। তারপর যে-কটি সান্ধ্য আসরে দেখা হয়েছে দু'জনের ফার্স্ট কনসালের দৃষ্টি ওঁকে ভেদ করে দূরে চলে গেছে। যেন মাদাম গ্রাণ্ড সেখানে নেই।

মহিলার আশা, একবার মাদাম দ্য তালেরঁ হয়ে গেলে শিষ্টাচার ও পদের সৌজন্যেও নেপোলিয়ন তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা কইতে বাধ্য হবেন। আর তখন...

মাদাম গ্রাণ্ড মনের চোখে দেখতে লাগলেন সেই সুদূর সন্ধ্যার সেই দৃশ্যটা..... দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ ইংরেজ ফিলিপ ফ্রান্সিস, সভায় উৎসবে নারীসমাজের হৃদয় উদ্বেল করা ফিলিপ ফ্রান্সিস, এই সেদিনও পার্টিতে যাঁর গলা জড়িয়ে নাচতে নাচতে মনে হল কী সুন্দরই না ছিল সেই আদিম যুগ যখন বিবাহ নামক সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হয়নি এবং সব নারীই ছিল সব পুরুষের সম্ভোগের উপকরণ, সেই ফিলিপ ফ্রান্সিস উঠে আসছেন ওঁর নিতান্ত সদ্যতরুণী কোলের লক্ষ্যে!

জর্জ ফ্রঁসোয়া গ্রাণ্ডের স্মৃতি যেন স্তব্ধ ঝড়। সন্ধেটাকে বহুকাল ধরে মনে হত ওঁর 'আমার প্রথম মৃত্যুর রাত'। গ্রাণ্ড মনের ভেতরের ঝড় থেকে সবে আসতে কোচের বাইরে চোখ চালিয়ে সেন নদীর জলে রোদ আর আকাশের প্রতিফলন দেখতে লাগলেন। কখন এক সময় হাত চলে গেল কোটের পকেটে আর মুঠোয় উঠে এল একরাশ কাগজ। গ্রাণ্ডের খুব ইচ্ছে তাঁর এই আত্মজীবনীর অংশবিশেষ পড়ে শোনান নোয়েল ক্যাথারিন..... থুড়ি, মাদাম গ্রাণ্ডকে। কে জানে, আজই হয়ত ওঁদের জীবনের শেষ সাক্ষাৎ। আর হাজার হোক এই রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে তো ওই সম্মোহিকাই। ওঁর সেই সুদীর্ঘ ঘন কেশ, মোহময়ী অক্ষি, ওষ্ঠ, গ্রীবা। চঞ্চল হাসি, উগ্র বক্ষ, নিতম্ব, গভীর যোনি।

কবে যে প্রকাশ হবে এই আত্মকথা গ্রাণ্ড জানেন না, তিনি স্মৃতি মলিন হয়ে পড়ার আগে সব লিখে রাখতে চান। আর চান একবার অন্তত এই অংশটুকু প্রাক্তন স্ত্রীকে পড়ে শোনাতে। তিনি হাতে ধরা রচনাটির একটি বিশেষ জায়গা খুঁজে বার করে সেখানে চোখ বুলোতে শুরু করলেন—

"১৭৭৮-এর ৮ ডিসেম্বর আমি সন্ধে ন'টা নাগাদ বাড়ির বাইরে যাই, যখন দুনিয়ার সব চেয়ে সুখী পুরুষ বলে জ্ঞান হচ্ছিল নিজেকে আর সেই রাত্রেই—এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে—বাড়ি ফিরে এলাম জগতের সব চেয়ে বেদনার্ত, দুঃখী মানুষটি হয়ে। যখন বেরিয়েছি তখন মনের মধ্যে এই কৃতার্থ অনুভূতি—আহা, পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী এবং চরিত্রবতী কন্যাটিকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছি। সমাজে সর্বত্র আমাদের সম্মান করে, আমাদের সঙ্গ দাবী করে সবাই। সমাজের সেরাদের মধ্যে বাস আমাদের, সমাজের আরো উঁচুতে ওঠার সিঁড়ি পায়ের গোড়ায়।

এই সব ভাবনাই মাথার মধ্যে খেলছিল যখন মিস্টার বারওয়েলের বাড়ির ভোজে বসেছি। ভদ্রলোক আমার হিতকারী বন্ধু, তাঁর বাড়ির ভোজে শহরের তাবড় তাবড় মানুষজন প্রফুল্লচিত্তে আসীন। যখন জীবনের সব চেয়ে মর্মান্তিক, কঠিন আঘাতটা আছড়ে পড়ল আমার বুকে। তখনো খাবার তোলা হয়নি মুখে যখন মিসেস গ্রাণ্ডের এক খাস চাকর এসে কানে ফিসফিস করে খবর দিল যে ফ্রান্সিস সাহেব ধরা পড়েছেন আমার বাড়িতে, আর আমার জমাদার তাঁকে আটকে রেখেছে সেখানে।

আমি তৎক্ষণাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে ছাদের দিকে গেলাম, আর হৃদয়ের সব বেদনা অশ্রু হয়ে তীব্র বেগে ছুটে বেরুতে লাগল দু'চোখ বেয়ে। তারপর সেখানে উপস্থিত এক বন্ধুকে অনুরোধ করলাম আমার সঙ্গে যেতে। কিন্তু সে বেচারি হয় ধূর্তের পদমর্যাদার কথা ভেবে কিংবা জমে ওঠা পার্টির আকর্ষণে খুব বিনীত ভাবে, না অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে গেল। আমি তখন আর কারো তোয়াক্কা না করে একাই এগোলাম বাড়ির পথে। শুধু রাস্তায় পড়ল বলে ঢুঁ মারলাম ওয়ারেন হেস্টিংসের সচিব মেজর পামারের বাড়িতে। ওঁর থেকে চেয়ে নিলাম একটা প্রমাণ সাইজের তরোয়াল, যা দিয়ে ঘটনার শেষ দেখার আশঙ্কা আমার তখন। একজন কেউ মাটিতে গড়িয়ে না পড়া অবধি এ তরোয়াল আমি খাপে গুঁজব না।"

।। ২ ।।

জর্জ গ্রাণ্ড পড়া শেষ করতে মাদাম গ্রাণ্ড চোখ তুলে তাঁর স্বল্পকালের স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু জর্জ, আমার পাপ তো আমি স্বীকারই করেছিলাম। তোমার পায়ে ধরে বলেছিলাম, 'আমায় রাখো আমায় ছেড়ে যেও না।'

গ্রাণ্ড হাতের কাগজগুলোকে আনমনে সাজাতে সাজাতে বললেন, তখনো পর্যন্ত তোমার প্রতি ভালোবাসাটাই উগ্র ছিল, তোমার ভুবনমোহিনী রূপের মায়াপাশে সেভাবে জড়াইনি। তাই দুঃখে, অপমানে, অভিমানে ছেড়ে যেতে পেরেছিলাম। আরো কিছুদিন একসঙ্গে থাকা হলে মোহ জন্মাত, ছাড়া কষ্ট হত।

প্রাক্তন স্বামীর এই কথার কোনো মানে করে উঠতে পারলেন না মাদাম গ্রাণ্ড। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার কথাবার্তার কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না, জর্জ, তুমি বলতে চাইছ, ভালোবাসা থাকলেই ছেড়ে যাওয়া সম্ভব? নারী পুরুষের সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করে মোহবন্ধন?

গ্রাণ্ড মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ঠিক তাই।

—তাহলে কোন্ মুখে তুমি ফ্রান্সিসের টাকা হাতে নিয়েছিলে? ভালোবাসা?

—বিলক্ষণ। ভালোবাসা ছিল বলেই তো অত ঘৃণা জন্মাল। আর ঘৃণা না থাকলে ওই লম্পটটার পয়সায় হাত দিতে পারতাম?

মাদাম গ্রাণ্ড ইতিপূর্বে প্যারিসের সেরা বাকচতুর পুরুষদের মুখেও এমন কথাবার্তা শোনেননি। তিনি মনের মধ্যে রীতিমতো আকাশ-পাতাল করছিলেন প্রৌঢ় স্বামীটার কথার খোঁচ ধরার জন্য।

শেষে কিছুটা ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের সুরে বললেন, আর এই তেইশ বছর পর যে একটা সই বিক্রি করে টাকা নিতে চলেছ এও কি ভালোবাসার সুদূর প্রতিক্রিয়ায়?

গ্রাণ্ড ম্লান ভাবে হাসলেন,—ভালোবাসার আর তুমি কী জান, নোয়েল? তোমার রূপের মধুভাণ্ডে শুধু মৌমাছির আনাগোনা। ভালোবাসা না থাকলে

আজকের মতো এতখানি বজ্জাত হতে পারতাম আমি? তরোয়াল নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন ফ্রান্সিসকে কোপাব বলে। এসে দেখলাম ফ্রান্সিস খিঁচে পালিয়েছে, আমার লোকজন বেঁধে রেখেছে শী-কে। শী-কে খুন করে আর কী করতাম? তাই ফ্রান্সিসকে ডুয়েলে আহ্বান করেছিলাম ক' দিন বাদে, হাতে মারব বলে। ও সাড়া দেয়নি। তাই কোর্টে গেলাম ভাতে মারব বলে।

হাতের পানীয়ে একটা ত্বরিৎ চুমুক দিয়ে দপ্ করে জ্বলে উঠলেন যেন মাদাম গ্রাণ্ড,—আর কোর্টে গিয়ে স্ত্রীর কেচ্ছাকে জগৎময় করলে।

—অবশ্যই। তবে ওই কেচ্ছা উদঘাটনের ফাঁকে ফাঁকে আমি কিন্তু সারাক্ষণ বলে গেছি, আমার বউটা ছেলেমানুষ, ওর দোষ দেখি না। বদমাইশ আসলে ফ্রান্সিস।

—আমার দোষ দেখোনি, অথচ ফিরিয়েও নাওনি।

—বললাম না, ভালোবাসায় ক্ষমা নেই!

—কী আছে তাহলে ভালোবাসায়?

জর্জ গ্রাণ্ড এক ঢোঁক ওয়াইন খেয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, খুন।

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলেন মঁসিয়ুর দ্য তালের্ঁ, তাঁর সঙ্গে একজন উকিল এবং দপ্তরি। অভিবাদন শেষে তালের্ঁ বললেন, আমার তাড়া আছে, কাউন্সিলের মিটিং আছে। সইয়ের পর্ব শেষ হলে এই ছোট্ট থলেটা আপনি নিয়ে যাবেন। এতে এক লক্ষ ফ্রাঁ আছে। এতে আপনার বাকি জীবন চলে যাওয়া কঠিন, তবে বুদ্ধিমতো কাজে লাগালে একটা স্থায়ী রোজগারের বন্দোবস্ত হতে পারে।

তালের্ঁ-র বাঁকা কথার একটা বাঁকা উত্তর উদ্ভাবন করলেন গ্রাণ্ড,—আমার বন্ধু, বেঙ্গল সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক স্যার ইলাইজা ইম্পের প্রচুর টাকা ছিল ফরাসি ব্যাঙ্কে। বিপ্লবের তোড়ে সে সবের কী দশা হয়েছে তা তো সবাই দেখতেই পাচ্ছি। এই মুহূর্তে টাকার খোঁজে স্যার ইলাইজা প্যারিসে। এরপরও আপনি টাকা রেখে সুদ তোলার কথা বলবেন?

তালের্ঁ কিছুটা অপ্রস্তুত এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, মিস্টার গ্রাণ্ডের দেখছি টাকা সংগ্রহেই যা প্রতিভা, বিনিয়োগ নয়?

গ্রাণ্ডও ছাড়ার পাত্র নন, বললেন, অধমের মন্দ কপাল, নিজের স্ত্রীধনটিকেই মূলধন করে চলতে হল।

তালের্ঁ হাতের ছড়িটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, কিন্তু এই শেষ। এক লক্ষ ফ্রাঁ নিয়ে আপনি বিদেয় হবেন আর কোনোদিনও আপনার ছায়া আমি দেখতে চাই না ...

গ্রাণ্ড কথা জোগালেন তালের্ঁকে,—কোথায়? প্যারিসে?

তালের্ঁ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভাবী স্ত্রীর গালে একটা চুম্বন দিয়ে একটা চাপা 'আদিউ।' বলে গট গট করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কিছু বাদে সইয়ের কাজ শেষ করে উকিল ও দপ্তরিও চলে গেল। গ্রাণ্ড ডেক্যান্টার থেকে নিজের ও প্রাক্তন স্ত্রীর গেলাসে পানীয় ঢেলে নিজের পাত্রটি শূন্যে তুলে চিয়র্স করলেন, হিয়ার্স টু মাই ওয়াস ডিয়ার ওয়াইফস লাভলাইফ। একদা প্রিয় স্ত্রীর প্রেমজীবনের শুভ কামনায়।

জানলা দিয়ে রোদ এসে ভাসাচ্ছিল ঘরটাকে, তবু গ্রাণ্ডের এই উচ্ছ্বাসের টোস্টিঙের পর ঘরের মেজাজটা কিরকম নিবু-নিবু হয়ে গেল। মাদাম গ্রাণ্ড হাতের গেলাস ঠোঁটে ঈষৎ ছুঁইয়ে উদাস চোখে জানলার ওপাশে গাছের সমারোহ দেখতে লাগলেন। মিস্টার গ্রাণ্ডও কিছুটা উদাস ভাবে দেখতে লাগলেন তাঁর তেইশ বছর আগে ছেড়ে আসা স্ত্রীকে।

মাদাম গ্রাণ্ড ভাবছিলেন, ওই গাছগুলো কত প্রাচীন, অথচ কত সবুজ। গ্রাণ্ড দেখছিলেন তাঁর চল্লিশ ছুঁই ছুঁই প্রাক্তনাকে। অবাক হচ্ছিলেন ওঁর অপূর্ব চুলের সেই গড়নে, ওঁর সারা শরীরের প্রলম্বিত যৌবনে, সেই দেহের প্রায় নিখুঁত সৌন্দর্যে। যে সব রূপ সৃষ্টিই হয় বিচ্ছেদ, দুঃখ, ট্যাজেডির জন্যই। অসাধারণ রূপ নাকি অসাধারণ ট্র্যাজেডির ভিত্তিভূমি। হঠাৎ কেনই যেন গ্রাণ্ডের মনে হল নোয়েল ক্যাথরিন আরো অনেক ওপরে উঠবে, আরো অনেক নিচে পড়ার জন্য।

ঠিক তখন মাদাম গ্রাণ্ড কথায় ফিরে এলেন। বললেন, এই টাকা দিয়ে তুমি কী করবে, জর্জ?

ওঁর ভাবনার মধ্যে হোঁচট খেলেন গ্রাণ্ড। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, সেভাবে এখনো ঠিক ভাবিনি। ইচ্ছে আছে ফের ভারতের আশপাশে কোনো দ্বীপে চলে যাব। ধরা যাক মরিশাস। কিংবা ধরো ভারতের করোমণ্ডেল তট, সেখানকার এ্যানকেবার-এ তোমার জন্ম।

মাদাম গ্রাণ্ড অস্ফুটে বললেন, হাঁ।

গ্রাণ্ড বললেন; তাহলে দ্যাখো জীবন সত্যিই কী অদ্ভুত। করোমণ্ডেলের ওলন্দাজ উপনিবেশে জন্মে আজ তুমি প্যারিসের সেরা সমাজে। আর পড়াশুনো করে কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিলাম ভারতে। আর আমি ইংল্যাণ্ডে বিতাড়িত ফরাসি পরিবারে জন্মে, সুইট্জারল্যাণ্ডে লোজান-এ পড়াশুনো করে কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিলাম ভারতে। আর আজ সেই ভারতেই ফিরে যেতে চাইছি স্বাধীনতার লোভে। কী বলবে একে? নিয়তি?

মাদাম গ্রাণ্ড আস্তে করে বললেন, ট্র্যাজেডি।

গ্রাণ্ড মাথা নাড়লেন। না, ভুল করলে নোয়েল। আমি কিছুই উঠিনি জীবনে যে ট্র্যাজেডির পাত্র হব। ট্র্যাজেডির পাত্রী হতে পারতে তুমি....

মাদাম গ্রাণ্ড কথার মধ্যে ঢুকে পড়লেন,—দোহাই তোমর জর্জ! দয়া করে আর ট্র্যাজেডির কথা বলো না, ওসব ফরাসি নাটকে দেখতেই খুব ভালো লাগে। আপাতত আমি জীবনটাকে রূপকথার মতো সাজিয়ে তুলতে চাই। আর সে জন্য. . .

—প্রয়োজনীয় সইটা আমি করেই দিয়েছি, বললেন গ্রাণ্ড। কি, তাতেও ট্র্যাজেডি দূরে সরে যায় না, নোয়েল?

—কেন? কী ছিলাম আমি, আর কোথায় এসেছি। এ সব, তুমি বলতে চাও, একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে?

—যাবে না, মিথ্যে হয়েই আছে। কারণ এ সবই তো টাকা নামক সোনার মোহরগুলোর বিচ্ছুরণ। আর টাকা, জেনো নোয়েল, হল পুরুষশক্তি। টাকা কথা বলে এটা সত্যি। কিন্তু টাকা কথা বলে পুরুষের কণ্ঠস্বরে। নারীর হাতে টাকা খুব আক্ষরিক ভাবে টাকা। তা বাড়িঘর, জমি-জায়গা, বসন-ভূষণ, সুগন্ধী, খাদ্য, ভ্রমণ-বিলাস কেনে। পুরুষের হাতে টাকা কিন্তু নারীকে কেনে, তার যৌনতা কেনে, নিজের সমাজ-মর্যাদা কেনে, সম্ভ্রম, স্বীকৃতি, আনুগত্য প্রভুত্ব ..বস্তুত সমস্ত সম্ভাবনাকেই কেনে। আমার হাতে এই যে টাকা দিয়ে গেলেন প্রিন্স তালের্ঁ, এ আসলে মূল্য; আমার নিচ, হীন দাবীর জোগান নয়, তোমার মূল্য। তোমার রূপ-যৌবন, দেহ-যৌনতা, সঙ্গসুখ, আনুগত্য, ছলকলা, দাসীত্বের মূল্য!

হঠাৎ করে ঘরে এক নিষ্ঠুর নৈঃশব্দা ভর করল। টাকার ভেলভেটের থলেটা কয়েক বার ঝাঁকিয়ে সেটির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গ্রাণ্ড। এই প্রৌঢ়ত্বেও টাকা জিনিসটা তাঁকে সেই পূর্বের মতোই মুগ্ধ, বিস্মিত করে। মনের কোথায় যেন একটা সন্দেহও রচনা করে।

মাদাম গ্রাণ্ডও এক অবাক চোখে দেখছিলেন জর্জের হাতে-ধরা থলেটা। এ জীবনে তাঁরও কিছু কম দেখা হয়নি টাকা। টাকায় যে কত কিছু হয় তা দেখা গেছে; কিন্তু টাকায় যে কত কিছু হয় না... অন্তত তাঁর জীবনে হল না, তাও একটু একটু করে দেখছেন মাদাম গ্রাণ্ড। তাঁর লোকসমাদৃত রূপসী শরীরের সঙ্গে ছায়ার মতো জড়িয়ে আছে লোকনিন্দা। এই সেদিনও তালের্ঁ-র প্রাসাদে পানভোজের আসরে উপস্থিত হয়েও ইংরেজ সাংবাদিক তাঁর পত্রিকায় লিখলেন, ইনি কে বটে? আশ্চর্য সুন্দরী তিনি অবশ্যই, কিন্তু কোনো এক ইংরেজের গৃহিণী প্রিন্স তালের্ঁ-র ভোজে গৃহকর্ত্রী হন কোন্ জাদুতে? ইঙ্গ-ফরাসী কূটনীতি কি এতদূর গড়িয়েছে? সংবাদটা পড়ে তেলেবেগুনে জ্বলে

উঠেছিলেন নেপোলিয়ন। তালের্ঁকে ডেকে কাগজটা ওঁর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিলেন, আর কত লোক হাসাবেন মশাই? ইংরেজরা সাধে আমাদের গাল পাড়ে। কাউকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে পড়ে দেখুন আপনারা, আমার সব সম্মানিত মন্ত্রীরা, কোথায় এনে ফেলেছেন ফ্রান্সের সুনাম।

সেদিনই তালের্ঁ বাড়ি ফিরে বলেছিলেন মাদাম গ্রাণ্ডকে,—এর পর যে পার্টি হবে এ বাড়িতে সেদিন আর কেউ তোমাকে কোনো এক ইংরেজের বর্জিতা স্ত্রী বলবে না, বলবে মাদাম দ্য তালের্ঁ।

তবুও তো প্যারিসের উচ্চ সমাজে কম টীকা-টীপ্পনি চলে না তালের্ঁ আর তাঁর প্রাচ্যসুন্দরীকে নিয়ে। জর্জ গ্রাণ্ড ঠিকই বলেছে যে টাকা দিয়ে পুরুষ অনেক কিছুই পায়, নারীর হাতে টাকার সেই ধার নেই। নাহলে মাদাম রেকামিয়ে, মাদাম তার্লিয়ঁ, মাদাম দ্য বোয়ারনে কি মাদাম রেমুজা-র মতো পারীসুন্দরীদের রূপে যৌবনে টপকে গিয়েও ওঁদের ওই মর্যাদা কেন জোটে না ওঁর? কেন সেদিন ওঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে পার্টিতে বললেন মাদাম ফুশে যে, এখন মাদাম গ্রাণ্ডের দরকার কাউকে টাকা দিয়ে নিজের একটা আত্মজীবনী লেখানো? যা শুনে মাদাম রেনাল মন্তব্য করলেন, আরে বলো না শাস্তাল, সে বই তো বাজারে পড়তেই পাবে না। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উবে যাবে।

তাতে মাদাম গ্রাণ্ডের বিশ্বাস জন্মেছে যে টাকায় নাম, এমন কি সুনামও খুব সহজে কেনা যায়। কিন্তু টাকায় দুর্নাম ততটা ঘোচে না, বিশেষত নারীর কলঙ্ক। জর্জের কথায় এইমাত্র ওঁর সেই পুরনো ভয়টাই ফিরে এল। মাদাম গ্রাণ্ড ওঁর পানীয় শেষ করে প্রাক্তন স্বামীকে বললেন, জর্জ, আমাদের আর দেখা হবে না মনে হয়। এই টাকাগুলোকে ঠিক ঠিক কাজে লাগিও। তোমরা পুরুষরা তো স্বাধীনতাও কিনতে পারো টাকা দিয়ে, তাই না?

জর্জ ফ্রঁসোয়া গ্রাণ্ড টাকার থলেটা বিচ্ছিন্না স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তোমাকে ভালোবাসা দিয়ে বিবাহ করে অঙ্কশায়িনী করেছিলাম বহু বছর আগে। তখন তুমি ছিলে নোয়েল ক্যাথারিন ভের্লি। সদ্য ষোড়শী। নিষ্পাপ প্রভাতী পুষ্প। আজ তুমি বিশ্রুতা সুন্দরী মাদাম গ্রাণ্ড, বিকেলে ভোরের ফুল। বহুমূল্যা রত্না তুমি। এই এক লক্ষ ফ্রাঁ-র বিনিময়ে আমি তোমাকে শেষ বারের মতো সম্ভোগ করি এসো।

যখন সমস্ত বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে শুধু দীর্ঘ, প্রশস্ত কেশে গা জড়িয়ে মাদাম গ্রাণ্ড ওঁর সামনে দাঁড়ালেন, দশাসই প্রৌঢ় জর্জ ফাঁসোয়া গ্রাণ্ডের মনে হল, এক লক্ষ ফ্রাঁর বিনিময়ে এর চেয়ে কত বড় স্বাধীনতা আর একজন পুরুষ অর্জন করতে পারে?

নোয়েল ক্যাথারিনের গোটা শরীরটাই ভীষণ নতুন আর অচেনা ঠেকছিল গ্রাণ্ডের। এবং, সবকিছু জানা সত্ত্বেও, সেই প্রথম রাত্রের মতোই নিষ্পাপ পবিত্র। হঠাৎ এক সময়—নোয়েলের শরীরের উপর শায়িত অবস্থাতেই—মনে হল যৌনতা আসলে সময় ও স্মৃতি। দেহ বড় সংকীর্ণ অংশ তার।

যখন চলে আসছেন গ্রাণ্ড, নোয়েল ক্যাথারিন টাকার থলেটা ওঁর হাতে দিয়ে বললেন, এটা রাখো। তোমার দরকার হবে।

নোয়েলের ঠোঁটে একটা ভারী চুম্বন দিয়ে থলেটা ফিরিয়ে দিলেন ওঁকে গ্রাণ্ড। বললেন, না, ওটা হয়ত তোমারই বেশি প্রয়োজন হবে একদিন, প্রিয়ে। সাবধানে রেখো, তোমার রূপের মতো।

।। ৩ ।।

১১ ডিসেম্বর, ১৮৩৫। প্যারিসে অস্বাভাবিক শীত, শহরের সব গাছপালা পাতা ঝরিয়ে বিবর্ণ হয়ে ধূসর আকাশের পটভূমিতে অগণিত কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে। মাঝেমধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ে শহরটাকে সাদা করে তুলছে, রাস্তায় রাস্তায় কাফেতে কাফেতে কথা উঠছে, আর বারের মতো এবারও ব্লঁ নোয়েল বা হোয়াইট ক্রিসমাস অর্থাৎ শ্বেত ক্রিসমাস হবে।

রু দ্য লিল-এ ওঁর বাড়িতে তখন আরেক নোয়েল—নোয়েল কাতরিন দা তালের্ঁ—মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তাঁর চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ শরীরটা আর কোনো নতুন ভোর দেখবে বলে মনে হয় না। তিনি তবুও মাথা তুলে অদূরে বয়ে যাওয়া স্যেন নদীর দিকে চাইলেন, দেখলেন পাতাঝরানো গাছপালার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটাও কিরকম নিষ্প্রাণ। গতকাল অবধি মাদাম দ্য তালের্ঁ-র আশা ছিল তাঁর কর্তা প্রিন্স আলের্ঁ তাঁকে অন্তত শেষ দেখা একবার দেখতে আসবেন। সে আশাও আজ মিলিয়ে গেছে। অবাক লাগে ভাবতে যে সেই ১৮৪৫-এ ছাড়াছাড়ি হবার পর ভদ্রলোক একবারও উদ্যোগ নিলেন না স্ত্রীকে দেখার।

প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হত মাদামের। মাত্র পনেরো বছরেই সব রস, সব সুখ নিঃশেষ হয়ে গেল। স্ত্রীকে বাৎসরিক ষাট হাজার ফ্রাঁ ভাতা দিয়ে লণ্ডনেও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তালের্ঁ। তখন একদিন উৎকণ্ঠায়, নিঃসঙ্গতায় ক্লান্ত মাদাম স্বয়ং ডিউক অফ ওয়েলিংটনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন—হে মান্যবর, আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ রদ করুন।

এরপর ফ্রান্সে ফেরা হল ঠিকই মাদামের। কিন্তু কর্তার সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা হল না। প্রথমে উঠলেন ওতেইয়ে, পরে সরে এলেন রু দ্য লিল-এ, নদীর পাড়ে। আর একটু একটু করে কেটে গেল আরো তিনটি বছর।

হঠাৎ খুব কাশির দমক উঠল মাদাম দ্য তালের্ঁ-র। সেটা সামলে উনি ঘণ্টা নেড়ে ডাকলেন চেম্বারমেড কোলেৎকে। সে আসতে মাদাম বললেন, কোলেৎ, আমায় ধরে একটু আয়নাটার সামনে দাঁড় করিয়ে দে তো।

কোলেৎ হাঁ হাঁ করে উঠল, কী বলছেন কী মাদাম? আপনার এই শরীরে আপনি খাট থেকে নামবেন?

মাদাম হাসলেন,—আরে পাগলি, নরকে নামার আগে একবার বিছানা থেকে নামব না?

কোলেৎ চটে গিয়ে বলল, কে বলেছে আপনি নরকে যাবেন? সে আপনার ওই পতি পরম গুরু তালের্ঁ সাহেব যাবেন। আপনার জন্য স্বর্গ বাঁধা।

মাদাম ফের হাসলেন,—বলছিস? তো তার আগে একবারটি দেখা না কী চেহারায় সেখানে উঠছি?

কোলেৎ তাঁকে ধরে আয়নার সামনে দাঁড় করাতে মাদাম বললেন, এবার তুই যা।

কোলেৎ অবাক না হয়ে পারে? বলল, সে কী। তিনদিন আপনি মুখে একটা গ্রাস তুলতে পারেননি। আর এখন এই জ্বরো শরীরে একা একা ঘোরাঘুরি করবেন?

মাদাম একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললেন, মেলা বকিসনি, কোলেৎ। আমার ঘোরাঘুরির দিন শেষ। এখন শুধু দেহটা ছেড়ে পাড়ি দেওয়া। আমাকে একটু একলা থাকতে দে, কোলেৎ।

কোলেৎ চলে গিয়ে দরজা টেনে দিতে বৃদ্ধা মাদাম খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন দেওয়ালজোড়া আয়নার সামনে। খুব কাছ থেকে নিজের চোখ মুখ নাক সব খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর একটা একটা করে গায়ের পোশাক খুলে খুলে মাটিতে ফেললেন।

অবশেষে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ালেন বৃদ্ধা ভেনাস। সময় সব রূপ, সব যৌবন হরণ করে নেবার পর যা টিকে আছে তা দেখে হাসি পেল মাদাম দ্য তালের্ঁ-র। তিনি জোরে রিণরিনে গলায় হাসতে হাসতে বসে পড়লেন মাটিতে, আর তার পরেও সমানে হাসতে হাসতে এক সময় কাঁদতে শুরু করলেন।

ওঁর মনে পড়ল প্রথম স্বামী জর্জ ফ্রাঁসোয়া গ্রাণ্ডের সেই সাক্ষাতের একটা কথা। ভালোবাসা থাকলেই ছেড়ে যাওয়া যায়, পুরুষের পথ রোধ করে মোহপাশ।

মাদাম চোখ তুলে আয়নায় নিজেকে দেখলেন আর অবাক হলেন—এই সেই মোহপাশ।

মাদাম তালের্ঁ-র মনে পড়ল ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার দশ বছর পর স্বামী তালের্ঁ কী বলেছিলেন ওঁর স্মৃতি রচয়িতা কোলমাশকে। বলেছিলেন, মাদাম তালের্ঁ-র প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ খুব শীঘ্রই নিভে গিয়েছিল, কারণ ওঁর দখলে ছিল শুধু রূপ। এই ধরনের আকর্ষণের প্রভাব তো খুবই সীমিত।

প্রেম বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই ক্রমাগত ঔৎসুক্য ও কৌতূহল সঞ্চার করে যাওয়া একে অন্যের মধ্যে। আর তাঁর সঙ্গে যদি বুদ্ধিবৃত্তি যোগ করা যায় তাহলে প্রেমের টান বেড়ে যায় দশগুণ।

কোলমাশের সেই রচনা পড়ে উচ্চৈস্বরে হেসেছিলেন সেদিন মাদাম তালের্ঁ। হায়। হায়। তালের্ঁর আর প্রেম।

তালের্ঁ আর ক্ষমতা বললে ঢের মানাত। বা তালের্ঁর আর অর্থ। বা তালের্ঁর আর রূপযৌবন বিলাস।

যদি রূপের চেয়েও বড় আকর্ষণ ছিল মেধা তাহলে মাদাম রেকামিয়ে-কে ছেড়ে মাদাম গ্রাণ্ডের কাছে কেন ছুটে এসেছিলেন তালের্ঁ? যদি রূপের নেশা মিটে যেতেই নোয়েল কাতরিনকে এত ভার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকের তাহলে তাঁর জায়গায় এক মহিলা ও তাঁর সুন্দরী তরুণী কন্যাকে এনে তুললেন কেন নৌইয়ির প্রাসাদে? জীবনে কিছু কম বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়নি মানুষটাকে ঠিকই, কিন্তু তাতে কি গভীর কোনো শিক্ষা ওঁর হয়েছিল?

তবু, তবু...... তালের্ঁকে দোষ দেওয়া যায় না। মাদাম তালের্ঁ ছিলেন মূর্তিমতী বিড়ম্বনা ওঁর জীবনে। ঠিকই, আমি ছিলাম বুদ্ধি ও মেধার দিকে ওঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—ভাবলেন মাদাম তালের্ঁ, আমার জন্যে কিছুটা বিপর্যস্ত ছিলেন ভদ্রলোক প্যারিসের সমাজে।

হ্যাঁ, প্যারিসের সমাজ বটে। তুলনা করার মতো একটাও সুন্দরী ওঁর পাশে দাঁড় করাতে পারেনি শহরটা। তাই প্রতিশোধ নিয়েছে ওঁর কম বুদ্ধি নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে। শেষ অবধি মাদাম তালের্ঁ-র মোহপাশ থেকে প্রিন্স তালের্ঁ-কে মুক্ত করল কিন্তু সমাজের টীকা-টিপ্পনি, কুটকচালিই।

নাহলে প্রথম বিচ্ছেদের পর দীর্ঘদিন তালের্ঁ কিন্তু স্ত্রীর খোঁজ রেখে গেছেন নিয়মিত। যদি কখনো একটু হাঁচি কাশি সর্দি ধরল তো সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সুন্দর চিঠি এল কর্তার, কোলমাশের হাত বেয়ে। যদিও কর্তা স্বয়ং সুদূরই থেকে গেলেন একই শহরের এপাশ ওপাশে থেকেও। মাদাম তালের্ঁ তখন ওই সোন নদীর জলের দিকে চেয়ে বলতেন, এ তো সংকীর্ণ একটা নদী নয়, প্রান্তহীন সাগর, যা না পেরোতে পারি আমি, না পেরিয়ে আসেন তিনি।

অথচ কত সহজেই না হয়েছিল সেই প্রথম আলাপ। মাদাম গ্রাণ্ড সাময়িক বসবাসের জন্য এসেছিলেন ইংল্যাণ্ড থেকে প্যারিসে। ভারত ছাড়ার পর ইংল্যাণ্ডে নেহাৎ মন্দ যাচ্ছিল না মহিলার। সমস্যা হচ্ছিল একটাই—ওঁর অতীত নিয়ে লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় রসালাপ। তখন ভাবনা হয়েছিল জীবনের স্বাদ বদলানোর জন্য একটু বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে যাওয়ার। আর দেশটায় পা রেখেই দেশ আর মানুষগুলোর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন মাদাম গ্রাণ্ড। ফলে খেয়ালই ছিল না, কবে কোনদিন পাশপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। আর সেই পাসপোর্টের নবীকরনের জন্য একদিন গিয়ে বসতে হল বিদেশ মন্ত্রকের দপ্তরে মঁসিয়ুর দ্য তালের্ঁ-র সামনে।

এরপর যা ঘটার ছিল তাই ঘটল। কী যে হল ভদ্রলোকের আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি করে পাশপোর্টটা আর দিলেনই না। আর দিনের পর দিন গিয়ে গিয়ে এক সময় মাদাম গ্রাণ্ডও ভুলে গেলেন ঠিক কী দরকারে তিনি আদৌ এসেছিলেন।

ফের আয়নার দিকে মুখ তুলে নিজের দিকে তাকিয়ে মাদাম মনে মনে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সেটা কি প্রেম ছিল? নাকি মোহবন্ধনের প্রথম আভাস মাত্র।

মাদাম আস্তে আস্তে কার্পেট থেকে জামাকাপড়গুলো একে একে কুড়িয়ে নিয়ে পরলেন। তারপর পাশের ড্রেসিং টেবিলে বসে মন দিয়ে মুখটাকে প্রসাধনে সুন্দর করলেন। ঝরে যাওয়ার পরেও মাথায় কত যে চুল—তা দেখেও কিছুটা অবাক হলেন মাদাম। তারপর নিজের গয়নার আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের অনভ্যাসের ফলে মনে করতে পারলেন না ঠিক কোন চাবি দিয়ে খোলে সিন্দুকটা। তখন সেই রিণরিনে দুর্বল গলায় ডাকলেন, কোলেৎ। কোলেৎ।।

তাঁর লোকসমাদৃত রূপসী
শরীরের সঙ্গে ছায়ার মতো
জড়িয়ে আছে লোকনিন্দা।

কোলেৎ আসতে মাদাম বললেন, দ্যাখ তো কোলেৎ, কোন চাবিতে খোলে এটা।

কোলেৎ সিন্দুক খুলে দিতে গলার মুক্তোছড়াটা খুলে মেয়েটার গলায় পরিয়ে মাদাম বললেন, এটা তোকে দিলাম। সাবধানে রাখিস। যখন তোর এই চেহারা-টেহারা ফুরিয়ে যাবে, পুরুষরা আর উৎসাহ দেখাবে না, তখনো এর দাম পাবি।

কোলেৎ মুক্তোর মালা পরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে মাদাম বললেন, হাঁ করে কী দেখছিস? তোকেই তো দিলাম। এখন যা, গিয়ে পাদ্রিকে খবর দে। বল্ মাদাম তালের্ঁ-র আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, এক্ষুনি চলুন।

কোলেৎ চলে যেতে মাদাম সিন্দুক থেকে বার করলেন ওঁর গয়নার কাসকেট। ডালাটা খুলতে সারা ঘর ঝলমলিয়ে উঠল হিরে মুক্তো নীলা চুনি পান্নার কিরণে। চোখ দুটো ঝলসে গেল মাদামেরও। তিনি ডালাটা ফের নামিয়ে দিলেন কাসকেটের।

এরপর আরেকটা বাক্স নামালেন মাদাম। আস্তে করে সেটার ডালা তুলে বার করলেন দুটো চামড়ায় বাঁধানো উপন্যাস, প্যারিসে দেখা করতে এসে ফিলিপ ফ্রান্সিসের রেখে যাওয়া উপহার। মাদাম গ্রাণ্ড—তখনো মাদাম তালের্ঁ হননি—ওকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার ঔৎসুক্য বোধ করেন নি। কিন্তু ফ্রান্সিস নাছোড়, বার্তাবাহক মারফত জানালেন—সম্পর্কের তো আর কিছুই পড়ে নেই। আছে শুধু কিছু স্মৃতি। সেই স্মৃতির দাবীতে আর একটি বারও কি মুখোমুখি হওয়া যায় না?

মুখোমুখি হয়েও কথা প্রায় কিছুই হল না। মাদাম গ্রাণ্ড মাথা নিচু করে শুধু বলেছিলেন, লণ্ডনেও আমি আপনার ছায়া মাড়াইনি ফিলিপ। আমার কারণে আপনাকে অনেক খেসারৎ দিতে হয়েছে ভারতে। সে গ্লানির ছায়া আমি পড়তে দিতে চাইনি ইংলণ্ডে।

ফ্রান্সিস একটা জোরালো হাসি হেসে বললেন, দুর। দুর। ওই ঘটনা কি তার দু'বছর পর ওয়ারেন হেস্টিংসের আমার পিস্তল লড়াই, গুটিকয়েক লাইনের বেশি স্থান পায় নি আমার স্মৃতিকথায়। কিন্তু তোমার রূপ, তোমার সান্নিধ্য ঢের বেশি জায়গা করে নিয়েছে আমার হৃদয়াকাশে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাদাম গ্রাণ্ড তখন বলেছিলেন ঘরের জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে, সেজন্যই কি আমার সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি আপনার স্ত্রীর কাছে? সবই তাঁকে জানতে হল পত্র-পত্রিকার গুজব-কলম থেকে?

ফ্রান্সিস চুপ করে অনেকক্ষণ বসেছিলেন এরপর, আর শেষে উপন্যাস দুটো ওঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, পারলে পড়ো। তোমারই মতো দু'জন নারীর কাহিনী। বলা উচিত, যে কোনো নারীর কাহিনী। তোমার জীবনে যেটুকু দর্শন তাতে এর চেয়েও রহস্যময় একটা উপন্যাস গড়ে উঠতে পারে। আমাদের মধ্যে ওই ছোট্ট ঘটনাটুকু না থাকলে হয়ত আমিই লিখতাম। আপাতত দায়িত্বটা তোমারই রইল।

বলতে বলতে ফ্রান্সিসকে লেখা মাদাম গ্রাণ্ডের সেইসব প্রেমপত্রগুলোও মহিলার হাতে তুলে দিলেন ভদ্রলোক। বই আর চিঠিগুলো নিয়ে 'আদিউ।' বলার সৌজন্যটুকু দেখাননি মাদাম গ্রাণ্ড। ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর থেকে।

মাদাম তালের্ঁ এবার সন্তর্পণে বার করলেন আরো একটা বাক্স। সেটা খুলতে বেরিয়ে পড়ল ভেলভেটের একটা থলে। তাতে নগদ একলক্ষ ফ্রাঁ। তার শেষ সাক্ষাতে সঙ্গসুখের জন্য মূল্য ধরে দিয়ে

যাওয়া জর্জ ফ্রাঁসোয়া গ্রাণ্ডের টাকা। যা সে আয় করেছিল বিবাহ বিচ্ছেদে সই বিক্রি করে। মাদাম থলেটা খুলে সোনার মোহরগুলো দেখলেন! এতদিনে কতই না বদলে গেছে টাকার দাম। কে জানে, লোকটা শেষ অব্দি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বাকি জীবন কাটাল।

ঠিক তখন দরজায় আঘাত আর কোলেতের হাঁক,—মাদাম, বিশপকে এনেছি। ভেতরে আসতে পারি?

মাদাম বই, চিঠি, টাকার থলে সব ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দিলেন প্রকাণ্ড সাইজের গয়নার কাসকেটে। তারপর আলমারি ভেজিয়ে কাসকেটটা ধরে উঠলেন গিয়ে বিছানায়।

বিশপকে নিয়ে কোলেৎ ভেতরে ঢুকে দেখল, মাদাম গয়নার বাক্স আকড়ে শুয়ে আছেন বিছানায়। বিশপ গিয়ে মাদামের কপালে হাত রেখে আঁৎকে উঠলেন, এ কী! জ্বরে যে পুড়ে যাচ্ছে আপনার শরীর! আমাকে ডাকলে কেন কোলেৎ? যাও, শিগ্‌গির একজন ডাক্তারকে ডাকো।

ঘুমে জড়িয়ে আসছিল মাদাম তালের্ঁ-র চোখদুটো। তিনি হাত দিয়ে ঈশারা করে বোঝালেন, ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ফাদার, আমার সময় বড় কম। ডাক্তার ডেকে সময় নষ্ট করবেন না। আপনি আমার মাথার কাছে দাঁড়ান।

বিশপ কাস্তিনাক মাদাম তালের্ঁ-র মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মাদাম কাসকেটটা ওঁর হাতে দিয়ে বললেন, ফাদার, আমি জানি আমার মতো পাপীর জন্য স্বর্গের দরজা বন্ধ। স্বর্গের স্বপ্ন আমি দেখিও না ফাদার। সারা জীবন শরীরের রূপ আর এইসব ভূষণকেই মূল্যবান মনে করে এসেছি। এরকম মূর্খতার স্থান হওয়া উচিত নয় স্বর্গে। আমার এই শরীরটা এখন পোকামাকড়ের খাদ্য হবে। কিন্তু এই গয়নাগুলো আপনি চার্চের ভাণ্ডারে রাখুন। দেখুন যদি কিছু অসহায় নারী, পতিতা জীবনে বাধ্য নারীকে-সুস্থ জীবনে ফেরানো যায়।

বিশপ কাস্তিনাক কাসকেটটা নিয়ে বললেন, তাই হবে, মাদাম তালের্ঁ . . .

বিশপের কথার মধ্যে প্রতিবাদ করে উঠলেন বৃদ্ধা, মাদাম তালের্ঁ নন, মাদাম গ্রাণ্ড সি ভু প্লে। দেখবেন ফাদার, আমার-সমাধি ফলকে যেন পরিচয় লেখা হয়—নোয়েল ক্যাথরিন গ্রাণ্ড, জর্জ ফ্রঁসোয়া গ্রাণ্ডের বিধবা, যাঁকে সমাজ চিনেছিল প্রিন্সেস দ্য তালের্ঁ নামে।

হতভম্ব বিশপ কাস্তিনাক বললেন, তাহলে কি প্রিন্স তালের্ঁর সঙ্গে আপনার সম্পর্কের পরিচয়টা আপনি অস্বীকার করছেন, মাদাম?

মাদাম বললেন, ফাদার, ওটা তো পরিচয় মাত্র। কিন্তু আমার সত্তা তো কোনো পরিচয়ে বাঁধা নয়। এত কলঙ্ক, কুৎসা, কষ্ট দুঃখ বেদনা যে মাদাম গ্রাণ্ডকে ঘিরে, সেই মেয়েটিই তো শেষ পর্যন্ত আমি। অর্থ সম্পদ সম্মান—এত সব দিয়ে নিজেকে কি মুছে দেওয়া যায়, ফাদার?

মাদাম চোখ বুঁজলেন, একটা বড় ঘুম ভর করেছে ওঁর চোখদুটোয়। ওঁর ঘুমের ধরন দেখে ফাদার কাস্তিনাক বিড়বিড় করে লাতিনে মন্ত্র বলা শুরু করলেন। গলার ক্রুশটা নিয়ে ছোঁয়ালেন বৃদ্ধার সাদা কোঁকড়া চুলে ফ্রেম হওয়া মুখটায়। আর সেই মুখটা দেখতে দেখতে আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, আহা, কী পরমাশ্চর্য রূপ! মানুষের দেহে এতকাল বন্দী ছিল এই রূপ!

বিশপ কাস্তিনাক ও কোলেতের চোখের সামনে মৃত্যু এসে মাদামের দেহ থেকে মুক্ত করে দিল স্বর্গীয় রূপমাধুরীকে। তখন মাদামের দু'চোখের কোনায় ঝুলে থাকা দুটি অশ্রুবিন্দুকে মনে হল দুটি হিরের টুকরো, যাতে স্বর্গের আলো আর মর্ত্যের বেদনা বাঁধা পড়েছে।

তাঁর জীবনের শেষ ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে তখন মাদাম তালের্ঁ স্বপ্ন দেখছেন তাঁর প্রথম বিবাহের প্রথম রাতের সেই অলৌকিক মুহূর্তটিকে, যখন জর্জ ফ্রঁসোয়া গ্রাণ্ড ওঁর ষোড়শী শরীর থেকে একে একে সব বস্ত্র লুঠ করে নিচ্ছেন আর শেষ আবরণটুকু সরে যেতে লজ্জায়, রোমাঞ্চে সদ্যযুবতী ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছেন ঘরের একমাত্র মোমবাতিটা. . . . .

With Best Compliments From

A WELL WISHER

পত্রপাঠ লা-জবাব

পত্রপাঠের 'এ-পিঠ ও-পিঠ' আমি নুনু রায় না-না করিতে করিতে শেষ অবধি 'না-না' রায় হইয়াছি। আমার নামটি লইয়া বিস্তর গোল বাধিয়াছে।

আমার স্বীকার করিতে বাধা নাই যে এই গোলোযোগের নিমিত্ত আমিই। কিন্তু আপনার অপরাধও কিছু অংশে কম নাই। অধ্যাপনা করিতে করিতে নিশ্চিত সাফল্যের একশ শতাংশ গ্যারেন্টি যুক্ত কোচিংসেন্টার খুলিয়া মাসান্তে লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জনের সহজ রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া আপনি আসিয়াছেন পত্রপাঠের ন্যায় বংশদণ্ড আহ্বানকারী পত্রিকার সম্পদনা করিতে।

বোটানিকেল গার্ডেনের সেই বটবৃক্ষটির মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে, যাহাদের আদি ও অন্ত কিছুই নাই তথাপি সহস্রাধিক শাখা-প্রশাখা ও ঝুরি বিস্তার করিয়া নিজদিগকে বাংলা সাহিত্যের ধারক ও বাহক মনে করিতেছেন। সেই সব মেকি ও অন্তঃসারশূন্য প্রতিষ্ঠানের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া সাইপ্রাস তরুর মতো উদ্ধতশিরে পত্রপাঠ জ্বালাইতেছেন, মাপ করিবেন, চালাইতেছেন। আপনার কপালে যে কী আছে, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও হয়ত অনুমান করিতে ভয় পাইতেছেন।

নিজ কথায় আসা যাক। আমি যেইমাত্র জানিতে পারিলাম যে আমার নামটি অশ্লীল পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে তৎক্ষণাৎ আমার পরমপূজ্য পিতামাতার নিকট আসিয়া ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলাম। এবং আমার নামকরণ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিলাম। আমার কথা শুনিয়া পিতৃদেব সেই মুহূর্তে নির্বিকার রহিলেন। পরে আমার মাতৃদেবী মারফৎ জানাইয়া দিলেন যে আমি ইচ্ছা করিলে আমার নাম বদল করিতে পারি। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন তাঁহার নাম (আমার পিতৃদেবের) বা তাঁহার পিতার নাম বা তাঁহার পিতামহের নাম লইয়া আমি প্রশ্ন উথাপন করিয়া থাকি তাহা হইলে তিনি আমাকে তেজ্য পুত্র করিবেন। হায় হায়, সাহিত্য করিতে আসিয়া এ আমার কী হইল। পত্রপাঠে লেখা প্রকাশ পাইবামাত্র কতই না স্বপ্ন রচনা করিয়াছিলাম। ভবিষ্যতে পত্রপাঠের পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করিবার বাসনায় দিবারাত্রি মশগুল থাকিতাম। কিন্তু এ আমার কী দুরবস্থা হইল। এখন আমি শ্যাম রাখি না কুল রাখি?

উক্ত ঘটনায় আমার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। খড়্গপুর স্টেশনে পল্লিগ্রামের এক অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি প্রাতঃ কালে ট্রেন ধরিতে আসিয়া কাউণ্টারে 'চুলেশ্বর' যাইবার জন্য টিকিট চাহিলেন। বুকিং ক্লার্ক সমস্ত তালিকা ঘাঁটিয়া গলদঘর্ম হইয়া উক্ত স্টেশনের হদিশ না পাইলে, তিনি টিকিট না দিতে পারার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন সেই ব্যক্তি যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া মুখ ব্যাদান করিয়া বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম প্রাতঃকালে অশ্লীল কটু কথা মুখে আনিব না, তা আপনারা যখন কটুকথা ছাড়া বুঝিবেন না তখন বলিতে বাধ্য হইতেছি—দ্যান একখানা বালেশ্বরের টিকিট দ্যান।'

যদি কোনো স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠক আমার নামটি লইয়া অভিযোগ জানিতেন তাহা হইলে আমি তাচ্ছিল্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখি সমাজের বিদগ্ধজনেরা এইরূপ জ্ঞান প্রদর্শন করিতেছেন তখন সত্যই গভীর পরিতাপ হয়। 'নুনু' নামটি শুধু আমারই নহে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এবং বীরভূমে এটি একটি বহুল প্রচলিত নাম। পিতা-মাতা তাঁহাদের সন্তানদের এই নামে বহু আদর করিয়া ডাকিতে ডাকিতে দ্বিতীয় কোনো নামের কথা ভাবিতেও ভুলিয়া যান। কোনো অশ্লীলতা নহে, এই নামের মধ্যে আছে পবিত্র অপত্য স্নেহের নিদর্শন।

ভৌগোলিক অবস্থানগত বিচারে কত শব্দই যে আছে যাহা আমাদের কাছে অশ্লীল মনে হইলেও তাহা একটি নিরীহ শব্দ মাত্র। কথায় আছে "কোনো দেশের বুলি, কোনো দেশের গালি।"

শ্লীলতা ও অশ্লীলতার বিচারে আমার মনে হয় শব্দ নয়, শব্দ বা কথার মধ্যে নিহিত ইঙ্গিতটিই মুখ্য। যেমন, একজন যুবক তাঁহার পিতার কাছে এইডস্ রোগটি সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলেন যে ইহা এমন একটি মারণ ব্যাধি যাহা খুবই সংক্রামক। এবং ইহা মূলত যৌন সংসর্গ দ্বারাই সংক্রামিত হইয়া থাকে। বলিয়াই তিনি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি তোমার এইডস্ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের ঘরের পরিচারিকাটিরও এইডস্ হইবে। পরিচারিকাটির এইড্স হইলে আমার এইড্স্ হইবে। আমার এইড্স্ হইলে....

রসিকতাটি মুদ্রিত হরফে উদ্ধৃত করিতে বাধিতেছে, যদিও ইহার মধ্যে একটিও ক্ষুদ্রতম অশ্লীল শব্দ নাই। পাঠকমাত্রেই রসিকতাটির সঙ্গে সম্যক পরিচিত। এবার আপনারাই বিচার করুন। ইতি—

হতভাগ্য
নুনু রায়,
অদ্য হইতে ব্যথিত চিত্তে
না-না রায়।

সিল্ক স্ক্রিন, ফ্লেক্সো ও গ্রেভিয়ার-এর মাধ্যমে সমস্ত রকম পলিব্যাগ ছাপা হয়

M/s Prasanta Kumar Dutt
7, M.C Garden Road
Dumdum
Kolkata- 700 030
Contact Phone : 219-0522

ধারাবাহিক কবিতা

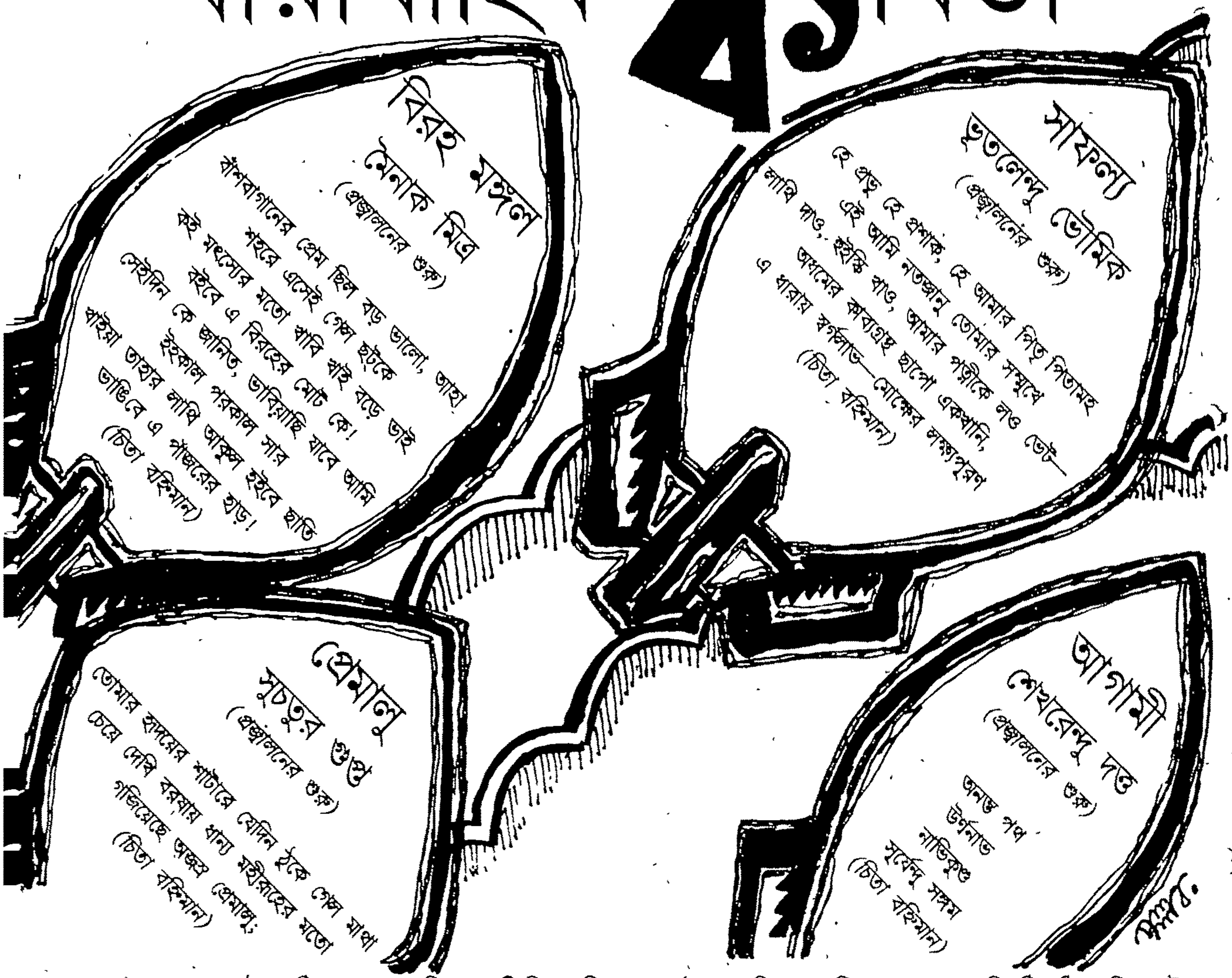

বিরহ মঙ্গল
মৈনাক মিত্র
(প্রজ্বালনের শুরু)

বাঁশবাগানের প্রেম ছিল বড় ভালো, আহা
শহরে এসেই গেল ছুটকে
কষ্ট মৎস্যের মতো খাবি খাই বড়ো ভাই
হইবে এ বিরহের শেষ কে!
সেইদিন কে জানিত, ভাবিয়াছি যাবে আমি
ইহকাল পরকাল সার
খাইয়া তাহার লাথি আকুল হইবে ছাতি
ভাঙিবে এ পাঁজরের হাড়!
(চিতা বহ্নিমান)

সাফল্য
ভূতলেন্দু ভৌমিক
(প্রজ্বালনের শুরু)

হে প্রভু হে প্রকাশক, হে আমার পিতৃ পিতামহ
এই আমি নতজানু তোমার সম্মুখে
লাথি দাও, ঝাঁটা দাও, আমার পত্নীকে লও ভেট—
অধমের কাব্যগ্রন্থ ছাপো একখানি,
এ ধারায় সর্বলাভ—মোক্ষের লক্ষ্যপূরণ
(চিতা বহ্নিমান)

প্রেমালু
সুচতুর গুপ্ত
(প্রজ্বালনের শুরু)

তোমার হৃদয়ের শাটারে যেদিন ঠুকে গেল মাথা
চেয়ে দেখি বরষায় ধান্য মহীরূহের মতো
গজিয়েছে অজস্র প্রেমালু:
(চিতা বহ্নিমান)

আগামী
শেখরেন্দু দত্ত
(প্রজ্বালনের শুরু)

অনন্ত পথ
উর্ণনাভ
নাভিকুণ্ড
সুর্যেন্দু সঙ্গম
(চিতা বহ্নিমান)

সাবধান। সাবধান।। পাঠক-পাঠিকা সাবধান। (বি. দ্র -এটি কিন্তু কবিতা নহে।) চিনিয়া পড়িবেন। কবিতা একপ্রকাব ওযধি। ঠিক ঠিক বুঝিযা খাইলে মোক্ষলাভ। ভুল হইলেই যমের দক্ষিণ দুয়ার। অতএব জানিয়া বুঝিযা চিনিয়া খাইবেন। ধারাবাহিক কবিতার কবিতাগুলিকে গঙ্গা-যমুনা-'ভাগীবথীর বক্ষে' প্রেরণ করিযা এখন হইতে শুরু হইল নতুন ধারা। এই ধারার প্রথম কবিতাটি হইল কবিতা-উপন্যাস, দ্বিতীযটি উপন্যাসোপম কবিতা, তৃতীযটি কবিতা নূপন্যাস এবং চতুর্থটি, চতুর্থটি নিখাদ আধুনিক কবিতা। আমরা কবি ও পাঠকদিগের শবীর ও মনের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। কবিতা-চিতা দীর্ঘজীবী হউক।

—সম্পাদক

সর্বপ্রকার সিল্ক স্ক্রিন ছাপার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
এবং পেপার-ব্যাগ প্রস্তুত কারক

DEE SOMA

16 B, Sitaram Ghosh Street
Kolkata-700 009
Phone : 219-0522

রবীন্দ্রনাথের নরবলি

হরিপদ ভৌমিক

'বলি' শব্দের অর্থ উপাচার। পূজোপহার (মনু ৩/৮৭)। দেবপূজায় দেবতাকে যে দ্রব্য সমর্পণ করা হয়, তাকেই 'বলি' বলে। পূজা বুদ্ধিতে দেবতাকে যা দেওযা যায় তা-ই বলি। গায়ত্রীতন্ত্রে (প:৫) বলা হয়েছে—'বলিদানং মহেশানি সর্বপূজাসু শস্যতে।' অর্থাৎ সব পূজাতে বলিদান প্রশস্ত। মহাকাল সংহিতার (৩/১১) মতে 'নৈমিত্তিক পূজায় বলি অবশ্যই দিতে হবে। বিশেষ করে সন্তোষ বিধানের জন্য দেবীর কাছে বলিদান অবশ্য কর্তব্য। বলি না দিলে দেবী পূজা অঙ্গীকার করেন না।'

বলি নিবেদনকে সাত্ত্বিক ও রাজসিক এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। রক্ত-মাংস বর্জ্জিত বলি সাত্ত্বিক আর রক্ত-মাংস যুক্ত বলি রাজসিক।

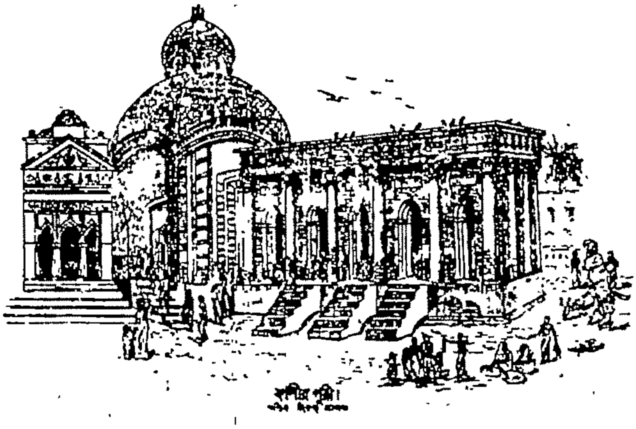

কালীঘাট মন্দিরে ছাগ-বলি। উনিশ শতকে কাঠখোদাই চিত্রে।

বলি প্রসঙ্গে গায়ত্রীতন্ত্রে (প: ৫) বলা হযেছে, বলির দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, স্বর্গলাভ হয়, ধর্ম ও অর্থলাভ হয়। এই সব লাভের আশায়ই বৈদিক যুগ থেকে একাল পর্যন্ত মানুষ দেবীর কাছে পূজার সঙ্গে নানান বলি দিয়ে আসছে।

১৮২৩ খ্রীঃ ১লা ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় একটি সংবাদ থেকে জানা যায়—

মোকাম কলিকাতার ঠনঠনিয়ার বাজারের উত্তরে কালীবাটীর নিজ পূর্ব্ব তেমাথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুয়ারি গ্রহণ দিবসে রাত্রিকালে ১ রাঙ্গা বাছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শৃগাল ও ১ শূকর এই পাঁচ পশু কাটিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাঁচ জন্তুর শরীরমাত্র আছে কিন্তু মুণ্ড নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কিছু জানা যায় নাই।

১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪'শে এপ্রিল তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম রেকর্ড থেকে নরবলির একটি ঘটনার কথা জানা যায়—

বাগবাজার চিত্রেশ্বরী মন্দিরে নরবলি

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে, অমাবস্যার দিন শনিবারে, চিৎপুরের কালীমন্দিরে একটি ভীষণ নরবলি হইয়া গিয়াছে।.... যে মানুষটিকে বলি দেওয়া হইয়াছিল তাহার রুধিরাক্ত মুণ্ডটি মন্দিরের প্রতিমার পদতলের উপরে ছিল, ধড়টা মন্দিরের বাহিরে একটি স্থানে পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া একখানি বহুমূল্য বেনারসী শাড়ি, সোনার কণ্ঠমালা ও দুইখানি রৌপ্যালঙ্কারও সেই প্রতিমার নিকট ছিল। এই নরবলি যজ্ঞের উপযুক্ত যে-সমস্ত পাত্রাদির প্রয়োজন, তাহাও সেইস্থানে পাওয়া গিয়াছে। যে শাস্ত্রের বিধানানুসারে এইরূপ নরবলি দিবার নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই সমস্ত পাত্রাদি নির্মিত হইয়াছে।......অনুষ্ঠান পদ্ধতি দেখিয়া ইহাও বোধ হয়, তিনি কেবল ধনবান নহেন, তন্ত্রাদি-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত।

উনিশ শতকেও নরবলির সংবাদ, সেকালের সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায়। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তারিখের 'সমাচর দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ.....ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে...সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩ নভেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ. মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পঁচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্য অনুমান দুই ২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে... সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই।

উনিশ শতকে নরবলির সংবাদ পাওয়া গেলেও এবং বিংশ শতকে নরবলির তেমন উল্লেখ না পাওয়া গেলেও, ১৩৪২ সনে বা ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায় ১৬ই আশ্বিন তারিখে এক হুলস্থূলু ব্যাপার ঘটে গেল। ঐ দিনের কাগজে শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের নরবলি' শিরোনামে একটি রচনা শুরু করেছেন এই বলে—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিতেছি জয়পুরের ভ্রান্ত যুবক রামচন্দ্র শর্ম্মাকে বলি না দিয়া আর ছাড়িবেন না। তিনি রামচন্দ্র শর্ম্মার এই প্রকার আত্মহত্যাকর কার্য্যের জন্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন অর্থাৎ রামচন্দ্র শর্ম্মা যাহাতে তাঁহার প্রশংসায় বিমূঢ় হইয়া আত্মহত্যার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লজ্জা বোধ করেন, তিনি তাহাই করিতেছেন। মহাত্মাজী রামচন্দ্র শর্ম্মাকে উপবাস করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় মুগ্ধ অপরিণত বয়স্ক রামচন্দ্র এখন আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।

এই অংশটি থেকে বিষয়টির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে না। তাই একটু ফিরে দেখা যাক ঘটনাটি আসলে কি।

সন ১৯৩৫। জুলাই মাসের ১৯ তারিখে খবর পাওয়া গেল, জয়পুরের অধিবাসী পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা ১৪ই আগস্ট তারিখে কলকাতায় পৌছবেন।

কে এই বামচন্দ্র শর্মা, তার পরিচয় কি? “পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মাব পিতা সাধী ভুরামলজী জয়পুবের নবসিংহ মন্দিরের অধিপতি। পাণ্ডবগণ যে বিবাট গ্রামে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, সেই গ্রামে তাঁহার বাসস্থান।”[১] কলকাতায় আসার তার বিশেষ উদ্দেশ্যটি হল, কালীঘাটে কালীমন্দিরে মায়ের সামনে যে পশুবলি হয়, এই পশুবলি বন্ধ করা। বেগুসরাই থেকে ইউ.পি. সংবাদ সূত্রে বলা হয়েছিল—

“জয়পুবের পণ্ডিত বামচন্দ্র শর্ম্মা দেবদেবীর নামে প্রাণী বলি দেওয়া বন্ধ করিবাব জন্য প্রাযোপবেশনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে কলিকাতা যাইবার জন্য তিনি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আগামী ১৪ই আগষ্ট কলিকাতায় পৌছুবেন, ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে তিনি অনশন আরম্ভ করিবেন। ইতিমধ্যে তিনি কলিকাতায় পশু বলি সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং রামায়ণ আবৃত্তি করিবেন।”[২]

কালীঘাটে মাযের কাছে বলি বন্ধ করতে অনশণে, এই সংবাদে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ক্ষুব্ধ হল। ফলে রামচন্দ্র শর্মাব অনশনকে কেন্দ্র কবে কলকাতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। দেবীব সামনে বলিদান শাস্ত্র ও ধর্মসঙ্গত এবং এই প্রথা দেশে স্মরণাতীতকালের। প্রাচীন প্রথায় অন্যায় হস্তক্ষেপ দেখে এই অনশন প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হল—

হিন্দুব এই ধর্ম্মপ্রথা রহিতের জন্য উপবাসের হুমকি জয়পুর বাসী পণ্ডিতের পক্ষে কেবল মূর্খতার পবিচায়ক নহে, দৃষ্টান্তেব দিক হইতেও জন সাধাবণেব পক্ষে ইহা নিতান্ত অনিষ্টকর। যে কোন লোকের মাথায় যে কোন খেযাল জাগিবে এবং সেই খেযাল অনুসারে অপরকে চলিতে বাধ্য করার জন্য সেই ব্যক্তি উপবাসে আত্মহত্যাব ভয দেখাইবে—এই প্রকার গোঁড়ামি কোন সমাজই বরদাস্ত কবিতে পারে না।[৩]

হঠাৎ ছাগবলি বন্ধে অনশনের সংবাদে সাধারণ ভক্তের সঙ্গে কালীঘাটের সেবাইতগণও বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেরা এক সভা করে ঠিক করেন, রামচন্দ্র শর্ম্মাকে যে করেই হোক কালীঘাটে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কালীমন্দিরের সেবায়ত সভার সম্পাদক ফণীলাল মুখার্জীব পক্ষে রায়বাহাদুর এম. ব্যানার্জী ও এ কে. ভাদুড়ী আলিপুরের পুলিশ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট এল. কে. সেনের এজলাসে জয়পুরের পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা যাতে কালীঘাট মন্দিরের (উত্তরে হাজরা রোড, পূর্বে রসা বোড, দক্ষিণে নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট এবং পশ্চিমে টালির নালা বা আদি গঙ্গা) আশে পাশে বলি বন্ধ কবাব উদ্দেশ্যে অনশন কবতে না পারেন তার জন্য বামচন্দ্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রার্থনা জানিয়ে ১৫ই আগস্ট ১৯৩৫ শুক্রবার এক দবখাস্ত পেশ করেন। দরখাস্তে আবো বলা হযেছে—‘বহু হিন্দু দেবপূজায় ছাগ বলিদান ধর্মসঙ্গত মনে করেন। ছাগ বলিদানের প্রথা স্মবণাতীত কাল হতে চলে আসছে। এই প্রথা একরকম আইন সম্মত। পণ্ডিতজী কালীঘাটেব কালীমন্দিরে ছাগবলি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনশনে মৃত্যুপণ কবে কলকাতায এসেছেন এবং তাঁকে এই অন্যায় কাজে সাহায্য করতে জনসাধারণকে প্রবোচনা দিচ্ছেন। তিনি যদি অনশন সত্যাগ্রহ করেন তবে শান্তি ভঙ্গ হতে পারে।’

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দরখাস্ত মঞ্জুর করে ১৪৪ ধাবায় নিষেধাজ্ঞা জারি কবে, ভবানীপুর থানার পুলিশকে দেওয়া আদেশনামায় বলেছেন, ‘পণ্ডিতজী যদি অনশন সত্যাগ্রহ করেন তবে বহু হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবে। পণ্ডিতজীর অহিংসা সম্পর্কে যে ধারণা, বহু হিন্দু তা সমর্থন করেন না। তিনি অনশন সত্যাগ্রহ করলে শান্তিভঙ্গ হতে পারে।’

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা সম্পর্কে সাধারণ মানুষেব কৌতূহল বাড়ল। প্রশ্ন উঠল, তিনি কোন ধর্মের মানুষ? সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেল—“উক্ত জয়পুবী পণ্ডিতটি বোধহয় জৈন সম্প্রদায়েব অন্তর্ভুক্ত, সুতবাং ছাগ বলিতে তাঁহার মনে বেদনা জাগিযাছে এবং তিনি কালীঘাট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।”[৪] এই সংবাদটি প্রকাশিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার জৈন মন্দিবের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদপত্র ঐ পত্রিকায় পাঠানো হয়। ২১ শে আগস্ট তারিখে এই প্রতিবাদপত্রটি ছাপা হয—

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা ও জৈন সম্প্রদায়

মহাশয, আপনার ১লা ভাদ্র তারিখে ‘যৎকিঞ্চিৎ’ কলমে পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মার অনশনের বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আপনি পণ্ডিত মহাশযকে জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে কবিযাছেন। প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত মহাশয় জৈন নহেন। কিম্বা জৈন সম্প্রদায়েব সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কও নাই। এবং কোন স্থানের জৈন সম্প্রদায় তাঁহাকে এখানে পাঠায় নাই বা স্থানীয জৈন সম্প্রদাযও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কবে নাই। পণ্ডিত শর্ম্মা মহাশয একজন সনাতন ধর্মী ব্রাহ্মণ। আশা করি আপনি এই প্রতিবাদ আপনাব পত্রে প্রকাশিত করিয়া জৈন সম্প্রদাযকে বাধিত করিবেন।

কলিকাতা নিবেদক
১৮-০৮-১৯৩৫ ছোটেলাল জৈন
৮২ লোয়ার চিৎপুর রোড জৈন মন্দির

কথা ছিল ১৪ই আগস্ট রামচন্দ্র শর্মা কলকাতায পৌছবেন, কিন্তু তা হয় নি। তিনি কলকাতায় আসেন ১৭ই আগস্ট তারিখে। ২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটেব অনন্তকুমাব রাযেব বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি সেখানে ওঠেন। ২৪ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধিব প্রশ্নে তিনি জানান—

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি অনশন আবম্ভ করিবেন এবং এই জন্য যদি তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত আছেন।

তাঁহার উপর আদালত হইতে যে আদেশ জারী কবা হইযাছে তাহা স্মবণ করাইয়া দিলে, তিনি বলেন যে, সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তিনি কারাবরণ কবিতে কোন দ্বিধা করিবেন না এবং কারাগারেও অনশন চলিতে থাকিবে।[৫]

জয়পুরের নবসিংহ মন্দিবে বলি বন্ধের চেষ্টা না করে হঠাৎ কালীঘাটে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বামচন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন “বড় বড় তীর্থস্থানে সাফল্য লাভ করিতে পাবিলে তাঁহার স্বদেশ জয়পুরে বন্ধ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন হইবে না।”[৬]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ৫১টি শক্তিপীঠ ও বহু উপপীঠ রয়েছে, বহু পীঠেই মায়েব কাছে ছাগ বলি দানেব রীতি প্রচলিত আছে। এত স্থান থাকতে হঠাৎ কালীঘাটকে বেছে নেওয়া হল কেন? এছাড়া কালীঘাটে ছাগবলি বন্ধ হযে গেলেই কি মানুষ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেবে? রামচন্দ্র শর্মা বলেছেন, ছাগমাংস মানুষ খেলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, আপত্তি কালীঘাটে পশু বলি।

এ কেমন কথা? প্রশ্ন তুললেন অনেকেই। মানুষ দুটো মতে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল, বিশেষ করে মাড়োয়াবী, এবং আরো কযেকটি সংগঠন সমর্থন জানালেন বামচন্দ্র শর্মাকে। অন্যদল সমর্থন কবলেন না। অনশন শুরু হলে বাদ-প্রতিবাদে একটি জটিল অবস্থাব সৃষ্টি হবে বিবেচনা করে একটি সভা

---

১. *আনন্দবাজার পত্রিকা* ২৫.৮.১৯৩৫ পৃ ১৩
২. তদেব ১৯ ৭.১৯৩৫ পৃ ৯
৩. তদেব ১৮৮ ১৯৩৫ পৃ ৬
৪. তদেব ১৮.৮.১৯৩৫
৫. তদেব ২৪.৮.১৯৩৫
৬. তদেব ২৫.৮.১৯৩৫ পৃ ১৩

ডেকে রামচন্দ্র শর্মাকে অনশনে 'আত্মবিনাশ' না করার অনুরোধ করা হবে বলে ঠিক হয়। ২৭শে আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে এলবার্ট হলে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভার জন্য যে আবেদনপত্রটি ছাপা হয়েছিল, তা ছিল নিম্নরূপ—

নিবেদন

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রায়োপবেশন করিয়া কালীঘাটে দেবীর উদ্দেশ্যে জীববলি নিবারণ করিবেন এই তাঁহার লক্ষ্য। পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। তিনি দেশের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, অহিংসা, জীবে দয়া এই সকল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র।

কালীঘাটে বলিদান সম্পর্কে সকল হিন্দু এখনও একমত নহেন। হিন্দুদের মধ্যে এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা বলিদানকে ধর্ম্মেরই অঙ্গ মনে করেন। যুক্তি দ্বারা এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিবর্তন করাই শ্রেয়। প্রায়োপবেশন দ্বারা বর্তমান অবস্থায় ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা অল্প। এ অবস্থায় পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার মত মহাপ্রাণ ব্যক্তির বহুমূল্য জীবন এই প্রকারে নষ্ট হইবে ইহার সম্ভাবনায় আমরা বিচলিত হইয়াছি। তাঁহার মত ধার্ম্মিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক এইভাবে আত্মবিনাশ করেন ইহা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। পণ্ডিতজীকে প্রায়োপবেশন হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে অদ্য মঙ্গলবার ২৭শে আগস্ট সন্ধ্যা ৬ টায় এলবার্ট হলে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সভায় সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। ইতি—

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র
শ্রী মৃণালকান্তি ঘোষ
জে. সি. গুপ্ত
শ্রী সন্তোষ কুমার বসু
শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার
স্বামী স্ গ্যানন্দ
ডঃ সরসীলাল সরকার
শ্রী হরিদাস মজুমদার
শ্রী গিরিজাকান্ত শর্ম্মা গোস্বামী
কাব্যসাংখ্য স্মৃতিতীর্থ

শ্রীমতী জ্যোতিৰ্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমতী বেলা হালদার
শ্রীমতী সরলাবালা সরকার
রায়বাহাদুর সখীচাঁদ
শ্রী দেবপ্রিয় বলিসিংহ
রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ দত্ত
রায়বাহাদুর বামদত্ত চোখানী
শ্রী পূরণচাঁদ নাহার
বসন্তলাল মুরারকা
ছোটেলাল জৈন
দুলীচাঁদ শেঠী

নিশিকান্ত সান্ন্যাল

সভায় সকলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ বিরাট জনসভায় যে লিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, সেই প্রস্তাবে লেখা হয়েছিল—

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা কালীঘাটে দেবীর সম্মুখে পশুহত্যা নিবারণ জন্য প্রয়োপবেশন করিবার সঙ্কল্প লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যতঃ পরিণত করিবেন—এই সংবাদে কলিকাতাবাসী সমবেত হইয়া পণ্ডিতজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন যে তিনি তাঁহার জীবন এই ভাবে ধ্বংস না করিয়া বলিদানের পক্ষপাতী হিন্দুদিগকে যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা স্বমতে আনয়ণ করুন। তাঁহার এইরূপ প্রয়াস সভাস্থ সকলে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিতেছে।

রামচন্দ্র শর্মাকে অনশন ত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হলে, তিনি যজ্ঞোপবীত হাতে করে বলেন, 'আজ আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে ভাদ্রের শুক্লা সপ্তমীর দিন হতে যদি কালীঘাটের বলি বন্ধের উদ্দেশ্যে অনশন ব্রত অবলম্বন না করি, তা হলে আমার গো-হত্যার পাপ হবে।'

উনিশ শতকের চিত্র। ছাগমুণ্ড মাকে নিবেদন করে ধড়টি কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছে ভক্ত

রামচন্দ্র শর্মার এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সভায় উপস্থিত দর্শক ও উদ্যোক্তাগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। পরে 'শক্তিপূজায় পশুবলি' শিরোনামে এক সংবাদে লেখা হল—

শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের নির্দেশক্রমেই ভারতের সর্ব্ব প্রদেশে পরিব্যাপ্ত বায়ান্ন-পীঠে, বেলুচীস্থানের হিঙ্গলাজ হইতে কামরূপ কামাখ্যার মন্দির পর্য্যন্ত প্রতি সিদ্ধ মহাপীঠে পশুঘাত পূর্বক শক্তিপূজা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, পাঞ্জাব বা যুক্ত প্রদেশের মহাপীঠ গুলিতে নহে, কেবলমাত্র বাঙ্গালার সিদ্ধপীঠ কালীঘাটে পশুবলি বন্ধ করিতে হইবে। কেন না, সহসা এক জয়পুরী ব্রাহ্মণ যুবক আসিয়া বলিতেছেন, হে বাঙ্গালী জাতি, তোমারা কালীঘাটে বলি বন্ধ না করিলে আমি অনশনে আত্মহত্যা করিব।

বাঙ্গালী হিন্দু স্বভাবতঃই উদার, পরমত সহিষ্ণু এবং দয়ালু। সেই কারণেই কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি সভা করিয়া যুবককে অনুনয় সহকারে এমন নির্ব্বোধ আত্মহত্যা করিতে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ফল হইল উল্টা। ঐ যুবক পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধদের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া সভা মধ্যে আঙ্গুলে পৈতা জড়াইয়া বাঙ্গালী হিন্দুকে বলিল, অদ্য হইতে এখনি কালীঘাটে বলি বন্ধ করিতে হইবে, নতুবা আমি মরিবই, কাহারো পরামর্শ শুনিব না।[৭]

এলাবার্ট হলের সভার পর আর একটি সভা হয় কালীঘাটে। ঐ সভার সংবাদ দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—"বুধবার সায়াহ্নে মুরলীধর সেন লেনে অমৃত সমাজে এক সভায় পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা কালীঘাটে বলিবন্ধের জন্যে তাঁহার অনশন আরম্ভের পূর্ব্ব দিবসে বক্তৃতা করেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৮]

এর মধ্যে ছাগশিশু রক্ষার জন্য কিছু মাড়োয়ারী যুবক রামচন্দ্র শর্মার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মাহেশ্বরী ভবনে রামচন্দ্রের সমর্থনে একটি সভা হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, কালীঘাটে ছাগাবলি বন্ধ না হলে বড়বাজারের

---

৭. তদেব ১৫.৯.১৯৩৫ পৃ ৬
৮. তদেব ৫.৯. ১৯৩৫ পৃ ৯

মাড়োয়ারীগণ কালীঘাটে যাওয়া বন্ধ করবেন। কালীঘাট বয়কটের এই মন্তব্যে কলকাতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বলা হয়—

....মহেশ্বরী ভবনে একদল মাড়োয়ারী সভা করিয়া প্রস্তাব করিলেন, বলি বন্ধ না হইলে, বড়বাজারের হিন্দুরা কালীঘাট বয়কট করিবে। সমস্ত বড়বাজারের হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে কথা বলিবার ইহাদের কি অধিকার আছে জানি না, কিন্তু এই অশিষ্ট ভীতি প্রদর্শনের ধৃষ্টতায় আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি এক সনাতন ধর্ম্মভুক্ত হইলেও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, একের সাধনা ও পূজা পদ্ধতি অন্য হইতে বিভিন্ন। একের নিকট অপরের কোন অনুষ্ঠান ভাল না লাগিলে অনশনভীতি বা বয়কটের ভয় দেখাইয়া জব্দ করিবার ফিকির খুঁজিলে, সমাজ কলহ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিবে। আমরা রাম শর্ম্মার মাড়োয়ারী জৈন ব্রাহ্ম প্রভৃতি মুরুব্বীদিগকে এই কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।[৯]

অনশনের তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। স্থান কালীঘাট, কিন্তু ১৪৪ ধারা জারি থাকায় পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা ২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতেই অনশন শুরু করবেন এবং মন্দিরে মন্দিরে বলি বন্ধ বিষয়ে বক্তৃতা দেবেন। ৪ তারিখ রাত ১২টায় খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ করে অনশনের কথা ঘোষণা করেন, বলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর খাদ্য গ্রহণ করবেন না বলে। শুধু প্রয়োজনে একটু জলপান করবেন, জানিয়ে দিলেন।

মনে হয়েছিল, এত লোকের উপদেশ অনুরোধে কাজ হবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। অনশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সাজ সাজ রব উঠল। চিন্তান্বিত কালীমন্দিরের সেবাইতগণ, ধর্মপ্রাণ মানুষের ভাবনা—কি হয়, কি হয়। আলিপুর পুলিশ কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট এল. কে. সেন কালীঘাট মন্দিরের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রবেশ ও শান্তি ভঙ্গের কোনোরকম কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভবানীপুর থানাকে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে আদালতকে রিপোর্ট জানাতে নির্দেশ দেন। ভবানীপুর থানার ইনস্পেক্টর কে. এইচ রেজা কোর্টকে এক রিপোর্ট পাঠিয়ে জানিয়ে দেন—'...আদালত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার ও তাহার অনুচরবর্গের উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর উপর উক্ত আদেশ জারী করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন অনুচরের সন্ধান না পাওয়ায় তাহাদের উপর উহা জারী করা যায় নাই। ....উক্ত পণ্ডিত বর্ত্তমানে অনশনে আছেন, তাঁহার মাড়োয়ারী অনুচরবর্গ কালীঘাটে পিকেটিং করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতেছে এবং মন্দিরে পিকেটিং আরম্ভ হইবারই সম্ভাবনা। এই অবস্থায় তিনি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করেন।'

সেবাইত সভার ১৪৪ ধারার আদেশের বিরুদ্ধে বলিদান বিরোধী দল আলিপুরের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ এন.সেনের কাছে আপিল করলে, তিনি পুরনো আদেশ সংশোধন করে মন্তব্য করেন—'....পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মার অনুগামিগণ ও তাঁহার প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা কালীমন্দিরে বলি বন্ধের জন্য বক্তৃতা করিতে, হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতে বা জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে পারিবেন না এবং যে সকল যাত্রী ও পূজার্থী মন্দিরে বলি দিতে চায় তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।' রামচন্দ্র শর্মার পক্ষে জে. সি. গুপ্ত, অশ্বিনীকুমার ধর, শীতলচন্দ্র দাস এবং সেবাইৎ সভার পক্ষে রায়বাহাদুর আর. এম. ব্যানার্জী ও এ. কে. ভাদুড়ী উপস্থিত ছিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনশনে না বসার জন্য পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মাকে নানান জন নানান ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেও বোঝাতে পারেন নি। ঐ দিন অনশন শুরু করবেন বলে পৈতা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে জেদ ধরে বসে রইলেন। এলবার্ট হলে ২৭ আগস্ট তারিখে সভা করার উল্টো ফল দেখে শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমস্ত ঘটনাটি জানিয়ে রামচন্দ্র শর্মাকে অনশন না করার পরামর্শ দেবার জন্য চিঠি লেখেন। ৩রা সেপ্টেম্বর কবিগুরু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের চিঠির উত্তর দেন। 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় ঐ চিঠিসহ সংবাদটি ছাপা হয়—

বাঙ্গালায় ছাগবলি বন্ধ করা দুঃসাধ্য
জয়পুরী পণ্ডিতের সঙ্কল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ
শান্তিনিকেতন, ৩রা সেপ্টেম্বর

কালীঘাট কালীমন্দিরে ছাগবলি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা নামক কোন জয়পুরী পণ্ডিত ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে যে অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট লিখিয়াছেন. পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা আত্মত্যাগের ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা দুর্ব্বলচেতা—তাঁহার সঙ্কল্পের ফল কি হইবে, তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় শক্তি পূজায় পশুবলি বন্ধ করা যে সহজ কথা নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। আমি জানি রামচন্দ্র শর্ম্মার উদ্দেশ্য আপাতত সফল হইবে না। কিন্তু তাঁহার আত্মত্যাগের তুলনা নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ দিয়া তাহা বিচার করিলে চলিবে না। তাঁহার আত্মবলিদানে আমরা ব্যথিত হইব, কিন্তু তাঁহার আত্মত্যাগের জন্য ঐ মূল্যই আমাদের দিতে হইবে। তিনি আত্মবলি দিলে কি ফল ফলিবে তাহা আমি জানি না, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্ত যে ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে, সেই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পার্থের মন অবসন্ন হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে তাহাই আমার মনে হইতেছে। আমরা তাঁহার সঙ্কল্পে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করিলে, তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে না। পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা তাঁহার কর্ত্তব্য ভালই জানেন। তিনি আরো জানেন যে, 'নিজ নিজ বিশ্বাসের জন্য জীবন উৎসর্গ করাও বাঞ্ছনীয়।'

পরে প্রকাশিত হলেও, ১৫ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি পাওয়া মাত্র পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মার উপর কবিগুরু একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় কার্ত্তিক সংখ্যায় ১২০ পৃষ্ঠায়—

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণ-ঘাতকের খড়্গে করিতে ধিক্কার
হে মহাত্মা, প্রাণ দিতে চাও আপনার
তোমারে জানাই নমস্কার।
হিংসারে ভক্তির বেশে দেবালয়ে আনে,
রক্তাক্ত করিতে পূজা সঙ্কোচ না মানে।
সঁপিয়া পবিত্র প্রাণ, অপবিত্রতায়
ক্ষালন করিবে তুমি সঙ্কল্প তোমার,
তোমারে জানাই নমস্কার।
মাতৃস্তনচ্যুত ভীত পশুর ক্রন্দন
মুখরিত করে মাতৃ-মন্দির প্রাঙ্গণ।
অবলের হত্যা অর্ঘ্যে পূজা-উপাচার—
এ কলঙ্ক ঘুচাইবে স্বদেশ মাতার
তোমারে জানাই নমস্কার।
নিঃসহায়, আত্মরক্ষা-অক্ষম যে প্রাণী
নিষ্ঠুর পুণ্যের আশা সে জীবেরে হানি,
তারে তুমি প্রাণমূল্য দিয়ে আপনার

---

৯. তদেব ১৫.৯.১৯৩৫ পৃ ৬

ধর্ম্মলোভী হাত হতে করিবে উদ্ধার—
তোমারে জানাই নমস্কার।
১৫ ভাদ্র, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

ঐ কার্ত্তিক সংখ্যার ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়, পরের পাতায় (পৃঃ ১২১) ১৮ই সেপ্টেম্বর (১লা আশ্বিন) এবং ২৪ শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর) তারিখে লেখা দুটি চিঠি একত্রে একই পাতায় ছাপা হয়—

রবীন্দ্রনাথের পত্র
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত

শান্তিনিকেতন

ওঁ

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমার শরীর অশক্ত। বিস্তারিত করে মত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। সম্প্রতি একটি পত্রের উত্তরে এ সম্বন্ধে যা লিখেছি আপনাকে পাঠাই। শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনো কখনো ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হইয়াছে। পশুহত্যাও রহিত হবে এই আশা করা যায়।

ইতি ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫।

ভবদীয়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড় চিঠি লেখার মতো শক্তি ও উৎসাহ আমার নেই। সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলি। জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেই জন্যে শ্রেয়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্ম্ম সাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মানুষের পরিত্রাণের উপায়। নিজেদের আবরণের হেয়তার দোহাই দিয়ে সেই সার্ব্বজনীন ও চিরন্তণ আদর্শকে যদি দূষিত করা যায় তাহলে তার চেয়ে অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। ঠগরা দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে তাদের ধর্ম্মের অঙ্গ করেছিল। নিজের লুব্ধ ও হিংস্র প্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ করে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব। এই আদর্শ-বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্ম্মের জন্যেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত; শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই প্রাণ দিতে স্বয়ং উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশই রামচন্দ্র শর্ম্মা পালন করছেন। সাধারণ মানুষের হিংস্রতা নিষ্ঠুরতার অন্ত নাই—স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ তাকে সম্পূর্ণ রোধ করতে পারেন নি। তবুও ধর্ম-অনুষ্ঠানে হিংস্রতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গের মতো দুষ্কর পুণ্যকর্ম্ম আর কিছু হতে পারে না; তাতে আশুফল কিছু হতে পারে কিনা জানিনে কিন্তু সেই প্রাণ উৎসর্গই একটি মহৎ ফল। রামচন্দ্র শর্ম্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণ-ঘাতক ধর্ম্মলোভী স্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন করতে বসেছেন এই জন্য আমি তাঁকে নমস্কার করি। তিনি মহাপ্রাণ বলেই এমন কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ইতি

২৪ ভাদ্র ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি ও কবিতাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কবিগুরু সমালোচনার মুখে পড়ে গেলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হল—

শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হতাশ হইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু কবি তাঁহাকে নিরস্ত হইতে উপদেশ না দিয়া এবং আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুর ‘প্রবাসী’ মারফৎ ‘মহাত্মা বলিয়া তাঁহার মহৎ ব্রতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিলেন। বেচারা রাম শর্ম্মা, কয়েকজন মাড়োয়ারী জৈন কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া অনশন আরম্ভ করিলেন এমনকি মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের অনশন স্থগিত করিবার উপদেশ ফলপ্রসূ হইল না।

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ পত্রিকাতেই আবার লেখা হল—

কবি রবীন্দ্রনাথ রাম শর্ম্মাকে ‘মহাত্মাজী’ বলিলেন। আর স্বয়ং আসল মহাত্মাজী বলিলেন—তাঁহার ‘মস্তিষ্ক বিকৃতি’ ঘটিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু লোক মুখে শুনিয়া ভাবিয়াছেন, এই ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্ম সংস্কার আন্দোলন করিলেন ভাল হয়। রাম শর্ম্মার নামে প্রচারিত মুদ্রিত যুক্তিতর্ক দেখিলে তিনিও বুঝিতে পারিতেন তাঁহাকে অম্বর প্রাসাদে কিম্বা বিন্ধ্যাচলে না লইয়া গিয়া কলিকাতায় কেন আনা হইয়াছে, আর কেনই বা এই দুর্গাপূজার মুখে একটা কৃত্রিম অনিষ্টকর ও উদ্ধত প্রস্তাব গ্রহণ ও বক্তৃতা করিতে সাহস পাইতেছেন? আমরা এখনও মনে করি, এই শ্রেণীর অনশন ও তাঁহার পৃষ্ঠাপাষকগণকে সমস্ত বাঙ্গলাদেশ উপেক্ষাই করিতেছে। পৃষ্ঠপোষকগণের উচিত পণ্ডিত রাম শর্ম্মাকে খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা।

তন্ত্রে আত্মবলিদানকে সর্বশ্রেষ্ঠ ‘বলি’ বলা হয়েছে। পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা ছাগ বলি বন্ধ করতে আত্মবলিদানের জন্য অনশন শুরু করলে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ‘মহাত্মা’ বলে ‘নমস্কার’ জানালে রামচন্দ্র নামক নরকে কবি আত্মহত্যা নামক বলিতে চড়িয়েছেন বলে মন্তব্য করা হয়—

অহিংস ভাবের আত্মহত্যা মাত্রেই দেবতার লীলাখেলার মত ভয়ঙ্কর একটা পুণ্য কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। প্রমাণ, ভক্তের পুষ্পবৃষ্টি এবং সর্ব্বশক্তিমান পুলিশের ও আইনের এই অহিংস আত্মহত্যা প্রচেষ্টার অসহায় অনুমোদন। স্মরণ রাখিবেন, বৈদিক যজ্ঞে আস্থাবিহীন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই নবাবিষ্কৃত নরমেধ যজ্ঞের তারিফ না করিয়া পারেন নাই।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সরাসরি নরবলি দিচ্ছেন বলে অভিযোগের আঙুল তুললেন কবিগুরুর দিকে। তিনি রামচন্দ্র শর্ম্মার উপর লেখা কবিগুরুর কবিতা ও চিঠি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে **‘রবীন্দ্রনাথের নরবলি’** শিরোনামে লিখলেন—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিতেছি জয়পুরের ভ্রান্ত যুবক রামচন্দ্র শর্ম্মাকে বলি না দিয়া আর ছাড়িবেন না। তিনি রামচন্দ্র শর্ম্মার এই প্রকার আত্মহত্যার কার্য্যের জন্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়াছেন অর্থাৎ রামচন্দ্র শর্ম্মা যাহাতে তাঁহার প্রশংসায় বিমূঢ় হইয়া আত্মহত্যাকর কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লজ্জা বোধ করেন, তিনি তাহাই করিতেছেন। মহাত্মাজী রামচন্দ্র শর্ম্মাকে উপবাস করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রশংসায় মুগ্ধ অপরিণত বয়স্ক রামচন্দ্র এখন আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না।

মাতৃমন্দিরে বলি কেন? কবির কোমল মনকে নাড়া দিয়েছিল এই প্রশ্ন। সেই বলি বন্ধ করার জন্য বাঙলার কোনো মানুষ এগিয়ে আসেনি। সুদূর জয়পুর থেকে এসে রামচন্দ্র শর্মা বলি বন্ধ করার জন্য অনশন করলে কবি আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কবির এই সমর্থনকে ‘নরবলি’ আখ্যা দিয়ে বিষয়টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গণতান্ত্রিক যুগ বলে যার যা খুশি তা-ই করছে, কেউ আত্মহত্যা করতে চাইছে, কেউ আত্মহত্যাকে সমর্থন করছে, বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। রামচন্দ্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে বাঁচাবার আবেদনও জানিয়েছেন অনেকে—

ইহা গণতন্ত্রের যুগ। গণমতের মর্য্যাদা রাখিতেই হইবে। তাই আজ যুক্তি নাই, বিচার নাই, আলোচনা নাই, আছে শুধু জুলুম আর জবরদস্তি, মানুষের দুর্ব্বলতার উপর নির্ম্মম আঘাত। আমি যাহা (চাহিব) তোমাকে তাহাই

অবিচারে মানিয়া লইতে হইবে.... না স্বীকার কর যদি, তবে তোমারই ঘরে বসিয়া তোমারই সম্মুখে আত্মহত্যা করিব। পরমত সহনশীলতার ইহাই বর্ত্তমান ব্যবস্থা, মত স্বাধীনতার ইহাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই অন্যায় জিদে, এই জবরদস্তি জুলুমে সমগ্র হিন্দু বাঙলাকে এই সেদিন সাম্প্রদায়িকতার খড়্গে নির্ম্মম ভাবে বলি দেওয়া হইয়াছে, জননীর আবার বলির অভাব? বলির ভাবনা না ভাবিয়া অতিথি রামচন্দ্রকে বাঁচান আপনারা। দোহাই আপনাদের।"

শরৎচন্দ্র বসুও রামচন্দ্রের এই অনশনকে সমর্থন করেন নি। তিনি বলেছেন—

আজকাল যে কেহ অনশন করে। কোথাও কোনো ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনশন করা হয় .. কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষতঃ যখন চাপ দিয়া লোককে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে অনশন করা হয়, উহার সহিত বল প্রয়োগের কোন পার্থক্য নাই। যে সকল ক্ষেত্রে অনশন করা বলপ্রয়োগ করারই নামান্তর, সেই সকল ক্ষেত্রে আমি তো অনশন সমর্থন করিতেই পারি না—এমনকি তাহাতে উৎসাহও দিতে পারি না। সমাজ, রাজনীতি বা ধর্ম্ম—সমস্ত ক্ষেত্রেই বল প্রয়োগ আমার নিকট ঘৃণার্হ।

.আর একটি বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা অনশন করিবার জন্য এত .পথ দৌড়াইয়া কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন কেন? জয়পুরের অম্বর প্রাসাদে এখনও দেবীপূজায় জীববলি হয়, তবে তিনি সেই অম্বর প্রাসাদেই অনশন করিলেন না কেন?

..আমাদের শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা সমাগত। সুতরাং এই সময়টা দেবী পূজায় বলিদান বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলনের পক্ষে আমি নিতান্ত অসময় বলিয়া মনে করি। দুর্গা পূজার সময় শান্তি ও সদিচ্ছাই আমরা কামনা করি, কিন্তু এই সময় দেবী পূজায় বলি বন্ধের জন্য আন্দোলন করিলে শান্তি ও সদিচ্ছা বিনষ্ট হইবে। আশা করি আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না। বরং লোকে যদি স্বেচ্ছায় বলি বন্ধ করে," তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি আনন্দিতই হইব।

মন্দিরে মায়ের সামনে বলি, কবিগুরু মনেপ্রাণে এই প্রচলিত রীতিকে মেনে নিতে পারেন নি। এই ঘটনার ৪৯ বছর আগে অর্থাৎ ১২৯৩ সনে লেখা 'রাজর্ষি' থেকে ছোট্ট একটু উদ্ধৃতি দিলেই কবির মনের ভাব বোঝা যাবে—

যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্তস্রোতের রেখা শ্বেতপ্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে এক-শো-এক মহিষ বলি হইয়াছে তাহারই রক্ত।

হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা একপ্রকার সংকোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, এ কিসের দাগ, বাবা?

রাজা বলিলেন, "রক্তের দাগ, মা।"

সে কহিল, "এত রক্ত কেন?"

এমন একপ্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল 'এত রক্ত কেন হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল 'এত রক্ত কেন'। তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন।

দীর্ঘ ৪৯ বছরেও কবি ভুলতে পারেন নি, 'এত রক্ত কেন?' রাজার মুখে বলিয়েছিলেন, 'এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।' এই কথা ১৩৪২ সনে বললেন পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা। কবিগুরুর চিঠি ও কবিতায় মহাপুরুষে পরিণত হয়ে রামচন্দ্র অনশন-আন্দোলন দীর্ঘ করেছেন মনে করে মহাত্মা গান্ধী কবিকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ৩রা অক্টোবর একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। ৬ই অক্টোবর তারিখে ৩২ দিনের দীর্ঘ অনশন ভাঙেন রামচন্দ্র শর্মা—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে। মহাত্মা গান্ধীর অনশনকে কেন্দ্র করে যে পুণা চুক্তি হয়েছিল, সেখানে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী, মদনমোহন মালব্য এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামচন্দ্র শর্মার বলি চুক্তিতেও এই তিনজনই রয়েছেন। মালব্যজি নাকি এক বছরের মধ্যে কালীঘাটে বলি বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন, এমন ইঙ্গিত দিয়ে রামচন্দ্র শর্মাকে অনশন ভঙ্গ করান।

পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্মা অনশন ভঙ্গ করায় নরহত্যার দায় থেকে কবিগুরু মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু বলি-চুক্তির সঙ্গে পুণা-চুক্তির মিল খুঁজে পেয়ে ব্যঙ্গোক্তি সহকারে জানানো হয়েছে সে কথা—

জয়পুরের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শর্ম্মা গত ৬ই অক্টোবর ১৯ শে আশ্বিন নবমী পূজার দিন, ৩২ দিন উপবাসের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্যজির অনুরোধে এবং চেষ্টায় অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। ৩২ দিন অনশনের পর তাঁহার শরীরের অবস্থা যেরূপ ছিল, ততদিন উপবাসের পর অন্য কোন লোকের শরীর ঐরূপ থাকে না, থাকিতে পারে না। যাহা হউক, পণ্ডিত মালব্যজী যে তাঁহাকে অনশন ভাঙ্গিবার পথ সুগম করিয়াছেন, সে জন্য আমরা সন্তুষ্ট।. এই রামচন্দ্রের অনশনকালে শুনা গিয়াছিল যে, তিনি নাকি মধ্যে মধ্যে রক্ত বমন করিতেছেন। আম্বেদকরকে তুষ্ট করিবার জন্য মহাত্মাজীর উপবাসকালে পুণাতে যে বৈঠক বসিয়াছিল—যে বৈঠকের ফলে পুণা চুক্তি হইয়াছিল—সেই সময়ও শুনা গিয়াছিল, মধ্যে মধ্যে মহাত্মাজীর অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং তাড়াতাড়ি এই অতিসুন্দর পুণা চুক্তি হইয়া গিয়াছিল। মালব্যজী সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ তথায় ঐ চুক্তির অনুমোদন করিয়া পরে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—ওটা তাঁহার তখন ঠাহর হয় নাই। পণ্ডিতজী এখন সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ বাতিল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু একটা কুকাজ করিয়া ফেলিলে তাহার সংশোধন করা কত কঠিন, পণ্ডিতজী তাহা এখন মর্মে মর্মে বুঝিতেছেন। তথাপি তাঁহার চৈতন্য হইতেছে না। তিনি আবার রামচন্দ্র শর্ম্মাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, দেবালয়ে পশুবলি যাহাতে বন্ধ হয়, সে জন্য তিনি চেষ্টা করিবেন। যদি বাঙালি লোক এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের চিরাচরিত উপাসনা পদ্ধতি বদলাইয়া না ফেলে, তাহা হইলে রাম শর্ম্মা পুনরপি জল খাইয়া উপবাস করিবেন। রবিবাবু আবার কবিতা লিখিবেন, রামানন্দ বাবু আবার অহিংসা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন,—স্যার পি.সি রায় আবার রাসায়নিক যুক্তির দ্বারা পাষাণী মূর্ত্তির সম্মুখে বলিদত্ত পশুমাংসের অপকারিতা ঘোষণা করিতে থাকিবেন। যাহারা ঘৃতে চর্ব্বি মিশাইয়া পেট মোটা করিতেছে, তাহারা আশা দিতেছে যে, চর্ব্বি কিনিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহারা নিরামিশাষী দেবীর নিকট মোটা পূজা মানত করিবে। ফলে বাঙ্গালী হিন্দুর দুর্দশা এখনও কাটে নাই। তাহাদের ভাগ্যে এখনও দুঃখ আছে। এখন ভিন্‌দেশীরা আসিয়া কেবল যে তাহাদের উপাসনা পদ্ধতির সংস্কার করিবে, তাহা নহে—তাহাদের গৃহস্থালীরও সকল ব্যবস্থা ভিনদেশীরা করিবে। সে শুভদিন সমাগমের বোধহয় আর বিলম্ব নাই। বাঙালী জাতির রসাতল প্রবেশের আর বাকী আছে কি?

উৎসবে-পূজা পার্বণে জগৎসেরা
মিষ্টান্নের পসরা নিয়ে হাজির

জগৎগৌরী সুইটস্

৭৪ ডক্টর লেন, কলকাতা-৭০০০১৪
প্রোঃ— বিমলকৃষ্ণ মণ্ডল ও মীণা মণ্ডল

সর্বমঙ্গলদায়িনী
তুমি মা দুর্গা
তুমিই জগজ্জননী

শারদ শুভেচ্ছায়

কেয়ো কার্পিন
পরিবারের আপনজন

Dey's
দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা

PRINTADEX '99

আপনার গাড়ী
আর সার্ভো®
বন্ধুত্ব যা
সারা জীবনের।
সার্ভো®
বিশ্বমানের ইঞ্জিন অয়েল
इंडियनऑयल
IndianOil
SERVO
SUPER
MULTIGRADE
4 STROKE ENGINE OIL
SERVO
2T
SUPREME
2 STROKE ENGINE OIL
SERVO
PRIDE
DIESEL ENGINE OIL

২য় বর্ষ ।। ৪- ৫ সংখ্যা ।।

নভেম্বর- ডিসেম্ব

পত্রপা

দাম : ৭ ট

বিদায় নেবার জন

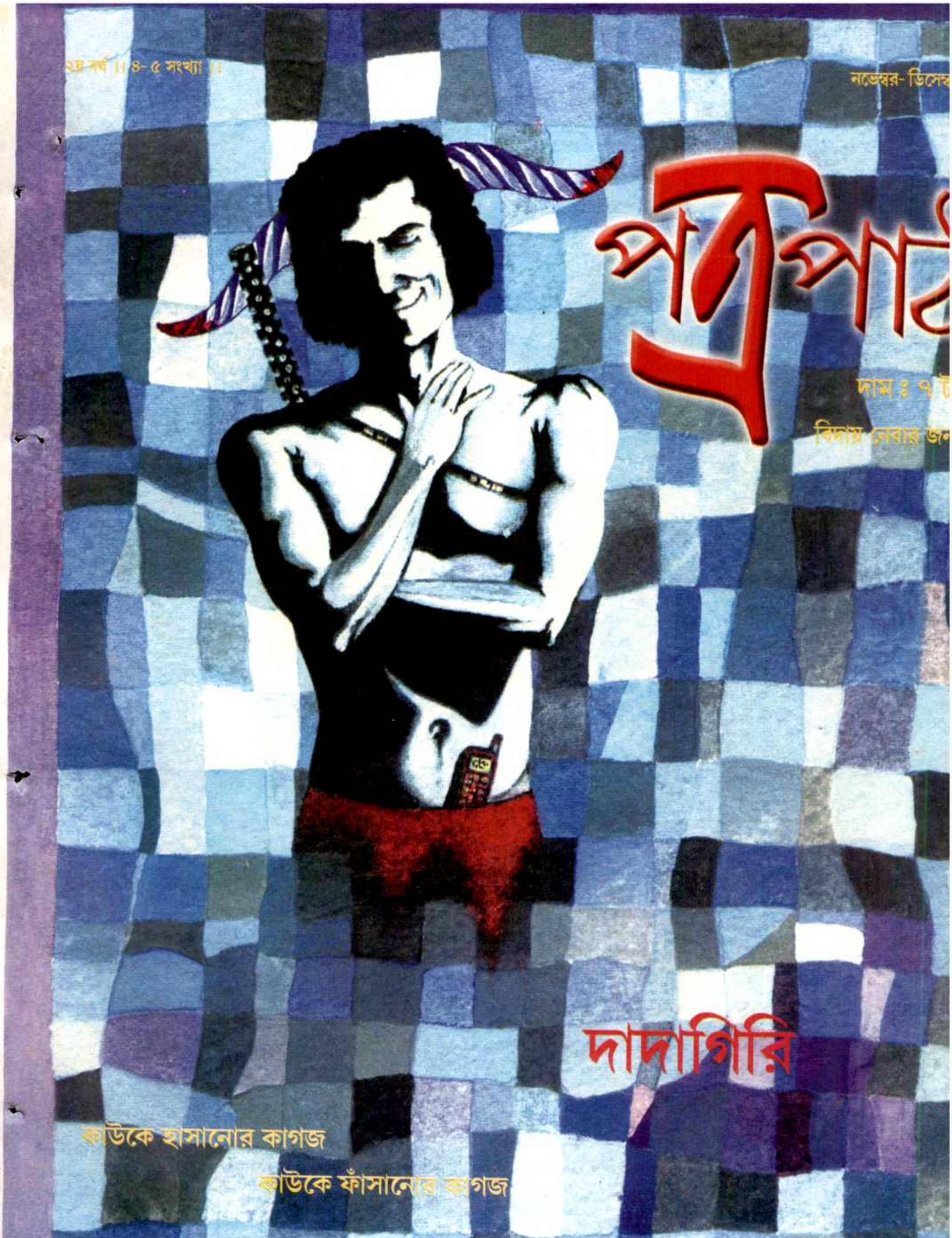

দাদাগিরি

কাউকে হাসানোর কাগজ

কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

With Best Compliments from :

KANKARIA GROUP

6,Little Russel Street
Kolkata

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০১

পত্রপাঠ

দাম: ৭ টাকা

২য় বর্ষ।। ৪-৫ সংখ্যা

সম্পাদকীয় □২ জবর খবর □২১ রাশিচক্কোর □২০ পত্রপাঠ জবাব □১০ হেঁসেল□১৩ মহিলা মহল □৩০ ধারাবাহিক কবিতা □২৫ সংস্কৃতি দুঃসংবাদ □১১ শিক্ষা দুঃসংবাদ □৩৯ টীকা নিষ্প্রয়োজন □২৮ ট্যারা চোখে □১৯, ২৭,৫১, ৫৪

পুরনো কাসুন্দি গিরিশচন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" নাটক থেকে □৮
ধারাবাহিক বইয়ের নিয়তি • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য □৫ অকপটে • সমরেশ মজুমদার □২৬

প্রচ্ছদ নিবন্ধ বোলতার চাকে গুলতি • ওম্‌বিকা গুপ্‌তো □৩৪সর্বঘটে দাদাগিরি • কৌশিক রায় □৩৬

গল্প মিস্‌ফায়ার • বিমান চট্টোপাধ্যায় □১৮ দাদা অসুর • গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ □৩৬ একটি ভোটের প্রতিবেদন • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □৫২

গল্প হলেও সত্যি বিমল দারোগার বিপত্তি • প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় □৩১

রসকাব্য দাদাকীর্তন • মৈনাক মিত্র □৪ কবি সাপ্তাহিকী • সুবীর মণ্ডল □১১ প্রেম সংলাপ• শিবনাথ পাল □২৪ দণ্ড হাতে বণিক • সৈয়দ রেজাউল করিম □২৪ উলট পুরাণ • অনির্বাণ ঘোষ □৪৮ কমলকান্তি• তসলিম আরিফ গায়েন □৫০

এ ছাড়া নেতাশাস্ত্র • গৌতম কুমার দে □১২ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন ও প্রাইভেট টিউশনি • প্রভাত বাগচী □১৪ নামচা • রঞ্জন বিশ্বাস □৪৬ শালা • দেবপ্রসাদ কুমার □৪৭ ভালো আছেন? • সুদীপ নাগ □৪৯ সম্পাদকের জুতো দান • জয়ন্ত সরকার □৫১ ভজহরির ভবিষ্যৎ দর্শন • বিষ্ণুজ্যোতি রায় □৫৫

বিদায় নেবার জন্য নয়

কলিকালে কেষ্টঠাকুরের আসার কথা ছিল। কথা ছিল তিনি বজ্জাতদের মেরে হাড্ডি চুর করে দেবেন। এমনকি ভালো মানুষের পোরা তাঁর কৃপায় সুখের ওপর শতরঞ্চি বিছিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবেন। কিন্তু কেষ্টঠাকুরের বদলে হাজির বড় মেজো সেজো সব দাদারা। সেই দাদাদের যৎসামান্য মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন **সমরেশ মজুমদার, ওম্‌বিক গুপ্‌তো** এবং **কৌশিক রায়**—এই সংখ্যায়।

প্রচ্ছদ : পল্লব চক্রবর্তী
অলঙ্করণ : শুভ • পল্লব চক্রবর্তী
কর্ম সহায়ক : কৌশিক রায় • অচ্যুতকুমার সিংহ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : শেখর আহমেদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : সুশীল কুমার সান্যাল
পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী
ডাঃ বিপাশা সেন • শচীন মিত্র • দেলওয়ার আলী

সম্পাদকীয় দপ্তর · ১০ বি, ফার্ণ বোড, কলি-১৯ *ফোন : ৪৬০ ০০৪১ (দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। রবিবারও ছুটির দিন বাদে)*
শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ বোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৪৪০-৩৮০৩

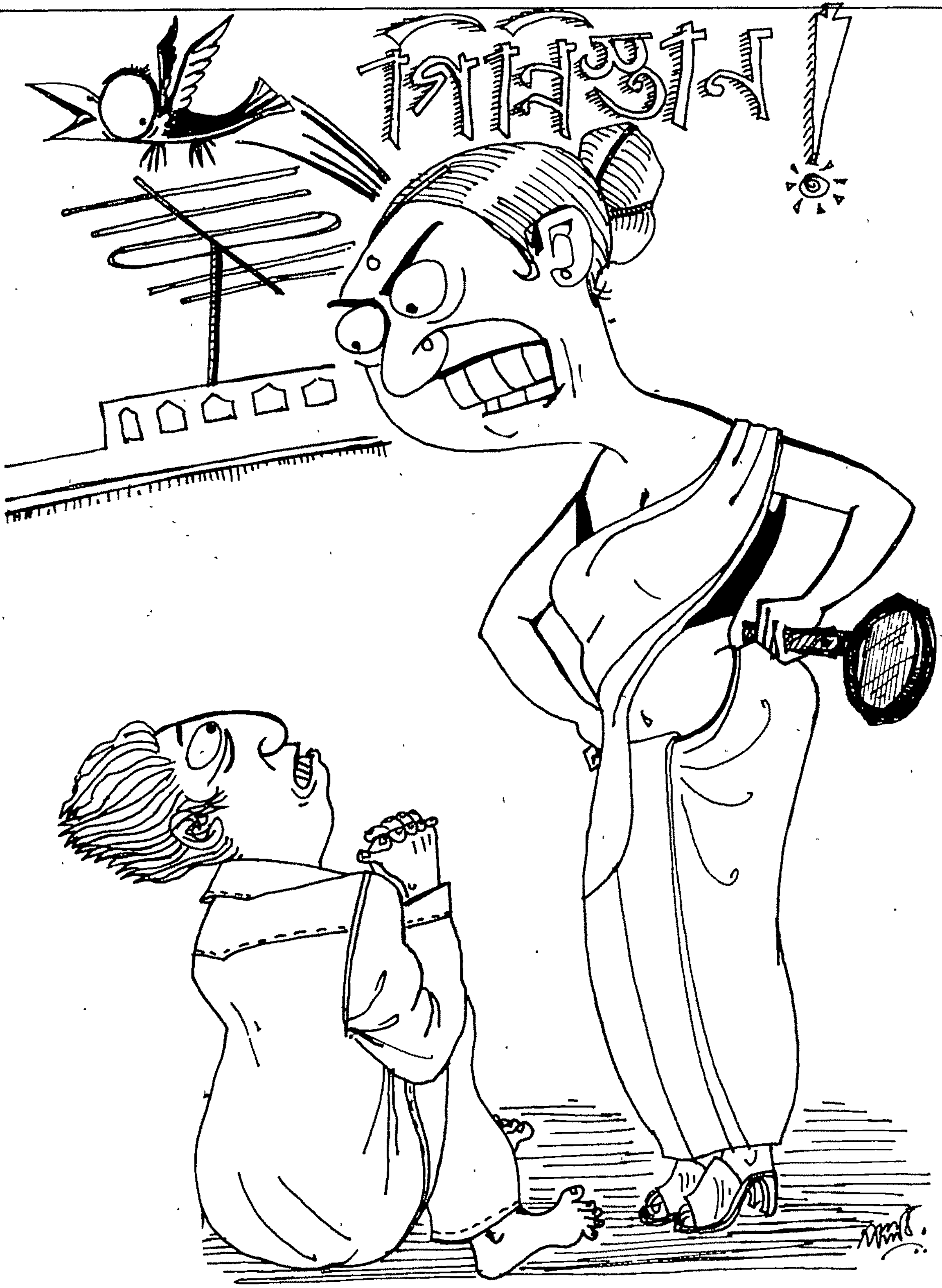

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

সম্পাদকীয়

দাদা-চরিত্র

দাদা তো নহেন, ঈশ্বর। সর্বত্র বিরাজমান। সর্বভূতেষু। সর্ববর্তমানেষু এবং সর্বভবিষ্যতেষুও বটে। সুযোগ পাইলেই তিনি বোমা-পিস্তল-বন্দুক-মর্টার সহ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। দাদা দি গ্রেট আমেরিকা হইতে শুরু করিয়া বালক ভিয়েতনাম কিংবা 'মেরা দাদা মহান' লাদেন হইতে পাড়ার রকের রোমিও দাদাটি পর্যন্ত—রোয়াব কাহারো কম নহে। এই তো তিন দশক পূর্ব পর্যন্ত ভিয়েতনামে মার্কিনদাদা কেশর ফুলাইয় নখদন্ত মেলিয়া ছিলেন। কিন্তু অপর দুই মহাদাদা সোভিয়েত ও চীন তলে তলে ঘা মারিয়া মার্কিনদাদার মুখ ভোঁতা করিয়া আপন অন্তঃপুরে ফেরত পাঠাইলেন। তারপর মুক্তি পাইয়া শিশু ভিয়েতনামও দাদা হইয়া উঠিল, ঝপাং করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল কাম্পুচিয়ার উপর। এ হেন বেয়াদবিতে রুষ্ট হইয়া তস্য দাদা চীন ভালোরকম উত্তম-মধ্যম উপহার দেওয়ায় ভিয়েতনামের মাথা ঠাণ্ডা হইল।

আবার আফগানিস্তানে থাবা বসাইলে সোভিয়েত দাদাকে ভিয়েতনাম-জ্বালা একই কৌশলে প্রত্যুপহার দিলেন মার্কিনদাদা। কসোভোয় মার্কিনদাদা ও রাশিয়াদাদা পরস্পরের প্রতি তড়পাইলেও কেহ কাহারো গায়ে আঁচড়টি কাটিলেন না। কেন না, বড় দাদারা সরাসরি মারপিট করেন না। সভ্যতা বলিয়া একটা ব্যাপার আছে না! নিজেদের কোঁদলের নিমিত্ত একটি দুর্বল বলিব প্রযোজন হয়। এই ধারা চলিতেছে, চলিতে থাকিবে। জনা পাঁচেক বড় দাদা—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইতে যাঁহারা স্ব-ঘোষিত জেনারেল হইয়া বসিয়া আছেন—আর কাহাকেও তাঁহারা দাদা হইতে দিবেন না। কোনো নূতন দাদাপদ সৃজন তাঁহাদিগের বিলকুল না-পসন্দ্। যাহা কিছু করিবে তাহা করিতে হইবে দাদার পদে মতি সমর্পণ করিয়া, দাদার ইচ্ছানুসারে, দাদার তুষ্টি ও স্বার্থ চরিতার্থতায়।

দাদাগণ চিরঞ্জীবী হউন। তাঁহাদিগের দাদারথ অনন্ত পরমায়ু লইয়া চলিতেই থাকুক। কিন্তু যদি সে আসিয়া পড়ে, সেই যে—দাদার দাদা। তখন!! কিন্তু কে সে? জন্মিল কবে? নাঃ, তাহার টিকিও দেখা যায না। ওসব অলীক স্বপ্নমাত্র। অতএব নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত?? কে বলিতে পারে? কোথাও সে চুপি চুপি বাড়িয়া উঠিতেছে না তো? কোনো অজ্ঞাত গোকুলে?? এ ভরসা কে দিবে! দাদার দাদা আবির্ভূত হইলে দাদাব কাছা কে সামলাইবে? মুক্তকচ্ছ দাদাদিগের সেই রূপ—আহা, ছিঃ—অমন কথা মুখেও আনিতে নাই।

দাদাকীর্তন

মৈনাক মিত্র

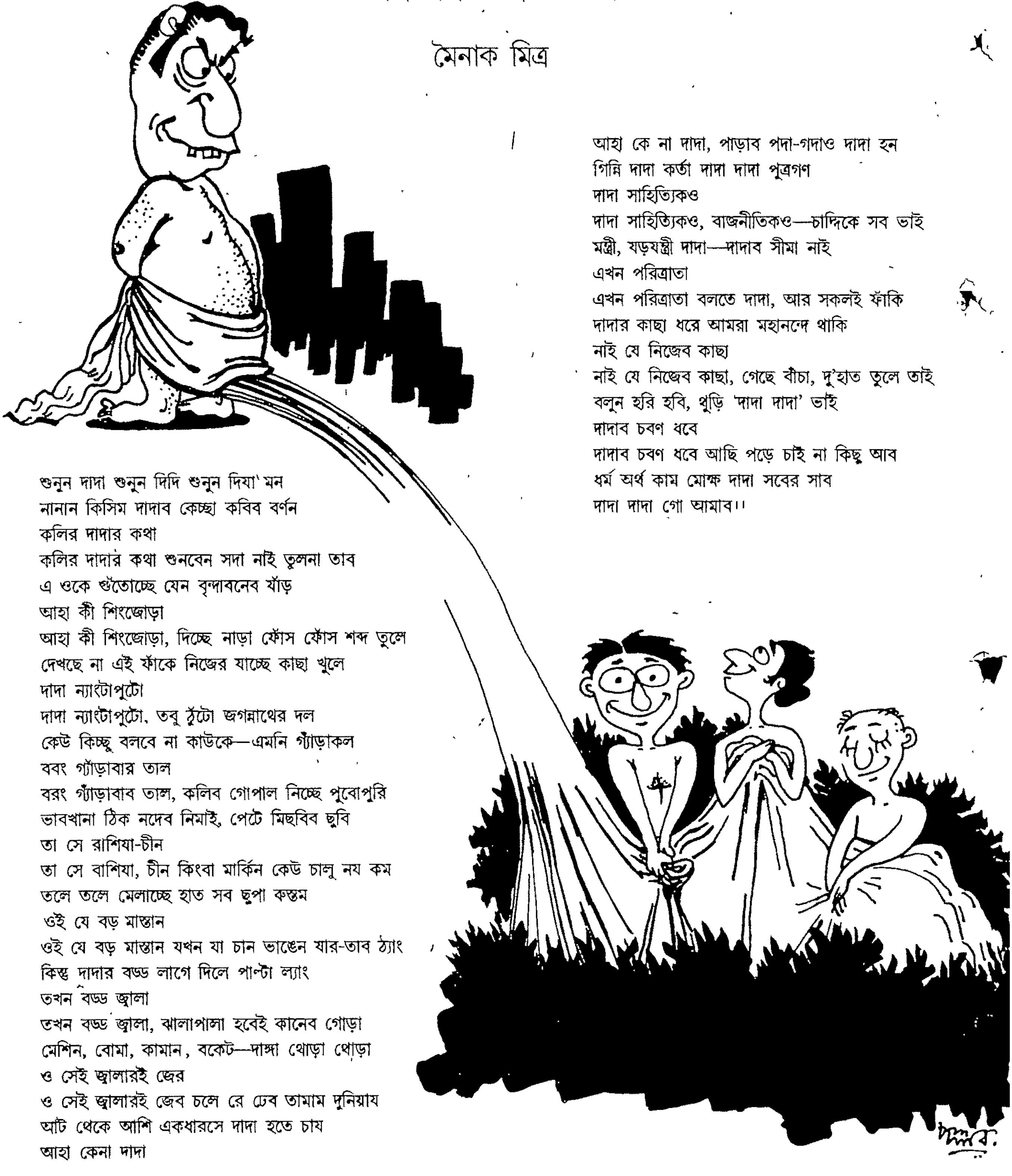

শুনুন দাদা শুনুন দিদি শুনুন দিয়া' মন
নানান কিসিম দাদার কেচ্ছা করিব বর্ণন
কলির দাদার কথা
কলির দাদার কথা শুনবেন সদা নাই তুলনা তার
এ ওকে গুঁতোচ্ছে যেন বৃন্দাবনের ষাঁড়
আহা কী শিংজোড়া
আহা কী শিংজোড়া, দিচ্ছে নাড়া ফোঁস ফোঁস শব্দ তুলে
দেখছে না এই ফাঁকে নিজের যাচ্ছে কাছা খুলে
দাদা ন্যাংটোপুটো
দাদা ন্যাংটোপুটো, তবু ঠুঁটো জগন্নাথের দল
কেউ কিচ্ছু বলবে না কাউকে—এমনি গ্যাঁড়াকল
বরং গ্যাঁড়াবার তাল
বরং গ্যাঁড়াবার তাল, কলির গোপাল নিচ্ছে পুরোপুরি
ভাবখানা ঠিক নদের নিমাই, পেটে মিছরির ছুরি
তা সে রাশিয়া-চীন
তা সে রাশিয়া, চীন কিংবা মার্কিন কেউ চালু নয় কম
তলে তলে মেলাচ্ছে হাত সব ছুপা রুস্তম
ওই যে বড় মাস্তান
ওই যে বড় মাস্তান যখন যা চান ভাঙেন যার-তার ঠ্যাং
কিন্তু দাদার বড্ড লাগে দিলে পাল্টা ল্যাং
তখন বড্ড জ্বালা
তখন বড্ড জ্বালা, ঝালাপালা হবেই কানের গোড়া
মেশিন, বোমা, কামান, রকেট—দাঙ্গা থোড়া থোড়া
ও সেই জ্বালারই জের
ও সেই জ্বালারই জের চলে রে ঢের তামাম দুনিয়ায়
আট থেকে আশি একধারসে দাদা হতে চায়
আহা কেনা দাদা

আহা কে না দাদা, পাড়ার পদা-গদাও দাদা হন
গিন্নি দাদা কর্তা দাদা দাদা পুত্রগণ
দাদা সাহিত্যিকও
দাদা সাহিত্যিকও, রাজনীতিকও—চাদ্দিকে সব ভাই
মন্ত্রী, ষড়যন্ত্রী দাদা—দাদার সীমা নাই
এখন পরিত্রাতা
এখন পরিত্রাতা বলতে দাদা, আর সকলই ফাঁকি
দাদার কাছা ধরে আমরা মহানন্দে থাকি
নাই যে নিজের কাছা
নাই যে নিজের কাছা, গেছে বাঁচা, দু'হাত তুলে তাই
বলুন হরি হরি, খুড়ি 'দাদা দাদা' ভাই
দাদার চরণ ধরে
দাদার চরণ ধরে আছি পড়ে চাই না কিছু আর
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাদা সবের সার
দাদা দাদা গো আমার।।

বইয়ের নিয়তি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

বইয়ের স্মৃতির কথা অনেক লিখেছি, তাতে লেখা শেষ হওয়ার নয়। জীবনে যে-সব বই এসেছে, থেকেছে (আবার তাদের কেউ কেউ চলেও গেছে)—তার স্মৃতিই এখন স্মৃতির বড় অংশ আমার। এমনও ঘটেছে বার কয়েক যখন এমন সব স্মৃতি হঠাৎ করে ভেসে উঠেছে মনের মধ্যে যে-দৃশ্য আসলে বইয়ের পৃষ্ঠা থেকেই গড়ে নিয়েছি। একজন মানুষকে একবার ভোররাতের স্বপ্নে দেখেছিলাম, তিনি আমাকে আমার স্বর্গত পিতৃদেবের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর তাতে আমার বুকভরা আনন্দও হয়েছিল। কেউ আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেই আমি বুঝে যাই যে তিনি এক বিশেষ বিগত সময়ের মানুষ, বিশেষ গুণপনারও হয়ত। কারণ বাবা আমার কাছে এক ভিন্ন জগৎ, ভিন্ন সময়। তো স্বপ্নের সেই ভদ্রলোক— বস্তুত একজন ইংরেজ সাহেব—যখন শুনলেন যে আমার পিতৃদেব দেহ রক্ষা করেছেন তিনি খুব বিষণ্ণ মুখে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন এবং মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিলেন। আমি তখন মন দিয়ে সাহেবকে দেখতে লাগলাম, আর ঘুমটা কেটে গেল।

আমি সেই থেকে মনের ভেতর হাতড়াই ওই ইংরেজ ভদ্রলোকটি বস্তুত কে। উত্তর পাই না, উত্তর পাই না, উত্তর পাই না . তারপর হঠাৎ একদিন 'আ বুক অফ্ ইংলিশ এসেজ' নামের এক রচনা সংকলন পড়তে পড়তে আটকে গেলাম আমার এক প্রিয় প্রাবন্ধিক রিচার্ড স্টিলের একটা লেখায়, 'রিকালেকশনজ অফ চাইল্ডহুড'-এ। শৈশব স্মৃতির কথা লিখতে লিখতে স্টিল যেখানে বর্ণনা করেছেন তাঁর পিতার মৃত্যুদিনের।

> এখন এই লেখাটাও যে ওঁরাই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন না, তারই বা কী নিশ্চয়তা?

স্টিলের এই রচনা আমি পুর্বে বেশ ক'বার পড়েছি, বিশেষ ওই জায়গাটায় এলে আমার গলায় কান্নাও জমেছে, কিন্তু মনে পড়ে না আমার বাবার প্রয়াণের সঙ্গে ওই ঘটনাকে তুলনা করে দেখেছি কিনা। অথচ সেদিন কিরকম যেন হিংসে হতে শুরু করল রচনার ওই অংশে এসে মনে হল সপ্তদশ শতকের শেষ দিকের এক মৃত্যুর মধ্যে (স্টিলের পিতার মৃত্যু হয় লেখকের বয়স যখন পাঁচ, ফলে সনটা দাঁড়ায় ১৬৭৭) আমার বাবার মৃত্যুর দিনের ছবি তোলা আছে। পাঁচ বছরের শিশুর মাথায়ই ঢুকছে না বাবা অত নিথর হয়ে শুয়ে কেন, আর কেনই বা সেদিন বাড়ির কেউ ওর সঙ্গে খেলায় উৎসাহী নয়। স্টিল লিখেছেন, 'The first sense of sorrow I ever knew was upon the death of my father, at which time I was not quite five years of age. but was rather amazed at what on the house meant, then possessed with a real understanding why nobody was willing to play with me I remember I went into the room where his body lay, and my mother sat weeping alone by it'

বাবার মৃত্যুকালে আমার বয়স আট, কিন্তু আমারও সেই প্রথম মৃত্যু দর্শন। বাড়িশুদ্ধু সবাই কাঁদছে আর অদূরে মা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে—এ দৃশ্য আমি কোনোদিনও ভুলব না। সদ্যপ্রয়াত বাবা, অসহায় মা আর আমি—এই ত্রিকোণ, সূক্ষ্ম সংসার ঠিক অনুরূপ ব্যঞ্জনায় আরেকজনের স্মৃতিতে ধরা পড়েছে দেখে (হিংসের কথা আগেই বলেছি) আনন্দ-বেদনার এক অদ্ভুত আন্দোলনও বোধ করলাম ভেতরে। প্রিয় লেখক স্টিলকে প্রিয়জনও ভাবতে শুরু করলাম। আর মনে হল অনেক দিন আগের সেই স্বপ্নে-দেখা সাহেবটা আসলে রিচার্ড স্টিল। অর্থাৎ সাহেব আমার জীবনে দেখা কোনো মানুষ নন, আমার পাঠস্মৃতি থেকে ভেসে ওঠা এক মূর্তি। ধারণাটা ক্রমশ এতই দৃঢ়মূল হল যে আমি এখন সাহিত্য বা ইতিহাসের কোনো বই ঘেঁটে রিচার্ড স্টিলের প্রতিকৃতি দেখতে ভয় পাই (আমি স্টিলের কোনো ছবি দেখিনি কখনো), পাছে আমার স্বপ্নের সেই সাহেবের সঙ্গে স্টিলের চেহারার মিল বেরিয়ে পড়ে।

মুদ্রিত হরফে প্রকাশিত তথ্যকে তো আমরা একটু বেশি-বেশিই বিশ্বাস করি। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শোনা ঘটনার চেয়েও যে-কারণে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের ছাপানো খবর। কিন্তু মুদ্রিত হরফে প্রকাশিত কোনো কল্পকথাকেও যেভাবে আমরা বিশ্বাসের বস্তু করে নিই তাতেই আমার

আশ্চর্য লাগে খুব। এই বিশ্বাসটা আমার এমন এমন বযসে, সমযে, গভীরতায ঘটেছে যে মাঝে মাঝে এখন আমি নিজেব মনেব দিকে চেয়ে বসে থাকি ঠায। নিজের মনকে, নিজের স্বপ্নকে তখন বিশ্লেযণের বিষয মনে হয। এক-আধটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়।

প্রথমে বলি পাঠস্মৃতির ও সেই পাঠাশ্রিত কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল না হওয়ার ঘটনাটা। অর্থাৎ নিজের কল্পনাকে এতটাই বিশ্বাস করে বসেছি যে সম্মুখের বাস্তব থেকে কোনো সাড়াই পাচ্ছি না ভেতবে। ঘটনাটা এই: আমি ছেলেবেলা থেকেই গত শতাব্দীব লণ্ডনেব ভযঙ্কর সিবিয়াল কিলাব জ্যাক দ্য রিপার সংক্রান্ত কাহিনীর একনিষ্ঠ পাঠক। তাই ১৯৭৭-এ প্রথম লণ্ডনে গিযে এক সুযোগে ইস্ট এণ্ড পল্লিতে টুঁ মেরেছিলাম। বলা বাহুল্য, বাস্তাগুলো খুঁজে খুঁজে শনাক্ত করতে হবে বলে সন্ধের পব না গিযে ভব দিনেব বেলায চলে গিযেছিলাম সেখানে। এছাড়া এও সত্যি যে, অন্ধকাব নামাব পর ও-পাড়ায় একা-একা চরে বেড়াবার মতো সাহসও পাইনি। আমাব পাঠস্মৃতি এমন সব জটিল কল্পনা সৃষ্টি করে, যাব মধ্যে ভয় এক প্রধান উপকরণ।

কিন্তু হায, হায়। দিনেব বেলা রাস্তাগুলোয ঘুরতে ঘুরতে এমনকি সেই বেজ্রায় অখ্যাতির পাব 'দ্য টেন বেলস'-এব সামনে দাঁড়িযেও কিছুতেই মেলাতে.পারি না পাড়াটাকে রিপাবের সময়, জীবন ও কুকর্মের সঙ্গে। প্রায এক শ' বছবের মতো সমযে এবং বিস্তীর্ণ নগরোন্নয়নে জায়গার ভূতটা কবেই যেন পালিয়ে বেঁচেছে। তবু এই জাযগাটাই তো বাস্তব— তা আমার কল্পনার সঙ্গে মিলুক আব না-ই মিলুক—তাই ভেবে অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। তারপর এক সময থেমে পড়লাম এক অন্যবকম ভযের আক্রমণে, ভয় হল এভাবে আবো ঘোবাঘুরি কবলে বিপারকে নিযে আমার ভিতরের রহস্যটুকুই উবে যাবে।

আমার পাঠস্মৃতি এমন সব জটিল কল্পনা সৃষ্টি করে, যার মধ্যে ভয় এক প্রধান উপকরণ।

অথচ একদিন সোহো পাড়ার সংলগ্ন এক রাস্তা বেয়ে বাড়ি ফিবছিলাম একটা খুনের ছবি দেখে, আলোয় ঝলমল করছে গোটা রাস্তা, সারি দিযে হোটেল, বার, রেস্টোরান্ট, নাইটক্লাব ইত্যাদি, আর একটু বেশি রাত বলে নির্জনও। কিংবা রাস্তাব লোকজন সব হোটেল, পাব--এ ঢুকে বসে আছে। আমি একাই হাঁটছি একটা ফুটপাথ ধবে, শান বাঁধানো ফুটপাথে নিজেরই জুতোর খটখটানি শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ—একেবাবেই হঠাৎ—মনে হল আমার পিছনেও কেউ একটা হাঁটছে।

ভাবলাম, হাঁটছে হাঁটুক। রাস্তা তো হাঁটাব জন্যই, আর বাস্তা তো আমার একার নয়। কিন্তু.....কিন্তু ভাবনাটা বেশিক্ষণ এরকম থাকল না। খুনেব ছবি দেখেছিলাম বলেই কিনা জানি না, নাকি সোহোব পাশাপাশি ওই এলাকার স্থানমাহাত্ম্যে—আমি ভাবতে শুরু করলাম এইভাবেই হয়ত এক কালে বারবনিতাদেব তাড়া কবত জ্যাক দ্য বিপাব।

ভাবনাটা উদয় হতে একটা শিহরণ জেগেছিল, একটা চাপা স্ফূর্তি , দিনেব বেলা ইস্ট এণ্ডে ঘুবে যে অনুভূতি হযনি সেটাই যেন অযাচিত ভাবে ফিবে এল। কিন্তু লম্বা রাস্তাব আর কিছুটা পার হতে সে শিহরণ এতই জোবালো হযেছে যে আমি একবারটি মাথা ঘুরিযে পিছনে তাকাতেও সাহস পাচ্ছি না। শুধু জোরে জোবে পা ফেলে এগোচ্ছি টিউব স্টেশনের দিকে। কিন্তু. ভাবনাটাও ভেতর থেকে যাচ্ছে না—রিপাব এভাবে পিছু নিত মেযেদের।

শেষে টিউব স্টেশনের কাছাকাছি এসে বেশ কিছু লোকজন দেখে পিছনে চাইলাম যখন ? দেখি এক প্রৌঢ়া মেমসাহেব একগুচ্ছের শপিং ব্যাগ হাতে ঝুলিযে আমার পিছন পিছন আসছেন। কে জানে, হযত, নির্জন রাস্তায় (বদনামি বাস্তাও বটে।) একটি মানুষকে অন্তত সামনে পেয়ে কিছুটা বল পাচ্ছিলেন মহিলা মনে। কিন্তু যার ভরসায হাঁটছিলেন তার মনের দশার কথা যদি জানতেন।

ঘটনা দুটো একটাই কথা ভাবায আমাকে। তা হল আমাব জীবনের বাস্তব অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় আমার পাঠের স্মৃতি ও কল্পনার দ্বাবা। আমার মনের গঠনেই হোক, গুণেই হোক আমি খুব স্মৃতিবন্দী মানুষ। দিনের অনেকখানি সমযই আমি স্মৃতিব মধ্যে বাস করি, মন দিযে কিছু না করলে আমাব শুধু মনে পড়ে, মনে পড়ে আর মনে পড়ে। এই মনে পড়ার মধ্যে যে কত কী থাকে তার তালিকা করা আকাশের তারা গোনাব মতো অসম্ভব কাজ। কিন্তু এইটা টের পাই বেশ কিছুদিন ধবে যে আমাব সব মনে পড়াই নির্ভেজাল স্মৃতি নয়, কিছু কিছু মনে পড়া হল নিজেব অজ্ঞাতে, বিনা প্রয়াসে, গড়ে ওঠা কাল্পনিক স্মৃতি। তবে কাল্পনিক বলে মিথ্যা স্মৃতি নয়, বানিয়ে নেওয়া (সচেতন ভাবেও বানানো নয) এক অন্যরকম স্মৃতি। যাকে বাস্তব থেকে আলাদা করা অত সহজ নয়। স্মৃতিতে আশ্রিত বাস্তবও কি খুব নির্ভবযোগ্য বাস্তব ? আবার এমন বাস্তবও তো আছে, যে লণ্ডনেব ইস্ট এণ্ডে ছড়ানো জ্যাক দ্য রিপারের স্মৃতি-অধ্যুষিত বাস্তব, যাকে মন মেনেই নিতে পারল না।

বই থেকে আমার জীবনও স্বপ্নে এমন একটা স্মৃতি গঠিত হযেছে যাব বিশেষ বিকল্প নেই আমার জীবনে। যে দৃশ্য নির্ভর করে এই স্মৃতি তা হল একটা গভীব নীল সমুদ্রের, যার বেলাভূমি হল সাদাটে আব সোনালি বালিতে গড়া। সমুদ্রেব ওপর আকাশটা হল শবৎনীল। বেলাভূমিব একখানে সাদা (কিছুটা ঘিযেটেও) পাথরের এক আকাশচুম্বী অট্টালিকা (দুর্গ মনে কবলেও কবা যায়), যার গাযে কোনো জানলা বা দবজা নেই। আর সেই ইমারতের কোনো এক জায়গা থেকে আমি একই সঙ্গে সমুদ্রতট আকাশ ও ইমারত দেখছি । আব সে যে কী আনন্দ মনের ভেতরে তা সাবাজীবন কলম পিশে বর্ণনা করতে পারব না। দৃশ্যটা এতবার দেখেছি এবং আনন্দ পেয়েছি যে এখন জেগে জেগেও দৃশ্যটা আমি মনেব মধ্যে ফিবিয়ে আনতে পারি এবং যে কোনো মনের ভার এক নিমেযে দূব করতে পারি; কিন্তু, কিন্তু দৃশ্যটা আমি চর্ম চক্ষে কখনো দেখিনি। এর উৎস, আমাব ধারণা, আলব্যের কামুর করা সমুদ্র বর্ণনা তাঁর একাধিক রচনায, বিশেষত 'লেতে' বা 'Summer' অর্থাৎ 'গ্রীষ্ম' বচনায। এই 'গ্রীষ্ম' নামকবণটা ওঁর নিজের কবা নয, উনি শুধু তাঁর বাল্য কৈশোরের দোলনা, যৌবনের লীলাভূমি আলজিরিযার সেই গ্রীষ্মশাসিত ওরান নগরীটিকে নিযে লিখেছেন তাঁব 'সিলেক্টেড এসেজ অ্যাণ্ড নোটবুকস'-এ (ওরান ওঁব অতুলনীয় 'প্লেগ' উপন্যাসেরও পটভূমি), কিন্তু সেই ভিন্ন ভিন্ন রচনায় নগবীর গ্রীষ্ম, সৈকত ও সমুদ্রের গ্রীষ্মের পাশাপাশি যে সব অবিস্মরণীয় দৃশ্য ফুটে উঠেছে তা, আমার ধাবণা, কাব্যেরও অতীত। এক শ্রেষ্ঠ ফরাসি গদ্য ব্যবহার করেছেন কামু এই সব বর্ণনায়, যা দৃশ্যকে বাস্তবের ঊর্ধ্বে তুলে তাকে স্বপ্নের এলাকায পৌঁছে দিযেছে। অন্তত আমাব স্বপ্নে তো বটেই। কিযৎপূর্বে যে স্বপ্নে দেখা সমুদ্রেব বর্ণনা দিযেছি তা আমার কামুব লেখা থেকে পাওয়া। দোষ ত্রুটির অভাব আমার চরিত্রে অবশ্যই নেই, তবে সেই সব দোষেব মধ্যে ঈর্ষা ব্যাপাবটা নেই—এ আমার আশপাশেব লোকজনও মনে হয় স্বীকাব কববেন। তবে যেটুকু যা ঈর্ষা আছে তার অনেকটাই কামুব প্রতি তাঁর সমুদ্রকূলে কাটানো বাল্য-কৈশোর-যৌবনের জন্য, দারিদ্র্যেব ছায়ায় বড় হতে হতে তাঁর সমুদ্রবিলাসী হয়ে ওঠায।

তাঁর ডায়েরিতে এক জায়গায় কামু লিখছেন—

'I grew up in the sea and poverty was sumptuous, then I lost the sea and found all luxuries grey and poverty, unbearable Since then. I have been waiting I wait for the homebound ships, the house of the waters, the limpidity of day I wait patiently, am polite with all my strength Men see me walk by in fine and learned streets I admire landscapes, applaud like everyone else, shake hands. but it is not me speaking

'Thus, though I possess nothing. have given away my fortune, camp by the side of all my houses, I can still be blessed with all riches when I choose, set sail at every hour, unknown to despair There is no country for those who despair, but I know that the sea comes before and after me, and held my madness ready'

তারপর আরেক জায়গায় লিখছেন—

'We sail across spaces so vast they seem unendig Sun and Moon rise and fall in turn, on the same thread of light and night Days at sea. even and indistinguishable as happiness . '

খুব ভালো গদ্য, খুব ভালো স্টাইল, বর্ণনা বা কাহিনী পড়লে আমরা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলি 'স্বপ্নের রচনা'। কামুর নোটবুকস, কামুর স্মৃতিময় নিবন্ধাবলীকে আমি ঠিক এই ধারায় 'স্বপ্নের রচনা' বলে ক্ষান্ত হতে চাই না। কামুর এই সব গদ্য বাস্তবিক অর্থে আমার স্বপ্নে প্রবিষ্ট হয়েছে, এবং এতটাই হয়েছে যে একবার ভোররাতের স্বপ্নে সমুদ্র ও তট ও আকাশ দেখতে দেখতে, মনে আছে, আমি স্বপ্নের মধ্যেই ভাবছি—আরে, এ তো কামুর সমুদ্র। আর জাগ্রত অবস্থায়? পুরীতে রৌদ্রালোকে তটে বসে ধেয়ে আসা প্রকাণ্ড সব ঢেউ দেখতে দেখতে আমি ভাবি—কামু হলে এই জল, এই ঢেউ, এই আকাশ, জলবিন্দুতে সূর্যরশ্মির খেলা দেখলে কী ভাবতেন? কী করে, কী করেই জানি আমার স্বপ্নের এবং বাস্তবের সমুদ্রের দখল নিয়ে নিয়েছেন কামু। এবং আমিও এক জাদুকরী সংবেদনে, ওঁর মতো প্রায় ওঁর ভাষায়—ভাবায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি 'I have always felt that I was living on the high seas. threatened. at the heart of a royal happiness'

আমি আমার অনেক গল্প পেয়েছি স্বপ্নে, সে-জন্য স্বপ্নের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। কিন্তু আমার স্বপ্নকেও যে আমি অনেক বই, বইয়ের তত্ত্ব, তথ্য, বর্ণনা, উপহার দিয়েছি এই বোধটা গড়ে ওঠার পর খুব স্বস্তি পেয়েছি। একেক সময় গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছি—কারো বই থেকে স্বপ্ন তৈরি হলে সেই ঋণ স্বীকার করার উপায় কী? রিচার্ড স্টিল, আলবেয়ার কামু, হর্হে লুইস বর্হেস বা দার্শনিক পাস্কাল আমার নানা স্বপ্নের নির্মাতা, স্টিলকে নিয়ে ইতোপূর্বে লেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু অন্য তিনজনের কথা আমি মাঝেমাঝেই লিখি, বা ওঁরাই আমাকে দিয়ে কিছু না কিছু লিখিয়ে নেন। বইয়ের মাধ্যমে যে সম্পর্ক এক সময় স্থাপিত হয়েছিল তা এখন স্বপ্নে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমি নিজের কথা লিখতে গিয়েও ওঁদের কথা লিখে বসি। ওঁদের লেখা পড়তে পড়তে নিজের জীবনটা চোখের সামনে দেখি। এখন এই লেখাটাও যে ওঁরাই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছেন না, তারই বা কী নিশ্চয়তা?

আমি এখন তাই কলম গুটিয়ে স্বপ্ন দেখায় ফিরে যাই।

কী লিখেছেন মেমসাই? এক কপিও বিক্রি হয়নি!
প্রকাশক
আমি লিখলুম কোথায়? এটা তো—— স্বপ্নে-পাওয়া সাহিত্য!

পুরনো কাসুন্দি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের “প্রফুল্ল” নাটক থেকে

তামাক খাবে খাও মেলা-বক্ বক্ কচ্ছো কেন?
Subho

কাঙ্গালীব ডাক্তারখানা

সুরেশ। কি বহুরূপী বিদ্যাধবি, বিদ্যেধর কোথায়?

জগ। এদিকে তো খুব চালাকী হয, কাজের চালাকী তো কিছু দেখ্‌তে পাই নি; সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়তিস।

সুরেশ। চালাকী এক দিনেই শেখে বিদ্যাধবি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাকতে থাকতে দুটো একটা শিখবো বৈকি। একছিলিম তামাক সাজো, বেশীক্ষণ বস্‌বো না, নগদ পয়সা, দু'ছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। বসো তামাক খাও।

সুরেশ। বাবাঠাকুবের নিষ্ঠেটুকু আছে, পূজোর মন্তর কি?—কস্যং গলাং কাটিতং—কাব গলা কাটবো?

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না; যাও তুমি বাড়ী থেকে বেবোও।

রেশ। তা শিগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রেব সভায নাচ্‌তে যাও কি পোযাকে না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপবাসী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকাব।

গ। তামাক খাবে খাও মেলা বক্ বক্ কচ্ছো কেন?

রেশ। আচ্ছা চাপরাসীরূপে তো বিল সাধো, খান্‌সামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধবীরূপে তো টাকা ধাব দাও,—আর ক'টি রূপ আছে বিদ্যাধরী, আমায় প্রকাশ ক'রে বল দেখি? (সুর করিযা)

“ঘুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ।”

জগ। চোপ্ ষ্টুপিড্।

সুরেশ। বিদ্যাধরি, আবার বল, তোমার ইংবেজী বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, আর এই দা-কাটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্। গাধা ছোকরা, তোকে বলি শোন্। রোজ বোজ দু'চাব টাকা ধার করিস্ কি কর্ত্তে? আমি কিন্তু চার টাকায চল্লিশ টাকা না লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে, তাব চেযে কেন বিষযটা ভাগ করে নে না?

সুরেশ। বাহ্বা বাঃ বহুরূপিণী বিদ্যাধবি, সাবাস্। এ দোকান তুলে দিয়ে এবার জেলায মোক্তারীতে বেরোও, আমি তোমায় চাপ্‌কান পাগড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙ্গালীচরণ)। জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্?

সুবেশ। খুড়ো, আমি—বিদ্যাধরীব বক্তৃতা শুন্‌ছি, আব খরসান খেযে কাস্‌ছি।

কাঙ্গালীচরণের প্রবেশ

কাঙ্গালী। কে ও সুরেশ? কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম দু'চার টাকা ক'রে ধাব কব্‌ছিস্ কেন? বিষয বখ্‌রা করে নে, উকীলের চিঠি দে, আমরা থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্ছি, তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙ্গালী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রমে বুঝবে—ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে ক'রে?

সুরেশ। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যাধবীর যুগল দর্শন, আর গোটাকতক টাকা কর্জ্জ।

জগ। একশো টাকাব নোট কর্জ্জন তো।

সুরেশ। রূপসী, তাব কি আর অন্যথা হবে?

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দুশো টাকা লিখে দাও তো হয।

সুরেশ। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধরি।

(নেপথ্যে রমেশ)। কাঙ্গালী, বাবু বাড়ী আছেন?

কাঙ্গালী। কে। —বকেয়া নাম ধ'রে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল—“এ হরিহব বাবুব বাড়ী, কাঙ্গালী বাবুব বাড়ী নয়।”

সুবেশ। ও বিদ্যাধবি, আমায় খিড়্‌কি দোর দিযে বা'র কবে দাও, মেজদা।

জগ। যাও, বাড়ীর ভেতর দিযে পালাও, রান্না-ঘরের জান্‌লা ভাঙ্গা আ[illegible] সেই খান দিয়ে বেরিযে পড়। সুবেশের [illegible]

(নেপথ্যে রমেশ)। বাড়ীতে কে আছে গো,—কাঙ্গালী বাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙ্গালী বাবুব বাড়ি না, হবিচরণ বাবুব বাড়ী।

(নেপথ্যে রমেশ)। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙ্গালী। আমি সরে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস।

কাঙ্গালীর প্রস্থান

জগমণি দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশের প্রবেশ

জগ। আপনি কাকে খুঁজছেন?

রমেশ। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় বলে যান, আমি তার কম্পাউণ্ড।

রমেশ। আপনি মেয়েমানুষ, কম্পাউণ্ডার।

জগ। ও মা তাও ত বটে।

বমেশ। 'তাও ত বটে' কি?

জগ। আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু নেই, আপনি এখন আসুন।

বমেশ। বাবু বাড়ী আছেন বইকি। তুমি যখন কম্পাউণ্ডাব আবার ঝি, বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দবকার আছে, কোন ভয় নেই, বল তাঁর ভাল হবে।

নেপথ্যে কাঙ্গালী। কেরে ঝি—কেরে?

কাঙ্গালীব পুনঃপ্রবেশ

কাঙ্গালী। আমি এই প্রাক্‌টিস (Practice) ক'রে খিড়্‌কি দোর দে ফিরে এলুম।

রমেশ। বসুন বসুন, কাঙ্গালী বাবু বলবো না হরিচরণ বাবু বলবো? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙ্গালী। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমেশ। হ্যাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে ফেবারি ক'রেছিলেন, তার ভাইপো আমায় এই কাগজপত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালেব ওয়ারিণ বাব করবার জন্যে।

কাঙ্গালী। কি আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে বসে অপমান করেন? চাপরাসী—

রমেশ। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা উনি তো হেথা হাজিরই আছেন, ব্যস্ত হবেন না, কি বল্‌তে এসেছি শুনুন, সে কাগজপত্র দেখে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি তা আমাব ধারণা হয়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্কগিরিও ক'রে গিয়েছেন। আমি নূতন আফিস কর্‌বো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক; আপনার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে কাগজও ফিরে দিচ্ছিনে, তাকে ধাপ্পা দিয়ে দিয়েছি যে চাবশো টাকা নিয়ে আয়, সে এখন বিশ বাঁও জলে; এই দেখুন সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙ্গালী। কই দেখি—কই দেখি—

রমেশ। এই দেখুন, এতো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমাব ঠেঁয়ে থাকবে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছিনি। আমি নূতন উকীল বটে তবে নেহাৎ কাঁচা নই; পাঁচবার এক্‌জামিনে ফেল হয়ে তবে পাশ হয়েছি। আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেকবার আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা, তা বটে তো বাবা,—মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর,—তোর কপাল ফিরবে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো বল্লে, যেন ভাগবত পড়লে। কি বাবা, কি কর্‌তে হবে আমায় বল? তুমি যা বল্‌বে ষ্টুপিডের কান ধ'রে আমি করাব।

রমেশ। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমাব ইচ্ছে হয়, এখন কাজের কথা বল।

রমেশ। সুরেশ ব'লে একটি ছোকবা তোমার এখানে আসে?

কাঙ্গালী। কে সুরেশ?

জগ। আ মর, বুড়ো হলি—কাকে বিশ্বাস কর্ত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কর্ত্তে হয় জানিস্ নি?—এসে বাবা এসে।

রমেশ। তোমাব কাছে টাকা ধার করে?

জগ। হ্যাঁ, তা করে।

রমেশ। তার নোটগুলো আমি কিন্‌বো, আব এবাব এলে তাকে বুঝিয়ে ঠিক ক'রতে হবে, যাতে একখানা Bond য়ে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাক্‌বে, তাতে এণ্ডোরস্ (Endorse) করিয়ে নেবে। কথাটা এই, "তাব বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।"

কাঙ্গালী। বুঝেছি বুঝেছি।

বমেশ। বুঝেছ তো?

জগ। বুঝলে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ'মাস বোঝাচ্ছি নালিশ কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিশ কববো না।

বমেশ। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকাব?

কাঙ্গালী। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমেশ। তাকে ভয দেখাও—নালিস কর্‌ব।

জগ। সে তো তাই চাই, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে তুমি কি করবে? একটু বুদ্ধি ঘটে নেই।

বমেশ। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি যা ক্লায়েন্ট (Client) জোটাবেন, তারই কস্ট(Cost)য়েব দশ আনা ছ'আনা। সেই আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙ্গালী। তা বাবা আমার হাতে তো ক্লায়েন্ট নেই, আমি একটা বদনামী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিছু মাইনে না দিলে চল্‌বে না। যা হোক, ডিস্পেন্সারি খুলে নিকিবীপাড়া, ডোমপাড়া বেড়িয়ে গড়ে আনা আষ্টেক ক'রে দিন পোযায়, আরো আবো সব কার্য্য আছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা কুড়িক ক'রে টাকা দিও, তারপর কস্টের দশ আনা ছ'আনা বল্‌ছো, চার-আনা বার-আনাতেও রাজী আছি।

বমেশ। আচ্ছা, তাব জন্যে আটকাবে না।

জগ। তোমার তো একটা পেযাদা চাই?

রমেশ। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন, নতুন আপিস কচ্ছ আমায় কেন রাখ না, আমি তোমাব চিঠি নিয়ে যাব।

রমেশ। তা রূপসি, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুবদাদা, এখানো তো ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চলবে?

রমেশ। চলবে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পাববে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাকব বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্ নি।

রমেশ। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব! রূপসি, চল্লুম।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

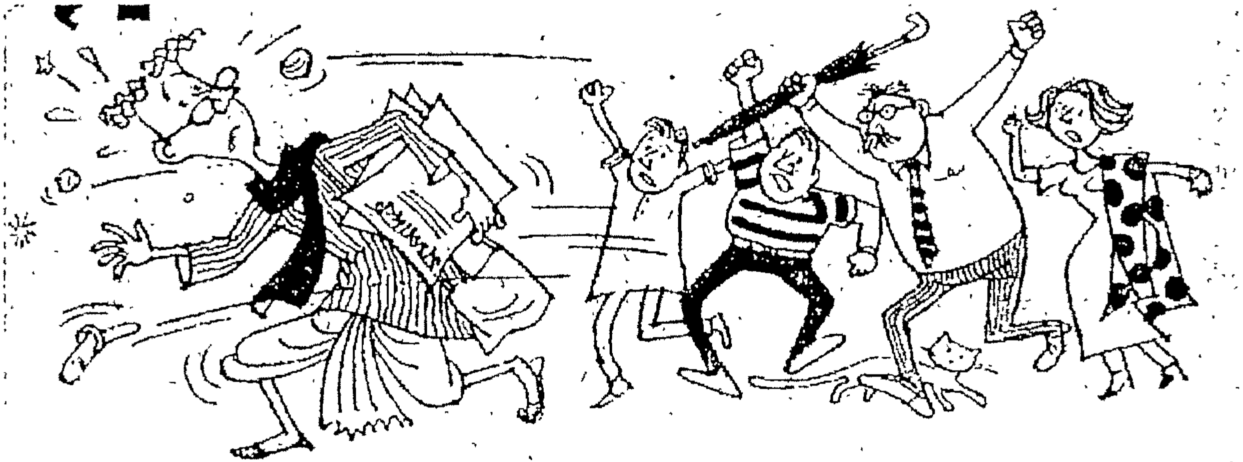

● শাবদীয় পত্রপাঠ দুর্দান্ত হবে শুনেছিলাম। কী এমন রেকর্ড গড়ল?

—বিজয়া বসু। কোন্নগর, হুগলী

☐ কেন, ছাপার ভুলের!

● শিয়ালদায় আপনাদেব শারদীয সংখ্যাব বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে দেখলাম বুদ্ধদেব গুহব নামটি ভুল লেখা হয়েছে— বুদ্ধেদেব গুহ। এ ভুল অমার্জনীয় অপরাধ।

—মইনুল শেখ, মছলন্দপুর, উঃ ২৪ পরগণা

☐ আরে ভাই, ওটা ভুলও নয়, অপরাধও নয, শিল্পীর স্বাধীনতা। হোর্ডিং যাঁরা লেখেন তাঁবা শিল্পী—এ-ও জানেন না? শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে নেই।

● পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী শারদীয় সংখ্যায় একটি চমৎকাব উপন্যাস লিখেছেন—বিদ্যাকাণ্ডে লণ্ডভণ্ড। কিন্তু সূচীপত্রে তাঁব নামটিকে আপনারা লণ্ডভণ্ড করে ছেপেছেন—পিনাকীশঙ্কর ভাদুড়ী।

—প্রীতিকণা মুখার্জী, কলকাতা-৫

☐ লণ্ডভণ্ড নয় ম্যাডাম, সম্পাদনা। সম্পাদক যদি গোটা লেখাটায় সম্পাদনার চান্স না পান...... কোথাও না কোথাও তাঁকে তো একটু সম্পাদনা করে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি সম্পাদক। আপনি কি চান বেচারা সম্পাদক কিস্সুটি না করে তাঁর চাকরিটি খোযান? চাকরি গেলে আপনি একটা চাকরি দিতে পারবেন?

● আগামী লোকসভা ভোট কেমন হবে মনে করেন—অন্তবর্তী না সাধাবণ? খাদ্যদ্রব্য, আনাজপাতির দাম বাড়বে?

—মণিকা দাস। কুচবিহার

☐ অসাধারণ! নাঃ, দাম একই থাকবে, তবে কিনা জিনিসেব পবিমাণটা কমে যাবে। যেমন ধরুন আলু প্রতি কেজি ছ'টাকাই থাকবে। কিন্তু কেজি প্রতি কেজিতে অর্ধেক কমে হাফকেজি হয়ে যাবে।

● তিন-তিনবার লেখা পাঠিয়েছি *পত্রপাঠ*-এ। একটাও ছাপেননি। আব কোনোদিন লেখা পাঠাব না। বন্ধুদেরকে অনুরোধ কবব, তারাও কেউ যেন *পত্রপাঠ*-এ না লেখে।

—বিনয় সুকুল, মেদিনীপুর

☐ আহা, এমন দিন কি হবে তারা।

● অটলবিহারী বাজপেয়ী বক্তৃতা দিবার কালে একটি কথা বলিয়া অতক্ষণ বিরতি দেন কেন?

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বটব্যাল, কলকাতা-৬৮

☐ তাঁহার সোনার কথাটিব ওজন ক' রতি হইল, বুঝিবার চেষ্টা করেন।

● ব্যবসায়ী মাত্রেই অসৎ। তবু কোন্ ব্যবসায়ীকে আপনি সবচেয়ে অসৎ বলে মনে করেন?

—বিপ্র দাশগুপ্ত, হাওড়া

☐ যাঁরা *পত্রপাঠ*-এ বিজ্ঞাপন দেন না।

● দেশে পাগলের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। তার শেষতম সংযোজন কি শেখর আহমেদ?

—লতিকা ঘোষাল, পুরুলিয়া

☐ কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সেই বিরল গৌরবের অধিকারী তিনিই ছিলেন, আপনার চিঠিটি হস্তগত হওযার আগে। এখন খেতাবটি আপনার মুঠোয।

● সবকিছুই আপনাবা মন্দ বলেন কেন? সবাই কি খারাপ। আপনাদের নজর অত্যন্ত নিচু।

—সুরঞ্জন ভট্টাচার্য, কাটোযা বর্ধমান

☐ কই, না তো। সবকিছুকে খারাপ বললাম কোথায়, পত্রপাঠকে মন্দ বলেছি কখনো, আপনার মতো।

● সৌরভের স্ত্রী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলেও তাঁর ব্যাটটি ক্রমশই বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে কেন?

—মামণি রায, মেদিনীপুর

☐ ব্যাটটি যে তাঁর স্ত্রী নয়, নিতান্তই লিভ টুগেদাব।

● আপনাদেব কাগজ রাঁচিতে যায়?

—ভবকান্ত সবকার, ১২/৩ অক্ষয়চন্দ্র বাই লেন, কলকাতা-৬

☐ দরকার হয় না, ১২/৩ অক্ষয়চন্দ্র বাই লেনে পাঠালেই সে কাজ সম্পন্ন হয়।

সংস্কৃতি দুঃসংবাদ

পুজোর কিছুদিন আগে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি এক শনিবার সন্ধ্যায় আপাত-নিরীহ ঘরোয়া সভাটিতে না উপস্থিত থাকলে আমাদের জানা হত না যে, রবীন্দ্রনাথ হেমলতা দেবী নাম্নী জনৈকা গৃহবধূকেও কোনো সাহিত্যিক কারণ ব্যতিরেকে দুই শতাধিক পত্র লিখে উত্যক্ত করে গেছেন। মহিলা স্বামীর সংসারে অসুখী ছিলেন। পত্রালাপের সূত্রপাত করেছিলেন তিনিই। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সাহিত্যরসিক শ্রী নৃপেন্দ্র সান্যাল এই পত্র বিনিময় প্রসঙ্গে জানালেন যে, হেমলতা দেবীকে লেখা চিঠিগুলি বাদছাদ দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বভারতীর সৌজন্যে। প্রকাশিত অংশ নিয়ে আমাদের কৌতূহল কম, কী কী অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলি জানা এখন প্রাসঙ্গিক, রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার স্বার্থে।

অনুষ্ঠানটি ছিল অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সমাজচর্চা কেন্দ্রের ৪৩তম অধিবেশন। গত পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে এঁরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সে আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন, আমরা খবর রাখি না।

বাংলা ছন্দের গবেষক প্রয়াত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য ১৯৯৬ সালে এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর সুযোগ্য পুত্র অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে। তিনি আপাতত নিজ বাসগৃহটি এই কাজে ব্যবহার করছেন। অতিথি আপ্যায়নে সহায়তা করেন তাঁর কন্যা উমা। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সমাজচর্চা কেন্দ্র তাঁদের কর্মকাণ্ড বিস্তারে উপযুক্ত সরকারি সাহায্য পাবেন।

—দুঃশাসন

> রবীন্দ্রনাথ হেমলতা দেবী নাম্নী জনৈকা গৃহবধূকেও কোনো সাহিত্যিক কারণ ব্যতিরেকে দুই শতাধিক পত্র লিখে উত্যক্ত করে গেছেন।

কবি-সাপ্তাহিকী

সুবীর মণ্ডল

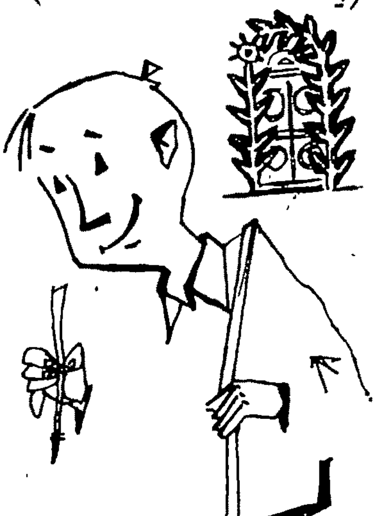

কবি যাঁরা হবেন তাঁরা শুনুন দিয়া মন
কবে কোথায় যেতে হবে দিতেছি বর্ণন।

সোমবার পহেলাদিন থাকে যেন মনে
সেজে-গুজে যেতে হবে কবি সম্মেলনে

মঙ্গলবারে যেতে হবে পত্রিকা দপ্তর
তেলের শিশি থাকে যেন ঝোলার ভিতর

বুধবারে শুভযাত্রা জিন্স-ফিন্স পরে
বিকাল বিকাল চলে যাবেন নন্দন চত্বরে

সোনাগাছি যেতেই হবে বৃহস্পতিবার,
কবি হতে এ অভ্যেসটা অবশ্য দরকার

এছাড়াও নেশা—যাহা কবিতা বাংলায়
শুক্রবারে তাহার লাগি খালাসিটোলায়

যেতে হবে কফিহাউস প্রতি শনিবার
না যদি যান, কবি হওয়া হল না আপনার

রবিবার সকালবেলা উঠুন তাড়াতাড়ি
চুপি চুপি যেতে হবে মস্ত কবির বাড়ি

এসব কথা বলছি শুনুন অভিজ্ঞতা থেকে
করেই দেখুন সপ্তাখানেক, কে রোখে আপনাকে

নেতাশাস্ত্র

গৌতম কুমার দে

কলকাতার এক ব্যস্তসমস্ত রাজপথ। পিক্ আওয়ার্স। মন্থর-মাথাধরা ঝিম্‌ঝিম্-ধুকধুক গতিতে চলছে টিন-প্যাক্‌ড্ বাসটা। শেষমেষ তেল-শেষ প্রদীপের শিখার মতো ক্রমশ স্তিমিত হয়ে একসময় একেবারে থেমে গেল। লাল শালু চিহ্নিত সতর্কবার্তা বিমনা চৈতন্য জানান দিল, তিনি আসছেন। 'তিনি' মানে ইয়ে, আমাদের জনদরদী N্যাতা। নিমেষে, বাক্‌ফোড়নের বিদ্রোহী ফোঁটায় তিনি স্ফুরিত হলেন মডিফায়েড বা সফিস্টিকেটেড পাপড়িসহ। তা যাক গে, আপনি যে সম্ভাষণই করুন না কেন (কেন না কথায় বলে, What's in a name?) একবস্ত্রে ইনি হলেন রাজনীতিতে পরম অব্যয় পদ।

তা N্যাতা বলে কথা। ভেবেছ কি হাতের মোয়া, বললেই যায় হওয়া? প্রদীপের জ্বলন্ত শিখার অন্তরালে যেমন সলতে পাকানোর এক দীর্ঘসূত্রতা থাকে তেমনি হরেকরকম সাধন-প্রসাধন আর মেহনতি রেওয়াজ—তবেই কিনা গড়ে ওঠে অমন N্যাতা।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ (মতান্তরে, স্ব-ভাব যোগ) ও কর্মযোগের এক অব্যর্থ চ্যবনপ্রাশ মেড ইন ইণ্ডিয়া এই তথাকথিত নেতাসামগ্রী। কাণ্ডে-কর্মে শয়নে স্বপনে ইনি ওয়ান-ডে ওয়াণ্ডার্স। যেখানে টিকে থাকার মূল শর্তই হল পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে হবে। ভাগ্যিস ভিন্‌দেশি বামুন না কায়েত কে এক ডারউইন আগেভাগেই বলে রেখেছিলেন—'Survival of the fittest' অর্থাৎ যোগ্যতমের উদ্বর্তন কিনা নচেৎ 'অধিকারী'-র মুকুটচ্যুত হবার সমূহ সম্ভাবনা ব্রঙ্কো-নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হত ষোলার পরে আঠারো আনা বোনাস সহ। স্বার্থের সম্মানে আনঅর্থোডক্স শট্ নেবে? নাও ক্ষতি নেই। তবে এ-লো-কা-সু-ন-দি-র (ইলেকশনের চোলাইয়ে) আসরে দিনকতক তোমাকে বাপু তত্ত্বের ব্যা-করণ মেনে চলতে হবে। তবেই কেল্লা ফতে। এই যেমন—

ভোটের মরশুমে দিনকতক নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণ শ্যাম কলমি লতার মতো একটা সবুজে নবীন দরদী লাবণ্য ফেসিয়াল করতে হবে; হতে হবে লজ্জাবতী লতার মতো সদা-কাব্যময় (টীকা . ছুঁলেই কুঁকড়ে যাওয়া যে কবিতারও স্বভাব); ভোটারের অনুযোগে (অভিযোগ এখন তামাদি হয়ে গেছে) চোখ হবে টলটলায়মান যাতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সারফেস টেনশানে (Surface Tension Theory) তা জলমগ্ন হতে পারে। অবশ্যি নিন্দুকে বলে কিঞ্চিৎ অধিক গ্লিসারিন ডলা হয়ে থাকে। এস্থানে ভাষ্যকার আকাশের জল আর চোখের জলের উৎপত্তিগত তথা স্থানিক ও তাৎক্ষণিক ধোঁয়াশা দূরীকরণে কয়েকটা টোট্‌কা বাতলেছেন। কেননা, এ দুটোর উপাদানগত প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটা মৃন্ময় আরেকটা চিন্ময়; একটা বাঙ্ময়—সারা আকাশ মুখর করে তোলে আরেকটা নৈস্তব্ধে বিরাজ করে সর্ব মনময়। অধিকন্তু নেতার অশ্রুমোচন থুড়ি ডায়ালেক্‌টিক্ দর্শনবর্ষণ—এ দু'য়ের মাঝামাঝি।

সর্বোপরি, ফি-মরসুমে পুজোর চাই নতুন জুতো-র রেকারিং সুরে জেলের সাথে কেলেহাঁড়ির মতো আলগোছে আগুপেছু থাকবে কিছু চামচে গ্যালাবৃন্দ, যারা ভক্তিভরে দেবে স্লো-গান (Slow gun) —

যত বাধা আসুক না প্রস্তরশক্ত
প্রয়োজন হলে দেব এক-নদী রক্ত (হায়, আল মাহমুদ)।

সাধারণ্যে নেতা অগম্য। তিনি হলেন রমতা সাধু,—বহুরূপে বিচরণকারী সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাসদৃশ বিততিপ্রিয় চারুকলা শৈলীর এক অনুপম সত্তা।

নেতা হল চোখের কাজল। যতক্ষণ সে দূরে থাকে ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ—সে কালো। কিন্তু মনশ্চক্ষের বিবাদ বিস্মৃত হয়ে চোখে মেখে নিলে তখন সে সর্বার্থেই স্ক্যামিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, 'নেতা'-কে বুঝতে হলে আগে তার ন্যাওটা হতে হবে। অনুক্ষণ ভজিবে তার কুলগুরু মন্ত্র—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

নেতা হলেন একালের সমাজের বিশল্যকরণী। তাঁর দল হল গন্ধমাদন পর্বত। আর ইলেকশন হল দলমত নির্বিশেষে দ্বি-বাৎসরিক পাঁচড়া সমাগম। নেতা অগতির গতি। যে যমেরও অরুচি সে হতভাগ্যও নেতার কাছে পরম রুচিসম্মত। তার প্রতি নেতার নিঃশুল্ক অভয়াবাণী—

মরণের তরে দু'টি দিন তুমি কোরো নাকো কোনো ভয়
যেদিন মরণ আসিবে না সেদিন আসিব নিশ্চয়।

তবে কিনা, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-নেতাদর্শন কখন হবে কেউ তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না।

তিনি সদা চলিষ্ণু। কেননা, গতিহীনতার অপর নাম মৃত্যু। তাই কর্ম সাধনার ইন্টারল্যুডে ডাউন ব্যাটারিকে চার্জ দেবার রীতিতে স্বদেশ মহিমা বিপণনার্থে তাঁকে যেতে হয় বিদেশ সন্দর্শনে। ফিরে আসেন পরিযায়ীর প্রসন্ন বদনে। অন্যথায় আয়াসলভ্য নেতা ঘরকুনো, থুড়ি, গোষ্পদে প্রতিবিম্বিত তারার মতো মানহারা প্রতিপন্ন হন।

পৌঃনপুনিকতার নামতায় সময় আসে। সময়ের আবর্তে তিনি বৃষ্টিভেজা ঝাপ্‌সা গাছপালার মতো বিস্মৃতির অতল ভেদ করে উঠে আসেন। জনসমাগমে শ্লীল-সংস্কৃত নেতার মঞ্চের আবহে খুশবু ছড়ায়—

“ ..বুঝবে সেদিন বুঝবে, আমি যেদিন হারিয়ে যাব অস্তরবির সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে। গাইতে বসে কণ্ঠ ছিঁড়ে আসবে যখন কান্না, বলবে সবাই, সেই যে পথিক তার শেখানো গান না?..”

* * *

সারকথা কিংবা নীতিবাক্য .

নেতা হল টপ্ পরা প্রেমিকা, যার বুকের উপর লেখা—'ফ্রেজাইল, উইথ কেয়ার'।

আমাগো এই পোড়া দ্যাশে মাইংস কিইন্যা কোপ্তা বাননের মতন ট্যাকের জোর আছে গিয়্যা কয়জনার, কন দিহি!

হেঁসেল

আলুর কোপ্তা

মাইংসের কোপ্তা খুউব চাইট্যাপুইট্যা খাইয়া লইয়্যা দ্যাখছেন গিয়া। তয় খাসা কথা কি—আমাগো এই পোড়া দ্যাশে মাইংস কিইন্যা কোপ্তা বাননের মতন ট্যাকের জোর আছে গিয়্যা কয়জনার, কন দিহি! তাই শম্পাদক মশায়রে কইয়্যা দিছি—হেইবারডি হ্যাঁসেল ঘরে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটামু। তাই আইজ্জ আপনেগো আলুর কোপ্তা কী কইর‍্যা রাঁধন যায় হেইডাই শিখাইমু। না-না, চোখ কুঁইচকাইবেন নি। ঠিকমতো কইর‍্যা রাঁইধলে আলুর কোপ্তার যা সোয়াদ হইব না, হালার কই-খাসির কোপ্তা তার কাছে লাইগে কোহানে! হগলে খাইয়্যা এক বাইক্যে কইবো মাইংসের কোপ্তাই হইছে গিয়া।

কি কি লাইগ্‌বো : (চাইরজনার খাওনের লেইগ্যা) আলু, বাইট্যা লওয়া পিঁয়াজ, ব্যাসন, লঙ্কাবাটা, আদাবাটা, একটুকুন লবণ, চিনি, গরম মশল্লা, কিসমিস, সইরষ্যার ত্যাল, জিরা, ত্যাজপাতা, টকদই আর খানকয় টম্যাইট্টু।

রন্ধন পোনালি পেথ্থমে আলুগুলান সিদ্ধ কইর‍্যা খোসা ছাড়াইয়্যা ভাল কইর‍্যা চট্‌কাইয়্যা লউন। হেইডার মদ্দি আন্দাজ মতন ব্যাসন, আদাবাটা, পিঁয়াজবাটা, গরম মসল্লার গুঁড়া, লবণ, চিনি, লঙ্কাবাটা, কিসমিস, পিস্তা, বাদাম দিয়্যা ভাল কইর‍্যা মাইখ্যা লউন। হেইবার ওই আলু মাইখ্যা হইতে ছোড ছোড গুলি কইর‍্যা চপের মতন ভইজ্যা রাখুন। তারপর উনানে ঘি, ত্যাজপাতা, পিঁয়াজ, আদা আর লঙ্কাবাটা, লবণ, টকদই, একটু চিনি ও ফড়ন দিয়্যা, কইষ্যা লইয়্যা বুইঝ্যা-শুইন্যা জল দ্যান। ঝোল কিছুক্ষণ ফুইটলে চপগুলান ছাইড়্যা দ্যান। একটুখন লাড়াচাড়া কইর‍্যা, মসল্লা ছড়াইয়্যা নামাইয়্যা রাইখ্যা দ্যান। দ্যাখ্‌বেন, আলুর চপগুলান বেশি ফুটাইবেন না য্যান্‌। তা হইলে কোপ্তা খাওনের মজাডা ব্যাবাক্ ফুইট্যা যাইবো গিয়্যা।

হেইবারের পদটা মুই শম্পাদকের সুপারিশ মতন আপনেগো লগে বানাইছি। হেইডা আমার লোতুন এক্সপেরিমেন্ট কইতে পারেন।

শশার শুক্তো

খাইছে আমারে! হালার শশা তো মাইন্‌ষে বিট লবণ দিয়্যা রাস্তা-ঘাট-হাটে-বাজারে কাঁচাই খায় গিয়্যা। হেই শশাগো লইয়্যা আবার শুক্তো পাকাইবার সাধ হইলো ক্যাম্‌নে? আপনেরা তো কাঁইচকলার শুক্তো, সইজ্‌নাফুলের শুক্তো, নিমপাতার শুক্তোর কথা হোন্‌ছেন গিয়্যা, তো হেইবারের পদটা মুই শম্পাদকের সুপারিশ মতন আপনেগো লগে বানাইছি। হেইডা আমার লোতুন এক্সপেরিমেন্ট কইতে পারেন।

কি কি লাইগ্‌বো (চাইরজনার লগে) : শশা, মটরডাইল বাটা, শুইক্‌না লংকা, ত্যাজপাতা, সইরষ্যা গুঁড়া, পাঁচফড়ন, আদাবাটা, চিনি, ঘি, লবণ।

রন্ধন পোনালি পাকা শশার খোসা ফেইল্যা সরু লংকা কুচি-কুচি কইর‍্যা কাইট্যা রাখুন। মটরডাল বাটা দিয়্যা বড়া ভাইজ্যা তুইল্যা রাখুন। হেইবার ওই ত্যালের মদ্দি ত্যাজপাতা, শুইক্‌না লংকা, সইরষ্যা গুঁড়া দিয়্যা নাইড়্যা-চাইড়্যা শশাকুচি ছাইড়্যা দ্যান। লবণ ছিটাইয়্যা ঢাকা দিয়্যা দ্যান। শশার জল শুকাইয়্যা গ্যালে আবার জল দ্যান আর ফুইট্যা উইঠ্‌লে বড়াগুলান ছাইড়্যা দ্যান। পরিমাণ মতন ঝোল থাইক্‌তে ঘি আর আদাবাটা দিয়্যা নামাইয়্যা দ্যান। শশার শুক্তোয় ডাইলবাটার বড়ার বদলে বাটা পস্তর বড়াও চালাইতে পারেন। তিতা খাওনের সাইধ জাইগ্‌লে উইচ্ছা বা করলা কুচি-কুচি কইর‍্যা কাইট্যা দিতে পারেন। অথবা পইলতা পাতা বা নাইলতে পাতাও দিতে পারেন। তয় কথা কি জানেন, হগলই আপনেগো রুচির ওপর নিভ্‌ভর করে। একডা কথা কিন্তু খাসা। শশার শুক্তো খাইলে পরাণে যা পুলক লাইগ্‌বো না—কচি শশা আর লবণ দিয়্যা খাইতে মোটেই ইচ্ছা কইরবো না। শশা দ্যাখলেই মনে হইবে, শুক্তো বানাইয়া খাইয়্যা লই গিয়্যা।

—কাঙ্গাল রায়

> যে শিক্ষক টিউশনি করেন না বা যে ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা নার্সিং হোমের সহিত যুক্ত না থাকিয়া কেবল হাসপাতালেই রুগি দেখেন, তিনি আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে টুকলি করিয়া পরীক্ষায় পাশ করেন নাই, সেই ব্যাপারে সমাজ নিঃসন্দেহ হইতে পারে না।

নারদের তদন্তমূলক প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন ও প্রাইভেট টিউশনি

প্রভাত বাগচী

একদিন সকালে ব্রহ্মা নারদকে মোবাইলে ধরলেন: পশ্চিমবঙ্গে এবার অকাল বাজেট পেশ হইয়াছে। তুমি ইমিডিয়েটলি একটি ডিটেইলড রিপোর্ট পাঠাও।

উনচল্লিশদিন পরে নারদের রিপোর্ট এল :

"যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতদ্—

মহাশয়,

আপনার ফোন পাইয়া মাথাগরম হইয়াছিল। আপনি আমার সহিত যোগাযোগের জন্য সর্বাধুনিক মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন অথচ আমার বেড়াইবার জন্য দিয়াছেন ঢেঁকি। ঢেঁকির ব্যবহারে আবেগ বাড়ে, বেগ কমিয়া যায়। তদুপরি গত কয়দিন অচল থাকিবার জন্য উহার স্থানে স্থানে উইপোকা আক্রমণ করিয়া করিয়া বল্মীকের পাহাড় রচিয়াছে, এমতাবস্থায় উহাকে যত গতি দিতে যাই, উহার যতি ততই বাড়ে। পত্রের পর পত্রে আপনাকে বাহনটি পাল্টাইয়া দিতে কহিতেছি, আপনি তাহা তো করিতেছেনই না, উপরন্তু আমার পে কমিশনের এরিয়ার বিলটি আটকাইয়া ভারতবর্ষের মতো বাজারে, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় গঞ্জিকা দেশলাই প্রভৃতি জিনিসপত্রের দাম শাস্ত্রকথিত কলহপ্রিয়ার মেজাজের ন্যায় জ্যামিতিক হারে বাড়ে—পাঠাইয়াছেন। আয় এবং ব্যয় দুইদিক সামলাইতে কিছু লোককে প্রাইভেটে সংস্কৃত শিখাইতেছি। সংস্কৃত ভাষা এখন সমস্ত ভারতবর্ষে অবশ্য পাঠ্য হইতে যাইতেছে। শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করতঃ ক্লান্ত হইয়া কর্মক্ষেত্রে গিয়া ঘুমায়। আমি টিউশনি করিয়া রিপোর্ট লিখিব কী প্রকারে? কিন্তু আমি নারদ, ফাঁকিবাজি আমার জন্মগত অধিকার, ধরা পড়ায় নহে। তাই টিউশনিও করিতেছি, রিপোর্টও লিখিতেছি। তবে পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখিতেছি, ইহা ইমিডিয়েটলি লিখিত বলিয়া ডিটেইলড্ হইবে না, আর যদি ডিটেইলড্ রিপোর্টই চাহেন, তবে মার্জনা করিবেন, তাহা ইমিডিয়েটলি হইবে না।

আপনার সাম্প্রতিক আদেশানুসারে বাজেট পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বেশ ঝামেলায় পড়িয়াছি। দিল্লি মুম্বাইতে শুনিতেছিলাম 'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান' মহামন্ত্র; বাংলা পাল্টা রাগিণী গাহিতেছে "শিল্প শিল্পায়ন শিল্পস্তান"। মার্কেট ঘুরিয়া খুব বেশি শিল্পপতি দেখিতে পাইলাম বলিয়া বোধ হইল না,

যদিও শিল্পীপতি ও পত্নী বেশ ভালো সংখ্যাতেই দৃষ্টিগোচর হইল। ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না শিল্প লইয়া বাংলা হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল কেন। পরে শুনিলাম ইহা আসলে ভোটেরই ক্যাবিশমা। এমনিতে দশটা পাঁচটা আপিস যাইয়া, মাঝে মাঝে বন্‌ধ নামক সবেতন ছুটি ভোগ করিয়া বাঙ্গালীর দিন বেশ স্বাভাবিক ছন্দেই অতিবাহিত হইতেছিল। হঠাৎ আসিল ভোট, লাগিল ঘোঁট। আদারওয়াইজ সারা বছর অশ্রুত বিরোধীরা সব নড়িয়া বসিয়া বাঁধিল জোট। অভিযোগ আসিল—বিগত বছর সমূহে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে কেবল পিছাইয়াই পড়ে নাই, একেবারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। ভোটের দায় বড় দায়, পিতৃদায় বা কন্যাদায় তাহা কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। সরকার পক্ষ, অতএব, এই অভিযোগ খুব একটা বড় গলায় অস্বীকার না করিয়া ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করিলে দ্রুত শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সাধারণত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ভাঙ্গিবার জন্য। পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করিতে যাঁহারা দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া যাইতেছেন, তাঁহারাই ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন এক কোটি বেকারকে চাকরি দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া। জনগণ তাই ইতর বিশেষ আশা না করিয়া কর্মযোগীর ন্যায় ভোট দিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হইল, এইবার পশ্চিমবঙ্গের অকাল বাজেটে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিয়া শিল্পখাতে কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বেশি হাতের অভাবে শিল্পপতিরা কেবল দুই হাত তুলিয়া এই বাজেটকে স্বাগত জানাইয়াছেন। ইনকিলাব অর্থাৎ রাষ্ট্র বিপ্লব জিন্দাবাদ অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার স্থান লইয়াছে শিল্প বিপ্লব (দ্বিতীয়)। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমে মলযজ্ঞ দূষিতং হইয়া উঠিলেও আশা করা হইতেছে অচিরাৎ পশ্চিমবঙ্গ শিল্পশ্যামলা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের নাম শিল্পবঙ্গ রাখিবার জন্যও বিল আনা যায় কিনা তাহা পর্যালোচনা করিতে এক সদস্যের কমিশন বসিয়াছে। শিল্পভাবনা আমাকেও এতটাই প্রভাবিত করিয়াছে যে, মহাশয়, বেয়াদবি মার্জনা করিবেন, আত্মবিস্মৃত হইয়া 'নারায়ণ নারায়ণ' ভুলিয়া 'শিল্পায়ন শিল্পায়ন' মন্ত্র জপ করিতে শুরু করিয়াছি।

পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করিতে যাঁহারা দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া যাইতেছেন, তাঁহারাই ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন এক কোটি বেকারকে চাকরি দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া।

তবে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন অপেক্ষা শিল্পোন্নয়ন অনেক বেশি জরুরি বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। ইতিপূর্বে বহুবার বঙ্গদেশে আসিয়াছি, বহুবার গঞ্জিকা সেবন করিয়া ও না করিয়া বাংলার গ্রাম-শহরে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কখনোই অত্রাঞ্চলে শিল্প নাই বলিয়া আমার বোধ হয় নাই, বরঞ্চ গ্রাম-শহরের সর্বত্রই কুটির ও প্রাসাদ শিল্পের রমরমা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বস্তুত অনাদি কাল হইতে, এমনকি গত বিধান সভা ভোটের পূর্বেও, পশ্চিমবাংলায় শিল্প ছিল, বর্তমানেও আছে, এবং কেহ যদি সাংঘাতিক ভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া না দেয় তাহা হইলে ভবিষ্যতেও থাকিবে। ইহা সত্য যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পী, বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী সংকোচনকারী নীতির অনুসারী ক্রমিক বস্ত্র সংকোচনকারী নায়িকা শিল্পী বাংলায় একটু কমই আছে, কিন্তু ইহাও তো অনস্বীকার্য যে কিছু কিছু বাংলা চলচ্চিত্রকে—যেমন 'বাবা কেন চাকর' বা 'বউয়ের পায়ে স্বামীর চরণ'—স্রেফ নামকরণের জন্যই ক্লাসিক্যাল শিল্পের আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বাংলা আধুনিক কবিতা তো আরো টেরিফিক শিল্প। দাঁড়ি নাই, কমা নাই, বোধ হয় তাহা ব্যবহার করিলে কবিদিগের কলমের কালি ফুরাইয়া যায়। যে কবিতা যত বেশি দুর্বোধ্য, তাহা তত উচ্চাঙ্গের; যে কবিতা যত কম লোকে পড়ে, তাহা তত জনপ্রিয়। সম্পাদকের সহিত লাইন থাকিলে আধুনিক কবিতা-শিল্প স্থাপন করিতে খুব বেশি অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না।

এইখানেই শেষ নয়। নির্বাচন পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে বৈজ্ঞানিক রিগিং একটি অতি পরিচিত বাগ্‌ধারা, ফি-বছরই সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়। এই 'বৈজ্ঞানিক রিগিং' ব্যাপারটি আমার মগজে ঠিক বোধগম্য হয় নাই। জয় নিশ্চিত জানিয়া, ক্ষমতা দখল করায়ত্ত দেখিয়া ভোট গণনায় ধরাশায়ী দলমাত্রই রিগিং-এর দোহাই দিয়া আপন মুখ রক্ষায় প্রয়াসী হয়। নির্বাচন কমিশনারকে 'বিক্রীত' বলাটা বৈজ্ঞানিক হইলেও রিগিং কখনোই বৈজ্ঞানিক হইতে পারে না। রিগিং একটা শিল্প, একটা ইন্‌ডাস্ট্রি, একটা ফাইন আর্ট। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সমূহ দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এক ও অপরিবর্তনীয়। যেমন জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞান বানানো, পুরোহিতবিদ্যা ও অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য দ্য গ্রেটের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তাকে গোটা বিশ্বমানবসমাজ বিপুল হর্ষে স্বাগত জানাইয়াছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ফলাফলকে একদিকে বৈজ্ঞানিক রিগিং এবং অপরদিকে জনমতের যথাযথ প্রতিফলন বলিয়া সপ্রমাণ করিতে রাজনৈতিক দলগুলি যে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে তাহাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি যতই বৈজ্ঞানিক হউক না কেন, রিগিংকে বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিতে এখনো অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইবে। বস্তুত যে রিগিং ঠেকাইবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং বিরোধী নেত্রী আপন ভোটটিও না দিয়া (জানিতাম তিনি রাজঅনৈতিক জীবনে কালি না লাগাইতে তৎপর, এই বছর দেখিলাম তিনি বাম তর্জনীতেও কলঙ্ক লাগাইতে অনিচ্ছুক) বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সারাদিন হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন, এবং দিনশেষে তর্জনী ও মধ্যমা উত্তোলিত করিয়া সাংবাদিক কুলকে রাইটার্সে দেখা করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন, সেই সমস্ত কেন্দ্রেই তাঁহার দল গো-হারান হারিল যে রিগিং-এর মাধ্যমে, তাহাকে নির্দ্বিধায় শৈল্পিক বা ঐন্দ্রজালিক রিগিং বলা যায়। বস্তুত রিগিং শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা প্রচুর। বেসরকারি উদ্যোগে তো চিরকালই ছিল, এইবার সরকার একটু নজর দিলে গোটা ভারতবর্ষের কাছে পথপ্রদর্শক হওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন, পঞ্চসভা বা জনপদসভা উপলক্ষে সারা বৎসর ধরিয়া কলিকাতা তথা বাংলার সর্বত্র যে শিল্প-সুষমা মণ্ডিত দেওয়াল লিখন, ব্যঙ্গচিত্র বা কাটআউট দেখা যায় তাহার ঐতিহাসিক ও নান্দনিক গুরুত্ব অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র বা সম্রাট অশোকের শিলালিপি অপেক্ষা কম নহে। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিবদমান দলীয় নেতা-নেত্রীরা মঞ্চে মঞ্চে পরস্পরের প্রতি যে মধুর সম্ভাষণ প্রয়োগ করেন তাহার মাহাত্ম্য কোনো কথামৃত শ্রবণ অপেক্ষা কম পুণ্যদায়িনী নহে। বাক্যবাণের এবম্বিধ আদান-প্রদান বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত কবিগানের সহিত তুলনীয়। শিল্পায়ন লইয়া চতুর্দিক অলোড়িত হইতেছে কিন্তু বাংলার এই ভাষণ-শিল্পকে কথাসাহিত্যের মর্যাদা দিতে অদ্যবধি কেহই অগ্রসর হইল না। অবশ্য এই দৈন্যদশা যথাসাধ্য দূর করিতে যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকার। 'পেন ইজ মাইটীয়ার দ্যান শোর্ড' নহে, তাহাদের কাছে "ভাষণ ইজ মাইটীয়ার দ্যান রেশন।" জনসাধারণ রেশন না পাইলে কোনো ক্ষতি নাই কারণ উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ভাষণ প্রদান করিতে পারিলে কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনেই নয়, লোকসভার নির্বাচনেও অ্যাবসোলিউট মেজরিটি আটকায়, আপন পত্নীর এহেন আপন ভ্রাতা এ দেশে আর কয়টা আছে? তাঁহারা তাই রেশন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তুলিয়া দিয়া সাপ্তাহিক

ভাযণ প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে যাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভাযণ-শিল্প আছে কিন্তু রেশন তাহার হাতে নাই। তাই অত্রাঞ্চলের সরকাব রেশন তুলিতে না পারিযা টিউশনি তুলিয়া দিতেছেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসিতেছি।

বাংলায় বারো মাসে তেবো পার্বণ। তেরো পার্বণ আসলে বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবনে বারো মাসে চৌদ্দবার ইনকাম ট্যাক্স প্রদান হিসাবে প্রতি বছরই দেখা দেয়। বারোয়ারী পার্বণ উপলক্ষে পাড়ার উদীয়মান ও উদ্দিত যুবকেরা আপন আপন এলাকা শিল্পাঞ্চলে পরিণত করে যে পদ্ধতির মাধ্যমে তাহাও এক ধরনের শিল্প। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সাদা টাকার উপর আয়কর লয়। বাংলার এই সকল ভবিষ্যতেরা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ উভয়বিধ আয়ের উপরই আয়কর সংগ্রহ করিযা থাকে। এতদুপলক্ষে চাঁদার দাতা ও গ্রহীতাদিগের মধ্যে যে বাক্যালাপ চলে তাহা দেশের সর্ববৃহদায়তন শিল্প হিন্দি সিনেমার নাযক ও ভিলেনের ডায়ালগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পয়সার যুগ এখন শেষ, তাই রসিদে লেখা হয় "...... টাকা ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল"। সেই ধন্যবাদ যে কতটা শিল্পসম্মতভাবে বিভীষিকাময় হইতে পারে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছে। যে সমস্ত ক্লাব বা সংঘ কর সংগ্রহে তেমন পারদর্শিতা দেখাইতে পারে না, কুটির শিল্প স্থাপন করিয়াই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; রাজস্ব বাবদ যাহাদের আয বেশ. মোটা তাহারা সপ্তাহখানেকের জন্য বৃহদায়তন শিল্প রচনা করে। পাড়ার এই সব শিল্পাঞ্চলে অতঃপর অবতীর্ণ হন বিভিন্ন দাম ও মানের শিল্পী। কোথাও নির্মিত হয়.পূর্ণ দগ্ধ বিড়িব প্রতিমা, কোথাও লবণের তৈরি মা ভগবতী চিনির তৈরি সন্তান-সন্ততি লইয়া কর্পূরের তৈরি অসুরকে সংবশে ধ্বংস করিতে আবির্ভূতা হন। এই সকল পূজাশিল্প উদ্বোধন করিতে স্বর্গের দেবদেবী অপেক্ষাও অধিকতর গ্ল্যামারাস অভিনেতা-অভিনেত্রী মুম্বাই চেন্নাই হইতে বাংলায় পদার্পণ করেন। যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাহাদিগের শিল্প স্থাপনের মহতী উদ্যোগ যাহাতে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া না যায় সেজন্য আছেন স্থানীয় অভিনেতারা। যাহাদের সে সঙ্গতিটুকুও নাই তাহাদের অকূলের কূল, অগতির গতি আছেন বিভিন্ন সাইজের জাতীয় ও আঞ্চলিক নেতা-নেত্রী। মোট কথা, যতই বিঘ্ন আসুক না কেন, পূজাশিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। এক বৎসরের সফল শিল্প পরিচালনা পরবৎসর আগাইয়া যাইবাব প্রেরণা যোগায়। পূজার সংখ্যা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, বাজেটও স্থিতাবস্থা বজায় রাখে না। শিল্প বিকশিত হয়, শিল্প-প্রযোজক ও পরিচালকদের বিকাশও খুব একটা অবহেলিত থাকে না।

বাঙ্গালীর ভাষাও এখন একটা শিল্প। রীতিমতো দক্ষ না হইলে যে-সে এখন এই ভাষা কহিতে বা বুঝিতে পারিবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর সন্তান এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়া ইংরাজি শেখে, হিন্দি শেখে। তাহার বাংলা রীতিমতো করুণ রসের জন্ম দেয়। একটা বাক্যে দুই-চারিটা হিন্দি-ইংরাজি না থাকিলে তাহা কোনো বাংলাই নহে। 'গুরু, মাইরি, চিজটা একদম জেনুইন'—হইল একটি মডেল বাংলা বাক্য। মৎলিখিত চিঠিতে এহেন বাংলারই সফল প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন। রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার লাভের আশায় বাংলা গীতাঞ্জলি ইংরাজি অনুবাদ করিতে হইয়াছিল; সত্যজিৎ রায় অস্কার ঘরে আনিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের ইংরেজি সাবটাইটেল করিয়া। আধুনিক রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎকে পুরস্কারের জন্য আধুনিক বাংলাতে লিখিলেই চলিবে। বাংলা ভাষা এখন এতটাই আন্তর্জাতিক যে হিন্দি ও ইংরাজি জানিবার দরকার নাই। ট্রানশ্লেসন এখন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয়।

তাই কহিতেছিলাম, শিল্প নাই বলিয়া বাংলার সর্বত্র এক অপপ্রচার চালিয়াছে। শিল্প বাংলার পথেঘাটে, শিল্প বাংলার যানবাহনে, শিল্প শিয়ালদহ ও হাওড়া রেলস্টেশনে। যে স্বাচ্ছন্দ্যে গৃহস্থ বাঙ্গালী কলিকাতার ফুটপাথে হকারের পণ্যসমাগ্রী বাঁচাইয়া, ভিড়ে কাহাকেও ল্যাং না মারিয়া ও ল্যাং না খাইয়া দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর প্রয়াস পান, যে দৈবপ্রদত্ত ক্ষমতায় বলীয়ান হইয়া তিনি অন্ধকারেও ম্যানহোলের ফাঁক দিয়া গলিয়া গিয়া সীতার পাতাল প্রবেশের পুনরাভিনয় মঞ্চস্থ করেন না, সেই দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাব কোনো শংসাপত্র না থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দি সিনেমার নায়ক-নাযিকা অপক্ষো তাঁহাব নৃত্যকুশলতা ভগ্নাংশেরও কম নহে। যে সহজাত দক্ষতায় বাঙ্গালীকে ভিড়ঠাসা বাসে সওয়ার হইয়া সহযাত্রীর কুনইয়ের গুঁতা বা পা মাড়ানি স্মিত হাস্যে সহ্য করিতে হয়, তাহার শিল্পসুষমা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যাযের স্কোয়ার ড্রাইভ অপেক্ষা কম কিসে? যে অনায়াস পটুত্বে কলিকাতার পকেটমার হাজার হাজার বাঙ্গালীর পকেটের ওজন নিমেষেই লঘু করিয়া দিতেছে, পি. সি. সরকাবের তাজমহল উধাও করিবার সহিত যে তাহার কোনো সাদৃশ্য খুঁজিয়া পায না সে মনুষ্য পদবাচ্য কি না, সে বিষযে সংশয় রহিয়াই যায়।

ভৌগোলিক অর্থেও পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে যথেষ্ট প্রাগ্রসর। কারখানা হয়ত এখানে কমই আছে এবং যেগুলি এখনো আছে সেগুলিও একে একে বন্ধ হইবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে, তবে, যে শিল্প বলিতে মূলধন বিনিয়োগ করিযা কাঁচামাল সহযোগে কায়িক শ্রম দ্বারা নূতন দ্রব্য উৎপাদন বুঝায়—যাহাকে কুটির শিল্প না বলিয়া গৃহলালিত শিল্প বলা ভালো, তাহা অধিকাংশ শিক্ষক ও সমস্ত ডাক্তারের ঘরে ঘরে। ছোটখাটো জনসভার আয়তন বিশিষ্ট এই সমস্ত কারুশিল্পের মূলধন হইল সংশ্লিষ্ট মালিকদের অধীত বিদ্যা, কাঁচামাল হইল ছাত্রছাত্রী ও রুগিসকল এবং স্পেসিমেন হিসাবে প্রাপ্ত কিছু নোটবই ও ঔষধপত্র। শ্রমিক হইলেন স্বয়ং মালিকরাই। ছাত্র জীবনের যাবতীয় বিনিয়োগ এক এক মিটিং হইতেই তুলিয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে। উঠিতেছেও। এই গৃহপালিত শিল্পবাণিজ্য হইতে যে আয় হয তাহার জন্য কোনো হিসাব বা আয়কর কাহাকেও দিতে হয় না, মোটামুটি পাড়ার ছেলেরা হাতে থাকিলেই হইল। এই শিল্পে যে ডাক্তার ও শিক্ষক যত বেশি নিয়োজিত প্রাণ, সমাজে তাহাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি তত বেশি। যে শিক্ষক টিউশনি করেন না বা যে ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা নার্সিং হোমের সহিত যুক্ত না থাকিয়া কেবল হাসপাতালেই রুগি দেখেন, তিনি আদর্শ স্থানীয় হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে টুকলি করিয়া পরীক্ষায় পাশ করেন নাই, সেই ব্যাপারে সমাজ নিঃসন্দেহ হইতে পারে না। আত্মসন্তুষ্টি তাঁহাকে আপন সহকর্মী অপেক্ষা স্বতন্ত্র বলিয়া ভাবাইতে পারে, কিন্তু তিলে তিলে স্ত্রীকে মানসিক অত্যাচার করিয়া আত্মহত্যায প্ররোচনা দিবার অভিযোগে যখন-তখন তাঁহাকে জেলে পোরা যায়। তাঁহারা সমাজে অপাংক্তেয়, কর্মক্ষেত্রে ব্রাত্য এবং পুরুষ পদবাচ্য নহেন। তাঁহাদের পোড়ামুখ দেখিলে শ্যালিকার মুখচন্দ্রিমা ম্লান হইয়া ভিলেনের ডেরায় রাত্রিকাটানো নায়িকার মসীকৃষ্ণ মুখেব ন্যায় নাতিসুন্দর হয় এবং জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়ে আমন্ত্রণ তাঁহাদের বরাতে জুটে না। এমতাবস্থায় শিল্পখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া এবং শিল্পের পীঠস্থান প্রাইভেট টিউশনি আইন করিয়া বন্ধ করিতে চাহিয়া এবং ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিসকে এই আইনের বাহিরে রাখিয়া সরকার বাহাদুর একসাথে ধর্মাধর্ম দুই তরী'পরে পা রাখিতে চলিয়াছেন। বস্তুত শিক্ষক বা ডাক্তার চাহেন বলিয়া টিউশনি বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস শিল্পে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহা নহে। সমাজই উহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রাইভেটাইজেশন প্রবর্তন করিতে। একটু পয়সা হাতে আসিলেই লোকে আপনাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। যে শিক্ষা বা চিকিৎসা সকলের সহিত লাইনে দাঁড়াইয়া ভাগ করিয়া লইতে হয় তাহা এই শ্রেষ্ঠত্ববোধের বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। আইন করিয়া এই অহংবোধ বন্ধ করা সম্ভব নয়। সরকার বরং প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ না করিয়া অফিসিয়াল টিউশনি, অর্থাৎ সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ

করিয়া দিলে অনেক বেশি সফল হইতেন। যে কারণে স্বয়ং স্বাস্থ্যসচিব চিকিৎসা কবাইতে চেন্নাই যান, বা মন্ত্রীরা যান বিদেশে, ঠিক সে কারণেই অসুস্থ হইলে লোকে নার্সিং হোমের খোঁজ করে, সরকারি হাসপাতালের কথা যাহার মনে পড়ে, সে জানে, তাহার কপালে অশেষ দুর্গতি সঞ্চিত আছে। সরকারি নামি বিদ্যালয়ে এমনকি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, সন্তানকে ভর্তি করিয়া অভিভাবক যে সামাজিক প্রেস্টিজ লাভ করিতে পাবেন নাই, তাহাই করায়ত্ত হয় সন্তানকে প্রাইভেট পড়িতে দিয়া। যোগ্যতাব কথা না বলিয়াও বলা যায়, অভিভাবকরা বেকাব যুবকের হাতে নিজেবাই সন্তানকে পড়াইতে দিতে চাহেন না, কারণ উহারা পড়ায় বেশি, ফি নেয় কম। অহংবোধটা ঠিক তৃপ্ত হয় না। ছাত্র যদি শিক্ষকের গৃহে যাইয়া পড়ে তবে অভিভাবকের স্ট্যাটাস কয়েকগুণ বাড়ে। শিক্ষক যদি আসিয়া পড়ায়, তবে স্ট্যাটাস শতগুণ বাড়িয়া গেল। আইন করিয়া প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ তাই মুসলমানের মুরগি পোষা, কায়েত বামুনের ভালোবাসা। শিল্পও চাহিব আবার শিক্ষকেব পড়ানো বন্ধ করিব—মানে সংবিধানের শপথ লইবা ধর্ম নিরপেক্ষ থাকিব এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দঘন মুহূর্তও বলিব। তবে আর্য সুযোগ হিসাবে এই আইন সর্বথাই বরণীয়। সার্কাসে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়: "দুর্বল হৃৎপিণ্ড লইয়া আসিবেন না।" পত্রপাঠ সার্কাস হাউসফুল হইয়া যায়। প্যাকেটে "সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর" লেখা বাধ্যতামূলক হওয়ায় সিগারেটের বিক্রি শতগুণ বাড়িয়াছে। আইনে আছে, বিবাহে পণ দেওয়া নাকি শাস্তিযোগ্য, এমনকি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। 'সারে জঁহাসে আচ্ছা'- মার্কা এই দেশে এমন কোনো ক্ষেত্র নাই, যে বিষযে, এমন কোনো আইন নাই যাহা ভাঙ্গা হয নাই, আইন প্রণীত হয় নাই, এই একটি বিষয়ে ভারত জগৎসভায় অলবেডি শ্রেষ্ঠ আসন লইয়া ফেলিয়াছে। সম্ভবত মাস্টারদিগের টিউশনি শিল্পে কিঞ্চিৎ মন্দা আসিয়াছে—যাহা ডাক্তারি শিল্পে এখনো হয় নাই—তাই টিউশনিকে বে-আইনি ঘোষিত করিয়া উহাকে আরো আকর্ষণীয় কবা হইল। যাহা সহজলভ্য, তাহার প্রতি মনুষ্য জাতির কোনো আকর্ষণ নাই। নিষিদ্ধ ফল, অবৈধ প্রেম এবং ব্লু ফিল্মের প্রতি মানব-আকর্ষণ চিরন্তণ। টিউশনি করা মৃত্যুদণ্ডনীয় অপবাধ হইলে টিউশনির প্রসার ভারতেব জনসংখ্যার ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে। টিউশনিকে বে-আইনি ঘোষণা করা, তাই, হংসডিম্বকে চৌচিব করিবার মতো সোজা; উহা বন্ধ করা কেবল কঠিনই নহে, কুকুরের লেজ সোজা কবিবার মতোই অ সৃ ম্ ভ ব। যতক্ষণ সারমেয়পুচ্ছটি হস্তধৃত, সব ঠিক। ছাড়িলেই তাহা পূর্ববৎ চক্রাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। জনগণ থতমত খাইয়া কাসে, নেতারা সব লজ্জা খাইয়া হাসে, সব বুঝিয়া সবাই না বুঝিবার ভাণ করে, বেকাররা খুশি হয়, নেতাদের বিপ্লবী ইমেজ বাড়ে, শিক্ষকের টিউশনি বাড়ে, এবং যাবতীয় সুফল একসঙ্গে ভোটযন্ত্রে প্রতিফলিত হয়।

বস্তুত রিগিং শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনা প্রচুর। বেসরকারি উদ্যোগে তো চিরকালই ছিল, এইবার সরকার একটু নজর দিলে গোটা ভারতবর্ষের কাছে পথপ্রদর্শক হওয়া যায়।

মাস্টার টিউশনি করেন, তাই তিনি শিল্পী। কিন্তু শিল্পপ্রতিভা তাঁহার বড়ই স্থূল। তাঁহার কার্যাবলী প্রত্যক্ষগোচর বলিয়া অপরেব চক্ষুশূলের কাবণ। টেবিলেব তলা দিয়া নোট এহাত-ওহাত হওয়া কাহারো নজরে পড়ে না, তাই তাহা বন্ধে কোনো আইনও প্রণীত হয না। বেচাবা মাস্টাবেব কর্মক্ষেত্রে চেয়াব থাকিলেও কোনো টেবিল ববাদ্দ নাই। তাঁহাকে শ্রেণীকক্ষেব টেবিল কিছুক্ষণের জন্য ব্যবহার করিয়া নোট কারেকশন করিতে হয়, নোট দিতে হয়, 'নোট' পাইবার কোনো সম্ভাবনাই তাহার নাই। পবিশ্রম করিয়া উপরি আনিতে হয় বলিয়া তিনি Industrious, Industrialist হইতে গেলে বিনা শ্রমে প্রচুর উপার্জন করিতে জানিতে হয। শাস্ত্রে বলে Art lies in concealing art । মাস্টার সামান্য Artist-ও নহেন, কারণ আর্টকে Canceal করিবাব আর্ট মাস্টারের জানা নাই, জ্ঞানে ভাবতভাগ্যবিধাতা নেতা-নেত্রীবা। মাসে একটাকা মাত্র মাসোহারা লইয়া পালিত পুত্রের বিবাহে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা কোনো পৌরাণিক রূপকথা নহে, আধুনিক ভারতেই তাহা পুরাঘটিত ও ঘটমান বর্তমান। তহলকা ও ইউ-টি-আই কাণ্ড লইয়া যাঁহারা খাবি খাইতেছেন, সম্ভবত তাঁহাদিগের মধ্যে মাস্টার খুব কম লোকই আছেন।

যাহার বা যাহাদের সহিত রশিদ খানের দহরম মহরম ছিল বা যাহাদের অঙ্গুলি হেলনে যুব ভাবতী ক্রীড়াঙ্গনে সমস্ত শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট লোকজন দিনেব পব দিন বাত্রি কাটায, তাহাদেব মধ্যে খুব খম লোকেরই পেশা শিক্ষকতা। এককালে বিড়ি চাহিয়া-খাওয়া, অধুনা মাত্র পাঁচশত টাকা মাসোহারার অর্ধেকটাই পার্টি তহবিলে দান করা, যে পঞ্চায়েৎ সদস্য বিদেশি সিগারেট বা দ্রাক্ষারস ছাড়া খান না, বিদেশি বস্ত্র না হইলে যাঁহারা অঙ্গ সজ্জিত হয় না, পার্টি মিটিংয়ে টু-হুইলাব লইয়া যাতায়াত কবিতে দেখিয়া আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্যের কৃপা যাঁহাকে বিদেশি ফোর হুইলার উপহার দেয়, তিনি শুধুই শিল্পী নহেন, বীতিমতো শিল্পপতি। পাবলিক হাঁ হইয়া দেখে, দেখিযা হাঁ হইতে থাকে। নেহাৎ যদি পুকুরচুবির ঘটনা ঘটাইয়া হাতেনাতে ধরা পড়িতে হয়, পশ্চাতে পার্টি থাকে; যখন পার্টিও বাঁচাইতে পারে না, ভোটে হার হয। কিছু পাইতে গেলে কিছু হারাইতে হয। কাজেই গুরু পাপে ভোটে পবাজয়ের মতো লঘু দণ্ডে কেহই আতঙ্কিত হয় না। তাছাড়া পাবলিক কত বছব ভোট না দিবে? পাবলিক-মেমারি চিরকালই দুর্বল। এ বছর হারিলে পরের বছর বিপুল ভোটে জয়লাভের নিশ্চয়তা মেলে। অতএব শিল্পও বিকশিত হইতে থাকে। এবং, যতদিন বিন্ধ্য হিমাচল থাকিবে, যতদিন গঙ্গা গোদাবরী থাকিবে, ততদিন এই রাজনৈতিক শিল্পে কোনোরূপ দৈন্যদশা আসিবে না : —

যাবদ্ ভাবতবর্ষ হি স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ গঙ্গা চ গোদা চ তাদেব হি রাজনৈতিক শিল্পম্।।
নারদ মুনেঃ এযা কথা ন ব্যর্থা এব।

নারদ মুনির এই কথা ব্যর্থ হইবার নয।

অতএব, মহাশয, বুঝিতেই পাবিতেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কলকাবখানা নাই ঠিকই, কিন্তু শিল্প নাই—তাহা বলা যাইবে না। নূতন শিল্প স্থাপনা না করিয়া দীঘকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই সকল শিল্পগুলিব একটু যত্ন লইলেই সময় ও অর্থের প্রচুর সাশ্রয় হয়, এবং বাংলা আবার ভারতসভায়, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয়বাদী অভিনন্দন জানাইয়া পত্র শেষ কবা ছিল রীতি। মাঝে চালু হইয়াছিল লাল সেলাম জানানো। গত বছরও সংগ্রামী অভিনন্দন আপনি সানন্দেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইদানীং ন্যাবা যেমন চতুর্দিকে হলুদ দেখে, আমি কেবল শিল্পই দেখিতেছি, কাজেই শৈল্পিক অভিনন্দন জানাইযা শেষ করিবার অনুমতি চাহিতেছি। আপনি প্রীত হইলে মাসিক তিন শতাংশ ডি. এ. সাপ্তাহিক কবিয়া দিবেন। নিবেদন ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
সেবক নারদ।।

মিস্‌ফায়ার

বিমান চট্টোপাধ্যায়

তিন সত্যি করেও আবার সেই কারণছাড়া কারণবারির প্রসঙ্গই এসে পড়ল।

আমার এক প্যাজ-পয়জার ছকে পয়সা করা বন্ধু বলেছিল—দেখ, দুটো জিনিস একদম বিশ্বাস করবি না। এক, প্রমিস করে প্রেম। দুই, গ্যাড়ানো গুড়ের গেম।

এমন একটা লিটারেরি ক্যালকুলাস শুনে আমার মাঝগলায় ঢোক আটকে যেতেই বলল, জানতাম। গিলে নে ঢোকটা—বলছি। অভিজ্ঞতাটা আমার, পেটেন্টও আমার। আর এই অভিজ্ঞতার Date of Expiry জানবি অন্তত থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পর্যন্ত।

কিছুই না বুঝে চেয়ে থাকি চোখে চোখে। তো, বন্ধু ঘটনাটা যা বলেছিল—আর আমিও সেটাকে পরে একটা গল্পের ডেভিল জাতীয় (ডেভিল গল্প নয়) কিছু বানিয়ে যা লিখে ফেলেছিলাম—দেখুন না নিচে সেটা, স্বাদে গন্ধে প্রায় শিককাবাব।

গল্প শুরু এইভাবে—

টপ্ অভিজাতদের একটা হাইফাই পার্টি শুরু হল।

আলোগুলো ডিমার হতেই ল্যাজামুড়ো ব্যাঙ্কোয়েট হলটা ঝমঝমিয়ে উঠল। শুরু হল 'জাজ্'। সঙ্গে বুড়ো ব্যাঙের ফুলো গলায় ব্যাগপাই ড্যামপ্—ঝাঁপ্-ড্যাপ্।

সঙ্গে সঙ্গে নারান জৈন গৈরিক দত্তকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, গৈরিক গেট রেডি। পার্টি স্টার্ট হয়ে গেছে।

তার আগেই বেয়ারা সবার হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বিকারশুদ্ধির ভায়োলেট পেগ। থলথলে প্যাকাল জর্জেটে সেজে মিসেস আহুজা। তরুণী বস্তির ইয়ারদোস্ত সাহেলি। প্রথম পেগের নেশাটা জমে ওঠার অপেক্ষায় ছিল জৈন। অভিজ্ঞ জৈন জানে, দু' পেগে ঠিক মিডিয়াম কিক্। তাতে একটা হালকা অথচ অ্যালার্ট সেক্স হাঙ্গার তৈরি হয়। গৈরিককে মিসেস আহুজার ঠিক ওই মোমেন্টটাকে হ্যামার করতে হবে।

গৈরিকের লেডিকিলার শরীর ব্যবহার করে, জৈন টেন পার্সেন্টে আগে দুটো বড় টেণ্ডারে টোটাল সাকসেসফুল। এক আর দেড় কোটির দুটো কোটেশন। এবার আড়াই কোটির। ইরেকশন জব। আহুজা সাহেবই ঠিকাদারের ভগবান।

জৈন বলে দেয়,—শোনো, ওই যে টাই-স্যুট পরে দাড়ি, সেলিম। কোল আর স্টীল বেল্টের সবচেয়ে বড় মানে চীফ মাফিয়া। ইদানীং কোলিয়ারির চোরাই ডেটোনেটর ওই-ই কিনে নিচ্ছে। আর ওই যে দেখছ, টাকমাথা সাফারি স্যুট, সিকিউরিটি চীফ্। সেলিমের চোরে চোরে মাসতুতো—। ওদের মাল খেলে হোল বডির নেশা হলেও কানের নেশা হয় না—এমনকি মরলে ডেথ সার্টিফিকেট কান বাদ দিয়ে ডেড লেখা হবে জানবে। তাই ওদের থেকে বেশ দূরে সরে যাবে। আর বেশি মাল খেয়ে আউট হয়ে যেও না। কারণ আহুজার মেম তোমার কোমর ধরে নাচতে নাচতে এক্সাইটেড হবে। ফলে, টেণ্ডারের 'মিনিমাম রেট' ভুল ফিগারও বলে দিতে পারে। অথবা, পাল্টা তুমিও নেশার ঘোরে ফিগারটা শুনলে হয়ত দশ, বললে বিশ। তো, হয়ে গেল সব আমার ফিনিশ। সে জন্যে প্রেম জমে উঠলেই 'মিনিমাম রেট'-এর ফিগারটা জেনে, আগে আমায় এসে বলে দিয়ে, তারপর যত খুশি নেশা বাড়াও। নইলে টেনশানে থাকব।

গৈরিক দত্ত ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা দাদা, এখনো কী ভাবেন বলুন তো আমাকে? ভয় নেই। গত রবিবারের পার্টিতে ন'হাজার টাকার হীরে বসানো আংটিটা কি মুখ দেখতে ভেট দিয়েছিলাম ওই হীরামতিকে?

জৈন বলে, তা ঠিক। অবশ্য ও-তো তোমার প্রেমের কসম খেয়েই রেখেছে—'মিনিমাম রেট' সাহেবের কাছ থেকে জেনে হোক, ব্রিফকেসের ফাইল দেখে হোক, এনি হাউ, এই রবিবারে জানাবে। কিন্তু টেণ্ডার জমা দেবার কালই লাস্ট ডেট। মনে রেখো, রেটটা আজ পেতেই হবে। বাই এনি মীনস্।

—হবে মানে? আংটি পেয়েই প্রেম-প্রমিস ছিল পাক্কা।

—তাহলে তো ঠিকই আছে। ওস্তাদেব মার শেষ রাতে। যাও-যাও, ডান্স শুরু হল।

—দাঁড়ান। আহুজা সাহেব কারো একটা বউযের কোমর জড়ালে, তবে না আমি ওর মেমসাহেবেব কৃপা পাব?

—আর শোনো, শুরু করবে এইভাবে—রিংটা আপনার সুইট লিরিক্যাল আঙুলকে কষ্ট দেয়নি তো?

গৈবিক হেসে বলে, এক্জ্যাক্ট্লি তাই বলব।

কিছুক্ষণ পরে 'জাজ' পাল্টে নাটকিং কোলের মিউজিক। কোমর জড়িয়ে চোখে চোখে চেয়ে—বল্ জাতীয। নেশার খুঁটে বাঁধা কামঘোরের টান। আহুজার বুঁদ স্টেপে, গবম ছোঁয়া যুবতীব বুক ও গালের। গৈরিক হাসছে। আহুজার বউ হাসছে। গৈরিক টানছে। আহুজার বউ নামছে। গৈরিকের কোমর ম্যাডামেব দখলে। ম্যাডমেব বুক গৈরিকের বক্ষরোম ছুঁযেছে। লাইট আরো ডিম। সুরে সম্মোহন বাড়ল।—টিট্-টিটি-টিট্-টিটি-টিট্-টিটি। ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যাট্যা-আ-। হার্টফায়ার।

প্রতিটি জোড়াই আলাদা দ্বীপ এবার। জেনের 'তুরুপের তাস' গৈরিক। কোম্পানির গোপন লোয়েস্ট রেট টেনে বের কবছে গৈরিক এবার। স্বপ্নের ডানায় ভাসছে পুরো হলঘর।

নাচ থামলে শুরু হবে বুফে ডিনাব। কথামতো গৈরিক এবার নাচ ছেড়ে মাঝপথে ফিবে আসছে। ফিরে এল।

জেন মনে মনে বলে, সাবাস। রেটফিগার এসে গেছে মুঠোয়। ব্রাভো। কালো হীরের অর্ডার পেতে সাদা হীরের ন'হাজারের কুন্কি ছেড়েছিল স্রেফ জেনের পাশে বসে পড়ে গৈরিক। ভেতবেব হার্টবিট লুকিযে জেন বলে রেট পেয়ে গেছ তো?

গৈরিক চুপ। গৈবিকের টাই বাঁকা। চুল উস্কো প্রেমবিলিতে। চোখে চাউনিতে প্রেমের চোঁয়া ঢেকুর।

—কী হল? আহুজার বউ আংটি পেযে খুশি নয়?

গৈরিক তবুও চুপ।

জেন গৈরিকের চোখেব দিকে তাকাল। মুখটা থমথমে না রাগমাখা এবার হাল্কা রসিকতায়,—বাগ করেছ নাকি? আরে, তুমি হলে আমা 'ওয়ার্ল্ড মনিটরি ফাণ্ড'। বাগ করলে আমি বাঁচব? তারপর কাঁধে হা রেখে,—আহুজার বউকে গত রবিবার একরকম দেখেছিলাম। এবার তোমা প্রেমে সাজেব চোটে চেহারাটাই অন্যরকম দেখাচ্ছে।

হঠাৎ গৈবিক চুড়ো থেকে আইস লাইনের বাইরে ছুঁড়ে দিল জেনকে। বলল, অন্যকে অন্যরকম দেখাবে না কেন? মেযেছেলেটা গত ববিবার আং নেওযা আহুজার আগের বউটা নয়। তাছাড়া ওটা ওর বউ ছিল না আদৌ ওব বউ দেশেব বাড়িতে থাকে।

—সত্যনাশ। তবে এ কে। —'কে?' শব্দটায় বোধহয় মাইল্ড স্ট্রোক হ গেল।

—আপনি বুঝুন, কে? চিরকাল কি গ্যাঁড়ানো গুড়ের গেম খেল জেতা যায়? আজকের ইনি নতুন, এ সপ্তাহের বউ।

ট্যারা চোখে

সেমি ফাইনাল

ভারতীয় ক্রিকেট দলটি ফাইনালে উঠিয়া নাকি নযবার টানা পবাজিত হইয়াছে। হ্যাটট্রিক শব্দটি কানে আসিয়াছিল। ভাবিলাম—মোটে তিনবার? কবে হইতেই তো হারার খবর শুনিতেছি। অনেক উদ্যম লইয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া ফাইনালে উঠিযাই মুখ থুবড়াইয়া পড়ে। পরে ভালো করিয়া খেয়াল করায় জানা গেল শব্দটি ছিল ট্রিপল্ হ্যাটট্রিক। অর্থাৎ তিন তিরিক্কে নয়বার পরাজিত। কিন্তু ইহাতে এত হট্টগোলেব কী আছে, তাহা বুঝি না। অলিম্পিক দৌড়ে পি.টি.উষা চার নম্বরে পৌছাইয়া "পায়োলি এক্সপ্রেস" হইল। তাহার ধারেকাছে আর কেহ পৌছাইতেই পারে না। আমাদের আদরের লিয়েণ্ডার পেজ অলিম্পিক টেনিসে সেমিফাইনালে উঠিতেই আমাদের বুকের মাঝে দুরুদুরু শুরু হইয়াছিল, কারণ হারিলে সবডঙ্কা কিন্তু জিতিলে তবু ব্রোঞ্জটা তো পাইবে। পদক তালিকায় ভারতের নামটা তো ঢুকিবে। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী তাহার কাছে দাবী রাখে নাই যে তোমাকে ফাইনালে উঠিতেই হইবে এবং সোনাটিও জিতিতে হইবে। ব্রোঞ্জ পাইযাই আমরা আশাতীত পাইয়াছিলাম। আর যত দোষ করিল কিনা ক্রিকেট টিমটিই? সে নয়-নযবার ফাইনালে উঠিযাছে কিন্তু জিতিতে পারে নাই বলিযা হায হায় বব উঠিযাছে। অলিম্পিকে দৌড়ে চার নম্বরে পৌছাইলে কোনো পুরস্কারই পাওয়া যায না, সে ক্ষেত্রে ফাইনালে দ্বিতীয় হইলে পুরস্কার অর্থগুলো তো পাওয়া যায।

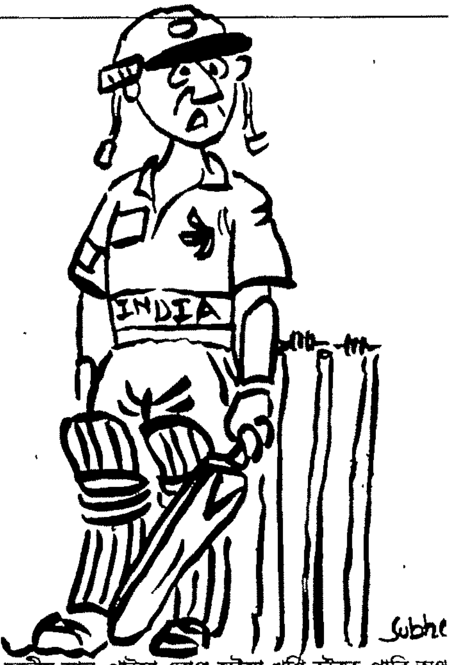

অলিম্পিক টেনিসে তৃতীয স্থান পাইয়া ব্রোঞ্জ লইয়া খুশি হইতে পারি অথ ক্রিকেটে এতবার ফাইনালে উঠিয়া দ্বিতীয় হওয়াব জন্য হায হায ক আমাদের চাহিদা এরকম আলাদা আলাদা ব্যক্তির কাছে আলাদা আলা হওযাটা কি পক্ষপাতিত্বমূলক নহে? অন্ততপক্ষে এতবার ফাইনালে উঠিবা অভিজ্ঞতা কটি ক্রিকেট টিমের আছে সেটিও তো বেকর্ড খুলিয়া খুঁজি হইবে, সেটিই বা কম কী?

—অঞ্জনা দ

রাশি চক্কর

জ্যোতির্ষাঁড়নব স্বামী কমলানন্দ অবধূত

রাজনৈতিক দাদা রাশি : রাজনৈতিক দাদাদের ওপরে বৃহস্পতি এ মাসে ীব প্রসন্ন। মাসে চারটি বৃহস্পতিবারের মধ্যে অন্তত দুটি বৃহস্পতিবার রাধীপক্ষের লাশ ফেলে দেওয়ার চান্স পাবেন। শুক্র ততোধিক প্রসন্ন থাকায় সর শেষ শুক্রবার নিজের দলেরই গুপ্ত ঘাতকের হাতে শহীদ হয়ে রাধীপক্ষের বদলা পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারবেন।

চাঁদাবাজ দাদা রাশি : এই রাশির জাতিকা হয় না, শুধুই জাতক (ব্যতিক্রম: নদেবী)। দাদাদেব একতলা বাড়ি দোতলা হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছে। বাস, লরি, ও টেম্পো থামিয়ে যে দাদারা চাঁদা আদায় করেন, মাতাল কের অনুগ্রহে নৈশকালীন কালেকশনের সময় চক্রযোগে মোক্ষলাভের ভাগ্যযোগ—গাড়ির তলার সঙ্গে দাদার গলার মধুমিলনের ফলে।

গৃহিণী দাদা রাশি : যে যে বাড়িতে গৃহিণীগণ দাদাগিরি করেন এবং া-মুখ চুন করে কেবল চুপ মেরে যান, সেই সেই বাড়িতে এ মাসে চুরির াবনা আছে। গৃহিণীর গলাবাজির দাপটে ছাদের কাক ও রাস্তার কুকুর ষরাতে পাড়াছাড়া হলেও কোনো কোনো কালা চোর পথ ভুলে সেই ড়িতে হাজির হয়ে সর্বস্ব ফাঁক করে দিতে পারে। তৎপরে গৃহিণী কর্তার দ্দেশ্যে যেরূপ জগঝম্প শুরু করবেন, তাতে তিন মাইল দূর থেকে ফায়ার গেড ছুটে আসতে পারে। শেষ রাত্রে ফায়ার ব্রিগেডের নিরন্তর বারিবর্ষণে হণী দাদার মস্তিষ্ক শীতল হওয়াব যোগ দেখা যায।

ইজম্ দাদা রাশি : এই রাশির জাতক যাহারা সর্বদা ইজম্ খুঁজিযা বেড়ান মন, কিউব-ইজম্, সুররিয়ালিজম্, পোস্টমডার্নইজম্,—তাহাদেব এই সের শেষ দিকে পাওনাদার-ইজম্ যোগ রহিয়াছে। তখন পার্সে দাঁত াচাইবার কাঠি ছাড়া আর কিছু না থাকিলে চড়-চাপড়-ইজম্ যোগ ও তবাদে ক্ষুর-ইজম্ যোগ দেখা দেয়।

কবি দাদা রাশি : এই রাশির জাতক চিনিবার সহজ উপায়—সর্বদা কবিতা বাশির পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া দিবাব জন্য ইহাদের দক্ষিণ হস্ত কিছুটা স্খলিতে অবস্থায থাকে এবং উড়িতে শেখা ভ্রাতৃদিগেব ডানা ছাঁটিবার দ্দেশ্যে বাম হস্তে কাঁচি মজুত থাকে। এই মাসে এই রাশিব জাতক কবিভ্রাতা শির আক্রমণে বেহাল হইতে পারেন এবং এক পক্ষ কালের মধ্যে সংবাদপত্রের অফিসে তাহার চেয়ারে কোনো করিৎকর্মা কবিভ্রাতা রাশির বহাল হইবাব উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যায়।

টেনিদাদা রাশি : গ্যাস মারিবার প্রাক্কালে এই রাশির জাতক এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সতর্কভাবে ফিল্ড দেখিয়া লইবেন, কেন না, গ্যাস বেলুন ফাটিবার যোগ দেখা যায়। গুল দিবাব সময সর্বদা মেশিন-গুল ব্যবহার করা বিধেয়। স্ক্রি-তে চা-সিগারেট যোগ থাকিলেও ওমলেট-যোগের আশা ক্ষীণ।

ফেলুদাদা রাশি : যাঁহারা প্রেমিকাকে বিবাহ করিয়া অফিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিযা বেডরুমে নানা সন্দেহজনক নমুনা—যেমন, অন্য ব্র্যাণ্ডেব সিগারেটেব ভগ্নাংশ, 'করেছিলমনেপড়েনা' প্রেমিকার গণ্ডে দংশনচিহ্ন দেখিতে পান, সেইসব ফেলুদাদা রাশির ভাগ্যে স্ত্রী-পলায়ন যোগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। পলাযনের সঙ্গে সঙ্গে তিন রতি গোমেদ ধারণ বিধেয়, অন্যথায 'চিঠি রি-ডাইরেক্টেড হইবার প্রবল যোগ দেখা যায়।

ফুকো-দেরিদাদা রাশি : এই রাশির যেসব জাতক গত পাঁচ বছব ধরিয়া "ফুকো দেরিদা" "ফুকো দেরিদা"—এই নাম জপিতে জপিতে মুখে ফেকো তুলিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের অবিলম্বে অন্য বিদেশি দাদা ধরা প্রয়োজন। যে জাতক যত আগে বিদেশি দাদা ধরিতে পারিবেন, কফি হাউস ও লিটল ম্যাগাজিনে তাঁহার তত বেশি কলিকাপ্রাপ্তি যোগ ঘটিবাব উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এমনকি, 'আইওযাক থু'—বিশ্ববিদ্যালযে চরিযা বেড়াইবার তৃণক্ষেত্র যোগ দেখা যায়।

প্রেমিকা দাদা রাশি : এই রাশির জাতিকা ওষ্ঠে গাঢ় লাল লিপস্টিক ও বক্ষে স্বল্পবাস স্কার্ট ধারণ করিলে এই মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ঈপ্সিত ফল পাইবেন। অবাধ্য প্রেমিক পালিত সারমেয়র ন্যায পদতলে গড়াগড়ি যাইবে। অবশ্য ইহা ঘটিবে প্রেমিকাদাদার অতি ক্রোধযোগে প্রেমিকের পদস্খলন হেতু।

পরিচালক দাদা রাশি : পরিচালক দাদাদিগের পক্ষে মাসটি খুব অনুকূল নহে। সদ্য সমাপ্ত চলচ্চিত্র উৎসবে অনুপ্রাণিত পরিচালক নবাগতা তরুণীকে একা ঘরে হাতে-কলমে রিহার্সাল দেওন-কালে অকস্মাৎ চামুণ্ডা রূপিণী স্ত্রীর উদয, ফ্লোরে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারযোগ এবং প্রত্যাবর্তনের পর গৃহে থালা-বাসন বিচূর্ণ মহাযোগ লক্ষ্য করা যায়।

াপনার দুর্ভাগ্য গণনা ও আপনাকে ভাগ্যহীন করিবার উপায় নির্ধারণের জন্য জ্যোতির্ষাঁড়নবজি প্রতি ইংরেজি মাসের ৩২ তারিখে মধ্যরাত্রে দপ্তরে সিয়া থাকেন। পারিশ্রমিক বাবদ তিনটি বিটকেল আধুনিক কবিতা (যাহা একমাত্র অমাবস্যার আঁধারে পাঠযোগ্য) সঙ্গে আনিবেন। অগ্রিম বুকিং লাগিবে।

জবর খবর

সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য

স্বামীরা যতই দোষ করুন না কেন, তাঁরা দেবতার সমান। স্বর্গ-নরক-আস্তাকুঁড়-ভুশণ্ডীর মাঠ—যেখানেই তাঁরা যান না কেন, স্ত্রীদেরকেও সেখানে যেতে হবে গঙ্গবস্ত্র হয়ে। শাস্ত্রের পুঁথিতে সেই বাল্মীকি ঋষির আমল থেকেই বুঝিয়ে বলা হয়েছে—স্বামীর ভাগ্যের সমান শেয়ার হোল্ডার হচ্ছেন স্ত্রী। তাই তো আগেকার দিনে স্বামী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়ে যখন চিতার আগুনে পুড়তেন, তখন স্ত্রীদেরকেও সিঁদুর-চন্দন-লালপেড়ে শাড়ি পরিয়ে চিতায় বসিয়ে দেওয়া হত। পতিব্রতা "সতী" সাধ্বী নারী যাতে পৃথিবীর অন্য সাইডে গিয়েও স্বামীকে সমানভাবে সার্ভিস দিতে পারেন।

তবে, হালফিলের নারীবাদের ঘূর্ণি হাওয়াতে এরকম আদ্যিকালের পুরুষতান্ত্রিকতা তামাদি হয়ে গেছে বলে মনে করলেন উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল জেলার কাঁসড়াগোছা গ্রামের প্রৌঢ় সনাতন মোহান্তি, সতী স্ত্রীর পুণ্যেই তাঁর নিজের পুণ্যের মানিব্যাগ ফুলে উঠবে—দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর। তাই উড়িষ্যা রাজ্য পরিবহন দপ্তরের ড্রাইভার সনাতন, স্ত্রী সঞ্জুবালাকে চিতায় পুড়তে দেখে আর স্থির থাকতে পারেননি। সোজাসুজি সেই চিতাতে নিজেই ডাইভ দিয়েছেন। সবাই মিলে যখন পত্নীব্রত সনাতনকে চিতা থেকে টেনে তুলল তার আগেই তিনি পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে ড্যাংডেঙিয়ে স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে স্বর্গে অথবা নরকে নতুন উদ্যমে হানিমুন করতে চলে গেছেন।

পত্নীভক্ত এই স্বামীহনুমান সনাতন মোহান্তির নাম শুনলেই এখন কপাল ঠুকে প্রণাম করছেন ঢেন্‌কানলের লোকজন। তবে নিন্দুকেরা আড়ালে বলছে স্ত্রী সঞ্জুবালার ডায়াবেটিসের খরচা জোগাতে গিয়ে তহবিল বেমালুম ফাঁক হয়ে গিয়েছিল সনাতন ভাইয়ের। তাই 'সতী' হওয়ার ছুতো করে এই স্বেচ্ছা স্বর্গ প্রাপ্তি।

মার্কিন-রবি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কলমের দোষে "ববিগুরু কবীন্দ্রনাথ" বানিয়েছেন অনেকেই। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানির দৌলতে দুই মার্কিন সম্পাদক লিও হ্যামিলটন আর এডমণ্ড এল হোল্‌প্ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বাগানো লেখকদের গল্প সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে সাধের বিশ্বকবিকে নতুন অবতার দান করেছেন। তাই নিয়ে বিশ্বভারতীতে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। কবিগুরুর অস্তিত্বই না এবার পেন্টাগন আর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়।

হ্যামিলটন আর হোল্‌প্ সাহেব বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে বড় ছেলে ছিলেন। এখানেই যত গণ্ডগোল। কাব্য সাহিত্য গান প্রেম প্রবন্ধে রবিঠাকুর অলরাউণ্ডার হতে পারেন, কিন্তু দেবেন ঠাকুরের পুত্র হিসেবে অনেক পরে—দ্বিজেন্দ্রনাথ আর 'জ্যোতিদাদা'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথই সবার আগে দেবেন্দ্রনাথের টিমের হয়ে ব্যাট ধরেছিলেন। এতেও নিস্তার নেই। সায়েবদের মতে রবিঠাকুর গঙ্গানদীর ঘাট ধরে শিয়ালদহে গিয়ে, না, লোক্যাল ট্রেনে বাদুড়ঝোলা নয়, জমিদারি দেখাশোনা করেছিলেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুজিত বোস রেগেমেগে জানিয়ে দি
রেলস্টেশনে রবিঠাকুরের জমিদারি থোড়াই ছিল। আসলে তিনি বাংলা
শিলাইদহে, পদ্মানদীতে নৌকায় বসে ঢেউ গুনতেন; সূর্যাস্ত দেখতে
খাজনার হিসেবের জাব্‌দা খাতায় কবিতা লিখতেন। ভুলে ভাবাক্রা
বইতে রবি ঠাকুরকে দুধে চোবানো, ধবধবে সাদা দাড়ির অধিকারী পাত্তা দেওয়া হয়েছে বেশি।

নাপিত-দিদিমণি

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা, ছাত্রছাত্রীদের শিষ্টতা, নিষ্ঠা, মনঃসংযোগ স
এখন যাদুঘরে জমা দেওয়ার মতো দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় চলে এসে
অভিযোগ সকলের। এদিকে আজকাল "স্টুডেন্ট" নামক "গাধা"দের
-তেন-প্রকারেণ "সু"-শিক্ষিত করে তোলার জন্য সব স্কুলেই সরকারে
থেকে নির্দেশনামা পৌঁছে গেছে। তবে বেহালা বিদ্যাভবনের ইং
দিদিমণি রমা অধিকারী কাঁচি ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন—চুল কেটেই
সুমতি ফেরাবেন। কদম ছাঁট কায়দার 'ডিসিপ্লিন' চলে আসবে বলে র
বিশ্বাস। তারপরেও ছাত্ররা বিশৃঙ্খল হলে ভাগ্যে রয়েছে নদের নি
"নীলাচলে মহাপ্রভু" ছাঁট। অমরীশ পুরীর মতো একদম নেড়ু।

যেই ভাবা সেই কাজ। স্কুলের সামনে কাঁচি নিয়ে খাড়া রমা
বেয়াড়া চুলওয়ালা ছাত্র দেখলেই হল। অমনি তাদেরকে লাইন দি
করিয়ে সাম্যবাদী চুলের কাটিং করে দিচ্ছেন।। স্কুলে হঠাৎ এইরকম মিনি
সেলুন সার্ভিস পেয়ে কাবু ছাত্ররা, বেশ কয়েকজন বিছানাতে শয়

রাতের ঘুম ছুটে গেছে ছাত্রদের বাবা-মায়েদেরও। নাপিত দিদিম
"কেশসেবা"-র হাত থেকে ছেলেদের বাঁচাতে থানাতে ডায়েরি
তাঁরা। ভয় হচ্ছে, তাঁদেরও না রমা দিদিমণি ভদ্র সভ্য হওয়ার জন
স্টাইল পাল্টাতে বলেন। দিদিমণি কিন্তু নাছোড়বান্দা। হাকিম নড়ে
নড়বে না। গাড্ডায় পড়েছেন বিদ্যা ভবনের কর্তৃপক্ষ। সরকারি অ
পেয়েছেন বছরখানেক আগে। দিদিমণির কাঁচি এবার না স্কুলের আয়ু
কাঁচি চালিয়ে দেয়।

খাবারের বিছে বিচার

দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে রেস্তোরাঁগুলোর মেনুকার্ডে একবার চোখ বোলালেই বিছের হুল ফোটানোর মতো জ্বালায় লাফিয়ে উঠতে হবে। কী নেই সেই খাবারের তালিকাতে? লঙ্কা লেবুর রস নুন দিয়ে মাখানো কাঁকড়া বিছে ভাজা, গঙ্গাফড়িং, পঙ্গপাল, ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর উঁইপোকা। বিছে ভাজার দামও জব্বর। প্রত্যেকটা এক মার্কিন ডলার করে। ভিয়েতনামে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরা এত বেশি পয়সা একদিনে আয় করতেই পারেন না। তাই বলে কি তাঁরা বিছে খাবেন না? তেঁতুলগোলা জল আর লেবুর আচার দিয়ে বিছে ভাজা খাওয়ার কথা শুনলেই জিভে জল আসে ভিয়েতনামিদের। শুধু ফুচকা গোলগাপ্পা খেতেই যে তেঁতুলগোলা জলের সঙ্গতের দরকার হয়, একথা আর কে বলবে। হ্যানয়ের্‌ তে তিন জেলাতে এখন বিছেখাদ্যের জয়জয়কার।

হ্যানয়ের দক্ষিণ দিকে লে মাত্‌ গ্রামে আবার শুধু বিছে নয়, সাপকে দিয়েও পাকানো হচ্ছে নানান সুস্বাদু খাবার-দাবার। রাজগোখরো সাপের মাংসের দাম শুনলে চোখ কপালে উঠবে তাবৎ ভারতবাসীর। প্রায় ১০০ মার্কিন ডলার।

ভিয়েতনাম আর প্রতিবেশী দেশ কাম্বোডিয়াতে এভাবে পোকামাকড় সরীসৃপ নিয়ে দেদার ভুরিভোজ হচ্ছে দেখে বেজায় চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন পতঙ্গবিদ আর পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। বিছে-ফড়িং-সাপদেরকে যদি এইভাবে পেটপুজো করা হয়, তাহলে বৃশ্চিক দংশন আর সর্পাঘাতে মৃত লোকের সংখ্যা বহুত কমে যাবে বলেই তাঁদের আশঙ্কা।

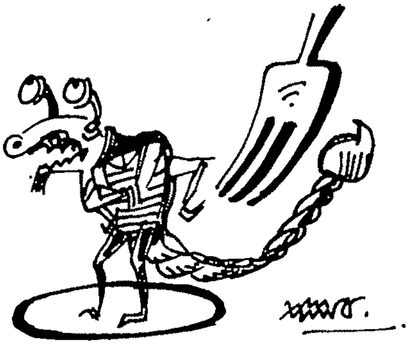

মানব-ইক্‌ সম্বর্ধনা

আবর্জনা নিয়ে পাল্টি খেয়ে পড়ে আছে কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার ট্রলি। পিছনে বছরখানেক সাফ না হওয়া 'গণতান্ত্রিক' মূত্রালয়। ডানদিকে এঁদো নর্দমা। গলির মধ্যে কাদা। তথ্যপ্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়কে বিজয় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য এর থেকে আর ভালো কোনো পরিবেশ খুঁজে পাননি বেলেঘাটা শিবতলা এলাকার একনিষ্ঠ মন্ত্রীদরদী পার্টিকর্মীরা। সাম্যবাদী বলে কথা। রাম-শ্যাম-যদুর সঙ্গে জলে-কাদায়-পুকুরে-ভ্যাটে না থাকলে মানববাবু আর মানবদরদী মন্ত্রীজি হবেন কী করে।

বোদামার্কা মুখে প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে মার্কস-লেনিনের মানবপ্রেম কার্যনীতির মুণ্ডপাত করছিলেন মানববাবু। বাতাসের দেবতাও কম সাম্যবাদী নন। অকস্মাৎ কম-রেডমানববাবুর ঘাড়ে পপাত মঞ্চের বাঁশে আটকানো বেশি-রেড কাস্তে-হাতুড়ি-তারা-র 'লোগো'-ওয়ালা ঝাণ্ডা। 'ইক্‌' শব্দ করে মানববাবু মানবিক হলেন।

কলির গোপাল

দ্বাপরযুগে ব্রজের প্লে-বয় কেষ্টঠাকুরের চারদিকে পরম বন্ধুর মতো ভিড় করে থাকত গরুবাছুররাও। মা যশোদার আদরে-বাঁদর মুরারিমোহন, ঘরে পাতা দুধ-দই-ক্ষীরের বংশ ধ্বংস তো করতেনই, আবার ব্রজভূমির গরু চরানোর মাঠে বসে রাধার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি।

এহেন লর্ড কৃষ্ণের গরু-দায়িত্ব বইতে একেবারে আদাজল খেয়ে লেগেছেন বিষ্ণু দত্ত ওঝা। এম. এ, এম. ফিল. ডিগ্রিগুলো নিয়ে দিব্যি রিসার্চের চোনা চিবোতে পারতেন, তবুও শ্রীগোসালা কাঠারের মুরুব্বি হয়ে থাকাটাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন ওঝাবাবু।

সকাল হতেই মোটরবাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখেন—কোন গরুর ঠ্যাং ভাঙল, শেষকৃত্য করতে হবে কোন গরুর, কোন গরুকে বদ্যির কাছে নিয়ে যেতে হবে। গরুদের জন্য পাঁচ ঘরওয়ালা একটা হাসপাতালও বানিয়েছেন শ্রী ওঝা। মানুষদের জন্য হাসপাতাল থাকুক বা না থাক, 'গো-মাতা'দের জন্য হাসপাতাল থাকবে না কেন?

শ্রী ওঝার এই অপরিসীম গো-ভক্তি দেখে আহ্লাদে দশখানা প্রাণী-উন্নয়নের ঝাণ্ডাবাহিকা মানেকা গান্ধী। তাঁর কাছ থেকে শ্রী ওঝা এই 'গরু-ভার' বহনের খরচের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। ওঝা বাবুর গোটা জীবনটাই 'গো-ময়'। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে প্রতিদিন সাতসকালেই এক গ্লাস গোমূত্র চোঁ-চোঁ করে মেরে দেন তিনি।

নারী-রূপেন

মহাভারতে কৌরবদের কাছে পাশা খেলায় সর্বস্ব (এমনকি নিজেদের ধুতি আর সম্ভবত অন্তর্বাসও) খুইয়ে থোঁতামুখ ভোঁতা করে অজ্ঞাতবাসে পালাতে হয়েছিল পাণ্ডবদের। সেই সময় বিরাট রাজার 'শেল্টারে' থাকার সময় ধনুর্ধর অর্জুন, হিজড়ে বৃহন্নলার পুরুষালি ছদ্মবেশে রাজকন্যা উত্তরাকে নাচা-গানার ট্রেনিং দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, ওই তা-ধিন-ধিনের মধ্যে দিয়েই অর্জুন-উত্তরার মধ্যে বেশ একটা মাখো-মাখো 'ইয়ে' হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকাতেও এরকম দু'জন মডার্ন অর্জুনের খোঁজ পাওয়া গেছে। ওহাইও রাজ্যের কশক্টন এলাকার বছর তেইশের দুই চ্যাংড়া—জ্যাসন হাউসহোল্ডার এবং জন স্টোকাম তাদের জুলিয়েটের দিকে অবশ্য প্রেমের তীর ছোঁড়েনি, তার বদলে তারা মেয়েদের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিল বিয়ারের খালি বোতল। প্রেমের ইকোয়েশন মাত্রেই যে সুরা আর নারী—এটা সবাইকে না ঘটা করে দেখালে জ্যাসন আর জনের চলছিল না মোটেই।

ওহাইওর এই বিয়ারবাবুদের দুঃসাহসী প্রেমবিলাসে অবশ্য বাদ সাধলেন কশক্টনের মহকুমা আদালতের প্রধান বিচারপতি ডেভিড হোস্টেটলার। তাঁর আদেশে বেলেল্লাপনা করার অভিযোগে হাতকড়ি পরানো হল দুই রোমিওকে। বিকেলে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দু'জনকে মেয়েদের স্কার্ট, জামা, পেটিকোট পরিয়ে মুখে কয়েকপ্রস্থ মেক্‌আপ লাগিয়ে আর মাথায় বিনুনি ওয়ালা পরচুল পরিয়ে সারা শহর ঘোরানো হল। মেয়ে-ন্যাওটা হওয়ার জন্য বৃহন্নলা বানিয়ে দেওয়া জ্যাসন আর জনকে ২৫০ ডলার করে গাঁটগচ্চাও দিতে হয়েছে। ওহাইও-র কোনো জেলেই আর সিট খালি নেই। তাই দু'জনের বরাতে এই অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা।

—কৌশিক রায়

মহব্বতের কর্পোরেশন

'চোরপোরেশন' বলে যে যতই গলাবাজি করুক না কেন, সুব্রতবাবুর সাধের কলকাতা কর্পোরেশন এখন প্যায়ার-মহব্বতের ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। স্বয়ং শেক্সপিয়রও হয়ত সশরীরে উপস্থিত থাকলে তাঁর 'রোমিও জুলিয়েট' প্রেম নাটকের ব্র্যাণ্ড নিউ এডিশন বের করে ছাড়তেন এই কর্পোরেশনকে দেখে।

ইংলণ্ডের মহাকবির ট্রাজেডিতে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্কের দুই খানদানি পরিবার—ক্যাপুলেট আর মন্টাগু। দুই পরিবারের লায়লা-মজনু রোমিও- জুলিয়েট কাঁটাতারের বেড়া, রক্ষীদের বর্শা আর ব্যালকনি টপকে তাদের লীলাখেলা চালিয়ে গিয়েছিল। কর্পোরেশনের এই অত্যাধুনিক প্রেমকাব্যে ওই দুই পরিবারের জায়গা নিয়েছে মেয়র-ইন-কাউন্সিল (শিক্ষা) সদস্য মইনুল হক চৌধুরি ও মেয়র-ইন-কাউন্সিল (বাজার) সদস্য, সামসুজ্জামান আনসারির পরিবার।

জনাব সামসুজ্জামানের বেয়াদপ ভাগ্নে পিংকা চম্পট দিয়েছিল মইনুল সাহেবের বেটি মুনিরাকে নিয়ে। পুলিশের ভয়ে আলিপুর আদালতে এসে লায়লা-মজনু নিজেদের কসুর কবুল করলে কি হবে, মইনুল সাহেবের চেলাচামুণ্ডারা পিংকোকে চাকু-বোমা-পিস্তল নিয়ে তাড়া করে "হারামজাদাকে" দোজখে গিয়ে মহব্বতের মহড়া দেওয়ানোর জন্য। প্রেমের গুলবাগিচায় ডিগবাজি দিতে গিয়ে থানা-পুলিশের দৌরাত্ম্যে পিংকা-মুনিরার এখন আওয়ারা হওয়ার দশা। হায় আল্লা! কিস্‌মতে এও ছিল।

মহব্বতের নামে এই গুণ্ডাগর্দী দেখে পৌরসভার গৃহকর্তা সুব্রতবাবু রেগে কাঁই। কর্পোরেশনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য মইনুল সাহেবকে পৌরসভা থেকে অবিলম্বে তল্পিতল্পা গোটাতে বলা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে মেয়রমশায় ভাবছেন—এইবার একজন ভালোবাসা-খেদানো মেয়র-ইন-কাউন্সিলের পোস্ট তৈরি করা দরকার।

—কৌশিক রায়

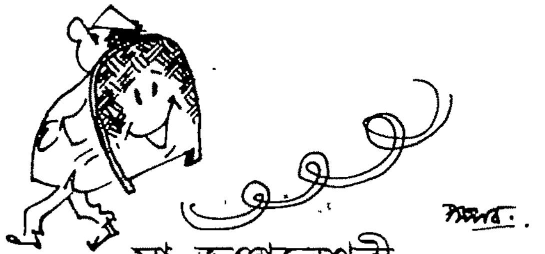

মা জঞ্জালেশ্বরী

মা মহামাযা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, বাস্তাব মোড়ে, ফ্ল্যাটবাড়ির ব্যালকনি পুকুরেব মধ্যিখানে—সর্বত্রই তাঁর অবারিত গতি। মাটি তিল চট, খড়ের আঁটি, প্লাস্টার অব প্যারিস, শাঁখ, পুঁতির মালা—কীসে নেই তিনি? ফি বছব এই "সর্বরূপেণ সংস্থিতা" বেকাব মহাদেবের স্ত্রীকে নানাবিধ বোলে পুজো করতে গিয়ে ববাতে বেশ ভালোরকম 'শারদ সম্মান'ই জোটে সার্বজনীন (অথবা চাঁদাজনীন) পুজো কমিটিগুলোব।

এবারের পুজোয মা দুর্গার অসংখ্য বৈদিক (এবং অ-বৈদিক) রূপের সঙ্গে আরো একটি রূপ ভালোই খুলেছে। সেই রূপের কাবিগবি হিসাবে বাগমারী ক্লাবেব সদস্যবা গন মাধ্যম আব শুভানুধ্যাযীদেব কাছ থেকে বেশ পিঠ চাপড়ানিও পেয়েছেন। তাঁবা দুর্গা প্রতিমাকে 'সৃষ্টি' করেছেন সাইকেলের ভাঙা চাকা, তোবড়ানো স্টিলেব থালা-বাটি, জং ধবে যাওযা কাঁটাচামচ, ভেঙে 'দ' হয়ে যাওয়া টেলিভিশন্ অ্যান্টেনা, দরজার ভাঙা কব্জা—এইসব জঞ্জাল থেকে। যেসব মহোৎসাহী যুবক এহেন্ জঞ্জাল মাতৃমূর্তি খাড়া করেছেন তাঁরা আবার ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিল্পকলাব পাঠক্রম গুলে খেয়েছেন। বাগমারী ক্লাবের ৮২ বছবেব পুজোতে এই প্রথম জঞ্জাল সহযোগে মা দুর্গার দেহেব ভূগোল পাল্টে দেওয়া হল। বাগমাবী ক্লাবে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে একই সঙ্গে শুধুমাত্র ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, আযতক্ষেত্র এঁকেই মা-ব চেহারাতে অভিনব ফ্যাশন নিযে আসা হযেছে। 'জঞ্জালিনী' দুর্গার দোসব হিসেবে দু'দিকে ধান ঝাড়ার কুলো দিযে বানানো হযেছে প্রভু জগন্নাথেব মূর্তি। পিঠে কুলো বাঁধা মহাকরণিক মন্ত্রীদেরকে সম্মান জানাতেই হয়ত।

রূপকথা নয়

বীরেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

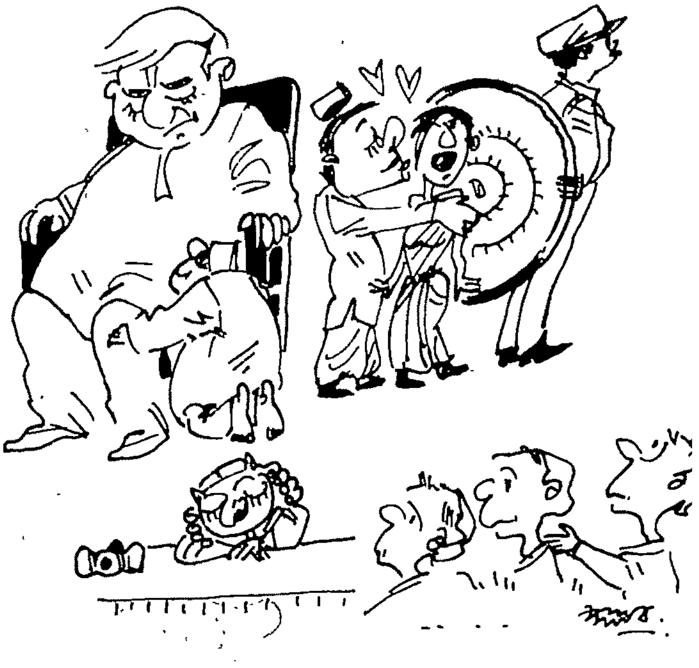

রাজা গেছেন নির্বাসনে মন্ত্রী বসেন সিংহাসন
নগরকোটাল সে টালমাটাল সদাগরও তুষ্ট নন।
রূপকথাতে দেখেছি এই চারজনেরই পুত্রগণ
তুচ্ছ দোযে রাজার রোযে শাস্তি পেতেন নির্বাসন।
(এখন) মন্ত্রীতনয করেন যখন পবের নাবী আলিঙ্গন
নগরকোটাল প্রকাণ্ড ঢাল দিযে কবেন আচ্ছাদন
সদাগরের তুষ্টি ছাড়া মন্ত্রীমশাইয়ের অঙ্গন
নয় নিরাপদ নানান আপদ জানেন সবাই বিলক্ষণ।
তাই সদাগর-তুষ্টি কাজে মন্ত্রী অনুক্ষণ মগন
এ দুই মশাই মাসতুতো ভাই বুঝে গেছে ইতরজন।
রূপকথা নয চুপ-কথা আজ দেখছে প্রজাসাধাবণ
'চোপ আদালত চলছে' এখন ব্যস্ত ধমাধিকবণ।

রসকাব্য

দণ্ড হাতে বণিক

সৈয়দ রেজাউল করিম

হরিকে চিনবেন।
মাথায় টাক, বয়স পঞ্চাশ,
কোনোক্রমে চার ক্লাশ পাশ।
কাঁধে ভার, কোমরে কাছা,
চোদ্দ পুরুষের ব্যবসা তার দুধ বেচা
এ পাড়া থেকে ও পাড়ায়।
বৎসরান্তে গণেশের খাতায়
ডিঙিয়ে পাহাড়ের বুক
আয়ের পাঁশটে মুখ
বরাবরই দেখে হরি।
মরি মরি—
তবুও তাকে ব্যবসা করতে হয়।
দুধ নয়—
জলের অন্য নাম জীবন
সেটা বাঁচাতেই ওদের আগমন।
বিদেশি বুদ্ধি আব স্বদেশি জল
মিলে মিশে নিট ফল
বোতল প্রতি পাঁচ টাকা।

যোগে গুনে হিসেবটা থাকা।
একশর পাঁচ কোটি লোক—
জল খায় প্রতিদিন।
তাহলে লাভ দাঁড়ায় পঁচিশ কোটি।
কথাটা জলজ্যান্ত খাঁটি।
শুনে হরি অবাক।

থাক না থাক—
পাঁচ কোটি বিজ্ঞাপনে।
দশ যাক মানীগুণী, নেতার সম্মানে—
খেলাধূলা, ট্যাক্সে আরো কিছু যাক,
সব কিছু দিয়ে বাদ
প্রতিদিন পাঁচ কোটি থাকা।

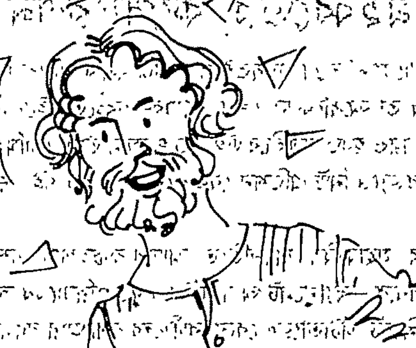

প্রেম-সংলাপ

শিবনাথ পাল

প্রেমিক ওগো দেবী
বলিয়াছ কি তোমার বাপকে
আমার সবই
সামান্য লোক নইগো আমি
আমি যে কবি।

প্রেমিকা উতলা অত হয়ো নাগো
চাঁদু সোনা
ধীরে ধীরে ভাঙছি তোমার
গুণপনা।

প্রেমিক কি কথা বলেছ ওগো
হৃদয়েশ্বরী
শুনিতে যে সাধ হয়
সয় না দেরি।

প্রেমিকা বেকার তুমি তাও বলেছি
উড়নচণ্ডি ভাব
মাঝে মাঝে মদ্যপানের
আছে বদ স্বভাব,
জুয়া খ্যালো জেলেও গ্যাছো
এতদূর বলেছি
এই কথাটি ইচ্ছে করেই
উহ্য রেখেছি।
তোমার এত ট্যালেন্ট জেনেও
রাজি আছেন ড্যাড
কিন্তু তুমি কবি জানলে
সিওর হবেন ম্যাড।

ধারাবাহিক কবিতা

পরিচালনা : কাব্যিটকেল কবিরাজ

বিরহমঙ্গল

মৈনাক মিত্র

(পূর্ব প্রক্ষালনের পর)

যাক ভেঙে যাক হাড় তা' বলে পগারপার
হব নাকি প্রেম-ফিস্ট থেকে
না হয় এ বিরহের আর স্মৃতি অতীতের
ককটেল খাব চেখে চেখে।
(চিত্তা বহ্নিমান)

সাফল্য

ভূতলেন্দু ভৌমিক

(পূর্ব প্রক্ষালনের পর)

ছাপিবে ছাপিবে প্রভু অধমের উৎকৃষ্ট কবিতা?
তবে আজ নিমন্ত্রণ এ দীনের গৃহে তব।
বহু যত্নে রাখিয়াছি দুষ্প্রাপ্য একখানি স্কচ
আর আমার বধূ? সে তো পূর্ব হতে সাজিয়া চাতকী।
চেনো না তাহারে? আহা, সে তো বলে, চিনেছে
তোমারে।
(চিত্তা বহ্নিমান)

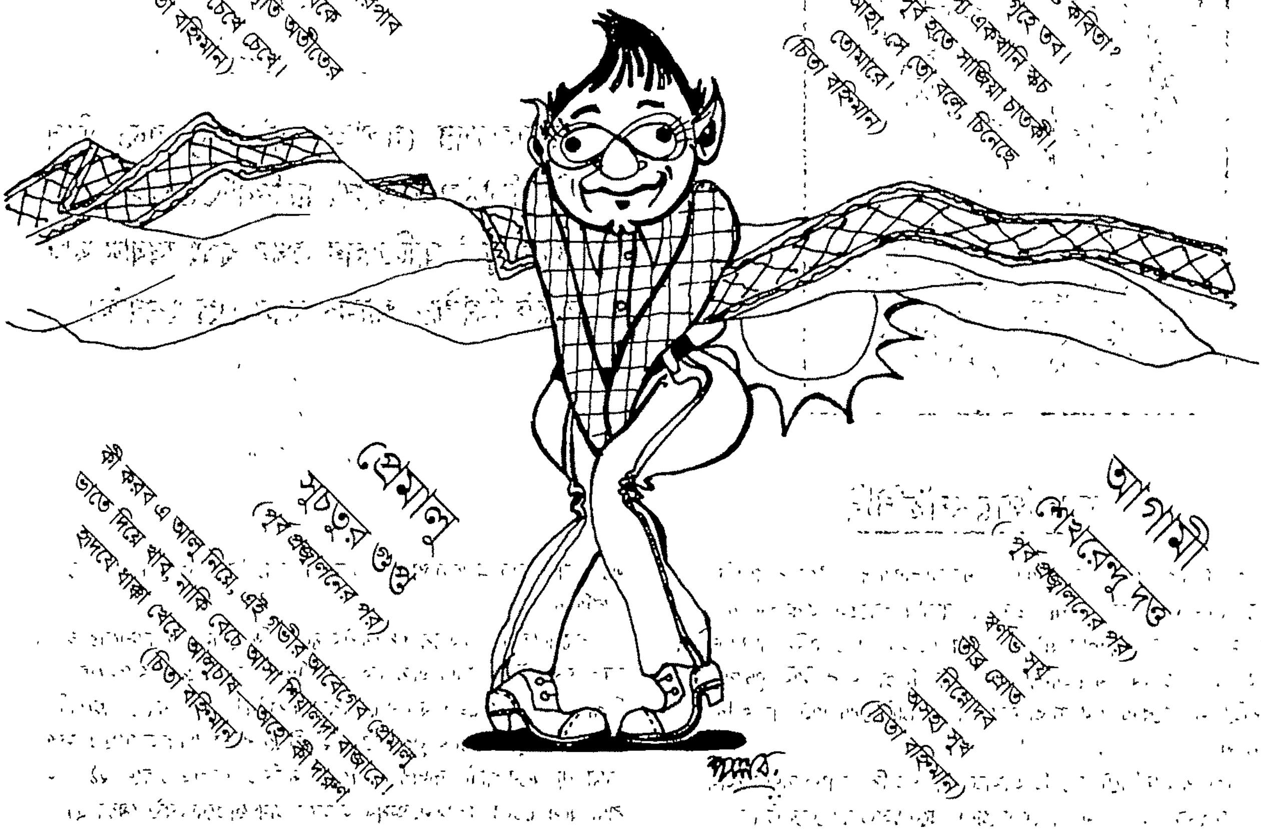

প্রেমালু

সুচতুর গুপ্ত

(পূর্ব প্রক্ষালনের পর)

কী করব এ আলু নিয়ে, এই গভীর আবেগের প্রেমালু
ভাতে দিয়ে খাব, নাকি বেচে আসা শিয়ালদা বাজারে।
হৃদয়ে ধাক্কা খেয়ে আলুচাষ—আহা কী দারুণ
(চিত্তা বহ্নিমান)

আগামী

শেখরেন্দু দত্ত

(পূর্ব প্রক্ষালনের পর)

ক্লান্ত সূর্য
তীব্র স্রোত
নিমোদর
অসহ্য সুখ
(চিত্তা বহ্নিমান)

কী পাঠক, কেমন বুঝিতেছেন? বেশ জমিয়াছে, কী বলেন? দেখিয়া আপনারও কবিতা লিখিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাই না? শব্দের পর শব্দ বসাইলেই শব্দ জব্দ হইয়া কবিতা হইয়া উঠে। চার অত্যাধুনিক কবি চার প্রকার প্রকরণ লইয়া কবিতা চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসিয়াছেন। চতুষ্পাঠীতে অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিলে চারিটি অত্যাধুনিক কবিতা লিখিয়া পাঠান—যাহা পড়িয়া সম্পাদক তো ছার, তাঁহার প্রয়াত পিতৃদেবেরও মুন্ড (যদি থাকিয়া থাকে), যেন সাঁ করিয়া ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া যায়।

—ভবদীয় কা. ক.

বড় পত্রিকার গল্প-সম্পাদক সন্তুষ্ট না হলে বড় কাগজে গল্প ছাপা হবে না। অতএব তাঁকে তেল দিতেই হবে। দরকার হলে মানিকতলা বাজার থেকে জ্যান্ত পার্শে কিনে গড়িয়াহাটে সেই দাদার বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে, আমাদের পুকুরের পার্শে এনে দিলাম।

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

> বউবাজারের গোপাল পাঁঠার কুখ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যখন আসামের নির্যাতিতবাঙালিদের পাশে ছুটে যাচ্ছিলেন তখন স্বয়ং বিধান রায় তাঁকে ফিরিয়ে আনেন বলে গল্প শুনেছি।

দাদাগিরি-ভাইগিরি

আমার কোনো দাদা ছিল না। অতএব বাল্যকালে কাউকে দাদাগিরি করতে দেখিনি। যাঁদের দেখেছি তাঁরা কাকাগিরি করতেন। এক কাকাব অভ্যেস ছিল আমার চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তোলা। এতে নাকি আমার চুলের গোড়া শক্ত হওয়ার কথা। জানতে পেরে ঠাকুর্দা তাঁর কাকাগিরি ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এখনো যে আমার টাক গজায়নি সেটা ওই কারণে কিনা জানি না।

স্কুলে যে ডানপিটে ছেলেটি আমাদের নেতৃত্ব দিত তাকে দাদা ভাবার কারণ ছিল না। কিন্তু তার আদেশ আমরা মেনে চলতাম। ছেলেটি যে দাদাগিরি করছে তা মনেই আসত না। ওর পরিকল্পনা মতো তিস্তার ধারে গিয়ে তরমুজ চুরি করে কখনো ধরা পড়িনি। স্কুলের শেষ ধাপে সন্ধেব মুখে তিস্তার বাঁধে লুকিয়ে প্রেম করতে আসা যুগলদের দর্শন করার সাহস ও না থাকলে পেতাম না। আমরা ওর কথামতো চলি বলে নিশ্চয়ই ওর আনন্দ হত, কিন্তু তার বদলে আমাদের কাছ থেকে কিছু চাইত না। দাদা এবং দাদাগিরিব মধ্যে পার্থক[illegible]লাম টেনিদা পড়ে। দাদা হওয়ার সুবাদে যে অত্যাচার টেনিদা করত তা আমার ওই বয়সে পছন্দ হত না। দাদা শব্দটিব মধ্যে যে ছাতার আড়াল অনুভব করা যায় তার বিপবীত অর্থ বহন করে দাদাগিবি।

কলেজে পডতে এসে দাদাগিরির মুখোমুখি হলাম। ইলেকশনের আগে কলেজের বাইরেব দাদা এসে ঠিক্ করে দিতেন কোন ক্লাশ থেকে কে নির্বাচনে দাঁড়াবে, জেতার পর কে কোন পোর্টফলিও পাবে। যে ছেলেটি আমাদের বন্ধু, ভালো বক্তৃতা করত, ইউনিয়নের সম্পাদক হয়েছেও সেও মাথা নিচু করে পার্টির দাদাব আদেশ মেনে নিত। কলেজ চলছে, হঠাৎ সেই দাদা এসে. ডেকে বললেন, অমুক কলেজে এক ছাত্রকে কেউ মেরেছে। তোমরা সবাইকে নিয়ে তোমাদের কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো। পড়া বন্ধ। দু-একজনের মৃদু প্রতিবাদে কাজ হয়নি, জলস্রোতের মতো ছেলেরা বেবিয়ে এসেছিল ক্লাশ থেকে।

মূলত ক্ষমতা দেখানো ছাড়া সে সময়ের দাদাগিরির অন্য কোনো কাম্য ছিল না। সে সময়ের কলকাতায় মাস্তান শব্দটা খুব একটা চালু ছিল না। ছিল গুণ্ডা শব্দটি। এখন এই শব্দটি প্রায় লোপ পেয়েছে। ভানু বোসদের লোকে যেমন ভয পেত তেমনই সমীহও করত। বউবাজারের গোপাল

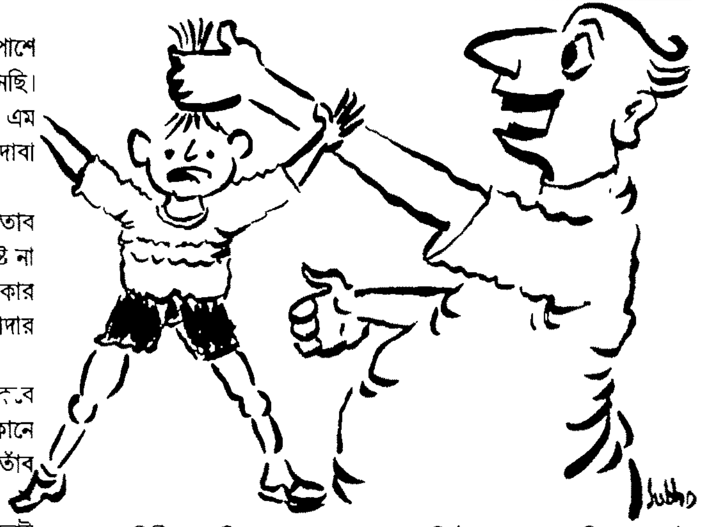

পাঁঠার কুখ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যখন আসামের নির্যাতিত বাঙালিদেব পাশে ছুটে যাচ্ছিলেন তখন স্বযং বিধান বায তাঁকে ফিরিয়ে আনেন বলে গল্প শুনেছি। রাম চ্যাটার্জীর নাম এক সময যে অর্থে উচ্চারিত হ্ত পরবর্তী কালে এম এল এ বা মন্ত্রী হওযাব পরেও সেটা একদম মুছে যাযনি। এইসব দাদাবা যে দাদাগিবি কবত তা স্পষ্ট চোখে দেখা যেত।

কিন্তু পরবর্তীকালে আর এক দাদাগিরি শুরু হ্ল। যার হাতে ক্ষমতা তাব ইয়েসম্যান না হলে দরজা খুলবে না। বড় পত্রিকার গল্প-সম্পাদক সন্তুষ্ট না হলে বড় কাগজে গল্প ছাপা হবে না। অতএব তাঁকে তেল দিতেই হবে। দবকার হলে মানিকতলা বাজ়াব থেকে জ্যান্ত পার্শে কিনে গড়িযাহাটে সেই দাদার বাড়িতে গিযে বলতে হবে, আমাদেব পুকুবের পার্শে এনে দিলাম।

অমুক তকণ লেখক অমুক সম্পাদকেব বাড়ির বাজ়াব মন দিযে ক্বব দিযে থাকেন, প্রাযই শুনতে পেতাম। সম্পাদক হেঁটে যাচ্ছেন চাযেব দোকানে আড্ডা মাবতে অফিস থেকে বেবিযে, পেছনে চলেছে তকণ লেখক তাঁব ব্যাগ বহন কবে।

সিনেমাতে অমুক নাযিকা অমুক পবিবেশকেব সঙ্গে বাইরে যাননি তাই কোনো নতুন ছবিতে অন্য পবিচালক তাঁকে নির্বাচিত কবলে পরিবেশকের ফোন আসে—ওকে বাদ দিন। ছবি চলবে না। পবিবেশকেব ক্ষমতা জানা থাকায সঙ্গে সঙ্গে নাযিকা বাদ হবে যাবে।

আবাব দাদা যদি এক পা হাঁটেন তবে ভাই দশ পা। লাদেন ওযার্ল্ড ট্রেড সেন্টাব গুঁড়িযে দিযে কী আনন্দ পেযেছে জানি না, কিন্তু দুনিযাব মানুয তাকে ইতিহাসের নির্মম খুনি হিসেবে চিহ্নিত কবেছে। কিন্তু তারপর ওই খুনিকে খুঁজে বের কবতে বুশ সাহেব দিনেব পর দিন আফগানিস্তানে বোমা ফেলছেন, প্রচুব নিরীহ, তালিবানদের অত্যাচাবে অতিষ্ঠ মানুষ মারা গিযেছে সেই বোমার আঘাতে। এই লাদেন-বুশ লড়াই-এ দেখলাম টনি ব্লেযাব অংশ নিলেন। লাট্টুব মতো তিন মহাদেশ ঘুবলেন। বুশ যা বলেন ব্লেযাব তাব তিনগুণ বলা পছন্দ করেন। এক সময তাঁকে মনে হ্ল বুশ সাহেবেব একান্ত সচিব। ইংলণ্ডের কাগজগুলো তাই লিখেছে, বুশেব দাদাগিবিব সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্লেযার ভাইগিরি কবছেন।

ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে, দাদাগিরির পাশাপাশি ভাইগিরিও আকর্ষণীয হযে উঠছে।

ট্যারা চোখে

তিন ওরিজিনাল

ওরিজিনাল (Onginal) নাকি তিনটে হয। জানা গেল কোনো এক বিদ্যালয়ের কোনো এক অভিভাবিকাব কাছ থেকে। এবং সেই কথা শুনে বিস্ময প্রকাশ কবায অন্য এক অভিভাবিকাও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানালেন তাঁকে এবং উল্টে আমাকে বুঝিযে দিলেন,—কেন হবে না, পয়সা দিলেই হয।

প্রথম জন আমাকে উপদেশ দিলেন, আপনি কবপোবেশনে খোঁজ নিযে দেখুন, তিনটে ওবিজিনাল হয়।

মৃদু প্রতিবাদ জানাবাব চেষ্টা কবেছিলাম,—তিনটেই ওরিজিনাল কী কবে হয?

জানা গেল, একই সমযে একাধিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি জন্য আবেদনপত্র দেওয়া হচ্ছে এবং সবাইকেই জন্ম তারিখেব প্রমাণপত্র হিসেবে পুরসভার মূল সার্টিফিকেটটি দেখাতে হচ্ছে। একটা ওবিজিনাল দিযে তো আব একাধিক বিদ্যালযে একই সমযে হাজিব হওযা সম্ভব নয। সুতরা উপবি কড়িব বিনিমযে পুরসভা থেকে তিনটি ওরিজিনাল সার্টিফিকেট। শু নিজে নয, তিনি আবো দু'জনেব হাতে বাকি দুটো ওরিজিনাল দিযে লাইনে দাঁড় করিযে দিয়েছেন। এত জোব গলায একাধিক জনেব কাছে ঘটনা জানার পব মনে একটি প্রশ্নই উদিত হল—তিনজন ওবিজিনাল মেয় বানানো গেলে কাজকর্মের কত সুবিধেই না হত। তিন দুগুনে ছটা চো নজর বেখে ফেরাতে পাবতেন পুরসভায কর্মসংস্কৃতি। চেহাবা বদলে যে কলকাতাব। সে সুদিন কি আসবে?

—সুরঞ্জনা ঘোষা

টীকা নিষ্প্রয়োজন

বুনো রামনাথ

মাথামুণ্ডু

হাতে সময় ছিল। কিন্তু হাতের কাছে পড়ার মতো তেমন কিছু পেলাম না। তাকের ওপর পাঁজি আর ধোপার খাতা। টেবিলের ওপর আজকের বাংলা কাগজটা, যেটার ওপর টেনেটুনে মিনিট তিনেক চোখ-বোলানো হয়ে গেছে 'যাট', থুড়ি, সাত সকালেই। নেই কাজ তো খই ভাজ। কিন্তু সে গুড়েও বালি। খই ভাজার 'রেসিপি'টা আমার ঠিক জানা নেই। অগত্যা টিভি খুলে বসলাম।

কী একটা চ্যানেলে টক শো বা চ্যাট শো গোছের কিছু একটা অনুষ্ঠান চলছিল। বেশ সাজগোজ করেই প্রস্তাবক দেখলাম দিব্যি নোঙর গেঁথে বসেছেন। পরনের নক্সাকাটা বস্ত্রটি ধুতি না শাড়ি—ঠিক বুঝলাম না। আর গায়ে যে ফুলতোলা রেশমি জামাটা চড়িয়েছেন, সেটি পাঞ্জাবিও হতে পারে আবার সেমিজ হওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়। মাথায় ঘনকৃষ্ণ কেশদাম বেশ পরিপাটি করে পাতাকাটা। না, কানে দুল, মাকড়ি দেখলাম না। পুরুষ হলে নির্ঘাত লালিমা পাল (পুং) শ্রেণীর কেউ হবেন।

যাঁর সঙ্গে প্রস্তাবক টক চ্যাট বা বকওয়াস করছিলেন তিনি অবশ্য এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা। তালিম নিয়েছেন শান্তিনিকেতনে খোদ মোহরদির কাছে। কী একটা কথায় রবী ঠাকুরের নামটা যেন কানে এল। বোলপুরের রাস্তায় সাইকেলে চেপে যাচ্ছিলেন উনি, দেখা হয়ে গেল ছাত্রীটির সঙ্গে। দুটো কথাও হল।

তা তো হল, কিন্তু মহিলাটির বয়স কত? রবীবাবুকে সাইকেল চাপতে দেখতে হলে মহিলাটিকে তো এখন থুত্থুড়ে বুড়ি হতে হয়। কই, তা তো নে হল না। চোখে দেখে যা মনে হল তাতে ওঁর প্রৌঢ়া হতেও বেশ কটা ছর লেগে যাবে। হয়ত দৃষ্টিভ্রম হল আমার, নয়ত কানে ভুল শুনলাম। নে মনে ঠিক করলা — আমার যদি কখনো ওইরকম কোনো 'বকওয়াস' াসরে ডাক পড়ে তা... আমিও খোদ রবীন্দ্রনাথ বা মহর্ষির গল্পটা শুনিয়ে ব।

চ্যানেলে চ্যানেলেই দেখলাম 'টক শো' চলছে। কোথাও প্রবীণ ফুটবলার টবল বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডার মধ্যস্থতা করছেন। কাথাও সাফকথার মাধ্যমে সাফাই গাইছেন সব হরিদাস বা ধনিদাস পালেরা। মনি কোনো একটা অনুষ্ঠানে দেখলাম একজন অতিথি অংশগ্রহণকারী নুযোগ করছেন যে বাংলা ছায়াচিত্রকে হেয় করাটা এখন একটা "ফ্যাশন" যে দাঁড়িয়েছে। অতি অন্যায় কথা। এরপর হয়ত শুনতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন হচ্ছে না বলাটাও বাঙালির একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে।

নানান সমস্যা, নানান অনুযোগ, নানান ন্যাকামি, আদিখ্যেতা নিয়েই কওয়াস'গুলির আসর। বিরক্ত হয়ে চ্যানেল বদলিয়েও মুক্তি নেই।

কোথাও 'জবাব চাই জবাব দাও'-র হুমকি, কোথাও হাড্ডাহাড্ডির মেলা, কোথাও যুক্তি-তর্কের ঝড়।

"মাথামুণ্ডু" অনুষ্ঠানটি কোন চ্যানেলে হচ্ছে, আপাতত খুঁজে পেলাম না।

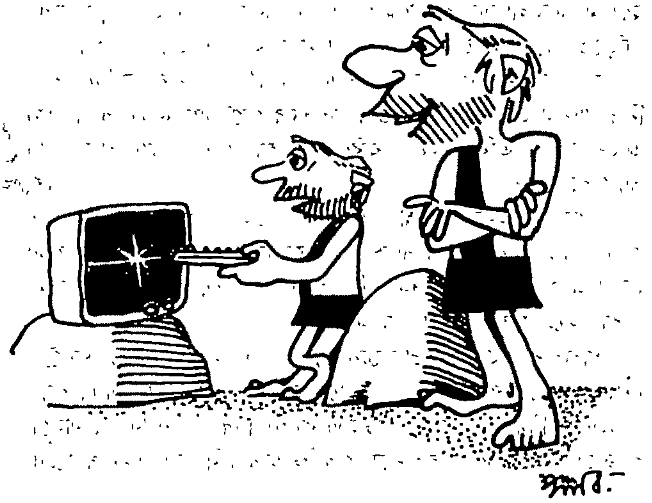

রাজা গজা

রাজতন্ত্রের গণেশ উল্টেছে কয়েক দশক আগেই। কিন্তু রাজাগজা নিয়ে আমরা দিব্যি মজে আছি আজও। দিল্লির কার্জন রোডকে এফিডেবিট বা ওইরকম কিছু করে নতুন নাম দিয়েছি, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ। কুইন্‌সওয়ের নাম রেখেছি জনপথ। কিন্তু রাজধানীর পয়লা নম্বর সড়ক কিংস্‌ওয়েকে রাজারাজড়ার খাতিরে আক্ষরিক অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হয়েছি। রাজপথ। অভিধান খুলে মিলিয়ে নিন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজাও নেই 'রাজ'ও নেই, তবু পথটা কেন রাজার নামে লেখা হবে? বিশেষ করে এই নাম বদলের পালা-পার্বণের যুগে? মাদ্রাজ চেন্নাই, বোম্বাই মুম্বাই, কলিকাতা থুড়ি ক্যালকাটা কলকাতা হতে পারে আর রাজপথ প্রজাপথ হতে দোষটা কি? যুগটাই যখন প্রজাতন্ত্রের তখন গণেশ ওল্টানো রাজতন্ত্রের রাজকে আঁকড়ে থাকাটা মানায়?

রাজনীতি? সেটা আবার কী বস্তু। প্রজাতন্ত্রে রাজনীতিকে কায়েম রাখার চেয়ে স্বৈরাচার আর কী হতে পারে?

রাজারা শিঙে ফুঁকেছেন। রাজতন্ত্রের বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু রাতনীতি বহাল তবিয়তে সাউথ ব্লকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

আর দাপাবে না-ই বা কেন? রাজার দূত না হয়েও রাজদূতেরা কিছু কম দাপাচ্ছে না বিশ্বের রাজধানীতে রাজধানীতে। হ্যাঁ, রাজধানী। প্রজাধানী বলে কোনো শব্দই নেই চলন্তিকায় বা আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধানে। শুধু রাজধানী কেন, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। রাজস্ব, রাজভবন, রাজকীয়, এমনকি ভীম নাগ, দ্বারিক ঘোষ, নেপাল হালুইকরের রাজভোগ শব্দটিও আজকের প্রজানৈতিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা

ব্যাকবণশুদ্ধ শোনায় কি? অথচ শব্দগুলো শুধু যে টিকে আছে তা নয়, ঠোঁটের গোড়ায়, কলমের ডগায় লেগেই আছে।

কিন্তু আশ্চর্য লাগে বাঙালি বিদ্বজ্জন যখন রাস্তার নাম বা শহরের নামের বৈধতা নিয়ে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে আন্দোলনে নামেন। তাঁরা কিন্তু রাজনীতিকে গণনীতি বা প্রজানীতি করণের স্বপক্ষে কোনো আইনি ব্যবস্থার জন্যে সোচ্চার হন না।

"ইউসেজ" বা যা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে তার অবশ্য একটা দোহাই দেওয়া যায়। নেসফিল্ড সাহেবও "ইউসেজ"কে ব্যাকরণের শাসন থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

উত্তম কথা। কিন্তু ক্যালকাটাও তো মান্ধাতার আমল থেকে না হলেও আঁতুড়ঘর থেকেই ক্যালকাটা নামেই পরিচিত। আর এ ব্যাপারে সরকারি স্বীকৃতিও তো আছে। এই তো কটা বছর আগেই চার্ণক সাহেবের হুগলীর তীরে খাটিয়া পেতে হুঁকো খাওয়ার দিন ধরেই ক্যালকাটার যেন ক'শ বছরের 'হ্যাপি বার্থডে'র কেক খাওয়া-খাযি হয়ে গেল সরকারি ব্যবস্থাপনায়।

সে যাই হোক, রাজার গজা বা খাজা চার্ণক সাহেব আমাদের শহরের নামকরণ করবে, সেটাই বা কী করে মেনে নেওয়া যায়। যায় না। ইতিহাসের পাতিহাঁস-সুলভ প্যাঁক-প্যাকানি শুনতে গেলে ক্যালকাটার ঔপনিবেশিক গন্ধটা থেকেই যায়। বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে ক্যালকাটার ওপর গাত্রদাহে 'কলিকাতা'কেও ক্যালকাটার সঙ্গে সহমরণে চড়ানোটা কি খুব যুক্তিযুক্ত হল?

অবশ্য সবকিছুই যে যুক্তিযুক্ত হবে এমন কোনো কথা নেই। এই যে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে দিল্লির রাজপথ-এর বুকের ওপর দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয়ে আসছে, সে নিয়ে পাঁচটা কথা কেন, একটা কথাও উঠেছে বলে শুনিনি।

শব্দদূষণ

কান ঝালাপালা করা সবাক শব্দই দূষণ-সৃষ্ট হয় বলে জানতাম। অবাক হলাম নির্বাক শব্দের, কান না হলেও চোখের মাথা-খাওয়া দূষণ প্রবণতা লক্ষ করে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি সাম্প্রতিক এবং মর্মান্তিক।

কারণ প্রথমটির হালে পানি পাওয়ানোর একটা প্রচেষ্টা ইদানীং শুরু হয়েছে। সবাক শব্দের তর্জন গর্জন মাইকের কণ্ঠরোধ করে বর্জন করার একটা আইনি প্রকল্প লাগু হয়েছে। কিন্তু দূষিত নির্বাক শব্দকে জব্দ করার কোনো ফন্দি কেউ এঁটেছেন বলে শুনিনি। অথচ বই-এর পাতায় পাতায়, খবরের কাগজের কলমে কলমে, রাস্তার পোস্টারে ব্যানারে, বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞপ্তিতে এই শব্দভিত্তিক দূষণতা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজবিরোধী বলে একটি শব্দ ইদানীং চোখ খুললেই নজরে আসে আর কান পাতলেই শুনতে পাই। আগেই পেতাম। শব্দটি নজর এড়ায়নি আগেও। খাসা শব্দ। খাঁটি বিদ্যাসাগরী বাংলা। অর্থটিও পরিষ্কার, সরল। সমাজের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে তারাই সমাজ বিরোধী। মানুষের গড়া সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকেই থাকে। অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকাটাই স্বাভাবিক। কট্টর রক্ষণশীল অনেক সমাজ আজও অতীতের কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। নৈতিক চেতনা সম্পন্ন অনেক মহাপুরুষ, মহিলা যুগে যুগে এই অন্যায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছেন। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, অকাল বৈধব্য-যন্ত্রণা, বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধীজির মতো সমাজ বিদ্রোহীরা। সমাজের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই বরেণ্য সমাজসেবী হিসেবে এঁরা আজ নমস্য।

কাগজে কাগজে, সরকারি ভাষণে, ইস্তাহারে, পুলিশ রিপোর্টে, প্রবন্ধে, বিজ্ঞাপনে সমাজ বিরোধী বলতে আজ বোঝায় গুণ্ডা, খুনি, মাস্তান, হেলবার্ড, কিডন্যাপার ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধীদের। হাজি মাস্তান, ছোটে শাকিলদের মতো বোম্বেটের দল আজ সমাজসেবী, থুড়ি সমাজদ্রোহী আখ্যানে সম্মানিত।

গণতন্ত্রে বিরোধিতা শব্দটির শুধু আইনি নয়, একটা নৈতিক এবং তাত্ত্বিক স্বীকৃতি আছে। শব্দটি মোটেই আনাড়ি গুণবাচক। যুক্তিসঙ্গত কারণে সমাজ, সংস্কার, এমনকি সরকারের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা একটি মানবিক অধিকার।

তাহলে রাতের 'ওয়াগন ব্রেকার' বা ভোর না হতেই প্রভাতী সংবাদপত্রে সমাজ বিদ্রোহীর তকমা পেয়ে গেল কী করে? কারণটা হয়ত বা সান্ত্বনা-প্রসূত। যেমন ধরুন কালাকে কালা বলা বা খোঁড়াকে ল্যাংড়া বলাটা ঠিক শোভনীয় বা সমীচীন নয়। বেচারি অন্ধ, খঞ্জরা তাতে মনোকষ্ট পেতেই পারে। সেই রকমই খুনিকে খুনে বা গুণ্ডাকে গুণ্ডা-বদমাইস বললে ওদেরও আঁতে ঘা লাগার সম্ভাবনাটুকু থেকেই যায়। হাজার হোক ওরাও তো মানুষ, জন্তু জানোয়ার তো নয়। না হয় দু'চারটে নিরীহ মানুষকে খুন করেছে, কি দু'দশটা ঘরে আগুন লাগিয়েছে, বা পাঁচটা বাচ্চা কি দামড়াকে পাঁজাকোলা করে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে রেখেছে। তাই বলে, ছি ছি, ওই সব দুর্বৃত্তদের সরাসরি গুণ্ডা, বদমাইস বলাটা সেই অন্ধকে কানা বলারই সামিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। আজকের যুগে গণিকাদের কেউ বেশ্যা বলে অপমান করে না। তেনারা সব যৌনকর্মী নামেই অভিহিত হয়ে থাকেন। সেই সূত্রেই হয়ত বা বোম্বেটের দল সমাজ বিদ্রোহীর ধ্বজা ধরে রাস্তাঘাটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। সমাজের অশেষ মঙ্গল এতে।

মহিলা মহল

'ফিস-ফিস' বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : কমলিকা ও প্রাণঘাতিনী দেবী

● কেউ স্বামী-পরিত্যক্তা হলে আপনারা তো বেজায় চ্যাঁচামেচি করেন। আমি পত্নী-পরিত্যক্ত হয়ে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না। কী করব, আপনারাই বলে দিন।

—সম্পদ রায়, রামরাজাতলা, হাওড়া

□ খুবই সহজ। একটি বোরখা ব্যবহার করুন।

● অসুরপুজো করেছেন কেন, মহিষাসুরের বৌকে পুজো করতে পারেন নি?

—কাদম্বরী দেবী , কলকাতা-১৮

□ তাঁর নামটাই যে জানি না—আচ্ছা, কাদম্বরী দেবী কী?

● আমার বিবাহোত্তর প্রেমিক আর বিবাহ-পূর্ব প্রেমিকের মধ্যে বনিবনাটি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। মুখোমুখি হলেই পরস্পরকে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো ঢুঁসোতে যাচ্ছে। কী করি বলুন তো?

—কণিকা মৈত্র, কুচবিহার

□ আপনার স্বামীর বিবাহোত্তর আর বিবাহপূর্ব প্রেমিকাকে এনে ওদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিন।

● আমাদের পাড়ার পুটকুন আমার মন চুরি করেছে। মনের অভাবে আমি খেতে পারছি না, ঘুমুতে পারছি না, শুতে পারছি না—খালি স্বপ্ন দেখছি। এর বিহিত কোথায় হতে পারে?

—রাজশ্রী সামুই, বাঁকুড়া

□ ম্যারেজ রেজিস্ট্রী অফিস।

● হাসবেন না কমলিকাদি। আমার খুব ইচ্ছে করে ঐশ্বর্য রাই হতে। কোনোভাবে তা সম্ভব?

—সোনিয়া সেন, বর্ধমান

□ আরে দূর, এটা কোনো সমস্যা হল? কোর্টে গিয়ে নামটা এফিডেবিট করালেই হয়।

● বিয়ের আসরে বরের হাতে জাঁতি ধরিয়ে দেওয়া হয় কেন? বউকে তা দেওয়া হয় না।

—চন্দ্রাণী নিয়োগী, আটাপাড়া, উঃ ২৪ পরগণা

□ কারণ ফুলশয্যার পরদিন থেকে জাঁতিটি ধারণ করবেন বউ। সারা জীবন যে জাঁতিকলে সভয়ে কাটাতে হবে, জাঁতিযাত্রার পুণ্যলগ্নে তাকে একটু চিনিয়ে দেওয়া—এই আর কি।

● তিনজন ছেলে একসঙ্গে আমার প্রেমে পড়েছে। ব্যাপারটা খুব এনজয় করছি। অবশ্য মাঝে মাঝে বিবেক-দংশনও হচ্ছে—এটা অপরাধ হচ্ছে না তো?

—রিয়া দাস, কলকাতা-৭৩

□ খুবই অপরাধ হচ্ছে। তবে যদি আরো দু'জনকে ওদের দলে ভেড়াতে পারো, তখন আর অপরাধ হবে না। তখন তুমি প্রেমের দ্রৌপদী হয়ে যাবে।

● আমি রোজ সকালে পার্কে দৌড় প্র্যাকটিস করতে যাই। কয়েকদিন হল একটি ছেলে ঠিক আমার পাশে পাশে দৌড়োচ্ছে। আর ছুটতে ছুটতে ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছে। এত অস্বস্তি হচ্ছে না। কী করে ওকে হঠাই বলুন তো।

—হৈমন্তী পাড়ুই, কলকাতা-১৯

□ তুমি বলবে, শোনো, ছেলেরা মেয়েদের পেছনে ছুটলে মেয়েরা তাদের কথা বিবেচনা করে; পাশে ছুটলে নয়।

● কোন পুরুষ সহজে বশ হয়?

—তৃষ্ণা বসু, দাঁতন, মেদিনীপুর

□ 'বস'।

● আমার স্বামী আমাকে প্রায়ই ভয় দেখায়, কথা পেটে চেপে রাখলে পেটের গণ্ডগোল হয়। পুরনো প্রেম-কাসুন্দি আর কতদিন চেপে রাখব? আমার খুব ভয় করছে। বলে দেব?

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কলকাতা

□ ভুলেও নয়। উল্টে তাকেই চেপে ধরুন। বলুন অফিস যাওয়া-আসার পথে সুন্দরী মেয়েদের দেখে তার মাথায় যে সব ভাবনার উদয় হয় তা মাথায় চেপে রাখলে মাথার গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

● আমার দু'বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু আমি কিছুতেই মা হতে চাই না। কিন্তু আমার বর গোঁ ধরেছে, সে বাবা হবেই। কলহ তুঙ্গে। প্রায় ছাড়াছাড়ি হওয়ার অবস্থা। এর সমাধান আছে?

—সীমা চৌধুরী, মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪পরগণা।

□ একটা উপায় আছে। তাঁকে বাবা হতে দিন। কিন্তু আপনি মা না হয়ে মাসি হন। অন্য কেউ মা হলে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই।

গোয়ালা তার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে বলল, কাহে হুঁজুর। ভৈঁসকা ডায়েরি মে তো বিশ রুপেয়াই লাগতা। বিমল এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি টাকাটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ভাবছিল, গোয়ালার মোষ হারাল আর সে পেল বিশ টাকা। সেই প্রবচনটা মনে পড়ে গেল—"হাঁস পোষে হরিমতী, ডিম খায় দারোগা"।

বিমল দারোগার বিপত্তি

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ ছিল বিমল। মানে এ. এস. আই বিমল মিস্তির। বড়তলা থানায় পোস্টেড ছিল সে। সেরেস্তায় তার ডিউটি। মানে, লোক থানায় এলে প্রথমেই যেখানে আসে। এখানেই ডায়েরি করা হয়। কনস্টেবল থেকে প্রমোশন পাবার পরই সে বড়তলায় আসে। পুরনো এ. এস আই মাখনবাবু তাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়ে দিয়েছিল। তার কাজ শেখার পরই স্বাধীনভাবে ডায়েরি লেখার কাজ পেয়েছিল। বিমলের মনে আছে প্রথম যেদিন ডিউটিতে বসেছিল সেদিন ডায়েরি করতে এসেছিল একজন হিন্দুস্তানি। বিমল জিজ্ঞেস করেছিল, কী হয়েছে?

—হুঁজুর। হমারা ভৈঁস নেহি মিলতা।

অর্থাৎ তার সামনে যে বসে রয়েছে সে একজন গোয়ালা আর তার মোষ হারিয়ে গেছে। এরকম একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ পেয়ে বিমল তার এতদিনের ট্রেনিং কাজে লাগিয়ে খুব গুছিয়ে ডায়েরি লিখে দিল। তারপর ডায়েরি নম্বর একটা কাগজে লিখে থানার স্ট্যাম্প মেরে গোয়ালার হাতে তুলে দিল। এর পরই গোয়ালাটি তার ময়লা ফতুয়ার পকেট হাতড়ে কী যেন তুলে এনে বিমলের হাতে তুলে দিল। বিমল তা খুলে দেখল দুটো দশটাকার নোট। অবাক হয়ে বলল, এ কি?

গোয়ালা তার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে বলল, কাহে হুঁজুর। ভৈঁসকা ডায়েরি মে তো বিশ রুপেয়াই লাগতা।

বিমল এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি টাকাটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ভাবছিল. গোয়ালার মোষ হারাল আর সে পেল বিশ টাকা। সেই প্রবচনটা মনে পড়ে গেল—"হাঁস পোষে হরিমতী, ডিম খায় দারোগা"।

এইভাবেই বেশ চলছিল বিমল মিস্তিরের এ. এস আই গিরি। নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটি। এলাকার অপরাধ—যেমন চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন—এ সবের কিনারা করার কোনো দায়িত্বই নেই। ওসব করবে দারোগারা, অর্থাৎ সাব ইন্সপেক্টররা। নিশ্চিন্তে চাকরি করতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। কোনো ঝুটঝামেলাই ছিল না।

কি কুক্ষণে, ঐ বুড়ো এ. এস আই মাখনবাবুর পরামর্শ শুনে সে সাব ইন্সপেক্টর হবার পরীক্ষায় বসেছিল, তাই ভাবে। মাখনবাবু বলেছিল, ভায়া, পরীক্ষায় বসে যাও। দারোগা না হলে ডিপার্টমেন্টে কোনো ইজ্জত নেই। তোমার কাঁধে একটা তারা দেখলে মনে মনে সবাই একটু অবহেলার চোখে দেখবে। এই আমি ভুল করেছি। পরীক্ষায় বসলাম না, তাই আজও আফশোষ করি।

আর বিমলের কপালও তেমন। এক চান্সে পাশ করে গেল। যথা সময়ে তার কাঁধে দুটো তারা উঠল। অর্থাৎ সে এখন সাব ইন্সপেক্টর, তদন্তকারী অফিসার। অপরাধের কিনারা করবে সে।

বিমলের পোস্টিং হল পাশের থানা জোড়াসাঁকোতে। ওখানকার ও সি. মিহিরবাবু জবরদস্ত লোক। তাঁর হাঁকডাকে থানা সব সময়েই তটস্থ থাকে। বিমল যখন এ থানায় জয়েন করতে গেল তখন তিনি তার আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর গমগমে গলায় বললেন, হুম্। তা নতুন প্রমোশন পেয়ে এসেছ, মন দিয়ে কাজ করবে। যে কেস লিখবে,

তার কিনারা করার চেষ্টা করবে। ছ'মাস বাদে তোমার কাজকর্মের হিসেব নেব।

বিমল লেগে পড়ল তার কাজে। প্রথম প্রথম বেশ লাগত। এ. এস. আইরাও তাকে 'স্যার' বলে কথা বলছে। কনস্টেবলদের সমীহের দৃষ্টি আরো ঘন হয়েছে।

কিন্তু প্রমোশন পাওয়ার বিপত্তিটা বিমল টের পেল কিছুদিনের মধ্যেই। তখন বুঝতে পারল, ঐ বাড়তি একটা তারার ওজন কতটা। বিমলের অবশ্য সময়টাই খারাপ চলছিল। তা না হলে সে ডিউটিতে বসলেই ছিনতাই হবে কেন? কেন এক সপ্তাহে তিনটে চুরি, দুটো ছিনতাই আর একটা ছুরি-মারার কেস থানায় রিপোর্ট হল?

একদিন মর্নিং ডিউটিতে বসেছে বিমল। থানার পুরনো সাব-ইন্সপেক্টরদের কথামতো টেবিলে কাচের তলায় রেখেছে কালীঘাটের মা কালীর ছবি। ডিউটিতে বসার সময় তিনবার সেখানে মাথা ঠেকিয়ে ধূপকাঠি জ্বেলে দেয়। তারপরই শুরু করে তার কাজ। সেদিনও সকালে ধূপ জ্বালিয়ে চোখ বুজিয়ে 'মা' 'মা' বলে প্রণাম জানাচ্ছিল। ইষ্ট দেবতাকে মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছিল—হে মা কালী, আমার ডিউটি পিরিয়ডটা যেন শান্তিতেই যায়। কোনো ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতির কেস রিপোর্ট যেন না হয়।

সেইসময়ই হৈ হৈ করে থানার মধ্যে ঢুকে পড়ল একদল লোক।—“ওদিকে লাশ পড়ে যাচ্ছে আর আপনারা থানার মধ্যে বসে আছেন?” বিমলের তখনো চোখ-বোজা রয়েছে। অস্ফুট স্বরে বলে যাচ্ছে—মা, মা!

—কী হল মশাই! বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন নাকি?

চমকে বিমল চোখ খুলল। তারপর যা শুনল তাতে মনে হল তার এতদিনের ধূপ জ্বালানো ব্যর্থই হয়ে গেছে। সেদিনই সকালে রিকশা করে এক ভদ্রলোক মুক্তারামবাবু স্ট্রিট দিয়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে আসছিলেন ট্যাক্সি ধরবেন বলে। হঠাৎ দু'জন রিকশা আটকায়। হাতে তাদের ছিল ভোজালি। তারা সুটকেসটা ধরে টানতে থাকলে তিনি বাধা দেন। তখনই তারা তাঁর পেটে ভোজালি চালিয়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যেতেই ছিনতাইকারীরা তার সুটকেস নিয়ে দৌড় দেয়। ঐ কাকভোরে রাস্তায় খুব বেশি লোক ছিল না। চায়ের দোকানদার কানাই একটা ট্যাক্সি ডেকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অপারেশনের পর তাঁর অবস্থা একটু ভালো আছে।

যারা থানায় এসেছিল তারা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়,—দিনের পর দিন ওখানে ছিনতাই হচ্ছে, আপনারা কোনো স্টেপ নিচ্ছেন না। এভাবে আর কতদিন চলবে? এখন আমরা রাস্তা অবরোধ করব, আপনাদের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে।

হৈ হৈ করে প্রায় শ'খানেক লোক চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে বসে পড়ে যানবাহন বন্ধ করে দিল। চারিদিকে উত্তেজনা। খবর পেয়ে ও.সি. মিহিরবাবু ছুটে এলেন। অভিজ্ঞ লোক। অনেক কষ্টে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। কথা দিলেন একসপ্তাহের মধ্যেই দুষ্কৃতকারীদের ধরে দেবেন। তাঁর কথায় আশ্বাস পেয়ে অবরোধ উঠে গেল।

অবরোধকারীরা চলে গেল। বিমলও বাকি ফোর্সের সঙ্গে থানার দিকে পা বাড়াল। ভাবছিল, যাক একটা ঝামেলা গেল। জনতার কটূক্তি তার আর সহ্য হচ্ছিল না। আরে বাবা, আমি কি ছিনতাই করেছি না ভোজালি মেরেছি? ছিনতাইকারীরা তাদের কাজ করেছে, এবার পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করবে। অর্থাৎ তদন্ত করবে, আসামি ধরবে। এসব কথা সবাইকে বুঝতে হবে। তা না, পুলিশের মা-বাবা তুলে গালাগালি? যাক, ঝঞ্ঝাট কেটে গেছে। এখন থানায় গিয়ে নিশ্চিন্তে ক্যান্টিনে চায়ের অর্ডার দিতে হবে। কিন্তু বিমল কল্পনাও করতে পারেনি তার জন্য থানায় কী অপেক্ষা করছে।

ক্যান্টিনের ছেলেটা প্লেট-ছাড়া এককাপ চা রেখে গেল। বিমল আয়েশ করে চুমুক দেবার জন্য কাপটা তুলতে গেল। আর তখনই বড়বাবুর ঘরের গেট ডিউটি কনস্টেবল মিশির এসে বলল, বড়াবাবু আপকো বোলাতা হায়।

বিমলের বুকটা কেমন গুরগুর করে কেঁপে উঠল। তেতেপুড়ে বড়বাবু সবে থানায় ফিরেছে। এখনই ডাকছে তাঁকে। তাঁর মানে খুব মোলায়েম ভাবে তাকে নিশ্চয়ই আপ্যায়ন করার জন্য ডাকছেন না।

কাপটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়েই বিমল ছুটল বড়বাবুর ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকেই স্যালুট দিয়ে দাঁড়াল সে। আর তখনই যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরিতে। শুরু হল অবিরাম তপ্ত লাভার বর্ষণ।

—ছ'মাস হল এই থানায় জয়েন করেছ। এর মধ্যে তুমি ডিউটি পিরিয়ডে ছটা ছিনতাই, দুটো ক্ষুর মেরে রাহাজানি আর তিনটে দোকানে চুরি রিপোর্ট হয়েছে। একটা কেসেরও কিনারা করতে পারোনি। কী করো কি? থানায় এসে ডিউটি পিরিয়ডে টেবিলে বাজিয়ে বাড়ি চলে যাও নাকি? এলাকার মানুষ রেগে গিয়ে রোড ব্লকড করছে, আমি এসে তাদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাস্তা থেকে ওঠাব? তুমি কী করতে থানায় আছ? উত্তর দাও।

বড়বাবুর ধমকের চোটে বিমলের মুখ থেকে প্রথমে কোনো উত্তর বেরোল না। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আমি তো চেষ্টা করছি স্যার।

বড়বাবু আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, রাখো তো। ঘোড়ার ডিমের চেষ্টা করছ। সেভাবে চেষ্টা করলে একটাও চোর-ছিনতাইবাজ ধরা পড়ে না? শোনো, কংক্রিট চেষ্টা করতে হবে। ওদের ধরার জন্য ফাঁদ পাততে হবে। তুমি কালই ভোরে রিকশা করে মুক্তারামবাবু স্ট্রিট দিয়ে যাবে। পায়ের কাছে বাধা থাকবে একটা সুটকেস। তোমার পাশে থাকবে মিশির। দু'জনের কাছেই থাকবে লোডেড রিভলবার। রিকশার পর্দা ফেলা থাকবে। যেই ওরা ওদের শিকার ভেবে রিকশা আটকাবে, সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়বে। ওদের ধরে ফেলবে। যদি হাতে ভোজালি নিয়ে তোমাদের অ্যাটাক করে তাহলে গুলি চালাবে, বুঝেছ? যাও। কাল সকাল বেলায়ই ফ্রুটফুল রেজাল্ট চাই।

বিমল ঢোক গিলে বলল, তাই হবে স্যার। এবার প্ল্যানটা ঠিক হয়েছে, ওদের ঠিক ধরে ফেলব।

—গুড। ধরতে পারলে ভালো রিওয়ার্ড দেব।

বিমল স্যালুট করে বড়বাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন তার মনে নতুন বল এসেছে। সে ছিনতাইবাজদের ধরে জন্য অফিসারদের দেখিয়ে দেবে, কারুর চেয়ে সে কম যায় না।

পরের দিন ভোরবেলায় একটা পর্দাঢাকা রিকশা করে বিমল আর মিশির আসছিল মুক্তারামবাবু স্ট্রিট দিয়ে। বিমল বলল, কি মিশির, রেডি তো?

—হ্যাঁ স্যার, হামি বিলকুল রেডি আছি।

—হ্যাঁ। যেই রিকশা থামাবে আমরা নেমে ধপাত্ করে ওদের ধরে ফেলব।

ঠুং ঠুং শব্দ করতে করতে রিকশা এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ গলির ভেতর থেকে দুটো বছর কুড়ি বয়সের ছেলে সাঁ করে বেরিয়ে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে রিকশাটার দিকে এগিয়ে গেল।

—এ্যাই রিকশা দাঁড়া।

রিকশাওয়ালা দেখল ওদের একজনের হাতে একটা খাপখোলা ভোজালি রয়েছে। তাই দেখে সে ভয়ে রিকশার হাতলটা রাস্তায় নামিয়ে দিয়েই দৌড়।

পর্দার ভেতরে বিমল তখন উত্তেজনায় ঘামছে। হাতে ধরা রিভলভারটা কাঁপছে। ছিনতাইবাজ ধরার মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেছে। রিকশার সামনেই তার ওয়ান্টেড আসামিরা দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাকশন নিতে বিমল মিশিরের দিকে একবার তাকিয়েই রিকশা থেকে দ্রুত নামতে গেল। আর তখনই ঘটে গেল অঘটন। রিকশার পাদানির কিনারাটা লেগে গেল পায়ে। আর বিমল হোঁচট

খেয়ে হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল পিচের রাস্তায়। চিৎকার করে উঠল সে—ওরে বাবারে, গেছিরে। আমার হাঁটু বোধহয় ভেঙে গেছে।

মিশির বিমলের অবস্থা দেখে তাকে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ বিশাল চেহারা তোলার ক্ষমতা তার নেই। বড় ভুঁড়ির ভারে সে হাঁসফাঁস করতে লাগল। ওদিকে বিমল যন্ত্রণায় চেঁচিয়েই চলেছে—আমি মরে গেলুম।

দুই ছিনতাইবাজ থমকে দাঁড়াল। অদ্ভুত এই শিকারের দিকে তাকিয়ে ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাতে ধরা রিভলবারটার দিকে তাদের চোখ গেল। দু'জনে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর ওদের একজন বাপী, বলল, অ্যাই, থানার অফিসার রে।

তারপর ওরা দু'জন মিলে বিমলকে তুলে ধরে বসাল। বাপী দৌড়ে গিয়ে ভোজালিটা রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের পাশের কোণটায় গুঁজে রেখে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল। ধরে ধরে বিমলকে ট্যাক্সিতে ওঠাল। মিশির বলে উঠল, হমারা ভি চোট লাগা হায়।

বাপী আর খোকন ওকেও ধরে ট্যাক্সিতে ওঠাল। তারপর দুই ছিনতাইবাজ পুলিশ অফিসার বিমল আর কনস্টেবল মিশিরকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে চলল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ওখানে বিমলকে ভর্তি করে নিল। বাপীরা দৌড়োদৌড়ি করে এক্সরে করাল। যাবতীয় ওষুধ ব্যাণ্ডেজ সব কিনে আনল। বিমলের পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। মিশিরকে চিকিৎসার পর ডিসচার্জ করে দিল। মিশির বাপী আর খোকনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে থানার দিকে চলল। বাপী আর খোকন ভিড়ে মিশে গেল।

মিশির থানায় গিয়ে বড়বাবুকে জানাল যে ভোরবেলায় সে এবং বিমলবাবু ছিনতাইকারীদের প্রায় ধরে ফেলেছিল। অনেকটা দৌড়েছিল তারা হাতে রিভলবার ধরে। কিন্তু রাস্তায় পড়ে থাকা একটা কলার খোসায় পা পড়লে বিমলবাবু পিছলে পড়ে যান। সে অনেক কষ্টে ট্যাক্সি ডেকে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওষুধ, ব্যাণ্ডেজ সব কিনে দিয়ে ওঁকে ভর্তি করে দিয়ে এসেছে। তার অনেকগুলো টাকা খরচা হয়ে গেছে।

বিমল যে ছিনতাইবাজদের ধরার জন্য চেষ্টা করেছে সেটা জেনে বড়বাবু খুব খুশি হলেন। বললেন, ঠিক আছে মিশির, তোমার খরচ হয়েছে, সে টাকা তুমি পেয়ে যাবে। আমি আজই বিমলকে দেখতে হাসপাতালে যাব।

ছিনতাইবাজ ধরার সঠিক প্রচেষ্টার জন্য ও. সি হাসপাতালে গিয়ে বিমলকে সাধুবাদ জানিয়ে এলেন। বিমল বুঝতে পারল না, কীসের জন্য এই অভিনন্দন।

যাই হোক, দু'মাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বিমল কাজে জয়েন করল। পুরনো পরিবেশে ফিরে এসে তার বেশ ভালোই লাগল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার পেছন ছাড়ল না।

প্রথম দু'দিন শান্তিতে কাটলেও তৃতীয় দিনে ছিল তার নাইট ডিউটি। সবে এসে মা কালীর ফটোতে নমস্কার করে ধূপ জ্বালিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে এক মহিলা এসে ঢুকে পড়লেন থানার ভেতরে। অনেক কষ্টে তাঁকে শান্ত করে বিমল জানতে পারল যে রাত ন'টা নাগাদ গিরিশ পার্কের পাশ দিয়ে যখন তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ একজন একটা গলি থেকে বেরিয়ে তাঁর গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই করে পালিয়ে গেছে। বিমল লক্ষ্য করল তাঁর গলায় জোর করে হার ছিনিয়ে নেবার দাগ রয়েছে। ব্যস। সে রাতে বিমল দৌড়োদৌড়ি করেও ছিনতাইবাজদের ধরতে পারল না। একটা বিরাট দুশ্চিন্তা নিয়ে বিমল ভোর হওয়া দেখল। কিন্তু একটা ছিনতাই করেই দুষ্কৃতকারী থেমে গেল না। পরপর বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। সব কটিতেই শিকার হচ্ছে মহিলা। সালঙ্কারা মহিলাই হচ্ছে টার্গেট।

ও সির সেই হাসি-হাসি মুখ পরিবর্তিত হয়ে গেল গাম্ভীর্যে।

—কী হে। একের পর এক মহিলার ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে একই স্পটে আর তুমি কিছুই করতে পারছ না? ক্রিমিনালরাই কি শেষ কথা বলবে?

বিমল কোনোক্রমে ঢোঁক গিলে বলল, না স্যার।

—তাহলে তুমি কী করে ধরবে এদের?

—স্যার, প্ল্যান করে এদের পাকড়াও করব।

—গুড। কিন্তু বেশিদিন দেরি করবে না, তাহলে ছিনতাইয়ের সংখ্যা বেড়েই যাবে।

বিমল নিজেই একটা প্লট সাজাল। গিরিশ পার্কের পাশে বিবেকানন্দ রোডের ওপর একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় সে আর একজন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে থাকবে স্বামী-স্ত্রীর মতো। সামনে থাকবে একটা এ্যামবাসেডর গাড়ি, তার বনেট খোলা। যেন গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে আর বিপদে পড়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রী রূপী মহিলা অফিসারের গায়ে থাকবে ইমিটেশন গহনা, যাতে ছিনতাইকারীরা আসল ভেবে প্রলুব্ধ হয়। তারপর কাছে আসলেই উনি রিভলবার উঁচিয়ে ওদের ধরে ফেলবেন।

ও সি-ও বিমলের পরিকল্পনাকে তারিফ করলেন। বললেন, এই তো বুদ্ধি খুলছে। ওদের কিন্তু এবার ধরে ফেলা চাই।

—স্যার। আমি চেষ্টা করব।

এক রাতে বিবেকানন্দ রোডে অন্ধকার নির্জন জায়গায় বিমল আর মহিলা অফিসার পজিশন নিলেন। বৌ বাজারের এক রোল্ডগোল্ডের গহনার দোকান থেকে আনা হয়েছিল অলঙ্কার। নিজেকে লোভনীয় করে দাঁড়িয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা। গাড়ির বনেটের ঢাকনা খুলে ড্রাইভার উঁকিঝুঁকি মারছে।

বিমলের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। সে মহিলার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

—বুঝছেন, ও. সি. তো প্রথমে আমার কথার কোনো গুরুত্বই দিচ্ছিল না। তারপর আমি বোঝালাম। বললাম, স্ন্যাচার ধরতে হলে এ ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। শেষে আমার কথা শুনল।

বিমল লক্ষ্যই করল না, পাশ থেকে কারা তার কথা শুনতে শুনতে চলে যাচ্ছিল। যখন বুঝতে পারল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কাছেই এসে ফাটল বোমাটা। এত জোরে আওয়াজ হল যে বিমল চমকে উঠল। তার দু'পায়ে ঢুকে গেল বেশ কয়েকটা স্প্লিন্টার। মহিলা অফিসার যে কী ভাবে পালিয়ে গেল তা সে বুঝতেই পারল না। সে যখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তখন প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারই তাকে টেনে তুলল গাড়িতে, ছুটল হাসপাতালে।

গাড়ি ছাড়ার আগেই বিমলের কানে গেল—শালা, ঝুটো গয়নায় মেয়ে পুলিশকে সাজিয়ে টোপ ফেলা হচ্ছে। প্রিন্সকে বোকা বানানো অত সোজা নয়।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল বিমল। সাজিয়ে অন্য ঘটনা বলার জন্য মিশির এবারে ছিল না। মহিলা অফিসার থানায় গিয়ে আসল ঘটনা ও. সি-কে বলে দিয়েছিল।

ও. সি দেখতে এলেন তাকে। নির্বাক বিমল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল ওঁর দিকে।

ও. সি বললেন, ঠিক আছে, তুমি অ্যাটেম্প্ট্ নিয়েছ, ছিনতাইবাজ ধরার জন্য। সেজন্য তোমাকে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে।

বিমল বলল, স্যার, একটা কথা বলব?

—হ্যাঁ বলো।

—স্যার। আমার রিওয়ার্ড চাই না।

—তবে কি চাও?

—আমাকে আবার এ. এস. আই বানিয়ে দিন স্যার, আমি দারোগা হতে আর চাই না।।

বোল্‌তার চাকে গুল্‌তি

ওম্‌বিকা গুপ্‌তো

দাদাগিরি থেকে রাজাগিরি না রাজাগিরি থেকে দাদাগিরি। ব্যাপারটা অনেকটা সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটার মতো— আণ্ডা আগে না মুরগি আগে! যুক্তিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলব, দুইই। অর্থাৎ অ্যাযো হয় আবার অযো হয়।

এখানে ঠিক তাই। দাদাগিরি না করলে আখেরে রাজাগজা হওয়া যায় না। আবার রাজাগজা না হতে পারলে দাদাগিরি করাটা খুব সহজ হয় না। সভ্যতার আদিকাণ্ড ঘাঁটলে দেখা যায় মূলে কিন্তু সেই দাদাগিরি। গুহার আঁতুড়ে জন্মেই কেউ আর রাজাগজা হয়ে যায় না। বাঁদুরে মানুষগুলো অনেক ঢিল (পাথর) ছোঁড়াছুড়ি করে, একে ওকে ঠেঙিয়ে, দল পাকিয়ে তবেই না এ ওর ওপর মোড়লি করে এসেছে। এক কথায় দাদাগিরি আর কি! সেই মোড়লি, সর্দারি, পাণ্ডাগিরি করেই গুহা দখল, পাড়া দখল, গাঁ দখল, শেষটায় দেশকে দেশ দখল। তবেই না আজ সব রাজাগজা হয়ে বসে নির্বিবাদে দাদাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে লাঠি ঘোরাচ্ছেন 'বিগ্‌ব্রাদার' মার্কিন দাদা। একরকম ফাঁকা মাঠেই বলব। কারণ দ্বিতীয় মাস্তান সোভিয়েত সাম্রাজ্য ময়দান ছেড়ে ভাগল্‌বা বেশ ক'বছর হয়ে গেল। এর আগে কয়েকশ' বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একচেটিয়া দাদাগিরি চালিয়ে গেছে ব্রিটিশ সিংহ। অতিষ্ঠ হয়ে উঠতি মাস্তান জার্মান দু-দুটো মহা দাঙ্গা, থুড়ি মহাযুদ্ধ, বাধিয়ে দিলে ব্রিটিশের লপ্‌চপানি ভাঙতে। শেষ পর্যন্ত তা ভাঙল ঠিকই কিন্তু জার্মানিরও মাস্তানি করা শিকেয় উঠল।

ময়দানে এলেন নতুন দুই মাস্তান—মার্কিন আর সোভিয়েত। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের গণেশ ওল্‌টানর কথা আগেই বলেছি, ফলে একা "শ্যামা খুড়ো"ই দাপাতে শুরু করে দিল। লাল চীন যে একটু আধটু ফোঁসফাঁস করেনি তা নয়। করেছিল। চ্যালা-চামুণ্ডাদের দিয়ে কোরিয়া, বিশেষ করে ভিয়েতনামে মার্কিনের মাস্তানি ল্যাজে-গোবরে করে ছেড়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত। মাও উত্তর চীনের হাঁউ-মাঁউ-খাঁউকে বিশেষ একটা পাত্তা দেয়নি সাদা বাড়ির দাদারা।

এ্যাদ্দিন আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়েছিল চীন। এখন পেপসি, পপ মিউজিক, ম্যাকডোনাল্ড, জীন্স, আরো সব "Things American" নিয়ে মেতে উঠল মাও-উত্তর চীনের তরুণ তরুণীরা। হ্যাঁ, মুখে ঠিক দাদা না বললেও মার্কিনি দাদাগিরির 'জগন্নাথ'যাত্রায় খুব একটা ট্যাঁ ফুঁ করেনি লাল চীন।

ইদিকে পাশের বাড়ি কিউবার ফিদেলেরও আর সে তড়পানি নেই। আর থাকবেই বা কোত্থেকে। মদত যে দেবে সেই দাদাও তো হাওয়া। সোভিয়েত সাম্রাজ্য তো ফুট্‌। জাপান? নিপ্পন তো ম্যাক আর্থারের কাছে সেই যে আত্মসমর্পণ করেছে, তারপর থেকেই আমেরিকাকে দাদা বলতে অজ্ঞান। ইংরেজদের কথা আর নাই বা বলা হল। কে যে এখন কার কলোনি সেটা বলে 'রাজ'বাড়ির হাঁড়িটা হাটে নাই বা ভাঙলাম। আর বাকি ইউরোপের প্রায় সবটাই তো 'ন্যাটো'র ল্যাজে বাঁধা, যার 'লিশ্‌'টি ধরে আছেন মার্কিন দাদা।

প্রজা না থাকলে যেমন রাজা হওয়া যায় না, ঠিক তেমনিই চামচা না জোটাতে পারলে আবার দাদা কিসের? বটেই তো। অতএব হরির লুট্‌ শুরু করে দিলে আমেরিকা। লাইন লেগে গেল চামচার দলের। লুট অনেকেই কুড়োতে লাগল কিন্তু হাজার হোক জাতীয়তা, সম্মানবোধ বলেও তো কথা আছে. আর তার ওপর গণতান্ত্রিক যুগে দেশের মানুষের কথাটাও শুনতে হয়। তাই লুট্‌ কুড়িয়েও চামচাগিরিটা রেখেঢেকেই চালিয়ে গেল আর পাঁচটা দেশ। কিন্তু পাকিস্তানের সে বালাই নেই। একের পর এক নিতানতুন নিধিরাম সর্দার শাসিত, মোল্লা-আশ্রিত দেশটিকে গণতন্ত্রের ঝামেলা পোয়াতে

হয় না।

অতএব আজ আমেবিকার, কাল চীনেব, পরশু দু'জনেরই চামচা হতে বাধাটা কোথায়?

ভারত নিয়ে আমেরিকার মাথাব্যাথা কোনোদিনই বিশেষ ছিল না। আর থাকবেই বা কেন। হাজাব হোক সম্পর্কটা ঠিক চোবে চোবে মাসতুতো ভাই না হলেও গণতন্ত্রে-গণতন্ত্রে পিসতুতো কি খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই তো বটে। একটি সর্বপ্রাচীন অপবটি সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র (গিনিস বুকে লেখা আছে কি না জানি না), একথা তো সেই নেহেরু-কেনেডির আমল থেকেই শুনে শুনে কানে তালা ধবে গেল।

তাই একবকম নিশ্চিন্ত হযেই গত সহস্রাব্দেব নব্বই-এব দশকে 'বিশ্ব-দাদা' স্বীকৃতিটি কায়েম করতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে আমেরিকা। আশপাশে সবই তো বলতে গেলে কবদ রাজ্য না হলেও চামচারাজ্য। টিকিটি পর্যন্ত বিকিযে দিয়েছে সব মার্কিন দাদার কাছে। কাজে কাজেই ঘোড়া আটকায কে? কিন্তু আটকাল। শুধু আটকালই না, আমেরিকার অমন খাড়া খাড়া জোড়াবাড়িতে চোরাগোপ্তা মেরে ঘোড়াটাকে যেন মনে হল খোঁড়াই করে দিল মোল্লাপাড়াব উঠতি মাস্তান ওসামা বিন লাদেন। কিন্তু সে কথায় একটু পরে আসছি। তার আগে ইতিহাসের ক'টা পাতা ওল্‌টানো যাক।

কেবেস্তানদেব সঙ্গে মোল্লাদের ঝগডাটা কিন্তু আজকের নয। প্রায হাজার বছব আগে "পুণ্যভূমি" নিযে ক্রুশেডের লড়াই শুরু হয ঈশ্বব পুত্র এবং পযগম্বর-এব চ্যালাদের মধ্যে। ইদিকে মিশর সিরিয়ার সুলতান সালাদীন আব উদিকে সিংহী-বুকো প্রথম বিচার্ড। দু'জনেব সোর্ড ফাইট হলিউডের কত ছবিতেই না দেখেছি! বেশ কযেকশ বছর লড়েও মোল্লারা কিন্তু সেবার ঠিক শায়েস্তা করতে পারেনি কেবেস্তানদেব। ইতিমধ্যে 'শ্যামাখুড়ো'ব জন্ম হল সন ১৭৭৬ এব চৌঠা জুলাই, সম্ভবত কর্কট লগ্নে। এবং মাত্র দুটো শতকের মধ্যেই বেশ হোমরা-চোমরা, যণ্ডামার্কা হয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় চামচা জুটিযে নিলে আমাদের "শ্যামাখুড়ো"। তা তো নিলো। কিন্তু উদিকে মোল্লাবাও ততদিনে বেশ তেলচুক্‌চুকে হয়ে উঠেছে। আব ও তেল কলকাতাব তেলিপাড়ার ক্যানেস্তাবাভর্তি কলুব তেল নয, এ হল ইঁদাবা থেকে তোলা হাজার হাজাব জ্বালা ভরা পেট্রো-তেল। টাকায কেনা যায় না এ মাল, [illegible]কেনাটা ডলারে হয়।

সত্যি বলতে কি জেল্লা খুলে গেল মোল্লাপাড়ার। উটের পিঠে বসে খেজুর চুযে খেজুরে আলাপ করার দিন আর রইল না মোল্লাদেব। বাতাবাতি রহিম হযে গেল উট চালানো সহিসের দল। কেরেস্তানদেব বেয়াদাপি আর বরদাস্ত হল না। তেলেব গরমে তেতে উঠে তেড়েমেড়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিযে বসল মোল্লাপাড়ার মাস্তানরা।

বিংশ শতকের 'ক্রুশেড' শুরু ইজরাইলকে নিয়ে। স্থান কাল পাত্র মোটামুটি সেই একই। মিশর সিরিযার বদলে এখন প্যালেস্তিন ও গোটা মোল্লাপাড়া। আর ইংলণ্ডেব সঙ্গে এখন মার্কিন দাদা। মামলা সেই 'পুণ্যভূমি' নিয়েই। এখন আর একটা সালাদীন নয, গুচ্ছের সালাদীন। প্রথমে এলেন আরাফত। হাইজ্যাকিং, কিডন্যাপিং, বোমাবাজি, চোরাগোপ্তা দিযে আবাফত উদ্বোধন কবলেন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আদিকাণ্ড। এলেন লিবিযাব গদ্দাফি, ইরানেব মোল্লাবীব আয়াতুল্লা, ইরাকেব সাদ্দাম হোসেন আব শেষমেষ সন্ত্রাস-সুলতান, আরবি-কাপ্তান, আফগান-তালিবান ওসামা বিন লাদেন।

খোদার ওপব খোদকারি করার অভিযোগে মোল্লাপাড়ায ধুযো উঠল : মার্কিন ঠ্যাঙাও। কিন্তু ঠ্যাঙাও বললেই তো আর ঠ্যাঙানো যায় না। সাত সমুদ্দুর তের নদী পাব হলে তবেই না মার্কিন মুলুক। মোল্লাদেব লগা তাদ্দুব যায কী করে?

কিন্তু গেল। বেশ গড়গড়িযেই গেল। এগারোই সেপ্টেম্বর সাতসকালে হাডসন আর পোটোম্যাক নদীর দুই কুলে বোলতার চাকে গুলতি ছুড়ল ওসামা। আমেরিকার গর্ভগৃহে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল হনুমান নয, বিন লাদেন!

বোলতাব চাকে গুলতি আব সৌদরবনের বাঘের ল্যাজে পা, ও একই কথা। ঝাঁকে ঝাঁকে শূলের মতো হুল উঁচিযে তেড়ে এল মার্কিন বোলতার দল। ছেয়ে গেল কাবুল-কান্দাহারের আকাশ। ওখানেই নাকি ঘাপটি মেবে লুকিযে আছে ওসামা। মার্কিন দাদা বুশ হুঙ্কাব দিলেন: ডেড অর অ্যালাইভ

লাদেন চাই।

তালিবানবা বললে : লাদেনেব কোনো ঠিকানা নেই।

এই লেখাটা যখন লিখছি তখন বোলতার কামড়ে তালিবানদের দফারফা হযে গেছে। ছাপা হতে হতে লাদেনের অবস্থা ততদিনে ইন্‌স আল্লা।।

ট্যারা চোখে

রাখে হরি, থুড়ি, কচুরিপানা

স্বামীব সঙ্গে ঝগড়া কবে তিনি যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য—বাপের বাড়ি। হাওড়া স্টেশনে পৌছে খেয়াল হল, টিকিট কাটার পযসা নেই। তাই বলে যাওযা বন্ধ হবে? কক্ষনো না। গন্তব্য একটু পাল্টে নিলেই আব টিকিট কাটার হ্যাপা থাকে না। বাপেব বাড়ির বদলে যমের বাড়ি। যেই ভাবা সেই কাজ। হাওড়া ব্রীজে উঠে নিচে ঝাঁপ। তখন কি আর জানতেন যে হরি না হলেও নিচে কোল পেতে রযেছেন কচুরি—কচুরিপানা? এত ঘন পানা যে, তিনি গলে যাওয়ার কোনো চান্সই পেলেন না। আহা, যমের বাড়ির বদলে যেন এসে পড়লেন প্রেমিকেব পেতে বাখা নবম গদির বিছানায।

তারপর রিভার ট্রাফিক পুলিশ এসে তাঁকে পাকড়ে চালান করে দিলে স্বামীর খাঁচায। রাখে কচুরি, মাবে কে।

—জ্যোতির্ময় মজুমদার

সর্বঘটে দাদাগিরি

কৌশিক রায়

পাড়ায় নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন অথবা নতুন বাড়ি করেছেন প্রশান্তবাবু। বাড়ির পিছনে টাকা ঢালতে গিয়ে মাথার চুল সব সাদা হয়ে যাওয়ার দশা প্রশান্তবাবুর। হঠাৎ একদিন সকালে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলতেই প্রশান্তবাবুকে একেবারে ঠেলে চেয়ারে বসিয়ে পাড়ার হর্তাকর্তা বিধাতা নিম্‌কিদা হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে বললেন, "আরে মোসাই আমাদের ইলাকায় লোতুন এসেচেন। এখনো পাড়ার ক্লাবে ট্যাক্সও দেননি! আসচে মাসে কালী পুজোয় একসো একান্ন টাকা বায়ান্ন পয়সা চাঁদা দিয়ে যাবেন। না হলে আপনার গলার মাপ লিয়ে লিবো।"

অথবা, প্রশান্তবাবু নেমন্তন্নবাড়িতে খেতে বসেছেন। আরো একটা ফিশ ফ্রাই নেওয়ার জন্য হাতটা বাড়িয়েছেন কি বাড়াননি, সঙ্গে সঙ্গেই জীবন-সঙ্গিনীর চাপা ধমক—"আবার তুমি ভাজাভুজি খাচ্ছ! বলেছি না, ওসব বেশি খাওয়া তোমার একদম বারণ।" প্রশান্তবাবু হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন খেয়েদেয়ে বাড়িতে গেলে বাক্যবাণের ফুটন্ত তেলে তাঁর হাড়মাস ভাজাভাজা হয়ে যাওয়ার চান্স সেন্ট পারসেন্ট।

মাননীয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের দৈনন্দিন এই টানাহেঁচড়া, আধপোড়া জীবনে দাদাগিরি (কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৌদিগিরি) কতরকম রূপ নিয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। পাড়ায় কেরোসিন বা রেশনের দোকানে অথবা মাদার ডেয়ারির ডিপোতে লাইন দিতে যান, সেখানে "ঘুমন্ত সংঘের" সব "সেবাব্রতী" 'সমাজ প্রেমিক' নান্টু, পটলা, মদনা, শিবুযাদের দাদাগিরি। তেনাদের পেয়ারের লোকেরা বরাদ্দের ডবল কেরোসিন আর দুধ নিয়ে গদাইলস্করি চালে চলে গেল, আপনি শুধু ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো রিক্ত হস্তে অথবা খালি কেরোসিনের জেরিক্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাড়িতে গেলে গিন্নির মুখঝামটায় আপনার আঠাশ গুষ্ঠিতে যে রাবণের চিতার আগুন জ্বলবে সেটা মালুম হল।

প্রায় নাভিশ্বাস ওঠা বুড়ো জ্যাঠামশাইকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। সেখানে বেড 'বাড়ন্ত'। "কোনো চিন্তা নেই দাদা। পেয়িং বেডের জন্য পাঁশসো টাকার একটা পাতি ছাড়ুন। মাল্লু না পেলে শ্মা সোশানে যাওয়ার জন্য খাটিয়াও পাবেন না।"

আপনি বুঝতে পারলেন—পটল তোলার পর এনাদের দাদাগিরির দৌলতে চিত্রগুপ্তের খেরো খাতাতেও আপনার নাম নথিভুক্ত করা হবে কিনা সন্দেহ।

শিক্ষিত এবং কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন বেকার, নির্বিরোধী যুবকদের সাইডে ফেলে দিয়ে "দশ বছর ধরে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী" দুলাল আর শানুকে কাজে "সেট" করে দেওয়ার পিছনেও দাদাগিরির অবদান অনস্বীকার্য।

ওসামা বিন লাদেন, পারভেজ মুশারফ আর জর্জ ডব্লিউ বুশের অসীম 'বন্ধুত্বের' বদান্যতায় ইদানীং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং আফগানিস্তানের মধ্যে তাল ঠোকাঠুকি বেশ ভালো রকমই চলছে। যাঁরা রাজনীতির খোয়া বের করা লাল রাস্তায় একটু বাঁ দিক ঘেঁষে হোঁচট খেতে খেতে চলেন, তাঁরা আমেরিকার 'সাম্রাজ্যবাদী, বিশ্বজনীন ও ঔপনিবেশিক' দাদাগিরিকে সবসময়ই শাপান্ত করে চলেছেন। তবে পেন্টাগন ভালো মতোই টের পেয়েছে, স্থলবাহিনী নিয়ে হিরাট, কান্দাহার, চারিকার এবং মাজার-ই-শরিফে পুশতুন তালিবানদের ওপর হামলা করতে গেলে আফগানিস্তানের অসংখ্য গুহ্য, খাদ আর পাথরের ফাঁকে যীশুকে স্মরণ করতে করতে ওপরে চলে যাওয়ারই প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে হবে। এশিয় কম্যুনিস্টদের ওপর দাদাগিরি করতে গিয়ে ষাটের দশকে হো চি মিন আর জেনারেল নগুয়েন ভন জিয়াপের গড়া সাদামাটা ভিয়েতকং বাহিনীর হাতে নাকাল হয়ে প্রায় আণ্ডারপ্যান্ট খুলে গেছিল মার্কিন সেনাদের। মার্কিন দাদাগিরির সাতকাহন বলতে গেলে

মহাভারত হয়ে দাঁড়াবে। কিউবাতে স্বৈরাচারী একনায়ক ফুন্‌গেলসিও বাতিস্তার সরকারকে ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করার জন্য বনে-জঙ্গলে চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো, রাউল কাস্ত্রো আর ক্যামিলো সিয়েন ফুয়েগোসের নেতৃত্বে গেরিলা বাহিনী মরণপণ যুদ্ধ চালাচ্ছিল। পাড়ার দুই মাস্তানের গ্যাং-এর মধ্যে লড়াইতে বড়দা গোছের "ন্যাতাবাবুরা" যেরকম ভাড়াটে গুণ্ডা সাপ্লাই দেন, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাতিস্তা সরকারকে দাদাগিরি করেই সি আই এ-র গুপ্তচর এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। অবশ্য, চে আর ফিদেলের নির্ভীক যোদ্ধার মনোভাব, দাদা আমেরিকার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মোটেই না দমে আমেরিকা কিউবার রাজধানী হাভানাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আগ বাড়িয়ে বে অফ পিগস্ উপসাগরে দূরপাল্লার ক্রুইজ মিসাইল মোতায়েন করে রেখেছিল। পরে অবশ্য, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি, নিকিতা ক্রুশ্চেভের পাল্টা দাদাগিরি আমেরিকাকে কিউবা থেকে পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য করে। এতেও রক্ষা নেই। পানামার রাষ্ট্রপতি হয়েও ম্যানুয়েল আন্তনিও নোরিয়েগা বহাল তবিয়তে মাদক দ্রব্য পাচারের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের আদেশের তোয়াক্কা না করেই মার্কিনী সৈন্যবাহিনী ঝটপট নোরিয়েগাকে গারদে ঢুকিয়ে দেয়। দ্বীপ রাষ্ট্র হাইতিতে পাপা দুভালিয়্যের এবং প্রস্‌পার এভ্রিলের স্বৈরাচারী শাসনের জাঁতাকলে পড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল অধিবাসীদের। মার্কিন সামরিক দপ্তর থেকে দাদাগিরির মতোই এই সব স্বৈরাচারী শাসকদের উৎখাত করে আমেরিকার পুতুল সরকার হিসেবে জাঁ বা ত্রাঁদ আরিস্তাইদকে হাইতিতে রাষ্ট্রপতি বানিয়ে রাখা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্সও যে তৃতীয় বিশ্বের ওপর কী হারে ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছে তার প্রমাণ ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলো। অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম আর লর্ড ডাফ্‌রিনের যৌথ উদ্যোগে কয়েকজন অভিজাত ভারতীয় মিলে তৈরি করেছিলেন জাতীয় কংগ্রেস, আসলে এই কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশদের কাছে একটা "সেফ্‌টি ভাল্‌ভ"-এর মতো। উনিশ দশকের শেষ ধাপে ভারতীয় যুবসমাজের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রেশার তখন ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হতে যাচ্ছে। তাই তাদের ওপর খবরদারি করার জন্য ওই কংগ্রেস "ভাল্‌ভের" দরকার হয়েছিল ব্রিটিশদের। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দোস্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "পরের ধনে পোদ্দারি" করার প্ল্যান প্রায় বানচাল করে দিতে বসেছিল। তাই ঢাকার মাথামোটা নবাব সলিমউল্লাহ্‌কে কিছুটা জমি আর টাকাপয়সা পাইয়ে দেওয়ার চুষিকাঠিটা সামনে নাড়িয়ে ধান্দাবাজ লর্ড কার্জন "বঙ্গভঙ্গ" নামক দাদাগিরির ছক কষেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত শান্তিকামী মিত্রশক্তির জোট, হেরে ভূত হয়ে যাওয়া জার্মানিকে টুকরো টুকরো করার এবং তাকে লুটেপুটে রাস্তায় বসানোর জন্য "ভার্সাই চুক্তি" নামক একটি দাদাগিরির কল তৈরি করেছিল। এর ফল অবশ্য ব্যুমেরাং-এর মতো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল। ভার্সাই চুক্তির বুটের লাথি জার্মানি সইতে পারেনি। সুতরাং, নাৎসি নেতা ফ্যুয়েরার হিটলার এবং তাঁর দোসর ইতালীয় ফ্যাসিস্ত বাহিনীর মধ্যে সর্বা বেনিতো মুসোলিনির মতো ক্ষমতালোভী "মেগালোম্যানিয়াকের" নাটকীয় দাদাগিরির পথটা সাফ করে দিয়েছিল ভার্সাই চুক্তিই।

আফ্রিকার রাষ্ট্র লিবিয়াতে স্বৈরতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক শাসন চলছে বলে রাষ্ট্রসংঘে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু, মার্কিনদের মদতপুষ্ট হয়ে লিবিয়ার রাজা প্রথম ইদ্রিশ তাঁর প্রজাদের ওপর দাদাগিরিকে একটা নৃশংস পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং লিবিয় জনতার পক্ষে কর্ণেল মুয়াম্মার গদ্দাফির মতো একজন স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু চতুর সামরিক একনায়ককে দেশের হাল ধরাতে সমর্থন করা ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় উপায় ছিল না। অনেকটা এই কারণেই ১৬৪২ সালে ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট বংশের বিলাসী এবং অত্যাচারী রাজা, প্রথম চার্লসের একচেটিয়া রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৬৬০ সাল পর্যন্ত কমনওয়েলথ এবং রাজাবিহীন গণতন্ত্রের নাম করে দিব্যি রাজত্ব করে [illegible] অলিভার ক্রমওয়েল এবং তাঁর "আয়রন সাইড" সেনাবাহিনী। স্টুয়ার্ট বংশের একমাত্র জীবিত বংশধর, 'গ্ল্যাক্সো বেবি' দ্বিতীয় চার্লস তখন পৈতৃক প্রপার্টি বাঁচাতে ফ্রান্সে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ১৬৬০ সালের পর ক্রমওয়েলের মৃত্যুতে লাইন ক্লিয়ার হলে তিনি এসে আবার চ্যালাচামুণ্ডাসহ ইংলণ্ডের ওপর দাদাগিরি করতে শুরু করেন। বলতে গেলে, সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যধিক মাত্রার দাদাগিরির জন্যই প্রাদেশিক শাসনকর্তা দৌলত খাঁ এবং আলম খাঁ লোদী মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের ছোট রাজা, জহিরুদ্দিন বাবরকে দিল্লিতে ঢোকার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। এরপর প্রায় ১৮০ বছর ধরে দিল্লির মসনদে কারা যে দাদাগিরি করেছিল সেটা আর নতুন করে বলার দরকার নেই।

ইতিহাসকে নিয়ে যাঁরা একটু নাড়াচাড়া করে থাকেন, তাঁরা জানেন আধুনিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মই হয়েছিল ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের দাদাগিরির বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর ফলে। আটলান্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে ১৩টা মার্কিন উপনিবেশকে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করত। সেজন্য আমেরিকাবাসীদের ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রী, তামাক, চা সবকিছুরই ওপর চলত ব্রিটেনের ট্যাক্সের দাদাগিরি। বোস্টন বন্দরে ব্রিটিশ জাহাজ থেকে শয়ে শয়ে চায়ের পেটি জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রিটিশ দাদাগিরির প্রথম প্রকাশ প্রতিবাদ করেছিলেন আমেরিকাবাসীরা। সারাটোগা, বাংকারহিল আ ইয়র্কটাউনের যুদ্ধে ব্রিটিশ ফৌজকে নাস্তাবুদ করে আমেরিকার বুকে ব্রিটি দাদাগিরির অবসান ঘটিয়েছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও টমাস জেফারসনেরা। দক্ষিণ আফ্রিকাতে সোয়েটো, নাটাল, প্রিটোরিয়াতে কালো মানুষদের ওপর জন স্মাট্‌স্ আর পিটার উইলিয়াম বোথা সরকারে বৈষম্যমূলক দাদাগিরি অমানবিকতার মাত্রা না ছাড়ালে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেলসন রোলিলাহলা ম্যাণ্ডেলা, ওয়াল্টার সিসিলু আর থাবো এম্‌বেকির মতো সংগ্রামী কৃষ্ণাঙ্গ নেতারা পাদপ্রদীপের আলোয় আসতেন না। ট্রান্সভাল আর অরেঞ্জফ্রি স্টেটের ব্লুমফন্টেইনে বংশপরম্পরায় বসবাসকারী 'বুয়র' বা ডাচ ভাষাভাষী মানুষদের ওপর সর্দারি ফলাতে গিয়ে ব্রিটেনে যে কি হাড়ির হাল হয়েছিল তা অনেকেরই জানা। এই তো সেদিনও আফ্রিকার না খেতে পাওয়া দেশ, সোমালিয়ার জঙ্গি নেতা মোহাম্মদ ফারা আইদিদকে পাকড়াও করতে গিয়ে একেবারে ল্যাজে গোবরে হতে হল নিজে ঢাক নিজে পেটানো মার্কিন এবং রাষ্ট্র সংঘের মিলিত সেনা ও বিমানবহরকে

পরাধীন ভারতের একজন গবেষক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অন্যান্য সব ব্রিটিশের পা-চাটা বিজ্ঞানীদের মতো ছিলেন না তিনি। তাঁ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যকে কিছুটা কল্কে দেওয়া নোবেল পুরস্কার কমিটির নির্লজ্জ দাদাগিরির ফলে রেডিও উদ্ভাবনের দরুণ পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারে শিকে ছিঁড়ল ইতালির গুইলিয়েমো মার্কনির ভাগ্যে। জগদীশচন্দ্র মার্কনি অনেক আগে বেতারবার্তার স্বরূপ নির্ণয় করেও যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেলেন।

ঠিক একই রকম দাদাগিরির উদাহরণ দেখা যায় জীব বিবর্তনবাদে জনক এবং "দ্য অরিজিন অব স্পিসিস বাই দা মিন্‌স্ অব ন্যাচারা সিলেক্‌শন"-এর লেখক চার্লস ডারউইনের ক্ষেত্রে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বী গ্যালা পাগোসে ডারউইন বিগ্‌ল জাহাজে করে পাড়ি জমিয়েছিলেন সেখানকা ব্যতিক্রমী প্রাণীদের জীবনচক্র পরীক্ষা করে বিবর্তনবাদ বা থিওরি অ ইভোলিউশনকে নতুন রূপ দেবেন বলে। কিন্তু সেই সময়ই ব্রিটেনে আলফ্রে রাসেল ওয়ালেস নামে একজন অখ্যাত গবেষক যুক্তি দিয়ে দেখালেন, মানু-

ঈশ্বরের অংশ নয়। বানর জাতীয় প্রাণী থেকেই "হোমো স্যাপিয়েন্স"-এর উৎপত্তি। কিন্তু ডারউইনের এবং সামনের সারির বিজ্ঞানী মহলের কারচুপিতে ওয়ালেস নাকি বাধ্য হন তাঁর বিবর্তনবাদকে অপ্রকাশিত রাখতে।

জ্যোতির্বিদ্যা বা অ্যাস্ট্রোনমির ওপর ধর্মের দাদাগিরির ইতিবৃত্ত অনেক বছরের। দুরাচারী পোপের কথাই বেদবাক্যি। সবাই জানত ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে মধ্যিখানে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন পৃথিবী মহাশয়া। তাঁর চারপাশে সূর্য সহ সব গ্রহ-নক্ষত্র বশংবদ চাকরের মতো পাক খেয়ে চলেছে। ইতালির জ্যোতির্বিদ জিওর্দানো ব্রুনো ধর্মের এই দাদাগিরির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ফলস্বরূপ তাঁকে 'শয়তানের চ্যালা' আখ্যা দিয়ে আগুনে রোস্ট বানিয়ে দেওয়া হয়। গালিলেওর ভাগ্যে জোটে সিসে দিয়ে মোড়া কারাগৃহে বন্দীজীবন। অন্ধ হয়েই মারা যান তিনি। ভণ্ড, ব্যাভিচারী পোপের এই দাদাগিরির প্রতিবাদেই মার্কিন লুথারের হাতে জন্ম নেয় প্রটেস্টান্ট ধর্মমত।

রাঢ়বঙ্গে শেষ সেন রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্ধ 'কৌলীন্য ব্রাহ্মণ' নীতির দাদাগিরি, বঙ্গদেশে তথাকথিত ছোট জাতের জাগরণ এবং বখতিয়ার খিলজির তুর্কী আক্রমণের পথ করে দিয়েছিল। হালফিলে গোঁড়া সুন্নী মুসলিম মৌলবাদের দাদাগিরি প্রায়ই মাত্রা ছাড়াচ্ছে। খাজা মইনুদ্দিন আর সেলিম চিস্তির নেতৃত্বে সুফি সাধকেরা এই মুসলিম ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বহুদিন আগেই সোচ্চার হয়েছিলেন। মুঘল বাদশাহদের শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ার জন্য কট্টর মৌলবি উলেমাদের কোপ সুফিদের ঘাড়ে এসে পড়েনি। কিন্তু ইদানীং "বাহাই" নামক উদারপন্থী মুসলিম সম্প্রদায়ের সভ্যরা রক্ষণশীল মুসলিমদের বুলেট আর চপার থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে গীর্জায় প্রার্থনারত নিরপরাধ খ্রীষ্টানদের ওপর প্রাণঘাতী জঙ্গি হানা থেকে বুঝতেই পারা যাচ্ছে কুরআন শরীফের মানবহিতৈষণা এবং সহনশীলতা কী মারাত্মক খবরদারির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

শিল্পকলায় দাদাগিরির ব্যাপারটা সাধারণত 'কমন'। কাগজের আপিসে গিয়ে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে থাকো। কয়েক মাস (কয়েক বছর) তেল সেবন করানোর পর নিউজ ডেস্কের দাদারা সুপ্রসন্ন হবেন। দু-একটা ছবি ছাপা হবে রবিবাসরীয়তে। বুকের ঢুকে যাওয়া পাটা ফুলবে। লেঙ্গি মেরে চলে যাওয়া পরমা বা জোনাকি আবার তোমার ক্যানভাস আলো করতে আসবে।। গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের সার্টিফিকেটটা আর ভেলপুরির ঠোঙা বলে মনে হবে না তখন।

অবন ঠাকুর পিকাসো রেমব্রাঁর কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ওরকম জন্মগত শিল্পপ্রতিভা খুব কমই পাওয়া যায়। আকাদেমি অব ফাইন আর্টস বা লণ্ডনের স্টেট গ্যালারিতে নিদেনপক্ষে একটা ছবির প্রদর্শনী করতে গেলে পিছনে "প্যাট্রোনেজ" বা "পৃষ্ঠপোষকতা" নামক বেশ কয়েকটা বাঁশের খুঁটির ঠেক্নোর দরকার হয়। ইতালিতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সোনালি যুগেও এরকম পৃষ্ঠপোষক দাদার অভাব ছিল না। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির " মোনালিসা" তিনতেরেত্তোর "প্রভু যীশু" রাফায়েলের "মাদোন্না" বা স্যান্দ্রে বত্তিচেল্লির কালজয়ী ছবি" দ্য বার্থ অফ ভেনাস'-ই হোক না কেন, সেইসব ছবিকে 'প্রমোট' করার জন্য, অর্থাৎ কিনা টাকাপয়সা দিয়ে সম্পূর্ণ করার জন্য উঠতি প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের কাছে একমাত্র পরম আশ্রয়দাতা দাদা, গৌরী সেন ছিলেন ফ্লোরেন্স শহরের মেদিচি পরিবারের অভিজাত জমিদার, লরেঞ্জো দি মেদিচি। তাঁর কাছ থেকে দাদাগিরির আশ্বাস না পাওয়ার ফলে সেকালের অনেক উদীয়মান শিল্পীরই ছবি আঁকার শখে ফুলস্টপ বসে গেছে।

দাদাগিরির বহরটা নানা দেশের পুরাণেও বড় একটা কম নেই। 'ইলিয়াদ' মহাকাব্যে গ্রীস আর ট্রয়ের ধুন্ধুমার যুদ্ধের মূল কারণটাই ছিল অলিম্পাস পর্বতের [illegible] বাসিন্দা জিউস, অ্যাথেনার অ্যাপোলের দাদাগিরি (এবং দিদিগিরি)। দেবী অ্যাথেনার খবরদারি করার শখ এতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যে তিনি ছোকরা সৈনিক সেজে ট্রয়ের নাম্বার ওয়ান তীরন্দাজ প্যানডারাসকে বললেন, গ্রীসের রাজা মেনেলাসকে বাণ মারতে। মাথামোটা প্যানডারাসও আগুপিছু না ভেবে মেনেলাসকে তীর মেরে বসলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরের দাদাগিরিকে জন্মের মতো টিট করতে দেবী দুর্গার বর্শাই যথেষ্ট ছিল, তবে গ্রীসের ক্রীট দ্বীপের নিরীহ বাসিন্দাদের ভাগ্য অতটা সুপ্রসন্ন ছিল না, তাই প্রতিদিন দ্বীপের একচ্ছত্র অধিকর্তা আধা ষাঁড় আধা মানুষ দৈত্য মিনোটরের দাদাগিরির সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হত তাদের। নিয়মিত জীবন্ত মানুষ মিনোটরের কাছে পাঠানো হত তার উদরপূর্তির জন্য। পার্সিউস নামক এক অসমসাহসিক যুবক মিনোটরের এই দাদাগিরির বারোটা বাজান।

ঠিক একই ভাবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখা যায় পুঁচকে ডেভিড (বা দায়ুদ) দৈত্য গোলিয়াথের দাদাগিরিকে শুধুমাত্র গুলতি ছুঁড়েই শেষ করে দিচ্ছেন। মহাভারতেও পাণ্ডবরা যখন পাশা খেলায় নক্ড্ আউট হয়ে গিয়ে গাছের ছাল পরে একচক্রা গ্রামে বাস করছেন তখন বক রাক্ষসের দাদাগিরির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁদের। তবে, পাণ্ডবদের ম্যাচো, অ্যাক্শন ম্যান ভীমের যুযুৎসুর প্যাঁচে বক রাক্ষসের পটল তুলতে দেরি হয়নি বেশি।

'বেটিং' 'দলবাজি' 'নোংরা রাজনীতি' —এই শব্দগুলোর সঙ্গে খেলাধুলোর জগতে "দাদাগিরি" শব্দটাও আসতেই পারে বহুবার। ভারতীয় দলে বেদি চন্দ্রশেখর এরাপল্লী প্রসন্ন বেঙ্কটের পাশাপাশি বাঁহাতি স্পিনার হিসেবে বিপক্ষের অনেক ব্যাটসম্যানের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিলেন দিলীপ দোশি। কিন্তু 'লিট্ল মাস্টার' সুনীল গাভাসকারের খবরদারির জন্যই টেস্ট আঙিনায় বেশিদিন হাত ঘুরোতে পারেননি দোশি। আত্মজীবনীতে আক্ষেপ করে দোশি বলেইছিলেন—"ওই বেঁটেটার পলিটিক্সের জন্যই আমার ক্রিকেট খেলা হল না।" অনেকেই জানেন ১৯৮৪-৮৫ সালে ভারতে ইংলণ্ড ক্রিকেট টিমের সফরের সময় কলকাতা টেস্টে রহস্যজনক ভাবে বাদ পড়েছিলেন কপিলদেব নিখাঞ্জ। কৃষ্ণাঙ্গ ইংরেজ পেসার নরম্যান কাওয়ান্স্ আর স্পিনার ফিল এডমণ্ডসের ঘূর্ণি বল এবং গ্রেম ফাউল আর মাইক গ্যাটিং-এর মারমুখী ব্যাটিং-এর কল্যাণে ভারতীয় ক্রিকেটাররা তখন চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। ক্যাপ্টেন সানির ব্যাটে রান না থাকলেও কপিলকে বসানোর মতো দাদাগিরি তাঁর যথেষ্ট ছিল।

ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা বা ভিজি, ক্রিকেট খেলাটা অত ভালো না জানলেও ট্যাঁক আর খানদানের দৌলতে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। তাঁর দাদাগিরির চোটে লালা অমরনাথ তাঁর চৌকশ ব্যাটিং সবাইকে দেখাতেই পারেননি। বাধ্য হয়ে ব্যাট আর প্যাড ভিজির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন লালা। ফল স্বরূপ দেশে ফিরতে হয় তাঁকে। একই রকম দশা ঘটে মিড্ল অর্ডার ব্যাটিং-এর অন্যতম স্তম্ভ এবং লালার ছেলে মহিন্দর অমরনাথের। নির্বাচকরা তাঁকে দলের বাইরে রাখার জন্য দাদাগিরি শুরু করলে মহিন্দার তাঁদেরকে "ভাঁড়ের দল" বলতে পিছপা হননি। অনেক ক্রিকেট বোদ্ধাই মনে করেন পাকিস্তানের বিশ্বখ্যাত অধিনায়ক ইমরান খানের সেরা আবিষ্কার দুই বাঁহাতি ফাস্ট বোলার। কিন্তু ওয়াসিম আক্রমের থেকেও সেলিম জাফরের স্যুইং-এ আরো বেশি বিষ মাখানো ছিল, একথা অনেক ব্যাটসম্যানই স্বীকার করেছেন। অথচ 'বাদশা' খানের দাদাগিরির জন্য আক্রমের জায়গা ছেড়ে দিতে হয় জাফরকে।

ব্রাজিলীয় সাম্বা ফুটবলে পেলের চেয়েও ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপে আরো বেশি সাড়া জাগিয়েছিলেন ছোট্ট চেহারার মাইকেল ফ্রান্সিসকো দোম সান্তোস্ গারিঞ্চা। তা সত্ত্বেও ব্রাজিলের ফুটবল কর্মকর্তাদের পক্ষপাতদুষ্ট দাদাগিরি গ্যারিঞ্চাকে পেলের সঙ্গে খেলতে দেয়নি। আসলে দোশি, কপিল, গ্যারিঞ্চা—এঁরা কেউই জানতেন না সেই অমৃতবাণীটি—

"দাদার আমি, দাদার তুমি, দাদা দিয়ে যায় চেনা"।

শিক্ষা দুঃসংবাদ

প্রাইমারি স্কুল-শিক্ষকদের পেনশন

একটি কাল্পনিক প্রতিবেদন

"টা-টা"
"টা-টা"
চিত্রগুপ্তকে বলবেন কিন্তু যে, আমরা এসেছিলা
প্রাইমারি শিক্ষক
PEN

['Another Complaint of the BPTA is that more than 80,000 retired Primary school teachers have not received their pensions Already 10,000 such teachers have died '–The Times of India. 5 9 2001]

শোনা যাচ্ছে, রাজ্যের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকেরা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পর কিছুতেই পেনশন নিতে চাচ্ছেন না। তাঁদের সংখ্যাটা কম নয়। আশি হাজারের মতো। এঁদের মধ্যে হাজার দশেক শিক্ষকের অবশ্য ইন্তেকাল ঘটেছে।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা বলছেন, সারা জীবন সরকারের কাছ থেকে যে মাইনে তাঁরা পেয়েছেন, তার পরিমাণ কম নয়। পড়িয়েছেন, মাইনে নিয়েছেন। এখন তাঁদের অবসরের জীবন। আর তাঁরা জনগণের টাকায় ভাগ বসাতে চান না। জনগণকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের ইচ্ছে, সরকার যে টাকাটা পেনশন বাবদ দিতে চান, সেই টাকাতে নতুন নতুন কল-কারখানা তৈরি হোক। এভাবেই তাঁরা দেশের সেবা করতে চান। কারণ, তাঁরা দেশকে ভালোবাসেন।

সরকার এতে খুব মুস্কিলে পড়েছেন। কেন না, এ রাজ্যে নতুন কল-কারখানী তৈরির মতো আর জায়গা নেই।

কোনো শিক্ষক অবসর গ্রহণের পরদিন থেকেই এ রাজ্যে পেনশন পেয়ে থাকেন। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু এখন আর পেনশনের কাগজপত্র অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা হাতেই নিতে চাচ্ছেন না। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করছেন। এতে সরকারি অফিসাররা এতই লজ্জা পাচ্ছেন যে তাঁরা অফিসেই যাচ্ছেন না।

শুধু তাই নয়। এঁদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও কনভেনশন ডেকে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন যে, তাঁরাও আর এখন থেকে পেনশন নেবেন না। সেই টাকাটা তাঁরা রাজ্যের উন্নয়ন তহবিলে দান করবেন। সরকার তাতে খুব ফাঁপরে পড়েছেন। কারণ, সরকারের অভিজ্ঞতা, উন্নয়ন তহবিল তৈরিতে দুর্নীতি বাড়ে। সরকারি আমলারা উন্নয়ন তহবিলের টাকা নয়ছয় করেন। সরকার তাই প্রস্তাবিত ঐ কনভেনশন স্থগিত রেখে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যে পূর্বোক্ত শিক্ষকদের কাছে আর্জি জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী রেডিও টিভি আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনশন গ্রহণের জন্যে বারবার করুণ আবেদন জানান। কিন্তু শিক্ষকেরা সেই আবেদনে সাড়া দেননি। অগত্যা মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকে এ ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। যেমন:

(এক) প্রত্যেক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সরকার প্রতিদিন পাঁচ লিটার করে বিশুদ্ধ পানীয় জল বিনামূল্যে সরবরাহ করবেন।

(দুই) এঁদের প্রত্যেককে সরকারি ব্যয়ে একটি করে ইজিচেয়ার দেও হবে। সরকারের আশা, এতে শিক্ষকদের অবসর জীবন আরামদায়ক হ

(তিন) এখন থেকে এঁদের বিনামূল্যে চশমাও দেওয়া হবে। কারণ, এ শিশুদের জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত করেছেন।

(চার) বিধানসভার শতকরা দশটি আসন এঁদের জন্যে সংরক্ষিত থাক ঐ আসনে শুধু প্রাইমারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকেরাই প্রার্থী হতে পারবে

(পাঁচ) প্রাইমারি স্কুলের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকদের জীবনকথা সরকারি ব্য পুস্তকাকারে ছাপিয়ে রাজ্যের প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূ বিতরণ করা হবে। সরকার মনে করেন, এতে ছোটরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হ

(ছয়) অবসর প্রাপ্ত কোনো শিক্ষক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে নিকট সরকারি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট স্বয়ং অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তাঁর বাড়ি যাবেন। হাসপাতালে সেই শিক্ষককে নিয়ে এসে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্য করবেন। এজন্যে প্রত্যেক হাসাপাতালে টিচার্স ওয়ার্ড তৈরি করা হবে

(সাত) বার্ধক্য হেতু কোনো অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের মৃত্যু ঘটলে শিক্ষকের অন্ত্যেষ্টির সময় পুলিশবাহিনী গার্ড অব অনার দেবে। এজ পুলিশবাহিনীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার সদস্যগণের আশা, শিক্ষকেরা সরকা এভাবে সেবার সুযোগ দেবেন। এ বিষয়ে শিক্ষকদের মতামত অবশ্য এখ পাওয়া যায়নি।

—ফজল আ

দাদা অসুর

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ

বার দুয়েক দ্রুত পাউডার ঘষে নিলেন দুর্গা। মুখে, গলায়। প্লাক করা ভ্রূ যুগলে পেন্সিল ঘষে আরো একটু কালো করে নিলেন। বয়স হয়ে আসছে। চুল পাকলে কলপ করা যায়, কিন্তু পাকা ভ্রূ কলপ করা মুশকিল। ধরা পড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। হাতের ঘাম লেগে মুখের মেকআপ বার বার উঠে যাচ্ছে। আলগোছে আর একটু পাউডার মেখে নিয়ে শেষবারের মতো আয়নায় তাকালেন। আয়নাটা বড্ড ছোট, সেই বিয়ের সময়ে পাওয়া কতবার স্বামীকে বলেছেন এই মান্ধাতার আমলের আয়নাটা পাল্টে একটা ড্রেসিং টেবিল নিয়ে আসতে। তা তিনি তো বাবা ভোলানাথ! লোকে বলে আত্মভোলা। আত্মভোলা না ছাই। আসলে আত্মভোলার দোহাই দিয়ে সংসারের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। এইটুকু ছোট আয়নায় কি দশহস্তে দশ অস্ত্রধারিণী দেবী দুর্গাকে সম্পূর্ণ দেখা সম্ভব? আপন মনে গজরাতে থাকেন তিনি। কিন্তু এখন ঝগড়া করার সময় নেই। বাপের বাড়ি থেকে বারোয়ারি পূজা কমিটির লোকজন অনেকক্ষণ আগেই এসে গেছে তাঁকে নিয়ে যেতে। ওদের সামনে ঝগড়া করাটাও ঠিক নয়। তার উপর স্বর্গেও এখন চালু হয়ে গেছে ব্যয় সংকোচন। ব্রহ্মার বিশেষ আদেশবলে এবার মহালয়ার দিনেই বিশ্বকর্মা পুজো। একই গাড়িতে বিশ্বকর্মার সঙ্গে যেতে হবে। জাতমান আর রইল না। তাও বলেন নি একই হাতিতে চেপে যেতে। তাহলে বদনামের আর শেষ থাকত না। বিশ্বকর্মা তো আগেই সেজেগুজে রেডি। তার পুজোর নির্ঘণ্ট পরে অথচ তারই ঢাল বেশি।

যত্তোসব। মুখে স্নিগ্ধতার ভাব এনে ওই ছোট্ট আয়নাতেই নিজের রূপসজ্জা যতদূর সম্ভব দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন পার্বতী বেরিয়েই ডাকলেন,—কেতু, গণু! কোথায় গেলি তোরা? তোদের হ'ল?

কেতু, গণু অর্থাৎ কার্তিক আর গণেশ তখন ড্রয়িং রুমে বসে ঝগড়া করছিল। গণেশ তার প্রতি অবিচারে ক্ষুব্ধ। যুগ পাল্টাচ্ছে। ধুতির যুগ শেষ। কার্তিক একটা জিনস্ এর ট্রাউজার আর একটা নাইলনের গেঞ্জি পরে যাবে। তাই দেখে গণেশেরও সাধ হয়েছে জিনস্ পরায়। সে কথা বলাতে দাদা হাসতে হাসতে দমবন্ধ হবার জোগাড়,—জিনস্! তুই পরবি? হোঃ হোঃ!

—কেন, আমি জিনস্ পরতে পারি না? গণেশ বুঝে পায় না এতে হাসির কি আছে। সে তো আর জিনস্ খেতে চায় নি।

কার্তিক হো হো করে হাসছে তো হাসছেই। গণেশ পুরোদস্তুর অপমানিত। তারও জিদ চেপে গেছে। জিনস সে পরবেই। কার্তিকেরটাই পরবে। কার্তিকও দেবে না ওকে পরতে। এই নিয়ে কিছুক্ষণ টাগ-অব-ওয়ার চলে দুই ভাইয়ের। বয়সে বড় হলেও গায়ের জোরে কার্তিক কখনোই গণেশের সঙ্গে পেরে ওঠে না। হাল ছেড়ে দিয়ে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গণুর অবস্থা কি হবে সে বুঝতে পেরেছে।

কার্তিকের হাত থেকে ট্রাউজারটা ছিনিয়ে নিয়ে বিজয়গর্বে সেটা পরতে শুরু করে গণেশ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখল হাঁটুর ওপর থেকে প্যান্টটা আর কিছুতেই টেনে তোলা যাচ্ছে না। অস্বাভাবিক মুটিয়ে যাবার জন্য কার্তিকের প্যান্ট তার হচ্ছে না। গণেশ হারবার পাত্র নয়। বেশিক্ষণ ধৈর্যও সে ধরতে পারে না। হাঁটুর ওপর থেকে প্যান্টটায় এক হ্যাঁচকা টান দিল সে। তার পরম প্রিয় ট্রাউজারটির এহেন অবস্থা দেখে কার্তিক আর স্থির থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল,—ওরে মোটু, তোর শক্তি দেখানোর জায়গা এটা নয়। আমার প্যান্ট ছিঁড়ে গেলে আমি কিন্তু তোকে ছেড়ে দেব না। তোর ধুতি নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর।

কার্তিক গণেশের মুখের ওপর ধুতিটা ছুঁড়ে দিল। গণেশও বুঝতে পেরেছিল ট্রাউজারের সদ্ব্যবহার তার পক্ষে কতটা অসম্ভব কিন্তু কার্তিক তার চোখের সামনেই জিনস্ আর গেঞ্জি পরে ড্যাং ড্যাং করে নাচতে নাচতে চলে যাবে, আর তাকে সেই সাবেকি ধুতি পরে আসতে হবে, এটা ঠিক সহ্য হল না তার। তাই সে ফুলপ্যান্ট টা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ করেই, একদম আচমকা, কার্তিককে অবাক করে দিয়ে তার জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে ফেলল। শে.প্র।

ছাড়াই। কার্তিকের এখন স্যাণ্ডেল পরে নাহলে খালি পায়ে জিনস্ আর গেঞ্জি পরে যেতে হবে। মনের আনন্দে ধুতি পরতে লেগে গেল সে। কার্তিককে বলল, তুই আমার খড়মজোড়া প'রে নি গে যা। যেন খড়মের জন্য কার্তিক খাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

—খড়মজোড়া নে গে, যা! একেবারে ভেংচে উঠল কার্তিক। সে বুঝতে পেরেছিল ট্রাউজার পরতে না পেরে হিংসুটে গণেশ অক্ষম আক্রোশে দাদার উপর প্রতিশোধ নিতে চায় গায়ের জোরে। কার্তিক বড় ভাই হলেও তার ক্ষমতা নেই গণেশের পা থেকে জুতোজোড়া কেড়ে নেবার। মেজাজ তাই আরো গরম হয়ে যায় তার,—জুতোজোড়া তাড়াতাড়ি দিয়ে দে মোটু। বড় বলে আমি তোর পা ধরতে পারব না। না হলে তোর ঠ্যাং ভেঙে জুতো খুলে তোকে পেটাতাম মনের সুখে।

—মুখ সামলে কথা বল শুঁটো! গণেশ হুঙ্কার দেয়।

—না, বলব না। কেন তুই আমার জুতো পরবি?

—বেশ করব। আমি না দিলে খোল তো দেখি জুতো আমার পা থেকে। এরকম চ্যালেঞ্জ গণেশের মুখেই মানায়।

মর্ত্যের লোকের কাছে কার্তিক বীর হলেও গণেশের সামনে মোটেই তা নয়। তাই কূটনীতির আশ্রয় নিতে হয় তাকে।

—তোর পা ধরলে আমার সম্মান হানি হবে। তার চে' আয়, তোর কানজোড়া ছিঁড়ে দিই, তোর দাঁতগুলো ভেঙে দিই।

—বটে? আয় দেখি—

বলে গণেশ নিজেই দু'পা এগিয়ে এল। কার্তিক দেখল বিপদ। কিন্তু গণেশের একখানা ঘুঁষি একবার তার নাকে বর্ষিত হলে ক'মাস যে তাকে ধন্বন্তরি নার্সিং হোমে কাটাতে হবে সেকথা তার অজানা নয়। হয়ত ডাক্তার তাকে ভর্তি নেবেই না। বাবা মেডিকেল বিলের টাকা মেটাতে এত গড়িসি করে—সামান্য ভিজিটের টাকাও দিতে চায় না। তখন ভাঙা নাক নিয়ে সে অপ্সরাদের সামনে কোন মুখে দাঁড়াবে? সে পালানোর পথ খুঁজছিল। কিন্তু ততক্ষণে গণেশ একখানা বিরাশি সিক্কার ঘুঁসি চালিয়ে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়—অবশ্য কার্তিকের পক্ষে সৌভাগ্যের—হাতের তুলনায় গণেশের ভুঁড়ির দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় তা কার্তিকের নাকে লাগে নি। কিন্তু প্রবল গতিশক্তিতে আন্দোলিত গণেশের বিরাট ভুঁড়ির ধাক্কায় সে একেবারে ছিটকে দরজার বাইরে, পার্বতীর পদতলে পার্বতী তখন সেই পথেই আসছিলেন।

অব হম লেঙ্গে এক ছোটা সা ব্রেক।

ধপাস করে একখানা গুরুভার বস্তু তাঁর সামনে পতিত হওয়ায় পার্বতী অবাক বিস্ময়ে চট্‌জলদি একবার পঞ্জিকাটা খুলে দেখে নিলেন এরকমই কিছু ঘটার লগ্ন পূর্বনির্দিষ্ট কি না। পরে ভালো করে জিনস্ গেঞ্জি পরিহিত কার্তিককে দেখে বুঝলেন গণেশের ভুঁড়িকম্প হয়েছে। রেগে গেলে তাঁর চোখ বড় হয়, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়; গণেশের ভুঁড়ি ওঠানামা করে। হাপরের মতো। ধন্বন্তরি হাতির মাথা গণেশের গলায় খুব সুন্দর ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিল কিন্তু ভুঁড়িকম্পের ওষুধ তার জানা নেই। শান্ত গণেশের ভুঁড়িকম্প রেগে গেলেই হয় আর তখন হাজার লিটার দুধ ঢাললেও তা শান্ত হয় না। চাই একমাত্র মায়ের স্নেহপরশ। তাই ব্যাপার কি হয়েছে জানতে কার্তিককে জিজ্ঞেস করায় সে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে শচীনদেব বর্মনের গানের সুরে যে কী বলল, বুঝে উঠতে পারলেন না শিবানী। দশ হাতের এক হাত থেকে অস্ত্রটি খুলে নিয়ে ফাঁকা হাতে কার্তিকের হাত ধরে গণেশের ঘরে গেলেন পার্বতী।

—গণু, কী হয়েছে বাবা? তোষণের ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন তিনি। গণেশ নিরুত্তর।

—কী হয়েছেটা কি? কথা বলছিস না কেন? পার্বতীর কণ্ঠে এবার ব্যগ্রতা। সাথে বিরক্তি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী এখনো তৈরি হয়ে এল না। মেয়ে দুটো সাজতেও পারে।

প্রশ্নের উত্তর এল কার্তিকের মুখ থেকে। মা সঙ্গে থাকতে তার বীরত্ব ফুলে উঠেছে। বলল, মোটু আমার জুতো কেড়ে নিয়েছে—

—শুঁটো!! গণেশের বৃংহতি নাদে কার্তিক ফের একলাফে মায়ের কোলে।

—ছিঃ বাবা! কার্তিককে নামিয়ে পার্বতী বলে চলেন,—দাদাকে কি ওভাবে বলতে হয়! তারপর গণেশের শুঁড়ে হাত বুলিয়ে বলেন, তুমি দাদার জুতো কেড়ে নিলে কেন?

আবার গণেশ চুপ হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে কার্তিক আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা খুলে বলল, যে, ট্রাউজার্স পরতে অক্ষম হয়েই প্রতিহিংসাবশত গণেশ এ কাজ করেছে।

—কেন তুমি এরকম করছ, বাবা গণু?

পার্বতীর করস্পর্শে গণেশ আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। মায়ের কথায় শুঁড় নাড়তে নাড়তে লাজুক ভঙ্গিতে সে বায়না করল,—এবার থেকে আমিও দাদার মতো প্যান্ট আর জুতো পরে দাদুর বাড়ি যাব। তার মুখে জুতো খোলার কোনো নামই নেই।

পার্বতী বুঝলেন গণেশের রাগ এখনো কমে নি। স্বেচ্ছায় না খুললে গণেশের পা থেকে জুতো খুলতে কেউ পারবে না। বিরক্তি বেড়ে যায় তাঁর। জানতে চান, তোমার আবার এই হুজুগ চাপল কেন?

কার্তিক মুচকি হেসে বলল, দেখলে মা, তোমার শান্তশিষ্ট শুঁড় বিশিষ্ট ছেলের বায়নাটা দেখলে।

এক ধমকে কার্তিককে থামিয়ে দিলেন পার্বতী। বাস ছাড়বার টাইম হয়ে এল। রীতিমতো রেগে যান তিনি—কি, বললে না তো, তোমার আবার দাদার মতো সাজবার ইচ্ছে হল কেন?

এবার গণেশেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল,—হবে না? প্রতি বছরই দাদুর বাড়ি যাই। দেখি ওখানকার মেয়েরা সব দাদাকে নিয়ে ফস্টিনষ্টি করে, হাত ধরে টানাটানি করে। আর আমার বেলা? আমার দিকে ওরা ভুল করে তাকায়ও না। দাদা মেয়েদের নিয়ে কত রঙ্গরস করে, দাদাকে ওরা খাওয়ায়, চুমু খায়, আদর করে। আর আমি কী পাই? আমার বুঝি ইচ্ছে হয় না মেয়েদের সাথে নিয়ে আনন্দ করার? যতই মোটা হই, হাতির মাথা থাকুক আমার গলায়, আমি তো মানুষ এবং পুরুষ মানুষ। আমার কি মন বলতে কিছু নেই? তোমার চোখের সামনেই দাদা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি সব দেখ, সব বোঝ, তাও চুপ করে থাকো। কিছুই বলো না, উল্টে ভালো ভালো জামাকাপড় তার জুতো এনে দাও তাকে। আর আমার বেলায় সেই ধুতি, ফতুয়া আর একজোড়া খড়ম ছাড়া আর কিছু জোটে না। আমি ওসব বুঝি না, আমারও এবার থেকে দাদার মতো পোশাক চাই। না হলে আমি এখান থেকে আর এক পা-ও নড়ছি না।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে থাকে গণেশ। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ অভিমান যেন শব্দের রূপ পরিগ্রহ করে গলিত লাভার মতো বেরিয়ে আসে।

অবাক হয়ে গেলেন দেবী দুর্গা। তাঁর নাদুস-নুদুস গণুর পেটে পেটে এত! এ তো জানা ছিল না। এই জন্যই বোধহয় ছেলেটার পেটটা এত মোটা। কিন্তু গণেশ শান্ত না হলে যে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাই বলেন— তোমার আবার মেয়েমানুষের দরকার কি বাবা? তোমার তো বিয়ে হয়েই গেছে। কত সুন্দর বউ তোমার। সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নামটাও কি সুন্দর—কলাবউ। খিদে পেলে কলাটাও খাচ্ছ, আবার বউ হিসেবেও—

—কলাবউ, কলাবউ, কলাবউ। একেবারে যেন পোখরানে বিস্ফোরণ

ঘটাল গণেশ,—আমার ভালো লাগে না, তুমিই রেখে দাও তাকে। একটা নীরস, অপদার্থ। সেই অনাদিকালে বিয়ে হয়েছে, এখনো ঘোমটা তুলল না। আর যারা কলাবউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাদের বলো না, ওরা তাকে বউ করে বাড়িতে নিয়ে যাক। আমি ওকে ডিভোর্স করতে রাজি।

গণেশ যে কলাবউয়ের ওপর ক্ষিপ্ত তার কারণ তার নীরসতা, অপদার্থতা অথবা দেড় ফুট লম্বা ঘোমটা নয়। আসল কারণ হচ্ছে যে, যে সমস্ত স্থূলকায়া তরুণীরা দাদার বদলে তাকেই অধিকতর পছন্দ করে তারা ঐ কলাবউয়ের সদাসতর্ক উপস্থিতির ফলেই তার দিকে অগ্রসর হতে সাহস পায় না। শুনে কার্তিক অবাক। কিন্তু রেগে গেছেন পার্বতী। কাটা কাটা গলায় বললেন, —তুই তাহলে কী করতে চাস?

মায়ের কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক পরিবর্তনে গণেশ প্রথমটায় একটু ভীত হলেও ফের বায়না ধরল,—আমাকেও দাদার মতো সাজিয়ে দাদুর বাড়ি নিয়ে চলো।

—কেতু, তোর জামাপ্যান্টটা এনে গণুকে দে তো, ও পরুক, সাধ মিটিয়ে নিক। রাগে ফুঁসতে থাকেন দুর্গা।

কার্তিক তখনই ছুটল মা'র আদেশ পালন করতে। এখন তাকে গামছা পরে গণেশকে প্যান্টটা দিতে হবে।

কার্তিক চলে যেতে গলার স্বর একেবারে নিচুগ্রামে নামিয়ে, মাথা নিচু করে, এক হাতের নখ দিয়ে অন্য হাতের নখ (খুঁটতে খুঁটতে অনেকে হতাশ হলে দাঁতে নখ কাটে, গণেশের সে উপায় নেই। হাতির দাঁত দিয়ে আর যাই হোক নখ কাটা যায় না, তাই হাতের ব্যবহার করতে হয়) গণেশ বলল, দাদার জামাপ্যান্ট এনে লাভ নেই মা। ওগুলো আমার হয় না। আমি যে— একটু থেমে বলল, আমি যে মোটা, মা।

পার্বতী ব্যাপারটা বুঝলেন। রাগের মাথায় ভুলে গেছিলেন কথাটা। পাতলা নির্মেদ ছিপছিপে কার্তিকের পোশাক দশাশই চেহারার গণেশের কখনো হতে পারে না। অথচ তা সত্ত্বেও গণেশ গণ্ডগোল করছিল। সেই জন্যই আজ এত দেরি। রাগ আরো বেড়ে গেল তাঁর। নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে প্রায় ভেংচে উঠলেন,—তা তোমাকে যে রোজ রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে তুলে দিই, তার পরেও এক পেট খেয়ে আবার পড়ে পড়ে ঘুমোও কেন? তোকে কবে থেকে বলছি, ডায়েট কন্ট্রোল কর। না, মন মানে না। 'আমি যে মোটা'! লজ্জা করে না বলতে? কেতু রীতিমতো হিসেব করে খায়, রোজ ব্যায়াম করে। কতদিন বলেছি, গণু, ভোরবেলা উঠে একটু দৌড়াদৌড়ি কর, হাঁট। তা বাবুর ইচ্ছে করে না! আবার স্যুটেড বুটেড হবার শখ হয়েছে। খোল্, জুতো খোল্।

অভিমানে চোখে জল এসে গেল গণেশের। অবশেষে মা-ও তার শারীরিক অপটুতা নিয়ে বিদ্রূপ করলেন। আর কোনো কথা না বলে সে জুতোজোড়া খুলে ফেলল।

গণেশের চোখে জল। পার্বতীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বড় মোক্ষম জায়গায় আঘাত করা হয়ে গেছে। অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তিনি বললেন, কাঁদিস নে। এবার বিশ্বকর্মাকাকুও আমাদের সঙ্গে একই গাড়িতে যাচ্ছে। আগে বেরোই চল, আমি পথে বিশ্বকর্মাকে বানিয়ে দিতে বলব। তবে, একটু থেমে বলেন তিনি, আজ থেকে ভোরে ওঠা অভ্যাস করতে হবে।। আর যা তা খাওয়া চলবে না, শুধু কলা আর সাগু।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন আশেপাশে কলাবউ আছে কি না। নিশ্চিন্ত হয়ে অবশেষে বললেন, শোন, একটা কথা। মেয়েদের হৃৎকম্প ধরাতে গেলে নিজের ভুঁড়িকম্পটি ছাড়তে হবে। এখন ধুতি পরেই চল, পরে দেখছি কতদূর কি করা যায়।

এখন একটু বিরতি। বিরতির পর থাকছে—

দুই পুত্র সমভিব্যাহারে পার্বতী বেরিয়ে এলেন। ওদিকে লক্ষ্মী আর সরস্বতীও প্রস্তুত। লক্ষ্মীর কোলে সুন্দরদর্শন একটা বড় চৌকোনা মতো অদ্ভুত বস্তু। তার পরনে শালোয়ার পাঞ্জাবি। বেশ ভালোই লাগছে মেয়েটাকে দেখতে। কিন্তু তার হস্তধৃত জিনিসটা ঠিক চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ধানের ঘড়াটা গেল কোথায়? হাতেই বা ওটা কী নিয়েছিস?

—এটা? হাতের জিনিসটা দেখিয়ে লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করল। তারপর চটপট সপ্রতিভতায় উত্তর দিল, এটা ফ্রিজ।

—ফিরিজ! এটা দিয়ে কী করবি তুই?

—ইস মা। তুমি এখনো সেকেলেই রয়ে গেলে। সঠিক উচ্চারণটাও শিখলে না। হাসতে হাসতে বলল লক্ষ্মী, আর তোমারই মেয়ে কি না স্বর্গলোকের শিক্ষামন্ত্রী!

সরস্বতীকে খোঁচা দিতেই এ কথা বলা। শিক্ষামন্ত্রীর নিজের বাড়িতেই শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে না, অন্য পরে কা কথা। পরে আড়চোখে সরস্বতীকে দেখে নিয়ে বলল, অবশ্য প্রদীপের তলাতেই সবচাইতে বেশি অন্ধকার হয়। সে থাক। মা, এটা ফিরিজ নয়, ফ্রিজ। ভালো বাংলায় বলে রেফ্রিজারেটর। চিত্র পরিচালক যেমন হাতে ধরে নবাগত অভিনেত্রীকে উচ্চারণ শেখান, আধুনিক মুম্বাই ফ্যাশানের অনুগামী লক্ষ্মী সে ভাবেই মাকে শেখাতে আগ্রহী।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু অপ্রতিভ হয়েই বলে ওঠেন মা দুর্গা,— আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আমাকে আর উচ্চারণ শেখাতে হবে না। তা কী হবে এটা দিয়ে?

—এটাও জানো না, মা। এতে কারেন্ট মানে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হলে কাজ শুরু করে। আজকাল গ্রামের চাষীরাও বাড়ির গোলাঘরে ধান রাখে না, সবাই যায় হিমঘরে। ওতে নাকি ধানে পোকা ধরে না। আমি তাই সোনার ঘড়াটা বিক্রি করে দিয়ে বিশ্বকর্মা কাকুকে বলে এটা বানিয়ে নিয়েছি। এতে

রান্না করা খাবারও দিনের পর দিন রেখে দিলে নষ্ট হয় না, সব ফ্রেশ থাকে। লক্ষ্মী বেশ জ্ঞানী-জ্ঞানী ভাবে কথাগুলো বলে তৃপ্তির হাসি হাসে।

এতক্ষণে পার্বতী বুঝতে পারলেন যে ইলেকট্রিসিয়ান কাম মেকানিক বিশ্বকর্মার বিল চট করে এ মাসে এত বেড়ে গেল কেন। লক্ষ্মীর সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে সরস্বতীর দিকে তাকালেন তিনি। একটা হালকা গেরুয়া রং-এর শাড়ি পরেছে মেয়েটা। তার সেই শ্বেত পোশাক আর নেই। চিরকালই ওর মধ্যে একটা সন্ন্যাসিনী ভাব, এবার যেন তা ফুটে বের হচ্ছে। মেয়েটা কি বৈরাগী হয়ে গেল? হাতে আবার কী যেন একটা যন্ত্র দেখা যাচ্ছে তারও। কতগুলো বোতামও রয়েছে তাতে। পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, তুই আবার কি নিলি ওটা? তোর বীণাটা হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি?

হাতঘড়িতে ব্যাটারি ভরতে ভরতে সরস্বতী বলল, আজকাল বীণা সেকেলে হয়ে গেছে মা, একদম আউট-অব-ডেট। এটা নিয়েছি তাই। এটাকে বলে কম্পিউটার। ল্যাপ্‌টপ। তিনবার ডব্লিউ টিপে যে কোনো ঠিকানায় ই-মেইল করলে যে কোনো ব্যাপারে যাবতীয় ইনফরমেশন পেয়ে যাবে।

তারপর একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, এখানে ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিলে সিনেমা হয়, গান শোনা যায়, বীণাও বাজে। কম্পিউটারই এখন লেটেস্ট গড। আগামী দু'চার বছরের মধ্যেই লোকে আর তোমার পুজো করবে না, 'দুনিয়া ডট্ কম, দুনিয়া ডট্ কম, দুনিয়া ডট্ কম নমো নমঃ' মন্ত্র পাঠ করবে।

সরস্বতীর হুঁশিয়ারিতে বিন্দুমাত্র শঙ্কিত না হয়ে মা দুর্গা জিজ্ঞেস করেন, অনেক কিছুই তো জেনে গেছিস দেখছি। তা ওর'ম সন্নেসির মতো গেরুয়া কাপড় পরেছিস যে।

সর্বজ্ঞানী সরস্বতী বলল, তুমি কিছুরই খোঁজ রাখো না, মা। শিক্ষাক্ষেত্রে এখন চলছে চরম গৈরিকীকরণ। জ্যোতিষশাস্ত্র সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে, পুরোহিততন্ত্র পড়ানো হচ্ছে কলেজে। সমস্ত বিদ্যানিকেতনে আমার বন্দনা আবশ্যিক হচ্ছে। কম্পিউটারে শঙ্করচার্যের সিডি-রম ঢুকিয়ে প্রত্যহ শোনা আবশ্যিক হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমি গেরুয়া না পরলে তোমরা দিল্লি দিয়ে পশ্চিমবাংলায় ঢুকতে পারবে ভেবেছ? একদিকে বিজ্ঞানের ও অন্যদিক বৈদিক সংস্কৃতির এমন চরমোৎকর্ষের স্বীকৃতি স্বরূপ আমার পরনে গৈরিক বসন, হাতে ল্যাপ্‌টপ্ কম্পিউটার। কম্পিউটারটি গৈরিক না হলে যে আমার যে মরেও সুখ নেই মা।

সরস্বতীর কথা শুনে লক্ষ্মী ঘরের ভিতর দৌড় দিল। মা দুর্গা আঁতকে উঠে বললেন, তুই আবার কোথায় চললি রে?

সে কথার উত্তর দেবার সময় নেই লক্ষ্মীর। ওদিকে সরস্বতীর সব কথা পার্বতী বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু বড় মেয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরস্বতীও তাঁকে হেনস্থা করুক সেটাও তিনি চাইছিলেন না। তাই লক্ষ্মীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা ভালো বুঝিস, কর। লক্ষ্মী আসুক, তারপরে চল তোদের বাবার কাছে। তাকেও তো সঙ্গে নিতে হবে।

একটু পরেই লক্ষ্মী ফিরে এল। হাতে তার একটা বিরাট পদ্মফুল। প্লাস্টিকের তৈরি। মাকে সেটা দেখিয়ে বলল, বাব্বা। ভুলেই গেছিলাম এটা নিতে। এ বছর আমার কাজ পদ্মফুলে বসে থাকা নয়, হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। মানুষের মনে এর ছবি চিরকালের জন্য গেঁথে দিতে পারলে আমাদের আসনও পাকা হয়ে থাকবে। তুমি ফিরে আসবে মা, আমি কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে পদ্মফুলের প্রচার করব।

অব বক্ত হ্যয় এক ব্রেক কি। কৃপয়া টি ভি ছোড়কে মত যানা।

বাবা ভোলানাথের ঘরের সামনে এসে নাক চেপে ধরল সবাই। বীভৎস গন্ধ। যেন যমরাজার পোস্টমর্টেম ঘর। ছেলেমেয়েরা বাবার ঘরে ঢুকতেই চাইল না। সরস্বতী তো স্পষ্টই বলে দিল, ও ঘরে ঢুকলে নাকি কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকবে। বাধ্য হয়েই পার্বতীকে একা ঢুকতে হল। গাঁজা, মদ, আফিং, ইদানীংকালের হেরোইন চরসের পাঁচমিশেলি গন্ধে পাঁচ মিনিটও ঘরে থাকা দায়। তবুও এই ঘর ত্যাগ করতে পারবেন না পার্বতী। ঘরটায় ঢুকলেই এক স্মৃতি মেদুরতায় ভরে ওঠে তাঁর মন। হাজার হোক, এটাই তাঁর ফুলশয্যার ঘর। ঘরে ঢুকে পার্বতী দেখলেন, মহাদেব চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে আছেন। মাথায় গলায় কতগুলো সাপও কিলবিল করছে। পার্বতীর হস্তধৃত দশ অস্ত্রের মধ্যে সাপও একটি। শিবের ঘরে সে সঙ্গীদের দেখা পেয়ে ওখানেই ছুটে যেতে চাইল। তাকে বাধা না দিয়ে তিনি স্বামীকে ডাকলেন, হ্যাঁ গো, তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ! যাবে না?

মহাদেব নিরুত্তর। নাক ডাকছে তাঁর।

এ তো আচ্ছা ফ্যাচাং শুরু হল। এ ঘুম তো চট করে ভাঙানো মুশকিল। অন্যান্যবার বাপের বাড়ি যাবার সময় শিবই পার্বতীকে তাগাদা দেন,—পারু, তুমি কিন্তু বড্ড দেরি করছ। পার্বতী যখন তৈরি হয়ে আসেন নীলকণ্ঠ বলেন—আঃ পারু, যা সেজেছ না, ইচ্ছে হচ্ছে আবার তোমাকে বিয়ে করতে যাই। পার্বতী কপট কোপের ভান করে বলতেন, হয়েছে হয়েছে, বুড়ো বয়সে আর সোহাগ দেখাতে হবে না। ছেলেমেয়েরা সব দাঁড়িয়ে দেখছে, চলো বেরিয়ে পড়ি। অথচ এবার সব যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছে। গণেশ জিনস্ পরতে চায়, কলাবউকে ডিভোর্স করতে চায়; কার্তিক তীর-ধনুক ফেলে দিয়ে নিয়েছে একটা একে-৪৭ রাইফেল, লক্ষ্মী ফিরি না পীরিচ কী যেন একটা নিল, আর সরস্বতী যন্‌পিটার নামে কি একটা বিদিকিচ্ছিরি যন্ত্র নিচ্ছে, উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায়। সবার উপরে তাঁর স্বামী। শুরু করেছেন গান্ধী প্রদর্শিত পথে অসহযোগ। স্বামী ছাড়া বাপের বাড়ি কীভাবে রওনা দেবেন তিনি ভেবে পান না দেবী দুর্গা। মুশকিল আসান করে দিল বাসচালক। দেবদেবীদের নামিয়ে দিয়ে তাকে পরের ট্রিপ মারতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে তার। বিরক্ত হয়ে সে বাসের হর্ন বাজিয়ে দিল। ইলেকট্রনিক হর্ন। মানুষদেরই তাতে কান ফেটে যায়, বাবা ভোলানাথ তো কোন ছার। হর্নের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসতে বাধ্য হলেন তিনি। জড়ানো গলায় বললেন,— উঃ, এই ভরদুপুরে কৃষ্ণটা আবার কোথায় বাঁশি বাজাতে শুরু করল। একটু যে শান্তিতে ঘুমোর দুপুরে, ঐ দুশ্চরিত্র আলুবাজটার জ্বালায় তারও কি যো আছে! ভারতবর্ষের লোকগুলোকে কবে থেকে বলছি ওরও একটা জন্মভূমি মন্দির বানিয়ে ব্যাটাকে আটকে রাখ, তা তারা সব রামমন্দির নিয়ে ব্যস্ত। লোকসভা ভোটের আগে নাকি কৃষ্ণের সিনিয়রিটি হচ্ছে না। কোন রাধার যে সর্বনাশ করতে যাচ্ছে ব্যাটা, কে জানে!

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসলেন মহাদেব। সাপগুলো সব নড়েচড়ে হিস হিস করে উঠল। লাল লাল চোখ নিয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলেন স্ত্রীকে। বুঝতে পারলেন কৃষ্ণের বাঁশি নয়, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী লীলা দেখাচ্ছে। ঘুম ছুটে গেল তাঁর। বিরক্তি মাখা গলায় বললেন, ও এটা তাহলে তোমারই কীর্তি! আমি ভাবি কৃষ্ণটা—

—তার মানে? কি যা তা বলছ? আমি আবার কি করলাম! পার্বতীর রাগ ক্ষোভ চাপা থাকে না আর।

—না, কিছু না। বাবা মহাদেব ভাবেন, মর্ত্যে লীলা দেখানোর মধ্যে নেই, এসেছে স্বামীর ঘুম ভাঙাতে। —তা হঠাৎ তব আগমন অত্র স্থানে? কহ রাণী, কোন বাজারে যেতে হবে, ভৃত্য সর্বদা তৈরি তব আদেশ পালনে।

একটু বোধহয় মন গলল পার্বতীর। স্বামী তাহলে এখনো বুড়িয়ে যান নি। আগের মতনই আছেন। তিনিও তাই আগের মতন কপট ক্রোধে বললেন, হয়েছে, হয়েছে। বাচ্চারা সব শুনতে পাচ্ছে। এখন নাও, তাড়াতাড়ি করো,

সবাই বসে আছে তোমার জন্য।

ভোলানাথের লাল চোখদুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল—বসে আছে? সকলে? আমার জন্য? কেন?

—কেন আবার? হয়ে ভগবান—।

—আবার ভগবানকে ডাকছ কেন? তুমি নিজেই তো একজন ভগবান, থুড়ি ভগবতী—

ভোলানাথ যে বাংলা জানেন না তা নয়, তবে সুযোগ পেলেও রসিকতা করবেন না এতটা বেরসিক তিনি নন।

বুড়ো মিনসের রসিকতায় দেবী দুর্গার মাথা ঠাণ্ডা হল না, তিনি রেগে উঠলেন,—তোমার ইয়ার্কি রাখো। সোজাসুজি বলো, যাবে কি না।

—কোথায় যাব? শিবঠাকুরের চোখ ছানাবড়া। এই ঘুমের সময় মেক্-আপ নিয়ে সুন্দরী হওয়া বউয়ের নাকে কান্না তাঁর ভালোও লাগছিল না।

—কোথায় যাব? দেবীর মেজাজটা বিগড়ে গেছে। এ অবস্থায় কে স্বামী আর কে পুত্র তাঁর ঠিক থাকে না— কোথায় যাব, না? খোকা। যাবে আমার বাপের শ্রাদ্ধ করতে।

এতক্ষণে শিবঠাকুরের গাঁজার নেশা কাটিতে থাকে।

—ও, এই জন্যই তো বলি, পাক সেজেগুঁজে চলল কোথায়। বলি. কেবল বাপের বাড়ি যাবার সময়ই আমার কথা মনে পড়ে। সারা বছর তো এ ঘরে একবার উঁকি মেরেও দেখ না আমি ভগবানটা মরে গেছি না বেঁচে আছি, একবারও খোঁজ নিয়েছ?

—বেশ করেছি, খোঁজ নিই নে। এমন ঢ্যামনাগিরি করলে আরো খোঁজ নেব না। রাগে দুর্গার তৃতীয় নয়ন থেকে আগুন বের হবার উপক্রম হয়। —স্পষ্ট করে বলো এখন, যাবে কি না।

—যাব না। হাঁই তুলতে তুলতে শিবঠাকুর ফের শুয়ে পড়েন।

—যাবে না? আমি কিন্তু একেবারে—রাগে ক্ষোভে কথা শেষ করতে পারেন না পার্বতী। দশ হাত থেকে দশটি অস্ত্র ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়ে গেল। অঝোর ধারায় অশ্রু নেমে এল গাল বেয়ে। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দশ হাতে দশটি রুমাল নিয়ে তিনি পা ছড়িয়ে কেঁদে দু'চোখের জল মুছতে বসলেন।

শিব ঠাকুরের আর সহ্য হচ্ছিল না। অসময়ে ঘুম ভেঙে গাঁজার নেশা কেটে গেছে কিন্তু হ্যাংওভারটা যায় নি। এর মধ্যে বৃদ্ধা স্ত্রীর কান্নাকাটিতে মাথা খারাপ হয়ে যায় তাঁর। ভয়ঙ্কর এক শৃঙ্গারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন,—না, যাব না! কাউকে রেয়াত করি না আমি। কেন যাব, শুনি! আমার গিয়ে কী লাভ। কতবারই তো গেলাম—সেই সৃষ্টির আদি থেকে তোমায় বাপের বাড়ি দিয়ে আসছি। সব সময় তোমার পেছনে পেছনে চলতে হয়, কোনোদিনও আগে যেতে দিয়েছ? শ্বশুরবাড়ি গিয়ে হাত পা গুটিয়ে বেকার বসে থাকা ছাড়া আর কী করলাম? তুমি নিজেই তো সব করে নাও। তোমার এই দুর্ব্যবহারের জন্যই তো লোকে আমায় বলে ঠুঁটো জগন্নাথ। সাক্ষীগোপাল। কোনোদিন তো তার প্রতিবাদ করলে না।

শুনতে শুনতে পার্বতীর কান্না কমা তো দূরের কথা, আরো উচ্চ গ্রামে উঠতে লাগল। আশুতোষ আশু তুষ্ট না হয়ে রুষ্ট হয়ে বলে চললেন,—আর বলিহারি বাবা মর্ত্যের পাবলিকের। যা কিছু প্রার্থনা সবই পারুর কাছে, আমি কি কিছুই করতে পারি না? এবার তো আবার নারীর ক্ষমতা অর্জনের বছর। ঠিক আছে বাবা, যা করার পারুই করুক, আমি আর যাচ্ছি না।

মায়ের দেরি দেখে লক্ষ্মী-সরস্বতী নাকে রুমাল চেপে অনেক কষ্টে ভেতরে এসেছিল। বাবা শিব তাদের দেখে আরো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন,—মর্ত্যের লোকগুলো আমার মেয়েদের কাছে কেউ ধনরত্ন চায়, কেউ বিদ্যেবুদ্ধি চায়। আর আমার কাছে! শালা পরিবারের সাথে থাকতে থাকতে আমার ইমেজটাই খারাপ হয়ে গেল। আমি কি নপুংসক নাকি? এত অপমানের পরও আবার যাব।

বাবা-মায়ের ঝগড়া দেখে সরস্বতী থ। লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী, যদিও বুদ্ধির ডিপার্টমেন্টটা চিরকালই সরস্বতীর দখলে। এবারে দাদুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে স্বর্গের অধিপতি মিঃ ব্রহ্মার কাছে একটা দরখাস্ত ঠুকতে হবে দপ্তর পরিবর্তন করার আবেদন জানিয়ে।

লক্ষ্মী বুঝতে পেরেছিল বাবা-মার মধ্যে এখন যা চলছে তা আসলে দুই ছাগলের যুদ্ধ। অজাযুদ্ধে ও দাম্পত্যকলহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। আলটিমেটলি কিছুই হবে না, শুধু শুধু নিজের দাম বাড়িয়ে নেওয়া। সে জানে এমন ঝগড়া প্রথামাফিক থামাতে গেলে বাড়া বই কমবে না। তাই সে সরু অর্থাৎ সরস্বতীর মতো বাবাকে মাথা ঠাণ্ডা করার ফালতু উপদেশ না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। বাবা ঠাণ্ডা হবেন ডাণ্ডা খেলে। লাঠৌষধি ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন ফর বাবা। এবার যদি না যাওয়া হয় দাদুর বাড়ি, সামনের বছর থেকে ওরা আর না-ও ডাকতে পারে। যাবতীয় সাজপোশাক মেক-আপ সব ফালতু হয়ে যাবে। বাবাটাই যত দোষের গোড়া। দরজার পাশে গণেশ মা-র অনুপস্থিতিতে কলা বউয়ের আঁচল ধরে বসে আছে। কার্তিক রাইফেলটা নিয়ে মায়ের পাশে কোন লেটেস্ট স্ট্যান্সে দাঁড়ানো যায়, ছবি এঁকে তারই প্ল্যান করছিল। লক্ষ্মীকে একা বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে কার্তিক বলল,—কি রে, বাবা-মা এলেন না?

—এলে তো দেখতেই পেতিস। কার্তিকের বোক বোকা প্রশ্নের কাটা কাটা উত্তর দিয়ে এগিয়ে যায় লক্ষ্মী।

—তুই একা একা কোথায় চললি? কার্তিক হতভম্ব।

—একটু পরেই বুঝতে পারবি। বলল লক্ষ্মী। আপন ভ্রাতা হয়েও কার্তিক লক্ষ্মীর ভুবন-গরব-দমন-গমন পথে কিছুক্ষণ না তাকিয়ে পারল না। লক্ষ্মীটা সব দিক থেকেই খুব রূপসী হয়েছে দেখতে।

দেবীয়োঁ, সজ্জনো, অব হমে এক ব্রেক লেনা হ্যায়। লেকিন আপ যাইয়েগা মত্।

অসুর তখন মোটামুটি রেডি। তার এবার চুলই নয়, দাড়িও লেটেস্ট। করোড়পতির বচ্চনের মতো কালো চুল আর পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সুন্দর করে দাড়ি ছেঁটে আফটার শেভ লাগাচ্ছিল সে, গুন্ গুন্ করে গাইছিল, কহো না প্যার হ্যায় ....। এমন সময় লক্ষ্মীর প্রবেশ। লক্ষ্মী এখন সম্পূর্ণ অসুরের বশ। অসুর যেখানে লক্ষ্মীও সেখানে। অসুর লক্ষ্মীকে খোঁজে না, লক্ষ্মীই অসুরের খোঁজে মর্ত্যে যায় এমনকি মর্গেও যায়। এ মুহূর্তে লক্ষ্মী অসুরালয়ে এসে বলল, কী সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে, অসুরকাকু। তুমি রেডি?

—এই হয়ে এল, ডার্লিং, দাড়িতে চিরুনি দিতে দিতে অসুর জানতে চাইল, বস্ রেডি?

উল্লেখ্য, লক্ষ্মী বশ হবার পর থেকে অসুর ভোলানাথকে বস বলে ডাকে।

—বাবার তো আর এমনি রেডি হবার ব্যাপার নেই, বাঘছাল তো পরাই আছে। বাবা ঝামেলা করছেন মায়ের সঙ্গে। যাবেন না বলছেন।

—সে কি! বসের আবার কী হল? অসুরকে বিচলিত দেখায়।

—ভীমরতি। সরু সামলানোর চেষ্টা করছে। আমি তোমার কাছে চলে এলাম। বুঝলে আংকল, ড্যাড দিনকে দিন একটা ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ভালো করে একটু টাইট দিয়ে দাও তো। যেন ইলেভেনথ্ আওয়ারে আর কখনো এমন পাংচার করার হিম্মৎ না দেখায়।

—ঠিক আছে, ডার্লিং, কাম অন। অসুর বেরিয়ে আসে। তাকে খালি হাতে বের হতে দেখে লক্ষ্মী বলল, তুমি কৃপাণ বা রিভলভারটা নেবে না।

স্মিত হেসে অসুর বলল, আমি কেতুর মতো উঠতি উগ্রপন্থী নই যে

সবসময় বন্দুক নিয়ে ঘুরব। এসো। ঠকাঠক্ হিলের শব্দ তুলে অসুর ঢুকে পড়ল শিবের ঘবে। কার্তিক জানত চাইস, এবাব কী পোজ্ নিয়ে দাঁড়াব বলে দাও না গুরু।

ওদিকে মন দেবার এখন সময় নয় অসুরের। ভেতরে ঢুকে অসুর দেখে দেবী দুর্গা হাঁপুস নয়নে কেঁদেই যাচ্ছেন অবিবত। এক-একটা রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন, সেটা যখন সম্পূর্ণ ভিজে যাচ্ছে, তুলে দিচ্ছেন সরস্বতীর হাতে। সরু সেগুলো চিপে বাখছে। নিজের দশটা রুমালই ভিজে প্যাচ্‌প্যাচ্ করছে। আপাতত সরস্বতীবটা দিয়ে কাজ সাবতে হচ্ছে তাই। এই কান্না এখনই থামানো দরকাব, নাহলে অচিরেই রুমাল সংকট দেখা দেবে বিশ্বে। বস দুর্গাব দিকে পেছন ফিবে শুযে আছে। ঘুমোচ্ছে কি না জানে।

অসুর দুর্গার মুখের দিকে তাকাল। ফুলের মতো কোমল দেবী দুর্গাব কী করুণ অবস্থা। বসটার প্রাণে কি কোনো দযামাযা নেই? মহামায়াব মেক-আপ উঠে গেছে, চোখগুলো ফুলে গেছে। থেকে থেকেই তিনি বিলাপ করছেন,—হায, আমার কি হবে? সেদিকে তাকিযে মোলাযেম গলায অসুর বলল, আব কাঁদবেন না বৌদি, আমি দেখছি কি করা যায।

—ঠাকুবপো, অসুব ঠাকুবপো—। অসুরকে দেখতে পেযে দেবী দুর্গা যেন আপনজন খুঁজে পেলেন। তাঁর ফোঁপানি বাঁধভাঙা বন্যার মতো উদ্দাম স্রোতে বেরিয়ে এল। কে বলে তিনি অসুব বিনাশিনী। তিনিও তো অসুরের কাছে সারেণ্ডারকারিণী। রুমাল চিপতে ব্যস্ত সবস্বতী ঘবে না থাকলে তিনি বোধ হয অসুরের গলাই জড়িয়ে ধরতেন। সবস্বতীকে ইঙ্গিত করল অসুর, যেন সে মাকে বাইরে নিয়ে যায। মুখে সান্ত্বনা দেবাব ভঙ্গিতে বলল, আচ্ছা আপনি বাইরে যান তো, আমি দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি যান, আমি বসকে নিয়ে আসছি।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে দেবী দুর্গা এগোতে থাকেন। হঠাৎ কি মনে পড়াতে ছুটে আসেন,—তুমি কিন্তু আবার ওঁকে মারধোর কবো না ঠাকুরপো। বুড়ো বয়স, সামলাতে পাববেন না।

—না না, তার কেনো প্রযোজনই হবে না। আপনি নিশ্চিন্তে যান তো।

এখন বিরতি

সরস্বতী সমভিব্যাহাবে পার্বতী বেরিযে গেলে অসুব শুরু কবে অপাবেশন দুর্গাপূজা। খাঁটি শিবসেনা স্টাইলে।

—বস, এ্যাই বস।

—উঁ!

—উঁ-টুঁ নয়, ওঠো তো দেখি, অনেক হযেছে।

—ঝামেলা করিস নে অসুব। আমি যাব না। বলেইছি তো—

—কেন যাবে না?

—আমি কি তোকে বলতে বাধ্য নাকি?

অসুর বলল, জানি না বস। ইচ্ছে হলে বলবে, না হলে বলবে না।। তবে একদম রং নিয়ে বাৎ কববে না। অসুরের গলার স্বর হিমশীতল। ব্যাপাব বেগতিক দেখে ভোলানাথ আর শুযে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন অসুবেব দিকে। অসুর প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ কবে বলল, তোমাকে বস বলে ডাকি বলে মনে কবো না যে তুমিই বস, আমি তোমার সাবঅর্ডিনেট। মর্ত্যের দিকে তাকাও, তাহলেই বুঝবে হু ইজ দ্য রিযেল বস, ইউ অব মি।

মহাদেব চুপ। তাঁর বিমূঢ় অবস্থা দেখে অসুর বুঝিযে বলল, শোনো বস। আমবা ক'দিন আগে একটা আন্দোলন করেছিলাম পরলোকের সমস্ত অসুর সেনা নিয়ে। আমাদের বক্তব্য ছিল প্রতি বছরই বৌদির হাতে আমি কেন মবব। এই দাবীতে এবং আনুষঙ্গিক আরো কযেকটি দাবী নিযে আমরা স্বর্গেব হেড কোয়ার্টাব মিঃ ব্রহ্মার অফিস ঘেরাও কবে বেখেছিলাম তিনদিন।

আমাদের বক্তব্য শুনে ব্রহ্মা বলেছিলেন এটা একটা ট্রাডিশনাল ব্যাপার। আমাকে মরতেই হবে তোমার মতো, বৌদির মতো, দেবতাদেব গ্ল্যামাব বাড়ানোর জন্য। আমরা আপত্তি কবে প্রতিবাদ জানালে উনি বলেছিলেন, ঠিক আছে, তোমাকে আর মবতে হবে না। এবার থেকে আমি মর্ত্যে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি।

—সে কি বে, এত বড় একটা ব্যাপাব ঘটে গেল, আমি জানতেও পাবলাম না! পাকব পুজো বন্ধ হলে খাব কি? মহাদেবেব তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।

কৌন বনেগা কবোড়পতিব অমিতাভ বচ্চন "লক কিযা যাযে" বলাব পরে যেমন মিটিমিটি হেসে বলেন "সহি জবাব, এত্‌না রুপিযা জিত গ্যযে আপ" তেমনি প্রাণে জল-ধরানো হাসিতে অসুর বলল, তখন আমবাই বসলাম আলোচনায। ঠিক হল, মহিষাসুব নিধন এখন নাটকেব মতো অভিনয কবা হবে। এখন তো লোকে নাটক থিযেটাব দেখার সুযোগ পায না, দুর্গাপূজা সেই সুযোগ এনে দেবে। আমবা কেউই আসল লড়াই কবব না, অভিনয করব আমাদেব পাবস্পরিক ভূমিকা অনুযাযী। সে কথা পাবলিকও জানে। সেই হিসেবে আমাদেব সঙ্গে মিঃ ব্রহ্মাব একটা কনট্রাক্টও সাইন হযেছে। আমি বেশ মোটা অ্যাকাউন্ট অ্যাডভান্সও পেয়েছি আমার চরিত্রে অভিনযের জন্য। এবাব তুমি যদি না যাও, বৌদিও যাবে না, নাটকটাও মঞ্চস্থ হবে না, আমিও কনট্রাক্টেব বাকি টাকাটা পাব না। তা তুমি বুঝি ঐ টাকাটা দিচ্ছ।

—এ্যাঁ।। কী বলছিস। না, না, ওসব টাকা-পযসার মধ্যে আমি নেই। চল্ আমি যাচ্ছি। তুই অভিনযের ফাঁকে ফাঁকে গাঁজাটা হেবোইনটা সাপ্লাই দিস বাবা।

—এই তো, লাইনে এসো বস।

—হ্যাঁ, চল্।

ভি আই পি যাত্রীদেব নিযে বাস বওনা হয়। মর্ত্যলোকের পাড়ায পাড়ায় আদারওযাইজ অবহেলিত বেডিওতে ব্রাহ্মমুহূর্তে শুরু হয মহালযা। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশযেব চণ্ডীপাঠ

জযন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তুতে।।
সর্বমঙ্গলামঙ্গলে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শবন্যেত্র্যম্বকে গৌরী নাবাযণী নমোহস্তুতে।।

এখন যতি। টিং টিং টি টি টং।

টিভিতে সুযোগ

ATN BANGLA-তে প্রতি মঙ্গলবার ৩-৩০ মিঃ

সপ্তসুর ঝর্ণা দেখুন।

কণ্ঠ ও নৃত্য শিল্পীরা যোগাযোগ করুন

ফোন : ৪৪০-২২৯১ (১১-৫টা)

নামচা

রঞ্জন বিশ্বাস

তোর নাম কী রে?

নামে কিবা আসে যায়।

যায়, নামে যথেষ্ট আসে যায়। যদি কিছু নাই আসে যায় তবে নাম নিয়ে এত রকমফের, এত বৈচিত্র্য, এত সোহাগ, এত খোঁজাখুঁজি হত না। যুগে যুগে দিকে দিকে নামের এত নামচা হত না। নামের যে একটা মর্যাদা আছে, তা বুঝি অনেকেই মানতে চান না। অথচ তাদের পরিবারে "ওয়াঁ-ওয়াঁ" ডাক ওঠা মাত্র বহু অভিধানের চচ্চড়ি তৈরি হয়ে যায়। আসলে জাতকের এমন একটা জুতসই নামকরণ দরকার যাতে ভবিষ্যতে বুক বাজিয়ে ঐরকম করে বলতে পারে, "প্রতাপাদিত্য নাম—যশোর নগর ধাম।" আবার শরৎ চাটুজ্যের নতুনদার মতো কিছু কুচুটে লোক আছে। তারা শ্রীকান্ত-র নাম ব্যবচ্ছেদ করে শ্রী-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে "কান্ত" করে ক্ষান্ত হয়। ঐ শ্রীকান্ত যদি ভবিষ্যতে কোনো বাবু হতে পারত, তবে বুঝি কোনো সভার সভাপতির পদ অলংকৃত করার সময় তাকে সম্বোধন করে বলা হত শ্রীযুক্ত শ্রীল শ্রী শ্রী বাবু শ্রীকান্ত। এতেগুলো শ্রী-র সুশ্রী সহাবস্থানে হয়ত শ্রীকান্ত অতীতে তার শ্রীহীন হবার দুঃখ ভুলতে পারত।

বাপ-মা কত সোহাগ করে নাম রেখেছিল ছেলের কৃপাসিন্ধু। ভবিষ্যতে দেখা গেল, ঐসব সিন্ধু টিন্ধু কিচ্ছু নয়, কৃপা নামের বদলে, আড়ালে লোকে তাকে কৃপণ বলে। তাই বলে ফেলনা নয়। তাই নবজাতকের নামকরণের সময় আয়োজন, রয়োজন, পরিজন, সুজন সকলেই নেমে পড়েন আসরে। এক একজন যেন মহাসমুদ্রে ডুব মেরে নিয়ে আসেন আস্ত একটা নাম, শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাবার আদ্যাক্ষর, মায়ের শেষাক্ষর এই নিয়েই তৈরি হয় তার নাম। কখনো আবার এর সঙ্গে ঠাকুমার গুরুভক্তির নাম থেকে "পদ" শব্দটা [illegible] নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয় নামের শেষে। যাতে করে ভবিষ্যতে তার গুরুপদে ভক্তি থাকে। এমনটি হয়েছিল আমার এক বন্ধুর বেলায়। সবশেষে নদীর স্রোতের মতো আবহমানের পদবী "দত্ত" বসে যায় লেজ হয়ে। ব্যস্ সেই জাতক জগৎসংসারে চিহ্নিত হয়ে গেল বিমলপদ দত্ত নামে।

এককালে মহিলারা যেমন নাকে নোলক পরতেন এবং সেটা যেমন শরীরের আগে দুলতে দুলতে চলত, সেই রকম সেকালের বাবুদের নাকের বদলে, নামের আগে গহনা থাকত। কখনো সেগুলি হল শ্রীযুক্ত, শ্রীল কখনো আবার শ্রী শ্রী বাবু ইত্যাদি ইত্যাদি। বামাগণের মধ্যে অবশ্য নামের পিছনে হাতের বালা কোনো প্রভাব ফেলেছিল কিনা জানা যায় না। বহুদিন ধরে নামের সঙ্গে এই রকম গয়নাগাটির ব্যবহার চলেছিল। সময়ের সঙ্গে নামের বাড়তি মেদ ক্রমে ঝরে যায়। অবশ্য পেটের দিকের মেদ বর্ধাদন জমেছিল। কয়েক দশক ধরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এমন কি চতুর্থ বিবাহ হবার পরেও অক্লেশে বহুজন কুমার হয়ে থাকত, বাজারে তখন বিবাহিত তথা বহু বিবাহিত কুমারের রমরমা।

এযুগের মতো সেযুগেও নামের অপভ্রংশ হত। তবে এযুগে যেমন দশ হাতে নামের অপভ্রংশ হয়, তখন তা হত না। এই অপভ্রংশ নিয়ে একটা গল্প নয় সত্যি বলি। আমার এক ভাগ্নে—তার বাবা-মা বড় মুখ করে ছেলের নাম রেখেছিল শুভঙ্কর। সাধ করে আমরা ডাকতাম শুভ বলে। প্রমাদ ঘটল যখন সে ইস্কুলে গেল। স্কুলের বন্ধুরা তার শুভঙ্কর নাম বদলে বানিয়ে দিল ভয়ঙ্কর। বিকৃত নাম সহ্য করতে না পেরে বাড়ি এসে ভাগ্নের সে কি কান্না। আমার বড় ভাগ্নে, মানে শুভর দাদা স্কুলে গিয়ে ভাইয়ের বন্ধুদের ধমকে মানা করে এল, যাতে আর তারা ভয়ঙ্কর নামে না ডাকে। স্কুলপড়ুয়েরা অবশ্য এরপর ভয়ঙ্কর বলে আর ডাকেনি, ডেকেছিল "নালিশকর" নামে।

প্রতি শনিবার সন্ধেবেলা বোস কেবিনে আমাদের পাঁচ বন্ধুর একটা শনি-আসর বসত। সেই শনি-আসরে বিভিন্ন বিষয়ে অবিষয়ী আলোচনা হত। এক একজন, এক একদিন এক এক বিষয়ে বোদ্ধা হতে চেয়ে লড়তে থাকত। আমি হলফ্ করে বলতে পারি এই সব বোদ্ধাদের দেখবার পর, পাঠকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, যার বোধ-বুদ্ধি ধা তিনি বোদ্ধা। প্রতি শনিবারের মতো যথারীতি এবারেও শনি আসর বসেছে। কথার পিঠে কথা তার পিঠে কথা এভাবে কথোপোকথন চলছে। আলোচনা প্রথম থেকেই নাম বিষয়ে গড়াচ্ছিল।

বিমলপদ দত্ত আমাদের পঞ্চবোদ্ধার একজন, যার নামের সৃষ্টিরহস্য আগেই বলেছি। সে বলল, আগেকার দিনে বোধহয় নামের এত ঘনঘটা ছিল না। ডাকনাম বলে সে অর্থে বিশেষ কিছু ছিল না। দেখিস না, বিখ্যাত লোকেরা নিজেরাই নিজেদের একটা করে নাম ঠিক করে নিত। যাকে আমরা ছদ্মনাম বলি। আর এযুগে বিখ্যাত মানে হল কোমরে নাইন এম এম অথবা সিক্সরোর, একটু বড় গোছের বিখ্যাত হলে হাতে এ. কে. ৪৭। আর এইসব রাতিস্মরণীয় ব্যক্তিদের কোনো ছদ্মনাম নেই। ডাকতে ডাকতে ডাকনাম হয়ে ওঠে। সেই ডাকনামে জগৎমাঝে এই কাটা, ফাটা, কেলেরা বিখ্যাত হয়ে ওঠে। কাগজে দেখিস না অমুক ওরফে তমুক। এই কথার পিঠে আমি বললাম, দিনে দিনে ডাকনামের চেহারাগুলো সব বিদ্ঘুটে হয়ে পড়ছে। তিরিশ বছরের অবিবাহিতা কুমড়ো প্রায় পটাশ চেহারার আমাদের পাড়া খ্যাত এক রমণীর ডাকনাম নাবু তার দশ বছরের এক ভাইঝির নাম নাইকুড়ু। এই নাম বাহারির মধে হঠাৎ শান্তনু মানে আমাদের পঞ্চদুর্লভের একজন শান্তনু লাহা, বলল, ছদ্মনাম, ডাকনাম ওসব পুরনো হয়ে গেছে। এমনকি তোর, আসল নামটার ব্যবহার পর্যন্ত কমে গেছে। ডট্ কমের যুগ, অতবড় নাম আর চলে না, কেবল মূল নামের আদ্যাক্ষর আর পদবীর আদ্যাক্ষর নিয়েই তৈরি হচ্ছে ডট. কম. নেম। যদি মিড্ নেম কিছু থাকে, তবে তার আদ্যাক্ষর বসে যাবে মাঝে যেমন করে বেমলা—আমাদের বিমলপদ দত্ত। এখনকার যুগে বি প দ। আর বসন্ত মিত্র হল ব মি.। ব্যস, তৎক্ষণাৎ বসন্ত আর বিমল, তাদের প্রত্যুত্তর জানিয়ে দিল শান্তনু লাহাকে,—তুই তো হলি শালা। একযোগে সকলেই হেসে ওঠে, এমন কি চা দিতে আসা ছেলেটা পর্যন্ত। নামের এহেন পরিণতিতে আমার শঙ্কা হয়, ওর পরই আমার পালা, এবং তার মানেই আমার ডট কমের নেমের দৌলতে আমার পিতামহ প্রদত্ত পিতৃদেবের নাম নিয়ে টানাটানি চলবে। তাই ঝট্পট উঠে পড়ে জানাই, সাতটা বেজে গেছে, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, চলি ভাই। যেতে যেতে মনে হল, ওরা বলছে ররি কেটে পড়ল রে।

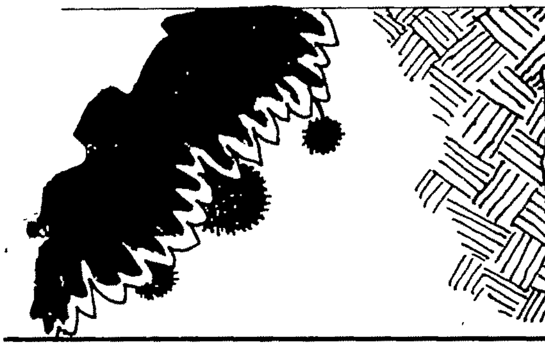

শালা

দেবপ্রসাদ কুমার

প্রভাবশালী প্রাণনাথের সহোদর তেমন ভাবে কোথাও উল্লেখ্যযোগ্য কল্কে পায় নি।

যদি আমি হ'তেম
রাবণ,....
আজ শালাকে
দেখতো কে?

প্রথিতযশা হাস্যরসিক সাহিত্যিক পরশুরামের 'স্মৃতিকথা' গল্পে সদ্যপ্রয়াত স্বামীর বিরহ নিরসনে শূর্পনখা দণ্ডকারণ্যে জম্ভুলা রাক্ষসীর মারফৎ মুদ্‌গল নামে একটি সুন্দর তরুণ ঋষির প্রণয়াসক্ত হয়ে পুরুষের মুণ্ডু ঘুরে যায় এমনি মোহিনী বেশে ব্রত পারণের অছিলায় তাঁকে ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ করতে গেছেন—বৃত্তান্তটি এই পর্যন্ত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী পুষ্কলাকে বলেছেন। কিন্তু পুষ্কলা রসভঙ্গ করে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা পিসিমা, সেই কচি ঋষিটিকে দেখে তোমার নোলা সপসপিয়ে উঠল না?"

এই বেমক্কা প্রশ্নে হতবুদ্ধি শূর্পনখা বিস্ময়ের তাৎক্ষণিক ঘোর কাটিয়ে উঠে বললেন, "তুই কিছুই বুঝিস না। যার প্রতি অনুরাগ হয় তাকে উদরসাৎ করা চলে না। মানুষটিকে যদি খেয়েই ফেলি তবে প্রেমের আর রইল কি?"

শিরোনাম দেখেই পাঠকের নোলা নিশ্চয়ই সপসপিয়ে উঠেছে। কিন্তু খাদ্য হিসাবে শালা কতটা সুস্বাদু অথবা আদৌ পাচ্য কিনা সে বিষয়ে কিছু গবেষণা করেছেন কি? পাঠককে এ বাবদে সচেতন করার আমার আদৌ কোনো দুরভিসন্ধি নেই। তবে কিনা ছাত্রাবস্থায়— "Look before you leap" এই প্রবচনের—আগের পাতার (leap-কে ভেবেছিলাম Leaf) দিকে তাকাও—ভাবানুবাদ করায় আমি যে ভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলাম, সেই 'সুখস্মৃতি' আমার মনে আজও অম্লান।

কিঞ্চিৎ ব্যয়বহুল হলেও কবিরাজি চিকিৎসা আজকাল জাতে উঠেছে। মারের চেয়ে যেমন ধাক্কা বেশি, তেমনি কোবরেজিতে ওষুধের চেয়ে অনুপানের দৌরাত্ম্য বেশি। শালা যদি ওষুধ হয় তবে এর অনুপানের পল্লবিত ফিরিস্তি নাতির মতোই দীর্ঘ। যথা—শালাজ, শালি, শালিবাহন, শালিপো ইত্যাদি। শালা শব্দের আক্ষরিক অর্থ স্ত্রীর সহোদর। তবে তুতোরাও (নাকি তেতো!) কিন্তু O.B C. গোষ্ঠীভুক্ত তো নয়ই পরন্তু স্বয়ং অভুক্ত থাকলেও তাদের জন্যে হরিদ্বর্ণ কদলী অথবা Thums up ! বিপ্লবকবি অকুতোভয় ছিলেন, তাই তিনি অক্লেশে লিখতে পেরেছেন—অদৃষ্টেরে হাস্যমুখে করব মোরা পরিহাস। পাপী মন বলছে, Victim of Circumstances । পাকে পড়ে অদৃষ্টস্থলে যদি শ্যালক আদেশ হত, তবে ব্যাপারটা কি ঠিক পরিহাসের পরাকাষ্ঠায় দাঁড়াত না? Prone শব্দের আক্ষরিক অর্থ পক্ষপাতী—কিন্তু স্বভাবতই মন্দাভিমুখী। কখনো কোথাও পড়েছেন কি —He is prone to puntuality? বরং কানে মধুবর্ষণ করবে যদি বলা হয়, He is prone to be puntual in bar (ব্যাকরণ মানি না)। সব জিনিসেরই আছে Prons and cons (স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিগুলি)। কিন্তু শ্যালক শব্দের এই মহিমা যে cons-এর ভিতর দিয়া কন কন করে হিয়া এবং এ বিষয়ে বিশ্বকবিও সম্যক অবহিত ছিলেন বলেই তাঁর নষ্টনীড়ে শ্যালক উমাপদ ভূপতিকে প্রায় অকিঞ্চনে উন্নীত করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। কর্মবীর শ্যালকের এই Precedent Relief Fund এর President না হলে সেটা কত বড় অধর্মাচরণ হবে ভাবুন তো? কল্পনা করতে বাধা নেই যে বিশ্বাস ভঙ্গের অন্তর্দাহে ভূপতির সমূহ বিপদে অনবহিত লক্ষ্মী চারু হয়ত Puff-box (পাউডার মাখার তুলি রাখার কৌটো) থেকে আননারবিন্দে এক পোঁচ পাউডার বুলিয়ে Casual মেরামত নিরত Puffed out (দম ফুরিয়ে গিয়েছে এমন) আর্যপুত্রের আসন্ন বিপদের আঁচ পেয়ে শিহরিত হয়েছিল? কাল্পনিক উত্তরটি যদি নঞর্থক হয় তার সমর্থনে যুক্তি হচ্ছে যে উমাপদ ভূপতির নিশিকুটুম্ব হলেও বড়কুটুম তো বটে।

কবিগুরুকে আপাতত নিষ্কৃতি দেওয়া যাক। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে এই সোনার ভারত এখনো পুরুষ শাসিত। তথ্য ভিত্তিক আলোচনায় এটাকে প্রায় আপ্ত বাক্য হিসাবে মেনে নেওয়ায় আপত্তি থাকার কথা নয়। আবার বজ্র আঁটুনি সত্ত্বেও অপরাধী ফস্কা গেরোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেকসুর খালাস পাওয়ার দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নয়। Pound কে Foolish করে

Penny- র Wise হওয়ায় Pound এর দুর্বলতাই শুধু দায়ী নয় Penny-র দাপটই মুখ্য। মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে খোলসা করলে দেখতে পাবেন যে প্রভাবশালী প্রাণনাথের সহোদর তেমন ভাবে কোথাও উল্লেখ্যযোগ্য কল্কে পায় নি। কিন্তু কলত্র ভ্রাতার আবদার সচরাচর প্রত্যাখ্যাত হয় না, নৈশশয্যা বিভক্ত হওয়ার আশু তথা অমোঘ আশঙ্কায়। চরণ ধরিতে দিও গো আমারে-কে যদি ভক্তিগীতি ভেবে থাকেন তবে বিধেয়, অন্যথায় আফশোস ভিন্ন গতি নাই। কোনো দুঃসাহসী প্রাগুক্ত প্রভাবশালী স্বামীকে স্ত্রৈণ, কাপুরুষ, ভেড়া, মেনিমুখো প্রভৃতি আখ্যা দেওয়ার আগে বৈষ্ণব পদাবলীর আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখাও —পদটি আর একবার ঝালিয়ে নিলে পৃষ্ঠদেশে জায়াহস্তের শতমুখী (ঝাঁটা) স্নেহস্পর্শের প্রেমানন্দ লাভ নাও হতে পারে। তবে এ বিষযে নিরঙ্কুশ Guarantee কর্কট রোগেব ওষুধের মতো অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত।

Other side of the hedge এর একটি হৃদয় বিদারক দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের "মেজদিদির" কেষ্টর অমানবিক নিগ্রহ। কাদম্বিনী তার বৈমাত্র ভাইকে দুই মুষ্টি অন্ন অমানুষিক শ্রমের বিনিময়ে অদৃশ্য চোখের জলের অনুপান সহ ছুঁড়ে দিত। এখানে কিন্তু কেষ্টা বিড়ম্বনায় কাদম্বিনীর প্ররোচনাই মুখ্য—কাদম্বিনীর স্বামী নবীন মুখুজ্যে যেন হারিকেনের সলতে। তলোদরীর (স্ত্রী) উসকানিতে নবীন ভাতির ইতর বিশেষ ঘটত। অর্থাৎ Remote Control স্ত্রীর হাতে।

পিতামহ বা মাতামহের কাছে তাদের পৌত্র বা দৌহিত্রকে শালা সম্বোধন অসূয়া উদ্রেককারী বিষয় নয়; বরং এতে আছে পরিহাস জনিত স্নেহাশ্রিত ছদ্ম কটূক্তি। রামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দ এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে শালা বললে তাঁরা সেটা প্রাপ্য সম্মান বলেই মনে করেছেন। সম্বোধন "শালা" অথচ গাত্রদাহ নৈব নৈব চ এমন মহেন্দ্রযোগ করাঙ্গুলি পরিমেয়। অর্থগৃধ্নুকে বঞ্চিত উমেদার, রক্তচক্ষু উপরওলাকে ত্রস্ত কর্মচারী, বেত্রপতি শিক্ষককে স্থূল মস্তিষ্ক ছাত্র, লম্বকর্ণকে বংশলোচন, দণ্ডদাতা বিচারককে দোষী আসামি, স্বেচ্ছা অনুপস্থিত নাগরকে বিপ্রলব্ধা (যে নায়িকা সংকেতস্থানে নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হয়), সজাগ গৃহস্থকে তস্কর, অন্যত্র মুণ্ডিতশ্মশ্রুকে নরসুন্দব, কি বিদ্বিষ্টকে শ্যালক সম্বোধন কে না করে।

কলসির কানা সংগ্রহশালায় রাখার পরিকল্পনা করবেন? আচ্ছা পরিকল্পনার সঙ্গে কি শালার কোনো সম্পর্ক আছে? স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে পঞ্চবার্ষিকী বা পাঁচশালা পরিকল্পনার কথা সকলেই অবগত। তবে এই দেশের অগ্রগতি যা হয়েছে তাতে শালাদের অবদান অস্বীকার কবে কোন শালা।

এতে কত শালা যে জড়িত ছিল তা পরিসংখ্যানবিদদের এক্তিয়ার হলেও পাঁচ শালার যে কম্মো নয় তা হলফ করে বলা যায়। কারণ এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে অকৃতদার মন্ত্রী সূর্যেন্দু সঙ্গমে চন্দ্রোদয় তুল্য বিরল প্রজাতির অন্তর্গত।

এই পর্যন্ত লেখার পর গৃহিণী খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন, ওগো। প্রহরণ আসছে।

আগন্তুক আমার সাক্ষাৎ দশপ্রহরণ ধারিণীর পঞ্চম ভ্রাতা বা আমার পাঁচ শালার সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল অনভিপ্রেত মেহমান। সুতরাং কাগজ কলম পত্রপাঠ গুটিয়ে রণে রঙ্গে ভঙ্গ দিতে হল।

Because I have only one head on my shoulder to spare.

উলট পুরাণ

অনির্বাণ ঘোষ

ঘুষের টাকা যত পাবিস দু'হাত ভবে আন
সঙ্কোচেব বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
দুর্জনেরে বক্ষা কবো, দুর্বলেরে হানো
নিজেবে দীন-হীনের তরে যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয
থাকলে টাকা আইন-আদালত হবেই হবে জয।
অবাধে কবো কালোবাজাবি চিন্তা নাই পাছে,
টাকার জোবে আইনকানুন গোলাম তোমার কাছে।
সঙ্কট এলে দেখবে তারাই রাখছে তোমার প্রাণ
তাই সঙ্কটেব কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মান।

ধর্ম এনে রাজনীতিতে লাগাও সেন্টিমেণ্ট
হাতেনাতেই ফলটি পাবে ঠিক সেন্ট পার্সেন্ট।
মরবে লক্ষ লক্ষ মূর্খ নিজের সাথে লড়ে
তোমার ঘবে আসবে টাকা, ভাঁড়াব যাবে ভ'রে।
তাই ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
রাজনীতিতে লাগিযে তাকে ফযদা লুটে আন।

খোলা বাজারে ধান্দা চালাও নেই তো কোনো ভয
আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেবে করো জয।
কেবল চলতে হবে পুলিশ প্রশাসনেব মন যুগিযে,
হাতে তাদেব রাখতে হবে মাসকাবাবি দিযে;
আমলা যদি হামলা চালায, কেউ যদি দেয় গালি
কেউ যদি চায দিতে তোমাব মুখেতে চুনকালি,
নীরব হয়ে নম্র হযে আঁধাব রাতে গুণ্ডা দিযে
যমের বাড়ির পথেই তাকে পাঠাবে সটান

জেনো সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।

ভালো আছেন?

সুদীপ নাগ

—কেমন দেখছ? এ বাজারে কেমন থাকা যায়? নিজে কেমন আছ? দেখে বুঝতে পারছ না আমি কেমন আছি?

—শুনেছিলাম আপনার দাঁতের যন্ত্রণা, বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, তাই।

—শুনলে কি তোমার ভালো হবে? দাঁত থাকলেই দাঁতের যন্ত্রণা হবে। হাঁটু থাকলেই বাত হবে। চোখ থাকলেই ছানি পড়বে। মাথা থাকলেই টাক গজাবে। তুমি কি ডাক্তার? এসব ভালো করতে পারবে? কেমন আছি জেনে তুমি কি করবে?

—আজ্ঞে আমার অপরাধ হয়েছে।

—অপরাধ হয়নি। এটা লোকের পেছনে কাঠি দেওয়া। বলো আদিখ্যেতা হয়েছে।

—সবাই জিজ্ঞেস করে, তাই করে ফেলেছি।

—তুমি যখন কিছু করতে পারবে না তখন জিজ্ঞেস করবে কেন? সবাই যদি হাওড়া ব্রীজ থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়, তুমিও দেবে, বলো? শুধু শুধু তোমার মরতে ইচ্ছে করবে?

—সেটা আলাদা ব্যাপার।

—না আলাদা নয়। সবার মতো তোমার যখন মরতে ইচ্ছে করবে না, তখন সবার মতন কে কেমন আছে জেনে তোমার কী লাভ?

—জেনে লোকসানও নেই।

—তোমার নেই, কিন্তু যাকে জিজ্ঞেস করছ তার থাকতে পারে। অন্যের ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে যাবে কেন? কে কেমন আছে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমাকে আমি জানাতে যাব কেন? তুমি আমার কী সুরাহা করবে?

—আজ্ঞে আপনি আমার পাড়া প্রতিবেশী, বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। দেখা হল তাই কর্তব্যের খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম।

—ও। তুমি কর্তব্যপরায়ণ বলছ? বাঃ বেশ। আচ্ছা তোমার মা সুগার প্রেসারে ভুগছে। তোমার বাবা চোখে ছানিতে কষ্ট পাচ্ছে। তোমার স্ত্রীর পায়ে বাত। তোমার বোনের বিয়ে হচ্ছে না। তোমার ভাই বেকারত্বের যন্ত্রণায় ভুগছে। তুমি তাদের কোনো সময়ে জিজ্ঞেস করো কেমন আছে? আমার সমস্যা শুনে তুমি কিছু করতে পারবে?

—ক্ষমতা থাকলে চেষ্টা করব।

—করবে না। প্রতিদান নয়ত প্রতিশোধ চাইবে।

—বলেই তো দেখুন।

—বলব? তোমার সুন্দর ফিন্‌ফিনে সাদা পাঞ্জাবির বুক পকেটে একগোছা একশো টাকার নোট দেখা যাচ্ছে। ওর থেকে একশো টাকা আমায় দাও তো, ফেরত পাবে না।

—আজ্ঞে হিসেবের টাকা। কী করে দেব?

—তাহলে বেহিসেবী কথাই বা আমাকে জিজ্ঞেস করবে কেন? কথার কি কোনো দাম নেই? কথাকে যদি টাকা ভাবো, তাহলে বেহিসেবি খরচ করতে পারবে?

—এত কথার কী আছে মশাই? এক কথায় তো মেরে দেওয়া যেত, ভালো আছি।

—তার মানে? জীবনটাকে তুমি মিথ্যের উপর দাঁড় করাতে চাইছ? আমি ভালো না থাকলেও ভালো বলতে হবে?

—তাহলে ভালো নেই বলবেন।

—ভালো নেই, কী করে বুঝলে?

—ভালো নেই তো রাস্তায় ঘুরছেন বেড়াচ্ছেন কী করে?

—ভালোর তুমি কি বোঝো? ঘোরা-বেড়ানোটা মেকানিক্যাল ব্যাপার। দুটো ঠ্যাং আছে, তাই ঘুরছি। একটার পাশে আর একটা ফেললেই হল। মানুষ হাঁটতে পারলেই ভালো থাকে?

—ওঃ। আপনাকে জিজ্ঞেস করা আমার পাপ হয়েছে। আমায় ছাড়ুন।

—তা বললে তো চলবে না। তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলে ভালো আছেন, তখন তুমি আমার কোন অংশের ভালোটা জানতে চাইলে?

—আপনি হেঁটে চলে বেড়ানো মানুষ। সেই মানুষটা ভালো আছে কিনা, এই ছিল আমার ছোট্ট প্রশ্ন। সেই তিল যে এতবড় তাল হবে ভাবিনি। আপনি যে কী মানুষ।

—মানুষ বলতে কী বোঝ?

—যে গরু নয়, ছাগল নয়। কোনো গরু-ছাগল পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে আমরা প্রশ্ন করি না, কী মশাই কেমন আছেন?

—কেন করো না?

—কারণ গরু-ছাগল নির্বোধ প্রাণী।

—কে বলেছে গরু-ছাগল নির্বোধ? গরু-ছাগলেরও যথেষ্ট বোধ আছে। আসলে তার ভাষা তুমি বোঝ না। কোনো চীনাম্যান কিংবা আফ্রিকানকে আদিখ্যেতা করে জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছেন? করবে না? কেন বলো তো?

—তার ভাষা জানি না বলে।

—ঠিক তাই। ভাষা না জানলে তখন মানুষ এবং গরু-ছাগল দুই-ই তোমাব কাছে সমান। তাহলে মানুষ আব গরু-ছাগলে তফাৎ কোথায়?

মানুষ জামা-কাপড় পবে। লজ্জা ঢাকতে পাবে। দু'পাযে হাঁটে। সুন্দর দেখতে।

—বকও তো দু'পাযে হাঁটে। লজ্জা সর্বদা ঢাকাই থাকে। সাদা পালকে মোড়া। দেখতে সুন্দর। মানবকে একটু ভালো করে বিশ্লেষণ করো।

—দাদা আমায় ছাড়ুন। আমি বাজারে যাব। বাজার যে উঠে যাবে।

—আবার ভুল বলছ। বাজাব কখনো ওঠে না। যারা বাজারে জিনিস বিক্রি করে, তারা উঠে যায়। তোমার শিক্ষার দৌড় খুবই কম। আজ তোমায় আমি একটু বগড়াব।

তোমার সামনে এই যে আমি দাঁড়িযে আছি, আমি কে?

—আপনি মানুষ।

—কী করে বুঝলে আমি মানুষ?

—আপনার হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে, বোধ আছে। ঝগড়া করতে পারেন, গান গাইতে পারেন।

—সে তো পাখিরও সব আছে। মানুষের থেকে ভালো গান গাইতে পারে। হারমোনিয়াম বাজায় না। মিউজিক দিতে হয় না। ঝগড়াও করতে পারে। মানুযকে একটু ভালো কবে ব্যাখ্যা করো।

—দাদা এই পর্যন্ত আজ থাক না। এরপর বাজাবে আর কিছুই পাব না। অফিসও কামাই হবে। দেরি করে বাজার নিযে গেলে বউ ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

—সে থাকুক। বউ তোমার একদিন ঝাঁটা হাতে দাঁড়িযে থাকবে। অফিস নাহয় একদিন কামাই হবে। একদিন বাজার না হয হবে না। কিন্তু এই যে জানছ, এটা সারা জীবনের জন্য জেনে রইলে। ভালো আছি বললে কী বুঝবে? ভালো থাকার বোধটা কোথায থাকে জানো?

—মনে।

—মন কোথায থাকে?

—বুকের ভেতরে।

—বড়দের সঙ্গে ফাজলামো কোরো না। মন থাকে ভাবে। মন হল আকাশ। কখনো রোদ কখনো মেঘ। কখনো বৃষ্টি কখনো বসন্ত। বাইরে থেকে বোঝবার উপায নেই।

—এবাব আমায় মুক্তি দিন দাদা। আমি আসি।

—মুক্তি বলতে তুমি কী বোঝ?

—কিচ্ছু বুঝতে চাই না। আমায ছাড়ুন। আপনার হাতে ধরছি।

—বড় অধৈর্য ছেলে তো তুমি। কোনো কিছু জানার আগ্রহ নেই? দ্যাখো, জ্ঞান হচ্ছে ঈশ্বর। যত জ্ঞান তত রস। তোমার ইচ্ছে হয় না রসের সাগরে ডুব দিই? আচ্ছা ধরো, একভাঁড় রস আছে। তুমি মাছি হয়েছ, কোনখানে বসে রস খাবে?

—আমি বস খাব না। আজকের দিনটাই আপনি নীরস কবে দিযেছেন। আমি চলি।

—শোনো কক্ষনো আর কাউকে জিজ্ঞেস করবে না, ভালো আছেন?

—আচ্ছা। (আপনাকে তো নয়-ই।)

—অবুঝের মতো ঘাড় নাড়লে যে? কেন করবে না জিজ্ঞেস করলে না তো?

—আজ্ঞে আপনার পাযে ধরছি। আমায় ছাড়ুন। আমার সব কেমন যেন গুলিয়ে গেছে। কেন করব না?

—কারণ সত্যিকাবের মানুষ কখনো ভালো থাকতে পাবে না। একমাত্র মিথ্যেবাদী মানুষেরাই বলতে পারে—ভালো আছি ভাই। বুঝলে?

কমলকান্তি

তসলিম আরিফ গায়েন

কমলকান্তি আমাব দোস্ত্
ঠেকে আমরা একসঙ্গে চুল্লু খেতাম
রোজ দেরি করে বাড়ি ফিরত, একা হাঁটতে পারত না।
মালেব দাম চাইলে এমন অবাক হয়ে রেল লাইনেব দিকে
তাকিযে থাকত, যে দেখে ভারি বাগ হত আমাদেব।

আমবা কেউ চোর হতে চেয়েছিলাম,
কেউ ডাকাত, কেউ ছিন্‌তাইবাজ,
কমলকান্তি সে সব কিছু হতে চায়নি,
সে মস্তান হতে চেযেছিল।
খুন, ধর্ষণ, পেঁচাডাকা রাত্রের সেই দাপুটে মস্তান
এ-পাড়া আর ও-পাড়ার গলিতে যা নাকি অল্প একটু
হিরোর মতো লাগে।

আমরা কেউ চোর হযেছি, কেউ ডাকাত, কেউ ছিনতাইবাজ্
কমলকান্তি মস্তান হতে পাবে নি।

সে এ. সি-ওযালা ঝক্‌ঝকে বিধান সভায় বসে।
মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা করতে আসে
মাল খায়—খুন-জখমের এটা ওটা কন্ট্রাক্ট দেয, তারপর
বলে, উঠি তাহলে।
আমি তাকে এ. সি. লাগানো গাড়ি অবধি এগিয়ে ফিবে আসি।

আমাদের মধ্যে আজ যে চুবি কবে,
অনায়াসে সে ডাকাত হতে পারত,
যে ডাকাত হতে চেযেছিল, ছিন্‌তাইবাজ্ হলে তার
এমন কোনো ক্ষতি হত না।।।
অথচ সকলের আশাপূরণ হল, এক কমলকান্তি ছাড়া।
কমলকান্তি মস্তান হতে পারেনি,
সেই কমলকান্তি, মস্তানির কথা ভাবতে ভাবতে
যে একদিন মস্তান হতে চেয়েছিল।

সম্পাদকের জুতো দান

জয়ন্ত সরকার

খনি অঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখ, জীবনযাত্রার পবিপূর্ণ ছবি লেখনীর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রফুল্ল কুমার সিংহ। নিজে কয়লা খনির সঙ্গে সবাসবি যুক্ত থাকার সুবাদে অনায়াসে অনুভব করতে পেরেছিলেন এখনাকার মানুষ জনের মন। নিজের আমুদে খোলামেলা চরিত্র আর অসাধাবণ অনুকরণহীন ভঙ্গিমায় গল্প বলার দক্ষতায় যে কোনো জায়গায় যে কোনো অনুষ্ঠানে নজর কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল মানুষটির। দিলখোলা এই মানুষটি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন ২৬ জানুয়ারি।

তাঁকে নিয়ে সভা সমিতি যথারীতি হয়েছে। স্মরণে বরণে তাঁর কীর্তিগাথার প্রশংসা কবে হাততালি কুড়িয়েছেন স্থানীয (আসানসোল-রানীগঞ্জ) সাহিত্য সেবকগণ। এরই মধ্যে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করায় দু' একজনের আগ্রহ বড় বেশি দৃষ্টিকটু। এমনই এক ব্যক্তি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক।

তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে স্মরণসভা করে তাক লাগিয়ে দিলেন এলাকায়। নিজের সম্পাদিত গোটা পত্রিকা তাঁর স্মরনে উৎসর্গ করলেন। সাধু সাধু! সম্পাদক মহাশযের এত দরদ দেখে অবাক সবাই।

ঘটনার লেজ কিন্তু অন্যত্র। সবাব জানার কথা নয়। সিংহ মহাশয় একবাব তাঁর গল্পেব বই নিজের খরচে ছাপেন। এই সম্পাদক মহাশয 'সব বই বিক্রি করে দেব' এই শর্তে সব বই পেটিশুদ্ধ প্রেস থেকে সোজা নিজের ডেরায এনে তোলেন। এরপর বিভিন্ন বইমেলায বছব, দু'বছর করে সময় গড়ায। সিংহ মহাশয় মাঝে মধ্যে খোঁচা মাবেন, কী হে, আমার বইগুলোব হিসাব কই? সম্পাদক মহাশয় ধূর্ত হাসি দিযে বোঝান, 'ভাবছেন কেন? আমি তো আছি। বুঝতেই তো পারছেন, এতো কাজ, লোককম। গুছিযে হিসাব কবাটা আব হযে উঠছে না'।

সিংহ মহাশয় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' আসলে তাঁর মনের সঙ্গে খরচ এর হাতটিও সুদূর প্রসারী। টাকা পযসার হিসাব নিযে তাঁর অত মাথা ব্যথা ছিল না।

তো এই মানুষটি মাঝেমধ্যে তাঁর দু'একজন প্রিয বন্ধুব কাছে আক্ষেপ করেও ছিলেন, 'অমুক আমার বইগুলো যে কী করলো'। সভ্য সমাজের সভ্যতা বজায় রাখতে কেউই আর ব্যাপারটি নিয়ে হৈ চৈ করেন নি। মোটামুটি হিসাবে প্রায় পনেরো হাজার টাকার বই।

দিনের পর দিন যায়। প্রকৃতির অমোঘ টানে সিংহ মহাশয ইহলোক ত্যাগ করলেন। সঙ্গোপনে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেন এই সম্পাদক মহাশয়। যাক, আব হিসাবেব প্রশ্ন নেই।

তবু যদি প্রশ্ন ওঠে? তাই জন সমক্ষে তাঁব স্মৃতি রক্ষার্থে পাঁচ-সাত-হাজার খরচ। কিছুটা ঋণশোধ। উপরি পাওনা সচেতন সম্পাদক হিসাবে বাজারে সুনাম আর তাঁর স্মরণে বিশেষ সংখ্যা পত্রিকাটিব বিক্রিলব্ধ অর্থ।

ত্যারা চোখে

প্রক্সি মন্ত্রী

খুব শীঘ্রই একটি বিজ্ঞাপন দেখা যেতে এইরকম—"প্রক্সি দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বা প্রক্সি মুখ্যমন্ত্রী চাই। যোগ্যতা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীর সমতুল।" লালু প্রসাদজিকে দুর্নীতিব জন্য সিংহাসন ছাড়তে হয়েছিল। তাঁবে সুরক্ষিত রাখতে ঘরণীকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং রাবড়ি দেবী তাব মর্যাদা দিতে কসুর করেননি। একইভাবে দক্ষিণের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী জয়বাম জয়ললিতারও সিংহাসন টালমাটাল অবস্থায়। এমতাবস্থায় তাঁ অনুগত কোনো স্বামী নেই, সম্ভবত অনুন্ধান চলছে অনুগত কোনো সখ বা সখীর, যিনি রাবড়িদেবীর মতোই সিংহাসনে না থেকেও রাজত্ব চালা সাহায্য কববেন জয়ললিতাজিকে। আমাদের দেশের সব বড় বড় নেতাদেব যে হারে দুর্নীতিগ্রস্ত হতে দেখা যাচ্ছে, ধীবে ধীরে অনেক রাজ্যেই এরক প্রক্সি মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন হওয়া সম্ভব। সুতবাং বেকাব যুবক-যুবতীরা একটু ভেবে দেখতে পারেন।

—অঞ্জনা দত

পাওয়া যাচ্ছে P.M. Exam Form
প্রক্সি-মন্ত্রী পরীক্ষা Rs. 2/-

নীলাম-নিলাম

তামিলনাড়ুর পঞ্চাযেত নির্বাচনে—পঞ্চায়েত সভাপতিত্বের নীলা ডাকা হয। পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে যে অধিক দাম দেয় তাকে বিক্রি ক হয় সভাপতিত্ব এবং ওই টাকায় নাকি গ্রামবাসীরা 'ফিস্ট' করে দিনকয়ে দেশের রাজনীতির যা হাল, পঞ্চায়েত সভাপতিত্ব কেন, রাষ্ট্রপতি পদে এই প্রথা চালু করলে কাবো আপত্তি থাকবে না। ববং নীলামে যে টা উঠবে তাতে মাসখানেক ভালো খাওয়া দাওযা চলবে। দেশ চালনা যে বক চলছিল সেবকমই চলবে। আমরা মহাভোজে নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষায়।

—কুটিলা কামি

একটি ভোটের প্রতিবেদন

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

আজকে ভোট।

ভোট দিতে যাবার ব্যাপারে প্রথমটা জ্যাঠাইমার একটু আপত্তি ছিল। ভোট দেবার জন্যে আবার যাবার কী দরকার পড়ল। যারা ভোট নিতে চায় তারা ঘরে এসে নিয়ে যাক না। আমরা যাব কেন? সব পাওনাদার বাড়িতে আসতে পারে, ওরা পারে না?

জ্যাঠাইমাকে বোঝানো হল, ওই একই জায়গায় ভোট দিতে টুনিমাসিও আসবে। টুনিমাসির কথায় জ্যাঠাইমা নরম হল;—কদ্দিন দ্যাকা হয়নি গো। কেমন আছে কে জানে।

টুনিমাসির বাড়ি শহরের ঠিক বাইরে খড়িগেড়ে গ্রামটার শুরুতেই। শহর থেকে বেরিয়ে যে রাস্তাটা সোজা বম্বে রোডে গিয়ে মিশেছে তারই ধারে। হেঁটে গেলে কুড়ি মিনিট। রিক্সায় আরো কম।

আসলে টুনিমাসির সঙ্গে জ্যাঠাইমার দেখা হয়নি মেরেকেটে দিন দশেক হবে। তাতেই জ্যাঠাইমার পেট ফুলে উঠেছে। ওদের দু'জনের দেখা হলে মোলাকাতের প্রথম ধাক্কা শেষ হতে লাগে পাক্কা এক ঘণ্টা। তারপর অন্য সব দরকারি কথাবার্তা। বাপের বাড়ির পাতানো সই তো। বেশিদিনের অদর্শন সইতে পারে না।

বাড়িতে কাকা জ্যাঠা ঠাকুরমা সবাই মিলে এগারোজন। তার মধ্যে ভোট দেবে পাঁচজন, দেবে না ছ'জন। তার মানে জোট হিসাবে 'দেবেনা'র দলই মেজরিটি। সরকার ওদেরকেই গড়তে দেওয়া উচিত। কিন্তু উচিত মতো কাজ আর হচ্ছে কোথায়?

অবশ্য খোঁচা একটা আছে । রান্নিমাসি আর গদাধরদা। ওরাই ভোট দেবে। ওদেরকে হিসাবে নিলে ছোটরা মাইনরিটি। কিন্তু এভাবে বহিরাগতদের টেনে এনে ছোটদের দাবীকে দাবিয়ে রাখাটা বড়দের চক্রান্ত ছাড়া আর কী?

আজকেরটা হল সাধারণ নির্বাচন। এম. এল. এ আর এম. পি তৈরির ভোট। ভোট পেয়ে ওরা সব কোথায় গিয়ে কী কী যেন করবে? কী করবে সেটা যারা ভোট দিচ্ছে তারাই জানে না। যারা ভোট দেবে না তাদের তো কথাই নেই।

সাধারণ নির্বাচনে ছোটরা ভোট দিতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু ভোটের অভিজ্ঞতা ওদেরই বেশি। বড়রা আর কবার ভোট দেয়। দু'বছর চারবছরে একবার। ছোটদের আছে অজস্র ভোট। ক্লাশের মনিটার তৈরির ভোট, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তৈরির ভোট, টিমের ক্যাপ্টেন তৈরির ভোট, পুজো কমিটির সেক্রেটারি তৈরির ভোট, এমনকি পিকনিকের জায়গা ঠিক করতেও ভোট।

ওরা সবাই জন্মেছে স্বাধীন দেশে। জন্মে থেকেই গণতান্ত্রিক ভোটের ব্যবস্থায় দারুণ আস্থা। —আমাদেরকে আর ভোট শেখাতে এসো না বাপু, আমরাই ভোট শিখিয়ে দেব।

ওদের ভোটও যে মাঝে মাঝে গড়বড় হয় না তা নয়। সেবারের ভোটের বিষয় ছিল কে বেশি মুটকি —জ্যাঠাইমা না টুনিমাসি। ভোট পড়ল সমান সমান। এদিকে তিন ওদিকে তিন। শেষ অব্দি সাব্যস্ত হল দু'জনেই সমান মুটকি।

আর একবার ভোটের বিষয় ছিল কারা বেশি বোকা, ছেলেরা না মেয়েরা। ওরা তো তিন ভাই তিন বোন। ছেলেরা ভোট দিল মেয়েদের

আর মেয়েরা ভোট দিল ছেলেদের। ফল সমান সমান, শেষে মেনে নেওয়া গেল যে সবাই সমান বোকা।

তাই বলছিলাম ছোটরা ভোটের ব্যাপারে শুধু অভিজ্ঞই নই, একেবারে বিশেষজ্ঞ।

সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারটা একটা বেহদ্দ মজার ব্যাপার। দেওয়ালে দেওয়ালে রঙ বেরঙের ছবি আর হরেক রকমের আঁকিবুকি লেখা। ভোট যতই এগিয়ে আসে ততই এগুলো বাড়তে থাকে। রাস্তার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত দড়ি খাটিয়ে তার থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে কাগজ আর কাপড়ের ফেস্টুন। তাতেও নানা রঙের ছবি। কী রংদার জেল্লা। বাজারের ভিতরটাই সব চাইতে বেশি। রঙে রঙে ছয়লাপ। দুর্গাপুজোতেও এত সাজগোজ হয় না।

এত জেল্লার মধ্যেই কিন্তু খোঁচা একটা থেকে গেছে। খবর এসেছে, ভোটের সময় গণ্ডগোল হবে, মারামারি হবে, বোমা পড়বে, গুলিগোলাও চলতে পারে।

গতকালই পুলিশ না মিলিটারি কারা যেন শহরের রাস্তায় লেফট রাইট করে গেছে। বড়রা বলল একে বলে ফ্লাগমার্চ। ফ্লাগমার্চ, কিন্তু কোনো পতাকা-টতাকার দেখা নেই। শুধু মাথায় টুপি ঘাড়ে বন্দুক গায়ে কাদা কাদা রঙের জামা পায়ে ধুমসো ধুমসো জুতো আর মসমসিয়ে হাঁটা।

ছোটদের বারণ করে দেওয়া হল, ভোটের দিন কেউ যেন বাইরে না যায়। কোথায় কি হয়ে যাবে বলা যায় না।

ওই সাবধানবাণীটাতেই হয়ে গেল হিতে বিপরীত। বড়দের বারণগুলোই যে ছোটদের কাজে বেশি উৎসাহিত করে তোলে সেটা বড়রা বোঝে না। কিন্তু ছোটরা খুব ভালো জানে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই 'ভোট দেবেনা'র দলের মিটিং বসল। ছ'জনই হাজির। সর্বজ্যেষ্ঠ ভোম্বল ক্লাশ ফোর। সর্বকনিষ্ঠ টুবলি ক্লাশ ওয়ান। ওরা সবাই ছাত্র এবং ছাত্রী। ছাত্রদলের ক্ষমতা অসীম। পাহাড় মাটি এক করে দিতে পারে।

মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ শতাব্দীর।

শুধু বিংশ নয়, একবিংশ শতাব্দীর মুক্তিও ওদের জন্যই কাঁদছে। সেটা চোখে দেখা যাচ্ছে না এই যা।

বেশ কিছু আলাপ.আলোচনার পর ঠিক হল ভোটের সময় যাতে কোনো গণ্ডগোল না হয় সে দায়িত্ব ওরাই নেবে।—আমরা ছোট বলে ভোট দিবে পাব না সেটা যেমন মেনে নেব, তোমরা বড়রা ঠিকমতো ভোট দিচ্ছ কিনা সেটাও তেমন জেনে নেব।

ওদিকে সকাল থেকেই বাড়িতে সাজো সাজো রব, উত্তেজনার ঠেলায় কাকা দাড়ি কামাতে গিয়ে ফ্যাঁস করে গালটা কেটে ফেলল। তারপর রক্ত দেখেই স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল। ভোট হচ্ছে কেন? দেশটা স্বাধীন, তাই। দেশটা স্বাধীন হল কী করে? শত শত দেশপ্রেমিকের রক্ত দানের ফলে। গিভ মি ব্লাড অ্যাণ্ড আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম। কে যেন বলেছিল।

কাকা আজ রক্তদান করল। স্বাধীনতার জন্য নয়। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তদের জন্যে তো নয়ই। কাকা আজ অযাচিত রক্তদান করল ভোটের জন্যে। ভোট হচ্ছে তাই কাকা জ্যাঠা দু'জনেরই অফিস ছুটি। 'ভোট দেবেনা'র দলেরও স্কুল ছুটি। সকালে উঠেই রান্নাবান্নার তাড়া থাকার কথা নয়। কিন্তু ভোট আছে না। রান্নিমাসি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আঁচ দিয়েছে। সাড়ে আটটায় রান্না শেষ। তারপরেই রান্নিমাসি আয়নার সামনে সাজতে বসল। সে সাজা শেষ হল সাড়ে বারোটায়।

সেজেগুজে সবাই মিলে দল বেঁধে বুথে গিয়ে দেখল 'ভোট দেবেনা'র দল সেখানে আগেই গিয়ে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ লাইন সামলাচ্ছে কেউ গেট আগলাচ্ছে, কেউ বুথের ভিতরে দাঁড়িয়ে জাল ভোট আটকাচ্ছে। দলপতি ভোম্বল প্রিসাইডিং অফিসারের দিকে কড়া নজর রাখছে যাতে সে কোনো বেআইনি কাজ না করতে পারে।

লাইনে দাঁড়িয়ে আছে শ'খানেক লোক। কাকা-জ্যাঠার আটজনের দলটা সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই বাপান তাদেরকে লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল। বাপানের ধমকের ঠ্যালায় লাইনটা একেবারে সোজা। যেন মিলিটারির লাইন।

একটা বোমা পড়ল। লাইনের মাঝ বরাবর। তবে লাইন থেকে একটু দূরে। তাই কোনো লোক আহত হল না। কিছু ধোঁয়া গন্ধ শব্দ আর যেখানে বোমাটা ফাটল সেখানে একটা ছোটখাটো গর্ত।

প্রথম চটকায় লাইনটা এলোমেলো হয়ে গেল। লাইনের লোকেরা পালাবার জন্যে তৈরি। বাপান চিৎকার করে এক ধমক লাগাল। কিছুটা লজ্জায় আর কিছুটা বাপানের ভয়ে তারা নিজের নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। লাইন আবার সোজা। যারা বোমাটা ছুঁড়েছিল তারা কিন্তু টুসকির নজর এড়াতে পারে নি। ওপাশে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জনা চারেক ছোকরা। ওদের বয়স হবে ষোল থেকে কুড়ি। বোমা ছুঁড়ে বীরত্ব দেখাল ঠিকই —কিন্তু চেহারা দেখলে মনে হবে খেতে পায় না। ওরা দ্বিতীয় বোমাটার ছোঁড়ার তোড়জোড় করছিল। টুসকিকে ওদের দিকে ছুটে যেতে দেখে থতমত খেয়ে গেল। একটা বোমা ওদের একজনের হাতেই ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ডিগবাজি খেয়ে তার বডিটা সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। পড়েই রইল। আর নড়াচড়া নেই।

দলের বাকি তিনটে বেড়ালের মতো হাইজাম্প মেরে দেওয়াল টপকে ওপারে চলে গেল। তারপর তারা যে কোথায় গেল এই প্রতিবেদক দেখতে পায়নি। তবে এই প্রতিবেদক যেটুকু দেখতে পেয়েছে, ওই ন্যাশনাল হিরোদের পালানোর বীরত্ব ছিল বোমা মারবার বীরত্বের চেয়ে তিনকাঠি সরেস।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের এস. আই-কে টুসকি হাঁক ছাড়ল,—যান ওটাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।

এস. আই দোনামনা করতে লাগল,—ওর বডির সঙ্গে যদি আরও ওইরকম বোমা থাকে? আর আমরা কাছে গেলেই যদি সেটা ফেটে যায়? তবে তো আমাদের অবস্থাও ওর মতোই হয়ে যাবে।

—চোপ্! ডরপোক কায়র ভীতু কোথাকার। যান্!

ধমক খেয়ে পুলিশ এগিয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে চেপে নবযুগের নওজোয়ানের বডি রওনা দিল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। তবে দেখে যদ্দুর মনে হল হাসপাতালে বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। অনতিবিলম্বেই নদীর ধারে শ্মশানের দিকে রওনা দেবে।

এর মধ্যে ছাব্বিশজন ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে পরিচয়পত্র ছিল না। প্রিসাইডিং অফিসার পরিচয়পত্র ছাড়াই তাদেরকে ভোটের অনুমতি দেবার ধান্দায় ছিল। ভোম্বল লাগাল এক কড়া ধমক।

—খবরদার বেআইনি কাজ করবেন না।

ধমক খেয়ে এখনো পর্যন্ত ছাব্বিশজনকে বার করে দিতে বাধ্য

হয়েছেন। আরো কতজনকে বের করে দিতে হবে কে জানে। আজ কপালে দুর্ভোগ আছে।

ততক্ষণে খবর চলে গেছে নিবার্চন প্রার্থীর কাছে। সে ভদ্রলোক জানত এটা তার নিজের এলাকার বুথ। এখানে একশ ভাগ ভোট সেই পাবে। বড় আশায় বাগড়া পড়ায় ভদ্রলোক রেগে কাঁই হয়ে জনাচারেক চামচা সঙ্গে নিয়ে এসে হুড়মুড় করে বুথে ঢুকে পড়ল।

প্রিসাইডিং অফিসারকে চোখ পাকিয়ে বলল, এসব হচ্ছেটা কী? আমার ভোটারদের ভোট দিতে দিচ্ছেন না কেন? মামদোবাজি পেয়েছেন?

প্রিসাইডিং অফিসার দাঁড়িয়ে উঠে হাতজোড় করে আমতা আমতা করে কী যেন বলার চেষ্টা করল। কিন্তু তার গলা তো শুকিয়ে কাঠ। সেখান দিয়ে কোনো স্বর বেরোল না। কি বলতে চায় বোঝাও গেল না।

লোকটা যখন হুড়মুড় ভেতরে ঢুকেছিল তখন ভোম্বল আটকাতে পারেনি কিন্তু তাই বলে বুথের ভেতর তো গুণ্ডামিও চলতে দেওয়া যায় না। লোকটার তড়পানি বন্ধ করার জন্য এগিয়ে এল।

ভোম্বল এগিয়ে আসার আগেই টুবলি অ্যাকশনে নেমে পড়েছে। [illegible]'বছরের মেয়ে। লম্বায় ছোট। ওর হাতটা ওই দশাসই সাড়ে ছ'ফুট লম্বা আশি কেজি ওজনের লোকটার কোমরও পাবে না। টুবলি চট করে প্রিসাইডিং অফিসারের চেয়ারে পা দিয়ে তার টেবিলের উপর চড়ে পড়ল। তারপর লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড়।

—মামদোবাজি ও করছে না। মামদোবাজি করছ তুমি। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

চড়টা বোধহয় যতখানি দরকার তার চেয়ে একটু বেশি জোরে হয়ে গেছল। লোকটা দু'হাতে মাথা চেপে ওখানেই শুয়ে পড়ল। কথা বলার ক্ষমতা নেই, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। টুবলির কথাগুলো বাতাসে ভেসে কোনো রকমে তার কান পর্যন্ত পৌঁছলেও মগজে ধাক্কা মারার আগেই সবকিছু অসাড়।

চারটে চামচা লোকটাকে চ্যাংদোলা করে তুলে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারবে কী করে? ওরা তো এক-একটি খেতে না পাওয়া বীর পালোয়ান। ওদের হাতে আফগান হয়ে যাওয়া লোকটার বিশাল বপুর ছ্যাঁচড়ানো অবস্থা দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হোমগার্ডগুলোর মায়া হল। জনাচারেক এগিয়ে এসে হাত লাগাল। সবাই মিলে কোনোরকমে জননেতাকে বাইরে বারান্দার মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে পাশে বসে হাঁপাতে লাগল।

প্রিসাইডিং অফিসার আর পোলিং অফিসাররা মুখটুখ শুকনো করে ধমক খাওয়া ছাত্রের মতো নিজের নিজের চেয়ারে বসে পড়ল। ভোটের কাজ চলতে লাগল।

প্রিসাইডিং অফিসার টুবলির কান বাঁচিয়ে পাশের পোলিং অফিসারকে চুপি চুপি বলল—আমার উপর নির্দেশ ছিল পরিচয়পত্র নিয়ে চাপাচাপি না করার। কিন্তু মাঝের থেকে বাচ্চারা এসে যদি এরকম ঝামেলা করে কী করতে পারি বলুন। অফিসে ফিরে গেলে ইউনিয়নের সেক্রেটারি যখন আমার কাছে জবাবদিহি চাইবে তখন কিন্তু তুমি আমার হয়ে সাক্ষী দিও ভাই।

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে ভোট দেয় সাবালক বাচ্চারা। কিন্তু গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে ঐ নাবালকরাই, স্বপ্নের এই প্রতিবেদনকে সত্যি করে তোলার জন্যে। কোথায় তারা? এই প্রতিবেদকের জানা নেই।

ট্যারা চোখে

পরিবেশ পরিষ্কারে পৌরসভার পুরস্কার

সুবর্ণ সুযোগ। হাতিয়ে নিন বহুমূল্য পুরস্কার। কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। এর সার্থক রূপায়ণে জনগণের সাহায্য একান্ত প্রার্থনীয়।

(ক) পথেঘাটে কিংবা নিজের বাড়িতে, সর্বত্রই 'বৃষ্মংঘ,-ক্রুতক্রান্তি—সিম্ফোনিয়েস্টিক দাঁড়েক্রম' সুরে সঙ্গীত পরিবেশন নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে শব্দ দুষণের জন্যই, থুড়ি, শব্দদূষণ রোধের জন্যই এই পদক্ষেপ।

(খ) শহরের কোথাও 'চিচিঙ্গেঁপটাস হেটেরোব্যাকটোরিয়াম' নামক প্রাণীর দেখা পেলে তাকে অবিলম্বে গ্রামাঞ্চলে চালান করতে হবে। এতে পরিবেশ দুষণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(গ) এটিই শেষতম প্রকল্প—শহরের কোনো বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং বা পোস্টারে 'অশ্লীল' বক্তব্য বা চিত্র থাকলে তা মুছে ফেলা হবে।

সাধারণ শুধু লিখে জানান—উক্ত সুরটি কেমন শুনতে? প্রাণীটি ঠিক কীরকম দেখতে? এবং অশ্লীলতার প্রকৃত সংজ্ঞা কী? শ্লীল এবং অশ্লীল-এর মধ্যে পার্থক্যটাই বা কোথায় কোথায়? বহু টাকার এই প্রকল্পগুলি গৃহীত হয়ে গেলেও এদের প্রকৃত অর্থ এখনো পৌরসভার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আপনারা অবিলম্বে লিখে জানান। শ্রেষ্ঠ লেখাটির জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। নাম, ঠিকানা, বয়স, জুতোর নম্বর গলার মাপ এবং কী কী খেতে ভালোবাসেন লিখে জানাতে ভুলবেন না।

—সুস্নাত চৌধুরী

রাজনৈতিক দলগুলি ও তাঁদের নেতা নেত্রীদের কাছে এই বন্যা বিশেষ আশীর্বাদ স্বরূপ হইয়া দেখা দিবে। এই বন্যার জন্যই বেশ কিছু পার্টিদাদার সম্পত্তি ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে।

ভজহরির ভবিষ্যৎ দর্শন

বিষ্ণুজ্যোতি রায়

চেতলা ব্রীজের সঙ্কীর্ণ ফুটপাথে বসিয়া বিশেষ পদ্ধতিতে পুরিয়া সেবন করিয়া মুখ তুলিয়া ভজহরি দেখিল তাহার সম্মুখে ব্যাঘ্র চর্ম পরিহিত ত্রিশূল ও ডমরুধারী বাবা ভোলানাথ দণ্ডায়মান। তিনি উৎসুক দৃষ্টি দিয়া পাতাখোর ভজহরির পুরিয়া সেবন দেখিতেছিলেন। ভজহরি মুখ তুলিতেই বলিলেন, বৎস, তোমার হস্তে ঐ শ্বেত কণিকাগুলি কী বস্তু, যাহার ধূম্র পান করিয়া নিমেষের মধ্যেই তোমার মন এমন উৎফুল্ল ও শরীর এরূপ সতেজ হইয়া গেল?

ভজহরি কহিলেন, দেব, গোদা বাংলায় ইহাকে আমরা পাতা বলিয়া থাকি। সাহেবি ভাষায় বলা হয় হেরোইন। ইহা ছাড়াও চরস ব্রাউনসুগার কোকেন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মানের মাদকদ্রব্য আপনি আমার নিকটে পাইবেন। যাহা আপনার গঞ্জিকা সিদ্ধি ধুতরা হইতে বহুগুণ উৎকৃষ্ট ও মনোরঞ্জক। আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই আপনাকে আমি উপহার স্বরূপ দিতে পারি। বলিয়াই ভজহরি তাহার জিন্সের পকেট হইতে একটি পুরিয়া বাহির করিয়া ভোলানাথের শ্রীহস্তে প্রদান করিল।

ভোলানাথ পুরিয়া পাইবামাত্র তাঁহার ঝোলা হইতে গঞ্জিকা ও সিদ্ধি সেবনের যাবতীয় উপকরণ আদিগঙ্গার বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। গদগদ চিত্তে বলিলেন, বৎস, একদিন আমিই তোমাদিগকে গঞ্জিকা সিদ্ধি ও ধুতরা সেবন শিখাইয়া ছিলাম। এখন যুগ পাল্টাইয়াছে। আমি গঞ্জিকা ও সিদ্ধিতে পড়িয়া থাকিলেও তোমারা প্রভূত পরিমাণে উন্নতি করিয়াছ। তাই অদ্য তোমার নিকট হইতে পুরিয়া সেবনের হস্তাগ্নী হইল। আমি ধন্য হইলাম। বিনিময়ে আমি তোমাকে দিব্যশক্তি দিতেছি, যাহার বলে তুমি যে বিষয়ের উপর চিন্তা করিবে তার ভবিষ্যত অবলোকন করিতে পারিবে।

ভজহরি নমস্কার করিল। ভোলানাথ হাসিতে হাসিতে পরমানন্দে অন্তর্হিত হইলেন।

ভজহরি আরো একখানি পুরিয়া বাহির করিয়া তাহা বেশ আমেজ পূর্বক সেবন করিয়া কিয়ৎকাল পর রক্তিম চক্ষু উন্মীলিত করিয়া যাহা দেখিল এই অধম তাই তাহার জবানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

'মুখোশের আড়ালে নয় মুখোমুখি' হইতে শুরু করিয়া ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় করে না বা 'পড়তে হয় নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়' গোছের সব সংবাদ পত্রের শিরোনামে বাংলার বিধ্বংসী বন্যা। গতবারের মতো এবারেও হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাইবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন ও নিসম্বল হইবেন। এই সুবর্ণ সুযোগে যে সব নেতা ও নেত্রীর নাম খবর কাগজ

ওযালার ভুলিয়া গিয়াছিলেন তেনারা আবার নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া বানভাসিদেব অশেষ দুর্গতি অবলোকন করিয়া পরম আনন্দ পাইবেন। চিড়িযাখানায় আমবা যেমন বন্দী পশুপাখিদের ঘাস পাতা ছুঁড়িযাদিই সেইরূপ তেনাবাও জলবন্দী মানুষ দিগকে ত্রাণ সামগ্রীব নামে যৎসামান্য খাদ্যবস্তু ও ছেঁড়া ফাটা ত্রিপল, পরিধানেব অযোগ্য নিকৃষ্ট মানেব বাতিল বস্ত্রখণ্ড ছুঁড়িযা দিয়া স্বমহিমায় নিজ নিজ ছবি ও নাম সহ সংবাদপত্রের শিরোনামে ফিবিয়া আসিবেন। এই ইভেন্টকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক দলগুলি আবাব পুবানো প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় শুরু করিয়া দিবেন।

রাজনৈতিক দলগুলি ও তাহাদের নেতা নেত্রীদের কাছে এই বন্যা বিশেষ আশীর্বাদ স্বরূপ হইয়া দেখা দিবে। এই বন্যার জন্যই বেশ কিছু পার্টিদাদাব সম্পত্তি ফুলিযা ফাঁপিযা উঠিবে। তাঁহারা ত্রাণ সামগ্রী বিলি বন্টনেব নামে নিজের নিজের আখেব গুছাইয়া লইবেন। এবং জনগণকে বুঝাইতে পারিবেন যে কেন্দ্র তাঁহাদের সহিত কীরূপ বৈমাত্রেয আচরণ কবিতেছে। অতএব কেন্দ্রীয সরকারের পদত্যাগ চাই। এতদোপলক্ষে মহানগব সহ বেশ কযেকটি জেলাতে মিছিল ও মহামিছিলের আযোজন কবা হইবে। পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা দফায় দফায় বৈঠকে বসিবেন। এবং কেন্দ্রীয সরকাবের বিরুদ্ধে একটি হুলুস্থুলুস কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন।

অপব দলনেত্রী তখন আব এই জলমগ্ন বাংলায় থাকিবার রিক্স্ লইবেন না। তিনি বিমান যোগে দিল্লি যাইযা বন্যার্ত মানুযদেব জন্য কাঁদিযা কাটিযা রাজধানী ভাসাইবেন। এবং এই বন্যা বাজ্য সরকারেব নিজ হাতে সৃষ্ট বা ম্যান মেড অ্যাখ্যা দিযা লাগাতার আন্দোলনে নামিবেন। ভুখা হবতাল কবিবেন। রাজ্য সরকারের মুণ্ডুপাত করিয়া এই সরকাবেব ক্ষমতায থাকিবাব যৌক্তিকতা লইযা প্রশ্ন তুলিবেন। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এই ডামাডোলেব বাজারে লাল বাড়িটি দখলের জন্য দিবা স্বপ্ন দেখিবেন। আব বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান হীন লক্ষ লক্ষ মানুষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিবেই থাকিবে।

অধুনা হকার উচ্ছেদ লইয়া বড় গোল শোনা যাইতেছে। হকার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলি তাঁহাবা একটু সাবধানে থাকিবেন। যদিও পুরসভা বাস্তা সাফ করিয়া দিযা বাজ্য সরকাবের সুবিধা করিয়া দিক তাহা অনেক নেতা ও নেত্রী চাহেন না তবুও যেহেতু এখন নেতাদের সম্মুখে কোনো নির্বাচন নাই তাই উচ্ছেদ করিতে এখন কারো হস্ত কম্পিত হইবে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে উচ্ছেদ হইয়া গেলে অনেক বিবোধী ও স্ববিরোধী নেতা ও নেত্রী পাইবেন যাঁহারা তাহাদেব (হকার ভাইদের) দুঃখে অনেক কুম্ভীবাশ্রু বিসর্জন করিবেন। ময়দানে দাঁড়াইযা চিৎকার কবিয়া গলা দিযা রক্ত তুলিবেন। কিন্তু হকাব ভাইদের অবস্থার কোনো উন্নতি হইবে না। তাহাবা নিজ নিজ রুজি হাবাইবে। পুত্র কন্যা স্ত্রীব দারিদ্র্য ক্লিষ্ট মুখগুলি দেখিতে না পারিযা কেহ কেহ আত্মহত্যা করিবে। কেহ কেহ অন্ধকাব পথে প্রবেশ করিবে। তবে আপনারা ধৈর্য্য হারাইবেন না। কষ্ট করিয়া দুই চার মাস অতিবাহিত করিবেন। যতক্ষণ না আবার একটিনির্বাচনের গাড্ডায় পড়িয়া আমাদের নেতা ও নেত্রীগণ দিশাহারা হইতেছেন। নির্বাচন বা ভোট উৎসব সম্মুখে আসিলেই তাহারা আবাব নিজ নিজ পসরা সাজাইতে পাবিবে।

আপনাদেব শবীর ও স্বাস্থ্যের বিষয়েও আমি খুব একটা শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। আকাশে বাতাসে দেখিতেছি ম্যালেরিয়া আন্ত্রিক কলেরা ডেঙ্গুর জীবাণু মহানন্দে ভাসিযা বেড়াইতেছে। তাহারা বাংলার এই উর্বর পরিবেশে বারোমাসে তেরো পার্বনের মতোই একটির প্রকোপ শেষ হইলে আবেকটি আসিয়া আক্রমণ করিবে। এবং গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায দু-একটি অজানা রোগের প্রকোপ দেখা যাইবে এবং যাহার প্রকৃত স্বরূপ চিহ্নিত করিতে ভাবতীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিককূল হিমসিম খাইযা 'হু' এর স্মরণাপন্ন হইবেন। বিদেশ হইতে চিকিৎসকদল আসিয়া পরমানন্দে ভারত ভ্রমণ করিয়া ভারতকে বিস্তর গালমন্দ করিযা একটি করিয়া পুস্তক রচনা করিবেন। এবং বোগের নামকরণ অনুষ্ঠান হইবাব আগেই বেশ কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করিবেন। আব আপনারা সাধারণ মানুযেরা সংবাদপত্রে বোগেব ভযাবহ পরিণতির কথা পাঠ করিয়া নিজেদেব জীবনের সুবক্ষার ভাব বিধাতাব উপর সমর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্তে হাই তুলিযা ঘুমাইতে যাইবেন।

আমাদেব বাজ্য সবকার পঁচিশ বৎসব ধরিয়া প্রাইভেট বাসের মতো বাম পাশ দিযা ল্যাংড়াইয়া ল্যাংড়াইয়া চলিতে চলিতে খেয়ালও করেন নাই যে, অন্য বাজ্যগুলি কখন শিক্ষাস্বাস্থ্য ও শিল্পের স্টপেজগুলিতে ওভারটেক করিয়া আগাইযা গিযাছে, তাই এই রাজ্যের বাসিন্দারাও প্রাইভেট বাসের আরোহীদের মতোই চবম দুর্ভোগেব শিকার হইবেন। এবং বাসে বসিয়া কণ্ডাকটর ও ড্রাইভারকে বিস্তর গালমন্দ করার মতোই সবকারকেও গালমন্দ করিযা গলদঘর্ম হইবেন। তথাপি শাসকেরা উক্ত বাস ড্রাইভাব ও কণ্ডাকটরের মতোই উদাসীন রহিবেন এবং রেড সিগন্যাল ছাড়া আব কিছুই বুঝিবেন না।

তবুও প্রাচীন কালে শখের শিকারীবা যেরূপ ব্যাঘ্র শিকারের নামে বনে বনে প্রমোদ ভ্রমণ করিযা বেড়াইতেন, তেমনি আমাদেব নব মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতি পাকড়াও কবিবাব নামে জনগণেব পযসায় দু চারটি দেশে প্রমোদ ভ্রমণ করিযা আসিবেন। আমাদেব বৃদ্ধ বাজা স্বাস্থ্যেব কারণে রাজ্যেব শাসনভার হইতে মুক্তি লইলেও দিল্লি মসনদে আসিন হইবার কল্পে বেশ কিছু দলেব সহিত জোট বাঁধিযা ঘোঁট পাকাইবার চেষ্টা কবিবেন।

দিল্লির শাসকেরাও কিছু কম যাইবেন না। এলোমেলো করে দেমা লুটেপুটে খাই নীতিতে বিশ্বাসী হইযা ছটোপুটি লাগাইযা দিবেন। আগের বছর যদিও বা কিছু কম কম ডট কম কেলেঙ্কারি হইয়াছিল এবার আব কম কম ডটের অবকাশ বাখিবেন না। জনগণের মনে বড় বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া কেলেঙ্কাবিয়াস কাণ্ড বা ঘোটলা ঘটাইয়া তাহেলকা মচাইযা দিবেন।

বেকাব যুবকেরা সাবধানে থাকিবেন। দেশেব অবহেলিত বিবাট যুবশক্তির উপর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের লোলুপ দৃষ্টি রহিযাছে। তাই রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ভাইদেব বিশেষ গুরুত্ব দিবে। তাহাদের হস্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের পরিবর্তে বড় বড় বন্দুক ধরাইয়া কেশপুর গড়বেতা অভিমুখে চালিত করিবেন। অতএব সাবধান।

কাহারো কাহারো যুবভারতীর শীততাপ নিযন্ত্রিত যুব আবাসে বাস কবিবার বাজকীয ব্যবস্থা থাকিবে। তাহারা কিযৎকাল পরম সুখে দিবস যাপন করিবে। কিন্তু পরিশেযে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া কাবাগারের অন্তবালই তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ হইবে। যে নেতার ছত্রছায়ায তাহাদের এই অধঃপতন, যে নেতা নিজ হস্তে তাহাদেরকে অস্ত্র তুলিযা দিযাছিলেন, তোলা আদায কবাইয়াছিলেন, মানুব খুন কবাইযা ছিলেন, ভোটের সময বুথ দখল কবাইয়া রিগিং করাইযা ভোটে জিতিযাছিলেন, সেই তিনিই সংবাদপত্রে তাহাদের ছবি দেখিয়া আব চিনিতে পাবিবেন না। অতএব সাবধান। নির্বাচন আসিলেই কোনো নেত্রী আবাব একশ কোটি বেকার যুবককে চাকরি দিব বলিযা বেকাবদের অমূল্য ভোটগুলি নিজ ভোট যন্ত্রে টানিয়া লইযা ভোটে জিতিয়া মন্ত্রীত্ব পাইয়া সব প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলিযা মারিয়া দিবেন। অতএব সাবধান।

হঠাৎ ভজহরির সম্মুখে সমস্ত কিছুই ঝাপসা হইয়া আসিল। সে ক্রমশই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইযাপড়িল। সম্মুখে এই কালঘোর অন্ধকারের ঘনঘটা দেখিয়া ভয় পাইযা চক্ষু মুদ্রিত করিযা দুই হস্ত দিযা মুখ ঢাকিল। বুঝিতে পারিল না যে এই ঘন অন্ধকার তাহার নেশা হ্রাস পাইয়া দিব্যশক্তি লোপ পাইবার সঙ্কেত নাকি ইহাই আমাদেব ভবিষ্যৎ।

কি তেল ? কেয়োকার্পিন of course। এত হাল্কা লাগাতে না লাগাতেই মিশে যায়। সারাদিন একটা দারুন হাল্কা অনুভূতি। আর একদম চিটচিটে নয়। কি, বোঝা যাচ্ছে তেল মেখেছি ?

With Best Compliments From :—

KISHAN SATHI MITTAL AGRO FOOD PVT. LTD.

Manufacturer of Agricultural Implements & Plant Protection Equipments

23, N.S. Road, 4-Commercial Building, 1st Floor.
Calcutta - 700001
Phone No : 221-0025

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসি
২য় বর্ষ ।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পত্রপা

জানুয়ারি ২০০২
বিদায় নেবার জ
দাম ; ৭ টাকা

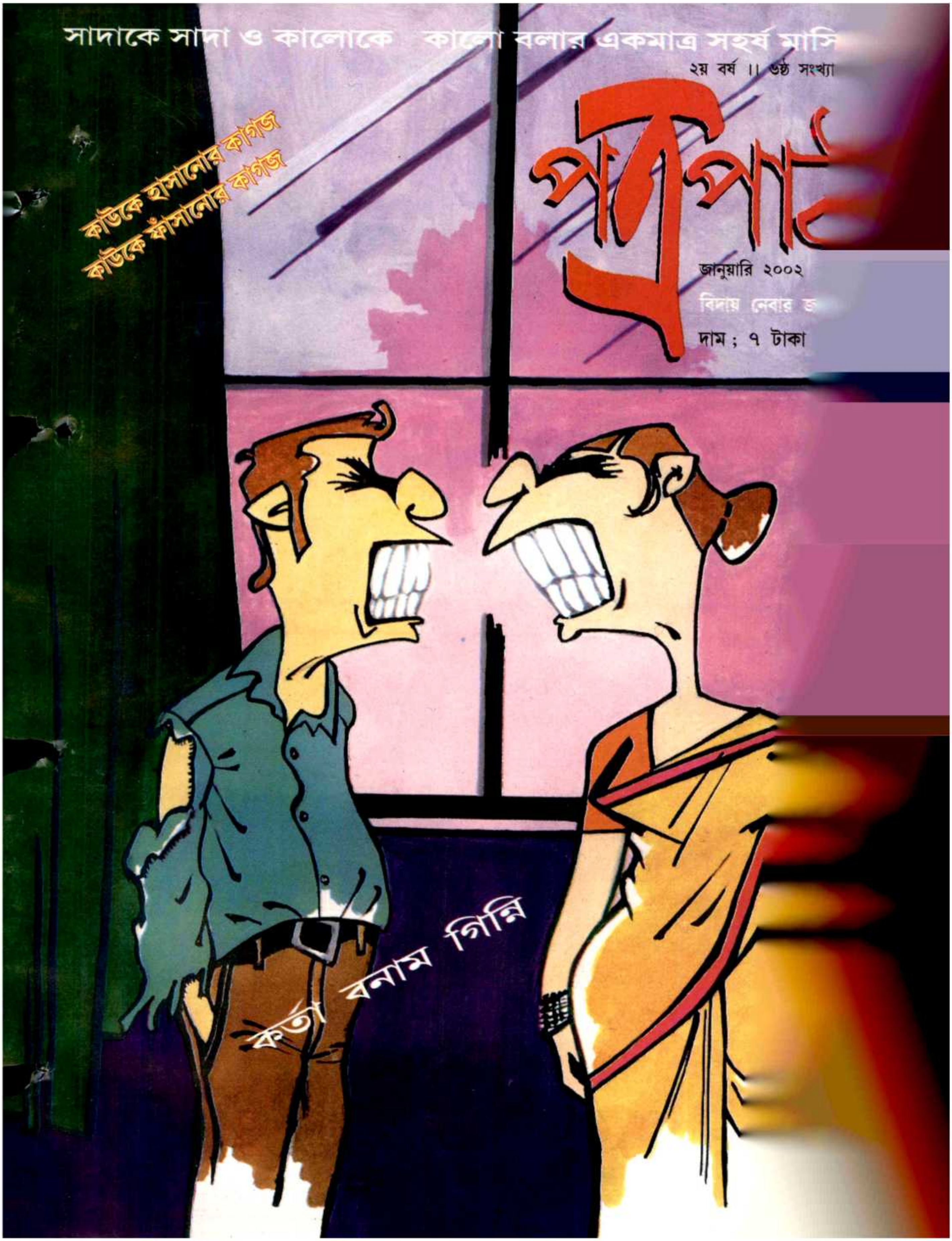

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

কর্তা বনাম গিন্নি

N. C. DAW & Co.

Gun Makers

Since 1835

9, B. B. D. BAG (EAST)
KOLKATA-700 001
220-6643/4317

ডি. টি. পি, অফসেট ছাপা, যে কোনো ধরনের বই ও পত্রিকা দায়িত্ব সহকারে সম্পূর্ণ ভাবে তৈরি করার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দেবী সারদা প্রেস

৩০/এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯, দুরভাষ: ২৪১-৭৬৫৩

জানুয়ারি ২০০২

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহৃর্ষ মাসিকপত্র

পত্রপাঠ

দাম: ৭ টাকা

২য় বর্ষ।। ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয় □২ মহিলা মহল □১০ পত্রপাঠ জবাব □১১ রাশি চক্কোর □১৩ সংস্কৃতি দুঃসংবাদ □১৮ শিক্ষা দুঃসংবাদ □২৩ টীকা নিষ্প্রয়োজন □২৬ ধাবাবাহিক কবিতা □২৯ সাহিত্য দুঃসংবাদ □৩৫ চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ □৩৭ জবর খবর □৪১ হেঁসেল□৪৮

প্রচ্ছদ কাহিনী কর্তা বনাম গিন্নি • দিব্যেন্দু পালিত-কল্যাণী পালিত, চুনী গোস্বামী-বাসন্তী গোস্বামী, জয়ন্ত সেন-অরুণা সেন, শৈবাল গুপ্ত-বিদ্যুৎপর্ণা গুপ্ত □৪ ও যে মানে না মানা • কমল কুমার দত্ত □৩৪ গাড়ির গায়ে কর্তা-গিন্নি সম্বাদ • গৌতমকুমার দে □৩০ বিবি ঘটিতং • মুসুমুসু কলমচি □৩৬

গল্প চা চেয়ে চিত্তির • পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী □৪৪ ৭৫ তম বিবাহ বার্ষিকী • সত্যবান মিত্র □২৮ Duo থেকে Duel • সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □৩৮

নিয়মিত রচনা অকপটে • সমরেশ মজুমদার □৮ নারদ মুনির প্রতিবেদন • প্রভাত বাগচী □১৪ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি □২৪

পুরনো কাসুন্দি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" (দ্বিতীয় পর্ব) থেকে □১৯

নতুন কাসুন্দি পিনাকী ভাদুড়ীর "অবকাশে নিযুক্ত আছি" গ্রন্থ থেকে □২১

রসনাট্য বিবাহ বার্ষিকী • সনৎকুমার মিত্র □৩২

রম্যরচনা সন্টুর কীর্তি • কাজি সারিন আফরোজ □৪৩

বিদায় নেবার জন্য নয়

হোম ফ্রন্টের যে লড়াই, তা নিতান্ত টপ্ সিক্রেট। শতং বদ মা লিখ। আর কাগজের লোকের কাছে তো একেবারেই মুখে কুলুপ। অতীব সতর্ক। তবু হাঁড়ির খবর একটু-আধটু জুটে যায় বই কি। হোম ফ্রন্টের পেনাল্টি এরিয়ায় ফাঁকা বল পেলেও চুনী গোস্বামী মুখে কুলুপ; কিংবা উপন্যাসের প্লটে নয়, নিজেদের ফ্ল্যাটে রেগে গিয়ে চ্যাচাচ্ছেন দিব্যেন্দু পালিত; অথবা বিখ্যাত শল্যবিদ জয়ন্ত সেনের স্ত্রী তাঁকে আখ্যা দিচ্ছেন 'বিষ পিঁপড়ে' কিংবা প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ শল্যবিদ শৈবাল গুপ্ত অকপটে স্বীকার করছেন, স্ত্রী রেগে গেলে চোরের মতো থাকেন।— ভাবা যায় !!!

৪

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : পল্লব চক্রবর্তী
কর্ম সহায়ক : কৌশিক রায় • অচ্যুতকুমার সিংহ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী
ডাঃ বিপাশা সেন • শচীন মিত্র • দেলওয়ার আলী

সম্পাদকীয় দপ্তর . ১০ বি, ফার্ণ রোড, কলি-১৯ ফোন : ৪৬৫ ০০৪১ (দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। রবিবারও ছুটির দিন বাদে)
শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । ফোন : ৪৪০-৩৮০৩

সম্পাদকীয়

নারী-পুরুষ

গৌরী সম্‌ঝে ভসম্‌ভার, পিয়ারি সমঝে কালা।
শচী সম্‌ঝে সহস্রলোচন, বীর সম্‌ঝে বীরবালা।।

বারবার 'সম্‌ঝে' দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, পুরাকালে রমণীগণ কর্তাকে বিলক্ষণ সম্‌ঝিয়া চলিতেন। এই তিন-চারি দশক পূর্ব অবধি কর্তার ইয়া গোঁফ আর বাজখাঁই গলার ভূকম্পে তটস্থ হইয়াই গৃহিণীগণ গর্বিত বোধ করিতেন। এখন দিন আসিয়াছে নিজে তটস্থ হইবার পরিবর্তে কর্তাকেই ঘটস্থ করার। তারপর এই Live টুগেদার। হাম দো, হামারে No. এবং দুই-চারি মাসে আহ্লাদ মিটিয়া গেল তো ঘরের ছেলে ঘরে Go. ইহার উপরে আছে যুগ-হুজুগে নারীবাদীদিগের অবিরাম তর্জন-গর্জন। নেলসন ম্যাণ্ডেলার দীর্ঘ কারাবাসের কালে তাঁহার ধর্মপত্নী উইনি ম্যাণ্ডেলা বিপুল বিক্রমে তাঁহার মুক্তির জন্য আন্দোলন গড়িয়াছেন। মুক্ত হইয়া, ক্ষমতায় বসিয়া নেলসন কী করিয়া সেই উইনিকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন? ইহার কারণ হিসাবে নারীবাদীরা বলেন, পুরুষের চিরাচরিত নারী-বঞ্চনা। পুরুষবাদীরা হয়ত বলিবেন, উইনি গলা ফাটাইয়া ফাটাইয়া এমন অভ্যাস করিয়া ফেলিযাছিলেন যে তাহা আর কমানো যাইতেছিল না এবং নেলসন নিতান্তই কর্ণপটহ রক্ষার খাতিরেই এই কাজ করেন। বস্তুত, মহাদেব বালিকা দুর্গাকে বিবাহ না করিলে, তাঁহার রণচণ্ডী রূপটি দেখিবার পর আর বিবাহ করিবার সাহস দেখাইতেন—এমন কথা কোন মূর্খ নিঃসংশয়ে বলিবে?

তেমনই পুরুষ যখন নিতান্ত কোমল হইয়া পড়ে, তখন কোন্ নারীই বা সেই ললিতলবঙ্গলতা (পুং) এর ঘর করিতে চাহিবে? পুরুষের কিঞ্চিৎ পৌরুষ থাকিবে, নারীর রমণীয় নারীত্ব—তবেই প্রজাপতির নির্বন্ধ ধোপে টিকিবার পথ খুঁজিয়া পায়! কিন্তু নারীর জাগরণ, অগ্রগতি নাকি এমনই দুরন্ত গতিতে ছুটিয়াছে যে নারী পুরুষকে বিবাহ করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর হইবে এবং পুরুষও মরণপণ ভিটা ছাড়িয়া এককদম অগ্রসর হইতে চাহিবে না—এমন মহাযুদ্ধের শুভদিন নাকি সমাগত প্রায়। কে জিতিবে বলা ভার। আপাতত কর্তা-গিন্নিগণ এই তর্কে নিজ নিজ অন্তঃপুরে পরস্পর রশি টানাটানি শুরু করতঃ এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে ব্রতী হইতে পারেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগের সহায় হউন।

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

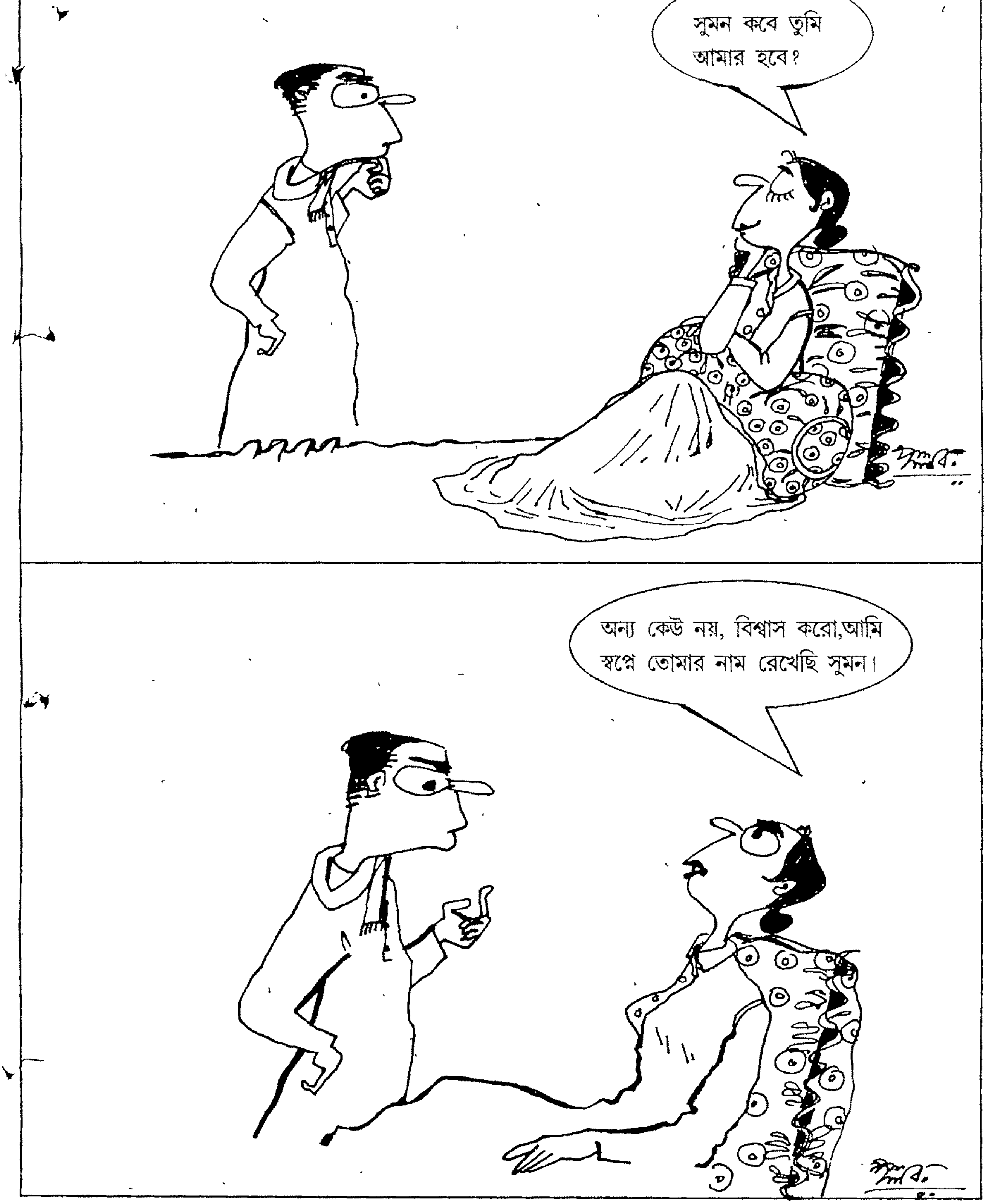
সুমন কবে তুমি আমার হবে?
অন্য কেউ নয়, বিশ্বাস করো,আমি স্বপ্নে তোমার নাম রেখেছি সুমন।

কর্তা বনাম গিন্নি

রাগের কারণ ঘটলে কখনো-সখনো আমিই বেশি চ্যাঁচাই।

দিব্যেন্দু পালিত

সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়নি বলে কোনো অভাববোধ—তেমন সুযোগেই ঘটেনি। প্রেমজ বিয়ে হলেও—দুই পরিবারের ইচ্ছা ও মতে শাস্ত্রীয় মতেই বিয়ে হয়েছে। অগ্নিসাক্ষী, মন্ত্রপাঠ—সবই ছিল। কলকাতায় এদের বাড়ির অনুষ্ঠানে বহু মানুষ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নেরও বেশ ভালো ব্যবস্থা ছিল। আমাদের বউভাতের অনুষ্ঠান হয় ভাগলপুরে। মা তখন ভাগলপুরেই থাকতেন।

কে বেশি মাথাগরম করে—এটা তো রাগ-পরিমাপক যন্ত্রে ধরা পড়বে। আমি সাধারণত এড়িয়ে থাকি, তবে, নিজের পক্ষে রাগের কারণ ঘটলে কখনো-সখনো আমিই বেশি চ্যাঁচাই। তবে সেটা খুব অল্প সময়ই ঘটে। শান্তি চলে আসতে দেরি হয় না। ও রেগে গেলে করার আর কী আছে? সাধারণত জবাব দেবার থাকলে দিই, নইলে চুপ। এটার ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ওয়াক আউট খুব একটা ঘটে না। তবে হঠাৎ কোনো কাজের কথা মনে পড়লে, সেই কাজের কারণেই বেরিয়ে যেতে হয়, রাগের কারণে নয়। ভয় করি না ওকে। ভয় করব কেন?

বিবাহপূর্ব জীবনের প্রেম এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বিবাহ পরবর্তী জীবনে কোনো গণ্ডগোল না ঘটলে সেই প্রেমই অন্য রূপ ধরে ভালোবাসা, মায়া, পরস্পর নির্ভরতা—ইত্যাদি আকর্ষণে পরিণত হয়। তখন প্রেমের উচ্চকিত প্রকাশ না থাকলেও পারস্পরিক হয়ে থাকে। ভাবনা, দায়দায়িত্ব, এটা নিজে থেকেই সৃষ্টি হয়ে যায়।

একটা ঘটনা বলি। বিবাহপূর্ব জীবনে, একবার ডবল ডেকারের দোতলায়, এসপ্ল্যানেড থেকে দক্ষিণ কলকাতায় আসবার সময় কিছুদূর এগিয়ে আমার পাশের খালি সিটে যিনি এসে বসলেন, এবং আমার হাতে ঘড়ি আছে দেখে কটা বাজে, জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আমার ভাবী শ্বশুরমশাই, তা চিনতে আমার মোটেই অসুবিধা হয়নি। ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলতেন। অনেক সময় গায়ে পড়ে আলাপ করতেন। উনি আমাকে চিনতেন না। হাসিখুশি এই মানুষটি সেদিন যেতে যেতে আমাকে সাদাসিধে দু'চারটি প্রশ্ন করলেও আমি খুবই আতঙ্কিত সময় কাটিয়েছি, পাছে পরিচয়ে ধরা পড়ে যাই।

কল্যাণী পালিত

৩৭ বছর বিয়ে হয়েছে। সম্বন্ধ করে নয়। তবে চেনা। কিন্তু বাড়ি থেকে দিয়েছে। প্রেম করেই বিয়ে। আলাপ হয়েছিল নিজেদেরই। সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়নি বলে কোনো আক্ষেপ হয় না। এর থেকে সম্বন্ধ করে বিয়ে হলে হয়ত খারাপই হত। অন্য অনকের ঘটনা যা শুনি। এই হয়ত আড্ডা মেরে দেরি করে ফেরে—এখন খুব রাগি না অবশ্য, কারণ আমারও তো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে গিয়ে দেরি হয়।

ওর ওপর রাগ হলে খুব বেশি কিছু করি না। প্রথমে মনটা খারাপ হয়ে যায়। তখন চুপ করে বই পড়ি বা টিভি দেখি বা গান শুনি। তখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যায়—মনে হয় এত সামান্য কারণে এত রাগ করা ঠিক হয়নি।

ও এমনিতে একটু কম কথা বলে। রাগ হলে আরো গম্ভীর। তখন চুপ করে থাকাই ভালো। একটু পরে ঠিক হয়ে যায়। আগে যখন ইয়ং ছিলাম দু-একটা কথা বলতাম। এখন বয়েস হচ্ছে তো, চুপ থাকাই সেফ।

তখনো বিয়ে হয়নি। শালোয়ার-কামিজ পরতাম। কিন্তু ইউনির্ভাসিটিতে শাড়ি পরা শুরু করেছিলাম। একদিন বন্ধুদের সঙ্গে নিচে নেমেছি। হঠাৎ খেয়াল হল, শাড়িটা খুলে যাচ্ছে। তখন ওকেই বললাম। কেন জানি না অতজনের মধ্যে ওকেই ভরসা করতে পারলাম। ট্যাক্সি করে নিয়ে চলল আমাকে। ট্যাক্সিতেই বোধহয় শাড়িটা ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম। এভাবেই আলাপ গভীর হয়। পুরো জীবনটাই কৌতুকের। ওর সেন্স অফ হিউমার খুব বেশি। ট্যাক্সিতে ঘোরানো দিয়ে শুরু হলেও, বিয়ের পর সারা ভারতই ঘুরিয়েছে প্রায়। বিদেশেও বহু স্থানে বেড়াতে নিয়ে গেছে। এভাবেই কেটে যাচ্ছে।

বিজলি গ্রিলে দিব্যেন্দু মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে খেতে যেত। বাবাদের "মিলনী" বলে একটা ক্লাব ছিল, সেখানেও বিজলি গ্রিলের দেবুদা খাবার দিতেন। আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে, ওঁরাই খাবার দেবেন। মালিক দেবু বারিক একদিন বাড়িতে এসেছেন—আমার বিয়ের খাবারের মেনু ঠিক করতে। আমাকে দেখে খুব মন খারাপ, কেন না—আমি তো অন্যের সঙ্গে প্রেম করি। একদিন খুব আপসেট হয়ে দিব্যেন্দুকে ডেকে বললেন, ইয়ে—আপনি যে মেয়েটির সঙ্গে আসতেন, তার তো অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কোনো চেষ্টা করলেন না কেন? তারপর সব শুনেটুনে আবার তাঁর মুখে হাসি ফুটল।

চুনী গোস্বামী

আমার স্ত্রী-র সঙ্গে রাগারাগি? না ভাই। এখনো সেরকম কিছু হযে ওঠেনি। উনি খুবই শান্ত, ভদ্র স্বভাবের মহিলা। তবে হ্যাঁ, রাগারাগি হলে হোম ফ্রন্টে দু'পক্ষেবই বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। তখন মুখেব পেনাল্টি এরিয়াতে কুলুপ এঁটে যে যার নিজের গোলপোস্ট সামলাই। তবে কথাটা হল কি, সমাজে এখনো তো আগে আগে পা ফেলে পুরুষেরাই চলে। তাই বাগ হলে আমাবই মেজাজ আর মুখে গোমড়া ভাব থাকে বেশি।

বিয়ে কবে হযেছে? তা প্রায় একশ—থুড়ি, ছত্রিশ বছর হল। মিথ্যে বলব না—সাতপাক ঘোরার আগে পাঁচ বছর ধরে অনেক জাযগাতেই একসঙ্গে ঘোরাঘুবি কবেছি। অমন ভালো মেয়ের সঙ্গে প্রেম না করে পারা যায়?

রাগারাগি হলে বেশিক্ষণ বাগ করে থাকতে পারি না। রাগ হলে আমাদের মধ্যে প্যাসিভ ভযেসে, মানে ভাববাচ্যে কথাবার্তা হযে থাকে। তবে হ্যাঁ, বাগাবাগি হলে ঘবেব আবহাওয়া অনেকটা থমথমে হয়ে যায়। তখন ভয হয—এই বুঝি ঝড় বয়ে গেল।

দু'জনের মধ্যে বাগাবাগি, মনকষাকষির মজার স্মৃতি? সেরকম কিছু এ মুহূর্তে মনে করে উঠতে পারছি না। দু'জনে তিন যুগেব বেশি সময ধবে একে অপবকে চিনি। আমাদের দু'জনের কাছে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই যথেষ্ট আনন্দের, আবেগের এবং একে অপরকে বুঝতে পারাব।

ফুটবল খেলা নিয়ে দেশে-বিদেশে একসময় খুবই ব্যস্ত ছিলাম। এখনো খেলাধূলার প্রশাসনিক জগতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা আছে। জীবনে সবসমযই ব্যস্ততা। হযত অনেক ক্ষেত্রেই আমার স্ত্রীকে সময দিতে পাবিনি। তবুও কোনোদিন ও অভিযোগ কবেনি। কোনো বড় চাহিদাও নেই আমাব স্ত্রী-র।

রাত দশটায় উনি যখন বাড়ি ফিরে হাঁকডাক করেন, তখন পাড়ার লোকের মালুম হয়— হ্যাঁ, এবার চুনী গোস্বামী এসেছেন।

বাসন্তী গোস্বামী

প্রেম করে আমাদের বিযে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু বিযেব আগে থেকেই আমাব আর ওনার পবিবাবেব মধ্যে ভালোই আলাপ ছিল। আর ঝগড়া? না না—ওরকম দিলখোলা, স্বচ্ছন্দ, মানুষের সঙ্গে কখনোই কথা কাটাকাটির ড্রিবলিং, আউটসাইড ডজ—এসব সম্ভব নয়। আমি সেকেলে মেযে। জানতাম ওনার ফুটবল জীবন কতটা ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। উনি তো আর দশটা পাঁচটাব কলমপেষা অফিসে কাজ করেননি কোনোদিনই। তবে, ফুটবল খেলার জন্য সাধ-আহ্লাদ কোনোকিছুই আমাকে ছেড়েছুড়ে দিতে হযনি। অনেক দেশ ঘুবেছি ওব সঙ্গে। কোনো বাঙালি মেযের পক্ষে অতো দেশ ঘোরা অসম্ভব। তবে, সিনেমা দেখতে হযেছে সবই নাইট শো-তে। দিনেব বেলা ফুটবল খেলা আব অন্যান্য কাজকম্মো নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন উনি।

ঝগড়া আমাদের মধ্যে হযই না বলা চলে। তবে, ঝগড়া হলে, পরিবেশের তাপমাত্রা চড়ে গেলে আমি নিজেই চুপ হযে যাই। আমাদের যৌথ পরিবার। ওপরেব ফ্ল্যাটে থাকেন শ্বশুর, দেওর। আমার নাতি আছে। তার যত দুষ্টুমি আর আব্দাব ওনার কাছে, অর্থাৎ দাদুব কাছেই। আমাব শাশুড়ি-মা এখনো বেঁচে। বযস প্রায় একানব্বই হল। তিনি কোনোদিনও আমাদেব ঝগড়া করতে দেখেননি।

মজাব স্মৃতি? সেরকম কিছু বিশেষ মনে পড়ছে না। একরাব বাতে দু'জনেব মধ্যে খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল। আমার ছেলে এমনিতেই খুব শান্ত। শুনতে পেলাম, সে, শোবার ঘর থেকে বাবাকে বলছে—"আঃ, বাবা, চুপ করো না। মা বেশিক্ষণ কথা বলতে পাববে না।" তখন উনি খুব কষে ধমকে দিলেন ছেলেকে,—" তবে রে ব্যাটা? মা-র হযে চামচেগিরি করা হচ্ছে!"

আব একবাব, মোহনবাগানের প্লাটিনাম জুবিলিতে উনি ক্লাবের হয়ে সফররত হাঙ্গেবির তাতাবানিয়া ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলছেন। তখন আমাদের সবে বিযে হযেছে। গ্যালারিতে তখন সবাই ওনাকে লক্ষ্য করে চেঁচাচ্ছে—"গুরু, গুরু, কি খেলাটাই না দেখালে। গুরুমা কি এখানে আছেন? আমার চারপাশে মোহন বাগানেব সব বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তাব্যক্তি বসে আছেন। বাড়ির গুরুজনবাও আছেন। লজ্জায় আমার তো কান লাল। সেখান থেকে তখন পালাতে পাবলে বাঁচি।

ওনার গলার আওয়াজ এমনিতেই নিয়ন্ত্রিত শব্দেব মাত্রা ছাড়িযে যায়। বাত দশটায় উনি যখন বাড়ি ফিবে হাঁকডাক কবেন, তখন পাড়ার লোকের মালুম হয়—হ্যাঁ, এবার চুনী গোস্বামী এসেছেন।

ডাঃ জয়ন্ত সেন

আমি তো সবসময়ই চুপচাপ। বই কেনা এবং বই পড়া—এই নিয়েই আমার সময় কাটে। ওর বিভাগে আমি বিশেষ মাথা গলাই না। রান্নাঘরে তো নয়ই। আমার অপারেশনের জিনিসপত্রই সামলাতে পারি না, তার আর ওর রান্নাঘরের ইনস্ট্রুমেন্টে মাথা গলাব কী করে? ও যখন আমার রোগিণী ছিল, তখনকার কথা বলতে গেলে মনে পড়ে ধ্রুব (ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার বিয়ের সময় কবিতা লিখেছিল, তার খানিকটা—

তোমাকে আমার শল্য বিঁধেছে আগেই
এবার তোমার পালা, হৃদয় অবাধ.

আর সুনীল (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) লিখেছিল—

ভালোবাসা শুধু মধুর বলেই জমে না, কিছুটা
টক্-ঝাল-লোনা
সব দেয়া-নেয়া শেষ হলে তবু আরো কিছু থাকে
সেটুকু খুলো না।

ভাগ্যিস ও আমার পেশেন্ট হয়ে এসেছিল। সংসারের হালটা আমাকে আর ধরতে হয়নি। আমি পারিও না।

আমি ঝগড়াই করতে পারি না। রাগ করে না খেয়ে থাকা আমার পোষায় না, বাড়ি ছেড়ে চলেও যাই না, কিছু ছুঁড়েও ফেলি না। ওর সঙ্গে দেখাই বা হয় কতক্ষণ? রাত এগারোটা-বারোটা থেকে সকাল সাড়ে ছ'টা-সাতটা—এটুকুই তো আমার বাড়ি থাকার সময় ছিল।

আমার শল্য ওকে আগে থেকে কতটা বিদ্ধ করেছিল সেটা ও-ই বলতে পারবে, তবে, ওর পালা এলে, ও সেটা পালন করেছে খুব মর্মান্তিক ভাবেই।

বিয়ের পর, বৌভাতের আগেই, আমরা বুধসন্ধ্যায় গেলাম। আমাদের মাঝখানে বসিয়ে লালাবাবু (বুদ্ধদেব গুহ) শুরু করল নিধুবাবুর টপ্পা, সমরেশ (বসু) আর সুনীল আরম্ভ করে দিল নাচ। সেকি খেমটা নাচ। দাম্পত্যের খেমটা নাচটা শুরু হল—এমনিই যেন ভাব।

ও রেগে গেলে আমি বেশিরভাগ সময়ই বই নিয়ে বসে থাকি। আমি এবং সুনীল এই একটা ব্যাপারে খুব একরকম। বউ রেগে গেলে স্পীকটি নট্।

আমি খুব উগ্র নাস্তিক, ও আবার ঘোরতর আস্তিক। কই, এ নিয়ে কখনো ঝগড়া করি? কখনোই না।

ও হল বিষ-পিঁপড়ে, টুক্ টুক্ করে কামড়ায়; প্রচণ্ড জ্বলুনি। আমার বাবা সব খোলামেলা ব্যাপার।

অরুণা সেন

১৯ বছর বিয়ে হয়েছে। সম্বন্ধ করে। আমি আসলে ওর পেশেন্ট ছিলাম। না না, তখন পেশেন্স হারাইনি। প্রেম করিনি বলে কোনো আক্ষেপ হয় না। না বাবা, ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়।

ওর রাগ চাপা। আমি যখন রেগে যাই, প্রচণ্ড রেগে যাই। মাথার ঠিক থাকে না। ও বলে তখন নাকি আমার গলা যোধপুর পার্ক থেকে ঢাকুরিয়ায় পৌঁছে যায়। ভাঙচুর করি না ঠিকই, তবে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেঁদে চুপ করে যাই। ও হল বিষ-পিঁপড়ে, টুক্ টুক্ করে কামড়ায়, প্রচণ্ড জ্বলুনি। আমার বাবা সব খোলামেলা ব্যাপার।

ও অদ্ভুত। একবার ওর ইচ্ছে হল, বাগান করবে, আমাদের এই ছাদে। তা, গাছটাছ এনে টব চাপানো হল ওয়েট মেশিনে। এসব নাকি দরকার। যেন রোগীর অস্ত্রোপচারের আগে তার শরীরের ওজন নেওয়া হচ্ছে। তারপর মাটি, বালি, পাথর—এইসব দিয়ে দুপুর দু'টো নাগাদ ঠা ঠা রোদ্দুরে বৃক্ষরোপণ হল। দশটা ডালিয়া গাছ। ডালিয়াদের কী করুণ অবস্থা। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বাড়ি ফিরে জল দিচ্ছে। আমি আপত্তি করায় আমাকে জ্ঞান দিয়ে বলল, এমনই দিতে হয়, ভরদুপুরে। সাতদিন দশটা গাছ মুখ বুজে রইল। তারপর একটা গাছ—নিতান্তই সার্জেন সাহেবের মুখ রক্ষার্থে এ—ইটুকু—ঠিক অ্যাত্তোটুকু একটা ফুল প্রসব করল। অপারেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেলিওর। ব্যস, সেখানেই বৃক্ষচর্চার অপারেশন থিয়েটারে তালা-চাবি। এখন এই যে সিঁড়িতে ধাপে ধাপে সুন্দর সুন্দর ফুলের টব, এসব আমার করা।

কর্তা-গিন্নির সম্পর্কে ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। তবে পছন্দ-অপছন্দ আছে। ওর ড্রিংক করা, তাস খেলা, সিগারেট খাওয়া—এসব আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। কিন্তু তবুও ও করে। আমিও তেমনি ওর পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও অ্যাকোয়ারিয়াম রাখি। ও বাড়াবাড়ি করলে যেমন আমি মানা করলেও শোনে না তেমনি আমিও জোর করে আমার পছন্দগুলো পালন করি।

ঝগড়া এখন বিশেষ হয়ে ওঠে না। কথা বলার সুযোগ জোটে কখন, যে ঝগড়া করব? ও থাকে ওর মতন, আমি আমার মতো।

ডাঃ শৈবাল গুপ্ত

কত বছর বিয়ে হয়েছে ভুলে গেছি। লাভলেস ম্যারেজ। লাভলেস ম্যারেজ আর লাভ ম্যারেজে বিশেষ তফাৎ নেই। শুধু আলাপের ক্ষেত্রে অল্প-বেশি। যেমন, ওকে তো হাঁটিয়ে বা চুল মেপে দেখিনি—পা বাঁকা কিনা, চুল ছোট কিনা। প্রেম করিনি বলে কোনো আক্ষেপ হয় না, ওর একটু হয় বোধহয়। খাবার-দাবারে পছন্দ মোটামুটি এক,—বাঙাল তো! আমি একটু স্থিতিশীল, ও পরিবর্তনশীল। আমি খাবারে খুবই পরিবর্তন চাই, ও আবার ঘর সাজানোয়। কিন্তু ওর O T-তে (কিচেন) নাক-গলানো? একেবারেই না। আমি শুধুই টেস্টার। আমার কাজের ক্ষেত্রে ও সাংঘাতিক প্রেরণা—কেন না, সবসময় টাকা চাইছে।

আমি ভীষণ রেগে যাই। কিন্তু জোলো রাগ। রাগের সাথে কোনো অ্যাকশান থাকে না। যারা রাগ পুযে রেখে ক্ষতি করে এবং যারা রাগ বের করে দিয়ে নিজের ক্ষতি করে না,—আমি সম্ভবত দ্বিতীয় দলে। রাগের ব্যাপারে আমরা একেবারে মেড ফর ইচ্ আদার—একেবারে রাজযোটক। ভীষণ ভয় করি ওকে। অপারেশনটাই প্রাইমারি, ওর ভয়ে যে বাড়ির বাইরে থাকি, তা নয়। তবে ও রাগলে চোরের মতোই থাকি।

দাম্পত্য কলহটা প্রথম জীবনে মিষ্টি। পরের জীবনে কাজকর্ম, পড়া—সবকিছুরই ক্ষতি করে, সেইজন্যেই ভয়।

স্মৃতিটা ওর প্রখর বেশি, আমার ততটা নয়।

বিয়ের পর যখন নানা কাজে বাইরে গেছি—আমি ভীষণভাবে ঘরোয়া লোক—সবসময়ই ঘরের অভাবটা অনুভব করেছি। এতদিন পর দাম্পত্য সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্যভাবে জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বউয়ের মুড খুব ভালো হবে—সেই আশায় বসে থাকতে হয়।

ওর সঙ্গে বাঘ দেখতে গেলে লাভ আছে। ও যখনই সঙ্গে থেকেছে বাঘেরা দেখা দিয়েছে। একবার একটা বাঘ, করবেট ন্যাশন্যাল পার্কে, পেছন পেছন আসছিল। আমরা হাতির পিঠে ছিলাম, কে জানে কেন আসছিল—আমাকে কিংবা ওকে কিংবা হাতিকে দেখেও হতে পারে।

সাধারণত ও খুব রেগে গেলে আমার অসহায় দশা। বাড়ির O. T তে অ্যাকিউট কেস হলে, তখন O T-ত্যাগ করে বাইরে সরে যাওয়াই সেফ।

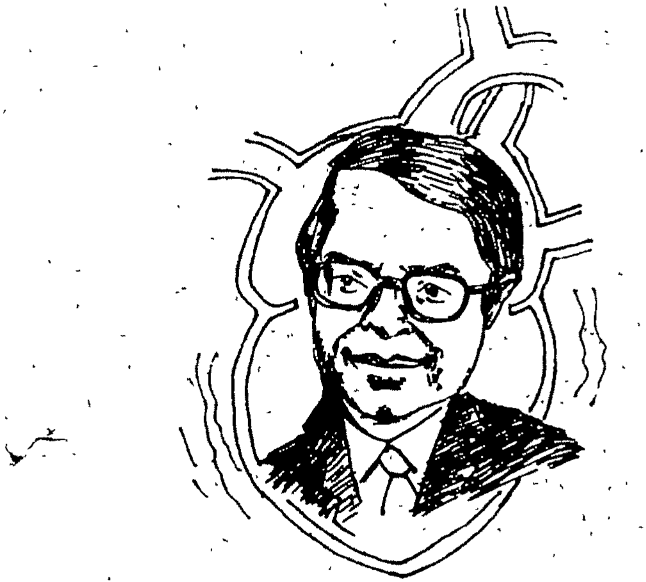

(৮০)

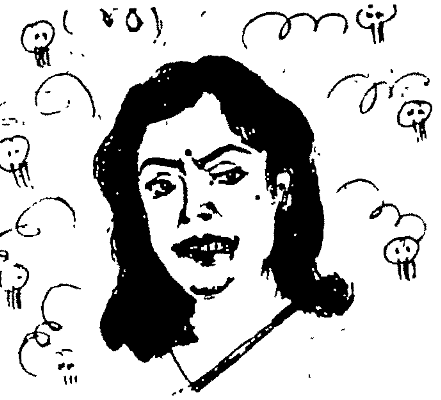

বিদ্যুৎপর্ণা গুপ্ত

'৬৭ সালে বিয়ে হয়েছে। আমার মনে হয় বিয়েটা ভালোবেসেই হোক বা সম্বন্ধ করেই হোক, সম্পূর্ণভাবে কোশ্চেন অব চান্স। ও যদি নিজের কর্মজগতে সুখী থাকে, সেটাই তো ভালো। অবশ্য কাজের জগতে সাফল্য না এলে সংসার-জীবনে তার প্রভাবটা পড়ে। কাজের জগতের সফল মানুষের সংসার-জীবনটা খুব একটা সফল নয়, তবে সার্থকতা সেটা ঢেকে দেয়। আমার বাবা ওর চেয়ে বোধহয় বেশিই খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন। এইরকম খ্যাতির পরিমণ্ডলে মানুষ হয়েছি বলেই এটা আর বিশেষ কিছু আলাদা মনে হয় না।

ও যখন সাফল্যের সংগ্রামে মগ্ন—সময় বাড়িতে সময় প্রায় দিতেই পারে না, আমি ছেলে-মেয়েদের নিয়েই পুরো ব্যস্ত থাকতাম। ফলে দু'জনের ব্যস্ততাই দু'জনেকে রক্ষা করেছে—ফাটাফাটির কোনো চান্সই হয়নি।

ও বাড়িতে ফিরে কখনো চুপচাপ টিভি চালিয়ে বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম—গেলাস দিয়ে যাও, বরফ দিয়ে যাও। কখনো কখনো এত হাঁকডাক শুরু করে, বলি—বিদেশ হলে তোমাকে পুলিশে নিয়ে যেত।

সামান্য ব্যাপারে ও খুব-টেন্সড্ হয়ে পড়ে। তখন সবে নতুন মারুতি কেনা হয়েছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ছটফট করে উঠল—যাঃ আমার গাড়ির সব সিট ইঁদুরে কেটে ফেলল। আসল রহস্য—কোনো পেশেন্ট মিস্টির বাক্স দিয়েছিল, বাক্সটা গাড়িতে রয়ে গেছে।

একবার সিলিংয়ে একটা আলো ঝোলানোর জন্যে সামান্য একটু খোঁড়া হয়েছে। রাত্রে ফিরে প্রশ্ন করে সবই জানল। বললাম, ওটা সামান্য। পরে মিস্ত্রি বুজিয়ে দেবে। তবু রাত দুপুরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বলল—তিতলির ঘরের ছাদটা এখনই পড়ে যাবে। হাঁকডাক করে ছেলেমেয়েদেরও তুলল। শেষে আমাকেই বলতে হল—আচ্ছা বাবা আমিই ও ঘরে গিয়ে শুচ্ছি। কী করে যে এই মানুষ অত বড় বড় অপারেশনে মাথা ঠাণ্ডা রাখে কে জানে।

ওই বেশি রাগ করে। রাগী বলে ওর সুনাম আছে কলকাতায়। যখন কর্পোরেশন বা সি এম ডি এ—এসব জায়গায় বিভিন্ন প্রয়োজনে গেছি, সেখানকার ডাক্তাররা শুনে বলে, 'ওরে বাবা ডঃ শৈবাল গুপ্ত। দারুণ রাগী মানুষ'। আমি খুব কম রাগী। সেরকম অকেশন মাসে একবার বা দু-তিনবারের বেশি হয় না। আমি রেগে গেলে হয়ত দুমদাম চ্যাঁচামেচি করলাম। তারপর ওঘরে চলে যাই, টি ভি চালিয়ে দিই, কাজের মেয়েকে বলি—একটা সফ্ট্ ড্রিংক দিয়ে যা—দু'ঘণ্টার আগে কেউ দরজা ঠক্ ঠক্ করবি না। জোরে জোরেই বলি, যাতে ও শুনতে পায়। তখন সবাই, মানে কাজের লোকেরা খুব ভয় পায়, এমনিতে তো পায় না।

ছোটবেলায় ও রেগে গেলে একটা লং ব্যাট্ল্ চলত। এখন আমি হয়ত এক কথায় বিষয়টা বলে দিয়ে চুপচাপ একটা খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকি। ও হয়ত রেগে 'ইম্পসিব্ল্' বলে বেরিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে দু-একদিন একটু গুম্। তারপর আবার সব ঠিকঠাক। না হয়ে উপায় কী?

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

ধর্ম নিয়ে যাবা বাড়াবাড়ি করে আমি কখনোই তাদের দলে নই। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ঘটনাচক্রে আমি একটি তথাকথিত হিন্দু পরিবারে জন্মেছি, অতএব হিন্দু, এই ঘটনাকেও মেনে নিতে আমার অস্বস্তি হয়। ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ডে যতবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লেগেছে ততবারই ব্যাপাবটাকে মুর্খদের মারামারি ছাড়া কিছু মনে হয়নি। আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। সবসময় বলা এবং লেখা হয়, হিন্দু-মুসলমান। এটা ঢাকার কাগজেও দেখেছি। হিন্দু শব্দটি ছোট বলে যদি আগে বসানো হয় তাহলে এ ব্যাপারে দু-দেশের মানুষদের সহমত আছে বলতে হবে।

কিছুদিন আগে আমার অল্পবয়সী লেখক বন্ধুরা কলেজস্ট্রিটের একটি পত্রিকার দোকানে একটা কার্টুন এঁকে লিখেছিলেন, বাংলাদেশের দালাল। সেই কার্টুনের সঙ্গে অনেকে নাকি আমার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। দালাল শব্দটি লিখলে আমাদের অতৃপ্ত বাসনার কিছুটা তৃপ্তি হযত হয়। সি আই এ-র দালাল, কোম্পানির দালাল, চীনের দালাল, সরকারের দালাল, গালাগাল দেওয়ার পক্ষে মন্দ নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দুর্বল রাষ্ট্রের দালাল বললে গালাগাল দেওয়া হয কিনা জানি না, কিন্তু খারাপ তো লাগেই। বাংলাদেশে আমি প্রথম যাই আমাদের বন্ধু কমলের আমন্ত্রণে, সাতাশি সালে। তখনো বাংলা গল্প-উপন্যাস ব্যাপকভাবে ওদেশে রপ্তানি শুরু হয়নি। নব্বই সাল থেকে সেটা হল। আমি যতবার ওদেশে গিয়েছি তা কারো না কাবো ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে। গিয়ে দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কয়েক হাজার বই যা বিক্রি হয়, তার বহুগুণ ওখানে হয়েছে। পাঠকরা আমাদের সব লেখাই জানেন। এই পাঠকদের জন্যে লেখক হিসেবে একধরনের নরম অনুভূতি স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হয়েছে। তারপর শুরু হল বই-পাইবেসি। পাইরেটদের দাপটে এদেশ থেকে বই রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল। পাইরেসি-উৎসবে আমাদের বই আরো বেশি বিক্রি হতে লাগল, কিন্তু না লেখক না মুর্খ প্রকাশক, একটিও পযসা পেলেন। আমরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারেননি।

এখন বই বিক্রির কথা ভাবি না। যেতে যেতে অনেকেব সঙ্গে যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেছে তাই আমার কাছে অনেক দামি। ওখানকার কাগজের সম্পাদকরা আমাদেব লিখতে বলেন, আমরা লিখি। কারো বাড়িতে থাকার সময় বিন্দুমাত্র মনে হয না বিদেশে আছি। মনে রাখতে হবে, এঁরা ধর্মসূত্রে মুসলমান। কিন্তু কখনোই ওঁদের আচরণে আমি কোনো বৈষম্য খুঁজে পাইনি। যেমন একটি খাওয়ার টেবিলের কথকোপকথন—

'আপনি কি গরু খাবেন? খান না, না?'
'না। অভ্যেস নেই। আপনি কি শুয়োর খান?'
'না। বুঝেছি। তাহলে গরুটা টেবিল থেকে সরিয়ে দিই।'

যেটা বলতে চাইছি, বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ধর্মান্ধতার প্রকাশ তেমন ভাবে দেখতে আমি পাইনি। এই কথাটাই বারংবার বলতে চেযেছি। এপার বাংলায় হিন্দু বাঙালিরা খুব সহজেই বলেন, 'আমরা বাঙালি, ওরা মুসলমান।' ওঁরা যে বাঙালি, এই ভাবনা এঁদেব মাথায আসে না। ওঁরা মুসলমান, এটাই বড় হযে দাঁড়ায়।

এসব কথা যখন লিখেছি বা বলেছি তখন আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় ছিল। আওযামি লিগের অন্য ব্যাপারে যা যা বদনাম থাকুক না কেন, ধর্মের ব্যাপারে উদারতা তাঁরা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের অনেক হিন্দু নাগবিককে সে সময় প্রশ্ন করে জেনেছি, তাঁরা কোনো অসুবিধেয় নেই।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে ক্ষমতা বদল হল। আওয়ামি লীগ গোহারা হারল বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বি. এন. পি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করল। নির্বাচনে আগে তাঁরা যাঁদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জামাত ছিল। জামাতের অস্তিত্ব হল ধর্মের নামে জিগির তোলা। যাঁরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী, তাঁদের ক্ষেপিয়ে তুলে ইসলামি রাষ্ট্রের পত্তন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে তাঁরা বাঙালি বা বাংলাদেশি নন, স্রেফ মুসলমান। নির্বাচন বৈতরণী পার হতে বেগম জিয়া তাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলেন। ভাবতেও পারেননি, নিজের দল একাই আওয়ামি লিগকে সরাতে পারে। মন্ত্রীত্বে আসার পর জামাত বলতে লাগল তাঁদের সাহায্য ছাড়া বেগম জিযা এভাবে জিততেন না। তারা অনেক বড় দপ্তর দাবী করেছিল কিন্তু বেগম জিয়া সেটা নাকচ করে ছোটতে সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন। এবং এর পরেই শুরু হল বাংলাদেশি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার। প্রথম কথা, হিন্দুদের ধরে নেওয়া হয়েছে আওয়ামি

লিগের সমর্থক। আওয়ামি লিগের যেসব নেতা অত্যাচারী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে যেমন বি. এন. পি ব্যবস্থা নিচ্ছে, তেমনি জামাত হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করছে। সীমান্ত পেরিয়ে হিন্দুরা চলে আসছেন পশ্চিম বাংলায়। শুধু গরিব হিন্দু নয়, ধনী হিন্দুকেও নিঃস্ব হয়ে চলে আসতে হয়েছে। শুধু এপার বাংলার কাগজে, না বললে নয়, এমন ভাবে খবর ছাপা হয়েছে। বেগম জিয়া কমিশন বসিয়েছেন ঘটনার সত্যতা জানতে।

একটি দেশের নাগরিকদের অন্য নাগরিকরা তাড়িয়ে দিচ্ছে, এটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ভাবা যেত যদি, না তাড়ানো মানুষগুলো আসায় আমাদের অর্থনীতির ওপর চাপ পড়ত। লক্ষ্য করেছি, যারা এসেছে তারা ভয় পেয়েছে তাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে বলে। এবার বাংলাদেশের হিন্দুদের পুজো বিঘ্নিত হয়েছে, শুনেছি প্রতিমাও ভাঙা হয়েছে। মাঝে মাঝে ভেবেছি, যে দেশে এখনো দেড়কোটি হিন্দু, তারা একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদ কেন করেনি।

যে সময়ে হিন্দুদের তাড়ানো, পুজো নষ্ট করার কুকাজ চলছিল সে সময় পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা মহা সমারোহে পুজো উৎসব পালন করেছেন। এখান থেকে কোনো প্রতিবাদ সোচ্চার হয়নি। কিছু রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় কর্মী বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে গিয়ে চ্যাঁচামেচি করে কর্তব্য শেষ করেছেন মাত্র।

এই সময় আমি ধাক্কা খেলাম। শাহরিয়া কবির বাংলাদেশের সুপরিচিত লেখক। তিনি এদেশে এসেছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, নতুন সরকার আসার পর ওদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে।। এই বিবৃতি গুরুত্ব দিয়ে এখানকার সব কাগজ ছাপেনি। কিন্তু কবির যেই জিয়া এয়ারপোর্টে ফিরে গেলেন অমনি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। এবং এখন পর্যন্ত তিনি পুলিশ হেফাজতে আছেন, তাঁর ওপর প্রবল অত্যাচার হচ্ছে।

ঢাকার লেখক বুদ্ধিজীবিরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেননি ভয়ে। করলে তাঁদের একই দশা হবে। বস্তুত মুজিবের মৃত্যুর আগে থেকে আজ পর্যন্ত নিরানব্বই শতাংশ গল্প-উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি নেই। লেখকদের লেখা পড়লে বোঝাই যাবে না ঘটনার সময় কখন। কোনো রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কথা সচেতনভাবে লেখকরা লেখেন না। আজও তাঁরা চুপ করে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা কী করছি? এপার বাংলার লেখকরা? কবিরের ঘটনার কোনো প্রতিবাদ এপার বাংলার লেখকরা করেছেন বলে জানি না। এই মুহূর্তে আমি হিন্দু নই, কিন্তু কিছু নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে কবিরের বক্তব্য সমর্থন করতে যদি আমাকে হিন্দু হতে হয়, আমি রাজি আছি।

আমাদের এখানে কবিতা উৎসব বা বইমেলায় বাংলাদেশি কবি লেখক প্রকাশকদের জামাই-আদরে ডেকে আনা হয়। খুব ভালো কথা। বইমেলায় তাঁদের বেশ বড় জায়গা দেওয়া হয় কিন্তু তবু নাকি ওঁদের মন ভরে না। অনেকেই অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু একুশের বইমেলা দূরের কথা, ঢাকায় ডিসেম্বর মাসে যে বইমেলা হয়, সেখানে আমাদের গিল্ডের জন্যে ছোট্ট একটি স্টল বরাদ্দ করে আমন্ত্রণ জানানো হয় যাওয়ার জন্যে। শর্ত থাকে, অবিক্রিত বই ফেরত আনা যাবে না। ছোট ভাই-এর আব্দার বড় ভাই যেমন সহ্য করে, আমাদের পাবলিশার্স গিল্ড তাই করে এসেছে এতকাল।

কিন্তু এবার বাংলাদেশের লেখক-কবি-প্রকাশকদের কাছে প্রশ্ন রাখার সময় এসেছে—আপনারা কেন শাহরিয়া কবিরের পাশে দাঁড়ালেন না? জামাই আদরের প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও বঙ্গ-উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েও কেন, কোন ভয়ে এবার এলেন না? বইমেলার সময়ে যদি বা আসেন, তাহলে আপনারা যেমন আমাদের মেলায় জায়গা দিয়েছেন, তার সমান জায়গা আমরা আপনাদের দেব না কেন?

একই সঙ্গে প্রশ্ন আমাদের কাছে। উদারতা যে কখনো দুর্বলতার নামান্তর, এটা কি খেয়ালে রেখেছেন?

ক্যালকাটা মদ্যসিপ্যাল কর্পোরেশন

বাড়ির সামনে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে তিন পুরুষের জঞ্জাল। লাইট বিহীন ল্যাম্পপোস্টের অসীম বদান্যতায় অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে আপনার তিনটি পিতৃদত্ত দাঁত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছে। অথবা চানঘরে জলের কল থেকে জল না পড়ার জন্য আপনাকে হয়ত সারা গায়ে সাবান মেখেই বিরহের গান গাইতে হচ্ছে। বাধ্য হয়েই সুব্রতময় কলকাতা পুরসভার বাপের শ্রাদ্ধ করছেন আপনি। সুব্রতবাবুর সনির্বন্ধ অনুরোধ—দয়া করে তেনার শ্রাদ্ধ করবেন না। করুন বাংলার (এবং কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ইংলিশ) বোতলের।

মেয়রমশাই নিজে সখেদে বলেছেন—পুরসভার ৪৫,০০০ কর্মচারীর মধ্যে ২৫,০০০ কর্মচারীই সুরাপান করে রোজ অফিসে ঢোকেন। প্রায়ই তাঁদের বোতলপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে মাসমাইনে নেওয়ার সময় তাঁদের 'আউট' হয়ে যাওয়া চোখজোড়া খেয়ালও করে না—মাইনের ৬,০০০ টাকার বদলে তাঁরা তিন হাজার টাকা পাচ্ছেন। শিবঠাকুরের আশীর্বাদধন্য অমৃতসুধার "হ্যাংওভারে" সারা রাত উল্টে পড়ে থাকেন পুরসভার কর্মকারেরা। সুতরাং পরদিন সকালে কর্পোরেশনে তাঁদের টিকিটিও দেখা যায় না। সুব্রতবাবু নিজেই নাকি একজন মালখোর অফিসারকে ধরে বেদম চাঁটিয়েছেন। তাতেও শিক্ষে হয়নি। পরদিনই আবার সেই অফিসার ব্যোম ভোলা হয়ে এসেছেন, রাতে বউকে ধরে হাতের সুখও করেছেন।

এর ফলে খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সুব্রতবাবু। মুখুজ্জে বামুনের সাত্ত্বিক ছেলে। জলটাকেও তিনবার ফুটিয়ে খান। এতগুলো বোতলকুমারের (এবং অ-কুমারের) মধ্যে থেকে তিনিও আবার নতুন জলপথে বিচরণ করবেন না তো?

—কৌশিক রায়

মহিলা মহল

'ফিস-ফিস' বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : **কমলিকা ও প্রাণঘাতিনী দেবী**

● আমার বয়স ২১, কোনো ছেলেকে সাক্ষাতে দেখে ভালো লাগে না। যারা আমার প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাদের কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো পুরুষ সম্পর্কে ভালো কিছু শুনলেই আমি প্রেমে পড়ে যাই। এই পরিস্থিতি থেকে মনকে মুক্ত করার একটা উপায় বলে দিন।

—*বৃষ্টি রায়; গড়িয়াহাট, কলকাতা-১৯*

□ মোট কতজনের প্রেমে পড়েছ, কতজনকে দেখে পালাতে চেষ্টা করেছ, কত কি.মি স্পীডে, গীয়ার কোন্ পজিশনে ছিল,—এসব পরিসংখ্যান জানানো প্রয়োজন। এ-ও জানাও—কোন্ পুরুষ সম্পর্কে ভালো কিছু শুনলেই প্রেমে পড়ে যাও—উত্তম পুরুষ না মধ্যম পুরুষ? এমন কোনো পুরুষের খোঁজ যদি পাও, যিনি একাধারে উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ, তবে নির্দ্বিধায় তাঁকে কাছ থেকে, আরো কাছ থেকে দেখতে পাবো, প্রেমের ফ্রেম ভাঙবে না। আর ভাঙলেও, উত্তম-মধ্যম যেহেতু সর্বদাই মজুদ তাঁর হাতে—সহজেই আবার তোমাকে সিধে রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

● আমার ভীষণ জামাকাপড় কেনার শখ, ভীষণ কিনতে ইচ্ছে করে, যখন মার্কেটে যাই। ফিরে এসে সারাক্ষণ এমনকি স্বপ্নেও জামাকাপড় দেখতে পাই। হায়, অত পোশাক কেনার মতো টাকা আমার নেই। কী করব দয়া করে বলবেন?

—*সানা রায়চৌধুরী, দমদম*

□ একটি শাঁসালো 'পোষক' জোগাড় করো, পোশাক রাখার জায়গা পাবে না।

● আমি একটি কো-এড কলেজের ছাত্রী। আমাদের কলেজের একটি ছেলে আছে তার নাম আবির। তার অদ্ভুত একটি স্বভাব আছে, যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় সে তার চোখের দিকে না তাকিয়ে বুকের দিকে তাকিয়ে কথা বলে। সেই সময় প্রচণ্ড রাগ হয়। আচ্ছা কমলিকাদি, একে কী শাস্তি দেওয়া যায় আপনি বলে দিন।

—*ইমাশ্রী দত্ত, কলকাতা-৭১*

□ সবসময় তার দিকে পিছন ফিরে কথা বলবে, তুমি এবং তোমার বন্ধুরাও। অবশ্য সে যদি তোমার বুকে ইতিমধ্যেই ঝড় তুলে থাকে তবে সেই সাইক্লোনে উড়ে আসতে পারে কবিগুরুর "ঝুলন"—বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে... তখন আগুপাছু না ভেবে ঝুলেই পড়ো—বাপ্-মা রক্ষা পাবে।

● ভালোবাসা আর প্রেমের মধ্যে পার্থক্য কি?

—*নীল দাশগুপ্ত , উল্টোডাঙ্গা*

□ একটা জাগে বিয়ের আগে, আরেকটা উদিত হয় 'তিনি' ওপারে পগারপার হলে তবেই।

● Please, আপনারা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দিলে কি ছাপবেন? আমার মেয়ে বড় হয়েছে, খুব চিন্তায় আছি। কার সাথে বিয়ে দেব বুঝতে পারছি না। ইন্টারনেটে পাত্র খোঁজার ব্যাপারে আমি অনুৎসাহী।

—*রীতা সাহা, রাধানাথ চৌধুরী রোড, মৌলালী*

□ আপনি ঘট খালি করলে আমাদের আর ঘটকালি করতে বাধা কোথায়?

● আমার না, সবকিছুই খেতে ভালো লাগে। সারাক্ষণ মনে হয় খাওয়ার গল্প করি। স্বপ্নেও মাঝে মাঝে এইসমস্ত দেখি আর চিৎকার করি। খাওয়ার একটু পরেই মনে হয় ভীষণ খিদে পেয়েছে। তখনই শুরু করে দিই খাওয়ার গল্প। জানি, সকলে একঘেয়ে বোধ করে। কিন্তু আমি এইসব গল্প ছাড়া থাকতে পারি না। কিছু উপদেশ দেবেন?

—*টিটি হালদার, বরাহনগর*

□ ভালো ভালো খাবার একাই সবটা না সাঁটিয়ে একদিন পুটলি-পোঁটলা বেঁধে দপ্তরে হাজির হও, ঢের উপদেশ দেওয়া যাবে।

● আমি আমপাচক খেতে ভালোবাসি। কিন্তু একটু বেশি হারেই খাওয়া হয়ে যায়। আমার বাড়ির লোক, বন্ধুরা ভীষণ রাগায় এই নিয়ে। কিন্তু আমি ছাড়তেই পারছি না। প্রায় নেশাই বলা চলে একধরনের, যাতে আমি আসক্ত হয়ে পড়েছি। দয়া করে এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ করে দিন।

—*নন্দিনী ভট্টাচার্য. সল্টলেক*

□ কিছুদিন প্রেম-পাচক খেয়ে দেখতে পারো। সেটা আমপাচকের চেয়ে অনেক কড়া নেশা। পাড়ার ছেলেদের কাছে তার অফুরান স্টক, পয়সাও লাগে না। বিবাহ-পাচকে পচার আগে পর্যন্ত আর কোনোদিকে তাকাবার ফুরসত পাবে না।

● আমি এক গোপন তদন্তে জানতে পেরেছি আপনি নাকি একটি ছেলে। আপনার উত্তর দেওয়ার পদ্ধতিতে বিমুগ্ধা হয়ে আমি আপনার প্রতি আকৃষ্টা হয়ে পড়েছি। দয়া করে আপনি আপনার সাথে সাক্ষাতের কোনো সুযোগ করে দিন।

—*সুচরিতা সেনগুপ্ত, লেকটাউন*

□ অয়ি সুচরিতে, গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি, তুমি একটি ডেঁপো ছেলে। তিন বছরে সাতবার প্রেমে ফেল মেরেছ। মেয়ে-সাজার জন্যেই নয় তো?

● আমার বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে। ফলত মাঝে মাঝে আমার ভালো লাগে, মাঝে মাঝে আমার ভীষণ বিরক্ত লাগে, মনে হয় সবার সাথে ঝগড়া করে, মারামারি করে তাড়িয়ে দিই। কেন এরকম মনে হয় বুঝতে পারি না। দয়া করে কারণ অনুমান করতে সাহায্য করবেন।

—*ডোরা মজুমদার, হাতিবাগান*

□ সবাইকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে তার জন্যে—শুধু একা যে রয়ে যাবে তোমার সঙ্গে মারামারি করতে।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● পত্রপাঠ-এর পরবর্তী সংখ্যার বিষয় কী?

—শ্যামলেন্দু দাশ, কদমতলা, হাওড়া

□ পত্রপাঠ-এর পববর্তী সংখ্যা বেরোচ্ছে নাকি? বেরোলে দয়া করে এককপি পাঠিয়ে দেবেন।।

● দাদা আপনাদের কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? যেভাবে লোককে উত্যক্ত করছেন, চুনোপুঁটি বলে আপনাদের তাঁরা ছেড়ে দেন ব'লে; নইলে যদি তাঁরা নাগাড়ে মামলা ঠুকতে শুরু করেন তাহলে আপনাদের ব্যবসা যে লাটে উঠবে। আপনাদের সাবধান করে দিলুম।

—সুনীতা চন্দ, কলকাতা-১২

□ দিদি খুবই ভয আছে যে, মামলা করার সাহস বোধহয কেউই দেখাবে না। তাই ভাবছিলুম, আমরাই বুক ঠুকে কারো কারো নামে মামলা ঠুকে দিই। যেমন ধরুন আপনার নামে। ভালোবেসে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন, আপনাকে কিছু উপহার দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

● Please দাদা, আপনাদের সংখ্যায় এবার দয়া করে ছাপিয়ে দিন, আপনারা কাকে সত্যিকারের সাহিত্যিক মনে করেন। উত্তরটিতে আপনাদের সম্পাদক মশাই-এর নাম না পেলেই বাঁচি। হরি হরি।

—দিগেন্দ্রনাথ মুখুজ্জে, বাঁশদ্রোণী

□ ছিমা মজুমদার। ইনি বয়সে নবীন এবং বেশ আধুনিকা। যদিও তিনি এখনো বিশেষ কিছু লিখেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে কযেকটি বড়সড় পুরস্কার দিবার এবং সাহিত্যিক জয়তিলক পরাইবার সিদ্ধান্ত হইযাছে। সেই সুবাদে তাঁহাকে একখানি উপন্যাস লিখিতেও অনুরোধ করা হইয়াছে। মরি, মরি।।

● সম্পাদক মশাই, আপনি শুনলে খুশি হবেন—পত্রপাঠ আমি কিনি। আমি একজন সমাজ-সচেতন সাহিত্যপ্রাণ অধ্যাপিকা। আপনাদের পত্রিকা আমি ক্লাশে পড়িয়ে ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজকে সতর্ক করিয়ে দিই—তারা যেন ভণ্ডামিতে জড়িয়ে না পড়ে। *—বিনতা বসুরায়, সিঁথি, কলকাতা*

□ এক কপিও পত্রিকা না কিনিয়ে ক্লাশসুদ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের গোটা পত্রিকাটা পড়িয়ে দিচ্ছেন—এর চেযে বড় ভণ্ডামি আর কী হতে পারে?

● আপনাদের লেখার ধরনটি ভারি ভালো। কিরকম 'ভাই-ভাই' বলে কথা বলেন। আহা, কতদিন যে এমন অমায়িক সরল ডাক শুনি না।

—সহেলি বসু, মুর্শিদাবাদ

□ আপনাকেও 'ভাই' বলে সম্বোধন কবেছি? উফ্, মুর্খ আব কাকে বলে? ইশ্। নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে কবছে।

● আমার মনে হয় বর্তমান সমযে একটি স্বাস্থ্যকর হাসির পত্রিকা সামাজিক অপকীর্তিগুলির পক্ষে সেফ্টি ভাল্‌ভের কাজ করবে। কিন্তু সম্পাদক মশাই ভেবে দেখুন, হাসিব (ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ) মধ্যে দিয়ে সমাজের সংশোধনের একটা চেষ্টা করতে গেলেই কি একেকজন করে প্রথিতযশা ব্যক্তিকে বেছে বেছে তুলোধোনা করতে হবে? ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে সত্যকে যাচাই করা এক জিনিস আর খিস্তি-খেউড় করা আরেক জিনিস। সুবোধ সরকার, কৃষ্ণা বসু, মল্লিকা সেনগুপ্ত, প্রভাত চৌধুরী—এঁদের পিছনে কাদা ছেটোবার তালে তাঁদেব নাম-মাহাত্ম্যে একটু নিজেদের গা গরম করার অভিসন্ধিও কি টের পাওযা যাচ্ছে না?

—দয়িত চ্যাটার্জী, কলকাতা-৭৩

□ গা গরম হয় দু'কারণে—আগুনের আঁচ পেলে আর জ্বরের কবলে পড়লে। তা ওঁরা কি জ্বরগ্রস্ত না অগ্নিগ্রস্ত যে, ওঁদের থেকে আমরা গা গরম করব? দয়া কবে ওঁদের দশা-টা জানাবেন?

● পত্রপাঠ জবাবের ছবিতে কাগজ (সম্ভবত পত্রপাঠ) বগলদাবা করে একাকী গড়াই পাঠকদের ইঁট-পাটকেল, জুতো (এবং অদৃশ্য বাক্যবর্ষণ-এর গুঁতো খাচ্ছেন, এই ছবি দেখে আসছিলাম। অ্যাদ্দিনে একাকী গড়াই আর একাকী নেই, তাঁর সভাসদ জুটেছেন দ্বিতীয় সুগ্রীব। তা সত্ত্বেও ছবিতে ওই একাকী গড়াই এক ঠ্যাঙে অর্ধখাড়া হয়ে থেকে কতদিন একাই দু'য়ের দাযভাব

বয়ে যাবেন? —*শ্যামলী হালদার, বজবজ*

☐ ওটা একাকী গড়াইও নয়, দ্বিতীয় সুগ্রীবও নয়—নিতান্তই সম্পাদক। হাতের কাগজে দিব্যি 'সম্পাদক' শব্দটাও খোদিত রয়েছে। আপনি কি ওই এক-ঠেঙের রূপে এতই মজেছেন যে, বাকিটা আর চোখেই পড়ে না? হা ঈশ্বর, ভবিষ্যজন্মে তুমি একাকী গড়াই আর দ্বিতীয় সুগ্রীবকেও এক-ঠেঙে করে পাঠিও।

● এত 'টাকা নেই, টাকা দিন' ব'লে গাঁক্ গাঁক্ করেন কেন? দোকানে খোঁজ নিয়ে দেখেছি, 'পত্রপাঠ' মাসে মাসে দিব্যি উঠে যায়। টাকার জন্যে সবসময় আপনাদের এত আদেখ্‌লামো আর সহ্য হয় না। আর ফাঁকে-ফোকরে যে হিসেব আপনারা দেন, তা তো তিলকে তাল বলেই মনে হয়।

—*রতিকান্ত নাইয়া, শাসন, দঃ ২৪পরগণা*

☐ তাল পরিমাণ একটি তিল, কিংবা তিল পরিমাণ একটি তাল দেখিবার সৌভাগ্য আমাদিগের হয় নাই। আপনি কোন গোত্রে—তিল না তাল? সন্ধান লইয়া জানিয়াছি, এমন প্রশ্ন করিলে আপনিও উঠিয়া যান। সত্য? কিন্তু প্রশ্ন—কোথায় যান?

● আপনাদের দেখিলে ভ্রম হয়—পাড়ার সমস্ত বখাটে ছোকরাগুলি একস্থানে জড়ো হইয়াছে, গলা তুলিয়া শিবাকণ্ঠে পরনিন্দায় মুখর। সমস্ত ক্রিয়ারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে—এটা স্মরণে থাকা বাঞ্ছনীয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাদের সুবুদ্ধি দেন।

—*হরিহর মহলানবীশ, চাকদা, নদীয়া*

☐ ঈশ্বর বড়ই একচোখা। যাবতীয় সুবুদ্ধি আপনাকে দিয়া; সকল দুর্বুদ্ধির বাণ্ডিল আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন।

● আচ্ছা, শেখর আহমেদ নামে সত্যিই কেউ আছেন তো? যে হারে মৌচাকে ঢিল মেরে যাচ্ছেন, হুলের ঘায়ে এতদিনে অন্তত বারকয়েক নিজের চোখে সর্ষেফুল এবং তৎপরে অন্যের চোখে ক্যাওড়াতলায় কিংবা আঞ্জুমান গোরস্তানে-নিজের ফুল-শোভিত দেহ দর্শনেরই কথা। অথচ তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই; 'পত্রপাঠ' দিব্যি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যেই কেউ শেখর আহমেদ নামের ঢালের আড়ালে বসে নেই তো? —*আঞ্জুমান বেগমম, পার্কসার্কাস*

☐ এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও খুব ঘোরস্তানে আছি। আর আপনার নামেই যখন গোরস্তান, আপনাকেই জিজ্ঞেস করি—আপনিই তিনি নন তো, ছদ্মনামে, শেখর আহমেদকে গোরে পাঠিয়ে?

● দুই বাংলা কি কোনোদিন এক হবে না?

—*নিশিনন্দন চাটুয্যে, বড়িশা, বেহালা*

☐ কোন্ দুই 'বাংলা'র কথা বলছেন? বাজারে যে অনেকগুলো ব্র্যাণ্ড আছে!

● ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কে হবেন?

—*পটল রায়, কলকাতা-১০*

☐ **সম্ভবত আপনি। অটলজির পর পটলজি ছাড়া আর কার কথাই বা ভাবা যেতে পারে? নিশ্চিন্ত থাকুন, দেশের যা হাল, আমাদের আপনাকে তোলা ছাড়া আর গতি নেই।**

● আসামি এবং স্বামীর মধ্যে তফাৎ কোথায়?

—*মনতোষ ঘোষ, দইপাড়া, মুর্শিদাবাদ*

☐ স্থানগত। একজন জেলে কাতরায়, অন্যজন বাড়িতে।

● পাকিস্তানকে আচ্ছারকম শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় কি?

—*স্বদেশ রায়, ব্যারাকপুর, উঃ২৪পরগণা*

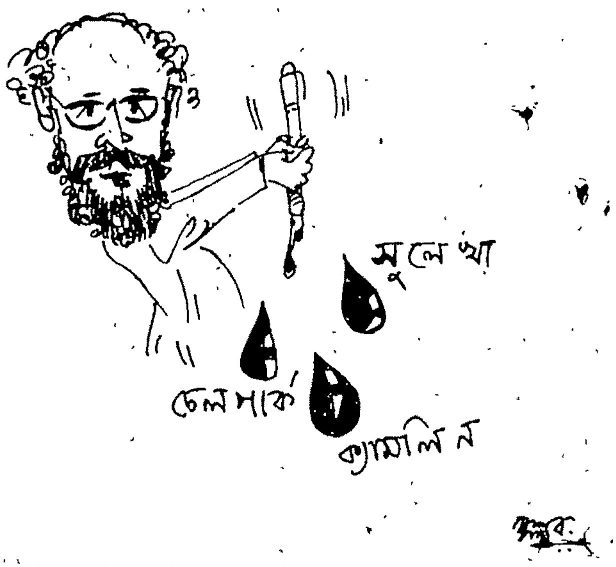

☐ নিশ্চয়। কিন্তু ... উর্দু তো জানিই না, ইংরেজি-জ্ঞানেও আমরা প্রায় অজ্ঞান. ভাবছি, বাংলা মিডিয়ামে মুশারফ কি রাজি হবেন?

● বিশ্বসুন্দরী তো বুঝি। কিন্তু বিশ্বশ্রী হয় কারা?

—*অবিরাম রায, বর্ধমান*

☐ বিশ্বনাথ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করুন। কারা বিভাগের দায়িত্বে উনিই আছেন।

● বহু স্টলেই দেখি, পত্রপাঠ থাকে না। কেন?

—*মুকুন্দ দাস, ক্যানিং*

☐ পত্রপাঠ স্টলে থাকলে অন্যদের বিক্রি টলে যায়।

● প্রথমে অমিতাভ চৌধুরি, তারপর শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন। গত সংখ্যায় আবার কে এক দুঃশাসন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের আবরণ ধরে টানাটানি শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় গৌরব। এই দুঃশাসনটি কে, দয়া করে জানাবেন?

—*প্রদ্যুম্ন চট্টোপাধ্যায়, পলাশি*

☐ জাতীয কৌরব।

● এই প্রজন্মের দু'জন জনপ্রিয় সাহিত্যিক জয় গোস্বামী এবং মন্দাক্রান্তা সেন-এর বিরুদ্ধে আপনারা আদাজল খেয়ে লেগেছেন। দয়া করে বলুন তো, এঁদের কলম থেকে আপনারা ঠিক কী আশা করেন?

—*প্রতীক চ্যাটার্জী, বেলঘরিয়া*

☐ সুলেখা। বিকল্পে চেলপার্ক। ক্যামলিনও চলতে পারে।

● পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে কি নির্দ্বিধায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করা চলে? —*বিজয়েন্দ্র দত্ত, যাদবপুর*

☐ কখনোই না। পশ্চিমবঙ্গের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটারের নাম জ্যো[illegible] বসু। চব্বিশ বছর ধরে টানা ব্যাট হাঁকড়াবার পর বোলারদের অপদার্থতা দেখে বিরক্ত হয়ে ক্রিজ ছেড়ে বাড়ি চলে গেছেন।

● আমার বয়েস নিরেনব্বই বছর। চোকে ভালো দেকতেও পাইনে। সায়েবরা এসে কলকেতার নাম পালটে রেখেছেল—কলকেটা। তা, তারা নয় বাংলা ঠিকঠাক আওড়াতে পারে না। আবার শুনলুম হালে এখেনকার একদল মাতব্বর কলকেতার নাম পালটে কলকাতা রেকেচে। কেন বাপু?

—*অহীন্দ্রনারায়ণ দে, কলকেতা-৪*

☐ আজ্ঞে, ওই 'কলকে'টা যদি পাওয়া যায়—এই বাসনায়।

রাশি চক্কোর

জ্যোতিষাঁড়নব স্বামী কমলানন্দ অবধূত

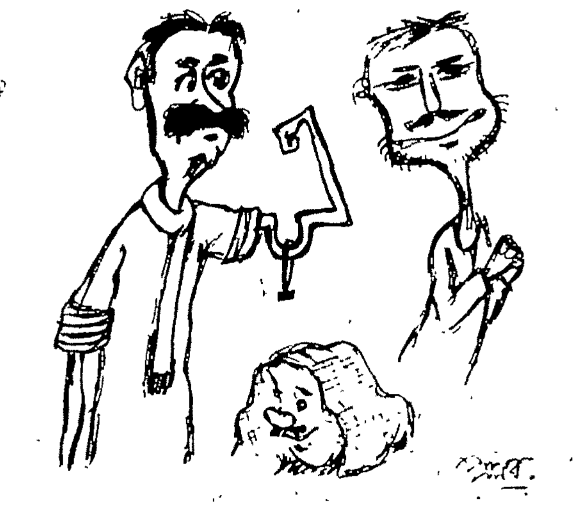

গৃহকর্তা রাশি : এ মাসে এই রাশির জাতক গৃহিণীর শত চোপাবর্ষণেও তূষ্ণীভাব অবলম্বন করবেন। অন্যথায় গৃহের ব্যালকনিতে রাত্রিযাপনের যোগ দেখা যায়।

গুহাকর্তা রাশি : এই বাশিব যে সকল জাতক গিন্নির ভয়ে সদাসর্বদা গুহা খুঁজিয়া বেড়ান তাঁহারা সাবধান। কোন গুহায লাদেন আছেন, তাহা ঈশ্বর এমনকি আমেরিকাও জানে না।

শুঁয়াকর্তা রাশি : শুঁযাপোকার ন্যায় যে সকল কর্তা সশস্ত্র হইয়া সংসার সমরাঙ্গনে চলাফেরা করিয়া থাকেন এবং মনে মনে সর্বদা প্রজাপতি হইয়া ফুলে ফুলে ঢলিয়া পড়িবার স্বপ্ন দেখেন তাহাদের এমাসে পেঁজাপতি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায অর্থাৎ ধুনুরিযোগ রহিয়াছে।

ধোঁয়াকর্তা রাশি : এই রাশির জাতক যাহারা নিজেদের চারিপাশে রহস্যের ধোঁয়ার বলয়-সৃষ্টি করিযা তাহার ভিতরে অদৃশ্য হইয়া সংসারে থাকিতে ভালোবাসেন তাঁহাদের অদৃষ্টে দুঃখযোগ আছে। অর্থাৎ ধোঁয়া সরাইয়া সেখানে আগুন প্রবেশ করিবে এবং জাতককে বেগুনপোড়া করিযা ছাড়িবে।

জামাইবাবু রাশি : জাম্‌বাবুদের দশা এ মাসে জাম্বুবান সদৃশ। রাবণকর্তার হাতে রামঠ্যাঙানি খেযে রামভক্ত জাম্বুবান বুঝেছিলেন—এ বড় শক্ত ঠাঁই। কিন্তু রক্ত জল করা পয়সা শালিদেব পিছনে পুরো ফুঁকে যাবার পবেও জাম্‌বাবুদেব হুঁশ হবে না। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই পকেট গড়ের মাঠ। অবশ্য তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতেই চৈতন্যযোগ দেখা যায়—সমরাঙ্গনে রাবণ-বিকল্প খুন্তিধারিণী গৃহিণীর আবির্ভাবে।

ক্ষ্যাপাকর্তা রাশি : আহা, 'ক্ষ্যাপার দশা ভাবতে গেলে আমাতে আব আমি নাই'। ক্ষ্যাপার হ্যাপা সামলাতে গিযে গিন্নির ড্যাবা ড্যাবা চোখে অনর্গল গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিত হবে। কিন্তু সাবধান। এ মাসেব ৭, ১৭, ২৭ তারিখে ভুলোগ্রহ যোগ থাকায় হঠাৎ হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই আপনি ক্ষেপতে ভুলে যেতে পারেন। তখন আপনাকে চিনতে না পেবে পরপুরুষ ভেবে গিন্নি ঝেঁটিয়ে বাস্তায় পাঠাতে পারেন।

হবুগিন্নি রাশি : প্রেমিকা কাম হবু গিন্নিদেব বৃহস্পতি এ মাসে উত্তুঙ্গে। মাসের প্রথম বৃহস্পতিবাব প্রেমিক কাম হবু বরের কাছ থেকে একটি মূল্যবান উপহার পেতে পাবেন। কিন্তু প্রেমিকেব শুক্র বক্র থাকায় পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার হবু শ্বশুরের ক্যাশবাক্সে ঘোরতর অমিল ধরা পড়বে এবং সেই সুবাদে তাঁর করুণায় আপনার হবু বরের মুখের পবিকাঠামো বিলক্ষণ পাল্টে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। ফলতঃ প্রেমেব পরিকাঠামো 'পবিফাঠামো'-ব দিকে মোড় নিতে পারে।

অন্তর্জলি-গিন্নি রাশি : হ্যাঁ, যে সব গিন্নিরা অন্তর্জলি-যাত্রায তৈবি, তাঁদেব দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান এ মাসেই হবার সম্ভাবনা প্রবল—শীতের প্রকোপ প্রবল হওযাব ফলে। এবং তাঁদেব শাঁখা-সিঁদুব তুমুলভাবে অক্ষয হতে পাবে। অর্থাৎ ভেজাল সিঁদুব আর নকল শাঁখা বৈদ্যুতিক চুল্লিতেও পুড়তে চাইবে না। তখন শ্মশান অধিকর্তাকে ডবল চার্জ দিয়ে এ কাজ করাতে হবে। এবং গিন্নি পটল তোলায় বুড়োকর্তার মুখে যে সুখের হাসিটি ফুটেছিল, খর্চা বেড়ে যাওয়ায় সে হাসির অচিরাৎ ফাঁসি হয়ে যাবে।

সন্দেহ-বাতিক গিন্নি রাশি : জাতিকাদের পক্ষে এ মাসটি খুবই শুভ। অনেক বাত অব্দি পতিদেবতার পথ চেয়ে বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়িযে থাকার কালে সামনের বাড়ির পদা-র বাবা কিংবা ন্যাপা-র জ্যাঠার হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেন। তারপর থেকে পতিদেব যতক্ষণ না ফেরেন ততক্ষণই স্বস্তি বোধ করবেন। অবশ্য এ মাসেব স্বপ্নে রাহুর দশা চলবে। ফলে ঘুমের ঘোরে মুখ ফসকে বেফাঁস তথ্য বেরিযে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু শনি তুষ্ট থাকায় কর্তাব কুংফু-ক্যারাটে মথিত হযে একটি পবিচ্ছন্ন নার্সিং হোমে মাসের বাকি কটা দিন আরাম কবে আসতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের জনসচেতনতা

প্রভাত বাগচী

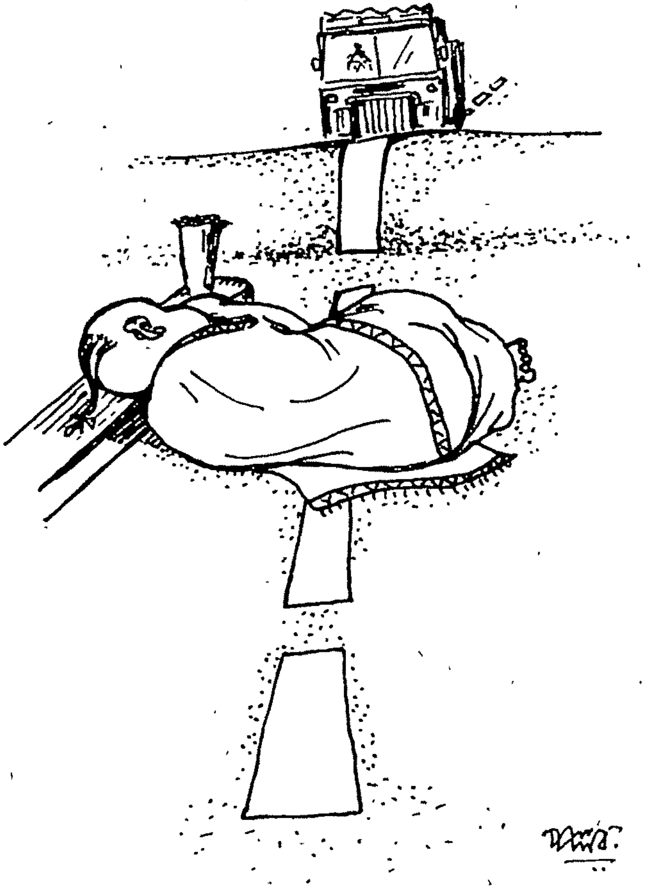

বিগত ১৫ই আগস্ট দিল্লির্ লোহিতগড় অর্থাৎ লালকেল্লাব সামনে দাঁড়িযে নারদ প্রধানমন্ত্রীর ভাযণ শুনছিলেন। দু' ছিলিম গঞ্জিকা ততক্ষণে তাঁর হৃদয়ঙ্গম হওযাতে ভাষণ রূপ ঢেউয়েব তালে তালে তিনি কখনো আবেগাপ্লুত হচ্ছিলেন। কখনো 'সাবে জহাঁসে আচ্ছা'র অধিবাসীদের দুঃখদুর্দশার বাঙ্ময চিত্র তাঁকে শোকে মুহ্যমান কবে তুলছিল। যখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্দশার মূল কারণ হল পাকিস্তান। ফোনটি বেজে উঠে তাঁব চিন্তার শ্রাদ্ধ কবে দিল। স্বর্গ থেকে ব্রহ্মাই ফোন অর্থাৎ ইমাবজেন্সি ফোন কবছেন ·

"শুনিতে পাই ভাবতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে নাকি জনসংখ্যাব বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। তথায় আবাসনও নাকি একটা গুরুতব সমস্যা। তথাপি পশ্চিমবঙ্গ হইতে ইদানীং স্বর্গে তথা দেবলোকে প্রতিনিধিত্ব এত কম কেন? তুমি অতি সত্বব সবজমিনে ব্যাপারটা অনুসন্ধান কবিযা একটা প্রতিবদেন (নাতিদীর্ঘ) প্রেরণ করো।"

ব্রহ্মা প্রজাপতি। তিনি স্বযম্ভু। তাই ব্রহ্মার পিতৃদেবের মুণ্ড মনে মনে পাত করতে না পেবে নারদ ব্রহ্মার ডেপুটি মোবাইলটিকেই মনেব সুখে সংস্কৃতে গালিগালাজ কবলেন। অনন্তব যথা সময়ে অর্থাৎ দেড় পক্ষকাল পরে তিনি রিপোর্ট পাঠালেন :

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতদ্—

মহাশয,

আপনাব আদেশানুসাবে দিল্লি হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিযা প্রতিবেদনটি পাঠাইতে যৎকিঞ্চিৎ বিলম্ব হইযা গেল। ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ সরকাবি পৃষ্ঠপোযণায় এখন এতটাই অসুস্থ হইয়া গিযাছে যে অতি শীঘ্র কোনো ডাক্তাব দেখানো প্রযোজন। বিপবীতে, প্রাইভেট ক্যুবিযার সার্ভিসগুলি তুবীয হইতে তুরীযার হইযা তুবীযেস্ট হইবাব প্রযত্ন কবিতেছে। অতএব প্রতিবেদনটি ক্যুরিযাবেই পাঠাইলাম। বিলটি সত্বর মিটাইযা দিবেন।

আপনি আমাকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বর্গের প্রতি আসক্তি কেন কমিযা আসিতেছে, তাহা সত্বব জানাইতে কহিযাছেন। কিন্তু এই গতিব যুগে সেই ব্রিটিশ আমলের ঢেঁকিতে অসংখ্য বাম্পাব ডিঙাইয়া অত্রস্থানে আসিতে যে কী শাবীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনুভূত হয তাহা ভাবিযা দেখেন নাই বা দেখিলেও ভাবেন নাই।

বস্তুত বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে না হইলেও পশ্চিমবঙ্গ জঞ্জাল তথা মশক সংরক্ষণে এবং কুড়ানিদের কর্মসংস্থানে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

যাহা হউক, সেই অসহ্য বোরিং জার্নি সমাপনান্তে যখন কলিকাতায আসিযা উপস্থিত হইলাম, মনে হইল যেন পাতালে উপনীত হইলাম। কলিকাতার সমীপবর্তী হইবামাত্র নয়ন যুগলে প্রদাহ বোধ কবিতেছিলাম, আরো কিয়দ্দুর অগ্রসব হইতে দরদর বেগে অশ্রুরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গে এখন শিল্প নাই কিন্তু শিল্প লইয়া আলোচনা আছে। শিল্পায়ন এখন নববঙ্গের নূতন মন্ত্র। 'শিল্পায়ন শিল্পায়ন' মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র কলিকাতাব বাযুবাজি যে পবিমাণ দুষিত হইযা চক্ষু জ্বালাইতেছে, অনুমান হয়, প্রকৃতই শিল্প সংস্থাপিত হইলে অশ্রু নহে, ববফ পড়িবে। তদুপবি, এইখানকার বাযুরাজি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমার হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস যুগলেব অবস্থা এতটাই করুণ কবিয়াছে যে মনে হয প্রাণ খুলিযা গঞ্জিকা সেবন কবিবার এবং 'নাবাযণ নারাযণ' জপিবার দিন আমার বুঝি সাঙ্গ হইল।

যাহা হউক, বিমূঢ় চিত্তে কোথায যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ বোধ হইল মাথা ঘুবিতেছে। চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। দুই-একটা সবিযার ফুলও নজরে পড়িল। অনেকক্ষণ পরে বুঝিলাম বাস্তবিকই অন্ধকাব হইযাছে। কারণ জ্যোতিহীনতা। লোডশেডিং। কযেক বৎসর পূর্বে নাকি কলিকাতার তিনশত বর্ষ পূর্তি হইয়াছে । কিন্তু চতুর্দিকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার

তাণ্ডব এবং জোনাকিদের দাপাদাপি দেখিয়া বোধ হইল শহরটির শ্বাসকষ্ট দেখিয়া বোধহয় শোকসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। চতুর্দিক এতটাই মসীলিপ্ত। হঠাৎই বিদ্যুৎচমকের ন্যায় মনে হইল, এই তিমিরান্ধকারে দুই নয়নে অশ্রুবারিরাশি লইয়া ঠিকমতো দেখিতে পায় না বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের পক্ষে স্বর্গধামের রাস্তা চিনিয়া লইতে মুশকিল হইতেছে। শুনিলাম, শারদোৎসব ও বারো মাসে তেরো পার্বনের ত্রয়োদশ পার্বন অর্থাৎ নির্বাচনোৎসবের সময় বিধাতার বরে এই লোডশেডিং নাকি সম্পূর্ণ উধাও হইয়া যায়, এবং যখন পুনরায় ফিরিয়া আসে, বেশ জাঁকিয়া বসে।

লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে অঙ্গুলিগণ্য লোক বৈকুণ্ঠধামে যায় তাহা দুর্গাপূজা ও ভোটপূজার সময়েই যায়— কেহ ভিড়ের চাপে দম হারাইয়া, কেহ দলের চাপে বোম নাড়াইয়া। এই ব্যাপারে দুই একজনের সাক্ষাৎকার লইবার জন্য সোৎসাহে ঢেঁকিবাহনটি চাপিয়া দমদম বিমানবন্দর হইতে বাহির হইতেই সহসা বাহনটি আমার ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া গেল। প্রবল ভিড়ে আটকা পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম, আমার দেবতা পরিচয় নিশ্চয় কেহ অবগত হইয়াছে, এখন আমাকেই না ইন্টারভিউ দিতে হয়! কী ভাষায় ইন্টারভিউয়ারকে সামলাইব ভাবিতেছি, কারণ আমার ইংরাজি জ্ঞান আর ভারতবর্ষের অর্থভাণ্ডার উভয়ের অবস্থা প্রায় একই রকম। স্টক খুব সীমিত। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন কেহই আমার সামনে টি ভি ক্যামেরা সহযোগে মাউথপিস ধরিল না, বুঝিলাম ভ্রম হইয়াছে।

আধুনিক যুগে যুধিষ্ঠির যদি জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে নরক দর্শন না করাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সরকারি যে কোনো হাসপাতাল দেখাইলেই চলিবে।

ভালো করিয়া অবলোকন করিয়া দেখি নাতিদূরে ভারতের ভাগ্যাকাশের ন্যায় একাধিক লালবাতি জ্বলিতেছে। আমার সম্মুখে চতুশ্চক্র যানের লাইন, পশ্চাতে যটচক্রযান পেটভর্তি যাত্রী লইয়া গাঁক্ গাঁক্ শব্দ করিতেছে। দক্ষিণে পদচালিত দ্বিচক্রযান তো বামে যন্ত্রচালিত দ্বিচক্রযান। প্রত্যেকেই অসাধারণ দক্ষতায় কর্ণবিদারী হর্ণ দিতেছে। ইহাকে নাকি ট্রাফিক জ্যাম কহে। ভারতবর্ষের জনগণের যেমন রাজনীতির মহাজোট এবং তৎপরবর্তী মহাজটের কবল হইতে মুক্তি নাই, কলিকাতার পথচারীরও তেমনি যানজটের হাত এড়াইবার শক্তি নাই। সেই যানযট খুলিতে অন্তত সাতদিন লাগিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল সেই যানযটের কবলে আটকাইয়া পড়িয়াও আমি বিন্দুমাত্র নিরানন্দ বোধ করি নাই। ওই অবস্থায় থাকিতে থাকিতেই আমার উপলব্ধি ঘটিল যে গৃহ হইতে নির্গমন করিলেই যদি একজনকে ট্রাফিক জ্যামে সাতদিন আটকাইয়া থাকিতে হয় তবে দেবলোকে পৌঁছইতে বিলম্ব তো স্বাভাবিকই, এমনকি অসম্ভবও বলা চলে। স্বর্গপথে নিষ্ক্রান্ত হইতেই তাহার পরলোকের টার্ম সমাপ্ত হইয়া পরবর্তী মনুষ্যজন্মের সময় চলিয়া আসে।

কিন্তু সে ধারণাও আমার ভ্রান্ত প্রমাণিত হইল। ট্রাফিক জ্যামের কবল হইতে মুক্তি পাইয়া এক ফার্লং পথও অগ্রসর হই নাই, হঠাৎ ধপাৎ করিয়া পথোপরি অবস্থিত একটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পাতালে প্রবেশ করিলাম। যেন পটল তুলিলাম। (পরে অবশ্য শুনিয়াছি এবম্বিধ উন্মুক্ত সুড়ঙ্গ কলিকাতার রাজপথে সুপ্রচুর এবং এইগুলিকে নাকি ম্যানহোল কহে। এই হোল মেড বাই এ্যাণ্ড ফর ম্যান বলিয়াই উহার এতাদৃশ নামকরণ।) দেবতা বলিয়া সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিলাম বটে কিন্তু অত্রাঞ্চলের মানুষগুলা এমন গর্ত থাকা সত্ত্বেও স্বর্গে না যাইতে পারে কী করিয়া তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। অতএব বিফল মনোরথ হইয়া যন্ত্রণাকাতর হাত-পাগুলা মর্দন করিতে করিতে বিকল ঢেঁকিটিকে কোনো মেকানিকের দোকানে লইয়া রিপেয়ার করিব ভাবিতেছি, এমন সময় 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি' পঁয়ষট্টি ডেসিবেলের মাত্রাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনকারী মাইকের ঘোষণা কানে আসিল, "... ... .কিন্তু ইতিহাস এদের ক্ষমা করবে না. পশ্চিমবঙ্গের সচেতন জনগণ এদের আস্তকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।" অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম উহা কোনো দৈববাণী নহে, কোনো এক নেতা বক্তৃতা করিতেছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই, মহাশয়, আমার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। আমার পশ্চিমবঙ্গে আসিবার উদ্দেশ্য সার্থক হইল।

বুঝিলাম, সচেতনতার জলজ্যান্ত প্রতীক পশ্চিমবঙ্গবাসী। পুরীতে যেমন পাণ্ডা, পুলিশের হাতে যেমন ডাণ্ডা, পশ্চিমবঙ্গে তেমনি জনসচেতনতা আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে জনগণের আইডিনটিটি নির্ধারিত হয় ধর্মের মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির মাধ্যমে। সুবাস ঘিসিং দার্জিলিংয়ে গোর্খাদের পরিচয় ঠিক করিলেন জি. এন. এল. এফের রাজনীতি করিয়া। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডী ও কামতাপুরীরা রাজনীতিকেই বেস্ট আইডিনটিটি কার্ড হিসাবে ব্যবহার করিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে যে ছোট বড় মেজ সেজো তেত্রিশ কোটি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই সমবেতভাবে চ্যাঁচাইয়া বলাবলি করিতেছে "সচেতন বাঙালি, সচেতন পশ্চিমবঙ্গবাসী এদের ক্ষমা করবে না।" অন্যান্য সকল বিষয়ে মত ও পথের বিস্তর ফারাক থাকিলেও এই একটি ব্যাপারে সকলেই একমত। রাজনৈতিক দলগুলি মতৈক্যে পৌঁছিয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর সচেতনতা লইয়া সন্দেহের অবকাশ নাই এবং এই সচেতনতার কারণেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বর্গে যাইবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। পরলোক যাওয়া আর কেন? যমরাজার কাছে দুই দণ্ড বসিয়া কিছু জ্ঞান শুনিয়া সচেতন হওয়ার জন্যই তো? কিন্তু যাহারা মর্তেই সচেতন তাহারা আবার কী করিতে স্বর্গে যাইবে? সাইট সিয়িং করিতে বাঙ্গালী ইতালি বা সুইজারল্যাণ্ড বা মঙ্গলগ্রহে যায়, স্বর্গের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না। বস্তুত সচেতন বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গবাসী অন্ধকারেও দেখিতে পায়, ম্যানহোল দিয়া পাতালে চলিয়া যায় না।

অথচ, মহাশয়, আমার কি দুর্ভাগ্য দেখুন। কতকাল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে আছি অথচ বিন্দুমাত্র সচেতনতা কোথাও নজরে পড়িল না। ঢেঁকি বাহনে চাপিয়া অথবা পদব্রজে যত পথেই ঘুরিলাম, দেখি সর্বত্রই দুইধারে রাশি রাশি জঞ্জাল জমা হইয়া নাতিক্ষুদ্র মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।" গৃহস্থ বাঙ্গালী সংসারী বাঙ্গালী কবির বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন করিতে পারে নাই। তাহারা ঝাঁটাইয়া গৃহ হইতে সমস্ত আবর্জনা পথে ফেলিয়াছে। দিন দিন তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছে। জনগণ পথে নির্গত হইবামাত্র তাহাদের নাসারন্ধ্রে পূর্ণের সুবাস প্রবিষ্ট হইতেছে। দুই -চারিজন, যাহারা পূর্ণের পদপরশ চাহে না, নাকে রুমাল চাপা দিতেছে। তথায় বরাহনন্দনদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির রসদ পাওয়া যাইতেছে, মশকের লীলাভূমি সৃষ্ট হইতেছে। জনাকয়েক কুড়ানিকেও সেখানে এটা-সেটা কুড়াইতে দেখিয়া ভাবিলাম কর্মসংস্থানের যুগে যাহাতে তাহাদের কর্মের অভাব না ঘটে সেই জন্যই এই ব্যবস্থা । বস্তুত বন ও বনাপ্রাণী সংরক্ষণে না হইলেও পশ্চিমবঙ্গ জঞ্জাল তথা মশক সংরক্ষণে এবং কুড়ানিদের কর্মসংস্থানে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। ইহা তো গেল পথের দুই পার্শ্বের দৃশ্য। রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি চালানোরও কি কম বিপদ! গ্রাম-শহরের অলিগলির সর্বত্রই দেখি বিশাল বিশাল কুঁজ, যেন মহুবা উপুড় হইয়া শায়িত আছেন। শুনিলাম ইহাকে নাকি স্পীড ব্রেকার বা বাম্পার কহে। রবীন্দ্রনাথ থাকিলে বলিতেন :

অস্তিত্ব আছে না আছে ভাঙ্গা সরু রাস্তা
বাম্পারগুলি না রহিলে আসিত অনাস্থা।

বাম্পার, জাতীয় সড়কসমূহেও প্রত্যক্ষ করিলাম। শুনিলাম, বাম্পার স্থাপনের কারণ নাকি দুর্ঘটনা এড়ানো। আমার মনে হইল দুর্ঘটনা বাড়ানো। আমার টেঁকিবাহনটি লইয়া কত পথেই চলিলাম। কেহই গাড়ি যাইবার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দেয় না। কি সাইকেল আরোহী, কি স্কুটারচালক, কি রিক্সাওয়ালা। আর পায়ে হাঁটা পথিক—যাহাদের পিতৃদেব মরণকালে টু পাইস রাখিয়া গিয়াছেন এবং যাহাদের ভাগ্য তদ্রূপ প্রসন্ন নহে—সকলেই মনে করে পাবলিক থরোফেয়ারের ঠিক মাঝখানটাই তাহাদিগের পিতৃদেবের সম্পত্তি, এবং তদনুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মাঝপথ দিয়া চলিতে থাকে। পশ্চাৎ হইতে বড় বড় গাড়ি আসিয়া ভ্যাঁ পোঁ করে, সাইড পায় না। তর্জন গর্জন, অনুরোধ উপরোধ এমনকি ইলেকট্রনিক হর্ণও নিষ্ফল হয়। বাঙ্গালী গজেন্দ্রগমনে মাঝপথ ধরিয়া চলিতেই থাকে। দুর্ঘটনা অনিবার্যভাবেই হয়, এবং সচেতনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গবাসী ড্রাইভারকে ধরিয়া গণধোলাই দেয়। চালক একা, পথিক বহু। বহুজনে মিলিয়া একজনের পিতৃদেবের নাম বিস্মরণ করাইতে যে বীর্যবত্তার দরকার হয় তাহা সংহত করিতে সচেতন বাঙ্গালী মুহূর্তেকও সময় লয় না, এবং প্রতিদিনই এক বা একাধিক ড্রাইভার বেঘোরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। নরকরাঘাতে মরে বলিয়া ইহারা স্বর্গলোকে প্রবেশাধিকার পায় না, ইহাদের স্থান হয় রৌরব নরকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে ড্রাইভার বাঙ্গালী এবং সে কারণে সচেতন, সে আপন সচেতনতার প্রমাণ দিয়া, দুর্ঘটনা ঘটাইয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" পন্থা অবলম্বন করে। সেক্ষেত্রে হাত নিশপিশ করিতে থাকা জনগণ বীরত্ব দেখাইবার সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়া যাওয়াতে পথ অবরোধ করিয়া ড্রাইভারের উপর রাগ মিটায়। বাম্পার স্থাপনার দাবী জানানো হয়, পথের ধার দিয়া হাঁটিবার কথা কাহারো মনেও আসে না। আদারওয়াইজ ডেফ এ্যাণ্ড ডাম্ব সরকার এই দাবী সহজেই মানিয়া লয়, যত্রতত্র শুধু অকারণ পুলকে বাম্পার গজিয়া উঠে, বাঙ্গালী সচেতনতার মূর্ত প্রতীক হইয়া বিরাজ করে। ইহাতে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরো বাড়ে, তাল মিলাইয়া বাম্পারেরও বংশবৃদ্ধি ঘটে। অথচ এই ভারতবর্ষেরই তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা ঘুরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া একটা বাম্পারও তো কোথাও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয়রা সচেতন বলিয়া কোনোখানে তো কোনো উল্লেখ নাই। নিশ্চয়ই উহারা ভীতুর ডিম, গাড়ির হর্ণ শুনিলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে জননীর বক্ষলগ্ন হয় নতুবা স্ত্রীর আঁচলে আশ্রয় লইয়া ফিডিং বোতলের খোঁজ করে নয়ত সেই দেশের বাম্পারগুলি মাটির নিচে পোঁতা রহিয়াছে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গবাসী যদি সচেতন হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে কোন দেশের জনগণ কতটা সচেতন তাহা সেই দেশের বাম্পারের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। সে কারণে পশ্চিমবঙ্গবাসীর আফশোষ একটাই, প্রবল সচেতনতা সত্ত্বেও তাহারা এখনো রেলপথ জলপথ বা আকাশপথে একটাও বাম্পার বসাইতে পারে নাই। তীব্র প্রয়াস চলিয়াছে সেই ঘাটতি অচিরাৎ কাটাইয়া পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিবার।

অতএব, মহাশয়, বুঝিতেই পারিতেছেন, রাজনৈতিক দলগুলি পশ্চিম-বাঙ্গালীকে কে কতটা সচেতন বানাইতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। যে সচেতনতার সেরা নিদর্শন পাওয়া যাইবে অত্রাঞ্চলের সরকারি অফিসে। সরকারি আদেশ আছে—সময়ে আসুন, সময়ে যান। তাই সকাল সাড়ে এগারোটার আগে এবং বেলা সাড়ে তিনটার পরে অফিসসমূহে লোক খুঁজিয়া পাওয়া আর বাঙ্গালী আই.এ. এস. দেখিতে পাওয়া একই ব্যাপার। যেদিন ক্রিকেট ম্যাচ থাকিল সেদিন তো লোক পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নাই। অফিসে আসিলে বেতন লইতে হইবে কিন্তু কাজ করিতেই হইবে তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। দৈবাৎ যদি কোনো অফিসে যাইবামাত্র কাজ হইয়া যায় লোকে কালবিলম্ব না করিয়া লটারির টিকিট কাটিতে ছোটে। লটারিতে প্রথম পুরস্কার পাওয়া আর অফিসে কাজ পাওয়া একই রকম দুষ্প্রাপ্য। পূর্বে সপ্তাহে ছিল একদিন ছুটি—রবিবার। বর্তমানে সপ্তাহ পাঁচ দিনের। এক বৎসরে তেরো পার্বন কথার কথা, বাংলায় আসলে বারো মাসে চৌষট্টি পার্বন। ফি সপ্তাহেই কোনো না কোনো উৎসব বাংলায় লাগিয়া আছে। যে সপ্তাহে তাহা থাকে না, রাজনৈতিক দলগুলি অগ্রসর হয় সে ঘাটতি পূরণে। তাহারা স্পনসরের ভূমিকা লইয়া সোমবার বা শুক্রবার দেখিয়া বন্ধ আহ্বান করে। সচেতন বাঙ্গালী বন্ধ সচেতন করিতে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছে। কাজে কাজেই একটি মৃত্তিকা নির্মিত কলস চুরমার করিতে যতটা শক্তির প্রয়োজন হয়, একটি বন্ধ্ সফল করিতে ততখানিও শক্তির প্রয়োজন পড়ে না। ফলত 'নো ওয়ার্ক ফুল পে' লইয়া কর্মব্যস্ত বাঙ্গালী সপ্তাহান্তে দারা পুত্র পরিবারের সহিত কাটাইবার মতো ফুরসৎ পায়। কর্তার সচেতনতা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

এই তিমিরান্ধকারে দুই নয়নে অশ্রুবারিরাশি লইয়া ঠিকমতো দেখিতে পায় না বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের পক্ষে স্বর্গধামের রাস্তা চিনিয়া লইতে মুশকিল হইতেছে।

'যখন স্বর্গে ছিলাম, আপনি 'সচেতনতা' বলিতে যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহার সহিত বাংলার 'সচেতনতা' ঠিক যুৎসই হইল না দেখিয়া একবার অভিধান খুলিয়া শব্দটির অর্থ দেখিলাম। বুঝিলাম সচেতন বলিয়াই পশ্চিমবঙ্গে অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ নাই। উন্মুক্ত দিবালোকে পুলিশ ঘুষ লইতেছে, পশ্চিমবঙ্গবাসী ঘুষ দিতেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী সচেতন, হাজিরা খাতায় সই থাকিলেও অফিসে কর্মী নাই, হাসপাতালে ডাক্তার নাই, বিদ্যায়তনে শিক্ষক নাই—পাবলিকের প্রতিবাদ নাই, কারণ পাবলিক পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী সচেতন। কোনো সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই সুইপার ও সাফাই-কর্মীর পদ খালি নাই। তদ্ সত্ত্বেও হাসপাতালগুলির টয়লেট বা কিচেনের অবস্থা এবং সাধারণ পরিবেশ দেখিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করিবার জন্য না সুস্থকে অসুস্থ করিবার জন্য—বুঝিতে না পারিয়া লোকে নার্সিং হোমে যাইতেছে। আধুনিক যুগে যুধিষ্ঠির যদি জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁহাকে নরক দর্শন না করাইয়া পশ্চিমবঙ্গের সরকারি যে কোনো হাসপাতাল দেখাইলেই চলিবে। পশ্চিমবঙ্গবাসী সচেতন। এক-একটা শূন্য পদে কর্মী নিয়োগের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা এহাত-ওহাত হইতেছে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গবাসী কি নিদারুণ সচেতন। একদিকে যখন প্রবল জলকষ্ট তখন পথের দুই ধারে পুরসভার কলগুলি দিয়া 'দরদর বেগে জল পড়ি' জল 'ছলছল' শব্দে বহিয়াই যাইতেছে। প্রতিবাদ তো দূরের কথা, তাহা বন্ধ করিবারই লোক নাই। পশ্চিমবঙ্গবাসী সচেতন। স্টেটবাসগুলি উপর-নিচে বাদুড়ঝোলা যাত্রী তুলিয়াও বছর বছর শুধু লোকসানেই রান করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখিতেছে, বুঝিতেছে, চুপ থাকিতেছে। কারণ তাহারা সচেতন। আন্দোলনের নামে শত-শত বাস-ট্রাম পোড়াইয়া যাত্রীদের চূড়ান্ত হেনস্থা করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী সচেতন। কলিকাতা ও শহরতলীর যুবক-যুবতী উন্মাদের মতো ড্রাগ ধরিয়া চব্বিশ ঘণ্টা পার্টি লাইনে 'ফোন-এ ফ্রেণ্ড' করিতেছে। পশ্চিমবাঙ্গালী সচেতন।

পশ্চিমবঙ্গের জনসচেতনতার রিপোর্ট করিতে হইবে ভাবিয়া প্রথমে আমি কিছুটা কন্‌ভিন্‌সড্ হইয়া গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম বাঙ্গালী বুঝি সত্যিই সচেতন। এক্ষণে বুঝিতেছি পশ্চিমবঙ্গের সচেতনতা লইয়া একধরনের গোয়েবলসীয় প্রচাব চলিতেছে। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচন কমিশনকে বিক্রীত বা বিকৃত যাহা খুশি বলিতে পারে কারণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একা, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষতি নাই। জনগণ বহু। তাহাদিগকে সমালোচনা করিয়া ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক ভুল করে এমন কোনো পিতৃদেবের পুত্র রূপী রাজনৈতিক দল তো একটাও দেখিলাম না। ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। যে প্রচাবের জোরে এসকিমো গৃহিণীবও বেফ্রিজারেটর না হইলে চলে না, নম্বর ওয়ান ম্যাকডাওয়েল না খাইলে সত্যিকারের অভিজাত হওয়া যায় না এবং একমাত্র কোকাকোলা পান করিলেই জীবনের ষোলোকলা পূর্ণ হয়, সেই প্রচারের জোরেই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া যজ্ঞছাগও কুকুর হইয়া ধূর্তত্রয়ের ভক্ষ্য হয়। ঠগই বাজিমাৎ করে, বোকামার্কা সাধুতা হারিয়া যায়। অবিশ্রাম প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের সচেতনতা না বাড়ুক আত্মসচেতনা বাড়িয়াছে। কর্তব্যবোধ বেপাত্তা। সৃষ্ট হইয়াছে ষোলো আনাব জায়গায় আঠারো আনা অধিকাববোধ। টপ-টু-বটম্ দুর্নীতির গণতন্ত্রীকরণ ঘটিয়াছে। দুর্নীতির শিকড় এতটাই গভীরে প্রোথিত এবং তাহা অক্টোপাসের মতো সকলকেই এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিযাছে যে কাহারো-মুখ খুলিবার জো নাই। প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া এবং নিজের আখের গুছাইতে ব্যস্ত। রাঘব-বোয়ালরা নিজেরা পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়া তৃপ্তিব ঢেঁকুর তুলিতেছে। উচ্ছিষ্ট ছিটাইয়া পড়িতেছে। সচেতন জনগণ তাহাই কুড়াইবার জন্য নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিতেছে। পরলোক, স্বর্গেব প্রতি কাহারো কোনো আকর্ষণ নাই। টিকিয়া থাকাটাই এখন বিপ্লব।

সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা—উন্নত মানের শাস্ত্রবাণী হইতে পাবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তাহা সর্বনিকৃষ্ট পথ। যাহার সাহস এবং সুযোগ নাই একমাত্র সেই সৎ থাকিতেছে এবং সৎ থাকিয়া দুঃখে ভাসিযা যাইতেছে। সকলেরই বোধোদয ঘটিয়া গিযাছে যে কোনটি আসল স্বর্গ আব কোনটি মরীচিকা। একবার ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া দেখুন, এমন স্বর্গরাজ্য ছাড়িযা স্বর্গলোকে যাইতে আপনারও কষ্ট হইবে।

পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়।

নিবেদন ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
সেবক নারদ।

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

—সাতসকালে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছেন?
—বউ খুঁজতে। মশাই চোখ মেলেই দেখি বউ হাপিস। তা, আপনি?
—গা ঢাকা দিতে। বউ চোখ মেলার আগেই কেটে পড়ছি।

ট্যারা চোখে

দুগ্ধ-শক্তি

বিহার থেকে ট্যাক্সো আদায় বিভাগের (এবং ঘুষ নেওয়ার) ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমশাই, ভাই দাদন সিং পাহালওয়ান যাদব, হালফিলে কলকাতায় চক্কোর মারতে এসেছিলেন। এখানে এসে ফুটপাতের ওপর সংসার পাতা 'গৃহস্বামী' আর ঠেলা রিক্‌শাওয়ালাদের বুকের পাঁজর মার্কা, হারমোনিয়াম চেহারা দেখে বিহারী পালোয়ানদাদার পিলে চমকে গেছে। তিনি একবাক্যে বলে দিয়েছেন—না, না, বুদ্ধের রাজত্বিতে এরকম হাড়ডিগ্‌ডিগে স্বাস্থ্যসম্পদ, হাভাতে বেকারদের মরা মিছিল চলতেই থাকবে, যদি না মন্ত্রীদের দুধ-ঘি খাইয়ে আক্কেল গজানো হয়। দুধের পাওয়ার মারাত্মক আর সুদূরপ্রসারী বলে দাবী বিহারের এই যাদব ভাইয়ের। আগের জন্মে দ্বাপর যুগে বেন্দাবনে জন্মে যাদব কুলতিলক, কেষ্ট ঠাকুরের সঙ্গে তিনিও মা যশোদার লুকিয়ে রাখা ননী-ছানার ডিপো সাফ করতেন কিনা সেটা অবশ্য জানাননি, তবে, আমাদের এই বিহারী শুভানুধ্যায়ী বুদ্ধবাবুকে জানিয়ে দিয়েছেন—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রাবড়িদেবী শুধু নামেই দুগ্ধজাত দ্রব্য নন, প্রতিদিন এত পরিমাণে দুধ-ঘি-ছানা হজম করেন, বিহারের শাসন-ক্ষেতে লাঙল তিনি ছাড়া আর কেউ ভালো চালাতে পারবেন না। পতি লালুপ্রসাদ বেউর জেলে বোতলবন্দী হয়ে থাকলেও তাঁর কিছু যায় আসে না। দুগ্ধবলে বলীয়ান রাবড়িদেবী ওরকম দশটা লালুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে নিজেই বিহারের বলদগাড়ি চালাতে পারবেন। সুতরাং গো-দুগ্ধই রাজনীতির ভাষা, হুমকি এবং যে কোনো লোককে বাঁশ দেওয়ার মোক্ষম দাওয়াই হতে পারে। তবে, পাহালওয়ান এটা ভেবে দেখেননি—লাল বাড়ির পাশে গোরুর খাটাল বানানো যেতে পারে, কিন্তু সেই খাঁটি দুধ খেয়ে পেটরোগা মন্ত্রীরা কতকাল দু'ঠ্যাঙে দাঁড়াবেন—সেটায় সন্দেহ আছে।

—-কৌশিক রায়

সংস্কৃতি দুঃসংবাদ

হ্যালো বাঙলা, কেমন আছেন? আশা করি আপনি খুশি। আপনার দনুজ চরিত্র নিয়ে এখন কলকাতায় উৎসব—বঙ্গ সংস্কৃতি। আশা করি বাস, কার, ট্রামের আওয়াজ ছাপিয়ে আপনি শুনতে পাচ্ছেন লোকগান, আপনার বোমকূপে রোমাঞ্চ লাগিয়ে সেখানের মঞ্চে মানুষেরা পুতুল সেজে নাচ করলেন পঁচিশে ডিসেম্বর রাতে। পুতুল বলতেই আমার মনে পড়ে গেল আপনার কথা। মনে পড়ে গেল এককালে আপনার উঠোনে পুতুলদের নাচানো হত, কথা হত, গান হত। আজ পুতুলেরা নিজেই নাচে। নেপথ্যের শিল্পী আজ চিরতরেই নেপথ্যে। আপনার কথাই বারবার মনে হ'ল আজ। সার সার খাবার আর খাবারের দোকান পেরিয়ে আব্বাসউদ্দিন মঞ্চে পৌঁছতে পৌঁছতে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমাদের সাথে আপনার সম্পর্কে ঘনত্ব এবং দূরত্ব দুই-ই। তবু ভালো লাগল এই দেখে যে বাঙালি টপ স্কার্ট আর মিনি ট্রাউজার্সের চাইতে ঢের পছন্দ করেছেন আপনার সংস্কৃতির কাপড়ের ক্যাঁথাস্টিচ্‌। কুটিরে কুটিরে, জেলায় জেলায় এই চর্চা দেখে মনে ভরে গেল। সত্যিই তো, আমাদের সংস্কৃতিতে এখন প্রচুর কাপড় দরকার, গা ঢাকা দেবার মতো যথেষ্ট যথেষ্ট কাপড় চাই আজ। না হলে চলবে কেন? মার্কাস স্কোয়ারে একদিন আপনি পুতুল ছিলেন। সেদিন ননী আপনি একাই সাবড়ে দিয়েছেন। তারপর ময়দানে সেই আড়াই দশক আগে বাঙালির সব আকর্ষণ নিঙড়ে নিয়েছেন। কিন্তু আজ আপনাকে চিনে ফেলেছি আমরা। এখন পুতুল সাজব আমরাই। আপনি শুধুই দেখুন। দেখে যান। আমাদের প্রথম পুতুল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নাম—কলকাতার শেরিফ। কাম—কিছুই না, শুধুই দর্শনধারী। হ্যালো, বাংলা, শুনছেন-হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো।।।..

একটি বিজ্ঞাপন

জনসাধারণের বিশেষ জ্ঞাতার্থে ও হিতার্থে প্রচারিত

ষাট বৎসর চারি মাস পঁচিশ দিন বয়স্ক এক বালক সম্প্রতি সম্পূর্ণ অনাথ হইয়াছেন। বালকটির জন্য রুচিশীল, ব্যবসা মনস্ক, ধান্দাবাজ, সদুপায়ী অভিভাবক প্রয়োজন।

বালকের বিবরণ

নাম : রবীন্দ্র কপিরাইট

জন্ম দিবস : ৭ই আগস্ট ১৯৪১ , অনাথ দিবস : ৩১ শে ডিসেম্বর ২০০১

আগ্রহী অভিভাবকদিগকে সত্বর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আর্থিক অবস্থা জানাইয়া আবেদনপত্র জমা দিতে আহ্বান জানানো হইতেছে।

পুরনো কাসুন্দি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" (দ্বিতীয় পর্ব) থেকে

বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো?

বিছানা পাতিবার জায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্টচিত্তে মা ভাগীরথীর উভয কূলেব মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। স্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইযাছিল। এই দুই ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথাব উপব দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙ্গালী থাকে ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওযাজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালাব আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার National সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে। এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, তাহা সেইখানেই দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকাব করিযা লইলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময এই যে এতগুলা সঙ্গীতবিশারাদ একসঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নীচে নামা উচিত হইবে কি না, সহসা স্থিব করিতে পারিলাম না। শুনিযাছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে না মুগ্ধ হয়, সে খুন করিতে পারে, না এমনি কি-একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুযের খুন চাপিয়া যায, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণিব পীঠস্থান কি না জানি না; না হইলে কাবুলিযালা গান গায, এ কথা কে ভাবিতে পারে। একপ্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিতেছিল। হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি, হঠাৎ দেখি একব্যক্তি তাহারই অদূবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্যণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক লোকেব চোখরাঙানি মাথায় করিযা এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনেব বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিযা পরিচয দিল। পাশে একটি বিগতযৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে বসিয়া আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুযেব এতবড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়াভুরূ আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায়, ইটি আমার পরি—

কথাটা শেয না হতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিযা গর্জাইয়া উঠিল—পবিবার। আমার সাত পাকের সোযামী বলচেন, পরিবাব। খবরদার বলচি মিস্তিরী,, যার-তার কাছে মিছে কথা ব'লে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্চি।

অমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হযে গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা। রাগ করিস কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর। পোড়া কপাল। জাতবোষ্টমেব মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবর্তের পবিবার। কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তবে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার জো নেই। টগব বোষ্টমী ম'বে যাবে,

তবু জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাতবোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্বে আমাব মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ-দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বাবংবাব বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায, দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক। দেখলেন। আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরেব পরিবারেব চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইযা প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাতবোষ্টমীব কথাগুলা মনে করিযা হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁযে এবং শহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা শুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওযা বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে। তবে এমন হইতে পারে বটে, এ দেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই।

আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ হইতেছিল। বাত্রি একটাব পরে সামান্য জল ও হাওযা হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্টশান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্রপীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতবাং বমি করাব দায়টা আমি একেবারে এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সপবিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি কবিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিযা উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহাব বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিযা ছিল, আমাকে দেখিযা প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্বে একটা কলহেব মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা কবিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই। মা গো মা, কি কাণ্ডই হযে গেল।

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিযা, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন-কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশভাজা বিক্রি করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙ্গার নীচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মসুরি-খেঁসারি সব একাকার করে দেয়, দেবতাব কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ হ'ল যে-যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিযা কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জিয়া উঠিল—আবার। ফের।

না, তবে থাক, বলিযা নন্দ উদাসীনেব মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্তিমান নোংরা একজোড়া কাবুলিয়ালা আপাদমস্তক সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইযা অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অতবড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওযা হবে না বল?

পবিবাব কহিল, মবণ আব কি। হবে কি ক'রে শুনি।

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকালে একটু বেলা হ'লে—

নন্দ আমাব মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্যি একহাঁড়ি বসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্যন্ত বলচি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিসনে—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে।

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই পুনবায সেই হতভাগ্য কাবুলীকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ কবিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পাবিনে। ওই দেখুন ভাঙ্গা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময তার রস; এব বেশি যদি কিছু জানতে চান ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, তা যাক, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত।

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবাব দেখা ত টগব!

টগর একটা ছোট পুঁটলি পা দিয়া ছুঁড়িযা ফেলিয়া দিযা বলিল, দেখাও গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাবুলী জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটি অমনি বেঁধে দেয। ফেলিস নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাস আমি ত হো-হো করিযা হাসিযা ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগবের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র-কর্কশ-শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিযা টগর চীৎকার কবিয়া উঠিল—জাত তুলে কথা ক'যো না বলচি মিস্তিবী—ভাল হবে না, তা বলচি—

চীৎকার-শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদেব বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালোমতোই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টাব জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইযা তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাশা করেচি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার বামে ও একবাব দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইযা, গলাব সুর আরও এক পর্দা চড়াইয়া দিযা বলিল, কিসের তামাশা। জাত তুলে আবার তামাশা কি। মোচলমানের রুটি দিয়ে মালসা-ভোগ হবে? তোর কৈবর্তের মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্ গে—বাপেব পিণ্ডি দিস্।

জ্যা-মুক্ত ধনুব মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইযা উঠিয়াই টগবের কেশাকর্ষণ কবিযা ধরিল—হারামজাদি, তুই বাপ তুলিস্!

টগর কোমবে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্। বলিয়াই আকর্ণ মুখব্যাদান করিযা নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধ তুমুল হইযা উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিযা ঘেবিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া ভুলিযা উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা ছি-ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল—সবসুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিযা গেল।

নতুন কাসুন্দি

[বিভাগটি নূতন। অবশ্যই যাঁহারা এতদিনেও খ্যাতির বৃক্ষচূড়ে চড়িতে পারেন নাই তাঁহাদিগের জন্য। সন্দেহ নাই, গাছে চড়াইয়া মই সরাইয়া লওয়াই সম্পাদকের দুরভিসন্ধি। ভালো থাকিবেন, ভবিষ্য বৃক্ষারূঢ়দিগের প্রতি এই আগাম শুভকামনা।]

বিয়ের পঁচিশ বছর

পিনাকী ভাদুড়ীর “অবকাশে নিযুক্ত আছি” গ্রন্থ থেকে (প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৯২)

বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষস্য ভাগ্যং নির্ধারিত হয়ে যায়। বিয়ের পঁচিশ বছর পরে বসে ভাবলে মনে হয় যে শেষ সুখের দিনটি চলে গেছে পঁচিশ বছর আগে, তার পর থেকে গৃহপালিত বন্দীজীবন চলেছে। পরশুরামের লেখা গল্পে বংশলোচনবাবু ফাঁক পেলেই যে বইটি পড়তেন, সেটি হল—How to be happy though married. আমরা দুই বন্ধুতে কথা বলছিলাম এ নিয়ে। দু'জনেই প্রায় একই সময়ে বিয়ে করেছিলাম, একজন প্রেম করে, অন্যজন সম্বন্ধ করে। দু'জনেরই এখন স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে যাবার মুখে। আমরা দুই স্বামীই এখন আসামীর কাঠগড়ায়। নিজের বিয়ে করা পুরুষটি ছাড়া পৃথিবীর আর সমস্ত পুরুষই বউকে খুশি করতে পারে। এ বিষয়ে বিড়লা এবং রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও কোনো তফাৎ হবার কথা নয়। বিড়লার বউ একথা ভাবতেই পারেন যে তাঁর স্বামী টাকা ছাড়া কিছু চেনেন না, আর রবীন্দ্রনাথের বউ বলতে পারতেন যে তাঁর স্বামী তো শুধু কবিতাই লেখেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে গেছেন। রাত করে ফিরে দেখলেন ভাত ঠাণ্ডা, বউ গরম। এটা আমাদের সবার সঙ্গেই মিলবে।

আমার বউ এ বিষয়ে পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল পাতানো সম্পর্ক, এ কখনোই সারাজীবন টিকবে না। তবু তাই নিয়েই চালিয়ে গেলাম। অফিসে বর্বর এবং বাড়িতে বর্বরা—এরাই বরাবর আমার জীবন বিশ বছরের বেশি বিষ করে দিয়েছে। কোনোদিনই বউ আমার বশ হল না, মতান্তর দাঁড়াল মনান্তরে। আমার যখন শীত করে, বউয়ের তখন পাখা চালাবার দরকার হয়। আবার যদি আমি পাখা চালাতে চাই, বউ তখন এমন আপত্তি করে যে পেরে উঠি না। আমি যা খেতে ভালবাসি, বউ ঠিক সেইটিই দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমি এবং আমার বন্ধু—উভয়েরই চালচলন বিপরীত। আমি সন্ধ্যার পরেই বাড়ি ফিরি, আমার বন্ধু তখন বেরোয়। আমার বউ বলে, ঘাড়ের ওপর বসে থাকো কেন, কোথাও যেতে পারো না? দেখো তো তোমার বন্ধুকে, কেমন বাইরে-বাইরেই থাকে।

ওদিকে বন্ধুর স্ত্রী বলে, রাত করে কোথায় ঘোরো? বাড়িতে থেকে একটু সাহায্যও তো করতে পারো।

আমার এক জ্যাঠাইমা বলতেন, পুরুষমানুষ বাইরে থাকবে, দরকার মতো টাকা পাঠাবে, ব্যস।

বিয়ের পর বছরখানেক বেশ কেটেছিল। প্রথম বার্ষিকীতে বউকে শাড়ি দিলাম, বন্ধুদের মিষ্টি খাওয়ালাম। পরের বছর থেকেই সেসব উঠে গেল। এখন বিয়ের তারিখে দু'জনেই খুব সংযত হয়ে থাকি, যাতে ঐদিনটা অন্তত কোনো ঝগড়াঝাটি না হয়। গোমড়ামুখেই থাকি, কেউ এসে পড়লে হাসিমুখ দেখাই, আমার কোনো মজার কথায় বউ হাসেও তখন। অর্থাৎ ধোঁকার টাটি বজায় রাখি।

আমার বউয়ের মতে, আমার মাত্র তিনটে দোষ—অকম্মা, নির্বোধ এবং স্বার্থপর। আমি এসবের কোনো জবাব দিই না। কারণ এর জবাব দিতে গেলে রাগতে হয়, আর আমি যদি রেগে যাই তবে বউ এমন ক্ষেপে যায় যে ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে যেতে হয়। একবার বউকে কী একটা অনুযোগ করেছিলাম, করেই বুঝলাম ভুল করেছি। কারণ বউ এমন আপসাতে লাগল যে ভয় পেয়ে গেলাম। আমাকে নাকি যথেষ্ট যত্নই করা হয়, এতেও যদি মন না ওঠে তবে আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। সে প্রায় নাটকীয় অভিসম্পাতের দৃশ্য।

আমার সেই লোকটির কথা মনে হয়, যে জাঁক করে বলেছিল, ঝগড়ার শেষে রোজই তার বউ মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এইটুকু বলেই সে ভেবেছিল যে বাহবা পাবে, কিন্তু সবাই জানতে চাইল, যে বউ কী বলেছিল তখন। সকলের চাপাচাপি এড়াতে না পেরে ইতস্তত করে তাকে বলতেই হল যে হেঁকে বলেছিল—খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আয় মুখপোড়া।

দেখেশুনে, অনেক খবরাখবর করে, শাঁখায়-সিঁদুরে যে মেয়েটিকে ঘরে এনে তুললেন, সে কীভাবে আপনার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ওঠে, বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা মেলে না। আমি একজনকে দেখেছি, স্ত্রী ত্রিসীমানায় না থাকলেও সে চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খেতে পারে না, কারণ তার স্ত্রীর ওটা পছন্দ নয়।

আরেকজনকে দেখেছি, তার স্ত্রী তাকে কখনো একলা ছাড়ে না, লোকটি বলেছিল যে নরকে গিয়েও বোধহয় রেহাই মিলবে না। আমার সেই ভদ্রলোকের কথা মনে হয়, যাঁকে তাঁর ছেলে প্রশ্ন করেছিল—বাবা, একটা বিয়েতে কত খরচ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, বলতে পারি না, আমি তো এখনো খরচ করে যাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে আমার দেখা একটি বিজ্ঞাপনের কথা বলি। পলাতকা স্ত্রীর স্বামী কাগজে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি আমার বউকে নিয়ে পালিয়েছেন, তাঁকে আমি খরচ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি তিনি বউকে ফেরৎ দিতে চান, তাহলে আমি তাঁর নামে অপহরণের মামলা করব।

বোধহয় এইজন্যই এক স্ত্রী যখন তাঁর স্বামীর কাছে আহ্লাদ করে জানতে

চেয়েছিলেন যে কখন আমাকে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তখন স্বামী বলেছিলেন, যখন তুমি বাপের বাড়ি থাকো।

স্বর্গরাজ্যেও বিবাহিতদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি যখন স্বর্গের দরজায় টোকা দিয়েছে, তখন দরজা খুলে তার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে সে বিয়ে করেছে কিনা। সে হ্যাঁ বলায়, প্রশ্নকর্তা স্বীকার করলেন, তবে তো তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ, এসো স্বর্গে এসো। কিন্তু তার পরে যে লোকটি এসেছিল, সে যখন বলেছিল যে সে দু'বার বিয়ে করেছে, তখন তার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, স্বর্গে কোনো মূর্খের স্থান নেই।

আমি অনেকবার ভেবেছি স্ত্রীর মোকাবিলা কীভাবে করা যায়। সিলভার জুবিলিতে এসে কবুল করি যে বিয়ের সিলভার লাইনিং হল শ্যালিকা। স্ত্রীর টোটকা হল স্ত্রীর বোন। বিয়ের সংকীর্ণতা সে কাটিয়ে দিতে পারে। যে মেয়ের বোন নেই, তাকে বিয়ে করা আর বনে যাওয়া একই। বনে বাঘ, বিয়েতে বাঘিনী। শ্যালিকা অবধারিত আপনার অনুরাগিনী। আপনাকে দিয়েই সে তার বয়ফ্রেণ্ডের মহড়াটা দিয়ে নেয়। দিদির হাতে জামাইবাবুর দুর্দশা দেখে তার করুণাই আপনার জীবনকে মরু হতে দেবে না। কখনো সে মরীচিকা, কখনো মরূদ্যান। আশায়-তামাশায় আপনাকে জিইয়ে রাখবে ঐ শ্যালিকা। বৌ নানা খোঁটা দেবে, বলবে তোমাকে নাচিয়ে হাসাহাসি করছে, বুঝছ না। কিন্তু আপনার তাতেই সুখ। পুরনো বউয়ের জন্য নতুন শাড়ি কেনার কোনো মানে হয় না, বরং শালীকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলে ভালো লাগবে। অবশ্য এসব করেও আপনি বৌকে শেষপর্যন্ত টেক্কা দিতে পারবেন না। কারণ তখন বৌ বলবে, সেই তো আমার বোনের কাছেই যেতে হল।

শ্যালিকা অবশ্য তার দিদির কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। সে সুন্দরী এবং সুমিষ্টভাষিণী। আপনাকে আবদেরে গলায় বলবে—চলুন আপনার বিয়ের তারিখে সবাই মিলে হোটেলে যাই। বিষম লাগবে গলায়, তবু এই অসম খরচে দমকা মেরে নেমে পড়তে হবে। শুধু শালীকে নিয়ে গেলে যা হতে পারত মহার্ঘ, সবাইকে নিয়ে যেতে হলে তাতেই টান পড়বে মহার্ঘ ভাতায়। সকলেই অতিথি, আপনি গৃহস্থ। আর সকলে নারায়ণ, আপনার কপালে নারায়ণসেবা। সুকুমার রায়ও বলে গেছেন—আমি আছি, গিন্নি আছেন—গিন্নির বেলায় সম্ভ্রমসূচক 'আছেন', উনি আছেন বলেই তো আমি আছি।

বিয়ের পঁচিশ বছর এইভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল, ডিভোর্সটা করে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু শাদির পয়লা রাতে বেড়াল মারা হয়নি, এখন ডিভোর্সের হুমকিতেও কাজ হবে না। হয় মোটা খোরপোষ বার করে নেবে, নয়ত বলবে, ডিভোর্স দেখাতে এসেছ? কে তোমায় ডিভোর্স দেয় দেখি একবার। তোমার বুকে বসেই দাড়ি ওপড়াব।

সঙ্গিনী নিয়ে সঙ্গীণ অবস্থায় রয়েছি। অবশ্য আমার আর এক যুগলের কথা মনে পড়ে, তাঁরা আমাদেরও টেক্কা দিয়েছেন। এখন তাঁরা উভয়েই গতাসু। পরপারে তাঁদের দেখা হয়েছে কিনা জানি না। সেই মহিলা তাঁর স্বামীর নামে অভিযোগ করে প্রবাসী পুত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি অবিকল উদ্ধৃত করি—

'তোমার বাবার জন্য আমার শান্তি নাই। সর্বসময় পিছনে লাগিয়া থাকে। কোথায় যাই, কী করি, কাহার সহিত কথা বলি, একেবারে গোয়েন্দার মতো নজর করে। ধমক দিয়া সরাইতে হয়। অবশ্য কথাও শোনে। এই চিঠি সে-ই লিখিয়া দিতেছে।'

স্ত্রীর মুখ থেকে চিঠিটির ডিক্টেশন নেবার সময়ে স্বামী কী ভেবেছিলেন, তা কোনোদিনই জানা যাবে না। তবে, আনুগত্যের এই ক্লাসিক উদাহরণটি উপহার দেবার জন্য এঁদের উভয়কেই জানাই কৃতজ্ঞতা।

ট্যারা চোখে

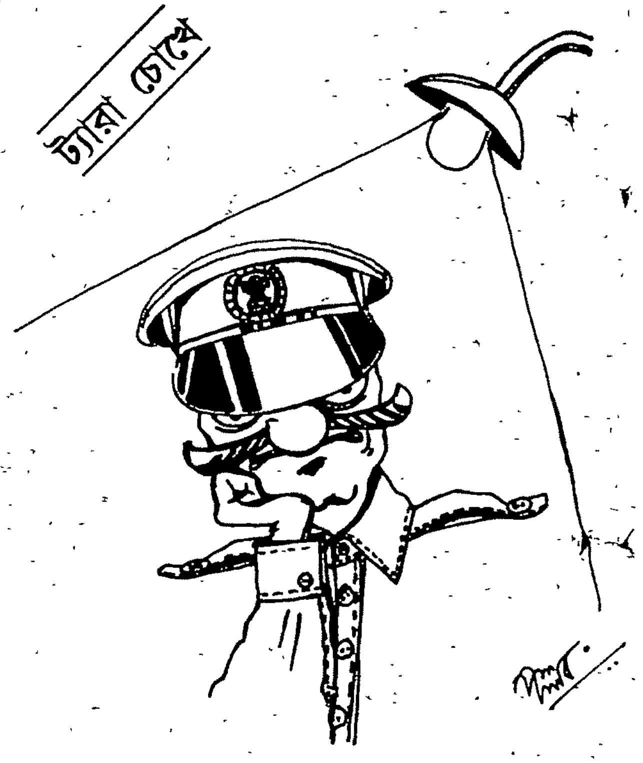

মধ্যরাতের বাবু

গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ময়লা বুশশার্ট আর ধস্তানো প্যাণ্টুল। পায়ে পুরনো চপ্পল। বাবু একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। বালিগঞ্জ থেকে। উদ্দেশ্য বেশিদূর নয়, ওই নবদ্বীপ পর্যন্ত। রাতও বেশি হয়নি এমনকিছু—সবে সাড়ে বারোটা। এমন ঘোর সময়ে ঘর থেকে বেরুলে মহাপ্রভুর গৃহত্যাগই তো টানবে। তফাৎ এই, মহাপ্রভু কেটেছিলেন পায়ে হেঁটে, চুপিসাড়ে, আর ইনি পাড়া জাগিয়ে, মারুতি হাঁকিয়ে।

রাণাঘাট লেভেল ক্রসিং পেরোলেন দেড়টা নাগাদ। এক ঘণ্টায় ?- আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি চড়ে আছেন মারুতিতে, আর মেজাজ স্টিয়ারিং ধরেছে তাঁর মগজে। হাইওয়ের ওপর হঠাৎ বেরসিক পুলিশদল বাদ সাধল শুভযাত্রায়,—অ্যাই। এত রাতে গাড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?

—নবদ্বীপ।

কনস্টেবল্ চেঁচিয়ে উঠল অফিসারের উদ্দেশ্যে,—ও স্যার, কার গাড়ি চুরি করে পালাচ্ছে। আবার মাল খেয়ে আছে।

এগিয়ে এলেন অফিসার,—কাগজ দেখা, কাগজ পত্তর দেখা! লাইসেন্স দেখা... .বলতে বলতে আর একটা গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কাগজপত্র, লাইসেন্স দেখতে দেখতে কনস্টেবলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—ব্যাটা, ক্রেডিট কার্ড পর্যন্ত চুরি করে এনেছিস?....

হঠাৎই কনস্টেবলের স্বর কুঁকড়ে গেল,—ও-ও-ও স্যার। ছবি এক, নাম এক—চোর নয় স্যার, মালিক!

অফিসার এগিয়ে এলেন,—তুমি, ইয়ে, আপনি—মাঝরাতে কী করছেন নবদ্বীপ, অ্যাঁ?

—বউদির সঙ্গে মাঝরাত্তিরে কখনো ঝগড়া হয়নি আপনার?

অফিসারের মুখ করুণ হয়ে গেল,—চান্স পেয়েছি মশায়? বউ আর বের করে দেবে কি, রাত হলে ডিউটিই যে রাস্তায়।

—মৈনাক মিত্র

একটি কাল্পনিক প্রতিবেদন

শিক্ষা দুঃসংবাদ

ফজল আলি

অপারেশন টিউশন

প্রাইভেট টিউশন নিয়ে শেষপর্যন্ত সমস্ত জল্পনা-কল্পনাব অবসান ঘটল। বাজ্য সরকার প্রাইভেট টিউশনকে আইনি স্বীকৃতি দিতে চলেছেন। সবকাবি সমীক্ষায় জানা গেছে, টিউশন পড়া এবং টিউশন পড়ানো দুটিই এখন সর্বনাশা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাইভেট টিউশন পড়া একালে সামাজিক মর্যাদাব প্রতীক। যে অভিভাবক সন্তানকে কোচিং সেণ্টার কিংবা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠান, প্রমাণ হয় তিনি যথার্থই বিদ্যানুরাগী। সামাজিক মর্যাদা লাভ এবং বিদ্যানুরাগী হওয়ার নেশায় অভিভাবকেরা তাই মুক্তহস্ত। প্রাইভেট টিউটরেরা আর এক নেশায় মত্ত। যার যত কাস্টমার, নাম-ডাক তত তার। এই নাম-ডাকের নেশায় তাঁরা বুঁদ হয়ে থাকেন। তাঁদের জীবনদর্শন : টাকা মাটি মাটি টাকা, নামের জন্যে বেঁচে থাকা। সন্দেহ নেই, উভয়পক্ষই নেশাগ্রস্ত। এ নেশা বন্ধ করা সরকারের সাধ্যাতীত। সরকার তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই নেশার ওপর আগামী আর্থিক বছব থেকে হিসেব মাফিক কর বসাবেন। সঙ্গতভাবেই সরকারি আবগারি বিভাগ ঐ কব সংগ্রহ করবে। আবগাবি বিভাগকে সেজন্যে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

সমীক্ষায় প্রকাশ, একালের বাচ্চাদেব হাতেখড়ি হয় প্রাইভেট টিউটরের কাছে। প্রাইভেট টিউটবরাই তাদের ঈশ্বব। ছোটবেলা থেকেই এই ঈশ্বরপ্রেম তাদের মনে গেঁথে যায। বযস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঈশ্বরপ্রেম প্রবল থেকে প্রবলতর হয। আরো দেখা গেছে, বাচ্চাদের ডাক্তারের ফি যেমন বেশি, বাচ্চাদের প্রাইভেট টিউটরের ফি-ও তেমনি জেয়াদা। সরকার তাই প্রত্যেক শিশুব অভিভাবক এবং শিশুর টিউটরেব ওপর নির্দিষ্ট পবিমাণ ট্যাক্স বসাবেন।

ট্যাক্স সংগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার করতে সরকার একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রি-প্রাইমারি, প্রাইমারি, সেকেণ্ডারি, হায়ার.সেকেণ্ডারি, কলেজ, ইউনিভার্সিটি—বিভিন্ন পর্যায়ের জন্যে টিউশনের ওপর সরকার আলাদা হারে ট্যাক্স বসাবেন। এব একটা অংশ আসবে অভিভাবকদের কাছ থেকে, অন্য অংশটি জোগাতে হবে প্রাইভেট টিউটরদেব। কোচিং সেণ্টার বা টিউটোরিযাল হোমের ক্ষেত্রে মালিকদের।

ছেলে-মেয়েকে প্রাইভেট টিউটর বা কোচিং সেণ্টার বা টিউটোরিয়াল হোমে পাঠাতে হলে অভিভাবকদের নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না নিলে কঠোর সাজা হবে। এমনকি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীকে এই অপরাধে বহিষ্কারও করা হতে পারে।

অন্যদিকে প্রাইভেট টিউটর, কোচিং সেণ্টার আর টিউটোবিয়াল হোমকে সবকারের কাছে ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীব সংখ্যার ওপর নির্ভর করবে সরকারি ট্যাক্সের পরিমাণ।

প্রকল্পটি চালু হলে, সরকার হিসেবে করে দেখেছেন, সরকারি কোষাগারে ফি বছর কযেকশ কোটি টাকা জমা পড়বে। সে টাকা, সবকার ঠিক করেছেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালযের উন্নয়নে খরচ হবে। শুধু তাই নয়, সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে অসংখ্য বেকার তরুণ-তরুণীকে চাকরিও দেওয়া যাবে।

ট্যাক্স সংগ্রহের ব্যবস্থাটি যথাসম্ভব সহজ-সরল কবা হচ্ছে। শহরে মিউনিসিপ্যাল ভবনে এবং মফস্বলে পঞ্চায়েত অফিসে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে এই ট্যাক্স জমা দিতে হবে। তাব বিনিময়ে টিউশন পড়ুযা আর টিউটর বা টিউটোবিয়াল প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুমতি দেওযা হবে। এ প্রকল্পের আইনগত দিকগুলি খতিযে দেখাব জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আইনজ্ঞদের কাছে পাঠানো হযেছে। সরকার যথাশীঘ্র তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানাতে বলেছেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর ধাবণা, টিউশন পড়া এবং পড়ানো সম্পর্কে একটি মডেল ব্যবস্থা এ বাজ্যে চালু হলে ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যান্য বাজ্যেও তা চালু হবে। আমবাই এক্ষেত্রে পাযোনীযর অর্থাৎ পথিকৃৎ হযে থাকব।

সরকার এ প্রকল্পের নাম দিয়েছেন 'অপাবেশন টিউশন'। অনেক ভেবেচিন্তেই সরকার এ প্রকল্প নিয়েছেন। টিউশন পড়া এবং টিউশন পড়ানো যখন সমাজের সমস্ত স্তরে এক ধরনের নেশায় পর্যবসিত, তখন টিউশন বন্ধেব ধুয়ো তোলার কোনো মানে হয় না। সরকার বরং ট্যাক্স বসিযে ব্যাপারটিকে আইনি বৈধতা দিতে চান। আর নেশার মতো সংক্রামক বলেই একে আবগারি দপ্তরের অধীনে রাখতে চান। এখন থেকে তাই মদ, গাঁজা বা আফিঙের দোকানের পাশে টিউটোরিয়াল হোম কিংবা কোচিং সেণ্টার খুলতে বাধা রইল না।

'অপারেশন টিউশন' থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থাগমের সম্ভাবনা দেখা দেওযায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আসন্ন বাজেট অধিবেশনে আবগারি বাজেটকে আরো উদার ও প্রগতিশীল করার কথা ভাবছেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি এজন্যে বেশ কয়েকটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। মায়াবী একটি শ্লোগান তিনি নাকি রাজ্যের কোণে কোণে পৌছে দিতে চান। তা হল. 'টিউশন পড়ো, টিউশন পড়াও, রাজ্য সরকারের আয় বাড়াও'।

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

শুক-সারী বিসম্বাদ

টেলিফোনে কথা শুনেই মালুম হল সুখময়ের স্ত্রী-সংহিতার পাতা ছেঁড়ার আয়োজন হয়েছে। খুব অনুনয় করে বলল আমি যেন একবার যাই। নিশ্চিত ছিলাম, কিছু পরে সুখময়-জায়া কুন্তলার ফোনও আসবে। না, কোনো জ্যোতিষবিদ্যার কুশলতা বশত নয়। নিতান্তই অভিজ্ঞতা। ইতিহাসের মতন অভিজ্ঞতারও পুনরাবৃত্তি ঘটে। আর ধুন্ধুমার দাম্পত্যের পুনরাবর্তনই জীবনকথার পূর্বাপর কথকতা।

বছরে তিন-চার বার পালাক্রমে, ওদের বিচ্ছেদ-বাসনা, যাকে বিচ্ছেদ আমোদও বলা চলে, গেঁজিয়ে ওঠে। ফলং বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া! তবু গট্ আপ গেম বলা যাবে না। অস্ত্রবর্ষণের সময় কর্ণার্জুনের যুদ্ধের কথা মনে হওয়া অতীব সঙ্গত। অস্ত্র অবশ্যই শব্দ, বাক্য, হাত-মুখ-চোখের মুদ্রাভাষ্য। তবে এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় হয় না। হয় নিঃশর্ত সন্ধি। দিন দুয়েক সুখময়ের পানাধিক্য ঘটে। কুন্তলার ডাক্তারের বিল আর ওষুধের তালিকা স্ফীত ও দীর্ঘতর হয়।

ওদের ছেলে সস্ত্রীক থাকে সিঙ্গাপুরে। মেয়ে স্বামীর ঘর করছে মস্কটে। সুখময় চাকরি ছেড়ে অধুনা চৌথসবৃত্তি, কনসালট্যান্সি করছে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের কাজ উকিল-ডাক্তারের মতনই, টিল ডেথ অ্যাপার্টস। বা যেন আদ্যন্ত দাম্পত্য। কুন্তলা হাতে-পায়ে যাতে বাতের ছোঁয়া না লাগে সেজন্য নারী-প্রগতির পতাকা নিয়ে সময়ে সময়ে নানা কিছু করার দাবী জানায়।

আমি অবশ্য বলি, যেদিন কিছু করার থাকে না, বা জীবন যাপনে নুন-লঙ্কা শূন্য পানসে স্বাদ লাগে তখনই দু'জনে গলায় বিছুটি ঘষে নেয়। ফুসফুসের ব্যায়াম হয়। গলায় শ্লেষ্মা থাকে না। আমাকে দুটো টেলিফোন ধরতে হয়। চল্লিশ বছরের বন্ধুর জন্যে এটুকু করতে আমার কুণ্ঠা নেই।

ভাবছিলাম, এবারের বিষয়টা কী? শেষবার ছিল মেয়ের জন্য নলেনগুড় বা জয়নগরের মোয়া পাঠানোর বিরোধ। শেষ পর্যন্ত দু'টোই পাঠানো হয়েছিল। তার আগেরবার ছিল ছেলের জন্মদিনে ছেলেকে আসতে বলবে নাকি নিজেরাই যাবে। কোনোটাই হয়নি। ছেলে চলে গিয়েছিল জাভা ভ্রমণে।

আমার ভাবনার মধ্যেই কুন্তলার ফোন এল। বলল, এবার চলে যাবই। আপনার বন্ধুর সঙ্গে আর থাকা সম্ভব না।

বললাম, তুমিও তো আমার বন্ধু।

কুন্তলা নাক টেনে (টেলিফোনে ঠিক শুনতে পাই) বলল, সেজন্যেই তো আপনাকে ফোন করছি। আপনাকে না বলে তো যেতে পারি না।

গিয়ে দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষের অবস্থা। শুধু শবের গন্ধ আর বিধবার রোদন নেই। তবে দীর্ঘ শব্দ-যুদ্ধের আন্দাজ মেলে। দু'জন দু'ঘরে বসে আছে। বিশাল ফ্ল্যাটে, (ষোলশ' বঃ ফুঃ) দুই মহাদেশে যেন।

বললাম, খাওয়া হয়েছে কিছু?

কুন্তলা বলল, এই ঘরে আমি জলস্পর্শও করব না।

আমি সঙ্গে গরম প্যাটিস আর কেক নিয়েছিলাম। বললাম, এগুলো খাও। জল খেতে না চাও, কোলা খাও।—আমিই বোতল বের করে বলি, খাওয়ার আগে কিচ্ছু শুনব না।

সুখময়ের জন্যে আমার কষ্ট হল। বেচারার ঈষৎ ভীমাকৃতি। খাদ্যরুচিও তদনুরূপ। উপোস সয় না। ওর খাওয়া দেখে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের আহারদৃশ্য উপমা হিসেবে মনে হওয়াটা শোভন না হলেও অসমীচীন হবে না। কুন্তলা কুট্‌কুট্ করে খাওয়ার সময় আড়চোখে নজর রাখে—স্বামী ঠিক খাচ্ছে কি না। আমি ওকে একটা অতিরিক্ত প্যাটিস দেওয়ায় সুখময়ের মুখের প্রফুল্লতা দেখে কুন্তলা বলে ওঠে, ষাট বছর বয়েস হল, এখনো নোলা কমল না।

সুখময় বলল, শুনলি তো? সকাল থেকেই চলছে। বাজার থেকে চার রকমের মাছ এনেছি। ওই এক কথা—এত খেয়েও নোলা কমল না। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি না মেছোর হাট?

কুন্তলা বলে, কেন বলেছি, তার আসল কারণটা বলতে বলুন।

আমি বললাম, দু'জনেই শর্ত ভাঙছ! আগে ইটিং পরে ফাইটিং।

খাওয়া চুকলে বললাম, সুখো তুই যা। লেডিজ ফার্স্ট। পরে তোর কথা শুনব।

কুন্তলা বলল, চরণদা, আপনি তো জানেন, কত কষ্টে, কত যত্নে এই ফ্ল্যাট সাজিয়েছি। তিল তিল করে গুছিয়েছি সব। দু'জনে একটু আরাম করে থাকব বলে। কিন্তু ও চায় না আমি থাকি। আমি চলেই যাব। এই একটা স্যুটকেসে সামান্য জামাকাপড় নিয়েছি। আর কিচ্ছু নেব না। সব থাকবে। ওর যা খুশি করবে। যাকে খুশি দিক, আমি কিচ্ছু বলতে আসব না।

—কোথায় যাবে ভেবেছ কিছু?

—ছোড়দার কাছে যেতে পারি। সেজ জামাইবাবু, জামশেদপুরে থাকেন, তিনি কবে থেকেই যেতে বলছেন। ও ভেবেছে কি আমার কোনো যাবার জায়গা নেই!

সুখময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল, সেজ জামাইবাবুর স্ত্রী মারা গেছে তিনমাস আগে। সুতরাং—

কুন্তলা ফোঁস করে ওঠে,—দেখলেন? দেখলেন কী অসভ্য মানুষ!! সবাই তোমার মতন নয়।

সুখময় বলল, আমি শুধু চরণকে খবরটা দিয়েছি। আর তো কিছু বলিনি। সব তথ্য ঠিক ঠিক না জানলে ও তো আমার বিরুদ্ধে সাপ্রেশন অব ফ্যাক্টের অভিযোগ করতে পারে।

বললাম, তুই যা এখন। হ্যাঁ, কুন্তলা বলো। এবারের সমস্যাটা কী?

কুন্তলা বলল, সমস্যাটা নতুন নয়, আগেও ছিল। অনেক বলেছি। ও কিছুতেই শোধরাবে না। আমার পক্ষে আর বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।

—একটু খুলে বলো।

—কী যে বলি, কী করে যে বলি। আপনি কী জানেন, ওর অন্য নারীর প্রতি প্রবল আসক্তি?

—অন্য নারী? কে, কার কথা বলছ?

—একজন হলে তো বলব। সব নারীর প্রতিই ও আসক্ত। এই বয়সেও মেয়ে দেখলেই ওর সড়সড় করে।

—কী সড়সড় করে?

—কী আবার।—মুখ বেঁকিয়ে যোগ করে,—নোলা।

—সব নারী? এটা ঠিক বলছ না। ক্যাসানোভাও পারেনি, লর্ড বায়রণও পারেননি। ও তো সামান্য মর্টাল। বায়রণ নাকি বলেছিলেন, দু'জন শুধু বাদ থেকেছে; মাদার—হুম্ আই শ্যুড নট্, আর কুইন—হুম্ আই কুড্ নট্।

—নিজে পুরুষ তো। বন্ধুর হয়ে বলবেনই। জানেন, সব পার্টিতে ও মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে লগ্ন হয়, পিঠে হাত দেয়, সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরে, গোপনে কথা বলে মেয়েদের সঙ্গে? দেখা-সাক্ষাৎও করে। গতকাল ওর চেম্বারে গিয়েছি। ঢোকার মুখে একজন মহিলার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে আর কি। মহিলা ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল। কী বলে একে?

—কুন্তলা, ও প্রফেশনাল মানুষ। ওর কাছে মহিলারা তো আসতেই পারে। আজকাল সব কাজেই তো মহিলারা আছে। কিছু কিছু অফিসে মহিলারাই প্রেফারড্। তাছাড়া চেম্বারে ও কী করতে পারে?

—ও আপনি বুঝবেন না। আমি ওর চোখমুখ দেখলেই বুঝতে পারি। আমি এখন অপরিচিত মেয়েদের দিকেও চোখ তুলে চাইতে ভয় পায়। কেবল মনে হয়, এও হয়ত আমার স্বামীর সঙ্গে শুয়েছে, এবং আমাকে দেখে মনে মনে হাসছে। এমন অপমান লাগে।—বলেই ভেজা চোখ মোছে।

আমি বলি, সে কী। তোমার তো গর্ব হবার কথা। অমন রমণী-বিজয়ের কেতন ওড়ানো মানুষটা তোমার আসামি—

ঝাঁঝিয়ে ওঠে কুন্তলা,—ছি ছি চরণদা, আপনিও আমাকে ঠাট্টা করছেন। আমার যে কী যন্ত্রণা—

বললাম, একটা কথা বলো তো, যাদের কথা বললে—ওই পিঠে হাত, জড়িয়ে ধরা—সেই মহিলারা কোনো অভিযোগ বা প্রতিবাদ করেছে?

—না। কেন করবে প্রতিবাদ? ওরাও তো মজা পায়। সব স্টারভড্ অ্যাণ্ড পারভার্টেড উওম্যান।

সুখময় ডেকে বলি, ওর অভিযোগ তোর জানা। কিছু বলার আছে?

সুখময় বলল, প্রথমেই বলার, বাবা যে আমার ভুল নাম রেখেছিলেন, দুঃখময় সংসারে, সুখময়, তার কৈফিয়ৎ কার কাছে চাইব? চরণ, আমি কি ক্লায়েণ্টকে বলতে পারি, কোনো মহিলা পাঠাবেন না আমার কাছে? সেদিন কেছরিওয়াল তাঁদের একজন অ্যাকাউন্টেন্টকে পেপারস্ দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, ফর মাই পেরুজাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্রুভাল। মহিলা আমার চেম্বারে ছিলেন মিনিট পনেরো। তাই নিয়ে এত কাণ্ড। আমাকে কোনো মহিলা, এমনকি ওর বান্ধবীও যদি ফোন করে, অশান্তি। মহিলাদের সঙ্গে কথা বলাতেই ওর আপত্তি। কোনো মহিলা যদি আমার হাত ছুঁয়ে বা পিঠে কিল মেরে কথা বলে, ও তার অন্য অর্থ করে। হাজার বুঝিয়েছি—তোমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, কোনো স্ক্যাণ্ডাল বা অ্যাফেয়ারে এ বয়সে জড়াবার প্রশ্নই আসে না। তবু, আমি ঘর থেকে বেরুলেই ওর চোখে জিজ্ঞাসা। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সব ওকে বলতে হবে। বলি, যথাসাধ্য বলি। সব কি পারা যায়? ক্লায়েন্ট ক্লাবে নিয়ে গেল হঠাৎ। কেন গেলাম? ক্লায়েন্ট না হাতি, নিশ্চয় কোনো মহিলা ছিল। বল, কী বলব? বলে কি জানিস, আমি কি কোথাও একলা যাই? বারন তো করিনি। বরং বলি, যাও, বন্ধুদের সঙ্গে যাও। ভাইবোনদের বাড়িতে যাও। ও যাবে না।

কুন্তলা বলে, আমার অন্য কারো সঙ্গে যেতে ভালো লাগে না। চরণদা, ও বোঝে না যে ও ছাড়া আমার জীবনে আর কিছু [illegible]ই।

বললাম, তবে যে চলে যাবে বলছিলে?

—যাবই তো। থাকতে চেয়েছিলাম। ও চাইছে না যে আমি থাকি।

—তুমি ওর, কি যেন, সড়সড় করা বন্ধ করতে চাও?

—হ্যাঁ।

—এ জন্যেই শাস্ত্রের বিধান ছিল, পঞ্চাশোর্ধ্বে বাণপ্রস্থ। তাহলে ওকে হিমালয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি। অথবা আমার আখড়ায় নিয়ে যাই?

সুখময় বলল, তাই কর চরণ। এই ফ্ল্যাট, গাড়ি, টাকা-পয়সা যা আছে, সব কুন্তলার নামে লিখে দিচ্ছি। ও থাকুক এখানে। যা ইচ্ছে করুক। তুই আমাকে নিয়ে চল। আমিও মুক্তি পাই।

বললাম, তাহলে ওই কথাই রইল, কুন্তলা। কাগজপত্র তোমার নামে করে সুখো জানালেই আমি এসে নিয়ে যাব।

কুন্তলা উঠে এসে স্বামীর পাশে বসে বলল, না।

—কী না?

—আমার কিছু চাই না।

—তাহলে সব রামকৃষ্ণ মিশনের নামে করে দিক।

—না।

—তাহলে তুমি চলো, সেজ জামাইবাবুর কাছে।

—না।

—কী?

—আমি যাব না।

বেরিয়ে আসার আগে বললাম, অত আঁটো বাঁধন ভালো নয়। দু'জনেই দু'জনকে একটু স্পেস দাও—যাতে মুক্ত বাতাস বইতে পারে। আর, বিশ্বাস নদীর পাড়ের মতন। ভাঙতে শুরু করলে থামে না। ওটাকে ভঙ্গুর হতে দিও না।

টীকা নিষ্প্রয়োজন

বুনো রমানাথ

দেশ ও দশ

সংবিধানের ভাষাতেই বলি 'ইণ্ডিয়া' তথা ভারতে রাজনৈতিক দলের সঠিক সংখ্যার সম্যক কোনো ধারণা আমার নেই। আমার কেন, কারুরই নেই। মোটামুটি একটা আন্দাজ অবশ্য করা যায়। যেমন ধরুন তিনশ একুশও হতে পারে আবার দু'হাজার চারশ ছত্রিশ বা ছাপান্ন হওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়। হাজার হোক আন্দাজে ঢিল মারা তো, গুনতিতে অমন একটু উনিশ-বিশ হতেই পারে।

মোদ্দা কথা আমাদের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক পরিবেশে হুজ্জুতি অনেক। রাজনৈতিক লড়াইটা ঠিক আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মতো ওয়ান-টু-ওয়ান, অর্থাৎ রিপাবলিকান বনাম ডেমোক্রাট বা লেবার বনাম কনসারভেটিভ নয়। এখানে নির্বাচন-ময়দানে কুম্ভমেলার মতো ভিড়। তাঁবুতে পতাকা উড়িয়ে রাজনৈতিক দলগুলো গেড়ে বসে। ওয়ান-টু-ওয়ান বলে কোনো ব্যাপারই নেই এখানে। লড়াই চলে শয়ে শয়ে। আবার দলে-দলেও দল পাকানো আছে এখানে। সেটাকে বলে নির্বাচনী 'সমঝোতা'। অর্থাৎ কিনা ক, খ, গ, ঘ, ঙ দলগুলো নির্বাচনের মুখে (এমন কি পরেও) একজোট হয়ে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ জোটের বিরুদ্ধে লড়ে যায়।

অথচ সব দলগুলির অন্তত মুখে মুখে মুখ্য বুলি এক · দেশ এবং দশ। দেশের কল্যাণ এবং দশের মঙ্গলার্থেই সবাই প্রতিশ্রুত। দেশ এবং দশের হিতার্থেই 'জীবনং ব্রত' তাদের। ল্যাঠা তো তবেই চুকেই গেল, লড়াইটা তাহলে কীসের? রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা হয়ত বলবেন—দিগ্‌দর্শনের। পথটা কী। দেশ এবং দশের মঙ্গল ও কল্যাণ তো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে মুড়িউলির ঝুলি থেকে তুলে নিলেই হল। দেশ ও দশ বলে কথা, এবং তাদিগের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন নিয়েই কর্মকাণ্ড। ব্যাপারটা কাজে কাজেই ঠিক ছেলের হাতে মোয়া ধরানোর মতো সহজ নয়। বুঝলাম। কিন্তু অতঃ কিম্?

দিগ্‌দর্শন। দেশ ও দশের মঙ্গল ও কল্যাণ কোন পথে? ডাইনে না বাঁয়ে, নাকি মাঝ বরাবর? লড়াইটা এই পথ নিয়েই—রাইট, লেফ্‌ট না সেণ্টার? তাই যদি হয়, তবে তে-রাস্তার মোড়ে এসে যে পথিক পথ হারিয়েছে তার সমস্যাটা তো ত্রিমুখী—ডাইনে চল, বাঁয়ে পা দাও, নয়ত সোজা নাকবরাবর হাঁটা দাও। রাস্তাটা তো আর শতমুখী বা সহস্রমুখী নয়, তবে এত টানা হিঁচ্‌ড়োনো কেন? কিন্তু ওই যে আলেকজাণ্ডার দ্বিজেন্দ্রলালের কলমে বলে গেছেন · "সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ।" এখানে বাঁ শুধু বাঁ নয়, এক বাঁয়েরই অনেক লেবেল—মার্কস-লেনিন বাঁ, নির্ভেজাল মার্কস বাঁ, লেনিন বাঁ, ট্রট্‌স্কি বাঁ,, স্ট্যালিন বাঁ, মাও সে তুং বাঁ, আরো কত—তার হিসেব নেই। ডানেরও সেই দশা।

এক 'আগমার্কা' কংগ্রেস তো আছেই সেই বাপ-দাদার আমল থেকে,, এখন প্রায় সব স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণে চিহ্নিত হুদো হুদো কংগ্রেস। আর যারা ইদিকেও আছে উদিকেও আছে, অর্থাৎ গাছেরটাও খাচ্ছে আবার তলারটাও কুড়োচ্ছে, তেমন দলের সংখ্যাও কিছু কম নয়। অতএব যত মুনি তত পথ। আর যত পথ তত চুলোচুলি দেশ ও দশের মঙ্গলার্থে ও কল্যাণার্থে। এমত অবস্থায় দেশ যদি উচ্ছন্নে যায় আর দশ যদি গোল্লায় যায় যাক, তাই বলে তো আর দেশ ও দশের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনায় কোনো রাজনৈতিক চৈতন্য সম্পন্ন দলের নীরব থাকাটা ঠিক শোভা পায় না। উদ্দেশ্য মহৎ—দেশ ও দশের মঙ্গল ও কল্যাণ। সেটাই বড় কথা। এখন তার ফল যদি হয় দেশ ও দশের উচ্ছন্নে কিংবা গোল্লায় যাওয়া তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর দোষটা কোথায়? বাস্তবিকই তো, শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন, বাবা, তোমার কর্ম তুমি করে যাও, 'মা ফলেষু কদাচন।'

তবে ওই যে ছড়ায় আছে "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"। প্রেস্ ক্লাবে এক রাজনৈতিক দলের তাত্ত্বিককে ছড়াটা শুনিয়েছিলাম। তিনি দাবড়ে দিলেন · ছাড়ুন তো মশাই ওসব ছেলে-ভুলোনো ছড়া। গীতার ভাষ্যর চেয়ে পিসি-মাসির মুখে শোনা ছড়াটাই আপনার কাছে বড় হল।

দেশ ও একাদশ

শুধু কি দেশ ও দশ। দেশ ও একাদশ নিয়েও ইদানীং ঝামেলাটা কিছু কম যাচ্ছে না। ক্রিকেট খেলাটাকে সাহেব কর্মকর্তারা ক্রমশই ডিকেন্সের আমলের ভয়াবহ পাবলিক স্কুলের ধাঁচে ঢেলে সাজাবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। দোষ অবশ্য সাহেবদের খুব একটা দেওয়া যায় না। উষ্মা ওনাদের হতেই পারে। হাজার হোক খেলাটা শেখালো সাহেব-সুবোরা, আর এখন করে খাচ্ছেন তেণ্ডুলকর, জয়সূর্য, মুরলিধরন, লারার দল। ওয়ার্ল্ড কাপ এখনো পর্যন্ত ইংরেজ সাহেবদের কপালেই জুটল না। তবু যাহোক, পাকা সাহেব না হলেও অস্ট্রেলিয়ান সাহেবরা কিছুটা মুখ রক্ষা করেছে।

এক ব্রাড্‌ম্যানকে বাদ দিলে ক্রিকেট খেলার প্রায় সব রেকর্ডগুলোই এখন কালোদের কব্জায়। আর ওই তেণ্ডুলকর ছোঁড়াটা যদি আর পাঁচটা বছর

বল্লাবাজি করে, তবে তো হয়েই গেল। 'বডি-লাইন' বল করে একদিন ব্রাড্‌ম্যানকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছিল ইংরেজ। পারেনি। এখন দ্বিতীয় ব্রাড্‌ম্যানকে ঠেকাতে হেডমাস্টারি শুরু করে দিলে লর্ডসের লংরুমের বড় কর্তারা।

এতদিন মাঠে দুটো ড্রিল মাস্টার দিয়েই ছোঁড়াদের শাসন করা হচ্ছিল। এবার এল তৃতীয় মাস্টারমশাই—থার্ড আম্পায়ার। এবং অতঃপর ডিকেন্স আমলের পাবলিক স্কুলের কড়া হেডমাস্টার, ম্যাচরেফারি এখন ঠ্যালা সামলাও।

সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের পরই হেডমাস্টারের ঘরে ডাক পড়ল ভারতীয় একাদশের। একটা টেস্ট ম্যাচ তখনো বাকি আছে। হেডমাস্টার ডেনিস দি মেনাস কাপ্তান সৌরভ এবং তেণ্ডুলকর সহ ভারতীয় একাদশের ছ'জনকে শুধু ফাইনই করলেন না, একরকম "বাস্টিগেট" করলেন। তেণ্ডুলকরের অপরাধ—ছোঁড়া নাকি বলের কাদা পরিষ্কার করার অছিলায় বলে খোঁচাখুঁচি করছিল। আশ্চর্য, মাঠের দুই ড্রিল মাস্টারমশাইয়ের বল খোঁচাখুঁচি চোখে পড়ল না, কিন্তু হেডমাস্টার তাঁর খাঁচায় বসে সব দেখে ফেললেন! সৌরভের অপরাধ—সে তার ছেলেদের দুষ্টুমি বন্ধ করতে পারছে না। আর চারজনের অপরাধ, বিশেষ করে সোহাগের, অতিরিক্ত 'অ্যাপীল' করা। সাউথ আফ্রিকার পোলকের 'অ্যাপীলের' অছিলায় বাঁদুরে নাচ টেলিভিশনে সারা দুনিয়া দেখল, হেডমাস্টারমশাই দেখতে পেল না। আর পেলেই বা কি, সে তো সাহেব-সুবোদের 'ট্যাঙ্গো' নাচ, ভাংড়া তো নয়।

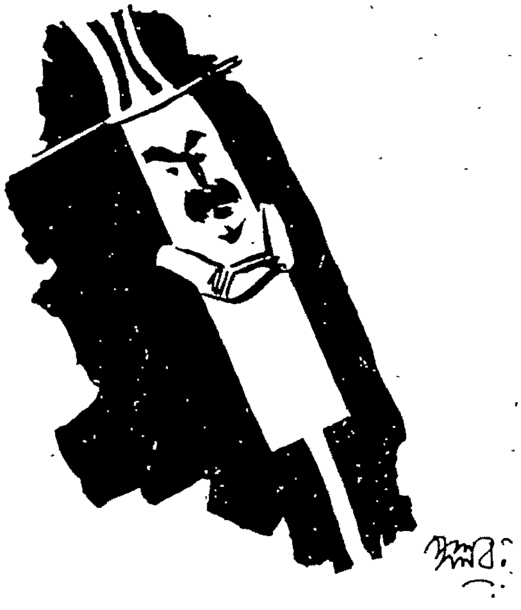

যাক, তবু সাউথ আফ্রিকার সাহেবদের কাছে গুঁতোই খেল ভারতের একাদশ। কিন্তু মাস কাবার না হতেই সেই ভারতীয় একাদশ, 'রাস্টিগেটেড' সোহাগ ছাড়াও, খোদ ইংলণ্ডের সাহেবদের যে গুঁতো দিল তার তো একটা বিহিত করা চাই।

অবশ্য দেশের একাদশের খেলার যা ছিরি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় বিহিত নিজেরাই করে নেবে। কাগজে-কলমে আর ভারতীয় ভাষ্যকারদের ভাষণে দেশের একাদশ অবধ্য। সাত-সাতটা দুঁদে বল্লাবাজ, তার ওপর বোলিং-এ ভারতীয় স্পিনের যাদু। কিন্তু কাগজ-কলম এক আর মাঠ-ময়দান আর এক বস্তু। বিশেষ করে বিদেশ বিভুঁইয়ের মাঠ-ময়দান। সেখানে পাঁচ দিনের খেলায় তিন দিনেই কুপোকাত হয়ে যায় দেশের একাদশ। তেণ্ডুলকরকে বাদ দিলে হারাধনের দশটি ছেলে মাঠে কোথায় যে হারিয়ে যায় কে জানে। লক্ষ্মণ কবে যে ঘি খেয়েছিল, এখনো ওর হাত শুঁকে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞের দল। দ্রাবিড় এমনই "টেকনিক্যালি পারফেক্ট ব্যাট্" যে বছর পার হয়ে গেল, এখনো ভাইস কাপ্তেন অফ্-স্টাম্পটি যে কোথায় থাকে, ঠিক ঠাওর করতে পারছেন না। সঞ্জয় মঞ্জরেকরেরও এককালে এই 'টেকনিক্যালি পারফেক্ট ব্যাট্' দুর্নাম বা সুনামটা ছিল। অবশ্য ক'টা বছরই বা টিকে ছিল সঞ্জয়। বাকি তো সব "লিপ্ ইয়ার" প্লেয়ার। চার বছরে একবার হাত খোলে। ওই একবারই। কারণ চার বছর টেকেই না এরা।

ভারতীয় 'স্পিন' যাদু? এখন বোধহয় যাদুঘরে। মাঠে-ময়দানে তো আজকাল শ্যেন ওয়ার্ন আর মুরলিই পি. সি সরকার আর হুডিনি।

ট্যারা চোখে

রবীন্দ্র কপিটাইট

সারা দুনিয়ায় কেউ যা করে না, বিশ্বভারতীর বিশ্বখেলায় তাই হল। ১৯৯১ সালে কচি খোকার বায়না সামলাতে সরকার রবীন্দ্র রচনাবলীর চুষিকাঠিটির মেয়াদ দশ বছর বাড়িয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে দশবছরও পার। কিন্তু খোকার বয়স বাড়লেও খোকাপনার বয়েস বাড়ে না। বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে বাজপেয়ীজি এবং জোশীজিকে পেয়ে আবার তাঁরা বায়না শুরু করেছেন—কপিরাইট থাক। রবি ঠাকুর বিশ্বজনীন, মানে বিশ্ববাসীর, তাঁর বইগুলিও বিশ্বজনীন—মানে বিশ্বভারতীর। তাঁদের নাকে কান্না—রবীন্দ্র রচনা হল জাতীয় ঐতিহ্য। জাতীয় ঐতিহ্য কখনো জাতির হাতে সহজে তুলে দিতে আছে? রবীন্দ্রনাথ তরুণদের হেঁকে বলে গেছিলেন—

সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়—
আমরা বলি—
ও পাণ্ডাদের ধর্ তো দেখে দেখে
জিজ্ঞেস কর্ ক'জন নিজে লেখে
বিট্‌কেলদের কলম যাবে বেঁকে—
অমনি ধ'রে দিস ঢুকিয়ে খাঁচায়।

—সুচতুর গুপ্ত

৭৫তম বিবাহ বার্ষিকী

সত্যবান মিত্র

(তিনবার শাঁখের আওযাজ, .. হাততালিব শব্দ .... শব্দ মিলিযে আসছে. ..

বক্তার গলা ভেসে এল ....)

" আমাদের এই ছোট্ট শহব অরূপনগরের প্রবীণতম মানুষ পবম শ্রদ্ধেয় ভোলানাথ দাস ও তাঁব সুযোগ্য সহধর্মিণী দযামযী দেবীকে বরণ করা হল। যে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেযেরা শঙ্খ বাজাল, মালা-চন্দন পরাল—তাদের কাবো পিতার পিতামহেব সঙ্গে, কারো পিতামহেরও পিতামহেব সঙ্গে 'শিশু ভোলানাথ' একদা ডাণ্ডাগুলি খেলতেন — একথা ভাবতেও রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনাবা সকলেই জানেন এঁদেব কথা; এই জীবন-শিল্পী দম্পতি আজ কিংবদন্তী হযে গেছেন। আজকে এঁদেব বিবাহেব হীবক জযন্তী। সু-উ-উ-উ দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর এঁবা শান্তিময দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। আজকে অরূপনগরের বিজয়া সম্মিলনীতে এই উপলক্ষে আমবা এই দম্পতিকে সম্বর্ধনা জানানোর এমন বিরল সুযোগ পেযে ধন্য।

"এঁদের জীবন-কথা আলোচনাতেও পুণ্য; এঁদেব জীবণাচবণকে আদর্শ কবতে পারলে ঘরে ঘবে শান্তির দুর্গ গড়ে উঠবে। কিন্তু ইয়ে আমরা তা পেবে উঠি না। এঁরা পেরেছেন, এক অকল্পনীয় অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

"এই শহবে যাঁরা নবাগত তাঁবা হযত ভাবছেন দীর্ঘ আযু লাভ কবলেই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন লাভ কবা যায, তা হযত সত্য। বস্তুত এ কাবণেই এঁবা সম্বর্ধনা নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। এর আগে সেদিনেব গজিয়ে ওঠা "টোয়েন্টি ফার্স্ট" ক্লাব এঁদেব 'মেড ফর ইচ আদার' পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করেছিল, প্রত্যাখ্যাত হযেছে সে প্রস্তাব। এঁবা সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পলকা তকমা কি হর-গৌরীর অঙ্গে শোভা পায? আমাদেরও বলেছেন, 'বুড়ো-বুড়িকে আবাব টানা-হ্যাঁচড়া কেন? কোন গৌরবেব কাজ করেছি আমবা তা তো জানি না।'

"হতেই পাবে। পুষ্প কি জানে সে সুগন্ধ বিতরণ কবছে? রামধনু কি উপলব্ধি করতে পাবে তাব বর্ণময সুষমা? এভাবেস্টের কোনো ধারণা আছে তাব সুমহান উচ্চতা সম্পর্কে? ইলিশ কি টের পায—তার স্বাদটি যে অলৌকিক? তেমনি এঁবাও জানেন না এঁদেব যুগ্ম জীবনের স্নিগ্ধ সৌরভে আমরা কতটা আমোদিত। এঁরা অবশেষে যে সম্বর্ধনা নিতে রাজি হযেছেন সেজন্য আমরা গভীর কৃতজ্ঞ।

"এঁদেব দিকে তাকিয়ে আমাদের বিস্মযের সীমা থাকে না, যখন ভাবি দী-ঈ-ঈ-র্ঘ পৌনে এক শতাব্দী কালে এঁদের একটি দিনের তবেও, এমনকি সামান্য মনোমালিন্যটুকুও কখনো হয়নি। এই কৃতিত্বই অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়। হ্যাঁ, অঘটন আজও ঘটে। যাঁরা বিবাহিত তাঁরা ভাবলে স্তব্ধ, বিমোহিত, বিহ্বল হয়ে পড়েন। এখানে এমন কেউ আছেন, যাঁবা এঁদেব মৃদুতম কথা কাটাকাটি বা কুসুম-উষ্ণ বাক্য বিনিমযও শুনতে পেয়েছেন কখনো। তেমন কেউ থাকলে হাত তুলবেন..... না, জানতাম একটা হাতও উঠবে না। আমরা আমাদের জীবিত বা মৃত বাপ-ঠাকুর্দার কাছেও কখনো শুনিনি এমন কথা। শহরের তিন-চার প্রজন্ম এঁদের কৃতিত্বে বিমুগ্ধ। আমাদের বাড়িতে যে-সব কাক-চিল বসতে পাবে না, যুগ যুগ ধবে তারা ভোলাদাদুর গৃহমন্দিবের শীর্ষে, আনাচে-কানাচে বৃক্ষশাখায বাসা বেঁধে আসছে। কাকের কণ্ঠস্ববও যে পবিবেশেব গুণে কতটা নম্র হতে পাবে তা তাঁবাই জানেন, যাঁরা ঐ পবিত্র শান্তিনিকেতনের পাশ দিযে হেঁটেছেন।

"তাই বলছিলাম, সম্বর্ধনা তো তুচ্ছ, নোবেল শান্তি পুরস্কার দিলেও এই দম্পতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওযা হয় না।

"আমি অনেকটা সময় নিলাম। অনেক বিশিষ্ট মানুষ অপেক্ষা করে আছেন এঁদের প্রণাম, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। তাঁরা একে একে সংক্ষেপে, দু'চাব কথায তা জানাবেন। তাবপর মানপত্র পাঠ, ...এটি... ইয়ে... আমারই বচনা। সবশেযে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে সামান্য কিছু উপহার প্রদান করা হবে এই দম্পতিকে।"

(পব পর করেকজনেব বক্তৃতা . ঘোষণা . দফায় দফায় হাততালি মৃদু ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়ে . আবার প্রথম বক্তার কণ্ঠ—)

"আমাদেব সম্বধর্নার পালা শেষ। এবার আমাদের প্রার্থনা ভোলাদাদুর কাছে। তিনি তাঁদের শান্তি-সাধনাব গোপন রহস্য সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।"

(মাইক-টানাটানির আওয়াজ, বৃদ্ধের গলা খাঁকারি, এবং বৃদ্ধের ঘড়ঘড়ে গলা...)

"রহস্য টহস্য কিছু নেই, সাতানব্বই বছর বযস হল, এক পা বাড়িয়েই আছি, এবার বলা যায।

" দেখো বাবারা, আমরা বিবাহেব দিনই একটা শান্তিচুক্তি করেছিলুম। জানতুম, বিবাহ হল যখন, কলহ হবেই। চুক্তি করেছিলুম— কোনো রকম মতান্তরেব সূচনা হলেই এক পক্ষ হার মেনে নিয়ে বাগানে খানিকক্ষণ পাযচারি কববে। তাহলে ঝগড়া শুরুই হতে পারবে না। তা এই নীতি মেনে চলে শান্তি তো লাভ কবেইছি, দীর্ঘ পরমাযুরও অধিকারী হয়েছি; কেননা বাবারা, (দীর্ঘশ্বাস) আমি প্রায পঁচাত্তব বছর বাগানে পাযচারি করে-করেই বেড়াচ্ছি।....."

ধারাবাহিক কবিতা

পরিচালনা : কাব্যিটকেল কবিরাজ

বিরহ মঙ্গল

মৈনাক মিত্র

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

তুমি নাই তাই আজ চাই চাই
তরলিত বিরহের কণা
আমার হৃদয়ে পাখি বাঁধিতেছে প্রেমরাশি
এ তো নহে কবি-কল্পনা।
(চিতা বহ্নিমান)

সাফল্য

ভূতলেন্দু ভৌমিক

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

এ তো নহে তুচ্ছ কোনো কথা, কাল রাতে দেখেছি স্বপন—
আমার কাব্য পড়ি যুবক-যুবতীগণ করিতেছে মত্ত কল্লোল
বরষার অশান্ত সমুদ্রের ন্যায়।
(চিতা বহ্নিমান)

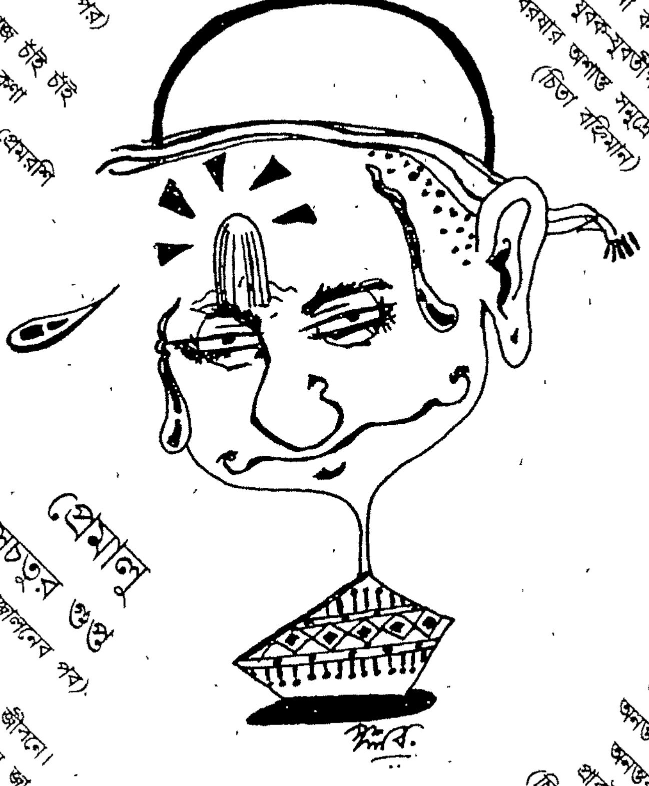

প্রেমান্ন

সুচতুর গুপ্ত

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

অভিজ্ঞতা এ নশ্বর জীবনে।
ও আমার প্রেম, কপালে অকালে জাগা প্রেমাঙ্ক
দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো রাবণের চিতার মতো।
(চিত্রা বহ্নিমান)

আগামী

শেখরেন্দু দত্ত

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

এই জীবন
এই ক্ষুন্নমন
অনন্ত জীবন
অনন্তের
প্রাপ্তায়ন
(চিতা বহ্নিমান)

ভালো, কবিতা চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হইবার জন্য কিছু আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে। কিন্তু সবেদন নিবেদন এই যে, যে কবিতাগুলি আপনারা পাঠাইয়াছেন তাহা পত্রপাঠের পত্রের পরিবর্তে ঝুড়িতে ঝাঁপ মারিয়াছে। সবগুলি কবিতারই মানে বোঝা যাইতেছে। এমন দুর্বোধ্য কবিতা আমরা বুঝিতে পারি না। একটু সহজ করিয়া লিখুন, যাহার অর্থ কবিতার ন্যায় কল্পনা করিয়া লইতে হয়। তবেই না পাঠকও কবি হইয়া উঠিবে। কবির সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে সবাই কবি হইয়া উঠিবে, তখন আর পাঠক থাকিবে না, কবিতার অর্থ খোঁজারও দায় থাকিবে না। যথার্থ কবি কখনো অন্য কবির কবিতা পড়েন না, কবিতাপাঠ অনুষ্ঠানে শোনেনও না। তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি কবিতা বাসরে নিজের কবিতাটি পাঠ করিয়া শুধুমাত্র নিজেই শোনেন।

—ভবদীয় কা. ক.

গাড়ির গায়ে কর্তা-গিন্নি সম্বাদ

গৌতম কুমার দে

> এক মিনিবাস তো বেশ কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই লিখে দিয়েছে—'কর্তা পাগল, পাগল-ছাগল/মুখ-এ নেই রা।'

টুং-টাং, সাঁই সাঁই, বলছে গাড়ি—সময় নাই। ছুটে চলেছে বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট কাব, অটো, লরি, ম্যাটাডোর, টেম্পো, রিকশা আরো কত কি। গলগল কবে বেবিযে আসছে কালো ধোঁযাব বিশৃঙ্খল কুণ্ডলী, আব তাব মধ্যেই আপনার নজর কেড়েছে আবছা আঁধাব মাঝে এক চিলতে উজ্জ্বল চলন্ত বাণী, যে বাণীব ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে কর্তা-গিন্নিব ধ্রুপদী সম্পর্কটি।

যানবাহনের জগতে গাড়ি হল 'মালিক কা দৌলত, ড্রাইভার কা পসিনা, চলতি হ্যায় গাড়ি বোড পে, মহব্বত কা হাসিনা' (লরির পিছনে)। নিজেব অজান্তে গাড়িই হয়ে যায ড্রাইভাবের প্রেয়সী কাম গিন্নি—'পাটনা সে নিকলি কুঁযাবি, হাওড়া সে শিঙ্গার হুযা, বড়াবাজাবমে ঘব বনাযা, ঔব ড্রাইভাবসে প্যার হুয়া।'

কর্তা-গিন্নি জয়েন্ট ভেঞ্চাবের সূচনা পর্বে সবচেযে মধুর ব্যাপার—প্রেম নিঃশব্দ চরণে চবণে ঘুবেফিবেই আসে। প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়ে উত্তরপ্রদেশ-আগত লরির পিছনে লেখা উর্দু শায়েরীতে—'দিল বরবাদ কী ভি কহনেওযালে দিল হি কহতে হ্যায/খিজাঁ দীদা চমন কী ভি চমন কহনা হি পড়তা হ্যায়।' ভাবার্থ : প্রেমহীন শূন্য হৃদযকেও হৃদয বলতে হয। এ যেন ঘাস-পাতা-ফুলহীন শুকনো বাগানকেও বাগান বলাব মতো। কিন্তু মরুভূমিকে নন্দনকানন বলা কতদুর সঙ্গত?

কেউ প্রেমেব (থুড়ি, বলা উচিত আন্ম্যাবেড গিন্নিব) দুর্নিবার মায়াবী আকর্ষণের অন্তবালবর্তী বিপদ সম্পর্কে বলছে : 'সমঝনা ইশ্ক্‌কো আফৎ ঔর উস আফৎ মে ফঁস জানা/ গবজ দানাভি হম কিতনে হ্যায়, ঔব নাদান কিতনে হ্যায'। অর্থাৎ প্রেমে সমূহ বিপদ আছে জেনেও (তার সঙ্গে যোগ করুন গিন্নির কড়া শাসন আর শাসানিব কাঠগড়ায দাঁড়াতে হবে জেনেও) আমবা (পড়ুন, কর্তাবা) তাতে নিজেদেব জড়িযে ফেলি। হায, কর্তাকুল একই সাথে কত না স-বুঝ আবাব কত-না অ-বুঝ।

প্রেয়সী কাম গিন্নিব নির্মম নিষ্ঠুর আচরণেব প্রতি সমাজের পক্ষপাতিত্বে ক্ষুব্ধ প্রেমিকা কাম কর্তাব বিপন্ন বিস্ময —'ম্যায উফভি করতা হ্যায় তো হো যাতে হ্যায় বদনাম/লেকিন ওহ্ কতল কবতে হ্যায তো চর্চা নেহি হোতে'।

ছেড়ে-যাওযা (পবিভাষায যাকে বলে 'তোমার সাথে ঘব করে ঘেন্না ধরে যাবাব' আগে) হবু গিন্নিব প্রতি কাবো সকাতব জিজ্ঞাসা—'ফুল তুমি ফুটেছিলে/ঝরে যাবে বলে/ভালো তুমি বেসেছিলে/ছেড়ে দেবে বলে?' এর হিন্দি সংস্কবণ চোখে পড়েছে আসানসোলে (লরির পিছনে) . 'ফুল খিলতে হ্যায, /ফিব বিখব জাঁতে হ্যায়; /সব খো জাতে হ্যায/দর্দ জম জাতেঁ হ্যায'। এসব দেখে আরেক বাহনেব সান্ত্বনা—'হম ইশ্‌ক কে মাবোঁকা ইৎনা হি ফসানা হ্যায/বোনেকি নেহি কোঈ, হসনে কো জমানা হ্যায়'। পাগলা-কর্তার প্রেমিক জীবনেব সাবসত্য—তোমাব দুঃখে চোখের জল ফেলাব মতো কেউ নেই এ দুনিয়ায, তবে তোমাব কীর্তিগাথায় তির্যক হাসি হাসতে সাবা দুনিয়া উন্মুখ হয়ে আছে। এক মিনিবাস তো বেশ কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই লিখে দিযেছে—'কর্তা পাগল, পাগল-ছাগল/মুখ-এ নেই রা।'

কারো অনুযোগ—'ফুল খিলতি হ্যায, গাড়িমে উঠতি কিঁউ নেহি?/ ড্রাইভাবকো প্যায়াব করতি হ্যায, লেকিন বোলতি কিঁউ নেহি?' প্রকৃতিব কাছে কাবো অনুযোগ ও প্রার্থনা কার্যত মিলেমিশে একাকার—'ইযে বাদল, তু ইত্‌না না ববয কি ও আ না সকে; ঔর ও আ যাযে তো ইত্‌না বরস্‌ কি ও যা না সকে।'

আজকাল মেয়েরা গিন্নি হিসেবে যথেষ্ট প্রগতিশীল। বিবাহোত্তর জীবনে তাঁবা তাঁদের বর্তমানে কর্তা অতীতে প্রেমিক সম্পর্কে ঘটমান বর্তমানে 'পোড়ামাটির নীতি' অবলম্বন কবে থাকেন।

কেউ ভালোবাসাব পুঁতিতে গেঁথে চলে তার মানসপ্রতিমা—
'এ তো নহি কি তুমসা জঁহামে হাসিন নহি
ইয়ে দিলকা কেয়া কর্ক কী বহালতা কহী নেহি'

(তুমি পৃথিবীর সুন্দরী কুলাশ্রেষ্ঠা না হতে পারো কিন্তু আমার নাছোড়বান্দা হৃদয় যে কেবল তোমাকেই চায়।) কেউ বা বাংলায লিখেছে—'বাগানের ঝরা ফুল আকাশের তারা/আমি কি থাকতে পাবি তোমাকে ছাড়া।' গিন্নিস্তানে গিন্নিবাজত্বে এ সবের খুব একটা মূল্য আছে বলে তো মনে হয় না। আপনারা কী বলেন?

একবগ্গা প্রেমে-পাগল আনম্যাবেড এক কর্তা বলে কিনা—'শিশিরে কি প্রেম হয, জল না হলে?/দুর থেকে কি প্রেম হয কাছে না এলে?' কেউ কিছুটা ব্যাকুল—'কেযা হুঁ খুশ্ হ্যায়?' কারো আশ্বাস—'ঠহরো, হাম আ রহা হ্যায়'। সংশয় মেশানো প্রশ্ন . 'ভুলে থাকা ভালো, তবে ভুলে থাকা কি যায়?' ('... শুনছ কি বেলা, শুনছ?...' হায় বঞ্জন প্রসাদ।) তেলের ট্যাঙ্কার বলছে—'তুমি ভালো থাকলে আমিও ভালো'। তবে একই বনে বাঘ আর সিংহ দু'জনেই কি করে ভালো থাকতে পারে তা অমাব অন্তত জানা নেই। তাই বোধহয় ভুল ইংরেজিতে অটো লিখেছে—'When I am looking back to see / If you are looking back to me!'

'বিয়ে হয় একবার, প্রেম হয় বারবার'—এই অটো-বাক্যটি আমায় পুলকিত করলেও আমি হঠকাবী হতে হোঁচট খেয়েছি। কেননা প্রায় পবমুহূর্তেই পরপর চোখে পড়ল—'বিয়ে হবে একবার, জেরবার বারবার' কিংবা 'চিঠি বট়ী পহার পর চিনি কে বাস্তে, লেড়কি শিঙ্গার করতি হ্যায়, লড়কে কে বাস্তে' অর্থাৎ পিঁপড়ে চিনির জন্য পাহাড়ে ওঠে, আর মেযেরা (পড়ুন গিন্নিরা) ছেলেদের (পড়ুন কর্তাদের) জন্যই সাজগোজ করে। কেউ বলছে 'ছেলেরা মেয়েদের থেকে সাবধান' কিংবা 'পত্থ গিরতা নেহি, হাওযা মে গিরা দেতি হ্যায়, / লড়কা বিগড়তা নেহি লেকিন লেড়কি বিগড় দেতি হ্যায়'। 'মেযে' 'লেড়কি' এ-সবই আসলে যা গিন্নি সর্বভূতেষু, চাই-কি, শক্তিররূপেণ সংস্থিতা।

সব দেখেশুনে বিশেষজ্ঞের অভিমত 'ভালো বাসো, প্রেম করো না'। অর্থাৎ বিবাহোত্তর জীবন পুরোপুরি নিরাপদ নয়। তাছাড়া 'সচল প্রেম হতে সাবধান।' কেননা, 'সচল প্রেম' হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বিচিত্রগামী, সর্বোপবি উন্মার্গগামী। বাহ্যজ্ঞান লোপ সহ চক্ষুলজ্জা প্রবলভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এই নার্সিসাসীয় মাদকতায় হৃদয়-ক্রীড়া অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু টেম্পোর ঘোষণা—'কা কস্য পরিবেদনা।' 'প্রেমের ফাঁদ পাতা এই ভুবনে কখন কে কোথায ভেসে যায় কে জানে?'

শেষ করব আমার এক অগ্রজ বন্ধুর সত্য ঘটনা বলে যিনি তাঁর স্ত্রীর ঘরে ঢোকার মুখে দরজার ওপরে বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছিলেন—'প্রাতঃস্মবণীয়'। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তিনি যদি সেই ম্যাটাডোরটিকে দেখতেন, যাব পিছনে লেখা ছিল—'বিশ্বাসের বাবা মারা গেছে'—তবে এটিও লিখে দিতেন।

কর্ম-সংস্কৃত

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ন বাম সরকারের মর্মশূল বলে বদলা উসুল করতে তাঁরা কাজকর্মে সংস্কৃতায়ন চালু করতে চেযেছিলেন। তার একটি ফতোয়া ছিল—কাজেব ডায়েরি। বস্তুত এটিকে অকাজের ডাযেরিই বলা চলে। চা খাওযা, সিগারেট ফোঁকা, খবরের কাগজ পড়া, ক্রিকেটেব আলোচনা করা, ইউনিয়ন বা কো-অর্ডিনেশন কমিটির দায়-দায়িত্ব পালন করা—ইত্যাদি সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের পর অকাজে সময় নষ্ট করার সময় কোথায় ? সে আদেশ Back to pavelion. কর্ম-সংস্কৃতিতে যে সংস্কৃতের গন্ধ থেকে যায়। তবে আর সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকারের সঙ্গে প্রাসনতন্ত্রীয় বামফ্রন্ট সরকারের তফাৎ কোথায? কী লজ্জার কথা, অমেরুদণ্ডী অধ্যাপককুল কোথাও কোথাও এখনো এটি লিখেই চলেছেন। আশা করা যায় খুব শিগগিরই অভয়বাণী ঘোষণা কববেন সরকার—ঢের হয়েছে, আর নেই দরকার।

—মৈনাক মিত্র

প্যা-পা

১৫২ এ মহাত্মা গান্ধী বোডে গান্ধীজি তাঁর চরণযুগল সার করে বর্তমান। তাঁর দরিদ্রনারায়ণ শরীর-ভাণ্ডারের খুদকুড়ো—চশমা, লাঠি, খদ্দরের ধুতি আর রোগা শরীবটি—সব খুইয়ে বসে আছেন। খড়মপরা চরণদুটি, তাও কায়ক্লেশে গোড়ালি পর্যন্তই, এখন জাতির সম্মুখে ভবসা। জাতির জনককে খাতিব করে—এমন লোক কলকাতায় বোধহয বেশি নেই, কিন্তু গান্ধীজি পা বাড়িযেই আছেন। সে পায়ের ধুলো দেওয়ার জন্যে নাকি 'হাঁটি হাঁটি পা পা ঘরেব ছেলে ঘবে ফিরতে পাবলে বাঁচি' ভেবে—তা তিনিই জানেন।

বিবাহ বার্ষিকী

সনৎকুমার মিত্র

কর্তা : হ্যাঁগো শুনছ। আজ কী কী রাঁধবে বলো তো?

গিন্নি : কী আবার রাঁধব, থানকুনি পাতা আর কাঁচকলা দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল আর ভাত।

কর্তা : আজকেও কাঁচকলা? আজ আমাদেব বিবাহ-বার্ষিকী, আজ বরং পাঁঠার মাংস নিয়ে আসি। কষা-মাংস আব পরোটা খাব।

গিন্নি : শখ দেখে আর বাঁচিনে। তারপরে তোমার বারোটা বাজুক আর কি? সেই সঙ্গে আমারও।

কর্তা কেন? কেন? তোমার কেন বারোটা বাজবে?

গিন্নি : ন্যাকামো করো না। তুমি ফুটে গেলে আমিও ফুটো নৌকা হয়ে তলিয়ে যাব, সে কথাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে?

কর্তা কেন? তলিয়ে যাবে কেন? এই বাড়ি করে দিয়েছি, ব্যাঙ্কে টাকা বেখে দিয়েছি, হিসেব করে চলবে।

গিন্নি · থাক ওসব কথা। তোমার হিসেব তুমি করো। আমার হিসেব আমি করি। এই হিসেব করে খাওয়াচ্ছি বলে এই বাহাত্তর বছর বয়েসেও বকবক করছ। নইলে...

কর্তা নইলে কী?

গিন্নি . নইলে আর তোমার বিবাহ-বার্ষিকীর বজত জয়ন্তী বর্ষ দেখতে পেতে না। অনেক আগেই টোয়া টেকুর তুলতে তুলতে পটল তুলতে।

কর্তা · পটল তুললেই ভালো হত। তা হলে আর চিরে চিরে এইরকম করে নুন-ঝাল ছিটোতে পারতে না।

গিন্নি : কী? কী বললে? আমি নুন-ঝাল ছিটোচ্ছি? না, তুমি আমাকে ছিবড়ে করে ছুঁড়ে ফেলেছ?

কর্তা . ছুঁড়ে ফেলেছি? না, বাসি শুকনো মালা হলেও গলায় ঝুলিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছি।

গিন্নি : কী? কী বললে? আমি বাসি শুকনো মালা? নিজে চেহারাটা একবার আয়নায় ভালো কবে তাকিয়ে দেখছে? মরা কাঠ কোথাকাব।

কর্তা . আমাকে মরা কাঠ কে বানিয়েছে? নিজেব মনকে জিজ্ঞাসা কবে দেখ।

গিন্নি : আমি? তুমি এই কথা বলতে পারলে? আমিই তো সেবা-যত্ন কবে তোমাকে বাঁচিয়ে বেখেছি।

কর্তা : নিজেই তো বললে আমাকে মরা কাঠ করে বেখেছ। কাঁচকলা খেয়ে কি কেউ হাতি হতে পারে?

গিন্নি : যার যেটা সহ্য হয়, সে সেটা খায়। খেয়ে হজম করতে পারলে ঐ কাঁচকলাব ঝোল খেয়েই নধর দেহেব অধিকাবী হতে পাবতে, বুঝলে? কলাগাছ খেয়েই ঐ বকম গতর হয় হাতিব।

কর্তা কলাগাছ খায়, কাঁচকলাব ঝোল খায় না।

গিন্নি : তুমিও তাহলে কলাগাছ খাও গিয়ে।

কর্তা · বাঃ বাঃ। তা হলে তোমাব আবো মজা হয়। যা একটু ঝোল-ভাত রাঁধছ, সেটাও আব রাঁধতে হবে না।

গিন্নি . সাবা জীবন গতর কালি করে রেঁধে খাওযালাম, কৃতজ্ঞতা বোধ নেই?

কর্তা : কী আমার গতব-কালিব নমুনা গো! বিয়ের সময ওজন ছিল চল্লিশ সেব আর এখন আশি ছুঁই ছুঁই।

কর্তা চল্লিশ নয, পঁয়তাল্লিশ ছিল।

কর্তা ওই হল। গতর কালি কবে ওজন বেড়েছে তো?

গিন্নি · নজব দিলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আজকের এই শুভদিনে কোথায দুটো ভালো কথা বলবে। তা নয, সকালবেলা উঠে শুরু কবলে।

কর্তা : আমি শুরু করলাম না তুমি শুরু করলে? আমি ভাবলাম আজ বিবাহ বার্ষিকীর শুভদিনে একটু ভালোমন্দ খাব। তাই জিজ্ঞাসা করলাম আজ কী কী রাঁধবে। ব্যস্, অমনি তোমার মুখঝামটা শুরু হযে গেল।

গিন্নি · তোমার ভালোর জন্যেই বলি। আমাবও কি ইচ্ছে করে না ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন খেতে? ইচ্ছে কবে না মোগলাই পরোটা আর কষা-মাংস খেতে? তোমার ভালোর জন্যেই সব ত্যাগ করে ঝোল-ভাত আব দই-ভাত খাই।

কর্তা : আচ্ছা—ঠিক আছে। তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ করব। বলো, তোমার কী ইচ্ছে করছে এই শুভদিনে?

গিন্নি : বলব?

কর্তা : হ্যাঁ বলো।

গিন্নি : সত্যি আমার ইচ্ছে পূর্ণ করবে?

কর্তা : হ্যাঁ, কবব।

গিন্নি . কথা দিচ্ছ?

কর্তা : কথা দিচ্ছি।

গিন্নি . তিন সত্যি করো।

কর্তা : না, তোমার মতলব তো ভালো মনে হচ্ছে না। তুমি যদি বাঘের ছাল চাও, তা দিতে পারব না, কারণ বাঘ মারা এখন নিষিদ্ধ। তুমি যদি মারুতি জেন অথবা ইণ্ডিকা মোটর গাড়ি চাও—তাও দিতে পারব না, কারণ আমি রিটায়াব করেছি বহুদিন হল। ব্যাঙ্কে টাকার সুদ কমিয়ে দিয়েছে। সুতরাং তিন সত্যি কবার আগে আমাকে বলো, কী চাও। তুমি কী চাও জেনে তবে বলব।

গিন্নি : না গো না, আমি ওসব কিছু চাই না। গতবছর তুমি এই হারটা করে দিয়েছিলে বিবাহ-বার্ষিকীতে। মনে আছে?

কর্তা · হ্যাঁ মনে আছে। ওসব কথা কি ভোলা যায়?

গিন্নি : এই এক বছরে কত নতুন ডিজাইন করেছে শুনতে পেলাম। এ বছর বিবাহ বার্ষিকীতে আব কিছু চাই না। শুধু লেটেস্ট ডিজাইনের একটা হার কবে দিও।

কর্তা : হা—হা—হার? সোনার হার? মাথাটা ভার ভার লাগছে গো। চোখের সামনে ধূ ধূ মরুভূমি দেখতে পাচ্ছি।

গিন্নি : তা তো দেখবেই! একটা মাত্র হার কিনে দিতে বললাম, তাতেই মরুভূমি দেখতে শুরু করলে। অন্য সকলের বউরা কত কি চায় জানো?

কর্তা : জানতে চাই না। কিচ্ছু জানতে চাই না। আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। বুকের বাঁ দিকে ব্যথা করছে। উঃ! আমি একটু শোবো।

গিন্নি : হ্যাঁগো, ওরকম করছ কেন? দাঁড়াও, ডাক্তারবাবুকে ফোন করি। একটু জল নিয়ে আসি। জল খেলে আরাম বোধ করবে।

কর্তা · চোখের সামনে সোনার হাব ভাসছে কেন?

গিন্নি : ওগো, হার চাই না! এই হারটাই থাক। আমি তোমার বুকে হাত বুলিযে দিচ্ছি। তুমি চোখ বুঁজে শুযে থাকো।

কর্তা · না—না, তোমাকে সোনার হার দেবই। উঃ—উঃ বুকের বাঁ দিকে ব্যথা করছে কেন? চোখে সরষের ফুল দেখছি কেন?

গিন্নি : সোনার হার চাই না। তুমিই আমার সোনার হার। তুমি কাছে থাকো। হ্যাঁগো ধূ ধূ মরুভূমি আর দেখছ না তো?

কর্তা . তুমি কি যাদু জানো? তুমি হাত বুলিযে দিলে, বুকের ব্যথা সেরে গেল। ধূ ধূ মরুভূমি আর দেখছি না। সরষের ফুলও দেখছি না। সোনা-ঝরা সকাল দেখতে পাচ্ছি। তোমাব সুন্দর মুখটা দেখতে পাচ্ছি।

গিন্নি : এই তো আমি কাছে রয়েছি। হ্যাঁগো এই জলটুকু খেযে নাও।

কর্তা : আঃ। আর ভয নেই।

গিন্নি : তাহলে তুমি বাজারে গিয়ে রসগোল্লা কিনে আনো। তুমি রসগোল্লা খেতে ভালোবাসো। আমি পাযেস রান্না কবছি। আর—হ্যাঁ, একটা রজনীগন্ধার মালা কিনে এনো।

কর্তা . (স্বগত) যাক্, বাজেটের মধ্যে এনে ফেলেছি। হুঁ হুঁ বাবা, অভিনয়টা মন্দ করি না!

ট্যারা চোখে

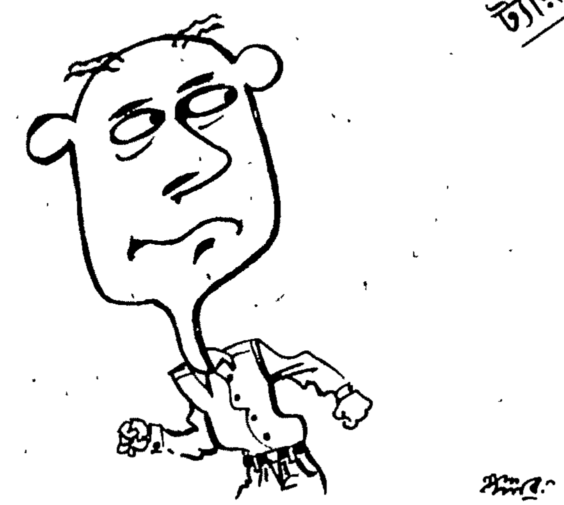

প্রথম বন্ধু : দ্যাখ, আমি বিয়ে করলাম, কেন না হোটেলে খেতে খেতে, বোতাম-ছেঁড়া জামা পরতে পবতে, লন্ড্রিতে গাদাগুচ্ছের টাকা খরচ করতে কবতে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম।

দ্বিতীয় বন্ধু · আরে, ঠিক এই কাবণগুলোর জন্যেই তো আমি বউকে ডিভোর্স করেছি।

নবপরিণীতা : কী যে কষ্ট আমার! অনেক রাত পর্যন্ত আমার স্বামী বাড়ি ফেরে না, এদিকে আমি জানতেও পারি না এতক্ষণ কোথায কাটিয়ে এল।

অভিজ্ঞা প্রতিবেশিনী . জানতে পারো না, এ তো ভালোই বলতে হবে। যেদিন জানতে পাববে সেদিন তোমার কষ্ট যে ভাই ডবল হয়ে যাবে।

—রবি সোম

ও যে মানে না মানা

কমলকুমার দত্ত

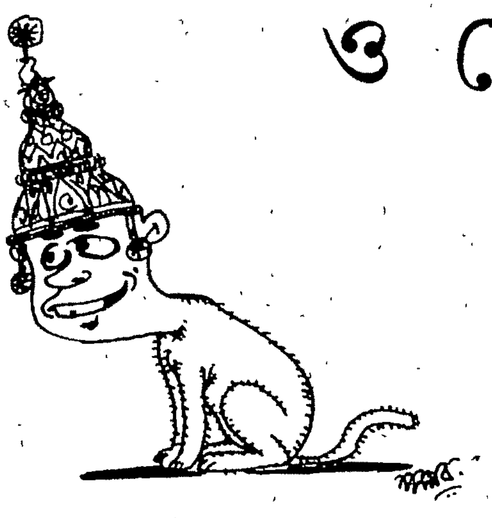

মান্ত। যদি প্রথম রাতেই বিড়ালটাকে মারা যেত। সে যেত আমাদের ঠাকুর্দাদের আমলে। বাবা-কাকাদের জমানা থেকেই মুঘল সাম্রাজ্য পতনের শুরু। আর এখন তো প্রথম রাত্তিরে বিড়াল মারার বদলে বিড়াল ব'নে গিয়ে ডট্ ডট্ ডট্ কম আটি মিউ মিউ। সে ভাগ্যও সবার হয় না রে ভাই, তার আগেই ভিক্টোরিয়ায়, ইডেনে, পর্দাঢাকা কেবিনে-কেবিনে স্বামীত্বের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকা হয়ে যায়। তারপর কার বেড়াল কে মারে? বাকি জীবনটা পুষি ক্যাট, পুষি-পুষি ক্যাট। ফলে যা হবার তাই হয়। তিন পিরিয়ডের ইস্কুল রে দাদা। ফার্স্ট পিরিয়ডে আপনি বলেন বৌদি শোনে, সেকেণ্ড পিরিয়ডে বৌদি বলে আপনি শোনেন, আর থার্ড পিরিয়ডে আপনারা দু'জনে বলেন, প্রতিবেশি, মানে 'নেবার' শোনে। তখন শুধু নেবার সম্পর্ক। লহ দেবী মাসের মাইনে; চরণতলে এনে দিচ্ছি, করতলে হর্তুকি সম্বল, বাকি মাসটা পাড়ি দিচ্ছি। তাতেও মানে না মানা। তাই নানা স্কিমে ধারে ধারে, ইনস্টলমেন্টে ইনস্টলমেন্টে টেনশন প্রেসার সুগার বাড়ে। মধ্যবিত্তের ঝর্ঝরে মেশিন, তাতে ক্যাঁচ্‌কোঁচ শব্দ হচ্ছে। মাসে যা পাই, ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি ডাক্তার ওষুধ হাতিয়ে নিচ্ছে। তবুও সে মানে না মানা। বলে 'লাইফটা হেল-এ গেল'। ফলে আবার ধার, নতুন স্কিমে আবার কড়ি পাযে ফ্যালো।

দেখেছেন, এত দুঃখেও কাব্যিরোগ গেল না। কী করে যাবে? এই কাব্যি দিয়েই কবর খোঁড়ার শুরুয়াৎ হয়ে থাকে যে। যে নিজে লিখতে পারে, তার প্রেমপত্রের ছত্রে ছত্রে মোহিনী মিল। এই মিল ধীরে ধীরে অমিলে গিয়ে স্মার্ট হয়। মানে পদ্য থেকে কবিতা। এইভাবে নতুন দশকের কবির সংখ্যা বাড়তে থাকে। সামান্য যে দু'চারজন ও কম্মোটি পেরে ওঠে না, তারা জীবনানন্দ, শঙ্খ, শক্তি, সুনীল, জয় গোস্বামীর গুঞ্জি দিতে দিতে এগিয়ে যায়, এগিয়ে যেতে থাকে। আর এই যাত্রাপথের আনন্দগান গো-ওয়েন্ট্-গান হয়ে মহাপ্রস্থানের যে গোলপোস্টে গিয়ে শেষ অব্দি আত্মঘাতী গোলটি দেয়, তার নামটি বেশ কাঁদো কাঁদো—'পীড়িত পুরুষ পতি পরিষদ'। যতদূর মনে পড়ে, রসিক চূড়ামণি মুজতবা আলী সাহেবের লেখায় এরকম এক 'পীড়িত পতি পরিষদ'-এর বিবরণ পড়েছিলাম। তখনো এরকম ফর্ম্যাল পরিষদ তৈরি হয়নি, হব হব করছে। খাণ্ডারনি বৌদের চোপায়-চোপায় চড়-চাপড়ে অস্থির তিতিবিরক্ত একদল লেজে-গোবরে পুরুষ বিক্ষোভ-সমাবেশ ডেকেছে। সভা চলছে, যাকে বলে একেবারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে। ফুলের মালা দিয়ে সভাপতি বরণ করা হয়েছে, বলা বাহুল্য সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছে সর্বাধিক স্ত্রী-লাঞ্ছিত ভদ্রলোক, যার কপালে ব্যাণ্ড-এইড্, হাতে ব্যাণ্ডেজ, যাকে ঘিরে সুরভিত হয়ে উঠেছে তাজা ডেটলের সুগন্ধ। সভা চলছে। মাইকের সামনে এসে বক্তারা বাকরুদ্ধ কণ্ঠে লাঞ্ছনার বিবরণ শোনাচ্ছেন, থেকে থেকে শ্লোগান উঠছে—চলবে না; চলবে না। এমন সময় যে ছেলেটি চা দিচ্ছিল, সে খবর নিয়ে এল যে, বৌদিরা খবর পেয়ে দলবেঁধে আসছে। ব্যস্, দু' মিনিটের মধ্যে সভা শূন্য। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। শুধু স্থির নিষ্কম্প হয়ে বসে রয়েছেন সভাপতি। মহিলা মিছিল এসে পৌঁছল, তবু ভাবান্তর নেই। সভাপতি-স্ত্রী কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে এগিয়ে এলেন। এসে চুলের মুঠি ধরতেই চেয়ার থেকে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়লেন সভাপতি। ডাক্তার এসে নাড়ি দেখে জানালেন—পাঁচ মিনিট আগেই সব শেষ হয়ে গেছে, হার্ট-অ্যাটাক। বোঝা গেল, চা-ওলা ছেলেটি যখন খবরটা নিয়ে এল, তখনই যা হবার হয়ে গেছে।

কিন্তু এ সবই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ার গল্প। চোর যখন হৃদয়ে সিঁদ কেটে ঢুকে পড়ে অন্দরমহলে তখন কার মানা কে শোনে? তখন ভেতরে ক্যাসেট বাজতে থাকে—'আষাঢ়-শ্রাবণ, মানে না তো মন'... । তখন 'মানে না নয়ন শুধু ফিরে ফিরে চায়. ' আর মনে হতে থাকে—'কে যেন গো ডেকেছে আমায়'। তখন যতই মানা করুন, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। সেই ছেলেটার মতো, বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে মাঠে চরে বেড়ানো চতুষ্পদকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে—বাবা, ওটা কী? বাবা উত্তর দিলেন—ওটা গাধা। —আর পাশেরটা? —ওটা গাধার বৌ। ছেলে অবাক —বাবা, গাধারাও বিয়ে করে?

বাবা গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ বাবা, গাধারাই বিয়ে করে।

এই ঘটনার বছর তিরিশ বাদে এই দিক দিয়ে যাচ্ছি। দেখি, সেদিনের সেই ছেলেটা তার ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে আর একই দৃশ্য দেখে ছেলের প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীর হয়ে বলছে—হ্যাঁ বাবা, গাধারাই বিয়ে করে।

বুঝতে পারলাম এ হচ্ছে তিরিশ বছর আগে বাবার পরোক্ষ মানা না মানার প্রত্যক্ষ ফল।

এর বাবা সাঁটে হলেও মানা করেছিল। সবাই আবার তাও করে না। যেমন হয়েছিল ভিক্টোরিয়ার বাগানে এক গাছের নিচে। গাছের গুঁড়ির একপাশে প্রেমিক-প্রেমিকার কথা শোনা যাচ্ছিল।

মেয়েটি — আজ তোমাকে কথা দিতেই হবে।

ছেলেটি — প্লিজ, আরেকটু সময় দাও। একটা চাকরি-বাকরি পাই আগে।

মেয়েটি — আর ওসব শুনছি না। দরকার হলে না খেয়ে থাকব, গাছতলায় থাকব। আমাকে ছুঁয়ে বলো—এ মাসেই বিয়ে করবে? বলো? বলো....।

এ পর্যন্ত শুনে গাছের ও-পিঠে গিন্নি অস্থির হয়ে উঠে কর্তাকে ঠেলতে লাগল—ওগো, ছেলেটাকে মানা করো, কথা দিতে মানা করো। মেয়েটা যেভাবে ধরেছে, কথা বোধহয় আদায় করেই ছাড়বে। ছেলেটাকে বাঁচাও।

হাজার উপরোধেও কর্তার ভাবান্তর নেই। তখন গিন্নি তেড়েফুঁড়ে উঠল—কী হল, যাও, ছেলেটাকে কথা দিতে মানা করো। ওকে বাঁচাও।

এতক্ষণে কর্তার কণ্ঠ শোনা গেল,—মরুক গে। মানা করতে আমার বয়ে গেছে। আমার কী? আমাকে কে বাঁচিয়েছিল, এই গাছের নিচে, তিরিশ বছর আগে? কে মানা করেছিল আমাকে?

সাহিত্য দুঃসংবাদ

সানন্দা : ~~জলাঞ্জলি~~ পুষ্পাঞ্জলি ১৪০৮

বউদের পড়বার এবং স্বামীদের দাড়ি কামাবার একমাত্র অ-সাহিত্য পত্রিকা। যে মেয়েদের বিয়ে হয়নি বা যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামী হারিয়েছেন, তাঁদের বেলা স্বামীর জায়গায় কে দাড়ি কামাবেন—এটা বলে দেওয়া হয়নি।

দেশ : বার্ষিক সংখ্যা ২০০১

ছেলেদের দাড়ি কামাবার এবং মেয়েদের চেয়ে দেখবার একমাত্র সাহিত্য অ-পত্রিকা। এ সংখ্যাটি তালিবানপন্থীদের জন্য বেদনার কারণ হতে পারে।

*কেউ কেউ সাহিত্যকে **SAVE** করতে চান, কেউ কেউ সাহিত্যকে **SHAVE** করতে চান; শুধুমাত্র শেভিং-ক্রীম ও শেভিং-ব্রাশ সাহিত্যই **SAFE.***

—ভূতলেন্দু ভৌমিব

বিবি ঘটিতং

মুসুমুসু কলমচি

তুমি ভালো থাকিলেই জাগতিক সকলকেই যে ভালো থাকিতেহইবে— এই মৃতলব বড় উত্তম নহে হে!

আমাদিগের সম্পাদকটি নির্ঘাৎ বঙ্গাল। নচেৎ একধারে যেম্নি অন্যান্য বঙ্গালদিগকে প্রচুর প্রচুর হাত মক্শো করিবারে দাতব্য সুযোগ দিতেছেন তেম্নি অন্যধারে মম বাটিতে আসিয়া মম গিন্নির সহিত গপ্পো মারিয়া বিনি পয়সায় চা পান করিয়া এমত ব্যবস্থা করিযাছেন যে, যে মুসু গিন্নিভয়ে মধ্যরাতে চুপিচুপি লিখিতে আসিতেন, তিনি সমস্ত দিন কলম হস্তে ঠায় টেবিলে বসিযা আছেন। মিনিটে মিনিটে পলে পলে কফি এবং লিকার চা আসিতে থাকিতেছে। মুসু যেন লিখেন—ইহাই ইদানীং মুসু-গিন্নির অভয় নামক ভয়ানক ওয়ার্নিং। অতএব হে পাঠক, সম্পাদক বঙ্গাল নহেন তো কী?

লেকিন, মুসু কেন লিখিবে? গিন্নি বলিলেই লিখিবেন অথবা না বলিলেই না লিখিবেন—এমত বান্দা নহেন কলমচি। ইনি ব্যক্তি অভয় এবং নিষ্পাপ। ইহার কারুবাসনা কেবলমাত্র রমণীকুলের আঁচল পরশন ; মায়াপাশে অনাবদ্ধ। ইনি মুক্ত। স্বাধীন, নচেৎ বহুকাল পূর্বেই, নিদেন যেইকালে মুসুর শ্রেণী পঞ্চম, সেইকালেই তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতঃ কলমচি হইয়া পড়িতেন। হন নাই, যেহেতু কাঞ্চন ভিন্ন রমণী এবং কামিনী, যে কেহই মুসুর মতে, ইগনোরেবল।

বহিরঙ্গে ফিট্ এবং অন্তরঙ্গে ছিট্গ্রস্ত রমণীকুলের সহিত মুসুর সম্পর্ক যেন অদ্রক এবং কাঁচাকদলী; অহি এবং নকুল। অবশ্য এই সকল বাক্যই মম গৃহিণী ভিন্ন অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা এই হেতু যে, কলমচি অদ্যাপি অজ্ঞ যে উহার গৃহিণী, কামিনী দূরঅস্ত্ আদৌ রমণী তথা নারী কিনা; ফলতঃ গৃহিণীর সহিত মুসু প্রায়শই যে একমত হইয়া পড়েন—ইহা নিতান্তই সরলতা প্রসূত।

আপনা ভিন্ন অন্যান্যদিগের প্রতি চাহিলে অতএব করুণরসে মুসু বড় মোহিত হযেন। উহারদিগের কী দশা! উহারদিগ কী অভাগা। অনন্তজীবন ইহারদিগ নারীপাশে তথা অঞ্চলে সমর্পণ করিয়াছে। মুসু ভাবেন, ইহক্ষেত্রে পূনর্জন্মই বড় দায়ী। জাগতিক যত পশু এবং উদ্ভিদ পূর্বজন্মে বড় বেশি ভালো খাইয়াছেন, আরাম পাইয়াছেন—উহাগণই পরজন্মে পুরুষজন্ম লাভ করেন। পূর্বজন্মে মুসু অবশ্যই কিছু কম আরাম করিয়াছিলেন, যে কারণ ফলতঃ ইহজন্মে উহার ভাগ্যে এক পুরুষালী স্ত্রী জুটিয়াছেন। শাকের আঁটিটি যে পূর্বজন্মেই খসাইয়া আসিয়াছি—ইহা বুঝি বড় কম পুণ্য হইল?

পত্রপাঠের দপ্তরীটির সহিত একদা পথে দেখা। গোঁপ-দাড়ি চাঁচিয়া ফুট্ফুটে ধব্ধবে হইয়া যে প্রকারে হাঁটিতেছিলেন, তাহাতে উনি যে নিতান্তই কাহারো পৌষ উপলক্ষে হাঁড়ি চাঁচিতে চলিয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছিল। কলমচি দেখিয়া হস্তোত্তলন পূর্বক কহিলেন—ভালো। আম্মো কহিলাম—তুমি ভালো থাকিলেই জাগতিক সকলকেই যে ভালো থাকিতে হইবে—এই মতলব বড় উত্তম নহে হে।

একথা সেকথা হইবার শেষে সে ব্যক্তি প্রশ্ন রাখিলেন—দাদা, দুই গণ্ড জুড়িয়া এমত মস্ত দাড়ি-জঙ্গল কী প্রকারে ঘটিল? যৌবনকালে কবি ছিলেন কি?

হে পাঠক, কী বলিব, জীবনে সেই প্রথম মুসু কর্তব্যে বিমূঢ় রহিলেন। উহারে কী প্রকারে কহিতাম যে জমিতে লাঙ্গলই পড়ে নাই, তাহাতে আগাছা উঠিবে না তো কি? বচ্চন বিবি বাবদে কত উচ্ছ্বাসই না করিলেন। অথচ যদি বলিয়া দিতেন "যিস্‌কা বিবি পুরুষ...", হায়। কথাটা কেহ ভাবিয়া পর্যন্ত দেখিলেন না।।খ

টিপ্পনী সুভাষিত

টিপ্পনী দেবী উবাচ

সিদ্ধান্ত : বিয়ে প্রেমের চেয়ে শক্তিশালী।
প্রমাণ : প্রথমার হাতে দ্বিতীয়ার মৃত্যু হয়।

'ফুলশয্যা' শব্দটির প্রথম অংশ ইংরেজি, দ্বিতীয় অংশ বাংলা। সঠিক বানান 'Fool-শয্যা'।

'বাসি বিয়ে' কথাটির মধ্যেই বিয়ের মূল দর্শন নিহিত। অর্থাৎ বিয়ে হল সেই বস্তু যা একরাত পেরুলেই বাসি হয়ে যায়।

ব্যাকরণের দৃষ্টিতে গাঁটছড়া—যে 'ছড়া' গাঁট কাটতেই জন্মেছে। —বহুব্রীহি সমাস।

দম্পতি—ব্যাসবাক্য : স্ত্রী দম দিলে তবেই পতি চলতে পারে।

চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ

তিত্‌লি নিয়ে তোৎলামো

ভারতে যখন প্রথম কোনো রাজ্যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, তখন মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ সাংবাদিক সম্মেলনে একটু তোৎলাচ্ছিলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি সবসময়েই তোৎলান? উনি সরস ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিলেন, না, শুধু যখন কথা বলি। ঐ সূত্র ধরেই আমরা বলতে পারি, ঋতুপর্ণ ঘোষ তোৎলান, যখন ছবি করেন। কেন বলছি একথা, সেটা পরিষ্কার করা যাক।

তাঁর 'উৎসব' ছবিটি আমাদের ভালো লেগেছিল। কাহিনীটির পরিকল্পনা, বিন্যাস এবং ভাষা দেখে মনে হয়েছিল অনেকদিন পরে কেউ এলেন, যিনি থাকতেই এসেছেন।

প্রথম ধাক্কা খেলাম তাঁর 'বাড়িওয়ালি' ছবিতে। এতে যে মুহূর্তে বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলাকে একটি অনামা চরিত্রে নামিয়ে শুটিং করা হচ্ছে, এবং রিহার্সাল বা মনিটর কিছুই করা হচ্ছে না, সেই মুহূর্তে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, এই দৃশ্যটি শেষপর্যন্ত ছবিতে থাকবে না। এবং সেই মুহূর্তেই গল্পটা ফুরিয়ে যায়। ছবি শেষ হয়নি, অথচ ছবির কাহিনী শেষ হয়ে গিয়েছে, এটা যে-কোনো পরিচালকের পক্ষেই ট্র্যাজিক। অর্থাৎ পরিচালকের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অকেজো হয়ে পড়েছে।

ঋতুপর্ণ ঘোষের আরেকটি টেলিফিল্ম 'অভিনয়'। বোঝাই গেল ছবিটির পরিকল্পনা পরিচালকের পক্ষে হেভি হয়ে গিয়েছে। অথবা তাঁর নিজের মাথাই হেভি হয়ে উঠেছে। হেভিহেডেড্ বললে কি মাথামোটা মনে হবে?

ছবির গোড়ায়, না কি ছবির আগে পরিচালক তাঁর সহকর্মীদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। এটির উদ্দেশ্য কী বোঝা যাচ্ছিল না, বরং আমরা ভেবেছিলাম এঁদের সম্বন্ধে বলতে বলতেই বা দেখাতে দেখাতেই মূল ছবি শুরু হয়ে যাবে। এঁদের কর্মকুশলতার মধ্যেই ফুটে উঠবে কোনো একটি দৃশ্য, কোনো একটি সম্পাদনা, কোনো একটি টুকরো সংলাপ—যার সাহায্যে মূল ছবির ইশারা পাবেন দর্শক। আশ্চর্য, গোলা দর্শক যা অনুমান করতে পারেন, গোদা পরিচালক তা আঁচই করতে পারলেন না।

মূল ছবিটি আলাদা ভাবে শুরু হয় এবং শেষ হয় একটি চমক দিয়ে। চমকটা তখনকার মতো চমকালেও, ঐটিই ছবিটির মচকে যাবার হেতু হয়ে দাঁড়ায়। ছবিটি দর্শক একবারই দেখবেন, দ্বিতীয়বার দেখতে চাওয়ার কোনো কারণ এতে অবশিষ্ট থাকল না। এবারেও ছবিটি ফুরিয়ে গেল।

'তিত্‌লি' ছবিটিতে পরিচালক তুৎলিয়েছেন প্রথম থেকেই। ছবিটি কমেডি হবে, নাকি সিরিয়াস স্টাডি হবে মানুষের মন নিয়ে, সেটি পরিচালকের কাছেও স্পষ্ট ছিল না। এবং ছিল না বলেই ছবির শেষের দিকে যখন তিত্‌লির মায়ের প্রাক্তন প্রেমিকের বিয়ের খবর আসে, তখন তিত্‌লি সহানুভূতির সঙ্গে বলে বটে, মা তোমার কষ্ট হচ্ছে? —কিন্তু দর্শকের কাছে দৃশ্যটির ইমপ্যাক্ট হয় বিপরীত, দর্শক এখানে বেশ জোরে হেসে ওঠেন।

ছবিটি দেখতে দেখতে কারো কারো সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির কথা মনে পড়েছে শুনলাম। আমাদের পড়েনি। এ ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র বেস ক্যাম্পেও পৌঁছতে পারেনি। সেটা খুবই অবভিয়াস, এ ছবির অবিচুয়ারি লিখলেও এমন কথা লেখা যায় না।

ছবিতে কঙ্কনাকে দেখার জন্য ব্যাকুল ছিলাম। কারণ তাকে আমি আগে দেখিনি। 'এক যে আছে কন্যা'-তে কঙ্কনা ছিল, কিন্তু যখন জেনেছি যে ওই ছবিটি নাকি অন্তত তিনটি ছবি থেকে টোকা, তখন আর বোকা বনতে চাইনি। রবীন্দ্রনাথের 'অধ্যাপক' গল্পের একটি লাইন মনে পড়ে গিয়েছিল আমার —'রচনাটির যে অংশ লাউয়েল সাহেব হইতে চুরি সে অংশটি ভাল, যে অংশটি লেখকের নিজের সে অংশটি পরিত্যাগ করিলেই ভাল হইত।' সুতরাং 'এক যে আছে কন্যা' দেখে সময় নষ্ট করিনি আমি।

'তিত্‌লি' ছবিতে তাই গোড়া থেকেই কঙ্কনাকে খুঁজছিলাম। প্রথমে 'তারা' নামে একটি কাজের মেয়েকে দেখে মনে হল যে এ কঙ্কনা হতে পারে। দেখতে-শুনতে ভালো, ক্যামেরা রেসপন্সও চমৎকার। পরে জানলাম যে এ কঙ্কনা নয়। আসলে কঙ্কনা তিত্‌লির ভূমিকাই করছে। তার মায়ের ভূমিকায় রয়েছেন নিজেরই মা। যদিও মনে হতে পারে তিত্‌লির রোলে 'তারা'র অভিনেত্রী কলরোল আনতে পারত।

অপর্ণা সেন এবং কঙ্কনা সেন শর্মাকে দেখে সব শর্মাই বলবেন ভালো, ভালো। পরিবারগত ভাবে Dynasty Misrule আমরা অবশ্য বলিনি। অপর্ণা সেনের অভিনয় একটা স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছেছে, একে সানসেট পয়েন্টও বলা চলে। সেই আপাতসরল মুখে কৃত্রিম বাচনভঙ্গি, এটা নাকি পাব্লিক খায়। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।

পরিচালক তাঁর কাহিনীর ঘাটতি মেটাবার জন্য নিসর্গকে দেখাতে চেয়েছেন খুব, কিন্তু সেইটিই তাঁর বিসর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কঃ এবং কেনঃ। কে এবং কেন এই চেষ্টা। মনে হয় ঋতুপর্ণের ঋতুসংহার খুব দূরে নেই।

পুনশ্চ : এ ছবির প্লাস পয়েন্ট হলেন মিঠুন চক্রবর্তী। একই সঙ্গে দর্শনধারী এবং গুণবিচারি, দুটোতেই তিনি পাস্‌ড উইথ অনার্স। বহুদিন বাদে তাঁকে সুভদ্রদর্শন দেখলেন সবাই এবং তাঁর অভিনয় রিজার্ভড্, ম্যাচিওরড্, কোয়ালিফায়েড্। মিঠুন না থাকলে এ ছবি থেকে উঠে আসতে হত। অবশ্য ইনি ছবির প্লাস হলেও বাকিরা মাইনাস। তাই প্লাসে মাইনাসে মাইনাসই হয়েছে। ঋতুপর্ণ এখানে গানও লিখেছেন, হয়ত সুরও দেবেন কোনদিন। গানটি ভালো লেগেছে।

তথাপি, এ ছবি সম্ভবত প্রাইজ পাবে, এবং সেটাও সারপ্রাইজিং হবে না।

—পিনাকী ভাদুড়ী

কবি ও নর্তকী :

Duo থেকে Duel

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নর্তকী সুরঙ্গমা বড় বিপাকে পড়েছে। তার মনেব মানুষ কবি বরদাকান্তর হাবভাব বড়ই বিরূপ ঠেকছে গত ক'মাস ধরে। আহা, তার আগে কি প্রেমেই মজে ছিল দুটিতে। জুটিতে লুঠি। নব বৃন্দাবন লেক, ইডেনে ভেসেছে, মজেছে ছুটিতে গদগদ হয়ে। মৌজ পেতে কবির মগজের হোসপাইপ খুলে গেছে যেন। কত সুন্দর সুন্দর গান বেঁধেছে তার পবমপ্রিয়ার জন্য। সেই গানে সুর লাগিয়ে সে কী মনমাতানো নাচ সুরঙ্গমা বা সুমাসের। সুমাসে নামটা তার ছদ্ম, অনেক ভেবেচিন্তে নেওযা। যখন পশ্চিমি নাচে, সেই সময় এই নাম। যে পুজোব যে ফুল। নিজেরই নাম সুরঙ্গমা সেন-এব তিনটে অক্ষর নিয়ে তৈরি এই ছদ্মনাম। দেখে বোঝার উপায় নেই কোথাকার নর্তকী, জাপান, জাভা বা জামাইকো-যে-কোনো জায়গাব হতে পারে।

তা সেই সুসময়ে জয়ের সুবাতাসে মশগুল সুরঙ্গমা ভাবতেই পারেনি, হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ার দমকে, ভেসে যাবে, কান্তকবি তাকে দেখেও দেখবে না। এর সূত্রপাত কিছুদিন আগে, যখন কবির কাছে দুই নবীনকে দেখেছিল। তা আসুক, ও তো কত অমন আসে যায়, যে থাকার সে রয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ তার নিজের কী যে মতিভ্রম হল। কবিকে একদম নিজস্ব করে নেওয়ার ইচ্ছে হল মনে। তখন যদি ঘুণাক্ষরেও জানত, এই ইচ্ছের ফলেই তারা duo থেকে duel-এ চলে যাবে। হায় রে, সে স্বর্ণযুগ কি আব আছে? এখন সারা জীবন সংসার করেও দুটিতে জুটি বাঁধে না। অনবরত চড়চড়, কড়মড় করে; আর এ তো নেহাৎই প্রেম। মনে মনে হাপসায় সুরঙ্গমা, ভুল সে করেছে সত্যি তা বলে কবি বরদা এমন করবে? তাকে দেখে চিনবেই না? সে তো অপরাধ কবুল করার জন্য মুখিয়েই আছে, কিন্তু সে সুযোগ পেলে তো।

উঠতি কবি হিমগ্নাকে অষ্টপ্রহর বরদার সঙ্গে দেখে জ্বলে উঠেছিল সুমাসে। আর এই বারুদে কাঠি দিয়েছে বরদাব হাবভাব। কেমন যেন আড়-আড় ছাড় ছাড় ভাব দেখিয়েছে তাব সঙ্গে। আবার কখনো-সখনো সাপটে ধরলে নীতি-প্রবচন শুনিয়েছে—এটা ভারত, বিলেত-আমেরিকা নয়। এখানে রেখেঢেকে কর কাজ। এজ হচ্ছে, ইমেজের কথা ভাবতে হবে। আহা, কথা বলছে, যেন হিমালযেব সন্ন্যাসী। সেই দূরাগত দৃষ্টি, সেই উদাসীন ভাব। অথচ আড়ালে-আবডালে লক্ষ্য করেছে, হিমগ্নার সঙ্গে কী গদগদ, কী সখ্য! যেন পারলে লীন হয়ে যায় ওই পীন বক্ষে। কবিকে বাগে আনতে না পেরে বাঁকা পথ ধরতে হয় নর্তকীকে। সে তো এমনি এমনি ফাঁকা মাঠ অন্যকে ছেড়ে যাবে না।

সে সরাসরি একদিন ধরে কবিকে। সেদিন আবার সঙ্গে হিমগ্না ছিল। কফিহাউসে কোণের এক টেবিলে বসে দুটিতে ফিসফাস করছিল। সুরঙ্গমা কবিকে প্রশ্ন করে, তোমার কী হয়েছে বল তো? এমন ভান করছ যেন আমায় চেনই না।

কবি কম কথার মানুষ,—ওই আর কি। ক্ষণিক পরিচয় হবেছিল মাত্র।

সুরঙ্গমা ফুঁসে ওঠে এবার,—মানে?

মানে আবার কী? আমি তো বাংলা ভাষাতেই বলছি। কবির স্বরে উষ্মা।

সুমাসে গলা চড়ায; —আমিও বাংলা ভাষাতেই বলছি, তোমাব ওই প্রতি-মাসে নব নব পাবার নেশার বাতিক আমি ছাড়াবই। অন্তর্জলির সময় হল বলে, এখনো নাল ঝরছে?

বরদা বলতে যায়, নারী আমার নবীনতার বিচ্ছুরণের বিতংস........শেষ করতে পারে না। ওপারের টেবিলে ছিল শিখা তোপদার। রাশভারি, ব্যক্তিত্বময়ী। খালি গলাটা চেহারার সঙ্গে খাপ খায় না। কথা বললে মনে হয়, এই কাঠামো

থেকে নয়, অন্য খোপ থেকে আওয়াজ আসছে। তাই, বলে খুব কম। এখন অনন্যোপায় হয়ে উঠে এসে সুরঙ্গমাকে টানে, —আঃ, কী হচ্ছে? এটা পাবলিক প্লেস। সিন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছ কেন, তুমিও জড়িত?

নর্তকীর মাথায় বক্তব্যটা সেঁধোয়। ফুঁসতে ফুঁসতে ওপাশের টেবিলে যায়। কবিকে বাগে আনার কাজে দু'জনের সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। একজন আনন্দময় কাবাসী। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত বাংলা ম্যাগাজিনের কলকাতা প্রতিনিধি। সে রঙে থাকতে ভালোবাসে। কখনো নীল, কখনো সবুজ, মাঝে মধ্যে কালো। নীল মানে, পুরোটা, কোথাও ফাঁক-ফোকর নেই। এখন শীতকাল, মাথায নীল টুপি, নীল জ্যাকেট, নীল শার্ট-প্যান্ট, মায় জুতোটা অব্দি নীল। অন্তর্বাস দেখা যায় না, গেলে হয়ত.......

সে লাল রংটা সম্প্রতি পরিহার করেছে। আগে প্রায়ই পরত। অবশ্য এটার কারণও আছে। একবার পুরো লাল হয়ে সে বরদার আছে জরুরি কাজে এসেছিল। তখন ছিল সুসময়, কবির সঙ্গে নিরালা কাফেতে সুরঙ্গমা একা। খুব ঘনিষ্ঠরা জানত সেই ঠেকের হদিশ। তা, জরুরি বার্তা-বিনিময় করে আনন্দময় প্রস্থানোদ্যত, হঠাৎ সুরঙ্গমা কবিতে একান্তে বলে ফেলে, —ওহো এই লালমুলোটা এখানেও জ্বালাতন করছে।

পুরোটা শোনেনি, তাই কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছিল আনন্দময়। ভীষণ ভালো ডজ করে বরদা বলেছিল, শীতে লাল রংটা খোলে ভালো। খুব উষ্ণ, কাছে টানে।

কবিকে কী ভালো যে লেগেছিল সেদিন!

আর একজনও সাহায্যের কাঙ্খিত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—শিখা তোপদার। আগুনের শিখা বা কামানের তোপ এমনিতেই মারাত্মক ত্রাস সঞ্চারকারী, আর এখানে তো দুটিতে একদম পাশাপাশি। ফল হয়েছে যাকে বলে সেনসেশন্যাল। অনাচার, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সতত সজাগ তোপদার। তাই যখন বরদার প্রত্যাখ্যানে বিমূঢ় সুরঙ্গমা তখন তাকে স্তোক দেয় তোপদার। আর কী আশ্চর্য, সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, বরদার জীবনের কত ঘটনা যে জানে আনন্দময় শিখা। সে যে কিছু জানে না। অবশ্য প্রেম তো এমনই। কিছু না জেনে বুঝে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে যায়।

তা ওদের পরামর্শে কবিবরকে ফিরে পেতে ছক কষেছে সুরঙ্গমা। এখন যাকে নিয়ে মাতামাতি, সেই হিমগ্নাকে বলে লাভ নেই কিছু। প্রেমিকা তো, দৃষ্টি আচ্ছন্ন। পাঁকে পদ্ম দেখে শুধু। ওর বাড়ির লোককে বলতে হবে কবির আসল রূপ। সে যে কতবড় খিলাড়ি, কতজনকে ঠেলে নামিয়েছে পাপের হিমগহ্বরে, সে ফিরিস্তি সাতকাহন করে জানিয়ে দেয় শিখা সুরঙ্গমাকে। আর এগুলোই বলতে হবে হিমগ্নার বর বরেনকে। শুধু বললে তো হবে না, প্রমাণ লাগে। তা সেটাও আছে, যাকে বলে অকাট্য প্রমাণ। বরদাকে উদ্দেশ্য করে হিমগ্নার স্বীয় হস্তাক্ষরে কবিতা—

পেলে তোমায় আপন করে
ভরবে এমন কূলে কূলে
ভাসব তখন স্থলে জলে
আলো-ছায়ায় দুলে দুলে।

বিশুদ্ধ বরদা-বন্দনা। নিচে আবার নামটাও লিখেছে হিমগ্না। এই অকাট্য প্রমাণ সুমাসে বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়েছে বরেনের হাতে। কোন পুরুষই বা পত্নীর পরপুরুষ ভজনা পছন্দ করে? বরেনও করেনি। ফলে হিমগ্নার সংসার সমরাঙ্গন অগ্নিস্তূপ হয়ে গেছে। ঘটনাটা হল, শীতে কবিতা পাঠের আসর বসে কাছে-দূরে। তা কবিতা পড়তে গিয়েছিল বরদা-হিমগ্না একটু দূরে। সেখানে পান-ভোজনের এলাহি ব্যবস্থা ছিল। তা হিমগ্না কিঞ্চিৎ বেশি টেনে ফেলেছে। কবির কেবল নারী প্রীতি ও বারি-ভীতি। সে পারতপক্ষে 'জলযোগ' পরিত্যাগ করে চলে। এখানে খুব অনুরোধ আসায় সামান্য দু'এক........সে ঠিকই ছিল। কিন্তু বইটাই তো তার হাতে আসেনি। হিমগ্না পানঘোরে সে বই হারিয়ে ফেলেছে। আর আনন্দময়ের হাতে পড়েছে সে বই, রবদা-বন্দনার বয়ানশুদ্ধ। ব্যস্, শাখায় শাখায় পল্লবিত হয়ে সে বিষয় যা মুখরোচক মাত্রা পেয়েছে না।

হিমগ্নার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। বহুদিন কবিতা লিখছে, কিন্তু এ পোড়া দেশে কবেই বা প্রতিভার কদর হয়েছে? হিমা ভাবে, ঠিক ঠিক দাম পেলে যা চূড়ায় উঠবে না। খানিকটা সেই ভেবেই কবির সঙ্গে সখ্য। এমনিতে বরদাকান্তকে ভালোও লাগত খুব। এত বয়স! কিন্তু কী সটান চেহারা! আর কলম তো নয়, যেন খোলা ফোয়ারা। কবি ধরলেই চলবল খলবল করে বয়ে চলে ধারা। সেই ধার যদি কিছুটাও এধারে আসে! এই ভেবে কবি-সান্নিধ্য। ওদিকে কবির আবার প্রেম-প্রীতিতে একমুখী নীতিতে আস্থা নেই। গর্ব করে মাঝে মাঝে— পঞ্চ পবিকল্পনা শেষ হতে আমার খুব জোর ছ'মাস লাগে। অর্থাৎ ছ'মাসে পাঁচটা নবপ্রেম সন্ধানী তিনি। আহা, দেশের সরকার যদি এ সময়ে পরিকল্পনা শেষ করতে পারত।

কবিকে ফিরে পেতে সুমাসের বরেন-নিলয়ে যাওযার ফল পাওয়া গেছে অবিলম্বে। কবি যে তার স্ত্রীকে এতটা নাচিয়েছে, তা সম্যক অনুধাবন করে বরেন তীব্র দাওয়াই প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে বলেছে, আমি তোমায় সারা জীবন ঢাল দিয়ে আগলে রাখলাম, কোনো তাপ-জল, আঘাত টের পেতে দিলাম না, সেই আমাকে ফাঁকি। আর যে তলোয়াবের মতো আঘাত করে, রক্ষা করেনা—তার সঙ্গে এত গদগদ। ঢাল-তলোয়ার এক খাপে একসাথে থাকতে পারে না। তোমাকে বেছে নিতে হবে—বিটুইন ডেভিল এণ্ড দ্য ডীপ সী (আবেগে ভুল বলে ফেলেছে)। হয় কবি নয় আমি।

এখানে হিমগ্না ফুঁপিয়ে কিছু বলতে গেছিল। বরেন তাড়াতাড়ি থামিযেছে,—নো মোর ওয়ার্ডস। শট ফাইনাল।

অগত্যা তাই হয়। হিমগ্না তো একদম ভেসে যেতে পারে না। কবির সঙ্গে আপাতত সম্পর্ক ছেদ হয়েছে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক, সুমাসের কাছে। আগে দেখা হলে কবি থমকাত, কখনো বা দু-একটা কথা। কিন্তু এখন সামনা-সামনি পড়লে এমন ভাব করে, যেন কস্মিনকালেও দেখেনি তাকে। ফলে নতুন গান নেই, সুমাসের নতুন নাচও নেই। এরকম ভাবে চললে, যাকে বলে, ক্যাডভারাস কান্ড ঘটে যাবে। কেউ আর নর্তকীকে চিনবে?

ভেবে ভেবে দিশেহারা হায় যায সুমাসে, কোনো কূল-কিনারা পায় না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে কবির বাড়ি যাওযাই স্থির করে। যদিও সেখানে কবিপত্নীর মুখোমুখি হবার সমূহ সম্ভাবনা এবং সে সাক্ষাৎ খুব সুখপ্রদ হবে না, তবু সুমাসে কী করে? কপাল ঠুকে বসে থাকা তো যায় না। এক গ্রীষ্মসন্ধ্যায় কবির বাড়ি হাজির হয়।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বরদাব বেটার হাফ বাড়ি নেই। চৈত্র সেলে মার্কেটিংয়ে গেছে। কবিকে একা পেয়ে যায় সুরঙ্গমা। কথা বলার সুবিধে কত। তবু মন সব হারানোর বেদনায় বড় হাহাকার করে ওঠে। আহা, এই ফাঁকা ঘর, আকাশে বাঁকা চাঁদ, এমন দিনে কিছুকাল আগে হলেও—তুমি আমার, আমি যে তোমার—হয়ে যেত। সে সুখদিন কি ফিরবে? কে জানে!

কবির মান সহজে ভাঙে না। ভাঙানোর জন্য যতই নিকটবর্তী হবার চেষ্টা চালায় সুমাসে, কবি যেন তড়িদাহত হয়ে সটকে যায়। অবশেষে নিরাপদ দূরত্বে থেকেই কবিব শর্ত শুনে নেয় সে। তার ব্যবহারে বরদা ভীষণ মর্মাহত এবং মানসম্মানের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। ওদিকে হিমগ্নাও স্বীয় সংসাবে বড়ই অবাঞ্ছিত রূপে বসবাস করছে। দুটি পরিবারকে এমন গুরু বিপাকে ফেলেছে নর্তকী। হত

মানসম্মান পুনরুদ্ধার যদিও সম্ভব নয় তবু একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। কফিহাউসে একদিন সবাই মিলিত হবে। হিমগ্না স্বামীসহ, কবি-সুবঙ্গমা এবং অতি কাছের দু-একজন। কিছুতেই আনন্দময় বা শিখা তোপদার নয়। সেই মিলন প্রত্যাশী সভায় সুরঙ্গমাকে বলতে হবে যে, যা বলেছে সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী, বাস্তব থেকে বহু দূরে অবস্থান। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যানের মানসিক আঘাতে তার মাথার ঠিক ছিল না।

সুমাসে এখন জলে ডোবা মানুষ। যে কোনো শর্তে সে মিটমাটে আগ্রহী। কাজেই সব ব্যাপারেই সে রাজি হয়ে যায়।

কফিহাউসে একটা টেবিলে বসেছে ছ'জন। স্বামীসহ হিমগ্না, কবি, সুরঙ্গমা, কবি-বন্ধু বলে পরিচিত (আসলে ল্যাংবোট) বিবেক বিদ্যার্থী ও নতুনমুখ সাংবাদিক শুভ সরকার। বিবেক উত্তব ভারতের ছেলে। লম্বা চেহাবা আর কটা রং ছাড়া তার দেহে দেশজ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সে কথা বলে মিন্‌মিন্ স্বরে এবং কবির কোনো কথারই পারতপক্ষে বিরুদ্ধাচরণ করে না। এজন্য কবির তাকে সবিশেষ পছন্দ।

টুকটাক খাওয়ার পরে সুরঙ্গমা বলে, আমি একটা কথা খোলাখুলি বলতে চাই যে, কিছুদিন আগে কান্তদার সঙ্গে যে ভুল-বোঝাবুঝি হযেছিল, তাতে আমি এমনই মর্মাহত হয়ে পড়ি যে. অনেক আবোল-তাবোল কথা বলে ফেলেছি। আসলে কান্তদা খুবই নরম, রোমান্টিক মনেব মানুষ, এবং সবাইকে সাহায্যেব হাত বাড়িযে দেন। যেমন, এখন তাঁর স্নেহধন্য হয়েছেন উঠতি কবি হিমগ্না। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এই সম্পর্কে অন্য কিছু খোঁজাব চেষ্টা বৃথা।

হিমগ্নার স্বামী ববেন এখানে উশখুশ করে বলে ওঠে, কিন্তু ওই যে বইটা, যেটা আপনি দিয়েছিলেন ওতে যে পরিষ্কার লিখেছেন—হিমগ্না!

এই আক্রমণে প্রস্তুত ছিল না সুমাসে। সে কথা হাতড়াতে থাকে। কিন্তু এই আক্রমণ চমৎকারভাবে 'ডাক' করে হিমগ্না। সে মিষ্টি হেসে বলে, সত্যি বলতে কি, ওটা তোমাকে দেবার জন্যই লেখা। ওখানে সবাই এত প্রশংসা কবলে আমার, তখন মনে এল, এই প্রশংসার, বা আমি যেটুকু হযেছি, তার মূলে তো তুমিই। ব্যস, গলগল করে লেখা বেরিযে এল। কিন্তু কপাল খারাপ, কেমন করে যে হারিয়ে গেল বইটা।

বরেন স্ত্রীর কথা শুনে স্তম্ভিত। সে হেসে বলে, এখনও এত! ভাবা যায় না। সে হিমাগ্নার হাত ধরে বাইরে চলে যায়।

ওই জুটি বেরিয়ে গেলে সুরঙ্গমা কবিকে বলে, তাহলে সব ঠিক আছে?

কবিব সহাস্য জবাব, সে আর বলতে!

নর্তকী বলে, তাহলে চল কোনো নিরালায়। কতদিন যে একান্তে কথা বলিনি আমরা!

এতক্ষণ খেয়াল কবেনি এরা। বরদার হাত ধরে সুরঙ্গমা গমনোন্মুখ হতে দেখা যায়, পাশের টেবিলে বসে আনন্দময় আর শিখা। আনন্দময় লঘু কণ্ঠে বলে,

ফিরে এসো সুরঙ্গমা
ফেলে দিয়ে সব বাধা.. ..

বরদাব আজ বরাভয় মূর্তি। সে মুচকি হেসে বলে, তুমি তো ভাই আনন্দময়। মিলনবেলার এই আনন্দ-সংবাদ সবাইকে জানিয়ে দাও। এই বলে চলে যায় সুমাসের সঙ্গে।

বহুদিন পর ভাঙা সম্পর্ক জোড় লাগতে চলেছে। মনে মনে বলে, আমি কি শিশু যে চুষিকাঠিতে ভুলে যাব? তবে বুনোটা বামাল সমতে ধরা পড়ে বড় বিপাকে। যাকগে, মিটিযে নিও। ওযান আপ হয়ে থাকলাম। আমার সেক্রেটাবি বণিতার কেসটা তো জানো না। বনে, পাহাড়ে কি রণটাই করে. . .! ওহো, সুইটি কিউটি রণি....তা....হেসে হাত বাড়িয়ে দেয়। ....

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

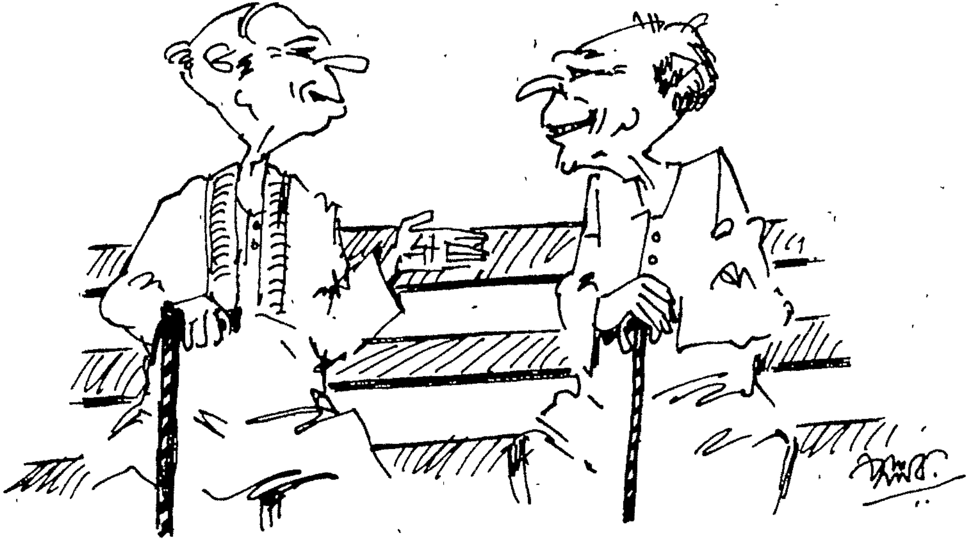

—সেদিন ঝগড়ার সময়ে আমার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে বসেছিল।
—বলো কি। তুমি তো বীরপুরুষ হে। তারপর হাঁটু গেড়ে কী বলল তোমার স্ত্রী?
—বলল, খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আয় মুখপোড়া।

জবর খবর

বিলিতি জলের জয়

বকধার্মিক আর নাক সিঁটকানো সাত্ত্বিক ভদ্দরলোকেরা যে যাই বলুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মতো খুব কম রাজ্যেই পাড়ার মোড়ে, চৌমাথায়, ওয়াগনের তলায়, গ্যারেজের পিছনে, পেট্রল পাম্পের পিছনে এরকম 'ড্যাম চিপ্'-এ মানে সস্তায় বোতলকে বোতল, মগকে মগ—ধেনো, চুল্লু আর হাঁড়িয়া পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনে ভাঁটা যে পড়েনি তা এখনো খুবই পরিষ্কার।—'না ছুঁই পানি'রা যে ছুপা রুস্তমের মতো এ রাজ্যের ৮৫৮টা 'ঠেক' থেকে নিয়ম করে গেলাস আর বোতল নিয়ে ডিমভাজা আর মাংসের চাঁপের চাট সহ চুকচুক্ করে মেরে দেন, তা নিয়ে আর নতুন করে কোনো ভট্টাচার্যীয় তদন্ত কমিশন বসানোর দরকার নেই। কিন্তু রবিকবির গাওয়া মাই ডিয়ার 'বাংলার জল' কি এখনো পপুলার? বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টোটাই। বঙ্গসন্তানেরা ইদানীং আবার পশ্চিমী জলপথে বিচরণ করতে শুরু করেছেন। ইংলিশ মালের বিক্রি ইদানীং চুল্লু ধেনোকে বেড়িয়ে দিয়ে ১৭.৭ শতাংশ বেড়ে গেছে এই রাজ্যে। সারা রাজ্যের ২৯২ টা এবং কলকাতার ১০৭ টা স্কচ হুইস্কি, জিনের 'র‍্যাশন' দোকানে গোঁফ না বের হওয়া খদ্দেরদের লাইন বেড়ে চলেছে। হাড়ে হাড়ে মালুম হচ্ছে, কান্ট্রি স্পিরিট এখন বুদ্ধির ঢেঁকি বাঙালির আক্কেলে জল ঢালতে একদমই না-কাম।

রাজ্যবাসীকে এহেন বিজাতীয় সোমরসে হাবুডুবু খেতে দেখে রাজ্য সরকারের শুল্কমন্ত্রী প্রবোধ সিন্‌হা একেবারে সুবোধ বালকের মতো কবুল করে দিয়েছেন—কলকাতায় আরো ১৯টা বিলেতি 'মাল'-এর দোকান খোলা হবে। কর্ম সংস্কৃতি এবার মদ্যসংস্কৃতির তলানি-তে ঠেকল বলে। সুখের কথা, চৈতন্যদেবের কৃষ্ণরসে না মজে এখন নদীয়া বীয়ার রসে মেতেছে সবথেকে বেশি।

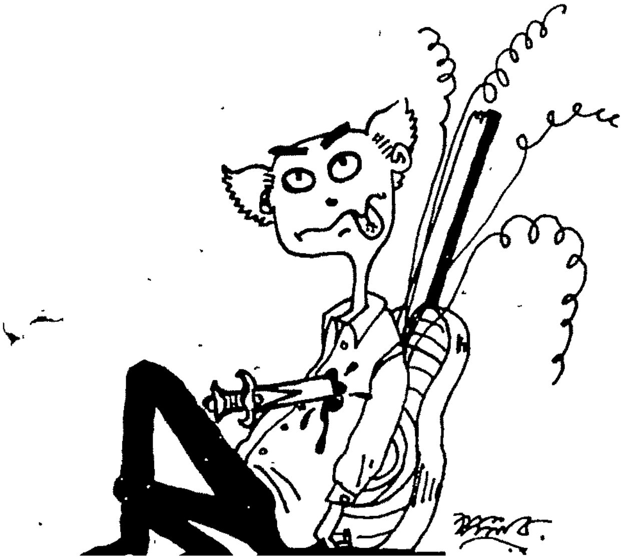

গান হত্যা!

'আবোল তাবোল'-এ সুকুমারের ওস্তাদ গুরুমারা গাইয়ে, ভীষ্মলোচন শর্মার দিল্লি থেকে বার্মা ওয়ালা গলার সাইরেনে নিজের বাপের নামই ভুলে গেছিল অনেকে। হালফিলের গানের গুঁতোয় কোনটা রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনটা নজরুলগীতি, কোনটা আবার লোকগীতি, কোনটাই বা জগাখিচুড়ি মার্কা রিমেক—এসব বুঝতে গেলে বোধহয় তানসেনের ঘাড়ে গিয়ে বসতে হবে। এই গানের সৌজন্যে ফিলিপাইন্‌সের উত্তর ম্যানিলা শহরে একজন দুর্ভাগার 'লাইফ' 'গন্' হয়ে গেছে। তিনি সোজা উপরে চলে গেছেন।।

ম্যানিলার একটা কারাওকে পানশালায় দিব্যি মদ্য গিলে স্বল্পবাস গায়িকাদের সঙ্গে কোমর নাচাচ্ছিলেন অনেক সঙ্গীত রসজ্ঞই। একদল ছোকরার নেশাটা একটু বেশিই চড়ে গেছিল। ওই কারাওকে বারে ঢুকে নটরাজের মতো প্রলয়নৃত্য শুরু করে দিল তারা। গায়ককে এক ধাক্কা দিয়ে, ধমক দিয়ে বলল যে তার গানে 'কোয়ালিটি নাকি একদম নেই।

ব্যস্, আর যায় কোথায়। নিজের গানকে ল্যাং মারার চেষ্টা? সেই কারাওকে গায়ক কখনো ব্রুস লি, কখনো জেট্ লি, কখনো র‍্যাম্বো হয়ে গিয়ে তাঁর ওইসব সমালোচকদের ওপর হাতের সুখ করতে লাগলেন। লড়াই থামাতে এসে ছুরি খেয়ে পরপারেই চলে গেলেন জনৈক প্রৌঢ়। গানের টান তাঁকে যে এরকম গান-শহীদে পরিণত করবে, তা তিনি জানতেন না।

চকোলেট সুন্দরী

একটু সুন্দর দেখতে হলেই কেল্লা ফতে। সেই সব মেয়েদের আর কোনো ইনভেস্টমেন্টের দরকার হয় না। কলেজে মাইনে জমা দেওয়ার কাউন্টারে মাথায় রোঁয়া ওঠা, খেঁকুরে ক্লার্ক, চিপুদা বা চন্দ্রদা-দের সামনে গিয়ে পাউডারের পলেস্তারা মারা মুখটাকে একটু সামনে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়ালেই হল। ছেলেগুলো লাইন দিয়ে সামনে দাঁড়ালেও তাদের সাইডে ফেলে চন্দ্রদা-রা তাদের বত্রিশ পাটি বিকশিত করে সেই রুপোলি মৌমিতাদের মাইনেটাই আগে জমা নিয়ে নেবেন। এই সুন্দর মুখের ঈশ্বরদত্ত অ্যাকাউন্ট ভাঙিয়েই ললনারা রেশন কেরোসিন টেলিফোন-বিল দুধের ডিপো—সব জায়গাতেই লাইনের আগে এসে যাচ্ছেন। কমপক্ষে গণ্ডাখানেক প্রেমিকরূপ ছাগশিশুকে বাতিল করে ও লেঙ্গি মেরে ডাস্টবিনে ফেলার জন্য তাঁদের চাপা ঠোঁটের বাঁকা ধনুক আর ভূকম্প জাগানো বক্র চাহনিই আসল মূলধন। হেলেন আর সীতার মুখচন্দ্রিমার খেপ্‌লা জালে পড়েই তো হাতে হ্যারিকেন হয়ে গিয়েছিল ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস আর লঙ্কেশ্বর দশাননের। সুতরাং মার্কিন বিজ্ঞানীরা যখন বললেন—ছোকরাদের মগজে মেয়েদের মুখ—চকোলেট, এমনকি কোকেন আফিং-এর মতোই নেশা ধরানো বস্তু বলে ধরা দেয়—তখন একটু মাথা ঘামাতে হয় বই কি।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার গোলোকধাঁধায় অনেক চক্কর মেরে অবশেষে ধরতে পেরেছেন—আমাদের মগজের যে অংশে চকোলেট, চাউমিন, আইসক্রিম খাওয়ার জন্য সাধ জাগে—সেখানে কোনো বনলতা সেন বা নারীর পটলচেরা চোখ আর প্লাক্ করা ভুরুর ছবি এলেই খাওয়ার সমস্ত চিন্তা বেমালুম গায়েব হয়ে যাবে। তাহলে, পেটে ছুঁচোর কেত্তন বাজলেও একটা চকোলেট-মুখের সুন্দর হাসির ট্যাবলেটই যথেষ্ট।

—কৌশিক রায়

ডায়েট কন্ট্রোল !!

কালো-ই ভালো

তেনাকে এই অবস্থায় দেখলে কবিগুরু আবার বলতেন-ই—“কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি. কালো, ও সে যতই কালো হোক্.”

দীর্ঘদিন ফ্যাটফেটে সাদা হয়ে জিনস্ পরে আর মুখে মাইক লাগিয়ে বাঁদুরে রক নাচা-গানা সহযোগে দুনিয়ার তাবৎ টিন এজারদের মাথাগুলোকে প্রায় ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে ছেড়েছিলেন পপ্ গান আর মুনওয়াকিং ডান্সের এই মুরুব্বিটি। হালফিলে এই মাইকেল জ্যাকসনের আবার চৈতন্য হয়েছে। ব্রিটানি স্পিয়ার্স, এনরিক ইগলেসিয়াস, রিকি মার্টিন আর ব্যাক্স্ট্রিট বয়েজদের অ্যালবামের সেল যখন আকাশ ফাটিয়ে বাড়তে শুরু করেছে, তখন জ্যাকসনের নয়া অ্যালবাম—ইন্‌ভিন্‌সিব্‌ল’-এর বাজার একদমই পড়তির দিকে। ‘ব্যাড’, ‘থ্রিলার’, ‘সাইবেরিয়ান গার্ল’ তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ মিহি তানে গেয়ে তাবৎ বিশ্বের যুবক-যুবতীর দীবল কোমর আর পায়ে ব্রেক নাচের ব্রেকনেক স্পিড এনে দিয়েছিলেন যিনি, সেই এম. জে এখন টের পেয়েছেন তাঁর অ্যালবামের ক্যাসেট আর সি. ডি. এখন ম্যানহাটনে আর লিভারপুলের বাজারে কে. জি দরেও বিকোবে না। এদিকে জর্জ হ্যারিসন ক্যান্সারে গঙ্গাপ্রাপ্ত হওয়াতে টিন এজাররা দল বেঁধে বিটল্‌সের হারানো দিনের সেই গানের ক্যাসেট কিনতে লেগেছে। এহেন উভয় সঙ্কটে পড়ে জ্যাক্‌সনের জিন্‌স্ খুলে গিয়ে ল্যাংগট পরার দশা। কেনই বা এরকম শুকনো ডাঙায় আছাড় খাওয়া? মাইকেল দাদা তাঁর উর্বর মগজ দিয়ে তার উত্তরও খুঁজে পেয়েছেন। আরে। তিনি না কালো মানুষদের গান-মাস্টার। চামড়াটা ময়শ্চারাইজার মাখানো সাদা হলে কালো খদ্দেররা তাঁর ক্যাসেট না কিনে মুখ ভেংচিয়ে চলে তো যাবেই। সুতরাং, জ্যাকসনবাবু আবার কালো হয়ে স্বমহিমায় ফিরে আসছেন। এর জন্য প্লাস্টিক সার্জনদের এর মধ্যেই ৫লক্ষ পাউণ্ড দিয়েছেন তিনি। ‘কালা’ না হলে কালো মানুষদের কাছে ‘দিলওয়ালা’ হবেন কী করে জ্যাক্‌সন বহুরূপী?

—কৌশিক রায়

সন্টুর কীর্তি

কাজী সারিন আফরোজ

শীত তো চলে এল, তাই সাত সকালে স্নান করে স্কুল যেতে কি বিরক্তিই লাগে না, কি বলব। তবুও মায়ের বকুনি খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে স্কুলে পৌঁছলাম।

গেট দিয়ে ঢুকতেই মাহারাজের সাথে (সন্টু শর্মা) দেখা, সঙ্গে আবার কিংশুকও। পোশাক-আশাক দেখে মনে হল, আজ স্কুলে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সন্টু উপরে পরেছে লেদারের কোট, নিচে লুঙ্গি, পিঠে ব্যাগ,পায়ে কেড্‌স। কিংশুকও তাই। আমি ব্যাপার বুঝতে না পেরে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সন্টু বলল, "ক্লাশে যাবি, সেখানেই আমি 'লুঙ্গির উপকারিতা' সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো লেকচার দেব।" কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলেই সোজা ঢুকে গেল ক্লাশে।

ভেবে দেখলাম, আজ ওদের ক্লাশে না গেলে কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারব না। আমার ভাগ্য ভালো, আজ ফার্স্ট পিরিয়ডে মাস্টার মশাই অ্যাবসেন্ট। উনি নাকি ভীষণ অসুস্থ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দৌড়লাম। সন্টুদের ক্লাশের দিকে।

ক্লাশে স্যার থাকায় আমার অবস্থান হল জানালাব পাশে, যাতে দেখতে না পায়। রোল কল করা হয়ে গেল, খাতাটা রেখে দিয়েই স্যার চোখ দুটো লাল করে বললেন—"সন্টু?"

সন্টু 'ইয়েস স্যার' বলে উঠে দাঁড়াল। যেন কত ভদ্র, নম্র।

স্যার বললেন—তুমি লুঙ্গি পরে স্কুলে এসেছ কেন?

সন্টু ভাষণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, স্যার, আজ পৃথিবীর সব জায়গায় পরিবর্তন এসেছে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প সব ক্ষেত্রেই। এতদিন আমরা প্রার্থনা সঙ্গীত "জনগণমনঅধিনায়ক" পড়ে আসছিলাম। কিন্তু সেখানেও দেখলাম পরিবর্তন। কাল আপনারাই জনগণের আগে "তুমি নির্মল কর, মঙ্গল কর" করে কি যেন একটা পড়ালেন। ঠিক তেমনি আমিও আমাদের স্কুল ইউনিফর্মের পবিবর্তন করতে চাই। এবার স্যার বলি, আমি কিভাবে লুঙ্গি দ্বারা উপকৃত হয়েছি।

স্যার যেন কি বলতে চাইছিলেন। কিন্তু তার আগেই সন্টু শুরু করে দিল —এমন আরামদায়ক সহজ সরল পোশাক পৃথিবীতে আপনি দ্বিতীয়টি আর দেখতে পাবেন না। পৃথিবীতে এমন কী পোশাক আছে বলুন, যা পা বা মাথার দিক দিয়ে পরা যায়? যখন ইচ্ছা মালকোঁচা মারা যায়? এত স্বচ্ছন্দ পোশাকের জন্যই ভাবতের কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা এবং আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত এর বিস্তাব।

এইসব কারণে আমার প্রস্তাব—
লুঙ্গিকে ভারতের জাতীয়
পোশাক ও স্কুলের
ইউনিফর্ম বলে অবিলম্বে
ঘোষণা করা হোক।

আবার অন্যদিকে দেখুন, লুঙ্গি সাম্যবাদ মেনে চলে। ধনী-গরিবে কোনো ভেদ করে না। আপনি ৩০ টাকাতেও লুঙ্গি পেতে পারেন। আবার ৩০০ টাকাতেও পেতে পারেন। তবে লুঙ্গির বাহারি চেক আমার মন কাড়ে। মেয়েরাই বা কম কিসে? নেপাল, বার্মা, চেন্নাই-এ যা পরে, তা লুঙ্গি ছাড়া আর কি? আধুনিকাদের কাছে প্যাঁচানো লুঙ্গি-স্কার্ট তো ভীষণ প্রিয়। দেখতে নাকি খুব স্মার্ট লাগে।

সন্টুর এই ভাষণে সমস্ত ক্লাশ জুড়ে চটপট হাততালি পড়ল। সন্টু এতে উদ্দীপ্ত হয়ে বলে ওঠে, একটা ছোট ঘটনা শুনুন স্যার। গত রবিবার আমি আর আমার প্রিয় বন্ধু কিংশুক নতিপপুরে রাসের মেলা দেখতে যাচ্ছিলাম, এই লুঙ্গি পরেই। সামনে নদী, জলও কম, খেয়া চলে না, কী করব? এগোচ্ছি। জল একটু একটু বাড়ছে। আমাদের লুঙ্গিও একটু একটু কমছে। লুঙ্গি বুক ছেড়ে একেবারে গলায় চলে এল। প্রায় ওপারে চলে এসেছি। জল একটু একটু কমছে। আমাদের লুঙ্গিও একটু একটু নামছে। শেষের দিকে লুঙ্গি হাঁটুর নিচে নেমে এল। বলুন তো, এমন বিপদতাবিণী পোশাক কোথায় পাবেন?

এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে গেল। স্যার কটমট করে সন্টুর দিকে তাকিয়ে ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার হাততালিতে ক্লাশ ফেটে পড়ল। আজকে সত্যিই সন্টুকে হিরো বলে মনে হচ্ছিল। আমি গুটগুট করে নিজের ক্লাশের দিকে এগোলাম।

চা চেয়ে চিত্তির

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

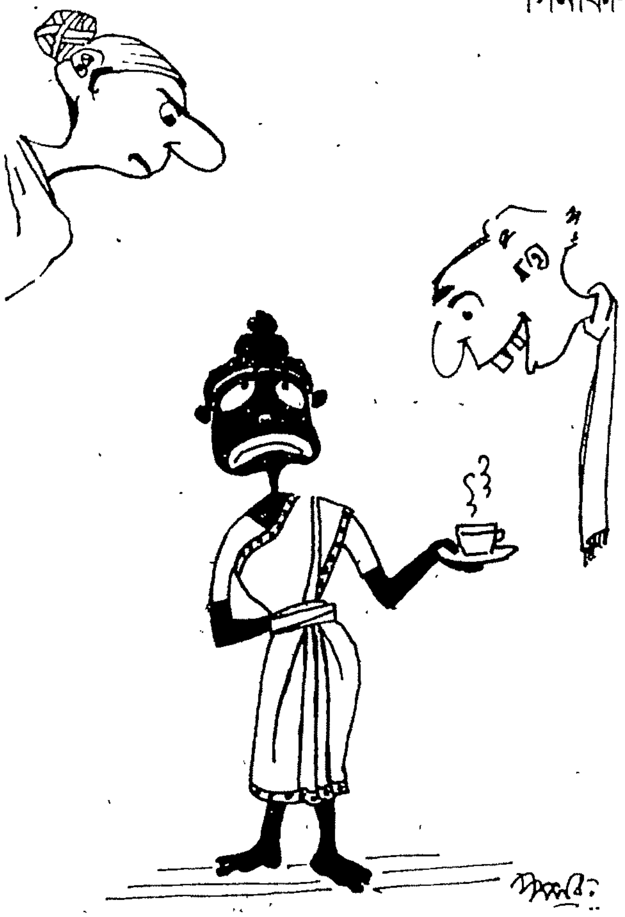

শরৎকালের দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আমিও একটু গড়িয়ে নিয়ে উঠে বসেছি। বসেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণ অন্য কিছু নয়। খুব ব্যস্ত হয়ে চিন্তা করতে বসলাম এখন কী করব। এই পৃথিবীতে সে-ই ব্যস্ততম মানুষ, যার হাতে কোনো কাজ নেই। কথাটা আগে কেউ বলে গেছেন কিনা জানি না। আমি এইমাত্র বললাম।

চাকরিজীবন থেকে অবসর নেওয়া হয়ে গেছে। তাই অফিসে বসে কাজের নামে গ্যাঁজানো কিংবা 'বস'- এর মুণ্ডপাত করা জাতীয় মহৎ কর্মগুলি হাতের কাছে নেই। মাঝে মাঝে ঘরে বসে আকাশের সঙ্গে বাতাস মিলিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করি। কিন্তু সেটাও তো মনের মধ্যে যথেষ্ট ভাব-টাব চাগাড় দিয়ে না উঠলে হয়ে ওঠে না। তাহলে কী করা? বসে বসে হাই তোলা? ধ্যুস। সেটাই বা কতক্ষণ পারা যায়? শরীরে যথেষ্ট হাওয়ার জোগান থাকতে হবে তো।

ছেলে তার মেয়েকে নিয়ে এলাহাবাদে। মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে। এহেন একজন অবসর পাওয়া লোকের হাতে কী কাজ থাকতে পারে? হ্যাঁ, একটা মস্ত কাজ থাকে। সেটা হল বসে বসে বৌয়ের বাতেলা শুনে যাওয়া। আর সেটা হজম করার চেষ্টা করা।

আজ্ঞে না। এ হজম সে হজম নয়। এটাকে অগস্তীয় হজম কোনোক্রমেই বলা যাবে না। অগস্ত্যমুনি দেবতাদের অনুরোধে পুরো সমুদ্রের জল খেয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর হজমশক্তি ছিল অপরিমিত। কিন্তু তিনিও লোপামুদ্রার বোলচাল হজম করতে পারেননি।

স্ত্রীর বোলচালে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তপস্বী ঋষি হয়েও অসুররাজ ইল্বলকে মেরে তার সমস্ত ধন-সম্পত্তি নিয়ে এসে লোপামুদ্রাকে অর্পণ করে তবে নিস্তার পেয়েছিলেন। তাতেও স্বস্তি নেই। সবাই জানে অগস্ত্যমুনি দক্ষিণ দেশে গিয়ে আর ঘরে ফিরে আসেননি। কেন আসেননি এবং এ ব্যাপারে লোপামুদ্রার বোলচালের অবদান কতখানি ছিল, সে ব্যাপারে পুরাণকাররা নীরব। সম্ভবত লোপামুদ্রার ভয়ে। কিন্তু অগস্ত্য-জীবনের এত কাণ্ড পড়ার পর কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়।

মহাতেজা তপস্বী অগস্ত্যমুনিও যেখানে হার মেনে গেছেন, সেখানে বাঙালিরা নিত্যদিন দু'বেলা এবং রাতেরবেলাও অবলীলাক্রমে গিন্নির বাতেলা কান দিয়ে ভোজন করে মগজ দিয়ে হজম করে চলেছে। বাঙালি জাতি কি কম? সেইরকম বাঙালি জাতির একজন বলে আমি তো নিজেকে নিয়ে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করি।

তা, যাকগে সে সব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। এই মুহূর্তে আমার গ্রামোফোনটি বাক্সবন্দী। কারণ গিন্নি বাড়িতে নেই।

গিন্নি বাড়িতে নেই মানে বাপের বাড়ি গেছেন, সেরকমটাও ভাবার দরকার নেই। মেদিনীপুরে ওঁর বাপের বাড়ি, মানে আর কি বর্তমানে দাদার বাড়িতে, মাঝে মাঝে যান না যে তা নয়। তবে গত মাস তিনেকের মধ্যে গেছেন বলে মনে করতে পারছি না। আর এই মুহূর্তে তিনি যে দাদার বাড়ি যাননি সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি। কারণ সে ক্ষেত্রে সেটা আমার মনে থাকত। ওনার প্রতিবারে দাদার বাড়ি যাবার সময় আমি একটা করে মনে রাখার মতো ঘা খাই। গুনে গুনে কুড়িটি একশো টাকার নোট ওঁর হাতে দিতে হয়। কলকাতা থেকে মেদিনীপুর আসা-যাওয়ার রাহাখরচ। ট্রেনে যান না ট্যাক্সিতে যান কে জানে। সিঁটিয়ে আছি কোনদিন না হেলিকপ্ট ভাড়া বাবদ দশহাজার টাকা চেয়ে বসেন। আমি তো জানি না, পাঠিকা

কেউ জানাবেন কি, কলকাতা-মেদিনীপুর হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে কিনা? কিংবা না হলেও কবে নাগাদ হবে? তাড়া নেই। পরে জানালেও চলবে। তবে এখন যেটুকু জানি আর জানাচ্ছি তা হল উনি এই পাশেই গড়িয়াহাট মার্কেটে শপিং করতে গেছেন।

শপিং না বলে মার্কেটিংও বলতে পারতাম। বললাম না ওঁর ভয়ে। মার্কেটিং কথাটায় ওঁর ভীষণ আপত্তি আছে। ওঁর মতে মার্কেটিং মানে হল বাজারে গিয়ে পোকা বেছে বেছে বেগুন কিংবা বেছে বেছে পচা মাছ কেনা। সেটা করি আমি। আর উনি যেটা করেন সেটা হল শপিং। অর্থাৎ শাড়ির আণ্ডিল হাতড়ে শাড়ি কিংবা ব্লাউজের বাণ্ডিল হাঁকড়ে ব্লাউজ কেনা ইত্যাদি। কিংবা তার চেয়ে আরো ছোট কোনো পরিধেয় বস্ত্র।

বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছি। একবার আকাশে উঠছি, একবার পাতালে নামছি। এইরকম ওঠানামার পরিশ্রম হয় না, পয়সা খরচ হয় না, এমন কি লিফ্‌টের বোতামও টিপতে হয় না। তাই আরামসে কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ওঠানামার মধ্যে হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল আর আমি দড়াম্‌ করে মাটিতে পড়ে গেলাম। না না, সত্যি সত্যির মাটিতে নয়, মনে মনে। মনে মনেই আকাশ-পাতাল করছিলাম মনে মনেই মাটিতে পড়লাম। এই বয়সে খাট থেকে পড়ে যাওয়া সহ্য হবে না। অত উঁচু থেকে সত্যি সত্যি পড়লে তো হাড়-পাঁজরাগুলো. ...।

কলিং বেলের দোষ নেই। সে তো বাজবার জন্যেই আছে। বোতামটি দাবালেই হল। বাড়ির আর সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে, এমনকি অবৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সঙ্গেও কলিং বেলের এইখানটায় তফাৎ। সব যন্ত্রপাতি কাজ করে বাড়ির লোক, অর্থাৎ তাদের মালিকের ইচ্ছে মাফিক। কিন্তু কলিং বেল কাজে করে বাইরের লোকের ইচ্ছে মাফিক, যে এই কলিং বেলটি লাগাবার জন্যে একটি পয়সাও খরচ করেনি। বাড়ির ভেতরে যারা থাকে তারা কেউ কলিং বেল বাজায় না। উল্টে বেল বেজে উঠলেই যে বাজাচ্ছে তার ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতে দরজার দিকে দৌড়ে যায়।

কোমরের কষি আঁটতে আঁটতে গিয়ে দরজা খুললাম। ভেবেছিলাম গিন্নি ফিরেছেন। না, তা নয়। দরজার সামনে ফোক্‌লা দাঁতের ধ্বজা উড়িয়ে ভেঙচি কাটার ঢঙে মুখময় একটা বেঢপ হাসির কাঁথা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমান বিধুচরণ। বিধুচরণ আমার কলেজ জীবনের দোস্ত। দু'জনে একসঙ্গেই ক্লাশ কেটেছি, প্রক্সি মেরেছি, প্রফেসারকে পেছন থেকে ভেঙচি কেটেছি।। একসঙ্গেই টুক্‌লি করে পাশ করেছি। যদিও চাকরি করেছি দুটো আলাদা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু জীবনে বাড়ি করেছি একই পাড়ায়। বিধুচরণ বর্তমানে আমার মতোই কাজ থেকে ছুটি পেয়ে যাওয়া নানা অকর্মে সদাব্যস্ত কর্মহীন বৃষবিশেষ। অবসন্ন বিকেলে কোনো কাজ খুঁজে না পেয়ে আমাকে সঙ্গদান করে আমার অকাজের বোঝা হালকা করতে এসেছে। আমি জানি সে আজকাল এই কাজটা করতেই আসে। তাই কেন এসেছে জিজ্ঞেস করে তালভঙ্গ করলাম না। আর যদি ভুল করে প্রশ্নটা করেও ফেলতাম তবে উত্তরটা দু'জনেরই জ্ঞানবুদ্ধির এতই বাইরে যে আকাশ পাতাল হাতড়েও কোনো উত্তর খুঁজে পেতাম না। না সে, না আমি। আমাদের দু'জনের কেউ সে সবের ধারকাছ দিয়েও গেলাম না। বিছানার উপরে জমিয়ে বসে গেলাম গপ্পো মারতে।

বসার আগে গলা উঁচু করে রান্নাঘরের দিকে তাক করে শব্দবাণ ছুঁড়লাম—নবনলিনী, দু'কাপ চা করে আন্‌ তো।

নবনলিনী আমার গিন্নির পেয়ারের কাজের মেয়ে। বয়স হবে বছর পনেরো। ওঁর বাপের বাড়ির দেশের কোন এক অজ পাড়া-গাঁ থেকে আমদানি। সেই সুবাদে গিন্নিকে মাসি বলে। আমাকে ডাকে মেসো। যদিও দাদু ডাকলেই বেশি মানানসই হত। কিন্তু মানানসই কাজটা হতে পাচ্ছে না এই জন্যে যে গিন্নির কড়া বারণ আছে। পনেরো বছরের মেয়ের দিদা হবার ওঁর ইচ্ছে নেই।

মেয়েটার মুখে মেসো ডাক শুনলেই মনে মনে আওড়াই—আমার কোন ভায়েরা ভায়ের আদরের মেয়ে গো তুমি। তোমার আর সবই ঠিক আছে। শুধু নড়াচড়ায় আর একটু কম সময় নিলে আর কথায় কথায় ঠোঁট ফুলিয়ে ফ্যাঁচফেচিয়ে কান্নাটা একটু কম করলেই ভালো হত। কিন্তু আমি আওড়ালে কী হবে, যিনি আওড়ালে কাজ হত তিনি যে আওড়ান না।।

বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতেই মনে সন্দেহ হল। রান্নাঘরের দিক থেকে কোনো নড়াচড়ার শব্দ আসছে না। আমার পাঠানো শব্দবাণটা যথাযোগ্য জায়গায় লক্ষ্যভেদ করেছে তো? নাকি সে মেয়ে পড়ে পড়ে ঘুম মারছে?

গল্প থামিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। যা সন্দেহ করেছি, ঠিক তাই। নবনলিনী রান্নাঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মানে আমার গলা উঁচু করে পাঠানো শব্দবাণ দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে উপর দিয়েই বেরিয়ে গেছে। মেঝেতে শুয়ে থাকা নবনলিনীর কানে পৌঁছায়নি।

আগেকার দিনে পাষাণপুরীতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকত। রাজপুত্র সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তার ঘুম ভাঙাত। কিন্তু আমি তো কোনো রাজপুত্র-টুত্র নই-ই, আমার হাতে কোনো সোনার কাঠিও নেই, তাই গলার শব্দকে ঢাকের কাঠি বানিয়ে সেটাকেই জোরে বাজিয়ে দিলাম। আমার হাঁকডাক শুনে নবনলিনী চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল ঠিকই, কিন্তু সামনে মেসোকে দেখে খুব একটা খুশি হল বলে মনে হল না। তার বোধহয় হিসেব ছিল মাসি শপিংয়ে গেছে সে ঘুমোবে, মাসি শপিং সেরে ফিরবে সে উঠবে। এর মধ্যে আবার মেসো কেন?

মহাতেজা তপস্বী অগস্ত্যমুনিও যেখানে হার মেনে গেছেন, সেখানে বাঙালিরা নিত্যদিন দু'বেলা এবং রাতেরবেলাও অবলীলাক্রমে গিন্নির বাতেলা কান দিয়ে ভোজন করে মগজ দিয়ে হজম করে চলেছে।

গলার স্বরে যথেষ্ট চিনি ঢেলে নবনলিনীকে বললাম, বাইরের ঘরে আমার বন্ধু এসেছে, দু'কাপ চা করে নিয়ে এসো তো।

নবনলিনী হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। ওর মৌনতাকেই সম্মতি ধরে নিয়ে আশায় বুক বেঁধে বাইরের ঘরে ফিরে এসে বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মত্ত হয়ে পড়লাম।

গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝেই প্রাণটা আনচান করে ওঠে এককাপ চায়ের জন্যে। কান চলে যায় রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে, চোখ ঘুরে আসে ওদিকের দরজার উপর দিয়ে। ওই পথেই তো নবনলিনী আসবে সাক্ষাৎ জগত্তারিণীর ভঙ্গিতে দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। চা আর আসে না। তার বদলে মাঝে মাঝে ওদিক থেকে সস্‌প্যানের সঙ্গে চামচের ঠোকাঠুকির ঠুন্‌ ঠুন্‌ শব্দ আসছে। বাসনপত্রের ঠোকাঠুকির শব্দ কানে এলে মনে আশা জাগে—হ্যাঁ, চা তৈরি হচ্ছে, যথাসময়ে এসে পৌঁছবে। কিন্তু যতই সময় গড়ায় ততই শব্দের ডেসিবেল বাড়তে থাকে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চা আসার আশা কমতে থাকে। কাপ-প্লেট চামচের ঠুন্‌ ঠুন্‌ শব্দগুলো ক্রমে ক্রমে বাসনপত্র পড়ে যাওয়ার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে প্রমোশন পেতে লাগল। তার মানে নবনলিনী রান্নাঘরে শুধু চা-ই করছে না। আরো অনেক কিছু এমন অকাজ করছে যাতে এই ধরনের শব্দ হতে পারে।

দশ মিনিটের মাথায় ঠন্‌ঠন্ করে চামচ পড়ার শব্দ। পনেরো মিনিটের মাথায় ডেক্‌চি পড়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ। কুড়ি মিনিটের মাথায় ঠকাস্ ঠাঁই করে চিনেমাটির কাপ-প্লেট পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার শব্দ।

আমার শুধু ধৈর্য নয়, সাহসেরও অভাব হয়ে গেল। এরপর যদি পুরো ওভেনটাই পড়ে যাওযার শব্দ শুনতে হয় তবে তো কেলেঙ্কারি। গল্প থামিয়ে আবার একবার রান্নাঘবের দিকে এগিয়ে যেতে হল। গিযে যা দেখলাম তাতে আমার চা না পাওযা শুকনো জিভ আরো শুকিয়ে একেবারে কাঠ।

দেখলাম ওভেনের দুটো বার্নারই পুরো খোলা অবস্থায় দাউ দাউ করে জ্বলছে। পাশে চায়ের কৌটো চিনিব কৌটো গড়াগড়ি দিচ্ছে। চিনি চা-পাতা দু'পক্ষই কৌটোর কোটর থেকে বেবিয়ে এসে মিলেমিশে কুকিং টেবিলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করছে। ঘরের মেঝেতে অন্তত দু'সেট কাপ-প্লেটের চুরচুর হযে যাওয়া মৃতদেহ আর তার চারদিক ঘিরে অর্ধেক তৈবি চায়েব পিঙ্গল গঙ্গাধারা এগিয়ে চলেছে বেসিনের নিচে জলনালার দিকে, বোধহয কপিলমুনির আশ্রমের খোঁজে। এবং এ সমস্ত কর্মের একমাত্র মূলাধার নবনলিনী দেবী নিজে অদৃশ্য।

ওইখানে দাঁড়িয়েই আমার কাঠ হয়ে যাওযার অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে মনের জোরে একজাযগায জড়ো করে ডাক দিলাম—নবনলিনী, তুমি কোথায়?

বাথরুমের ভেতব থেকে উত্তর এল—আমি এখানে। আমার শাড়িতে চা পড়ে গেছে। তাই সাবান দিয়ে পরিষ্কার করছি।

বাঃ। উত্তর শুনে বিগলিত হযে গেলাম। এরপর আমার আব কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি বোতাম ঘুরিয়ে গ্যাস বন্ধ করলাম। আর চা পাবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বসার ঘরে এসে বসলাম।

আরো কিছুক্ষণ গল্প করাব পর বন্ধুব বিদায় নেবার পালা। বন্ধুকে চা খাওযাতে পারলাম না আর সেইসঙ্গে নিজেও একটু চা খেতে পেলাম না বলে এগিযে দিতে গিযে বললাম— তোকে চা খাওয়াতে পারলাম না রে বিধু, বড্ড খাবাপ লাগছে।

বন্ধুর মুখেচোখে তখন ক্ষমাসুন্দর হাসি.—তাতে কী হযেছে।। আর একদিন এসে চা খেযে যাবখন।

গিন্নি যে বাড়ি নেই সেটা সে বুঝতে পেবে গেছে আর নবনলিনীর কাণ্ডকাবখানা তার নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

খোলা দবজা দিযে বন্ধুর প্রস্থান এবং সেই একই দরজা দিয়ে একটু পরে গিন্নির প্রবেশ। শপিং করাব ক্লান্তিতে যথেষ্ট হেদিয়ে পড়া অবস্থা। গিন্নিকে ঘরে ঢুকিয়ে বেশ খানকযেক সহানুভূতি মাখানো ইস্ আস্ চুক্ চাক্ ছুঁড়ে দিযে টিভির নব ঘুরিয়ে বসে গেলাম। মনে মনে আশা, এবারে কি জানি এক কাপ চা পাওয়া যাবে। এইমাত্র যতটা সহানুভূতির মাখন মাখিযেছি তাতে এক কাপ গবম চা নিশ্চয় আশা করতে পারি।

‘ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায় মুগ্ধ মানবের মন মুগ্ধ ত্রিভুবন....’ নবীন সেন সেই কবে কথাটা বলে দিয়ে কেটে পড়েছেন। তিনি আর নেই। কিন্তু কথাটা আজও সমান সত্য।

আমার আশাটা যদি পূর্ণ হত তাহলে আমাব এই প্রতিবেদনটা লেখারই দরকার হত না। সেক্ষেত্রে গিন্নির হাতের এক কাপ্ গরম চা খেয়ে অন্য একটা গল্পে হাত দিতাম। কিন্তু তা তো হয়নি। তাই এই গল্পটাই চালিয়ে যাচ্ছি।

একটু পরে গরম চায়েব বদলে নিজেই যথেষ্ট গরম হয়ে গিন্নি ভেতবেব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন,—নবনলিনীকে তুমি কী করেছ?

প্রশ্নটার জন্যে একদম তৈরি ছিলাম না। তাই কথাগুলো কানে এলেও অর্থটা চট করে মাথায় ঢুকল না। প্রশ্ন শুনে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। আমার গোব্‌দা মার্কা চোখমুখ দেখে গিন্নি দয়া করে আর একটু প্রাঞ্জল হলেন,—নবনলিনী কাঁদছে কেন?

এবারে ব্যাপারটা আমার মগজে ঢুকল। যে কোনো কারণেই হোক নবনলিনী কাঁদছে এবং গিন্নি বুঝে নিয়েছেন যে তার পেছনে আছে আমারই কোনো অপরাধ। তাই জানতে চাইছেন আমি কী করেছি।

কিন্তু এর পরেই ঠাঁই করে আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। যাই-ই হোক না কেন, আমি কী বলেছি, জিজ্ঞেস না করে উনি জিজ্ঞেস করলেন কেন—আমি কী করেছি? তার মানে গিন্নির অনুক্ত কথাটা আর অবধাবিত সন্দেহটা হল এই যে মেয়েটাকে একা ঘরে পেযে আমি নিশ্চয় এমন কিছু একটা.. ...।

ঝাঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। বটে। আমারই গিন্নি হয়ে আমারই সঙ্গে চল্লিশ বছব ঘর কবার পব আমাকেই সন্দেহ?

আমাব চটে যাওযার যথেষ্ট অধিকার আছে। কিন্তু ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ। অতএব ঘুরে যাওযা মাথাটাকে প্রাণপণে স্বস্থানে ধরে বাখার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পাবছি গিন্নি আমাকে সন্দেহ করছেন। তবু ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার। উনি আমাকে সত্যি সত্যি সন্দেহ করছেন, নাকি আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে ওঁর এই কথাটার অন্য কোনো অর্থ আছে? ওঁর মনের আসল ভাবটা যাচাই করে নেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে যতদূর সম্ভব সংযত রেখে পাল্টা প্রশ্ন বাখলাম, কী করব?

—কী করবে সেটা তুমিই জানো।

এরপর উনি যে চোখে আমার দিকে চেযে রইলেন তার অর্থটা যথেষ্ট শালীনতা বজায় রেখে খুঁজে বার করা আমার মতো ভদ্রলোকের সাধ্য নয।

শুধু আমি কেন, ওই চোখের দৃষ্টি যদি স্বয়ং চাণক্যেব সামনেও মেলে দেওয়া হত তবে তিনিও হাত তুলে দিতেন। বলতেন, ধুর মশাই, ওসব ব্যাপার স্যাপারগুলো দেবতারাই ন জানন্তি, আমি তো কোন্ কুতো মনুষ্যাঃ। আর কালিদাসকে দেখালে উনি হয়ত দুটো একটা মনগড়া উল্টোপাল্টা অর্থ আবিষ্কার করে ফেলতেন, এবং সেগুলো হয়ত কাব্য হিসেবেও বেশ উৎকৃষ্ট হয়ে উঠত, কিন্তু তাব একটাও আসলের ধারকাছ দিয়ে যেত না।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল আমাদের স্নায়ুশক্তির প্রতিযোগিতা। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছি। আমি সোফায বসে আর উনি দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে। দু'জনের অবস্থাই ন যযৌ ন তস্থৌ। যে আগে চোখ নামাবে তারই হার। এখন উপায?

এই অচলাবস্থা কতক্ষণ চলত কে জানে। কিন্তু সেটা অনতিবিলম্বেই শেষ হল রঙ্গমঞ্চে নবনলিনীর আবির্ভাবে।

নবনলিনী নেহাৎই গাঁয়েব মেয়ে। গেঁইয়াপনাটা এখনো খসে পড়েনি, থেকেই গেছে। বযসেব হিসেবে বলা যায একটু বেড়ে ওঠা লুসি গ্রে। ভাগ্যিস শহুরে চালবাজিগুলো এখনো রপ্ত হযনি। হলে কি জানি লুকিযে লুকিয়ে আমাদের এই অবস্থাটা দেখত আর তারিয়ে তারিয়ে মজাটা উপভোগ করত। তার বদলে সোজাসুজি চোখ মুছতে মুছতে দরজায় এসে দাঁড়াল আর নিজে থেকেই তার কান্নার কারণটা জানাল—মেসো আমাকে অপমান করেছে।

নবনলিনীর কথা শুনে গিন্নির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওঁর সন্দেহটা সত্যি বলে প্রমাণ হযেছে। আমি তো জানি আজ পর্যন্ত যতবার যত সন্দেহ উনি আমাকে কবেছেন তাব কোনোটাই প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উনি কোনো সাক্ষ্য- প্রমাণের তোয়াক্কা কবেননি। সন্দেহটাই দোষ প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সাক্ষ্য- প্রমাণ নিজে-নিজেই হাতের কাছে এসে হাজিব। চোখমুখ উজ্জ্বল হবাবই কথা। কিন্তু এদিকে আমার অবস্থাটা যে হবে গেল হাড়িকাঠে মাথা গলানো পাঁঠার মতো।

সর্বনাশ। এ মেয়ে বলে কী? এবার তো সত্যি মিথ্যে মিশিযে একটা কাহিনী খাড়া করবে আর আমার উপর খাঁড়াটি নেমে আসবে। আমি নিজেকে

যতই বৃষ বলে জাহির করি না কেন এক্ষেত্রে গিন্নি আমাকে পাঁঠার পর্যায়েই ফেলবেন। ধর্মশীলা হিন্দু রমণী হিসেবে বৃষবধে আপত্তি থাকলেও পাঁঠাবধে পাপ নেই। ওরে মাই ডার্লিং লুসি গ্রে, এক্ষেত্রে অপমান কথাটার মানে বুঝিস? তুই ভাবছিস মেসোকে মাসির কাছে বকুনি খাওয়াব। বেশ মজা হবে। কিন্তু বকুনিটা যে কতদূর প্রাণঘাতী হতে পারে তোর মাথায় তার কোনো আন্দাজ আছে?

আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। তবু ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ওকে জিজ্ঞেস করলাম,—তোকে আবার আমি কখন অপমান করলাম?

—কেন, তুমি তো একটা বাইরের লোকের সামনে বললে যে আমি চা করতে পারি না।

এর পর ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে যা বলল তার নির্গলিতার্থ হল এই যে, সে আমার কথা মতো দু'কাপ চা-ই তৈরি করেছিল। কিন্তু বাইরের লোকের সামনে একটা সাধারণ শাড়ির পরে বেরনো ঠিক হবে না মনে করে সে মাসির একটা শাড়ি পরে নিয়েছিল। শাড়িটা পরার সময়ই তার আঁচলটা জ্বলন্ত ওভেনের উপর পড়ে গিয়ে একটু ছ্যাঁকা লেগে গেছল। সেটা সামাল দেবার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে চায়ের কাপদুটো উল্টে মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে। আর শাড়িতে চায়ের ছোপ লেগে গেছে। মাসির শাড়িতে চায়ের দাগ লেগে গেলে দেখতে খারাপ লাগবে, তাই সে তাড়াতাড়ি স্নানঘরে গিয়ে শাড়িটা জলে ডুবিয়ে কাচতে লেগে গেছল। তাইতেই তো তার চা দিতে দেরি হল। ওদিকে স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে শুনতে পেয়েছে আমি ওই বাইরের লোকটাকে বলছি— তোকে চা খাওয়াতে পারলাম না, বড্ড খারাপ লাগছে। তার মানে তো নবনলিনীর উপরেই দোষ চাপানো হল। ঘুরিয়ে বলা হল যে সে চা করতে পারে না। এটা তার অপমান নয় তো কী?

আমার গিন্নি এতক্ষণ বেশ তারিয়ে তারিয়ে নবনলিনীর বর্ণনা শুনছিলেন আর আমার উপর কী কী বাক্যবাণ বর্ষণ করা হবে মনে মনে তারই মুসাবিদা করছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে শাড়ির কথা উঠল অমনি ওয়েদার ককের মুখটা একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল। বাদবাকি সব কথাগুলো চালুনির ছাঁদা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পড়ে রইল শুধু ওই শাড়ির কথাটুকু। উনি সেটুকুই ছেঁকে তুললেন। নবনলিনীকে জিজ্ঞেস করলেন,—তুই আমার শাড়ি পরতে গেলি কেন? কোন শাড়িতে চা ফেলেছিস্?

উনি মুখে তো বললেন, শুধু শাড়িতে চা ফেলার কথা। কিন্তু সেই শাড়ির আঁচলটা যে জ্বলন্ত ওভেনের উপর পড়ে গিয়ে ছ্যাঁকা লেগে গেছে, সে কথাটা কি ওঁর কানে যায়নি? আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে কথাটা শুধু ওঁর কানেই নয়, মগজে গিয়েও যথেষ্ট জোরে ধাক্কা মেরেছে। শাড়ির ব্যাপার বলে কথা। শাড়ির ব্যাপারে ওনারা যে কতটা সংবেদনশীল, সেটা তো সেই বিখ্যাত উক্তিটি থেকেই নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত। উক্তিটি হল— অ্যান ওম্যান উইল শেয়ার এভরিথিং উইথ হার হাজব্যাণ্ড বাট নট দি কাবার্ড। আর যে কাবার্ডের চাবি প্রাণ থাকতে কোনো মহিলা তাঁর স্বামীর হাতে তুলে দেন না, তাতে কী থাকে? শাড়ি। সুতরাং.....

গিন্নির প্রশ্নের উত্তরে নবনলিনী লজ্জা-লজ্জা চোখ করে বলল, তোমার সেই গরদের শাড়িটা। যেটা পরে কাল কালীঘাটে পুজো দিতে গেছলে। ওটাই সামনে ছিল, তাই ওটাই পরতে নিয়েছিলুম।

পাঠিকারা মাফ করবেন। আমার ওঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট ভয়ও। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি, নবনলিনীর কথাটা শোনার পর উনি যে গতিতে বাথরুমের দিকে দৌড়ে গেলেন সেটা হয়েছিল দেখার মতো।

আর আমি! বাঁচিল গরু, রক্ষা পেল ধরা।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। কথাটা ভুলও বলিনি, বানিয়েও বলিনি। রবি ঠাকুর থেকে টুকলি করেও বলছি না। আমার পিতৃদত্ত নাম গোবর্ধন।

টিভিতে সুযোগ

ATN BANGLA-তে প্রতি মঙ্গলবার ৩-৩০ মিঃ

সপ্তসুর ঝর্ণা দেখুন।

কণ্ঠ ও নৃত্য শিল্পীরা যোগাযোগ করুন

৮০/১ এফ, কাঁকুলিয়া রোড, কোলকাতা - ২৯

ফোন : ৪৪০-২২৯১ (১১-৫টা)

হেঁসেল

> সম্রাট্ আকবর শাহ্জাহানের আত্মা যদি হেই খিচুড়ির খোঁজ পায় তাইলে কিন্তু আপনের জিব্বার ভাইগ্যে কাঁচকলা।

বাদশাহি খিচুড়ি

ঠাণ্ডাটা এইবাব জব্বর কইর‍্যা পইড়বো মনে লয। তয ঠাইণ্ডা তাড়াই তে ক্যাবল সোযেটাব আলোয়ান হইলে চইল্‌ব না। রান্নাঘবেও ভালোমন্দ রাঁধন হওযা চাই। শরীল গরম বাইখ্‌তে আপনের মধ্যে যে সব মুখপড়াবা হাঁড়িয়া খেনো চুল্লু খান, বা বিলাইতি রাঙ্গাপানিতে চুমুক মারেন, তাগো লগে কিন্তু আমার হেই বাদশাহি খিচুডির পদটা লিখি নাই—একথাটা কইব্যা রাইখ্‌লম—হুঃ।

কি কি লাইগ্‌ব : মুইগ্ দাইল—১ কিলো, আতপ চাইল—২৫০ গ্রাম, ঘি পাঁশ্‌শো, বাদাইম—আড়াইশ গেরাম, পোস্ত—একশ গেরাম, চিনি—একশ গেরাম, আদাবাটা—একশ গেবাম, ধইন্যা বাটা—পইন্‌চাশ গেরাম, ত্যাজপাতা—তিনখান, দই—আড়াইশ গেরাম, হিং—শুইক্‌ন্যা লঙ্কা বাটা—পঁচিশ গেবাম, হইল্‌দি গুঁড়া দুই চামচ, লবণ আপনেগো রুচিমতন।

রন্ধন পোনালি : ঘি গরম কইব্যা বাদাইম, কিশমিশ পোস্ত ভাইজ্যা রাখেন। জল গরম কইব্যা ব্যাবাক্ মশল্লা একটা কাপড়ে বইন্ধ্যা জলে ডুবাইয়া রাখেন। জলে মশল্লার রং ধইবলে নামাইয়া লউন, কড়াইতে ছটাক খানেক ঘি দিয্যা হেই মশল্লাটা চাপান। সঙ্গে ত্যাজপাতা হিং আব লবং। আচ্ছা কইর‍্যা ভাজেন। ভাজনেব পব আতপ চাইল, ও বাকি ঘি দিয্যা নাড়াইতে থাকেন, মশল্লাব জল ফ্যালাইবেন না য্যান্। ঘি-তে দিয্যা দ্যান্।। স্যাদ্দ হইয্যা গেলে ভাজা বাদাইম, পেস্তা কিশ্‌মিশ আর অ্যালাচ্ ছড়াইযা দ্যান্। দই-এব লগে চিনি ম্যাশাইয়্যা ফেটাইয্যা লউন। হেই দইডা খিচুডিতে ঢ্যাইল্যা নাইড্যা দ্যান। যেনাবা প্যাঁজ, রোসুন ভালোবাইসেন তেনারা অবিশ্যি হিং-এর বদলে ওগুলান দিতে পারেন।

মা শেতলার নামে দিব্যি কইব্যা কইত্যাছি—এই বাদশাহি খিচুড়ি খাইলে আর কিচ্ছু খাইতে সাধ যাইবো না শীতের রাতে। সম্রাট্ আকবর শাহ্জাহানেব আত্মা যদি হেই খিচুড়ির খোঁজ পায় তাইলে কিন্তু আপনের জিব্বার ভাইগ্যে কাঁচকলা।

> ইস্কুল থিক্যা দশ কেজির বস্তা সাথে লইয়্যা বাড়িতে ফিইর‍্যাই বাচ্চাগুলান চ্যাঁচায়—অমলেট দাও, নুড্‌ল্‌স দাও, চকোলেট দাও।

ভুজিয়া রোইল

অহিজকাইলের পোলাপানগুলার খাওন-দাওনই অদ্ভুত। আমাগোব সময পাঠশালা থিক্যা আইস্যাই পাইন্‌তা ভাইত আর কাঁইচ্যা লঙ্কা নাইরকল কোবা দিয্যা হুড়ুম খাইতাম গিয্যা। আইব অহন। ইস্কুল থিক্যা দশ কেজিব বস্তা সাথে লইয্যা বাড়িতে ফিইব্যাই বাচ্চাগুলান চ্যাঁচায—অমলেট দাও, নুড্‌ল্‌স দাও, চকোলেট দাও। বাপ্পো রে, হেইসব খাবারের নাম মোব ঠাউরদার জন্মেও শুনি নাই। তয় হেইবার ভুজিযা রোইল বাননেব কথা আপনেগো কইত্যাছি—হেইডা কিন্তুক কেঁচোমার্কা চাউমিন আব এগ বোলে থিইক্যা ভালা লাইগ্‌ব আপনের বাচ্চাদের।

কি কি লাইগ্‌ব (চারডি বোইলের লগে) : ছোড বাটিব এক বাটি মযদা, দুইট্যা বড় প্যাঁজ, কাঁইচ্যা লঙ্কা, আদা, রোসুন কুচি, হইল্‌দি গুঁইড়্যা, দুইডা বড় টম্যাইট্টু, দাইলদা অথবা আম্নার ত্যাল।

রন্ধন পোনালি : মযদা জলে মাইখ্যা লউন। একডা ভিজ্জা পাইতলা কাপড়ে হেই মাখাটারে কিছুক্ষণ ঢাইক্যা রাখেন। ফ্রাইং প্যানে ছটাক্ খানেক দাইলদা গরম কবেন। তাইবপব প্যাঁজ, আদা রোসুন, কাঁইচ্যা লঙ্কা ভাইজ্যা লউন। কিছুডা হইল্‌দি গুঁড়্যা আর টম্যাইট্টু কুচি দিয়্যা দ্যান। মুচমুইচ্যা ভাজা হইয্যা যাওনের পব তিনডা ডিম ভাইজ্যা দ্যান এবং কাঠের খুন্তি দিয়্যা নাইড়তে থাকেন। বেশ ঝুবঝুইব্যা কইব্যা ভাইজ্যা জিনিসটাবে নামাইয়া দ্যান। আলাদা পাত্তরে বাখেন। হেইবাব মাখা মযদাব চাইবডা লেচি কাইট্যা লউন। ত্যাল দিয়্যা রুটির মতন করেন। উনানে রুটিগুলান ভাজেন। ভাজা হওনেব পব হেই ডিমেব ভুজিয়াটা চাইর ভাগ কইব্যা এক-একটাব মদ্দি রোলেব মতন কইর‍্যা দিয়্যা দ্যান। চিলি সস্ বা টম্যাইট্টু সস্ দিতে পাবেন। হেইবাব রুটিগুলানরে বোইলের মতন গুটান। হেইবার বাচ্চার সাথে আপনেও ভুজিযা বোইলে কামড মাবেন। তহন মনে অইবো আবো খান কয়েক বোইল বানাইলে ভালা হইতো।

—কাঙ্গাল রায়

শিক্ষা * প্রগতি * সমাজসেবা * অসাম্প্রদায়িকতা

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে
বহিবারে দাও শকতি......."

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি

৩০/৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট (চারতলা)
কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন : ২৪৪-৭৫৬৯

বাংলা ভাষায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম ইন্টারনেট দৈনিক পত্রিকা

সংবাদ

নিয়মিত পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে দেখুন ও পড়ুন

Website : http// www. sambad.com
Reg. Office : 18/31, Ballygunge Place [East]
Kolkata-700019
Phone : 463-9245/440-2761
E-mail : suprabat @ cal.vsnl.net.in

With Best Compliments From :—

KISHAN SATHI
MITTAL AGRO
FOOD PVT. LTD.

Manufacturer of Agricultural Implements
& Plant Protection Equipments

23, N.S. Road, 4-Commercial Building, 1st Floor.
Calcutta - 700001
Phone No : 221-0025

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো
বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

ফেব্রুয়ারি ২০০২

পত্রপাঠ

২য় বর্ষ ।। ৭ম সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম ঃ ৮ টাকা

কলকাতা বইমেলায় 617 নং স্টলে
আমাদের সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ

"আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস" মহান ২১শে ফেব্রুয়ারীর পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত ভাষা সম্পর্কে একটি সমৃদ্ধ সংকলন। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার বিশিষ্ট লেখকদের লেখা সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে।

মজহারুল ইসলাম ও চিত্ত মণ্ডল সম্পাদিত

মহান একুশে ২৫০.০০

সোমেন চন্দের সমগ্র রচনা সহ সোমেন বিষয়ক লেখায় সমৃদ্ধ অনবদ্য গ্রন্থ

ড. দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত **সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ** ২০০.০০

নজরুল ও তাঁর রচনা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত মূল্যায়ন

জিয়াদ আলী রচিত **নজরুল প্রতিভার উৎস : বিতর্কিত বিস্তার** ২০০.০০

ঘাতকের আক্রমণে নিহত এক সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পীর জীবনকথা (ভূমিকা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

ড. দিলীপ মজুমদার রচিত **শিল্পী আক্রান্ত** ৫০.০০

এ. এম. এম. নাজিমউদ্দৌলাহ্-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ **সভ্যতার লজ্জা** ৫০.০০

চীন বিপ্লবের প্রাণপুরুষ **মাও সে তুঙ এর নির্বাচিত রচনাবলী**

(৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ৬৭৫.০০ (বইমেলায় সংগ্রহকারীদের জন্য ৬৭৫ টাকার বই ৫০০ টাকায়।)

ঃ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ

ড. আহমদ শরীফ-এর **বিশ শতকে বাঙালি** ৫০৲
শেখর আহমেদ্-এর **মানুষ** ৪০৲
ড. শ্যামাপ্রসাদ বসুর **নিয়তির সঙ্গে কথা রাখা** ৭৫৲
কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের **কমরেডস লাইনটা সোজা করুন** ৬০৲
ড. তপন চক্রবর্তী-এর **সাহিত্য ইদানীং** ৪০৲
মজহারুল ইসলাম-এর **মানুষ গড়ার কারিগর** ৫০৲
শংকর শীল-এর **সভ্যতার সংকট ও রবীন্দ্রনাথ** ৫০৲
হরেকৃষ্ণ কোঙার-এর **পথের সন্ধান** ৫০৲
সতীশ পাকড়াশীর **অগ্নিযুগের কথা** ৪০
সুদর্শন রায়চৌধুরীর **গণতন্ত্র স্বাধীনতা বিপ্লব** ৪০৲
ড. দিলীপ মজুমদার-এর বাংলা সাহিত্যে প্রগতি চিন্তা ৪৫৲
রেবতী বর্মণ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ ৫০৲
তপোবিজয় ঘোষ-এর **সামনে লড়াই** ৫০৲
কিন্নর রায়-এর **ধর্ম সংকট** ৩৫৲
কৃষাণ চন্দ-এর **যব ক্ষেত জাগে** ৩০৲
সন্ধ্যা নন্দীর **দীন যে দীনের বন্ধু** ১৫৲

★ ★

স্তালিন রচনাবলী ৭৩০৲

নজরুল ও নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ—

কাজী নজরুল ইসলাম-এর
ধূমকেতু ২৫৲ ☐ **মরুভাস্কর** ৩৫৲ ☐ **রুদ্রমঙ্গল** ১৫৲
☐ **বিষের বাঁশী** ১৫৲ ☐ **নজরুল নাট্য সংগ্রহ** ৬০৲
সম্পাদনা : **ড. তপন চক্রবর্তী**

ড. বাঁধন সেনগুপ্ত-এর **নজরুলের ছেলেবেলা** ২৫৲
রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল ৩৫৲
নজরুল কাব্যগীতি বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন ১০০৲
মজহারুল ইসলাম-এর **আমারে দেব না ভুলিতে** ১২৫৲
ড. লায়েক আলি খান-এর **নজরুল প্রতিভা** ৭৫৲
শান্তিপদ সিংহ-এর **নজরুল কথা** ৩৫৲
ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর-এর বেতারে নজরুল ও তাঁর গান ৬০৲
নজরুল সঙ্গীতের সুরবিকৃতি ও সুরসংরক্ষণ ২০৲
ড. হারাধন দত্ত-এর **মানুষ ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম** ৭৫৲

নবজাতক প্রকাশন ☐ এ ৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ☐ কলকাতা-৭

ফেব্রুয়ারি ২০০২

পত্রপাঠ

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ব মাসিকপত্র

দাম: ৮ টাকা

২য় বর্ষ।। ৭ম সংখ্যা

বিদায় নেবার জন্য নয়

আবার বইমেলা। বই নিয়ে হইচই। কেউ বেচবেন, কেউ কিনবেন, কেউ চিনবেন—ধান্দাবাজি কারে কয়। বাবাজিরা বইবাজি করে বেড়াবেন। কেউ কেউ মামদোবাজি। ধুলোর মতো উড়ে যাবে না বই-এর গাদা, তবে ধুলো উড়বে বিপুল। ফিসফ্রাই, ঝালমুড়ি, মোগলাই, কফি—একেবারে বইকুণ্ঠ। বই পড়েন না? আহা, তাতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে, বইকুণ্ঠ যাত্রা করলেই হয়।

সম্পাদকীয় □৩ মহিলা মহল □৩০ পত্রপাঠ জবাব □১১ পত্রপাঠ লা-জবাব □১৩ রাশি চক্কোর □৫ সংস্কৃতি দুঃসংবাদ □১৮ শিক্ষা দুঃসংবাদ □২১ ধারাবাহিক কবিতা □১৪ সাহিত্য দুঃসংবাদ □১৬ হেঁসেল□৪১

প্রচ্ছদ কাহিনী বই নিয়ে দু-চার কথা • প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী □৩৯ বইবাজার ও বইচুরি • সৌরেন বসু □২০ প্রকাশকের সুখদুঃখ • হিমাংশু বন্দোপাধ্যায় □৪৩

গল্প বলা বাহুল্য • সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় □১৭ পুরুষোত্তমপুরের দারোগা • সোমনাথ চক্রবর্তী □৪৭

আনবিক গল্প ক্যাঁৎ • পল্লব চক্রবর্তী □১৫

নিয়মিত রচনা অকপটে • সমরেশ মজুমদার □৭ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি □২৮

পুরনো কাসুন্দি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কমলাকান্তের দপ্তর" থেকে □ ৬

নতুন কাসুন্দি বিমল রায়চৌধুরী সম্পাদিত "দৈনিক কবিতা" থেকে □ ৩৫

রসনাট্য বইমেলার ধুলো • সনৎকুমার মিত্র □২২ বই রাগ • কৌশিক রায় □৩১

রম্যরচনা ব'ধোদয় • শরদিন্দু কর □১৮ সাবধান বসন্ত এসেছে • কমলকুমার দত্ত □৩৮ সরি • সৈয়দ রেজাউল করিম □৪৫

রসকাব্য পত্রপাঠ জবাব চাই • নবনীতা দেব সেন □২৬ ন্যাকা • বিষ্ণুজ্যোতি রায় □২৯ সিদ্ধিদাতা ঠাকুর • নিঃস্বানন্দ ভারতী □২৯

এছাড়া ২০০২ সাল কেমন যাবে • শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় □৪ মুক্ত অ-চিন্তা • সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত □২৭ জেন্টসমেন ভার্সেস প্লেয়ার্স • মঞ্জুষ দাশগুপ্ত □১০ বিদ্যাভূষণ • মুসুমুসু কলমচি □২৪

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : পল্লব চক্রবর্তী
কর্ম সহায়ক : কৌশিক রায় • অচিন্ত্য কারক

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী
ডাঃ বিপাশা সেন • শচীন মিত্র • মীর দেলওয়ার আলী

সম্পাদকীয় দপ্তর : ১০ বি, ফার্ণ রোড, কলি-১৯ ফোন : ৪৬০ ০০৪১ (দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। রবিবার ও ছুটির দিন বাদে)
শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৪৪০-৩৮০৩

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

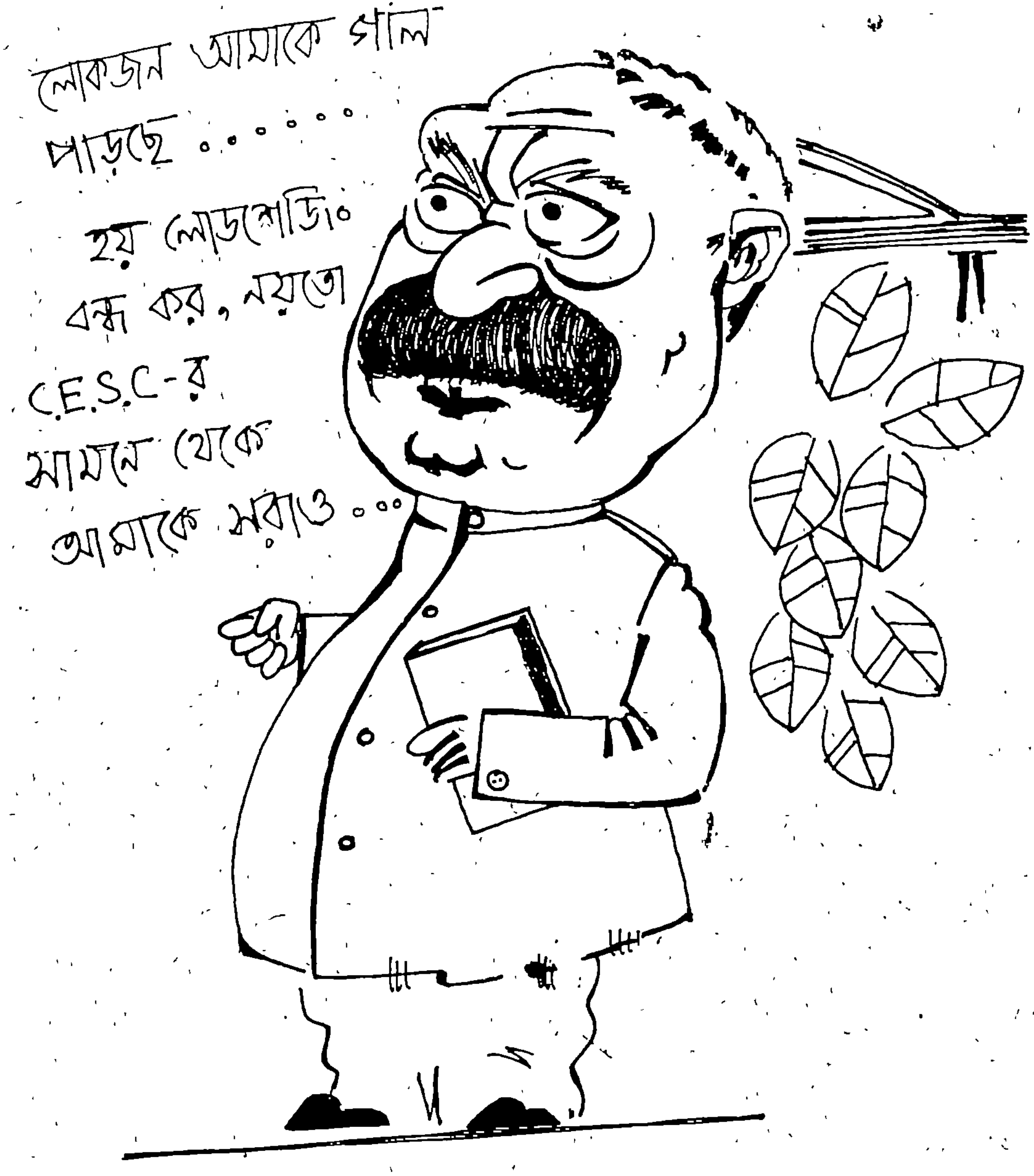
লোকজন আমাকে গাল পাড়ছে ......
হয় লোডশেডিং বন্ধ কর, নয়তো C.E.S.C-র সামনে থেকে আমাকে সরাও ...

P17605

সম্পাদকীয়

বইবাজ

গঙ্গাসাগরের পুণ্যস্নান এবং তদুপলক্ষে তুমুল মেলার রেশ কাটিতে না কাটিতেই বইমেলার দুন্দুভি। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভালো যে ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা বুক ফেয়ার তথা কলিকাতা পুস্তকমেলা সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। এবং এ বৎসর হইতে তাঁহার স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন কলকাতা বুক ফেয়ার, ভাষান্তরে কলকাতা পুস্তকমেলা, পাড়ার ন্যাপাকে ওপারে পাঠাইয়া পাড়ার ট্যাঁপা যেরূপ কালীপুজার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে। যাঁহারা এই বিয়োগ-বেদনা সহিতে অপারগ, তাঁহাদিগের জন্য ভিন্ন অপ্‌শান : প্রকৃতপক্ষে ক্যালকাটা বুক ফেয়ারের মৃত্যু হয় নাই; তাঁহার শ্রীবদনে ইতিহাসের বিশ্রী প্রলেপ লাগিয়াছিল বলিয়া থুতনিতে একটি আপারকাট ঝাড়িয়া মুখশ্রী ফিরাইয়া আনা হইয়াছে; পাড়ার ন্যাপা-ট্যাঁপার পরিভাষায় 'খোমা' বদলাইয়া দেওয়া আর কি! সংস্কৃতিবাজ আঁতেলরা ইহাকে 'রিমেক' কহিতে পারেন।

এ হেন বইসাগরে পুণ্যধূলিস্নান সহ ফুচকা ও ফিসফ্রাই খাওয়া, প্রেম করা, ফ্যাশান প্যারেডে মত্ত তীর্থযাত্রীর পাশাপাশি কিছু বইবাজ আসিবেন, যাঁহাদিগের ফ্ল্যাটে আর একটি শো-কেস আসিয়াছে। তাঁহারা সেইসব বিখ্যাত কাউণ্টারে দাঁড়াইবেন, যে স্থলে কমপক্ষে দুইঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইতে হয় এবং লোকে দেখিয়া বুঝে যে ইনি বই কেনেন বটে। যদিও সারা বৎসর তাঁহাদিগকে একটি পাঁজিও কিনিতে দেখা যায় নাই। বই, নির্বাক হস্তপদহীন বই বৈ তো নহে। ভাগ্যিস! হাত-পা থাকিলে তাহারা যে কাহার গণ্ডদেশে কখন চটাস্ পটাস্ শব্দে আপ্যায়ন করিত তাহা কে জানে।

২০০২ সাল কেমন যাবে

যদিও সন্ধ্যা আসিছে ...

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য বছরের প্রথমেই রবিগ্রহে রাহু প্রবেশ করেছে, একথা স্মরণ রাখা উচিত। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্ররচনার জনপ্রিয়তা কমবে বলে মনে হয় না। খুব একটা বাড়বে বলেও মনে হয় না, কেন না রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন। মানুষ রবীন্দ্রনাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে বুঝতে পারে না। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের ষাটজন আরামভোগী কর্মচারীকে ভি আর এস দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এদিকে বইবাজারে নাভিশ্বাস ওঠার যে অবস্থা সৃষ্ট হয়েছিল, বৃহস্পতির প্রভাবে তার সাময়িক প্রশমন ঘটবে। নানারকম প্রচ্ছদে আমরা গল্পগুচ্ছ, সঞ্চয়িতা আর গীতিবিতান—এই তিনটি গ্রন্থ দেখতে পাব সামনের বইমেলায়। কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামের বারো ফর্মার কি কুড়ি ফর্মার কোনো নতুন বই চোখে পড়বে না।

কেতু এবং শনিগ্রহের অবস্থান দেখে মনে হয়, এ বছর পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, এমনকি আনবিক অস্ত্র প্রয়োগের ফলে আংশিক ক্ষতিও হবে না কোনো রাষ্ট্রের। তবে যুদ্ধ চলবে। বারুদ ফুরনো পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধ থাকবে। স্ব-প্রণোদিত পারিষদ টনি ব্লেয়ার সহ প্রেসিডেন্ট বুশ আপন আপন দেশে নিন্দিত হবেন। পাকিস্তান ও ভারত—এই দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তন যোগ প্রবল।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে তা পরিলক্ষিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বাঘ থাকবে, মানুষও থাকবে; বাঘ মানুষের ক্ষতি করবে না, মানুষ বাঘের ক্ষতি করবে না। আলোচ্য বছরে এই বিষয়ে প্রথম 'মউ' সই করা হয়ে গেছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাগ্য গণনা করে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা হল, জ্যোতিবাবু রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন না। বর্তমান রাষ্ট্রপতি বিদায় নিলে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ সুন্দরী মহিলা ওই পদে আসীন হবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরের ওজন ও রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস পাবে। বদবাগী খেলোয়াড় হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলি এবছর রেকর্ড সৃষ্টি করবেন, যদিও তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো আশঙ্কা নেই। মহানগরীর নামে 'O'-কার যোগ করার কৃতিত্বে সহায়তা করার জন্য কবি-সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতার শেরিফ পদ প্রাপ্ত হয়েছেন। এবার মোটরগাড়ির নম্বরে বাংলা অক্ষর আনার আন্দোলন সফল করার সুবাদে তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত করা হবে। এর ফলে তাঁর হ্রাসপ্রাপ্ত আয় ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। তাঁর সুপারিশক্রমে এবছর অন্তত চারজন মহিলা লেখক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হবেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্পবাণিজ্য এবং পরিবহনের উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি হওয়ার যোগ নেই। তবে রাজ্যের সম্মানবৃদ্ধির জন্য নাম পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাতে অসম রাজ্যের পরেই বঙ্গের স্থান হবে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রশ্রয়ে বেকার যুবকদের উঞ্ছবৃত্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রশাসক দলের মধ্যে চিড় ধরলেও ভাঙন হবে না, কেন না সেখানে মঙ্গলের দশা বর্তমান।

আলোচ্য বছরে সারা বিশ্বে নারী জাতির অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কন্যা রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান হেতু হিন্দুনারীরা বিবাহ বহির্ভূত জীবন যাপনে উৎসাহিত হবেন। মুসলিম নারী ঘোমটা নামিয়ে দেবেন। পুরুষতন্ত্রবিরোধী খ্রিস্টান ও ধর্মনিরপেক্ষ নারীগণ সমকামিতায় মুক্তিলাভ করবেন। যৌনকর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, আয় বৃদ্ধি পাবে না। বধূহত্যা কমবে। ক্ষুব্ধ পুরুষ-সমাজকে আর পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব বহন করতে হবে না। রাত্রে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদ থাকবে না আর। এই সব পরিবর্তন দ্রুত আসবে, তবে এক বছরেই সম্পূর্ণ হবে না। ততদিন পত্র-পত্রিকায় পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপন অক্ষুণ্ণ থাকছে। এটাই আশার কথা।

২০০২ সাল কবিদের পক্ষে দুর্বৎসর। প্রতিভাবান তরুণ কবিগণ ক্রমশ টেলিভিশনীয় অনুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকবেন। সাংস্কৃতিক সভায় কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ শুনতে কেউ আসবে না। পাউডার মাখা, চুলে কলপ দেওয়া আবৃত্তিকারদের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

বিনোদনপ্রিয় বাঙালি দূরদর্শনে স্বল্পবেশিনীদের ধেইধেই নৃত্যগীত উপভোগ করে অধিক সময় ব্যয় করবেন। পারতপক্ষে বেতারযন্ত্রের চাবি ঘোরাবেন না। পথ-দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাবে। 'দেশ' পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচনা ছাপা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রতি সংখ্যায় মাত্র একটি করে কবিতা ছাপা হবে। বিষণ্ণ সুরে গাঁথা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভিন্ন সুরে গাওয়া শুরু হয়ে যাবে। একাদশে শুক্র থাকার ফলে কবি অমিয় চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ স্মরণ করে সাহিত্য অকাদেমি তাঁর নির্বাচিত কবিতার একটি সুশোভন ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করতে পারেন।

গৃহশিক্ষকদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা জাগতে পারে। তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আশাতীত উন্নতি হওয়ার ফলে শিক্ষিত বাঙালি যুবক-যুবতী জীবিকার অন্বেষণে অন্য রাজ্যে চলে যাবেন। তসলিমা নাসরিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন প্রারভেজ মুশারফ।

রাশি চক্কোর

জ্যোতিষাঁড়নব স্বামী কমলানন্দ অবধূত

বই-ধান্দা রাশি : যাঁহারা নিজের বই ছাপিবার জন্য আকুল, এই মাসে তাঁহাদিগের মঙ্গল বুধে প্রবেশ করায়, বুধবার শুরু-হওয়া বইমেলা সমাপ্ত হইবার পরবর্তী মঙ্গলবার একটি চটি কবিতার বই বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হইবার শুভযোগ দেখা যায়। ফলত তৎ পরবর্তী একমাস তাঁহাদিগের বন্ধুবিচ্ছেদ যোগ বর্তমান। বই কিনিবার অনুরোধ এড়াইতে বন্ধুবর্গ শতহস্ত দূর হইতে উর্ধ্বশ্বাসে কাটিয়া পড়িবে।

বই-পুরস্কার রাশি : বই লিখিয়া পুরস্কার পাওয়াই যাঁহাদিগের ইহজীবনের মোক্ষ— সেইসব জাতক ও জাতিকার ভিন্ন ভিন্ন হাউসে বসিয়াও ক্রমশ 'ব্যাট বেস'-এ পিছাইয়া পড়িবেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে হাউসগমন করিয়াই কামাল করিয়া দিবেন জাতিকা, বিশেষত অনূর্ধ তিরিশ, আধুনিকা এবং বিবাহ-বিচ্ছিন্নাগণ। এবং পুরস্কার পাকা করিবার পর তাঁহারা উপন্যাস রচনায় হাত দিবেন। জাতকগণের কপাল চাপড়ানো ও হাত কামড়ানোর বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

বইদাদা রাশি : বই লিখে লিখে যাঁরা দাদা হয়েছেন, মাসটি তাঁদের পক্ষে ভালো-মন্দয় মেশানো। ভালোর মধ্যে চামচাদের ভিড়ে পায়ে পা বেধে প'ড়ে নড়বড়ে তিনটি দাঁত ডেন্টিস্টের ভিজিট বাঁচিয়ে বিদায় নিতে পারে। আর মন্দর মধ্যে এক ষোড়শী এই মাসেই আপনার প্রেম-জালে জড়িয়ে পড়ায় ব্যয়বৃদ্ধি যোগ দেখা যায়। তিনমাসে একটির পরিবর্তে একমাসেই তিনটি ঝাঁটার ফরমাশ জুটতে পারে গিন্নির কাছে—আপনার সম্মানর্জনার্থে।

বই-প্রকাশক রাশি : এই মাসে প্রকাশক রাশির ঘাড়ে তরুণী কবিগ্রহের সন্নিবেশ থাকায় বইমেলায় প্রকাশক মশায়ের ব্যবসা ভ্যাপ্‌সা মেরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সদ্য প্রকাশিত সুন্দর প্রচ্ছদ শোভিত গ্রন্থগুলির প্রতি ময়দানের ধুলো ছাড়া আর কেউ ধাবিত হচ্ছে না দেখে নিজের চুল ছিঁড়ে সেলুনের খরচ সাশ্রয় হতে পারে। গৃহে পত্নীর বিপরীত মুখী শয়ন, অবন্ধন ও হৃদয়-বিদারক বাক্যবান যোগ লক্ষ্য করা যায়।

বই-চোর রাশি : বইচোরদের পক্ষে মাসটি অনুকূল। বইমেলার প্রথম দিনেই পুরাতন বইয়ের স্টলে প্রায়-নতুন "একশ বছরের তীব্র প্রেমপত্র সংকলন" নামক দামি বইটি গাপ্ করতে পারেন। কিন্তু হাঁপ ধরবে, যখন প্রচ্ছদ খুলে দেখবেন, সেটি গত বইমেলায় গ্যাঁড়ানো এবং প্রেমিকাকে উপহার দেওয়া সেই বিশেষ বইটি। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিকে বইচোরদের সৌভাগ্যে সম্ভাবনা আছে—বউচুরি হওয়ার ফলে। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একটি বই আপনার বউচোরকে উপহার দিলে বউ-এর প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

রচনাবলী রাশি : এই রাশির যে সকল জাতক কোনো লেখকের রাশি-রাশি বই পৃথকভাবে না কিনিয়া লেখকের মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকেন এবং মৃত্যু পরবর্তী রচনাবলী কিনিয়া নাচিতে নাচিতে তাক সাজান তাহাদের বলি, এই বৎসর বইমেলা হইতে রবীন্দ্র রচনাবলী না কিনিলে পরের বইমেলায় ওজনদরে কিনিবার সুযোগ পাইবেন।

নামাবলী রাশি : যাঁহারা কোনো একজন লেখকের উপর ভরসা করিতে পারেন না, সর্বদা দুই মলাটের মধ্যে একঝাঁক লেখক অর্থাৎ সংকলন কিনিতে ভালোবাসেন তাঁহাদের প্রতি সতর্কীকরণ—এই বৎসর বইমেলায় 'দুই বাংলার বিবস্ত্র গল্প সংকলন (সচিত্র)' নামে যে বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখিতেছেন, তাহা গত বৎসর বইমেলায় প্রকাশিত 'লালপাড়ার সচিত্র নীল গল্প বই' নাম ভাঁড়ানো সংস্করণ।

সাইজ-প্রেমী রাশি : এই রাশির জাতক যাঁহারা সাইজ দেখিয়া বইমেলায় বই কিনিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে এই মাসে ১, ৮. ৬ সংখ্যা তিনটি শুভ। অর্থাৎ ৮"×১৬", ১"×৮৬", ৬১"×৮". ১"×৬৮", ১৮"×৬" মাপের বই কিনিবেন।

ক্যাটালগ রাশি : এই রাশির যে সকল জাতক প্রতি বৎসর বইমেলায় কেবল ফ্রি ক্যাটালগ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, বই ক্রয় করেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই মাস শুভ নহে। লিটল ম্যাগ টেবিল হইতে তাঁহাদেরকে পত্রিকা ঠেলিয়া বিক্রয় (পুশ সেল) করিতে পারে। অতএব টেবিল-সংসর্গ নিষিদ্ধ।

'পেয়ে থাকেন' রাশি : যাঁহারা বইমেলায় বই ক্রয় করেন না, কেবল 'পেয়ে থাকেন', তাঁহারা এই মাসে শুধু দুর্বোধ্য কবিতার বই পাইবেন। জাতকদের সেইসকল বই অবিলম্বে হস্তান্তরের পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। অন্যথায় মস্তিষ্ক গোলযোগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

বেনফিস রাশি : এই রাশির জাতিকা ও জাতকগণ বই কেনেন না, বইমেলায় বেনফিস খান। কিন্তু এ বছর তাঁদের উন্নতিযোগ বিপুল। বেনফিস-এর অনাকাঙ্ক্ষিত কাঁটা গলায় বিঁধে Pain Fish হওয়ার পর তাঁরা একটি করে "গলার কাঁটা নিষ্কণ্টক করিবার হরেক উপায়" ক্রয় করে দুর্লভ 'পুস্তকপ্রেমী'র পর্যায়ভুক্ত হবেন।

পুরনো কাসুন্দি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর' থেকে

> সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গছাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে

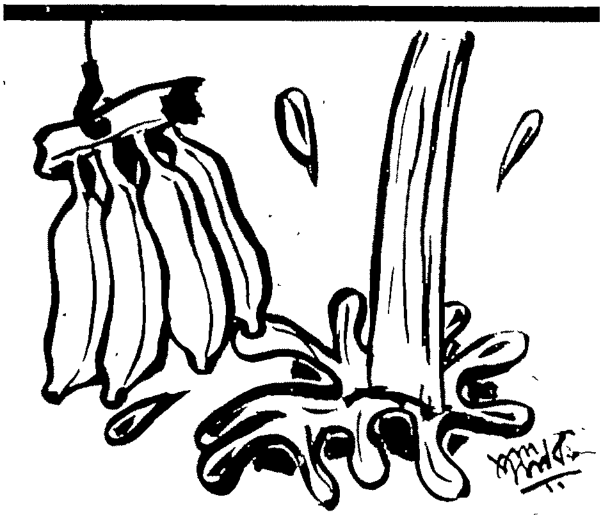

সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন। বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারাস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"

বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

"বেচিতেছে কে?"

"আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছে। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"

"কিনিতেছে কে?"

"আমরাই।"

বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।

তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম; দেখিলাম যত উমেদার, মোসাযের সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই—নাই নাই—নগদ টাকা আছে ত—আচ্ছা, তাই দাও—তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব—আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আব্দার, তোমার কাণে অবিরত খোশামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব—বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব—আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে—রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গছাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে—মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে—কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন—কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া, রায়বাহাদুর, রাজাবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,—চাঁদা, সেলাম, খোশামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত—কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছেন না— কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম—কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে—খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম—তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার—কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না—কেবল এক সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম—অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।
বিক্রেয়—অনন্ত যশ।
বিক্রেতা—কাল।
মূল্য—জীবন।
জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম—আমার যশে কাজ নাই—কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

অকপটে

লেখালেখির ক্ষেত্রে পাঠকই শেষ কথা। 'পাঠক নির্বোধ' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে নিজেরই পতন ডেকে আনা হয়।

সমরেশ মজুমদার

কয়েক সপ্তাহ আগে চন্দননগরে একটি গল্পপাঠের আসর বসেছিল। প্রয়াত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সহ তরুণ গল্পকারদের গল্পপাঠ সেদিনের অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল। শুনতে পেলাম, এক তরুণ লেখক, যাঁব বয়স এখন পঞ্চাশ, বাজারী লেখকদের খুব গালাগাল কবেছেন।

ষাট সালের আগে এই ব্যাপারটা ছিল না। লিট্‌লম্যাগের দিন শুরু হতেই দেখেছি এসটাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবার প্রবণতা তৈরি হল। প্রথমদিকে ব্যাপারটা সত্যি ভালো ছিল। বানানো গল্প, সাজানো চরিত্র নিয়ে লেখালেখি যাঁরা ছাপেন এবং করেন তাঁদের প্রতি কোনো সমর্থন থাকাই উচিত নয়। পরে দাঁড়িয়ে গেল গালাগাল দেওয়ার জন্যে গালাগাল দেওয়া। কারো লেখা জনপ্রিয় হলেই তিনি সৎসাহিত্যের লেখক নন, বাজারী লেখক, অতএব তাঁকে নিয়ে কোনো আলোচনা নয়—এরকম ঘোষণা চলতে লাগল। মজার কথা হল, যাঁরা এই বিক্ষোভে অংশ নিলেন তাঁদের পায়ের তলা থেকেই মাটি সরতে লাগল হু হু করে।

চন্দননগরের ঘটনাটা ব্যতিক্রম নয। তবে ঘটনাটা শোনার পব আমি কলেজস্ট্রিটে গেলাম। যেসব পঞ্চাশী তরুণ সেদিন অনুষ্ঠানে ছিলেন তাঁদেব বই কলেজস্ট্রিটের এক প্রকাশক ছেপেছেন। ঘটনাচক্রে তিনি আমারও প্রকাশক। তাঁব সঙ্গে আমার এরকম কথাবার্তা হল—

আমি ॥ তরুণ লেখক বলতে আপনি কী বোঝেন?

প্রকাশক ॥ এই যারা সবে লিখছে, চার-পাঁচ বছব, পঁয়ত্রিশের নিচে বয়স, তাবাই তরুণ।

আমি ॥ এই বযসের মধ্যে লিখে কি সাফল্য পাওযা যায?

প্রকাশক ॥ আগে তো তাই হত। সব বিখ্যাত লেখক, একমাত্র রাজশেখর বসু ছাড়া, পঁয়ত্রিশের মধ্যেই বিখ্যাত হয়েছেন। এখনকাব সুনীল, শীর্ষেন্দু তো তাই। আপনার 'দৌড়' বেবিযেছিল পঁচাত্তব সালে। তার মানে আপনি তখন বত্রিশ ছিলেন। তাই তো?

আমি ॥ হ্যাঁ। তবে তাবও আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্তেব যুগেব কথা ভাবুন। এমনকি আমাদের আগে শঙ্কর লেখা শুরু করে বিখ্যাত হয়েছেন। ত্রিশেব মধ্যেই। তাহলে তারুণ্যের কাল কি বেড়ে গেছে? এখনকার পঞ্চাশেব লেখকদেরকে কি আপনি তরুণ বলে চালাবেন?

প্রকাশক ॥ আসলে কি জানেন, এঁবা ত্রিশেও যে জায়গায় ছিলেন পঞ্চাশেও সেই জাযগায় থেকে গেছেন। ফলে তখনো তরুণ বলতাম, এখনো অভ্যেসে বলে চলেছি।

আমি ॥ আপনি তো এঁদেব বই ছেপেছেন। কেমন বিক্রি হয?

প্রকাশক ॥ নাম না করেই বলছি। মোটামুটি লিট্‌লম্যাগে লেখেন, এমন অনেকেরই বই আমি ছেপেছি। কাবো বই দু'বছরে হাজার কপি বিক্রি হলে খুব ভালো বিক্রি বলি। অনেকেরই তা অবশ্য হয় না।

আমি ॥ দু'বছবে হাজার কপি?

প্রকাশক ॥ কিছু করাব নেই। তার বেশি পাঠক ওঁদের চান না।

আমি ॥ আপনার লাভ হয়?

প্রকাশক ॥ আজকাল হাজার কপি বিক্রি হলে বই ছাপার খরচটা ওঠে। দু'বছবে খরচটা উঠলেই বাঁচি। টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে সুদ পেতাম, ওটা পাই না।

আমি ॥ তাহলে ছাপেন কেন?

প্রকাশক ॥ এসে অনুবোধ করেন ছাপার জন্যে। তাছাড়া ভেবে নিই, যাদের বই বেশি বিক্রি হয় তাদেব লাভের টাকায না হয় কিছু টাইটেল বাড়ানো যাক।

আমি ॥ অর্থাৎ এঁদেব অবস্থা আপনাব কাছে প্যারাসাইটেব মতো, বৃক্ষেব ওপর নির্ভরশীল।

প্রকাশক ॥ এত সত্যি কথা না বলাই ভালো।

এবপর আমি এই ধবনের তরুণ লেখকদেব মুখোমুখি হতে চাইলাম, যাঁদেব বই বাজাবে পাওয়া যায এবং যাঁরা বাজাবী লেখকদের মুণ্ডু চিবিয়ে খুব আনন্দ পান। শেযপর্যন্ত এক বিকেলে কফিহাউসে পেয়ে গেলাম

একজনকে। তাঁর সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছিল তা এইরকম—

আমি ॥ আপনি বাজারী লেখক বলতে কী মনে করেন?

তরুণ লেখক ॥ যাঁরা জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন, প্রচুর বিক্রি হয়, প্রচুর টাকা পান, তাঁদের বাজারী লেখক বলি।

আমি ॥ যাঁরা জীবন নিয়ে লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন?

তরুণ লেখক ॥ হতেই পারেন না।

আমি ॥ ধরুন, আশাপূর্ণা দেবী।

তরুণ লেখক ॥ উনি তো মেয়েদের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন।

আমি ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়?

তরুণ লেখক ॥ কবিতার ক্ষেত্রে সুনীলদা সৎ। উপন্যাসে বাজারী। বর্তমান এড়িয়ে অতীতে পড়ে আছেন, কারণ অতীত খায় ভালো।

আমি ॥ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়?

> **তরুণ লেখকদের মুখোমুখি হতে চাইলাম, যাঁদের বই বাজারে পাওয়া যায় এবং যাঁরা বাজারী লেখকদের মুণ্ডু চিবিয়ে খুব আনন্দ পান।**

তরুণ লেখক ॥ শীর্ষেন্দুদার বই আগে একদম বিক্রি হত না।

আমি ॥ এখন তো হয়। বাংলাদেশে উনি খুব জনপ্রিয়।

তরুণ লেখক ॥ হ্যাঁ উনিও ক্রমশ বাজারী হয়ে যাচ্ছেন।

আমি ॥ বুদ্ধদেব গুহ?

তরুণ লেখক ॥ উনি তো হট্ কেক। কিছু বলার নেই।

আমি ॥ আমি?

তরুণ লেখক ॥ নিজে জানেন না কী করেছেন? শরৎচন্দ্রের সেন্টিমেন্ট নিয়ে আধুনিক চেহারা দিয়ে তার সঙ্গে নকশাল বা সমসাময়িক প্রব্লেম ঢুকিয়ে এমন ককটেল করেছেন যে তার সঙ্গে জীবনের কোনো মিল নেই। আপনার আর সুনীলদার লেখা নাকি গোগ্রাসে গেলে লোকে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে। ড্রাগের মতো ব্যাপার। ছিঃ।

আমি ॥ আপনার, আপনাদের লেখালেখি তো বই হয়ে বের হয়।

তরুণ লেখক ॥ হ্যাঁ।

আমি ॥ বিক্রি হয় কেমন?

তরুণ লেখক ॥ দেখুন, আমি বা আমার বন্ধুরা আম-জনতার মুখ চেয়ে লিখি না। আমাদের যা ভাবনা তা স্বাধীনভাবে আমাদের মতো করে লিখি। সেই লেখা পাবলিক যদি না বোঝে না বুঝুক, কোনো কোনো পাঠক নিশ্চয়ই বোঝেন। তাঁরাই বই কেনেন। তাছাড়া আমরা কি লিখছি তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব প্রকাশকের। আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। বিজ্ঞাপন দিতে চান না তাঁরা।

আমি ॥ বিজ্ঞাপন দিতে টাকা লাগে। বই-এর জন্যে কাগজ কিনতে, ছাপতে টাকা দিতে হয়। দপ্তরীকেও টাকা না দিলে চলে না। এসব খরচ একজন প্রকাশক করেন ব্যবসার জন্যে। আপনার বই নিয়েও উনি ব্যবসা করেন। এখন মুষ্টিমেয় কিছু পাঠক আপনাদের বই কিনলে তো ওঁর ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে।

তরুণ লেখক ॥ তাই বলে আমি বাজারী লেখক হতে পারব না।

আমি ॥ আপনার বই ঠিক আমাদের মতো রঙচঙে হয়ে যখন বাজারে বের হয় তখন তো আপনিও বাজারীদের দলে পড়বেন। হ্যাঁ, আপনি যদি নিজের পয়সায় বই ছেপে বিনামূল্যে তা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি বাজারী লেখক নন। সেটা করছেন না কেন? কেন প্রকাশকদের কাছে যাচ্ছেন?

তরুণ লেখক ॥ পাগল। আমার অত পয়সা কোথায়?

আমি ॥ তাহলে যাদের বই বিক্রি হয় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গিয়ে আপনারা প্রায় ফলো অনে হারছেন। সেটাই আপনাদের ক্ষোভের কারণ। তাই তো?

তরুণ লেখক ॥ কি যা-তা বলছেন। ওঁদের কোনো ক্লাস আছে, যে প্রতিযোগী ভাবব? এই যে কমলকুমার মজুমদার অথবা অমিয়ভূষণ মজুমদার, এঁদের ধারেকাছে আসতে পারেন ওইসব বাজারী লেখকরা? কমলকুমার বা অমিয়ভূষণকে পাঠকরা বুঝতে পারেনি। বইও কম বিক্রি হত। তার মানে ওঁদের সাহিত্য খারাপ?

আমি ॥ মোটেই নয়। তবে গবেষণা করে দেখা দরকার, কেন, কী কারণে ওঁদের লেখা পাঠকরা গ্রহণ করেনি বিপুলভাবে। আচ্ছা ধরুন আপনার কোনো বই বের হওয়া মাত্র হৈ হৈ করে বিক্রি হয়ে গেল। প্রথম বছরেই দশটা এডিশন। আপনাকে কি তখন বাজারী লেখক বলা যাবে?

তরুণ লেখক ॥ দূর। এরকম হবেই না।

আমি ॥ যদি হয়ে যায়?

তরুণ লেখক ॥ তাহলে বুঝতে হবে আমি কোথাও আপোষ করেছি।

আমি ॥ তার মানে হল, আপোষ করলেই আপনি দারুণ জনপ্রিয় হতে পারেন।

তরুণ লেখক ॥ না—মানে—।

আমি ॥ 'পথের পাঁচালি' পড়েছেন?

তরুণ লেখক ॥ অবশ্যই।

আমি ॥ বাজারী লেখা বলে মনে হয়?

তরুণ লেখক ॥ না-না।

আমি ॥ কত হাজার কপি বিক্রি হয়েছে এবং হচ্ছে জানেন?

তরুণ লেখক ॥ ওগুলো ক্লাসিক। চিরকাল বিক্রি হবে। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

আমি ॥ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শংকর 'কত অজানারে' লিখেছিলেন। বইটি এখনো সমানতালে বিক্রি হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর সময়টাকে আপনার কীরকম মনে হয়?

তরুণ লেখক ॥ কোনো সাহিত্যভ্যালু নেই। নতুন ধরনের বিষয় বলে পাবলিক কিনছে।

আমি ॥ পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পৃথিবীতে নেই। এখন যাঁরা কিনছেন তখন তাঁদের অনেকেই জন্মাননি। তাহলে আপনি বলছেন পাবলিক একই আছে?

তরুণ লেখক ॥ হ্যাঁ। অবশ্যই।

আমি ॥ শেষ প্রশ্ন, আচ্ছা এই যে আপনাদের বই ছেপে প্রকাশকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাতে আপনাদের বিবেকে লাগে না?

আমার প্রশ্নটি শুনে পঞ্চাশ বছরের তরুণ লেখক টেবিল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এর মাঝখানে আর এক শ্রেণীর কিছু লেখক আছেন যাঁরা সাতেপাঁচে

থাকেন না। কারো পেছনে লাগেন না। তরুণকালে হয়ত কোনো বড় সম্পাদককে সুন্দরবনের চিংড়ি খাইয়েছেন, এইমাত্র। এরকম কয়েকজনকে আমি চিনি, যাঁরা গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বড় কাগজে ছোট গল্প লিখে যাচ্ছেন অথচ কোনো প্রকাশক তাঁদের বই ছাপতে আগ্রহী নন। গত পঁয়ত্রিশ বছরে কোনো বড় কাগজের সম্পাদক তাঁদের কাছে উপন্যাস চাননি। এঁদের গল্প বছরে এক-দু'বার বড় কাগজে ছাপা হয়। নিজেদের ভালো লেখক মনে করেন এঁরা। কফিহাউসের টেবিলে গম্ভীর মুখে বসে থাকেন। অর্থাৎ জীবনে সাফল্য নেই। পঁয়ত্রিশ বছর আগে যেখানে ছিলেন আজও সেখানে রয়ে গেছেন।

> এঁদের গল্প বছরে এক-দু'বার বড়
> কাগজে ছাপা হয়। নিজেদের ভালো
> লেখক মনে করেন এঁরা। কফিহাউসের
> টেবিলে গম্ভীর মুখে বসে থাকেন।

যেহেতু লেখকদের অবসরের কোনো বয়েস নেই তাই অবসর নিতে পারছেন না। লেখক হিসেবে কেউ তাঁদের চেনে না। পাড়ায় গিয়ে খোঁজ করলে নাম শুনে মুদিওয়ালা বলবে, 'ও, নবীন মাস্টারের বাড়ি জানতে চান? ওই যে হলুদ বাড়িটা—।'

কলকাতার বাইরে গিয়ে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন শহরের বই-এর দোকানে ঘুরলে পাঠকদের পছন্দের একটা তালিকা পাওয়া যায়। বর্ধমানে গিয়েছিলাম বইমেলা উপলক্ষে। সেখানে দুটি মেয়ে বই কিনতে এসেছিল। কলেজে পড়ে। তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম—

আমি ॥ এখন যাঁরা লিখছেন তাঁদের মধ্যে কার কবিতা বেশি ভালো লাগে?

দু'জনে একসঙ্গে ॥ জয় গোস্বামী।

আমি ॥ আর কেউ না?

প্রথমজন ॥ মন্দাক্রান্তা সেনও মাঝে মাঝে ভালো লেখেন।

আমি ॥ ভালো লাগে কেন?

দ্বিতীয়জন ॥ পড়লে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মনে হয় বন্ধুর মতো।

আমি ॥ গল্পকার?

প্রথমজন ॥ আপনাদের মধ্যে?

আমি ॥ না না। তরুণদের মধ্যে।

প্রথমজন ॥ কে তরুণ তা তো জানি না। এই তো, বাণী বসু তো বেশিদিন লিখছেন না। আমি ভাবতাম উনি খুব তরুণ। সুচিত্রা ভট্টাচার্যকেও তাই মনে হত। কিন্তু জানলাম বাণী বসু আপনার চেয়েও বয়সে বড় আর সুচিত্রা ভট্টাচার্য দিদিমা হয়ে গেছেন।

আমি ॥ যাদের বয়স পঞ্চাশের নিচে, যাদের কাছে আমরা এখনো অনেক আশা করতে পারি।

দ্বিতীয়জন ॥ (ফিক্ করে হেসে) আমার মায়ের বয়স বিয়াল্লিশ। মা বলে, বুড়ি হয়ে গেছি।

আমি ॥ নিশ্চয়ই কথাটা ঠিক নয়?

প্রথমজন ॥ তাহলে অভিজিত তরফদার আর সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

আমি ॥ কেন?

দ্বিতীয়জন ॥ বা রে। আমরা চোখের ওপর দেখলাম কয়েক বছর ধরে ওঁরা একটু একটু করে কী ভালো লিখছেন এখন।

আমি ॥ লিট্‌লম্যাগে লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, এমন কার গল্প তোমাদের ভালো লাগে?

(ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। শেষপর্যন্ত)

প্রথমজন ॥ কেন? সুনীল গাঙ্গুলি, শক্তি চ্যাটার্জী।

আমি ॥ কোন লিট্‌লম্যাগ?

দ্বিতীয়জন ॥ কৃত্তিবাস।

আমি ॥ তার পরে? তার পরে?

> আপনার আর সুনীলদার
> লেখা নাকি গোগ্রাসে গেলে
> লোকে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে!
> ড্রাগের মতো ব্যাপার। ছিঃ!

প্রথমজন ॥ আপনি নাম বলুন, আমার মনে পড়ছে না।

(আমি স্টলের একপাশে রাখা ওইসব পঞ্চাশী লেখকদের বই দেখালাম)

দ্বিতীয়জন ॥ খুব বোর হয়েছি পড়তে গিয়ে।

প্রথমজন ॥ কী যে লেখে, ঠিক বুঝি না।

আমি ॥ গল্প, মানে কাহিনী, পান না?

প্রথমজন ॥ পাই, কিন্তু যেই দানা বেঁধে ওঠে, অমনি অন্যদিকে চলে যায়।

আমি ॥ এটাই তো জীবনের নিয়ম। জীবন কি একটানা গল্প হয়ে বয়ে যায়?

দ্বিতীয়জন ॥ অতশত জানি না। আমাকে টানে না।

যে যাই বলুক, একজন লেখকের লেখালেখির ক্ষেত্রে পাঠকই শেষ কথা। 'পাঠক নির্বোধ' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে নিজেরই পতন ডেকে আনা হয়। তাছাড়া একজন বা দশজন ভুল করতে পারেন, হাজার হাজার পাঠক একই ভুল নিশ্চয়ই করবেন না। তাই বাজারে যখন নেমেছেন তখন নিজেকে যাচাই করুন। কেন পাঠকসমাজ মুখ ফিরিয়ে আছেন? কোথায় আপনার অক্ষমতা।

শেখর আহমেদের
কয়েকটি কিশোর গল্পগ্রন্থ
মজার ভূত আর ব্যাজার ভূত ৩০৲
আজগুবি নয় ২৫৲
মামাদের কাণ্ডকারখানা ২৫৲
পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা বইমেলা, স্টল নং-৯৪৮

জেণ্টলম্যান ভার্সেস প্লেয়ারস্

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

গেল শতকের পাঁচের দশকে, হয়ত বা ছয়ের দশকেও ইংলণ্ডে জেন্টলমেন ভার্সেস প্লেয়ারস ক্রিকেট খেলা হত। যাঁরা পেশাদার নন তাঁরাই জেন্টলমেন অর্থাৎ তাঁরা খেলার জন্যে কোনো সম্মানদক্ষিণা পেতেন না, হয়ত বা দাবীও করতেন না। আর প্লেয়ারস যেহেতু পেশাদারি, তাঁরা তা পেতেন। প্রসঙ্গটি মনে পড়ল মঞ্চের প্রয়োগশিল্পী ও বাঙালি কবিদের সম্মান-দক্ষিণা পাওয়া না-পাওয়ার বিষয়ে। অধিকাংশ কবিই সম্ভবত জেন্টলমেন। তাই তাঁরা মঞ্চে উপস্থিতির জন্যে সম্মান-দক্ষিণা দাবী করেন না। আর করলেই বা তাঁদের দিচ্ছে কে। অথচ গায়ক গায়িকা কিংবা তাঁদের হ্যাণ্ডস তা পান। আবৃত্তিশিল্পী অভিনেতা অভিনেত্রীরা সম্মান-দক্ষিণা ছাড়া কোথাও যান না, যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উদ্যোক্তারা তাঁদের অনুষ্ঠানে এঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল। সুতরাং তাঁদের গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া বা বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরে বা আগে সম্মানমূল্যের খাম এঁদের হাতে ধরিয়ে দিতে হয়। পণ্যায়নের যুগে এইই তো স্বাভাবিক ব্যবহার।

কবিতা কি পণ্য হয়ে ওঠেনি। কবিরা কি সুপিরিয়ার মর্টালস, যে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা জঠরযন্ত্রণা থাকবে না। 'চারিদিকে সবে বাটিয়া দুনিয়া / আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া' প্রেক্ষিতে কবিদের সৌজন্যবোধের সুষমার জন্যে বঞ্চনা করা হবে। অর্থের প্রয়োজন কার নেই? শুধু মুখ ফুটে কবিরা দাবী করতে পারবেন না বলে উদ্যোক্তারা তাঁদের শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেবেন? কালেভদ্রে গোলাপের স্তবক কিংবা স্মারক তাঁদের সৌভাগ্যচিহ্ন হয়ে থাকবে?

রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতাটির প্রসঙ্গ কেউ কেউ স্মরণ করিয়ে বলবেন—সেখানে তো কবি পুষ্পমাল্যেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পৃথিবীর সেই শোভনতম মানুষটি নৃপতির কাছে অন্য কিছুই প্রার্থনা করেননি। ঠিক কথা। দরিদ্র কবির সৌজন্য বা সম্মানবোধ একার্থে অর্থমূল্যে পরিমাপ করা যাবে না, কিন্তু বহু নৃপতি তাঁদের সভাকবিদের আর্থিক প্রয়োজনের দিকে সতর্ক নজরও রেখেছিলেন। এক্ষেত্রে নৃপতি-উদ্যোক্তাদের সৌজন্য-সৌন্দর্য যে ছিল তা বলা বাহুল্য। এই অতীত আচরণ থেকে একালীন উদ্যোক্তাদের বুঝি কিছু শিখতে নেই?

আসলে এখন কবি অনেক। চাহিদার চেয়ে যোগান যখন বেশি হয় তখন তার মূল্য কমে যেতে বাধ্য। একজন কবি যদি উপযুক্ত সম্মানমূল্য ছাড়া কোনো মঞ্চে উপস্থিত হতে না চান তাহলে আরেকজন যে তখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন? যিনি বিনা পারিশ্রমিকে নিজের অর্থক্ষয় করে মঞ্চ দখলের লালসায় উদ্যোক্তাদের অনুগ্রহ-ভিখারি। সামান্য অর্জনের কবি জনসংযোগের জোরে নিজের ইঁদুর চেহারাকে জিরাফের মতো করে তোলেন।

জনৈক আবৃত্তিশিল্পী আমাকে বলেছিলেন—'কই আপনি তো আমাকে কোনো কাব্যগ্রন্থ উপহার দেননি। কী ভাবে আপনার কবিতা আমি জনমানসে মুদ্রিত করে দেব?' দায় কবির। তিনি আরো বলেছিলেন, 'জানেন, অমুক অমুক বিখ্যাত জনপ্রিয় কবিরা তাঁদের কাব্যগ্রন্থ বেরুলেই আমার বাড়িতে এসে উপহার দিয়ে যান।' অর্থাৎ আমার মতো নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির এই স্পর্ধা মানায় না। ভাবি, ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড়তা ছাড়া কাউকে কাব্যগ্রন্থ কি উপহার দেওয়া যায়। বাণিজ্য-মানসিকতার হাওয়ামণ্ডলে লালিত আবৃত্তিশিল্পীর দাবীর যুক্তি সঙ্গত বলেই মেনে নিয়েছেন বহু আত্মসম্মানহীন কবি।

একজন তরুণ কবি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি প্রচারবিমুখ?' তাঁকে উত্তর দি—'স্বয়ং বাল্মীকি 'রামায়ণ' রচনা শেষ করে, তা কেমন করে প্রচার করবেন তা নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলেন, আর আমি তো Inferior Mortal; নিজের কবিতা গৃহীত হোক, এ তো সবার কামনা।' কিন্তু তাঁকে যা বলিনি, তা অনেকটা এরকম : প্রচারের জন্যে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি আমার প্রার্থিত নয়। একটি ছোট পত্রিকা করে বছরে ছটি কবি সম্মেলন ও আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজের নাম প্রচারের বাসনা আমার নেই। এত সময়ও আমার হাতে নেই; তাহলে লিখব কখন।

সাহিত্যসেবা করার জন্য, দু-একজন ছাড়া, অধিকাংশই পত্রিকা করেন না। একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্যে এ যেন নিরাপদ এক ওভারব্রিজ। তবু একথাও সত্য—ছোট পত্রিকাগুলি থেকে অনেক উল্লেখ্য কবি-লেখক উঠে এসেছেন যাঁদের বাণিজ্যিক পত্রিকা গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁদের সংখ্যা তেমন বেশি নয় বলে অন্যান্য উল্লেখ্যরা ক্ষোভে অভিযোগে কিংবা আত্মগ্লানিতে সোচ্চার হয়ে উঠছেন এবং বিকল্প প্রচারযানে সওয়ারি হওয়ার পরিকল্পনা প্রয়াসী। তাঁরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে অথবা বিশ্বাসভাজন তরুণদের ব্যবহার করে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি প্রসারিত অস্তিত্বের প্রার্থনায় উন্মুখ।

কবিদের সম্মান-দক্ষিণা পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নে তাঁদের কারো কারো কৌশলী বা নির্বোধ আচরণ যে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তা ওপরের অবস্থানগুলি থেকে স্বচ্ছ হয়ে যায়। সুতরাং একক বা ছোট ছোট উপদলের প্রচারপ্রয়াসী আয়োজনের পাশাপাশি যদি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, মঞ্চে উপস্থিতির জন্যে উদ্যোক্তারা সম্মান-দক্ষিণা না দিলে অনুষ্ঠানে যাবেন না, তাহলে সম্ভবত অবিচার থেকে তাঁরা মুক্তি পাবেন। এই সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করার জন্যে একটি তৎপর সংবাদসংগ্রহ বাহিনীও গড়ে তুলতে হবে, যাঁরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতারক কবিদের চিহ্নিত করবেন।

শেষপর্যন্ত অবশ্য কবির কাজ বিনিদ্র রাত্রির জাগরণে কালোত্তীর্ণ কবিতা রচনা করা। সাম্প্রতিক নগদ বিদায়ের প্রশ্নটি তখন গৌণ হয়ে যাবে এবং মৌন আগামীকালের মুখর সম্ভাষণে হয়ত কবি সমাদৃত হবেন। একটি উদাহরণ তো হাতের কাছেই আছে , তিনি জীবনানন্দ।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● মিথ্যে বলব না, ব্যবসাপাতি করে বেশ দু'পয়সা কামিয়েছি। কিন্তু সন্তানাদি নেই। স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে দু-বছর আগে। তিনি মাথার দিব্যি দিয়ে নূতন দার-পরিগ্রহ করতে মানা করে গেছেন। কষ্টার্জিত পয়সা, কাউকে দান করতেও পারি না। ব্যাঙ্ক আমানতের দিকে তাকালে বুকটা হু হু করে আর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কিন্তু খরচই বা করি কিসে? একটু সৎপরামর্শ দিতে পারেন? *—শ্যামাপ্রসাদ সা, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা*

□ বুঝতে পারছি আপনাকে কোনো পাগলা কুকুরে কামড়েছে। তবু কোনো চিন্তা করবেন না দাদা, একটা মাসিকপত্র বের করে তার সম্পাদক হয়ে যান। দেখবেন, আপনার টাকার প্রেসার আর ব্লাড প্রেসার একই সঙ্গে চড়চড় করে নেমে আসছে। আমাদের সম্পাদক মশাইও এই রোগে ভুগতেন। আমরা পাঁচে-পাঁচজনে সুপরামর্শ দিয়ে তাঁকে সম্পাদক বানানোর পর এই দেড় বছরে বাজারে দিব্যি ধারদেনা জমে ওঠায় তিনি বেশ সুস্থই আছেন। এই জবাব দেওয়ার সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর বাসস্থানটি বিক্রিবাটার ফিকিরে রয়েছেন।

● আবু বরকত আতাউল গনি খান চৌধুরী মশায় যদিও এখন আর রাজনীতিতে খুব আলোচিত নন, তবু আমি কিন্তু তাঁর কথা প্রায়ই ভাবি, তাঁর নামটির কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলাম না, অতগুলো শব্দের মধ্যে কোন শব্দটি তাঁর আসল নাম।

—বিজনকুমার বসু, কুচবিহার

□ শুনেছি খাঁ সাহেব নিজেও সেটি আবিষ্কার করতে পারেননি এবং বিষয়টি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওই যে, যাঁরা আবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন, বোটানিক্যাল গার্ডেনের প্রাচীন বটগাছটির আসল গুঁড়ি কোনটা। দুটি বিষয়েই সমান তালে প্রবল উদ্যমে গবেষণা চলছে।

● পত্রপাঠ-এর জানুয়ারি সংখ্যায় দেখলাম আঁকার ব্যাপারটা পল্লব চক্রবর্তী একাই গ্রাস করেছেন। এত খিদে কেন তাঁর? উনি তারাশঙ্করের সেই "খাও হে চক্কোত্তি" বামুনটি নয় তো, পিণ্ডি-গেলা অগ্রদানী?

—বিপুল দত্ত, কলকাতা-৮২

□ অগ্রদানী নয় রে ভাই, খানদানি। এই খানসেনার দাপটে সব শিল্পীই খানখান হয়ে গেছে।

● এবার বইমেলায় ভালো বই কি কি বেরোচ্ছে? একটা তালিকা দেবেন? *—সুদীপা বসু, উত্তরপাড়া হুগলী*

□ ভালো বই? বলতে পারব না। তবে খবর আছে, ভালো বউ কিছু বেরোচ্ছে, যারা বইমেলায় যাবে, ফ্রিস বাটার, ফুচকা, আইসক্রিম খাবে, ধুলোমাখা রূপে আলো করে চাদ্দিকে ঘুরে বেড়াবে, অডিটোরিয়ামে নারীবাদী কবিতা পড়া হলে তেড়ে হাততালি মারবে, কিন্তু বই কিনবে না। অবশ্য তাদের তালিকাটা আমরা পাইনি।

● ঢাক-ঢোল পিটিয়ে কি একজন পৃষ্ঠ-পোশাক না পৃষ্ঠপোষকের খুব পিঠ চুলকে দিলেন দেখলাম। তা দুটি সংখ্যা যেতে না যেতেই তিনি অন্তর্ধান হলেন কেন? *—যাদুগোপাল দাস, দুর্গাপুর, বর্ধমান*

□ তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। বুঝেছেন, পৃষ্ঠপোষণ অপেক্ষা পৃষ্ঠপ্রদর্শনই শ্রেয়।

● সমরেশ মজুমদার আর কতদিন অন্যদের ঠেস দিয়ে লিখে যাবেন? নিজের লেখায় মন দিলে ভালো হয় না।

—পাপিয়া মুখার্জী, কলকাতা-১৪

□ মরেচে। এই লেখাটা তাঁর নিজের নয়? অন্যে লিখে দেন? দয়া করে সেই আসল লেখকের নামটা জানিয়ে দিন, তারপর দেখছি।

● পত্রপাঠ পড়ে কাদের উপকার হচ্ছে?

—প্রমীলা ঘোষ, বালী, উত্তরপাড়া

□ পড়শিদের উপকার হচ্ছে ভাই, কেন না বঁড়শিদের চিনে ফেলছেন তাঁরা। দড়ি-কলসিও জোগাড় করে রাখছেন, ঠিক সময়ে ধার দেবার জন্যে।

● পত্রপাঠ-এর মতে সমাজে কবির গড় হিসেব কী?

—জয়শ্রী গোস্বামী, কলকাতা-১৯

□ কাদের কথা জানতে চান? কবিআল?—যাঁরা নিজের চান্দিকে কবি-কবি ভাব এঁটে নন্দন চত্বরে চলাফেরা করেন? নাকি কবিঢাল?—কবিতার ঢাল দিয়ে পাওনাদার ঠেকান? অথবা কবিখাল?—খাল কেটে কুমির আনতে হয় না, যে নিজেই খাল কেটে আপনার সমীপে হাজির হয়? কিংবা কবিপাল?—যাঁরা পাল বেঁধে আসেন আর আপনি পালাবার পথ পান না?....

● জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় সানন্দা এবং দেশ-এর মতো ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাকে লক্ষ্য করে ছ্যাবলামো না করলেই ভালো করতেন। অন্যকে বিদ্রুপ না করে নিজেদের লেখার মান উঁচু করার চেষ্টা করুন।

— সেলিম আলম, হাওড়া

□ আঃ হা—, কতফুট সেটা বলে দেবেন তো। সেই অনুযায়ী মইয়ের অর্ডার দিতে হবে, যাতে চড়ে আপনারা পড়বেন।

● ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ হলে আধুনিক কবিদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত? *—মুক্তি ব্যানার্জী, ঢাকুরিয়া, কলকাতা*

□ সর্বাধুনিক কবিতাগুলি তাড়া বেঁধে বগলে নিয়ে হাজির হওয়া এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলা—ভাইয়োঁ, আমরা লড়াই করতে আসিনি। নিতান্তই সদ্‌ভাওনা কবিতায়েঁ শোনাতে এসেছি, মেহেরবানি করে শোনো। অমনি তারা দু'কানে আঙুল দিয়ে বন্দুক ফেলে (দু-হাত দু-কানে দিতে গেলে বন্দুক ফেলা ছাড়া গতি নেই) অ্যাবাউট টার্ন করে সিধে করাচি কিংবা রাওয়ালপিণ্ডির দিকে দৌড় মারবে, আপনা আপনা বিবির ওড়নার তলায় লুকোবার জন্যে।

● জ্যোতিষবিদ্যা দেশময় চাপিয়ে দিলে মানুষের ক্ষতি হবে না?

—অমরকুমার দত্ত, কুচবিহার

□ নাঃ। চব্বিশ বছর 'জ্যোতি'বিদ্যা হজম করেও যখন বেঁচেবর্তে আছি, জ্যোতিষবিদ্যা আর বেশি কী করতে পারে?

● স্কুলে নিচু ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা কি স্মরণযোগ্য?

—শ্যামলেন্দু দাশ, কদমতলা, হাওড়া

□ তাঁর 'কঠিনপাঠ' বইটি, যেটি তিনি লিখে যাননি। তিনি অত্যন্ত অদূরদর্শী ছিলেন। ভেবেছিলেন ছোট ছোট ছেলে সহজে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে সহজভাবে 'সহজপাঠ' পড়তে পারবে। ইস্কুলে ভর্তি হওয়াটা যে বৈতরণী পার হওয়ার চেয়েও কঠিন হতে পারে, সেসব বোঝার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সরকার তাই বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁর সহজপাঠ বাতিল করে যতরকম বোঝা এবং বোঝার ওপরে মাননসই শাকের আঁটির ব্যবস্থা করেছেন।

● রবীন্দ্রনাথের "তোতা কাহিনী" কাদের কাছে গীতাভাষ্য হয়ে উঠেছে?

—অনন্তকুমার বসু, কলকাতা-৬৩

□ সরকারি শিক্ষাদপ্তর।

● শেখর আহমেদকে আমরা অন্য চোখে দেখতাম। কিন্তু পত্রপাঠ-এর নীচতা দেখে ভদ্রলোক সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাই বদলে গেছে।

—দিলারা বেগম, মুর্শিদাবাদ

□ আপনার সম্পর্কেও আমাদের ধারণা বদলে গেল। শেখর আহমেদকে 'ভদ্রলোক' বলে বসলেন কোন আক্কেলে?

● জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যার প্রচ্ছদে কর্তা এবং গিন্নির দাঁত খিঁচোনো রূপটি অপরূপ হয়েছে। পুরুষটি যে দ্বিতীয় সুগ্রীব, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু লেজটা কোথায় গেল?

—সুরভি দাস, ডোমজুড়, হাওড়া

□ ভুল হয়ে গেছে ভাই। তখন ওটা ধোপার বাড়ি দিয়েছিলাম। নোংরা হয়ে গেছিল। তাই বলে আপনার ছবি আঁকার আপনিও যেন ভুল করে শিংজোড়া পালিশ করতে পাঠিয়ে দেবেন না।

● এটা দুর্ভাগ্যজনক যে বর্তমানের বাংলা সাহিত্যে নারীদেহ ও যৌনতার নগ্ন ব্যাখ্যা করণই হয়ে উঠেছে মূল বিষয়। বহু নামি-দামি লেখকও বাজার পাবার লোভেই বোধহয় এই বিষয়টিকে তাঁদের রচনায় আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে রাখছেন। আর 'পত্রপাঠে'র বিগত কয়েকটি সংখ্যায় দেখেছি এই বিষয়ের সমর্থন। শালীনতার প্রসঙ্গটা তো জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যেই প্রত্যাশা করা হয়, সংযমও। শুনেছি আপনি একজন প্রফেসর। তাই আপনার সম্পাদিত পত্রিকায় এই বিষয়টি রক্ষিত হবে—এ প্রত্যাশা তো আমরা করতে পারি।

—সাহানি বেগম, দক্ষিণ গুমা, উঃ ২৪ পরগণা

□ প্রফেসর হয়েছেন বলে ওনাকে 'জীবশ্রেষ্ঠ'ও হতে হবে। আর কাউকেই খুঁজে পেলেন না?

● যাহা লিখিয়াছি, তাহা গোটাকতক খাতার মধ্যে রহিয়াছে। কে বলিতে পারে, আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহ পাইলে আমার কলম হতে হয়ত দুর্লভ কিছু আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

—বিপ্লবকুমার রায়, কামারগাঁতি, উঃ ২৪ পরগণা

□ তেমন আশঙ্কাই আমরা করিতেছি। শুধু ভয়, পৃষ্ঠপোষকতার পূর্বেই না বাহির হইয়া পড়ে।

● বাংলাদেশে সন্তানের পরিচয় সংক্রান্ত কাগজপত্রে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম লেখা বাধ্যতামূলক করেছিলেন হাসিনা সরকার। বেগম জিয়া কি তা আবার বদলে দেবেন?

— সোনামনি গাঙ্গুলি, চুঁচুড়া, হুগলী

□ সম্ভবত। বোধহয় তিনি-মায়ের পাশে মাতামহী এবং মাতামহীর মায়ের নাম ছাপা যায় কিনা তাই-ই ভেবে দেখছেন।

● আপনাদের হুঙ্কার দেখে আপনাদেরকে অসুর বলে মনে হচ্ছে। বিখ্যাত লেখকদের তুলোধোনা করছেন, লিটল ম্যাগকে ধরাশায়ী করছেন, সমরেশ মজুমদার দেখছি আবার অপ্রতিষ্ঠিত সীরিয়াস লেখকদেরকেও অপমান করতে ছাড়ছেন না। সবাই আপনাদের শত্রুর তালিকায়? বন্ধু তবে কারা? *—সুহৃদ বসুরায়, যাদবপুর*

□ ওঁরাই, যাঁদের কথা বললেন। অসুর তো, তাই ভজনাটা শত্রু রূপে না করে উপায় নেই।

● আমাদের কলকাতার শেরিফ সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাট্যকার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, দেশের প্রধানমন্ত্রী কবি অটলবিহারী বাজপেয়ী, বাকি থাকে রাষ্ট্রপতি পদটি। আমার দাবী—রাষ্ট্রপতি পদটি একেবারে পাকাপাকি ভাবে কবি-সাহিত্যিকদের জন্যে সংরক্ষিত করা হোক।

—কুমারী সুচেতা পাত্র, নিউ আলিপুর, কলকাতা

□ শুধু রাষ্ট্রপতি? শুনছি 'পতি'-মাত্রের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য হবে।

পত্রপাঠ লা-জবাব

মশাই,

আপনাদের কর্তা বনাম গিন্নি সংখ্যায় পত্রপাঠ-এ বাদশাহি খিচুড়ি পড়ে তো আঁতকে উঠেছি। করেছেন কি মশায়। কাঙ্গালকে শাগের ক্ষেত দেখিয়েছেন? এ তো দেখা যাচ্ছে কাঙ্গালের পাল্লায় পড়ে পত্রপাঠ থেকে হেঁসেল বিদায় না নেয়। একটু-আধটু রান্না যেটুকু শিখেছিলাম সবই মনে হল গুলিয়ে যাচ্ছে। এককিলো মুগ ডালের সাথে মোটে আড়াইশো গ্রাম আতপ চাল। এতদিন জানা ছিল খিচুড়িতে চাল ডাল সমপরিমাণে লাগে। তাজ্জব কি বাত, আড়াইশো গ্রাম চালের সাথে পাঁচশো গ্রাম ঘি, তাও আবার বাঙালি পেটের জন্য (আসলে বোধহয় গৃহকর্তা পাছে কৃপণ হন, তাই সারা মাসের ঘিয়ের হিসেবটা একেবারে ধরে দিয়েছেন। এতেও কাঙ্গালবাবুর সাধ মেটেনি। আড়াইশো গ্রাম চালের সাথে আড়াইশো গ্রাম বাদাম, একশো গ্রাম পোস্ত। পোস্তটা আবার বাটতে হবে কিনা বলা নেই। অথচ সস্তার জিনিস তেজপাতার বেলায় কৃপণতা কেন, বলা নেই।

আরে মশাই, রান্নার সময় ডালটা যে কখন দিতে হবে তাই জানা গেল না। অনেকের মাছ দেখে দেখে ভাত খাওয়া হয়ে যায়, সেরকম ডাল দেখে দেখেই খিচুড়ি রান্না হয়ে যাবে কিনা কে জানে। আবার অনুপানের মধ্যে আদৌ পেস্তা, কিশমিস এলাচের কথা বলা নেই, অথচ রান্নায় দিতে বলা হচ্ছে। কর্তা কাঙ্গালবাবুর লিস্টি অনুযায়ী বাজার করে দিয়ে অফিস যাবেন আর খিচুড়ি রাঁধতে গিয়ে গিন্নি কপাল চাপড়ে মরবেন আর কি। নয়ত খিচুড়ির হাঁড়ি নামিয়ে রেখে নিজেকেই ছুটতে হবে বাজারে। দেখা যাচ্ছে এই রান্না বিশ্লেষণ করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবার আশঙ্কা। তার চেয়ে এই রান্নাটার নাম দিন খিচুড়ি কেলেঙ্কারি এবং রাঁধুনির সন্ধানে একটা তদন্ত কমিশন বসান। আমাদের দেশে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট দেবার কোনো ঐতিহ্য নেই। সুতরাং নিশ্চিন্তে পরের সংখ্যায় আবার একটা কেলেঙ্কারিযোগ্য রান্না অনায়াসে দিয়ে দিতে পারবেন।

আরে মশাই, হিংকে শুকনো লঙ্কাবাটার সাথে একসাথে করে দিয়েছেন পঁচিশ গ্রাম। আমরা ছড়া পড়েছিলাম—খুকু করে রান্না/তাই দেখে কাকাবাবু জুড়ে দিল কান্না। এবং সেই রান্নাতে খুকু এমন ঝাল দিয়েছিল যে কাকাবাবু আর খেতে চান না। লঙ্কা আর হিং -এর পরিমাণ দেখলে আমাদেরও সেই দশা হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হিং-এর বদলে বসুন পিঁয়াজ দিতে চাইলে সেটাই বা কতটা? তার চেয়ে আপনাদের কাঙ্গালবাবুকে বলুন, পত্রপাঠ দপ্তরে একদিন বাদশাহি খিচুড়ি রান্না করুন এবং আমাদের সবার সামনে খেয়ে দেখান। আমরা সবাই চোখ ভরে দেখি তাঁর কত সাহস।

—অজন্তা ঘোষাল

পত্রপাঠ আপাতত বছরে ৬টি

- পত্রপাঠ শুধু পত্রিকা প্রকাশনাই নয়, পূর্ণোদ্যমে গ্রন্থ প্রকাশেও অবতীর্ণ হয়েছে। বইবেলা ২০০২-এ প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থ :

১। অকপটে — সমরেশ মজুমদার ৩৫্
২। পত্রপাঠ সহর্ষ গল্প সংগ্রহ ৩৫্
৩। পত্রপাঠ — ১ম সংখ্যা থেকে জানুয়ারি ২০০২
সুদৃশ্য বাঁধাই সংস্করণ ১৪০্
(মাত্র ৮০টি সীমিত সংখ্যা)

- ভারতে প্রথম বাংলা ইন্টারনেটে দৈনিক সংবাদ (যার প্রতিদিন ওয়েবসাইটে পাঠক পাঁচ লক্ষেরও বেশি) এবং **পত্রপাঠ** মাসিকপত্রের যৌথ উদ্যোগে ইন্টারনেটে প্রকাশিত হতে চলেছে **সংবাদ পত্রপাঠ**, যা ওয়েবসাইটে দেখা যাবে কিছুদিনের মধ্যেই।

এইসব কারণে, বুঝতেই পারছেন, সম্পাদকের হাতে কাজকর্ম ক্রমশই কমে যাচ্ছে, তাঁর অফুরন্ত সময় তিনি কী করে খরচ করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না এবং খরচপত্তরও হচ্ছে না একেবারেই। ফলে জমে জমে পাহাড় হয়ে ওঠা টাকা-পয়সা নিয়েও তিনি পড়েছেন বিপদে—কী উপায়ে এর সদ্গতি হবে? বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই হল যে, এবার থেকে পত্রপাঠ এইভাবে প্রকাশিত হবে : ১) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২) মার্চ-এপ্রিল ৩) মে-জুন ৪) জুলাই-আগস্ট ৫) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (শারদীয়) ৬) নভেম্বর-ডিসেম্বর।

আশা করা যায় সম্পাদক তাঁর সময় কাটাবার এবং টাকাপয়সা ধসাবার একটা রাস্তা এতে খুঁজে পাবেন।

বছরে ছয়—এই ওভার বাউণ্ডারিতে যদি তাঁকে কাত্ করা যায়, তখন তাঁর ওপরে চাপ কমানোর জন্যে আবার ডবল ওভার বাউণ্ডারির মানে বছরে বারোর ব্যবস্থা করা যাবে

ধারাবাহিক কবিতা

পরিচালনা : কাব্যিটকেল কবিরাজ

বিরহ মঙ্গল

মৈনাক মিত্র

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

এ তো নহে কবিকথা সদা বুকে বাজে ব্যথা
ব্যথাতেই অমৃতের স্বাদ
শুধু প্রেম খাঁটি সোনা,—তাতে হয় কি গহনা
দিই তাই বিরহের খাদ।
(চিতা বহ্নিমান)

সাফল্য

শুভেন্দু ভৌমিক

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

এই স্বপ্ন, এই সুখ—শুধু এই আশা
সঙ্গে লয়ে হেঁটে যাই প্রকাশক ও সম্পাদকের
বাজারের থলি স্কন্ধে অনুগত ভৃত্য যেমন।
(চিতা বহ্নিমান)

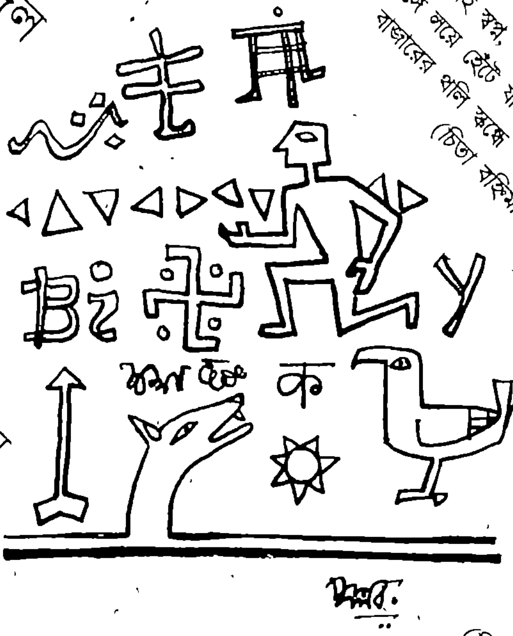

প্রেমালু

সুচতুর গুপ্ত

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

যতই জ্বলুক চিতা
পরিত্যজ্য কখনো সে নয় জানি
শেষ অবধি রেখে দেব তাকে হিমঘরে
হিমঘর—প্রেমালুর কোল্ড স্টোরেজ।
(চিতা বহ্নিমান)

আগামী

শেখরেন্দু দত্ত

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

কস্মীক শাবক
প্রজনন
ভ্রূণপোকা
প্রতিপত্র
(চিতা বহ্নিমান)

তিরিশ শতাব্দী

কাব্যিটকেল কবিরাজ

(প্রজ্বালন শুরু)

তিরিশ শতাব্দী এলে আমি
রোবট-রমণীর সঙ্গে ছুটে যাব
হাঁসখালি নদীর ওপর দিয়ে
অন্তত সিকি কিলোমিটার স্পিডে
(চিতা বহ্নিমান)

নাঃ, শেষে আমাকেই কিনা কবিতা লিখিতে হইল। উপদেশ প্রদান এবং দুই-চারিটা হ্যানা-ত্যানা শব্দ বসাইয়া তাহার নাম দেওয়া—কবিতা। বাঙালি ইহাতে কবে পিছপা হইয়াছে? তা, কাব্যিটকেল বাঙালি তো বটেন। তাঁহাকে রোধে কে। আপনারাও দিস্তাদরে লিখিতেছেন তো? হাঁ, লিখিতে থাকুন। আমি এই স্বল্প সময়ে যাহা জমাইয়াছি, তাহাতে অন্য কিছু না হউক, শীত বাড়িলে, উষ্ণতার যোগান যথেষ্ট দিতে পারিবে।

—ভবদীয় কা. ক.

আনবিক অথবা দানবিক গল্প

পল্লব চক্রবর্তী

ক্যাঁৎ-১

চামুণ্ডা আসিয়া কহিলেন —'বাবা বিষ্ণু, অমনি কবে মানুষগুলোকে হেলাফেলা কবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে, যেখানে সেখানে যেমন-তেমন ফেলে রেখো না। এত দামি জিনিস—তুমি বাবা একটু যত্নটত্ন না কল্লে—একদিন দেকবে সব কোতায ভেঙে ছড়িয়ে ছত্রাকার হযে গ্যাচে। সেদিন আমিও বেজায বাগ করে ফেলব'খন। বুজ্‌লে। একটাও কিন্তু কিনে দেব না আব, এই বলে রাখলুম—হ্যাঁ।।'

চামুণ্ডা চলিয়া গেলেন।

বিষ্ণু হেঁটমুণ্ড হইয়া মানবেব হিতার্থে যত্নবান হইলেন।

এইরূপ সময়ে শিউঠাকুর যণ্ডারোহন করিযা নন্দীর প্রতি তাঁহার জিজ্ঞাস্য পেশ কবিলেন—'নন্দে, কডা বাজে র‍্যা?' নন্দী তৎকালে গাঁজায বিভোর হইয়া শুনিলেন, যেন মহাদেব জানিতে চাহিতেছেন—নন্দী কীবা ভাবিতেছে। নন্দী বলিলেন—'কঙ্কে।' শিউঠাকুর ভাবিলেন যেহেতু তিনি নন্দীকে নন্দে বলেন সেইহেতু কঙ্কে অর্থে কল্কি। অর্থাৎ বিষ্ণু এইসময় অবতার হইবে। বিষ্ণু কল্কি হইলেই শিউঠাকুরের ডিউটি আওয়ার্স শেষ। শিউজি শিঙা ফুঁকিলেন।

হিতরত বিষ্ণুর বোধ হইল তাঁহার আপন পশ্চাদ্দেশে হযত বা একটি ক্যাঁৎ করিয়া শব্দ হইল। বহুদিন বসিযা থাকার কারণে তাঁহার পশ্চাদ্দেশের বোধশক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত। অবশ্য, 'ক্যাঁৎ' কোনোরূপ নূতন ঘটনা নহে। পুনর্জন্মের অব্যবহিত পূর্বে প্রাণীদিগের ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিযা আসিতেছে আবহমান কাল। ইহাই ধারা।

ক্যাঁৎ-২

আমাদের সদা মণ্ডলের মুদ্রাদোষ হচ্ছে কথায় কথায 'ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ' বলে ফিস্‌ফিস্ করা। ব্যাপারটি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সেদিন কে যেন একজন বললে, সদা নাকি বাথরুমে ছোট বাইবে কত্তে কত্তেও ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ ব'লে ফিস্‌ফিস্ কচ্ছিলো। আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলুম সদাকে শুধরোনোব জন্যে। ওকে ছেলেদেব ইস্কুলের পাশ থেকে এক প্যাকেট 'দাঁতের লড়াই' লজেন্স কিনে দিযেছিলুম আমরা বন্ধুবান্ধবেবা, চাঁদা তুলে। 'দাঁতেব লড়াই' মুখে দিলে সেগুলো এমনি কায়দায চোয়াল আঁকড়ে ধরে যে ফিস্‌ফিসানি তো দূবস্থান, লোকে কিছু ভাবতে পর্যন্ত পারে না।

প্রথম যেদিন সদা দাঁতের লড়াই খেল, আধঘণ্টাটাক আমাদের সাবা দুনিয়াব মস্করাতেও রা-টি কাড়েনি। আমরা খুশি। সদাকে যখন আমবা এইজন্যে জমিযে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছি তখন হঠাৎই সদা ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ-ক্যাঁৎ বলা শুরু করল। ঘণ্টা দুয়েক এইরূপ করে যখন থামল তখন বুঝলুম যে আধঘণ্টা ধবে তাব যাবতীয ক্যাঁৎক্যাঁতানি 'দাঁতের লড়াই'-এব সাথে জবরদস্ত লড়াই করে শেষমেয যখন বেরিয়েছে তখন সদা সত্যি সত্যিই 'সদা'তে পৌঁছে গিযেছিল। অগত্যা লজেন্সগুলো আমবাই মুখে পুবে ভলান্টারি রিটারমেন্ট নিযে নিলুম।

প্রসূন অবশ্য অন্যরকম কথা বলে গেল এক্ষুনি, আমাদেব সদা নাকি আজকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির হ'য়ে কণ্ট্রাক্ট বেসিসে হোল-টাইমারি করে। সদা নিজেমুখে বলেছে প্রসূনকে—'বুজলি না, ক্যাঁৎ। একজন ক্যাঁৎ মহাপুরুষ বলেছিলেন ক্যাঁৎ যে, তোমার নিজের যেটুকু ক্যাঁৎ আছে সেই ক্যাঁৎটুকুই ঠিকঠাক ক্যাঁৎ কবে দেখো, তুমি ক্যাঁৎ অনেক বড় ক্যাঁৎ হবে—কথাটা কে ক্যাঁৎ বেশ বলেছিলেন, ক্যাঁৎ যিশুখ্রীস্ত নাকি ক্যাঁৎ জবাহ্লুষ্ট, ধুস্ ক্যাঁৎ, মনে পড়চে না।

কলকাতা সম্ভবত তিল ছেড়ে তালোত্তমা হয়ে গেছে। তিলোত্তমা নিয়ে তিলমাত্র মাথাব্যথা নেই। হয়ত থাকত, কিন্তু সম্প্রতি এক অকৃত্রিম তিলোত্তমা কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছেন। ইনি একজন লেখিকা।

সাহিত্য দুঃসংবাদ

তিল তিল করে তিলোত্তমা হয়—এমন একটা কথা বেশ চালু আছে। জীবনানন্দ একরাশ আশা কিংবা তামাশা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, কলকাতা একদিন কল্লোনিনী তিলোত্তমা হবে। ভাঙা ম্যানহোল, ডাঁই করা জঞ্জাল, পটাপট মোড়ে মোড়ে যানজট—এতসব গুণপনায় কলকাতা সম্ভবত তিল ছেড়ে তালোত্তমা হয়ে গেছে। তিলোত্তমা নিয়ে তিলমাত্র মাথাব্যথা নেই। হয়ত থাকত, কিন্তু সম্প্রতি এক অকৃত্রিম তিলোত্তমা কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছেন। ইনি একজন লেখিকা। এত সাংঘাতিক লেখিকা যে, বছরখানেক আগেও সাহিত্য জগতে তাঁর নাম অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও অনুভব করা যেত না। ইদানীং সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কারো অথবা কারো কারো নেকনজরে পড়ার দরকার হয়। নেকনজর ইদানীং আবার তাঁদেরই দামি যাঁদের লেখ-নজর ব্যাপারটি প্রায় নেই। কিছু বছর ধরে আমরা আনন্দ সহকারে লক্ষ্য করছি যে এক বিশেষ আনন্দ মার্গ-ই সাহিত্য বাজারের একমাত্র মার্গ। অন্তত তাঁদের তাই ধারণা। কপালগুণে আমাদের দুঃস্বপ্নের এবং জীবনানন্দের স্বপ্নের তিলোত্তমা তাঁদের সানন্দ অনুগ্রহ ভাজন হয়েছেন। তাঁর লেখালিখির বয়স যথার্থ এক বছরও পেরোয়নি। কিন্তু তাতে কি? বছর নিয়ে ওজর তোলা ভারি অপরাধ, বিশেষ করে মেয়েদের বয়স সম্পর্কে, থুড়ি, তাঁদের কালিবাজির বয়স সম্পর্কে।

১৯৮২ সালে শ্রীমতী কমল দাশ অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়ায় ঝড় উঠেছিল এই বলে যে, তিনি এমন কিছু বেশি লিখে ফেলেননি যে, তাঁর বই ভালো হলেই তাঁকে পুরস্কার দেওয়া চলে। এবং একদা সতীনাথ গুহ রবীন্দ্র পুরস্কার পেলে সেই একই প্রশ্নে ঝড় বয়ে গেছিল যে, তিনি সাহিত্যিকই নন, অতএব আমাদের সার্বজনীন রবীন্দ্র ঠাকুর তাঁর কাঁধে সমাসীন হতেই পারেন না। অ্যাকাডেমি বা রবীন্দ্র-তে আনন্দ কোথায়? নেই। আনন্দ হয় শ্রেষ্ঠর জন্য—তিলোত্তমার জন্য। তিল তিল করে গড়তে যদি সময় লাগে ঢের, তবে তাল তাল করেই গড়া হোক না কেন। যাঁরা তালে থাকেন, তাঁরা জানেন, একটি তালে অসংখ্য তিল ধরা পড়ে।

তিল এবং তাল প্রবাদে পাশাপাশি অবস্থান করে থাকে। তালে থাকা তালেবররা তাই তিলকে ধরে নিতে মুহূর্তেক দেরি করেন না, যেমন চুম্বক ধরে লোহাকে। তাই তিলোত্তমার একটি বই তাঁদের ফোকাসে প্রকাশিত বা ফোকাসিত হতে না হতেই তাঁদের ভূর্জপত্রে প্রশংসার এমনই বাণীস্রোত বয়ে যায়, তাতে তিলোত্তমার মস্তক পশ্চাদ্দিকে ঘূর্ণিত হয় না শুধু প্রশংসকের মস্তক ঘূর্ণনের প্রতি অনুকম্পা বশত। শুধু প্রশংসা নয়, সেই ভূর্জপত্র কিংবা বর্জ্যপত্র বিনতিবাচক তথা ভীতিবাচক ঘোষণা রাখেন যে. এই অসাধারণীর বিরূপতা যেন না করা হয়, কেন না. তিনি বিশ্বজয় করতে চলেছেন।

জয় যে তিনি করেছেন, সন্দেহ নেই সন্দেহ নেই সন্দেহ নেই তায়। জয় অবধি তাঁকে রেয়াত করতে বাধ্য হন।

একদা তসলিমা নাসরিনকে মুকুট পরানোর জন্য সমরেশ মজুমদারের 'কইতে কথা বাধে'-র গমকে ইতি টানা হয়েছিল দুম্ করে। এখন তিলোত্তমার মুকুট লাগি তাঁর লেখা তাল তাল করে ছাপা হচ্ছে। তাঁকে আনন্দ দানের ব্যস্ততা এমনই যে তাঁর ধারাবাহিক একটি সংখ্যায় এমনকি ষোলো পৃষ্ঠা অবধি ছাপা হচ্ছে। সবই আনন্দের ব্যাপার। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়তি জায়ন্তে।

তালোত্তমা, মাপ করবেন, তিলোত্তমা আনন্দিত হবেন—এ আমাদের নিতান্ত কাঙ্খিত।

এলাম দেখলাম জয় করলাম—এ কি সবাই পাবে? কেউ কেউ পাবে। তার জন্য Be-শেষ গুণের অধিকারিণী হতে হয়। তিলোত্তমা সে গুণ টানতে অবশ্যই দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন।

ক্রিকেটার আজহারউদ্দিন তাঁর ক্রিকেটার জীবনের শুরুতে যখন ছক্কারক্কায় চোখ ঝলসে দিচ্ছিলেন, সারা দেশ তাঁর কৃতিত্বে উৎফুল্ল হচ্ছিল, প্রবীণরা আতঙ্কিত হয়ে বলেছিলেন, না, না, বেশি বলো না, ছোকরার মাথা ঘুরে যাবে, শেষ হয়ে যাবে ছেলেটা।

এখানে অবশ্য এঁর মাথা ঘোরার ব্যাপার নেই। মাথা একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে গেছে দেশ-সুদ্ধ সবার। তাঁর কলমে গড়াচ্ছে বসুধারা, সুমুখে বইছে আনন্দধারা। এই ধারায় ধারায় যে ধারাপাত, তা পড়ার জন্যে আর সামান্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সে ধারাপাত আদৌ অ্যাকাডেমিক না হলেও হবে আনন্দিক ।

তিলোত্তমা একদিন কল্লোলিনী কলকাতা হবে। হবে কি মশাই, হয়ে বসে আছে।।

—মৈনাক মিত্র

বইমেলায় পত্রপাঠ -এর
গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে
স্টল নং-৯৪৮ (পার্ক স্ট্রিট মেন
গেটের পাশেই পুকুরপাড়ে)

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
সরাসরি—৬৫.০০
সডাক—১০০.০০

তার বয়স হয়েছে। সে গর্ভ-উন্মাদনা আর নেই। কিন্তু বড় মেয়েটি বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। এখানো কোনো প্রজননক্ষম প্রণয়ী সে পাবে কোথায়?

বলা বাহুল্য

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

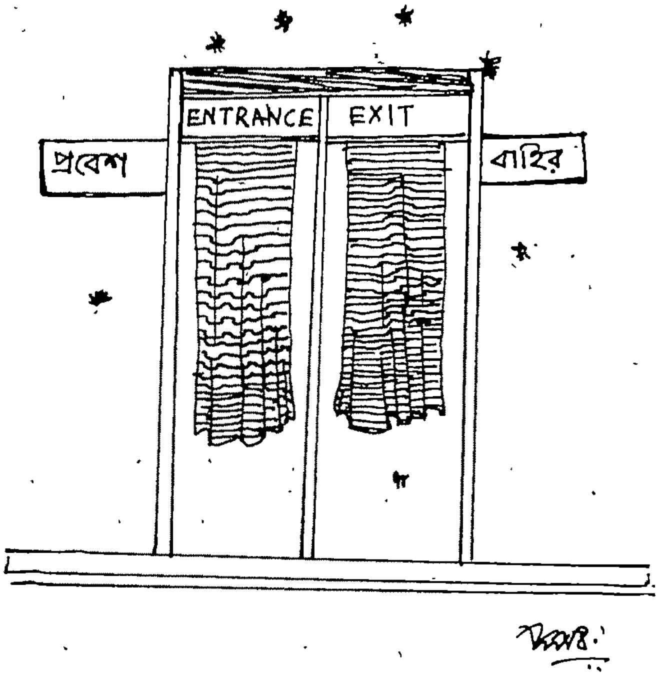

একবার মশকগিন্নি ঠিক করল গোশালা ছেড়ে সে কিছুদিন হুই উঁচুতে হাতির কানের মধ্যে বসবাস করবে এবং, সেইমতো, হাতি কানের কাছে উড়ে গিয়ে যথাসম্ভব ভন্‌ভনিয়ে তার অভিলাষ ব্যক্ত করে সে জানাল, 'মহাশয়ের যদি কোনো আপত্তি থাকে তো জানাবেন।'

বলা বাহুল্য হাতি শুনতে পেল না। কচি দেখে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে হুউস শব্দে সে সবটা উদরে পাঠিয়ে দিল।

এক সপ্তাহের মধ্যে মশাগিন্নি ফ্যামিলি নিয়ে হাজির।

বলল, 'মহাশয়, আপনি যখন কিছু জানালেন না, তখন ধরে নিচ্ছি আপনার কোনো আপত্তি নেই।'

এত বলে সে হাতির কানের মধ্যে ঢুকে গেল এবং সপরিবারে সেখানেই বসবাস করতে লাগল।

বলা বাহুল্য, প্রথম ক'দিন তাঁদের ভালোই লেগেছিল। হাতি যেদিন কান পর্যন্ত ফনা-তোলা মস্ত ময়াল সাপটা শুঁড়ে তুলে নিয়ে নদীর ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তারপর বানভাসি নদী সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠল, তখন কানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ পোঁ-পোঁ শব্দে বিউগিল না বাজিয়ে ওঁরা পারেনি। না ভেবে পারেনি যে, এসব ওরাই করেছে। হাতির শরীরের মধ্যে ওরাও সবাই ছিল না তখন। হাতি আর ওরা কি আলাদা। ওরাও 'হেঁইও' বলেছিল।

কিন্তু, কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, কর্ণালয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে মশাগিন্নির এবং খুবই। প্রথমত, প্রতি তিনদিনের মাথায় তার একফোঁটা রক্ত চাই-ই চাই আর সেজন্যে দংশনের পক্ষে মানুষের পাতলা আর নরম চামড়াই সুবিধাজনক। আর ঐটুকুই রক্ত চুষে না খেলে পুরুষ মশাকে আকর্ষণ করার তথা গর্ভসঞ্চারের ক্ষমতা তার থাকে না। তিনদিন অন্তর ডিম পাড়তে জলও চাই কিছুটা। এখানে, এই হস্তিকর্ণপুরে কোথা মানুষ, কোথায় বা জল।

পুরুষদের আর কী। কারণ, গর্ভ হল না হল, তাতে ওদের ভারি বয়েই গেল। ওরা তো গাছের পাতার রস খেয়েই দিব্যি বেঁচে থাকে। ওদের তো গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করতে হয় না। ডিম পাড়াপাড়িরও দায় নেই।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই তাই, মশাগিন্নি বুঝতে পারল, এখানে, এত উঁচুতে, এহেন বাতাসবহুল, বড়সড়, এবং পরিচ্ছন্ন বাসস্থান তার বা তার সন্তান-সন্ততির পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়। তার বয়স হয়েছে। সে গর্ভ-উন্মাদনা আর নেই। কিন্তু বড় মেয়েটি বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। এখানে কোনো প্রজননক্ষম প্রণয়ী সে পাবে কোথায়?

বলা বাহুল্য তখন কানের ভেতর বসে সে হাতির উদ্দেশে যথাসম্ভব উচ্চস্বরে বলল, 'মহাশয়, আপনার কর্ণালয়টি রাজপ্রাসাদ বিশেষ হলেও, আমাদের পক্ষে মোটেও সুবিধাজনক নয়। তাই আমি, আমাদের পূর্বতন বাসা অন্ধকার ও মলমূত্রগন্ধী ষণ্ডক্ষুরনিকেতনেই আবারো ফিরে যাবার অনুমতি চাইছি। আমার আত্মীয়স্বজনও সব ঐখানে। এ ব্যাপারে আপনার আপত্তি থাকলে জানান।

বলা বাহুল্য, হাতি এবারেও বলল না কিছু। শুধু অগ্রপশ্চাৎ গা দুলিয়ে গেল।

মৌনই সম্মতি-লক্ষণ ধরে নিয়ে মশাপরিবারটিও সহর্ষে জাতীয় সঙ্গীত ('পোঁওও....') গাইতে গাইতে হস্তিকর্ণালয় ছেড়ে উড়ে গেল তাদের নরক-স্বর্গ ষণ্ডক্ষুরনিকেতনের দিকে।

তাদের আসা-যাওয়া ব্যাপারটা অজানাই থেকে গেল হাতির; বলা বাহুল্য।

'ব'-ধোদয়

শরদিন্দু কর

**সকলে বলল, আর সবাই বাই বাই হবে।
কিন্তু বৌ-এর বৃন্দাবনে তুমি চিরকালই বন্দী।**

সেই সময় বেলুড়ের বিখ্যাত ব্লেডের কারখানায় আমার বেকার জীবন শেষ হয়েছিল। কারখানার বাইরে একটি ঝুপড়িতে মাঝে মাঝে জুটে যেত এক হাফ সাধু।

কারখানার গেট থেকে ছুটির ঘণ্টার পর বেরিয়ে এসেছি, হঠাৎ কে যেন ডাকল পিছন থেকে,—বাবা একটু এদিকে এসো।

দেখি সাধু। থেমে মুখ ফেরালাম অনিচ্ছায়।

নিজেই পরিচয় দিল, আমার নাম বিশ্বনাথবাবা। বাস বৃন্দাবনে। ব্রজবাসী।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, অ্যা-ত-'ব'!

সাধু হাসল,— এসো একটা কথা শোনাই। 'ব' নিয়েই জীবন। ব-কে জড়িয়েই সব। ছেলেবেলায় বাবা আর বড় হসে বস—এই দু'জনের চলন ঠিকমতো বুঝতে না পারলেই বিড়ম্বনা।

ছেলেবেলা থেকে বেকারী জীবন। বাবার হাতে আর চাকরিতে ঢুকে বুঝতে পারছি 'বস' কি 'বস্তু'।

কথাটা মিথ্যা বলেনি। তবু অবজ্ঞা দেখিয়ে চলে এলাম। 'ব' সামলাতে আমার বয়েই গেছে।

তখন কি বুঝেছিলাম, চাকরির পরই সে আসে? আমার ক্ষেত্রেও গায়ে আঁচল জড়িয়ে লাজুক পায়ে এল মোক্ষম-ব। বৌ।

সকলে বলল, আর সবাই বাই বাই হবে। কিন্তু বৌ-এর বৃন্দাবনে তুমি চিরকালই বন্দী।

বৃন্দাবনের লীলাখেলায় একদিন বৌ-কে নিয়ে ফিরতে হল হাসপাতাল থেকে। সঙ্গে তোয়ালে জড়ানো বেবি। পথে আসার সময় পাড়ার নিলুকাকা বলে, কী হল বাপু, বেটা না বেটি?

আবার চমক। 'ব' তো দুটোতেই রয়েছে। ব দেখছি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল। একদিন কচি মুখে শুনলাম 'বাবা'। বুক ভরে গেল।

বৌ বলল, শুধু বাবা ডাকে তো পেট ভরে না। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি তুমি বেটিকে একটু সামলাও।

বাবা সামলেছি, বস সামলাচ্ছি, বৌ-কে সামাল দিই এখন, বেটি সামলাতে হবে। ব আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে। কার কাছে যাই?

পরাণসখা অনিলের কাছে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বলি, তোর নামটাতে 'ব' নেই। বাঁচালি। তোর নামটা বেশ।

অনিল ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, আমার নাম কোনো ব্যাপার নয়। তোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক—তুই আমার বন্ধু। আমাদের আসল পরিচয় বন্ধুত্বে।

ব-কে এড়াতে একদিন বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ি। সর্বমুক্তি সর্বশান্তি হিমালয়ের কাছাকাছি পৌঁছে নির্জন বনে চোখ বুজে খুব করে ডাকলাম। ভেবে নিলাম তিনি এলে প্রার্থনা করব, প্রভু চারপাশ ঘিরে রয়েছে 'ব'-এর সপ্তরথী। আমি একা অভিমন্যু, কী করি?

ডাক শুনে তিনি এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর করে হাসলেন। আমার বুক ভরে উঠল আনন্দে। তাঁর হাতে অভয়মুদ্রা। বললেন, বলো, কী বর চাও? আমি বিধাতা।

বর! বিধাতা। আমি থমকে গেলাম। 'ব'-এর কথা কী করে বলি?

হতাশ হয়ে ফিরছিলাম হিমালয়ের এক অচেনা নির্জন রাস্তা দিয়ে। পথে একদল ট্যুরিস্টের সঙ্গে দেখা। বেশ খলবল করে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে এক সুদর্শনা, যাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু ব-এর কথা ভুলতে চাইছিলাম তিনি সামনে এসে হেসে শুধোলেন, পথে প্রবাসের সেই চিরনতুন প্রশ্ন—দাদা আপনি বাঙ্গালী?

বাগ্‌দেবী শেষ পর্যন্ত দিল বিদ্যা।

ব্যাগ গুটিয়ে বুথ থেকে ফোন করলাম বৌকে।—ব্যাকুল হয়ে ফিরে আসছি বাঙ্গালীর ছেলে বাংলার মাটিতে বিরহী বধুর বাহুবন্ধনে। বাৎসল্য বিহীন জীবন বৃথা।

—বাবুসোনা ভালো আছে তো। বাবা, বাড়ির বাকি সকলে, বন্ধুরা?

ব-ই তবে বিরাজ করুক বহাল তবিয়তে।

বইবাজার ও বইচুরি

সৌরেন বসু

বাজারে চোর থাকবে না—এ কখনো ভাবা যায়। নিদেনপক্ষে গ্যাঁটকাটাদের সন্ধান মিলবেই। আর বাজারে কেই বা গ্যাঁট কাটছে না—বলতে পারেন? আপনি যতই ব্যাজার মুখে থাকুন না কেন, আলু-পটল বেগুন-মুলো, তেল-নুন-লকড়ি চাল-গম-লঙ্কা-হলুদ মায় বই পর্যন্ত সব জিনিসের দাম চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে। মনে হয় সব্বাই আপনার পকেট কাটিতং। খাচ্ছেন-দাচ্ছেন তবু যেন কি হারিয়েছেন।

ইংরিজিতে একটা কথা চালু আছে —'Man is not living by bread alone'. তাহলে অন্যটা কি? ভুঁড়ি ঠাণ্ডা হলে মুড়ি অর্থাৎ মাথাটাও খাবার চায়। তখন পেট ভরে তো, মন ভরে না। আর এই মন ভরাতেই চাই বই। সেই বই জোটাতে যেতে হয় বাজারে। বই আর বাজার এ-দুটো একেবারে গলাগলি জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে।

বই-এর বাজার এখন আর কলেজ স্ট্রিটে বসে নেই। জেলা-শহরেও বড় বড় বই-এর দোকান হয়েছে। আর নতুন বাজার তৈরি হয়েছে বইমেলায়। এটা শুধু শহরে নেই, ছড়িয়েছে গাঁ-গঞ্জে। তা হলে বই-এর বাজার এখন রমরমা। তা নয়, সবায়ের মুখে মুখে প্রথমেই একটা কথা শোনা যাচ্ছে—কেব্‌ল লাইন আর টিভি সিরিয়ালের ধাক্কায়, ই-টিভির কল্যাণে আর নাকি কেউ বই-এর মুখ দেখতে চাইছেন না—মানে তাঁরা বই-এর পাতা উল্টে কষ্ট করে পড়তে চাইছেন না। এমনকি নিজের গিন্নির সাথে কর্তা কথা বলার ফুরসৎ পাচ্ছেন না। আবার উল্টোটাও। রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত বোকাবাক্সের সামনে বসে একেবারে বিছানায় এসে ফ্ল্যাট্। আবার ছোট ছোট ফ্ল্যাটে সাহিত্য নিয়ে আড্ডা মারার বন্ধুও ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। কেউ কড়া নাড়লেই বা কলিং বেল টিপলেই—দাঁত চেপে বলে উঠছেন —'আর আসবার সময় পেলেন না, যত্তো সব ইয়ে!' মানে এ-সব কান দিয়ে একবার শুনলে, কারো বাড়ির ত্রিসীমানায় আর পা বাড়াবেন? আর বাচ্চারা? তারা তো ঢাউস ব্যাগ পিঠে নিয়ে হপ্তায় পাঁচদিন টিউশনি পড়তে যাচ্ছে নানান আখড়ায়। তাহলে বাংলা বইমেলাগুলোতে বছরে কোটি টাকার বিক্রিবাটা হচ্ছে কী করে? শুধু কলকাতা বইমেলায় খোঁজ নেবেন, ক'দিন সবশুদ্ধু ক'কোটি টাকার বই বিক্রি হয়। তবু বাজার তো ছোট হয়ে গেছে। বাংলা দেশে তো এপার বাংলার বই যাওয়া বন্ধ। অথচ সেখানে এপারের বাংলা বই ছাপা হচ্ছে নকল করে, ইংরিজিতে যাকে বলা হচ্ছে 'পাইরেসি'। এমনকি উপন্যাসের চরিত্রের নাম পাল্টে, লেখকের নাম পাল্টে বই ছাপিয়ে বিক্রি হচ্ছে।

এই হল বই-বাজারের সাথে বইচুরির সম্পর্ক। যে বই বাজারে খাচ্ছে বেশি, সেই বই-এর নকল বেরোনোর সম্ভাবনাও বেশি। দু'দেশের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হলেও—এ জোয়ার রোধিবে কে?

বাংলা ভাষায় যখন থেকে পুঁথি লেখা শুরু, তখন থেকেই পরের লেখা পুঁথি নিজের নামে চালাবার প্রবণতা ছিল। নাহলে নকলকারীদের উদ্দেশ্যে কখনোই লেখা থাকত না—"শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ।।" অথবা

"পুস্তকং হরতে যস্তু কাণো দুঃখী
ভবেন্নরঃ,
মৃতঃ স্বর্গং ন গচ্ছেত্তু পিতরং
নরকং নয়েৎ।"

তাহলে বুঝুন, দীর্ঘ পরিশ্রম করে, হাতে লিখে বই চুরি চলত। আর এখন ছাপার যুগে তো এসব কাজ চলছে ঝট্‌পট্ যত্রতত্র। আর ছাপার অক্ষরের ওপর আস্থা আমাদের সর্বাধিক। আপনি যতই ধিক্ ধিক্ করুন, শুধু নামের জন্য চুরি নয়, এ হচ্ছে বাজারে ব্যবসা করে দু'পয়সা কামাবার জন্য চুরি। আগে তো পুঁথির পর পুঁথি লোক দিয়ে কপি বা নকল করার পদ্ধতি চালু ছিল, আর হারিয়ে গেলে খোঁজ করার হ্যাপা ছিল অনেক। তাই অভিশাপ দিয়ে লেখকরা নিরস্ত হতেন। এমনকি বংশক্ষয়ের অভিশম্পাৎ দিতেও কসুর করতেন না পণ্ডিতেরা।

ইদানীং দক্ষিণবঙ্গে লোকসাহিত্যের কোনো কোনো গবেষক পূর্ববর্তী গবেষকগণের আবিষ্কৃত তথ্যাদির স্বীকৃতি ছাড়াই নিজের বলে চালিয়ে বই

ছাপাচ্ছেন।

এখন আবার সরকাবি ছাপানো 'টেক্সবুকগুলোর নকল ছাপিয়ে বেরুচ্ছে, স্রেফ বাজারে ব্যবসাব খাতিবে। এ-সব ধরা পড়ার জন্য' প্রকাশকের হাতে দড়ি পড়ছে অভিশম্পাতের বদলে।

এ ছাড়া বইচুবিমানে আস্ত বই চুরির ঘটনা নতুন কিছু না। এই ধরুন, বই পড়তে চেয়ে নিযে গিয়ে ফেরৎ না দেওয়া। এটাকে কেউ কেউ আবার চুরির পর্যাযে ফেলতে চান না। এ নাকি জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিগণের মুদ্রাগুণ। কলকাতা বইমেলায় কে একজন স্টলে বই পড়তে পড়তে দাম না দিযে নিজের ব্যাগে বই ঢোকালে ধরা পড়ে যায়। যিনি ধরেছিলেন তিনি ছেলেটিকে বলেছিলেন, 'এই বই-এ কী লেখা আছে, বলতে পারলে বইটা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে।' ছেলেটি হুবহু অনেক জায়গায় মুখস্থ বলে দিতে স্টল-মালিক তাকে বইটি পুরস্কার দেন। পবে জানতে পারেন বইটি কেনার টাকা না থাকায় এবং বইটি শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখবার প্রবল ইচ্ছায ছেলেটি এ কাজ করেছে। এ ছাড়া দপ্তরির ঘব থেকে চুরি করা কত মলাট বিহীন দামি বই কলেজ স্ট্রিটের বেলিং-এ ঝুলতে, ফুটপাতে বিক্রির জন্যে শুযে থাকতে দেখবেন পাঠাগারের স্ট্যাম্প জল দিযে তুলে ওই চুরি, মক্কেল সেজে এসে উকিলের বসার ঘর থেকে আইনের বই চুরি, বন্ধু বলে এসে বন্ধুর অনুপস্থিতিতে বই-এর List তৈরি করে টেবিলের ওপর রেখে দিযে, চিঠি লিখে বই নিয়ে উধাও—এসব চাযের আড্ডায় বহু চর্চিত।

হ্যাঁ, আবার বাজারের কথায় আসি। বিদেশে বই-এর বিক্রি বাড়াতে এবং নতুন সম্ভাবনাময় লেখকদের তুলে ধবতে প্রকাশকরা ছোট ছোট সভা করেন। বড় বড় প্রকাশক, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং জ্ঞানীগুণী অতিথি অভ্যাগত থাকেন পঞ্চাশ-ষাট জন। ছোট সভায তাঁবা বইটি সম্পর্কে আলোচনা কবেন এবং তুলে ধরেন নতুন লেখককে। এখন 'বাংলা অ্যাকাডেমি' বা 'জীবনানন্দ হলে' এবং অন্যত্রও কিছু কিছু বই-এর উদ্বোধন হচ্ছে কিন্তু সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবিতা পাঠের অংশগ্রহণকারীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবিতা পাঠের অংশগ্রহণকারীদেব প্রাধান্য। নমো নমো করে বই-এর উদ্বোধনই যথেষ্ট। নতুন লেখক বা কবিকে কেউ তুলে ধরার চেষ্টা কবলে পাশ থেকে কানে আসবে— 'আব না, আর না', 'হল ভাড়াব সময় আর মাত্র আধ ঘণ্টা'।

লেখকের জীবদ্দশায় অনেকেই অপবিচিত থেকে গেছেন সাধারণের কাছে অথচ পরবর্তীকালে যাঁরা খ্যাতিমান হযেছেন, এমন নিদর্শন সর্বদেশে সর্বকালেই আছে। কিন্তু তাঁদের আলোয় এনে পরিচয় কবিযে দেওয়ার দায়িত্ব কি পালন করবেন মিডিয়াগুলো। বই না পড়েই একদল তাঁবেদার সমালোচক নতুন সম্ভাবনামঘ লেখক সম্বন্ধে আজে-বাজে লিখে দিচ্ছেন। এতে কবে নতুন বাংলা বই-এর বাজাব সীমিত হচ্ছে। প্রবাসী বাঙালিদেব কাছে নতুন বই-এর সংবাদ পৌছচ্ছে না। ভাবতেব বাইবে, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য প্রদেশে অনেকেই নতুন বাংলা বই-এর অনুসন্ধান করছেন। কিন্তু সন্ধান নেই। সন্ধান দেবার প্রয়াস নেই।

এবারে বইচুরি দিয়ে লেখাটার ইতি টানা দরকার। কারণ অপ্রিয় সত্য কথা সবজান্তাদের কাছে আবার পথ্য হয় না। যে কথা বলতে চাই। শরৎচন্দ্র তো বাংলাদেশে অলরেডি পাইরেটেড। এখন রবীন্দ্রনাথের পালা। রবীন্দ্রনাথের সব লেখাব সাথে পরিচয় আঙুলে গুনতি মানুষের কাছে থাকতে পারে, সকলের নয়। এ ক্ষেত্রে অভিশম্পাতে কাজ হবে না। তবে জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে রবীন্দ্রনাথ কে আত্মসাৎ করার আশঙ্কা আছে। কেবল পাঠাগারে, ধনীগৃহে আর পণ্ডিত-ভবনে ববীন্দ্রনাথ আর বিরাজ করবেন না। ঘরে ঘরে যত্রতত্র হাতে হাতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাবে—এটা আনন্দের। তবে পাইরেটেড হলে? তাই বলি, সাধু সাবধান।।

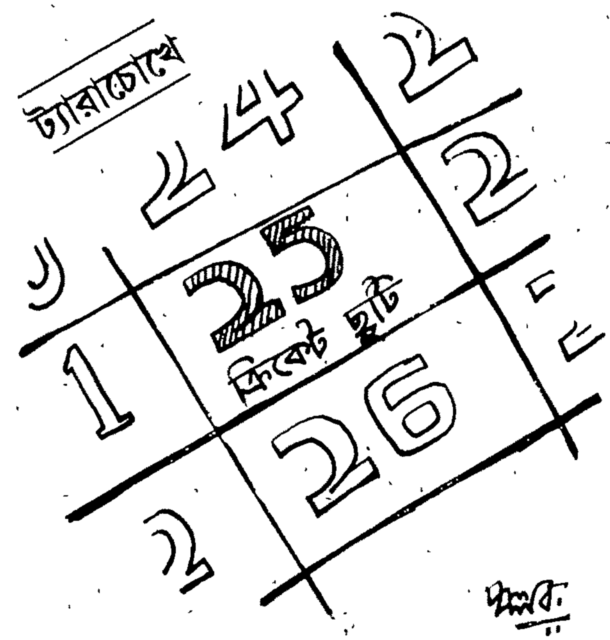

নাকি সুরে

বাঙালি, বিশেষ করে কলকাতাবাসীকে আমবা ক্রিকেট পাগল বলিযা জানিতাম। ভাবতের যে কোনো প্রান্তেই ক্রিকেট খেলা হউক না কেন, রাস্তায বাস্তায়, অফিসে অফিসে বোকা বাক্স ঘিরিয়া জমাট ভিড় প্রত্যক্ষ করা যায, আর সরাসরি ইডেন উদ্যানে খেলা থাকিলে তো কথাই নাই, কলকাতায় অঘোষিত ছুটি হইয়া যায। বহু ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালযে অনুপস্থিত থাকে। বহু প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীরা গবহাজির থাকেন, এমনকি সবকাবি অফিসগুলিতেও প্রায় ছুটির আবহাওয়া বিরাজিত হয়, কারণ কর্মচারীরা উপস্থিত হইলেও কাজ ফেলিয়া, মৌচাকের ন্যায় যে স্থানে বোকা বাক্স অবস্থিত আছে, সেই সেই স্থানে জমায়েত হন দলমত নির্বিশেষে। এতদ সত্ত্বেও একথা বলা যাইবে না যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রিকেট খেলা দেখিবার জন্য সরকারি ভাবে ছুটি ঘোযণা করিয়াছেন। কিন্তু দেখা গেল তামিলনাড়ু সরকার আবো এক কাঠি সরেস। তাহারা ২৫শে জানুয়ারি ২০০২-তে অনুষ্ঠিতব্য দিন-রাতের একদিনেব ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে চেন্নাই সহ আরো দুটি জেলায় ছুটি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। সরকারের মতিগতি দেখিযা একজন সচেতন নাগরিক তবু চেন্নাই হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলা দায়ের কবিযাছিলেন। কিন্তু ভবি ভুলিবাব নহে। হয়ত হাইকোর্টেব বিচারপতিরও খেলাটি দেখিবাব যথেষ্টই সাধ রহিয়াছে। সুতরাং তিনি মামলাটিকে পত্রপাঠ নাকচ করিয়া দিয়া সবকারের সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখিয়া দিয়াছেন। আহা, কি সুসমাচাবই শুনিলাম। হাইকোর্ট বলিযাছেন, সরকারেব সিদ্ধান্তে হাইকোর্ট নাক গলাইবে না। অহো, অন্যান্য রাজ্যের সবকারপক্ষরাও এই সিদ্ধান্ত শুনিযা না জানি কত না পুলকিত বোধ করিতেছেন। তাঁহাবা ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত লইবেন এবং বিচাবালয় তাহাতে নাক গলাইবে না।—ইহার অপেক্ষা সুসমাচাব কি কিছু আছে বলিযা বোধ হয? এই যে মুর্খের ন্যায নাকটি গলাইযা ফেলিলাম—এখন নিজ নাসিকাটি দুইবার মলিযা লইতেছি। শূর্পনখা হইতে কে চাহে?

—অঞ্জনা দত্ত

শিক্ষা-দুঃসংবাদ

ফজল আলির ফাজলামি

নিন্দুকেরা যতই বলুন না কেন, রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাব বেহাল অবস্থা, আমরা তা মানছি না, মানবো না। একটা নয়, দুটো নয়, পঞ্চান্ন হাজাব চারশো তেপান্নটি প্রাইমারি ইস্কুল আমরা রক্ত আর ঘাম দিয়ে তৈরি করেছি। কতখানি এলেম থাকলে এতগুলো ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায় বলুন তো? শুধু এলেম? স্বপ্ন, কল্পনা আর পরিকল্পনার ত্রিবেণী সঙ্গম না ঘটলে এমনটা হয না। হতে পাবে না। আমাদের অনেক কিছুর অভাব আছে, কিন্তু স্বপ্ন-কল্পনা-পবিকল্পনার মজুত ভাণ্ডাবটি আমাদের অফুবন্ত।

এব মধ্যে দু-হাজার চারশো পঁচাশিটি ইস্কুলে অবশ্য আমবা ঘর-বাড়ি, মায ছাদেব কোনো বালাই রাখিনি। কেন জানতে চান? ব্যস্ত হবেন না। ব্যাখ্যা করলেই বুঝতে পারবেন। আপনারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। আপনাদেব বুদ্ধিতে আমাদের অগাধ আস্থা। আসলে এই ইস্কুলগুলোকে আমরা মুক্তাঙ্গন ধাঁচে গড়ে তুলেছি। রীতিমতো খোলামেলা ব্যবস্থা। শীতকালে শীত, গ্রীষ্মকালে গরম আর বর্ষাকালে বৃষ্টি— এসব কচিকাঁচারা উপভোগ করবে। ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে চলতে শিখবে। স্বাস্থ্য হবে নিটোল, মন হবে সতেজ। ছোটদের দেহ-মন এভাবেই গড়ে তুলতে হয, বুঝেছেন? অত পুতুপুতু করলে চলে না। ইস্কুলের ঘরবাড়ি না থাক, সাইনবোর্ড তো আছে। ওটা একটা প্রতীকী ব্যাপাব কিনা, তাই রাখতে হযেছে। সাইনবোর্ড না থাকলে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায় না? আপনারাই বলুন। তাছাড়া সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে আমাদের সংকল্পের কঠোরতা; বিদ্যা বিস্তারের সংকল্প। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে শক্তি ঐ সংকল্পকে ব্যাহত করতে পারে। হুঁ হুঁ বাবা, এ হল বাঙালির জেদ।

একথা ঠিক, এগাবো হাজার চাবশো আশিটি ইস্কুলে একটা কবে ক্লাশকম আমরা তৈরি কবেছি। এ সবই অতীতের ব্যাপার। এখন আব ওপথে আমরা হাঁটছি না। বড্ড ভুল হযেছে ঐ ঘবগুলো তৈরি করে। বিস্তর টাকা খরচ হযেছে। ঐ টাকায় হাজার হাজার সাইনবোর্ড বানিয়ে আরো অনেকগুলো ইস্কুল আমরা রাজ্যবাসীকে উপহার দিতে পাবতাম। উপহার দিতে আর উপহাব নিতে কাব না ভালো লাগে বলুন?

লোকসানটা অবশ্য অন্যভাবে পুষিয়ে নিয়েছি। পাঁচ হাজার একশো দশটা ইস্কুলে মাত্র একজন করে টিচার মোতাযেন করেছি। একজন টিচাব একসঙ্গে চাবটি ক্লাশ ম্যানেজ করছেন, ভাবতে পারেন? ম্যানেজমেন্টের যুগ মশাই, ম্যানেজমেন্টের যুগ। কী করে তা সম্ভব? খুবই সহজ। খোদ টিচাব যিনি, তিনি ক্লাশ ফোরের ক্লাশ নেন। ক্লাশ ফোরেব ছেলেমেযেবা পালা করে ক্লাশ থ্রিব ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে থাকে। ক্লাশ থ্রি-র ছেলেমেয়েরা পালা করে ক্লাশ টু-ব বিদ্যাশিক্ষার দাযিত্ব নেয়। এবং ঠিকই ধবেছেন, ক্লাশ টু-র ছেলেমেয়েরা পালা কবে ক্লাশ ওয়ানের ছেলেমেযেদেব অক্ষর পবিচয় করায়। এতে লাভ হল, উঁচু ক্লাশেব ছেলেমেযেরা পুবনো পড়াশুনোগুলো আর একবার ঝালিযে নেওয়াব সুযোগ পেল। শুধু কি তাই? ভবিষ্যতে যারা টিচার হবে তাদের একটা প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও হল। তবেই দেখুন, কী নিখুঁত আমাদেব পবিকল্পনা। কীভাবে বিদ্যাশিক্ষাব বনিয়াদ আমরা শক্তপোক্ত করছি। তাবিফ করুন মশাই, হাততালি দিয়ে আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। এই মুহূর্তে প্রাইমারিতে ছাব্বিশ হাজাব টিচারেব পদ খালি আছে। কিন্তু নতুন টিচাব নিয়ে শুধু শুধু পযসা নষ্ট করে লাভ কি বলুন? ইস্কুলের ছেলেমেয়েরাই যখন দিব্যি ইস্কুল চালিয়ে যাচ্ছে তখন অহেতুক নতুন টিচাব এনে কী হবে? ছেলেমেযেদেব ট্রেনিং হচ্ছে, হোক না।

017605

নিন্দুকেবা বলে, প্রতি বছর শতকবা পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী নাকি ইস্কুল ছেড়ে দেয়। পড়াশুনোয ইস্তফা দেয়। তা দিক গে, বাকি পঞ্চাশজন তো থাকল, তাই বা কম কি? বলুন তো, পুকুবে এত যে চাবাপোনা ছাড়া হয়, সবগুলো কি বাঁচে? মাচাভর্তি লাউগাছে যত ফুল হয়, সবগুলোতেই কি ফল ধরে? আমেব গাছে যত মুকুল হয়, তত কি আম হয়? এ হল প্রকৃতির নিযম। কিছু যাবে, কিছু থাকবে। আপনাবা বুদ্ধিমান এবং ভদ্রলোক। বোঝালে বুঝবেন। আপনারা তো নিন্দুক নন। নিন্দুকেরা হল সেয়ানা বজ্জাত। খ্যাঁকশেয়ালের মাসতুতো ভাই।

তাছাড়া সবাই ইস্কুলে পড়াশুনো কবলে কাজকম্মের লোক পাবেন কোথায়? বাসন মাজবে কে? গরু চরাবে কে? মাঠে লাঙল দেবে কে? রিকশা টানবে কে? মাল বইবে কে? এও তো সেবা। জনগণের সেবা। দেশের সেবা। তাদের সেবায বাধা দেবেন কেন? প্লিজ, বাধা দেবেন না। এতে গুনাহ্ হয়।

—ফজল আলি

বইমেলার ধুলো

সনৎকুমার মিত্র

ধুলো খাই, যদি ক্রেতা পাই…

প্রকাশক · বইদুটো কিরকম লাগল বলুন?

পাঠক · খুব ভালো লাগল। তাইতে আপনার এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বই দুটো শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললাম।

প্রকাশক · তাহলে বই নেবেন তো? এটা ষাট টাকা, এটা চল্লিশ টাকা। সব মিলিয়ে দাম হল একশ টাকা। শতকরা দশ টাকা ছাড়।

পাঠক নাহ্ নেব না। বই তো পড়া হয়ে গেল।

প্রকাশক · তাহলে কোন বইটা নেবেন বলুন। এত বই আছে। এ সবই তো আপনাদের জন্যে। আরো বই দেখুন। আরো বই পড়ুন।

পাঠক নাহ্ এবার অন্য প্রকাশকের স্টলে যাব। এতক্ষণ আপনার এখানে বই পড়লাম। আরো পড়ার ইচ্ছে আছে। কিন্তু খুব লজ্জা করছে। এক দোকানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। এবার অন্য স্টলে গিয়ে আবার কয়েকটা বই পড়ব। তারপরে আর একটা স্টলে যাব। তারপরে ..

প্রকাশক : তার মানে?

পাঠক তার মানে আমি পাঠক। আমি ক্রেতা নই। আপনি তো জানেন, তিন শ্রেণীর লোক আপনার স্টলে আসে। আমি যাদের তৃতীয় শ্রেণীর লোক মনে করি, তারা বই কেনে কিন্তু বই পড়ে না। তারা বই সাজিয়ে রাখে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বই কেনে এবং বই পড়ে। আর প্রথম শ্রেণীর পাঠক কারা জানেন? যারা বই পড়ে, কিন্তু কেনে না। এই যেমন আমি।

প্রকাশক না-না, বসুন বসুন। ভয় নেই, আপনাকে বই কিনতে কোনো প্যাঁচে ফেলব না। ওই যে চা-ওয়ালা যাচ্ছে। চা খাবেন?

পাঠক চা? তা চলতে পারে। না না, আপনি পয়সা দেবেন না। আমি দিচ্ছি। আপনি আমাকে এতক্ষণ বই পড়তে দিয়েছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই যে, দুটো চা দিন।

প্রকাশক . আপনার মতো পাঠক বহু এসেছেন এই বইমেলায় আমার স্টলে, কিন্তু আপনার মতো সত্যি কথাটা এর আগে আমাকে কেউ বলেনি।

পাঠক আসল কথা কি জানেন? বইমেলার এই কটা দিন গোগ্রাসে বই গিলি। দুপুরে খেয়ে উঠেই বেরিয়ে পড়ি। টিকিট কেটে তিনটের মধ্যেই ঢুকে পড়ি বইমেলায়। তারপরে একটা একটা করে স্টলে যাই। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। চারিদিকে বই থইথই করছে। হাওয়া বুঝে কোনো স্টলে একটা বই পড়ি, কোনো স্টলে দুটো। বইমেলাতেই সারা বছরের খিদে মেটাই।

> ওপরে ওঠা অত সহজ নয়। অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। যোগাযোগ না হলে কিছুই হবে না। প্রতিভা একশ ইনটু পরিশ্রম একশ ইনটু যোগাযোগ শূন্য ইজ ইকোয়ালটু শূন্য। জিরো।

প্রকাশক একটাও বই কেনেন না?

পাঠক . একটাও কিনি না, তা হয় নাকি? যারা বই ভালোবাসে, তারা না খেয়েও বই কেনে।

প্রকাশক তাই বলুন।

পাঠক যারা বইমেলায় মেলা দেখতে আসে, তারা— দেখুন গিয়ে একশ টাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে ফিসফ্রাই, চিকেন কাটলেট, কোকাকোলা, কফি খাচ্ছে আর হিহি হিহি হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে।

প্রকাশক এটা তাদের প্রেম করার নিরাপদ জায়গা।

পাঠক আমরা বই দেখতে আসি। আমাদের ছোট বাড়িতে বই রাখার যে জায়গা আছে, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল,

মাইকেল, জীবনানন্দ রাখতেই হিমশিম।

প্রকাশক : ঠিকই বলেছেন। বই ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আর আর্থিক অবস্থা খেড়িয়ে চলেছে।

পাঠক সেখানে নিজেরাই ভালোভাবে শুতে বসতে পাই না, বই রাখি কোথায় বলুন?

(এক কবির প্রবেশ)

কবি: এই যে সাহাবাবু, কেমন চলছে?

প্রকাশক · চলছে কোথায়? থেমে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে।

কবি : কেন? কেন?

প্রকাশক : যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা মূল মাঠে কাছেই স্টল পেয়েছেন। বিক্রিবাটাও হচ্ছে তাদেরই। আর এই দূরে, টিনের বেড়ার ধারে আমরা মশা মারছি।

কবি : আমি তো দেখলাম দূরের কয়েকটা স্টলেও লম্বা লাইন পড়েছে। ঢুকতেই পারলাম না।

প্রকাশক : ওখানে ঢুকতে পারেননি বলেই আমার এখানে ঢুকেছেন। নইলে আসতেন না, কী বলেন?

কবি . আমাকে ঠুকছেন?

প্রকাশক : আমরা তো ঠোকাঠুকি করেই মরছি। এই যে আপনার কবিতার বই আমি প্রকাশ করেছি.....

কবি আমার কছে থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছেন।

প্রকাশক · গত চার বছরে চার কপিও বিক্রি হয়নি। স্টলে সাজিয়ে রাখা-ই সার।

কবি : আমার টাকাও তো মার খাচ্ছে।

প্রকাশক · তাই তো বলছি, উপন্যাস ছাপান, কিছু রিটার্ন পাবেন।

কবি : কিন্তু নামি পত্রিকাতে খুব প্রশংসা করেছে!

প্রকাশক · ওটাই আপনার লাভ। ওপরে ওঠার সিঁড়ির এক ধাপ তো উঠেছেন। এরপর একটা পুরস্কার পেলে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। কিন্তু আমরা কী পেলাম? এই যে আপনার বই প্রকাশ করেছি, মেলায় মেলায় বয়ে বেড়াচ্ছি।

কবি : না ভাই, ওপরে ওঠা অত সহজ নয়। অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। যোগাযোগ না হলে কিছুই হবে না। প্রতিভা একশ ইনটু পরিশ্রম একশ ইনটু যোগাযোগ শূন্য ইজ ইকোয়ালটু শূন্য। জিরো। একজন নামি প্রকাশক বললেন, ভালো উপন্যাস লিখে নিয়ে আসুন, ভেবে দেখব।

প্রকাশক : তিনি ঠিকই বলেছেন। ভালো উপন্যাসের এখনো কিছু বাজার আছে।

কবি কিন্তু কবিতা লিখে যে আনন্দ পাই।

প্রকাশক তাহলে আপনার আনন্দ নিয়ে আপনি ঘরে বসে থাকুন। আসল কথা হল টি. ভি. আমাদের বই-এর বাজারের শতকরা সত্তর ভাগে থাবা বসিয়েছে। মাত্র তিরিশ ভাগ নিয়ে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছি এই ত্রিশ ভাগের মধ্যে পনেরো ভাগ শিশু-কিশোর সাহিত্য আর স্কুল-কলেজের বই। বাকি পনেরো ভাগের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ উপন্যাস, গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ, ছোটগল্প, ভ্রমণ, স্বাস্থ্য। তাহলে হাতে রইল কী?

কবি : শতকরা পনেরো ভাগের শতকরা নব্বই ভাগ চলে গেল? তাহলে পনেরোকে একশ মনে করে তার দশ ভাগ? ওরে বাবা, এ বড় কঠিন অঙ্ক। আপনি বলুন, হাতে রইল কী?

প্রকাশক : হাতে রইল কলা। কবিতার বই—কিছু কবি এবং কবিতাপ্রেমীরা পড়েন। খুব বেশি হলে তার মধ্যে শতকরা দশজন কেনেন।

কবি . ওরে বাব্বা। শতকরা পনেরোর শতকরা দশ, তার শতকরা দশ তার মানে তো দশমিকে গিয়ে ঠেকল।।

প্রকাশক : এই ঠেকাটাও নামি কবিদের জন্যে। তাই আপনাদের হাত থেকে সেটাও পিছলে গেল!

কবি তাহলে? আমার হাতে কী রইল?

প্রকাশক : কলার খোসা।

কবি না—না, নিরাশ হবেন না। আজ পাচ্ছেন না, আগামীকাল নিশ্চয় পাবেন।

প্রকাশক · আশা নিয়েই বেঁচে আছি। মাসের মাইনে হাতে পেলে শনিবার রবিবারে কিছু পাঠক, থুড়ি, কিছু ক্রেতা নিশ্চয় পায়ের ধুলো দেবে।

কবি : এই দিকটাতে ধুলো কম। বেশ শান্ত।

প্রকাশক : এখানে বসে কবিতা লেখা যায়, বই বিক্রি হয় না। প্রার্থনা করি, আগামী বইমেলায় যেন ওই ধুলোয় ভরা মাঝমাঠে স্টল পাই। আপনারা না এলেও চলবে, কিছু খদ্দের পায়ের ধুলো দিক।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

SARADA GLASS & CHEMICALS

**33, DIXON LANE,
KOLKATA - 700 014.
PH : 227-0387/217-1879.**

বিদ্যাভূষণ

মুসুমুসু কলমচি

> আগর খাহী ছিয়া হিরা বওয়াকুল
> ঘুটর কুন্‌কুন্‌, ঘুটর কুন্‌কুন্‌।

অপবাদ শুনিতেছি এইরূপ, যেইহেতু কলমচি বয়স্ক ও বিচক্ষণ, অতএব তিনি তাঁহার আপন কালবিবরণ পেশ করিবেন, ইহাই অভিপ্রেত। বড় উত্তম। উপরন্তু ইহাও জ্ঞাত হইলাম, ইদানীং যেই কাল অধুনাস্তিক, যেইকাল ত্যজ্যতি কলমচিন্যায় প্রবীণ সকলের, সেইকালে ইনি ব্যক্তি নিতান্ত অবোধ বাক্যবিলাস না করতঃ ববং ইহা ব্যক্ত করুন যেন ইহাগণ কী পরিমাণ অপরিণত আছিলেন ইত্যাদি । মুসুমুসু লেখক নহেন। ইনি ফরমায়েসি কর্ম সম্পাদন করিযা থাকেন, অতএব কলমচি। ফলতঃ ফরমায়েস অগ্রাহ্য করতঃ আপন পবিচয়ে কালিমালিপ্ত কবিতে ইনি অপারগ। হে পাঠক, ইহাতে আপনি বড় দুঃখিত না হইবেন। মুসুর কেবিয়াব-এ মন্দা আনিবে, এইমতো মজ্জা বঙ্গালের অস্থিতে নাই।

মুসুমুসুব কচিকালে অধুনার বঙ্গালদিগের ন্যায় হাতেখড়ি ঘটে নাই। ববঞ্চ ঘটিযাছিল যাহা তাহা 'হাতেকঞ্চি' । দেবীমূর্তির সম্মুখস্থ ভূমে খানিকস্থান পরিপাটি করিযা মৃত্তিকা, পরে কঞ্চি দ্বারা দাগা বুলাইযা তাহাব অক্ষর দর্শনে বুৎপত্তি ঘটে। আঙ্গুলের ব্যবহারও গর্হিত না আছিল। ইত্যাকাব প্রকারে কঞ্চি চালনায় এবং তর্জনী ঘুরানোয পাবদর্শিতা আসিলে কদলীপত্রে উচ্চতর লিখন-অভ্যাস আবম্ভ হইত। প্রাথমিক অবস্থায় কঞ্চি দ্বারা আঁচড় কাটিয়া মক্‌শো হইত। দিবাশেষে এই সকল কদলীপত্র কাঁটাঝোপে ফেলিয়া আসিতাম। অনন্তর, কদলীপত্রে কালিদ্বাবা লিখন প্রণালী আরম্ভ হইত। সেইকালে, প্রাথমিক অবস্থায ঘরে প্রস্তুত কালি ব্যবহৃত হইত। লৌহ-কড়ায হরিতকির রস, মরিচা ও অন্যান্য বিবিধ বন্যফলের কয জ্বাল দিয়া, ছাঁকিয়া লইয়া কালি প্রস্তুত হইত। ফলেব অনুপানেব বিভিন্নতার দ্বারা কালির রং কালচে লাল, কালচে খযেরি, কালো প্রভৃতি করা হইত। কড়াই মধ্যে একটি কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা ঘন ঘন সঞ্চালনে কালিব ঘনত্ব ও স্থায়ীত্ব নির্ণীত হইত। ইহা উপলক্ষে মম সিলেটি বান্ধব এক ছড়া কাটিয়াছিলেন—

আগর খাহী ছিযা হিরা বওয়াকুল
ঘুটর কুন্‌কুন্‌, ঘুটব কুন্‌কুন্‌।

ছড়াটি পরবর্তী সময়ে সৈয়দ মুর্তাজা আলী মহাশয তাঁহার জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। নল জাতীয খাগ এবং ওয়াস্তিবের কলম দ্বারা লিখন অভ্যাস হইত। ওয়াস্তিরের কলম অর্থে হংস-পালক দ্বারা প্রস্তুত কলম। হংস-পালক উপযুক্ত রূপে কর্তন করা এক সুচারু শিল্প। সকলের দ্বারা অসম্ভব। যাঁহারা কলম কাটিতেন তাঁহাবদিগেব আদর এমত আছিল যে অধুনা যে কোনো একজন রাজনৈতিক নেতাই ঈর্ষা করিবেন। অবশ্য অধিক বিব্রত বোধ কবিবেন ইহা শুনিলে যে কী অসাধাবণ দক্ষতার সহিত আমাগণ পাঠশালে পড়া মুখস্থ কবিতাম। মাইক্রোফোন বিনা। ভাগ্যে সেইকালে শব্দ দূষণ নিযন্ত্রণ পবিষদ না আছিল। অন্যথায় আজীবন মূর্খ হইযাই জীবন কাটাইতে হইত।

উচ্চ বিদ্যালযে আসিয়া বহু বিষযে নবজ্ঞান প্রাপ্ত হই। প্রতি ঘরে এক একটি করিয়া বড় বালতি জলভর্তি রাখা থাকিত। শিক্ষক মহাশযেব টেবল-এ থাকিত একটি ফুটা পিতলের ঘটি। মহাশয় আসিযাই ঘটিটি সযত্নে বালতির জলে ভাসাইয়া দিতেন। ঘটি ধীরে ধীরে ডুবিত। আমাগণ সমানুপাতে উজ্জীবিত হইতাম। ঘটি সম্পূর্ণ ডুবিলে আমাদিগের জাগরণ সম্পূর্ণ হইত। ঘটিটির ভাসান হইতে উহার সম্পূর্ণ নিমজ্জন অবধি কাল, অর্ধঘটিকা হিসাবে বিবেচিত হইত। ঘটি ডুবিলে দেবীর ঘটক বিদায় হইতেন। আমাদিগের এক ছাত্র জলে হাত ডুবাইয়া ঘটি উদ্ধার কবতঃ তাহাকে পুনঃ টেবল উপরে স্থাপন করিয়া আসিত।

পৌষ ও মাঘ মাসেই অধিক মজা । ঘটি ডুবিয়া পড়িযা থাকিত। কেহ তুলিত না। বিশ্বচরাচরে অ-কাল ঘটিত। দিবস অর্ধ-ঘটিকা। কখনো দিবস-রাত্রি মিলিয়া অর্ধ-ঘটিকা। ফলতঃ শৈত্য প্রবাহেব দিবসগুলিতে বিদ্যালযের দপ্তরি ফটিকদাদা একখানা ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে বারান্দাগুলি ধরিয়া হাঁটিয়া আসিতেন। ফটিকদাদার ঘণ্টারোহন কাল পরিমাপ করিত প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের কক্ষস্থিত ঘটিটি। উক্ত বিশেষ ঘটিটিব উদ্ধারও ফটিকদাদার বিশেষ কর্মের মধ্যে পড়িত। মধ্যাহ্নে খাইবার ছুটি মিলিলে আমাদিগ কয়জনা ফটিকদাদাকে ঘিরিয়া ধরিতাম—'দাদা, আজ ক'বাব তুলে।' দাদা ভযানক ক্ষেপিতেন। অবশ্য এ রহস্য একদিন অনাবৃত হইযাছিল। ছোট বাইবে কবিবাব নিমিত্ত বাহির হইয়া বিদ্যালয় টো-টো-দর্শন কালে আম্মো এবং মম বান্ধবগণ দেখিয়াছিলাম—পণ্ডিত মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে ফটিকদাদা টেবলস্থ কঞ্চিটি লইযা পরম সমাদবে, প্রচুর কাঁৎ-কোঁৎ ঘাঁৎ-ঘোঁৎ করিযা বালতি হইতে ঘটি উদ্ধার করিতেছেন। লেকিন তৎকালে যেইসকল শব্দবন্ধ তিনি ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহাসকল যেই বর্ণপরিচযেব অন্তর্ভুক্ত তাহা আমাদিগের পাঠ্যসূচী বহির্ভূত আছিল। অদ্যাবধি ফটিকদাদা মম ধন্যবাদার্হ আছেন। হেতু এই যে, ইফ্ ফটিকাদাদা উক্ত শব্দবন্ধ অব্যবহার করিতেন, দেন্ আম্মো কদাচ পাঠ্যবহির্ভূত পুস্তক পঠনে আগ্রহী না হইতাম। মম সহপাঠীগণ যেইকালে মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযের 'জাপানী ফানুষ' পড়িয়া ও-লালা হইতেছিলেন, সেই কালে মুসুমুসু ইসমাইল হোসেন শিবাজীর "প্রেমাঞ্জলি" সম্পূর্ণ কবেন। 'প্রেমাঞ্জলি'র সহিত সেইকালে গীতাঞ্জলিব তুলনা ঘটিত অহরহ।।

শুরু হল **পত্রপাঠ**-এর প্রকাশন যাত্রা

‘কইতে কথা বাধে’ বেধে যেতে সমরেশ মজুমদার লিখতে লাগলেন **‘অকপটে’**। কাউকে ছেড়ে কথা না বলা চূড়ান্ত বিতর্কিত সেই বই—

অকপটে ৩৫৲

সমরেশ মজুমদার

পত্রপাঠ-এ প্রকাশিত সরস গল্প—মনোজ বসুর অপ্রকাশিত গল্প থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু পালিত, নবনীতা দেব সেন, সমরেশ মজুমদার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়—কে নেই!!

পত্রপাঠ সহর্ষ গল্প সংগ্রহ ৩৫৲

মাত্র ৮০ টি। আপনি আসা পর্যন্ত থাকবে কি? পত্রপাঠ প্রথম সংখ্যা থেকে (আগস্ট. ২০০০) জানুয়ারি ২০০২ (দুটি শারদীয় সংখ্যা সহ) সুদৃশ্য বাঁধাই সংস্করণ

পত্রপাঠ সংকলন ১৪০৲

পত্রপাঠ প্রকাশন
১০জে, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, ফোন : ৪৪০-৩৮০৩

বইমেলা স্টল নং-৯৪৮ (পার্ক স্ট্রিট মেন গেট)

পত্রপাঠ এখন ৮

পত্রপাঠ-এর দাম মারা গেছে। অনেকেই বলছেন। এক্কেবারে নট নড়ন-চড়ন। একমাত্র মৃতেরাই স্থির ও অবিচল। যুক্তি খণ্ডন করার উপায় নেই। তাই তাকে ঘাট থেকে ফেরাতে ৮-ঘাট বাঁধতেই হল। পত্রপাঠ এখন আট, মরবে কেন, বালাই ষাট!!

পত্রপাঠ জবাব চাই

নবনীতা দেব সেন

পত্রপাঠ জবাব দিন
আছেন কোথায় লাদেন বিন?

জ্যোতিষ, তন্ত্র সম্মেলন
এই বিষয়ে বাক্যি কন।

কিসের জ্যোতিষ, কিসেব তন্ত্র
ধরতে পারার নেইকো মন্ত্র

জগৎ জুড়ে কী হৈ চৈ
বশীকরণ হচ্ছে কৈ?

জঙ্গি হানে দিগ্বিদিক
তন্ত্র জ্যোতিষ জবাব দিক।

পত্রপাঠ জবাব চাই
বিশ্বে কেন শান্তি নাই?

লক্ষ্যভেদ

বাংলা অথবা বিশেষ করিয়া হিন্দি চলচ্চিত্রে আমরা বহু সময়ই শ্বাস রোধ করিয়া দেখিতে পাই অপরাধী বা খলনায়ক দ্রুতগতির কোনো যানে চড়িয়া পলায়নে তৎপর এবং নায়ক দৌড়াইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার পর বহু প্রকার পন্থার সাহায্য লইয়া অবশেষে নায়কের জয় আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কলকাতার পুলিশের কাছে কি আর আমরা অতটা আশা করিতে পারি? আর সেই জন্যই এক পুলিশ কনস্টেবল এক অপরাধী ট্যাক্সিচালককে ছুটিয়া ধরিতে না পারিয়া মাথার হেলমেটটিকেই ছুঁড়িয়া মারিযাছেন। ফলবশত সেই হেলমেটের আঘাতে ট্যাক্সির কাচ চুরমার হইয়া ভিতরের নিরপরাধ যাত্রীরা আহত হইয়াছেন। এ যেন সেই প্রবাদেব ন্যায ঝিকে মেবে বৌকে শেখানো। যাত্রীকে মারিয়া ট্যাক্সি চালককে শিক্ষা দেবার চেষ্টা। কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, এই ভাবে হেলমেট ছুঁড়িবার অধিকাব পুলিশকে কে দিয়াছে? কিন্তু পুলিশই বা কি করিবে? তাহার হাতে তো আর বন্দুক ছিল না যে অপরাধী ট্যাক্সিচালকের গাড়িব চাকা লক্ষ্য কবিযা গুলি ছুঁড়িয়া তাহাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিবেন। যদিও আমাদের বীরপুঙ্গব পুলিশদের এমনই লক্ষ্যভেদ করিবাব ক্ষমতা যে তাহারা পথের আন্দোলনে গুলি ছুঁড়িয়া জনগণকে ছত্রভঙ্গ কবিবাব চেষ্টা করিলে দোতলার জানালায় দণ্ডায়মানা গৃহবধূ নিহত হন। সেই তুলনায় উক্ত পুলিশ কনস্টেবলটিকে তো প্রশংসার্হ বলিতে হয়, কারণ তিনি চলন্ত ট্যাক্সির জানালায হেলমেটটিকে লাগাইতে পারিয়াছেন অনায়াস দক্ষতায। তিনি ট্যাক্সিটিকে যেন তেন প্রকারেণ থামাইতে চাহিযাছিলেন এবং সেই লক্ষ্য তিনি ভেদ করিয়াছেন। ট্যাক্সিব আরোহীদের চিৎকারে ট্যাক্সি থামিয়াছে, যদিও অপরাধী ট্যাক্সিচালক পলাতক। তা হোক, কান টানিলেই মাথা আসিবে। ট্যাক্সির লেজ ধরিয়া টান মারিলেই ট্যাক্সিচালক সুড়সুড় করিয়া আসিযা ধরা দিতে বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং বন্দুকের বদলে পুলিশকর্মীদের বেশি করিয়া হেলমেটই দেওয়া যাইতে পারে কিনা ভাবিয়া দেখা হইতেছে।

—অঞ্জনা দত্ত

মুক্ত অ-চিন্তা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আজকাল ছেলেরা খুব জিমনাসিয়ামে ভর্তি হচ্ছে। হৃতিক বোশন নামে যুবক হাতের গুলি দেখিয়ে অল্পবযেসী মেয়েদের খুব টেনেছে। অবশ্য বেশি বয়সের মেযেরাও পুরুষদের স্বাস্থ্য মনে মনে পছন্দই করে। তবে বেশিরভাগ রমণী "পহেলে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারি।" আসলে মেযেরা এতদিন রোগা হোক মোটা হোক সুন্দর সুন্দর পুরুষে আকৃষ্ট হত বেশি। এমন তারা ব্যায়াম করা যুবাপুরুষকেই পছন্দ কবছে। অর্থাৎ হৃতিক রোশন সাধারণভাবে ব্যাযাম বিমুখ বাঙালি যুবকদের, সন্ধ্যায় রাস্তার মোড়ে শিস দেবার জন্য অপেক্ষা নিবত যুবকদের, পেশী আসক্তির রাস্তাটা দেখিয়েছে। আমি হৃতিক ছেলেটির কোনো ছবি দেখিনি। এই কারণেই নাতনির বযসী মেযেবা আজকাল আমায় পাত্তা দেয় না। প্রথমত 'নন্দন প্রেক্ষাগৃহ' ব্যতীত আমি গত দশবছরে (দু-একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া) কোনো সিনেমা দেখিনি। টিভি তো পুত্রদের অধিকারে। তাই দেখি না তেমন। তবে টিভির অনুষ্ঠানে অবশ্য অংশ নিতে মাঝে মাঝে যাই, কিন্তু পরে ছোট পর্দায় নিজের মুখ ও টাক দেখতে এত খাবাপ লাগে যে তাও আজকাল দেখি না। তবে ছেলেরা বাড়ি না থাকলে এবং একেবারেই কোনো কাজ না কবাব থাকলে, কখনো কখনো চালাক মানুষকে বোকা বানাবাব ঐ টি.ভি নামক বাক্সটি খুলি। এভাবেই মূলত নৃত্যরত পেশী উথ্লানো হৃতিক বোশন ছেলেটির ঈর্ষণীয় ফিটনেস সহ দর্শনীয় শরীর কয়েকবার চোখে পড়েছে। ছেলেটি নাচতেও পারে নাকি অসম্ভব ভালো, পাড়াব ছেলেবা আমাকে বলেছে।

বহুকাল হল হিন্দি সিনেমায় নাচ উঠে গেছে। নাচের নামে যা হয় তা নিছক অ্যারোবিক এক্সারসাইজ। সরোজ খান নামের এক মহিলা এইসব উম্মাদ কসরতের নির্দেশ দিয়ে খুব নাম করেছেন। তিনি নিজে এতই স্থূলাঙ্গিনী যে তাঁকে অবিলম্বে শারীরিক শোধনাগারে পাঠানো দরকার। এখন শুধু নায়ক-নায়িকার দ্বৈত নৃত্য নয় সঙ্গে অন্তত আবো দশ-বিশজন থাকা চাই। নাযক নিজে নেচে বা ব্যায়ামে যা দেখাচ্ছেন, তাঁর পুরুষসঙ্গীরা তাই হুবহু অনুকরণ করছে।

মেয়েদের বেলাযও তাই। নায়িকাদেব কবা নাচের মতো ব্যায়াম বা ব্যায়ামের মতো নাচেব নকল করবেন। তাঁদের সঙ্গিনীরা। আমি নিজে সিনেমা তৈরিব সুলুক-সন্ধান কিছু কিছু জানি। তপন সিংহের দু-একটা ছবি, (আমাব ভাই প্রয়াত বলাই সেন তপনবাবুর মূল সহকারী পরিচালক ছিলেন) সত্যজিৎবাবুর নায়ক-এর পুরোটা, এবং আমার ভাগ্নে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর নাচবিহীন স্যুটিং দেখেছি।

আরো পেছালে অতীতে দেবকী বসুর দু-একটি ছবি আমার বন্ধু এবং শ্যালক নিতু সেনের কল্যাণে দেখেছি। এতে আমার কোনো অকল্যাণ হযনি। বরঞ্চ লাভই হযেছে। কী করে স্ক্রিপ্ট লিখতে হয তাব একটা সম্যক ধারণা হয়েছে। তা এতসব দেখে সুনিশ্চিত মনে হযেছে সিনেমায মেঝেতে চকখড়ি আঁকা এলাকায় ঘুরেফিরে অভিনয় করার চেয়ে মঞ্চে অভিনয অনেক বেশি কঠিন। ছবি বিশ্বাস তো সিনেমাকে বলতেন ডেড আর্ট। আমরা অবশ্য তা নাই বিশ্বাস করলাম। আমি নিজেও একাধিকবাব কাব্যনাট্যসূত্রে মঞ্চে এবং বেডিওতেও অভিনয় করেছি। আমার এই শখ অনেকদিন চলেছিল ষাট এবং সত্তর দশকে। পরে বুঝেছিলাম, ওটা আমার প্রকৃত কৃত্য নয়।

কী যেন বলছিলাম। না না, লিখছিলাম। ও হ্যাঁ, হৃতিক রোশন। তাঁর শরীরেব বোশনইতে অনেক মেযেই নাকি ঠাণ্ডা উষ্ম। দেখতে সুন্দব পুরুষদের আকর্ষণকে যদি মৌন আকর্ষণ বলি, তবে দেহ-রোশনাইকে যৌন আকর্ষণ বলা যেতে পারে কি? যৌন আকর্ষণ শুধু মেযেদের দেহে থাকবে, পুরুষদের অঙ্গে থাকবে না, এটা সম্ভবত সৃজনকালে বিধাতার মনে ছিল না। শুধু শবীরই বা বলি কেন, লিখনেও মেয়েরা কত চাম্পিযান যৌনতা দেখাতে পারে, তা আমরা এই উপমহাদেশেই এক বাধ্যতামূলক কারণে প্রবাসিনী বাঙালি নাবীব মুখে, না মুখে নয়, কলমে দেখেছি। বইটি আমি বিশ্বস্ত সূত্রে পড়েছি। মাঝে রিভিউ পড়েছি। তাতে সমালোচক তুচ্ছ যে-ক'টি উদ্ধৃতি খেলা বা লেখাচ্ছলে দিয়েছেন তাতে মনে হয়েছে, দেশে ছোকরাদেব আর সুরেন বাঁড়ুজ্জে রোডে যেতে হবে না।

না, সাহিত্যে প্রয়োজনীয় যৌনতার বিরোধী নই আমি। অনেক আপাত যৌন অথচ একই সঙ্গে মহান লেখা কি আমরা আগে পড়িনি? জাঁ জেনে, হেনরি মিলার, সাঁদ— কত নাম করব? আমাদের পুরাণ সাহিত্যের অনেকানেক বচনায অলংকার হিসাবে কি যৌনতা উপস্থিত নেই? কালিদাস কি শুধুই বলাহক বিলাসী? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক কমলকুমার মজুমদাবেব 'অন্তর্জলি যাত্রা'র ডোম ও সদ্য বিধবার মধ্যে কি অসহায যৌনতা সঙ্গত আকর্ষণ হয়ে আসেনি? আজকাল তো কাগজের সঙ্গে সাবান, শেভিং ক্রিম, ব্রাশ দেওয়া শুরু হয়েছে। জানি না পাঠক-পাটিকার অন্তরে পৌঁছানোর জন্য ভবিষ্যতে অন্তর্বাসও দেওযা হবে কিনা। আসলে টি. ভি ক্রমশই পাঠক কেড়ে নিচ্ছে দেখে সাহিত্যের কাগজের সঙ্গে দেওয়া লোভানিগুলি টিভিকে কাউন্টার অ্যাটাক কিনা বুঝতে পাবছি না।

আসলে আমাব লেখার কোনো বিষয়বস্তু নেই। কিংবা যৎকিঞ্চিৎ সিঞ্চন থাকলেও বস্তু একেবাবেই নেই। বস্তুকে ক্রমাগত বিযয করতে চেযে যা ইচ্ছে তাই অর্থাৎ যাচ্ছেতাই কবে তুললে ক্রমে সমস্ত ব্যাপাবটাই অবাস্তব হযে ওঠে। আসলে হৃতিকের ছলে বা ছুতোতে এই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র অঙ্কবগুতো। হৃতিকের নামেব অর্থটা ভালোই, এই লেখার ভালো-মন্দ কোনো অর্থই নেই।

চরণ বৈরাগীর

ইকড়ি মিকড়ি

গ্রন্থগ্যাঁড়া

মাধুকরী যার জীবনবৃত্তি, স্থায়ী আস্তানাব আকাঙ্খা তাব কাছে অবাস্তব। এ-ঘাটে, ও-পাড়ায়, এ-ঘরে, ও-শহরে এই ঝুগ্নি ওই ঝুপড়ি করেই কেটে গেছে দিন মাস বছর। সম্প্রতি ঝুপড়ি উচ্ছেদের কল্যাণ-কল্পনা চলছে। স্বাধীনতার জন্য কোটি মানুযেব উচ্ছেদ হতে পারলে, প্রগতির বা গণ উন্নতির ট্যাঁড়া বাজাবার জন্য হাজার কযেক উচ্ছেদ তো মামুলি। জবরদখলকারীরা ভোটজনতার অগ্রগতির জন্য বলিদত্ত। এতে আপত্তি করার কী থাকতে পারে। কিন্তু বছরের ধারাপাত গুণতে গুণতে বৈরাগীর বৈভব বলতে কিছু পুঁথিপত্র। সেই দুর্লভ সম্পদের স্থিতি-ব্যবস্থা করতে গিয়ে অনেক বিস্ময়ের পরিচয় মেলে। কিছু কিছু বই দেখে চমকে উঠতে হয। এরা ছিল নাকি। কী মধুর চমক। আবার দেখি, কিছু বই নানা সুহৃদ জনের, লাইব্রেরির। মাধুকরীতে কি উপহার দিযেছিল? ভুলে গিয়েছিলাম? ফেরৎ দেওয়া হয়নি? লজ্জার চমক।

লজ্জায কিন্তু অবগুণ্ঠিত হওযা গেল না। কিছুদিন আগেই খবরের কাগজে পড়েছি, জাঁদরেল মন্ত্রী, আমলা, পুলিশের হর্তাকর্তারাও নাকি সরকারের গ্রন্থাগার থেকে বই নিযে ফেরৎ দেননি, দিচ্ছেন না। কোনো কোনো লজ্জাহীন দামড়া আমলা গলা ফুলিযে ঘোষণা করলেন, "আমার মনে পড়ছে না, ওরা বইয়ের তালিকা দিক।"

জানতে ইচ্ছে কবে, এঁদের গৃহিণীবা ছেলেমেযে বাড়ি ফেরেনি বললে, আমলা মশাই জানতে চান কি, কার ছেলেমেয়ে, কোন ছেলেমেযে, নাম বলো। এমন পুলিশকর্তা ও মন্ত্রী আছেন বলেই গর্বের সঙ্গে বলা যায়, আমাদের দেশ বোফর্স মামলার দেশ, তহলকা কাণ্ডের দেশ, সুখরামের দেশ, শহীদ জওয়ানেব কফিনের কমিশন খাওয়ার দেশ। এবং আমাদের দেশ মহান।

আগুনখেকো নেত্রী অবশ্য মাছি তাড়ানোর মতো কবে মন্তব্য করলেন, ও সামান্য যাট-সত্তর লাখ টাকা। জিজ্ঞাসা জাগে, কত টাকা গ্যাঁড়ালে তবে গ্যাঁড়াবাজ বলা চলে, আব গ্যাঁড়াবাজেদের প্রতি কত মমত্ব থাকলে তবে মমতাময়ী হওয়া যায়?

এই বৈরাগীর অধম পরাণ লজ্জায় আতুর। তা কাতরতায পৌছায এই দেখে যে, অনেক সুজন-স্বজনের নাম-ঠিকানাও হাবিয়েছি। দু'একজনকে মনেও করা গেল না। আবার স্মৃতিতর্পণও কবা গেল বহুদিন গতায়ু বন্ধুর স্বাক্ষবিত গ্রন্থ দেখে। শুনেছি অনেক বিখ্যাত মনীষীদেব গ্রন্থাগাবেও নাকি মাধুকরীলব্ধ বই পাওয়া গেছে। সবিনয়ে জানাই, 'মাধুকরী' আর যাই হোক, গ্যাঁড়ানোব প্রতিশব্দ নয। তবে বই গ্যাঁড়ালে নাকি দোষ নেই। আমার এক বন্ধু অবশ্য চিবকাল অবিচল বলে এসেছে, চুমুব মতো বইও চেয়েচিন্তে চাখতে হয়। অত বই কেনা সম্ভব নাকি? কেউ যেন জিজ্ঞাসা না করে, কত চুমু চাখলে পবে চাকলাদাব হওয়া যায়। বন্ধুকে বলেছিলাম, বই গ্যাঁড়ালেও থাকে, চুমু তো পরমুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন। ও বলেছিল, ঐ জন্যই চুমুর কোনো লাইব্রেরি নেই।

কুসুম মাসি আমাদের ঝুপড়ি-পাড়াতেই থাকে। আমার ঝুপড়ি ঘযামাজা করে। কেবলই বলে, অ্যাত্ত জঞ্জাল জমিয়ে কী হবে বলো দেখি। বেচলেও দুটো পযসা পেতে।

ওকে বোঝানো যায় না, বই আবর্জনা নয, অ-বর্জনীয় আহবণ। আমার ভাঙা ঘবের নিওনবাতি। কুসুমমাসির শরীর খারাপ বলে ওর ছেলে কাঙালি আমাকে সাহায্য কবে পুস্তক পুনর্বাসনে। এই প্রক্রিযার মধ্যেই আবিষ্কার কবেছিলাম, দ্য কালচারাল হেবিটেজ অব ইণ্ডিয়াব চার খণ্ডই বহাল আছে। চৌযট্টি সালে সংগ্রহ করেছিলাম, নগদ মূল্যে। গত কুড়ি বছরে এদেব অস্তিত্বই মনে পড়েনি। সযত্নে ঝেড়েঝুড়ে রাখি বিছানার পাশে স্তূপীকৃত খবরেব কাগজের ওপব। যথা সময়ে আবাসনেব ব্যবস্থা করব। ঘব খোঁজা, যৎসামান্য তৈজসপত্রর গমন-আযোজনে মগ্ন থাকায খেযাল করতে পারিনি যে ঘরেব মধ্যেই ভ্রমণ চিকীর্যার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

চার খণ্ডের ওই দুর্লভ সংগ্রহ স্থানান্তরিত করার জন্য খুঁজতে গিযে দেখি ওবা নেই। সাবা ঝুপড়ি তন্ন তন্ন। গ্রন্থ চতুষ্টয নিরুদ্দেশ। কোন দুষ্টের কীর্তি? নিরীহ প্রাচীন গ্রন্থের সঙ্গে শিল্পপতি—খাদিম বা এক্সাইড—কারুরই কোনো সম্পর্ক থাকাব কথা জানা নেই। তবে? নিষ্ফল খোঁজাখুঁজিতে ঘাম, উষ্মা, শুষ্ক কণ্ঠ।

কাঙালি ঘরে ঢুকে বলল, কী হযেছে? এমন কবতিছেন ক্যান?

বললাম, ওখানে বাখা চারটে বই পাচ্ছি না।

কাঙালি বলল, মোটা ভাবি রংচটা বই?

মাথা নাড়ি,—হ্যাঁ, সাঁইত্রিশ বছব পুরানো।

এক গাল হেসে কাঙালি বলল, সে আমি দেখেই বুঝেছিলাম।

—তাব মানে?

—ওগুলো তো তোমার কোনো কাজে লাগতে ছেলনি, আমি বেচে দিযেচি চল্লিশ টাকায়। এখানেও পড়েছেল, ওই দোকানেও পড়ে থাকবে। তবে জানো দাদা, ওই টাকার ওষুধ খেযে মা সেবি গেছে। কাল থেকে কাজে আসবে।

আমাব মুখে কোনো কথা আসে না। আমি অপলক কাঙালিকে দেখি। ওর মুখের বিভাময সলাজ হাসি আমার শুকনো কণ্ঠ বসসিক্ত করে তোলে, যাকে বলা যায়—কণ্ঠে আমার অশ্রু।

"পলকে সকলই সঁপেছি চবণে, আব তো কিছুই নাহি!"

ন্যাকা

বিষ্ণুজ্যোতি রায়

কব্‌তে যে কেন লেখা
চুপি চুপি একা একা
কখনোই কোনো কাজে লাগে না,
কব্‌তের রঙ নেই রস নেই
আলুভাতে আলুনি—
    নেই কোনো গন্ধ।

ছাতাপড়া ভ্যাদ্‌ভেদে
প্যাচ্‌পেচে ম্যাদামারা
আধুনিক কবিতার নেই ধার নেই ভার
নেই কোনো মানে তার
    নেই কোনো ছন্দ।

কব্‌তে যে কেন লেখা
ম্যাগাজিনে কেন ছাপা
নিজে লিখে নিজে ছেপে
নিজে পড়া বার বার—বুঝি না।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
কেন মিছে চ্যাঁচামেচি
লিখেছি যা পাতা পাতা
নেই ছাতা নেই মাথা
কোনোদিনও তার মানে খুঁজি না।

নেই কাজকম্মো
ধম্মের ষাঁড় এক
সাধ ছিল মনে মনে
কোনোদিন কোনোকিছু
অঘটন—ঘটানো।

কবিতাই সোজা পথ
লিখে যাই পত্ পত্
ছেপে বই-পত্তর নন্দন চত্বরে
লালিপপ মেয়েদের—পটানো।

লিখেছিনু কব্‌তে
ফুটফুটে জোছ্‌নায়
খুটখুটে বনতল
সুমধুর কেকারব
তুমি আর আমি শুধু—একা।

সেই ছিল শেষ কথা
সে আমার বনলতা
সে আমার নীরা, মুখ বাঁকিয়ে
হিল তুলে বলে গেল—ন্যাকা।

সিদ্ধিদাতা ঠাকুর

নিঃস্বানন্দ ভারতী

আমাদের   রবীন্দ্রঠাকুর
আমাদের   কলসিভরা গুড়
তার   কপিরাইট পেলে
মোদের   ডোলে হৃদয় ডোলে
মোরা   ফিরে ফিরে বেচি তারে নিত্যই নূতন।
মোদের   বেওসা ফাঁদার মেলা
মোদের   দাদাগিরির খেলা
মোদের   গুরু বেচার টাকা গোনা দুপুর-রাত্রি বেলা।
মোদের   গণেশ ঠাকুর রবি
মোদের   সব পেয়েছির কবি
মোদের   সদাই রাখেন খুশি—মোরা রবীন্দ্রসূদন।।
মোরা   তাঁরেই খুঁড়ে খুঁড়ে
উড়ি   যশের এখো গুড়ে
মোদের   স্বার্থমাঝে শনির গিটার বেঁধেছি তার সুরে।
মোদের   ছুঁচোপনার মানে
বুড়ো   একটুও না জানে
মোদের   অলস মাথার সঙ্গে নিজেই বেঁধেছে বন্ধন।।

মহিলা মহল

‘ফিস-ফিস’ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : **প্রাণঘাতিনী দেবী**

● ব্রণ বেরোনো নাকি যৌবনের লক্ষণ। আমার তো মনে হচ্ছে, ব্রণ হল যৌবনের শত্রু। দিন যতই বাড়ছে, ওরাও ততই আমার মুখে দলে ভারি হচ্ছে। কত ডাক্তার দেখালাম, কত ক্রিম মাখলাম, ফেস ওয়াশ, লোশনের শ্রাদ্ধ করলাম। ব্রণরা আর আমার মুখের মায়া কাটাতে চায় না। রাস্তায় ছেলেদের দিকে লজ্জায় চাইতে পারি না। এখন তুমিই অন্ধের শেষ সম্বল। কি করব বলে দাও না, প্লিজ।

—সুমেধা সেনাপতি, বিড়া, উঃ ২৪ পরগণা।

□ বনজ মধু যেমন আকর্ষণীয়, ব্রণজ প্রেমও তেমনি আদর্শ স্থানীয়। দেখবে, এই ব্রণর টানেই অনেকে ঘন হওয়ার চেষ্টা করছে। চোখ-কান খোলা রাখো, যাতে সময়মতো গেঁথে ফেলতে পারো।

● আমার সমস্যাটা জল নিয়ে। আমার পাঁচ বছরের দুই যমজ ছেলের বদভ্যাস আছে, প্রতি রাতে তারা একেবারে নিয়ম করে বিছানা ভেজাবেই। বিছানায় শোয়াতে যাওয়ার আগে করিয়ে নিই, তবুও। এজন্য স্বামীর সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। জল বন্ধ করার একটা টোট্‌কা বলে দাও না প্রাণঘাতিনীদি।

—মানবী মুহুরি, বীরেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা

□ আপনার ছেলের নাম কি ব্রহ্মপুত্র আর দামোদর?—এত জল ছাড়ছে যে বাপ্ মায়ের সম্পর্কটাই ভেসে যাচ্ছে?

● ভারি সমস্যাতে ফেঁসে গেছি। অফিসের হাফবুড়ো বড়কর্তা আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ছে। এদিকে তাঁরই অজান্তে তাঁর ছোটভাই-এর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে। কী করি?

—মালিনী মৈত্র, হাটখোলা, বারাসত।

□ দাদা আছেন আকাশে, ভাই তাঁর মাটিতে। বাকি রইল জল। সেখানেই আপাতত গলা ডুবিয়ে বসে থাকো। হ্যাঁ, বড় শীত এখন, যথেষ্ট গরম জামাকাপড় আগেভাগে পরে নিও কিন্তু; নইলে আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

● মেয়েদের স্কুলে জীবন বিজ্ঞান পড়াই। কিছুদিন আগে একটা দাঁত তুলেছিলাম। তারপর থেকে সবসময়ই মনে হচ্ছে, আমার আলজিভটা আরো ছোট হয়ে আসছে। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখি, নিচের মাড়ির সব কটা দাঁত খুলে অমার হাতে চলে এসেছে। এর মধ্যেই আমার স্বামী ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় বিয়ে করব কি?

—রূপসী মিত্র, শেঠপুকুর, মধ্যমগ্রাম.

□ তেমন বুকের পাটাওয়ালা পুরুষের সন্ধান পেয়েছেন বুঝি?

● আমাদের পাড়ার পুটুকে আমার ভালো লাগে, আমাদের পাড়ার তানিয়াকে আবার পুটুর ভালো লাগে, তানিয়ার আবার গণুকে ভালো লাগে, গণুর আবার আমাকে ভালো লাগে—সব কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কী করি বলুন তো? *—মৌমিতা দত্ত, মানকুণ্ডু, হুগলী*

□ বাজারে বিশুদ্ধ নারকেল তেল পাওয়া যায়। ভালো করে মাখিয়ে চিরুনি চালালে জট ছেড়ে যাবে।

● আমি হাউস ওয়াইফ। বাচ্চাকাচ্চা নেই, বাড়ির কাজ সেরে বাকি সময়টা আর কাটে না। একটু কাজের সন্ধান দিতে পারেন?

—অতসী মুখার্জী, কলকাতা-১০

□ ডোর টু ডোর “পত্রপাঠ” বিক্রি করুন।

● প্রাণঘাতিনীদি, আমি এক অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছি। পবন নামের একটি ছেলেকে আমি ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। ওর সব ভালো, শুধু নামটা ছাড়া। ‘পবন’ বললেই আমার মনে হয় হনুমানের বাবাকে ডাকছি। ইস্, কী বিচ্ছিরি। কত অনুরোধ করেছি কোর্টে এফিডেবিট করে নামটা বদলে ফেলতে। কিন্তু পিতৃদত্ত নাম ও কিছুতেই পাল্টাবে না।

—অঞ্জনা সাহা, বারাসত, উঃ ২৪ পরগণা

□ এঃ হে! নিজের নামটার দিকে কখনো খেয়াল করোনি? এমনকি তোমাদের ছেলে হবার পর নাম বাছাইয়ের ঝঞ্ঝাট পর্যন্ত পোয়াতে হবে না। সেও নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। তুমি ভাগ্যবতী।

বইরাগ

কৌশিক রায়

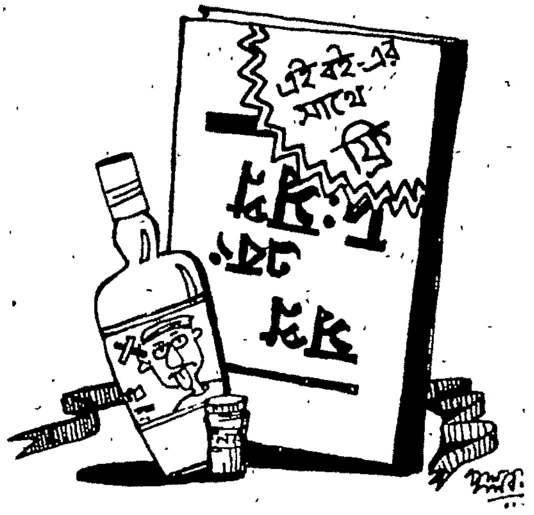

—এই যে দাদা। এখানে কোনো বইটই পাওয়া যায়?

—টই আবার কি? হাতে মাখে, না মাথায় দেয়? না কি কোনো নতুন লিপস্টিক? আর বই? কেন, চোখে ঠুলি পরে রয়েছেন নাকি? দেখছেন না, সাইন বোর্ডে ড্যাবা ড্যাবা হরফে লেখা আছে ‘সুভাষের বই-এর দোকান’।

—ওঃ হো। একদম দেখতে পাইনি, ক্ষমা করবেন। তা, এই মোটা বইগুলো বেশ প্যাকেট করে সাজানো রয়েছে দেখছি, এগুলোর সঙ্গে কৌটোগুলো কিসের?

—এই বইগুলো এখন হটকেকের মতো বিক্রি হচ্ছে দিদি। নাম হল—“কীভাবে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন দেখবেন”। লেখক বিপদকৃষ্ণ ঘোষ। আগে জলপাইগুড়ির রাজাভাতখাওয়াতে কাঠের বিজনেস করতেন। হঠাৎ একদিন দু'বোতল চোলাই খাওয়ার পর রাতে মহাদেবকে স্বপ্নে দেখেন। তিনিও তখন ককটেল খেয়েছিলেন। বাবারই আদেশে বিপদকৃষ্ণবাবু বিজনেস শিকেয় তুলে স্বপ্ন দর্শনের বই লিখছেন। কী নেই এতে, দিদি। স্বপ্নে কোন রং-এর চুল বাঁধার ফিতে দেখলে কোন ধরনের মেয়ের সঙ্গে ‘ইয়ে’ হতে পারে, ফুচকার খালি বাক্স দেখলে চাকরির ইন্টারভিউতে কিরকম স্ট্যাণ্ড করতে পারবেন, পেট ছাড়িয়ে ফুলপ্যান্ট পরা, খালি গা অধ্যাপকের স্বপ্ন দেখলে কি ধরনের জামার দোকান করতে পারবেন, ঝাঁটা আর খুন্তির স্বপ্ন দেখলে কত তাড়াতাড়ি ডিভোর্স করতে পারবেন—সবকিছু পেয়ে যাবেন দু' মলাটের এই আড়াইশ পাতার বই-এর মধ্যে। এখন তো ময়দানে বইমেলাতে সব কাস্টমার সটকে পড়েছে। তাই এই কলেজস্ট্রিট এখন সুনসান। নিয়ে নিন, সাড়ে পঁচিশ পারসেন্ট ছাড় দিয়ে দেব।

—ঠিক আছে, দেখছি। কিন্তু বইগুলোর সঙ্গে প্যাক করা এই কৌটোগুলো কী ভাই?

—আরে, তাও বুঝলেন না? ওগুলো হল খাঁটি মাদ্রাজ নস্যির কৌটো। প্রতিটি কপির সঙ্গে একশ গ্রাম করে ফিরি। মানে বিনা পয়সায়। কোন সাহিত্যিক যেন বলেছিল না—নস্যি না নিলে বইও পড়ে বুঝতে পারা যাবে না—ভালো স্বপ্নও দেখা যাবে না। তাই আমার এই স্কিম। সকলে তো বই-এর সঙ্গে প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে শেভিং ক্রিম, দাড়ি কামানোর ব্রাশ, হজমিগুলি, গরম মশলার প্যাকেট দেয়। তাই আমি বিপদকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে এস্পেশাল পরামর্শ করে গিনিমাগনা নস্যি গিফ্‌ট দিচ্ছি। দেখুন না, আমি নিজেও বইয়ের আদর্শ দোকানি হওয়ার জন্য নস্যি দিয়ে দাঁত মাজা ধরেছি। এই নস্যি আর বই-এর কল্যাণেই তো বসিরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের হেডক্লার্কের অমন উপরি পাওনার পোস্ট ছেড়ে বই-এর দোকান দিয়েছি। তিন মাসেই একেবারে লালে লাল। কোন উজবুক বলে বই-এর বেওসাতে প্যান্টের পিছনে তাপ্পি পড়ে যায়? বউ দেওরের সাথে ভেগে যায়? এই দ্যাখেন, বেংলিশ মেয়েরা এখানে সব পড়তে আসে তো? ওরা আবার বাংলা বই দেখলে রঙকরা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—“অ্যা মাই গ্যাড, হোয়াট রাব্বিশ।” তাই, বিপদকৃষ্ণবাবুর স্বপ্ন দেখার বইটার ইংরেজি পেপারব্যাক অনুবাদও বের করেছি।

—এগুলোর সঙ্গে একটা করে ছোট বোতল দেখছি। ঘি বা মধুর শিশি নাকি? সোঁদরবনের রয়্যাল হানি?

—দূর দূর, কি যে বলেন না মাইরি। এ হল গিয়ে আসলি গম আর যব-পেষাই মধু। ইংলিশ বই তো। তাই তার সঙ্গে পঞ্চাশ মিলিলিটার হুইস্কির বোতল ফিরি। ওই মাল খেলেই ব্যস, বিছানাতে চিৎপটাং হয়ে যত্রে ইচ্ছে সপ্‌নো দেখতে পারবেন। বাংলা বইটার সঙ্গে বাংলা হাঁড়িয়া বা চুল্লুর বোতল বিনাপয়সায় দিতে পারতাম। কিন্তু গরমেন্ট আবার ওপেন রোডে বাংলা চোলাই বন্ধ করে দিয়েছে।

—আচ্ছা বাংলা সাহিত্যের গৌরব তো রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, আশাপূর্ণা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়—এঁদের লেখা বই আপনার দোকানে দেখছি না কেন?

—আপনি সেই মান্ধাতার আমলের ক্যাবলাদিদি মাইরি। নিশ্চই কোনো গার্লস স্কুলে বছরকে বছর জবাফুলের রং কিরকম, পুংকেশর কাকে বলে, বা পানিপথের যুদ্ধ স্থলপথে হয়েছিল কিনা—এসব পড়িয়ে বেড়ান। ঘিলুটা তাই ডিপ ফ্রিজে চলে গেছে। আরে, লাইফ এখন ফাস্ট হয়ে গেছে। ওসব ‘নৌকাডুবি’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘আনন্দমঠ’-এর মতো গাব্দা মার্কা বই কে আর পড়ে বলুন দেখি? কলকাতা বইমেলাতে যান একবার সেখানেও দেখবেন স্টলে স্টলে রবিবাবু, শরৎদারা শুধু ময়দানের ধুলো খাচ্ছেন। গেল

মাসে একসেট রবীন্দ্র রচনাবলীর অর্ডার এসছিল। যে মালটা কিনল সে, এক গামলা মার্কা মারোয়াড়ি। পোস্তাতে সুতোর বেওসা আছে। অনেক বাঙালি বিজনেসম্যানের সঙ্গে লেনদেন হয় কিনা। তাই ড্রয়িং রুমের বুকশেল্ফে রবীন্দ্রনাথের বই থাকলে বেওসা আরেকটু ভালো জমতে পারে আর কি। সে নিজে এক বর্ণও বাংলা জানে না। কী কেলো।

—শুনে খুবই দুঃখ পেলাম। যাঁদের হাতে বাংলা সাহিত্যের হাতেখড়ি, তাঁরাই আজ ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছেন।

—গড়াগড়ি কি বলছেন দিদি। তেনাদের এখন লাথ মেরে বই-এর বাজার থেকে আউট করে দেওয়া হয়েছে। গতবার পুজোতে ভূতনারায়ণ রায়ের লেখা "আমি সিরাজের বাঁদী" বইটা দেড়হাজার কপি সেল হয়েছে। সঙ্গে অবশ্য দশখানা ফিরি রঙিন ফটো ছিল। 'আনন্দমঠ' নিয়ে এসেছিলাম একশ' কপি, বিক্রি হল মোটে একটা।

—কে কিনলেন?

—একজন ভদ্দরলোক। ওনাদের ওখানে বেজায় লোডশেডিং চলছে। তাই ওনার মেয়েদের মোমবাতিতে পড়াশোনা করতে হয়। টেবিলের ওপর গলানো মোম এসে পড়ে। এদিকে সুন্দর মোমবাতির স্ট্যাণ্ডের দাম অনেক। তাই ডিসকাউন্ট দিয়ে বইটা আমার কাছ থেকে নিলেন তিনি। বইটার কভার বেশ মোটা তো। তাই মোমবাতি রাখা যেতে পারে। মোম পড়লেও বইটার কোনো ক্ষতি হবে না। ভেবে দেখুন, একসময় 'আনন্দমঠ'-এর স্বামী সত্যানন্দ আর জীবানন্দ ব্রিটিশদের কচুকাটা করতে ভারতীয়দের বিপ্লবের আলো দেখিয়েছিলেন। আজকে সেই আনন্দমঠই মোমাবাতিদান হয়ে ভবিষ্যতের উজবুকদের লো পাওয়ারের আলো দেখতে হেল্প করছে।

—স্বাস্থ্য আর চিকিৎসার বই তো মার্কেটে বেশ কাটে শুনেছি। শরীর থাকলেই তো অসুখ হবে। তা, আপনার কাছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার কোনো বইটই নেই?

—বছর পাঁচেক আগেও চিকিচ্ছের বই চলত। এখন হয়েছে মুশকিল। প্রতিটা রোগের স্পেশালিস্ট ডাক্তার, তেনার চেম্বার নিয়ে বসে আছেন। লোকেরা ওনাদের ফি দিতেই ফতুর হয়ে গেল। আবার সাধ করে চিকিচ্ছের বই কিনতে যায় নাকি? তাও আবার কি জানেন, আজকাল স্পেশালিস্টেরও স্পেশালিস্ট ডাক্তার তৈরি হয়েছে। এই তো সেদিন আমার ছেলেকে নাক-কান-গলার ডাক্তারের কাছে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে ডাক্তারবাবু আবার বললেন—'আপনার ছেলের বাঁ কানে পুঁজ জমেছে। আমি হলাম গিয়ে ডান কানের বিশেষজ্ঞ। তাই আপনার ছেলেকে সারিয়ে তোলার দায়িত্ব আমার নয়।' বুঝুন।

—তবুও দু-একটা চিকিৎসার বই রাখতে দোষ কি? খদ্দের ঠিক পেয়ে যেতেন।

—রাখি না কি আর? স্বাস্থ্য নিয়ে যে সব ইংলিশ আর বাংলা ম্যাগাজিনগুলো আছে, ওগুলো মোটামুটি সেল হয়ে যায়। চ্যাংড়া ছেলেমেয়েগুলো ম্যাগাজিনের ওপর সাঁতারের পোশাক পরা সিনেমার হিরো-হিরোইনদের রঙিন ছবি দেখে নিয়ে চলে যায়। ভাবে, ফিল্মের কোনো রসালো ম্যাগাজিন হবে। আমি একবার মুখের নানা রোগ ভালো করবার একটা বই সাজিয়ে রেখেছিলাম। লাইফ সায়েন্সের একজন মাঝবয়েসি দিদিমনি বইটা কিনতে এলেন। তেনার নাকি প্রায়ই মনে হচ্ছে, আক্কেলদাঁত ওঠার পর থেকে মুখের ভিতর দাঁত আর জিভটা ক্রমশ গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছে। সেই দিদিমণি তো তাঁর মুখে আঙুল ঢুকিয়ে পরখ করতে বাধ্য করলেন, জিভটা সত্যি সত্যিই দাঁতের দিকে এগোচ্ছে কিনা। বাপ রে, তার পর থেকেই দোকানে আর ডাক্তারি বই লাগাই না।

—গত বছর তো বইমেলাতে ধর্মকর্মের বই নাকি বিক্রির তালিকাতে একেবারে উপরের দিকে ছিল বলে শুনলাম। ধর্মের বই রাখেন তাহলে?

—ধর্মের বই? হাসালেন। যেসব ছেলে আর ছেলের হালফ্যাশানের বউরা বুড়োবুড়ি শ্বশুর-শাশুড়িকে বৃদ্ধাশ্রমের ডাস্টবিনে ঠেসে দেওয়ার মতলব ভাঁজছে, তারা সস্তার বিদায় উপহার হিসাবে কিছু কিছু মোটকা বাল্মীকি রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, আর ভাগবদ্গীতা কিনে নিয়ে যায়। আজকাল অনেক ছেলে-ছোকরা এসে তড়পায়—ধর্মের বই যখন রেখেছেন তখন বাৎস্যায়ন মুনির "কামসূত্র" নেই কেন? ওটাই নাকি আসল ধর্মের বই। ধর্মের কথা কী আর বলব? ছোটবেলায় দুগ্গা মায়ের পুজোতে দেখতাম ঢাকিরা এসে ঢাক বাজাত, অষ্টমীর সন্ধিপুজোয় ভট্চাযজেঠু মন্তর পড়তেন। ওসবের পাট চুকে গিয়ে এখন হয়েছে রেডিমেড ফাস্টফুড মার্কা পুজো। ঢাকের বাজনা শুনতে পাই ক্যাসেট রেকর্ডারে। পুরুতের মন্তরও তাই। হবে না। রাস্তার মোড়ে, নর্দমার কোনায়, ছ' তলার টং-এ মা-কে যেভাবে বসিয়ে রাখে সব্বাই।

পিনাকী শঙ্কর চৌধুরী-র
দেদার হাসির মজার গল্প-উপন্যাস-চুটকি

গল্প
ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ২৫
দশগপ্প ২০
গ্যাসগপ্প ৩০
খোশগপ্প ৩৫
এই সময় ৪০
পাগলের কাণ্ড ২০
টকটক নাটক ২০
চায়ের কাপে তুফান ২৫

উপন্যাস
জোড়াবাট ৫০
ইউনিবাবা ৩০
ছোটকাকু ৩০
ভূতের সঙ্গে বসবাস ৩৫

চুটকি ছড়া
আবলা তাবলা ১২
পদ্যকল্পদ্রুম ২০
ডামাডোল ১০
লালিকা—রবীন্দ্রনাথ স্মরণে
গোবিন্দনাথ ৫

প্রাপ্তিস্থান : পত্রপাঠ, বইমেলা স্টল নং-৯৪৮
ছবি প্রকাশনী
এইচ ২/১১৪ শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১

সবকটা বারোয়ারি পুজোয় ট্রিপ মারতে গিয়ে পুরুতগুলোরই বারোটা বেজে যায়। হাওয়াইচটির ফিতে গঙ্গাযাত্রা করে, সাইকেলের টায়ারও চুপসে নেতিয়ে যায়। তার ওপর ওই সংকীর্তন। ওঃ, রাতের ঘুমের দফারফা। দিনেরবেলা দোকানে চালে কাঁকর মিশিয়ে ওজন বাড়াচ্ছে, রাতে নিজের বাড়িতে ছুঁচোর কেত্তন করে দেখাচ্ছে, যেন ভক্তির রসমালাই। কেত্তনের সুরগুলো একবার শুনেছেন? সব হিন্দি ফিল্মের হিট গানের সুর। কেষ্টঠাকুরের ওইসব ধামাধরা সিঙ্গার আর মিউজিশিয়ানদের দল আবার মাঝে মাঝে আমার দোকানে এসে বলে গা-গরম করা ছবির বই আছে? কোকশাস্ত্র আছে? হিরোইনদের ছবি আছে? সবকটা বকধার্মিক।

রান্নার বই? স্কুলের পাঠ্য বই? নাটকের বই? এগুলোর মার্কেট এখন কীরকম ভাই?

—কী যে বলেন দিদি। হালফ্যাশানের বউরা এখন কি আর হাত পুড়িয়ে শ্বাশুড়ি-জ্যেঠিমাদের মতো পেঁপের শুক্তো আর মৌরলা মাছের টক রাঁধবে? ঘুম থেকে উঠতেই তেনাদের সকাল সাড়েনটা। কাদাখোঁচা দাড়িওয়ালা স্বামীদের হাতে বেড-টি খেয়ে তারপর স্নো-পাউডার মেখে স্কুল অফিসে দৌড়ন। চাট্‌নিদেবীর একটা বাঙালি রান্নার বই-এর তিন কপি এনেছিলেন। গতকাল ওজনদরে বেচে দিয়েছি। যা দিনকাল আসছে—ভাত, ডাল, মটন কালিয়া—সবকিছু রেডিমেড হয়ে প্যাকেটবন্দী অবস্থায় বাজারে চলে আসবে। রান্নার বই-এর মুখে ঝ্যাটা। প্যাকেট খোলো, খাও আর পেটের রোগের ডাক্তারের কাছে যাও। টেক্সট্ বই-এরও ওই একই হাল। এগ্‌জামিনের আগে লক্ষ্মীদির "লাস্ট সাড়ে দশ মিনিটের সিওর সাক্‌সেস" সাজেশন বিক্রি হয়। পাঠ্যবই নয়, বাবা-মায়েরা আসেন নোটবই কিনতে। হালফিলে আবার মালিনী ম্যাডামের লেখা "ছবিসহ টুক্‌লি করিবার একশত উপায়" বইটার আর সাপ্লাই দিতে পারছি না। দোকানে এলেই উড়ে যাচ্ছে।

—নাটকের বই?

—নাটকের বই এখন আর কেউ কিনে পড়ে না দিদি। গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনীর নাম মাঝে মাঝে বাংলা অনার্সের আর ড্রামা নিয়ে এম. এ. পড়া ছেলেমেয়েরা মুখস্ত করে। আসল নাটক দেখবেন তো চলে যান নন্দন, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ঘাট, ভিক্টোরিয়ার ঘাসজমিতে। দেখবেন সেখানে কত হাত ধরাধরি, হাই-হিল জুতো অ্যাক্‌শন, চোখা সব ডায়ালগ—দীপালি তুমি আমার রং আমি তোমার তুলি, কদুদা কাল আমাকে দেখতে আসছে, তুমি না একটা আস্ত ট্যাড়শ, একটা দারোয়ানের কাজও পেলে না, শুধু চিনেবাদামই খাওয়ালে...তবে হ্যাঁ, দিদি, মিথ্যে বলব না, পতাকীরাম ড্রামাওয়ালের লেখা "শ্বাশুড়ি আমার চোখের বালি" আর "ঠাকুরপো তুমি কার" নাটকদু'টোর সেল ভালো। সামাজিক নাটক কিনা।

দূর, আমিই ফেঁসে গেলাম। বই সংস্কৃতির রাজধানী নাকি কলকাতা। সেজন্য আমার পুজো হয়ে যাওয়ার পর দুর্গা মা-কে বলেকয়ে কলেজস্ট্রিট আর কলকাতা বইমেলা দেখার জন্য থেকে গেলাম। এর চেয়ে কৈলাসে বসে মহাভারতের নোট্‌স্ লিখলেও ভালো হত। সবাই কেটে পড়ল আর আমি ঢং দেখতে পড়ে রইলাম। খাবার মধ্যে শুধু বাতাসা, বাসি পাঁচমিশেলি খিচুড়ি আর কদমা। ছাত্রগুলোর জন্যে দেখি কষা মাংস, দই, চাটনি, লুচি আর বোতলের রাশ। যে ক'টা বই আমার সামনে রাখা হল, সেগুলোর নামই বাপের জন্মে শুনিনি—কম্পিউটার ফাণ্ডামেন্টাল্‌স, রেডিও ফিজিক্স, লজিক, ইন্টেরিয়র, মাগো! ছবির ছেমড়িগুলোর গায়ে একচিলতে পোশাকও নেই।

—অ। আপনিই দেবী সরস্বতী? মানে, পঞ্চমীর ভোরে ফুল চুরি করে, চান করে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে, জল না খেয়ে অথবা লুকিয়ে দু'টো নারকেলি কুল চিবিয়ে যার পুজোতে বলতে হয়—'ইয়ে যুগ শোভিতা ইয়ে পদ্মাদনা ইয়ে বীণাধরা।" স্কুল লাইফে আপনার পুজো করে, বেগুনভাজা আর বাঁধাকপির ঘ্যাঁট খেয়ে বিনোদিনী গার্লসের বাসন্তীরঙা শাড়ি পরা পৌলমী, মধুমিতা, শম্পাদের সঙ্গে কতবার ম্যাটিনি শোতে ইংলিশ ছবি দেখেছি।

—হ্যাঁ, আমিই সেই সরস্বতী।

—তা, সাদা শাড়ি ছেড়ে হঠাৎ চুড়িদার পরলেন?

—কী করব। সেই আশ্বিন মাসে মর্তে এসেছি। ইস্ত্রি করা যে সব কাপড় ছিল সবই ভিড়ভাট্টায় লাট খেয়ে গেছে। এই চুড়িদারটাই ছিল। এটা পরে যোগমায়াদেবী কলেজের সামনে দিয়ে আসছিলাম। বাঁদর ছেলেগুলো মোটরবাইকের সিটের ওপর বসে সিটি দিয়ে বলতে লাগল—"আ গিয়া, হিরোইন আ গিয়া।" মেট্রো সিনেমার সামনে এসেছি। হঠাৎ একটা গুঁফো লোক এসে বলল, 'কিগো, তোমার রেট কত?' দেশটার কী যে হল।

—আজ্ঞে ওসব বাতেলা মারবেন না। নিজে কি! বাবা ব্রহ্মার সঙ্গেই আপনার ইয়ের সম্পর্ক। তার ওপর বদমেজাজি, হাই ব্লাডপ্রেশারের রোগি। আপনার জন্য এই বইটাই স্পেশাল গিফ্‌ট।

—ওমা। এ কি। এই বইটা কাগজে জড়িয়ে দিচ্ছেন কেন আমাকে?

—আরে, এটাই তো আপনার উপযুক্ত বই। কাগজ খুললেই যেসব সিন দেখবেন, যে সব গল্প পড়বেন—তার ফলে বৈকুণ্ঠ আর রসাতল সব একাকার হয়ে যাবে আপনার কাছে। এই বই-এর মধ্যে জ্ঞানের যা সাপ্লাই আছে না, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র, গায়ত্রী মন্ত্র, অ্যাসিডের ধর্ম, গাছের বাষ্প পদ্ধতি, পদাবলী সব তোড়ে ধুয়েমুছে যাবে। বুঝলেন না, এই বই হল গিয়ে সবরকম জ্ঞানের ওয়াটার ট্যাঙ্ক। এজন্যই তো এর এত সেল।

কলকাতা বইমেলায় ৪১০ স্টলে চিরায়ত বই
ড. নিতাই বসু
নানা আলোকে রবীন্দ্রনাথ ৫০
শরৎচন্দ্র ঃ জীবন ও সাহিত্য ৫০
ড. দেবী খান
কর্মসংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ৬০
সুনীলময় ঘোষ
রমণীয় দ্বিজেন্দ্রলাল ৫০
ড. সতীশচন্দ্র মাইকাপ
রণক্ষেত্রে বৃটিশরাজ ও নেতাজী সুভাষ ৫০
ড. আলোককুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ও উক্তি ৫০
ড. পরশুরাম চক্রবর্তী
বনের বেদান্ত ঘরে এলো ৫০
ড. শিশির কর
সংবাদ পরিবেশন ৩০
Terrorism & Tagore 75/-
টিচার্স বুক এজেন্সী ১৩সি কলেজ রো, কল-৯

With Best Compliments

From

A WELL WISHER

নতুন কাসুন্দি

বিমল রায়চৌধুরী সম্পাদিত "দৈনিক কবিতা" পত্রিকার ২৫শে বৈশাখ, ১৯৬৬ সংখ্যা থেকে

সহজ কাব্যরচনা শিক্ষা

চারুবাক সেন

খুব একটা কঠিন কাজ নয়, কবি হওয়া। আপনিও হ'তে পারেন। সামান্য চেষ্টা করলেই, যে-কোন ভালো কাগজে প্রকাশ করার মতো কবিতা আপনিও লিখে ফেলতে পারেন। এমনকি হয়তো অনেকেব চেয়ে ভালোই লিখতে পাবেন। সেজন্য আপনার মনেব মধ্যে কোনো অনির্দেশ্য আকুতি, অপ্রাপ্যকে পাবাব বেদনা, নিঃসঙ্গতাবোধ ইত্যাদি থাকার প্রয়োজন নেই। যা দরকার তা হ'ল খুব সামান্য খানিকটা ছন্দবোধ যা প্রত্যেক মানুষেরই আছে, এবং তাব চেয়েও বেশি যা দবকার তা হ'ল এই নিবন্ধটি পাঠ করা। বিশেষত কাব্যজগতে এই ডামাডোলেব দিনে, যখন মুদ্রণযন্ত্র ও কাগজের ভুরিপবিমাণ অপচয়ে প্রতি সপ্তাহে একটি নতুন কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, প্রায় প্রতি মাসেই একটি ক'বে নতুন কবির নাম শোনা যাচ্ছে, দশকনির্ভব কাব্যালোচনা পুবনো হ'য়ে গিয়ে পঞ্চক বা ত্রয়োকের কাল আসন্ন, তখন আপনিই বা সারস্বত সমাজের বাইরে থাকবেন কেন? আসুন, কবি হোন।

> **সদ্য যারা বদ্ধঘরে পদ্য লিখে, মদ্যপানেই লব্ধজ্ঞান —এ তত্ত্ব শিখে, কলার তুলে ঘোরাফেরা করে, তাদের হাততালিতে আপনার সহজ অধিকার জন্মে যাবে।**

কবি হবার সহজতম উপায়, এখন বোধহয়, স্ট্যাটিসটিক্সেব ভাষায় যাকে বলে র‍্যান্ডম সার্ভে। আধুনিক কবিতায় প্রচুব ব্যবহাব হচ্ছে, এমন শ'তিনেক বিশেষণ, শতখানেক বিশেষ্য ও শতখানেক ক্রিয়াপদ ছোটো-ছোটো কার্ডে লিখে ফেলুন। এই শব্দগুলোও আপনাকে ভেবে বার করতে হবে না। পাতিরাম থেকে গোটা পাঁচসাত কবিতা পত্রিকা কিনে এনে, প্রতিটি কবিতার প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক কাগজে লিখে ফেলুন। অব্যয ইত্যাদি লেখার প্রয়োজন নেই। এখন এই কার্ডগুলো শাফ্‌ল্ করুন তাসেব মতো। ভালো করে শাফ্‌ল্ করার পব গোটা পঞ্চাশ শব্দ তুলে নিন . যে-কোনো পঞ্চাশটা। নিয়েছেন? আপনাব সনেটের অর্দ্ধেক তৈবি হয়ে গেল। দেখুন কিভাবে হয।

আঠারো মাত্রার পয়ারই এখন বাজ্বাবচলতি এবং বেশিরভাগ বাংলা শব্দই দুই, তিন বা চার মাত্রার। অপিচ, আঠারো মাত্রার পয়াবের ভাগ হল তিন তিন দুই / চার চাব দুই; অথবা, চার চার/ চার চার দুই; অথবা, চার চার/ তিন তিন / দুই দুই ইত্যাদি। একটা উদাহবণ দিই। ধরুন আপনার পঞ্চাশটা কার্ডের মধ্যে এই শব্দ গুলো পেলেন : অন্ধকার, বিস্ফোরণ, বমণী, তুমুল সুপ্রাচীন, প্রবল, ব্যথিত, গিয়েছিলো, জল, তীব্র, বৃক্ষ ও অধিকন্তু। এই কটা শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে চমৎকার দু-লাইন পয়ার কবা যায়। মিলেব কথা ভাববেন না, কোনো প্রয়োজন নেই মিল দেবার। যদি হঠাৎ মিলে যায় তো ভালই, নয়তো থাক। এখন দেখুন, কীভাবে এই শব্দকটা দিবে দু'লাইন পয়ার বানানো যায়। কিচ্ছু না ভেবে লিখুন, 'অন্ধকারে গিয়েছিলো।' আটমাত্রা কমপ্লিট। রমণী শব্দটা বয়েছে, ভাবনা কী? শুধু লক্ষ্য বাখবেন, বিশেষণগুলো যেন গদ্যগত বর্ণনায় একেবারে অচল হয। 'বমণী'র আগে কী বিশেষণ বসানো যায়?

নিশ্চযই 'তুমুল'। তুমুল রমণী বললে মেয়েটিকে নিম্ফোম্যানিযাক ব'লে মনে হবে, সেখানে আপনি বাড়তি খানিকটা সুবিধে পাচ্ছেন। সুতবাং 'অন্ধকারে গিয়েছিলো তুমুল বমণী'। কিন্তু আঠারো মাত্রা হতে আরো চাব মাত্রার বাকি, সুতরাং 'সুপ্রাচীন' কথাটাও জুড়ে দিন তার সঙ্গে। 'তুমুল রমণী সুপ্রাচীন' বা 'সুপ্রাচীন তুমুল রমণী'—দুটোই করতে পাবেন। তাতে প্রমাণিত হবে আপনি যুবতীর প্রতি আসক্ত নন, বৃদ্ধা রমণীর কামুকতাই আপনাব প্রিয়—বেশ চকচকে আধুনিকতা, বীটনিকদের ধরনে। আপনার সনেটেব পঙ্‌ক্তি—'অন্ধকারে গিয়েছিলো সুপ্রাচীন তুমুল রমণী'।

পরের লাইন শুরু করুন রমণীব একটা উপমা দিয়ে। হলেনই বা আপনি আধুনিক এবং হ'লোই বা আপনার নায়িকা বৃদ্ধা হয়েও কামাসক্ত, তাই ব'লে তার উপমা দেবেন না? উপমাহীন রমণী হয় না, যেমন উপন্যাসে নাযিকা কখনো কুৎসিত হয না। কী উপমা দেবেন? প্রথম লাইনটা একটু খোঁচা তোলা হয়েছে, বড্ড বেশি ধোপদুরস্ত, ওকে একটু নবম ক'রে দিন। 'ব্যথিত' শব্দটা বসান প্রথমে। 'ব্যথিত জল'—মন্দ নয। ফ্রয়েড সাহেবের আমল থেকেই জল জিনিসটা যৌনতার প্রতীক, সুতরাং আপনার কবিতার ধারাবাহিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। পুরো বাক্যটা দাঁড়ালো তাহলে—'অন্ধকারে গিয়েছিলো সুপ্রাচীন তুমুল বমণী / ব্যথিত, জলের মতো।' ব্যথিত'ব-পরে কমা দিতে পারেন, না দিলেও ক্ষতি নেই।

এবার নিজেকে ঢুকিয়ে দিন। কবিতায আমি বা তুমি থাকতেই হবে, কিন্তু 'বমণী' ব'লে আপনি প্রথম পুরুষ ব্যবহার কবে ফেলেছেন, সুতবাং তুমিটা অচল। আমি। আমি বিস্ফোরণে তীব্র একা— কেমন হয়? 'আমি তীব্র বিস্ফোরণে একা' কিছুতেই লেখা যায় না, কারণ তীব্র বিস্ফোবণ হ'তে পারে, আপনি একাকীত্বকে তীব্রতাময করে দিন। তাহলে দেখুন এবাব পঙ্‌ক্তি দুটো দাঁড়ালো কিনা—

অন্ধকারে গিয়েছিল সুপ্রাচীন তুমুল রমণী
ব্যথিত, জলের মতো। আমি বিস্ফোরণে তীব্র একা,

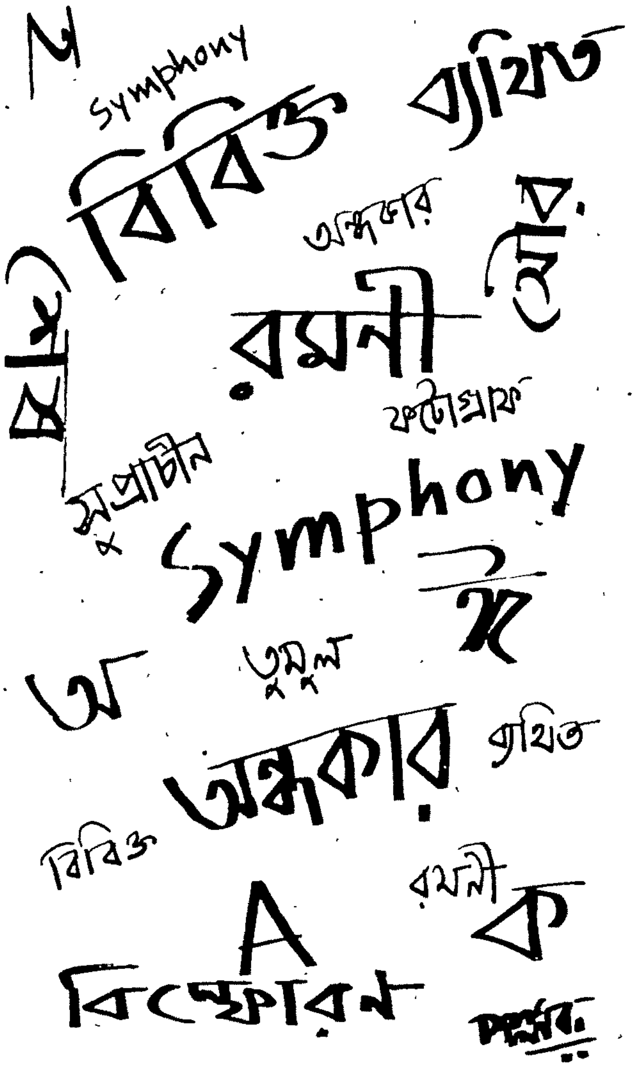

লাইনদুটো ফ্যাশানদুরস্ত এটা মানতেই হবে। এইভাবে লিখে যান কার্ডের পর কার্ড তুলে তুলে। একসঙ্গে বেশি কার্ড না তোলাই ভালো, নির্বাচনের প্রশ্নটা জটিল হয়ে যাবে। দশ পনেরোটা করে তুলবেন এক-একবারে। যদি নিজেকে ক্লাসিক্যালধর্মী কবি বলে প্রমাণ করতে চান তাহলে মিল দেওয়াই ভালো। রমণীর সঙ্গে ধমনী নিখুঁত মিল, আর ধমনী শব্দটা বেশ দব্‌দবেও বটে। ওটা দেয়া যায়। আর যদি রাবীন্দ্রিক মিলে আপনার রুচি না হয়, যদি চোখে পড়ার মতো মিল দিয়ে ছন্দোবিৎ ব'লে নাম করতে চান, তাহ'লে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সর্বদা ইংরেজি বা ল্যাটিন শব্দে মিল দেবেন, এবং শব্দটা রোমান হরফে লিখবেন। এটা এখনো বোধ হয় কারো মাথায় আসেনি।

দেখুন না চেষ্টা করে। ধরুন Antimony বা Symphony—রমণীর সঙ্গে বেশ চলে যায়। সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাক-ক্যালকুলেশন করে লিখতে হবে লাইনটা। তাও শিখিয়ে দি। Symphony শব্দটা লাইনের ডানদিকে বসালেন। তিনমাত্রার শব্দ—আগে আরেকটা তিনমাত্রা দিলেই ওটা ছন্দে প'ড়ে যাবে। সুধীন্দ্রনাথের কায়দায় 'বিবিক্ত Symphony', অমিয় চক্রবর্তীর কায়দায় 'দুরান্ত Symphony', বিষ্ণু দে'র কায়দায় 'তবুও Symphony' কতরকম হয়। এবার তার আগে একটা চার মাত্রার শব্দ। যে কোনো কার্ড নিন। কী পেলেন? সতর্কতা? পৌত্তলিক? ফটোগ্রাফে বিবিক্ত Symphony? বেশ। বাকি রইল প্রথমের তিন তিন দুই বা চার চারের পর্ব, ওতে আর কতক্ষণ লাগে?

> অন্ধকারে গিয়েছিলো সুপ্রাচীন তুমুল রমণী
> ব্যথিত, জলের মতো। আমি বিস্ফোরণে তীব্র একা।
> বহুদিন সাজালাম ফটোগ্রাফে বিবিক্ত Symphony—

এবার 'একা'র সঙ্গে একটা মিল ভাবুন। ছোটো শব্দের সঙ্গে বিরাট শব্দের মিল বেশ চমকপ্রদ। সংস্কৃত ছাড়া কোথা পাবেন? রেখা—কররেখা—সৌরকররেখা—বেশ হচ্ছে, আরো বাড়িয়ে দিন—বর্ণ-গন্ধসৌরকররেখা—বাজে হ'লো, নতুন কার্ড থেকে একটা ভালো চারমাত্রার শব্দ বার করুন—বিপর্যস্ত সৌরকররেখা—সমাসবদ্ধ করে দিন—সৌরবিপর্যস্তকররেখা। চমৎকার। আটমাত্রা মাত্র বাকি। আগের লাইনে চার চার করেছেন, এবার বৈচিত্র্যের জন্য তিন তিন দুই করুন—

> অন্ধকারে গিয়েছিলো সুপ্রাচীন তুমুল রমণী
> ব্যথিত, জলের মতো। আমি বিস্ফোরণে তীব্র একা।
> বহুদিন সাজালাম ফটোগ্রাফে বিবিক্ত Symphony–
> বিগত বসন্তদিনে সৌরবিপর্যস্তকররেখা।

ছন্দের কারচুপি করতে চান যদি, যদি তিনমাত্রা লিখে চারমাত্রার এফেক্ট আনতে চান, তাহলে শেষ পঙ্‌ক্তিতে এক মাত্রা কমিয়ে,ও কিঞ্চিৎ যুক্তাক্ষর বাড়িয়ে দিয়ে 'সূর্যাস্তে বিস্রস্ত কররেখা' করতে পারেন। টপ ইন্টেলেকচুয়োলরা অনুপ্রাসটা পছন্দ করবে না, কিন্তু সদ্য যারা বন্ধঘরে পদ্য লিখে, মদ্যপানেই লব্ধজ্ঞান—এ তত্ত্ব শিখে, কলার তুলে ঘোরাফেরা করে, তাদের হাততালিতে আপনার সহজ অধিকার জন্মে যাবে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, কবিতা লেখা ব্যাপারটা আপনি যত কঠিন বলে ভাবতেন, এই বাজারে সেটা তত কঠিন নেই আর। এই তো চার লাইন বানিয়ে দিলুম আমি। বাকি দশলাইন রচনা করতে কতক্ষণ লাগবে আপনার? দশ দুগুণে কুড়ি মিনিট? দু-পাঁচটা লেখার পর তাও লাগবে না। এবং শব্দ নিয়ে যে-পদ্ধতি উপরে আলোচনা করা হ'লো, ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে আস্ত পঙ্‌ক্তি নিয়ে কবিতার র‍্যান্ডম সার্ভে করা যায়। সেটা আরো সোজা। প্রত্যেক কার্ডে শব্দের বদলে একটা করে পঙ্‌ক্তি টুকে নিন, শাফ্‌ল্ করে তুলে তুলে সাজিয়ে যান। অসাধারণ কবিতা মিনিট পাঁচেকে বেরিয়ে আসবে। ফ্যাক্টরি-মেইড। কেউ আপত্তি করলে বলবেন, একে বলে কম্পিউটিং প্রসেস। পরবর্তী কালের প্রাবন্ধিকদের জন্য চমৎকার একটা টেকনিক্যাল শব্দও তৈরি হয়ে গেল দেখুন।

> প্রমাণিত হবে আপনি যুবতীর প্রতি
> আসক্ত নন, বৃদ্ধা রমণীর কামুকতাই
> আপনার প্রিয়—বেশ চকচকে
> আধুনিকতা, বীটনিকদের ধরনে।

With Best Compliments from

DISHA EYE HOSPITAL
&
RESEARCH CENTRE (P) LTD.

88/63, Ghoshpara Road
Barrackpur
Phone No. 561-1729/3737

নেবেন দাদা —
রবীন্দ্রনাথের
শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ!
বই

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

সাবধান, বসন্ত এসেছে

কমলকুমার দত্ত

Beware of বসন্ত। বসন্ত সমীবণ যেন কোনো ফাঁকফোকর দিয়ে গেরস্তর ঘরে ঢুকে না পড়ে! সাংঘাতিক জিনিস মশাই এই বসন্তের হাওয়া। এ বাতাস ছা-পোষা গেরস্তজীবের মনে লাগা মানেই গৃহযুদ্ধ—গড়াতে গড়াতে একেবারে কোর্ট পর্যন্ত পৌছে ডিভোর্সে শান্তি। তাই তো কবি বড় দুঃখে গেয়েছেন 'বসন্ত তোব শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে রঙ্গ'। 'শেষ ক'রে দে' বাক্যবন্ধটি তিন তিনবাব ব্যবহার কবে কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন—বার-বার তিনবার—মানে একেবারে যাকে বলে ফুলস্টপ। কবি আরো সাংঘাতিক কথা বলেছেন আরেকটা গানে, প্রথম চরণের আঘাতেই কাত কবে দিয়ে বলছেন 'বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে'। এ হাসির মানে কি এই যে—লটঘট লাগিয়ে দিয়ে গেলুম, এবার ঠ্যালা সামলাও। এ কি সেই মোক্ষম হৃদয় বিদারক হাসি? গাছে তুলে দিযে মই নিযে মস্করা?

তখন স্কুলে পড়ি। বসন্তের ঠারঠোর বোঝার বয়স নয় সেটা। তবু বেডিওতে 'মোর মালঞ্চে বসন্ত নাই রে নাই' শুনলে কেমন কষ্ট কষ্ট লাগাত। তখন অবশ্য বসন্তেব টিকে-ও ছিল। একটা স্টিলের বোমাত মতো লাগানো দণ্ড ওষুধে ডুবিয়ে হাতের দু'জায়গায় পরপর রগড়ে দেওয়া হত। ধারালো বোতাম হাতের চামড়া—মাফ কববেন—'ত্বক' কেটে বসন্তের ভ্যাকসিন বক্তে মিশিয়ে দিত—ব্যস, নিশ্চিন্দি। অবশ্য একশোভাগ নয়। ওর মধ্যেই দু'চারজন সাবা মুখে, শরীবে গুটি বা ফোস্কা নিয়ে শুয়ে থাকত দু'তিন সপ্তা। তখন মা শীতলা আর নিমপাতা হচ্ছে যাকে বলে গিয়ে এম.এল.এ-র ভোটার। সে শীতলা মা'র মূর্তি দেখলে হৃৎকম্প হত। সে কী চোখের দৃষ্টি। এখন বসন্তের, বিশেষ করে বসন্তের গুটিরূপ গুটিগুটি বিদায় নেবাব ফলে মা শীতলাকে কখনো মাধুরী কখনো কাজল বলে ভ্রম হয়। যাগ্‌গে, যা বলছিলাম, বিছানা থেকে উঠলেই হল না, দাগও তো ওঠাতে হবে। তখন খোঁজ পড়ত কোথায় ডাবের জল, কোথায শাঁখের গুঁড়ো। শাঁখেব গুঁড়ো রীতিমতো লেবেল লাগানো দেশলাই সাইজের প্যাকেটে বিক্রি হতে দেখেছি। এখনো কি হয়? হলেও নিশ্চযই আগের সে রমরমা নেই। এখন তো চামড়ায় ঘসে ঘসে লাগানোর কিছু দেখা পাওযাই যায় না বাজারে। এখন সবকিছু ত্বকে 'জেন্টলি রাব' করতে হয়। এখন সাবান তো গায়ে মাখাই সম্ভব নয়। সাবান পেলে তবে তো মাখবেন। এখন সব তো মযশ্চারাইজিং ক্রিম, প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস্, বেসন নয়ত জড়িবুটির ডেলা, মাফ করবেন, 'কেক'। ত্বকে চিরবসন্ত-কায়েম করবার মাল্টিন্যাশনাল কারবার। ত্বকের বসন্ত যেন টাল না খায়, গালের টোল যেন ষাটেও অটল থাকে। তা থাকুক, তাদের ঠোঁটের সিঁদুরের মতো শরীরের প্যাঁচপয়জার ও চিরবসন্তের নির্যাস মেখে-মেখে চিরহরিৎ থাকুক। ফাগুন এসে যেন ফিরে না যায। আর যেন কোনো 'তরুণ'কে গত যৌবনের দীর্ঘশ্বাস মেখে 'মোর মালঞ্চে বসন্ত নাইরে নাই' গাইতে না হয়।

প্রবাদ বলে—বিপদ কখনো একা আসে না। বসন্তও একা আসেন না, তিনি 'হোলি হ্যায়'-কে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। অনেকটা 'ধুম মাচা দে রং জমা দে' স্টাইলে। সে রং কখনো কখনো এমনই জমে যায় যে মনে হতে থাকে পরেব দোলের হাতে রিলে রেসের লাঠি ধরিযে না দিয়ে এ যাবে না। কবি এম্নি এম্নি বলেননি, 'ভুলতে পারি হোলির দিবস ফাগের দাগ যে তুলতে নারি'। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের বসন্ত যেভাবে তার জীবনে মূর্ত করে তুলেছে তা রীতিমতো ক্ল্যাপ পাবার মতো। স্বামীজি বলেছিলেন—এসেছিস যখন দাগ রেখে যা। কখনো পক্স রূপে কখনো পক্সেব টিকে রূপে কখনো হোলি হ্যায় রূপে কীভাবে দাগ রেখে যেতে হয তা আমাদের বসন্ত বিশ্ববাসীকে শেখাতে পাবে।

আব কোকিল। কোকিল ছাড়া বসন্ত দাঁড়াতেই পারে না, তো আসবে কি! সেই ছোটবেলাকার যাত্রা শুরুর মতোই—যাত্রা শুরু হবে মাঝরাত্তিরে, সন্ধে থেকেই বাজনাবাদ্যি শুরু হয়ে গেল। তেম্নি 'কুহু' 'কুহু'-র কনসার্ট শুরু হবে, মন আঁটুপাঁটু করবে, তবে না 'দক্ষিণা পবন' স্টেজে অ্যাপিয়ার কববে। স্কুলের পরীক্ষায় ভি. ভি. আই ভাবসম্প্রসারণ ছিল—'তুমি বসন্তের কোকিল, শীতবর্ষাব কেহ নও'। সেখানে 'বাজদ্বারে শ্মশানে চ' সংস্কৃত শ্লোকট্লোক লাগিযে দু'তিন পৃষ্ঠা নামাতে হত। কোকিল সেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর ভিলেন। কোটেশন লাগিয়ে লাগিযে যত বেশি স্বার্থপর বানানো যেত তত নম্বর উঠত। তারপব বড় হয়ে সিগাবেট ফুঁকতে ফুঁকতে চাদ্দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি হল যে কোকিলকে আসলে আমরা হিংসে করি, তাই স্বার্থপর বানালে নম্বর ওঠে। নইলে ন্যায়ত ধর্মত কোকিলকে আমাদেব জাতীয পক্ষীব মর্যাদা দেওয়া উচিত।

আমরা যা যা মনে মনে করতে চাই কিন্তু বিবেক, সমাজ এ সবের জ্বালায় করে উঠতে পারি না, রোগাভোগা ছানাপোনা, দজ্জাল নযত ছুচিবাইওলা বউ, অম্বল, গ্যাস্ট্রিক, হাইপারটেনশন, সুগার নিযে সংসারে ল্যাজে-গোবরে হয়ে থাকি, কোকিল তা করে দেখায়। প্রেমের হদ্দমুদ্দ সেরে বাচ্চগুলোকে ডিম্বাকারে কাকেব বাসায চালান করে দিব্যি শিস দিতে দিতে পরের বসন্তেব দিকে ডানা ভাসিয়ে দেয়। পরেব বছরে আবার নতুন সঙ্গী, আবার নতুন উদ্যমে প্রেম, নো ডাউন মেমোরি লেন, নো অম্বল, নো হাইপাবটেনশন। এই পাখিকে মডেল করেই এখনকার মারকাটারি হিন্দি সিনেমাগুলো তৈরি হচ্ছে, যেখানে 'প্যার' আর 'দিল' ফিফটি ফিফটি। আমরা কোকিল হতে চাই কিন্তু পারি না। তাই অন্ধকার হলে বসে কোকিল-কোকিলার কুহু কুহু দেখি আর বাড়ি ফিরে রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পৌঁছে যাই সেই স্বপনকাননে, যেখানে পরীর মতো সুন্দবী মেয়েরা শরীরে বিভঙ্গ তুলে মাটির উপর দিযে ভেসে আসছে আমাদের দিকে। তাদের দু'হাত দু'দিকে পাখিব মতো মেলা। ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে থমকে আছে সময। সেখানে দীর্ঘশ্বাস, সন্দেহ আব দজ্জাল বউদের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে শুধু 'প্যাব' আর 'দিল'। সেখানে দিলদরিয়া যুবক-যুবতীরা ফুলে ফুলে মধু চেখে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে আর লুকোনো ক্যাসেট থেকে দৈববাণী ঝরে পড়ছে—কহো না প্যাব হ্যায়,
কহো না প্যার হ্যায়....

বই নিয়ে দু'চার কথা

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্বশুরবাড়ি থেকে ভালই দেওয়া-থোয়া করছে। বৌও বেশ কাজের হইছে। ইলেকট্রিক হীটার, ইলেকট্রিক ইস্তিরি, দুই-চারখান শাড়িও দিছে বন্ধু-বান্ধবরা। সবই ভাল ভাল পাইছে। খারাপের মধ্যে কেবল দুইখান বই।

বই নিয়ে কিছু বলতে গেলেই প্রথমে আমার মনে পড়ে যায় মাখনদার কথা। মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন নবগঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। বেলুড়মঠ কলেজ থেকে এসে যাদবপুরে যোগ দিয়েছেন। আমার সামনেই একদিন একখানা নতুন বই কিনে, টাকাপয়সা গুনে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে, দোকান থেকে বেরিয়ে প্রথমে ক্যাশমেমোটি চার টুকরো করে ফেলে দিয়ে তারপর টাটকা বইয়ের সুন্দর শক্ত মলাটটি সজোরে টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে রাস্তায় ফেলে দিলেন। আমি হতবাক, ব্যাপারটা কি?

মাখনদাকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি সংক্ষেপে বললেন, আপনার বৌদির ভয়ে।—আমি আর কথা বাড়ালাম না। মোটামুটি মাখনদার দাম্পত্য জীবনের এবং তাঁর সংসারের একটি চিত্র মনে মনে এঁকে ফেললাম। আর ভাবলাম,—সত্যি এমনও হয়। আমিও তখন বিবাহিত এবং বিয়ে করেছি সাত বছর আগে। আমার নতুন দাম্পত্য জীবনের মধুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ চিত্র ঠিক মিলছিল না। ঘটনাটি প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগের।

'চরকাশেম' উপন্যাসের লেখক অমরেন্দ্র ঘোষকে খুবই কাছে থেকে দেখেছি। ১৯৪৮ সনে তিনি বরিশাল থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে বাসা নিয়েছেন টালিগঞ্জের এক ব্যারাকবাড়িতে। হাঁপানির রোগী, শীতের রাত্রে রিকশা করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। চোখে ঘুম নেই। সঙ্গে থাকেন বৌদি পঙ্কজিনী ঘোষ। শেষ রাত্রে রিকশা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় আশ্রয় নেন। তখন হয়ত একটু ঘুম আসে। এরপর জেগে গিয়ে সারা দিন কাটান লিখে। লিখে চলেছেন উপন্যাসের পর উপন্যাস। এভাবেই রচিত হয়েছে—ভাঙছে শুধু ভাঙছে, বেআইনি জনতা, কনকপুরের কবি, মন্থন, দক্ষিণের বিল ইত্যাদি।

ঐ বাড়িতেই অন্য এক ঘরে থাকতেন রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন অমরদার স্থানীয় অভিভাবক, লোক্যাল গার্জেন যেন। অমরদার মাসিক বসুমতীতে লিখে টাকা পেতে দেরি হচ্ছে, তাই নিয়ে গিয়েছেন রমেশদাকে সঙ্গে করে। অরমদা সদ্য পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন, শহরে চলতে ফিরতে একজন সঙ্গী থাকলে ভালো হয়। বিশেষ করে রমেশদার মতো দাপুটে লোক থাকলে তো আর কথাই নেই। অমরদাও ছাত্রজীবনে কলকাতাতেই কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন সাউথ সাবার্বন কলেজের ছাত্র। তখন আশুতোষ কলেজের ঐ নাম ছিল। ছাত্রাবস্থাতেই বাবা মারা যান। সেই যে দেশে গেলেন আর এসেছেন একেবারে দেশ ভাগ হবার পরে।

রমেশদা ঢাকার লোক, কিন্তু ছাত্র ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের। স্কটিশের গ্র্যাজুয়েট বলে একটু গর্বই করতেন রমেশদা। স্কুলের ছাত্র পেলেই সেই বুড়ো বয়সেও তিনি অঙ্ক আর ট্রানস্লেশান জিজ্ঞাসা করতেন। বেশিরভাগই ঠিক উত্তর দিতে পারত না। দু-এক জন পেরে গেলে রমেশদা যেন মনে মনে ক্ষুণ্ণ হতেন। রমেশদার তিন ছেলে, এক মেয়ে। মেয়েকে তিনি স্কুলে-কলেজে না পাঠিয়ে নিজেই বাড়িতে পড়িয়ে বি এ. পাশ করিয়েছেন। এই রমেশদাকে নিয়ে অমরদা মাসিক বসুমতীর অফিসে গিয়ে সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের কাছ থেকে দক্ষিণা আদায় করতেন। রমেশদা ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায় ও মোহিতলাল মজুমদারের বন্ধুস্থানীয়। তিনি নিজেও একদা লিখতেন। অবিনাশ ঘোষালের 'বাতায়ন' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত পুস্তক সমালোচনা করতেন। একেক সংখ্যায় একজন ঔপন্যাসিকের চারটি করে উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি এঁদের সঙ্গেই 'উজ্জয়িনী সাহিত্য সভায় এবং সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেনের 'সাহিত্য সেবক সমিতি'তে গিয়েছি।

বই মেলা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মেলা তো হচ্ছেই, তা ছাড়া জেলায় জেলায়, শহরতলির পাড়ায় পাড়ায়ও হচ্ছে। খরচা-খরচা করে প্রকাশকদের, বিক্রেতাদের কী যে থাকে তা হিসেব করে ওঠা বড়ই কঠিন।

ব্যাঙ্ক নাকি বইয়ের কারবারকে ব্যবসার মধ্যে গণ্য করে না। ব্যাঙ্ক সব ব্যবসার জন্যই টাকা ধার দেয় কিন্তু পুস্তক প্রকাশককে দেয় না। হয়ত এরও

কোনো উপযুক্ত কারণ আছে।

বইপাড়ার সঙ্গে বহুকালের পরিচয় থাকার জন্যে তাদের সমস্যা যে আছে তাও অনেকটা বাইরে থেকে দেখেছি। এই ব্যবসাতে কিছু অসততা যুক্ত হয়ে পড়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যবসাটি খুবই কঠিন কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক নতুন লোক এ কাজে যুক্ত হচ্ছেন। লেখকদের প্রকাশনা-সংস্থাও কিছু আছে। এ ব্যাপারে বোধহয় মনোজ বসুই প্রথম পথপ্রদর্শক। হাল আমলেও একজন অধ্যাপক-কবি ভালোই প্রকাশনা চালাচ্ছেন। বাবা হয়ত কোনো বইয়ের দোকানে কর্মী ছিলেন কিংবা বাবার ছিল বাইণ্ডিং কারখানা অথবা ছিলেন প্রেসের কর্মী। হাওড়া স্টেশনে পাঁচ পয়সা দামের চিরুনী বিক্রি করেছেন হেঁকে হেঁকে, পরে বইয়ের ব্যবসা করে সল্টলেকে সুদৃশ্য বাড়ি করেছেন, ফুটপাথে লক্ষীর পাঁচালী বিক্রি করতেন এখন চেতলায় বড় ফ্ল্যাট।—এমন কিছু লোকও বইয়ের ব্যবসায়ে এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভালোই জমিয়ে ফেলেছেন। বইয়ের ক্যানভাসিং করতে করতে লেখক প্রকাশক হয়েছেন তেমন উদাহরণও আছে। কিছু কিছু পুরনো দোকান হাত পালটে গেছে, দোকানের নাম পালটায়নি।

এক কালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজসেবার মনোভাব নিয়ে বইয়ের ব্যবসা করে ভালোই টাকা কামিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মাইনের টাকায় উপন্যাস ছাপিয়ে বিক্রি করেছেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকা করেছেন। তখন বই 'কমোডিটি' ছিল না। এখন কিন্তু বই 'কমোডিটি'। ব্যবসার সঙ্গে যা কিছু জড়িত থাকবার কথা এখন সবই আছে। চুরি, জোচ্চুরি, তঞ্চকতা। সেই আমলের বঙ্গদর্শনের পাতায় গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা ছাপা হত। তার তালিকা দেখে মনে হয় না যে বঙ্কিমবাবু যা খরচ করেছেন সাহিত্যের কারবারে, তা তুলতে পেরেছেন ঘরে।

অনেকে অবশ্য ভালোবেসেও বইয়ের ব্যবসায় এসেছেন। এক সময় শুনেছি কলকাতার বইয়ের ব্যবসা হত বেশির ভাগ পূর্ববঙ্গে। সেই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হয়ে গিয়ে বইয়ের ব্যবসা মার খেয়েছে। কিন্তু ৪৭-এর দেশভাগের পরে একটি প্রকাশন সংস্থা কারবার শুরু করে এখন বাংলা বইয়ের বাজারে শীর্ষস্থানে রয়েছে, তাও দেখা যাচ্ছে।

এই এত ধুলো খেয়েও লোকে বইমেলায় আসে। বড় বড় কাউন্টারে ইয়া লাইনের পিছনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা! বইকে মানুষ এত সহজে ছাড়তে পারবে?

বই নিয়ে কত মজার গল্প আমাদের মধ্যে চালু আছে, তারই একটি এবং একজন প্রায়-কবির ছবি দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করতে চাই। আমার একান্ত সুহৃদ প্রীতিমাধব গুপ্ত একটি কাহিনী বলেছেন।

আমার পিসি আলোর মাকে খুড়িমা বলত। দেশ ভাগ হলে খুড়িমা বরিশাল থেকে এসে নেতাজীনগরে থাকত টিনের ঘর করে। খুড়িমার এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়েটি বড়, ছেলে ছোট। আলো বি. এ পাশ করে গবর্মেন্টি চাকরি করে। ওর ভাই বেশি লেখাপড়া করে নি, দর্জির কাজ শিখেছে। বাড়িতেই দর্জির কাজ করে।

আলো এখনো বিয়ে করেনি। ভাইকে বিয়ে দিয়ে তবে নিজে বিয়ে করবে। মা থাকতে আলো বিয়ে করতে পারেনি। কারণ আলোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে তার কথা মা শুনলে দুঃখ পাবে। এই জন্য এতদিন বিয়ে করেনি। ওর অফিসেরই ছেলে। আলো তার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই মিশছে। ওদের বিয়ে হবে অসবর্ণ। সেই জন্যে দেরি করা। এর মধ্যেই একটা ছোট্ট মতো ফ্ল্যাট কিনবারও ব্যবস্থা করেছে। বাণ্টি সিনেমার কাছেই ফ্ল্যাট পেয়েছে।

আলো ছুটির পরে আমাদের বাড়িতে এসে একটু-আধটু গল্পগাছা করে তবে বাড়ি যায়।

আলোর ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। ভাই বিয়েতে অনেক ভালো ভালো জিনিস পেয়েছে। আলো বলল,—শ্বশুরবাড়ি থেকে ভালই দেওয়া-থোয়া করছে। বৌও বেশ কাজের হইছে। ইলেকট্রিক হীটার, ইলেকট্রিক ইস্তিরি, দুই-চারখান শাড়িও দিছে বন্ধু-বান্ধবরা। সবই ভাল ভাল পাইছে। খারাপের মধ্যে কেবল দুইখান বই।

বইকে সকলেই একরকম নজরে দেখবে—এ কখনো হয়।।

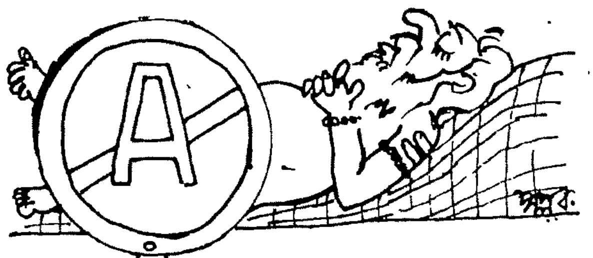

নাগা রক্ষী

হরদুয়ারের মহিলাদের কলেজে গোঁফপাকানো পুলিশের কনস্টেবল বা ইন্সপেক্টরদের বদলে সেইসব 'প্রাঙ্গণ আলো করে দিচ্ছেন একেবারেই জন্মদিনের পোশাক পরিহিত নাগা সন্ন্যাসীরা। উত্তর প্রদেশের পুলিশরা সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে—নাগা সন্ন্যাসীদের জেলের মধ্যে পুরে হিন্দু ধর্মের মুখে বুটের ছাপ্পা মারা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এইসব অত্যধিক 'ম্যাচো' সাধু-সন্ন্যাসীদের কিন্তু সেরকম পাত্তা দিচ্ছে না কলেজের লায়লা-জুলিয়েটরা। কেননা, নাগা সাধুদের মধ্যেও তাদের দিকে ডাঁশেডেশে তাকানো মহাযোগীর পুণ্য-সন্ধান মিলেছে। এদিকে নাগা সন্ন্যাসীরা আর্জি জানিয়েছেন, মাতৃসমা ছাত্রীদের সম্মান রক্ষা করার জন্যই নাকি মহাদেব তাঁদেরকে কলেজের সামনে পোস্ট করে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁদের নড়ায় কার সাধ্যি।

জবর খবর

সাহিত্যোদ্যমী সাদ্দাম

যুদ্ধের পাট চলে গেলেও পাড়ার পেটোর মতো এখনো মার্কিনীরা খুচখাচ দু'একটা মিসাইল ঝাড়ছে ইরাকের ওপর। তাতে অবশ্য হুসেন সাহেব ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি এবার মেশিনগান ছেড়ে লেখনী ধরেছেন। সাহিত্যের পণ্ডিতেরা কানাঘুষো করতে শুরু করেছেন, সাদ্দামই তাঁর নাম গোপন রেখে 'জাবিবা ওয়াল' মালিক-এর মতো ৭১২-পাতার উপন্যাস জমিয়ে দিয়েছেন। শুধু উপন্যাসই নয়, সাদ্দাম এবার দমাদ্দম ছোট গল্প আর ছোটখাটো উপন্যাসও প্রসব করতে শুরু করেছেন। রাজনীতিতে তাঁর জাতভাই, জার্মানির প্রাক্তন একনায়ক, হিটলারের আত্মজীবনী 'মাইন ক্যাম্ফ' পড়ে সাদ্দাম ওস্তাদ বাড়তি উৎসাহ, এন্থু পেয়ে গেছেন কিনা সেটা নিয়ে জল্পনা চলছে।

—কৌশিক রায়

হেঁসেল

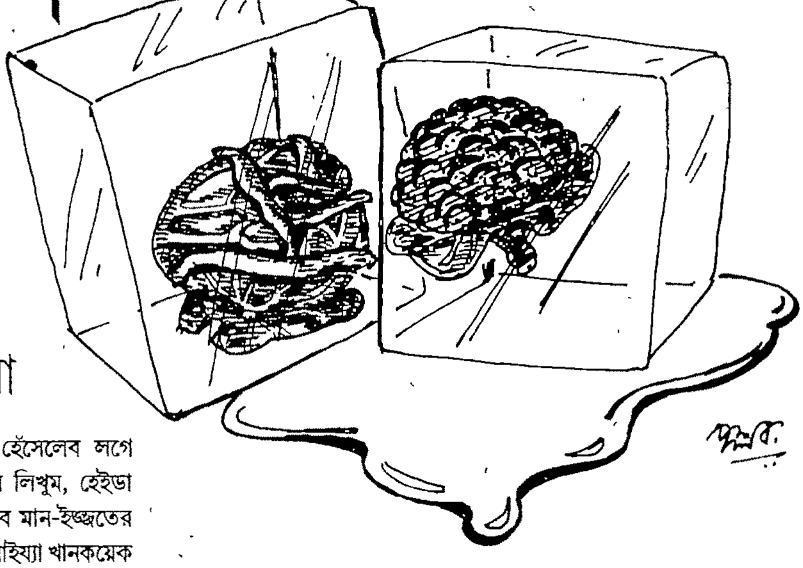

বাইন্ধা কপির ডাইলনা

শীতের মুহে আগুন। কাম-কাজ তো দূরের কথা, হেঁসেলের লগে আপনেগোর সোয়াদের জন্যি যে খানকয় রন্ধন পোনালি লিখুম, হেইডা করতিও আইল্স্যা ভাব লাগত্যাছে গিয্যা। তয় শম্পাদকের মান-ইজ্জতের পোস্নো, হেই জন্যিই হেইবারডি কম্বলের ওমের থিক্যা বাইরাইয্যা খানকয়েক শীতের পদ, আপনাগো জন্যি লিইখ্যা দিত্যাছি। বাইন্ধা কোপি লইয়া ল্যাখ্তেই অইবো। শীতের লগে বাইন্ধা কোপির পিরিতির সম্পক্কো হে না বুইঝ্ছে তাগো আর লায়লা মজনুর বেত্তান্ত পড়তি অইবো না। তাই আপ্নেগো পেথ্থমে বাইন্ধা কোপির মায়াজালে বাইন্ধা লইত্যাছি। শুধু একডিবার বাইন্ধা কোপির ডাইল্না হগ্গলকে খাওযাইয্যা দ্যান গিয্যা।

কি কি লাইগবো : বাইন্ধা কোপি একখান বড়ো দেইখ্যা (ওই পাঁশ্শো গেরামের মতন হইলেই অইবো), আলু আড়াইশ গেরাম, মটরশুঁটি তা ধরেন গিয্যা একশো পঁচিশ গেরামের মতন। হইল্দা এক চাইমচা, জিরা বাটা দ্যাড চাইম্চা, ধইন্যা বাটা তিন চাইম্চ্যা, আদা কুচানো হাফ চাইম্চা, পস্ত বাটা দুই চাইম্চা। চিনি, লবণ, ত্যাল পঁচাত্তর গেরাম, একটু খানিক ঘি, গরম মশল্লা হাফ চাইম্চা, ত্যাজপাতা ছয়ডা, জল আপনের আইন্দাজ মতন।

রন্ধন পোনালি : পেথ্থমে বাইন্ধা কোপির কচি পাতাগুলান ছাড়াইয্যা সরু সরু কইর্যা কাইট্যা ধুইয়্যা রাইখেন। আলুগুলানের চামড়া, ক্ষ্যামা দিবেন, খোসা ছাড়াইয্যা ডুমা ডুমা কইর্যা কাইট্যা ধুইয্যা রাখেন। মটরশুঁটি গুলানরে ছাড়াইয্যা অগোও ধুইয্যা রাখেন। এক যাত্রায় পেথক ফল অইবো ক্যান্? উনানে (অ, আপনের শহুরে মা-জননীদের তো আবার গ্যাসের ইস্টোভ, আঃ হেই বাক্সোপানা যন্তরডারে কি কয় য্যান, মাইক্রুব-উভেন) আঁইচ দিয্যা কড়াই চাপাইয়া ত্যাল দিয্যা দ্যান। খানিকক্ষণ পর আদা, গরম মশল্লা, ত্যাজপাতা দিয্যা একলগে নাইড়তে থাকেন ত্যালের মদ্দি। কপি, আলু আর মটরশুঁটি—হগ্গলডিরে হেইবার কড়াইতে ঢাইক্না চাপা দিয্যা দ্যান। কিছু সময় পর চাপাটা তুইল্যা লবণ দ্যান। আবার চাপা দ্যান। হেই অবস্থায় আপ্নের চক্ষু দিয্যা, না-না, বাইন্ধা কোপি সিদ্ধ থিইক্যা যে জল বাইরইবো, হেইতেই হগ্গলডি সিদ্ধ হইয়া যাইবো গিয্যা। হেইবার গরম জলে পস্ত বাদে আর সব মশল্লা গুইল্যা কোপির মদ্দি ঢাইল্যা দ্যান। কড়াই আবার চাপা দ্যান। ফুইট্যা উঠলে পস্তবাটা আর চিনি দিয্যা খানিকক্ষণ নাড়া দ্যান কোপিড়ারে। দ্যাখ্বেন একদম মাখোমাখো হইয়া গ্যাছে গিয্যা। তহনই গরম মশল্লা আবার ওর মদ্দি দিয্যা, ঘি দিয়্যা নাড়াচাড়া কইর্যা ঢাইক্যা রাখেন। হেরপর ঢাকা খুইল্যাই ডাইলন্যারে প্যাটে চালান কইর্যা দ্যান্।

ফুইলকপির দম

কাম সারছে। বাইন্ধা কোপির ডাইল্ন্যা তো আপনেগো বাইন্ধ্যা খাওযাইলাম। বাইন্ধার ছোডোভাই, ফুইলকোপিডা আবার কি দোষ করল ক'ন দিহি! তাই, হেইবার ঠিক করছি, ফুইলকোপির দম খাওয়াইয্যা আপনাগো হগ্গলের দম বাইর কইর্যা দিমু। কি কইলেন? আমার নামে মাডার কেসের মাইম্ল্যা ঠুইক্বেন? আর মশয, আমি মাইর্বার কেডা? হক কথা হইলো গিয্যা, আমার এই ফুইলকোপির দম এমন কইর্যা এক দমে গিলবেন যে আপনেগো সত্য সত্যই না দম বাইরইয্যা যায়।

কি কি লাইগবো : ফুইলকোপি মইজ্ঝা মাপের একডা, চিনা বাদাম পঁচিশ গেরাম (কুচাইয্যা লইবেন), কিশমিশ দশ গেরাম, টক দই এককাপ, আদা বাটা দশ গেরাম, পিয়াঁজ একডা বাইট্যা লইবেন, হইল্দ্যা গুঁড়া এক চা চাইম্চা, জিরা ভাজা (সাবধান, চিঁড়া ভাজা লয কিন্তু) দুই চা-চাইম্চা, গরম মশল্লা—তা দ্যান আপনের আইন্দাজমতন, লঙ্কাগুঁড়া, লবণ, কুচানো কাঁচালইঙ্কা—হগ্গলই আপ্নের ইচ্ছামতন, সইরয্যা বা বাদাইম ত্যাল পরিমাণ মতন, ত্যাজপাতা গোটা বারোহান।

রন্ধন পোনালি : ফুইলকোপি বড় পিস কইর্যা কাটেন। কড়াইতে ত্যাল গরম কইর্যা ওগুলান লাইল কইর্যা, অইচ্ছারকম-ভাইজ্যা লউন। ত্যাজপাতা, দই ও মশল্লা দিয্যা কয়েক মিনিট দমে কইর্যা লউন। হ্যার মদ্দি ফুইলকোপির ভাইজ্যা টুক্রাগুলান দিয্যা আরো খানিকক্ষণ কষেন। অন্য কড়াইতে কিছুডা ত্যাল গরম কইর্যা কুচানো চিনা বাদাইম ভাইজ্যা লইবেন। হেইবার পেসার কুকার যন্তরডার মদ্দি কষা ফুইলকোপি, চিনা বাদাইম, কিশমিশ, লবণ, চিনি অল্প জল দিয্যা সিদ্ধ কইর্যা লউন। কুকারের ঢাকনি খুইল্যা যদি দ্যাহেন জল আছে, তাইলে মাখো মাখো কইর্যা নামান। হেরপর জিব বাইর কইর্যা আগাইয়া যান।

দুধপুলি

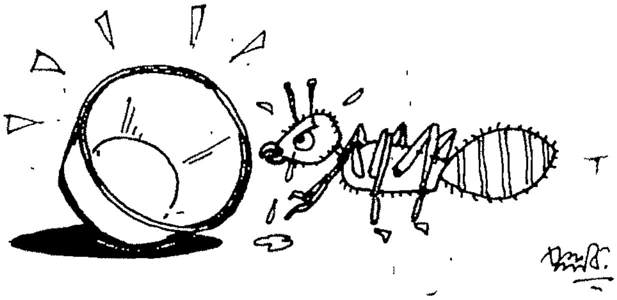

হেইডা ক্যামন কামের কথা হইল গিয়্যা ক'ন দিহি ভাইডি। কইলাম শীতে ম্যাজ্জাজ কইর্যা খাওনের লগে রন্ধন পোনালি লিখুম, তা শম্পাদক মশায় কইত্যাছেন, পিঠ্যা পায়েসের পদগুলান বাদ থাউক।। পওষ সংকেরান্তি আইবো—আর আপনারা কি হক্কলে ওই অলেপ্লেয়ে সাহেব-মেমগুলানের মতন কটা কেশ লাচাইয়্যা কেক-প্যাস্ট্রি খাইবেন? কাঙ্গালের মাটির পোলাপান আমরা, তা হেইডা ওপার, আর এপার যেই পারডাই হউক না ক্যান্, দুই পারের পাঠকদের লগেই তাই শীতের রোদে পিঠ দিয্যা খাওনের জন্যি পুলিপিঠা বাননের পোনালি কইত্যাছি। দ্যাখ্‌বেন, আগে থিক্যাই লাল ফ্যালাইয়া 'পত্রপাঠ'-এর পাতা ভিজাইয়া দিবেন না য্যান্।

কি কি লাইগ্‌বো : দ্যাড় লিটার দুধ, সফেদা এক কাইপ, খোয়াক্ষীর পইনচাশ্ গেরাম, হাফমালা কুরানো নাইরকল, কিশমিশ, কাজুবাদাইম, প্যাস্তা, চিনি এক্‌শ গেরাম, পাটালির গুড় তিনশ গেরাম, একটুখান ময়দা।

রন্ধন পোনালি : একডা পাত্রে দুধ আর সফেদা একলগে রাইখ্যা ঢিম্যা আঁইচ দ্যান। ফুইট্যা উঠলে সিদ্ধ হইলো কিনা দেইখ্যা লউন। দ্যাখবেন, বেশ আঠালো মণ্ড তৈরি হইবো। তক্ষুনিই নামাইয়্যা লউন। কিছুডা ময়দা মিশাইয়্যা রাখেন। হেই মাখাডা থিক্যা ছোডো ছোডো লেচি কাটেন। পেথ্থম দিকে অবিশ্যি খোয়াক্ষীর, নাইরকল, কিশমিশ, কাজুবাদাম, প্যাস্তা ও চিনি একলগে মিশাইয়া ঢিম্যা আঁইচে পাইক্ দিয্যা পুর তৈয়ার কইর্যা রাইখ্‌বেন। বাকি দুধডা ঘন কইর্যা জ্বাইল দ্যান। হেইবার লেচিগুলান একেবারে একটাকা দামের ল্যাংচার মতন কইর্যা তাতে খানিকটা কইর্যা পুর ভইর্যা দ্যান। পুরভরা পুলিগুলান ঘন দুধে সিদ্ধ করেন। দুধে পুলি ভাইস্যা উইঠলেই বুঝবেন সিদ্ধ হইছে। পাটালিটা হেইবার দুধে দিয্যা দ্যান্। গইল্যা যাইবো। দুধের লগে পাটালি মিইশ্যা ঘন হইয্যা আইলেই নামাইয্যা লউন।

দ্যাখ্‌বেন, দুধপুলির গন্ধে গন্ধে আপনের কাছে অনেকেই আইবো। একদম পাত্তা দিবেন না। ঘরের মদ্দি, আইলমারির পিছন দিকডায় বইস্যা দুধপুলির বাটিটা একেরে সাবড়াইয্যা দ্যান্, জয় মা রন্ধনেশ্বরীর নাম কইর্যা।

—কাঙ্গাল রায়

ট্যারা চোখে

ল্যাকম-চ্যাকম

মাফিয়াদের কাছে শুভ সংবাদ।

লড়ে যাচ্ছেন ৩৬ বছরের যুবক তরুণ কুমার চক্রবর্তী। আজ থেকে ১৪ বছর আগে যাঁর সম্বল ছিল একটি ভাঙা সাইকেল, দুটো চটের ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে থাকত কিছু চালু ওষুধ। দোকানে দোকানে সেই ওষুধ বিক্রি করে যার দিন চলত, সেই তরুণ কুমার চক্রবর্তী আজ তিনটে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ও ৬৮ চৌরঙ্গি রোড কলকাতা-২০ নম্বর বাড়ির মালিক।

কে বলেছে বাঙালি ব্যবসা করতে জানে না? সামান্য ওষুধ ফিরি থেকে আজ কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে তরুণবাবু নির্মাণ করেছেন মেডিক্লু রিসার্চ এণ্ড ডাইগোনোস্টিক সেন্টার, গত ১৬ই জানুয়ারি ২০০২ যার উদ্বোধন হয়ে গেল। উদ্বোধন করে গেলেন স্বয়ংস্বাস্থ্য মন্ত্রী ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র। কয়েকশো মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই অনুষ্ঠান কভার করার জন্য। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর গতানুগতিক অমৃত ভাষণ দিয়ে হাসিমুখে ফিতে কেটে চলে গেলেন। 'তরুণবাবুর দাবী— তিনি এমন সব মেশিন আনিয়েছেন যা পূর্বভারতে নেই। কিন্তু . কিন্তু একটা বিরাট কিন্তু থেকে যায়—মাননীয় তরুণবাবু কি তাঁর আজ থেকে ১৪ বছর আগেকার কথা মনে রেখে সাধারণ মানুষের ব্যয়সাধ্যের মধ্যে মেডিক্লুকে রাখবেন, নাকি একটা পুরনো কহাবত -এর পুনরাবৃত্তি হবে? মুসলিম ঠাকুমা তার নাতিকে জিজ্ঞাসা করল, "দুগ্গাঠাকুর কেমন দেখলি?" নাতি উত্তর দিল, "ওপরে ল্যাকম-চ্যাকম ভেতরে খড়ের বোজা, দেখে এনু হিঁদুদের দুগ্গাপূজা"।

—অরবিন্দ ঘোষ

প্রকাশকের সুখদুঃখ

ড. হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

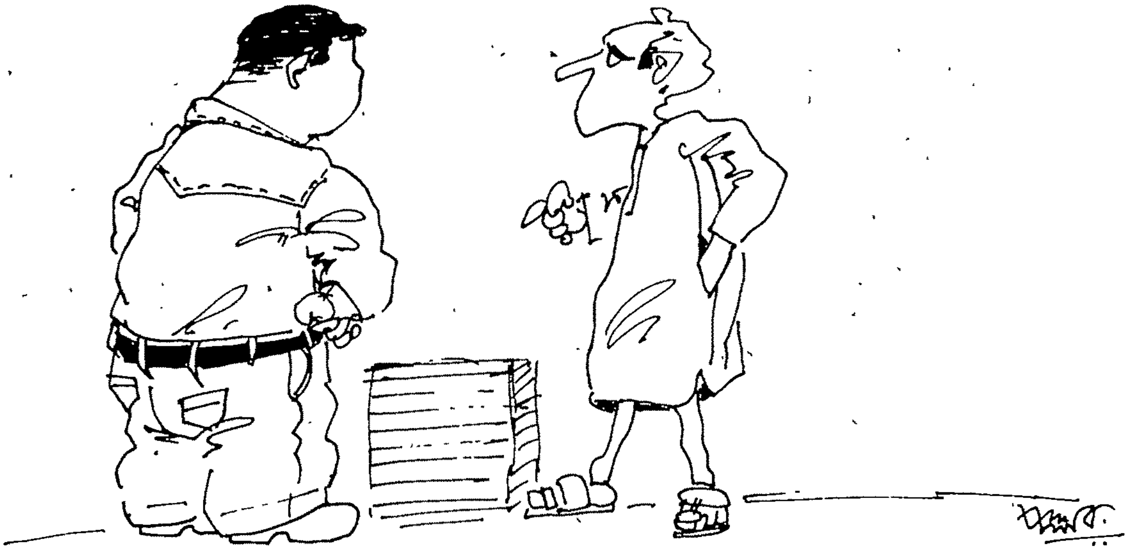

কলেজস্ট্রিট বইপাড়ার কথা পৃথিবীর ইতিহাসে সুবিখ্যাত। এইরকম বই নিয়ে Localisation of Book Industry অন্য কোনো দেশে নেই। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ মাত্রেই এ ব্যাপারে জ্ঞাত আছেন নিশ্চয়ই। এ পাড়ার সুখ দুঃখ রাগ-বিরাগ হাসিকান্না যেমন আছে, সেইসঙ্গে আছেন কিছু মাম্নাবাবুরা, যাঁরা প্রায়শই মাথা গরম করেন। কেউ কেউ তার মধ্যে কিছুক্ষণেই ঠাণ্ডা হন, কারণ ঠাণ্ডা না হলে তাঁর গতি নেই, আগেই রেগেমেগে কথার ডাণ্ডা দিয়ে তাঁর মেজাজের দফারফা করেছেন; তাঁকে করতেই হয়। চা, পান, সিগারেটও খসাতে হয়। হাইপারটেনশনের ধাক্কায় অনেকের প্রেসার বাড়ে, অনেকের সুগার বাড়ে, অনেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবুও 'মেজাজটাই তো আসল রাজা'র মতো চোখমুখ লাল করে গজরাতে থাকেন।

যাঁরা প্রকাশক তাঁদের তো কাগজওয়ালা, দপ্তরীখানা, প্রিন্টিং প্রেসের লোকজনের মধ্যে আনাগোনা করতেই হয়। কথা দিয়ে প্রেসের মালিক হয়ত কথা রাখতে পারেননি। আর যায় কোথায়। মোহনবাবুর মেজাজ। নূতন বই ছাপা নেই, বিক্রেতারা বইটা চেয়ে চেয়ে ফিরে যাচ্ছে। কেউ কেউ ব্যঙ্গ করছে। তিনদিন ঘোরবার পরে একজন ক্রেতা টিপ্পনি কেটে বসলেন, 'বই দিতে পারেন না, বই পাঠ্য করান কেন? স্কুলে গিয়ে বইটা Out of print, পাওয়া যাবে না—বলে কাটিয়ে দেব।'

মোহনবাবু : কী বললেন মশায়? আপনার স্পর্দ্ধা তো কম নয়। বই কাটিয়ে দেবেন? যান যান, কাটান দেখি আপনি। স্কুল বই পাঠ্য করার জন্য টাকা নেয়নি? দেখব কত ক্ষমতা। এই কানু, এই ভানুবাবু, তোমরা এই লোকটাকে কোনো বই বিক্রি করবে না।

পুস্তক বিক্রেতা : বই বিক্রি করব না। মামদোবাজি। দেখি কেমন বই বিক্রি করবেন না। আমিও দেখে নেব। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভায় যাব।

মোহনবাবু : যা যা, যেখানে যাওয়ার থাকে, যা। আমার বই আমি তোকে বিক্রি করব না—এই আমার সোদ্দা কথা।

বিক্রেতা : আপনি আমাকে তুই-তোকারি করছেন কোন অধিকারে?

মোহনবাবু : যা যা ডেঁপো ছোকরা। আমি তোর বাপের বয়সী। 'তুই' না বলে পুজো করব? যা, ভাগ্ এখান থেকে।

মোহনবাবুর ফোন উত্তোলন,—হ্যাঁ তোমাদের মালিককে দাও।

সোমনাথবাবু প্রেসের মালিক। হ্যাঁ বলছি.. .

মোহনবাবু : কে, সোমনাথ? কী ব্যাপার, এটা কি বাপের জমিদারি পেয়েছ নাকি? গত পরশু বাইণ্ডার দু-বার ভ্যান নিয়ে গিয়ে ফেরৎ এসেছে। আমার বইটা আমাকে দেওয়া কথা অনুযায়ী বেরুলো না কেন? লোকে আমার বাপ-মা'র শ্রাদ্ধ করছে। এর মধ্যে ১০টা স্কুলে আমার বইটা নতুন পাঠ্য হয়েও কেটে গেছে। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে? এরপর বই নিয়ে ধুয়ে খাব?

শ্বাসটান, সেই সঙ্গে সঙ্গে কাসি। কানু জলের বোতলটা খুলে ধরে।

সোমনাথ : কাকু, আপনি আমার কথাটা শুনুন।

মোহনবাবু কী কথা শুনব? যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না তারা মানুষ।

সোমনাথ : শান্ত হোন, কাল কাউন্টারে বই পাবেন। আমিই দপ্তরীখানায় পৌঁছে দেব।

ব্যস্ত প্রকাশক কাউন্টার। প্রকাশক মশায় ভিতরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় কফি খেতে খেতে জরুরি ফোন সারছেন। হঠাৎ কাউন্টারে চিৎকার-চাঁচামেচি। দেখা গেল চোর ধরা পড়েছে—বই চোর। রসিক, তবে মারের চোটে রক্ত ঝরে পড়েছে। প্রকাশক মশায় বেরিয়ে এসে শুরু করলেন — এই শুয়ারগুলোর জন্যে শেষ হইয়া গেলাম। আমারে সর্বশান্ত কইর্যা দিল। ওরে থানায় লইয়া যা। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? কতদিন ধইর্যা এই বই বাজারে বিক্রি করতেছ্যস্? কানু, যা ৪৫নং স্টলওয়ালারে ধইর্যা আন। সামনের ল্যাম্প পোস্টে বান্ধ। তারপর দেহি কোন বাপ ওরে বাঁচায়।

বেশ কিছু প্রকাশক এবং লোকজন জমে গেছে। স্টলওলা এবং বইচোরকে পোস্টে বেঁধে পেটাই চলছে।

প্রকাশক ভট্টাচার্যবাবু : ওই শালার স্টলগুলো চোরাই বই কেনা-বেচার আদর্শ স্থান। স্টল ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। একে ব্যবসার এই হাল, তার ওপর চুরি। ওর থেকে আমায় ছুরি মারলে ভালো করত।

সত্যিই এর থেকে ছুরি মারলেই বোধহয় ভালো করত। পরিশেষে স্টক মিলিয়ে ক্যাশমেমো ধরে দেখা যাচ্ছে প্রকাশক মহাশয়ের ৯৬০০০ টাকার বই দোকান-কর্মচারী কর্তৃক চুরি এবং বইচোর অর্ধেক দামে স্টলে ঝেড়ে দিয়েছে। এদিকে হাঙরের মতো হাঁ করে প্রকাশকের পাওনাদার মুখিয়ে আছে। তাদের সময়মতো টাকা পরিশোধ না করলে পরবর্তী কালে ব্যবসা চালানো মুস্কিল। এককথায় ছোট মাঝারি প্রকাশকের পক্ষে অসম্ভব।

মাথা গরম কি সাধে হয় মশায়, এর বহু কারণ আছে।

এই ধরুন না দপ্তরীখানা প্রথমে কাজ দিন কাজ দিন বলে পাগল করে দেয়। যদি সব দেখেশুনে কাজ দিলেন, তো ল্যাজ ভারী। ল্যাজ ভারী মানে পায়া ভারী। কাজ তো পেয়ে গেছি। তার সুবিধামতো বই ডেলিভারি দেবে। প্রকাশকরা অবশ্য ফর্মাটি দেওয়ার পরই সীজনের সময়ে বই চান। গ্রন্থন ব্যবসায়ে কতকগুলো ভাগ আছে।—ফর্মা ভাঁজাই, সেলাই, আঠা লাগানো কাটিং, পেস্টিং—প্রয়োজনে পুস্তানি। কাজ করতে কয়েকজন লোক লাগে। বই দেওয়ার কথা আজ। কর্মচারীর পরব, তাই একদিনের জায়গায় চার দিন পরে কাজে যোগ দেয়। প্রেসের ক্ষেত্রেও তাই। এবার শুনুন প্রকাশক সামন্ত মশায়ের রাগের ফিরিস্তি।

স্কুল-সিজন টাইম। বই ছাপা নেই। ডি. আই অফিসে ঘুষ প্রদানে একশটা স্কুলে নতুন করে বইটা পাঠ্য হয়েছে। প্রায়ই সায়াহ্নকালে অম্বর-এ, পান-খানা শালায় সামন্ত পয়মন্ত ডিআই অফিসের বাবুদের দিয়ে একটু খানাপিনা করেন। কয়েকটা মেলায় বইটা ভালোই ধরেছে।

এরপরই তাঁর খিস্তির বন্যা—অমুকের ভাই তমুকের ইয়ে, এতবড় আস্পর্ধা বাইণ্ডারের.....! তাঁর এই মুখ-দোষকে তাঁর পার্টি সমঝে চলে। তবে এটা ঠিক, পেমেণ্ট একদম ঠিক সময়ে।

দোকান, মানে সেলস কাউন্টার বন্ধ। স্বয়ং প্রকাশক মশায় বাইণ্ডারের কারখানায়। চার অক্ষর দিয়ে শুরু করতেই—

বাইণ্ডার রামবাবু : শান্ত হোন, ওরে চা নিয়ে আয়। আপনার বই ভ্যানে উঠছে। চা খেয়ে যান। বই পৌঁছে যাবে।

এক নেতা-প্রকাশককে ধরলাম। বইপাড়ার মানুষরা বিলক্ষণ জানেন, ভদ্রলোক একটুতে রেগে ওঠেন। যখন তখন এর-ওর মা-বাপের শ্রাদ্ধ সারেন। তাঁর সকাশে গিয়ে প্রশ্ন রাখলাম—মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যেভাবে চলছে বা চালানো হচ্ছে, সেটা কি ঠিক?

—দূর মশায়, ওটা একটা খোঁয়াড়। ২৭ বছর সিলেবাস একই ভাবে চলছে। এই যে সভ্যতার অগ্রগতির ফলে কত কি উত্থান-পতন হচ্ছে, নতুন নতুন রাষ্ট্র রাজ্য জন্ম নিচ্ছে, আমরাই তো সর্বশেষ বিষয়টাকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরছি। কিন্তু ওঁরা ছাত্রমেধ যজ্ঞ করেই যাচ্ছে। শিক্ষাবর্ষ পরিবর্তন করে কার লাভ হয়েছে বলতে পারেন? না আমাদের, না ছাত্রদের। বরঞ্চ আগের থেকে এখন, বিশেষ করে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪০ ক্লাস করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সিলেবাস স্কুলে পড়িয়ে শেষ করতে পারে না অথচ সব বুঝেও তাঁরা নির্বিকার। কিছু বলতে গেলেই এমন বোদ্ধা সাজেন, এমন সব কথা বলেন, তাতে মান-সম্মান থাকে না। ২৭ বছরের অন্তে এসে হঠাৎ এক ফতোয়া জারি—নির্দিষ্ট ফি দিয়ে T B No পাওয়া সমুদয় বইগুলো ১৮ দিনের মধ্যে পর্ষদে পুনর্মূল্যায়নের জন্য জমা দিতে হবে। পর্ষদ নির্দেশিত (২৭ বছরে আগের) পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই সেই বই বাতিল বলে গণ্য হবে। আচ্ছা মশায়, আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? একবার ফি দিয়ে সংশোধন করে যে বই-এর Test book Number বোর্ড দিয়েছেন, ঠিক সেইসব বই-এর জন্য আবার আমরা টাকা দেব কেন বলতে পারেন? প্রতিটি বই তো কিছু বেশি পৃষ্ঠার দাঁড়িয়েছে। কেন দাঁড়াবে না? যে প্রশ্ন আগে এক পাতায় সারা যেত, সেই প্রশ্ন এখন দাঁড়িয়েছে চার-পাঁচ পৃষ্ঠায়। জ্ঞানবোধ প্রয়োগ মূলক বিভিন্ন ভাগে প্রশ্নকে বেছে বেছে করতে হচ্ছে। রাশিয়া ভেঙেচুরে তছনছ। বার্লিনের পাঁচিল ভেঙে গেছে। ভারতে তিনটি রাজ্য বেড়েছে। সেন্সাস রিপোর্ট ২০০১ প্রকাশিত হয়েছে অথচ পর্ষদ সিলেবাস বদল করেনি। আমরা সময়মতো সব সঠিক বিবরণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তুলে ধরেছি। পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে কি আর বলব, সর্ব স্থানেই তো 'বাঁয়া হাত কা খেল' হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার জাল পর্ষদ পুস্তক বেমালুম পশ্চিমবঙ্গে শহরে জেলায় গাঁয়ে, গঞ্জে বিক্রি হচ্ছে। বেচাকেনার শেষ পর্যায়ে দু-এক জন স্টল হোল্ডারদের ধরে কাজ সেরেছে সরকার। আমার মশায় মাথার ঠিক থাকে না।

সবই মশায় ঘুষ সাহেবের কৃপা—তাঁর মহিমা সভ্যতার শুরু থেকে অদ্যাবধি বিরাজমান। স্কুলে স্কুলে আজকাল ডোনেশান নামক ঘুষ-সাহেবের আবির্ভাব ঘটেছে। ভালো বই মন্দ বই পরের ব্যাপার। আসলটা দাও, পাঠ্য পুস্তক তালিকায় স্থান পেয়ে যাবে। শুধু কি তাই? একবার স্কুলে দাও, তারপর ব্যক্তিগত ভাবে দাও। দিতে পারলে কাজ নিতে পারবে। শুধু ভালোত্ব দিয়ে কিছু জায়গায় ঠাঁই পাবে, বাকি সব হবে প্রাচীন প্রণালিতে। ছ্যা ছ্যা, ঘেন্না ধরে গেল। যারা জাতির মেরুদণ্ড, তারাই দেখছি ভণ্ড। অবর্তমানে ঘুষ, সব হবে পণ্ড।

কথাবার্তার মধ্যে হাজির জেনারেল বুকসের এক বড় প্রকাশক। তাঁকে দেখেই নেতা-প্রকাশক বলে উঠলেন, এই যে গাঙ্গুলিবাবু, সাক্ষরতার অতগুলো বই একাই অর্ডার পেয়েছেন। তা কি এমনি এমনি? পুজোটুজো দিতে হয়নি? অনেকেই বই জমা দিয়েছিলেন। কয়েকজন বড় বড় প্রকাশক সিংহভাগটাই ঘরে তুলেছেন।

গাঙ্গুলিবাবু আবার আমাকে নিয়ে কেন? বলেই ডাংগুলির মতো সড়াৎ করে কেটে পড়লেন।

—দেখলেন তো হিমাংশুবাবু, দেখে মনে হয় ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না। আমি মশায় অপ্রিয় সত্যি কথা বলে ফেলি। রাখ-ঢাক বুঝি না। আমার মুখদোষটা বাদ দিয়েই লিখবেন, তাহলে টক্-ঝাল-মিষ্টি হবে, মাখা মাখা। নেন চা নেন, সেবা করুন।

মানুষ হিসেবে এঁরা ভালো।

“For all the happiness mankind can gain
Is not in pleasure but in rest from pain.”

সরি

সৈয়দ রেজাউল করিম

পায়ের উপর পা দিয়ে, ধাক্কা মেরে, কনুয়ের গুঁতো মেরে, অন্ধকার সিনেমা হলে কারোর হাতের উপর হাত রেখে যদি আপনি সময় মতো 'সরি' শব্দটা ব্যবহার করতে পারেন, দেখবেন আপনার সাতখুন মাফ।

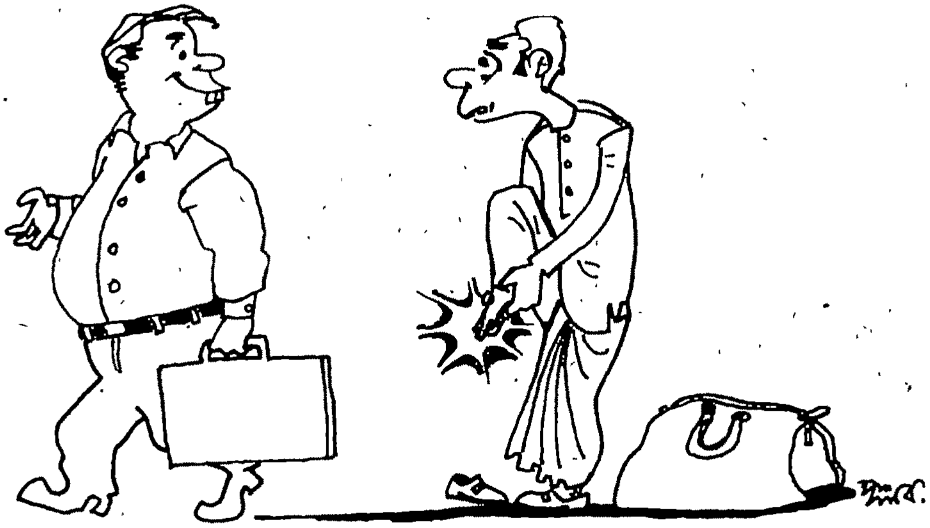

ক্রিং ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা আর্তনাদ করে উঠতেই ছুটে গিয়ে টেলিফোনের বুকটা ধরে কানে মুখে সেঁটে বললাম, হ্যালো? ওপার থেকে শেখরদার গলা ভেসে এল—কে করিম? আমি বললাম, শুধু করিম নয়, রেজাউল করিম বলছি।

টেলিফোনের ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল একটা বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস। তারপর দাঁত খিচিয়ে বললেন, সকাল থেকে গুনে গুনে পঁচিশ বার ফোন করলাম। প্রতিবারই এক্সচেঞ্জ উত্তর দিল —'সরি এনগেজড্' । বলি, ব্যাপারটা কি? ডি. আই পি হয়ে গেলে করে থেকে?

আমি হেসে বললুম, ব্যাপারটা তা নয় শেখরদা। গিন্নি আমার ল'য়ে পাশ করেছে। সিন্নি দিতে হবে মসজিদে। তাই একটু হাটে গিয়েছিলাম পকেটটাকে গড়ের মাঠ করতে। যাবার সময় এক্সচেঞ্জকে বলে দিয়েছিলুম 'এনগেজ' বলতে।

—ও। বুঝতে পারলাম তোমার কেরামতি। এম এল. এ মিনিস্টার হলে ভালো করতে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম, সরি। আমি তো দাঁড়াচ্ছি না, দাঁড়াচ্ছে গিন্নি। আর কালো হাতটা বাড়াব আমি। কেমন হবে বলুন তো?

শেখরদা রেগে বললেন সব সময় বক্‌বকানি। যা বলছি শোনো, একটা লেখা দিও। যে লেখাটা দিয়েছিলে লোকে পড়ে ছিঃ ছিঃ করছে। মাথায় কাপড় দিতে গিয়ে আর সব কাপড় তুলে দিলে? সবকিছু বলে দিলে, অথচ কিছু বললে না, এমন ভাব দেখালে। অমন কাঁচা লেখা কচি খোকাও লিখতে পারে।

আমি বললুম, এক্সট্রিমলি সরি।

ধপ্ করে টেলিফোনটা রেখে দিলেন। আমি হ্যালো, হ্যালো করে চিৎকার করি। কোনো সাড়া পাই না। ঠিক যেমন মুটে-মজুরেরা করে—জবাব চাই, জবাব দাও, আমাদের দাবী মানতে হবে। কিন্তু জবাব কি মেলে? দাবী কি মেটে? সরি। আই অ্যাম ভেরি সরি। কেমন যেন রাজনীতি রাজনীতি গন্ধ আসছে। রাজনীতির চেয়ে সরিনীতি অনেক ভালো। অনেক মনোরম।

কে কখন, করে কোন যুগে এই সরি শব্দটা বার করেছিল কে জানে?

এই আন্তর্জাতিক ভাষাটা কেউ যদি মুখ ফসকে একবার বলে ফেলে, সে হাজার দোষ করলেও তাকে হাসি মুখে বিদায় করা ছাড়া আর অন্য কিছু গতি থাকে না। পায়ের উপর পা দিয়ে, ধাক্কা মেরে, কনুয়ের গুঁতো মেরে, অন্ধকার সিনেমা হলে কারোর হাতের উপর হাত রেখে যদি আপনি সময় মতো 'সরি' শব্দটা ব্যবহার করতে পারেন, দেখবেন আপনার সাতখুন মাফ। কেউ কিচ্ছু বলতে পারবে না।

আমার চোদ্দপুরুষ সব মূর্খের দল। আমি আবার আকাট মূর্খ। বাবুরা 'সরি সরি' বলত, আমি কিছুই বুঝতাম না। ফ্যাল-ফ্যাল করে ক্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকতাম। একদিন হল কি, শেয়ালদা ইস্টিশনে গুড়পাই নিয়ে বসে আছি। মাছির মতো ভন করছে লোকজন। এমন সময় মাইকে অ্যানাউন্স করল—ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন তেরো নাম্বার প্লাটফর্ম থেকে ছাড়ছে। একটা স্যুট কোট পরা ভদ্রলোক হাতে অ্যাটাচি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এল ট্রেন ধরবে বলে। চোখটা তার ট্রেনের দিকে। পা-টা কোথায় পড়ছে কে জানে? আর মারবি তো মার আমার গুড়পাই -এ মেরে দিল ধাক্কা। ভাঁড় ভেঙে গড়াতে থাকল গুড়। ভদ্রলোক 'সরি' বলে ছুটতে যাচ্ছিলেন।

আমি ভাবলুম লোকটা 'সরে পড়ি' বলে কেটে পড়ছেন। পিছন থেকে গিয়ে ধরলুম জামার কলারটা। বললুম, ও সব সরে পড়ি বললে চলবে না। আগে গুড়পাই-এর দাম দাও। তারপর সরে পড়বে।

ভদ্রলোক এক ঝটকায় আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আসলে অশিক্ষিত ছোটলোকের দেশ তো, ম্যানারস কাকে বলে জানে না। আদব-কায়দা, রীতি-নীতি কিছুই তো শেখেনি।

আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললুম, এটা আবার কি রকম মামদোবাজি?

ভদ্রলোক আরো রেগে গিয়ে বলল, হোপলেস, এরা দেশের আইন মানে না, তো আন্তর্জাতিক আইন মানবে কি? সরি বলার পর আর কি কিছু বলার থাকে? যান, গুড়গুলো অন্য ভাঁড়ে তুলুন। ভাঁড়ের দামটা না হয় আমি দিচ্ছি।

পিছন থেকে কয়েকজন লোক ভদ্রলোককে উৎসাহিত করে সমস্বরে বলে উঠলেন, আপনি মশাই আচ্ছা ছোটলোক তো? 'সরি'র অর্থ জানেন না?

তার পর থেকে আমি অনেক বার 'সরি' শব্দটা ব্যবহার করতে গেছি, কিন্তু প্রতিবারই লোকে আমার কথা শুনে হেসেছে। তেড়ে মারতে এসেছে। ছোটলোক, ইতর, অভদ্র বলে গালাগাল দিয়েছে। তবুও বলা ছাড়িনি। হাজার হোক আন্তর্জাতিক ভাষা তো।

একদিন ডায়মণ্ড হারবার কলেজের পাশ দিয়ে ফিরছি। হঠাৎ দেখি একটা শালপাতা এসে আমার জামায় আটকে গেল। হাত দিয়ে ফেলে দিতে গিয়ে দেখি সর্বনাশা ব্যাপার। সাদা জামায় হলুদ ছাপ। বিয়ের সময় যেমন করে হলুদ মাখানো হয়, ঠিক তেমনি। পিছন ফিরতেই দেখি একপাল ডাগর ডাগর মেয়ে ঘুগনি খাচ্ছে। আমার অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসছে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম—সরি।

একটা মেয়ে বলল, এমা, কি বোকা। আপনি সরি বলছেন কেন? 'সরি' বলব তো আমি। আর আপনি হাসি হাসি মুখে তা শুনবেন।

মেয়েটার কথা শুনে আমি হাসি হাসি মুখ করে কথাটা শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলাম। মেয়েগুলো আরো খিল খিল করে হেসে উঠল। আমি রেগে গিয়ে বললুম, কী ভেবেছেন বলুন তো আপনারা?

একটা মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, সরি। এত রুডলি হচ্ছেন কেন? একজন যুবতীর সঙ্গে নরম গলায় হেসে হেসে কথা বলতে হয় তাও জানেন না? তাছাড়া চোখের মধ্যে একটা সপ্রেম ভাব থাকবে।

আমি রেগে বললুম, চোখে সপ্রেম ভাব, সেটা আবার কি? ও পাঠশালায় তো আমি পাড়িনি।

তারপর একটু থেমে বললুম, আমি চলি এখন।

বলে হনহন করে পা বাড়াতেই শুনতে পেলুম মেয়েটার গলা, এখনই যাবেন? এই তো সবে শুরু। আপনার সম্বন্ধে এখন তো ভালো করে কিছুই জানা হল না।

আমি যতদূর সম্ভব চোখে প্রেমের ভাব ফুটিয়ে বললুম, সরি। নিয়ার মাই গিন্নি।

মেয়েটা 'সরি' বলে যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তাতে আমার বুকটা শুকিয়ে উঠল।

এই সরি নিয়ে দেদার দুর্ঘটনা ঘটেছে আমার লাইফে। হরেদরে বস্তাদুই হবে। তখন আন্তর্জাতিক প্রেমবর্ষ চলছে। বন্ধু-বান্ধবরা উঠেপড়ে লেগেছে। এনিহাউ আমাকে একটা জুটিয়ে দেবে। ওদের কথামতো সেদিন মেয়ে দেখতে গেলাম। পথে যেতে যেতে ওরা বলল, 'কম কথা বলবি। যেটুকু বলবি মিষ্টি সুরে বলবি। তারপর যা করার আমরা করব।

মেয়েটাকে দেখে আমার নাক সিঁটকে গেল। কোনো রকমে চেপে, লাইনটাকে বেলাইন করার উদ্দেশ্যে আজেবাজে প্রশ্ন করছিলুম মেয়েটাকে। বন্ধুরা চোখ টিপল, আমি বুঝতে পারলুম বেশি কথা বলা হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের উদ্দেশ্যে করে মিষ্টি সুরে বললুম ও, সরি। তড়াক করে মেয়েটা উঠে চলে গেল ঘরের ভেতর। তারপর তার বাবা ভাই পাড়ার আত্মীয়-স্বজনরা এসে আমাকে এই মারে তো সেই মারে। ইতর নচ্ছার, এমন কত কি বলে গালাগাল দিল। আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

পরে শুনলাম মেয়েটার নাম সরিতা। সরি বলে ওকে ডাকে। আমার মতো অপরিচিত লোকের মুখে মিষ্টি সুরে ওভাবে যদি ও 'সরি' শোনে, তাহলে কার না মাথা বিগড়ে যায়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা তো আর ওটা ছিল না। সেটা আর কে বুঝবে।

একটা কথা না বলে পারছি না। এই যে, সরি সরি আমরা বলি, সেই সরির অর্থটা যে কি, তা আমার জানা ছিল না এতকাল। কেউ সরি বললে আমি মুচকে হাসতাম। যেন সব কিছু জানি, সব কিছু বুঝি। কে জানে আমার বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে গিন্নিকেও শুধাতে পারিনি। একদিন চুপি চুপি গিন্নির ডিক্সনারিটা বার করে 'সরি' খুঁজতে গিয়ে দেখি এস এর কিছু পাতা হাওয়া। গিন্নি করে চা গরম করেছে কে জানে। আমি কিন্তু ছাড়ার পাত্র নই। 'স' আর 'রি' এই দুটো শব্দ নিয়ে হয়েছে সরি। পাতা খুলে বার করলাম 'স' মানে দেখা, আর 'রি' মানে পুনঃ। সব সমেত পুনরায় দেখা। মনটা আনন্দে ভরে গেল। এতদিন একটা কাজের মতো কাজ করলাম।

ভোরে স্নানটান সেরে বাহারি শাড়ি পরে, পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে, বগলে ভ্যানিটি ব্যাগটা ঝুলিয়ে, পান চিবুতে চিবুতে সাতসকালে গিন্নি কোথায় ওয়ান ফরটি ফোর জারি করতে যাচ্ছিল।

দাওয়ায় বসে দাঁত মাজতে দেখে আমাকে বলল, বুঝলে আমি একটু আসছি।

রাত্রের 'সরি'র কথা মনে পড়তেই আমি বললুম 'সরি' (পুনরায় দেখা) হবে।

গিন্নি আমার কী বুঝল কে জানে। গিন্নির অগ্নিমূর্তি দেখে বুঝলুম কথাটা বলে ভালো করিনি। তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, যত বয়স হচ্ছে তত ঢং বাড়ছে।

তিনি বিনির্গত হওয়ার পর আমার মুখ দিয়ে এবার এমনিই নির্গত হল—সরি।

পুরুষোত্তমপুরের দারোগা

সোমনাথ চক্রবর্তী

সে বহু বছর আগেকার কথা। পুরুষোত্তমপুর নামে হাওড়া জেলায় একটি সুন্দর সবুজ, খাল-বিল নদী-নালায় ভরা গ্রাম ছিল। সেখানে রুইদাসপাড়ায় প্রবীর ওরফে গুপে নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত ঈষৎ খর্বাকৃতি ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার গাত্র ছিল মসীবর্ণ, মাথার উপরিভাগটি ছিল অনেকটা শিংছাড়া মহিষের মস্তকের ন্যায় থ্যাবড়ানো এবং গণ্ডদেশটি ছিল সারমেয়, অর্থাৎ কুকুরের মুখের ন্যায় সুঁচালো আকৃতির। তিনি অত্যন্ত ক্রুর প্রকৃতির এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুলিশে কাজ করিতেন এবং উপরওয়ালা পুলিশ কর্তাদিগকে বহু অর্থ ও সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া বড় দারোগার পদে উন্নীত হইয়া অনেক সুকীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এ কারণে তাঁহাকে কেহ কেহ 'কুকুরমুখো দারোগা' কেহ বা 'গুপে দারোগা' নামে অভিহিত করিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিত।

তিনি ভয়ঙ্কর রাগী এবং নিজের জন্মদাতা পিতা কেঁচো রুইদাসকে 'বরাহনন্দন' বা 'শুকরতনয়' ইত্যাদি সম্বোধন করিতেন, নিজের জন্মদাত্রী পেঁচী দাসীকে মাঝেমধ্যেই চপেটাঘাত করিতেন ও মুখরোচক গালিগালাজ প্রয়োগ করিয়া হুলুস্থুল বাধাইয়া দিতেন। তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিতে খুবই ভালোবাসিতেন। কেহ তাঁহাকে অসম্মান করিলে ভয়ঙ্কর চটিয়া যাইতেন। থানা, ফাঁড়িতে কেহ তাঁহাকে 'হুজুর বাহাদুর পরনাম হই' না বলিলে তিনি তাহাকে 'ইস্টুপিট অভদ্র' এবং আরো সুন্দর সস্তা ভাষার দ্বারা সম্বোধন করিতেন এবং পুলিশের ডায়েরি বহিতে তাহার বিরুদ্ধে রামগঙ্গা, অনেক কিছু লিখিয়া আরক্ষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। উক্ত পুলিশ কর্মচারীর যাহাতে সাজা হয়, তাহার জন্য সুপারিশ করিতেন।

সেই সুপারিশপত্রের সহিত উক্ত কুকুরমুখো, ওরফে প্রবীর ওরফে গুপে দারোগা কচু, ঘেঁচু, কাঁচকলা, বেগুন ইত্যাদি অতি উপাদেয় তরকারিসকল পট্টবস্ত্রে মুড়িয়া পাঠাইয়া দিতেন, যাহাতে উপরওয়ালা সাহেব মহোদয় তাঁহার উপরে প্রীত থাকেন এবং অসম্মানকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

কুকুরমুখো এ সকল মূল্যবান আনাজপাতি নিজে ক্রয় করিতেন না। 'বটু' নামে পুলিশের এক মহিষাকৃতি হাবিলদার হাটুরে, ঘাটুরে, পকেটমার, ছিনতাইবাজ প্রভৃতিদের নিকট হইতে কুকুরমুখো দারোগার ভেট হিসাবে আরো অনেক দ্রব্যের সহিত এ সকল দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিত।

কুকুরমুখো প্রবীর দারোগার প্রথমা স্ত্রী পাগলী দাসীকে দেখিতে ছিল অত্যন্ত কদাকার। সে কারণে

যা সত্য তা সবাই জানুক। পুলিশ অপরাধীদের মদত দেয়! কিভাবে?
রুণু গুহ নিয়োগীর
সাদা আমি
কালো আমি
১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে
প্রতি খণ্ড ৮০.০০ টাকা
- আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না, আমি ডি, সি, পোর্ট বিনোদ মেহেতো।
- ইদ্রিশ খুব অসুস্থ...। রাজকুমার ওকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে গেছে। আমিও যাচ্ছি। আপনি যাবেন?
M.L. DEY & CO. 13/1, Bankim Chatterjee Street, Kolkata-73.

তাহাকে অপছন্দ হওয়ায় কুকুরমুখো গোপনে পুলিশ অফিসের ঝাড়ুদারনি সুনন্দাকে গন্ধর্বমতে বিবাহ করেন। ঝাড়ুদারনির গাত্রবর্ণ ধবল হইলেও তাহার মুখাকৃতি ছিল গরুর ন্যায়, ড্যাবড্যাবে দুটি চক্ষু এবং গলার স্বর ছিল ভাঙা কাঁসরের ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঝ্যান্-ঝ্যান্' শব্দের ন্যায়। আস্তে কথা বলিলেও প্রেতিনীর কণ্ঠস্বর মনে করিয়া শিশু-কিশোরেরা ভয় পাইত। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন শিবপুরের লেঠেলবাড়ির দোতলায় প্রস্রাবাগারের নিকটে দুইজনে গোপন শলাপরামর্শ করিতেন—তখন প্রবীরের সহিত সুনন্দার বিকৃত কণ্ঠস্বর সহসা শুনিয়া অনেক বয়স্ক ব্যক্তিও চমকাইয়া যাইতেন। সে কারণে সকলেই তাহাকে 'সুনন্দা রাক্ষসী' বলিয়া অভিহিত করিত।

সুনন্দার প্রথম পক্ষের একটি কন্যাসন্তান ছিল। তাহার গলার স্বর ছিল বাঘিনীর ন্যায়। চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ এবং দেখিতে ছিল একটি ছোটখাটো হস্তিনীর স্বরূপ। সে প্রবীর দারোগাকে 'ধর্মবাপ' ডাকিয়াছিল। তাহার বিবাহের জন্য পাত্রের সন্ধানে একদিন সুনন্দা ও কুকুরমুখো মিলিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ভয়ঙ্কর ভিড়ভাট্টা। ধাক্কাধাক্কি খাইয়া দুইজনেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মনোমতো পাত্রের দেখা মিলিল না।

তখন রাগ করিয়া সুনন্দা বলিলেন, ' এ জায়গাটির নাম তো শিয়ালদহ। সেইজন্যেই এখানে সব শিয়ালের মতো পাত্র দেখা যাচ্ছে। ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি করছে। ছুটোছুটি করে পাল্লাচ্ছে গাড়ি ধরার জন্যে আর নামার জন্যে। এরকম পাত্র আমার বাঘিনী মেয়ের পছন্দ হবে না। তারচে' বরং বাঘাযতীন ইস্টিশনে চলো। বাঘের মতো পাত্রের দেখা মিলবে।'

প্রবীর দারোগা অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, 'হো-হো-হো-হো। বেশ বলেছ তুমি। বাঘাযতীনের বাঘের সাথে হাওড়ার হস্তিনী। বাঘ আর হাতিতে মিলবে ভালোই।'

সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা ফোঁস করিয়া উঠিলেন, 'কি বললি রে মুখপোড়া? আমার মেয়ে হস্তিনী? তাহলে তুই কি? তোকে তো সকলে কুকুরমুখে দারোগা বলে। অনেকে আবার গুপে দারোগা বলে, সেটা কি জানিস?'

কুকুরমুখো রাগে ফুলিয়া উঠিলেন, 'তোমাকেও তো সকলে সুনন্দা রাক্ষ বলে, সেটা কি জানো?'

এইরূপে দুইজনের মধ্যে জোর ঝগড়াঝাটি শুরু হইয়া গেল। তারপ শুরু হইল হাতাহাতি। বিকট চিৎকার.. তখন শিয়ালদহ স্টেশনে ভীষ রকমের গোলযোগ শুরু হইল। চারদিকে ধাক্কাধাক্কিতে বহু যাত্রী প্ল্যাটফ হইতে রেললাইনের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতে লাগিল। হিন্দুস্তানি মুটি কুলিরা লাল জামা ও পরনের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া ল্যাঙোট পরা অবস্থা বাথরুমের ক্ষুদ্র কক্ষগুলিতে ঢুকিয়া পড়িয়া হনুমানের নাম জপিতে লাগিল অনেকে আবার শিয়ালের ন্যায় প্রাণ বাঁচাইবার জন্য শৌচালয়ে গর্ত খুঁজি লাগিল। হকারদিগের খাবার-দাবার, খৈনি, ছাতু, ফল-সবজি মাটিতে লুটাপু খাইতে খাইতে কোথায় যে উধাও হইয়া গেল, তাহা বলা যায় না। তাহা জবরদখলের দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পেঁড়া-সিরনি মানত করিতে করি ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। টিকিট পরীক্ষকেরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জ স্টেশন প্ল্যাটফর্মের অ্যাসবেস্টসের ছাউনির উপরে উঠিয়া কালো কোটগু দুইহাতে উঁচুতে তুলিয়া ধরিতে লাগিল। তাহারা উচ্চৈস্বরে চ্যাচাইতে লাগি 'উগ্রপন্থী হানা দিয়েছে, কে কোথায় আছো। বাঁচাও। শিগ্গির মিলিটা পাঠাও।' রেলরক্ষীগণ পলাইয়া গিয়া মহাত্মা গান্ধী রোডের উপরে দাঁড়াই মহাত্মাজির উদ্দেশ্যে হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, যাহা সকলেই হিংসা পরিত্যাগ করে।

তখন সেই ভয়ানক গোলমাল থামাইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন শিয়ালদ প্ল্যাটফর্মের ও সি হাবিলদার মিস্টার ভট্টরাই। তিনি একখানি বেতের লা লইয়া নিজের টাক মাথায় ঠুকিতে ঠুকিতে ভিড় ঠেলিয়া কুকুরমুখ বড়দারোগা এবং সুনন্দা রাক্ষসীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'দোহাই হুজু দোহাই হুজুরানি, আপনারা এখুনি এখান থেকে সরে যান। না হলে দু'জনে মারা পড়বেন।'

কুকুরমুখো হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'আমাকে মারবে? কার এতবড় বুকে পাটা আছে শুনি? আমি আমি হচ্ছি শ্রীমান প্রবীর কুমার ..'

'ব্যস ব্যস, আর বলবেন না।' ও-সি হাবিলদার তাঁহাকে থামাইয়া দিয় বলিলেন, 'হুজুর, ওরা যে কামান নিয়ে আসছে।'

'কামান নিয়ে?' সুনন্দা রাক্ষসী বাজখাঁই গলায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন

'ঐ যে মিলিটারি। ফোর্ট উইলিয়াম খবর পেয়েছে, এখেনে উগ্রপন্থীর ঢুকে পড়েছে। তাই ওরা কামান নিয়ে ছুটে আসছে। তাদেরকে তোপ দে উড়িয়ে দেবে বলে।'

'তাই নাকি?' দুইজনেই তখন হাত ধরাধরি করিয়া প্রাণভয়ে ভিড়ের মধ দিয়া ছুটিতে লাগিলেন। কিন্তু অত ভিড়ের মাঝে, হুড়োহুড়ির ভিতরে, হা ধরাধরি করিয়া দৌড়াইতে গিয়া দু'জনেই ভিড়ের মধ্যে হোঁচট খাইয়া গড়াই পড়িলেন।

ও সি হাবিলদারের মুখে তোপ দাগিবার কথা আরো অনেকেই শুনিয়াছিল মুহূর্ত মধ্যে গোটা স্টেশন চত্বরে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, মিলিটারিরা কামা লইয়া আসিতেছে গোটা স্টেশনটিকে উড়াইয়া দিবার জন্য। ধাক্কাধা ছুটাছুটির মধ্যে গুপে দারোগা ও সুনন্দাকে মাড়াইয়া লোক চলিয়া গেল স্টেশন চত্বর ফাঁকা হইয়া গেলে দেখা গেল, গুপে দারোগা ও সুনন্দ ক্ষতবিক্ষত হইয়া কোঁ কোঁ করিতেছেন। গুপে চিঁ চিঁ করিয়া সুনন্দাকে সান্ত্ব দিলেন, 'এমন জানলে পুলিশ না হয়ে মিলিটারি হতুম।'

মননশীল পাঠকের অপরিহার্য সঙ্গী
শতবর্ষ সংকলন
* জীবনানন্দ : একদিন শতাব্দীর শেষে
* নজরুল : শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য
* তারাশঙ্কর : শততম বর্ধাপন
প্রতিটির মূল্য : ১২০ টাকা।
* কল্যাণ, দারিদ্র ও উন্নয়ন (অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সম্মানে প্রবন্ধ সংকলন)
মূল্য : ২০ টাকা
* পেটেন্ট অক্টোপাস : মূল্য ৫ টাকা।
বইমেলায় 'ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি' ও পত্রপাঠ(৯৪৮ নং স্টলে)-এ পাওয়া যাবে।
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

প্যাপিরাস নিবেদিত চিন্তার সাহিত্য

স্টল নং - ৬১২

সাহিত্য ও সমাজ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর
ঐতিহ্য ও পরম্পরা
উনিশ শতকের বাংলা ১২০

সৌরীন ভট্টাচার্যের
পরিবর্তনের ভাষা :
একটি সমকালীন প্রেক্ষা ৪৫

শিশিরকুমার দাশের
ভাষা জিজ্ঞাসা ৪০
কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল ৪০

হিতেশরঞ্জন সান্যালের
স্বরাজের পথে ১০০

জ্যোতির্ময় দত্তর
প্রবন্ধ সংকলন ৬০

অশোক সেনের
কথায় উপকথায়
বিদ্যাসাগর ৬০

মৈনাক বিশ্বাস স.
হেমাঙ্গ বিশ্বাসের
গানের বাহিরানা
সংকলিত সংগীত-বিষয়ক রচনা ১২০

রুশতী সেনের
বিভূতিভূষণ :
দ্বন্দ্বের বিন্যাস ৮০

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য-র
টীকাটিপ্পনী ৭৫

সুজিৎ চৌধুরী-র
প্রাচীন ভারতে
মাতৃপ্রাধান্য
কিংবদন্তীর পুনর্বিচার ৭০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
ভূতের বেগার ৫০

সুজিত সরকারের
বিশ্বকবিতার সহজপাঠ ৫০

দীধিতি বিশ্বাসের
নারদীয় শিক্ষা ৬০

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য স.
চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর
হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান ৮০

পলাশ বরন পালের
ধ্বনিমালা বর্ণমালা ১০০

শিবনারায়ণ রায়ের
স্বদেশ সকাল
স্বজন ১০০

শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত
জিজ্ঞাসা সংকলন ১০০

গুণময় মান্নার
ক্ল্যাসিক্যাল বাংলা
উপন্যাস ৮০

পথিক বসু সম্পাদিত
অন্য পথের সন্ধানে ৮০

রবীন্দ্রনাথ

পিনাকেশ সরকারের
রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক
বাংলা কবিতা ১০০

নরেশ গুহ স.
কবির চিঠি কবিকে
রবীন্দ্রনাথকে অমিয় চক্রবর্তী
(১৯১৬-৪১) ১২০

সুনন্দা দত্তর
রবীন্দ্র-কাব্যভাষা ১০০

সর্বানন্দ চৌধুরীর
বাংলা গীতসংকলনে
রবীন্দ্রনাথের গান
(১৮৮০-১৯১০) ১০০

শেখর সমাদ্দারের
নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ ৮০

চিন্মোহন সেহানবীশের
রবীন্দ্রনাথের
আন্তর্জাতিক
চিন্তা ৬০

গুণময় মান্নার
রবীন্দ্ররচনার
দর্শনভূমি ৯০

সুচিত্রা মিত্র ও
সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত
রবীন্দ্রসংগীতায়ন
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : ৩০ ও ৩৫

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রবীন্দ্রনাথ :
শিশু সাহিত্য ৫০

কবিতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সাপলুডো অথবা ঘরবাড়ি ৩০

সুমতীন্দ্র নাডিগ-এর
দাম্পত্যের গান ও অন্যান্য ৬০
অনু : সুবোধ সরকার ও মল্লিকা সেনগুপ্ত

জয় গোস্বামীর
উন্মাদের পাঠক্রম ১৫

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা.
সমীর দাশগুপ্ত স.
নির্বাচিত ব্রেখট ৮৫
(কবিতা ও গান)

মৌলিক ও অনুবাদ নাটক

গিরিশ কারনাডের
তুঘলক ৩০
অনুবাদ : চিত্তরঞ্জন ঘোষ
ও স্বপন মজুমদার
হয়বদন ৩০
রক্তকল্যাণ ৩০
অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

বিজয় তেণ্ডুলকরের
কন্যাদান ১৫

শেখর সমাদ্দারের
অপূর্ব গোলাপ ৪০

শিশিরকুমার দাশের
আকবর-বীরবল ২৫
বাঘ ২০ **সিন্দুক** ৩০

ডব্লু বি. ইয়েটস্-এর
দুটি নাটক একত্রে
প্রায়শ্চিত্ত /
পুনরুজ্জীবন ২০
অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু /সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

জাঁ পল সার্ত্র-এর
কপাট ৩০
অনুবাদ : নরেশ গুহ

নির্বাচিত ব্রেখট ৭৫
ছোটো নাটক
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

ম্যাক্সিম গোর্কির
রাতকুঠরি ৪০
অনুবাদ : শিবনারায়ণ রায়

কথাসাহিত্য

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
আধুনিক ভারতীয় গল্প
প্রথম-পঞ্চম খণ্ড : প্রতিটি ৬০

সুধীর চক্রবর্তীর
সদর মফঃস্বল ১০০

গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেস-এর
কর্নেলকে কেউ
চিঠি লেখে না ৩৫
সরলা এরেন্দিরা ও তার
নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য
করুণ কাহিনী ৬০
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
এ পরবাসে ৩০
অনুবাদ : কল্যাণী ঘোষ

সের্হিও রামিরেস-এর
গল্প সংগ্রহ ৬০
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পেটার বিকসেল-এর
গল্পসংগ্রহ ২৫
অনুবাদ : মাইকেল কটিনার /
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গুসতাভ ফ্লোবেয়ার-এর
মাদাম বোভারি ১৫০
তিনটি গল্প ২৫
অনুবাদ : সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

আলেক্স হেলি-র
শিকড়ের সন্ধানে ৬০
(The Roots-এর বঙ্গানুবাদ)

বরিস পাস্তেরনাক-এর
ডাক্তার জিভাগো ১৮০
অনুবাদ : মীনাক্ষী দত্ত ও
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গবেষণামূলক বিস্ফোরক উপন্যাস
অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা

অর্ধ-নারীশ্বরের উল্লেখ আছে হিন্দুশাস্ত্রে, বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে রাধা-বেশে কৃষ্ণ-সাধনার কথা—কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মোড়ক যখন খুলে যায়, মূলস্রোতের ভণ্ড সমাজ তখন ঘৃণায় শিউরে ওঠে—অর্ধ-নারীশ্বরদের তখন ঠাঁই হয় প্রান্তিক সমাজে—হিজড়া-খোলে। কতটুকু জানি আমার হিজড়েদের কথা! জানি কি যে হিজড়েরা সবাই শারীরিকভাবে স্বাভাবিক পুরুষ—কিন্তু মনের গভীর সবাই তারা নারী। এই অর্ধ-নারীদের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই, কিন্তু মূলস্রোতের মানুষই বেশ্যা-গমনের মতো এদের সম্ভোগ করে—অথচ এদের যৌনতা স্বীকৃত নয়। স্বাভাবিক নারীর মতো এরাও চায় প্রেমিক, স্বামী-সন্তান—কিন্তু অর্ধ-নারীদের এ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পায় না কোনোদিনই—তাই এরা *অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা*।

ENGLISH BOOKS

Susobhan Sarkar
ON THE BENGAL RENAISANCE 25/-
TOWARDS MARX 40/-

Sankha Ghosh
THE POET'S INTENTION 60/-
TRANSLATED BY
NITYAPRIYA GHOSH

Buddhadeva Bose
TAGORE : PORTRAIT OF A POET 60/-
AN ACRE OF GREEN GRASS 50/-

Brajendranath Seal
NEW ESSAYS IN CRITICISM 75/-

Shefali Moitra ed.
WOMEN HERITAGE AND VIOLENCE 125/-

Himani Bannerji
THE MIRROR OF CLASS
ESSAYS ON BENGALI THEATRE 200/-

R. K. Dasgupta
EAST WEST LITERARY RELATIONS 250/-

Sabyasachi Chatterjea
THE PALACE SUITE AND OTHER STORIES 120/-

Geraldine Hancock Forbes
POSITIVISM IN BENGAL 200/-

U R Anantha Murthy
LITERATURE & CULTURE 250/-
A J Thomas ed.

L. M. Banerjee
A FEW FRAGMENTS OF PERSIAN AND URDU POETRY 60/-

Bimalendu Dutta ed.
TAGORE ABROAD
From Modern Review
1912-1934 175/-

Sumit Sarkar
A CRITIQUE OF COLONIAL INDIA 160/-

Sisir Kumar Das
SAHIBS AND MUNSHIS
AN ACCOUNT OF THE COLLEGE OF FORT WILLIAM 200/-

Ananda Lal &
Sukanta Chaudhuri ed.
SHAKESPEARE ON CALCUTTA STAGE
A CHECKLIST 150/-

Pranati Dutta Gupta ed.
LYRICAL BALLADS AND ITS LEGACY 200/-

Souvik Raychaudhuri
THE CINEMATIC WILL OF RITWIK KUMAR GHATAK 195/-

Chinmoy Guha ed.
WHERE THE DREAMS CROSS T. S. ELIOT & FRENCH POETRY 200/-

পরিবেশিত বই
ঐ আসনতলে
'সপ্তক' দশকপূর্তি সংকলন
পুনরমুদ্রিত ৬০

প্যাপিরাস ।। ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪ ফোন : ৫৫৫-৬০৮১

PATRAPATH • February 2002 • Vol-2 Issue-7 • DL No-81 • Rs. 8.00

ড়দের সঙ্গে
নিয়ে ছোটরা
দখতে এসো
রবিন্দ ঘোষের
ছাটদের ছবি

ঙুড়লি

কাহিনী
সরোজ ঘোষ

সুরকার
মৃণাল রায়

শব্দগ্রহণ
প্রভাময় দাস

সম্পাদনা
অরবিন্দ ভট্টাচার্য

প্রচার
বিজয় রায়

অভিনয়ে
দেবরাজ রায়
সুমিত্রা মুখার্জী
নত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
উদয়ন ব্যানার্জী
ণাল দত্ত, চন্দন দাস
সুদেষ্ণা রায়
শিবানী ভট্টাচার্য
রাজেশ ভট্টাচার্য
ডঃ এ. কে. পাল
নিমাই লাহিড়ী
বন ঘোষ, মানা দে
সুবীর চক্রবর্তী
সুবীর দত্ত,
অনুপ ধাড়া
অশোক সাঁতরা
সঞ্জয় অধিকারী
দেবেশ মজুমদার
তপন মারিক
সঙ্গীতা, রূপসা,
লিকা, লুনা, সহেলী,
প্রয়াঙ্কা, শ্রেয়া ঘোষ
ও চিরঞ্জীত

কণ্ঠ সঙ্গীতে
ণ ভাদুড়ী, হৈমন্তী শুক্লা
শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়
সকত মিত্র, শম্পা কুন্ডু
তিম ঘোষ, সুশান্ত শীল

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

মার্চ-এপ্রিল ২০০২

পত্রপাঠ

২য় বর্ষ ।। ৮-৯ সংখ্যা

দাম : ৮ টাকা

বিদায় নেবার জন্য নয়

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

নারীবাদ
নারী বাদ!

বইমেলা ২০০২

পত্রপাঠ স্টল

কাঁধে ঝোলা! সেটাই তো হওয়ার কথা। সমরেশ মজুমদার বোধহয় সেই পথেরই পরিমাপ করছেন—সব খুইয়ে যে পথ ধরে ঝুলি-কাঁথা সম্বল সম্পাদক হিমালয় যাত্রা করবেন।

অটোগ্রাফ! নাকি বিস্ময়—পত্রিকাটা এখনো টিকে আছে!!

আপনা হাত জগন্নাথ!

হুম্ ! সামনে যে দেখছি শুধুই অন্ধকার ! পত্রপাঠ- এর ভবিষ্যৎ ভেবে গম্ভীর তারাপদ রায় । কিন্তু উদ্বিগ্ন লেখক -পত্নী মিনতি রায় । না- না, পত্রপাঠ নয়, তারাপদ রায়-এর আষাঢ়ে মুখ দেখে।

কর্তাটির উদ্ধারের আশা আর কি আছে? সম্পাদক-পত্নী বোধহয় এই ব্যাকুল প্রশ্নই করছেন সমরেশ মজুমদারকে।

ফটো : কৌশিক রায়

মার্চ-এপ্রিল ২০০২
২য় বর্ষ।। ৮-৯ সংখ্যা
দাম : ৮ টাকা

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী • শচীন মিত্র

কবিরাজের নাড়িজ্ঞান যদিবা কখনো পরিপক্বতা লাভ করে, পুরুষের নারীজ্ঞান তাদৃশ হইবার সম্ভাবনা প্রায় নাই। শাস্ত্রকার কহিয়াছেন—স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। তথাপি অসীম সাহসে নারীবাদী নারীচরিত্রের বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হইয়াছেন **সমরেশ মজুমদার, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, চরণ বৈরাগী** প্রমুখ। ফলাফল কী হইবে তাহা ঈশ্বরও জানেন কিনা আমাদিগের জানা নাই।

সম্পাদকীয় ☐৩ পত্রপাঠ জবাব ☐৪ সঙ্গীত দুঃসংবাদ ☐ ৯ পথঘাটের কিসসা ☐৯ রাশি চক্কোব ☐১১ পুরুষ মহল ☐২০ হাড্ডাহাড্ডি ☐ ২৫ সাহিত্য দুঃসংবাদ ☐২৭ জবর খবর ☐২৮ ধারাবাহিক কবিতা ☐৩৭ শিক্ষা সুসংবাদ ☐৪৪ সমাজ দুঃসংবাদ ☐৪৭ হেঁসেল☐৪৮ ট্যারা চোখে ☐৩০,৩৫ রসকেলি ☐১০,৩৮ কার্টুন ☐২,২৪,২৬,২৭,৩৮,৩৯ টীকা নিষ্প্রয়োজন ☐১৭,৪০

প্রচ্ছদ কাহিনী কে কাকে ভোগ করে • সমরেশ মজুমদার ☐১৬ নারী আবার নারীবাদী হল কবে • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ☐১৮ পুরুষরাই বিপজ্জনক • শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ☐২৩ নারী থাক বাদ • চরণ বৈরাগী ☐১৩ মহিলাক্রেসি • কৌশিক রায় ☐২১

গল্প দেখাশোনা • কুশিকনন্দন রায়বাহাদুর ☐৩১ আনবিক অথবা দানবিক গল্প • পল্লব চক্রবর্তী ☐৩৬ নারীবাদ নন্দিনী • মৈনাক মিত্র ☐৪১

নিয়মিত তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম• তারাপদ রায় ☐১২

পুরনো কাসুন্দি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর রচনা থেকে ☐ ৭

রসকাব্য দশটি পুরুষবাদী কবিতা • সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় ☐৬ হায় • অধীনানন্দ দাস ☐১০

এ ছাড়া পত্রপাঠ পুরস্কার দিচ্ছেন • পিনাকী ভাদুড়ী ☐৫ কার্টুন নেটওয়ার্ক বনাম নারীবাদ • সুবোধ সরকার ☐২৬ বন্ধ • অসীম কুমার রায় ☐২৯ সন্টুর কীর্তি • কাজী সারিন আফরোজ ☐৩৪ দেবা জানন্তি, বদন্তি নেহি • মুসুমুসু কলমচি ☐৪৬

প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ কর্মকার
অলঙ্করণ : পল্লব চক্রবর্তী • সিদ্ধার্থ কর্মকার • অরুণ সেন • শুভাশিস বসু
কর্ম সহায়ক : কৌশিক রায় • অচিন্ত্য কারক

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, সন্ধ্যা ৫-৯টা)
সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ণ রোড, কলি-১৯ , মুদ্রণ . দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

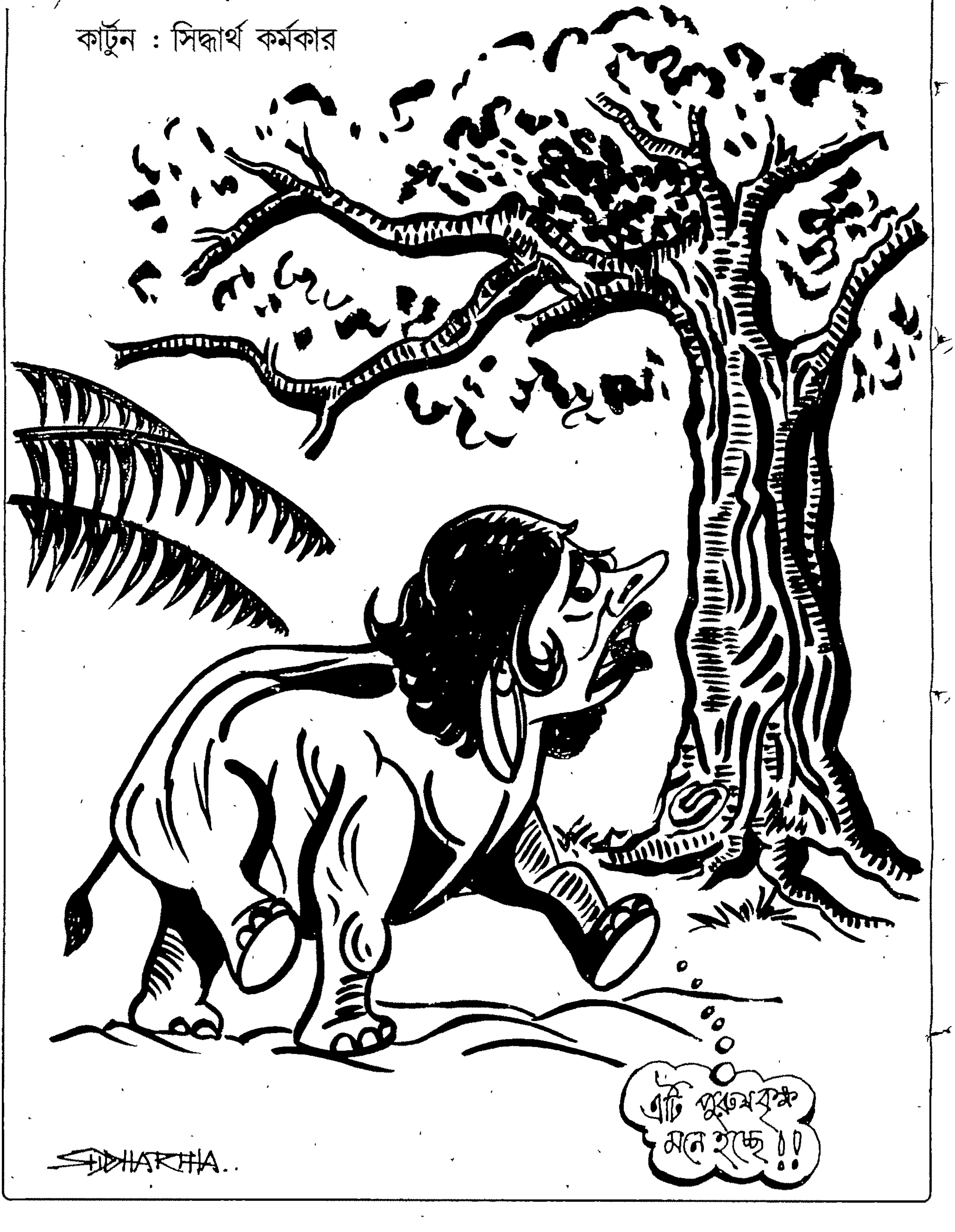
এটি পুরুষবৃক্ষ
মনে হচ্ছে !!
SIDDHARTHA..

সম্পাদকীয়

মেয়ে না...

মাতা দুর্গা অসুরকে রাম ঠ্যাঙানি দিয়া নারীজাতিকে জাগ্রত করিয়াছিলেন যে—আমরাও পারি। এখন আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ-টর্ষ তো তাহারই প্রতিক্রিয়া। একালের কালী-চামুণ্ডা-ছিন্নমস্তাগণের উল্লাসের আর সীমা নাই। সাবান কাচা, হেঁসেল সামলানো তো বটেই, এনারা বলিতে শুরু করিয়াছেন যে পুরুষকে এমনকি গর্ভধারণও করিতে হইবে। হতভাগ্য বিধাতার যাবতীয় কর্মসূচী রূপায়ণ একেবারে রসাতলে। আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলে মাতা-মাতামহী-পিতামহীগণ কত কষ্টেই না ছিলেন ভাবিয়া ইঁহাদের কষ্টের আর শেষ নাই। সেই কষ্টে তাঁহারা লাফাইতেছেন ঝাঁপাইতেছেন নাচিতেছেন ছুটিতেছেন ফুটিতেছেন—কী করিবেন আর ভাবিয়া পাইতেছেন না। কেহ কাকুর সহিত প্রেম ফাঁদিয়া হাসিয়া-কাঁদিয়া অস্থির, কেহ বা চাচা-খুড়া-ভাই—সকলেরই কামনা ও আকর্ষণের একমাত্র বস্তু হিসাবে নিজেকে জাহির করিয়া চেল্লাইতেছেন। ইঁহাদিগের দাপটে পুরুষগণ পিছু হটা কা কথা, সম্মিতি-টমিতি গঠন করিয়াও বাঁচিবার শেষ চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতীদিগের জয় হউক। কেবল মা-ঠাকুমাগণ, এই প্রবল স্রোতোবেগও যাঁহাদিগের শরীর-মন হইতে অমার্জিত অসংস্কৃত পুরাতনী গন্ধ দূর করিতে পারে নাই, তাঁহারা ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিতেছেন—এরা মেয়ে না মন্দ!!

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● যে ভেরীনিনাদ ও আড়ম্বর পূর্ণভাবে তোমার "পত্রপাঠ" শুরু করেছিল, তা দেখেই আমার ভয় হয়েছিল—ও তো থাকার জন্য আসেনি।

—নির্মল সেনগুপ্ত, কলকাতা-৬

□ ভয় পাওয়ার মার্শাল আর্ট একটু শিখিয়ে দিয়ে যাবেন তো! কিছুতেই রপ্ত করতে পারছিনে।

● শারদীয় ১৪০৮ সংখ্যার পত্রপাঠে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে লিখতে গিয়ে বোর্ডের সভাপতি আব্দুস সাত্তার সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা নিয়ে বিতর্কে না গিয়েও বলতে পারি, সম্পাদক নিজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হয়ে একজন পদাধিকারী সম্পর্কে এমন কটু সমালোচনাকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্যায় কাজ করেছেন।

—লিয়াকৎ চৌধুরী, মালদা

□ আমরা সম্পাদককে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে দাউদ ইব্রাহিম, আফতাব আনসারি, চুন্নু মিঞা থেকে শুরু করে সব মিঞাভাইদের সম্পর্কে প্রশস্তিবাণী তিনি যেন ধারাবাহিক ছাপেন। তালিকায় ঠাঁই পেতে চাইলে অচিরাৎ আপনার কীর্তিকলাপ লিখে পাঠান।

● 'পত্রপাঠ' ঠিক কাদের মুখপত্র?

—সুচিত্রা বসু, কলকাতা-৯

□ মুখখুদের।

● অযোধ্যার বিতর্কিত জমিটির সমস্যার কোনো সহজ সমাধান হতে পারে বলে আপনারা মনে করেন?

—সনৎ কুমার মুখার্জী, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা

□ নিশ্চয়। কবে থেকে ভেবে রেখেছি। একজন জাঁদরেল প্রমোটারের হাতে জমিটি তুলে দিতে হবে। লিফ্‌ট, মার্বেল ফ্লোর, গ্যারেজ স্পেস, সিকিউরিটি—সরকার ভালো পয়সা পেতে পারেন। আর হ্যাঁ, একটি করে ফ্ল্যাট বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটিকে দিতে হবে। সেখানে অফিস খুলে তাঁরা মন্দির-মসজিদ বিতর্কটি জিইয়ে রাখবেন যাতে ভোটের সময় নিজ নিজ পেয়ারের দলের পালে হাওয়া লাগানো যায়।

● আচ্ছা, ওসামা বিন লাদেন কি সত্যিই মারা গেছেন?

—দিগেন্দ্র রায়, চুঁচুড়া, হুগলী

□ দেখা হলে জিজ্ঞেস করে জানাব। আপনি যোগাযোগ রাখবেন।

● দুটি মূল্যবান কবিতা পাঠাচ্ছি। ছাপলে খুশি হব।

—তপোধর পাত্র, বর্ধমান

□ দুটি বিজ্ঞাপন পাঠান। কবিতাদুটি ফেরত দেওয়ার আগাম প্রতিশ্রুতি রইল।

● তারাপদ রায় কি পত্রপাঠ গঙ্গাযাত্রা করেছেন নাকি?

—বিপুল কুমার দাস, কদমতলা, হাওড়া

□ একটু ভুল হল। তিনি গঙ্গারাম-যাত্রা করছেন—এই সংখ্যা থেকেই।

● আপনারা কী কী শর্তে পুরস্কার প্রদান করতে রাজি আছেন?

—বিদিশা মাইতি, মেদিনীপুর

□ মাটি করলেন। পর্দার আড়ালের কথা আড়ালেই জিজ্ঞেস করতে হয়।

● এবারের বাজেটে বিলিতি মদের দাম কমেছে। দিশি মদের দামও কমা উচিত ছিল না কি?

—হরেন সাধুখাঁ, এন্টালি, কলকাতা

□ আপনার সঙ্গে আমরা একমদ।

● সল্টলেকে দুনিয়ার যৌনকর্মী এক হয়ে শান্তি-উৎসব করলেন।। আয়োজক ছিলেন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি। শুনলেই কেমন মার-মার মনে হয়। এরকম নাম কেন? *—সুচরিতা গোস্বামী, গোবরডাঙ্গা*

□ এক্ষেত্রে আমরা মৌনকর্মী।

● আপনারা হঠাৎ তিলোত্তমাকে নিয়ে পড়েছেন কেন? উনি কার পাকা ধানে মই দিয়েছেন? *—সুকুমার আদক, পলাশি , নদীয়া*

□ মই দিলে তো আর কথা ছিল না রে ভাই, বই দিচ্ছেন যে।

‘পত্রপাঠ’ পুরস্কার দিচ্ছেন

ফেরৎ ডাকে পুরস্কার প্রার্থী চাই

এই প্রথম, প্রথম বছর শেষ হয়ে যেতে না যেতেই এবারে ‘পত্রপাঠ’ পত্রিকা বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার দেবেন বলে স্থির করেছেন। এই প্রকল্পটির জন্য বিচারকমণ্ডলী নির্বাচনের কাজ চলছে। তাঁদের খাম-খেয়ালের উপরেই নির্ভর করবে প্রাপকের অযোগ্যতার বিচার। এই অযোগ্যতাই হবে মূল চাবিকাঠি। যাঁরা আবেদন করবেন তাঁদের জন্য কিছু শর্ত থাকছে। সেগুলি মিলিয়েই আবেদন করতে হবে, নচেৎ আবেদনপত্র খারিজ হয়ে যাবে।

প্রথম বছরে কেবল ‘সাহিত্য’ বিষয়েই অযোগ্যতা নির্ধারণ করা হচ্ছে। ক্রমশ বিজ্ঞান, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়েও ভাবা হবে। অবশ্য পুরস্কার পদ্ধতিটি হবে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, কারণ বিজ্ঞান সঙ্গত বা বিজ্ঞান সম্মত কোনো উপায় যদি অবলম্বন করা হয়, তবে এদেশে কেউই পুরস্কারের যোগ্য হবেন না। আমাদের দেশে এখন মিডিওক্রিটির জয়জয়কার চলছে। এমন সাহিত্যিক নেই যাঁর লেখা পুরোটা পড়া যায়। যদি বা কেউ জোর করে পড়েন, তিনি সেটি আর একবার পড়তে চাইবেন না এবং কয়েক বছর পরেই সেটি বিস্মৃত হয়ে যাবে। তথাপি প্রকাশক মহল সবাই ভুলে যাবার পরে আরো একবার বিজ্ঞাপনের (বিজ্ঞানের নয়) ঢক্কানিনাদ শুনিয়ে ঐ বিগত, বিস্মৃত বইগুলিকে আর একবার মুদ্রিত করে মুদ্রা রোজগারের চেষ্টা চালিয়ে থাকেন। আমরাও ভালো বই পড়তে না পেয়ে পেয়ে এইগুলিকেই গ্রহণ করে থাকি। এঁদের দু’একটি লেখা যদি হঠাৎ ভালো লেগে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেগুলি কোনো ইংরেজি বই থেকে টোকা। অনেকেই জানেন সে কথা, কিন্তু বলেন না। যাঁরা বই লিখছেন তাঁরাও জেনেছেন যে তাঁরা লিখতে পারেন না, কিন্তু নাম হয়ে গেছে বলে ছাড়তেও পারছেন না। এখন আর তাঁদের পক্ষে আলুর দোকান করা সম্ভব নয়, যদিও ওইটিই তাঁদের ঠিক লাইন ছিল। গতানুগতিক শ্রেণীর সাহিত্যিক না হয়ে ভালো দোকানদার হলে তাঁদের ভালোই হত। বই লিখে টাকা কামানোর বদলে আলু বেচে টাকা জমালে তাঁরা বড় ইনড্রাস্টিয়ালিস্ট হতে পারতেন। এখন সেলুনের নামে বিউটি পার্লার হয়েছে, চুল-দাড়ি কামিয়েও টাকা কামাতে পারতেন তাঁরা। ইংরেজি নামকরণে বাংলা প্রণামী পেতেন।

এবারে পুরস্কারের জন্য অ-যোগ্য পদের উপযুক্ত আবেদন চাওয়া হচ্ছে। উপযুক্ততার (বা অনুপযুক্ততার) নিদর্শন হিসেবে এই তথ্যগুলি পেশ করতে হবে—

সমস্ত লেখা ‘পত্রপাঠ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া চাই। দেশের অন্য কোনো বাজারের সাহিত্য গ্রাহ্য হবে না, তা যত আনন্দই দিক না কেন। যিনি প্রার্থী, তিনি মহিলা হলে সর্বাধিকার পাবেন। সুন্দরী হওয়া জরুরি, নিদেন সুশ্রী তো হতেই হবে। আধুনিকা এবং প্রগল্‌ভা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভুল বাংলা এখন সবাই লেখেন; সেইটি এখন অতিরিক্ত সম্পদ হবে। ‘পত্রপাঠ’ পত্রিকায় নামকরা সাহিত্যিক অনায়াসে ‘প্রশ্ন রাখছি’ লেখেন। এঁরা সরাসুরি সাহিত্যের অযোগ্য এবং সেজন্যই পুরস্কারের যোগ্য। যাঁরা ‘বক্তব্য বলেন’ না, ‘বক্তব্য রাখেন’ তাঁদের আমরা কোথায় রাখি ভেবে পাইনি, তাই তাঁদের পুরস্কার দিতে পারব। এই পুরস্কার তাঁদের জীবনে তিরস্কার হয়ে দেখা দেবে কিনা, এইটা ‘পত্রপাঠ’ বলতে পারবে।

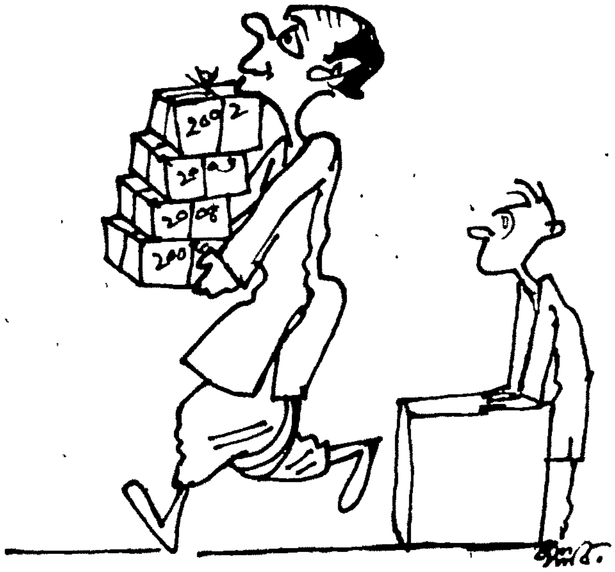

যদি কোনো পুরুষ প্রার্থী হন, তবে তাঁর একটি সঙ্গিনী থাকা চাই যিনি খুনখারাপি হাসি হাসতে পারেন, সবার সঙ্গেই যিনি সখ্যও ‘(?) পাতাতে পারেন।

সমগ্র বিষয়টির জন্য, অর্থাৎ অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য এই সাহিত্যিক (যদি তাঁকে সাহিত্যিক বলা যায়) কীভাবে এগোচ্ছেন, কাকে ধরাধরি করছেন—এটাও জানাতে হবে।

শর্ত—‘পত্রপাঠ’ পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরাই এই পুরস্কার পাবেন। আমরা ইন-হাউস পুরস্কারে বিশ্বাসী। যাঁরা এই পত্রিকার সম্পাদকের দ্বারস্থ হবেন, অথবা সম্পাদকের স্ত্রী-পুত্রের পেয়ারের লোক হবেন, তাঁরাই কেবল আবেদন করতে পারবেন।

অতএব যাঁরা এখনো যোগাযোগ করেননি, সম্পাদকের স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দেননি, পুত্রকে নিয়মিত আইসক্রিম খাওয়াননি, তাঁরা তৎপর হোন।

পুরস্কারের জন্য আবেদন করার কোনো শেষ দিন নেই। আপনারা আবেদন করতে থাকুন, আমরাও নানা মতলব ভাঁজতে থাকি। অনুপযুক্ত আবেদন না পেলে আমরা পুরস্কার না-ও দিতে পারি। সেক্ষেত্রে এ বছরের আবেদন পরের বছরে ব্রট ফরোয়ার্ড হবে।

পুনশ্চ : এ ধরনের পুরস্কার দেশের বাজারে যদি থাকে, তবে মিল খুঁজে পেলে কাকতালীয় ভাববেন না। কারণ তাল আমাদের একটাই। সে তাল টিপ্ করে পড়ে, না পড়ে টিপ্ করে, সে বিচার কে করবে? কে?

—পিনাকী ভাদুড়ী

দশটি পুরুষবাদী ছড়া

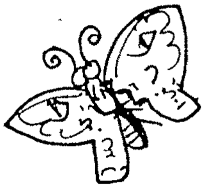

সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

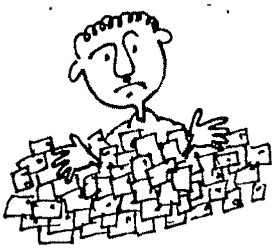

করতে চাও কি বিয়ে-শাদি?
বউ বেছো না নারীবাদী।
বাক্যবাণের বেদম ঠেলায়
রুগ্ন হয়ে রোজ দু'বেলায়
গিলতে হবে "সারিবাদি"।

★

সুখী বিয়ের গোপন কথা
জানতে কি চাও, বলছি শোনো—
সেই কথাটা গোপন আছে
গুরুর থেকে আজ এখনও।

★

"সত্যিকারের সুখ যে কেমন—
জানতাম না বিয়ে না হলে,
কিন্তু তখন হয়ে গেছে
অনেক দেরি"—পুরুষ বলে।

★

সুখী বিয়ের চাবিকাঠি
জেনো শুধুই "দেওয়া-নেওয়া",
স্বামী শুধু দিয়েই যাবে
স্ত্রীর কপালে জুটবে মেওয়া।

★

বউ বললে বরকে, "তোমায়
করেছিলাম বিয়ে যখন,
আজ মনে হয় ভাবলে সেটা—
নিরেট বোকা ছিলাম তখন।"
"বিয়ের সময় প্রেমের নেশায়
অন্ধ তখন ছিলাম আমি,
বুঝতে সেটা পারিনিকো
সেই কারণে"—বলল স্বামী।

★

"এই কথাটা সত্যি নাকি?"
পুত্র শুধায় বাপকে ডেকে—
"দু-এক দেশে বিয়ের সময়
চেনেই নাকো বর কনেকে?"
বালক ছেলের প্রশ্ন শুনে
বাবা তখন বললে হেসে,—
"এই ঘটনা এক দেশে নয়,
রোজই ঘটে সকল দেশে।"

★

"বউ দরকার"—দৈনিকেতে
পুরুষ দিল বিজ্ঞাপন,
পরদিনেতেই তার বাড়িতে
চিঠির বোঝা কয়েক মন
পৌঁছে গেল। সব চিঠিতে
একটি কথাই কেবল লেখা—
"আমার বউকে নিতে পারো,
এই ঠিকানায় করো দেখা।"

★

বিয়ের পরে প্রথম বছর
মেয়েরা শোনে, পুরুষ বলে,
দ্বিতীয় বছর পুরুষ শোনে,
মেয়েরা কথা বলেই চলে।
তৃতীয় বছর স্বামী-স্ত্রীতে
চলে প্রবল রেষারেষি
কথা বলার; শোনে শুধুই
পাড়ার যত প্রতিবেশী।

★

বিয়ে করা, তা যেন ঠিক
খেতে যাওয়া রেস্তোরাঁতে
ইয়ার-বন্ধু সঙ্গে নিয়ে,
খাবার যখন আসবে পাতে
তোমার নিজের 'অর্ডার' মতো,
বন্ধুরা কী খাচ্ছে দেখে
ভাববে তুমি, ভালো হত
তাদের খাবার দেখলে চেখে।

★

বউকে তোমার চুরি করে
অন্য পুরুষ নিজের ঘরে
নিয়ে গেলে, তোমায় বলি,
বদলা নেবে কেমন করে।
বউকে তোমার থাকতে দিও
তার কাছেতেই, দেখবে তবে—
অন্য পুরুষ বউ-এর কাছে
অল্প দিনেই জব্দ হবে।

পুরনো কাসুন্দি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র রচনা থেকে

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদেব তেমন পাবে।।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেবে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলিতী বোল কবেই কবে।।

* * *

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া।
ঠাঁঠ ঠমকে চালাক চতুর,
সভ্য হবে থোড়া থোড়া।।
আব কি এবা এমন কোরে,
সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে?
আব কি এরা আদর কোরে,
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
কপালে যা লেখা আছে,
তাব ফল তো হবেই হবে।
(এরা) এ বি পোড়ে বিবি সেজে,
বিলিতী বোল কবেই কবে।
(এরা) পর্দ্দা তুলে ঘোম্‌টা খুলে,
সেজে গুজে সভায় যাবে।
ড্যাম্ হিন্দুয়ানী বোলে,
বিন্দু বিন্দু ব্রাণ্ডি খাবে।
আর কিছুদিন থাক্‌লে বেঁচে,
সবাই দেখতে পাবেই পাবে।
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে।*

* * *

যৌবন গিয়েছে ঢোসে, শরীর পড়েছে খোসে,
তবু আছ ঠিক্ বোসে, ঠোঁটে দিয়ে কস্ লো,
ঠোঁটে দিয়ে কস্।
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর,
এখন' লাবণ্য তোব, কবে টস্ টস্ লো।
করে টস্ টস্।।
তোযারি তোমাব চেয়ে, এমন কে আছে, মেয়ে,
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ লো,
কর সব বশ।
তুমি দিদি কল্পলতা, সমাদর যথা তথা,
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো,
সবে গায় যশ।।
স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম,
বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে দিক্ দশ লো,
ছোটে দিক্ দশ।
দল হীন হ'লো কলি, তমথাচ মোহিত অলি,
হ্যাঁলো দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রস লো,
তবু এত রস।।

* * *

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর রচনা থেকে

১

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দেই—
আর তোমরা বসিয়া খাও।
আমরা দুপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি—
আর তোমরা নিদ্রা যাও।
বিপদে আপদে আমরাই প'ড়ে লড়ি,
তোমরা গহনা পত্র ও টাকা কড়ি
অমায়িকভাবে গুছায়ে পাল্কী চড়ি'—
দ্রুত চম্পট দাও।

২

সম্পদে ছুটে কোথা হ'তে এসে পড়,—
আহা! যেন কত কাল চেনা;
তোমরা দোকানী, সেক্‌রা, পসারী ডাক—
আর আমাদের হয় দেনা।
সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি',
—নব কার্ত্তিক আর কি!—আদরে গলি',
"প্রাণবল্লভ, প্রিয়তম, নাথ" বলি—
কৃতার্থ ক'রে দাও।

৩

তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও—
ভয়ে আমরা স্তব্ধ রই;
আমরা কহিতে পাছে কি বেফাঁস বলি,
সদা সেই ভয়ে সারা হই।
কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি'—
আমরা যেন বা কতই না অপরাধী;
পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি,
তবু ফিরে নাহি চাও।

৪

আমবা বেচারী ব্যবসা, চাক্‌রি করি—
আর তোমরা কর গো আয়েস;
আমরা সদাই মুনিব-বকুনি খাই—
আর তোমরা খাও গো পায়েস।
তথাপি যদি বা তোমাদেব মনোমত
কার্য্য করিয়া না পুরাই মনোরথ,
অবহেলে চ'লে যাও নেড়ে দিয়া নথ,
অথবা মরিতে ধাও।

৫

আমরা দাড়ির প্রত্যহ্ অতিবাড়ে
রোজ জ্বালাতন হ'য়ে মরি;—
তোমাবা সে ভোগ ভুগিতে হয় না; থাক
খাসা বেশবিন্যাস করি।
আমরা দুটাকা জোড়ার কাপড় পবি,—
তোমাদের চাই সোনা দশ বিশ ভবি,
বোম্বাই বারাণসী বছব বছরই,
তবু মন উঠে না ও।

সঙ্গীত দুঃসংবাদ

কেলাব-এর গান

না, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আমাদেরি বাংলা", জীবনানন্দেব "রূপসী বাংলা" অথবা কপিরাইট পরিত্যক্ত রবীন্দ্রনাথের সুরধন্য "আমার সোনার বাংলা"ও নহে, 'তারা বাংলা' চ্যানেলের অডিও ক্যাসেট বিপণন বিভাগের অসীম বদান্যতায় একটি জগাখিচুড়ি "ক্লাব বেঙ্গল"-এর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই অডিও ক্যাসেটটিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের খোল-করতাল-ড্রাম আর সিন্থেসাইজার-এর ঘ্যাটচচ্চড়ি দ্বারা সর্বশ্রী মান্না দে, সলিল চৌধুরী, রাহুল দেব বর্মণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য আর বাউলদের পিণ্ডি চটকাইয়া বিজাতীয় সঙ্গীত তর্পণ করিয়াছেন অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয় এবং আরো কিছু বেনামি 'বিমিক্স' কণ্ঠশিল্পীরা।

"ক্লাব বেঙ্গল"-এর গুণী নির্মাতাদের পক্ষ হইতে অবশ্য দাবী করা হইয়াছে—তাঁহারা এই ক্যাসেটের মাধ্যমে বাংলা গানের আত্মা নূতন অবয়বে, নূতন আঙ্গিকে উপস্থিত করিতে দৃঢ়সংকল্প। সেই অর্থে এই ক্যাসেটকে নাকি কোনো প্রকারেই "বিমিক্স" বা খিচুড়ি অ্যালবাম বলা যায় না। শুধুমাত্র বাংলার সাম্প্রতিক প্রজন্মের হৃদয়ে সঙ্গীতের ছিন্ন তারটি তাঁরা যুক্ত করিতে চাহেন। তবে "তিন ভুবনের পারে" চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা সৌমিত্র ও তনুজা এবং সর্বশ্রী মান্নাবাবু যদি এই ক্যাসেটে 'জীবনে কি পাবো না' গানের সশব্দ ব্রেকড্যান্স রূপটি শোনেন—তাহা হইলে তাঁহারা সত্যসত্যই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—তিন ভুবনের পার ছাড়াইয়া মহাশূন্যে বিলীন হইতে চাহিবেন। পঞ্চমদা'র দুর্ভাগ্য, তিনি শুনিয়া যাইতে পারিলেন না তাঁর "শোন মন বলি তোমায়" গানটিতে অভিজিৎ কীভাবে যন্ত্রমানবের অর্থাৎ রোবটের স্বর নকল করিয়াছেন। বাবুল সুপ্রিয় সলিল চৌধুরীর "দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক" গানটি গাহিয়া "ক্লাব বেঙ্গল" ক্যাসেটটির শুভ-সূচনা করিয়াছেন। তবে যে পাক তিনি দিয়াছেন তাহাতে হেমন্তবাবুর স্মৃতি ভুলিযাও জাগ্রত হয় নাই, বরঞ্চ বাবুল নিজেই গিটার সিন্থেসাইজার এবং ড্রামের চর্কিপাকের মধ্যে সাবানের 'বাবল্' বা বুদবুদ্ হইয়া মিলাইয়া গিয়াছেন।

—কৌশিক রায়

পথঘাটের কিসসা

কিছুদিন আগের খবর—ভূগর্ভ বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে কলকাতার ভূগর্ভে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিদ্‌দের এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় প্রকাশ যে কলকাতা নাকি তেলের ওপর ভাসছে।

শিয়ালদা সাউথ স্টেশনে জনৈক হকার দৈনিক সান্ধ্য পত্রিকা হাতে নিযে চিৎকার করে বলতে লাগল—"জোর খবর—কলকাতার মাটির নিচে তেল।" জনৈক স্টেশনচারী তেলের খবর শুনে চেঁচিযে মন্তব্য করল—"জোর খবর, কলকাতার মাটির নিচে তেল, মাটির ওপরে তেলেভাজা।"

টিকিট কাউন্টারের কাছে এক ভদ্রলোক এক হাতে টিকিট ও অপর হাতে একটি 'পত্রপাঠ' নিযে পড়তে পড়তে চশমার ওপর দিযে একবার দেখে নিযে জিজ্ঞেস করলেন—"এই যে ভাই, কোন কাগজে তেলেভাজা, দেখি?

স্টেশনচারী—তেলেভাজা? মির্জাপুর স্ট্রিট ধরে যান না। শিয়ালদা থেকে কলেজস্কোয়ার, রাস্তার দু' ফুটপাতে রাশি রাশি পেঁযাজি, আলুর চপ, বেগুনি, ফুলুরি, ডালবড়া। যত খুশি খান না।

"সত্যি, একদিন তো মির্জাপুর পটুয়াটোলার মোড়ে গরম তেলের কড়ায় পড়ে ভাজা হয়ে যাচ্ছিলুম। রাখে হরি মারে কে।"

এক ভদ্রলোক উল্টোদিকে মুখ করে দাঁড়িযে ছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িযে জিজ্ঞেস করলেন, "কর্পোরেশন এসব দেখে না? রাস্তাঘাটে এইসব চলছে। পৌরপিতারা নেই?"

"ওঁদের সময় কোথা? রক্তদান শিবির, ফাংশান, লঞ্চে পিক্‌নিক—এইসব দেশ উদ্ধারের কর্মযজ্ঞে রয়েছেন। আর কলকাতার লোক? তেলপ্রেমী মানুষ সব। তেলেভাজা খায় বটে তবে তেল দিতে ভালোবাসে তার চেয়ে বেশি।"

"খায় বটে কি বলছেন? তেলেভাজা জিলিপি খেয়ে খেয়ে এখানকার লোকের চেহারাও পাঁপড়ভাজা হযে গেল। বদহজম, দাদ, চুলকুনি, ঘামাচিতে ভরে গেল। পেটের মধ্যে সর্বদাই ভুট্‌ভাট্ ফুটফাট্।"

হঠাৎ একজন ফেরিওয়ালা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসে হাঁকতে লাগল—"যা খুশি খান, কাঁচা আমলকি খান। চোঁযা ঢেঁকুর, গলাজ্বালা, গ্যাস, অম্বল, পেট ফাঁপা, পেট গুড়্ গুড়্—ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ করবেন না, লজ্জা করবেন না। কাঁচা আমলকি চিবিযে খান, শুকনো আমলকি ভিজিযে খান। দাম মাত্র এক টাকা।"

"এই যে ভাই, একটা দাও তো।"

নিমেষে প্যাকেট ফাঁকা, সার্থক ফেরিওয়ালার হাঁকা।

—বরুণ ঘোষ

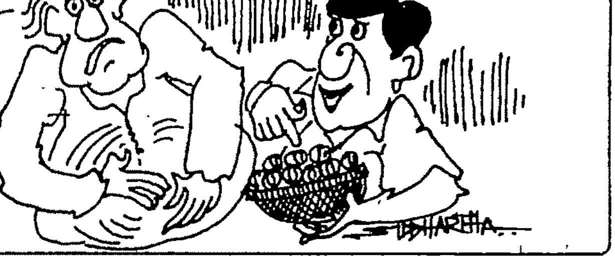

মেয়েগুলা আসিয়াছে এই দেশে এলাচের দ্বীপের থেকে
আর, তারা তাই মৌমাছি নাই,
ফড়িং-এর মতো বা প্রজাপতিটির মতো হয়ে গেছে,
ঘর বাঁধিবার কোনো কথা তারা শোনে নাকো আজকাল,

হায়!

অধীনানন্দ দাস

১

মানবীর মুখে কোনো প্রিয় আমি কোনোদিন কখনো দেখি নাই।
তেল তেল ডিমের মতো মুখে.... আমি আর কোনোভাবে শুনি নাই
মুরগির কোঁ.... হাঁসের ছানার মতো তাহারা
কেবলই মুখের 'পরে প্যাঁক প্যাঁক বলিয়া গিয়াছেন;
নিমেষ তরেও, ছন্নছাড়া দাড়ি মুখে খোঁজে নাই হবতনি সিম্বল;
হাঃ—ভাগ্য হে, হোঃ, শুধুই ফুটবল
সেণ্ট্রাল ফবোয়ার্ডে কিক্ দেয রমণীয় হাইহিল।

২

দু'দশ দিনেব তরে আসি নাই আমি এই কাবাগারে।
সিমের বীজের মতো উচ্ছল বাঁচিবার সাধ,
যেমন কুচাযে রাখে মাসিমারা বটিতে, বাটিতে,
তেমনই হ'তেছি কুচিকুচি;
হায় দিন নাহিকো কোথাও, হায রাত...
অসীম আলুর মতো চাপা আছি স্বপ্ন জমিনে;
কারাগারে, শ্যালাধরা স্যাঁতা গন্ধ দেহে
লুনাটিক পিণ্ড কবে ধুকপুক লুনা নাম্নী নদীটির মতো।
সব মেয়ে ঘরে ফেবে—সব মেযে—
তেষ্টার বুকে হাঁটু রেখে, হায়, মরুভূমি বুকে
জলেব কলসি কাঁখে ট্যুরিজমে আসে।

৩

মেযেগুলা আসিয়াছে এই দেশে এলাচের দ্বীপের থেকে
আর, তারা তাই মৌমাছি নাই,
ফড়িং-এর মতো বা প্রজাপতিটিব মতো হয়ে গেছে,
ঘর বাঁধিবাব কোনো কথা তারা শোনে নাকো আজকাল,
শোনে না, অথচ তবুও বারেবার
ঘটকেবা এ জীবনে আসে যায় গণতন্ত্রেব মতোই
বাতাসা ছড়াযে দেয পথে পথে, কার্নিশে, উঠানে—
হবির লুটের মতো, আমি
লক্ষ্মীর লুট পেতে বসে আছি, অনিশ্চিত..

খেয়াল

অনেকদিন থেকে পাযেব নখ কাটা হয়নি। জুতোর মধ্যে, মোজার মধ্যে পাযের নখ যে বড় হযে গেছে তা খেয়াল কবিনি।

বাজার করে আসার সময়, আজ রবিবাব, চেনা মুচির সামনে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম নখ কাটাব জন্য। মুচি যে নাপিত নয়, তা তখনো খেযাল করতে পারিনি। খেযাল হল, যখন পায়ে পেবেক পুঁততে শুরু করে দিলে মুচি। চেঁচিযে উঠলাম,—আহা-হা, করছ কি, কবছ কী? উঃ। পায়ে পেবেক পুঁতছ কেন?

মুচি বললে,—বাবু, হাম খযাল নহি কিয়া। ম্যাযনে চটি সমঝা।

—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

রাশি চক্কোর

জ্যোতিষসাস্ত্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

[আমাদের জ্যোতিষাঁড়নবজ্জি অন্যের ভবিষ্যৎ গণনায় এতই মগ্ন ছিলেন, নিজের ভবিষ্যৎটি যে একেবারেই অন্ধকার—তা আর খেয়াল করেননি। নামের মধ্যেকার ষাঁড়টি এমন না ব'লেকয়ে শিং বাগিয়ে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং ষাঁড়ের গুঁতোয় ষাঁড়নবজ্জি রাশি চক্কোর ছেড়ে একধাক্কায় হাসপাতালের শয্যাচক্কোর আশ্রয় করবেন—তা আর কে জানত। অগত্যা তাঁর জীবিত আত্মার শান্তি কামনা করে হাল ধরছেন জ্যোতিষ সাস্ত্রী মহারাজ, যতক্ষণ না তাঁর নামের মধ্যেকার সাস্ত্রীমশায় রাস্তায় নেমে তলোয়ার বাগিয়ে ধরেন।]

সমাজ সেবিকা রাশি: এই মাসে আপনার কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির যোগ লক্ষ্য করা যায়। নির্যাতিতার পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় জয়লাভের সম্ভাবনা আছে। তবে রাহুর চক্রান্তে স্ত্রী-হারা যুবকের প্রেম আপনার দিকেই বাহুবিস্তার করতে পারে, এবং আপনার ধরাশায়ী হওয়ার ষোলোআনা সম্ভাবনা।

বিবাহিতা নারীবাদী: অর্থাৎ গৃহিনী। আপনার দীর্ঘদিনের সংগ্রাম সফলতার দ্বারপ্রান্তে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শনিবার পতিদেবতাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়া হাতাখুন্তি ধরিতে বাধ্য করিতে পারেন। তবে শনির দুষ্ট প্রভাবে কুকিং ওয়ার্ড হইতে অচিরাৎ পাড়া-প্রতিবেশী, তৎপরে ফায়ার ব্রিগেড ও হাসপাতালের বার্নিং ওয়ার্ড যোগ রহিয়াছে।

পোস্ট মডার্ন নারীবাদী : বিভিন্ন সাহিত্য ও অ-সাহিত্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে উপহার হিসেবে পাওয়া দাড়ি কামানোর মলম ও বুরুশ ব্যবহারে সুফল পেতে পারেন। যাঁরা অন্তত তিনমাস নিরন্তর অধ্যবসায় চালিয়েছেন তাঁদের এই মাসেই শ্মশ্রু-গুম্ফের ঘনতর রেখা দর্শন হতে পারে। বাসে-ট্রামে মহিলা আসনে বসার লোকলজ্জা হতে নিস্তার পাবেন।

নারীবাদী নেত্রী রাশি : আপনার সভায় ক্রমশই পুরুষের উপস্থিতির হার বাড়তে থাকবে। তবে রবির কু-প্রভাবে ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় সভায় জনৈক ছোকরার বিরোধী মন্তব্যে তাঁকে সহ যাবতীয় পুরুষ জাতির মুণ্ডপাত করার পর অবহিত হতে পারেন যে—তিনি আসলে তরুণ নন, তরুণী।

ছাত্রী রাশি : ভবিষ্যতে নারীবাদের নেতৃত্বে উঠে আসার সাধনা করছেন, স্টুডেন্ট ফোরামে তাঁদের এ মাসে বেশি লম্ফঝম্প না করাই ভালো। কলেজের সিঁড়ির দু-একটি রেলিং নড়বড়ে থাকায় পতন-যোগ দেখা যায়। নারীবাদী ছাত্রীসংসদে অনুরাগী ছাত্রবন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দু-একজন গুপ্তশত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। হস্তে সিগারেট, ওষ্ঠে মদিরা ও অঙ্গে স্বল্পবাস ধারণ করলে শত্রুদের মিত্র হয়ে ওঠার শুভ সম্ভাবনা।

পাত্রী রাশি : পাত্রের অভিভাবকরা গান গাইতে বললে একমাত্র পপ্ সঙ্গীত পরিবেশন করুন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিবেশ দূষিত করবেন না। পাত্রের পূর্বপ্রণয়ের নিদর্শন সিডি-তে দেখে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। ডিভোর্সী জাতিকাগণ এইমাসে পাত্রকে বিবাহ করে ঘরে আনতে চাইলে প্রাক্ শর্ত হিসাবে অগ্রিম বিবাহ-বিচ্ছেদনামায় সই করিয়ে রাখুন। অন্যথায়, বিচ্ছেদ অভাবে জীবন দুর্বিষহ হওয়ার সম্ভাবনা।

নারীবাদী লেখিকা রাশি : আট থেকে আশি, বালক-যুবক-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ এবং ভ্রাতা-পিতৃব্য-পিতামহ—সকলকেই কামোন্মাদ রূপে চিত্রিত করলে, তাদের অত্যাচারের (আপনার প্রতি) উত্তেজক বর্ণনা দিলে এবং স্বীয় ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গণগনে ধুয়ো তুললে আপনার বই এ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে পররর্তী সংস্করণের মুখ দেখবে। স্বদেশে তিরস্কার ও বিদেশে পুরস্কার এবং বসবাস যোগ। বিদেশে বসে মনের সুখে পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলে নারীবাদী আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে।

অভিনেত্রী রাশি : যাঁরা অভিনয় জানেন না কিন্তু হাস্যলাস্য পটিয়সী এবং প্রযোজক-বরে উৎসুক, তাঁদের ফাঁদে এ মাসেই নির্বোধ নতুন প্রযোজক-পুরুষ পা দিতে পারেন। মন্দর মধ্যে ছবিটি ঠাকুর-দেবতা বিষয়ক হওয়ায় প্রযোজকের ব্যক্তিগত কক্ষ ছাড়া অভিনয়ে বেশবাস সঙ্কুচিত করার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যাবে। ভালোর মধ্যে ছবিটি রিলিজের প্রথম দিনেই সুপার ফ্লপ হওয়ায় কেউ দেখবে না, ফলে আপনার অভিনয়ের নিন্দা করারও সুযোগ পাবে না।

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়

জীবনে দু'বার ভালোবেসে জব্দ হয়েছি। একবার যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সে আমাকে বিয়ে না করে অন্য একজনকে বিয়ে করে। আরেকবার যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সেই মেয়েটি আমাকে বিয়ে করে।

বেশ কয়েকমাস পরে ফিরে এসে আবার কিভাবে আরম্ভ করব ভেবেছিলাম। উদ্ধার করল গঙ্গারাম এসে। এ বছর আমেরিকায় গিয়ে, বিশেষ করে ১১ই সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ঘটনার পরে নানারকম ঝামেলায় মার্কিন দেশে আটকে গিয়েছিলাম। সেপ্টেম্বরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার ধ্বংসের পর সব রুটিন, টাইম টেবিল, শিডিউল তছনছ হয়ে গেল। টিকেটে যে তারিখ দেওয়া আছে সেদিন কোনো প্লেন নেই। যে তারিখে প্লেন আছে জেনে বিমান বন্দরে গেলাম, বিমান এল না। শুনলাম, নিরাপত্তার কারণে বিমানকে নামতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। অবশেষে উত্তেজনাময় দিনগুলি পেরিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি।

গঙ্গারামকে অনেকদিন পর দেখে ভালো লাগল। কিন্তু গঙ্গারামের কেমন মুখ ভার দেখলাম। আমি ভেবেছিলাম-আমেরিকার কথা সে জিজ্ঞেস করবে। যেমন জানতে চেয়েছে সবাই। কিন্তু, গঙ্গারামের গাম্ভীর্য দেখে নিতান্তই নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কি হয়েছে?

গঙ্গারাম বলল—কি আর হবে?

আমি অনুমান করে বললাম—বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি বুঝি?

গঙ্গারাম চুপ করে রইল।

আমি বললাম—দাম্পত্য কলহের মতো মধুর জিনিস কী আছে? আমরা স্বামী-স্ত্রী গত চল্লিশ বছর ধরে ঝগড়া করে আসছি। ছোটখাটো খিটিমিটি সবসময়ই আছে। মাসে দু'চারবার বড় রকমের ঝগড়া হয়।

এবার গঙ্গারাম মুখ খুলল। সে বলল—মাসে দু'চারবার নয়, মাসে মাত্র একদিনই আমার সঙ্গে বউয়ের ঝগড়া হয়।

আমি বললাম—অর্থাৎ?

গঙ্গারাম বলল—আজকে হল মাসের পয়লা তারিখ। সন্ধেবেলা মাইনে পেয়ে বাড়ি ফেরার পরেই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া লাগে। সে চায় যতটা টাকা পাবে তার দখল নিতে। আজকে প্রায় পুরো টাকাটায় কেড়ে নিয়েছে।

আমি বললাম—অতঃপর?

গঙ্গারাম বলল—অতঃপর ঊনত্রিশ দিন যুদ্ধবিরতি, আবার মাসপয়লায় ঝগড়া।

ভালো কথা।

পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে গঙ্গারামের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। শ্রীমান গঙ্গারাম রায়, অনতিযুবক এক বিবাহিত ব্যক্তি। সন্তানাদি এখনো কিছু নেই। গঙ্গারামের প্রধান গুণ এই যে—সে আমার অনুরক্ত পাঠক, একনিষ্ঠ ভক্ত। একাধিকবার একাধিক জায়গায় তারাপদ রায় ফ্যান ক্লাব করতে গিয়ে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছে।

গঙ্গারামের আরো পরিচয় ক্রমশ পাওয়া যাবে। এবার গঙ্গারামের একটি স্মরণীয় উক্তি দিয়ে এই শুভ সূচনা সমাপ্ত করছি।

গঙ্গারাম বলে—জীবনে দু'বার ভালোবেসে জব্দ হয়েছি। একবার যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সে আমাকে বিয়ে না করে অন্য একজনকে বিয়ে করে। আরেকবার যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সেই মেয়েটি আমাকে বিয়ে করে।

এই মেয়েটির সঙ্গে আপনাদের ধীরে ধীরে পরিচয় হবে।

অপেক্ষা করতে থাকুন.

প্রচ্ছদ কাহিনী

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

নারী থাক বাদ

হওয়া উচিত ছিল সন্ত্রাসবাদ বা হত্যালীলার বর্ষ। যা ঘটছে আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে। ঘটে চলেছে গুজরাটে। আর কত 'স্তান' ও 'বাট' অপেক্ষায় আছে, তা জানার জন্য বৎসরান্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কিন্তু তা না বলে, এ বছরকে বলা হল "নারীবর্ষ"। এই 'উল্টা বুঝলি'র ব্যাপারটার শিকার নারীর উদ্ভাবনা থেকেই। শারীরিক ভাবেই নাকি একটা বিপুল ভুল বা অপূর্ণতা থেকে গেছে। ভগ্নাঙ্কুরের অঙ্কুরটা যদি সঠিক বিকশিত হত তাহলে কী হত? নারী সম্পূর্ণই বাদ হয়ে যেত। তাতে অবশ্য উৎপাদন ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটত কিনা বা কোনো ভিন্নতর বিকল্প অনুসৃত হত সে বিষয়ে কোনো গবেষণার সমাচার এই অধমের জানা নেই।

ঐ অপূর্ণতার জন্যই হয়ত নারীদেহের বেলুন-প্রবণতা, যা বাছবিচারহীন। সঠিক সময়ে শুক্রাণুসন্ধান পেলে আকালের উদগ্র পিপাসায় তা গ্রাস করার তোড়ে, স্থান কাল পাত্র কিছুই গ্রাহ্য করে না। ঐ মুহূর্তে নারীর সম্পর্কে জাতিধর্ম-বর্ণ-ভাষা-দেশকাল নিরপেক্ষ বীর্যতোষণের কোনো দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। নারীবাদ কি এই তোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া? নারীশরীর "পোরাস", মানে রন্ধ্রময়। সেজন্যই তার সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এত আইনি আয়োজন ইনক্লুডিং মনুর "ঘৃণ্য" বিধান। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অনাকাঙ্খিত কোনো শুক্রাণু যাতে তার রন্ধ্রান্বেষী হতে না পারে তার জন্য প্রকৃতিবিধাতা বা বিধাতাপ্রকৃতির কাছে সম্মিলিত নারী ডেপুটেশন পাঠানো হতে পারে। এমন ইঙ্গিতই এক একান্ত সাক্ষাৎকারে আন্তর্জাতিক নারীবাদী ফোঁসফোঁস সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতি নিনাদিনী ভগুলাগার ত্রিসিংহী দিলেন। সারা ভারত মুক্তকচ্ছ বৈরাগ্য সংসদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে তাঁর মহাব্যস্ত সময়ের একটুকরো উপহার দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারে তুবড়ি কবি ছন্নছাড়া তুখোড়ও উপস্থিত ছিল।

যদিও নারীরূপ বর্ণনা আমার 'চায়ের কাপ' নয়, এবং তেমন বর্ণনা নারীবাদের পরিপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হতেও পারে, তবু অনুধাবন উপযোগের জন্য জানাই, শ্রীমতি ত্রিসিংহীর বপু নাজমা হেপতুল্লাতুল্য। চোখ ফুলনদেবী সঙ্কাশ। কণ্ঠস্বর কার মতো ভাবছি, তখনই ছন্নছাড়া তুখোড় বলল, ও তো

সরল ছন্দ—কৃষ্ণা বসু নির্দ্বন্দ্ব। তবে বপুর ব্যাপারে আমি কিছু না বললেও মল্লিকা আপত্তি করলে আমাকে দোয দেবেন না।

চরণ : মল্লিকা? মল্লিকা সারাভাই? দারুণ—

ছন্নছাড়া তুখোড় : বৈরাগী হয়েও আপনার সারাভাইয়ে চোখ? সারাবোন হলে কী করতেন? আমি তাঁর কথা বলছি না। সে-ব্যাপারে বলার অধিকারী একমাত্র প্রীতীশ নন্দী। আমি বলছি মল্লিকা সেনগুপ্তর কথা। খাঁটি ওরিজিন্যাল আগমার্কা নারীবাদী এবং ওঁর কোনো ব্রাঞ্চ নেই। লেডি অরণ্যদেবও বলে কেউ কেউ।

কিন্তু চোখ দুটো ফুলন দেবীর মতো কেন বলছেন?

চরণ : তুমি ফুলনের 'নাজুক' হাসি দেখেছ? দেখনি। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে দেখেছি। ও-হো-হো- সে এক অনবদ্য আগ্নেয় দৃশ্য। ঐ চোখ, ঐ কণ্ঠ, ঐ হাসি, শেয়াল পর্যন্ত লেজ ভিজিয়ে ফেলত।

ছন্নছাড়া : আর কিছু লিখবেন না? কালিদাসেব ব্যকরণরীতি না মেনে নারীর রূপ বর্ণনা হয় নাকি। বয়সটা—

> **সুচিত্রা সেনের মেয়ে মুনমুন সেন, মুনমুনের মেয়ে রাইমা সেন—রাইমা সেনের মেয়েও হবে—হাই-মা সেন। একেবারে পার্মানেণ্ট পেটেণ্ট।**

চরণ : ছিঃ ছিঃ। তুমি না তুবড়ি কবি তুখোড়। এটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার যে নারীদের এজ লিফটিং করে কখনো কোনো কথা বলতে নেই। নারী শুধু নারী—যতক্ষণ বাদ এসে বাদ না সাধছে। থির বিজুরি, স্থির যৌবনা সুতনুকা—

ছন্নছাড়া : সবুজ এবং কাঁচা।

চরণ : কেন?

ছন্নছাড়া : নইলে আমাদের মতো আধমরাদের ঘা দিয়ে, তিলে তিলে মারবার জন্যে, বাঁচাবে কে।

আমাদের মধ্যে এই আলোচনা অবশ্যই ইন্টারভিউর পরে হয়। এবাবে সাক্ষাৎকাবের কথা উল্লেখ করি।

চরণ · আপনি তো Ms. নিনাদিনী ভণ্ডুগাকাব ত্রিসিংহী। কিন্তু বাংলায় ঐ মেসি ব্যাপার, Ms. টা নেই, তাই আমরা আপনাকে শ্রীমতি নিনাদিনী ভণ্ডুলাকার ত্রিসিংহীই বলার অনুমতি চাইছি।

নিনাদিনী : বিলক্ষণ। শ্রীমতি তো ভেরি কিউট শব্দ। কী সুন্দর অর্থ। শব্দশরীরে কী সুঘ্রাণ।

চরণ : কিন্তু আমাদের একটু মুশকিল আছে। আমাদেব দেড়েল কবি লিখে গেছেন "শ্রীমতি নামে সে দাসী"—তাই শ্রীমতি শুনলেই বাঙালি নাগরিক রমণীরা মনে কবে ওদের দাসী বানাবার ঘৃণ্য অপচেষ্টাব ঘৃণ্যতর ষড়যন্ত্র ঘৃণ্যতম পুরুষসমাজ করছে।

নিনাদিনী : ইজ ইট সো? হাউ ফানি। বাট আই ফাইণ্ড ইট—শ্রীমতি—একেবারে মনভরা দিনভরা আমেজের সুবাস। জলভরা মনোহরা নলেন সদৃশ।

চরণ : আচ্ছা, শ্রীমতি নিনাদিনী ভণ্ডুলাগার ত্রিসিংহী, ত্রিসিংহী কি আপনার পদবী?

নিনাদিনী : অফকোর্স। কুকুব-বিড়ালেরও পদবী, মানে পেডিগ্রি থাকে, আর নারীদের থাকবে না?

চরণ · নিশ্চয়, নিশ্চয়। তা পদবীটা কি আপনার মার না বাবার নাকি প—

নিনাদিনী : নো পতি। আই হ্যাড এনাফ অফ ইট। অ'ফুল। ত্রিসিংহী আমার বাবার পদবী। এর এক দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। বাবা অবশ্য শুধু সিংহী লিখতেন। বিয়ের পর আমি হই দ্বিসিংহী। বিচ্ছেদের পর লিখছি ত্রিসিংহী।

চরণ : আর ভণ্ডুলাগার—

নিনাদিনী : ওটা আমি ডিভোর্সের পর যোগ করেছি। ওটা স্বামীর টাইটেল। সো দ্যাট পিপল ক্যান রিয়েলাইজ দি ট্রুথ।

ছন্নছাড়া : ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ ট্রুথ।

নিনাদিনী : ইনি কে? এঁকে তো চিনলাম না।

চরণ : আমারই ভুল—আপনাদেব আগেই পরিচয় করিয়ে দেওযা উচিত ছিল। ইনি তুবড়ি কবি ছন্নছাড়া তুখোড়। এ ভেরি ভেরি ব্রাইট পোয়েট অব দ্য নিউ মিলেনিযাম।

নিনাদিনী : তুবড়ি কবি? হোয়াট ইজ তুবড়ি কবি?

চরণ : আপনি তুবড়ি দেখেননি? কালীপুজাব সময দেযালিতে হাজারে হাজারে জ্বলে মরে।

নিনাদিনী ওঃ তুবড়ি বাজির কথা বলছেন? অফকোর্স। ছেলেবেলায় কত জ্বালিযেছি। বাট্ তুবড়ি কবি—

ছন্নছাড়া · বোঝা মোটেই কঠিন নয় খুবই সরল।
যে কবি জ্বলে যায, পুড়ে যায়, থাকে না গরল
পাঠকেরা ভুললেও ভোলে না ভবী
সেই হয় বিখ্যাত তুবড়ি কবি।

নিনাদিনী : বাঃ! দারুণ তো। এটা আমি লিখে নেব।

চরণ · শ্রীমতি ভণ্ডুলাগার ত্রিসিংহী, আপনাদের কোনো ইস্যু—

নিনাদিনী : কোনো কি বলছেন, প্লেনটি অফ ইস্যু এগেন্সট দ্য মন্সট্রাস পুরুষশাসিত সমাজ।

চরণ · সে তো আছেই—এত বড় সংগঠনের প্লেনারি সেশন, প্লেনটি অব ইস্যু ছাড়া হবে কী করে। আমি বলছিলাম আপনাদের কোনো সন্তান আছে?

নিনাদিনী : আই হ্যাভ এ লাভলি কিউট ডটার। এ ডল। বড় হলে অনেক পুরুষের প্রাণের আইডল হবে।

চরণ · আপনাব মেয়ে পুরুষদের আইডল হবে—এটা আপনি সমর্থন কববেন?

নিনাদিনী : নিশ্চয়! পুরুষ-প্রশংসা না পেলে, ওদেব বুকে দুরমুশ বাজাতে না পারলে, নাবী হয়ে কী লাভ।

ছন্নছাড়া : "কে বলে যে নারী ভোগ্যা শুধু?
নারীটিও ভোগ করে প্রিয় পুরুষের সঙ্গ, আসঙ্গের মদ,....
পুরুষ গেয়েছে শুধু যোষিতের যশ, লিখেছে রূপেব তীব্র গান,
নারী কিছু লেখেনি কখনো।"

নিনাদিনী : কে লিখেছে এই কবিতা?

ছন্নছাড়া . এমন অকুণ্ঠ সরগরম কবিতা একজনই লিখতে পাবেন—কৃষ্ণা বসু। আরো শুনুন—
নারী চিনে নেবে তার রঙিন পুরুষ
বর্ণে, নামে, তীব্রতায়, প্রতিযোগী রঙের বিন্যাসে।

নিনাদিনী : বাঃ বাঙালি মেয়েরা দেখছি স্বাধীন—মুক্ত নারীচেতনার শীর্ষে পৌঁছে গেছে।

চরণ : যা বলেছেন। তা মেয়ের কী নাম রেখেছেন?

নিনাদিনী : বিদ্যাধরী। পদবী কোনটা দেব ভাবছি। আপাতত ত্রিসিংহী লিখছে। কিন্তু সিংহী তো আসলে আমার বাবার পদবী। বিয়ের আগেই ত্রিসিংহী লেখা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমি কখনোই চাইব না আমার মেয়ের আমার মতো দুর্ভাগ্য হোক। অল্প বয়সেই ডিভোর্সী—এর চেয়ে উইডো হওয়া অনেক ভালো। পুরুষের স্নিগ্ধ সহানুভূতি মেলে। ডিভোর্সীকে ভাবে বেওয়ারিশ মাল।

চরণ : তাহলে তো বিদ্যাধরী ভণ্ডুলাগার-ই লিখতে হয়।

নিনাদিনী : কক্ষনো না। পুরুষের এক দলীয় শাসন-শোষণ মানব না বলেই তো আমাদের জেহাদ—

ছন্নছাড়া : চলছে—চলবে।

চরণ একটা কাজ করতে পারেন, আপনার মার সারনেম আপনার মেয়েকে দেবেন, সে আবার তার মেয়েকে দেবে—একেবারে অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী পদবী।

নিনাদিনী : কীভাবে?

চরণ : সুচিত্রা সেনের মেয়ে মুনমুন সেন, মুনমুনের মেয়ে রাইমা সেন—রাইমা সেনের মেয়েও হবে—হাই-মা সেন। একেবারে পার্মানেন্ট পেটেন্ট।

নিনাদিনী : নো। আমি আমার লিবার্টি অফ চয়েস লুজ করতে চাই না।

চরণ : তবে আপনার নামই থাক—বিদ্যাধরী নিনাদিনী।

নিনাদিনী : গুড আইডিয়া। বাবার নামের বদলে মার নামই তো চলা উচিত। কারণ মা হচ্ছে ফ্যাক্ট, ফাদার ইজ—

ছন্নছাড়া : ফিকশন।

নিনাদিনী : না-না, ফিকশন নয়। তবে মাদারের মতো ফ্যাক্টও নয়, জাস্ট বিশ্বাস।

চরণ : মার নামে সন্তানের পরিচয় হলে বিবাহ নামক জগদ্দল বন্ধনেরও দরকার থাকে না।

নিনাদিনী : অবশ্যই। তবে ওটা বন্ধন নয়, টাইরেনি। আমরা এই টাইরেনির অবসান চাই।

ছন্নছাড়া : একটা সমস্যা থাকবে।
কী করে বোঝা যাবে বৈধ না অবৈধ
বাবা ব্রাহ্মণ না শিখ না আবু সঈদ।

আমরা চাই নারীদেহে এমন মডিফিকেশন করা হোক যাতে ইচ্ছাবিরুদ্ধ সন্তান ধারণে তাকে বাধ্য না হতে হয়। আমরা মেডিক্যাল কাউন্সিলকেও বলছি এমনই উপায় উদ্ভাবনের জন্যে—যাতে গর্ভাধান ঘটবে কেবল নারীর সম্মতিতেই।

নিনাদিনী : বিবাহ নামক কুসংস্কার উঠে গেলে—বৈধ-অবৈধের ফিউডাল কনসেপ্টও উড়ে যাবে। সব সন্তান মাদার মেরীর সন্তান-সঙ্কাশ হবে।

ছন্নছাড়া : কিন্তু সঙ্কটের নিরসন হবে না। সন্তানের সব দায়ভার, খরচাপাতির কী হবে?

নিনাদিনী : যে বাবা, সেই দেবে।

চরণ : ধরবেন কী করে, কে বাবা? ধরলেও তাকে মানাবেন কোন আইনে?

নিনাদিনী : ঠিক বলেছেন। আইনের একটা জিজ্ঞাসা থাকছেই। আমরা হায়েস্ট লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিয়ে নেব শিগগিরই।

চরণ : এবার শেষ প্রশ্ন শ্রীমতি নিনাদিনী ভণ্ডুলাগার ত্রিসিংহী। আপনারা যে সম্মিলিত নারী ডেপুটেশন পাঠাবেন বলে ভাবছেন, সেটা কী জন্যে?

নিনাদিনী : দেখুন, নারী-শরীরের একটা ফাণ্ডামেন্টাল সমস্যা—যে কেউ শুক্রাণু নিষিক্ত করলেই সাধারণত গর্ভাধান ঘটে। দিস, উই ফিল দ্য মোস্ট অ্যাবমিনেবল ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি অন উইমেন। আমরা চাই নারীদেহে এমন মডিফিকেশন করা হোক যাতে ইচ্ছাবিরুদ্ধ সন্তান ধারণে তাকে বাধ্য না হতে হয়। আমরা মেডিক্যাল কাউন্সিলকেও বলছি এমনই উপায় উদ্ভাবনের জন্যে—যাতে গর্ভাধান ঘটবে কেবল নারীর সম্মতিতেই। সম্মতি থাকলেই শুধু সংশ্লিষ্ট স্নায়ু রুদ্ধদ্বার অবারিত করবে। এটা একটা সাইকো-ফিজিক্যাল মেকানিজম। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা।

চরণ : অনেক ক্ষেত্রে নারী তো স্বামীকেও পছন্দ করে না।

নিনাদিনী : না করতেই পারে। অপছন্দ হলে তার সন্তান ধারণ করবে কেন?

চরণ : কিন্তু পছন্দের অন্য পুরুষের—

নিনাদিনী : নিশ্চয়। ওটা নারীর ফাণ্ডামেন্টাল রাইট।

চরণ : রাইট না রং জানি না। তবে এতে কাকের ঘরে কোকিলছানার বসতি বাড়বে না?

নিনাদিনী : আপনাদের এখনকার রেজিমেন্টাল ম্যারেজ সিস্টেমেও ভূরিভূরি কোকিলছানা চরে বেড়াচ্ছে না? সন্তান কি গায়ে রাবারস্ট্যাম্প নিয়ে জন্মায়? সন্তান দরকার, সন্তান হল। কার বীজ, কেমন বীজ—এসব ন্যক্কারজনক প্রশ্নই পুরুষ শোষণের হাতিয়ার। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল? আপনাদের যা নিরেট মাথা। কোনো মুক্তচিন্তা হাতুড়ি মেরেও ঢোকানো যায় না।

চরণ : জলবৎ তরলং বুঝিয়েছেন আপনি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

নিনাদিনী : ধন্যবাদ আপনাদের। সব পুরুষরা আপনাদের মতো সংবেদনশীল হলে আমাদের আন্দোলনের দরকারই হত না। তবে বিটুইন আস একটা গূঢ় কথা বলি, আসলেই ফ্রিডম অফ এ উওম্যান ইজ এ ফ্রেজাইল থিং। নমস্কার।

শ্রীমতি নিনাদিনী ভণ্ডুলাগার ত্রিসিংহী চলে যেতেই তুবড়ি কবি ছন্নছাড়া তুখোড় বলল, চরণদা, কী বুঝলেন?

অধম বৈরাগীর বোঝার কিছুই নেই। নারীবর্জিত জীবন স্বেচ্ছায় অনেক আগেই বেছে নিয়েছি। বললাম, তুখোড়, জীবন থেকে নারী বাদ রাখাই শ্রেয়। নারী না থাকলেই দেখবে ঝগড়া নেই, যুদ্ধ নেই, টাকার জন্য ইঁদুরদৌড় নেই। সোনার দোকানে ভিড় নেই। শাড়ির দোকানে বাতি নেই। হাসপাতালে লাইন নেই। লাইফ উইল বি বিজ্ঞাপনের ভাষার মতো—সুখ।

তুবড়ি কবি : তাহলে প্রজননের কী হবে? বংশগতি, সমাজসভ্যতার অগ্রগমন?

বলতে বাধ্য হলাম,—ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার থেকে শুরু করে আফগানিস্তান গুজরাট কাশ্মীরে যা ঘটছে তাতে কি মনে হয় সভ্যতা প্রস্তরযুগ থেকে একটুও এগিয়েছে? নবজাতকদের এই হিংস্র দুনিয়া না দেখাবার জন্য নারী না হয় বাদই থাকল। অন্তত কিছুকাল। ধরণীর জনভার যদি সামান্যও লাঘব হয়, মন্দ কী।

প্রচ্ছদ কাহিনী

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

কে কাকে ভোগ করে

(এক)

আমি ছেলেবেলায় বেলা কাকিমার খুব ভক্ত ছিলাম। বেলা কাকিমা, যাকে বলে ডানাকাটা সুন্দরী, তা নন, কিন্তু ওঁর দিকে তাকালে আমার খুব আনন্দ হত। বেলা কাকিমার বর রমেশকাকু খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কণ্ট্রাক্টরি করতেন। এবং প্রতি শনিবার রাত্রে বেলা কাকিমাকে মারতেন। ঠিক রাত আটটা থেকে সওয়া আটটার মধ্যে শুরু হত প্রহারপর্ব। মার খেতে খেতে বেলা কাকিমা চিৎকার করে কাঁদতেন। কান্নাজড়ানো শব্দগুলো ছিল এইরকম—ওরে বাবারে, আমাকে মেরে ফেলল রে, ও মাগো, আমি মরে যাব গো আমাকে বাঁচাও বাঁচাও। এই একই সংলাপ প্রতি শনিবার রাত্রে শোনা যেত। শুনতে শুনতে রাগে দুঃখে আমি ক্ষেপে উঠতাম। মনে হত ছুটে গিয়ে রমেশকাকুকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দিই। কিন্তু তখন আমার বারো বছর বয়স। ওই বয়সে কত কিছু করতে ইচ্ছে করে যা বাস্তবে করা যায় না। শুনেছিলাম পাড়ার অভিভাবকরা নাকি প্রথম দিকে রমেশকাকুকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ওই সময় বেলা কাকিমার গলাই সবাই শুনতে পেত কিন্তু রমেশকাকু একটি আওয়াজও করতেন না। রমেশকাকু গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রীর একটু কান্নাকাটি করার অভ্যেস আছে, ও নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না। সপ্তাহে আধঘণ্টা কাঁদার স্বাধীনতা ওঁর নিশ্চয়ই আছে।'

পরদিনই সাজুগুজু করে সবাই বেলা কাকিমাকে স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় যেতে দেখেছে। দোকানে গিয়ে দামি দামি শাড়ি কিনে রমেশকাকুর গায়ে গা মিশিয়ে বাড়ি ফিরছেন—এ দৃশ্য সবার দেখা। ফলে প্রতিবেশিনীরা ওঁকে এড়িয়ে চলত। আমি পারতাম না। আমাকে দেখলেই উনি বলতেন, 'এই যে, একটা উপকার করবে? লাইব্রেরি থেকে বইটা বদলে এনে দেবে?' নতুন কোন বই আনতে হবে তার নামও বলে দিতেন। আমার ক্ষেত্রে বড়দের বই পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বেলা কাকিমার জন্যে যে বই আনতাম তা উল্টে পাল্টে পড়ে নিতাম নির্জন জায়গায় গিয়ে। অনেকটাই বুঝতাম না। চরিত্রহীন উপন্যাসটি এনে যখন ওঁর হাতে দিয়েছিলাম তখন উনি হেসে বলেছিলেন, 'পড়ার ইচ্ছে আছে নাকি?' আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'এটা তো বড়দের বই।'

'কেন? তুমি কি খুব ছোট?'

ব্যস। নিজেকে বড় ভাবতে লাগলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, 'তুমি কাঁদো কেন?'

'আমাকে যে কাঁদায়, তাই।'

'তোমাকে কি খুব মারে?'

'খু-উ-ব।'

'তাহলে বাবা-মায়ের কাছে চলে যাও না কেন?'

'গিয়ে কি হবে?'

'মার খেতে হবে না।'

'তা ঠিক। তবে সেইসঙ্গে কেউ ভালোবাসবে না।'

'কেউ ভালোবাসলে তার সঙ্গে চলে যাবে?'

> **সেই বসন্তবিলাসের সময়ে মেয়েটি কি একটুও আনন্দিত হয়নি? তাহলে কয়েক লক্ষ বছর ধরে মেয়েরা কেন বলে আসছে যে পুরুষরা ভোগ করে চলে যায়!**

'দূর। যে ভালোবাসবে সেও তো মারবে। নতুন মার সহ্য করতে আর পারব না।' বেলা কাকিমা খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছিলেন।

আমার সে বয়সে বেলা কাকিমা রহস্যময়ী ছিলেন। কোনোদিন বই পাল্টে গিয়ে দেখেছি উদাসিনী হয়ে আছেন। আমাকে কনুই দেখালেন। তার ওপর কালসিটে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। আমি খুব রেগে গিয়ে বললাম, 'তুমি থানায় চলো, পুলিশকে সব বলবে।'

'তাহলে আমাকে খেতে দেবে কে?'

সেই বয়সে বুঝে গিয়েছিলাম—মেয়েদের সব আছে কিন্তু রোজগার করার ক্ষমতা না থাকায় কিছু করার নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা মাথায় ঢোকেনি। এই যে আমার মা অনেক কিছু করার ইচ্ছে হলেও করতে পারেন না, বাবার সে সমস্যা হয় না।

(দুই)

নরনারীর সম্পর্ক, বিশেষ করে যৌন অঙ্গ এবং তার ব্যবহার শেখাবার কোনো চেষ্টা ছিল না আমাদের স্কুলে। অভিভাবকরাও ছিলেন উদাসীন। যেন ব্যাপারটা কিছু নয়, তারা যেমন শিখে ফেলেছিলেন আমরাও শিখে নেব। তা ওই বয়সে আমাদের ক্লাশের একটি জঙ্গী ছেলে, যার নাম সুজিত,

সে এই বিষয়ে খুব পারদর্শী ছিল। তার পাড়ার বউদিদের কল্যাণে সে নাকি বেশ জ্ঞানী হয়ে উঠেছিল। সমবয়সী হলেও আমাদের ছেলেমানুষ ভাবতে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। সুজিতও একটা কথা প্রায়ই বলত, প্রকৃতি একটা ব্যাপারে ছেলেদের মেরে রেখেছে। ছেলেরা ইচ্ছে করলেও মা হতে পারবে না।

ছেলেদের মা হওয়ার কী দরকার? তারা তো চিরকাল বাবা হয়। প্রশ্ন করলে সুজিত মুচকি হাসত। বলত, 'মেয়েদের প্রকৃতি সব দিয়েছে কিন্তু বাবা হওয়ার ক্ষমতা দেয়নি।' এটাও তখন বুঝতাম না। দুটি মেয়ে এক সন্তানের বাবা-মা হতে পারে? হওয়ার কী দরকার? সুজিত বুঝিয়েছিল, 'ধর, মেয়েরা বলল, ছেলেদের চাই না। আমরা নিজেরাই কাফি। তো, কী হবে? আর যাই হোক বাচ্চা হবে না। আবার মেয়েরা যদি কেটে পড়ে তাহলে ছেলেদেরও একই সমস্যা। দু'জনে মিলে গেলে তবে সৃষ্টি বাড়বে। তখন মনে হয়েছিল, সত্যি, ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই খুব অসহায়।

'মেয়েদের প্রকৃতি সব দিয়েছে
কিন্তু বাবা হওয়ার ক্ষমতা দেয়নি।'

(তিন)

এখন মেয়েরা এমন সব কাজ করছেন যা বিশ বছর আগে চিন্তাও করা যেত না। একটি মেয়ে পঁচিশ বছর বয়সে লাখ টাকা মাইনে পাচ্ছে, এমন উদাহরণ প্রচুর। তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যত বেড়েছে তত ছেলেদের তৈরি করা নিয়মগুলো খসে গেছে।

কিন্তু কতগুলো ব্যাপারে খটমটো লাগছে। কোনো মেয়ে নিজে এগিয়ে গিয়ে অচেনা ছেলেকে প্রেম নিবেদন করতে দ্বিধায় পড়ছে এখনো। ধরা যাক দ্বিধা কাটিয়ে উঠল। পরের দিন মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরে বলল না, 'তব করতল মোর করতলে হারা।' একটু নির্জনে পেয়ে টকাস করে চুমু খেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা ছেলেটিকে বলতে পারল না, 'এই। রাগ করলে?'

কোনো দুর্দান্ত মেয়ে এইসব লজ্জা কাটিয়ে উঠে স্মার্ট গলায় যদি বলে, 'তোমার সঙ্গে বিবাহিত জীবন সুখের হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি সক্ষম তো?' ছেলেটি পালাবে। আবার মেয়েটি যদি খুলে কিছু না ব'লে প্রশ্রয় দেওয়ায় ছেলেটি যদি তাকে বিয়ের আগে বিছানায় নিয়ে যায়, মেয়েটি নিজেকে কি এখনো বউ বউ বলে ভাববে? নাকি বলবে, 'এটা হয়েই থাকে।'

(চার)

আজ সকালের ডাকে এক পাঠিকার চিঠি পেয়েছি। পুরুষজাতির ওপর তার ভীষণ রাগ। পুরুষ মানেই অসৎ, লম্পট। পুরুষ মানেই স্বার্থপর। একটি ছেলেকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল কিন্তু সে ওকে ভোগ করে অন্য মেয়ের সঙ্গে চলে গেছে। লিখেছে 'যদিও আপনি পুরুষ, তবু লেখক বলেই জানতে চাইছি, আমার কি প্রতিশোধ নেওয়া উচিত নয়?'

আমি ভাবতে বসলাম। এই যে ভোগ করার ব্যাপারটা, এটা কি ছেলেটি একাই করেছিল? সেই বসন্তবিলাসের সময়ে মেয়েটি কি একটুও আনন্দিত হয়নি? তাহলে কয়েক লক্ষ বছর ধরে মেয়েরা কেন বলে আসছে যে পুরুষরা ভোগ করে চলে যায়!

(পাঁচ)

চিঠির জবাব যদি এই রকম হয়—'প্রতিশোধ নিন। আপনিও আর একটি যুবককে ভোগ করে চলে আসুন। মরুক ব্যাটা হতাশায়।'

জানি না, এই সদুপদেশে মেয়েটি উদ্বুদ্ধ হবে কিনা।

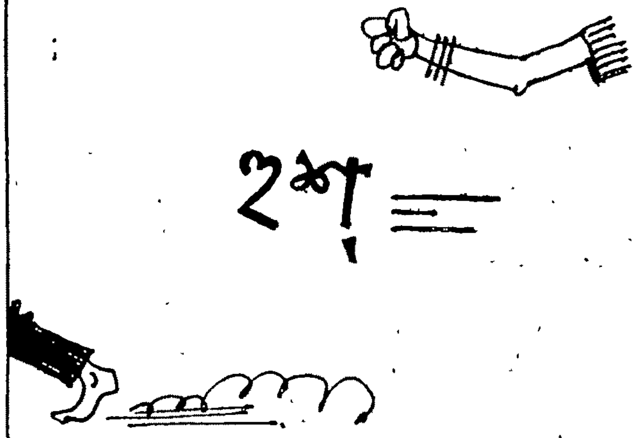

টীকা নিষ্প্রয়োজন

নারীবাদ। জিন্দাবাদ।।

তসলিমা নাসরিন। বেগম জিয়া। বেনজির ভুট্টো। জয়ললিতা। মমতা বন্দোপাধ্যায়। উমা ভারতী। মেনকা গান্ধী। শাবানা আজমি। অপর্ণা সেন। হয়ত বা ঋতুপর্ণ (আ-কার উহ্য)।

—বুনো রামনাথ

প্রচ্ছদ কাহিনী

‘আরে ভাই, কি সেক্স লড়াচ্ছে ওই মহিলা ওঁর উপন্যাসে। বিছানা ছেড়ে ওঠেই না দেখি নায়িকা। আর আমিও দেখি বই ফেলে উঠতেই পারি না।’

নারী আবার নারীবাদী হবে কী করে!

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

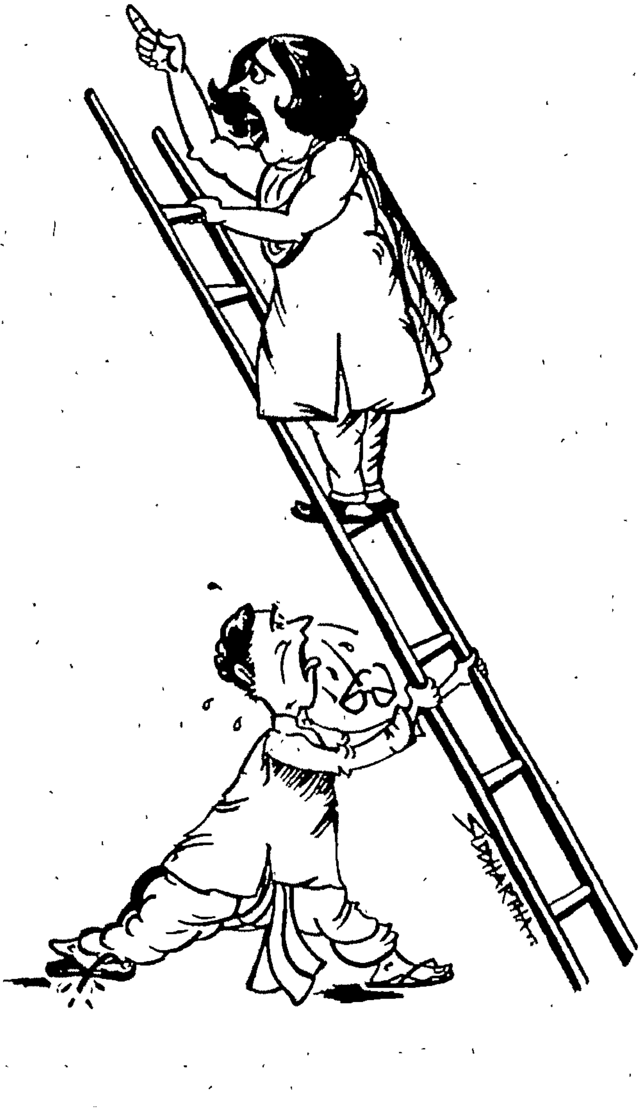

ছেলেবেলায়, মনে আছে, কী সুন্দর খোলামেলা পরিবেশ ছিল আমাদের মধ্য কলকাতার পাড়ায়। সমবয়সী ছেলেমেয়ে সবাই আমরা দিব্যি খেলাধুলো করতাম, আড্ডা মারতাম, কিছু ইয়ার্কি-ফাজলামিও করতাম। দিনমানে ছেলের দল নিয়ে মেয়ের দলের সঙ্গে মিশছি, খেলছি ঠিকই, কিন্তু রাতের বেলায় গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি শুধু মেয়েদের। দিনের বেলায় বালিকারা সব সুচিত্রা সেন, সোফিয়া লোরেন, অড্রে হেপবার্ন হয়ে ফিরে আসছে রাতে। কী মনোমোহিনী আকর্ষণ তখন তাদের। তাদের বৈ কিচ্ছুই যেন দেখি না তখন। রাত মানে তখন নারীর রাত, নারীর ব্রহ্মাণ্ড। দিনে লাজুক, ভদ্র, কিছুটা একটেরে আমি রাতের বেলায় পূর্ণ নারীবাদী।

আমার তাই বেশ গোল বাধে মহিলাদের মুখে নারীবাদের কথা শুনলে, নারীরা কী করে নারীবাদী হবে? সন্ত কবীরের কথায় বলতে, জলের মাছ কি কখনো জলপিপাসু হয়? নারীবাদী তো কেবল পুরুষই হতে পারে। নারীবাদের মানে আর যত যাই হোক, তার মূল তো হতে হবে নারীর প্রতি ভালোবাসা, নারীপ্রেম। সেই ভালোবাসা, সেই প্রেম পুরুষ ছাড়া আর কার হৃদয়ে থাকবে। সাধে ফরাসিরা সেই কবেই বলে রেখেছে, Vive le difference!' নারী-পুরুষের ভেদাভেদ চিরস্থায়ী হোক। আর সাধে ফরাসি মনীষী আনাতোল ফ্রঁস বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার চাইছে? কী আশ্চর্য! পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি অধিকার সারা জীবন ওরা ভোগ করে আসছে, সে সব কি তাহলে ওরা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করবে?

যারা নারীবাদ, নারীবাদ করে সারাক্ষণ স্লোগান দেয় তারা সত্যি-সত্যি কাদের জন্য লড়ছে আমার জানতে ইচ্ছে করে। ব্রা পোড়ানো, প্যান্টি পোড়ানো এসব-যদি প্রতিবাদের ভাষা হয় তাতে নারীর কী উপকার? কিছু লম্পট পুরুষেরই তাতে উপকার হতে পারে। ইদানীং কিছু লেখিকা গাদা গাদা সেক্স ঢেলে গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখা চালিয়ে যাচ্ছেন; সে সব লেখা গোগ্রাসে পড়ে দেখি মোটা বুদ্ধি আর স্থূল অনুভূতির পুরুষরাই। সেদিন যেমন এক গোদামার্কা পুরুষ আমায় বললে এক পার্টিতে, ‘আরে ভাই, কি সেক্স লড়াচ্ছে ওই মহিলা ওঁর উপন্যাসে। বিছানা ছেড়ে ওঠেই না দেখি নায়িকা। আর আমিও দেখি বই ফেলে উঠতেই পারি না।’ লোকটার কথা শুনে আমার

তো আক্কেল গুড়ুম। নারীবাদী লেখার এই তাহলে নিয়তি!

তবু নারীবাদের হয়ে দু'চারটে জয়ধ্বনি আমাদের তুলতেই হয়, কারণ নারীবাদ এখন বাজারে হেভি খাচ্ছে। নারীবাদে ভিড়তে পারলে কিছু ফীস-জোটানো বক্তৃতা, প্লেনের টিকিট-জোটানো সেমিনার, চল্লিশ মিনিট টানা টিভি-তে মুখ-দেখানো সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকায় দু'চার খেপ পোস্ট এডিটোরিয়াল কি সাময়িকীতে গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধ-কাব্য ম্যানেজ করা কোনো ব্যাপারই নয়। নারীবাদী সিনেমার এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে যে হারে নগ্নতা ও যৌনতা দেখানো হল দেখলাম সেভাবে কোনো পুরুষ করলে অবস্থা কী দাঁড়াত বলা মুশকিল। মীরা নায়ারের তো বেজায় প্রতিষ্ঠা নারীবাদী ফিল্মমেকার হিসেবে। সেই মীরার করা 'কামসূত্র' ছবিটা কি দেখেছেন পাঠক/পাঠিকা? অত অশ্লীল, নির্বোধ এবং হাস্যকর ছবি কোনো পুরুষ করলে তো তাকে তুলোধোনা করা হত। তাহলে নারীবাদী হওযাটা কি 'নারীবাদী মহিলা'-র (ফের বলছি। এই Expression-টা, আমার ধারণা, এক পেল্লায স্ববিরোধ) আত্মরক্ষা ব্যবস্থা?

ইদানীং কিছু লেখিকা গাদা গাদা সেক্স ঢেলে গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখা চালিয়ে যাচ্ছেন; সে সব লেখা গোগ্রাসে পড়ে দেখি মোটা বুদ্ধি আর স্থূল অনুভূতির পুরুষরাই।

অস্ট্রেলিয চিত্রপরিচালিকা জেন ক্যাম্পিয়ন (যাঁর 'পিয়ানো' ছবিটা আজও মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে) এক নারীর বিড়ম্বিত জীবনের কী দুর্ধর্ষ দলিল তুলে দিযেছেন সমাজকে; তিনি কিন্তু নারীবাদের ছাতাব নিচে ঢোকেননি। আর অপর যে অস্ট্রেলিয়কে সম্বল করে নাবীবাদীরা বহুৎ হৈ চৈ করল পাক্কা চার দশক সেই 'দ্য ফিমেল ইউনাক' গ্রন্থের রচয়িত্রী জর্মেন গ্রিয়র তো পরিণত বয়সে এসে বই লিখলেন 'ডেস্টিনি অফ সেক্স', যার মূল প্রতিপাদ্য হল—নারীজীবনের পূর্ণতা হল মাতৃত্বে। এ যেন চেঙ্গিস খাঁ রায দিচ্ছেন যে যুদ্ধ করা অমানুষের কাজ।

জর্মেন গ্রিয়ব ওঁব ওই প্রথম, সাড়াজাগানো, 'দ্য ফিমেল ইউনাক' বইয়ে উদ্ধৃতি দিযেছিলেন আমার এক অতিপ্রিয় দার্শনিক আর্থার শোপেনহাউযারের, যে বেচারির একটা জীবন সঙ্গিনীই জোটেনি জীবনে, নিজের মাতৃদেবী তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেন। শোপেনহাউযারের সেই উদ্ধৃতিতে আছে যে জীবজগতে বিপরীত লিঙ্গের থেকে স্বাধীন তো একমাত্র তেঁতুলবিছে, যে নিরন্তর নিজের সঙ্গে নিজের মধ্যে সঙ্গমক্রিযা চালিয়ে যেতে পারে।

নাবীবাদীদের দেখি আবাব বার খাওয়ায একদল পুরুষ, যাদের জীবনের ধ্যানজ্ঞান হল কিছু ভীমভবানী নারীর হয়ে লড়াইয়ে নেমে গোটা পুরুষজগতকে একহাত নেওয়া। পুরুষদের সঙ্গে সরাসরি সম্মুখ সমরে নামার তেমন এলেম নেই বলেই বোধহয এরা নারীবাদীদের আঁচলের আড়ালে চোখা চোখা বাণ ছোঁড়ে অন্য পুরুষদের দিকে। নারীবাদে অংশ নিয়ে এদেরও একটু-আধটু নামধাম, টু-পাইস হয়। নারীবাদীবাও এদের হাড়ে হাড়ে চেনে, তাই দিব্যি খেলিয়ে নেয়। পুব বাংলাব স্ল্যাং-এ যেমন বলে—উরুৎ দেখিয়ে ছ'মাস, সেই কেস আর কী।

নারীবাদ নিয়ে বড় প্রশ্নটা ওঠে তখনই যখন দেখি হৈ হৈ করে দুনিযাব যত মাজাভাঙা প্রতিভাবা জমায়েত হয়েছে ওই আন্দোলনের পতাকার নিচে (নাকি শামিয়ানায়?)। আর একটু উঁচু মানের গুণাগুণ নিয়ে যাঁরা নারীবাদী, তাঁরা যে কী ধূর্ত। কী ধূর্ত। বলে বোঝানো যাবে না। আর এঁদের সব্বাইয়ের মিলিত প্রয়াসে যে কত অখেদ্যে বইপত্র লেখা, ছাপা ও পবিবেশনা হচ্ছে তার হিসেব রাখা কম্পিউটারেরও অসাধ্য। বইবাজারের (বিশেষ কবে ইংরেজির) দিকে চোখ ফেলা যায় না এই সব উৎপেতে বইয়ের গুঁতোয়। কী সব টাইটেল। 'Gender equation and subaltern recipiocity' (মানে কী!), 'Phallic symbol and female angst' (রাবিশ!), 'Male morality and female response' (দূর! দূর!) ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলাতেও এই সব হাবিজাবি কারবার শুরু হয়ে গেছে, হেসে লুটোপুটি খাওয়ার দিন এসে গেল বলে।

মহাশ্বেতা দেবী, সুচিত্রা মিত্র, সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো মহিলাদের আমি খুব শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। কত কাজের কাজ এঁরা সারাটা জীবন ধরে কবে গেলেন, কই এঁদের তো সে ভাবে পতাকা কি স্লোগান বয়ে বেড়াতে হল না। আর পতাকা কি স্লোগান যদি নিতেও হয় তো সেটা পুরুষের দেরাজ থেকে চুরি কবে কেন? নারীবাদী তো বাস্তবে পুরুষেরই হওয়ার কথা (সত্যি কারের পুরুষ, নারীর ধামা ধরা হাফবোকার দল নয), সেই কারবারটা নিযে নারী গোল পাকাবে কেন?

একটি 'বুক' লিখিয়া 'বুকার' পাইয়া তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বি-বিখ্যাত হইয়াছেন আদালত অবমাননার দায়ে একদিন জেল-এর সেলে নিশিযাপন করিযা। আমাদিগের 'গড' একটি স্খল ভুল করিয়াছেন—তাঁহাকে মেযে করিয়া পাঠাইয়াছেন। যদিচ তিনি অরুন্ধতী নাম পাল্টাইয়া 'অরুণাভ', কিংবা 'অরুণাংশু' হন নাই; তথাপি তাঁহাকে 'নারী' বলিলে তিনি বিলক্ষণ কুপিতা হয়েন। 'পিপ্‌ল' পত্রিকা তাঁহাকে বিশ্বের পঞ্চাশজন 'সুন্দরী'র একজন হিসাবে ঘোষণা কবায় তিনি স্বভাবতই অসম্মানিত ('অসম্মানিতা' নহে পাঠক) বোধ করিযাছেন এবং তাঁহার কুঞ্চিত কেশদামকে এই দুর্নামের অন্যতম উৎস জ্ঞান করিয়া পত্রপাঠ কুচ্ কুচ্ করিয়া কাটিয়া পুরুষ সদৃশ স্মল হেয়ারের অধিকারিণী, থুড়ি, অধিকারী হইয়াছেন। এখন তাঁর দিব্য ছেলে-ছেলে ভাব। 'পিপ্‌ল' পত্রিকার এমনই অদূরদর্শিতা যে তাঁহাবা নিজ নামের মাহাত্ম্যই বুঝেন না। পৃথিবীর পঞ্চাশজন সুন্দর 'পিপ্‌ল'-এব একজন হিসাবে ঘোষণা করিলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হইত তাঁহাদের? বরঞ্চ মিনি-মাগনা নিজের বিজ্ঞাপনেব ঢাকটি বাজানো যাইত। মূর্খকে কে বুঝাইবে?

অবশ্য এই বিজ্ঞানের প্রভুত্বেব যুগে, যখন আকছাব ললিত লবঙ্গলতা (পুং)-রা নারী-তে এবং 'পুরুষের নাক-কান কাটা' রমণীরা, পুরুষে রূপান্তরিত হইতেছেন—অরুন্ধতী সে পথে হাঁটেন নাই। রমণীয সুবিধাগুলি যে তাহাতে হাতছাড়া হইয়া যায়। অতএব.....

পুরুষ মহল

'গাঁক্ গাঁক্' বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : **উন্মাদন দলপতি**

[বেশ কিছুকাল পুরুষদিগের পক্ষ হইতে কিছু সমস্যা সম্বলিত চিঠিপত্র জমা হইতেছিল। এ সংখ্যায় নারীবাদ, অর্থাৎ নারী বাদ, অতএব প্রাণঘাতিনী দেবীও বাদ। সেই সুযোগে উন্মাদন মহাশয়ের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। উন্মাদনের উন্মাদনায় উন্মাদ হইবেন না— এই সতর্কতা জ্ঞাপন করা হইল।]

● আমার বউ রেগে গেলে খুব কামড়ায়। ও যে পূর্বজন্মে কুকুর ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু "তুমি কি কুকুর ছিলে?" বললে আরো রেগে যায়। কেন?

—বিশ্বনাথ মণ্ডল, কলকাতা-৪৪

□ অপমান হয় বলে। লিঙ্গটা ঠিক করুন, যথাযথ সম্মান দিয়ে কথা বলুন। "কুকুর" নয়, হবে "কুকুরী" কিংবা "মহিলা কুকুর"।

● আমি বন্ধুর বউয়ের প্রেমে পড়ে গেছি।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কৃষ্ণনগর নদীয়া

□ তবে আর কি, এগিয়ে যান। নাঃ আপনাকে আর কষ্ট করে এগোতে হবে না, নরক ইস্টিশানটাই শোঁ শোঁ করে আপনার দিকে এগিয়ে আসবে।

● বাবা আমার জন্যে একটি পাত্রী পছন্দ করেছেন। খুবই সুন্দরী, দোষের মধ্যে বোবা। বোবার সঙ্গে কি আমার প্রণয় সম্ভব?

—বিজয় পাত্র, শেওড়াফুলি, হুগলী

□ বোবার সঙ্গে সকলেরই প্রণয় সম্ভব। বোবার শত্রু নেই।

● আমি কবিতা লিখি। নারীবাদী কবিতা লিখলে কি তাড়াতাড়ি বিখ্যাত হতে পারব?

—অমলকৃষ্ণ বাগ, বর্ধমান

□ আপনার নাড়িজ্ঞান কেমন জানি না তবে নারীজ্ঞান একেবারেই নেই। নারীকবিদের বাজারে নাড়া বাঁধতে গেলে ন্যাড়া হয়ে ফিরতে হবে।

● আমি উচ্চ মাধ্যমিক পড়ি। কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারছি না। বই খুললেই পাড়ার সুন্দর সুন্দর মেয়েরা পাতা জুড়ে ফুটে ওঠে, আর আমি সব ভুলে যাই।

—কমল মিত্র, কলকাতা-৫

□ যে অত্যুচ্চ মাধ্যমে পৌঁছেছ তুমি তাতে আর উচ্চ মাধ্যমিক পড়ে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। বাবাকে বলে সরাসরি 'বিয়ে' পরীক্ষায় বসে যাও, এক চান্সের দরকার হবে না, হাফ চান্সেই পাশ হয়ে যাবে।

● আমি যে মেয়েটিকে ভালোবাসি সে আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। কিন্তু ও জানে না, ওকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

—সূর্য মুখার্জী, কলকাতা-৬৩

□ আমিও তাই ভাবতুম রে ভাই। এখন বুঝতে পারছি, না পেলেই সুস্থ থাকতুম।

● আমি একটা অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি। কোনো মৌলভী সাহেবও এর উত্তর দিতে পারছে না। ফুটবল আমার প্রাণ। কিন্তু আমি খুব ধর্মভক্ত। এই ২৩ বছর বয়সেই হজ্জ করতে যাচ্ছি। হাজি হওয়ার পর কি ফুটবল ছেড়ে দিতে হবে?

—বদরুদ্দিন গাজী, খিদিরপুর, কলকাতা

□ কেন ভাই, রুমানিয়ার হাজি-র ফুটবল খেলা নিয়ে তো কোনো সমস্যা হয়নি।

● আমার প্রেমিকার নাম শ্বেতা। নামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হঠাৎ তার মুখে শ্বেতী দেখা দিয়েছে। এরপরে তার সঙ্গে প্রেম করার সব উৎসাহ উবে গেছে। কিন্তু এই নির্মম কথাটা কিছুতেই মুখ ফুটে তাকে বলতে পারছি না। কী করি বলুন তো?

—বিপ্র বসু, ঢাকুরিয়া, কলকাতা

□ একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করো।

● চটক দেখে ভুলেছিলাম। হঠাৎ সেদিন জানতে পারলাম, যে মেয়েটির সঙ্গে প্রেম করছি, সে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত। হায় ভগবান, শেষে সমাজ বিরোধী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলাম।

—অলকেন্দু দাস, ক্যানিং, দঃ ২৪পরগণা

□ প্রেম তো সমাজ-বিরোধীই। তোমার চেয়ে ভাগ্যবান কে আছে?

● আমরা দুই বন্ধু, কিন্তু বান্ধবী চারজন। মহা সমস্যায় পড়েছি। কী করি সারপ্লাস দু'জনকে নিয়ে?

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকদ্বয়, মালদা

□ সারপ্লাসরা উর্বশী-রম্ভা হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দাও, নইলে আর কি, নিজেদের ম্যাও নিজেরা সামলাও।।

প্রচ্ছদ কাহিনী

মহিলাক্রেসি

কৌশিক রায়

সেই খ্যাপা বাউলের গানের কলিকেই একটু ঘুরিয়ে বলা ভালো—"পুরুষ মারা কল রয়েছে জগত মাঝারে।" কোন গুণধর পণ্ডিত ব্যক্তি যে হিসেবে নিকেশ করে বলেছিলেন—এই ছেলে-শাসিত সমাজে মহিলারা সত্যিই অসহায, বড় অবলা, শুধুই পুরুষের ভোগের সামগ্রী।

কিছুদিন আগেও স্বামীরা স্কচ হুইস্কি খেযে বাড়িতে ফিরে বউকে পেটাই করে জল খেত। পণ হিসেবে টি. ভি. আর ফ্রিজ না দেওয়ার জন্য পুত্রবধূকে বেগুনপোড়া কবে বিছানার তোষকের মধ্যে এগরোল বানিয়ে ফেলে রাখাটা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এখন?

পুরাণ বা লোককথাকে অনেকেই গালগপ্পো বলে উড়িযে দেন। তবুও এইসব লেখাতে বাস্তবের টক-ঝাল মিষ্টির স্বাদ জড়িযে থাকবেই। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম অধ্যায 'জেনেসিস' বা 'সৃষ্টিসূক্ত' অধ্যাযেব কথাই ধবা যাক। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (অথবা সর্বঅঘটনকারী) তো অত সাধ করে নিজের কার্বন কপি করে বানালেন প্রথম মানুষ আদমকে। স্বর্গের অমন সুন্দব ফাইভস্টাব মার্কা 'নন্দনকানন' বা 'গার্ডেন অব ইডেন'-এ আদমেব একা থাকতে নাকি বড্ড 'বোর' লাগছিল। অগত্যা আদমের হাড় থেকে ঈশ্বরবাবা তৈরি করলেন প্রথম মেযেমানুষ ইভকে। কথায বলে না, সুখে থাকলে ভূতে কিলোয? ইভেরও হল একই দশা। শযতানের কথায় বেমালুম ঠকে গেল। জ্ঞানবৃক্ষের আপেল না পেড়ে দিলে ইভেব সখী-সখী শবীবটা ছোঁয়া আদমের একদম বারণ। রমণীর আহ্লাদে আমাদের প্রথম পূর্বপুরুষ প্রথম পাপটি করলেন। ফল যা হবার তা-ই হল। পিছনে ক্যাঁৎ করে একটি লাথি মেরে পরমপিতা বললেন—ধ্যাষ্টামো অনেক হয়েছে বাপু, আর বাপেব হোটেলে খেতে পারবে না।

ওল্ট টেস্টামেন্টেই দেখা যায ইহুদিদেব রাজা ডেভিড এবং সলোমনকে দুই ডাকসাইটে সুন্দবী মহিলা বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়েছিলেন। মেহেরউন্নিসা নূরজাহানের বিগত যৌবনা সুরতের গুলবাগিচার খুসবু-তে মুঘল বাদশাহ সেলিম জাহাঙ্গীরেরও এরকম ন্যালাখ্যাপার দশা হয়েছিল। এমনকি মুঘল মোহরে সম্রাটের পাশাপাশি খোদাই কবা থাকত নূরজাহানের শ্রীমুখও। ওই কালনাগিনী সুন্দরীর দোজখের মতো হিংসায় বলি হযেছিলেন নিষ্পাপ এবং প্রায় অপরিণত বুদ্ধি বাজকুমার শাহরিযার। চোখ কানা করে মসনদে বসার অযোগ্য কবে দেওযা হয় তাঁকে।

তবে, মহিলাতন্ত্রের প্রাণঘাতী পবিণাম দেখতে পাওয়া যায় ব্রিটিশ ইতিহাসে। স্কটল্যাণ্ডের বাণী মেরী সিংহাসন ও ব্যাভিচারের লোভে স্বামী ডার্নলিকে কোতল করে পবিচিত হন রক্তলোলুপা বা "ব্লাডি মেরী" নামে। মধ্যপ্রাচ্যে কনস্টান্টিনোপল নগরীকে (অধুনা তুবস্কের অন্তর্গত ইস্তাম্বুল) কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের স্ত্রী, অসাধারণ বিদুষী ও বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরের রূপের আগুন পুড়িয়ে দিয়েছিল বহু পুরুষ পতঙ্গকেই। স্পষ্টতই থিয়োডোরার হুকুমের পাশে জাস্টিনিযানের রাজদণ্ড ছিল ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। সাম্রাজ্যেব প্রধান সেনাপতি সুপুরুষ বেলসাবিযাসের সঙ্গে বৈধ সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েছিলেন কুহকিনী থিযোডোবা। নিজের শরীরেব ভুখ মিটে গেলে অপদার্থ আখ্যা দিয়ে বেলসারিযাসকে বধ্যভূমিতে নিযে যাওয়ার আদেশ দিতেও পিছনা হননি থিয়োডোরা। এই সম্রাজ্ঞীর হাবভাব অনেকটাই ফরাসি ঔপন্যাসিক আলেকজাঁদ্রে দুমা বিরচিত "থ্রি মাস্কেটিয়ার্স" কাহিনীর স্বৈরিণী নারী মাদাম মিলেভিক্লাবিস-এর মতো। রাশিযান ঔপন্যাসিকদ্বয় নিকোলাস লেস্কফ্ এবং কাউণ্ট লিও তলস্তযের সৃষ্ট যথাক্রমে "লেডি ম্যাকবেথ" এবং "অ্যানা কারেনিনা" উপন্যাসে কাতেবীনা লভ্ভনা এবং অ্যানাও একইরকম ভাবে পুরুষের ঘাড় ভেঙে খাওয়া ও সেই পুরুষকে ধ্বংসেব অতলে তলিয়ে দেওয়াব চক্রান্তে বেশ হাত পাকিয়েছিলেন। মিশরের আকর্ষণীয়া রাণী ক্লিওপেট্রাও রোমান সেনাপতি মার্ক অ্যাণ্টনিকে প্রায় ছিবড়ে করে দিযেছিলেন। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজাব একবার ব্রিটেন আক্রমণ করেছিলেন। ব্রিটেনে তখন বাজত্ব করতেন বোদিচিয়া নামে একজন রাণী। তাঁর কথাতেই গোটা ব্রিটিশ বাজ্য ওঠাবসা করত। উন্নত সেনাদল আর অস্ত্র নিয়ে বোদিচিযাকে হাবাতে গিযে জান একদম কয়লা হযে গিয়েছিল জুলিয়াস সিজারের। অশেষ সৌভাগ্য রোমানদের, জ্ঞাতিগুষ্টিব লোকেরাই বোদিচিয়াব এন্তেকাল করল। তবে ইউরোপীয ইতিহাসে সাচ্চা মহিলারাজ চালানেওযালির কথা বলতে গেলে দু'জনের নাম আগে নিতেই হবে। গোটা অস্ট্রিযা, প্রাশিযা এবং সাইলেশিযা জুড়ে একসময সকলে সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসার ভযে মুখে কুলুপ এঁটে থাকত। হালফিলেব ব্রিটেনেব প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বা শ্রীলঙ্কাব প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েকও বোধহয় মারিযাব মতো দেশীয় বাজনীতির ওপর এরকম ছড়ি ঘোরাতে পারেননি। ইংরেজ বাণী চিরকুমারী প্রথম এলিজাবেথ তো ঠিকই করে রেখেছিলেন—'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে, চুল ভিজাব না'। শেক্সপীয়র আর নামজাদা পৃথিবী পর্যটক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে-র সঙ্গে তাঁর শারীরিক ঘনিষ্ঠতাব কথা অনেকেই অস্বীকাব করতে পারবেন না। মেজাজী এই ইংরেজ মক্ষিরাণী যে-কোনো পুরুষকে অপছন্দ হলেই সো—জা পাঠিযে দিতেন টাওযার অব লণ্ডনের

বন্দীশালায়। সেখানেই তেনাদের মাথাগুলো জল্লাদেরা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে নামিয়ে দিত। স্পেনের রাজা ফিলিপ একবার রাণীকে শাদি করতে চেয়েছিলেন। একরোখা বলিউডি হিরোইনের মতো এলিজাবেথ তাঁকে নাকচ করে দিলেন। ফিলিপ তখন তাঁর অপরাজেয় নৌবাহিনী, "স্প্যানিশ আর্মাদা"-কে পাঠালেন। এলিজাবেথের বাঁ হাতের এক ইশারাতেই স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক আর জন হকিন্সের মতো পোড় খাওয়া বোম্বেটে জলদস্যুরা সেই 'আর্মাদা' কামান দেগে দফারফা করে দিল। একমাত্র এই এলিজাবেথের জন্যই ব্রিটেনের রাজ্যপাট গোটা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

অনেকটা এলিজাবেথের মতনই সাবেকি মধ্যযুগীয় চীন দেশে প্রমীলা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন সম্রাজ্ঞী ডু শি। তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে ছেলে, রাজা কোয়াং শু-ও ঠিকমতো রাজকার্য করতে পারতেন না। ছেলের 'একশো দিনের সংস্কার' গরিব প্রজাদের জন্য উপকারী জেনেও আমল দেননি ডু শি। ইংরেজ হানাদারদের বিপক্ষেও যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেখিয়েছিলেন এই চৈনিক রাজনারী। অবশ্য পরাধীন ভারতে নাগাল্যাণ্ডে ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে শুধুমাত্র একজন নাগা মহিলার কাছে প্রবল বাধা পেয়েছিল। রাণী গুইদালো-র নির্মল চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট কুৎসা রটনা করেছিল গোরারা। তবুও নাগারা দেবীর মতো মেনে চলত রাণী গুইদালোকে। আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগির তোলা অকুতোভয় আহমদনগরের চাঁদ সুলতানা আর গণ্ডোয়ানা রাজ্যের রাণী দুর্গাবতীও হয়ত এতটা সম্মান পাননি তাঁদের প্রজাদের কাছে।

> মেজাজী এই ইংরেজ মক্ষিরাণী, যে-কোনো পুরুষকে অপছন্দ হলেই সো—জা পাঠিয়ে দিতেন টাওয়ার অব লণ্ডনের বন্দীশালায়। সেখানেই তেনাদের মাথাগুলো জল্লাদেরা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে নামিয়ে দিত।

১৯১৭ সাল নাগাদ জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তাঁর পরিবারের ভবলীলা সাঙ্গ করে লেনিন-ট্রটস্কিরা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিস্ট সাম্যবাদের উত্তপ্ত বাতাস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য অনেকে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন—সাম্যবাদ মানে শুধু লেনিনতন্ত্রই নয়, বলশেভিক পার্টির কার্যনীতির অনেকটাই জুড়ে ছিল লেনিনের ধর্মপত্নী নাদেজ্‌দা ক্রুপস্কায়ার রাজনৈতিক তন্ত্র-প্রভাব। সম্প্রতি সার্বিয়া ও বলকান উপদ্বীপে নির্বিচারে নরহত্যা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা চালানোর জন্য আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে সার্ব রাষ্ট্রপতি স্লোবোদান মিলোসেভিচ্‌কে। অনেকেই জানেন, শেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথের মতনই ঘাতক মিলোসেভিচের একনায়কতন্ত্রকে পর্দার আড়ালে বসে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তাঁর স্ত্রী মারিয়ানা মার্কিচ।

আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি হিসেবে একসময় সেনোর হুয়ান পেরন খুবই কল্কে পেয়েছিলেন। আসলে পেরন নয়, তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের মূল খসড়া বেরোত অসামান্য রূপসী স্ত্রী এভিতা পেরনের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে। সাবেক রাষ্ট্রপতি গর্বাচভের যে 'পেরেস্ত্রৈকা' আর 'গ্লাসনস্ত' উদারনীতির জন্য রাশিয়ার-তরী ডুবল, তার জন্য দায়ী অনেকটাই স্ত্রী রাইসা-র খবরদারি। পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোসের জমানাতে ফিলিপাইন্‌সের হাঁড়ির হাল হয়েছিল বৌ ইমেলডার জন্যে। বউ-এর জুতো আর গয়নার স্টক বাড়াতে বাড়াতেই গদি ওল্টায়। কিন্তু তারপরেও সেই নারীতন্ত্রই গ্যাঁট হয়ে বসে সেখানে। বেশ কয়েক বছর কোরাজান অ্যাকুইনো ফিলিপিন গণতন্ত্রে পতাকা ওঠানামা করানোর ভার নেন। বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় ভেলুপাল্লি প্রভাকরণ আর তাঁর সঙ্গীদের দুরমুস করার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শ্রীমতী চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা। এল টি. টি. ই জঙ্গীদের কল্যাণে একবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেও তাঁর হাঁকডাক তুঙ্গেই আছে। ইজরায়েলে রাষ্ট্রনেতা পুরুষ হলেও সেনাবাহিনীতে মহিলাদেরই বেশি খবরদারি। অনেকেই জানেন একদা গোল্ডা মেয়ার ইজরায়েলের অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতিতে যুগান্তর এনেছিলেন। ইজরায়েলবাসীদের সৌভাগ্য, তাঁদের আর মাদাম দ্য পম্পাদু-র মতো মহিলার খবরদারিতে পড়তে হয়নি। পরমা সুন্দরী এই রক্ষিতা তৎকালীন ফরাসি সম্রাট চর্তুদশ লুইকে দেহে এবং মনে প্রায় ভেড়া বানিয়ে রেখেছিলেন। ব্যাপারটা অনেকটা দশরথ ও কৈকেয়ীর মতো। বুড়ো দশরথকে দেহসম্পদ দেখিয়ে কৈকেয়ী নিজের ছেলের সিংহাসন পাকা করতে রামকে জঙ্গলে পাঠানোর ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন, যাকে বলে 'পুসি ফ্লগিং'।

রূপের চটক দেখিয়ে গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডে ট্রয় নগরীর একেবারে তেরোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন গ্রীক সম্রাট মেনেলাউসের গিন্নি হেলেন। বরকে ঝেড়ে ফেলে পাড়ার ঠাকুরপোর সঙ্গে ভেগে যাওয়ার মতো হেলেন ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিসের সঙ্গে কেটে পড়লেন। ফলে গ্রীস আর ট্রয়ের মধ্যে এসপার-ওসপার লড়াই। এই যুদ্ধেও অবশ্য অলিম্পাস পর্বতের দেবীরাই কলকাঠি নাড়লেন। দেবী হেরা, অ্যাথেনা, থেটিস, আর্তেমিসরা ইচ্ছেমতো যুবরাজ হেক্টর, অ্যাকিলিস ও দিসিয়ুস-এর পক্ষ নিয়েছেন।

ভারতীয় পুরাণেও দেবীদের দাপট যথেষ্ট বেশি। শিবভক্ত হলেও রাজা রাবণ রামের হাতে চৌপাট হয়ে গেলেন স্রেফ এই কারণেই যে রামচন্দ্রের পক্ষে ছিলেন খোদ শিবের গৃহিনী দুর্গা।

গ্রীক ও রোমান পুরাণে অনেক সময় দেখা যায়, নরকে কাকে গরম তেলে চোবানো হবে বা শূলে চড়ানো হবে সেটা ঠিক করবেন যমরাজ প্লুটো বা হেডেসের স্ত্রী প্রসারপিনা বা পের্সেফোনি।

কুটনৈতিক ক্ষেত্রে শরীর এবং বুদ্ধি দিয়ে তাবড় তাবড় নেতাদের বুদ্ধু বানিয়ে কার্যসিদ্ধি করার একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল মহিলা গুপ্তচরদের। মগধের ক্ষমতাশালী রাজা ধনানন্দকে ছলাকলায় কুপোকাত এবং দুনিয়া থেকে আউট করার জন্যে চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত পাঠিয়ে ছিলেন এক বিষকন্যাকে। নিজের জোরে নয়, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতেশ্বর হতে পেরেছিলেন এই লাস্যময়ীর জন্যেই।

ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে পরাক্রমশালী ইজরায়েলী বীর স্যামসনকে পর্যুদস্ত করতে না পেরে প্যালেস্টাইনের কর্তারা শরণাপন্ন হয়েছিলেন ডেলাইলা নামের এক ষোলোকলা পটিয়সী নারীর। ডেলাইলার রূপের প্যাঁচে পড়ে স্যামসন একেবারে ছিবড়ে হয়ে গেল। তারপর বন্দী হয়ে কী নির্যাতনটাই না তাকে সইতে হয়েছিল।

খবরদারি, নজরদারি, দখলদারি—যেটাই বলুন, শাসনের ছড়ি হাতে তুলে নিতে মহিলারা চিরকালই সিদ্ধহস্ত। মনুষ্য নির্মিত যে কোনো আইন এই মহিলাতন্ত্রের সামনে অচল। মহানায়ক উত্তম কুমারের ঠোঁটে উচ্চারিত এই কথাটি চিরকাল সভয়ে স্মরণ করতেই হবে—

নারী চরিত্র বেজায় কঠিন
কিছুই বলা যায় না
ওরা কোনো ল-ই মানে না
তাই ওদের নাম ললনা।

পুরুষরাই বিপজ্জনক

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তেরোই মার্চ ২০০২ সালের একটি ছোট খবর, ঢাকা থেকে। বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ এরশাদ স্বীকার করেছেন যে ১৯৯৯ সালে, তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সে, তিনি তাঁর অর্ধেক বয়সী মহিলা বিদিশাকে ভালোবেসে বিবাহ করেছেন এবং তাঁদের একটি শিশুপুত্রও জন্মেছে। এরশাদ জোর দিয়ে বলছেন যে, তিনি কোনো অন্যায় কাজ করেননি। এই বিবাহ ইসলাম ধর্মসম্মত। উপরন্তু এই বিবাহে তাঁর প্রথম স্ত্রী রওশন—যিনি জাতীয় দলের অন্যতম নিয়ামক—তাঁর সম্মতি ছিল।

খ্রীস্টান হওয়ায় দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি পাননি অপর এক রাষ্ট্রপতি — বিল ক্লিনটন—তাই তাঁর নামে কী কেচ্ছাটাই না রটল সারা বিশ্বে। তিনিও অপর এক মহিলার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন এবং স্বগৃহে অনুমতি না থাকায় যত্রতত্র স্বেচ্ছাচার করে বেড়িয়েছিলেন, তাই তাঁকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হল। আর তাঁর স্ত্রী স্বামীর এই দুঃসময়ে একটিও মন্তব্য করেননি, তাই শেষ রক্ষা হল।

এর উল্টো দিকে আমরা দেখি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার-এর স্ত্রী ছেচল্লিশ বছর বয়সে আবার মা হয়েছেন। দশ নং ডাউনিং স্ট্রিটে বহুকাল পরে আবার সদ্যোজাত শিশুর কান্না শোনা গেল। প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল থেকে গর্ভবতী হয়েছেন এবং মা হয়েছেন বেনজির ভুট্টো, তাতে কোনো কলঙ্ক রটে না।

আমাদের দেশেও ভারতরত্ন শিল্পী রবিশংকর বৃদ্ধ বয়সে একজন তরুণীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের কন্যা তনুশ্‌কা এখন প্রায় যুবতী, বাবার সঙ্গে আসরে-বাসরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটিও আইনসিদ্ধ বিবাহ, কেন না রবিশংকরের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বিচ্ছেদ আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে।

এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে যে প্রাকৃতিক সত্য বেরিয়ে আসে তা হল . এক, সভ্যসমাজ নরনারীর মধ্যে যে বিবাহপ্রথা চালু করেছে তার প্রধান উদ্দেশ্য হল নিয়মিত যৌনজীবন অক্ষুণ্ণ রাখা, আর-দুই, মহিলাদের বেলা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স আসতে না আসতে যৌনকর্মের দরকার মিটে যায় অথচ পুরুষদের বেলা যৌনক্ষমতা থাকে সত্তর-আশি বছর বয়স পর্যন্ত। তাই দীর্ঘজীবী দম্পতি জীবনের শেষ ত্রিশ বছর অশান্তিতে কাটাতে বাধ্য হন। স্বামীর কাছে স্ত্রীর যৌন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু গৃহকর্মের নানা ব্যস্ততায় লিপ্ত থেকে স্ত্রী সেটা বুঝতে দেন না। অভুক্ত স্বামীর চেষ্টা থাকে ফাঁকে-ফোকরে একটু নিষিদ্ধ স্বাদ আহরণ করার। এই কারণেই নারী-নির্যাতন মামলায় প্রধান অভিযুক্ত হন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, যাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর থেকে সত্তর বছর অবধি। কিন্তু তাঁরা যাবেন কোথায়? যৌন বাজার যে পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে সঙ্কুচিত। সুতরাং এঁদের একাংশ যান গণিকালয়ে। অর্থ এবং গোপনতার বিনিময়ে যৌন স্বাদ গ্রহণ করে আসেন।

নারীবাদীদের সমস্যাটিকে আমি উল্টো দিক থেকে ধরার চেষ্টা করলাম। একথা সত্য যে, পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সী মহিলারা কর্মক্ষেত্রে অধিক আকর্ষণীয়। চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে মহিলারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। পুরুষরা বিপজ্জনক।

অতএব প্রাকৃতিক দিক থেকে আমাদের দেশে মহিলাদের অবস্থা যথেষ্ট দুঃখজনক। সামাজিকভাবে এই দুঃখকে অস্বীকার করে কিছু সংখ্যক নারী তাই পুরুষতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে নেমেছেন এবং যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছেন। সংগ্রামী নেত্রীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়স্কা। তা না হলে একক বা বিচ্ছিন্ন বা বিধবা।

কিন্তু যথার্থ যুবতী বা তরুণী, এমনকি কিশোরীরা পর্যন্ত এই সংগ্রামে যুক্ত নয়। টিভি প্রোগ্রামে যে অর্ধেক অংশ বিজ্ঞাপন থাকে তাতে যেসব স্বল্পবাস নারীরা নিরন্তর ধেইধেই করে নৃত্য করে বা পুরুষপ্রেমিকদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, ওদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে ওদের কোনো বক্তব্য আছে। বরং উপবাসী এবং ভিতু পুরুষদের জন্য বিনোদন প্রক্রিয়ায় তারা নিয়োজিত।

ওই ভিতু আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষরাই কর্মক্ষেত্রে নারীদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। কিছুদিন আগে ‘সংহিতা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মানবিক অধিকারমূলক এক প্রোগ্রামে বলা হল যে, ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ১৩ই আগস্ট ১৯৯৭ তারিখে দেওয়া নির্দেশিকায় জানিয়ে দিয়েছেন কী ধরনের আচরণকে কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন বলা হবে। সেগুলি হল—শারীরিক সংস্পর্শ, প্রেম নিবেদন, যৌন উত্তেজক ঠাট্টা-ইয়ার্কি, অশ্লীল ছবি বা লেখা প্রদর্শন এবং পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো যৌন বাসনার প্রকাশ। এই রকম ঘটনা ঘটলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও বলা আছে নির্দেশিকায়।

কিন্তু মূল গোলমালটা রয়ে গেছে ওই ‘Unwelcome’ শব্দটির মধ্যে। যদি পুরুষবিশেষের আচরণ নারীবিশেষের কাছে অপছন্দের না হয়, তা হলে মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হল না। আসল কথা হল নিরাপত্তা। পুরুষ ও নারী মিলেমিশে কাজ করবে। কর্মক্ষেত্রটিকে নিরাপদ মনে করবে। তবে এর দ্বারা প্রাকৃতিক সমস্যার সমাধান হল না। যুবতীদের চাহিদা থেকেই যাচ্ছে। এবং পুরুষের পক্ষে দু'বার বিবাহের অনুমতি নেই।

নারীদিবসের কড়চা

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ : শুভাশিস বসু

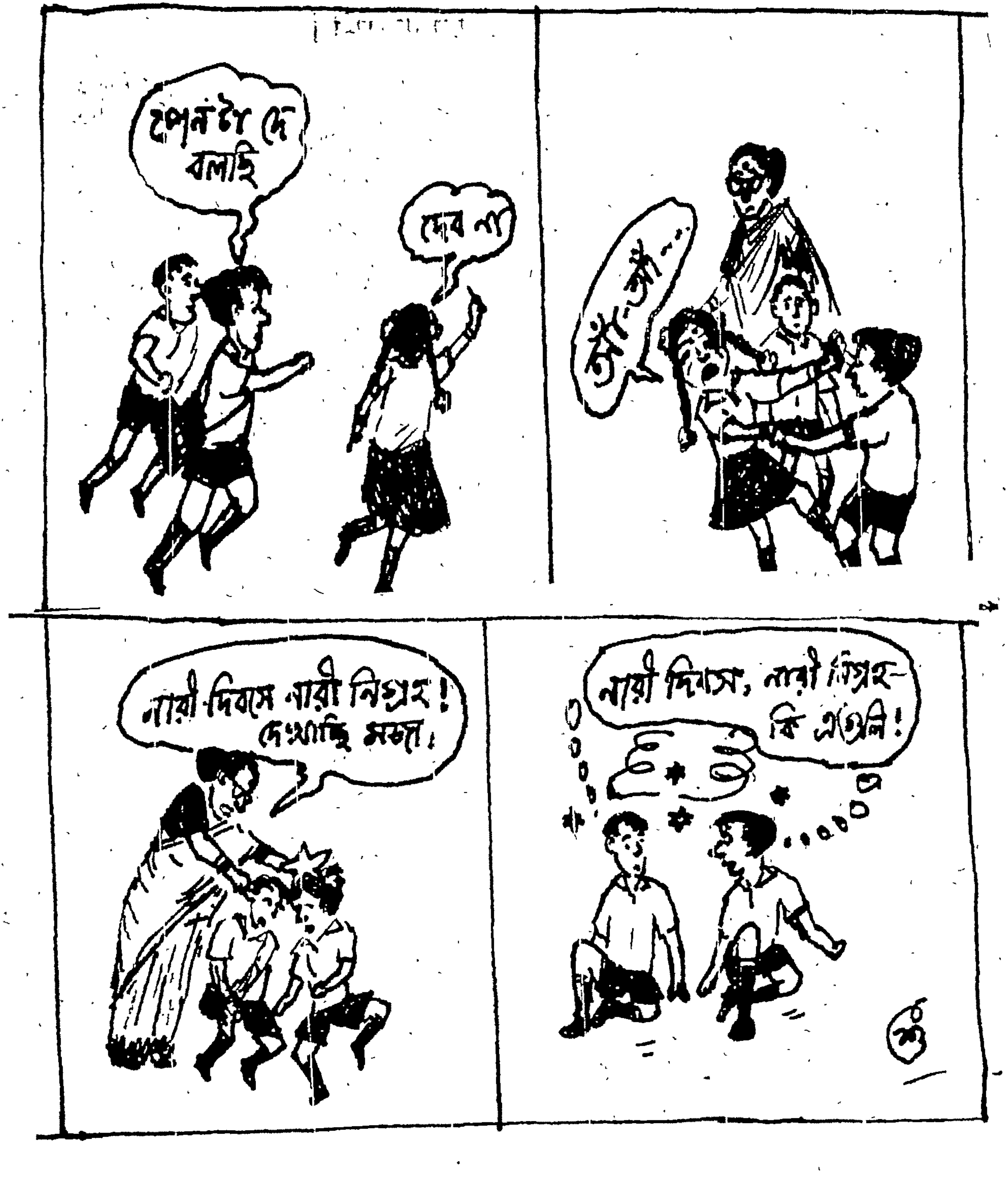
পেনটা দে বলছি
দেব না
ভ্যাঁ-ভ্যাঁ...
নারী দিবসে নারী নিগ্রহ! দেখাচ্ছি মজা।
নারী দিবস, নারী নিগ্রহ— কি এগুলি!
শু

সমুদ্দুর পারের নোনা হাওয়ায় বুঝিবা রম্য রচনা গল্পও হয়ে ওঠে, কিংম্বা গল্পের গরু, তারপর মুনিবকে পিঠে নিয়ে গাছে ওঠে, তারপর, তারপরের নিকুচি করেছে

হাড্ডাহাড্ডি

চাপান

ফেব্রুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় সৈয়দ রেজাউল করিম-এর 'সরি' লেখাটির সঙ্গে আমার লেখা 'সরি'-র অনেকাংশে মিল আছে। শুধু মিল নয়, ৪৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় লাইন "পায়ের উপর পা দিয়ে ধাক্কা মেরে কনুয়ের গুঁতো মেরে" থেকে "আমি যতদূর সম্ভব চোখে প্রেমের ভাব ফুটিয়ে বললুম সরি" পর্যন্ত লেখা এবং তার লাইনগুলো হুবহু নকল। লেখার নাম এক হতে পারে, ঘটনাও মিলে যেতে পারে, তবে একটা লেখার সঙ্গে আর একটা লেখার লাইন কখনো মিলবে কি, তাকে যদি নকল করা না হয়?

'সরি' নামে আমার সংকলনটি বেরোয় ১৯৯১ সালে বইমেলায়। তার আগে লেখাটি বেরোয় সুইডেনের একটি পত্রিকায়। মূল বাংলায় লেখাটি দুটি ভাষায় অনুবাদও হয়ে প্রকাশ পায়। পরে বইটি পরিমার্জিত হয়ে কলকাতা বইমেলা ২০০২ সালে প্রকাশ করে 'বিশ্বজ্ঞান'। কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী প্রচ্ছদ অলংকরণ করেন এবং 'হিমানীশ গোস্বামী' বইটির জন্য একটি আশীর্বাদ লিখে পাঠান। এর আগে যখন লেখাটি সুইডেন থেকে বেরোয় তখন তার অলংকরণ করেন প্রখ্যাত শিল্পী অন্নদা মুন্সী। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত বইটির 'সরি' লেখাটি জেরক্স কপি পাঠালাম। সৈয়দ রেজাউল করিমের 'সরি' লেখাটির পড়ে চণ্ডী লাহিড়ী তাঁর প্রতিবাদ আমাকে জানান। পত্রিকাটি ওনাকে দিয়েছেন সমরেশ মজুমদার, পত্রিকার উপদেষ্টা। আশা করি, বাকি বিষয়টি সম্পাদক মশাই দেখবেন।

"কাউকে হাসানোর কাগজ, কাউকে ফাঁসানোর কাগজ"। সত্যিই অভিযোগ না জানিয়ে পারলাম না, এর জন্য 'রিয়েলি সরি'।

—সুদীপ নাগ, কাশীপুর, দাশনগর, হাওড়া-৭১১১০৫

দোয়ারকি

আপনাদের ফেব্রুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় প্রকাশিত সৈয়দ রেজাউল করিমের লেখা 'সরি' গল্পটি পড়ে স্তম্ভিত হলাম। সুদীপ নাগের 'সরি' বলে একটি গল্প সুইডেন থেকে প্রকাশিত "উত্তরপ্রবাসী" নামক পত্রিকায় সম্পাদক হিসাবে (১৯৮২ সালে) আমি প্রথম প্রকাশ করেছিলাম। তাতে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন প্রয়াত শিল্পী অন্নদা মুন্সী। সেই গল্পটির অনেক অংশ হুবহু উদ্ধৃত করে রেজাউল করিম তাঁর 'সরি' গল্পটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। গল্পের শিরোনামের নিচে উদ্ধৃত অংশটুকুও সুদীপ নাগের। কোনোরূপ সৌজন্য মূলক স্বীকৃতি না দিয়ে এ ধরনের কাজ গর্হিত বলে আমার মনে হয়। এসব দু'নম্বরি কাজে লেখক যেমন দোষী, সম্পাদককেও তেমনি সাহিত্যকৃতির অপবিজ্ঞতার দুর্নাম বহন করতে হয়।

—গজেন্দ্র কুমার ঘোষ, সম্পাদক, উত্তরাপথ, সুইডেন

ঢিমে তেতালা

শ্রী সুদীপ নাগ ও গজেন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা পত্র দেখলাম। ১৯৮২ সালের 'উত্তর প্রবাসী' পত্রিকার 'সরি' রম্য রচনার আসল কপি দেখার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যময়তা ও 'সরি'র অদৃশ্য হাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন প্রতীক্ষা যবনিকা উন্মোচনের এবং রহস্য উদ্ঘাটনের পর কে সরি বলবেন, তারই।

—সৈয়দ রেজাউল করিম

ফাঁকতাল

লেগে যা নারদ নারদ। আমরা বাপু অল্প-সম্পাদক, ঠিক গল্প-সম্পাদক নই। অবশ্য সমুদ্দুর পারের নোনা হাওয়ায় বুঝিবা রম্য রচনা গল্পও হয়ে ওঠে, কিংম্বা গল্পের গরু, তারপর মুনিবকে পিঠে নিয়ে গাছে ওঠে, তারপর, তারপরের নিকুচি করেছে, এখন জোর মওকা—খেলা জমে উঠেছে, ফাঁকতালে বাচ্চেলোগ জোরসে তালি দেওয়ার জন্যে তৈয়ার।

—সম্পাদক

আমার নিজের ঘরেই যা একখানা তৈরি হচ্ছে! যে ঘরে সারাক্ষণ নারীবাদের বইপত্র ছড়ানো, তার ভেতর দিয়েই দিব্যি একটি পুরুষ গজিয়ে উঠছে।

কার্টুন নেটওয়ার্ক বনাম নারীবাদ

সুবোধ সরকার

আমার পুচকে ডানপিটে ছেলেটিও একটি পুরুষ। সে আমাকে হুকুম করে—বাবা টিনটিন খুঁজে দাও। বাবা জল খাব। সে আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে, টেবিলে খালি গ্লাস ঠুকতে থাকে। তার মানে তার গ্লাসে জল নেই, অর্থাৎ আমি পড়ার টেবিল থেকে উঠে এসে তার গ্লাসে জল ভরে দিই। তবে তিনি জল মুখে দেন। মাত্র দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জলের বোতল তিনি দেখতে পান না। বহুবার তাকে বলেছি, জলটা নিজে নিয়ে খেতে শেখ। তাতে তার মুখে যে হাসিটা তৈরি হয়, আমি জানি ঐ হাসিটাই একদিন বড় হবে, ঠোঁট ছাড়িয়ে, কান ছাড়িয়ে, কানের পাশ দিয়ে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। আমার নিজের ঘরেই যা একখানা তৈরি হচ্ছে। যে ঘরে সারাক্ষণ নারীবাদের বইপত্র ছড়ানো, তার ভেতর দিয়েই দিব্যি একটি পুরুষ গজিয়ে উঠছে। মনে মনে বলি আর বোতল থেকে জল ঢেলে দিই। আমারই সবচেয়ে দরকার নারীবাদ।

পুরুষের দরকার নারীবাদ? এটা কীরকম কথা হল? হ্যাঁ, আমি জানি. আমাকে লোকে প্রশ্ন করবে, চা বানিয়ে খাও, ভাতের মাড় গালতে পারো, রান্নাঘরে ঢোকো?

আমি অবশ্যই রান্নাঘরে ঢুকতাম, যদি কাজের মাসি না থাকত। রান্নার লোক রাখার সামর্থ না থাকলে আমি ডালে-চালে ফুটিয়ে নিতাম। আর তাই দেখে আমার পুচকে গুণ্ডাটিও কার্টুন নেটওয়ার্ক থেকে উঠে এসে আমাকে সাহায্য করত। এটা হল না, তার কারণ, কাজের মাসি। কাজের মাসির জনাই নারীবাদ আমাদের বাড়িতে মোটামুটি ব্যর্থ।

ব্যর্থ, তবু ঠিক ব্যর্থ নই। একটা দুটো উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। মাসি যখন থাকে না আমি দুধ আনি। ছেলে বোতলে জল ভরে। আজকাল বিছানাতে বালিশটাও রাখতে শিখেছে। বেল বাজলে দরজা খোলে, ফোনও ধরে। আবার ঘরের মধ্যে ক্রিকেটও খেলে। কার্টুন নেটওয়ার্কে এখন একটা ড্রাগন বল-Z বলে জাপানি কার্টুন হচ্ছে। ওদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয়। প্রচণ্ড ফাইটিং। বোবো-কে দিয়ে ওই সময়ে বোতলে জল ভরানো যাবে না। অন্য সময়ে যাবে। এটাই নারীবাদের সফলতা।

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

—যাও দেখি, বাপ-ছেলে মিলে আমার বইগুলো বেচে এসো…

সাহিত্য দুঃসংবাদ

বুড়োদার ভীমরতি

লেখকদের ব্যক্তিগত প্রবণতা কিছু থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে দেখি যে হিমালয় ভ্রমণ কালে তিনি যা-ই দেখছেন, তাতেই ঈশ্বরের পরম করুণা অনুভব কবছেন। তেমনই কি আমাদের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সবকিছুর মধ্যেই দেহগন্ধ পান এবং তা সাহিত্যে উপস্থাপিত করতে ছাড়েন না? তাঁর সমকালীন কিছু লেখা নিযে এমন প্রশ্ন উঠছে। এঁব সৃষ্ট চবিত্র শশিশেখব (চলচ্চিত্র—'দেখা') প্রখ্যাত অধ্যাপক ও কবি। তিনি বিপ্লবেব কথা বলেন, নানা বুলি আওড়ান, বিপ্লবী দম্পতির সন্তানের আদর্শভ্রষ্টতার জন্য বিস্মিত ও ব্যথিত হন। বস্তিব ছেলে ও মানুষদেব সুবিধাব কথা ভেবে পুকুর প্রমোটারকে দেন না। লিট্‌ল ম্যাগ-এর জন্য অর্থ সাহায্য করেন। অথচ তিনি ঘবে প্রেমময়ী স্ত্রী (তিনিও ছাত্রী) থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীদের দেহ নুন-মবিচ দিয়ে খান। তিনি নারী-লোলুপ। তিনি রাস্তা থেকে বাবাঙ্গনাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়িতে যান। নিজেব শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেব স্বামীবিচ্ছিন্না কন্যার প্রতিও লোলুপ। ভারসাম্যহীন এ চরিত্র কীসের প্রতিফলন।

> **কবে তিনি আবার না কোন লেখার বিষয় হয়ে ওঠেন এবং কোনো অপ্রিয় ঘোষ না বলে বসেন—ওটা তিনি নন, এক বুড়ো ভাম—এই শুধু ভয়!**

দ্বিতীয দৃষ্টান্ত—'বাণু ও ভানু' উপন্যাস। সেখানে তিনি ৬০ বছরেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১২ বছর বয়সী বাণুর প্রথম সাক্ষাৎকারটার বর্ণনা যে রূপে উপস্থাপিত করেছেন তা অবিশ্বাস্য। রবীন্দ্রনাথ বাড়ির বাইবে থেকে রাণুব বাবার নাম ধরে ডাকলে ১২ বছবের রাণু এসে বাইরের দরজা খুলে দিযে দাঁড়িযেছে সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে। স্বাভাবিক অবস্থায ঐ বযসের মেয়ের দেহে 'নারীত্ব' এসে যায। আজ থেকে প্রায় আশি বছব আগেব সময়ে এক শিক্ষিত রুচিশীল বক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ের এই আচবণ।

ঐ উপন্যাসেবই আরো একটি ঘটনা—বিবাহের পর রাণু স্বামীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নিয়ে গেছে ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে রাতে খাওয়া-দাওযার পব নির্জনে ও অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা করে আছেন রাণুর জন্যে। তাকে ডেকেও পাঠিযেছেন। রাণু ঐ বৃদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলছে—ভানুদাদা যা চাইছেন, তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই—নেই—নেই।

এ কোন ববীন্দ্রনাথকে আঁকা হল? নিত্যপ্রিয় ঘোষ বলেছেন যে 'ভানু' চরিত্রে যাকে ধরা হয়েছে তিনি ববীন্দ্রনাথ নন, এক বুড়ো ভাম।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাণুব বযসের পার্থক্য ছিল ৪৭ বছর। ধবে নেওযা যায বাণুর বিবাহের সময়ে কবির বযস প্রায় ৬৫। সুতরাং রাণুব প্রতি তাঁব যেমন বা যত দুর্বলতাই থাক, কবিব আচরণকে ঐভাবে চিত্রিত কবা কতখানি রুচি সম্মত?

আমাদেব লেখক বযসেব হিসাবে বুড়ো হয়েছেন তো বটেই। কবে তিনি আবাব না কোন লেখার বিযয হযে ওঠেন এবং কোনো অপ্রিয ঘোষ না বলে বসেন—ওটা তিনি নন, এক বুড়ো ভাম—এই শুধু ভয।

—ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

তোমাব সংসারে এসে সারাজীবন দাসীগিবিই করে গেলাম..

জবর খবর

মদ চিবোনো!

শাকসব্জি, ডাল-ভাত, মাংস-মাছ, চকোলেট তো অনেক চিবিয়েছেন। আপনি যদি ইয়ংম্যান হন, তাহলে আপনার মাথাটিও নিশ্চয়ই কোনো সুন্দরী চিবিয়ে খেয়েছেন। এবারে অন্য কিছু চিবোতে ইচ্ছা হওয়ারই কথা। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সংস্থা সেই 'অন্য কিছু' চিবোনোরই ব্যবস্থা করেছে আপনাদের। এই কোম্পানির 'মাল' চিবোলে আপনাদের আর কারোর গুষ্টির পিণ্ডি চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করবে না।

দক্ষিণ কোরিয়ার কুক্ সুনদাং ব্রেউয়ারি কোম্পানি তাঁদের ভাটিখানাতে বানিয়েছেন এক আজব কিসিমের মদ। এক চুমুকে এই 'মাল' সাবড়ে দিতে আপনি পারবেন না মোটেই। দক্ষিণ কোরিয়ার এই মদ, অনেকটা জেলির মতো দেখতে। স্কচ রাম ভদকা কেনার রেস্ত না থাকাতে আমরা অনেকেই সস্তার ধেনো গিলে টালমাটাল হই। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিটি গ্রাম এবং শহরতলিতেও এখন ধেনো মদের জয়জয়কার। 'পাইকসাইজু' নামের এই ধেনো মদকেই আরো একটু ময়ান দিয়ে ঘন করে তৈরি করা হয়েছে এই জেলি মার্কা, চিবোনোর মদ। তবে এই মার্কামারা মদ খেয়ে সবাই কিছুক্ষণের জন্য 'আউট' হবে না একেবারেই বোল্ড আউট হয়ে উপরে চলে যাবে, সেটা নিয়ে এখনো কোনো গবেষণা করেননি কোরিয়ার ধেনো মদ বিশেষজ্ঞরা। শোনা যাচ্ছে প্রত্যেক কোরিয়বাসীকে চিবোনো মদের ফ্রি নমুনা বিলি করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে দক্ষিণের এখন মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ। ওদের মাথা চিবোনোর জন্যে এই চিবোনো মদ সরবরাহ করা যায় কিনা, ভেবে দেখা হচ্ছে।

পাখিবাজার সায়েন্স কলেজ

রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ ইদানীং যত রাজ্যের পায়রা, চড়ুই আর হুতোম প্যাঁচার সাধের আড্ডাখানা হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞান কলেজের যুবকরা ইদানীং আশায় বুক বেঁধে বসেছিল—ক্লাশরুমে হাইহিল খট্‌খটানো, স্যাণ্ডাল ফট্‌ফটানো, রাঙা ঠোঁট বাঁকানো আর আঁটো শালওয়ার কামিজ পরিহিতা পাখিদের কলকলানি বোধহয় আরো বাড়বে। কা কস্য পরিবেদনা। সেই 'ডার্লিং' চিড়িয়াদের জায়গায় ল্যাবরেটরি, বাথরুম, ব্যালকনি, ক্লাশঘর, কমনরুম, ক্যাণ্টিনরুম—সর্বত্রই এইসব পাখিদের অবারিত উপস্থিতি। জোড়া পায়রাকে দেখে অবশ্য স্বস্তি পেয়েছে অনেক পড়ুয়াই। কবুতরকে দেখে তারা এমন সব রোমাণ্টিক কবিতা লিখছে যে মণিকা-লিপিকা- সোনালিরা সেই কবিতা পড়ে তাদের শ্রীরাধিকা হতে বাধ্য। অনেক অধ্যাপকই মজা করে বলছেন, এবার থেকে কেমিস্ট্রির বই বা ল্যাববুকের মধ্যে নয়, পায়রার গলাতেই প্রেমপত্রগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পায়রা-চড়াইদের দলে যদি এবার শহরের বিখ্যাত দাঁড়কাক আর পাতিকাকরা আসে? ঠোঁটের ঠোক্কর সইবে তো?

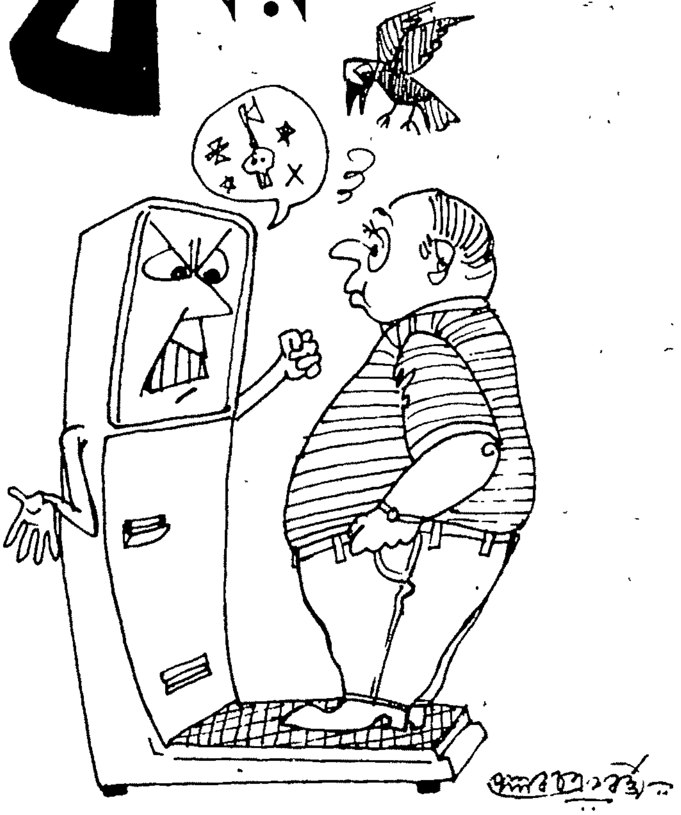

গাল দেওয়া মেশিন!

গায়ে গতরে চর্বি জমলে সকলের কাছ থেকে একটু-আধটু "খেঁটু", "কুমড়ো পটাশ", "গদাই লস্কর"—এসব মধুর বুলি শুনতেই হয়। তা নিয়ে স্থূলকায় মানুষেরা বড় একটা মাথা গরমও করেন না। অস্ট্রেলিয়ার মোটা মানুষেরা কিন্তু রেগে একেবারে একশোখানা হয়ে আছে। না, কোনো পাড়াপড়শি তাদের চর্বি নিয়ে ফোড়ন কাটেনি। মোটা বলে তারা বেজায় গালাগালি খেয়েছে ওজন মাপার একটা মেশিনের কাছ থেকে।

বলিহারি এই ওজন যন্ত্রটিকে বসানো হয়েছিল উত্তর-পূর্ব মেলবোর্ণ শহরের গ্রীণস্‌বরো প্লাজা নামের বাজারের মধ্যে। মুশকিলের ব্যাপার হল—বেঢপ মোটা লোক এই কম্পিউটার চালিত যন্ত্রে ওজন পরীক্ষা করার জন্য উঠলেই যন্ত্র থেকে ওজন লেখা কাগজ বেরিয়ে আসত। শুধু ওজনই নয়, যে সব ব্যক্তির দেহে চর্বির ভাগ একটু বেশি, অথবা বড় রাস্তায় বেরোলে সবার আগে ভুঁড়িটা চলে, তাদের উদ্দেশ্যে ওই কম্পিউটার প্রিণ্টআউটে বাবা-মা তুলে গালাগালিও থাকত। মেলবোর্ণের গোয়েন্দাদের সন্দেহ—এই নিরীহ যন্ত্রটিকে গালি দেওয়ার মতো করে তৈরি করেছে কোনো ছ্যাঁচড়া। অনেকেই বলছেন, সকালে যাদের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়, তাদের জন্য এরকম গালাগালি করা ঘড়ির খুব দরকার।

—কৌশিক রায়

বন্ধ

অসীম কুমার রায়

ভোর থাকতেই ক্ষমতাদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন, যদিও কাল অনেক রাত অব্দি মিটিং করেছেন। অনেকদিন পরে তিনি বন্ধ ডেকেছেন। সবকিছু বন্ধ হল কিনা দেখার জন্যে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন।

ক্ষমতাদির অন্য একটা নাম আছে কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতায় আসার লড়াই চালাবার জন্যে, অন্যেরা তাঁর আড়ালে তাঁকে ঐ নামেই ডাকে। সেই কতদিন আগে ক্ষমতায় আসার জন্যে ঝগড়া করে দল ছেড়ে অন্য দল গড়েছিলেন। তারপর ঝগড়া করে মন্ত্রীত্ব ছেড়েছেন। তারপর থেকে ঝগড়ার ট্রাডিশন সমানে চালিয়ে গেছেন। গত নির্বাচনের সময়ে ক্ষমতা তাঁর প্রায় হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঝগড়া করে তাঁব নিজের দলকে দু-টুকরো করলেন। পুরনো দলের সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচনে হেরে গেলেন। তারপর আবার তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। হেরে যাবার পর তিনি ক'দিন হৈ চৈ করলেন এই বলে যে, এই নির্বাচন ঝুটা হ্যায়। ওরা অর্থাৎ শাসকদল ভোট চুরি করেছে।

যখন তাঁকে বলা হল যে তাঁদের দলও ভোটচুরি কম করেনি, তখন তিনি চুপ করে গেলেন। কিছুদিন চুপ করে থাকার পর তাঁর মনে হল যে লোকেরা তাঁকে ভুলে যাচ্ছে। সাংঘাতিক ব্যাপার। লোকচক্ষুর সামনে না থাকলে তিনি ক্ষমতায় আসবেন কী করে?

শাসকদল বন্ধ ডেকে ডেকে দু'যুগ ধরে ক্ষমতায় কায়েম হয়ে বসে আছে। ক্ষমতাদিও মাঝেমধ্যে দু-একটা বন্ধ ডেকেছেন। কিন্তু কিছুই সুবিধে করতে পারেননি। সেইজন্যে তিনি শাসকদলের ডাকা সব বন্ধের তুমুল প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন।

ছোট্ট একটা দল কাগজে তাদের নাম ছাপাবার জন্যে তুচ্ছ কাবণে বন্ধ ডেকেছে। ক্ষমতাদি লাফিয়ে উঠলেন শত্রুর অস্ত্র নিয়ে তাকেই ঠ্যাঙাবার জন্যে। ক্ষমতাদি বন্ধের সমর্থন করলেন। ছোট দলটা চুলোয় যাক। কাগজে তাঁর এবং তাঁর দলের নামই ছাপা হবে। শাসকদলের আর বন্ধ ডাকার দরকার নেই, কারণ আগামী কয়েক বছর তাঁদের আর কোনো ভাবনা নেই। পরের নির্বাচনের সময় দেখা যাবে।

শাসকদল যখন দেখলেন, তাঁদের ফেলে রাখা অস্ত্র দিয়েই ক্ষমতাদি লড়াই করবেন, তাঁরাও বন্ধকরতে দলকে মদত দিতে বললেন। তাঁরাও এও বললেন যে বন্ধ ডাকলে খেটে-খাওয়া দিনমজুরদের খাওয়া জুটবে না, যদিও তাঁদের ডাকা বন্ধেব সময় দিনমজুরদেব হাওয়া খেতে বলা হয়েছিল। খালি বড়লোকেরাই হাওয়া খেতে বেরোবেন. তা তো সম্ভব নয়। তাঁদের রাজত্বে সকলেই সমান।

ক্ষমতাদি বললেন যে বন্ধের সময় সবকিছু বন্ধ করে তাঁর ক্ষমতায় আসার পথ খুলে দিতে হবে। তারপর তিনি ক্ষমতায় আসলেই সবাই রাজভোগ খাবে। শাসকদল চটে গিয়ে ফতোয়া দিলেন যে, যে করেই হোক বন্ধ বন্ধ করতে হবে। তার জন্যে ক্ষমতাদিব দলের সঙ্গে যদি যুদ্ধ কবতে হয়, তো হোক। কয়েকটা বোমা যদি ফাটে তো ফাটুক। কয়েকটা দোকানপাট যদি লুঠ হয়, তো হোক। কয়েকটা নিরীহ লোক যদি মরে, তো মরুক।

এ রকম পবিস্থিতিতে ক্ষমতাদি রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু হাঁটলেই বড়রাস্তার মোড়। দোকানপাট সব বন্ধ। অবশ্য এত ভোরে কোনো দোকানই কেউ খোলে না। কেবল মোড়ের মাথায় পানবিড়ির একটা দোকান আর ফুটপাথের ওপর ঝুপড়ি দেওয়া, রাস্তার ওপরেই বেঞ্চি পাতা একটা চায়ের দোকান ভোরবেলাতেই খুলে যায়। সে দুটোও আজ বন্ধ। রাস্তায় কোনো লোক নেই। গাড়িও চলছে না। ক্ষমতাদির মনটা খুশিতে ভরে উঠল। জনসাধারণ তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে।

হঠাৎ তাঁর নাকের সামনে দিয়ে একটা সরকারি বাস ডিজেলের কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে

জনাদশেক লোকও বসে আছে। ক্ষমতাদির পা থেকে মাথা অবধি আগুন জ্বলে গেল। বাড়ি ফিরে ক্ষমতাদি দেখলেন তাঁর দুই অনুচর সবু আর সদু বসে আছে। থমথমে গলায় ক্ষমতাদি বললেন, "রূপা, চা করো।" রূপা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী, সবকিছুই দেখাশোনা করে।

তারপরেই ক্ষমতাদি ফেটে পড়লেন,—"সদু। বাস চলছে কেন?'

—সে তো সরকারি বাস দিদি। প্রাইভেট বাস আর ট্যাক্সি—সব তো বন্ধ করে দিয়েছি।

—সরকারি বাসই বা চলবে কেন?

—দিদি, ওরা তো বন্ধ ভাঙার চেষ্টা করবেই।

—তাহলে তোমারা আছ কী করতে? কয়েকটা বাস থামাবার মুরোদ নেই? তুমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

—কিন্তু দিদি—

—আমার মুখের ওপর কথা? এক্ষুনি যদি বেরিয়ে না যাও তাহলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

ম্লান মুখে সদুর প্রস্থান।

ক্ষমতাদি বললেন, সবু এক্ষুনি পাটুকে টেলিফোন করো। আবদুলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে যেন কয়েকটা সরকারি বাস অকেজো করে দেয়। তাহলেই সব থেমে যাবে।

—দিদি, আবদুল তো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের দল ছেড়ে আমাদের দলে আসার জন্যে পুলিশ আবদুলকে খুঁজছে।

অগ্নিকন্যা অগ্নিশর্মা হলেন,—আমাকে এসব কথা বলা হয়নি কেন? তোমরা কেউ কোনো কাজের নও। আমাকেই সবকিছু করতে হবে দেখছি। এক্ষুনি যত পারো লোক জোগাড় করো। আমরা রাস্তা বন্ধ করব।

ভাগ্যক্রমে টেলিফোনটা বন্ধ হয়নি। গোটা দশেক ফোন করার পরে পাড়ার কাছাকাছি থেকে জনা তিরিশেক লোক জোগাড় হল। যারা দূরে থাকে তাদের গাড়ি না পাঠালে আসতে পারবে না। গাড়ি পাঠিয়ে যদি আনতে হয়, তাহলে আর বন্ধ কোথায় হল?

সবু অবশ্য একবার বলেছিল যে তার এক ডাক্তার বন্ধুর রেডক্রশ লাগানো গাড়িটা ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ক্ষমতাদি বললেন বন্ধের দিনে ডাক্তারদের রোগী দেখাও বন্ধ করা দরকার। সেই জন্যে নীতিগত ভাবে ডাক্তারের গাড়ি ব্যবহার চলবে না।

ঘণ্টাখানেক বাদে জনা তিরিশেক লোক নিয়েই ক্ষমতাদি বড় রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। সরকারি বাস চলছে দেখে আর কোনো গণ্ডগোলের খবর না পেয়ে বেশ কিছু প্রাইভেট গাড়ি রাস্তায় চলছে। ফুটপাথেও কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে। ক্ষমতাদি হাতে পতাকা নিয়ে দাঁড়াতেই দু'পাশের গাড়ি সব থেমে গেল। তাদের পিছনে গোটা দুয়েক সরকারি বাসও দাঁড়িয়ে পড়ল।

পুলিশ নিশ্চয়ই ক্ষমতাদির গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল। তড়িৎ গতিতে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি এসে মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। একজন পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে এগিয়ে এলেন।

—ম্যাডাম, আপনারা রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠুন।

—কেন? রাস্তা দিয়ে যাব না কেন? রাস্তা সকলের জন্যেই।

—কিন্তু আপনারা তো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন না। আপনারা রাস্তা অবরোধ করছেন। আইনত এটা অপরাধ।

—কী? আমাকে আইন দেখাচ্ছেন? জানেন আমি কে? এক্ষুনি আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিন।

পুলিশ অফিসার নড়লেন না।

—ম্যাডাম আমাদের ওপর হুকুম আছে রাস্তায় গাড়ি চলাচল করার জন্যে রাস্তা খালি রাখতে হবে।

—আমাকে হুকুম দিচ্ছেন? এতবড় সাহস? এক থাপ্পড়ে দাঁত ভেঙে দেব।

ইন্সপেক্টরের মুখ লাল হয়ে গেল। পুলিশের ডিসি দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এবার এগিয়ে এলেন।

—ম্যাডাম, আপনারা যদি রাস্তা ছেড়ে না যান তাহলে আমরা আপনাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

ক্ষমতাদি চট্ করে বিষয়টা ভেবে নিলেন। মাত্র তিরিশজন লোক দিয়ে বিপ্লব করা যায় না। তার ওপর তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন জানতে পারলে আর কারো কোনো ভয় থাকবে না। বন্ধের বারোটা বেজে যাবে। তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ডিসির দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমরা এখন যাচ্ছি। কিন্তু আবার ফিরে আসব। দেশে আগুন জ্বালিয়ে দেব। দেখি আপনারা কী করেন। ওদের পা চাটা বার করে দেব।

বিধ্বস্ত ক্ষমতাদি বাড়ি এসে হাঁক দিলেন,—রূপা, এদের সকলের খাবার ব্যবস্থা করো।

রূপা একটু বাদে বেরিয়ে এসে বলল, খাবার-দাবার কিছু নেই, আর কাল এতবার চা হয়েছে যে রান্নার গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। আজ রান্নাঘর বন্ধ।

পরের দিন কাগজে দু'রকম বিবৃতি বেরলো। শাসকদলের মতে গতকাল মোটেই বন্ধ হয়নি, সবই ঠিকঠাক চলেছে। আর ক্ষমতাদি বিবৃতি দিয়েছেন যে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবকিছু বন্ধ করে বন্ধকে শতকরা একশোভাগ সফল করেছেন।

উজবুক

উদ্বোধনের দিন বইমেলার মাথায় বাস্তবিকই আকাশ ভেঙে পড়েছিল। রাত তখন সাড়ে আটটা। স্টলগুলিতে, বিশেষ করে ধারের স্টলগুলিতে বইপত্তরের ওপর জল পড়ছে দেখে বাবুদের মাথা যতই গরম হয়ে উঠছে, ততই মাথার ওপরে জলের বেগ বেড়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রাকৃতিক চিকিৎসা চলছে, যাকে বলে ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট, একেবারে নিখরচায়।

কিন্তু বাঙালির মাথা এত সহজে ঠাণ্ডা হয় না। দল বেঁধে সব দৌড়লেন গিল্ড-এর মেলা-অফিসে। মেঠো সম্পাদক, যাকে সোজা বাংলায় বলে গ্রাউণ্ড সেক্রেটারি, ফোনে ডেকরেটারের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাসের বন্যা বইয়ে দিলেন—আপনারা যে যার স্টলে চলে যান, উনি এক্ষুনি যাচ্ছেন।

বাঙালির আশ্বাসে বিশ্বাস রাখে এমন বাঙালি নেই। আশ্বাসটুকু বুকে বেঁধে যে যার বাড়ির পথ ধরলেন। একজনমাত্র উজবুককে দেখা গেল বুক বেঁধে সুনসান মাঠে অন্ধকার স্টলে বসে আছেন। পত্রপাঠ-এর সম্পাদক। তাঁর বাঙালিত্ব, এমনকি বাঙালত্ব নিয়েও আমরা সন্দিহান।

—মৈনাক মিত্র

দেখাশোনা

কুশিকনন্দন রায়বাহাদুর

বিবাহ। অর্থাৎ কিনা বিশেষরূপে বহন। বাক্স-প্যাঁটরা সব্জির ঝুড়ির মতো পেটমোটা ভি. আই. পি-কে নয়, স্বয়ং স্ত্রী-কে। তিনি তখন ভি. আই পি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। তিনি তখন অর্ধাঙ্গিনী থেকে পূর্ণাঙ্গিনীতে পরিণত। মাসমাইনে, সাধ-আহ্লাদের সবকিছুই তখন তাঁর চাবির আঁচলে। বাসে চড়লেই আড়াই টাকার বদলে পাঁচ টাকা গচ্চা। পুজোর সময় তেনার জন্য আনকোরা চোখ কপালে তোলা দামের 'ডাইনামাইট' শাড়ি। কর্তার আধপোড়া কপালে সর্বসাকুল্যে একটা গেঞ্জি, একটা জাঙ্গিয়া। ভাগ্যদেবী সদয়া হলে একটা ষাট টাকা দামের ফতুয়া। সাতপাক ঘোরার সময় থেকেই মাথা ঘোরার শুরু। তারপর রান্নার গ্যাসের বিল, রেশন, টেলিফোনের বিল, ইলেকট্রিক বিল, ছেলের পেট খারাপের দাওয়াই, ইস্কুলে বইয়ের ফর্দ, অ্যাডমিশন ফি, গায়ে-পড়া শ্যালিকাদের জন্য ম্যাটিনি শো-এর টিকিট কিনতে গিয়ে সেই মাথাধরা মগজের চিরস্থায়ী ব্যামোতে পরিণত। প্রায়ই ননদ, শাশুড়ি আর পুত্রবধূর মধ্যে ঝগড়া আর খামচাখামচির ত্রিদেশীয় ক্রিকেট ম্যাচ দেখে বলতে ইচ্ছে করবে—'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে।' চল্লিশ পেরোলেই চোখে ছানি, ব্লাডসুগার, দুশো বাই তিনশো ব্লাড প্রেসার, কোমরে বাত। তন্বী গৃহিনী তখন তাকিয়াতে পরিণত। 'ওগো', 'হ্যাঁগো' ছেড়ে তখন কর্তা 'বুড়ো ভাম', 'ঘাটের মড়া' বা 'মিনসে' জাতীয় বিবিধ সম্মানে ভূষিত।

'ওসব কথা ছাড় তো। বাড়িতে ছেলের বৌ আনতে কোন বাপ না চায়?' হাঁটুর বাতের ব্যাথায় কোঁকাতে কোঁকাতে বাবা বললেন আমাকে।

'রাখো তো। বিয়ের পর প্রথম তিন চার মাস ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানবে না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি যেন [illegible], কত্তো ভালো। দশরথ-কৌশল্যারও তিন কাঠি ওপর। তারপরই দেখবে তাণ্ডব নৃত্য কাকে বলে। তোমাকে আর মাকে তখন পুঁটলি পাকিয়ে পোস্টাপিসের স্ট্যাম্প মেরে সো—জা বৃদ্ধাশ্রমে চালান করে দেবে।' সাফ জবাব আমার।

করি সামান্য সাংবাদিকের চাকরি। এতেই লোকে বলে আমাদের নাকি সংসারী হওয়া অসম্ভব। রাত দুটোর সময় ক্রিং-ক্রিং—টালা পার্কের ত্রাস নিমকি মস্তান পটল তুলেছে। বৌ ফেলে তখন ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ছোটো। তিনদিনেই সোনার সংসার টিনের হয়ে যাবে। তখন আবার কপালে ডিভোর্স, আদালতের চর্কিপাক।

এবার ধেয়ে এলেন আমার জননী—'তোর বাবার হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে হাড় মাস একেবারে কালি হয়ে গেল। আর তোকে খাওয়াতে হবে কেন? তেরো বছর বয়সে গান্ধীজি বিয়ে করেছিলেন। রবিঠাকুর বিয়ে করেছিলেন বাইশ বছর বয়সে। বলি এঁরা কি তখন সব চাকরি করতেন? সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।'

মায়ের মুখে এই পরম রমণীয় বাক্য শুনে বলতে ইচ্ছা করছিল, 'সুখের আগে একটা 'অ' উপসর্গ বসিয়ে দাও মা জননী। বৌমা যখন সংসারে চরণ ফেলবে, তখন বর্ণমালার সব স্বরবর্ণ আর ব্যাঞ্জনবর্ণ ভুলে বসে থাকবে।

'সামনের রবিবার তুই মেয়ে দেখতে যাবি। ওরা তোর ফটো দেখেছে। পছন্দও হয়েছে মনে হয়। মেয়ে লোকসঙ্গীতে এম এ করেছে। মা-বাবা দু'জনেই প্রফেসর। মধ্যগ্রামে ওদের ফ্ল্যাটবাড়ি।'

শুনে আমার ফ্ল্যাট হবার অবস্থা। লোকসঙ্গীতে এম এ, মানে 'মা' হতে চলেছেন। কী ধরনের লোকসঙ্গীত রে বাবা। ইহলোক না পরলোক? ঢোঁক গিলে শুধোলাম, 'মেয়ের নাম কি?'

'সুতনুকা দলপতি।'

ওরে বাবা। দলপতি। কোন দল? বামফ্রন্ট, বিজেপি না তৃণমূল কংগ্রেস? তাহলে তো 'দলনেত্রী' হবে। মেয়েটার বাবা-মা কি গ্রামার-ব্যাকরণ জানে না? হতেও পারে, হয়ত আদর্শ 'দম্পতি' হতে গেলে 'দলপতি' পদবী হওয়া দরকার। তা না হলে সংসার নামক আলুরদমের স্বরূপ বুঝতে পারা যাবে না। এই সম্বন্ধ দেখতে যাওয়াটাই আমার কাছে কেমন গোলমেলে ঠেকে। বাজার করতে গিয়ে দশজন দোকানির কাছে গিয়ে কার টম্যাটো, কার ঢ্যাঁড়শ ভালো সেটা যাচাই করে কেনার মতো।

মধ্যমগ্রাম রেলস্টেশনে নেমে অভিভাবকরূপী বড় মেশোমশাইকে ব্যাপারটা বলতেই তিনি হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন। বাবা অবশ্য তিরিশের বর্ডার লাইনে চলে আসা এই অকাল কুষ্মাণ্ডের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপনী প্রচার চালিয়েছিলেন। সেই প্রচারের দৌলতে (নয়ত দুর্ভাগ্যে) রাজ্যের যাবতীয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছ থেকে এক হাত বাঁকা, কানে কম শোনা, বিয়ের তিন রাত্তিরের মধ্যে ডিভোর্সী সচ্চরিত্রা, উঃ মাঃ ফেল, তির্যক চক্ষু (মানে টেরা আর কি।) মেয়েদেরকে সংসার-নদী পার করানোর আর্জি জানিয়ে শতাধিক চিঠির একটা প্যাকেট এসেছে।

শেষ পর্যন্ত শ্রীমানকে গিয়ে গোঁত্তা মারতে হবে দলপতিদের ডেরায়। কারণও আছে। ওনাদের খুড়তুতো কোন পিসেমশাই নাকি আমার বাবার মেজ শালার ভাই-বৌয়ের বড় ভাসুর হতেন। লতায়-পাতায় জড়িয়ে থাকা

এরকম নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধনীর ফার্স্ট ব্রাকেট না,এসে থাকতে পারে?

"আসুন, আসুন অরুণদা, কী সৌভাগ্য আমাদের।"

স্টেশন ছাড়িয়ে পা বাড়াতেই বারমুডা আর টি-শার্ট পরা এক দড়িপাকানো ছোকরা এসে আমার হাত ধরল। মেসোমশইয়ের কোঁচাটা প্রায় খুলে অন্তর্বাস বেরিয়ে পড়েছিল। বনগাঁ লাইনের ট্রেনে রবিবারেও ভিড়ভাট্টা থাকে তো। সেটা সামলাতে সামলাতে তিনি বললেন,—'বাবা অরুণ, এ হচ্ছে দেবব্রত, ওরফে দেবু। সুতনুকার ছোট ভাই। কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।'

মানে আমার সম্বন্ধে হবু শ্যালক। চেহারাটা দেখে তো মালুম হচ্ছে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড, গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর অ্যাকোয়া রিজিয়ার সলিউশনে নিজেকে কয়েকবার চুবিয়ে ছেড়েছে।

'পথভোলা আবাসনে'র পাশেই আমার 'উড-বি' বৌয়ের ফ্ল্যাটবাড়ি। নেমপ্লেটে চোখ পড়তেই চমকে গেলাম। শ্বেত পাথরের প্লেটে লেখা আছে— 'প্লাস-মাইনাস'। দেব্রবতের দিকে তাকাতে সে মুলোর মতো দাঁত বের করে বলল, "আসলে বাবা-মা খুব ঠাকুর দেবতা মেনে চলেন কিনা। আমাদের কুলগুরু একশো আঠারো শ্রীএঁটুলিনন্দ বলেছেন, এ জগতে নিয়মিত যোগ আর বিয়োগের খেলা চলছে, তাই বাড়ির এই নাম। যা হোক, এই যোগ বিয়োগের ঘরে পা দিতেই কান ফাটানো চিৎকার—'চাই না, চাই না, আমি আর দেখতে চাই না আমার অন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।'

সেরেছে। আমার শ্রীমুখ দেখে কারো আবার ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল নাকি।

আশ্বস্ত হলাম সম্ভাব্য শাশুড়ির কথায়—"ও হো। তুমিই বুঝি অরুণ। এসো বাবা এসো। টিভিতে উত্তম-সুচিত্রার 'সাগরিকা'-র শেষ দৃশ্যটা হচ্ছে তো। আওয়াজটা একটু জোরে হয়ে গেছে।'

এখনই শেষ সিন। আমার নিজের ওপেনিং সিন কী হবে কে জানে? সোফায় নিজেকে সেঁধিয়ে দিযে ভিড় বাসে ধরাপড়া গাঁটকাটার মতো একবার চারিদিকে তাকালাম। বেশ মালদার পার্টি মালুম হচ্ছে। ঢাউস কালার টিভি ছাড়াও দামি মেহগিনি কাঠের আসবাব। গোমড়ামুখো মিক্সার গ্রাইন্ডার আর ওয়াশিং মেসিন, স্টিরিও ডেক, কলেজ মুখো মেয়েদের মতো দুলকি চালে দুলতে থাকা জানালার দামি পর্দা, আর টেবিল ক্লথ, দেওয়াল ঘড়ি, চায়ের কাপ, আলমারির মিনেকরা কাচ—সর্বত্রই লোকনাথবাবা, শিব-দুর্গা থেকে শুরু করে চৌদ্দগুষ্টি দেবদেবী আর মহাপুরুষের ছবি। বাথরুমের দিকে চোখ গেল, সেখানেও কমোডের ফ্লাসটাবে শিব-দুর্গার সহাস্য যুগলমূর্তি।

বলিহারি। একেই বলে ঈশ্বরের সর্বত্র অবস্থান। কোথায় তিনি নেই? বাথরুমের মধ্যেও তিনি বিরাজ করছেন ভক্তের আশ্রিত হয়ে।

'সুতানুকাব বাবাকে তো দেখছি না। তিনি আসেননি বুঝি মহামায়াদি?'

বাবার প্রশ্ন আমার শাশুড়ি হতে চাওয়া ভদ্রমহিলার দিকে। চুলে কলপ করা মহামায়া দেবী তাঁর নাকের নোলক নাড়িয়ে মায়াময়ী গলায় বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কি জানো তো ভাই, ওর বাবা হচ্ছে গ্রন্থকীট। তারওপর সমাজসেবক । হলদিযাব বাড়ির লাইব্রেরি ছেড়ে একদম বেরোন না। প্রফেসরি থেকে রিটায়ার করার পর উনি এখন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া আর বীরভূমের গ্রামে ব্যবহার করা নানা ধরনের ঝাঁটা আর চপ্পলের ওপর গবেষণা করছেন। এই তো কয়েকদিন আগে আমেরিকার মিশিগান ইউনিভারসিটি থেকে ডাক এসেছিল পেপার পড়ার জন্য। তারওপর আজ আবার হলদিয়াতে আকাশ-পাতাল কিশোর সঙ্ঘের রক্তদান শিবির হচ্ছে। উনি হলেন গিয়ে সভাপতি।'

ফ্রিজের মর্গে দিন চারেকের জমানো হিমশীতল রসগোল্লা আর দড়কচা প্যাটিস খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম ভদ্রলোক কী ধরনের গ্রন্থকীট—উইচিংড়ি না উইপোকা। তিনি যদি কীট হন তাহলে তাঁর কাছে আমি তো কীটস্য কীট। টিভিতে তখন উত্তম-সুচিত্রার প্যানপ্যামানি শেষ হয়ে ভারত-শ্রীলঙ্কার টেস্ট ক্রিকেটম্যাচ হচ্ছে। বল হাতে মুরলীধরনের মহিষাসুরের দৃষ্টি তখন আমাকেই গিলে খাচ্ছে। তার ওপর আমার বাবার মহামাযাদির পরীক্ষকের চাহনি যেন দেখে নিচ্ছে, অরুণ নাম এই খোরাপাঁঠাটির গলায় দড়ি বাঁধা যাবে, না এটা গোঁয়ার-গোবিন্দ খচ্চর টাইপের হবে।

'অরুণের সম্পর্কে সবকিছুই তো শুনেছেন মহামায়াদি, নতুন করে কি আর বলব। এখন সংবাদ তখনই সেকাল-এর চিফ রিপোর্টার পোস্টে আছে।'

যেই এই কথা বলা, ওমনি, পাশে ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকা দেবব্রত ফিরিস্তি দিতে শুরু করল—'হ্যাঁ মোসোমশাই। মিডিয়ার সঙ্গে আমাদের হে—ভি রিলেশন। আমার বড় জামাইবাবু পান্তাভাতবাংলা চ্যানেলের সংবাদ অধিকর্তা, ছোটকাকু বিবিসির করেসপণ্ডেন্ট। ফড়দি আর মেজদির লেখা কতবার যে 'দ্য হিন্দু' আর 'ইন্ডিযান এক্সপ্রেসে' বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।'

সত্যই ইয়ত্তা নেই। গণমাধ্যমের ঝাণ্ডাধারী এতগুলো মাধ্যমের মধ্যে পড়ে আমার অবস্থা উত্তম কি অধম হবে, সেটা বুঝতে পারলাম না।

'তুমি তো তোমার ছেলের প্রশংসাই করে গেলে। আমি তো আমার ছোট মেয়ে সুতনুকার মানে টুনির কোনো প্রশংসাই করিনি।' এই বলে ১৫০০ মিটার দৌড়ের আগে এ্যাথলেটিকরা যেরকম লম্বা একটা দম নেয়, সেভাবে দম নিলেন মহামায়া দলপতি—'আমার মেয়ে এই বয়সে লোকসঙ্গীতের বিশ্বকোষ। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ঝুমুর—সব ধরনের লোকসঙ্গীতই ওর দুই ঠোঁটের মধ্যে। যখন যেটা গাইতে বলবে সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে হুড়হুড়িয়ে বেরিয়ে আসবে। তার ওপর মন একেবারে দযায় ভরা। কখন কার ওষুধ লাগবে, গ্যাস সিলিণ্ডার লাগবে, জুতো সারাতে লাগবে, কার ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে, মরার সময় কার মুখে শেষ জল দিতে হবে, শিল্পীর বদলে উদ্বোধনী সঙ্গীতে গান গাইতে হবে—সবখানেতেই টুনি-মা আমার উপস্থিত। ওকে বাদ দিযে কোনোকিছুই সম্ভব নয়। সুতনুকা একবার এদিকে এসো তো মা। এঁরা তোমাকে একটু দেখতে এসেছেন।'

মনে মনে এই সর্বভূতে সুতনুকার স্বরূপ কেমন জরিপ করছি। এই সময়ে কনেদেখা নাটকের দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন হল। সুতানুকা দেবী সশরীরে উপস্থিত হলেন।

বাপ রে, 'সুতনুকা' বটে। ওই প্রায় এক কুইন্টাল বপুর দৌলতে তিনি মাইকে না চেঁচিয়েই যে-কোনো দলের অবিসংবাদিত দলনেত্রী হতে পারেন। যা হোক, সেই সু-তনুকা এসে সোফাতে উপবেশন করলেন। মৃদু ভূমিকম্পের একটা অনুভূতি পেলাম। চোখ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। ভাবখানা—কী হে মদন। আবার বিয়ের পিড়িতে বসার শখ হল কেন? সামলাতে পারবে তো?

'ওনাদেরকে একটা নজরুলগীতি আর একটা লোকগীতি শুনিয়ে দাও তো মা। তুমি তো খালি গলাতেই দারুণ গাও।' বাবার মহামায়াদি বললেন মেয়েকে।

খালি গলা, তার মানে অ-মাইক। 'সংসার' নামক ইডেনের স্টেডিয়ামে ঢুকে গলা আবাব কোন স্কেলে বাজবে কে জানে, ফ্ল্যাট না সি-মেজর।

'কোন নজরুলগীতিটা গাইব মা? আমার তো স্বরলিপির সব গানই ঠোঁটস্থ।'

আমি আর মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারলাম না। বলেই ফেললাম, 'আজ্ঞে একটা কাজ কবলে হয় না মাসিমা? আজকাল তো খিচুড়ি বা রিমিক্স গানের খুব চল হয়েছে। উনি আমাদেরকে সবকটা নজরুলগীতি থেকে এক কলি করে নিয়ে একটা গান শুনিয়ে দিন না। তাহলে এক চান্সে অনেকগুলো

গান শুনতে পাওয়া যাবে।'

সুতনুকার মুখ তেলা হাঁড়ির মতো গোমড়া হয়ে গেল। বাবা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন, 'ছাগল কোথাকার।' অবস্থা একটু জণ্ডিসের দিকে যাচ্ছে দেখে দেবব্রত বলে, 'ঠিক আছে ঠিক আছে। না হয় পরেই গান শোনাবে। আপনি বরং ওঘরে গিয়ে ছোড়দির সঙ্গে কথা বলে নিন।'

আমি একটু দোনামনা করছি দেখে সুতনুকা মানে টুনির মা হাসির মেকআপ মাখা মুখে বললেন, 'যাও না ও ঘরে। তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, অত লজ্জা কি? সামনাসামনি কথাবার্তা হওয়াই ভালো। মা টুনি, তোমার কোনো আপত্তি আছে?'

'না না আমার কিছু বলার নেই।' কলাগাছের মতো পা দু'খানা কত্থকে ছন্দে নাচাতে নাচাতে বলল সুতনুকা। আর আমার মনে পড়ল ক্লাশ এইটে অ্যানুয়ালে মৌখিক পরীক্ষায় কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দিতে না পারায় দু'হাতে দুটো থান ইঁট নিয়ে আধঘন্টা দাঁড়াতে হয়েছিল। এই মেয়েটা আবার সেরকম মাথা ঘোরানো প্রশ্ন করবে না তো?

কে যেন বলেছিল বিয়ের ফাইনালের আগে এই কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে হবু ইয়ের সাথে কি ভাবে কথা বলতে হয়, তার জন্য বেশ ক'টা বই আছে। তাড়াহুড়োর মাথায় সেগুলোও আমার পড়া হয়নি। তবুও আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় প্রথম কথা বললাম—

'ইয়ে মানে কি বলে যেন, আপনি তো জানেন আমি কি করি। আমাদের পেশা কি ভালো লাগে আপনার?'

উত্তরে বেশ কয়েকটা শব্দের মার্বেলগুলি এসে আমাকে আঘাত করল —'একটু আধটু শুনেছি। আপনাদের কাজটা খুব রিস্কি। যখন তখন যেখানে সেখানে দৌড়তে হয়।'

তা তো হবেই সোনামনি। ঝুঁকি না থাকলে লাভ হয়? তোমার মতো নো রিস্ক নো গেইন হয়ে বি-এড এর নোট্স মুখস্থ করে আর হাতে তানপুরা নিয়ে সঙ্গীত সাগরে সাঁতরালে কোন শালা আমাকে সন্দেশ খাইয়ে যাবে?

'বিবাহিত জীবন কেমন লাগে আপনার?' প্রশ্নটা করতেই হল।

'এখনই ভালো লাগে কিনা বলতে পারছি না। ইচ্ছেও নেই খুবএকটা।' এই বলে যেন খুব কৃতার্থ করে দিয়েছেন এইরকম ভাব নিয়ে আমার দিকে চেয়ে চোখ নাচাল সুতনুকা—'এম এ-তে ফার্স্টক্লাস পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। তাছাড়া আমার একটা চাকরিও দরকার। আজকাল মেয়েদের সাবলম্বী হওয়াটাই উচিত।'

হয়ে গেল। বাবার ইচ্ছামতো 'সুগৃহিনী, গৃহকর্ম নিপুণা' পাত্রীর তালিকা থেকে এনাকে আপাতত ছাঁটাই করতে হচ্ছে। ইংরাজি-অঙ্ক-ইতিহাসের এত এম-এ বি-এড আজকাল যখন চাকরি না পাওয়ার মরুভূমিতে জিভ বের করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিনি তখন গানের গুঁতোর দৌলতে কোন মরূদ্যান তৈরি করে স্ব-অবলম্বিনী হবেন? তিনি কি চার ঠ্যাঙে দাঁড়াবেন? জানতে খুব ইচ্ছা করল। কিন্তু মুখটা এমনিতেই বাংলার পাঁচের মতো ব্যাজার। তবুও শেষ প্রশ্ন—

'ধর্ম মানেন বুঝি?'

'বোকা বোকা প্রশ্ন। যেটুকু ধর্ম মানার সেটুকু তো মানতেই হবে।'

চালাক মেয়ের এই চলকে দেওয়া উত্তরের পর শুকনো গলা দিয়ে আর কথা বের হল না।

এইভাবে তো মৌখিক পরীক্ষার ট্রায়াল শেষ হল। বাইরে বের হবার সময় বাবার মহামায়াদি বাবাকে দাঁত বের করে বললেন, 'ছেলে খুব ভালো তোমার, আমি ক'দিন পরে তোমাকে ফোন করে জানাব।' তখনই বুঝতে পারলাম বিয়ের এই ব্যাঙলাফানি মহড়ায় আমি ইতিমধ্যেই ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে গিয়েছি। প্রাইভেট টিউটরকে যখন কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার ইচ্ছা হয়, তখন স্টুডেন্টের বাপ-মা ঠিক এইভাবেই বলেন—ক'দিন পড়ানো বন্ধ থাক। পরে তোমাকে জানাব। সেই 'পরে'-র অপেক্ষা করতে করতে তখন চোখে ছানি পড়ে যায়। এদিকে অভিভাবক মেসোমশাই আমাকে আড়ালে খোঁচা মারতে লাগেলন,—'বাবা অরুণ, গায়ের রঙটা কেমন দেখলে?'

বলতে ইচ্ছা করছিল—কোন রঙ? চারদিকেই তো হলুদ সর্ষেফুল দেখেছিলাম। তবুও বলতে হল, 'না, মায়ের থেকে একটু কালো।'

'অ। তার মানে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ডার্ক কমপ্লেক্সন। তা মেয়ের বয়েসটা কত আন্দাজ করলে?'

মেয়েদের আবার বয়সের গাছ-পাথর আছে নাকি? ওই ছাঁচি কুমড়োর মতো মুখে রুজ-পাউডারের প্লাস্টার লাগিয়ে রেখেছিল। বললাম, 'কত আর, এই পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে।'

'তার মানে মেয়েটা বয়েসের একটা সীমানায় চলে এসেছে। যাকে বলে মেয়েদের পক্ষে বিয়ের এজ কবে ছুঁয়ে ফেলেছে। সুতরাং ওনাদের এই বিয়েতে মত না হয়ে যায় না।'

বয়সের সীমানা কি? ওই 'সু'মতীর দৈহিক প্রস্থ তো সমস্ত জানাশোনার ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারে। 'বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়/ কোথায় কারার দ্বার।'

বলা বাহুল্য, এরপর মাসখানেক আমাদের টেলিফোন যন্ত্রটি নিথর হয়েই থেকেছে। মানে মধ্যমগ্রাম পার্টির কাছ থেকে কোনো দুরভায় বার্তা আমাদের কাছে আসেনি। বাবা এখন রীতিমতো ফুটপাথের হকারের মতো যাকে দেখছেন তাকেই গলবস্ত্র হয়ে বলছেন, 'ভালো দেখে একটা মেয়ে দেখ।' এদের মধ্যে আমার স্কুলের লাইফ সায়েন্সের টিচার, বাবাকে অফিসে নিয়ে যাওয়া রিক্সাওয়ালা, দুধওয়ালা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রিও আছে। শুনতে পেলাম, বাবা নাকি ক'দিন আগে হাবড়া স্টেশনে টিকিট চেকারকেও বলে রেখেছেন আমার জন্য একটা মেয়ে দেখতে। ভয় হয়, বাড়িতে যারা ভিক্ষে করতে আসে বা চটের বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োতে আসে তাদেরকেও না বাবা আবার আমার পাত্রী দেখতে বলে।

'লাড্ডু দেখছস, লাড্ডু?' আমার বাল্যবন্ধু মনোজ কনুইয়ের গুঁতো মেরে জিজ্ঞেস করল।

সেরেছে। মনোজের তো 'নিতাই জেরক্স সেন্টার' আছে। আবার হলদিরামের লাড্ডুর ব্যবসা শুরু করল নাকি।

'আরে হাঁদারাম, বিয়া হইলে গিয়া হালার লাড্ডুর মতন। খাইছস কি, দম আটকাইয়া মরছস। না খাইছস কি চণ্ডীদাসের খুড়ার মত জিহ্বা বাইর কইর‍্যা দৌড়াইবি।' মাথায় একটা চাঁটি মেরে বলল মনোজ। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আম্মো কিন্তু হেইবার একডা জব্বর সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলাইছি। যেইভারে কয়, একেরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। ক্রস কান্ট্রি কানেকশন। মিদ্‌নাপুইরা বৌ, ফরিদপুরের জামাই। এই দ্যাখ তার ছবিডা। আলাপ হওনের পর কদিন ধইর‍্যা না-না করতে আছিল। এক কলেজেই পড়ি কিনা। অহন ফিট্ হইয়া আসতাছে। ইস্টবেঙ্গল আর ওয়েস্টবেঙ্গল মিইল্যা মিইশ্যা এক হইয়া যাইব। ঘটি-বাঙ্গাল ঐক্য জিন্দাবাদ।'

ছবি দেখে মনে হল কলকাতা পুরসভার খোঁড়া গর্ততে আমাকে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিচ্ছে। এ যে মূর্তিমতী তিনি। অর্থাৎ আমার ইয়ে হতে যাওয়া সুতনুকা দলপতি। প্রেম-প্রজাপতির খাঁচায় ইনি যে এরকম বর্ণচোরা আমের মতো প্যাবালাল ইনিংস খেলছেন মনোজের সঙ্গে, কে জানত?

ঢোক গিলে শুধোলাম—'কতদিন লাইন মারছিস?'

'আরে পিরিত করলে অত ঘন্টা-দিনের হিসাব রাখে কে? তয় আন্দাজ— বছরখানেক তো হইবই।'

সণ্টুর কীর্তি

কাজী সারিন আফরোজ

কি বন্ধুরা, এবার শীতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে? খুব আনন্দ করেছ নিশ্চয়। আমরাও কিন্তু বাদ পড়িনি। স্কুল থেকে আমরাও গিয়েছিলাম তারকেশ্বরের কাছে এক নিরিবিলি গ্রামে। দারুণ পিকনিক স্পট।

সেখানেও খ্যাতিমান (?) সণ্টু তার কিছু অবদান রেখেছিল। যেহেতু স্কুলে সণ্টুর বেশ নামযশ আছে, (সেটা তো তোমাদের সবার বেশ জানাই আছে) সেহেতু তার বন্ধুরা আমাদের সাথী হয়েছিল।

সেখানে গিয়ে আমরা উঠলাম ছোট্ট একটা গেস্ট হাউসে। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম বেশ সকালেই। স্নান সেরে কিছু হাল্কা টিফিন করছি, কিন্তু সণ্টু ও তার সঙ্গীদের পাত্তা নেই। সাতসকালে পাঁচ পাঁচটা ছেলে একেবারে গায়েব! স্যার ভীষণ রেগে গিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে বললেন— "কোথায় গেল শয়তানগুলো? আমাকে বেড়াতে এসেও জ্বালিয়ে মারল।"

আমাদের মধ্যে একজন ভয়ে ভয়ে বলে উঠল সণ্টু ও তার বন্ধুদের অনেকক্ষণ আগে গামছা নিয়ে বেরোতে দেখেছে। কিন্তু তারপর সে আর কিছু জানে না। স্যার রাগে পা ঠুকে বললেন, "আসুক শয়তানরা, তারপর দেখছি।"

খাওয়ার পাট শেষ করে বসে আছি, দেখি সণ্টুরা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে হাজির। সণ্টু কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, "প্লিজ, একটা গামছা দিবি?"

আমরা ওদের এই অবস্থা দেখে বলে উঠলাম, "কী হয়েছে রে তোদের?"

সণ্টু ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আগে গিয়ে গামছা আন তারপর বলছি।"

তারপর আমরা গিয়ে বসলাম সামনের সবুজ মাঠে। সেখানে বেশ রোদ পড়েছে। মাঠের একদিকে আমাদের স্কুলের অজিতকাকু (দারোয়ান) পিকনিকের আয়োজনে ব্যস্ত। অন্যদিকে সণ্টু তার কীর্তিকলাপ বলা শুরু করল।

সণ্টুর বলার আগেই ক্লাশের ফার্স্ট বয় সব্যসাচী চোখ গোল করে বলল, "সণ্টু, তোর ড্রেস কোথায় রে? গামছা পরেই যে বসে আছিস?"

সণ্টু সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত বোধ করে বলল, "তোরা আমায় ঘিরে থাক। স্যার যেন না দেখতে পায়।" তারপর করুণ স্বরে বলল, "জানিস কি হয়েছে, আমরা এখানে এসেই প্ল্যান করলাম পুকুরে স্নান করব। তাই গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একটা সুন্দর, ঘেরা পুকুর দেখে, পাড়ে জামাকাপড় রেখে পুকুরে ঝাঁপ দিচ্ছি। খুব সাঁতার কাটছি, পাড়ে উঠে লাফ দিচ্ছি। এমন সময় দেখি কয়েকজন ষণ্ডা মার্কা লোক আমাদের জামাকাপড় তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। আমি রেগে গিয়ে বললাম, "ও দাদা, জামা নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? ওগুলো যে আমাদের জামা। দিয়ে যান।" লোকগুলো কি বলল জানিস, "হ্যাঁ দেব, তার সঙ্গে আরো একটা জিনিস দেব, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।" আমরা সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু কী করেছি বুঝতে না পারায় বললাম, "আমরা কী করেছি?" লোকগুলো বলল, "কী করোনি তোমরা? জানো না এটা মেয়েদের পুকুর? আর তোমরা এত ধেড়ে ছেলেরা এখানে চান করছ। জানো তোমাদের জন্য ওরা (মেয়েরা) বেরোতে পারছে না।" আমি অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, "মেয়েদের পুকুর বলে তো কোথাও লেখা নেই।" তখন তারা চোখ পাকিয়ে বলল, "এটা কি শহরের টয়লেট যে লেডিস্ জেন্টস লেখা থাকবে?" আমি বললাম, "ভুল হয়ে গেছে দাদা, ক্ষমা করে দিন।" কিন্তু তারা কিছুতেই শুনল না। এদিকে আমরাও জল ছেড়ে উঠতে পারছি না, মারের ভয়ে। ওদিকে কিংশুক ওপার দিয়ে পালাবার তাল করছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক ওপারে গিয়ে বলল, "এসো, দিচ্ছি।" কিংশুক বলল, "না না আমি পালাচ্ছি না, আমি তো জলের পোকা, তাই জলে ভাসছি।"

কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন আর পারছিলাম না তখন আমি শিষ্যদের (বন্ধুদের) বললাম, "যা হয় হবে, চল উঠে যাই।" জানিস, উঠে তাদের কিছু বলার আগেই, একটা লোক আমাকে এক লাঠির ঘা মারল। আমি তো লাফাতে লাফাতে ছুটছি। লোকগুলোও আমার পিছনে দৌড়চ্ছে। কিন্তু তারা কি আমার সঙ্গে পারে? এদিকে শিষ্যরা অন্যদিক দিয়ে ছুটল।"

সণ্টু তারপর আমাদেরকে তার লাল টকটকে পা-টা দেখাল। হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো হাত নেড়ে বলল, 'ইস মারকা বাদলা হামনে লুঙ্গি।" (তার নিজের ভাষা)। পরক্ষণেই চুপসে গিয়ে বলল, "এই, তোরা স্যারকে গিয়ে বল না, আমাদের যে সব জামা-কাপড় নিয়ে নিয়েছে।"

আমরা দল বেঁধে স্যারকে গিয়ে বললাম সব। স্যার শুনে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "হুম।" তারপর আমাদের দু-চারজনকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেন। আমিও স্যারের সঙ্গী হলাম। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি চার-পাঁচজন লোক স্কুলড্রেস নিয়ে আমাদের দিকেই আসছে। স্যার সামনে গিয়ে বললেন, "নমস্কার, আমি এদের স্কুলের মাস্টার মশাই।" ওরা বলল, "হ্যাঁ, বলুন স্যার।" স্যার বললেন, "জানি ওরা খুব ভুল করেছে। আমি ওদের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি।" ওরা লজ্জা পেয়ে বলল, "না স্যার, আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন? তবে ওরা খুব বাজে কাজ করেছে।" স্যার বললেন, "এর শাস্তি ওরা পাবেই।" ওরা খুশি হয়ে জামাকাপড় দিয়ে দিল।

গেস্ট হাউসে ফিরে একটা ঘরে পাঁচজনকে স্যার ডাকলেন। দরজা বন্ধ করলেন। আমরা চুপি চুপি জানালা থেকে দেখছি। স্যার গম্ভীর স্বরে বললেন, "পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার উদ্যোগ কে নিয়েছিল?"

লাইনের প্রথমে ছিল সণ্টু। মাথা নিচু করল। স্যার বললেন, "স্নান করতে

খুব মজা লাগছিল, না। এবার আমার বেতটাও খুব ভালো লাগবে। হাত পাত, সন্টু।"

সন্টু ভয়ে ভয়ে হাত মেলল। সপাং। সন্টু তার তার নামযশ ভুলে "বাবা রে, গেলাম রে" বলে চিৎকার করে উঠল। স্যার আবার হাত পাততে বললেন। সন্টু কাঁদতে কাঁদতে হাত পাতল। স্যার সজোরে যেই না মারতে যাবেন, ও হাত সবিয়ে নিল। বেতটা সোজা গিয়ে লাগল স্যারের পায়ে। "বাবা রে, মবে গেলাম"—স্যার একদম বসে পড়লেন—"ওরে কে কোথায় আছিস, জল আন।"

তক্ষুনি সন্টু ও তার শিষ্যরা স্যারের এত সেবা করতে লাগল যে স্যারের পা খুলে যাবার জোগাড়।

পিকনিক এভাবেই ভালোমন্দে, খুশিকান্নায় শেষ হল। সন্ধ্যায় আমাদেব বাস ছাড়ল।

পরেব দিন স্কুলে স্যার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে করিডোর দিযে হাঁটছেন। হেডস্যারের সামনে পড়লেন। "একি, কী হযেছে মিত্রবাবু?" হেডস্যার জিজ্ঞাসা করলেন।

"আব বলবেন না"—স্যার হাত নেড়ে সমস্ত ঘটনা বললেন।

হেডস্যার অত্যন্ত রেগে গিযে বললেন, "ছি ছি। এই অঞ্চলের মধ্যে আমাদের স্কুলের যথেষ্ট সুনাম। প্রতি বছর ম্যাধমিকে স্টার বের হয। এইভাবে ওরা দুর্নাম করছে? কাভি নেহি, আজ ওদেব আমি দেখেই ছাড়ব।"

হেডস্যারের ঘরে পাঁচজনের ডাক পড়ল। আমবা চোখ ফিট করলাম জানালা দিযে। দেখি সন্টু কিছুতেই লাইনের সামনে দাঁড়াবে না। ওর যুক্তি, তারকেশ্ববেব লোকেদের হাতে মার খেযেছি, অঙ্কের স্যারের হাতে মার খেযেছি, আর আমি সামনে দাঁড়াচ্ছি না। এবার তোরা দাঁড়া। সবচেয়ে রোগা লিকপিকে কিংশুক দাঁড়াল সামনে। স্যাব চোখ মুখ লাল কবে—"ছিঃ স্কুলের কলঙ্ক।" বলেই সপাং করে কিংশুকেব পিঠে, হাতে—আর তখনই দেখা গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। দুটো মার খেয়েই কিংশুক কাঁপতে শুরু করল। মুখটা একদিকে বেঁকে গেছে, ঠোঁটের কোণ বেযে থুতু পড়তে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে শুরু করেছে ভুল বকা—"কে আমাকে বাবার কাছ থেকে আনল, আমি বাবার মাথায জল ঢালব।" স্যার ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুইযে দিলেন। গাযে মাথায় হাত বুলিযে, বাবা বাছা করতে শুরু করলেন। গরম দুধ খাওযালেন। তারপর সে যখন একটু সুস্থ হযেছে, স্যার ওদের চার বন্ধুকে কিংশুকেব দেখাশোনার ভার দিলেন। অজিতবাবুকে দিয়ে একবাক্স মিষ্টি কিনিযে এনে ওদের দিযে বললেন—"তোরা পেট ভরে খা। এমন হবে আমি তো জানি না, তোরা যেন বাড়িতে গিয়ে বলিস, না।" তারপব স্যার ক্লাশ নিতে বেরোলেন।

ওমা, অবাক কাণ্ড। মিষ্টির বাক্স খুলে যেই না ওরা খেতে শুরু করেছে কিংশুক তাড়াতাড়ি উঠে স্বাভাবিক স্ববে বলে উঠল, "একি। আমাকে বাদ দিযে তোরা খাচ্ছিস?" সবাই চমকে তাকিয়ে বুঝল কিংশুক এতক্ষণ নাটক করছিল। সন্টু মুখটা একটু গম্ভীর করল। হযত ভাবল—শিষ্য তার উপর দিয়ে যায যে।

ক্লাশ শেষ করে স্যার হন্তদন্ত হয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিংশুক শুযে "আমাব কি হয়েছিল" "আমি বাড়ি যাব"—ইত্যাদি বকতে শুরু করল। স্যাব একটা রিকসা ডাকলেন। সন্টুকে ডেকে ওকে বাড়ি পৌছে দিতে বললেন। "বাড়ি গিয়ে খাস্ বাবা, বিশ্রাম নিবি।" কিংশুক একটু বেঁকে ঘাড় কাত করল।

বিশ্রাম নিতে বলায সে প্রায় তিনদিন কামাই করে স্কুলে এল। হেডস্যার এখন ওকে বেশ ভালোবাসেন। সন্টুর এখন মুখ ভার। সব জাযগায মার খেল সে নিজে; আর ভালো হল কিনা কিংশুক। তা হোক, শিষ্যদের ট্রেনিংয়ে সে তো সাকসেসফুল।

ট্যারা চোখে

ম্যানেজার না ড্যামেজার

দ্রৌপদী ছাড়া মহাভারতের পাঁচ স্বামীকে কেউ ম্যানেজ করতে পারতেন কি মাথা ঠাণ্ডা রেখে? বাবার প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে বনের মধ্যে গিয়ে তো সেঁধোলেন রামচন্দ্র। সীতা না থাকলে বনে তার দেখাশোনা করতটা কে? স্বদেশী যুগের কবি রজনীকান্ত সেনের গানে ফুটে ওঠা বঙ্গললনাদের বিলাপ সত্যিই বাস্তবিক—"আমরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আনিয়া দেই গো, তোমরা বসিয়া খাও"। সত্যিই তো—নিজের হাড়মাস কালি করে অষ্টপ্রহর হেঁসেল সামলানো, "বিগ ড্রপ" নার্সারিতে পড়া ছেলের হোমটাস্কের খাতা, স্কুলব্যাজ কোথায় আছে খুঁজে বের করা, কর্তার অফিস-ফাইল খুঁজে দেওয়া আবার শাশুড়ির বাতের ব্যথার ওষুধ নিয়ে আসা—এসব কাজ দশ হাতে মহিলারা কি করেন না? তাহলে তাদের কেন বলা হয় ড্যামেজার, কেন তাদেরকে এখনো "এটা করো না," "সেটা দেখ না"-র ঠোঙায় বন্দিনী করে রাখার চেষ্টা? সবকিছু ম্যানেজ করার বাহবাটা কি চিরকাল পুরুষই নিয়ে থাকবে?

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কর্মাস বণিকসভা বোধহয় স্টক এক্সচেঞ্জ দালাল, শেয়ার মার্কেট নিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে একটু মুখ পাল্টাতে চেয়েছিল। তাই রোটারি ক্লাবকে সাথে নিয়ে এক সেমিনার। মেয়েদেরকে "ম্যানেজ মাস্টার" শিরোপা দেওয়ার চেষ্টা। বিতর্কে উর্বর মস্তিষ্ক বে-গুণের গুণমণি আমলা, আঁতেল ইংরেজির অধ্যাপিকা এবং ফ্যাশানচুলো পোস্ট মডার্ন মাড়ওয়ারী সম্পাদিকা এ ওকে কথার বাণে তুলোধোনা করলেন। তাঁদের কাউকেই আর কথা ও সময় ম্যানেজ করতে দেখা গেল না।

—কৌশিক রায়

আনবিক অথবা দানবিক গল্প

পল্লব চক্রবর্তী

মাত্রাজ্ঞান-১

আমাদের সাথে কলেজে পড়ত, কবিতা লিখত, সেই যে ঝুম্পালি মৌলিক—তার নাকি এখন মস্ত নামডাক। শুনে আমাদের ভারী আনন্দ। অন্তত একজন তো কিছু হয়ে দেখাল আমাদের মধ্যে। তাও স্রেফ কবিতা লিখে। ভারা যায়, ডেইলি ছ-সাতটা করে চেক আসে ঝুম্পালির বাড়ি। পিনাকী তো বলেই ফেলল যে যাদবপুরে পড়তে গিয়েই নাকি ঝুম্পি এসব লাইনটাইন করে ফেলেছে। আজকাল চ্যানেল করতে পারলে কী না হয। যাই হোক, একদিন সকালে বাজার কামাই করে আমরা চার-পাঁচ বন্ধু মিলে ঝুম্পিব বাড়িতে হাজির। মিষ্টি-ফিষ্টি খেলাম। বেশ গল্পগাছাও হল। শেষে উঠব উঠব করছি, এমন সময় সায়ন বললে—"তা ঝুম্পি, নামডাক হযে গেছে বলে কি একটা কবিতাও শোনাতে নেই।"

ঝুম্পালি চোখ বড় করে বললে—"কবিতা?"

শুনে পিনাকী কেমন ক্ষেপে গেল,—"যা-যা রোজ যে দুটো-তিনটে চেক জমছে ঘবে, সে বুঝি ফালতু ফালতু?"

নিভেই গেল ঝুম্পালি। কইল,—"না বে পিনু, ঠিক ফালতু নয। তবে কি জানিস, ওগুলো আসে যাতে আর কবিতা না লিখি সেটাই এনশিওর করতে।"

সম্পাদক সাহেব নেই - ছুটিতে।
তবে আপনাকে এই চেকটা দিতে বলেছেন।

মাত্রাজ্ঞান-২

এ জগতে করবাব জিনিসের যে কত অভাব তা সাম্যকে না দেখলে বোঝা যেত না। জনসংখ্যা বাড়ছে। সবকারের শুভবোধ বাড়ছে। শিক্ষিতেব হাব বাড়ছে। আশেপাশে এখন গিজ্‌গিজ্ কবছে প্রতিভাধর মগজ। আর থিক্‌থিক্ কবছে চোব। ভাবনা-চোব। মৌলিক ভাবনা আত্মপ্রকাশের আগেই চুরি হয়ে যাচ্ছে। নতুন একটা কিছু শুরু করে দেখা যাচ্ছে কাজটা আগেই কেউ একজন কবে ফেলেছে। চুরি বন্ধের উপায় নেই। হায়! সাম্যর চিন্তা—কেন মুখ্যমন্ত্রীর ছাগল হয়ে জন্মাল না। যদি হত তাহলে ফেবৎ পাবার গ্যাবাণ্টি থাকত অন্তত।

প্রথমে যে গল্পটা লিখবে বলে ভেবেছিল সাম্য, সেইটা মায় টাইটেল পর্যন্ত ঝেড়ে দিযে লিখে ফেলেছিলেন বাংলাদেশেব এক লেখক—শেখব আহমেদ। কলেজ স্ট্রিটেব স্টলে বইটা দেখে সাম্য তো ক্ষেপে গিয়ে দোকানদাবকেই একহাত নিযে নিল। পাইরেসি বলে পাইরেসি। এ তো ইলোপ। নাঃ, বাংলাদেশটা দিনকে দিন যাচ্ছেতাই হয়ে গেল।

"রাজ্য সাহিত্য পত্রিকা"-র জন্যে একটা কবিতা লিখেছিল সাম্য শবৎচন্দ্রেব মতো মহিলা-ছদ্মনামে। কেয়াব করে ক্যারিযাবে দিযে আসাব পর দেখল 'দেশ সাহিত্য পত্রিকা'য হুবহু সেই কবিতাটাই ছাপা হযেছে, এমনকি 'কৃষ্ণা বসু' ছদ্মনামটা পর্যন্ত বাদ নেই। ভাবা যায়। উফ্, সাম্য যদি একবাব জানতে পেত যে কীর্তিটা কার? কিন্তু সবচাইতে কষ্টে ও কেঁদে ফেলেছিল, যেবাব ওব প্রিযতম কবি জয গোস্বামী ওব সাথে বিট্রে কবল। সবে আধখানা লিখেছিল উপন্যাসটা। কবিতায় উপন্যাস—"যাবা বোদ্দুবে ভিজছিল।" নামটা সামান্য চেঞ্জ কবে বই বের করে ফেললেন জয গোস্বামী। আহত বাঘেব মতো টানা সাতদিন কোদাল দিযে বাগানেব মাটি কুপিযেছিল সাম্য—যদি রাগ পড়ে।

তা বলে পিছপা হবার পাত্র নয় সাম্য। এবার সে আত্মজীবনী লিখছে কবিতায়—কাব্যাত্মজীবনী। প্লিজ দাদা, আপনাবা যাঁবা লেখক তাঁরা আর এ লাইনে নাই বা এলেন। এবারও চুরি হযে গেলে—উফ্ কী যে করবে ছেলেটা—ভাবতেও পারছি না।।

ধারাবাহিক কবিতা

পরিচালনা : কাব্যিটকেল কবিরাজ

বিরহ মঙ্গল

মৈনাক মিত্র

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

বন্ধু গো বহু বহু বাজে বুকে যে বিরহ
তাহাতেই দিন চির ভর
উঠিব না কভু আর, নাহি কিছু বলিবার
আঁটিলাম এ মুখে কুলুপ।
(ওঁ গঙ্গা)

সাফল্য

ভূতলেন্দু ভৌমিক

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

যারা হাসিতেছে বাজাতেছে তালি
তাহাদের তোতামুখ ভোঁতা হবে মড়কের ইঁদুরের ন্যায়
যেদিন আমার নাম লেখা হবে পুরস্কার-খাতে
এ সি ঘেরা ঘ্যাসটামিয়াস ঘরের ভিতর।
(ওঁ গঙ্গা)

প্রেমালু

সুচতুর গুপ্ত

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

এইসব ভাবনায়
প্রেমালু—প্রেমালু করে দেখি
আমার কপাল ছেড়ে কবে সে যে চলে গেছে হনলুলু
আমাকে হনন ক'রে। আলু নয়, এখন শুধুই
আলুনি জীবন।
(ওঁ গঙ্গা)

তিরিশ শতাব্দী

কাব্যিটকেল কবিরাজ

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

তিরিশ শতাব্দী—সে তো সোজা কথা নয়,
যদি না তার ঢের আগে ফিনিশ হয়ে যাই
তিরিশ শতক এলে কোনো এক আইরিশ দ্বীপে
তুমি আমি স্ট্রিপটিজ নেচে যাব—
দর্শক থাকবে না।
(চিতা বহ্নিমান)

আগামী

শেখরেন্দু দত্ত

(পূর্ব প্রজ্বালনের পর)

আদিম যৌবনা
বিচরণ
বিপণন
কক্ষ-কক্ষান্তর...
অপ কাব্য
উপন্যাস
ব্যাঙের ছাতা
ছাতার মাথা
মস্তক ঘূর্ণন...
(ওঁ গঙ্গা)

পাঠক, এক মিনিট সরবতা পালন করুন। আহা, চার-চারটি কবিতা এই সংখ্যায় গঙ্গালাভ করিল। তাহাদিগের অমর আত্মার শান্তি কামনা করিয়া যথাবিধি পিণ্ডদান করুন। এমনিতে কাঁদি কাঁদি কবিতার ভূত (লিখিবার,—পড়িবার কিংবা শুনিবার নহে) বাঙালির কাঁধে কাঁধে ভর করিয়াছে। কাঁদিয়া কুল পাইতেছে না মানুষ। তার উপরে মৃত কবিতা পিণ্ড না পাইলে যে কী দশা ঘটিবে—ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। পাঠক, কষ্ট করিতে হইবে না, কাশী যাইতে হইবে না, আপন আপন কবিতার খাতা ও কলমটি নিকটস্থ গঙ্গা, অভাবে ভাগীরথী, দামোদর, ব্রহ্মপুত্র—তদাভাবে বাটীর পার্শ্বস্থ পুকুর, বাগমারি খাল কিংবা টালিনালাতেও ভক্তিভরে সমর্পণ করিলেই কবিতার পুণ্যাত্মা শান্তি লাভ করিবে; আপনারাও উপদ্রব হইতে বাঁচিবেন।

—ভবদীয় কা. ক.

রসকেলি

—আপনি কি নিজের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছেন?
—আজ্ঞে হ্যাঁ।
—আপনি কি আশা করেন আপনার স্ত্রী আপনাকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে?
—নিশ্চয়।
—সকালে চা প্রস্তুত করিবে?
—অবশ্যই।
—বিছানা ঠিক করিবে?
—তা তো বটেই।
—আপনার বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবাযত্ন করিবে?
—তা আর করিবে না।
—পুরুষ-বন্ধুর সহিত সিনেমায় যাইবে?
—রাম রাম!
—মদ্যপান করিবে?
—কী সাংঘাতিক!!
—নাইট ক্লাবে যাইবে?
—ছি ছি। তাও কি হয়!!
—আপনার কপালে স্ত্রী নাই। আপনি স্বামী হইবার অযোগ্য। আপনি আমাদিগের "কাজের মেয়ে সরবরাহ কেন্দ্রে" যোগাযোগ করিতে পারেন।

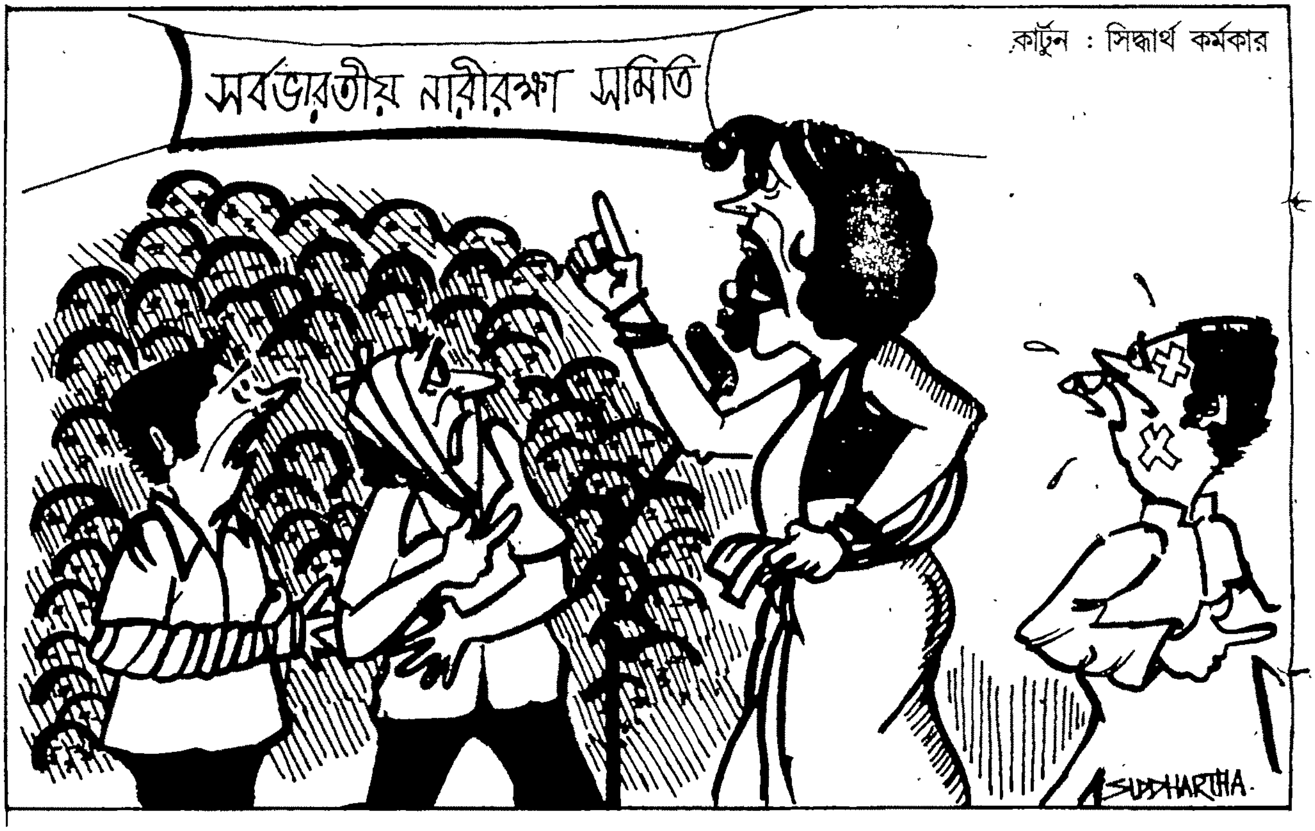

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

—আজ অবধি পুরুষদের অত্যাচাব আমরা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যাচ্ছি, কিন্তু....

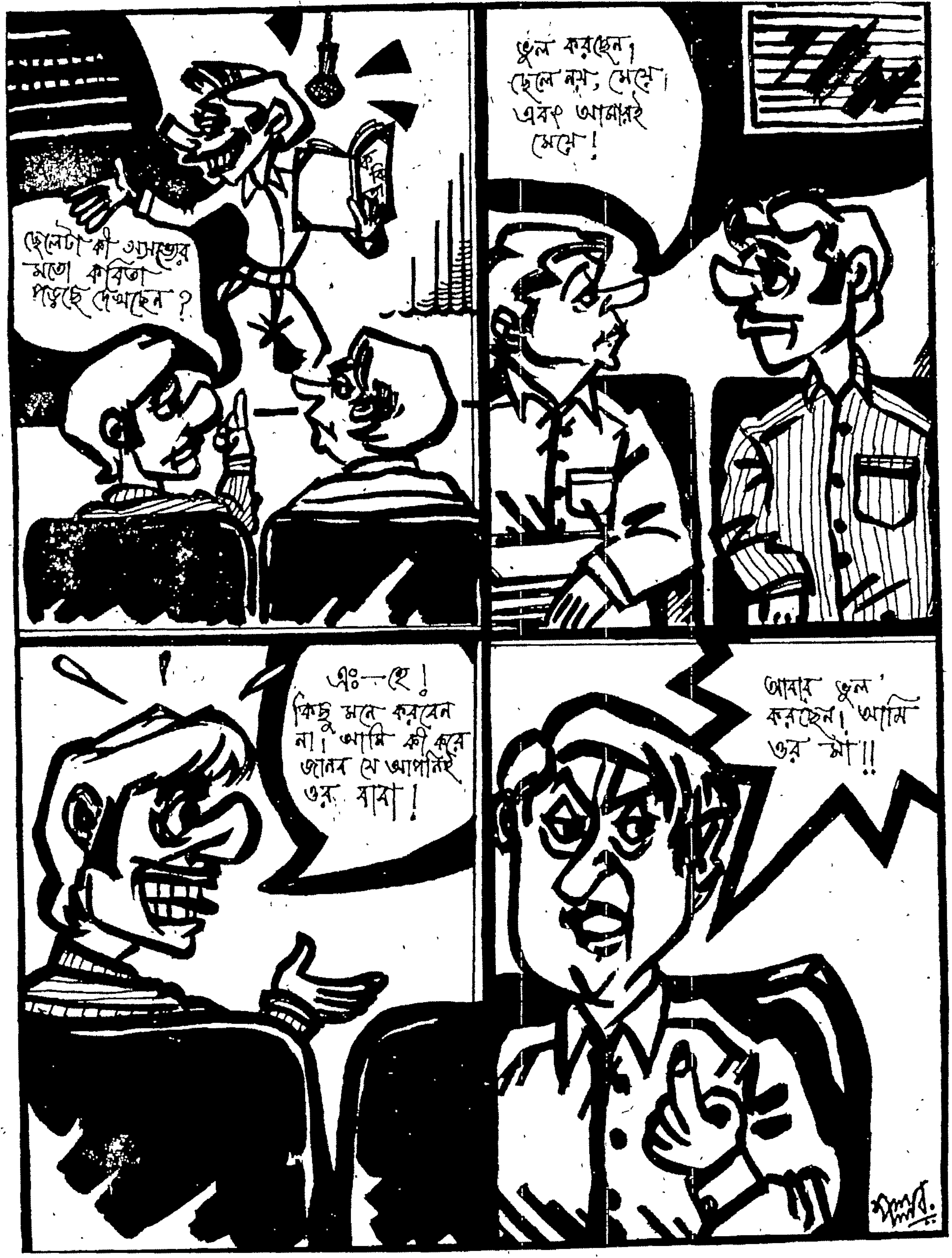
ছেলেটা কী অসভ্যের মতো কবিতা পড়ছে দেখছেন ?
ভুল করছেন। ছেলে নয়, মেয়ে। এবং আমারই মেয়ে!
এঃ—হে! কিছু মনে করবেন না। আমি কী করে জানব যে আপনিই ওর বাবা!
আবার ভুল করছেন। আমি ওর মা!!

কার্টুন : পল্লব চক্রবর্তী

টীকা নিষ্প্রয়োজন

অষ্টমকাণ্ড রামায়ণ

কথায় বলে সাতকাণ্ড রামাযণ পড়ে সীতা রামেব জ্যাঠা। রামায়ণ অজ্ঞতার এটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। বেশ ক'বছর ধরেই রামভক্তরা অযোধ্যা কাণ্ডেই লঙ্কাকাণ্ড বাধাবাব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সপ্তকাণ্ড রামাযণের অষ্টম কাণ্ড অর্থাৎ অবাক কাণ্ড লিখতে বদ্ধপরিকর আজকেব বাল্মীকি, তুলসীদাস, কৃত্তিবাসেব দল। নবসিংহবাবুর আমলে অযোধ্যায লঙ্কাকাণ্ডর ট্রায়াল রান হয়ে গেছে। এবাব ছিল আসল কাণ্ডটা ঘটানো। বাল্মীকি বামাযণের কোনো কপিবাইট সমস্যা না থাকলেও উচ্চ আদালত বামাযণে অষ্টম কাণ্ড সংযোজনায স্বীকৃতি দিলেন না। সুবিচারই বলব। বিখ্যাত বচনাব সংক্ষিপ্তকবণ হয, কিন্তু বৃদ্ধিকবণ হয, বলে কেউ কখনো শোনেনি।

আদত কথা, সে বামও নেই আব সে অযোধ্যাও নেই। কিন্তু হনুমানবা আছে। অতএব ল্যাজে আগুন ধরিযে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধালেই হল। সমস্যা হল, সে রাম সে অযোধ্যার মতো সে লঙ্কাও আর নেই। সে লঙ্কা এখন শ্রীলঙ্কা। বন্দর নায়েকেব উত্তর-পুরুষ মহিলাবাজ সেখানে ক'যুগ ধবেই চলছে। এল টি. টি ই-ব অমন তাগড়াই টাইগাবদেব থাবা যাদেব কাবু কবতে পারছে না, সেখানে হনুমানদেব বাঁদবামি করা সম্ভবপব নয। অতএব ত্রেতা যুগে যা হয়ে গেছে—গেছে, কলি যুগে শ্রীলঙ্কায় লঙ্কাকাণ্ড বাধানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অগত্যা অযোধ্যা।

রামাযণ মহাকাব্য। পুবাণ ভিত্তিক। এর কাহিনীর বা ঘটনাক্রমের কোনো ঐতিহাসিক স্বীকৃতি নেই। আর্যপুত্র শ্রীরাম ত্রেতা যুগে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করলেন কী মন্ত্রবলে? আর্যদেব ভারতে আগমন হয় ত্রেতা দ্বাপরেব পব কলি যুগে। সঠিক সন তারিখ না হলেও মোটামুটি সময়টা ইতিহাসেব পাতায বিশদভাবেই লেখা আছে। সাক্ষী না হলেও সাবুদ সহ।

মৌলবাদী না হলেও হেঁদু হিসেবে শ্রীবামকে বিষ্ণুব অবতার বলেই মানি। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। স্টেটাস একই। সমগ্রোত্রীয়। দু'জনেই বিষ্ণুর অবতাব, দু'জনেই দেবতা, দু'জনেই ভগবান। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে—একজন ত্রেতা অন্যজন দ্বাপরে—এন আব জি—অর্থাৎ 'নন রেসিডেন্ট গড' হিসেবে ভাবতে বসবাস কবেছিলেন। তা করুন, কিন্তু আদতে তো দু'জনেই ভগবান। ভগবানদের মৃত্যু নেই। আব মৃত্যুই যখন নেই তখন আবার জন্ম কীসেব? জন্মভূমিই বা কেন? সর্বত্রই তাঁরা বিরাজমান।

বাল্মীকি তাঁর কাব্যে রাম চবিত্রটিকে ঠিক ভগবান হিসেবে ট্রিট করেননি, করেছিলেন মানুষ হিসেবে। বাল্মীকির কাব্য-কাহিনীব নাযক বামের জন্ম হয় অযোধ্যায। রামপুরহাট বা রামরাজাতলায় নয় কেন? কারণ রামায়ণেব বচযিতা ওদিককার লোক ছিলেন, অযোধ্যার ভৌগোলিক অবস্থানটা ওঁব নখদর্পণে ছিল। তদানীন্তন অযোধ্যার। রামপুরহাট বা রামরাজাতলার নামও হযত বাল্মীকি শোনেননি, দেখা তো দূরেব কথা। কিন্তু রামায়ণেব রচযিতা যদি উত্তরাখণ্ডের মানুষ না হযে পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দা হতেন, সে ক্ষেত্রে বামপুরহাট বা রামরাজাতলা, অন্যথায সীতাবামপুবও বামেব জন্মভূমি হওযাটা কিছু বিচিত্র ছিল না। বরং ভালোই মানাত। নিদেন পক্ষে সে ক্ষেত্রে বাববিমসজিদ রামজন্মভূমি নিযে এই তুলকালাম কাণ্ড ঘটার কোনো সুযোগ থাকত না।

কিন্তু এই সত্যটা অষ্টমকাণ্ড বামাযণ রচনায় অভিলাষী, অযোধ্যাকাণ্ডে লঙ্কাকাণ্ড বাধানোব অভিপ্রাযী রামভক্ত হনুমানদেব মগজে গজাল মেরে ঢোকাই কী উপাযে? ইতিহাস যাদের কাছে পাতিহাঁস বা ছাইপাঁশ, কাব্য যাদেব কাছে অশ্রাব্য বা অপাঠ্য, সেই সব লেজুড়ে ..থাক।

—বুনো রমানাথ

বই তো অনেকেই ছাপেন, রাবীন্দ্রিক
মর্যাদায় রবীন্দ্রনাথের বই ক'জন ছেপেছেন?
সঞ্চয়িতা ৯০্
গল্পগুচ্ছ ১০০্
সহজপাঠ (১ম ভাগ) ১২্
ঐ (২য় ভাগ) ১২্
পাবলিশিং হাউস
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০০৯

নারীবাদ নন্দিনী

মৈনাক মিত্র

একদা অপরাহ্নকালে এক মারুতি আরোহিনী যোধপুর পার্ক হইতে বাংলা আকাদেমির পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। মণিবন্ধ সুসজ্জিত সময নির্ণায়ক যন্ত্র দেখিয়া যুবতী দ্রুতবেগে মারুতি চালনা করিতে লাগিলেন, কেন না সম্মুখে একাদিক্রমে জ্যাম। কি জানি, যদি কালধর্মে কোনো মহামিছিল নির্গত হইয়া পড়ে তবে যৎপরোনাস্তি ভোগান্তি হইবে।

ক্রমান্বযে ট্রাফিক সিগন্যালে ব্রেক কষিতে কষিতে মিন্টোপার্ক পৌছিবার পূর্বেই সূর্যাস্ত হইল। কিন্তু রাস্তার একটি বাতিও জ্বলিল না। বহুপূর্ব হইতেই তাহারা লোডশেডিং মাতৃকার স্নেহক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল।

অল্পকাল মধ্যে মহারবে এক বিশৃঙ্খল মহামিছিল প্রধাবিত হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইট-পাটকেলধারা পড়িতে লাগিল। মারুতি আরূঢা যুবতী গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না। গাড়ির মাথায, কাচে অবিশ্রান্ত ইষ্টক বর্ষণ হইতেছে। অনতিবিলম্বে হেডলাইট দুইটি চুরমার হইয়া গেল। যুবতী কেবলমাত্র অনুমান নির্ভর করিয়া এক সংকীর্ণ পথে মারুতি সহ প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে কিযদ্দূর গমন করিযা কোনো কঠিন অবয়বে ঘর্ষিত হইয়া মারুতির গতিরোধ হইল। ওই সময়ে নিকটে একটি বোমা সশব্দে বিস্ফোবিত হওয়াতে সেই আলোকে পথচারিণী সম্মুখে প্রকাণ্ড নির্মীয়মান কোনো পদার্থ চকিতমাত্র দেখিতে পাইলেন। ওই স্তূপ অট্টালিকা হইবে—এই বিবেচনায় মারুতি আরূঢ়া দ্রুত ভূতলে অবতরণ করিলেন। কৌশলে দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ। রমণী সবল হস্তে দ্বারে ভূযোভূযোঃ করাঘাত কবিতে লাগিলেন; কেহই দ্বাবোন্মোচন করিতে আসিল না।

বমণীর প্রবল শবীরাঘাত অস্থায়ী কাষ্ঠকবাট অধিকক্ষণ সহিতে পারিল না, অল্পকালেই অর্গলচ্যুত হইল। দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবতী যেমনই কক্ষাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন অমনি অস্ফুট মৃদু আর্তনাদধ্বনি শ্রুত হইল। কক্ষমধ্যে মনুষ্য অথবা ভূতপ্রেত—তাহা যুবতী অনুমান কবিতে পারিলেন না। কহিলেন, “কক্ষমধ্যে কে আছ?” কেহ উত্তর করিল না। কিন্তু জড়সড় হইবার সচকিত শব্দ অনুভূত হইল। যুবতী বাক্যব্যয় বৃথা জ্ঞান করিয়া বোমার স্প্লিন্টার ও ইষ্টকখণ্ডের প্রবেশ বোধার্থ দ্বাব যোজিত কবিলেন এবং স্বীয শরীর দ্বারে নিবিষ্ট কবিযা হিমশীতল স্বরে কহিলেন, “যে কেহ কক্ষমধ্যে থাকো, শ্রবণ করো। আমি এই হাইহিল পাদুকা হস্তে দ্বারে বসিলাম। বিবক্ত করিও না। বিঘ্ন করিলে, যদি নারী হও, সমুচিত দণ্ড দিব, আব যদি পুরুষ হও, নিশ্চিন্তে অবস্থান করো, বমণীহস্তে সেফ্‌টিপিন ও মজবুত পাদুকা থাকিতে কেহ তোমাদিগের বোমস্পর্শ করিতে পারিবে না।”

“কে আপনি?” কক্ষমধ্য হইতে ভীত পুরুষ কণ্ঠে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হইল।

শুনিয়া সবিস্ময়ে যুবতী উত্তব করিলেন, “স্বরে বুঝিতেছি, এ প্রশ্ন কোনো সুন্দব করিলেন। আমার পবিচয়ে কী প্রয়োজন?”

কক্ষমধ্য হইতে উত্তর হইল,—“ভযে আধমরা হইযাছি। আমার সঙ্গীর এখনো বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না।”

যুবতী তখন কহিলেন, “আমি যেই হই, আমি উপস্থিত থাকিতে দুর্বল পুরুষজাতিব কোনোরূপ বিঘ্নের আশঙ্কা নাই।”

পুরুষ কহিল, “আমরা সাযাহ্নকালে হেথা আসিযাছিলাম। গোলযোগে কর্মচাবীগণ ও গাড়িসহ চালক কোথায় পলায়ন করিয়াছে।”

যুবতী কহিলেন, “চিন্তা করিবেন না। কিয়ৎক্ষণ পর আমি আপনাদিগকে পৌছাইয়া দিব। আপনারা সাহসে ভব কবিযা কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি একটি মোমবাতি সংগ্রহার্থ নিকটস্থ দোকানে যাই।”

পুরুষ কহিলে ।, “মোমবাতি আমাদিগেব নিকটেই আছে কিন্তু দিযাশলাই নাই।”

যুবতী বলিলেন, “চিন্তা করিবেন না, আমি ব্যাকডেটেড নহি। সিগাবেট ও লাইটাব সর্বদাই আমার ভ্যানিটিতে মজুত থাকে।”

যুবতী তাঁহার মূল্যবান লাইটার দ্বারা মোম প্রজ্বলিত করিযা একটি সিগার ধরাইলেন। দীপালোকে দেখিলেন, দুইজন মাত্র পুরুষ। যিনি নবীন, তিনি চারিচক্ষুর মিলনমাত্র নতমুখ হইলেন। তাঁহার বহুমূল্য পবিচ্ছদ, দুর্মূল্য পাদুকা, হীরক ও মণিমুক্তাখচিত একাধিক অঙ্গুরীয। কণ্ঠে ভাবী ক্রুশ চেন, মণিবন্ধে স্বর্ণনির্মিত বালা। দেখিয়া যুবতী বুঝিলেন, নবীন হীন বংশোদ্ভূত নহেন। প্রবীণেব পাবিপাট্য তুলনায সাধাবণ হইলেও তাঁহাকে সাধাবণ কর্মচাবী বলিয়া বোধ হইল না।

> দুর্দমের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র ব্যাঙ্গম কেবল পিতার অন্ন ধ্বংস ও বিলাস বাহুল্যে মগ্ন ছিল। এই অপদার্থকে যখন কোনো রমণী হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে তখন ইহার যে কী দুর্গতি হইবে ভাবিয়া দুর্দম সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন।

যুবতী যখন মোমবাতি কক্ষে স্থাপন কবিযা পুরুষদিগেব সম্মুখে দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার শবীবোপরি দীপবশ্মি পতিত হইল। যুবতী কৃশ। কটিদেশ এতই ক্ষীণ যে মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করা যায। ক্ষুদ্রাযতন জ্যাকেট ভেদ করিয়া পীন বক্ষযুগল যেন পক্ষ বিস্তার করিতে চাহে। মূল্যবান জিন্‌স-এব পাৎলুন ও হাইহিলে হৃদয বিদাবী অলৌকিক শ্রী। কেশদাম পুরুষেব ন্যায ক্ষুদ্রাকাব কিন্তু রেশমকোমল। কপালে সামঞ্জস্যপূর্ণ টিপ। আয়ত চক্ষুযুগল আইল্যাসার শোভিত। উন্নত নাসিকায একবিন্দু হীবক দীপ্তি বিচ্ছুরণ করিতেছে। গোলাপকলি ওষ্ঠ গাঢ় ওষ্ঠরঞ্জনী বিভূষিত, তদুপরি সিগার অপরূপ শোভা বিস্তার করিযাছে।

পবস্পর পবস্পরের পবিচয় জানিবাব নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। প্রথমে যুবতী কৌতূহল প্রকাশ করিলেন, “বুঝিয়াছি আপনারা কোনো অভিজাত

বংশের গৌরব স্বরূপ। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয়, তথাপি আমার পরিচয় প্রদানে যে বাধা, আপনাদিগের তা না-ও থাকিতে পারে।”

জ্যেষ্ঠ কহিলেন, “পুরুষের পরিচয়ই বা কি। রমণীর পরিচয়ের আলোকেই তাঁহারা আলোকিত, যেমন সূর্যালোকে চন্দ্র।”

যুবতী এ কথার উত্তর করিলেন না, কেন না তাঁর চিত্ত ভিন্ন প্রসঙ্গে মগ্ন ছিল। তরুণ যুবা ধীরে ধীরে বদন উত্তোলন করিতেছিলেন। যুবতী বিমুগ্ধ নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। বোধ হইল, তাদৃশ রূপরাশি আর কখনো দেখিতে পাইবেন না।

যুবার বয়স যুবতী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। তথাপি মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালকভাব ছিল। সুডৌল ললাট। কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম। চক্ষু অতি চঞ্চলতায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। পাঠিকা কি শ্যামবর্ণ ভালোবাসো? তবে এ যুবা তোমার মনমোহন হইতে পারিবে না। যুবার বর্ণ অতীব গৌর। দুধে-আলতা রঙ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আয়ত চক্ষু। তাঁহার শরীর অত্যন্ত সুগঠিত। পাঠিকা, হৃতিক রোশনকে স্মরণ করুন। ওষ্ঠাধর দাড়িম্ববিম্বোধর। সদাই মৃদু হাস্যে আলোকিত, রসে টলমল করিতেছে। একটু ঘুরানো একটু ফুলানো—একবার যদি দেখিতে। যোগিনী হও, সন্যাসিনী হও, যুবতী হও, বৃদ্ধ হও—চক্ষু ফিরাইতে পারিতে না, চিরকালের ন্যায় মানসপটে মুদ্রিত হইয়া যাইত।

যুবতীর নিকট উত্তর না পাইয়া জ্যেষ্ঠ কহিলেন, “ইষ্টক ও বোমাবর্ষণ শান্ত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা যাত্রা করিতে পারি।”

যুবতী উত্তর করিলেন, “আমি আপনাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতেছি। আমি এতক্ষণে নিজ কার্যে গমন করিতাম, কিন্তু আপনার সখার ন্যায় এমন রূপবানকে বিনা রক্ষকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত কার্য নহে।”

> **যদি পুরুষ হও, নিশ্চিন্তে অবস্থান করো, রমণীহস্তে সেফ্‌টিপিন ও মজবুত পাদুকা থাকিতে কেহ তোমাদিগের রোমস্পর্শ করিতে পারিবে না।”**

পুরুষ কহিলেন, “পুরুষের মন্দ কপালের কথা কী আর বলিব। কিন্তু যখন ইহার মাতা ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে কাহার সঙ্গে আসিয়াছ, তখন?”

যুবতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, “বলিবে নিখিল ভারত নারীগর্জ্জন সমিতির সভানেত্রী ঝঙ্কার গাঙ্গুলীর কন্যা টঙ্কার গাঙ্গুলীর সহিত আসিয়াছি।”

ভবন মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। পুরুষদ্বয় শিহরিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তরুণ কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণ করিলেন। প্রবীণ করজোড়ে কহিলেন, “ম্যাডাম, না জানিয়া কত অপরাধ করিয়াছি। নির্বোধ পুরুষজাতিকে মার্জনা করিবেন।”

যুবতী হাসিয়া কহিলেন, “এ অপরাধের ক্ষমা নাই। তবে ক্ষমা করিতে পারি, যদি তোমার সঙ্গীর পরিচয় পাই।”

প্রবীণ সসম্ভ্রমে বলিলেন, “ম্যাডাম, সঙ্গীর পরিচয় যে এ মুহূর্তে দিতে পারিতেছি না, ইহার উপযুক্ত কারণ আছে। আপনি যদি নিতান্তই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকেন তবে পক্ষান্তরে এই স্থলে এইরূপ সময়ে আসুন।”

“তাহাই হইবে।” বলিয়া যুবতী তৃষ্ণাকাতর লোচনে যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লম্ফ দিয়া মারুতি আরোহনপূর্বক চলিয়া গেলেন।

এই স্থলে তৎকালীন কলিকাতার পরিচয় কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। এই পরিচ্ছেদ ইতিহাস সম্বন্ধীয়। পাঠিকা নিতান্ত অধীর হইলে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। তবে লেখকের পরামর্শ এই যে, এত অধৈর্য হওয়া ভালো নহে।

তৎকালে বঙ্গে নারীগর্জ্জন সমিতির ঝঙ্কার গাঙ্গুলী প্রবল প্রতাপে নারীবাদের ধ্বজা উড়াইতেছিলেন। পুরুষবাদীগণ পশ্চাদপসরণ করিয়া উত্তর কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু নারীবাদী নেত্রীগণের ঘরে ঘরেই পুরুষরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে লাগিল। ঈশ্বরের চক্রান্তে রমণীগণ একান্ত অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও পুত্রসন্তান প্রসব করিতে থাকায় তাহারা গোকুলে কৃষ্ণের ন্যায় মাথা তুলিতে লাগিল। দুর্দম ভট্টাচায্যি নামক এক প্রমোটার, প্রবল নারীবাদ বিরোধী সেনানায়কের নেতৃত্বে তাহারা পুনর্বার মাথা তুলিল। বাংলা আকাদেমি ও নন্দন চত্বরে তাহাদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নারীবাদ বিরোধী স্লোগান ও কবিতাপাঠে নন্দনচত্বর মুখরিত হইয়া উঠিল, পাড়ায় পাড়ায় রোয়াকে রোয়াকে তাহাদিগের সেনানীগণ নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল।।

ঝঙ্কার বিশ্বাসী কর্মঠ প্রতিনিধিগণকে ইহাদের দমনে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু শত প্রচেষ্টাতেও সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা সুদূর পরাহত রহিয়া গেল। ঝঙ্কারের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী যোদ্ধা দমনী দাম পুরুষবাদ দমন করিতে গিয়া নিজেই দমিত হইলেন। নিজে জয়মাল্য পরিবার বদলে পুরুষবাদী শিলীন্ধ্রশূর-এর কণ্ঠে বরমাল্য পরাইয়া বসিলেন।

পুরুষগণ কী কৌশলে একে একে তাঁহাদিগের ঘাঁটিগুলি ছিনাইয়া লইতেছে, এবং কী কৌশলেই বা নারীবাদী যোদ্ধাদিগকে আপন বক্ষলগ্ন করিয়া ফেলিতেছে ইহা জানিবার নিমিত্ত একজন সৈন্যাধ্যক্ষাকে নিয়োজিত করিতে ঝঙ্কার মনস্থ করিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা টঙ্কার এই দুঃসাহসিক কার্যের

ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া নেত্রী তাঁহাকেই দায়িত্ব প্রদান করিলেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় উক্ত দিবসেও টঙ্কার কর্মোদ্দেশ্যে আকাদেমিব পথে গমন করিতেছিলেন। তখন পাঠিকাবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে।

যে অসম্পূর্ণ অট্টালিকার কক্ষে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা দুর্দম ভট্টাচার্য নির্মিত। এক্ষণে কর্পোরেশনের কয়েকজন অসাধু কর্মচারী তাঁহার কিছু জাল কাগজপত্র আটক কবায় নির্মাণকার্য স্থগিত ছিল। তাঁহাব ন্যায় নেতার কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, এমন দুঃসাহসী কে আছে, দুর্দম বুঝিযা পাইতেছিলেন না। অবশ্যই ইহা নারীবাদীদের কূট চক্রান্ত হইবে ভাবিয়া উপযুক্ত উৎকোচে প্রকৃত তথ্য জানিবার প্রযাস পাইতেছিলেন।

দুর্দমের অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র ব্যাঙ্গম কেবল পিতার অন্ন ধ্বংস ও বিলাস রাঙ্গল্যে মগ্ন ছিল। এই অপদার্থকে যখন কোনো রমণী হস্তে সমর্পণ কবিতে হইবে তখন ইহার যে কী দুর্গতি হইবে ভাবিয়া দুর্দম সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন। উক্ত দিবস তিনি তাঁহার শ্যালক বগলা বাঁড়ুজ্যে সমভিব্যহারে ব্যাঙ্গমকে নির্মীযমান গৃহে প্রেবণ করিযাছিলেন, যদি ব্যাঙ্গম এইরূপে কিঞ্চিৎ ব্যবসা মনস্ক হয়।

নির্দিষ্ট দিবসে বগলা সুচারু বেশবিন্যাস করিয়া নির্গত হইলেন। ব্যাঙ্গমকে তিনি সবিশেষ স্নেহ করিতেন। এই একপক্ষকাল ব্যাঙ্গম যেন কোন স্বপ্নের জগতে নিমজ্জিত হইয়া আছে। আহারে রুচি নাই। ইযাব-বন্ধুদিগের সহিত জুয়া খেলিতেছে না। একটি ডার্বি হওয়া সত্বেও রেসকোর্সের মযদান-অভিমুখী হয় নাই। মূল্যবান স্কচেব বোতল আলমাবিতে পড়িযা পচিতেছে। ব্যাঙ্গম আর সে ব্যাঙ্গম নাই। আকাশ প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিয়া বিড়বিড় করিতেছে—টঙ্কার...টঙ্কার...। তাহাব বর্ণে যেন কালিমা লাগিযাছে। দেহতনু ক্ষীণ হইযা আসিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে বগলাব দুই চক্ষু অশ্রুবারিরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

> **বিগত একপক্ষকাল মারুতি ভিন্ন গাড়ি**
> **চড়ি নাই, স্কচ ভিন্ন মদ্যপান করি**
> **নাই, সিগার ভিন্ন ধূমপান করি নাই।**
> **আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।”**

বগলা গৃহসম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, টঙ্কার পূর্বেই উপস্থিত হইয়াছে। মারুতির চালকাসনে বসিযা ঘন ঘন সময নির্ণাযক যন্ত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। বগলা নমস্কার করিযা বলিলেন, “একাকী এ স্থলে আসিতে শঙ্কিত হইয়াছিলাম। আপনার দর্শনে বল পাইলাম।”

যুবতী কহিলেন, “তোমাদিগের কুশল তো?”

বগলার অভিপ্রায়, প্রথমে জানিয়া লন, নেত্রীতনয়া সত্যই ব্যাঙ্গমে অনুবক্ত কিনা। বলিলেন; “হ্যাঁ ম্যাডাম। মদনদেবের করুণায় তিনি কুশলেই আছেন।”

যুবতী বলিলেন, “মদনদেব কাহাকে করুণা কবেন আর কাহাকে পীড়ন করেন, বুঝা দুঃসাধ্য। মন্মথ এই অধীনের উপর বড়ই দৌরাত্ম্য শুরু করিযাছেন।”

ব । এ অসম্ভব কথা কে বিশ্বাস করিবে?

যুব । যে পক্ষকাল মধ্যে নিজ প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়, তাহার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে ভেদ কি?

ব । কি প্রতিশ্রুত ছিলাম, স্মরণ কবিযা দিন।

যুব । তোমার সঙ্গীর পরিচয়।

বগলা গম্ভীর হইয়া গেলেন। কহিলেন, “সত্য পবিচয দিতে ভয হয়। পাছে তাহা আপনার অসুখেব কারণ হয়।”

যুবতী ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন হইয়া কহিলেন, “যাহাই হউক, তুমি প্রকাশ করিযা আমার উৎকণ্ঠা দূর করো। বিগত একপক্ষকাল মারুতি ভিন্ন গাড়ি চড়ি নাই, স্কচ ভিন্ন মদ্যপান করি নাই, সিগার ভিন্ন ধূমপান করি নাই। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।”

এই কথা শুনিবার জন্যই বগলা এত যত্ন কবিতেছিলেন। তথাপি কহিলেন, “আর্যে, আপনি নাবীবাদে বিচক্ষণ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে দুঃসহ দায়িত্বভার আপনি বহন কবিতেছেন, তাহাতে দুষ্প্রাপ্য যুবকে মনোনিবেশ কবা কি উচিত? আপনি আমার সঙ্গীকে বিস্মৃত হউন, অবশ্যই নিজ কর্মে সফল হইবেন।”

যুবতীব অধরে বেদনাব হাস্য প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন, “কর্মেব কথা বলিতেছ? আমার সকল কর্মে তোমার সঙ্গীর মুখ প্রভাতপদ্মের ন্যায় ভাসিতেছে। যখন পুরুযবাদী মস্তকোপবি প্রবন্ধেব খাতা তুলিতেছে, আমি তাহারই ধ্যান কবিতেছি। মনে হইতেছে, মস্তক বিদীর্ণ হইলে তো আর সে প্রিযমুখ সন্দর্শন কবিতে পারিব না। তখন নিজ কবিতার খাতা দ্বারা তাহাব হস্ত চূর্ণ কবিয়াছি। কোথা গেলে তাহার দর্শন পাইব?”

বগলা সূতা ছাড়িলেন। বলিলেন, “মানিকতলায আমাব সঙ্গীর দেখা পাইবেন। ব্যাঙ্গম-রূপবান মহারথী প্রমোটার দুর্দম ভট্টাচার্যের পুত্র।”

টঙ্কার গাঙ্গুলীকে যেন লো-প্রেসার দংশন কবিল। অধোমুখে দণ্ডায়মানা রহিলেন। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলিযা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “হায। তোমার কথাই সত্য হইল। ব্যাঙ্গম আমাব হইবে না। আমি নন্দন-চত্বরে চলিলাম। শক্রশিবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কবিয়া নিজ প্রাণ বিসর্জন দিব।”

টঙ্কারের দুই গণ্ড বাহিযা দবদরধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। বগলা মনে মনে বলিলেন, “দুর্দমটা কেবল বাড়িঘর প্রমোটিং বুঝে, প্রজাপতি নির্বন্ধ প্রমোটিং আমাব কাছে শিখিতে হইবে।”

পাঠিকা, বগলা টঙ্কাবেব অশ্রুজল মুছাইতে থাকুন, ইত্যবসবে আমবা ‘পত্রপাঠ’-এব পত্রান্তরে গমন কবি।

এই সব বিষয়ে পত্রপাঠ লেখা আহ্বান করছে

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল
পুরুষবাদ (শুধুমাত্র নারীরাই লিখবেন,আঁকবেন)
ছুঁচোর কেত্তন
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

সরস নিবন্ধ,গল্প,রসরচনা,ব্যঙ্গ কবিতা (ছড়া নয়)
অতি সত্বর পাঠান।

নারী অঙ্কন-শিল্পীরা (নারীবাদী নয়) যোগাযোগ করুন।

আমরা আবিষ্কার করেছি যে রেলে বারো ঘণ্টার ডিউটি আছে। তারাও মাস্টার কিনা! ব্লক স্টেশনে যে মাস্টার আটঘণ্টা ডিউটি করে ফ্ল্যাগ স্টেশনে গেলেই তার ডিউটি বারোঘণ্টা হয়ে যায়।

শিক্ষা সুসংবাদ

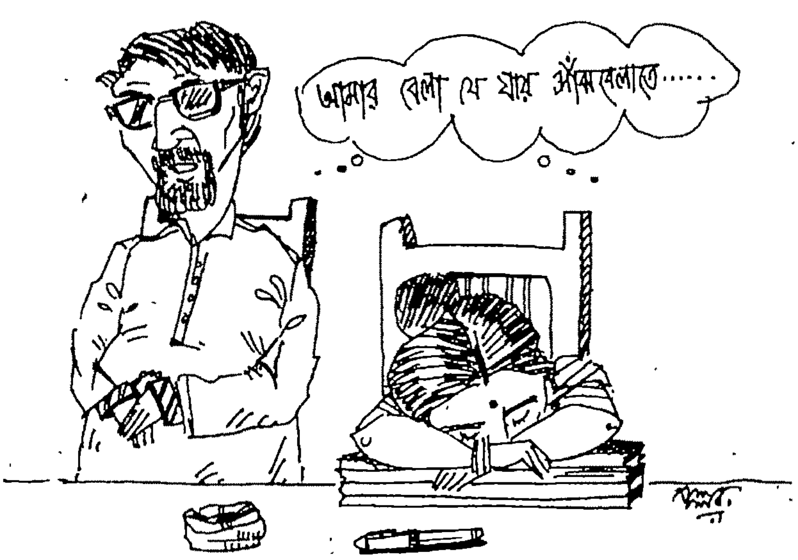
আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে……

বারো ঘণ্টার দাওয়াই

কলেজে কলেজে মাইনে হচ্ছে না। তা না হোক, শিক্ষা বিস্তার বেশ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। আমরা মাস্টাবদেব (হ্যাঁ, অধ্যাপকদেব আমরা এখন এই নামেই সম্বোধন করে থাকি) কলেজে রোজ পাঁচঘণ্টা আটক রাখার বন্দোবস্ত করেছি। বাবুবা কলেজে আসতেন, নিজের নিজের ক্লাশগুলো নিতেন আব সুট্‌সাট্‌ কেটে পড়তেন। আমরা বোকা, ভাবতুম এটাই বোধহয় ওঁদের কাজ। এখন আমাদেব চোখ খুলে গেছে। বোকা ছিলুম বলে চিরকালই বোকা থাকব—এমন দাসখৎ তো লিখে দিইনি। হঠাৎ আমাদের বুদ্ধি খুলে গেছে। এমনকি সে—ই কবে মুখস্থ করা শোলোকটাও মনে পড়ে গেছে—উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত। আমরা জেগে উঠেছি। জাগা মানে একেবারে বাঘার মতো জাগা। এই নিরীহ মাস্টার জাতটা চিরকালই বঞ্চিত। কেউ তাদের কথা ভাবত না। আমবা, হ্যাঁ আমরাই, নিজের ঘর-সংসারের কথা ভুলে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্যে যাকে বলে একেবাবে আদাজল খেয়ে লেগেছি।

লেখাপড়া শিখলেই কি আর বুদ্ধি খোলে? খোলে না। তাহলে তো একজন ভাঙা লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ীর চেয়েও অন্তত মাস্টাররা দু'পয়সা বেশি রোজগার করতে পারত। পিলেব ব্যামো, অম্বলের ধাত আর হাই প্রেসারের হাতে নিজেকে সঁপে দিত না। এসব তাদের হয়েছে শুধুমাত্র নিজেদের নির্বুদ্ধিতার ফলে। কলেজে এসে পড়ায, তারপর বাড়ি ফিরে টিউশনি করতে বসে (যদিও এরা সংখ্যায় খুব বেশি নয়, তবু এদের কথা মাথায রেখেই সকলের ভবিষ্যৎ মাপকাঠিটি বানাতে হচ্ছে), তারপর পরীক্ষার খাতা দেখতে বসা, তারপর আবার কোনো কোনো বোকা মাস্টাব পরদিনের ক্লাশের পড়া তৈরি কবতে বসে। ভাবুন একবার, ক্লাশের পড়া তৈবি কববে তো ছেলেরা। মাস্টাবরাও যদি তাই-ই করতে বসে তবে সে আর কীসেব মাস্টাব? তবে তো তাব মাস্টারি করাব যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। আমবা—এদেশের সচেতন গণতন্ত্র রক্ষাকারীরা, আমরা কি কখনো এসব হতে দিতে পারি? একজন মাস্টার, হাজার হোক গণ্যমান্য ব্যক্তি, চাকরি খুইয়ে পথে বসবে। মামাবাড়ি নাকি? তবে আর আমরা আছি কী করতে?

এইজন্যে আমরা প্রথমেই তাদের টিউশন বন্ধ করেছি। সারাদিন নাগাড়ে পড়িয়ে গেলে ফুসফুসেব আর কিছু থাকবে? টি. বি. হয়ে যাবে যে। তাছাড়া একজন শিক্ষক, যিনি কিনা সমাজে আদর্শ স্থানীয ব্যক্তি, বাসে-ট্রামে গোঁত্তা খেতে খেতে, ধুতিব কাছা খুলে, পাযের চটি ছিঁড়ে আধমবা হয়ে চলাফেরা করেন, তিনিও যদি গাড়ি চড়ে বেড়ান, তবে সমাজের আদর্শ দৃষ্টান্ত আর কে হবে? একজন ব্যবসায়ী কিংবা ডাক্তাব কিংবা সমাজ বিরোধীর সঙ্গে তাঁর তফাৎটা বইল কোথায়। বোকা মানুষ এঁরা। কালিদাসের মতো, যে ডালে বসে আছেন, সেই ডালই কাটতে লেগেছেন। তাই আমরা আমাদের দলীয় কর্মীদের লাগিয়ে দিযেছি, তারা এদেব কলেজ এবং বাড়িতে নজর বাখছে, যাতে কেউ টিউশনি কবে আত্মহননের পথে পা না বাড়াতে পারে। আত্মহত্যা প্রবণতা এক ধরনেব বোগ কিনা। সবসময় রোগীকে চোখে চোখে রাখতে হয।

তাবপব ধরুন পাঁচঘণ্টা। ভুলেও ভাববেন না, আমবা এদের বন্দী করে রাখছি। এ তাদেরই মঙ্গলেব জন্যে। বাড়িতে থাকলেই অহর্নিশ বউয়ের খোঁটা (মহিলাদের ক্ষেত্রে শাশুড়ির), টেনশান, ইরিটেশান, প্রতিবেশিব সঙ্গে বিবাদ—মানসিক শান্তি একেবারে বববাদ। তাব চে' কলেজে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খাও, রাজা-উজির বধ করো। মন প্রফুল্ল থাকবে। বাজেট নিযে টেবিল গবম করো, অযোধ্যা নিযে ফাটাফাটি করো, তাবপর ক্রিকেট—এসব নিয়ে এনারা মাথা না ঘামালে আর কে ঘামাবে বলুন তো। এনাবাই তো আমাদেব বল-ভরসা। দেশের এই ঘোর দুর্দিনে. .

পাঁচঘণ্টা কলেজে বসিযে রাখছি, কিন্তু ক্লাশ কি খুব বেশি নিতে হচ্ছে? কখনোই না। মাস্টাররা কলেজ ছেড়ে নড়তে চাইছে না—এমন উৎপাত ছাত্র-ছাত্রীরা আগে কখনো দেখেনি। এমনিতেই তারা কলেজ লাইফটা আমোদে

কাটায়, এমন প্রমাদের মুখোমুখি হওয়াব কথা কোনোদিন তারা ভেবেছিল নাকি। এত চাপ সয় না। ক্লাশে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিব্যি হাজিরা খাতাব 'নো স্টুডেণ্ট ফাউণ্ড' লিখে টিচার্স রুমে ফিরে এসো। তারা তখন কোথায় কোন ক্যামোফ্লেজিং টিউটরের কাছে প্রশ্নোত্তর নিতে থাকুক। তবেই দেখুন, মাস্টারদের পরিশ্রম লাঘবের ব্যবস্থাও আমরা কবেছি। মনের সুখে প্রিন্সিপ্যালেব সঙ্গে কোঁদল করো, দলাদলি করো, এ ওর নামে কুচ্ছো গাইতে থাকো—হাতে অঢেল সময। এনজয় করুন মশাই, এনজয় করুন।

মাস্টার বন্ধুগণ, নিন্দুকে কান ভাঙাবার খুব চেষ্টা করবে। কান দেবেন না মশাই—একেবারে কান দেবেন না। ওরা আপনাদের বন্ধু সেজে আসবে। কিন্তু আসলে দুশমন। মনে রাখবেন, এ জগতে আমরা ছাড়া কেউ আপনাদের বন্ধু নয়। ওরা বলবে—বাপু, এই যে মাইনে পাচ্ছ না, বসে বসে আঙুল চুযছ, এব নাম চাকরি। ছ্যা ছ্যা।।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

নাঃ, ব্যাপারটা বুঝিযে বলতেই হচ্ছে। প্রথমে একটা কথা খোলসা করে দিই। মাইনে কি আপনারা পান না? কড়ায গণ্ডায বুঝে পান। হতে পারে, আজ না হয় কাল। তারপর ধরুন ওই পি এফ, গ্র্যাচুইটি, পেনশন। পান না, বলুন? বুকে হাত দিয়ে বলুন। পান, আজ না হয় কাল। আপনি না পেলে আপনার ছেলে পাবে। তার আমলেও যদি না হয় তো তার ছেলে পাবে। হুঁ হুঁ বাবা, এ হল হিসেবের কড়ি। নিজের আয়ু ফুরলো বলে দুঃখ করবেন না। 'জীবন মৃত্যু পাযেব ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' বলে নির্ভয়ে পাড়ি দিন। আপনার পয়সা খাতায়-কলমে সরকারের ঘরে থাকবেই। এই যেমন প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা। ঠিকই আছে। বকেযা বেতন কাগজে-কলমে দিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের হিসেবে তুলে দিলুম। কী দারুণ খেলা। শেযার মার্কেটের মতো। লাখ লাখ টাকা লেনদেন হয়ে গেল কাগজে-কলমে কিন্তু একটি পযসাও ছুঁতে হল না। উল্টে হাতে না পাওয়া টাকাটার ইনকাম ট্যাক্স গুনে গুনে পকেট থেকে দিতে হল। আর সে টাকা সুবক্ষার কি জম্পেশ কায়দা। নিজেব প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা, যা কিনা মাস্টারের নিজেরই জমানো টাকা,—ধার চাইতে গেলে কিন্তু পাবে না। মেযের বিয়ের দোহাই দিক আর বাড়ি মেরামতের দরকার হোক। এভাবে টাকা নষ্ট হতে দিতে আছে? মাস্টার যদি অবিবেচক হয়, আমরা তো আর হতে পারি না। মেযের বিয়ে নাই বা হল। তাকে নারীবাদী আন্দোলনে ভিড়িয়ে দিলেই হবে। আর বাড়ি? যত ভেঙে ভেঙে পড়বে, ততই তার ঐতিহ্য বাড়বে। সেইজন্যে ফাণ্ড থেকে টাকা সরিয়ে দিয়েছি।

যাক গে, যে কথা হচ্ছিল, মাইনে পাওযা না-পাওয়া। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দু-তিনমাস দেরি করা হয় মাইনে দিতে। সে তো পরিকল্পনা মাফিক। এ হল কৃচ্ছ সাধনের ট্রেনিং। যেমন মিলিটারিতে হয়। ছুতোনাতা কবে দু'দিন একবিন্দু জলও খেতে দেওয়া হল না। অথচ ভাঁড়ারে মজুত অঢেল খাবার। দেশ যখন আক্রান্ত তখন দু'দিন খাওযা জোটেনি বলে কি সৈন্যরা বন্দুক কাঁধে তুলবে না? মাস্টাররাও তো সৈনিক। তাদেব শিক্ষাযুদ্ধ করতে হবে না? আর কে না জানে যে উপবাসে শরীর মন—দুই-ই শুদ্ধ হয়।

অবশ্য মাস্টারদের লড়ুয়ে হিসেবে তৈরি করার কাজ আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় গোড়া থেকেই রেখেছি। ওই যে পরীক্ষার হলে গার্ড দেওয়া। ছাত্রদের ট্রেনিং আছে, তাবা একটু দলাই-মলাই কবে। ক্ষেত্র বিশেষে ছুরি বোমা...যুদ্ধক্ষেত্রে তো এসবের মোকাবিলাই করতে হবে। আর এসবের মুখোমুখি হয়ে একটা-দুটো প্রাণ যেতেই পারে। দেশের জন্যে স্বার্থত্যাগ দশের জন্যে প্রাণাঞ্জলি।

এবারে নিশ্চয খোলসা হচ্ছে যে পড়ানোটাই মাস্টারদের প্রধান কাজ নয়। ওটা গৌণ। মাস্টাররা কলেজের নানান কমিটিতে ঢুকবে, খাতাপত্তর সারবে, হিসেবপত্তর দেখবে, ছাত্র ভর্তি করবে, পরীক্ষা নেবে, খাতা দেখবে, ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব কষবে।

পাঁচঘণ্টা সময়ে এরা নিরাপদ। শুধুই আত্মোন্নতি। এবং নিরাপত্তা। এখন প্রশ্ন উঠেছে—মাত্র পাঁচঘণ্টাই কি যথেষ্ট? ২৪ ঘণ্টার তুলনায় তা যে চারভাগের একভাগও নয়। তাই শোনা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয ভাবনাচিন্তা করে এদেরকে আটঘণ্টা কলেজেব নিরাপত্তা বলয়ে ধরে রাখাব সুপারিশ করতে চলেছেন। এতে নাকি মাস্টাররাও সন্তুষ্ট। কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট নই। আমরা চাই প্রতিটি কলেজ মাস্টারদের আধা-সংসার হয়ে উঠুক। বিনোদন ক্ষেত্র। তার জন্যে কম করে দিন-রাতের আদ্ধেক অর্থাৎ হররোজ অন্তত বারোঘণ্টা এই প্রেক্ষাগৃহে মাস্টারদের ধরে বাখা হোক। গরমের ছুটি আমরা উঠিয়ে দিযেছি। দেড়-দেড় মাস আমাদেব নজরদারির বাইরে তারা থাকলে আমরা সুস্থিব থাকতে পাবি? এই দীর্ঘ সময়ে কোন শত্রুব প্রবোচনায় কার চারিত্রিক শুদ্ধতা যে কীভাবে নষ্ট হবে তা কে বলতে পারে? পুরো গরমের ছুটিটা আমরা এদের ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছি। লাগাতার পরীক্ষার গার্ড দেওযা। এবং ওই একই ভাবে পুজোর ছুটিটাও বরবাদ করা যায় কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কিন্তু ওই বারো ঘণ্টা? মাস্টারদের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ আমরা। তবু একটা দৃষ্টান্ত অন্তত না পেলে শুধু মাস্টারদের জন্যে এই অতিরিক্ত সুবিধা কী করে বরাদ্দ করি। অন্যেরা যে বঞ্চিত ভাববে নিজেদেব। তাবা তো সতীনপুত্র নয।

এইসব ভেবে দুনিয়া তোলপাড় করে আমরা আবিষ্কার করেছি যে রেলে বারো ঘণ্টাব ডিউটি আছে। তারাও মাস্টাব কিনা। ব্লক স্টেশনে যে মাস্টার আটঘণ্টা ডিউটি কবে, ফ্ল্যাগ স্টেশনে গেলেই তার ডিউটি বারোঘণ্টা হযে যায়। (ওভার টাইম? ছিঃ। মাস্টার কি শ্রমিক।।) ব্যস্, মাস্টারে মাস্টারে মিলে গেল। নিন্দুকের মুখ বন্ধ। রক্ষা পেল আইন।

এখন আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, চব্বিশ ঘণ্টার কোনো দৃষ্টান্ত আছে কিনা। গ্র্যাণ্ড মাস্টার, রিং মাস্টাব, ব্যাণ্ডমাস্টার হলেও চলবে।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক

দেবা জানন্তি, বদন্তি নেহী

মুসুমুসু কলমচি

সম্পাদক দূরভাষে নির্ভয় জানাইযা কহিয়াছেন, 'মুসু হে, বড় ধামাকা সুযোগ, নারীকুল বাদ দিযা সংখ্যা করিযাছি। ইহাতে না লিখিলে যদি, তবে ইহজনম বৃথাই।' বচন শুনিযা কলমচি কবি শামসুর রহমান মহাশযের 'প্রথম গান, দ্বিতীয মৃত্যুর আগে' হইতে এক পংক্তি আবৃত্তি কবিলেন—"গলায বক্ত তুলেও তোমাব মুক্তি নেই।" কাব্যটিব নাম 'আত্মজীবনীর খসড়া' আজন্ম একই কথা একই বক্তব্য ঘুরিয়া ফিরিয়া শুইযা বসিয়া লিখিযা চলিলাম তথাপি মা ঘটিল নির্বাণ, মা হইল প্রাচিত্তিব। যাহা কহিলাম তাহা কেহই বুঝিল না, যাহা বুঝিল না তাহা লইয়া খেউড়ের অন্ত নাই।

নারী যদি বাদ হইবে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পৌরুযের আবাদ মিটিল। বেমক্কাই বঙ্গালদিগ এই সত্য অস্বীকার করিযা চলিযাছেন। ইহারা কেহ কেহ ভাবেন স্ত্রৈণ শব্দে ঘোর অপবাদ লুক্কাযিত। অপরপক্ষের বহুজন মঠের গেকয়া ভিন্ন অন্যতর সকল চালচলনেই সিদ্ধি লভিয়াছেন। যে কযজন বঙ্গাল স্ত্রৈণ নহেন, হে পাঠক, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সে কযজন অবশ্যই লম্পট। উপরন্তু যে কযজন অ-লম্পট, সে কযজন নির্ভেজাল কাপুকষ। এই দুই শ্রেণী ভিন্ন, অন্যতর নবীন কোনো শ্রেণী মুসুমুসু অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করেন নাই। যেই দেশে পুরুষ জাতির অবস্থা ইত্যাকাব, উক্ত দেশের নারীগণ বাদী পক্ষাবলম্বী না হইলে সমাজ চলিবে না। মহাপুরুযগণ অযথা অযথাই নারী শক্তিকে চালিকা শক্তি আখ্যা দেন নাই। নারীই ভালো। নারী বড় ভালো। বড় মিষ্টি। বড় সুহৃদ। কলমচি আন্তবিক চাহেন যেন নাবীগণ পুরুযগণের সর্বভার লাঘব করেন। উহাবা পরিত্রাতা হউন। মম গৃহিনী পবিত্রাতা হউন। মম সর্বভাব গ্রহণ ককন। অনন্তর উনি আমার মতো এবং আমি তাঁহাব মতো জীবন কাটাই। এদানীং কোমরে বেশ বাত ধরিযাছে। বাসে-ট্রামে ছুটাছুটি করিতে পারি না। প্রাতে মাদার ডেয়াবির গোযালঘরে লাইন লাগাইতে পারি না। গৃহিনী আমার মতো হইলে কী ভালো। সমস্ত দিন ধবিয়া লবণের বাটিটি একবাব এদিক হইতে ওদিক এবং অন্যবার ওদিক হইতে এদিক আমি দিব্য রাখিতে পাবিব। শতবার কেন, সহস্রবার পারিব।

কলমচি অবশ্য সবিশেষ জ্ঞাত এই যে, নারীগণ কদাচ এইরূপ হইবেন না। তাঁহারা সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন উদ্ধারকর্ত্রী হইবেন না। ক্ষমতা নাই এই জন্য নহে। এমত ধুয়াও তাঁহারা তুলিবেন না যে পুরুযগুলান বিধাতা হন নাই অতএব তাঁহারা দুয়া কেন হইবেন। মম গৃহিনী শিব পূজার উপোস করিয়া মম অন্তরেব ঈর্ষা-বহ্নি দাউদাউ উস্‌কাইয়া দিবেন অথচ যেন্নি আম্মো শিবঠাকুরটি হইব অন্নি গৃহস্থেব ঝাড়ুটিব আর একটি শলাকাও অবশিষ্ট মা রহিবে। আপামব নাবীগণ এই একটি মাত্র রূপেন সমবাদী হইযা থাকেন। ইনি সন্ধ্যাকালে সমিতি কবিতে অথবা চান্দা কালেক্ট কবিতে বাহির হইবেন। আড্ডা মাবিযা রাত্রি সাড়ে নয কবিযা গৃহে ফিরিবেন। গৃহবন্দী মম মন ইতো মধ্যে পচিযা উঠিলে জ্ঞান দিবেন যে বাহিবেব দু-পাঁচজনেব সহিত গপ্পগাছা করিযা আসিলে মন সুস্থ বহে। পরসন্ধ্যায ফেব সমিতি খেদাইতে উড়িয়া যাইবেন। একদা মুখ কাচুমাচু করিযা হয়ত কহিব,—সন্ধ্যায আমি আজ যাই। ব্যস্, যুগ-যুগান্তবে সঞ্চিত, বঞ্চিত, ব্যথিত, নিষ্পেষিত নির্যাতিত বুকেব ইতিহাস—ইতিহাস তো বটেই—চুঁইয়া চুঁইয়া পড়িতে থাকিবে। অখাদ্য ইলশেগুঁড়ি। কালে কালে মম মানসে এমন সন্দেহ হয যে পুনর্জন্ম নাই, জন্মান্তব নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে যেইকালে ভাগবান, স্রেফ একটি ফল খাইযাছিল বলিয়া আদম ভদ্রলোকটিকে স্বর্গ হইতে খেদাইয়া দিলেন সেইকালে মম গৃহিনী এবং তাঁহাব সমিতি-সদস্যাগণ কোন চুলায অগ্নি সংযোগ কবিতে ছিলেন! এত লড়াই লড়িতে পাবেন তো সেদিন ভগবানেব সাথে একটু লড়িযা দেখিলে ক্ষতি কীই বা হইত। অথবা, ভগবান এক নারীই মাত্র। ক্যামুফ্লেজে পটিযসী আধুনিকাদিগের ন্যায়? উমাশশী দেবীর ন্যায়, যিনি একদা গৃহিনীব অবর্তমানে মম বাটিতে পদ অর্পণ করিযাছিলেন। অধবোষ্ঠ প্রান্তে সামান্য গোঁপিনী যাহাকে দেখিযা মুসু শিংভাঙা হেলে-বলদ ভ্রমে এবং তাঁহার গৃহিনীব সহিত ইহাব কী পরিমাণ ভাব হইযা থাকিবে—ইত্যাকার শঙ্কা জনিত কৌতূহলে বহুক্ষণ গপ্প কবিযাছিলেন। এমনকি অতঃপর গৃহিনী ফিরিয়া আসিযা যুগলকে হস্তধৃতা-ধৃতি অবস্থানে দেখিয়া যেই কাহিনী বচিযাছিলেন তাহাতে কলমচিব প্রাপ্ত নীতিশিক্ষা এইরূপ হইযাছিল যে—'কদাচ সংসাবে নারিকেল শলাকা, চিনামাটি, খুন্তি, কড়া, হাতা, হ্যাঙ্গাব, ফুলদানি প্রভৃতি বস্তুর প্রবেশ না ঘটাইবেক। অদ্যকল্য মম সন্দেহ এই যে, ভগবান অবশ্যই উমাশশী দেবীর সহোদরা। নিদেন মামাতো খুড়াতুতো কেহ একজন হইবেনই। স্বর্গোদ্যানেব শান্ত পবিবেশে ইভ-ঠাম্মার বড় অসুবিধা হইতেছিল, অতএব ভগবান এবং ঠাম্মা মিলিযা আমারদিগের ঠাকুবদাদাটির সহিত এক সামান্য গট্ আপ গেম খেলিযাছিলেন। অবশ্য ইত্যাকার কিঞ্চিৎ ষড় প্রবণতা ভিন্ন বমণীদিগের অন্য কোনোরূপ দোষ মুসু দেখিতে পান নাই।

দুষ্ট পুকষসকল কহিযা থাকেন যে, সন্দেহ প্রবণতাই নারীবাদের মূল ভিত্তিভূমি। অপলাপে সিদ্ধ ইঁহারা বলেন যে, আদম মহাশযেব একটি পাঁজর হইতে সৃষ্ট ইভ দেবী জন্ম হইতে প্রত্যহ গোপনে আদম-ব্যক্তির পাঁজরগুলি গুনিযা দেখিতেন। তাঁহার ভয় আছিল, যেন হইতেই পাবে যে গোপনে অন্য কোনো আঙ্গিনায় অন্যতব কোনো ইভ ইনি সাজাইয়া আসিযাছেন। সন্দেহ হয়ত বা অমূলক নহে। হয়ত বা অমূলক। দুষ্ট ব্যক্তিব বাক্যে কর্ণপাত না করিবেন, ইহাই অভিপ্রেত। এদানীং সরকারি প্রচার পর্যন্ত চলিতেছে যে গুজবে কান দিবেন না। হে পাঠিকা, আপনি অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকিবেন। মুসুমুসু দুষ্ট নহেন। ইহাব চরিত্র সাদা এবং স্বভাব ফুল্লকুসুমিত। আনন সহাস্য এবং অয়ন নিষ্পাপ মহাসমুদ্র। বচনগুলি কলমচি স্বকর্ণে আড়াল হইতে শুনিযাছেন। তাঁহাব গিন্নি এই সকল বাক্য দূরভাষ মাধ্যমে উমাশশী দেবীর নিকট কহিতেছিলেন। হেতু? সম্ভবত দেবা জানন্তি, লেকিন বদন্তি নেহী।।

সমাজ দুঃসংবাদ

ফজল আলির ফাজলামি

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে ভারতবর্ষের প্রিয় খেলা কী, তাহলে আমার উত্তর হবে বধূ নির্যাতন। প্রতি চুয়ান্ন সেকেণ্ডে নাকি এদেশে একজন বধূ নির্যাতিত হয়। প্রতি সেকেণ্ডে একজন বধূ নির্যাতিত হলেও অবাক হতাম না। বধূ এদেশে সহজ লভ্য। ডাল-ভাত খাওয়ার মতোই বধূ নির্যাতন তাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। পুরুষের কাজই পৌরুষ প্রদর্শন। আর ভারতবর্ষ যে সাচ্চা মরদের দেশ, সেকথা কে অস্বীকার করবে?

বধূ নির্যাতনের আবার রকমফের আছে। বধূর পিতৃকুল মাতৃকুলের উল্লেখ করে কটূক্তি করা, বধূর অন্নবস্ত্রের জোগান বন্ধ করে দেওয়া, লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করা, ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা, গরম লোহার শিকের ছ্যাঁকা দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। বধূকে নিয়ে আর একটি খেলা অবশ্য বিশেষ জনপ্রিয়। তা হল, বধূর গায়ে কেরাসিন তেল ঢেলে দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দেওয়া। দারুণ ইন্টারেস্টিং খেলা, তবে এ খেলা দেখতে শক্ত নার্ভের দরকার। হার্টের রোগীর পক্ষে এ খেলা না দেখাই ভালো। কেরাসিন তেলের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ করেও মারা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গলাটা টিপে ধরতে হয় কিংবা গলায় দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ, দে দেখি দোল। আর একটি খেলা হল, বিষ খাইয়ে বধূকে মেরে ফেলা। বিষ অবশ্য খাঁটি হওয়া চাই। একটু ব্যয় সাপেক্ষ, কিন্তু খেলাটা তারিয়ে তারিয়ে অনেকক্ষণ উপভোগ করা যায়।

আগে এই খেলাতে তেমন ঝুঁকি ছিল না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখত না। তাই দেশ দুনিয়ার খবর রাখত না। কপাল টপাল মানত। কিন্তু একালে মেয়েরা বড্ড বেয়াড়া হয়ে গেছে। মুখে মুখে তর্ক করে। থানা-পুলিশের ভয় দেখায়। মামলা-মোকদ্দমা করে খোরপোষ দাবী করে। সত্যি, কালে কালে কী যে হল। মেয়েরা উকিল-ব্যারিস্টারের মতো কথা বললে কার ভালো লাগে বলুন তো। এসব ন্যাকামি কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

এ খেলায় শাশুড়ির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু আজকাল মেয়েরা শাশুড়িকে আর পাত্তাই দিচ্ছে না। এই প্রবণতাটা ভালো নয়। অনেক মেয়ে আবার লেখাপড়া শিখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। বিয়ের পিঁড়িতে লাথি কষাচ্ছে। এভাবে চললে তো ভারতবর্ষ থেকে এই রোমহর্ষক খেলাটি কালক্রমে উঠেই যাবে। সেটা কি ঠিক হবে? এতদিনের একটা পুরনো খেলা শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে? খুবই পরিতাপের বিষয়। অধঃপতন আর কাকে বলে। আমাদের দীর্ঘদিনের একটা জাতীয় ঐতিহ্যকে এভাবে কালিমালিপ্ত করা কিছুতেই চলতে পারে না। অসহ্য, অসহ্য। *

—ফজল আলি

ভিন্ন স্বাদের বই

রামায়ণ ঃ কথা ও কাহিনী ● মোহিত রায় ৩০ বোর্ড ৪০
দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল ● কৃষ্ণকালী মণ্ডল ১০০
দার্জিলিং ঃ রূপান্তরের ইতিবৃত্ত ● ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য ৪০
দক্ষিণ ২৪পরগণা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ
● কৃষ্ণকালী মণ্ডল ১৫০
কবিতা
পাহাড়ের ঘুম ভাঙছে ● ড. হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০
গোধূলির আবীরে ● ড. হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০
কমরেডের গান ● ড. হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়
● নব সাক্ষরদের জন্য ●
বাংলার লোককথা ● বন্দনা ঘোষ (যুক্তাক্ষর বর্জিত) ১৬
ঈশপের নীতি গল্প (নব সাক্ষরদের জন্য)
● ড. অঞ্জলি ভট্টাচার্য ১৫
পরিবেশ দূষণের গল্প (নব সাক্ষরদের জন্য)
● ড. সুমিত্রা খাঁ ১৫

নব চলন্তিকা
৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ - ০৩৩-২৪১-৩৩১৪

হেঁসেল

শুক্‌না হালুয়া

শম্‌পাদকেব লগে কইলকাতা বইম্যালায যাইতে হইছিল। যত্ত না বইপত্তর, তার থিক্যা বেশি ধুলা। মইন্‌যে তো আব বই কিন্‌তে আছিল না, বইম্যালায় গ্যাছিল শম্পারে পম্পাবে গার্গীরে লইয্যা পিবিত কবতে আব ডবল দামেব চপ কাট্‌লেট চাওমিন খাইতে। যে পরিমাণ ধুলা খাইছে. চপ-কচুবি খাওনের জাযগা আব নাই। তাই ধুলামুখে আপনেগো এট্টু হালুযা খাওনের ব্যবস্থা করি।

কি কি লাইগ্‌ব : এক লম্বরের আটা পাঁশ্‌শ গেরাম, ছোড দানার চিনি শ তিনেক গেরাম, অ্যালাচ পাঁচ গেবাম, দারুচিনি—হেইডাও পাঁচ গেরাম, ঘি দেড়শ গেবাম, কিশমিস পইন্‌চাস্ গেরাম, কাজুবাদাম একশ গেরাম, ভাজা নাইরকল কুচি পইন্‌চাস গেবাম, কপ্পুর অ্যাক চিমটার বেশি না—প্যাট গবম হইয্যা যাইব, ত্যাজপাতা মোটে দুইহান।

রন্ধন পোনালি : পেথ্‌থমে আটাটা চাইল্যা লন। হেইবার গাযে মাখার পাউডাবের মতন কইর‌্যা অ্যালাচ ও দাবুচিনি আলাদা গুঁড়া কবেন। কিসমিসগুলান পরিষ্কাব কইর‌্যা ফ্যালান। নাইবকলরে ফিন্‌ফিনে সিল্কের শাড়িব থিক্যাও পাত্‌লা কবেন, ছোড ছোড টুক্‌রা কইব্যা ফ্যালান। হেইবাব কড়াইডা উনানে বসাইয়া দ্যান। কড়াই গবম হইয্যা গ্যালে অল্প একটুখান ঘিতে কাজুবাদাম ভাজেন। একটুখান বাঙাপানা রং হইলে বাদামগুলান ব্যাবাক্ তুইল্যা ফ্যালান। হেরপর একইভাবে নাইরকল ভাজেন আব তুইল্যা একডা বাটিতে ঢাকা দিয্যা রাহেন। হেইবার বাকি ঘি কড়াইতে ঢাইল্যা দ্যান গিয্যা (নিজের মাথাব লয কিন্তু।)। ঘি-ডা ফুইট্যা উঠ্‌লে ত্যাজপাতা ফোড়ন দিয্যা আটটা ঢাইল্যা দ্যান। বেশ খানিকক্ষণ খুন্তি লইয়া নাড়ন-চাড়ন করেন। আটাডা যখন বাঙাপারা হইব আব সেণ্টের মতন গন্ধ ছাইড়তে থাকব তহন চিনি ঢাইল্যা দ্যান। আরো দু-চাইর মিনিট নাড়েন, তা হইলে হইব কি—চিনিডা আটাব লগে এক্কেরে মিইশ্যা যাইব। হেই ভাজা আটার লগে নাইবকল, কাজুবাদাম, কিশমিশ আর অ্যালাচ পাউডার, দাবুচিনি পাউডার, কপ্পুর একলগে ম্যাশান। ঢাইক্যা দিয্যা রাহেন মিনিট তিবিশেক। তক্কে তক্কে থাহেন। আশেপাশে কেউ য্যান্ ঢাইক্‌না খুইল্যা জিনিসডা তার প্যাটে চালান না কইর‌্যা দ্যায। ঠাণ্ডা মাইর‌্যা গ্যালে বাড়ির পিসা, মেসো, কাকা, নানা, জ্যাঠা, চাচা—হগ্গলরে চাখাইয়া দ্যান। জল লাগাইবেন না। হেই হালুয়া কৌটায কইর‌্যা মাসখানেক রাইখ্যাও দিতে পারেন। তয়, তালাচাবি দিযা কিন্তু। আপনের নিজেব হাতরেই বিশ্বাস নাই কিনা।

স্যাঁকা ইলিশ

কথায় আছে না মাছেভাতে কাঙ্গালি। তয আইজকাইল মাছেব বাজারে দামের যা বহর! শুইন্যা মনে হয আঁইশবঁটিতে নিজে দুইভাগ হইয্যা গিয়া বাড়িতে গিন্নিব মাছ খাওনের নোলা জন্মেব মতন ঘুচাইয়া দিই। মাছের দাম মানিব্যাগ তো ফর্সা কইর‌্যা ফ্যালায়ই, সাবা গতরে আগুনের ছ্যাঁকাও দিয়্যা যায়। তাই হেইবাব সত্যসত্যই স্যাঁকা ইলিশ খাইয়্যা দ্যাখেন।

কি কি লাইগ্‌ব : এক কেজি ইলিশ মাছ, চাইর চাম্‌চা মাখন বা ঘি, সস—হেইডাও চাইর চাম্‌চা, লবণ, গোলমবিচগুঁড়া। তয মডার্ন মা-জননীরা, গ্যাসের ওভেন বা মাইক্রোওয়েভে হেই বান্না হইব না। মা-জ্যাঠাইমার মতন কাঠকযলার উনানে রাঁইধতে হইব। তা সে আপনাবা যতই বংকরা মুখ ব্যাঁকান গিয়া।

রন্ধন পোনালি : মাখন, মবিচ, সস আব লবণ—সব একসাথে মিশাইযা মাছের গাযে মাখাইয়া রাখেন। কাঠ কযলাব উনানে দমে কইব্যা আঁইচ দ্যান। গমেব ভুষি আব মুড়কি মিশাইয়্যা উনানে ভইব্যা দ্যান। যা ধুঁযা বাইর হইব, তাতেই ইলিশ স্যাঁকা হইয়া যাইব গিযা। মাছটা লোহাব জালি বা গ্রিলেব ওপব বাইখ্যা উনানেব ওপর বসান। ড্যাক্‌চি দিয্যা ঢাইক্যা দ্যান। ধুঁযা য্যান বরাববের লগে বাহির হইতে থাকে। দ্যাখ্‌বেন, আগুন লক্‌লক্ কইর‌্যা না বাইড়্যা উঠে। উঠলে আগুনে জল দিয্যা কমাইয়া দ্যান। মাঝে মাঝে মাছটা উল্টাইয়্যা দ্যান। বাকি সস্‌টা মাছের ওপর গায়ে হল্‌দির মতন কইর‌্যা লাগাইয়্যা দ্যান। মাঝে মাঝে ছুবি দিয়া মাছটারে গাঁইথ্যা দ্যাহেন মুচমুইচ্যা রকম স্যাঁকা হইল কিনা। সামান্য মুচমুইচ্যা হইলেই গরম গরম খাওয়াইবা দ্যান্। মাছটা আকারে বড় হইলে ত্যারচা ভাবে কাইট্যা, ছোড ছোড পিস্ কইর‌্যা পরিবেশন কইরতে পাবেন। স্যাঁকা পাঁপড় আব পাঁউকটি টোস্টের থিক্যা স্যাঁকা ইলিশ তো জব্বর হইবই—কী, কন।

—কাঙ্গাল রায়

বইয়ের মলাট দেখে কিনবেন না।
বইয়ের ছাপাই দেখে কিনবেন না।
বইয়ের বাঁধাই দেখে কিনবেন না।
বইয়ের বিষয় দেখে কিনুন।

সমরেশ মজুমদার যেখানে বেপরোয়া, ছেড়ে কথা কননি কাউকে, 'কইতে কথা বাধে'নি এক তিল—

অকপটে ৩৫

পত্রপাঠ-এ কে না লিখেছেন সরস গল্প! **মনোজ বসুর** অপ্রকাশিত রসের গল্প থেকে শুরু করে **শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু পালিত, নবনীতা দেব সেন, সমরেশ মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কণা বসু মিশ্র**.... এমনকি কবি-গল্পকাররাও—**সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন**—মলাট নয়, মলাটের অভ্যন্তরে এঁরা রসের অবগাহনে—

পত্রপাঠ সহর্ষ গল্পসংগ্রহ ৩৫

পত্রপাঠ প্রকাশন
১০জে, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, সন্ধ্যা ৫-১০টা)
৯৮৩০০-৫২১৮২ (শুধুমাত্র পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে 'পত্রপাঠ' পত্রিকা সংক্রান্ত নয়)

পরিবেশক : **নবজাতক প্রকাশন**, এ৬৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭
প্রাপ্তিস্থান : **লেখা প্রকাশনী**, ৫৭ডি কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

।। শ্রীশ্রী মা অন্নপূর্ণাদেবীর ভরসা ।।

।। শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণায় নমো নমঃ ।।

"ওঁ অন্নপূর্ণে নমস্তভ্যং জগদম্বিকে।
তচ্চারু চরণে ভক্তিং দেহী দীনদয়াময়ী।।
ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমহস্ততে।।

'অন্নপূর্ণা জ্যোতিষ মন্দির'-এ
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় দুবে
(জ্যোতিষরত্ন)
ঐ পুত্র আর্যভট্ট পুরস্কারপ্রাপ্ত জ্যোতির্বিদ—
পণ্ডিত শ্রীহৃদয়মাধব দুবে
বি.এ. (ডি), জ্যোতিষরত্ন
জ্যোতিষ বিদ্যার্ণব, এম, এ, আর, পি, (ক্যাল)

গ্রাম ও পোঃ —কাপিষ্ঠা ● জেলা—বাঁকুড়া ● পিন—৭২২১৩৩
।। যোগাযোগ করুন ।।
বিঃ দ্রঃ—কুষ্টি বিচার ও হস্তরেখা বিচার দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয়।

PATRAPATH • March-April 2002 • Vol-2 Issue-8-9 • Regd. No.-WBBEN/2000/5855 • Rs. 8.00

Best Compliments

From

A

WELL WISHER

কাউকে হাসানোর কাগজ   কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

মে ২০০২

পত্রপাঠ

দাম : ৮ টাকা

বিদায় নেবার জন্য নয়

২য় বর্ষ ।। ১০ সংখ্যা

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো
বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

গাঁয়ে মানে না
আপনি মোড়ল

দ্রুত গতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে

উড়ান প্রোডাকশন
নিবেদিত
ফিরদৌসুল হাসান ও জয়দীপ মুখার্জী
প্রযোজিত

রহস্য ও রোমাঞ্চকর বাংলা ছবি

উদ্ধার

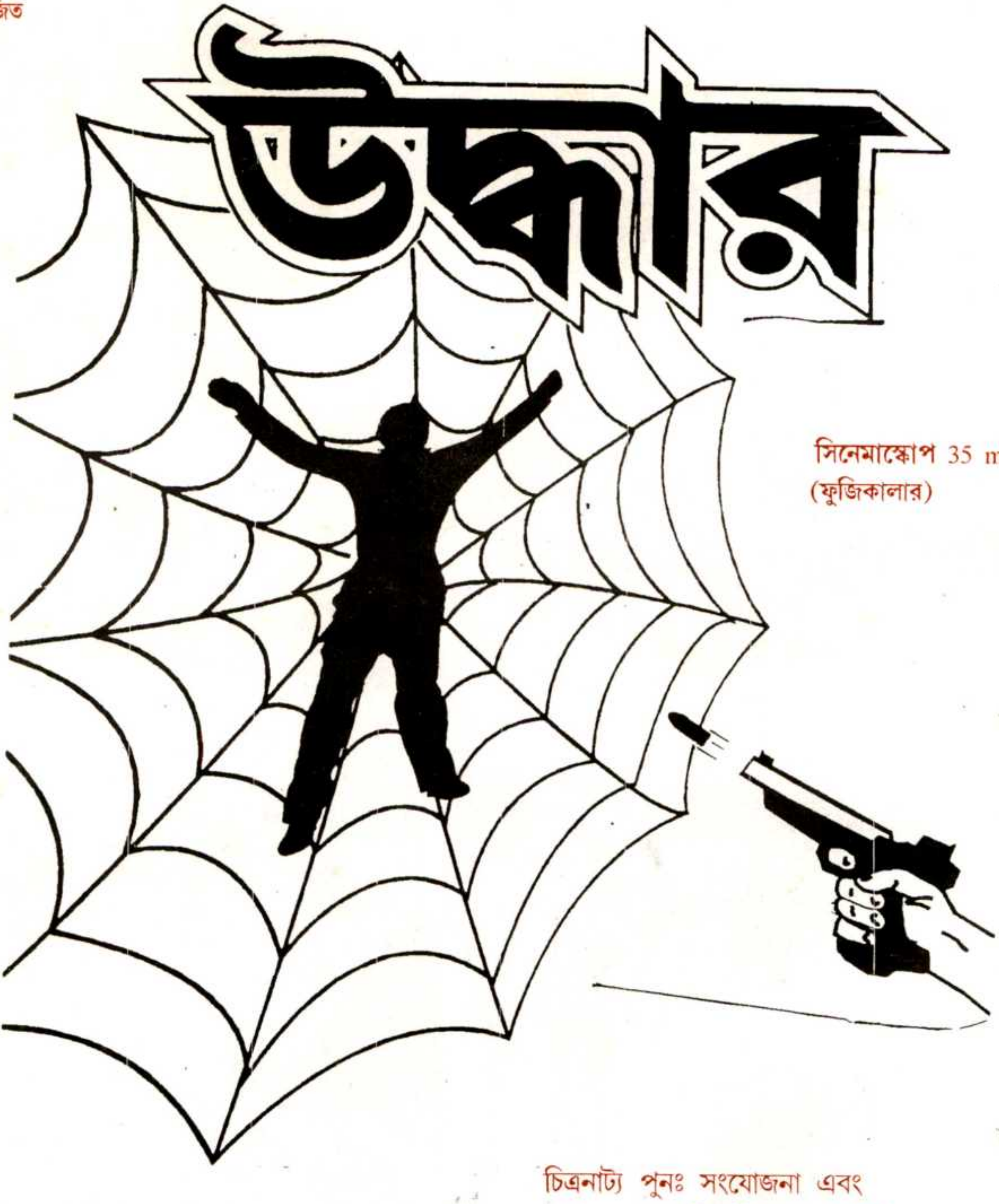

সিনেমাস্কোপ 35 mm
(ফুজিকালার)

চিত্রনাট্য পুনঃ সংযোজনা এবং
পরিচালনা : **শ্রী মিলন ভৌমিক**

মে ২০০২
২য় বর্ষ।। ১০ সংখ্যা
দাম : ৮ টাকা

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পবিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী • শচীন মিত্র

হামেশাই দেখছি আমরা। ঠেকছিও। নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছি। তবু দেখেও দেখি না। ঠেকেও শিখি না। এই মহাপুরুষদের সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া বিপজ্জনক বৈকি। কি আর করা যাবে। অত বিচার বুদ্ধি পত্রপাঠের নেই। অতএব আবার সেই মৌচাকে ঢিল। মেরেছেন যথারীতি **সমরেশ মজুমদার, চরণ বৈরাগী, কৌশিক রায়** এবং অন্যান্যরা।

সম্পাদকীয় □৩ পত্রপাঠ জবাব □৪ রাশি চক্কোর □৯ জবর খবর □৭ শিক্ষা সুসংবাদ □১৯ অনু কবিতা □২৬ হেঁসেল □৩০ রাজনীতি সুসংবাদ □৩৩ চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ □৩৯ সংগীত দুঃসংবাদ □৪২ পথঘাটের কিসসা □৪৭ ট্যারা চোখে □১৯,৪৬,৪৮ রসকেলি □২৮ কার্টুন □২,১৬,৪৮

প্রচ্ছদ কাহিনী তেনারা আছেন, থাকবেন • সমরেশ মজুমদার □১০ প্রবীণ ঘোড়েল অথবা নবীন নিরো • চরণ বৈরাগী □১৭ মোড়ল বাজির বিড়ম্বনা • কৌশিক রায় □১৩

গল্প খি খি খি • পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী □২০ এবারেও ফার্স্ট • সুজয় চট্টোপাধ্যায় □ ২৭ ষষ্ঠীপুজা • পল্লব চক্রবর্তী □৩৫ বৃন্তচ্যুত • রীতা ভট্টাচার্য □৪১

নিয়মিত তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □১২

পুরনো কাসুন্দি স্বামী বিবেকানন্দ-র "পরিব্রাজক" ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর "হাসির গান" থেকে □ ৫

রসকাব্য জামাইষষ্ঠী • সনৎকুমার মিত্র □২৯ পদ্যপাঠ • গোবিন্দ গোস্বামী □৩৪ কর্তা সমীপে • বিষ্ণুজ্যোতি রায় □৩৭

এ ছাড়া হোলি • দিব্যেন্দু দাস □২৯ বর্ণচোরা • দেবপ্রসাদ কুমার □৩১ মানে নাই মানা • মুসুমুসু কলমচি □৩৪ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল • প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী □৩৬ ভণ্ড তপস্বী • মৈনাক মিত্র □৩৮ উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে • বিপাশা মণ্ডল □৪১

প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ কর্মকার
অলঙ্করণ : পল্লব চক্রবর্তী • সিদ্ধার্থ কর্মকার • অরুণ সেন • শুভাশিস বসু
কর্ম সহায়ক : কৌশিক রায় • অচিন্ত্য কারক

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ন রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, সন্ধ্যা ৫-৯টা)
সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১৫ বি, ফার্ন রোড, কলি-১৯, মুদ্রণ . দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

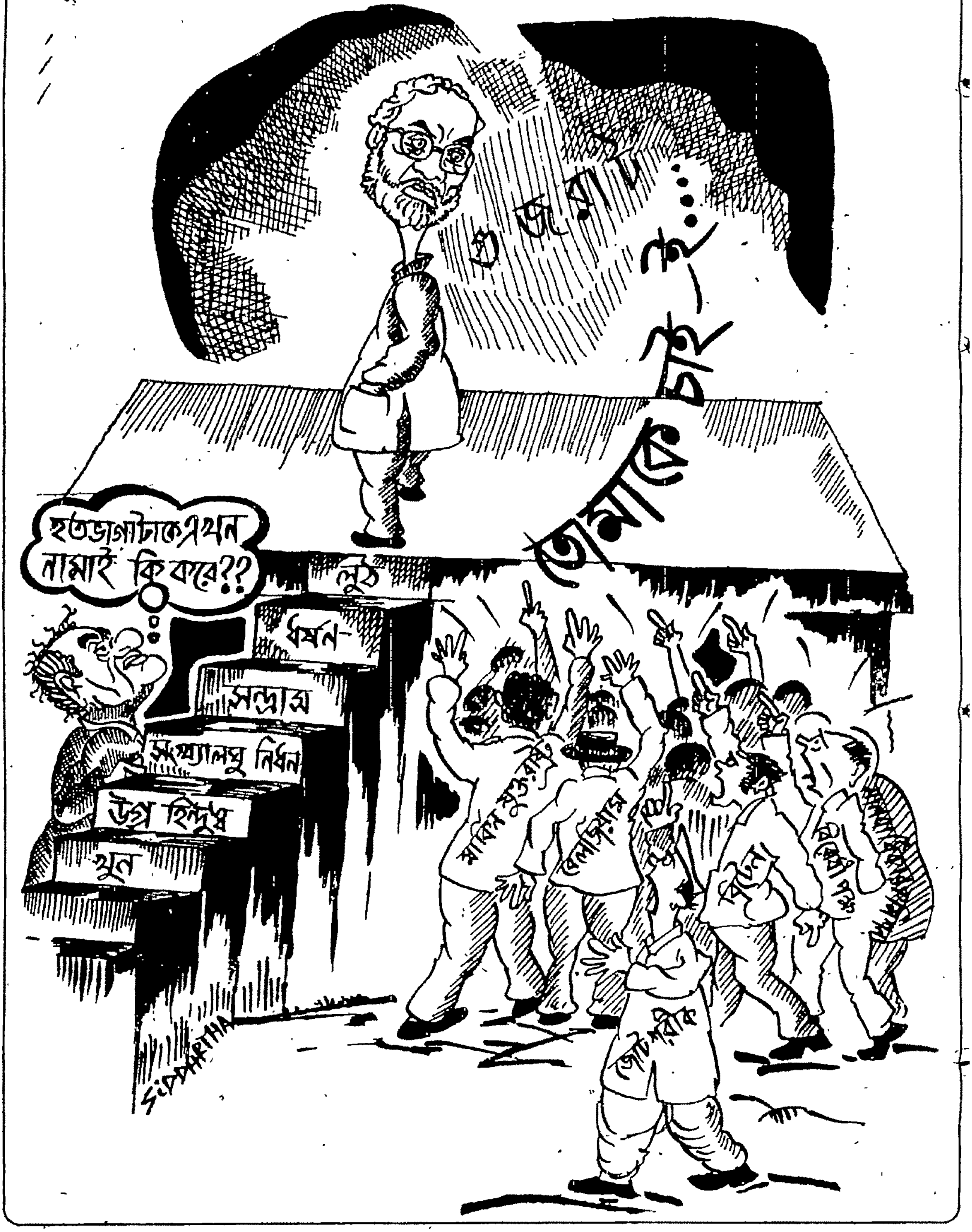

সম্পাদকীয়

হাসির কথা

রামগরুড়ের ছানা, হাসিবার কথা যাহারা ভুলিয়াও ভাবিতে পারে না, তাহাদের খবর সুকুমার রায় দিয়া গিয়াছেন। বাসস্থান সম্পর্কে যদিচ কিছু বলেন নাই তবে তাহাদিগকে এই বঙ্গেই দেখিয়া থাকিবেন—এমত ধারণা করা যাইতে পারে। বাঙালির দেহে পশ্চিমের ডাল-রুটির তাকৎ নাই, পঞ্চনদের পরিপুষ্টি নাই, ফুসফুস অতীব দুর্বল—গলা ফাটাইয়া হাসিবার দম কোথায় পাইবে ? কিন্তু ইদানীং যাহা ঘটিতেছে গুজরাটকে কেন্দ্র করিয়া, তাহাতে বাঙালি বুঝি সুকুমারের মান আর রাখিতে পারিল না। ঘাতকদের হস্ত হইতে কপালজোরে পরিত্রাণ পাওয়া উদ্বাস্তুরা সাক্ষ্য দিতেছেন যে পুলিশ বাহিনী আক্রান্তকে সাহায্য করা দূরে থাক, ঘাতকদের সহিত হাত মিলাইয়া নরমেধ যজ্ঞে সামিল হইয়াছে, তথাপি কোনো পুলিশের শাস্তি হইতেছে না, ঘাতকদিগের তো নয়ই, কেন না মহানায়ক নরেন্দ্র মোদী কোথাও কোনো অন্যায় আচরণের লেশমাত্র দেখিতে পাইতেছেন না। সর্বাধিনায়ক মহামান্য বাজপেয়ীজি 'গুজরাটের কারণে বিশ্বের কাছে মুখ দেখাইবার উপায় নাই' বলিয়াও মহানায়কের এমন কোনো দোষই দেখিতে পাইতেছেন না যাহাতে তাঁহাকে এক ঝট্‌কায় কুরশি হইতে নামাইয়া অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়। মোর্চা শরিক দেশম-নেতা নাইডুজি এবং আমাদিগের 'অগ্নিকন্যা' দিদি বিস্তর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াও ভোটাভুটিতে অভিযুক্ত 'বড়দা'-র বিরুদ্ধে যাইবার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ধর্ষণ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে নির্মম নৃশংস হত্যা, এমনকি পূর্ণ গর্ভবতী রমণীকে বিবস্ত্র করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণধার তরবারিতে তাঁহার উদর বিদীর্ণ করণ, তরবারির ডগায় অভূমিষ্ঠ জীয়ন্ত শিশুকে গাঁথিয়া 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মহোল্লাস—দেখিলে শ্রীরামচন্দ্র, আর্তজনে বিগলিত প্রাণ নরনারায়ণ মূর্চ্ছা যাইতেন; হেইল হিটলার কুর্নিশ করিয়া বলিতেন—'তোমারে সেলাম'। এমন কর্মকাণ্ডের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ভারতীয় জনতা পার্টির বড় মেজ সেজ সেনাধ্যক্ষগণ এবং তাঁহাদিগের সহযোগীবৃন্দ যে নির্লজ্জ প্রহসননাট্য প্রত্যহ অভিনয় করিয়া যাইতেছেন, তাহাতে না হাসিয়া থাকিবে কে? দেশ হাসিতেছে, দশ হাসিতেছে, হাসিতেছে সারা বিশ্ব। হাসি বড়ই ছোঁয়াচে। রামগরুড়ের ছানাদিগের বাসস্থান জনহীন আন্টার্টিকায় ব্যবস্থা করা ভিন্ন বুঝি সুকুমার রায়ের আর উপায় নাই।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● দক্ষিণেশ্বরে গেলে মনটা এত উদার আর সরল হয়ে যায় কেন?

—শ্যামা পাল, বরাহনগর, কলকাতা

☐ দক্ষিণের ঈশ্বর সর্বদাই মনকে উদার করে দেয়। শুধু দক্ষিণেশ্বর কেন, ঐ যে কিসের একটা দক্ষিণদুয়ার বলে, সেটারও।

● এ বছর একদম আম হয়নি। কি হবে?

—বিজয়া ভাদুড়ী, কন্টাই, মেদিনীপুর

☐ আমজনতা যা বলবে। এরপর আবার জাম হয়নি বলে যেন চিঠি লিখবেন না। সেটা জেনে নেবেন জ্যামজনতার কাণ্ডারী মিছিলবাবুদের কাছে।

● খুন এবং ধর্ষণের মধ্যে কোনটা বেশি অপরাধ?

—শ্যামলকান্তি বসু, বাটা, দঃ ২৪ পরগণা।

☐ বিচার হলে, না বিচার না হলে।

● বিজেপি-র পুরো কথাটা কি? ভারতীয় জনতা পার্টি?

—তাতন লাহিড়ী, কুচবিহার

☐ আমরা তো তাই-ই জানতুম রে ভাই। কিন্তু অধুনা কোনো কোনো দুরাচার বলছে—ওটা আসলে ভারতীয় জল্লাদ পার্টি। এই নিন্দুকদের নিন্দার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমরা।

● ধারাবাহিক কবিতার পরিচালক 'কা. ক' সত্যিই কাক। কবিতার নামে আবর্জনা বৃদ্ধি করছেন। একজন আধুনিক কবি হিসেবে তাঁকে ধিক্কার জানাই। *—ললিত দাস, সালকিয়া, হাওড়া*

☐ ভুল হল ভাই। কাক আবর্জনা বর্ধন করে না, ভক্ষণ ক'রে সমাজের উপকার করে। এখনো আপনার কবিতার দিকে কেন তাঁর নজর পড়েনি, কাক-এর ওপর আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলছি।

● শুনেছি বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মীনাক্ষী দত্ত-র বাড়িতে একবার চুরি হয়েছিল। কিন্তু চোর সব বাদ দিয়ে শুধু তারাপদ রায়ের 'কাণ্ডজ্ঞান' বইটি নিয়ে যায়। তারপর কী হয়েছিল বলতে পারেন?

—সুফল ঘোষ, কলকাতা-৫

☐ বিশেষ কিছুই না। চোরের কাণ্ডজ্ঞান দেখে তারপদবাবুর কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়েছিল—এই আর কি!

● শুনছি তসলিমা নাসরিন এখন থেকে বছরে চারমাস করে কলকাতায় থাকবেন? এতে কার কী উপকার হবে?

—মৃদুল কুণ্ডু, কলকাতা-৩৩

☐ বাংলা সাহিত্যের। যৌনপীড়ন মূলক কিছু যৌনউত্তেজক লেখা তার অন্তর্জলি যাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। প্রকাশক মার্কা বামুনঠাকুর তৈরি হয়েই আছেন।

● পুরস্কারের আশায় আপনাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে আমি বিনীতভাবে সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারস্থ। কিন্তু বেকার জীবনে নিজের শাড়িই ঠিকমতো কিনতে পারি না, তো সম্পাদক মশায়ের স্ত্রীকে কি দিই? অবশ্য এটাই যদি প্রধান শর্ত হয় তাহলে "বার্ষিক ডিফেকটিভ শাড়ি সেল" সংস্থা থেকে চারশ টাকার শাড়ি তিরিশ টাকায় জোগাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করব।

—বিপাশা মণ্ডল, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা

☐ আপনার পুরস্কার নিশ্চিত। পুরনো খবরের কাগজে আলতায় লেখা মানপত্র এবং হজমিগুলির একটি প্যাকেটের সঙ্গে পাঁচলাখ টাকার নোট।

● আমি পত্রপাঠ-এর জন্য একটি বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছি। অবশ্য সেটি কমপ্লিমেন্টারি। একটি ছোট আচার কোম্পানির। সেটি কি ছাপবেন?

—নির্মল

☐ কেন ছাপব না? শুধু বিজ্ঞাপনের বয়ানটা একটু আমাদের মতো করে নেব। যেমন—এই আচার খেলে মৃত্যু অনিবার্য।

পুরনো কাসুন্দি

আমরা হচ্ছি ডমমমম—

স্বামী বিবেকানন্দের "পরিব্রাজক" থেকে

বাণিজ্য-যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙের তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু-চারটা তোপ বসিয়ে অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়াহুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়, তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানি ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বললেই হয়। আমাদের দেশের ও ইউরোপের বাণিজ্যে পি. এণ্ড ও. কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি. আই. এস্ এন. কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম (Messageries Maritimes) ফরাসী, অস্ট্রিয়ান লয়েড, জার্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি. এণ্ড ও. কোম্পানি যাত্রী-জাহাজ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী—লোকের এই ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য-ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য।

এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, যেন কোন কালা আদমী এমিগ্রান্ট অফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলী করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে; অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাহিরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, অমুক ছোট জাত; সরকারের কাছে সব 'নেটিভ'। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য, শূদ্র—সব এক জাত—'নেটিভ'। কুলীর আইন, কুলীর যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভে'র জন্য—ধন্য ইংরেজ সরকার। একক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায় আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য। তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে—কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা। তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য। আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি—ও সব ওঁদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব ঐ কায়েতফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজদের মতো ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল। এখন এস না এগিয়ে? 'সব নেটিভ' সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম-বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, সব নেটিভ। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বলো? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বলো? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি-ঝাঁটার চোটটা বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজরাজ। তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ তো হয়েছেই, আরও হোক, আরও হোক। কপনি, ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু-পায়ে শুধু-মাথায় হিল্লী দিল্লী যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল-ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি,

> বলে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।' একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্!'

ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি-কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ। পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কবলা। 'সাধ ক'রে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত'। ধন্য ইংরেজ সরকার। তোমার 'তখৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক।

আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে 'ও চেহারা এখানে চলবে না'। মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি-মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া-মন্ত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইওরোপী পোশাক পরলেই মুশকিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু-একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদের পেট জ্বলে যায়, খাবার-দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিসটা দাও'; বললে 'নেই'। 'ঐ যে রয়েছে।' 'ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মতো ভাল লাগতে লাগলো। যাক পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি—বলে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।' একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্।' কিন্তু মজাটি দেখছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর "হাসির গান" থেকে

কবি

১

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ,—
শেলি, ভিক্টর-হিউগো, মাইকেল
আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে টস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে।
(কোরাস্) মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ
'কুইলের' কলম হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু?—নমস্তে নমস্তে।

২

আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে,
নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝ্‌বে কি তা অন্যে।
আমি যা লিখেছি এবং
আজকাল যা সব লিখ্‌ছি;
সে সব থেকে মাঝে মাঝে
আমিই অনেক শিখ্‌ছি।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৩

আমার কাব্যের উপর আছে
আমার অসীম ভক্তি;
আমি তো লিখ্‌ছি না সে সব,
লিখ্‌ছেন বিশ্ব-শক্তি;
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা,—
পাবে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে সস্তা।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তায় নেইক বড় বেশী নূতনত্ব)
যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ,
আমি না বোঝালে তাহা ক'জন বুঝ্‌তে পার্ত্ত?
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম,
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য।
এখন কর গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য,
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব।
মর্ত্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

জবর খবর

শ্রীমতী স্বামী

রবিঠাকুর কি রক্মিনী আমল তো বটেই হালফিলেও মহিলারা মনেপ্রাণে শিবঠাকুরের মাথায় জল ঢালতেন এই কামনা করে যে, তেনাদের স্বামীর গোঁফজোড়াটি হবে চেয়ে দেখার মতো, গলার স্বর হবে ষষ্ঠী পালোয়ানকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়ার মতো, আর চেহারাটাতে একাধারে হারকিউলিস, ভীমসেন আর দারা সিং-এর মিক্সচার থাকলে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া যাবে। ইদানীং এহেন খাম্বাজে স্বামীর থাবাকে বড় একটা পাত্তা না দিয়ে মাকুন্দ, স্মার্ট, ছিপ্‌ছিপে পাত্রের গলায় ঝুলতে চাইছেন আধুনিকা সাবিত্রী-রাধা-দময়ন্তীরা। তিনি মেনিমুখো আর গোবেচারা হলে তো কথাই নেই। তাহলে বাকি জীবনটা তেনাকে দিয়ে বেড টি বানানো যাবে। গুচ্ছের শাড়ি কাচানো যাবে। তবে শ্রীলঙ্কার কলম্বো নিবাসী এক যুবতীর ভাগ্যে মেনিমুখো স্বামী জুটবি তো জোট, এসে জুটল লেডিস সোয়ামী।

সবে বিয়েটা হয়েছিল। বিয়ের রাতেই কনে তার পতিদেবতার রাইকিশোরী চলাফেরা দেখে ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। এরপর বাসরঘরে স্বামী যখন কনেবউকে পাশের বাড়ির ট্যাপাবৌদির মতো মিহি গলায় সোহাগ জানাতে গেল তখনই বউ তো বটেই, বাড়ির সবারই আক্কেল গুড়ুম। হিজড়ে বরকে ফেলে বউকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে চম্পট দিল সবাই। বেচারা স্বামী। বিয়ে হওয়ার পর পরই তাকে যে এভাবে অনাথ হতে হবে সে কি জানত? শখ তো তার মেটেনি। তাই 'ওগো' বলে নববধূর হাত ধরতে গেছিল। ব্যস, শ্বশুরবাড়ির লোকজন এই বর-দিদিকে আদালতের কাঠগড়া দেখিয়ে দিয়েছে।

মাইনাস-বেত মাস্টার

আগেকার দিনে গুরুমশায়ের মুখোমুখি হতে গিয়েই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত কোমলমতি ছাত্রদের। কি জানি কখন পিঠে সপাং করে বেত মহারাজ সশব্দে পতিত হন। বেত এবং গুরুমহাশয়েদের মধ্যে এরকম প্রেমময় সম্পর্ক দেখে ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের পড়া তো অবশ্যই, নিজের চোদ্দগুষ্টির নামধাম ভুলতেও বেশি দেরি হত না। গুরুমহাশয়রাও গাধা পিটিয়ে মানুষ করাটাকে শিক্ষাতীর্থের সবচেয়ে বড় পুণ্যকর্ম বলে মনে করতেন।

ইদানীং অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, মাস্টার মশাইদের এই বেতপুণ্য অর্জন করার পথে বাগড়া দিতে শুরু করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস সাফসাফ জানিয়ে দিয়েছেন—খবরদার। ছাত্র-ছাত্রীরাই ভবিষ্যতে রাজ্যের উন্নতির ঠেলাগাড়িকে ঠেলেঠুলে এগিয়ে নিয়ে যাবে; তাদের বেত মারা তো দূরের কথা, চপেটাঘাত করা বা কানে মধুমোড়া দিলেও শিক্ষা দপ্তর সেইসব শাসক শাসিকা টিচারদের মাসমাইনের সময়টাতে যষ্টিমধুর মোক্ষম প্যাঁচ দিয়ে দেবেন। রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের সভাপতি জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ বলেছেন—বেত হাতে রক্তচক্ষু শিক্ষককে দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা কাপড় চোপড়ে হয়ে বসে থাকবে, পৃথিবীর আকার পুঁটিরামের সন্দেশের মতো বলে ঠ্যাঙানি খাবে—সম্পর্কটা আরো কাছাকাছি, আরো মাখোমাখো না হলে 'ন্যাকাপড়ার' আর মূল্যটা কি রইল।

শিক্ষকদের বেতবিহীন করা হয়েছে। কিন্তু স্টুডেন্টদের হস্তবেত রোধিবে কে? সাউথ সুবার্বান স্কুলের ক্লাশ সিক্সের এক ছাত্রকে ঠেঙিয়েছিলেন একজন মাস্টারমশাই। খবরটা চাউর হতেই সেই ছাত্রের দাদারা এসে গুরুমশায়কে প্রহারেণ ধনঞ্জয় করে পত্রপাঠ হাসপাতালে ক্লাশ নেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। হাত থেকে বেত তো গেলই, এখন বেতনও না যায়।

মেডিকেল সার্টিফিকেট এনেছেন তো?
অফকোর্স, ফ্রম লুনাটিক অ্যাসাইলাম

অন-লাইন স্বয়ম্বর!

নিলামের বউ

স্বয়ংবর সভা আজকাল আর হয় না। যতই নারী স্বাধীনতার ঝাণ্ডা নিয়ে গলাবাজি করা হোক কুমারীদেরকে প্রকাশ্য সভায় ডেকেডুকে আর বলা হয় না তাদের মন্‌পসন্দের কোনো রাজকুমারের গলায় মালাটি গলিয়ে দিতে। আজকাল তো মিস্‌রা মিসেস হওয়ার জন্য ময়দান, কফি হাউস, বাঁশঝাড়ের

পিছন অথবা নন্দনের টিকিট কাউণ্টারকেই স্বয়ংবরের জায়গা হিসাবে বেছে নিচ্ছেন। তবে পোস্টমডার্ন স্বয়ংবরেব সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত এবং আদর্শতম স্থান হচ্ছে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইট। নেট-পুরুতঠাকুরের অসীম বদান্যতায় চোখেব পলক ফেলতে না ফেলতেই নরওয়েব নাথান এবং কালীঘাটের কণিকার মধ্যে 'যদিদং হৃদয়ং তব' হয়ে যাবে। এই নেট-বিবাহের স্বয়ংবরা হতে গিয়ে নিজেব হাড়ির হাল করে ছেড়েছিলেন ব্রিটেনের ইন্টারনেট বিশেষজ্ঞা যুবতী কে হ্যামণ্ড।

কে হ্যামণ্ড সোজাসাপটা বাপ-মাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন—দেখাশোনা করে বর খোঁজার অত সময় তার একদমই নেই। সেইজন্য তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন ইন্টাবনেটে জিনিসপত্র নিলাম বা অকশন হয়—এবকম একটি ওয়েবসাইট। অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে যোগ্য পাত্রী হিসাবে নিজেব বিজ্ঞাপনও ছেড়ে দিয়েছিলেন কে।

কিন্তু এত ঘটা করে নেট-স্বয়ংবর কবলেও কে-র পতি অন্বেষণের নিট সুফল পাওযা যাযনি মোটেই। কে-ব পাণিগ্রহণের জন্য সাড়া দিয়েছেন মোটে একজন। কে তবুও দমে যাওয়ার পাত্রী নন। ওযেবসাইটে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছেন, তাঁকে বউ কবলে স্বামী আড়াই লাখ পাউণ্ডেব মালিক হবেন। কা কস্য পরিবেদনা। এহেন অর্ধেক রাজত্বি আব রাজকন্যের লোভনীয় অফারেও কে-র হাত ধরতে আসেনি তেমন কেউই। কে অবশ্য বলেছিলেন, তাঁকে বিয়ে করতে যে চায সে মানসিকভাবে সুস্থ কিনা তাব পবীক্ষা নেওযা হবে। এখানেই যত গেরো। কে-ব মগজ সুস্থ আছে কিনা সেটা নিয়েই চিন্তিত সকলে।

চোখা মিথ্যে

চোখে-মুখে মিথ্যে কথা বলা। এবারে আর রেহাই নেই। অন্তত মার্কিন মুলুকেব বিজ্ঞানীদেব হাত থেকে। যতই মিথ্যে কথা বলা হোক না কেন, এইসব বিজ্ঞানীদেব তৈবি যন্তর একনিমেষে আসল মিথ্যেবাদীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিযে নাকেব জলে চোখেব জলে করে দেবে।

মিনেসোটা বাজ্যের রস্টার শহবের মেয়ো ক্লিনিকের গবেষক জেম্‌স্ লেভিন তৈরি করেছেন এই মিথ্যাদর্শন যন্ত্র। দেখতে অনেকটা সাধারণ ক্যামেরার মতো। কোনো ছিঁচকে চোর যখন দিব্যি করে বলবে যে সে ধার্মিক সাধু, বা কোনো বিবাহিত ও সন্তানজনক অধ্যাপক যখন অষ্টাদশী সুন্দরী ছাত্রীকে পড়াতে গিযে বলবেন তিনি নিষ্কলঙ্ক কুমার, তখনই ওই ক্যামেরামার্কা যন্ত্র থেকে তাপ প্রতিবিম্ব বা থার্মাল ইমেজিং পদ্ধতির সাহায্যে খুব সূক্ষ্ম কয়েকটি আলোকরশ্মি গিয়ে পড়বে সেই মিথ্যুকবাবুব চোখে। ঝুটা বাত বললেই আমাদেব চোখের চারপাশে বেশিমাত্রার উত্তেজনার জন্য রাক্তের বক্ত জমা হয। সেই বক্ত দেখেই বুঝতে পারা যাবে কে ধার্মিক সত্যবান আর কে "অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ"। লেভিন সাহেব হলফ করে বলেছেন—তাঁব এই মিথ্যাবোধ মেশিন "হীরক বাজাব দেশের" মগজ ধোলাই মেশিনের থেকেও পযমন্ত। লণ্ডনের হিথ্‌বো আর ক্রযডন বিমানবন্দবে মেশিনটি পবীক্ষা করে দেখা হযেছিল। মেশিনের কল্যাণে কাস্টম্‌স্ কাউণ্টাব দিযে চোবাই মাল নিয়ে চুপ্‌কে চুপ্‌কে যাওযা বেশ কযেকজন "ভদ্দবনোক ব্যবসাযী" ধবা পড়েছে। যন্তবটা ব দাম একটু কমতি হলে বাবা-মা-বা তাঁদের যৌবনোচ্ছল ছেলে-মেযের ওপব টেস্ট করে দেখতে পারেন। তখনই বুঝতে পারা যাবে, ছেলেকে দেওয়া ইলেকট্রিক বিলের টাকাটা আসলে মৌমিতা-কে চাউমিন খাওযাতে খরচ হয়েছে কিনা বা সুনন্দা কলেজে একস্ট্রা ক্লাশ না কবে বোঁচাদা-ব সঙ্গে মযদানে বেড়ু করতে গেছিল কিনা।

সাদা পোশাকে থাকি বলে শেষে আমাকেই!!..

ওগো পুলিশোত্তমা!

কলকাতা পুলিশ আর কোনো কাজের কাজ করে দেখাতে না পারুক, দাঙ্গা-মিছিল ঠেকাতে গিয়ে নিধিরাম সর্দারের মতো নিজেরাই ইট-পাটকেল খেযে হাসপাতাল-সই হোক, উর্দিপরা মহিলা, মাফ কববেন, যুবতী কনস্টেবল এবং ইন্সপেক্টররা ইদানীং সকলেব নজব (এবং মন) হরণ করতে শুরু করেছেন। সেই অকৃত্রিম, মাথাকে ১৮০° ঘুবিয়ে দেওযা জোড়া ভুরু, বাঁকানো চাউনি, ঠোঁটজোড়াতে চোরাগোপ্তা হাসি, হাঁসের মতো কটিদেশ এদিক-সেদিক দোলানো, মিষ্টি কবে 'অসভ্য' বা 'দুষ্টু' বলা—শুধু পরনের খাকি পোশাক, হাতেব লাঠি আব কোমবের রিভলবারই সাবধান কবে দেয—খববদার, এদিকে নজব একদম নয় বাপু। তবে খিদিবপুরের ভূকৈলাশ রোডে রোমিও ছোকবা ছোট্‌কা এসব উর্দি আর চেম্বারকে থোড়াই কেযার কবে। তাই সে ডিউটিরতা পুলিশোত্তমার দিকে শুধু নেকনজবই দেয়নি, সেই 'থানেদাব মিস'কে একটা কিস উপহাব দিযে তবে ছেড়েছে।

ভূকৈলাশ রোডেব রাজবাড়িতে মেলার ধুমধাম। বেশ কযেকজন সুন্দরী পুলিশ-প্রমীলা সেখানে তক্কে তক্কে ছিলেন—ইভ-টিজাব চ্যাংড়া ছেলে দেখলেই দুটো থাপ্পড় আর রুলের গুঁতো দিযে ভ্যানে চালান করে দেবেন। হঠাৎই ঘটল ঘটনাটা। ভুঁইফোঁড়ের মতো প্রেমিক পুরুষ ছোট্‌কাব আবির্ভাব অকুস্থলে। সামনে সাদা পোশাকে থাকা লেডি কনস্টেবলটি কিছু বোঝার আগেই বলিউডি কায়দায তেনাকে জাপটে ধবে চুমু খেল মজনু ছোট্‌কা। অবশ্য ছোট্‌কার বরাত পোড়া। ইভ-টিজারকে পাকড়াও করতে এসে নিজেই এভাবে 'টিজ্‌ড্‌' হযে যাবে এতটা বোধহয ভাবা হযনি পুলিশ মিসদের। তাই ছোট্‌কাসোনাকে কোমরে দড়ি বেঁধে আদালতে পেশ কবা হল। মহব্বতের ফোর্সটাই বেশি। জামিন পেতে দেরি হযনি ছোট্‌কার। লালবাজাবেব পুলিশকর্তাবা মুখ কালো কবে বলছেন—ছোট্‌কার পেটে নিশ্চযই লাল জল ছিল। তবে কর্মক্ষেত্রে মহিলা পুলিশকে এভাবে 'মেহ্‌বুবা' বানানোর ঘটনায পুলিশের থোঁতা মুখ যে আবো ভোঁতা হযে গেছে, এতে তাঁবা দ্বিমত নন।

—কৌশিক রায়

রাশি চক্কোর

জ্যোতিষসাম্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

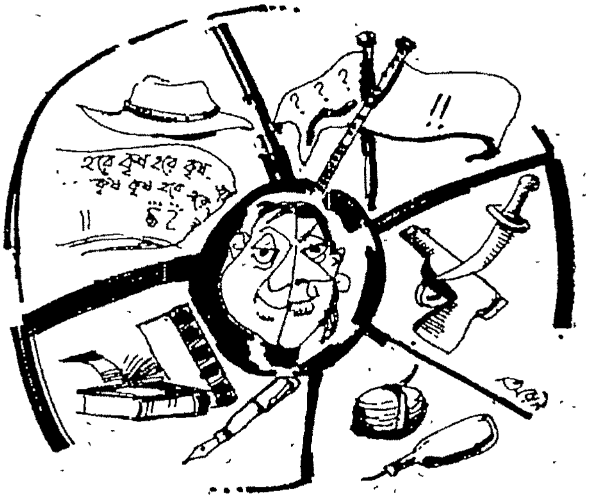

নেতা মোড়ল রাশি : মাসটি আপনার পক্ষে শুভই। গণপিটুনিতে নিহতের দায় মাথার ওপর নিয়ে শ্বশুরবাড়ির ঘানি ঘোরাতে পারেন। ফলত দলীয় বিরোধী গোষ্ঠীর গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে আপাতত মুক্তি।

দাদা মোড়ল রাশি: পাড়ার দাদারা সাবধান। এই মাসে পাড়ার দিদিমনিদের নয়নবাণে আপনাদের বোমা-পিস্তল ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। ফলত নিজ কর্তব্যে অবহেলা এবং প্রেমের জাল থেকে সোজা পুলিশের জালে আটক। পরে অবশ্য জেনে সুখী হবেন—দিদিদের কেস ছিল নিতান্তই নাটক।

কবি মোড়ল রাশি: কেউ মানে না শ্রেষ্ঠ কবি বলে? তো চলে যান নন্দন-আকাদেমি-সদন চত্বরে। দৃষ্টি রাখুন উদাস, চুল উস্কোখুস্কো। মধ্যে মধ্যে নয়ন নিমীলিত। হ্যাঁ, দিন কুড়ি এমনটি করলে বেশ বুঝতে পারবেন যে কেউ মানুক না মানুক আপনি অত্যন্ত উঁচু মানের কবি হয়ে উঠেছেন। শুভফল পেতে বাম হস্তে ডায়েরি ও দক্ষিণ হস্তে কলম ধারণ করুন। অবশ্য যদি এরি মধ্যে আপনার একক কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে বস্তে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হবে—বাম হস্তে ব্যাণ্ডেজ ও দক্ষিণ হস্তে কাটা-ছেঁড়ার মলম।

ধর্ম মোড়ল রাশি : যাঁরা ধর্মাচরণ করেন, তাঁদের দশায় হেরফের নেই। তবে যাঁরা ধর্মের নামে পশু হতে ভালোবাসেন, তাঁদের পক্ষে মাসটা মিশ্র। মন্দর মধ্যে বিজাতীয়ের বাড়ি ভেবে নিজের আত্মীয়ে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে ফেলতে পারেন এবং ভালোর মধ্যে আপনার নিকটাত্মীয়া এই কাজে খুশি হয়ে আপনার মুখে জ্বলন্ত কাঠের টুকরো চেপে ধরলে আপনি বীর হনুমানের রূপপ্রাপ্ত হতে পারেন।

গায়ক মোড়ল রাশি: গাঁ মানবে না মানে? গাঁয়ের বাবা মানবে। গাঁয়ের মা মানবে। গলা সাধা শুরু করুন রাত সাড়ে দশটায়, থামবেন ভোর তিনটের আগে নয়। হ্যাঁ, এই মাসের মধ্যেই মানপত্র সহ অনিদ্রাকাতর পল্লীবাসী আপনার দরজায় হাজির হবে এই বলে—"তোর চে বড় শিল্পী দুনিয়ায় আর নেই, নতুন করে আর গলা সাধা কেন?" তবে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আপনার কাঙ্খিতা প্রেমিকার পাড়া ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

একটি সুখদায়ক বিজ্ঞপ্তি

বিগত জুন ২০০১—"চলচ্চিত্র চচ্চড়ি' সংখ্যায় সম্পাদক আবেদন করেছিলেন, যাঁরা মনে করেন, এই পত্রিকার বক্তব্য তাঁদেরই মনের কথা, তাঁরা এগিয়ে আসুন সাধ্যমতো আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে। না না, ভিক্ষা নয়, পত্রপাঠ-এর মালিকানায় অংশ নিন—এই ছি আবেদন। যে পরিমাণ সাড়া আমরা পেয়েছি, তাতে টাকা-পয়সা রাখার জায়গা নেই আর। হ্যাঁ, এবার বরঞ্চ বলা যাক, যাঁরা মনে করেন এই পত্রিকার বক্তব্য তাঁদেরই মনের কথা, তাঁরা টাকা-পয়সা নিতে রাজি কি? তবে যোগাযোগ করুন সম্পাদকের সঙ্গে। কী, এবার নিশ্চয় বেশ উৎসাহ পাচ্ছেন, কি বলেন? আপনার পদধূলির প্রতীক্ষায় রইলাম।।

—সম্পাদক

নায়ক মোড়ল রাশি: পাড়ার মঞ্চে নাটকে 'জনতার একজন' চরিত্রে অভিনয় যোগ। পরপ্রভাতে 'মাটিতে পা পড়ে না' যোগ। তৎপরে 'ম্যানহোল কিংবা খানাখন্দ' যোগ। তৎপরে 'হাসপাতাল' যোগ।

সম্পাদক মোড়ল রাশি: খুবই ভালো সময় আপনার। হরদম এর-ওর পেছনে কাঠি মারার সুফল এ মাসেই পাবেন। কাঠির বদলে লাঠি। একেবারে মাথার ওপর। তবে সঠিক অনুমান শক্তিতে ঠিক সময়ে মাথাটি সরিয়ে নেবেন। আর তখনই পত্রিকা-প্রকাশকের সঙ্গে মাথায় মাথায় ঠকাস্। তারপর সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়ে উভয়কে....নতুন উদ্যমে . একই পত্রিকায় মোড়লিয়ানার চূড়ান্ত।

শিল্পী মোড়ল রাশি: যাঁরা সহজ জিনিসকে পেঁচিয়ে জিলিপি করে আঁকতে চান, অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ আঁকাটি আঁকবেন। স্ত্রী ভাববেন—তাঁকে উদ্দেশ্য করে আঁকা ছাগল, বন্ধু ভাববেন তাঁর বাঁদর সংস্করণ, বাবা ভাববেন তাঁকেই শকুন বানানো হয়েছে, মা ভাববেন তাঁর তাড়কা রাক্ষসী প্রতিমূর্তি . ইত্যাকার ভাবনার বহিঃপ্রকাশ যেরূপ উচ্চনাদে আপনার ওপর বর্ষিত হবে—আপনি নিজেই আপ্লুত হয়ে যাবেন আপনার ছবির মাল্টিপারপাস ডাইমেনশান দেখে। তবে কিঞ্চিৎ ব্যয়যোগ আছে। নতুন উৎসাহে পরবর্তী ছবি আঁকতে গিয়ে দেখবেন রং-তুলিগুলির উনুন অথবা নর্দমা প্রাপ্তি হয়েছে।

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

তেনারা আছেন, থাকবেন

ভদ্রলোক একগাল হেসে পাশে বসা সুন্দরীকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, ‘আমার পরিবার।’

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা নিচু গলায় প্রতিবাদ করলেন, ‘অদ্ভুত।’

ভদ্রলোক সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বললেন, ‘মাই ওয়াইফ।’

ভদ্রমহিলা এবার আমার দিকে তাকালেন, ‘উনি আমার স্বামী।’

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলালেন, ‘ওই হল আর কি।’

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, ‘না। হল না। এক হয় না।’

বুঝলাম ভদ্রলোকের অস্তিত্ব বেশ বিপন্ন। এই আমার আমার করার অভ্যেসটা না পারছেন শেষপর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে না পারছেন ছাড়তে।

পৃথিবীতে যত লোক জন্মায় তার অধিকাংশই পেছনের দিকে থাকা পছন্দ করে। বরন্ লিডার বা জন্মমাত্র নেতা হন কেউ কেউ। এই নেতৃত্বকে সমালোচনা করার পেছনে একধরনের আনন্দ আছে। নিজের কিছু হারাচ্ছে না কিন্তু গালাগাল দিয়ে সুখ পাচ্ছি। নেতা হতে গেলে গালাগাল খেতেই হবে। গান্ধীজির মতো বড় নেতা ভারতবর্ষে জন্মায়নি। অথচ ষাট দশক থেকে সিনেমাহলের ডকুমেন্টারিতে গান্ধীজির ছবি দেখালেই তারস্বরে পাবলিক বিদ্রূপ করত। অনেক বৃদ্ধ বলেছেন, ‘এই গান্ধীর জন্যে দেশটার বারোটা বেজে গেল। ব্রিটিশ আমলে বেশ ভালো ছিলাম আমরা।

কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের নেতা হওয়ার খুব শখ। যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে তাঁদের জিভ সুড়সুড় করে। লোকে তাদের সামনে তোল্লা দেয় পেছনে উপহাস। এঁদেরই বলা হয় গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

এখন সেই গাঁ নেই, মোড়লও নেই। যদি পঞ্চায়েত প্রধানকে মোড়ল বলা যায় তবে তাঁকে ওই পদে আসতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। ওই পদে বসতে হলে তাঁকে পেতে হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের সমর্থন। আর এখানেই তাঁর রক্ষাকবচ। চাও বা না চাও তোমাকে তাঁর কর্তৃত্ব মানতে হবেই নইলে পার্টি তোমাকে একঘরে করে ছাড়বে।

তবে যে দল ক্ষমতায় থাকে না তার নেতাদের আচার আচরণ ওই মোড়লের মতো। যদিও গ্রামটা দেশ হয়ে যায়। লক্ষ্য করবেন, এক একজন ক্ষমতাহীন নেতা যে যার নিজের মতো চিৎকার করে চলেছেন। কেউ তাঁর কথা শুনছে না, শুনুক তাও তিনি চান না, কিন্তু চিৎকার না করলে লোকে যদি তাঁকে ভুলে যায় তাই তাঁকে চ্যাঁচাতেই হবে। ধরা যাক, মুর্খ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত নিলেন, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কাউকে পশ্চিমবাংলায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। অমনি এই নেতারা চ্যাঁচাতে আরম্ভ করবেন। ‘মানবতা বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী নিপাত যাক। নির্যাতিত হয়ে যারা এদেশে আসছে তাঁদের বাঁচার সুযোগ কেড়ে নেওয়া চলবে না।’ এরপর মুখ্যমন্ত্রী যদি সিদ্ধান্ত বদলান, তাহলে এঁরাই আন্দোলনে নামবেন, ‘বেআইনি বিদেশিদের এনে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজানো চলবে না। অনুপ্রবেশকারী আনা হচ্ছে ভোটের জন্যে। চলবে না, চলবে না।’

আজ, স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরে দেশের মানুষ বুঝে গেছে যে রাজনৈতিক নেতারা যা বলেন তা শুনতে নেই। এঁরা যা করার করে যাবেন, আমাদের দিনদিন আরও খারাপ অবস্থার সামনে পড়তে হবে। এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। ওঁরা মোড়লি করে যান, আমরাও না মেনে বসে থাকি। তবে একথা ঠিক, লোকে মানুক বা না মানুক মোড়লি করার সবচেয়ে ভালো রাস্তা হল রাজনীতি করা।

রাজনীতিতে কোটি কোটি টাকার খেলা আছে, তাই মোড়লি করার চেষ্টা থাকবেই। কিন্তু সামান্য টাকা বরাদ্দ, একটু সংস্কৃতির ছাপ আছে—এমন সব সংগঠনে ঢুকে পড়ে মোড়লি করার চেষ্টা তো অবিরত চলছে।

একজন প্রথম যৌবনে ভালো নাটক করার জন্যে চেষ্টা করেছেন। দু-তিনটে প্রযোজনা নামও করেছিল। তখন তিনি বামফ্রন্টের হয়ে রাস্তায় নামলেন পথ-নাটক করতে। ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর তিনি কাকুতি মিনতি করে একটা সরকারি ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দল উঠে গেছে। একে ওকে টেনে এনে নতুন নাটক নামাতে গিয়ে বুঝেছেন ওটা নাটক হচ্ছে না। অথচ তাঁর বেঁচে থাকতে হলে টাকার দরকার। আবার পথ-নাটকে নেমে গেলেন। এবার পুরস্কার হিসেবে পেয়ে গেলেন সরকারি-নাট্যউপদেষ্টার পদ, যার মাসমাইনে বেশ ভালো। এখন তাঁর দল উঠে গেছে। কিন্তু যে কোনো সেমিনারে, টিভিতে নাটক নিয়ে আলোচনা হলেই তাঁকে গম্ভীর গলায় কথা বলতে দেখা যায়। নাট্যকর্মীদের অত্যন্ত অপছন্দের এই নেতার তাতে কিছু এসে যায় না। সরকারের প্রীতি পাওয়ায় তিনি নাট্য বিষয়ক মোড়লি চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের মাস্টারমশাই নারায়ণ গাঙ্গুলির একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি নিজে শেষ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু তাঁর বড় পরিচয় ছিল ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকার হিসেবে। শেষ লেখা ‘সুনন্দর জার্নাল’ যে আলোড়ন তুলেছিল তা আজও মনে আছে। নারায়ণবাবু বলেছিলেন; ‘পত্র পত্রিকায় বই-এর সমালোচনা যাঁরা লেখেন তাঁদের অধিকাংশই অধ্যাপক। খোঁজ নিলে জানতে পারবে এঁদের সকলেরই গল্প লেখার বাসনা ছিল। সেগুলো হালে পানি পাচ্ছে না দেখে সমালোচক হয়ে গেছেন এক একজন। এখন এঁদের রায় আমাদের মানতে হবে।’ মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে তর্ক করে উদাহরণ দিয়েছিলাম, যিনি কখনো জলে নামেননি তিনি বিখ্যাত সাঁতারের

কোচ হয়েছেন। অবশ্য এরকম উদাহরণ খুব কম। আমাকে লেখক হতে দিল না, দাও ব্যাটার বারোটা বাজিয়ে—এই মানসিকতা নিয়ে কলম ধরতে অনেককে দেখেছি। ক্রমশ এঁদের কেউ কেউ সাহিত্যের মোড়ল হয়ে যান। এঁদের কাছে না পৌঁছতে পারলে তরুণ লেখকদের সম্পর্কে এক কলমও লেখা হবে না। সেদিন এরকম একজনেব লেখায় প্রসঙ্গ ছাড়াই এক তরুণ লেখক সম্পর্কে সুখ্যাতি পড়লাম। পরে জানলাম বেচারা তরুণ লেখক কলকাতা থেকে ট্রেন ধরে নকুড়ের সন্দেশ কিনে নিয়ে প্রণামী দিয়ে এসেছিল ওই মোড়লকে। আমাদের কপাল ভালো, এই মোড়লি বাঙালি পাঠক আদৌ আমল দেন না। সমালোচনা পড়ে বই কেনেন না তাঁরা।

সেদিন টিভিতে বাংলা সাহিত্যের হালচাল নিয়ে একটা আলোচনা সভা বসেছিল। ছিলেন একজন অধ্যাপক যিনি গল্প লেখার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সমালোচক হয়েছেন, একজন প্রকাশক আর লেখক হিসেবে যিনি ছিলেন তাঁকে আমি গত ছত্রিশ বছর ধরে দেখে আসছি। এই ভদ্রলোক বাকি দু'জনকে কথা বলতে দিচ্ছিলেন না, এমনকি অধ্যাপককেও নয়। সত্তরে পৌঁছে যাওয়া এই লেখক সারাজীবন গোটা চারেক ভালো গল্প লিখেছিলেন, তাও পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে। বাকিগুলো তাঁর অবদমিত আকাঙ্খার ক্ষিপ্ত প্রকাশ। সরাসরি পর্ণোগ্রাফি লেখেননি কিন্তু যৌনতার গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া লেখা না লিখলে শান্তি পেতেন না। ক্রমশ তাঁর সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গ ত্যাগ করে জুনিয়র লেখকদের দাদা হলেন, তারপর তাদেরও কমবয়সীদের অভিভাবক বনে গেলেন। চার দশক ধরে এই চালিয়ে যাচ্ছেন যিনি তাঁকে নিরানব্বই ভাগ বাঙালি পাঠক চেনেন না। কিন্তু তিনি এখন তাত্ত্বিক দাদা। টিভিতে শুনলাম, 'লিখছে? কে লিখছে? ওগুলো লেখা বলে নাকি। হ্যাক্।' 'না মশাই, আমাকে বলতে দিন। বাংলা সাহিত্যে শেষ কথা বলে গেছি আমরা। এই যে আমরা বললুম, কোন আমরা। আমার সঙ্গে যারা শুরু করেছিল তাদের কেউ কেউ বড় গাছে নৌকো বেঁধে দিব্যি টাকা পয়সা মদ মেয়েমানুষ নিয়ে রসেবশে আছে। তাদের হাত দিয়ে এখন যে লেখা বের হচ্ছে তা বেল্লাকোবা গ্রামের কালীচরণ মুদির লিস্টির চেয়ে খুব বেশি দামি নয়। হে হে হে। এটা টিভি মিডিয়া, তবু বলি, এখন কোনো বৃক্ষ তো দূরের কথা, তরু পর্যন্ত নেই। এখন সব ভ্যারেণ্ডা গাছ।' এসব কথা বলে টিভি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় প্রতীক্ষারতা এক কুড়ি-একুশের বোকা-বোকা যুবতীকে বলবেন, 'ভরদুপুরে মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ বলে মনে হয় না।' যুবতী ফিক্ করে হেসে মুখ ফেরাবে, 'কি মনে হয়?'

'কলাগাছ। ছাড়িয়ে যাও আর ছাড়িয়ে যাও, নাই রস নাই।' তিনি হাসলেন, 'আজ শালাদের যা এক হাত নিয়েছি না। চলো একটা চায়ের দোকানে বসি।'

এই মানুষটি একজন মোড়ল। নির্বিচারে-মোড়লি করে যাচ্ছেন।

আর এক ধরনের মানুষকে মোড়ল করে দেওয়া হয়। এবারের বইমেলায় লেখক-পাঠক-মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমার নাম ছিল না। বছর কুড়ি ধবে বসে দেখেছি প্রশ্নগুলো প্রায় একই বকমের। তবু লিস্টটা দেখলাম। তার মধ্যে কয়েকটা আধচেনা নাম আর একটি সম্পূর্ণ অচেনা নাম পেতে উদ্যোক্তাদেব জিজ্ঞাসা কবলাম, 'ইনি কে?' উত্তর হল, 'লেখেন।' 'কি লেখেন?' সেটা সঠিক জানে না কেউ। কেন তালিকায় নাম উঠল তার দায় এ ওব ওপর চাপাচ্ছে। শেষপর্যন্ত জানা গেল একটি বিশাল সংস্থা প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকার বই কেনেন। এই ভদ্রলোক সেই কেনার দায়িত্বে। একটু আধটু শখ আছে লেখালেখির। তাঁকে সন্তুষ্ট করতেই ওই আসরে বিখ্যাতদের পাশে বসানো হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন ওঁর কোনো লেখা পাঠকরা পড়েননি অতএব প্রশ্ন কববেন কি করে, তাহলে ভুল ভাবা হবে। পাঠকদের হয়ে প্রশ্ন লেখা হয়ে গেছে। তা মাইকের সামনে পড়া হল, 'রহস্য উপন্যাস বলতে আপনি কি বোঝেন?' অথবা, 'কল্প বিজ্ঞানেব ভবিষ্যৎ কি?' ইনি তার জবাব দিলেন। কেউ ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মালটা কে রে?' উত্তর হল, 'কোনো মোড়ল হবে হয়ত।' কিন্তু এর মোড়লি প্রকাশকরা মানতে বাধ্য। গাঁ মানুক বা না মানুক।

কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের নেতা হওয়ার খুব শখ। যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে তাঁদের জিভ সুড়সুড় করে। লোকে তাদের সামনে তোল্লা দেয় পেছনে উপহাস। এঁদেরই বলা হয় গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

এই আমি, আমিই বা কম মোড়লি করছি কোথায়? 'পত্রপাঠ'-এ লেখা শুরু করার আগে 'দেশ'-এর পাতায় কী দরকার ছিল একে ওকে যেচে গালাগাল দেওয়ার? দিয়ে কী লাভ হল? আপনারা ভাবলেন, বেটা মোড়লি করছে অথচ কেউ মানছে না। তবে একটা সান্ত্বনা আছে। সেটা জেনেছিলাম বাংলা ছবির একটা সংলাপে। বছর পঁয়তাল্লিশ আগে দেখা ছবিতে সংলাপ ছিল, 'চরকায় তেল দেওয়া যার স্বভাব সে নিজের চরকা পরের চরকা বিচার কবে না, চরকা পেলেই তেল দেয়।'

একটু পাল্টে আমি বলতে পারি, 'মোড়লি করা যার স্বভাব সে স্থান কাল পাত্র বিচার করে না। চান্স পেলেই মোড়লি করে।'

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়

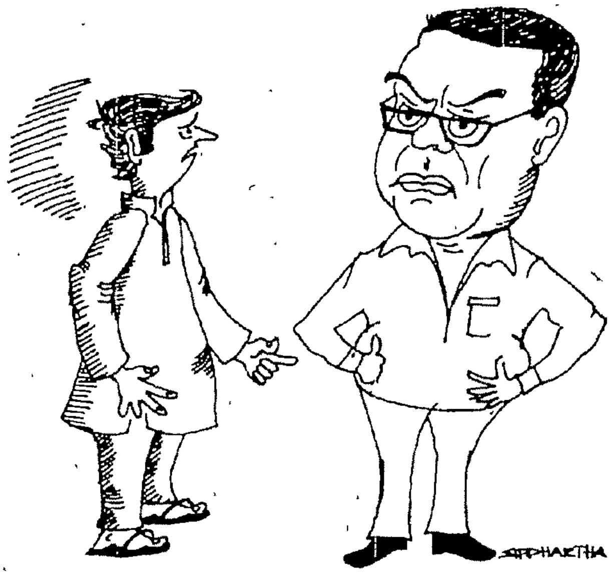

ভাবছি এই সংখ্যাটাও বৃথা গেল। গঙ্গামণি অথবা গঙ্গারানীর সাথে আপনাদের পরিচয় করানো এখনো হল না।

আগের বার বলেছিলাম—গঙ্গারামের স্ত্রী-র সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। গঙ্গারামের স্ত্রীর নাম ইতিপূর্বে আগে কোথাও কোথাও গঙ্গামণি, আবার কোথাও কোথাও গঙ্গারানী লিখেছি। এটা অবশ্য গঙ্গারামের সঙ্গে মানানোর জন্যে। বানানো নাম। কারণ একালে কোনো মেয়ের, যে কিনা দক্ষিণ কলকাতায় বড় হয়েছে, লেখাপড়া করেছে সাউথ পয়েন্টে, যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ে, তার নাম হওয়া উচিত অর্পিতা কিংবা রাইমা। অন্ততপক্ষে নেহা বা কঙ্কনা।

আমরা কিন্তু কাহিনীর সুবিধার্থে গঙ্গারামের স্ত্রীকে গঙ্গামণি বলেই ডাকব।

সেদিন গঙ্গারাম এসেছে। তাকে বললাম,—তোমার স্ত্রী-র বিষয়ে কিছু লিখতে হচ্ছে। কি লিখব, বলো।

গঙ্গারাম বলল,—দাঁড়ান, আপনার বউমাকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

গঙ্গারাম আমার ফোন তুলে বাড়িতে ফোন করল। ওপারে ফোন বাজতে গঙ্গারাম 'হ্যালো' বলে জিজ্ঞাসা করল,—তেত্রিশ, চৌত্রিশ, একশ?

ও প্রান্ত থেকে কি বলল, আমি শুনতে পেলাম না। গঙ্গারাম ধুত্তোর বলে ফোন নামিয়ে রাখল।

আমি জানতে চাইলাম,—কি ব্যাপার?

গঙ্গারাম বলল,—ব্যাপার গোলমেলে। আমি বউয়ের গলা স্পষ্ট শুনলাম। কিন্তু ফোনের নম্বর মিলল না।

আমি বললাম,—তুমি তো কি একটা নম্বর বললে—তেত্রিশ চৌত্রিশ একশ। ওপারে কি বলল?

গঙ্গারাম বলল,—আমি যতবার জিজ্ঞেস করছি তেত্রিশ চৌত্রিশ একশ কিনা—ওপাশ থেকে বলছে তিনশ তেত্রিশ চারহাজার একশ।

আমি মনে মনে সংখ্যা দুটো মিলিয়ে দেখলাম। তারপর গঙ্গারামকে বললাম,—আমার তো মনে হচ্ছে দু'টো একই নম্বর।

গঙ্গারাম চটে গিয়ে বলল,—এসব কঠিন অঙ্কের ব্যাপার। আপনি কিছু বোঝেন না।

আমি বললাম,—কি রকম?

গঙ্গারাম বলল,—এই তো গত রোববার সকালে বললেন—কলকাতা থেকে ঢাকা যতটা দূর, ঢাকা থেকে কলকাতার দূরত্ব ঠিক ততটাই।

আমি বললাম,—সে তো বটেই। একথা তো সবাই বলবে।

গঙ্গারাম চটে গেল। রেগে বলল,—সবাই বলবে? সবাই-এর বলার প্রয়োজন কি? আপনি ভেবে দেখুন একবার, "রোববার থেকে বিষ্যুদবার যতদূর, বিষ্যুদবার থেকে রোববার কি ততদূর?"

আমি আর কি ভাবব? ভাবছি এই সংখ্যাটাও বৃথা গেল। গঙ্গামণি অথবা গঙ্গারানীর সাথে আপনাদের পরিচয় করানো এখনো হল না।

রাষ্ট্র সংঘের মহাসচিবরা তো অনেকেই এলেন গেলেন। সেইসব আয়ারাম গয়ারামদের মোড়লি মেনে চলতে বয়েই গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যান্য দাদা স্থানীয় সদস্য রাষ্ট্রের।

মোড়লবাজির বিড়ম্বনা

কৌশিক রায়

গাঁয়ে না মানলেও নিজেকে মোড়ল ভাবার এবং ভেবে ল্যাজে-গোবরে হওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে। খ্রিস্টানরা একবার গোঁ ধরে বসল—জেরুজালেম একমাত্র তেনাদেরই যখের ধন। ঈশ্বরের আদরের ছেলে যিশু, ইজরায়েলের ওই শহরেই গোরুর জাব দেওয়ার পাত্রে জন্ম নিয়েছিলেন। মুসলমানরাই বা ছেড়ে দেবে কেন! জেরুজালেম কি কেরেস্তানদের বাপ-ঠাকুর্দার জবরদখল সম্পত্তি নাকি? উঁহু, ওটি হচ্ছে না। পয়গম্বর মহম্মদ ওইখানেই তাঁর মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসেছিলেন। এই তাল ঠোকাঠুকির মধ্যে দিয়েই গোটা ইউরোপ আর এশিয়া জুড়ে শুরু হল 'ক্রুসেড'-এর দাপাদাপি। ভদ্রসভ্য ভাষায় যাকে বলে 'ধর্মযুদ্ধ'। মুসলিম সুলতান সালাদিনের ডাঁট ভেঙে দিতে ইংলণ্ডের প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশের জাঁহাবাজ সম্রাট সিংহহৃদয় রিচার্ড তো মধ্যপ্রাচ্যে তাঁর বিশ্বস্ত নাইটদের নিয়ে রে-রে করে ধেয়ে গেলেন। ইংলণ্ডের সিংহাসনে গ্যাঁট হয়ে বসলেন রিচার্ডের ধনুর্ধর ছোটভাই জন। বউ-ন্যাওটা বুড়ো দশরথের মুখের কথায় রামচন্দ্র বনবাসে গেলে ভরত দাদার খড়মকে সিংহাসনে বসিয়ে কতটা মোড়লগিরি করেছিলেন সেটা অতটা জানাননি বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস কেউই। তবে এই হাড়বজ্জাত জন রাজার খবরদারিতে নাওয়া-খাওয়া একেবারে শিকেয় উঠল ইংলণ্ডের আমজনতার। কী দাদার কী ভাই!

জনের যাবতীয় মোড়লগিরি ছিল অভিজাত ফরাসি নর্ম্যানদের দ্বারা পদদলিত অ্যাংলো স্যাক্সন জাতটার ওপর। জনের বদমায়েসিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁকে টুঁটিটি চেপে কবরে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্রত নিলেন স্যাক্সনদের মুক্তিদাতা বীর শেরউড বনের রবিনহুড। গরিবের বন্ধু এই অসম সাহসিক যোদ্ধাকে অসামাজিক বলে ঘোষণা করেছিল শাসকগোষ্ঠী। এহেন রবিনহুড এবং তাঁর অকুতোভয় সাথী লিট্‌ল জন, ফ্রায়ার টাক, ওয়াট আর উইল স্কারলেট-এর হাতে নাকদম হয়ে রাজা জন আর তাঁর তোষামুদেরা বুঝতে পারল, নিধিরাম সর্দার হয়ে একটা বিপ্লবী জাতির ওপর দালালি করতে যাওয়াটা কতটা বিপদের।

ঠিক একই ভাবে মার্কিন মুলুকের ফ্লোরিডা, টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকোতে স্পেনীয়দের ওপর মোড়লবাজি শুরু করেছিলেন গভর্নর রাফায়েল মন্‌তেরো। হালে পানি পাননি তিনি। মন্‌তেরোকে আলুভাতে বানাতে স্পেনীয়রা পেয়েছিলেন তাঁদের পরিত্রাতাকে—তলোয়ারবাজ জোরো। "রাজা করেন তম্বিতম্বা/ মন্ত্রীমশাই কিসে কম্‌ বা। সবখানেতেই অষ্টরম্ভা"—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গুপী-বাঘা হাল্লা আর শুণ্ডির রাজাদের কাছে গিয়ে বুঝতে পেরেছিল, বজ্জা-গজ্জা আর তেনাদের শেয়ালপণ্ডিত উজির-মন্ত্রীরা যতই হাঁকডাক করুক না কেন, সাধারণে বুঝে গেছে যে একটা বেগুন বা ট্যাঁড়শের যোগ্যতাও ওইসব মান্যগণ্যদের নেই।

'মুখেন মারিতং জগৎ' জগত রাজপুরুষদের দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের ইতিহাসেও। পলাশির আমবাগানে রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে সিরাজের গদি উল্টে দিলেন মীরজাফর। এদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সাগরপারের ঘোড়েল বেনেদের আড্ডাখানা। তাদের প্রতিনিধি হয়ে ক্লাইভ বাংলার মসনদে বসলে ব্রিটিশ সিংহ বেগড়বাঁই করতে পারে। সুতরাং অগতির গতি সাদা চামড়ার বেনেদের গাধা মীরজাফরকেই রাজসিংহাসনে দেখনহাসি নবাব করে বসানো হল। চেনে বাঁধা বুলডগের মতো মীরজাফরও ঘেউ ঘেউ করে সবাইকে জানাতে চাইলেন, বাংলার সব ক্ষমতার ব্লু প্রিন্ট তাঁরই হাতে। ততদিনে ব্রিটিশদের হাতে সর্বস্বান্ত হয়ে বাংলার মানুষ বুঝে গেছে—মীরজাফরের এই মোড়লিয়ানার দৌড় কতটুকু। তাই মীরজাফরকে সরিয়ে তার জামাই মীরকাশেমকেই বসানো হল বাংলার মসনদে। ক্লাইভও তখন মীরজাফরের দিকে আর দয়ার কুটি ছুঁড়ছে না। হামবড়া ভাব দেখাতে গিয়ে মীরজাফরের তখন মুর্শিদাবাদের মাঠে-ঘাটে ঘুরে ফ্যা-ফ্যা করে চোখ ওলটানোর দশা। যে জগৎ শেঠ, শওকত জঙ্গ, ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদেরা সিরাজকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মীরজাফরের ফাঁপা ঢাকে কাঠি দিয়েছিলেন,

তাঁরা আর মীরজাফরকে চেখে উল্টেও একবার দেখলেন না।

একই অবস্থা হয়েছিল কর্ণাটকের নবাব আনওয়াব উদ্দিন আর চান্দা সাহিবের। ভারতের বাণিজ্যের দখলদারি নিয়ে ফরাসি সেনাপতি দুপ্লে এবং রবার্ট ক্লাইভেব মধ্যে চুলোচুলি গোলাগুলির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সময় চান্দা সাহিব আব কর্ণাটকের নবাব ভাব দেখালেন, তাঁরাই যেন যুদ্ধেব মূল কারণ। এর পর তাঁদের নামই ইতিহাসে আর খুঁজে পাওযা যাযনি।

হাত পা খেলিয়ে একটা মোড়লগিরি করাব আদর্শ জাযগা হল সমাজসেবা, নিদেনপক্ষে সমাজসংস্কার। বিভিন্ন সময়ে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো সমাজসংস্কার করতে গিয়ে একঘরেও হয়েছেন অনেকেই। রাজা রামমোহন রায়ের মাথায় একবার ঝোঁক চাপল বিধবা কুলীন মেয়ের বাহাত্তুরে বরগুলো পটল তুললে পরে হিঁদু শাস্তবের 'নিয়ম' অনুযাযী তাদেরও 'বুড়োদের সঙ্গে একই চিতেয় পুড়ে মরতে হত। তাহলেই 'সতী' হযে সগ্গে গিয়ে স্বামীদেবতার পদসেবা কবতে পারবে সেইসব মেযেবা। এই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে আদাজল খেয়ে লাগলেন রামমোহন। তখনই সতী-প্রথার বিরোধী রামমোহনের বিরুদ্ধে সারা বাংলা জুড়ে শুরু হল গোঁড়া হিন্দুদের হুঙ্কার। সাধারণ শুনুক না শুনুক, একেবারে কোমর বেঁধে বামমোহন বাযের বিরুদ্ধে নামলেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুব এবং অন্যান্য সমাজপতিরা। রামমোহন রায়কে 'ম্লেচ্ছ', 'কুলত্যাগী' ও 'সুরাই' মেলের কুল ইত্যাদি নানা মধুর সম্ভাযণে ভূষিত করা হল। অবশ্য রামমোহনের জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী। হিন্দুশাস্ত্রেব ধবজা তুলে, নানা উত্তেজক কথাবার্তা বলেও রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পাবেননি তাঁর বিরোধীরা।

একই অবস্থা হয়েছিল মধ্যযুগীর ইউবোপে। খ্রিস্টান দুনিয়ার তথাকথিত হেডমাস্টার পোপেব ভণ্ডামি ঘুচিয়ে দিয়ে যিশুর ধর্মমতকে সাধারণ মানুষের আরো বেশি কাছে নিয়ে এসেছিলেন প্রতিবাদী বা প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রবর্তক মার্টিন লুথার, জেসুইট ধর্মমতের গুরু ইগ্নেশিয়াস লযোলা এবং জন ক্যালভিন। মানুষেব টাকা-পয়সা শুষে নেওযা ঈশ্বরতন্ত্রের বিরুদ্ধে চাষীদের নিযে ইংলণ্ড এবং পূর্ব ইউরোপে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন জন বল ওয়াট টাইলর এবং জান হাস্। এঁদের কাজে বাগড়া দেওযার জন্য, এমনকি এঁদেরকে পরপারে পোস্ট করে দেওয়ার জন্যও মোড়লিয়ানা শুরু করেছিলেন বিলেতের রক্ষণশীল যুক্তি না-মানা হরিদাস পালেরা।

গোয়েন্দা সাহিত্য পড়তে চাইলে কলকাতা বইমেলার ধুলো খেয়ে লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কালবিয়োগ না করে খুঁজতে থাকি সত্যজিতের ফেলুদা আর স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্স-কে নিয়ে কোনো গপ্পো বেবলো কিনা। অস্বীকার করা যায় না যে রজনী সেন রোডেব চিলচক্ষু, কম কথা বলা, চারমিনার ফোঁকা প্রদোষ মিত্তির অথবা ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে দোস্ত ডাঃ ওযাটসনকে নিয়ে ঘাঁটি গাড়া মুখে পাইপ চেক্‌কাটা আলখাল্লা পরা ঈগল চোখের হোম্স নিঃসন্দেহে গপ্পের টিক্‌টিকিদের মধ্যে ওস্তাদ স্থানীয়। তবুও সত্য-সন্ধানীদের মধ্যে সামনে আসাব যোগ্যতা ছিল অনেকেরই। আফশোস্ এটাই—সব রকম গুণপনা থাকা সত্ত্বেও গোযেন্দাপ্রিয় পাঠকরা আরো বেশ কয়েকটি 'প্রাইভেট আই' চরিত্রকে তাঁদেব পছন্দের প্রথম তালিকাতে ঢুকতেই দিলেন না। জি কে চেস্টারটনের খ্রিস্টান ধর্মযাজক গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোয়েন্দা পরাশর বর্মা, অদ্রীশ বর্ধনের ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ও হেনরির টিক্-টক্ অথবা আশাপূর্ণা দেবীর ট্যাপা আর মদনাদের কেউ উল্টেই দেখল না। অপরাধ গপ্পেব পাটরানী আগাথা ক্রিস্টির পেয়ারের বেলজিযান ধোপদুরস্ত গোযেন্দা আরকুল পোয়ারোর সত্য সন্ধান এবং পাকানো বিশাল গোঁফজোড়াতেই মজে গেল সকলে। এদিকে, আগাথারই আরেক গোযেন্দা, খুড়ি, গোযেন্দানী, মিস্ জেন মার্পল-এর ক্ষুরধার বুদ্ধির তদন্তগুলো ছুঁযেই দেখলেন না কেউ। মিস্ মার্পলের জনপ্রিয়তা অবশ্য বহুদিন আগেই পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। তিনি যদি বাংলার প্রথম গোযেন্দানী কৃষ্ণা, পিটাব ও ডোনেলেব সৃষ্টি পরমা সুন্দরী গুপ্তচর মডেস্টি ব্লেইজ অথবা জেম্স্ হ্যাডলি চেজের লাস্যময়ী, পুরুষের মাথায় আইসব্যাগ ধবানো যৌবনবতী চপলা হতেন তাহলে হয়ত উঠতি ছেলে-মেয়েরা পোযারো ছেড়ে মার্পলকে নিযেই মেতে থাকত।

দু'নম্বর বিশ্বযুদ্ধেব পর দুনিয়াতে শান্তির বাণী শোনানোব জন্য তথা যুদ্ধবাজ দেশগুলোকে সাধু-সন্যাসী বানানোর জন্য একটা সং-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা বানানো হযেছে—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ। ১৯৪৫ সালেব পর থেকে রাষ্ট্রসংঘ পৃথিবীকে পবমাণু বোমামুক্ত করাব জন্য অনেক প্রকল্প হাতে নিলেও সেগুলো সবই রয়ে গেছে কাগজে-কলমে। রাষ্ট্র সংঘের মহাসচিববা তো অনেকেই এলেন গেলেন। সেইসব আযারাম গয়ারামদের মোড়লি মেনে চলতে বযেই গেছে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং অন্যান্য দাদা স্থানীয় সদস্য রাষ্ট্রের। ট্রিগ্‌ভি লি, ডাগ হামারশোল্ড, উ থাণ্ট, কুর্ট ওয়াল্ডহাইমরা কোনো না কোনো সময় রাষ্ট্রসংঘের সর্বাধিনাযকের চেয়ার আলো করেছেন। তবে, তাঁদেব খবরদারি করার ক্ষমতা অনেকটা ভাবতের রাষ্ট্রপতির মতনই। একেবাবে হাত-পা বিহীন ঠুঁটো জগন্নাথ। উ থাণ্ট, বার্মার বাসিন্দা হলেও তাঁব দেশে ন্যায্য গণতন্ত্রের আন্দোলনকে টুঁটি টিপে মাবা জঙ্গি একনাযকদের দমাতে পাবেননি একমাত্র মার্কিনিদের হস্তক্ষেপেব জন্যই।

লাতিন আমেরিকার নাগরিক হয়েও রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব, হাভিযেব পেরেজ দ্য কুইযার তাঁর দেশ পেরুতে অবাধে চলতে থাকা মাদক চোবাচালান এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে থোড়াই বন্ধ করতে পেরেছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের সুইডিশ মহাসচিব ডাগ হামারশোল্ড আফ্রিকার কঙ্গো রাজ্যে কাতাঙ্গা জেলাতে ভাড়াটে সৈন্যদের দৌরাত্ম্য থামাতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তাঁব এতটা মোড়লি বোধহয় সইতে পারেনি কাতাঙ্গা, তাই কঙ্গোব তৎকালীন রাজধানী লিওপোল্ডভিল থেকে উত্তর রোডেশিয়ার নদোলাতে পাড়ি দেওযাব পথে হামাবশোল্ড সহ প্লেনটি মাঝ আকাশেই বিস্ফোরিত হয। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, বালক আকবর পানিপথের দ্বিতীয যুদ্ধের পর গোঁফদাড়ি গজিয়ে যখন সম্রাট আকববে পবিণত হলেন, তখন তিনিও তাঁব অভিভাবক বৈরাম খানের অত্যধিক মোড়লি সইতে পারেননি। তাই মক্কা যাওয়ার পথেই গুপ্তঘাতকের সৌজন্যে বৈরামকে বেহেস্তে নামাজ আদাযেব জন্য পৌঁছে যেতে হয়। প্রাশিযাতে 'রক্ত ও লৌহ' কূটনীতি চালিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক তো কাইজার দ্বিতীয় ভিলহেল্‌মকে সিংহাসনে বসালেন। ব্যাস, ক্ষমতা পেয়েই নেমকহারাম ভিলহেলম্ বুড়ো বিসমার্কের সর্দারিকে ঘাড়টি ধরে আউট করে দিলেন।

মহাভাবতে সবচেয়ে অসহায এবং গোবেচারা বাজপুরুষটি হচ্ছেন কৌববজনক ধৃতরাষ্ট্র। দ্রৌপদীর শাড়ি ধরে টানাটানি কবা, পাশাখেলাতে চোট্টামি কবে পাণ্ডবদের হারিয়ে দিয়ে তাঁদেব ঘটিবাটি চাটি করে বনে পাঠানো, বাবণাবতে গালা দিয়ে তৈরি বাড়িতে পাণ্ডবদেব জ্যান্ত পুড়িয়ে মাবার চেষ্টা—কৌববরা যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছিল। হস্তিনাপুরের মোড়লমশাই ধৃতবাষ্ট্র তখন শুধু নামেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি জড়ভরত, গেঁটে বাতে পঙ্গু হযে যাওয়া বুড়োকর্তার মতোই অক্ষম। হালফিলে বাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নান-এর অবস্থা এই ধৃতরাষ্ট্রেবই মতো। প্যালেস্তিনিয়দের ঝাড়েবংশে উৎখাত করার জন্য ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন পি এল. ও. নেতা ইয়াসের আরাফতেব ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন। আফগানিস্তানে লাদেনের টিকি খুঁজে পাওযা তো দূর অস্ত্, আল কায়েদাব গেবিলা সেনারা আমেরিকানদের নাকদম করাচ্ছে। ইরাকের জাঁহাবাজ রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন কুর্দ জাতির মানুষদের গরু-ছাগলের মতো খেদিয়ে দিচ্ছে। আন্নান

অসহায়ভাবে সবকিছুই দেখে যাচ্ছেন। তাঁর কর্তৃত্বকে মেনে চলার দায় নেই কোনো দেশেরই। রাওয়াণ্ডা, বসনিয়া, কাবুল, হিরাট-এ সৈন্য পাঠিয়ে নির্বিচারে গোলাগুলি চালাচ্ছে 'ন্যাটো' সংস্থাটি। তবুও আন্নান পারছেন না ন্যাটোর মুরুব্বি জেভিয়ার সোলানাকে বুঝিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে নির্বিচারে নরহত্যা করা থেকে বিরত রাখতে।

আন্নানের মতো প্রায় একই অবস্থা গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত আলাবেনিয়ার স্বাধীনতাকামী মুসলিমদের নেতা ইব্রাহিম রুগোভা-র। অত্যাচারিত মুসলিম উদ্বাস্তুদের মানবিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য বহু পরিকল্পনা নিয়েছিলেন রুগোভা। তাঁর কথাকে নিছক ফাঁপা মোড়লিয়ানা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল বলকান উপদ্বীপের প্রায় সব মুসলমানই। দক্ষিণ আফ্রিকাতে রাষ্ট্রপতি এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলা এবং থাবো এম্বেকির কথামতোই চলে সবকিছু। তাঁদের ওপর ওলন্দাজ বুয়র এবং জুলু ইন্কাথা ফ্রিডম পার্টির নেতারা ইউজিন টেরিব্লান্শ ও মেনগিসিটু বুটুলেজি সর্দারি ফলাতে গিয়েছিলেন। এখন এই দু'জনের মাতব্বরিকে বহু আগেই দেশ থেকে বিদায় জানিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ। আফ্রিকার দুই নৃশংস একনায়ক—পূর্বতন জাইরের রাষ্ট্রপতি মোবুটু সেসে সিকো এবং উগাণ্ডার রাষ্ট্রপতি ইদি আমিন-এর প্রাণঘাতী অমানবিক মোড়লিয়ানাকে বেশিদিন মেনে নিতে পারেনি আফ্রিকাবাসীরা। তবে অন্ধকার এই মহাদেশের রাজনীতির মূল নীতিই হল—যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। লাইবেরিয়ার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি স্যামুয়েল ডো-কে হঠিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান চার্লস টেলর বেশ কিছুদিন হম্বিতম্বি করেছিলেন। অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি হোসে এদোয়ার্দো দস সান্তোস-এর ওপর ইদানীং খবরদারি শুরু করেছিলেন জোনাস সাভিম্বি, ইউনিটার সর্বেসর্বা। তবে হালে আর শেষমেষ পানি পাননি সাভিম্বি। তাঁর পেয়ারের লোকেরাই তাঁকে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আমজনতা না চাইলেও জিম্বাবোয়েতে প্রেসিডেন্টের চেয়ারটি পৈতৃক সম্পত্তির মতো বগলদাবা করে রেখেছেন রবার্ট মুগাবে। সাদা চামড়ার অবস্থাপন্ন চাষীদের খামারবাড়ি, জমি-জিরেত, গরু-বাছুর সবকিছু কেড়েকুড়ে নিচ্ছে মুগাবের প্রিয় পোষ্যরা। জিম্বাবোয়ের জনতাও গোমুখ্যু। গত নির্বাচনে মুগাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সবরকম শক্তি নিয়ে তাদের দরজায় ভোট চাইতে গিয়েছিলেন বিরোধী দল মুভমেণ্ট ফর ডেমোক্রেটিক চেঞ্জ-এর নেতা মর্গ্যান ত্সানগিরাই। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, মর্গ্যান-এর যুক্তিকে ফালতু মোড়লিয়ানা মনে করে তাঁকেই বদল করার সিদ্ধান্ত নিলেন জিম্বাবোয়েবাসীরা।

পায়ে হেঁটে গোটা চিন পাড়ি দিয়ে চেয়ারম্যান মাও সে তুং বেইজিং-এ নতুন সরকার বানান। মাও-এর বন্দুকভিত্তিক সাম্যবাদের ম্যাও সামলাতে পারেনি জেনারেল চিয়াং কাইশেক-এর মোড়লগিরি। চিনাদের খ্যাদানি খেয়ে চিয়াং অবশ্য তাইওয়ান থেকে বেশ কিছুদিন মাও-বিরোধী ফাঁকা আওয়াজ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর শান্তি ও সার্বভৌমত্বের খামোখা বারোটা বাজিয়ে যেসব সন্ত্রাসবাদী দল নতুন সরকার, নতুন শাসনব্যবস্থা শুরু করার লম্বাচওড়া বুলি আওড়ায় তাদের মধ্যেও এরকম ফাঁপা ঢাক পেটানোর ব্যামোটা দেখা যায়। সীমানার ওপারে থেকে এবং এই দেশের ভিতরে থেকেও ভারতকে 'মুসলিমস্তান' বানানোর হুমকিটা বেশি করে দেয় হরকাত-উল আন্সার, হিজবুল মুজাহিদ্দিন, সিপাহী-ই জঙ্গ এবং লশকর-ই-তৈবা-র দেড়েল মোড়লরা। এনাদের মধ্যে হালে পানি পাওয়ার জো-ও নেই জম্মু কাশ্মীর লিবরেশন ফ্রন্ট নামক উগ্রবাদী গোষ্ঠীটির। তবুও গোষ্ঠীটির হর্তাকর্তা আমানুল্লা খান লণ্ডনে তাঁর গোপন ডেরাতে ঘাপটি মেরে বসে এমন হম্বিতম্বি করেন, মনে হয়, ভারতকে দুরমুশ করার জন্য পাক জঙ্গীরা তাঁর কাছেই সন্ত্রাসবাদের বর্ণপরিচয় শিখতে যাবে। শ্রীলঙ্কাতে, বিশেষ করে জাফনা আর বাত্তিকালোয়া অঞ্চলে প্রেসিডেন্ট চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা-কে থোড়াই কেয়ার করে এল. টি টি ই, জঙ্গীদের স্বাধীন সরকার চালাচ্ছেন ভেলুপল্লি প্রভাকরণ। তবুও তামি ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট এবং জনতা বিমুক্তি পেরুমুনা নামক দু রাজনৈতিক গোষ্ঠী এখনো বুক বাজিয়ে বলে যাচ্ছে, রাম-রাবণের প্রাচী (সম্ভবত) যুদ্ধক্ষেত্রে তামিলদের নাগরিক অধিকার আদায় করতে তারাই এখ এগিয়ে রয়েছে। প্রভাকরণের চ্যালাদের স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হ গেছে এই দু'টি দলের অনেক হামবড়া, একনিষ্ঠ কর্মী। তামিল জনতাও এঁদেরকে আর পাত্তা দেয় না। তবুও ভবী ভোলবার নয়।

লাতিন আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া, ইকোয়েদর এবং আরো কয়েক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সন্ত্রাসের নতুন ধারাপাত তৈরি করেছে 'টুপাক আমারু' নাম একটি জঙ্গী গোষ্ঠী। পেরুভিয়ান সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে গোষ্ঠীটির নেত নেস্টর কার্পা পটল তুললেও তাদের বন্দুকের জোর কমেনি মোটেই। তবু বোকার হদ্দের মতো টুপাক আমারুর গুরুত্বকে ছুঁয়ে ফেলেছে বলে দাবী জানাচ্ছে শাইনিং পাথ বা শেরনান্দো লুমিনিয়োসো নামের একটি জঙ্গী দল কিন্তু দলটির নেতা তথাকথিত অধ্যাপক এবং চিন্তাবিদ আবিমাইল গুজমান পেরুভিয়ান সরকার গোরেড়েন দেওয়ার পর দলটির সামনে সূর্য ডোবা সময়ের সামান্য আলোটুকুও নেই। একইরকম অবস্থা ফিলিপাইন্সের 'মোরো জঙ্গী গোষ্ঠী এবং শুকু আশাহারা নামক তথাকথিত মুশকিল-আসান গুরু অধীনে থাকা জাপানের 'আউম' দলটির। কলার তুলে বেড়াবার চেষ্ট করলেও এদের পাত্তা দেয় না কেউ।

খেলাধুলোর দুনিয়াতে নিজের গাওনাটা গাওয়া অনেকের কাছে পেশাদারীত্বের পর্যায়ে চলে গেছে। বোলারদের তুলোধোনা করে সুনী গাভাসকার আর ব্যাটসম্যানদের তিনকাঠির দুর্গকে খোলামকুচির মত ঈগলগতির বলে উড়িয়ে দিয়ে কপিলদেব নির্ঘাত ভারতকে বিশ্ব ক্রিকেটে ম্যাপে একটা চলনসই জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন। সানি কপিল পাজীর- এতটা জনপ্রিয়তা আঘাত করেছিল সন্দীপ পাটিল আর দিলীপ বেঙ্গসরকারের মোড়লিয়ানাকে। ইংলণ্ডের পেসার বব উইলিসের এক ওভারে চারের বন্যা বইয়ে দেওয়া পাতিল আর লর্ডসে সেঞ্চুরি করা বেঙ্গসরকার এমন ভা দেখাতেন যেন তাঁরাই টিমের ক্যাপ্টেনসিতে ঢুকছেন। হিরো বনতে যাও পাতিল দেবশ্রী রায়ের সঙ্গে সিনেমাতে নাচন-কোঁদন করতে গিয়ে ক্রিকেটে সবটুকুই ভুলে বসলেন। তাঁর কোচিং-এও ভারতীয় দলের একই হাল হল ওয়েস্টইণ্ডিজের মার্শাল-হোল্ডিং-রবার্টস-উইনস্টন-ডেভিসের বলে মিড্লস্ট্যাম্প বারবার ভাঙতে দিলীপ আর তাঁর খেলাতে ফিরে আসতে পারেননি। ৮৭'র রিলায়েন্স বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে গুচ-গ্যাটিং-এ ইংলণ্ডের কাছে ভারতের আশার বেলুন চুপসে যাওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যম দায়ী করেছিল দিলীপকেই। বেছে বেছে ওইদিনেই মাছ খেয়ে তাঁর পে ছাড়ল।

বক্সিং রিং-এ একসময় সঙ্গত কারণেই জো ফ্রেজিয়ার, কেন নর্টন, সনি লিস্টনের মতো হেভিওয়েটদের কুপোকাত করার পর মহম্মদ আলি হুঙ্কা ছেড়েছিলেন—আই অ্যাম দ্য গ্রেটেস্ট, আমিই বিশ্বসেরা। তবে ল্যারি হোম্সের কাছে এটা নিছক ফাঁকা আওয়াজ বলেই মনে হয়। আলিকে রিং-এ শুইয়ে দেওয়ার পর হোম্স বলেছিলেন—আলি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট, বাট আই অ্যাম দ্য লেটেস্ট।

পায়ের তলায় জনসমর্থনের শক্ত জমি না থাকলেও ছড়ি ঘোরানোর স্বভাবটা ভারতীয় রাজনীতিতে বরাবরই চলে আসছে। বলাই বাহুল্য, ভোটাভুটির নাটক শুরু হলেই এইসব মোড়ল রাজনীতিকদের বেশি দেখা যায়। ১৯৮৪ সালে দেহরক্ষীর গুলিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঝাঁঝরা হন। জাতীয় নির্বাচনে পাইলটের সিট ছেড়ে নিমরাজি হয়েই রাজনীতির লুডো খেলতে আসা ছেলে রাজীব গান্ধীর দিকে জনতার সহানুভূতি একটু ভারী ছিলই বলতে হবে। তবুও

উত্তরপ্রদেশেব আমেথি কেন্দ্রে রাজীবকে হারিয়ে ভূত করে দেবার চ্যালেঞ্জ জানালেন মহাত্মা গান্ধীর নাতি রাজমোহন গান্ধী।

কিন্তু দেশের লোকে তখন প্রধানমন্ত্রীর গদিতে জওহরলাল নেহেরুর নাতিকেই দেখতে চায়। সুতরাং আষাঢ়ের তর্জন-গর্জন সার। নির্বাচনে গো-হারা হারলেন রাজমোহন। ওই একটা নির্বাচনে রাজীবের বন্ধু এবং 'শোলে', 'দীওয়ার'-এর মেগাস্টার হওয়াব সুবাদে এলাহাবাদ বিধানসভা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হন অমিতাভ বচ্চন। তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িযে পোড়-খাওয়া নেতা হৈমবতী নন্দন বহুগুণা যতই নিজের কথা সাতকাহন কবে বললেন, জনতাব রায় গেল বিজয় দীননাথ চৌহান অমিতাভের দিকেই। অবশ্য তাবপর বোফর্স মামলাব মাকড়শার জালে রাজীব আটকে পড়াতে অমিতাভের সঙ্গে তাঁর দোস্তি মাঠে মারা যায়।

হালফিলে বিজেপি-ব বাম-হনুমান রথে চেপে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিং ভেবেছিলেন, এবাবও মুখ্যমন্ত্রীব কুর্সি তাঁরই। মাঠে-ময়দানে অনেক বড় বড় বুলিও ঝেড়েছিলেন রাজনাথ। ভোটের ফল বেরনোব পব অবশ্য হাসতে-হাসতে লাড্ডু খেলেন বহুজন সমাজপার্টির মায়াবতী এবং সমাজবাদী পার্টিব মুলায়াম সিং যাদব। বিহারেব জঙ্গুলে রাজনীতিতে ভোট হোক বা না হোক, সিঙ্গাড়ার মধ্যে যতদিন আলু-ফুলকপির পুর দেওযা থাকবে ততদিনই লালুপ্রসাদ যাদব থাকবেন। পশুখাদ্য কেলেঙ্কাবি, খুনি আসামিদের নির্বাচনের টিকিট পাইয়ে-দেওয়া, ইংরাজি লিখতে গিযে কলম ভাঙা মেযেকে এম. ডি. পাশ ডাক্তারনি বানিযে তার বিযেতে কোটি টাকা ওড়ানো, বেউব জেলের মধ্যে ভি.আই.পি-দেব মতো আয়েস-করা লালুর ভুঁড়ির ওজনেব থেকে তাঁর কেচ্ছাব ওজন বোধহয চারগুণ বেশি। লালুও ভালো করেই জানেন, বিহারীবা তাঁর বাতচিৎকে ছাতুর ডেলার থেকে কম দাম দিলেও তাঁর বউ কাম রাবারস্ট্যাম্প মুখ্যমন্ত্রী বাবড়িদেবী তাঁর কথা মেনে চলবেনই।

লালুজির মতো অবস্থা অনেকটা সুভায চক্রবর্তীব। জ্যোতিবাবু বুদ্ধদেবের টিম না তৃণমূলী দিদির টিম—কোথায সই কববেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এইভাবে দোনামোনা করতে গিয়েই আমজনতাব কাছে পেলো হতে শুরু করেছেন সুভায। মাঝেমধ্যে রক্তদান শিবির, বালিকা বিদ্যালযের পুরস্কার বিতবণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসনে বসে গবমাগবম কথা বলে জনতাকে তাতানোব চেষ্টা কবেন সুভায। অবশ্য তাঁব কথা বোধহয মন দিয়ে শোনেন শুধু বেসরকারি বাসের মালিক-কর্মচারীরাই। প্রতি বছব যুবভাবতী ক্রীড়াঙ্গন অথবা নেতাজি ইনডোব স্টেডিযামে তাঁদের সবাইকে নিয়ে দবজা আটকে মিটিং করেন 'সুভাযদা'। তা না হলে বাসের ভাড়া চড়চড়িযে বাড়বে কী করে? মার্কিন মুলুকে বাষ্ট্রপতির পোস্টের ইজাবা নেওয়ার সময বোনাল্ড বেগন এবং জর্জ বুশেব বিরোধী প্রার্থী হিসেবে যথাক্রমে টাকাব কুমিব ওযাল্টাব মনডেল এবং মাইকেল ডুকাকিস জনতাকে মিটিং-মিছিল কবে সমঝানোর চেষ্টা কবেছিলেন যে দেশের সরকাবের স্টিযাবিং একমাত্র তাঁরাই ঘোরাতে পাববেন। জনগণ অবশ্য অতটা বোকামি করেনি নির্বাচনেব সময।

পৃথিবীর মানুযের থেকেও বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী মঙ্গলগ্রহে অপেক্ষা কবে আছে বলে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে খুব প্রচার চালিযেছিলেন হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস এবং পববর্তীকালে বে ব্রাডবুবী, ব্রায়ান অ্যালডিস, লেইন ব্যাঙ্কস্, এমনকি ঘনাদাব দৌলতে আমাদের প্রেমেন্দ্র মিত্রও। শিযা পাবেল্লি এবং পার্সিভ্যাল লাওযেল তো মঙ্গলগ্রহেব দিকে দূরবীন দিযে দেখে সেখানকাব 'মানুযেব' কাটা অ্যাস্ত্রে লম্বা জলসেচের খাল আবিষ্কাব করেই ফেললেন। তবে মঙ্গল নিযে মোড়লিযানা চলল না বেশিদিন। 'ভাইকিং' আব 'পাযোনিযর'—এই দুই কৃত্রিম উপগ্রহেব পাঠানো ছবি থেকে মালুম হল—যে মঙ্গলগ্রহকে মানবজাতির বাপ-ঠাকুর্দাব বাসভূমি বলা হযেছে, সেখানে মিথেন আব কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া আব কিছুই নেই।

কার্টুন : অরুণ সেন

ছটা-সাতটা মঞ্চ জুড়ে কবিতা গল্প নাট্য সঙ্গীত ইত্যাকার যত উৎসবে গণবণ্টন চলে সম্বৎসর
তাতে খুদ-কুড়ানো সংস্কৃতিসেবীদের সংখ্যা অচিরেই ছাঁটাই বেকারের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে।

হুম! ক'দিনেই বেশী বড় হয়ে গেছে, দেখছি!!

প্রবীণ ঘোড়েল অথবা নবীন নিরো

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

এই রাজ্যের, বিশেযত শহর কলকাতাব মানুযের সনহশীলতা হিমালয় তুল্য। আব নিবাপত্তাবোধ বোদে-পড়া মাখনেব মতো। সাম্প্রতিক গুটিকতক ঘটনা মনে করলেই বোঝা যায়, এই মরূদ্যান অ-বোধিপ্রাপ্ত মানুযেব পবিগম্য নয। দমদমেব নৃশংস জোড়া হত্যা, বালি-হাওড়া ও আলিপুব ইত্যাদি, কল্যাণী এক্সপ্রেস ওযের বাসে নারীব প্রতি অশালীন আচরণেব প্রতিবোধ কবতে গিযে মলয দাস নামক বেকুব যুবক খুন। তড়কার দোকানে সামান্য বিতণ্ডায গুলি-বর্ষণ—এই মরূদ্যানের মহতী বর্ণনা দিয়ে বগল বাজাতে যে নির্লজ্জতাব প্রসাধন প্রয়োজন তা উত্তবিত সিদ্ধার্থেই সম্ভব। কৃষ্ণ-পণ্ডা-দুলালেব জন্য রাস্তা বেল অবরোধ, মিছিলের নেতৃত্বে বিধায়কের সবোষ আস্ফালন, বেহালাখুনির বাজ-উত্তবাধিকার, এমনকি সিডি ক্যাসেটেব জোচ্চুবি বাণিজ্যের হোতার রাজ-নেতা অভিধান—এসবই কি মরূদ্যানের পান্থপাদপ? এই লুঠের রাজত্বে সবাই লুঠেরা। ঘোড়েলেব বাজ্যে সবাই ঘোড়েল। না হতে পাবলে মরো বা মাব খাও। মলয দাসের মতো মোড়লি করলে পরিণতি যথাবিহিত হবে। হবেই।

এটুকু লেখা পড়ে তুবড়ি কবি ছন্নছাড়া তুখোড় বলল, দাদা দেখছি খুব খেপচুবিযাস।

বললাম, না—ট্যাকচুবিযাস।

বুঝতে না পেবে ছন্নছাড়া ফ্যালফ্যাল চোখে বলল, ব্যাপারটা কি?

দমদম অববোধেব দিন মাধুকবী সেবে ফিরছিলাম। প্রতিবোধ ধর্নাব হট্টগোলে কখন যে কে বৈবাগীর ট্যাক খালি করে গেছে বুঝতেও পারিনি। একসহযাত্রীর দযায কোনোক্রমে আখড়ায ফিবতে পেরেছি। কারুর যদি রাস্তা অবরোধ করার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকে অন্যদেবও নিরুপদ্রবে চলাচলেব সংবিধান-নির্ধাবিত গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। কিন্তু পেশীব জোব আর 'দিশি'-র গাঁটছড়ায় ব্যক্তিমানুয, অসংগঠিত জনসাধাবণ প্রতিদিন সর্বত্র লাঞ্ছিত নিগৃহীত ও নিপীড়িত হচ্ছে। কাটা-ঘায়ে বিছুটি ঘবার মতো আবাব মানুযের সার্বিক মুক্তির সাফাইয়েব ফুটিফাটা চাঁদোয়া লাগানো হয। শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রী নাকি মাযাকোভাস্কি ছেড়ে অধুনা কাফকা পড়ছেন।

তুখোড় বলল, পড়ছেন মানে পড়ে একেবারে হজম করে ফেলেছেন। "পোকা" পড়েননি?

বলি, কাফকাকে কাফন পবিযে "পোকা" পাশ করানোর চেষ্টা কবছেন যখন পড়াব আব দবকাব কি। হাড়ে-হাড়েই পোকা কিলবিল কববে।

ছন্নছাড়া তুখোড় তীব্র প্রতিবাদ কবে,—আপনি ভুল বলছেন। একদম ভুল। উনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে "দুঃসময়" লিখেছিলেন।

—যাতে এই সুসময়ে তবী বাইতে পারেন।

—মোটেই না। এবার তিনি মহাকাব্য লিখবেন—

—নাম দিতে বলো 'বঙ্গবধ কাব্য'।

তুখোড় তুবড়ির মতো জ্বলে উঠে বলল, আঃ চরণদা, আপনাব মতো ডাঁদা বৈবাগীব এমন সার্ডনিক মন্তব্য শোভা পায না। আব, আমি বলছিলাম

মহাকাব্য বা একটা দীর্ঘ—অতিদীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। শুরু হয়ে গিয়েছে, তবে এখন প্রকাশ কবা হবে না।

—সে তো নিশ্চয় প্রকাশ হবে শেযের সেই ভযঙ্কর দিনে—। তা তুমি এত জানলে কোত্থেকে?

পৃথিবীর ইতিহাসে আপনি এমন মুখ্যমন্ত্রী আর পাবেন না। একাধারে কবি, নাট্যকার, আবৃত্তিকার, অনুবাদক। সর্ব সংস্কৃতির প্রলয় নাচনের প্রধান

তুখোড় লাজুক হেসে বলল, ওঁর নিভৃত সাহিত্য-সচিবও তুবড়ি কবি ছিল। ও-ই বলেছে, একেবারে শক্তিদা—মানে শক্তি চট্টোপাধ্যাযেব স্টাইলে শুরু—

করতে পারি কিন্তু কেন করব
ভোট হারানোর ফাঁদে পড়ব।
পুলিশ ঘুষ খাবেই, মস্তান তুলবে চাঁদা
শ্মশানে মড়া পুড়বে মন্ত্রীবা ভাষণ জুড়বে
এই সবল সত্যে আমরা থাকব বাঁধা।

আরো অনেক আছে। লেখা তো শেষ হযনি। চলছে। চলবেও।

ছন্নছাড়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, আপনি দেখা কববেন?

—কার সঙ্গে দেখা করব?

—মুখ্যমন্ত্রীর নিভৃত সাহিত্য-সচিব সর্বংসহ কোঁচাধব ঘোড়েল—আকাদেমি-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল থেকে শুরু কবে শিরোমণি-চূড়ামণি ভুয়ালকা-তহলকা টাইটান-খৈতান হর্ষ-বিষাদ কালিদাস-হরিদাস তাবৎ পুরস্কার পাওযা তুবড়ি কবি। মুখ্যমন্ত্রীর একমাত্র প্রাণের মানুষ।

তুখোড়ের আবেগে জল না ঢেলে বললাম, জানা বইল। সময়মতো একদিন দেখা করব।

ছন্নছাড়া নাছোড়,—যাই বলুন দাদা, পৃথিবীর ইতিহাসে আপনি এমন মুখ্যমন্ত্রী আর পাবেন না। একাধারে কবি, নাট্যকার, আবৃত্তিকার, অনুবাদক। সর্ব সংস্কৃতির প্রলয় নাচনের প্রধান—না, একমেব, পুবোহিত। না, নৃত্যকাব। নটরাজের প্র-প্র-প্র-প্র.. পৌত্রও বলা যায।

মাথা চুলকে বলি, সে আর বলতে। শিল্পে শূন্য পেলেও সংস্কৃতিমেলা সংগঠনে ওযার্ল্ড চ্যাম্পিযন। সংস্কৃতির কোনো লাভ না হলেও ট্যাকশক্তি আব প্যাঁকশক্তি বাড়ছে হু হু।

তুখোড় বলল, ট্যাকশক্তি বুঝলাম। প্যাঁকশক্তি?

—ছটা-সাতটা মঞ্চ জুড়ে কবিতা গল্প নাট্য সঙ্গীত ইত্যাকার যত উৎসবে গণবন্টন চলে সম্বৎসব তাতে খুদ-কুড়ানো সংস্কৃতিসেবীদেব সংখ্যা অচিরেই ছাঁটাই বেকারের সংখ্যাকে ছাড়িযে যাবে। আর তাবা দিকে দিকে দলে দলে সংস্কৃতি-সম্রাটেব জয়ধ্বনি কববে। এটা হচ্ছে খ্যাঁকশক্তি। আব বিবোধীরা যা পাবে, সেটাই প্যাঁকশক্তি। উদাহবণ—ছোট আঙাবিযা। জযতু বঙ্গেশ্ববোবা সঙস্কৃতিশ্বরোবা।

ছন্নছাড়া বিস্ফারিত চোখে বলল, দাদা আপনি একেবারে প্রতিক্রিয়াশীলদেব মতো বলছেন।

বললাম, শোনো তুবড়ি কবি, ক্রিযা করলে তবে তো প্রতিক্রিয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী, যিনি পুলিশমন্ত্রীও বটেন, তাঁব প্রাথমিক ক্রিয়াটাই ত্যাগ করেছেন। তাঁর স্থির করা দবকাব—মন্ত্রীত্বের দাযবদ্ধতা পালন কববেন না কি অর্বাচীন সঙ-কৃতিব ইজারাদাব অধিকাবী হবেন। তোলা-মস্তানি, প্রমোটাব তোযণ-শোযণ, পুলিশি নৈবাজ্য, হত্যা-সন্ত্রাসের গেণ্ডুযালীলা বাধাবন্ধহীন চলবে আর তিনি 'পোকা'-র উপাসনা করবেন? পাঞ্জাবি-ধুতির সফেদ ঔজ্জ্বল্যের বিজ্ঞাপন-সুযমাব লালিত্য বাখতে অসৎ দুর্বিনীত উৎপীড়ক বৃহন্নলা পুলিশ-বাহিনীকে মহাভারতীয সার্টিফিকেট দিতে থাকবেন? এহেন লজ্জাহীন স্থবিব নিষ্ক্রিযতার জন্য মলয় দাসবা মবছে—আবো বহুকাল, হয়ত, মববে।

এমন মোড়ল কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
নবীন নিরোর হাতে 'পোকা'-বাঁশি।

Yes we care

MEDICLUE

(A RAMKRISHNA GROUP COMPANY)

RESEARCH &
DIAGNOSTIC *Private Limited*

68, CHOWRINGHEE ROAD, KOLKATA 700020
PHONE : 2811138, 2811139
Opp : Rabindra Sadan Metro Rail Station

Major services available over here :

ULTRASONOGRAPHY
GASTROENTEROLOGY
CARDIOLOGY
RADIOLOGY
PATHOLOGY

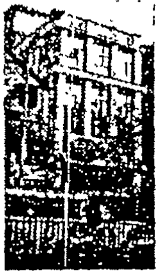

কেউ বোরখা পরে পড়াতে যাবেন। কেউ নার্স সেজে কেউবা চারটে প্লাসটিকের মগ নিয়ে সেলসম্যান, ধুনুরি, ধাইমা, কিরিটি, ব্যোমকেশ। কেউবা আবার টর্চ-খাতা নিয়ে ‘মিটার’ বলে ঢুকে যাবেন।

শিক্ষা সুসংবাদ

“ওরে আমি চোর নই, তোদের মাস্টার মশাই।”।

গুরুকুল বিল

সরকার-কর্তার দুটো বিয়ে ছিল। সে সময় চালের মণও সস্তা, মানুষের মনও বস্তা। এখন নস্যির ডিবে। বাপের দেওয়া বিয়ের পরেও মানুষ নিজে দেখে একটা করতে পারত। এখন একটাতেই জ্বলে গেল। পারলে ভাইকে দিয়ে পাহাড়ে চলে যায়। সরকার-কর্তা বাপের দেওয়াটি খাস মহলে রাখলেন, নিজের করাটি বাগানবাটীতে। বছরে এককালীন বাগানবাটীর সংসার-খরচা পাঠিয়ে নিজে থাকতেন বাপের দেওয়াটিকে নিয়ে। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ সরকারি দ্বিতীয়পক্ষ ‘এডেড্’। ইস্কুলও ঐ দু’জাতের। গবর্মেন্ট আর গবর্মেন্ট এডেড্।। সম্পত্তির বেলা এডেড্ পাবে কম। এটাই নিয়ম। প্রাইভেট টিউশনি নিষিদ্ধ হয়ে চিঠি গেল এডেড্ ইস্কুলগুলোতে। হিন্দু, হেয়ার—কর্তার প্রথম পক্ষ; টিউশনি, বিরিয়ানি অক্ষুণ্ণ থাক। ব্ল্যাক বোর্ডে ফ্ল্যাগ ঝুলিয়ে ইস্কুল সুদ্ধু ছাত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাও। গুরুকুল। ব্যাচ্ করে শিক্ষা বেচো। মাইক নিয়ে এক ঘরে বসো, পাশের ঘরে চোঙা। পেচ্ছাপ পেলে রাস্তায় যেও বাবা। তোমাদের মাসিমা রাগ করেন। এক তারিখে দিও বাবা। নইলে রেজাল্টে রিং-ওয়ার্ম কেরিয়ারে ক্যানসার।

ঐ এক চিঠিতে এডেড্ ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে গেল চোরাকারবারী। কেউ বোরখা পরে পড়াতে যাবেন। কেউ নার্স সেজে কেউবা চারটে প্লাসটিকের মগ নিয়ে সেলসম্যান, ধুনুরি, ধাইমা, কিরিটি, ব্যোমকেশ। কেউবা আবার টর্চ-খাতা নিয়ে ‘মিটার’ বলে ঢুকে যাবেন। দু’ঘণ্টা বাদে বেরোবেন। যারা বাড়িতে ব্যাচ্ করাতেন তাঁরা কখনো বাবুঘাটে, কখনো বন্ধুর বাড়িতে, কখনো বিমান ঘাঁটিতে। শিক্ষার মোবাইল ভ্যান। নন্দনের চত্বরে আর্কিমিডিস, ভিক্টোরিয়ার মাঠে ভুট্টার চাষ, দক্ষিণেশ্বরের চাতালে শুক্রানু। মা মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বাড়ি চলে যাবে। শিক্ষায় মারো ঝাঁটা। প্রজন্মের হাতে পলতে।

গ্যাসের দাম যতই বাড়ুক লোক গ্যাস খাবেই। বাসভাড়া চেকে দিতে হলেও লোক চাপবে। গুরুকুল তুলে দিলে মরবে ছাত্রকুল। কালিদাস, সোমা, শান্তনুদের কী হবে? এই বলে কর্তার দ্বিতীয় পক্ষ কেস ঠুকে দিল কর্তার নামে। ক্লাশরুমে শিকল, তেইশে এপ্রিল থেকে লাগাতার অনশন। উত্তম কুমারের মূর্তির পাদদেশে। দুশমন জামানা। পক্ষপাতিত্ব মানব না। আইন করে আমদানি বন্ধ করতে দেব না। গার্জেন গর্জাও। ছ’মাস কোচিঙের মাইনে মকুব। ছাত্রসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়ো। সিলেবাস হচ্ছে শিক্ষার অন্তর্বাস। পরলে কি পরলে না, কিছু এসে যায় না। অ্যাভারেজে সবাই বেরিয়ে যাবে। ব্যস্ কালিদাস ক্যাবারে দেখতে চলে গেল। সোমা শান্তনুকে নিয়ে সার্কারিনায় ঢুকে গেল। নুন শোয়ে “যৌবনের জ্যামিতি।”

—দিব্যেন্দু দাস

ট্যারা চোখে

ছাত্র কিছুতেই অঙ্ক ঠিক করতে পারছে না। ভুল হচ্ছে। শিক্ষক ছাত্রকে বললেন,—তোমার এ অবস্থা।। অথচ স্যার আশুতোষ তোমার মতো বয়সে এই রকম অঙ্ক মিনিটে দশটা করে ফেলতেন। আর তুমি বসে বসে কী করছ?

ছাত্র—স্যার, আর আপনার বয়সে আশুতোষ দু-বার ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়ে গিয়েছেন। আপনি কী করছেন দেখুন।

□

ছাত্রের বাড়িতে এসে শিক্ষক পড়ান। তিনি সন্ধ্যাবেলা আসেন, এসে দেখেন ছাত্র ঠাকুরঘরে প্রণাম করছে। ছাত্র বই নিয়ে পড়তে এলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন শিক্ষক,—প্রণাম করে ঠাকুরের কাছে কী চাইলে?

ছাত্র—টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত।

শিক্ষক—একি একটা চাওয়া হল?

ছাত্র—আপনি কী চাইতেন, স্যার?

শিক্ষক—আমি ঠাকুরের কাছে সবসময়ই চাই বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান।

ছাত্র—তা স্যার, যার যেটা নেই সে তো তাইই চাইবে।

—প্রণয় কৃষ্ণ গোস্বামী

খি-খি-খি

পিনাকীশঙ্কর চৌধুরী

বছর দশেক আগে একটা পাকা ল্যাঙড়া আম খেয়ে গজেন দলুইয়ের বউ আঁটিটা পুঁতে দিয়েছিল উঠোনের মধ্যেই ওদের টালির দোচালা ঘরটার একটু দুরে। কতটা দূরে পোঁতা উচিত ছিল সেটা ঠিকমতো আঁচ করতে পারেনি। আর তাইতেই এই বিপত্তি। বেচারা রিক্সাওয়ালার বউ কি আর অত গজ-ফুট-মিটারের হিসেব জানে? তার কাছে আমটা মিষ্টি, জাতটা ভালো। গাছ গজালে আরো অনেক আম খাওয়া যাবে। ভাতার-পুতকে খাইয়ে সুখ। হায়রে সুখ।

প্রথম পাঁচটা বছর গেল অপেক্ষা করতে করতে। কোলের ছেলে ততদিনে কোল ছেড়ে হাঁটি হাঁটি পা-পা পার হয়ে বই-শেলেট বগলে ইস্কুলে যাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আর গাছটাও ডালপালা মেলে গোটা উঠোনটাকে ছায়া দিতে শুরু করেছে।

ছ'বছরের মাথায় আম-গাছে মুকুল এল। গজেনের বৌয়ের মনে আনন্দ আর ধরে না। কোলের মেয়ে বড় হয়ে বিয়ে হয়ে পোয়াতি হলে যা হয় আর কি। কিন্তু মুকুল বড় হয়ে আম পাকতে পাকতে গাছে রইল গোনাগুনতি আটটি। ঠিক আছে, আটটা আটটাই সই। নিজের গাছের আম বলে কথা। আঃ। কী মিষ্টি। পরের বছর আরো হবে।

কিন্তু পরপর তিনটে বছর কাটল, সেই এক কাণ্ড। চোত্ মাসের গোড়ায় ঝেঁপে মউল আসে। কিন্তু মাসটা কাটতে না কাটতেই ঝরে গিয়ে সব শেষ। একটা আমেরও দেখা নেই। কাঁচাই নেই, পাকা তো দূরের কথা। কী কাণ্ড।

গাছে প্রথম মউল আসার সময় সে কি রবরবা। গাছের ডালে ডালে মৌমাছি প্রজাপতির মোচ্ছব। কিন্তু পনেরোটা দিন কাটতে না কাটতেই সব মউল ঝরে গিয়ে কালো হয়ে গাছের তলায় মউলের কার্পেট। যে কটা গাছে লেগে রইল সে কটা শুকিয়ে কালো হয়ে গাছের গায়ে যেন আঁচিলের দাগ। দেখলে দুঃখ তো লাগেই সেই সঙ্গে মরা ডাঁটার ঝলসে যাওয়া চেহারা দেখলে গা শিউরে ওঠে। প্রতিবারেই গজেন-বউ ভাবে—যাকগে যাক, এবারে হল না, পরের বারে ঠিক হবে। তখন আম খাওয়া যাবে।

কিন্তু কোথায় কি। পরপর তিন বছর সেই একই কাণ্ড। আম খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি। চারবারের বার যখন গাছে মউল এল তখন গজেন-বউ গজেনকে ঠেলে পাঠাল ডাক্তারের কাছে। গাছের ডাক্তার—যাও ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে এসো, কী করতে হবে।

ডাক্তার বলল—স্প্রে করতে হবে, ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। জলে গুলে গাছের ডালে দেখে দেখে মউলের উপরে ওষুধ ছিটাও। গাছে আম ধরবে।

টালির ঘরের মটকায় চেপে গজেন ওষুধ ছিটাল। আর পনেরো দিনের মাথায় গাছের সারা অঙ্গ ছেয়ে আমের গুটি। গুনতিতে হাজার তো হবেই। এখন যদি ঝড়ে অর্ধেকও পড়ে যায় তবু বাকি যা থাকবে খেয়ে শেষ করা যাবে না। লোককে ডেকে বিলোতে হবে।

বৈশাখের শেষ দিকে আম যখন জামের সাইজ পার হয়ে জামরুলের সাইজে এসেছে তখনই এল সেই দুর্বিপাক। শেষ বৈশাখের এক বিকেলে পশ্চিমদিকের আকাশ কালো করে ঝড় এল, হু হু করে বাতাস বইল, কড় কড় করে মেঘ ডাকল, চকাস চকাস করে বিদ্যুৎ চমকাল আর তারপরেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হল টানা দু'ঘন্টা।

এক হাজারের যুবতী মা এতটা সইতে পারল না। মাটির বাঁধন আলগা করে হুড়মুড়িয়ে কাৎ হয়ে পড়ল। পড়বি তো পড়, গজেনের ঘরের টালির চাল বরাবর। কাৎ হল কিন্তু পুরোটা পড়ল না। তাইতেই রক্ষে। পুরোটা পড়লে গজেনের টালির চাল আর ছিটে বেড়ার দেওয়াল আস্ত থাকত না। গজেন, গজেন-বৌ ব্যাটাকে নিয়ে সবশুদ্ধ সমাধি হয়ে যেত।

ভগবানের অসীম করুণা যে ওই ভারী গাছ অর্ধেক বেঁকে ওই টালির চালের হাত পাঁচেক উপরেই কেত্‌রে আটকে গেল। আটকে গেল ঠিকই কিন্তু এই পড়ি এই পড়ি অবস্থা।

ঝড়ের দাপট আর সাধের গাছের কাণ্ড-কারখানা দেখে গজেনের মুখ শুকিয়ে গেল। তার বউ ভগবানকে ডাকতে লাগল আর ছেলেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে দাওয়ায় বসে জেগে রাত কাটিয়ে দিল।

সকালে আলো ফোটার পর সরেজমিনে অবস্থা দেখে গজেন বুঝল এ গাছ কেটে না ফেললে যে-কোনো সময়ই সমূহ সর্বনাশ ঘটে যেতে পাবে। আম গাছের মায়া আর আম খাবার লোভ করলে ও-দুটোর কোনোটা পাওয়া যাবে না। কোনদিন হয়ত ঘরটাই ভেঙে যাবে। এই রকম আর একটা ঝড় এলে আমগাছ আর টালির চাল সুদ্ধ ঘরের মধ্যে চাপা হয়ে মরে পড়ে থাকতে হবে।

গজেন কাটারি-কুড়ুল নিয়ে গাছ কাটতে তৈরি হল। পাড়ার জীবনেকেও ধরে আনল কাজে হাত লাগানোর জন্যে। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কান্না চাপতে চাপতে গজেন-বৌ গাছ কাটায় সায় দিল। তার মনে তখন ছেলে-হারানোর শোক। আহা, নিজের হাতে আঁটি পুঁতে লাগানো গাছ। ছেলেরও বাড়া।

গজেনদের উঠোনের সীমানা লাগোয়া বাড়িটা তার খুড়তুতো দাদা শ্রীধরের। সে হল গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তি। পার্টি করা রইস লোক। তার বাড়িটা পাকা আর দোতলা। আগে লোকে ডাকত ছিধর দলুই বলে। ইদানীং মোটর বাইকটা কেনার পর ডাকে শ্রীধর বাবু। শ্রীধর তার এই গরিব হাপোষা ভাইকে খুব স্নেহ করে। বিপদে আপদে এগিয়ে এসে বুক দিয়ে আগলায়। এই বিপদেও এগিয়ে এল। বলল, সরকারের অনুমতি ছাড়া গাছ কাটার আইন নেই। কাটলে ফাইন হবে, জেলও হতে পারে। তুমি না জেনে যাতে কোনো বিপদে না পড়ে যাও সেটা চিন্তা করে তোমার ভালোর জন্যেই এসব বলা। আর তুমি যদি উসব আইন-কানুন মান্যি না করে জবরদস্তি গাছ কাটতে যাও তবে তো ওয়ার্ড কমিটির মেম্বার হিসেবে আমাকেই পুলিশে খপর দিতে হবে। তখন বাপু আমাকে দোষ দিতে পাববে নি। এটা আমার দাযিত্ব। তুমি এখন বুঝে-সমঝে কাজ করো।

গজেন বলল, কিন্তুক গাছটা না কাটলে তো যে কুনো সময আমার ঘরের উপরে পড়ে গিযে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিবে। তখুন কী হবে?

—তখুন কী হবে সেটা দেখার দায় তো আমার নয। কিন্তুক তুমি বে-আইনি কাজ করলে সেটা আমাকে নিশ্চয় দেখতে হবে। বেআইনি কাজে বাধা দেওয়াটা আমার দাযিত্ব। বিশেষ করে আমাদের পার্টি যখন সরকারে আছে তখুন আমার দায় তো আরো বেশি। এই এরিযাটা যদ্দিন গ্রাম পঞ্চাযেতে ছিল তদ্দিন ইসব আইনের অ্যাতো কড়াকড়ি ছিল নি। এখুন এটা মিউনিসিপালিটি হযে গ্যাচে। এখুন আইন মেনে কাজ করতেই হবে।

ভাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা দাদা হিসেবে তার কর্তব্য। তাই শ্রীধরই পথ বাতলে দিল, গাছকাটার অনুমতি দিবার জন্যে সরকার একটা কমিটি করে দিয়েছে। সেই কমিটির অনুমতি নিয়ে এসো। গাছ কাটতে পারবে।

গজেন দলুই শহরে চলল ট্রি ফেলিং কমিটির অনুমতি আনতে। শহর এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূর।

আর পিছন থেকে শ্রীধর—শ্রীধরবাবু, খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল— উ অনুমতি আনা তোর হাড়ে হবে নি রে গজেন। আবার আমার কাছেই আসতে হবে। উ আমগাছটা আমিই লিব।

এই পর্যন্ত পূর্ব কাহিনী। আমাদের কাহিনী শুরু এইখান থেকে।

আইন না মানলেই ফাইন কিংবা জেলের মধ্যে ইন। দেশটার নাম ভারতবর্ষ। এদেশে আইন অনেক আছে। খুব সুন্দর সুন্দর আইন। আইনের বয়ানগুলো শুনলে মনে হবে আহা দেশটা কি জানি স্বর্গরাজ্য। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। আইন লেখা আছে বইয়ের পাতায়। কিন্তু যাদের জন্যে আইন তারা তো গরিব আর মুর্খ। তারা কেউ কোনোদিন সে সব আইন চোখে দেখেনি। বরং ওদেরকে যখন দম লাগাবার দরকার হয তখন আইনের ব্যবসাদাররা সেগুলো বই থেকে টেনে বার করে আর ওদের মাথা কাটে।

শহরে গিযে গজেন সারা সকাল দুপুর ধরে খুঁজে বেড়াল 'টিরি পেলিং কমিটি'টা কোথায় আছে। যাকেই জিজ্ঞেস করে সেই মাথা নাড়ে। উঁ হুঁ। ওরকম একটা বিদঘুটে নামের অফিসের কথা কেউ জানে না। দু'একজন সবজান্তাবাবু বলল—কোথায আছে জানি না, তবে ওরকম একটা অফিস যে আছে ঠিক। একজন যুক্তি দিল—বনবিভাগের অফিসে যাও। গাছপালার ব্যাপার যখন, বন-বিভাগ হয়ত বলতে পারবে।

ডি এফ ও অফিসের বড়বাবু প্রথমটা বিশেষ পাত্তা দিতে চাইলেন না। উনি ব্যস্ত মানুষ। কত কাজ। সারাদিন অফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি। ফাইল থেকে মাথা তোলার সময় পান না। কোনোদিন দুটো তিনটে, কোনোদিন বা আরো বেশি, চার পাঁচটা পর্যন্ত ফাইল ডি এফ ও সাহেবের টেবিলে পাঠাতে হয। আজ সাহেব অফিসে নেই। ট্যুরে গেছেন। তাই ফাইলের ব্যাপারটা নেই। কিন্তু সে ছাড়াও তো অনেক কাজ সামাল দিতে হয়। কত ইনক্রিমেন্ট বোনাস আর সিনিয়ারিটির হিসেব, কর্মীদের অভাব-অভিযোগ। অফিসে কাজ করে প্রায় কুড়িজন লোক। তারা তিনটে আলাদা ইউনিয়নের মেম্বার। তিনটেই সর্বভারতীয় ইউনিয়নের অনুমোদিত। তাই কাউকে ছোট করে দেখা চলবে না। তাদের মধ্যে সমানভাবে ট্যুর ভাগাভাগি করে দিতে হয়। ক্যাপের টেণ্ডার আর তার কম্পারেটিভ স্টেটমেণ্ট করার ভারও সমান ভাবে ভাগ করে দিতে হয়। যার ভাগে কম পড়বে তারই মুখ ঝুলে যাবে আর তাদের ইউনিয়ন তখন শ্রমিক ঐক্যকে সংগ্রামের হাতিয়ার বানিয়ে বড়বাবুর উপর চড়াও হবে। সারাদিন এইসব সামাল দিতে দিতেই বড়বাবু গলদঘর্ম। ফাইল থেকে এইজন্যেই মাথা তুলতে পারেন না। তার মধ্যে আবার গজেনের মতো এইসব উটকো লোক এসে বিরক্ত করে।

—কী চাই আপনার? প্রশ্ন তো নয়, বুলেট। সরকারি অফিসের চেয়ারে বসে আছেন, বুলেট ছুঁড়তেই পারেন।

—আজ্ঞে চাই না তো কিছু। ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমার নিজের হাতে লাগানো আমগাছটা গত পরশুর ঝড়ে ডালপালা নিয়ে কেত্‌রে পড়েছে আমারই ঘরের উপরে। এখন কেত্‌রে আছে, পরে যদি ছেত্‌রে পড়ে তবেই তো চিত্তির। বউ-বাচ্চা নিয়ে চাপা পড়ে মরে যাব বাবু। গাছটা কেটে ফেলার অনুমতি চাই। লোকে বলছে আপনাদের অনুমতি ছাড়া নাকি গাছ কাটা যাবে নি।

—হুঁ। অনুমতি? বড়বাবু গজেনকে জরিপ করলেন, কতটা মালদার। কতখানি কী দিতে থুতে পারবে। জরিপ করতে বেশিক্ষণ লাগল না। এই কবে করে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। সাজ-পোশাক দেখে তো খুব একটা দিতে থুতে পারবে বলে মনে হয় না। মনে মনে খিঁচিয়ে উঠলেন—যতো সব উট্‌কো লোকের বেগার খাটা। খিঁচানোটা মনে মনে হলেও বড়বাবু মুখে সেটা প্রকাশ হতে দিলেন না। সরকারি চেয়ারে বসে চেয়ারের মর্যাদাটা রাখতে হবে তো। তাই মুখের ভাবটা এমন করলেন, যেন উনিই ডি এ ফ ও। অনুমতি যা দেবার

সেটা উনিই দেবেন।

—তা অনুমতি তো এমনি দেওয়া যাবে না। আগে আমরা ইন্সপেক্টর পাঠাব। ইন্সপেক্টরবাবু তাঁর রিপোর্ট দেবেন। সেই রিপোর্ট কমিটির মিটিং-এ প্লেস করা হবে। মিটিং-এ রেজোলিউশন হবে। তারপর অর্ডার ড্রাফ্‌ট হবে। অর্ডার সাইন হবে, ইস্যু হবে। তবে তো আপনি গাছ কাটতে পারবেন। তা এত কাজকি এমনি এমনি হয়ে যাবে? কিছু খরচ-খরচা তো আছে।

এতগুলো ইংরেজি কথা একসঙ্গে গজেন কোনোদিন শোনেনি। কথাগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই তার মগজে ঢুকল না। সে বুঝল শুধু শেষের কথাগুলো। কিছু খরচ খরচা তো আছে। কথাগুলো বুঝতে পেরে তার বুক কেঁপে উঠল। বড়বাবুর সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল।

বড়বাবুর দয়ার শরীর। গরিবের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদে। গজেনের দুঃখেও তাঁর প্রাণ হু হু করে কেঁদে উঠল—আরে বাপু, ওরকম হাঁদা গঙ্গারামের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে হবে?

ওদিকে গজেনের বোঝার ক্ষমতা কিন্তু খুবই কম। সে আকাশ-পাতাল ভেবেও বার করতে পারল না, বড়বাবুর কথার কী উত্তর হতে পারে।

বড়বাবু একলাফে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলেন। তাঁর জরিপের ক্ষমতা অসাধারণ,—আর বাপু, কথাটা ধরতে পারছ না? তোমার গাছটা তো আমগাছ, না কী? শিরিষ গাছ তো আর নয় যে গাছে শুধুই পাতা।

গজেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—হ্যাঁ বাবু, আমার নিজের হাতে লাগানো আমগাছ। মানে আর কি আমার বৌয়ের হাতে লাগানো। গত তিন বছরে একটাও আম ধরেনি। ই বছর ওযুধ দিলুম, তো ঝেঁপে আম এল। বেশ বড় বড় হয়ে উঠেছে। কি মিষ্টি আম। কিন্তু দেখুন না বাবু, আমেই আমার কাল করল। গাছটা বোধহয় আমের ভারেই পড়ে গেল।

মিষ্টি আমের গল্প শুনে বড়বাবুর জিব তৎক্ষণে জলে ভর্তি, সেই কথাই তো বলছি রে। তুমি দেখছি কিছুই বোঝো না। তা সে আম আমাদের না দেখালে আমরা বুঝব কী করে যে ওটা আমেরই গাছ? কী করে বোঝাতে হবে তা তো বুঝছি না। আজ যাও। কাল আম নিয়ে এসে দেখিয়ে যাবে। তারপরে কাজ হবে। আর হ্যাঁ, ভালো কথা বলে দিই। দু'চারটে আনলে হবে না। অন্তত দুটো ব্যাগ ভর্তি করে এনো। দেখছ তো, অফিসে কতগুলো বাবু বসে আছে।

গজেনের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল, ও, এইকথা। তা বাবু কালকে লিয়ে আসব আম। আমার কাজটা হয়ে যাবে তো?

চেষ্টা তো করব। তারপর তোমার কপাল। জানো তো, আমি আছি তাই ওই আমের উপর দিয়েই যাচ্ছে। আগেকার জমিদারি আমল হলে তো পুরো আমগাছটাই চলে যেত। আমরা কত রকমের জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন করে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করেছি। জোতদারদের হটিয়ে বর্গাদারদের জমি দিয়েছি। তবেই না এখন তুমি বলতে পারছ যে ওটা তোমার গাছ। আমাদের এইসব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। শুধু কি তাই? আমি না থেকে এই চেয়ারে যদি অন্য কোনো লোক থাকত, তবে তোমার ওই আমগাছ তো যেতই, সেই সঙ্গে ঘর থেকে দুশোটি টাকা এনে ভরতে হত। আমি তোমার সেই টাকাটা বাঁচিয়ে দিলাম। যাও বাপু, এখন যাও। কাল আম নিয়ে এসো, তখন কথা হবে।

গজেন বাড়ি ফিরে এসে বৌকে সুখবরটা দিল, দুটো ব্যাগ ভর্তি করে আম পেড়ে দাও। কালই আমাদের কাজটা হয়ে যাবে,—বড়বাবু খুব ভালো লোক। একটাও পয়সা চাইল নি গা। গজেন শুনেছিল সরকারি অফিসে কাজ করাতে গেলে পান খাবার পয়সা দিতে হয়। ধ্যেৎ। যত্তোসব বাজে কথা।

পরদিন সকালে গজেন আর গজেনের বৌ দু'জনে চড়ে বসল টালির ছাদে। আঁকশি বাড়িয়ে একগাদা আম পেড়ে ফেলল গাছ থেকে। তারপর দুটো ব্যাগ ভর্তি করে দু'হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল টিরি পেলিং কমিটির বড়বাবুর উদ্দেশ্যে।

বড়বাবুর টেবিলে তখন একদিকে উনি নিজে আর অন্য তিনদিক ঘিরে অন্য বাবুদের ভিড়ে ছয়লাপ। খুব জোরালো মিটিং চলছে। সব বাবুরাই নিজের নিজের চেয়ার টেনে এনে বড়বাবুর টেবিলের তিনদিক ঘিরে চাঁদের হাট বসিয়ে দিয়েছে। কী বৃত্তান্ত। না, পুরীতে হলিডে হোম।

অফিসের বাবুরা সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। এত খাটুনি কি শরীরে সহ্য হয়? শরীর মন—দুই-ই ভেঙে পড়েছে খাটুনির ঠেলায়। শরীর মন চাঙ্গা করার জন্যে মাঝে মাঝে একটু আনন্দ বিনোদনের তো দরকার। না হলে কর্মসংস্কৃতির উন্নতি হবে কেমন করে? যদিও অফিসের বারান্দায় একটা টেবিলের উপরে একটা ক্যারামবোর্ড সব সময়ের জন্যে পাতাই আছে, আর সারা অফিস-টাইমটা সেখানে খেলোয়াড়ের কোনো অভাব হয় না। অফিস টাইম বলতে কাগজে কলমে দশটা-পাঁচটা। কিন্তু আসলে হল এগারোটা চারটে। সরকার কটা টাকা মাইনে দিয়ে কী এমন মাথা কিনে নিয়েছে যে ঠিক দশটাতেই অফিসে এসে বসে থাকতে হবে এবং সেই পাঁচটা পর্যন্ত? আমাদের তো অন্য কাজও আছে।

তা সে যাই হোক, অফিসের বারান্দায় ক্যারাম খেলার বিনোদনটা এমন কিছুই নয়। কর্মীদের জন্যে কোথাও সাগরতীরে একটা হলিডে হোমের ব্যবস্থা চাই সেখানে গিয়ে যাতে কর্মীরা পরিবার সহ ক'টা দিন কাটিয়ে আসতে পারে। এটা কর্মীদের একটা যুক্তি সঙ্গত দাবী। এ দাবী সরকারকে মানতেই হবে। সরকার যাতে এই দাবী মেনে নেয় সেটা দেখা ডি এফ ও সাহেবের কর্তব্য। সাহেবের কাছে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হবে। তার ব্যবস্থা করার জন্যেই আজকের এই মিটিং।

দু'হাতে দু'ব্যাগ ভর্তি আধপাকা ল্যাংড়া আম নিয়ে গজেন অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল পাকা দু'ঘণ্টা। মাঝে মাঝে দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে উঁকি মেরে দেখে মিটিংয়ের আর কত বাকি। এতবড় একটা দরকারি বিষয় বলে কথা। মিটিং কি সহজে শেষ হতে চায়? বাবুদের মিটিং ভাঙার পর যখন বড়বাবুর কাছে যাবার অনুমতি মিলল ততক্ষণে বোশেখ মাসের গরমে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা গজেন ঘেমে নেয়ে আধমরা।

গজেনের হাতে আমের ব্যাগ দেখে বড়বাবু বেশ প্রীত হলেন। আহা বড়বাবু, প্রীতি মানেই তো স্বর্গলোকের চাবি। তস্মিন তুষ্টে জগত তুষ্ট। আম দেখে উনি মনের মধ্যে একটু খি খি করে হেসে নিলেও মুখের ভাবে সেটা বেরোতে দিলেন না। ভাব দেখালেন, অনেকগুলো দামি দামি দরকারি কাজ ফেলে উনি গজেনের কাজটাই আগে করে দিচ্ছেন, এ জন্যে গজেনের কৃতার্থ থাকা উচিত।

গজেনের আনা ব্যাগ দুটো বড়বাবুর চেয়ারের পেছন দিকে দেওয়ালের গায়ে ঠ্যাসানো হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গজেন মনে মনে অঙ্ক কষে নিল—বড়বাবুকে আম দেবার কথা ছিল, ব্যাগ দুটো তো দেবার কথা ছিল না। কিন্তু এখন ব্যাগ দুটো চায় কেমন করে? বড়বাবু যদি চটে যায়। ইস। এমন জানলে সে আমগুলো দুটো ছেঁড়া ফুটো ব্যাগে ভরে আনত। ব্যাগ দুটো এই কদিন আগেই তার বৌ বাজার 'থিকে' পছন্দ করে কিনে এনেছিল গা। এখুন কী হবে? মনের দুঃখ মনে চেপে গজেন তার কাজটা হয়ে যাবে সেই আশায় বড়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অনেকক্ষণ ধরে একটা ফাইল নিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে নাড়াচাড়া করার পর বড়বাবু মুখ তুললেন, কই দাও। বড়বাবু ডান হাতটা বাড়ালেন। গজেন ধরতে পারল না কী দিতে হবে। ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো বড়বাবুর বাড়ানো হাতটার দিকে চেয়ে রইল।

—আরে। অবাক হয়ে গেলে দেখছি। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল

না। তোমার ঘরের আমগাছ কাটতে হবে। সেজন্যে তো একটা দরখাস্ত দিতে হবে, না কি? ডি এফ ও সাহেব কি মুখের কথায় কাজ করবেন? তুমি তো ওঁর এমন কিছু এক কেলাশের বন্ধু নও যে উনি তোমার নামেই চিনে ফেলবেন আর গাছ কাটার অর্ডার দিয়ে দেবেন। দরখাস্ত এনেছ কি?

—আজ্ঞে না। তেমন কিছু তো আনি নি। কী লিখতে হবে তাই-ই তো জানি নি। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।

বড়বাবু অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। গজেনের এরকম একটা গা-জ্বালানো কথা শুনে উনি খিচিয়ে উঠতে পারতেন, গজেনকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বার করে দিতে পারতেন। কিন্তু তার কিছুই করলেন না। শুধু অমায়িক ভাবে বললেন, কাল একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে এসো।

গজেন আবার বিশবাঁও জলের তলায়। সর্বনাশ। বড়বাবু বলে কী? দরখাস্ত কেমন করে লিখতে হয় সেটা সে তো ছার, তার গুরুদেবও ঠুকে বলতে পারবে নি। ভেবে ভেবে কোনো কূল কিনারা করতে না পেরে গজেন হাত কচলাতে কচলাতে বড়বাবুকে বলল, বাবু, আমি মুখ্যু মানুষ। দরখাস্ত লিখতে তো জানি নি। আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন বাবু।

—ঠিক আছে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু যে লিখবে সে তো আর এমনি লিখবে না। তাকে মজুরি দিতে হবে।

'বড়বাবু মজুরির পরিমাণটা কত? ব'লে সেটা শোনার জন্যে গজেন অপেক্ষা করে রইল। আর বড়বাবু ওকে জরিপ করতে লাগল কত বলা যায়।

—দ্যাখো বাপু, অন্য কেউ হলে তো একশো টাকার কমে হত না। আমি তোমার জন্যে পঞ্চাশ টাকায় করিয়ে দেবখন।

—প-ঞ্চা-শ টাকা। গরিব মানুষ বাবু। একটু কমসমে করে দিন।

—সব ব্যাপারে দরাদরি? এ সব কি দরাদরি করার জিনিস রে বাপু? যে লিখবে তাকে মাথা খাটিয়ে লিখতে হবে তো। আচ্ছা যাও, তোমার জন্যে আমি চল্লিশ টাকায় করিয়ে দেবখন। টাকাটা কাল আনবে আর দরখাস্তে সই দিয়ে যাবে।

—ঠিক আছে বাবু, কাল টাকা নিয়ে আসব।

বড়বাবুর পিছনে রাখা নতুন কেনা ব্যাগ দুটোর দিকে অসহায় চোখ মেলে তাকিয়ে গজেন অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

দু'ব্যাগ ভর্তি আমের ব্যাপারটা ছোকরা কেরানি সুবীরের নজর এড়ায়নি। এতক্ষণ বড়বাবুর টেবিল ঘিরে বসে অফিসের বাবুরা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছিল। মিটিং শেষ হবার পর জনা পাঁচেক চলে গেল অফিস ক্যান্টিনে চা খাবে বলে। বাকিরা কেউ সেদিনের খবরের কাগজ, কেউ বা ফিল্ম্ ফেয়ার খুলে বসল। ওদিকের কোণে সুজাতাদি আর প্রতিমাদির গুজ্‌গুজ্ ফুস্‌ফুস্। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না কী নিয়ে আলোচনা। তবে নিশ্চয় কোনো শাস্ত্রীয় আলোচনা নয়।

সুবীর চুপচাপ নিজের সিটে বসে তার সম্বন্ধীকে একটা চিঠি লিখছিল। লেখা শেষে সেটা মুড়ে খামে পুরল। তারপর খামসুদ্ধ বুকপকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বড়বাবুর সামনে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বড়বাবু প্রথমটায় খুব-একটা পাত্তা দিতে চাইলেন না। কিন্তু বেশিক্ষণ অবহেলা করে থাকাও গেল না। চোখ তুলতে হল।

—বড়বাবু, আমগুলোর সাইজ তো বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। এগুলো পাকতে দিলেই তো ভালো হত।

বড়বাবু মুখে একটা হাসির প্রলেপ মাখিয়ে বললেন, আরে বাপু আমি কি একা খাব? একটা ব্যাগ তোমার ভাগ করে নাও।

—না বড়বাবু, সেটা একেবারে একতরফা হয়ে যাবে। একটা ব্যাগ আমরা সবাই মিলে আর একটা ব্যাগ পুরো আপনি একা? এতগুলো লোক আছি। একটা ব্যাগ ভাগ করলে মাথা পিছু কটা থাকবে?

বড়বাবু পারলে চোখের চাউনিতে ওইখানেই সুবীরের দুপাটি দাঁত খসিয়ে দিতেন। কিন্তু পারলেন না। সুবীরটা বড্ড ত্যাঁদোড় আর ঠোঁটকাটা। যেখানে সেখানে যা-তা বলে দেয়। ওকে একটু সমীহ করে চলতেই হয়। মনের ভাব মনে চেপে মুখে একটা বশিষ্ঠ মার্কা হাসি মাখিয়ে বড়বাবু বললেন, তা, যা মনে হয় তাই করো। আমি আর কি বলব। তবে বাপু তোমাকেই একটা কাজ করতে হবে। ওই লোকটার অনুমতি চেয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে।

—অ্যাই তো বড়বাবু। যত খাঁড়ার কোপ আমার উপরেই কেন? দরখাস্ত লিখে দেবার আর কাউকে পেলেন না? আমাকে সামনে পেলেন তো আমিই হলাম বলির পাঁঠা?

—আরে না না। সেজন্যে নয়। আসলে তোমার লেখার স্টাইলটা ভালো

তো, তাই তোমাকে বলা। তুমি যেরকম লিখবে সেরকম অফিসে আর কেউ পারবে? আমি সবসময় যোগ্য কাজের ভার যোগ্য লোকের হাতেই দিই।

একেবারে অব্যর্থ মবিল। সুবীরের চাকা না ঘুরেই পারে না। সুবীরও অবশ্য তেমন কাঁচা ছেলে নয়। তেলে চুবচুবে হয়েও তার খুঁটি ছাড়ল না, —তাহলে যোগ্য লোকের জন্যে আমের ভাগটা সেইরকম যোগ্যই হওয়া উচিত।

—সে তো বটেই। সে কি আর বলতে হবে? তোমার জন্যে চারটে আম আগে সরিয়ে রেখে তারপর বাকিটা সমান ভাগ হবে।

সুবীর নিজের কৃতিত্বে খুশি। কিন্তু বড়বাবু অলক্ষ্যে প্রমাণ করে দিলেন যে তাঁর কাছে সুবীর এখনো শিশুই। ওই চারটে আধপাকা আমের দাম চল্লিশ টাকার থেকে অনেক কম। তাও সে আম চারটে বড়বাবুর নিজের ভাগ থেকে গেল না। গেল সকলের ভাগ থেকে।

পরদিন গজেন আবার এল। একটা তৈরি হয়ে থাকা চোথায় নাম সই করল। নামটা লিখল 'গজেন'। কিন্তু দেখতে হল অনেকটা 'ভজহরির' মতো। অনেক কসরত করে নামটা লেখার পর বলল—বাবু, এবার আমি গাছটা কাটতে পারব তো?

একটু আগেই পকেটে চল্লিশটা টাকা ঢুকেছে। তাই গজেনের মূর্খতায় এবারেও না রেগে গিয়ে বড়বাবু মুখে একটা দেবদূত মার্কা হাসি বিলিয়ে দিলেন। বড়বাবুর হাসি দেখে গজেন প্রথমটায় কৃতার্থ হয়ে গেল আর পরের কথাটা শুনেই পাথর হয়ে গেল।

—মাস খানেক পরে এসে খবর কোরো। তার আগে তো কিছু হবে না।

হতাশ হয়ে গুটি গুটি বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া গজেনের তখন আর কী বা করার থাকতে পারে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা গজেনের কাছে সুযুক্তিটা এসে গেল একেবারে ভগবানের আশীর্বাদের মতো। বিকেল বেলা গজেন যখন সাইকেল রিক্সাটা নিয়ে ট্রিপে বেরোতে যাচ্ছে, বাড়ির সামনেই দেখা হয়ে গেল সুরেশ সাঁতরার সঙ্গে। গ্রাম সম্পর্কে গজেনের খুড়ো।

—আরে গজেন, তোমার এই আমগাছটা তো দেখি ঘরের উপরে হেলে পড়েছে। ওটা কাটিয়ে ফেলার ব্যবস্থা কর। নইলে কুনদিন না কুনদিন তোমাকে ঘর সুদ্ধ চাপা দিয়ে দিবে।

—কী করি বলো তো খুড়ো। গাছটা কাটার হুকুম পাচ্ছিনি। টি পেলিং কমিটি থেকে হুকুম না পেলে নাকি গাছ কাটা যাবে নি। তা সে কমিটির অফিসে গেছলুম। তারা বলছে হুকুম হতে একমাস লাগবে।

—কিন্তু একরম বিপদ মাথায় নিয়ে ঘরে থাকবে কী করে? যে কুনো একটা ঝড়-ঝাপটা এলেই তো গাছটা পড়ে যাবে। তখুন কী হবে? আমি বলি কি উসব কমিটি ফমিটি বাদ দাও। ওরা একমাসের জায়গায় এক বছরও কাটিয়ে দিতে পারে। তুমি বরঞ্চ আমাদের এম এল এ-কে গিয়ে ধরো। এম এল এ কে, চেনো?

—আমি আর কোথিকে চিনব। তারা হল সব বড় বড় লোক।

—আরে না না। আমাদের এম এল এ খুব ভালো লোক। লোক তো নয়, মহিলা। ওই যে সোমা দত্ত দিদি। মনে নেই? গত ইলেকশনেই তো ভোট চাইতে আমাদের পাড়ায় এসেছিল।

গজেনের মনে পড়ে গেল। সোমাদিদি ভোট চাইতে এসে বিনয়ে গলে গলে পড়ছিল। কত হাসি, কত নমস্কার। হাতদুটো জড়ো করেই আছে। ভাব দেখলে মনে হবে ভোটাররা যদি চাঁদ চায় তো আঁকশি বাড়িয়ে চাঁদটাই পেড়ে এনে দেয়।

তবু গজেনের মনের সন্দেহটা যায় না। ভোটের সময় এমন তো সবাই করে। তারপর সব ভুলে যায়।

সুরেশখুড়ো সাহস দিল—না না, তুমি যাও। গিয়ে বলো। নিশ্চয় একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মনে সাহস পেয়ে গজেন সকালেই গেল সোমাদিদির সঙ্গে দেখা করতে।

সোমাদিদির বাড়িতে অনেক লোকের ভিড়। ভিড় ঠেলে এগোনোই মুস্কিল। সকাল আটটা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেলা এগারোটায় কথা বলার সুযোগ পেল। তিন ঘণ্টার রোজগার বরবাদ।

দিদি সব কথা মন দিয়ে শুনলেন, —ঠিক আছে। আমি দেখছি কী করা যায়। তুমি বরং মিউনিসিপালিটির কাছে একটা দরখাস্ত জমা দিয়ে দাও। তারপর আমি দেখব।

সর্বনাশ। আবার দরখাস্ত।

—দিদি, আমি তো দরখাস্ত লিখতে জানি নি। কী হবে?

দিদি ডি এফ ও অফিসের বড়বাবু নয়। জন প্রতিনিধি। পাশের একজনকে বললেন—ওরে দীপক, দে তো বাবা ওর দরখাস্ত লিখে।

দীপক গজেনের হয়ে একটা দরখাস্ত লিখে দিল। কোনো টাকা-পয়সা চাইল না। গজেন কৃতার্থ হয়ে গেল। দরখাস্তের নিচে আবার সেই 'ভজহরি' মার্কা সই হল, আর সেই দরখাস্ত নিয়ে গজেন চলল কমিশনার সাহেবের অফিসে।

এবারে তো হাতে ব্যাগভর্তি আম নেই। কমিশনারের অফিসে বড়বাবু তো দূরের কথা, তস্যর তস্য ছোটবাবুর কাছে, না কি কোন পিওন আর্দালি হবে তার কাছে তাড়া খেয়ে ফিরে আসতে হল। এখানে ওসব চিঠিপত্র জমা নেওয়া হয় না।

গজেন আবার ফিরে চলল সোমাদিদির কাছে। এখন এই বিপদে সোমাদিদিই ভরসা। জন প্রতিনিধি বলে কথা। বড়ই আপনজন। আবার সেই তিনঘণ্টা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকার পর সোমাদিদির দর্শন। কিন্তু এই দু'দিনে চাকা অনেকখানি ঘুরে গেছে।

গজেন তার আমগাছ কাটার তদ্বির তাগাদা করার জন্যে কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে সে খবরটা আর কেউ না রাখুক, একজন কিন্তু ঠিকই রাখছিল। সে তার দাদা শ্রীধর। ভাইকে বিপদে আপদে আগলানো তার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

গজেন প্রথম যেদিন সোমাদিদির সঙ্গে দেখা করে এল সেদিন বিকেলেই শ্রীধর গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। একই পার্টির একজন এম এল এ আর একজন ওয়ার্ড কমিটির মেম্বার। যখন যায় তখনই কথা হয়। তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হয় না।

—সোমাদি, গজেন এসেছিল একটা আমগাছ কাটার ব্যাপারে?

একটু চিন্তা করে সোমাদিদির মনে পড়ে গেল—হ্যাঁ, তা এসেছিল। ও নাকি ট্রি ফেলিং কমিটির পারমিশন পাচ্ছে না, ওকে আমি কমিশনারের কাছে দরখাস্ত জমা দিতে বলেছি।

—ব্যাপারটা কিন্তু আপনি যতটা সোজা ভাবছেন ততটা সোজা নয়। এর মধ্যে অন্য ব্যাপারও আছে।

—কী ব্যাপার? লোকটা তো শুনলাম তোমারই ভাই হয়।

—হ্যাঁ, তা হয়। আর তাই নিয়েই তো ঝামেলা। যে গাছটাকে সে নিজের বলে চালাচ্ছে সেটা আসলে তো তার একার নয়। ওটা এজমালি গাছ। যে জমিতে গাছটা হয়েছে তাতে আমারও ভাগ আছে। তাই নিয়ে বিবাদও আছে। সে বিবাদেরও ফয়সালা না হলে তো ও ওই গাছ কাটতে পারে না। তাছাড়া আমি জানি, ও ভোটের সময় অন্য পার্টিকে ভোট দিয়েছিল। ওদের ক্যাম্পে খুব লুচি-মাংস খেয়ে ওদের সঙ্গেই দল বেঁধে গিয়ে ভোট দিয়ে এসেছে। আমার কাছে খাঁটি খবর আছে। এখন ওকে কোনো একটা দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে দেবার আগে একটু ভাবনাচিন্তা করা দরকার।

ব্যস্। এইটেই হল আসল কথা। একে বলে ভেনাম ইঞ্জেকশন। জায়গা

মতো ফুঁড়তে পারলে মন্ত্রের মতো কাজ করে। দেশটা রংয়ের দেশ। রং দেখে কাজ হয়। রং দেখেই ঠিক হয় জনপ্রতিনিধি তার কাজটা কতটুকু করে দেবে আর কতটুকু দেবে না। শুধু কি তাই? সোমাদিদির গদি রাখার জন্যে শ্রীধরের মতো লোকেরাই হল হাতের লাঠি। সেই লাঠি, যার মহিমার পবিচয় দেবার মন্ত্র হল—যিস্‌কি লাঠি উস্‌কি ভৈঁস। ওরা ফস্কে যাওযা মানে তো হাতের লাঠিটাই গেল। সোমাদিদি সেটা হতে দিতে পারে না। হাতে লাঠি না থাকলে লাঠি খেলা হবে কী দিযে? আবাব লাঠিটা খেলতেও হবে এমন উঁচুতে বেখে গজেনের মতো লোকেরা হাজার চেষ্টাতেও তার নাগাল পাবে না।

—ও, তাহলে এই ব্যাপাব? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গাজেন এরপর আমার কাছে এলে ওকে আমি থানার ও. সি-র কাছে পাঠিয়ে দেব। তুমি ও. সি-কে ফিট করে রাখো যাতে সে ওকে গাছেব মালিকানা নিয়ে তোমার সঙ্গে রফায আসতে বাধ্য করে।

মনেব আনন্দে নাচতে নাচতে শ্রীধর চলে গেল থানায়। কলকব্জা সব ঠিক। এখন গজেন এসে মাথাটি গলাবার অপেক্ষা।

গজেন যখন সোমাদিদির কাছে গিযে জানাল যে কমিশনারের-অফিসে দরখাস্ত জমা নেযনি তখন সোমাদি মুখে খুব সমবেদনা জানাল। সুযোগ পেয়ে কমিশনাবের পার্টিব আদ্যশ্রাদ্ধ করল। আব ভবিষ্যতে গজেন যেন কোনোদিন ওদের পার্টিকে ভোট না দেয তার জন্যে প্রতিজ্ঞা কবিয়ে নিল। তারপর বলল, তুমি এক কাজ কবো। থানাব ও. সি-র সঙ্গে দেখা করো। তাকে সব কথা বলো। আমার নাম করে বলবে। ও. সি. একটা ব্যবস্থা করে দেবে। আমি ও. সি-কে ফোনে বলে দেবখন।

বেচাবা গজেন বিক্সা চালায়। রাস্তাঘাটে নজবানা সেলামি যা কিছু দেয সে সব দেয ওই কনিষ্টবল বাবুর হাতেই। তাব দৌড় ওই পর্যন্ত। থানার বড়বাবু পর্যন্ত কোনোদিন যাবার দবকারও হয়নি, সে সাহসও ওব নেই। আজ সোমাদি পাঠাচ্ছে। সেই সাহসে চলল বড়বাবুব সঙ্গে দেখা করতে। ভয কি। গিয়ে বলবে সোমাদি—এম.এল.এ. পাঠিয়েছে।

থানায় গিয়ে গজেন যে অভ্যর্থনাটা পেল সেটা তার সব কল্পনাব বাইরে।

বড়বাবু নিজের টেবিলের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসতে দিল। গজেনের সব কথাই মন দিযে শুনল। তাবপর 'হুম্‌' করে একটা হুঙ্কার ছাড়ল। গজেনের মনে আশা হল, কি জানি কাজটা হযে যাবে।

কিন্তু বড়বাবু এরপর যে কথাটা বলল তাতে তার হাত-পা নিথর হয়ে গেল। বড়বাবু বলল, দেখ বাপু, আমার কাছে যা খবর আছে তাতে তোমাদের ওই আমগাছটার মালিকানা এখনো সাব্যস্ত হয়নি। ওটা এজমালি গাছ। তোমার দাদারও ভাগ আছে। গাছটা তোমার একার নয়। গাছের মালিকানা সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তো গাছ কাটার পাবমিশান পাওয়া যাবে না বাপু।

—না বাবু, গাছটা আমাব। আমার বৌয়ের হাতে লাগানো গাছ। এতে আর কারো কুনো ভাগ নেই।

—বললে তো হবে না। গাছ কে লাগিযেছে সেটা কোনো ব্যাপার নয়। কার জমিতে লাগানো আছে, সেটাই আসল কথা। তুমি বুক ঠুকে বলতে পারবে ওটা তোমার জমিতেই লাগানো হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। উটা তো আমারই জমি। আমাদের ঠাকুর্দাব সম্পত্তি। আমি আর দাদা যে যার অংশ ভাগ করে নিয়ে বেড়া দিয়ে দিইছি।

—ভাগ যে কবেছ তার কোনো দলিল দেখাতে পারবে?

—আজ্ঞে দলিল তো এখুনো হযনি। কিন্তু জমির ভাগাভাগি তো পাঁচজনকে সাক্ষী রেখেই হয়েছে।

—ওসব সাক্ষী-টাক্ষী গুলি মারো। আসলে দলিল না হলে ভাগাভাগির কোনো দাম নেই। আমি একা তোমাকে ওই গাছ কাটার পাবমিশন দিতে পারব না।

—তাইলে?

—তাইলে আর কি। তোমার দাদার সঙ্গে একটা মিটমাট করে নাও। তোমাদের আপোয়ে নিষ্পত্তি হযে গেলে আমি আর কিছু বলতে যাব না।

গজেনের মাথায় তখন আর কিছু খেলছে না। চুপচাপ থানা থেকে বেরিযে এল।

ঘরের সামনে রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিল শ্রীধর। শ্রীধর বাবু। ভাইকে দেখে খুবই দবদ-মাখা গলায় বলল, কিরে, তোর গাছ কাটাব ব্যবস্থা কিছু হল? পারমিশন পাওয়া গেল?

আহা হা! এমন নির্দোষ সরল অমায়িক প্রশ্ন আর হয না।

গজেন দাদার দিকে কড়া চোখ তুলে বলল, আচ্ছা দাদা, বলো দিকিনি, এই আমগাছটা কার?

—কার আবার, তোর।

—তাইলে থানার বড়বাবু কেন বলল, ওটা এজমালি গাছ? গাছের মালিকানার নিষ্পত্তি না হওয়া পজ্জন্ত গাছ কাটার হুকুম হবে নি?

—তুই আবার থানায যেতে গেলি কী করতে? জানিস তো পুলিশে ছুঁলে আঠাবো ঘা। থানা পুলিশ করতে গেলেই তার ক্যাচাল অনেক।

—কী কবব? সোমাদিদি যে যেতে বলল।

—ইস্‌। শ্রীধর মুখে চুক্‌চুক্‌ শব্দ কবে ভাইকে সমবেদনা জানাল, তোকে কে যে কী যুক্তি দেয় বুঝি না। এব-তাব যুক্তিতে চলে নিজেই বিপদে পড়ছিস। অথচ আমি যে এখানে আছি, আমার যুক্তিটা শুনছিস না। আমার যুক্তি শুনলে তোকে এত ঝামেলায পড়তে হত না।

— তোমার যুক্তিটা কী, তাই শুনি।

তাইলে বলি শোন। তুই ওই গাছটা আমায বিক্রি করে দে। আমি ওটা কাটিয়ে নিচ্ছি।

গজেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলল, কত টাকা দাম দিবে?

—দামটা তো এখেনে কোনো ব্যাপার নয। আসলে তোকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাটাই আমার উদ্দেশ্য। তা দাম চাইছিস যখন দেবখন কুড়িটা টাকা।

—বলো কি দাদা? ওই গাছে যা কাঠ আছে তার দাম তো হবে কম করেও পাঁচশো টাকা।

—আবার সেই এক কথা? দামটা এখেনে কুনো ব্যাপার নয, তোকে এই বিপদ থেকে উদ্ধাব পেতে হবে তো? নাকি এই বিপদ মাথায নিযে থাকবি? এটা ঠিক কথা যে ওই গাছ কাটার পারমিশন তুই কোনোদিন বার করতে পাববি নি। আমি ভালো যুক্তি দিলুম। মানতে চাস তো ভালো। নইলে নিজেরটা নিজে দেখে নে। আমি কিছু বলতে যাব নি।

গজেনেব যাঁতাকলে পড়া অবস্থা। এগুলেও বিপদ, পেছুলেও সর্বনাশ। ডুবন্ত লোকের শেষ কুটিগাছটি আঁকড়ে ধরার মতো বলল, অন্তত একশোটা টাকা দাও।

শ্রীধব মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিযে বলল, তাইলে অন্য কাউকে বিক্রি কবে দেখ না, একশো টাকা পাস কিনা। তাবপর একটু থেমে আবার বলল, ঠিক আছে, তুই বলছিস যখন, আবো কুড়িটা টাকা বাড়িযে দিলুম। ওই চল্লিশটা টাকাই দেবখন। আমাকেও তো গাঁটের কড়ি খরচা করে গাছটা কাটাতে হবে। এখন রাজি থাকলে বল।

বাজি হওযা ছাড়া গজেনেব কাছে দ্বিতীয কোনো রাস্তা ছিল না।

এব পরের ব্যাপারটা খুবই সংক্ষিপ্ত। দশ বছরের ইতিহাস তিন ঘণ্টায় শেষ। আমগাছটা উঠোনের অনেকখানি জাযগাকে ছায়া দিয়ে ঢেকে বাখত। এখন সেখানটায উন্মুক্ত বোদ্দুর।

গজেনের বৌ আঁচলে মুখ চেপে কাঁদল। গাছটাকে সে মেযের আদরে বড় কবেছিল। তার ফুঁপিযে ফুঁপিয়ে আঁচলচাপা কান্না কানে শোনা গেল, কিন্তু ওই আমগাছের কান্নাটা, যদি সে কেঁদে থাকে, শোনা গেল না। আর শোনা গেল না কিছু নেপথ্য হাসি—অফিসের বাবু, থানার বাবু, জনপ্রতিনিধি আব সবার উপরে রক্তের সম্পর্ক থাকা আপন দাদার হাসি—খি-খি-খি।

অনু কবিতা

পরিচালনা : কাব্যিটকেল কবিরাজ

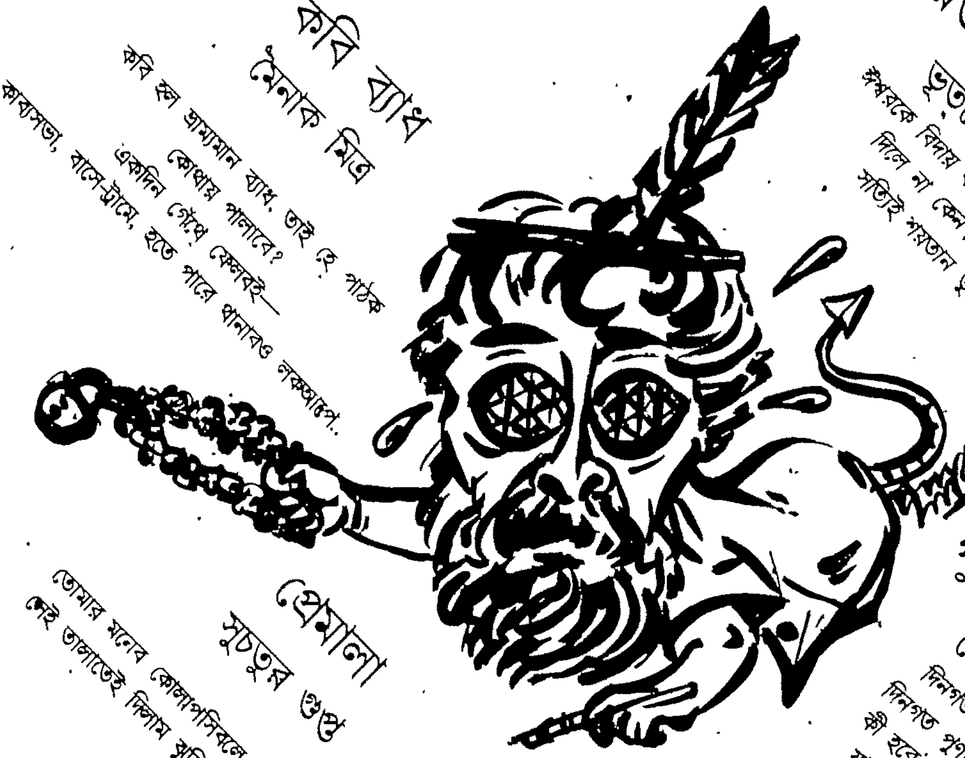

কবি ব্যাধ

মৈনাক মিত্র

কবি হন ভ্রাম্যমান ব্যাধ, তাই হে পাঠক
কোথায় পালাবে?
একদিন গোঁফ ফেলবই—
কাব্যসভা, বাসে-ট্রামে, হতে পারে প্রানাবও লক্ষ্যভেদ..

শয়তান, শয়তান তুমি

ভূতলেন্দু ভৌমিক

ঈশ্বরকে বিদায় করেছি, তবু শয়তান
দিলে না কেন পুরস্কার?
সত্যিই শয়তান তুমি!

প্রেমালা

সুচতুর গুপ্ত

তোমার মনের কোলাপসিবলে ঝুলিয়ে দিয়েছ তালা?
সেই তালাতেই দিলাম ঝুলিয়ে আমার প্রেমের মালা।

পুণ্যবানের জ্বালা

শেখরেন্দু দত্ত

দিনগত পাপ ক্ষয় হয়
দিনগত পুণ্য কেন নয়,—
কী হবে, সেই ভদ্রলোকের
যার শুধু পুণ্যই সঞ্চয়!

কাব্যিট

কাব্যিটকেল কবিরাজ

কাব্যিট কেল কেল কাব্যিট
কবি রাজ রাজ কবি!

দুষ্ট চতুষ্টয় আধুনিক কবির পাল্লায় পড়িয়া কাব্যিটকেলের চাকুরি 'নট' হইবার দশা। এনারা ক্ষেপিয়াছেন যে, আপাতত কিছুদিন অনু কবিতার চর্চা করিবেন। অনু কবিতা, যাহার শুরু হয় না, শেষ হয়। সুতরাং ধারাবাহিক কবিতার পাতাটি এখনকার মতো সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিল। কাব্যিটকেলের দুর্ধর্ষ আধুনিক কবিতাটি সমাপ্ত হইতে পারিল না, এজন্য অনুরাগী, বিশেষত অনুরাগিনীগণ অনুযোগ না করিয়া তাঁহার অনু কবিতাটি অনুধাবন করুন। কী! বলিতে বাধ্য হইতেছেন তো যে এমন অনু কবিতা বাপের জন্মে, এমনকি মায়ের জন্মেও পড়েন নাই! তবে? হাততালি দিন। জোরসে।

—ভবদীয় কা. ক.

এবারেও ফার্স্ট

সুজয় চট্টোপাধ্যায়

দোতলা বাড়ির বাইরের বারান্দা। তার সামনে রাস্তায় একটা ভিখিরির কালো মেয়ে। বয়েস খুব জোর ছ' বছর। পরে আছে একটা রঙ-ওঠা প্যান্ট। প্যান্টটাতে যত ছেঁড়া তত ময়লা। ঘাড়ের কাছে ছোপ ছোপ হয়ে আছে। চোখে পিচুটি, দাঁতে কালচে কালচে দাগ ধরা। মাথার চুলে জট পড়েছে। চুলগুলোর ওপর দিয়ে উড়িষ্যার ঝড় যাবার পর যেন কেউ আর হাত দেয়নি ওখানে। বাচ্চুর মা বলে—"ওদের মাথায় ভীষণ উকুন।"

বাচ্চুর দাদু শিল্পী মানুষ। তিনি পঞ্চাশবছর ধরে ক্যামেরা ঘাঁটছেন। গত মাসেই জাপান থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড এসেছে। ফার্স্ট হওয়াটা দাদুর কাছে কিছুই না। দাদু বাচ্চুকে বলে—"তোমার এখন সবে ক্লাস থ্রি, দাদুভাই। অনেক বড় হতে হবে তোমায়। দাদু অনেক পুরস্কার, এমনকি রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়েছে। টিভিতে দেখিয়েছে সারা পাড়া, এমন কি বাচ্চুর স্কুলের দিদিমনিরাও পর্যন্ত ওর গাল টিপে, চুল ঠিক করে দিয়ে বলে—"তোর দাদুই দিলীপ বসু নাহঃ।" বাচ্চু ঘাড় নাড়ার পর দিদিমনিরা বলে—"সেদিন ওনার প্রাইজ নেওয়া দেখলাম। আমরা তো বাড়িতে বলি, ওনার নাতি আমাদের স্কুলেই পড়ে।"

কালো মেয়েটা বারান্দার দিকে তাকিয়ে তখন থেকে লাফ দিয়েই যাচ্ছে। যেন এবারেই পেয়ে-যাবে পেয়ে-যাবে ভাব। গ্রিলের ওপর থেকে বাইরে হাত বাড়িয়ে রেখেছে বাচ্চু। হাতে ধরা দুটো রুটি। গতকাল রাতে খেয়ে বেশি হয়েছিল। তারপর পিঁপড়ে ধরবে বলে মা ফেলে দিচ্ছিল।

মেয়েটা লাফিয়ে উঠছে তিড়িং করে। একটুর জন্য ধরতে পারছে না। আর বাচ্চু ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ফেলছে। এই নিয়ে কতবার হল কে জানে। মেয়েটাও ট্যাটা আছে। ওদুটো না হাতিয়ে ছাড়বে না, বাচ্চুর মা ভেতর থেকে ডাকল, বাচ্চু সাড়া দিল। সেই ফাঁকে মেয়েটা সজোরে লাফ মেরে রুটিটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল। বাচ্চু বেখেয়াল হলেও ঝট্ করে বাঁহাতে গ্রিল ধরে হাতটা আরো ওপরে তুলে দিয়েছে। প্রথম প্রথম মেয়েটা এটাকে একটা খেলা ভেবেছিল। হাসছিল মিটিমিটি। তারপর যখন কাঠফাটা রোদে দরদরিয়ে ঘামতে লাগল, গা-মাথা ঝরে পড়তে লাগল রুটির দাম্‌গুলো, মেয়েটার মুখ ফ্যাকাসে মেরে গেল। ওরও দোষ নেই, সেই যে যেখানে ক'দিন আগে বন্যা হয়েছে, ওখান থেকে ওরা পালিয়ে এসেছে। কি করে কে জানে।

বাচ্চু টিভিতে দেখেছিল কত জল। ওর দারুণ মজা লেগেছে। কি সুন্দর লোকগুলো জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ধেড়ে ধেড়ে লোকগুলোর গায়ে একটা জামা অব্দি নেই। প্যাণ্ডেল হয়েছে কিন্তু পুজো হয়নি। বাচ্চুর এবারে ন'টা জামা হয়েছে, লোকগুলো সব প্যাণ্ডেলের বাঁশে চড়ে আছে। ওদের কী মজা! বাচ্চুদের পাড়ায় এবারে সুবর্ণজয়ন্তী। ই টিভি থেকে ক্যামেরাম্যান এসছিল ছবি তুলতে। পাড়ার ফ্যাংশন চলেছে তিনরাত ধরে। ফাটাফাটি কাণ্ড। বাচ্চু দিনরাত ওখানেই পড়েছিল। বন্যার ওখানে ঠাকুর নেই, বাচ্চুর খারাপ লেগেছে। কিন্তু ওটাও তো একটা নতুন মজা। কত জল। কি দারুণ সাঁতার কাটা যাবে হুপুস হুপুস করে। সেদিন দাদু বলছিল—ইস ওদের কি কষ্ট বল তো দাদুভাই। কত কত সংসার চলে গেছে, মানুষ মরে গেছে। কত মেয়ের বাপ, কত সধবার স্বামী-সন্তান ধুয়ে গেছে নিমেষে! মা বলছিল—সত্যিই এবারে পুজোটাও ওদের হল না। কি খারাপ লাগে। ইস্। হা ভগবান, তুমি কি পাষাণ।

কালো মেয়েটা কিন্তু, এখনো প্রাণপণ লাফিয়েই যাচ্ছে। ও বুঝতে পেরেছে ছেলেটা ওকে রুটি দেবে, কিন্তু ওকে লাফিয়েই নিতে হবে। বাচ্চু বলছে—"আর একটু জোর লাফা। তালেই তো পেয়ে যাবি।" বাচ্চু গ্রিল বেয়ে ওপরে উঠে আছে তাই মেয়েটা কিছুতেই হাত পাচ্ছে না। মেয়েটার খালি পায়ের নিচে ছোট ছোট হাজা গোছের হয়েছে। ওগুলো লাফাতে লাফাতে জ্বালা করছে, তাই মাঝে মাঝে চুলকে নিচ্ছে। মেয়েটার পাশে একটা খেঁকি কুকুর বসে হাঁ করে দেখছে রুটি দুটো। মেয়েটার মা আবার কোন গলিতে ঢুকেছে সাহায্য চাইতে।

দাদু পরশু খেতে বসে বলছিল—রিয়েলিটি এখন ব্যাকওয়ার্ড, চাই ন্যাচরালিটি। আমার সঙ্গে এই নিয়ে রাশিয়ান এক সাংবাদিকের কনসার্ন হচ্ছিল সেবারে। ওয়েস্টার্নরাও তাই বলছে।

মেয়েটা আর পারছে না। হাঁপিয়ে গিয়ে কি বড় বড় নিশ্বাস টানছে

কথা যেন পরিষ্কার বলতে পারে না। আধো আধো গলায় বলছে—"দাও না।" বাচ্চু রুটিদুটো একটু নামিয়ে বলছে—"এই নে" মেয়েটা সরল-সোজার মতো হাত তুলতেই বাচ্চুও হাতটা তুলে নিচ্ছে আবার। মেয়েটার মাথার ভেতর শোঁ শোঁ করছে। আর একবার চোখদুটো কাঁদো কাঁদো করে বলল—"ফেলে দাও না। হাত যাচ্ছে না।" বাচ্চুর এবার সত্যিই হাসি পেয়ে গেল।

এভাবে আরো খানিকক্ষণ চলল, বাচ্চুর আবার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে। সকালে মেয়েটা যেই না জানলার সামনে এসে হাত বাড়িয়েছে দাদু হঠাৎ ডাকল বাচ্চুকে। বাচ্চু ছোটঘরে ইংলিশ পড়ছিল।

মেয়েটা এবার মরীয়া। আর পারছে না সত্যিই, এইটুকুনি চেহারা নিয়ে আর কতবার পারে? হঠাৎ বারান্দার ওপরের ছাদ থেকে দাদুর গলার আওয়াজ —"দাদুভাই।" রুটিদুটো নেমে এল মেয়েটার হাতের কাছে। মেয়েটা যেন কত জন্মের পর রুটি দেখছে! হামলে পড়ল রুটিদুটোর ওপর। কুকুরটা কী ভেবে এগিয়েও আর এগোলো না।

রুটি দুটো দিয়ে বাচ্চু আর তাকাল না। ছুটল ছাদে। মা বলল—"কি হল, তেল মাখ।" বাচ্চু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল—"আসছি, দাঁড়াও না।"

বাচ্চুর বাবা বসে ডাইনিং টেবিলে খাচ্ছিল। অফিসে রোজ দেরি হয়ে যায় আর নাকেমুখে গুঁজে দৌড়তে হয়। বাচ্চুর মাকে বলল—"ছেলে কোথায় গেল?"

বাচ্চুর মা রান্নাঘর থেকে খুন্তিতে করে একটা গরম কইমাছ ভাজা এনে বাচ্চুর বাবার থালায় দিয়ে বলল—"কোথায় আবার, দাদুর কাছে।"

বাচ্চুর বাবা বলল—"বাবা ছাদে কী করছে?"

বাচ্চুর মা হেসে বলল—"শুনলে না। দাদু আর নাতিতে প্ল্যান হল। ঐযে একটা ভিখিরির বাচ্চা মেয়েকে বাচ্চু রুটি দেখাবে আর মেয়েটা রুটি দেখে লাফিয়ে ধরতে যাবে; বাবা তখন ছাদ থেকে ওর কয়েকটা শট নেবেন। সেদিন বলছিলেন না, এবারের সাবজেক্ট হল "হাঙ্গরী"।

বাচ্চুর বাবা বলল—"বাব্বা! বাবা পারেও বটে। আসলে ন্যাচরাল না হলে তো হয়ও না। ওহোঃ। শিল্পীর মাথা জিনিয়াস।"

বাচ্চুর মা বলল—"হ্যাঁ। এবারেও ফার্স্ট প্রাইজটা বাবাই পাবেন, নাগো?"

বাচ্চুর বাবা দু'আঙুলে একটু চাপ দিতেই মাছটার বুকের কাছটা ভেঙে একরাশ গরম ধোঁয়ার হল্‌কা বেরিয়ে গেল।

রসকেলি

ভোট

আরে হেডমাস্টার মশাই যে, আসেন আসেন। কি মনে করে?

শিবু, এবারে আমি ভোটে দাঁড়াচ্ছি, জানো তো?

না, তাতো জানিনে মাস্টেরবাবু।

সে কথাই বলতে এলাম। আমি দাঁড়াচ্ছি, ভোটটা আমাকেই দিও।

কথা দিয়ে ফেলেছি যে মাস্টেরবাবু। রাজেনবাবু এয়েছিল। তাহাকেই ভোট দেব বলে দিইচি।

রাজেনবাবু আর আমার মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ, সেটা তুমি নিজেই ভেবেচিন্তে দেখ।

ভেবেচিন্তে দেখলে তো আপনাকেই দিতে হয়। কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছি যে, সেটাই তো মুস্কিল হল।

কথা দিলে কিছু হবে না। ভোটের বাজারে আবার কথা দেওয়ার কি আছে? তুমি তো আর আগে জানতে না যে আমি দাঁড়াচ্ছি, তাহলে কি আর তুমি রাজেনবাবুকে কথা দিতে?

সেটা তো ঠিক কথা কয়েছেন। আমি আগে জানতি পারলে ওনাকে কোনো মতেই কথা দিতুমনি। এখন তাই ভাবতিছি, কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি কি করে?

ভোটের বাজারে কথার খেলাপ বলে কিছু নেই।

এতে পাপ হবি নে, মাস্টেরবাবু?

ভোটে কোন পাপ নাই।

মিথ্যে বললেও নেই?

না না, ভোটের ব্যাপারে মিথ্যে বলে কিছু নেই। পাপ বলে কিচ্ছু নেই।

আপনি মাস্টেরবাবু, তা বলতিছেন?

হ্যাঁ, আমি বলছি, ভোটের বাজারে মিথ্যে কথায় কিচ্ছু পাপ-টাপ হয় না।

মিথ্যে বললে পাপ হবে নে?

না না, পাপ আবার কি?

তবে আর কি, আমি আপনাকেই দেব। আবার কথা দিলুম।

—প্রণয় কৃষ্ণ গোস্বামী

বাঙালির পালা-পার্বন

হোলি

দিব্যেন্দু দাস

হোলি হ্যায়। হ্যা-হ্যা-হ্যা। রাগ চামুণ্ডা গাইতে গাইতে বাঙালির হোলি খেলা। কি বাহার। গুপীগাইন বাঘাবাইন। খোল কত্তাল। দল দল ভূতের রাজা। সত্যজিৎ টুনি জ্বালিয়ে এক পিস্ দেখিয়ে গেছে। সামনে এক দঙ্গল বাইসন। যৌবনে-জল-ঢালা বয়সের। একটু তফাতে পেছন-পেছন নেড়িদের দল। হিন্দি গান গাইতে গাইতে পাড়া ভ্রমণ। মাঝে মাঝে ঐ রাগ। মাথায় আবির মেখে সব বীর হয়ে বেরোলেন। ঘণ্টা তিনেক বাদে মুখে আলকাতরা লাগিয়ে কালো যোগেশ। অ্যাকাডেমি থেকে সোজা কলঘরে। নিজের বৌ 'চোর—চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠল। গলা শুনে তবে চেনা গেল—চোর নয়, মিন্‌সে। তারপর 'দাও দাও।' রুবি গামছা দাও, গেঞ্জি দাও, গায়ে মাখা সাবান দাও, বাসন মাজা ছোবড়া দাও। কলঘরে আধ ঘণ্টা কসরৎ করে বাবু বাইরে এলেন। বন মোরগ। লাল কপাল, বেগুনি নাক, কালো কান, গোলাপি গাল, চোখের চারপাশে চিক্‌চিক্ সিলভার, চিবুকে হলুদ, হাতে ভুষো কালি। আহা যেন আন্দামানের নরখাদক কালিঘাটে বলি দেখতে এসেছে। বাজার যেতে বলো, মুখে কাগজ বিছিয়ে বসে পড়বে। দুলালের তালমিছরি, বলরামের ল্যাঙট, কুমিরের চাষ, লোকসভায় অলৌকিক কাণ্ড। লণ্ডভণ্ড। বৌ ফ্রিজ-কুড়ুনি। যা পারো রাঁধো। সোয়াবিন, স্যাকারিন, দৈকর্মা। অফিস-পথে গ্যাস বুক করতে বলো। থার্ড সিলিণ্ডারের অ্যাপ্লাই করে আসবে। ইলেকট্রিকের বিল জমা দেয় পাড়ার বেকার। পায়খানার পাল্লায় বর্ষার রাত। ছিটকিনি ফুটো ছেড়ে হাফ্ ইঞ্চি দূরে হাঁপাচ্ছে। কিছুতেই সেঁদুচ্ছে না।। বাবুকে মিস্ত্রির কথা বললে বলে, 'উল্টো দিকে মুখ করে বসো। প্যান্ হল পতাকার মতো। সোজা-উল্টো নেই। তাছাড়া ত্যাগ হবে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য। হবে নিরপেক্ষ। পাত্রবিচার কোরো না। খোকার ডেলিভারি ভুলে গেলে? আগে পা, তারপর কান—।

আবার চ্যাঙদোলা করে বাড়ি। বৌ ঠোঙা ঝেড়ে বাবুর দু'পায়ের তলায় আবির মাখিয়ে সাদা কাগজে ছাপ তুলে নিল। আর তো ক'ঘণ্টা। তারপর নারীমুক্তি!

সেই বাবু 'হোলি হ্যায়' করে ফেরেন তিন ঘণ্টা বাদে। যেন যমদূত গরুর গাড়ি করে গড়িয়া থেকে লোক তুলতে গিয়েছিল। লঙ্ ডিস্ট্যান্স জার্নি; কাল বাজার করে রাখেনি। ভেজাল মেখে ভাত খাও। হাত থেকে পেটে দু'ভরি কেমিকেল চলে গেল। বিকেল থেকেই অশনি সংকেত। রাতে 'কম্মোলিনী। ভোরের দিকে রঙ ফ্যাকাসে। পাড়ার ছেলে ডেকে বাবুকে হাসপাতালে। অমন রাঙানো রুগি কিছুতেই নেবে না। ওয়ার্ডে মহামারী লেগে যাবে। এম. ও দেখে বলল ভয়ের কিছু নেই। সিদ্ধিলাভ-মতো হয়েছে। জলে মরিচ গুলে গালে দিন। ঘোর কাটতে কাল ভোর হবে। চাঙ্গা হয়ে চরে বেড়াবে। বাড়ি নিয়ে যান।

আবার চ্যাঙদোলা করে বাড়ি। বৌ ঠোঙা ঝেড়ে বাবুর দু'পায়ের তলায় আবির মাখিয়ে সাদা কাগজে ছাপ তুলে নিল। আর তো ক'ঘণ্টা। তারপর নারীমুক্তি। শাড়ি ছেড়ে শালোয়ার। হাতে পেতলের পিচ্‌কারি। সারা-রারা-রা, তোমার হল সারা, আমার হল শুরু। সারাদিন চা-জল না পেয়ে শ্বশুরটাও শুকিয়ে যাবে। বৌ রঙ খেলে ফিরতে ফিরতে উবে যাবে। মিন্‌সে মামদো—দুটোই খতম। সিঁথির রঙ মুছে ঠোঁটে লাগাও। হোলি হ্যায় রুবি রায়।

জামাইষষ্ঠী

সনৎকুমার মিত্র

'বেলুড় থেকে কসবা যেতে ধরল হাঁপ,
এই গরমে জামাইষষ্ঠী? বাপরে বাপ।'
বলেই বিলুর জামাইবাবু বলল, 'ভাই
আমায় একটু জল খাওয়াবে? ঠাণ্ডা চাই।
আম খাবো না, ঘাম হবে খুব। মিষ্টিটাও—
সুগার হবে, তাই খাবো না, দূর হঠাও।
ফ্রায়েড রাইস, মটর পনীর, মাংস, মাছ
ঢুকলে পেটে করবে শুরু কত্থক নাচ,
তাই খাবো না ওসব কিছু। জানাও মাকে
ভাতের সঙ্গে মাছের ঝোল আর যদি থাকে
টক দই, ব্যস। আর কিছু না।' বিলুর মুখে
এ সব শুনে মা বললেন, 'থাকুক সুখে
এমন সোনার লক্ষ্মী জামাই সবার ঘরে;
বছর বছর এমনি যেন গরম পড়ে।'

হেঁসেল

দই পটোল

বুঝতেই পারত্যাছেন, আপ্নেবা যহন পত্তরপাঠের হেই সংখ্যাডা হাতে পাইবেন তহন সুয্যিদ্যাবের কল্যাণে আপ্নেগো হাড্ডি এক্কেরে জ্বইল্যা পুইড়্যা যইত্যাছে। বোশেখেব রোদ্দুরে আলুভাজ্জা হইবার কালে প্যাটেও যদি মশলাদাব খাবারদাবাব দ্যান তাহ্লি আর ট্যাহের পয়সা খচ্চা কইব্যা চিতায উঠতি অইব না। এমনিতেই জ্বইল্যা যাইবেন। তাই হেঁইবাব আপনেগো প্যাট ঠাণ্ডা কবনেব লাইগ্যা দই-পটলেব পদ বাঁধছি। ভয নাই, খাইয়্যা মোটেই পটল তুলবেন না।

কি কি লাগ্ব : (চারজনের লগে) দশখানা পটল, দেড়শ গেবাম টক দই, দুই চাম্চা আদাবাটা, চিনিও লাগব দুই চা-চাম্চা, লবণ—হেঁইডা আপনেগো লোনাব সোয়াদ মতন দিবেন, মুই আব কি কমু। কিছুডা গবম মশল্লা, দুইহান ত্যাজপাতা, ফড়ন দিবার জন্যি জিবা, ভালা ঘি দুই চাম্চা, কিশমিশ্ পনেবো গেবামেব মতন, লঙ্কাগুঁড়া বেশি দিবেন নি, এক চাম্চাব মতন। হিং-এব গুঁড়া মাত্তর এক চিম্টা।

রন্ধন পোনালি : পটলগুলানের খোসা ছাডাইয়া দু'দিক একটুকুন কইব্যা চিইর‍্যা দ্যান। কড়াইতে ত্যাল ঢালেন। পটলগুলান ভাইজ্যা তুইল্যা বাখেন কড়াইতে। হেঁইবাব কড়াইতে ত্যাল দিয়্যা জিবা, গরম মশল্লা, হিং, ত্যাজপাতাব ফড়ন দ্যান। অগো উপরে ঘি দিলে জব্বব অইব। মশল্লা ভাজ্জা হইয়া যাওনের পব দই ঢাইল্যা দ্যান। হেবপব আদাবাটা, লংঙ্কাগুঁড়া, হল্দিগুঁড়া ফেটাইয়া কড়াইতে জল দিয়্যা দ্যান। দ্যাখবেন, লবণ, চিনি আর কিশমিশ দিতে ভুলবেন নি য্যান। খুন্তিডা হাতেব কাছে আছে তো? সবকটা দব্য নাইড়্যা লন। ভাজ্জা পটলগুলান দিয়্যা দ্যান হেই মশল্লাব মদ্দি। পিবিতির মতন সবক'টা মাখোমাখো হইয়্যা গ্যালে নামাইয়া লন। হেঁইবাব খাইযা দ্যাহেন দিহি দই-চিঁড়া আব দই-ইলিশ কোহানে লাগে।

দই বাইগন

বিযাবাড়িতে নিমন্তন্ন খাওনের কালে দ্যাখ্ছেন তো। বাইগন ভাজ্জা দিয়্যা শুরু আব দই-চাটনি দিয়্যা খ্যাটনের শ্যাষ। হেঁইবাব যদি দই আব বাইগন একলগে দিয়্যা একখান পদ আপনেগো জন্যি বানাইয়া দিই, তাইলে মন্দ লাগব না। হেই দই-বাইগন, ভদ্দরনোকেবা যেডারে বইগন-বাযতা কইয্যা থাকেন, তাব তিন বকম সোযাদ। তয এহানে আমবা বাইগনকে ভাসা ঘিতে ভাইজ্যা দই মাখাইয়্যা আপনাগো সামনে লইয্যা আনত্যাসি।

কি কি লাগব : মাঝাবি সাইজেব আস্ত বাইগন (বোঁটাটা ফ্যালাইয্যা দেবেন নি য্যান) একখান, আড়াই চাম্চা ঘি, কালা সইবযাব দানা হাফ চাম্চা, হাফ চাম্চা আস্ত জিবা, হিং-এব গুঁড়া, লবণ, টক দই দেড় কাপ লইবেন, ধইন্যা পাতা কুচি দুই চাম্চা না হইলে বান্নাডাই মাটি।

রন্ধন পোনালি : পেত্থমে বাইগনডাবে লম্বালম্বি চাব টুক্‌রা কবেন। এক ইঞ্চি কইব্যা টুক্‌রাগুলান আবাব কাটেন। ভাসা ঘিতে ভাইজ্যা লন। দ্যাখবেন বাদামি বং-এব অইব টুকবাগুলান। ঘি ঝবাইয্যা দিয্যা ঠাণ্ডা কবেন টুকবাগুলানবে। কড়াইতে ঘি গবম কইব্যা আস্ত জিরা, কালা সইরয্যা আব হিং ছাইড়্যা দ্যান। ওগুলানবে নাইড়্যা-চাইড়্যা ভাজ্জা বাইগনগুলানবে ছাড়েন। হেঁইবার হাফ চাম্চা লবণ, মবিচ আর হলদিগুঁড়া দিয়া নাইড়্যা চাইড়্যা বাইগনগুলাবে নামাইয়্যা রাহেন। হেঁইবাব আসল কাম। দই আব কিছুডা লবণ একলগে ফেটাইযা লন। ধইন্যা পাতা দিয্যা দ্যান। ঠাণ্ডা বাইগন-এব মদ্দি দইডা ঢাইল্যা দিয্যা হাতা দিযা নাড়েন। সাববান। বাইগন গবম থাকলি দই-এর তেরো বাইজ্যা যাইব। খাইয্যা দ্যাহেন, বাইগনের গুণ যে অসীম— হেঁইডা আপনেবে মানতিই হইব।

বাইগন বাহারি

দইবে অনেক পাব্লিসিটি দিছি। হেঁইবাব বাইগনবে আপনেগো সামনে একডু ভাল কইবা হাজিব করি। বাঙ্গালা নোতুন বছবে বাহাবি জামাকাপড় তো আপ্নেবা হগ্গলেই পবেন। তা হইলে বাইগনবে বাহাবি কইব্যা দেখাইতে দোষ কিসের। শাকসব্জিব দাম যে ভাবে লাফ দিযা বাড়ত্যাছে, শ্যাষে না আম্মগো শুধু বাইগন না খাইয়া থাক্তি হয়।

কি কি লাগব : পাঁশ্‌শ গেরাম বাইগন, দুই চাম্চা পস্তু, সইবষ্যা বাটা এক চাম্চা, কুবানো নাইবকল, দুই হান টম্যাইট্টু, লঙ্কা, হল্দি গুঁড়া, চিনি আব আন্দাজ মতন ত্যাল।

রন্ধন পোনালি : ডুমা ডুমা কইব্যা বাইগনডাবে কাইট্যা লবণ, চিনি হলদিগুঁড়া মাখাইয়্যা আধা ঘণ্টা বাইখ্যা দ্যান। পস্তু বাইট্যা বাহেন। টম্যাইট্টুগুলানও পিইষ্যা লন। বাইগনের টুক্‌বাগুল্লানরে ভাইজ্যা লইয্যা সইবষ্যা বাটা, পস্তু বাটা আর নাইবকল কুবা দিয্যা দ্যান। হেবপর বাটা টম্যাইট্টু দিয়্যা অল্প সময নাইড়্যা চাইড়্যা ভাজ্জা বাইগনগুলানবে নামাইয়্যা লন। যখন হগ্গলবে খাইতে দিবেন তহন বাইগনেব ওপর ধইন্যাপাতা কুচি ও নাইরকল কুবা ছড়াইয্যা দ্যান। দ্যাখবেন, বাইগন বাহাবি খাইয়্যা হগ্গলে আপ্নেবে ক্যামুন বাহবা দিত্যাছে। তয সাববান। নিজ্জের জন্যি কিছুটা সবাইয্যা বাইখ্যা তারপর পবিবেশন করেন। তা না হলি আপনেব পোড়া কপালে শুধু বাইগনপোড়াই জুটতি পাবে।

—কাঙ্গাল রায়

বর্ণচোরা

দেবপ্রসাদ কুমার

সুকুমার রায়ও হয়ত তাঁর শব্দকল্পদ্রুম নাটকে বিশ্বম্ভরের পদ্যের অন্তরালে বর্ণচোরার গতিপ্রকৃতির একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য খসড়া দাখিল করেছেন মনের অবচেতনে

পাকিলেও যাহার বর্ণের পরিবর্তন হয় না; বাহির দেখিয়া যাহার ভিতর বুঝা যায় না; যে নিজের রং গোপন করে—চলন্তিকা। যাহার প্রকৃত বা উপযুক্ত বর্ণ লক্ষিত হয় না এরূপ; যাহার বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝা যায় না—আশুতোষ দেব। যাহার প্রকৃত বর্ণ অপ্রকাশিত, যাহার বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝা যায় না—সুবলচন্দ্র মিত্র।

বর্ণচোরা সম্বন্ধে বিভিন্ন আভিধানিকরা একটি বিষয়ে অক্ষরে অক্ষরে একমত, অর্থাৎ বাহির দেখিয়া যাহার ভিতর বুঝা যায় না। চলমান এই পৃথিবীতে জীবন যে রকম জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে বা আরো উঠবে বলে নিত্য আশঙ্কিত তাতে আসল নকল বুঝে ওঠা শিবেরও অসাধ্য হয়ে উঠবে। মুশকিল আসানের পরিপ্রেক্ষিতে শিবকেই সম্ভবত সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হয়, নাহলে শিবের অসাধ্য প্রবাদের সৃষ্টি হত না। শিবের কার্যকলাপের যে বায়োডাটা মুনিঋষিরা আমাদের দিয়েছেন তাতে সমুদ্র মন্থনের হলাহল কণ্ঠে ধারণ ভিন্ন অন্য কোনো সদর্থক দিক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। বাকি যা রইল তার তো সবটাই নঞর্থক। সতীর দেহত্যাগে ক্রোধে অন্ধ হয়ে এমন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করলেন যে বিষ্ণু সতীদেহকে একান্ন খণ্ড না করলে ত্রিভুবন কেত্‌রে যেত। বাঘছাল, গাঁজার কল্কে আর নন্দী-ভৃঙ্গীর দল নিয়ে জটিল সমস্যাকে সরল করা তাঁর কম্মো নয়। বউ-এর কাছে যাকে অন্ন ভিক্ষা করতে হয় তার উপর ভরসা করে বসে থাকলে পরকাল ফরসা। তবে তাঁর গাঁজার কল্কে একটা শিক্ষাই আমাদের দেয় যে সমস্যা জর্জরিত অনুর্বর মগজটিকে বেশি চিন্তাগ্রস্ত না করে বুঁদ হয়ে থাকো। আর ধরতে গেলে আমরা আছিও একরকম তাই। বন্যা ভয়াবহ, সব কিছু ভাসিয়ে দেয়। বন্যার কিন্তু একটা ভালো দিকও আছে, সেটা হচ্ছে প্রতিশ্রুতির বন্যা। আমাদের দেশে সমস্যার অন্ত নেই। আমরা সমস্যার শরশয্যায় শয়ান। যথা, বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, চিকিৎসা সঙ্কট, শিক্ষায় হ য ব র ল, বাসস্থান সমস্যা ইত্যাদি। তালিকা লম্বা করে লাভ নেই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এইসব সমস্যার আমূল পরিবর্তন হওয়ার প্রতিশ্রুতির বন্যায় কি আমরা ভাসছি না? আর এই গাধার নাকে মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে রাখার মতো প্রতিশ্রুতি লঙ্গরখানার দুষ্পাচ্য খিচুড়ির মতো কারা বিনামূল্যে বিতরণ করে যাচ্ছে? তারা কি বর্ণচোরা পদবাচ্য নয়? পদবাচ্য কিনা, এর উত্তর কে দেবে? লেখক নিশ্চয়ই নয়। লেখকদের এই একটা সুবিধা। কোকিলের মতো সমস্যার ডিমটি কাকরূপী পাঠকের বাসায় প্রসব করেই খালাস। লালন পালনের দায় থেকে নিষ্কৃতি। একেবারেই মুক্ত পুরুষ। ভুল বললাম—মুক্ত কোকিল।

এখন খানা-তল্লাসির পালা। বর্ণচোরারব দল কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে আত্মগোপন করে আছে তারই খোঁজে লেখকদের সুলুক-সন্ধান করতে হবে। সে কি সফল হবে, না সবটাই পণ্ডশ্রম হবে, তা খোদায় মালুম। বর্ণচোরা অন্বেষণে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রখর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন নেই, কারণ তারা আমাদের চোখের সামনেই ঘোরাফেরা করছে বা টাকার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে, শুধু ধরতে পারলেই হল। কিন্তু অফিসের বড়কর্তা আর শয্যাসঙ্গিনীর পদযুগল ছাড়া যে একটা ফড়িংও ধরতে পারেনি, তার কাছে বর্ণচোরা ধরার প্রত্যাশা নবীন সেনের ধন্য আশা কুহকিনী বই আর কি? আর কারো আছে, কিনা জানি না, তবে আমার যখন বউ-এর পায়ে ধরা একটা পবিত্র এবং নিয়মিত অভ্যাস, তাহলে তাকে ধরলে কেমন হয়?

এই দুনিয়ায় কত রকমের প্রাণী রয়েছে। যেমন সিংহ, বাঘ, হরিণ ইত্যাদি। কিন্তু তুলনা করতে গেলে (অবশ্যই আমার সঙ্গে) আমার ইস্তিরির প্রথম পছন্দ ধোপার সেই ভারবাহকটি। যদি তাঁর মনে হয় যে এই সম্বোধনটি নিতান্তই একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে তবে আমার প্রতি করুণাবশত নয়, মুখ পাল্টানোর জন্য

সেই জন্তু পর্যন্ত অবতরণ করতে পারেন, যে আমাদের দুধের যোগান দেয়। একথা বিশেযভাবে স্মর্তব্য যে দুধ শুধু গরুই দেয় না, মোষও দেয়।

দুগ্ধ সরববাহকারী এই দুই জন্তুর মধ্যে যদি আমার বুদ্ধি ও গায়ের রং-এর তুলনাত্মক বিচাবের প্রয়োজন হয় (যদি নয়, হামেশা) তবে তার ফলাভিষিক্ত হবে যথাক্রমে প্রাগুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় জন্তু। এই সমস্ত মধুর সম্ভাষণ আমায় শুনতে হয় মাসের দ্বিতীয থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। কিন্তু কেন জানি না, মাসের প্রথম সপ্তাহ এবং যে সময় বোনাস পাই সেই সময়ে তাঁর সুর বেসুরো বাজে। বেসুরো বলছি এই জন্যই যে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি অকারণে আমার উপর দযা বর্ষণ করেন। এক কাপের পবিবর্তে দু-কাপ চা চাইলে বিমুখ করেন না। এই রকম আবো সব অনভ্যস্ত দাক্ষিণ্য। আপনাবা বিশ্বাস করবেন না জানি। তবুও আমি হলফ করে বলতে পারি যে মাসের প্রথম সপ্তাহে এমনও হয়েছে যে তেনার রন্ধনরত ঘর্মাক্ত শ্রীবদন আমি রুমাল দিযে মুছিয়ে দিয়েছি অথচ তিনি আমায চপেটাঘাত করেননি। অধিকন্তু তিনি তাঁর বিম্বোষ্ঠ আমার দিকে এগিয়ে দিযেছেন—আমার অবশ্য অতটা সাহস হয়নি। মাসের প্রথম দিন যে আমাব মাইনে হয় সেটা ধীমান পাঠকের বুঝতে নিশ্চযই ফেলুদা হতে হযনি। চাক্‌রে স্বামীর বউ মাসেব প্রথম সপ্তাহে কোন শ্রেণীভুক্ত—এব জন্য কি চারটে অপশানের প্রয়োজন আছে?

ববীন্দ্রনাথ একবার গল্প করতে করতে বলেছিলেন যে একটি লোক তাঁর কাছ থেকে দশ টাকা ধার নিয়ে বলেছিল 'আমি আপনার কাছে চিরঋণী বইলাম।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "লোকটা কিন্তু সত্যবাদী ছিল—চিরঋণীই বযে গেল।" (শান্তা শ্রীমানী সংকলিত—মনীযীদের বসিকতা।)

আমার এক বন্ধু তার স্ত্রীর অসুখে চিকিৎসাব জন্য যে কিছু টাকা-পয়সার ভীযণ দরকার—সেটা বেশ করুণ বাগিনীতে ইনিযে বিনিযে বলে আমায় গলিয়ে ফেলল এবং কিছু টাকা হাতিযে বলল, "তোর কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম ভাই।" আমার ঐ বন্ধুও ভীযণ সত্যবাদী। পাঁচ বছব হযে গেছে, কিন্তু টাকাটা ঐ বন্ধুর জিম্মাতেই। আমার স্ত্রীর মতো সকলেই জানে যে আমি কসাই-এর হাতে তুলে না দেওয়া একটি বোকা পাঁঠা (বোকা পাঁঠার একটাই সুবিধা যে বযঃপ্রাপ্ত বোকা পাঁঠা অভক্ষ্য)।

আমার বন্ধু যখন তার স্ত্রীর ব্যাধি ও নিজের দুরবস্থার কথা বলছিল তাতে হৃদযকে দ্রব করাব মুন্সিযানায কোনো ঘাটতি ছিল না এবং আমার বোধোদয় হল তখন, যখন জানলাম যে সে আমার টাকায় শকুনি মামার সামনে যুধিষ্ঠির হযেছিল, তবে দ্রৌপদীকে পণ রাখার সুযোগ পাযনি। আমাকে সে টুপি পরাতে পেরেছিল কারণ আমার হস্ত ছিল মুক্ত আর দ্রৌপদীব হস্তে সম্মার্জনী, এবং তা বহু ব্যবহাবে ক্ষযপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুড়ো। বর্ণচোরা বন্ধুব বেশেও আসে।

বান্ধবের বেশে এলে সহকর্মীর বেশে আসতে বাধা কোথায? যে কোনো অফিসে কর্মচারীদের আচরণ আপাতদৃষ্টিতে হবিহরাত্মা অর্থাৎ নিঃশেযে প্রাণ কে করিবে দান—এব যেন প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা। প্রকাশ্যর বিপরীতার্থ গুপ্ত এবং এখানে সুপ্ত বললেও কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আপাতদৃষ্টির ঠিক যুৎসই বিপরীত অর্থ এই মর্কট লেখকের জানা নেই; কিন্তু পাঠক যেহেতু চতুর অতএব এটা আশা করা যায যে লেখকের অজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ঠিক বুঝেছেন যে লেখকের বক্তব্যটি কি। আসলে সহকর্মীদের ভড়ং-এর আড়ালে লুক্কায়িত শিবাজীর গোপন অস্ত্র, যা প্রযোগ করা হযেছিল আফজল খাঁয়ের উপব। অস্ত্রটি সর্বজনবিদিত "বাঘনখ", যা প্রযোজনে প্রকাশ্য কিন্তু সবসময় সযত্নে লুক্কায়িত, প্রযোগের অপেক্ষায়। সহকর্মীদের ভিতর কে যে শিবাজী আর কে যে আফজল খাঁ, এটা নির্ণয় করা শিবের অসাধ্য। প্রায় সকলেরই আপাত আচবণ মধুময। বিপিনবাবুর স্ত্রী ফিমেল ডিজিজে ভুগছিলেন। অফিসেব সুধাময়বাবুব ব্যাপারটা যখন কর্ণগোচর হল তখন তিনি বিপিনবাবুকে পরশুরামের "চিকিৎসা সংকটে"র তারিণী কররেজেব মতো অভিযোগ কবলেন যে অফিসে 'এমন বিচক্ষণ কোবরেজ, থাকতি, তাঁকে না জানানোব কারণটা কি। কারণটা সুধার মতো উপাদেয নয বলে বিপিনবাবু সুধাময়বাবুর কর্ণগোচর করেননি। মোদ্দা কথা বিপিনবাবুর কারণটা জ্ঞাত হবার পর সুধাময কোবরেজ বিপিনের কর্ণকুহরে এমনই মধু বর্ষণ করলেন যে চিকিৎসার অছিলায বিপিন-জায়া সুধাময কোদণ্ডে ছিলার মতো ঝুলে রইল বিপিনকে দণ্ড দেবার জন্য।

প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে মাত্র মাস দুয়েক পবে বিপিন যখন ভাবছে যে আপদ গেছে, ঠিক সেই সময় বিপিনের বউ বেয়াবিং লেটারেব মতো ফিবে এসে যেন কৈফিয়তের সুরে বলল, এই দিনকতক হাওয়া খেয়ে এলুম। তুমি তো সাতজন্মে কোথাও নিয়ে যেতে না।

শেক্সপীযব বলেছেন Jelasy thy name is Woman. আর অফিসের সহকর্মীবা বলেন, বর্ণচোরা, তোমার নাম বিপিনবাবুর কারণসুধা।

প্রেমের ফাঁদ ভুবনে ভুবনে অসাবধান তথা উন্মুখ প্রেমিকদের জন্য অলক্ষ্যে পাতা থাকে এবং এতে কে কখন যে ধবা পড়ে যায় তাব কোনো পূর্বানুমান থাকে না। সুকুমার রায়ও হয়ত তাঁর শব্দকল্পদ্রুম নাটকে বিশ্বস্তবের পদ্যব অন্তরালে বর্ণচোবাব গতিপ্রকৃতির একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য খসড়া দাখিল কবেছেন মনেব অবচেতনে এবং তাব উল্লেখ এখানে সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে তাঁর সেই অনবদ্য পদ্যটি "সাধু সাবধানেব" অন্তত দুর্বল বিজ্ঞাপন হিসাবেও যদি বিবেচ্য হয তবে লেখকের শ্রম সার্থক হলেও হতে পারে—

"ভব পান্থবাসে এসে কেঁদে কেঁদে হেসে
ভুগে ভুগে কেশে কেশে দেশে দেশে ভেসে ভেসে
কাছে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে এত ভালো বেসে বেসে
টাকা মেরে পালালি শেযে।

একটু লক্ষ্য করলে এটা সহজেই অনুমেয় যে সেই বর্ণচোরার টাকা আত্মসাৎ করাব পূর্বে আযুধ হিসাবে ব্যবহৃত ফিরিস্তি হচ্ছে ক্রন্দন, হাস্য, কাশরোগে ভোগান্তি, ভ্রাম্যমান অবস্থা, সুচতুর নিকট সান্নিধ্য এবং ভালেবাবাসাব ভড়ং—যেগুলোকে প্রাথমিক পর্যায়ে অবিশ্বাস করার আপাত গ্রাহ্য কোনো হেতু নেই। বর্ণচোরার আবির্ভাব ও তিবোধান অনেকটা শবীরেব অবাঞ্ছিত স্ফীত মাংসপিণ্ড বা আবের মতো, যার গলদ বিসমিল্লায় অদৃশ্য কিন্তু পরিমাণে প্রায়শই কর্কট রোগে বিনাশ।

ববেণ্য মনীষীদের বিশ্বাস ছিল যে এই দেশ স্বর্ণপ্রসু, কিন্তু বহু প্রসবিনী এই সোনার ভারতমাতা যে বর্তমানে অস্থিকঙ্কালসার, তাব দাযভাগ কি সেই প্রাতঃস্মরণীয় বর্ণচোরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইযে দেওযা কর্ণকুহরে মধুবর্ষণকারী বহুরূপী "বিরিঞ্চি বাবা"রা অস্বীকার করতে পারেন? প্রথমেই বলা হযেছে যে "বাহির দেখিযা যাহাব ভিতর বুঝা যায় না" তাদেবই বলে বর্ণচোরা এবং আমরা এ ব্যাপারে প্রবঞ্চিতেব দল, এব নঞর্থক দিকটির সঙ্গেই পবিচিত, যার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হচ্ছে আমবা আলমগীরের মতো দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তকে বিশ্বাস করতে পারি না। সেদিন এক অস্থিকঙ্কালসার ভিখারি অত্যন্ত করুণ নয়নে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করেছিল। বাড়িতে খয়রাত করাব মতো খাদ্যও ছিল। কিন্তু সর্বগ্রাসী অবিশ্বাসের জন্য ভিখারিকে বলা হল, "কেটে পড়ো চাঁদ। এখানে চিঁড়ে ভিজবে না।"

প্রত্যাখ্যাত ভিখারির হতাশ স্খলিত চরণের অতি শ্লথ প্রতি পদক্ষেপ, তাব যে অনেকদিন ঠিকমতো আহাবাদি হযনি, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে কোনো প্রহেলিকা রাখেনি।

রাজনীতি সুসংবাদ

জনডিস্ জাতি

জনডিস্ হলে অমনটা হয়। ছেলের থেকে পিলে বড়। টিউবেব থেকে স্টার্টার বড়। জাতীযতাবাদেব থেকে অঞ্চলবাদ বড়। সিকিমেব মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং জাতীয সঙ্গীত 'সিন্ধু'-র জায়গায় 'সিকিম' দাবী করেছে। 'সিন্ধু'টা নাকি সেকেলে, আর পুরোটাই গেছে পাকিস্তানের পেটে। অকাট্য যুক্তি। তবে আর কি, লেগে পড়ো।

'জনগণমন অধিনায়ক জয়হে
ভাবত ভাগ্য বিধাতা—
পাঞ্জাব, সিকিম, গুজরাট, উড়িষ্যা,
ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, উত্তবাঞ্চল,
নাগাল্যাণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড, পণ্ডিচেরি, ঘুসুড়ি, ডিমাপুর, যষ্টিতলা....

জাতীয সঙ্গীত হয়ে গেল পৈতের ফর্দ। সংবিধানের মাঠে বসে যাবে সংশোধনের মেলা। লেক্সপো, ল্যাঙপো, ঠাকুরপো নানা ভাষা, নানা ক্ষ্যাপা, নানা বিধান। সংশোধিত সংবিধান দশ খণ্ডে ছাপা হবে। রাজ্যেব ম্যাপ আব প্রোমোটারদের নাম-ঠিকানা সংযোজিত। বেদের বাবা। পেছনের মলাটে হালকা পানীয়ের বিজ্ঞাপন। বচ্চন পার্লামেন্টের ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। নাম হবে "এন্সাইক্রো পিডিয়া ইণ্ডিকা"। ইণ্ডিযাব পিণ্ডি। সাঁওতালি ভাষাতেও উপলব্ধ। গুরুং, ওঁরাও, মেড়াওরা পড়বে। গোয়া উঠে গিয়ে গযা হবে কেন্দ্রশাসিত। ইচ্ছে করলে গোযাবাসীবা গয়ায় রেলালাইনের ধারে ঝুপড়ি করে থাকতে পারবে। পাগলদের পুনর্বাসন ও স্ত্রীহত্যা নতুন মৌলিক অধিকাব। করসেবকরা সমস্ত করের উর্দ্ধে। বাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা। যে কোনো সময় বাজ্যপালকে গলা টিপে মেরে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা যাবে। অযোধ্যা বাদ দিযে বাকিটা। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। পতাকার পেছনদিকে সিনেমাব বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে। জাতীয় হোর্ডিং। রাষ্ট্রপতিকে কেবল ভারতীয হলেই চলবে না। তুক্তাক্ জানতে হবে। তারা গুনতে হবে। কেবল কটা সই করে শুবে পড়লে চলবে না। প্রেস ও মিডিয়ার গুরুত্ব বৃদ্ধি। এখন থেকে সংবাদ ছাপিযে, ছিঁড়ে নৌকা করে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। তাইরে নাইবে না। পাল্কি চলে পেট্রোলেতে। হুঁ-হুঁ-না। হুঁ-হুঁ-না।

সব দেখে স্বর্গবাসী আম্বেদকর উন্মাদ হযে গেলেন। দৌড়ে গিযে শিবঠাকুরকে গাঁট্টা, বিষ্ণুকে বাপ তুলে শাপ, ইন্দ্রকে 'লোফাব', জগদ্ধাত্রীকে 'জানেমান্'। চন্নামিত্তে চানাচুর। রাজ্যের লিস্ট শুনে ভারতেব ভাগ্যবিধাতা চোঁ চোঁ দৌড়। অতগুলো কে সামলাবে বাবা। তাও ফ্রি অফ্ কস্টে। বৃষ্টির জল বোতলে ভরে বিশ টাকার 'বিসলারি'। আমার বেলায এডাল্ট সিনেমা দেখে বেবোনোব সময় বিড়বিড়। তাও শালারা তুলে দিল। এখন শুধু বিউগিলের সুর। ক্যান্টন্মেন্টে কেত্তন। চামলিঙ ল্যাঙ মেরে দিল জাতীয়তাবাদে। গান্ধীজির হাতে হাত-পাখা। মাদ্রাজ হল চেন্নাই। আসাম হল অহম। গৌহাটি গুযাহাটি। ক্যালকাটা কলকাতা। এবাব পাটনা হবে পটলবা, চণ্ডীগড় হবে চণ্ডিকুড়ি, পুবী হবে পুরুচি, হাযদ্রাবাদ হবে হাযদুড়ুবাদুড, আদুড় বাদুড়। ক্রমে অঞ্চলবাদের দাবী উঠবে জাতীয় পতাকা আর কাবেন্সি নিযে। দশ টাকাব নোটে শুধু বাঘ আব হাতি কেন? আসাম চাইবে গণ্ডাব, হিমাচল চাইবে চামরি-গাই, বাজস্থান চাইবে ময়ূর, বিহাব চাইবে মোয। নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এড্স্ রুগিব মুখ চাইবে। জাতীয জন্তু। ব্যস, নোট হযে গেল চিড়িয়াখানা। সাইজে হযে গেল ক্যালেণ্ডাব। দশ পিস্ থাকলেই কেলিয়ে যাবে। দড়ি দিয়ে বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে বেরোতে হবে। পাযেব কাছে বেখে উবু হযে বসে দড়ি খুলে বাসভাড়া দিতে হবে। কণ্ডাকটারবা বুকে নোটের বস্তা নিযে পেছনের সিটে শুয়ে থাকবে। আহা শঙ্কব যেন শিবানীকে বুকে নিয়ে ডিউটি কবছে। শারুখ-জুহি, মনমে ফাগুন, দেশমে আগুন।

নোটে শুধু বাঘ আর হাতি কেন? আসাম চাইবে গণ্ডার, হিমাচল চাইবে চামরি-গাই, রাজস্থান চাইবে ময়ূর, বিহার চাইবে মোষ। নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এড্স্ রুগির মুখ চাইবে। জাতীয় জন্তু। ব্যস, নোট হয়ে গেল চিড়িয়াখানা।

গুজরাটে দাঙ্গা হল। প্রধানমন্ত্রী টিভিতে দেশবাসীর কাছে আবেদন করলেন, যে যা পারো দাও। ভাঙা সাইকেল, পোড়া পলতে, তবলার পিঁড়ে, লুডোব ঘুঁটি, হোলির পাজামা, টিভিব বাক্সো, পুবনো সংবিধান। এদিকে পশ্চিমেব দাঙ্গায ক্ষতিগ্রস্তদেব জন্যে চাঁদা তুলতে গিযে দাঙ্গা লেগে গেল পশ্চিমবঙ্গে। শ'খানেক শুযে পড়ল। কলকাতাব গুজরাটি সম্প্রদায ইস্তেহার বিলিযে বলল, ক্ষ্যামা দে মা, দাতা মারা দান চাই না। আমাদের ম্যাও আমরাই সামলাব। ব্যস্, দরদের দুধ কেটে ছানা। জাতির বুকে হাতি। অনেক হয়েছে বাছা, এবাব ম্যাপে মারো কাঁচি।

—দিব্যেন্দু দাস

মানে নাই মানা

মুসুমুসু কলমচি

দেহপ্রাপ্ত ইদানীং নিদ্রাভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। দেহকে দোষ দিইয়াও বড় লাভ নাই। বেগার খাটুনিরও পরিসীমা রহিয়াছে বৈকি। তাও যদি সেই খাটুনি হইত দেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ঠাকুর-দেবতার নিমিত্ত তো এক কথা। লেকিন, এই খাটুনি এক সামান্য কলমচির জন্য বই নয়। অগত্যা দেহ মানে না আপনি মোড়ল হইয়া যেইকালে প্রচুর আত্মসুখে বিভোর হইয়া আরাম কেদারাটিতে বসিয়া আছি, সেইকালে সম্পাদক দূরভাষে দর্শন দান করিলেন। পাঠক বলিবেন, ভুল হইল হে মুসুমুসু, দর্শন দান দূরদর্শনে ঘটে, দূরভাষে নহে। মা অধীর হে পাঠক, আমাদিগের সম্পাদক মহাশয়ের ভাষ্যদান এবং দর্শনদান একই ব্যাপার। বলিলেন সেই চিরকেলে বাণী— "কই মুসু, লেখা কই। এইবারের বিষয়" গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল"—জ'ম্মে লিখুন দেখি মশায়।"

লিখুন দেখি মশায়। বলিলেন বলিয়াই লিখিতে হইবে—এ কি বড় ভীষণ আবদার নহে? শক্তি চ্যাটুজ্জ্যের ন্যায় মুসুমুসু বুঝি কহিতে না পারে যে, লিখিতে পারি কিন্তু কেন লিখিব। লিখিয়া কী হইবে। লিখিয়া, আঁকিয়া কে কবে কাহার মন ভরাইতে পারিয়াছে। সম্পাদক লেখা চাহেন তাঁহার পত্রিকার পাতা ভরাইবার জন্য। কাঁচা বয়েসের লেখকগণ ভাবেন সম্পাদক এক বড় হিরো। তাঁহারা সম্পাদকের ন্যাজ খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান। পাইলে আজীবন ঝুলন-যাপনে ব্রতী হয়েন। নামি লেখক ভাবেন, সম্পাদক নবীন ভাড়াটিয়া, মালিক পক্ষের নিকট আসিয়াছেন। অতএব উহাগণ পহলে সম্পাদকের বাজারদর যাচাই করেন। অবশেষে মুসুর ন্যায় দু-একজনা পড়িয়া রহেন—সম্পাদক সম্ভবত ইহাদিগরে আপন ক্যাশবাক্স ভাবিয়া থাকেন। অথবা, সরকারি ভরতুকি হয়ত। হায়, বলিয়া দিবেন কে। শাফ্লিং এণ্ড বি-শাফলিং গেমে আমাগণ আসি, যাই। দু'পয়সা হইতে দশ পয়সা যাহা পাই, তাহাই অধিকন্তু। ভাগ্যে ইনি আছেন, নতুবা ইত্যাকার বুড়াকালে ইত্যাকার ভার্মদিগ, অযথা শঙ্কা ভিন্ন কীবা দিতে পারে?

তাই বলিয়া, দিবার ইচ্ছা নাই—এ অপবাদ কেহ যেন না দেন। আমাগণ কিপ্পু নহি। আমাগণ পথিমধ্যে স্পিড ব্রেকার নহি। নূতনের গাড়ি প্রবল বেগে আমাদিগরে ওভারটেক করিয়া যাইবে, ইহাতেই হৃদয়ের সত্য আনন্দ। বেসামাল পথে উহারদিগের বাহনের সহিত দুই-তিন ঠোক্কর ঘটিবে, তাহাও নিশ্চুপে সহিব। লেকিন যদ্যপি দেখি যে, বাচ্চেলোগ যে পথে চলিয়াছেন তাহার ম্যাপটিই তাহারদিগেরই অজানা কিংবা সমস্ত যানবাহনাদিই যে কেবলমাত্র হ্যাণ্ডেল মারিলেই মা গড়গড়ায়তি—এই তথ্য ভুলিয়াছেন, তৎকালে খানিক বকম্ বকম্ করিতেই হয়। ফলতঃ এককালে হয়ত বা এইরূপ ঘটে যে গাঁ-ময় জোয়ান-মদ্দের মধ্যিখানে আম্মো একাকী হাড়গিলা—তব্? বয়েসের জোরে যদিচ মুরুব্বি হইলাম, তো সে এমন মুরুব্বি, যাহাকে কেহ না মানে। দুইপক্ষে একই জাতীয়-সঙ্গীত—'ও যে মানে না মানা'। গান হয় প্রচুর, মিল হয় না।

অগত্যা হে পাঠক, অধুনার বাজারে আম্মো-ই সেই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল যেই মোড়লের তরে জনগণের দুখের অন্ত নাই। যেই মোড়লের তরে হাসির অন্ত নাই। আশরীরে দুক্কো গজাইয়া যেই গ্রামের তরে প্রাণপাত করিলাম, যাহারে স্বাধীনচেতা, মুক্ত-হৃদয়, নির্ভয় করিলাম জীবনপণ করিয়া—সে যদি আজ নাও মানে তথাপি আপনারে বড় নির্মল মনে হয়। মনে মনে বলি—বাপু হে, ভাবো দেখি, যদি এমত হইত যে, মোড়ল মানে না আপন গাঁয়ের পাঁচজনারে। সমস্ত জগৎ নিশ্চুপ, কেবল এক ব্যক্তি হাস্য করিতেছেন—হা ঈশ্বর, সে যে বড়ই পৈশাচিক।।

পদ্যপাঠ

গোবিন্দ গোস্বামী

আমিই আমার জয়-পরাজয়, যাত্রাপথের শুভাশুভ
শিশু বৃদ্ধ আমিই আবার বখা ছোকরা ক্রুদ্ধ যুব
কাদায় মাখা দোলগোবিন্দ মঞ্চোপরি জননেতা
খাতক সেজে দেঁতো হাসি উত্তমর্ণে আদিখ্যেতা
প্রেমের কাছে পদ্মপুকুর ছাদনাতলায় কুপোকাৎ
মুখের তোড়ে জগৎ মেরে ঘরের কোণে জগন্নাথ
নগর পারে অরূপনগর চোখের পাতায় নাগরদোলা
দাদার দলের আঁতেল হয়ে তুলে রাখি গোপন তোলা
আমিই আমার অচল টাকা ঘুরিয়ে দেখি এপিঠ-ওপিঠ
সব পেয়েছি ভেবেই রাখি শূন্য সে এক আঁচলে গিঁট
আলোয় আমার অবাধ গতি অন্ধকারেও আনাগোনা
নতুন করে উড়তে পারি উড়িয়ে বাসার ছানাপোনা
গোড়ের মালা গলায় বেধে টানতে পারি গলায় ছুরি
পায়রা বেলুন ভাসিয়ে ধরাই শুদ্ধ হাতে গোলাপকুঁড়ি
ভেঙে সাজাই সাজিয়ে ভাঙি ভাঙি চিরদিনের রাত্রিদিন
ছন্দ থেকে হারিয়ে মেলাই যা-কিছু সব ছন্দহীন
কান্নাভেজা চোখের পাশেই রাখতে পারি চোরা হাসি
যুগ থেকে যুগ-যুগান্তরে আমিই গিয়ে ফিরে আসি;
মৃত্যুদিনের আলোয় জ্বালে জন্মদিনের প্রদীপ ধূপ
পদ্য থেকে জীবন নিয়ে মৃত্যু দেখার এই বেকুব!

আনবিক অথবা দানবিক গল্প

ষষ্ঠীপুজো

পল্লব চক্রবর্তী

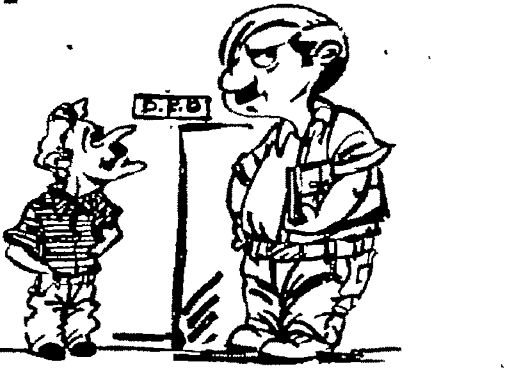

১

হরিমতীর কোনো পোলাপান নাই। তাহাতে হরিমতীর যত না দুঃখ তাহার চাইতে ঢের অধিক দুঃখ তাহার বড় ভাজের। প্রায়শই বড়টি পাড়া মাথায় তুলিয়া বলিয়া থাকে—"থাকত একটা, তবেই বেটি বুঝত। নিজের তো কোনো যন্তন্না হয় নাই, তাই অপরের ছেলেকে নাই দিয়ে, আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে। ব'লি বড় হলে এ ছেলেকে রাখবে কে—তুই না মুই?"

সাত চড়েও সচরাচর রা কাড়ে না হরিমতী। বিশেষত বড়ভাজের সহিত তো নয়ই। আপন রেপুটিশন বাবদে হরি বড় ওকিবহাল। তদ্ভিন্ন রন্ধনশালার দুয়োরে দাঁড়াইয়া খানিক আঁচল দুলাইলেই যদ্যাপি প্রত্যুত্তরপর্ব সমাধা হইয়া থাকে, সেহেতু অযথাই অব্যয় ব্যয় করিবে কোন আহাম্মক। পাড়া মহলে হরিমতীর সুনামের অন্ত নাই।

আপন পুত্রটিকে বেমালুম পরমানন্দ হইতে দেখিয়া অতএব বড় ভাজকেই ইনিসিয়েটিভ লইতে হইল। দেবরটিকে ডাকিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, হরির মতিগতি ভালো ঠেকছে না যেন। আমার ভোলাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল এতকাল। এবার মন পড়েছে পাড়ার ছেলেপিলের দিকে।

তো, গুরুদেব বল্লেন, বাড়িতে ষষ্ঠীপুজো ক'রে তোমরা যদি মানত রাখো তো।...

ঠাকুরপোর মৌনতাই সম্মতি ধরিয়া জগতে আহ্লাদের পরিসীমা বাড়িয়া গেল।

বড় এক উৎসব বসিল বটে। পূজার দিন ঊষা না উঠিতে দুই ভাজে কর্মতৎপরতার বন্যা বওয়াইয়া দিল। ফাঁকে ফোকরে পরামর্শ ও মতামত দানের হিড়িক লাগিল। কী প্রকারে হাতজোড় করিলে মা মুখ তুলিবেন, ক'মণ ভক্তি-তেল ঢালিতে হইবে ইত্যাদি, প্রত্যাদি। পূজাপাঠ সমাপন হইলে প্রথমে ভাজদিগের অঞ্জলি প্রদান পর্ব। এটি সমাধা হইলে দুইজনা গলবস্ত্র হইয়া গড় হইলেন আপনাপন ইচ্ছা পেশ করিতে। আনন্দে বড়ভাজের কণ্ঠদেশে আবেগ দলা পাকাইয়া উঠিতেছিল। সহসাই হরিমতীর ক্ষীণ উচ্চারণমালা সেই সমূহ আবেগ কাঁটাফলে রূপান্তর করিল। হরিমতী কহিতেছিলেন—'মা-মাগো, দিদি ইচ্ছেটা পূর্ণ করো মা। আমাকে নিমিত্ত করে তোমার সামনে একটা আর্জি এনেছে—এতে আর খারাপটা কি আছে। ওকে আরেকটা ভোলা পাইয়ে দাও মা—সামান্য একটা শখ বই তো নয়....

২

এরকম মাড়োয়ারি আর বাঙালি জোটের পাড়া শহরে দ্বিতীয়টি নেই। বংশ পরম্পরায় আমরা এখানে আছি, তা সেই মিউটিনির আমল থেকে। সদ্ভাবের অন্ত নেই। থাকতও না—যদি না ষষ্ঠীর এমনতর প্রাদুর্ভাব ঘটত। গুচ্ছের ছেলেপুলে একযোগে বেকার হ'য়ে বারোমাসি কারবার ফেঁদেছেন হেথায়। মাসে মাসে কাকুমা, পিসিবাবার নামে চাঁদা নামক 'তোলার' রসিদ কেটে রেখে যান বাড়িতে বাড়িতে।

গত দুগ্গার বারোয়ারিতে তাদের মধ্যে কিছু ঝঞ্ঝাট হয়েছিল, বোধহয়। তহবিল তছরুপ গোছের ব্যাপার। শিউপ্রসাদ পাড়ার মাড়োয়ারি চ্যাংড়াগুলোর মধ্যমণি। তার বিরুদ্ধেই তছরুপের অভিযোগ এনেছে বাংলার পাড়াতুতো বড়দা—খোকা। দুটোই শিবের ষাঁড়। চালকলার বাঁটোয়ারা নিয়ে এমনি বচসাও তাই হামেহাল লেগে থাকে।

সিজন্‌টা ছিল শিউপ্রসাদের। গণপতিজির পূজা। খোকারা প্রতি বছর এই সময়টায় রকে বসে হিসাব মেলায়—গণপতিজির ব্যয় এবং মা দুগ্গার ঘাটতি সমান রইল কিনা। কিন্তু এ বছর দেখলাম তারা বেশ বিদ্যাসাগরী রামের মতো ভাজা মাছ উল্টোনোর চেষ্টায় মশগুল। পূজারী বামুন নরেন ভটচায বললে, খোকা নাকি তার কাছে গেছিল, অকালবোধন ব্যাপারটা যে-কোনো দেবতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিনা—তাই জানতে।

দেখা গেল মুখোমুখি দুটো প্যাণ্ডেল বাঁধার কাজ চলছে। একটা শিউপ্রসাদের গণপতিজির জন্যে। আরেকটা শুনলাম খোকারা ষষ্ঠীপুজো করবে—অকাল ষষ্ঠী। কিন্তু সবচাইতে বড় খবরটা হল যে, খোকারা এ পুজোর জন্যে চাঁদা তুলছে না। প্রথমদিন দিব্যি কাটল। একেই বোধহয় মোচ্ছব বলে। হৈ চৈ রঙ্গ-তামাশায় পাড়া মশগুল।

পরদিন ভোররাত থেকেই পাড়ায় লাঠালাঠি শুরু। গণপতিজির ইঁদুর গায়ব। শিউপ্রসাদ আর খোকা পারস্পরিক লাঠিবাজিতে জখম হয়ে দুই প্যাণ্ডেলের মাঝে পজিশন নিয়েছে। অবস্থা এমন যে—দুধওলা, কাগজওলা, মায় বাড়ির ঝি, রামুমেথর—কেউই পাড়ায় ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। শিউপ্রসাদ ক্ষণে ক্ষণে লাল, গোলাপি, হলুদ, সাদা...। আর,—আর খোকার দল তুলনায় ঠাণ্ডা হয়ে বলে চলেছে—আচ্ছা কাকাবাবু, এসব দেবতাদের ব্যাপার... আমরা কি জানি বলুন তো.. ষষ্ঠীর বেড়ালই যে ইঁদুর খেয়েছে, এটা বুঝলে কী করে?

খোকা সামান্য স্রাগ্‌ ক'রে যোগ করলে—আরে, আমাদের বেড়ালটা তো ওদের প্যাণ্ডেলেই পাওয়া গেছে।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল

প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী

আপনাকে কতজন চায় না চায় সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হৈ আপনার প্রতিপক্ষের হাঁড়ির খবর যোগাড় করা এবং প্রয়োজন মতো বানর সৈন্যকে কাজে লাগানো। তা না হলে রাম কি রাবণ বধ করতে পারতেন?

সম্পাদক বিষয় বেছেছেন। আর লেখকেব কাছে সম্পাদক হলেন প্রভুর সামিল। কিন্তু সবিনযে বলি, এই প্রবাদটি আধুনিক জীবনে সর্বৈব সত্য কিন্তু অন্যভাবে। যে ব্যঙ্গেব তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি নিযে প্রবাদটি একদা আমাদের কাছে আদৃত হত তার প্রেক্ষিত একালে একেবারেই অচল। কারণ কালের গতিতে মোড়ল হতে গেলে অথবা মোড়ল থাকতে হলে গাঁ আপনাকে মানুক না মানুক তাতে কিছু যায় আসে না। অন্যভাবে বলা যায়, গাঁয়েব মানামানির ব্যাপারটা নিছকই হেঁয়ালি। মানা মানে সম্ভ্রম কবা, মানা মানে মেনে চলা—এসব এখন অতীতের ব্যাপার। আধুনিক জীবনে মানানোর নানা কৌশল আছে। ডেল কার্নেগীর মতো সমাজবিদ্যা বিশারদেবা তো আছেনই। তাছাড়া আছে কথিত এবং অকথিত বহু ম্যানুযাল। অথবা দেশি ভাষায় যাকে বলে পাঁচালি। প্যাঁচের পাঁচালি। আপনি যদি প্যাঁচ ঠিকমতো খেলতে পারেন অনেকেই দেখবেন কুপোকাত। আর তার সঙ্গে চাই আম্‌চে-চাম্‌চের দল। দেখবেন একজন চামচে সহজেই জয় কবেছেন পুবপাড়ার লোকজনকে। পশ্চিমপাড়া তো আছেই আপনার পুরো দখলে। সত্যি বলুন তো, এই যে Majority theory —এও কেমন হাস্যকর? মোট ভোটের ৩০% পেয়েও দিব্যি গদি দখল। তাছাড়া দুই প্রবল প্রতিপক্ষেবব মাঝখান থেকে কযেকটি আসন ছিনিয়ে নিযে কেমন অবলীলাক্রমে ছড়ি ঘুরিযে যাওযা। একে কী বলবেন—গণতন্ত্র না আধুনিক মোড়লতন্ত্র? সেই প্রাচীনকাল থেকেই মোড়ল হওয়ার জন্য বিপুল জনসমর্থনেব চেযে অনেক অনেক বেশি কার্যকবী হল Back room Politics. অর্থাৎ আপনাকে কতজন চায় না চায সেটা বড় কথা নয। বড় কথা হল আপনার প্রতিপক্ষের হাঁড়ির খবব যোগাড় করা এবং প্রয়োজন মতো বানর সৈন্যকে কাজে লাগানো। তা না হলে বাম কি রাবণ বধ করতে পারতেন? বীরত্ব? হ্যাঁ, বীবত্ব তো আছেই। কে যেন বলেছিলেন— Discretion is the best part of Valour! সময মতো বুদ্ধি খরচাই হল আসল বীবত্ব। সুতবাং মোড়ল যদি হতেই হয তবে আপনাকে Self Styled মোড়ল হতে হবে এবং আযত্ব করতে হবে অপবকে 'মানাবার কৌশল'— ভালোবেসে আর ভালোবাসাব অভিনয করে, অন্যাযের প্রতি চোখ বুঁজে (অবশ্য সাবধান থাকবেন, Dicky Bird নাকি চোখে কম দেখছেন) অঙ্কেব ধাঁধার কথা মাথায রেখে ভোটারলিস্ট থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত সজাগ থেকে, প্রয়োজনে জঙ্গীপনা দেখিযে এবং অবশ্যই সমাজসেবা কবে। এই সমাজসেবাই হল মোড়লত্বের শ্রেষ্ঠ সোপান— ক্লাবগুলিকে উদারহস্তে অর্থ বিতরণ কবে, সভাসমিতিতে উপস্থিত হযে শ্রীবৃদ্ধি (সভার না নিজেব?) এবং অবশ্যই কলকাঠি নাড়াব জন্য বা হুমকি দেওযার জন্য Muscle Power ।

একসময গ্রামের মোড়ল ছিলেন প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর কাজ ছিল দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। তিনি এগিযে যেতেন সবাব সুখে এবং অবশ্যই সবার দুঃখে। কিন্তু আধুনিক কালে গণতন্ত্রেব এমনই বমরমা যে মোড়ল জানেন কী করে গ্রামকে বাধ্য করা যায় তাঁকে মোড়লেব স্বীকৃতি দিতে।

সম্পাদক মহাশযকে ধন্যবাদ, তিনি এমন একটি বিষয় বেছেছেন যেখানে আধুনিক ব্যক্তিবাদেব রমরমা। একটি খাবাপ কথা মনে পড়ে গেল—কি যেন জন্তু লড়ে খুঁটিব জোরে। হ্যাঁ মশাই, জন সমর্থন থাক না থাক, ব্যক্তি হিসেবে চবম আযোগ্য হলেও যদি কেউ একটা Stamp যোগাড় করতে পাবেন যেন তেন প্রকাবেণ, তাহলে তাঁর মোড়লত্ব প্রাপ্তি কেউ ঠেকাতে পাববে না। সাবা গাঁ তাঁর দাপটে থরহরি কম্পমান হবে। এখন মোড়লবা Self Styled-ই শুধু নয় তারা Self made: মোড়লকে চাপিয়ে দেওয়া হয আর সারা গাঁ তাদেব কুর্নিশ করে। ভালোবেসে বা শ্রদ্ধায় নয, ভয়ে এবং পিঠ বাঁচাবার তাগিদে। প্রিয সম্পাদক মশাই মৌচাকে ঢিল মেরেছেন। পিঠ বাঁচবে তো।।

কর্তা সমীপে

বিষ্ণুজ্যোতি রায়

পাড়ায় পাড়ায় দু'হাত দূবে পার্টি অফিস আছে, তিন খানা
বীর শহীদেব স্ট্যাচু আছে, কারো হাত ভাঙা কাবো চোখ কানা।

সাতখানা কবে গজিযে উঠেছে টিউটোরিযাল হোম
দেড়খানা করে সাইবার কাফে, জ্যাম শনি থেকে সোম।

মাঝখানে ছিল আধখানা, তাও হল যে পুকুর চুরি
ডায়েটিং করা তরুণীর মতো ফ্ল্যাট ওঠে ভুবি ভুবি।

একখানা পার্ক তিনখানা বেঞ্চ প্রেম তাতে হবদম
তবু কেন টাকা ফাঁকা কবে দেখা কভি খুশি কভি গম?

একখানা কবে নার্সিং হোম বেড়ে ওঠে প্রতি বর্ষ
গর্ভপাতই করা হয শুধু, দেওযা হয পরামর্শ।

একখানা বুথ মাছি ভন্ ভন্—ওটা যে মাদাব ডেয়ারী
চারখানা আছে রোলের দোকান, নেই তাতে ফাঁকা চেয়ারই।

একখানা আছে ইংলিশ আর দুইখানা শুধু বাংলায
আটখানা মোটে চুল্লুর ঠেক তিনবেলা ভিড় সামলায়।

ছোট বড় মেজ কত নেতা আছে, আছে ঢের তোলাবাজ
আমরা তাদের রসেবসে রাখি, করে খাই যারা কাজ।

স্বাধীনতা নয়, প্রজাতন্ত্রতে ভাযণের ঝড় তুলি—
বাড়ি ফিরে এসে উবু হযে বসে বোতলের ছিপি খুলি।

গান্ধী-নেতাজি-বিবেকানন্দ, আমাদের কবিগুরু
নেই কেউ বাদ—ছুটির কী স্বাদ, আযেসটা বেশ পুরু।

বেশ আছি সব ধাঁই ধপা ধপ্—আলুতে বেগুনে ভর্তা
খাসা আছি সুখে হাসি হাসি মুখে, আরামে ঘুমও কর্তা।।

বিজাতীয় ভাষায় রচিত এই কবিতাটি সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।
এর সরল কাব্য-বঙ্গানুবাদ ও টীকাভাষ্য আহ্বান করা হচ্ছে।

শুন বরনারী

এসেছ গোপুরে তুমি বড় অবেলায়
ধূসর সৃক্কনী নারী সমিধ সুরিনা;
প্রতিগ্রাহের সাধে প্রেষিত তৃষায়
বাড়াই প্রীণিত বাহু, ফেরাতে পারি না

অথচ এখন আমি ভৌমী ভৃঙ্গারে
সূর্যেন্দু সঙ্গমে করি গরিষ্ঠ তর্পণ
তমস্বিনী চিদাভাস শীলিত সংহারে
পরেছি নিদিধ্যাস-নীত আবরণ।

আকীর্ণ কৃশানু হতে তবু প্রাবরণ
দলিত মথিত করে ধামনিক ধৃতে
মনোজ্ঞ মাথুরে গাই প্রিয় নীরাজন;
বশিতা বহিত্রে এসো অনাদি ঈশিতে।

সোজা চোখে

ভণ্ড তপস্বী

মৈনাক মিত্র

এঁরা এখন মোড়ল। এবং হায় রে, জনগণের নির্বাচিত মোড়ল, যাঁদের কাছে জনগণও আজ অসহায়।

কে যে কখন কার ওপর সর্দারি ফলায়—তার হিসেব আগে থেকে মেলানো খুবই কঠিন। রাজতন্ত্রের যুগে রাজার ব্যাটা হলেই সকলের ওপরে ছড়ি ঘোরানোর কাজটি করার ছাড়পত্র একদিন হাতে এসে যেত। অবশ্য মুঘল আমলে সম্রাট-তনয়রা এ ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে পরবর্তীকালে আমজনতার ওপর ছড়ি ঘোরানোর কায়দাটি প্রথমে চর্চা করে নিত। এখন আর সেদিন নেই। এখন গণতান্ত্রিক সর্দারের যুগ। জনগণ অঞ্চলে-অঞ্চলে কিছু প্রতিনিধি ঠিক করে দিলেন। তাঁরা সবাই মিলে রাজ্যের প্রধান বাছলেন। দেশের প্রধান বাছলেন।

আমজনতার কী ইচ্ছে? গদিতে আসীন হবার পর সে কথা জানতে চান কে? জানার উপায়ই বা কি? আজ অমুকের বিরুদ্ধে জনগণের রায় নিয়ে কাল তাঁরই সাথে 'গঠবন্ধন' করার কালে কোথায় জনগণ? এ বিচিত্র ভারতবর্ষে নেতারাই পাল্টি খান ক্ষণেক্ষণে। জনগণেশের সাধ্য কি তখন তাঁদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে। রাজনীতির রাজকীয় ঘোলা জলে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে যাঁরা অবস্থান করেন তাঁরা চাণক্য-শিষ্য নন, চাণক্যই তাঁদের প্যাঁচ-পয়জার দেখে লজ্জায় অদৃশ্য হতে পথ পান না।

রাজনীতি এখন রাজধানীতে, মাঠে-ময়দানে, শহর-গ্রামে, কলেজে-ইস্কুলে, পাঠাগারে-ক্লাবঘরে এমনকি রান্নাঘরেও। এবং তার বিচিত্র রূপ। একদা এক সুপ্রতিষ্ঠিত দৈনিকপত্রে দেখা যেত রাজনীতি বিষয়ে তিন ধরনের লেখককে মজুত রাখা হয়েছে। তাঁরা এক-একজন এক-একদিন এক-এক ধাঁচের লেখায় দর্শন দেন। বামপন্থী, ডানপন্থীর, মধ্যপন্থী। এরেও দেখা হল ওরেও দেখা হল, আবার এরেও সমালোচনা করা হল, ওরেও সমালোচনার কড়াইয়ে কিঞ্চিৎ ভেজেভুজে নেওয়া হল।

হালফিলে এমন নানান ধাঁচের আপাত শিখণ্ডী খাড়া করে যে দলটি ভারতের মসনদে ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে তার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। চমৎকার এঁদের বাণিজ্যিক পেশাদারিত্ব। শ্রীযুক্ত আদবানি—কট্টর। শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী—উদার। শ্রীযুক্ত মহাজন—মাঝামাঝি। যখন যাঁকে রঙ্গমঞ্চে তোলার দরকার হয়, তখন তাঁকেই সামনে এগিয়ে বলা—বাপু হে, এই হলুম আমরা। হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হচ্ছে? ভোটে ঘাটতি পড়ার অশুভ সংকেত? এসে গেলেন মঞ্চে আদবানিজি। ছেড়ে দিলেন দু-চারটে গরমাগরম বুলি। খুশি হয়ে কট্টররা বললে—'মাভৈ মাভৈ একদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ'।

তারপরই দেখা গেল মুসলমানরা ক্ষেপে ব্যোম। এই গলার কাঁটাটি বিজেপি না পারে গিলতে না পারে ওগরাতে। একটিই সমস্যা—এদের ভোট আছে। যার ফলে সেই চক্ষুশূল মুসলমানদেরকেই চাকরি-বাকরি, ক্ষমতা-অনুদান-ঋণ—নানান উপঢৌকনে তুষ্ট করে একটি সেল খুলতে হয়েছে। পুষতে হয়েছে সিকন্দর বখ্‌ত্‌—মুজফ্‌ফর খানদের।

তো, যে কথা হচ্ছিল। তাদের তুষ্ট করতে ওপর ওপর এমন ভাব দেখানো হল যে অটলজি দুঃখে রাতে প্রায় ঘুমোতে পারছেন না, আদবানিজির সঙ্গে তাঁর বেধে গেছে জোর লড়াই। এই নারদ-নারদ অভিনয়ের ভাঁওতা আমরা আজও হজম করে যাচ্ছি। এঁরা তো কুশীলব। মাথার ওপরে কিংবা পশ্চাৎপটে আসল ছড়িটি ঘোরাচ্ছে পরিষদ, বজরং দল, ন্যাস এবং আরো কত কি।

রামমন্দির-বাবরি কেচ্ছা সময়ের তালে ম্লান হচ্ছে। নতুন করে উত্তেজনার আগুন না ছড়ালে গদি রক্ষা করা যাবে না। হিন্দুত্বের বিকৃত টনিক।

গুজরাটে যে দাঙ্গা, দাঙ্গা নয়, নির্বিচার মুসলিম নিধন, নারকীয় অত্যাচার, তার শুরু ক' বছর আগে উড়িষ্যায় ধর্মযাজক হত্যার মাধ্যমে। আমরা কতটুকু প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছি? কতটুকু? প্রতিবাদের কত বড় ঢেউ তুলতে পেরেছি, প্রতিরোধের?

হিন্দুত্ব। অটলজি নাকি কবি মানুষ। কাব্যটাব্য লিখে থাকেন। সাহিত্যের খবর রাখেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত হিন্দুর উল্লেখ করেছিলেন, কাজে হিন্দু—নামে হিন্দু নয়। মুখে নারায়ণের নাম উচ্চারণ না করলেও, শ্রেষ্ঠ মানবিকতার প্রকাশই হিন্দুত্ব। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যতদিন দেশের একটা কুকুরও না খেয়ে থাকবে, ততদিন তিনি ধর্ম বলতে এইসব সমস্যা ও যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই বুঝবেন না।

এঁরা কোন হিন্দু? আশ্রিতকে আশ্রয়দান ধর্ম নয়? আর্তকে রক্ষা করা ধর্ম নয়? আর্তকে নিধন করা ধর্ম। অসহায় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা ধর্ম? ধর্ষণ ধর্ম?

মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ পর্যন্ত অন্তত দশবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গুজরাট নিয়ে কথা বলেছেন। কী আনন্দের কথা, ঘটনার প্রায় দেড়মাস পরে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে যান। সম্ভবত ততদিন তিনি নরেন্দ্রবাবুর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, পাছে বেচারা কোনো বিপদে পড়ে।

নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বনাম। নরেন্দ্র মোদী এই নামের অযোগ্য, কলঙ্ক। ধর্মকে পুঁজি করে যারা রাজনীতি করে তাদের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। ধর্ম মানবিকতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার নয়।

এই কারণেই অটলজি, আদবানিজি কিংবা মোদীজির মধ্যে কোনো ফারাক নেই। এঁরা একই। ভণ্ড তপস্বী। ক্ষমতা দখলের জন্যে এক-একজন এক এক কুশীলব সেজে আছেন। অটলজিই শুধু কবি নন, শিল্পী সবাই। ধ্বংসের আগুনের আলোয় এঁরা মনের আনন্দে জয়ের বাজনা বাজাতে বাজাতে ফয়দার হিসেব কষেন। সারা দুনিয়া ধিক্কার দিচ্ছে। সারা দেশ। এঁরা ভাব করছেন—গুজরাটে এমন কিছুই হয়নি, হচ্ছে না। লক্ষ্য একটাই—এই হিংস্রতার তরঙ্গে ভোটের মুনাফা তুলে নেওয়া। দেশের জনগণ, বিশ্ববাসীর কথায় কিছু যায় আসে না। এঁরা এখন মোড়ল। এবং হায় রে, জনগণের নির্বাচিত মোড়ল, যাঁদের কাছে জনগণও আজ অসহায়। গণতন্ত্রের করুণ কৌতুক এখানেই।

ধর্মের নামে এই ভণ্ডামি চলবে আরো বহুকাল। কেন না, এর বিপরীতে যারা, আমরা, আমাদেরই বা কোন ধর্ম আছে? রাজনীতির কমবেশি অঙ্গুলি হেলনে চলতে হয় আমাদের সকলেই। নানা দল-উপদলের ছোটবড় কুশীলব আমরাও। আমরা কি আমাদের কথা বলি? নাকি যা বলি, সেও আমাদের ছোটবড় প্রভু-মহাপ্রভুরই আরোপিত বুলি??

চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ

'জিৎ'—ফর্মূলার দেশপ্রেম

বলিউডের চলচ্চিত্র রন্ধনশালাতে অধুনা এক নম্বর মশলা তেরঙ্গা দেশপ্রেম, যদিও উহার সহিত ক্রমাগত উন্মোচিত হইতে থাকা সেক্স এবং রক্তারক্তিতে খুনোখুনির টম্যাটো সস্ বহুলাংশে বর্তমান রহিয়াছে। মুম্বইয়ের রুপোলি পর্দায় সানি দেওল যদি খুঁটি উপড়াইয়া পাকিস্তানিদের বেধড়ক প্রহার করিতে পারেন, আমীর খান যদি মস্তকে পাগড়ি বাঁধিয়া, হুক্কা হাঁকাইয়া ইংরাজদের গৌরবের বেলুনকে চুপসাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের চলচ্চিত্র-সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত কর্মশালা টালিগঞ্জ বা কী দোষ করিল? সেই জন্যই টলিউডের শতচ্ছিন্ন হইতে থাকা প্রেক্ষাপটে আমৃত্যু নায়কের শিরোভূষণ ধারণ করিয়া থাকার সংকল্পকারী প্রসেনজিৎ এবং চিরঞ্জিৎ ধনুকভাঙা পণ করিয়াছেন—পরিচালক অনুপ সেনগুপ্ত এবং প্রযোজক অভিষেক দাগা-র অসীম বদান্যতায় 'ইনক্লাব" ছবিটিতে অতিমানব দুই ভ্রাতা তথা পুলিশকর্তা অভিজিৎ চৌধুরী এবং অবিনাশ চৌধুরীর রোলে নামিয়া যাবতীয় অসৎ নেতা এবং তাঁহাদিগের পদলেহী আইন রক্ষকদের যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখাইয়া দিবেন। ইনক্লাব ছবিতে পরিচালকের সাহিত্যজ্ঞানের অসীম বদান্যতায় আদর্শনগর গ্রামটিকে মুরারিমোহন দত্ত নামক ধান্দাবাজ ও ছুরিকাহস্ত নেতার অধীনে আদর্শহীন অন্ধকূপ হিসাবে দেখানো হইয়াছে। এহেন বিপরীত নামকরণ বা সেন্স অব 'আইরনি'-র নিমিত্ত পরিচালক অবশ্যই সমালোচকদের শুষ্ক হাসি উপঢৌকন পাইতে পারেন। মোটা কলের কল্যাণে মুরারি মোহনের লোকজনদিগের হাড়গোড় ভাঙিয়া দিতে দিতে অবিনাশবাবু অর্থাৎ চিরঞ্জিৎ বুক বাজাইয়া বলিয়াছেন—তাঁহার কোনো বিনাশ নাই। বরঞ্চ তিনি শয়তানদিগের বিনাশ তথা ভারতমাতার লজ্জা দূর করিতেই বিনাশকের অবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মেকাপ-এর অন্তরালে চিরঞ্জিৎবাবুর ঝুলিয়া পড়া প্রৌঢ় মুখাবয়ব দেখিলে সচেতন দর্শকবৃন্দ করুণা করিয়া বলিতেই পারেন, চলচ্চিত্রে বড়দা সাজিয়া হম্বিতম্বি করিবার ইচ্ছাটি কি তাঁহার বিনাশ হইতে এখনো সময় লাগিবে? অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ অধুনা বাংলা ছবির কার্বাইড নায়ক-কদলী প্রসেনজিৎ অবশ্য প্রায় নীলামে উঠিতে যাওয়া ডাকবিভাগের উন্নতি বিধানে যথোপযুক্ত যত্নবান ইয়াছেন। আই পি এস. ট্রেনিং চলিবার সময় তিনি কোন এক যাদুবলে সময় বাহির করিয়া লইয়া অবিনাশের শ্যালিকা নীলা অর্থাৎ অর্পিতা পালকে দুই সহস্রাধিক প্রেমপত্র লিখিয়াছেন। অবশ্য পত্রগুলি ডাকযোগে প্রেরিত হয় নাই। তৎ পরিবর্তে আই. পি. এস শিক্ষকদের সম্মুখ দিয়াই প্রসেনজিৎ দিদিমা বেশিনী অর্পিতাকে লইয়া যথেচ্ছ পরিমাণে কোমর নাচাইয়াছেন। বর্তমানে সংকটাপন্ন পুলিশ প্রশাসনে এইরূপ প্রেমিক প্রবর আই. পি. এস-দেরই আশু প্রয়োজন—যাঁহারা নাচিতে পারিবেন এবং বিচার প্রার্থীদেরকে নাচাইতেও পারিবেন। অবিনাশ অভিজিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লোকেশ ঘোষ অবশ্য এই দেশপ্রেমের ফর্মুলার পরোয়া করেন না। তিনি অসাধু শিল্পপতির সুইমিং কস্টিউম পরিহিতা কন্যা এবং পাঁচটি কোম্পানির মালিক হইয়া বসিয়াছেন। ভ্রাতৃভক্ত রামচন্দ্রের কলিযুগ সংস্করণ হইয়া চিরঞ্জিৎ লোকেশের সঙ্গে জাল নোটের সম্বন্ধকে নিজের মস্তকে তুলিয়া হাজতে ঢুকিয়াছেন। দারোগা চিন্ময় রায়কে হুইস্কিপ্রেমে বশীভূত করিয়া প্রায়ই কারাগার হইতে বাহির হইয়া মুরারি মোহনের চ্যালামুণ্ডাদের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন তিনি। মুরারিবাবু অর্থাৎ দেবেশ রায়চৌধুরী, শরবতে অবিনাশের মিশ্রিত দ্রাক্ষারস সেবন করিয়া নারীলিপ্সু হইয়াছেন এবং সম্বর্ধনা সভায় উন্মত্ত হইয়া দিদিমণিদের ক্রোড়ে উঠিয়া নাচিয়াছেন। দেবেশের ভিলেনি দেখিয়া উৎপল দত্ত এবং শেখর চট্টোপাধ্যায়ের আত্মা বারকয়েক বিষম খাইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। পুলিশ অফিসার সেলিম আহমেদ সাজিয়া অভিষেক, দুষ্কৃতীকে পদাঘাত করিবার নিমিত্ত বীর হনুমানের মতন লম্ফ প্রদান করিয়াছেন। প্রসেনজিৎ চিরঞ্জিৎ যেভাবে শরীরকে ডানদিকে-বামদিকে বাঁকাইয়া শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত রকেট ক্ষেপণাস্ত্র এড়াইয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সীমান্তে পাক সন্ত্রাসবাদীদের সহিত সংঘর্ষরত ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা যথেষ্ট আত্মরক্ষার শিক্ষা লইতে পারেন। ভারতের আর ভয় করিবার কারণ নাই।

—কৌশিক রায়

জিৎ-কোম্পানী হাঙ্গামা লি.
আমি তো অমনি অমনি খাই!
বলিউডের হাঙ্গামা টনিকই এই বার্ধক্যেও আমার প্রাণশক্তির উৎস..

বইয়ের মলাট দেখে কিনবেন না।
বইয়ের ছাপাই দেখে কিনবেন না।
বইয়ের বাঁধাই দেখে কিনবেন না।
বইয়ের বিষয় দেখে কিনুন।

সমরেশ মজুমদার যেখানে বেপরোয়া, ছেড়ে কথা কননি কাউকে, 'কইতে কথা বাধে'নি একাতিল—

অকপটে ৩৫্

পত্রপাঠ-এ কে না লিখেছেন সরস গল্প। **মনোজ বসুর** অপ্রকাশিত রসের গল্প থেকে শুরু করে **শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, দিব্যেন্দু পালিত, নবনীতা দেব সেন, সমরেশ মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কণা বসু মিশ্র**.... এমনকি কবি-গল্পকাররাও—**সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন**—মলাট নয়, মলাটের অভ্যন্তরে এঁরা রসের অবগাহনে—

পত্রপাঠ সহর্ষ গল্পসংগ্রহ ৩৫্

পত্রপাঠ প্রকাশন
১০জে, ফার্ণ রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, সন্ধ্যা ৫-১০টা)
৯৮৩০০-৫২১৮২ (শুধুমাত্র পুস্তক সংক্রান্ত বিষয়ে 'পত্রপাঠ' পত্রিকা সংক্রান্ত নয়)

পরিবেশক : **নবজাতক প্রকাশন**, এ৬৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭
প্রাপ্তিস্থান : **লেখা প্রকাশনী**, ৫৭ডি কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

পত্রপাঠ আবার মাসে মাসে!

স্বভাব না যায় মলে। পত্রপাঠ জন্মলগ্ন থেকেই ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। এই দেখলেন দপ্তর সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে, তো দু'দিন বাদে সেখানে গিয়ে দেখলেন ভোঁ ভা। কোথায় গেল, কোথায় গেল? শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট। চলো যাই, অগত্যা। আবার দু'দিন বাদে—কোথায়, কোথায় "বল মা শ্যামা!" ফার্ণ রোড।

এই যার স্বভাব তার কথার কোনো দাম থাকবে না, এ কি কারো অজানা ছিল? তা সত্ত্বেও পত্রপাঠ-এর শুভার্থীরা আনন্দে দু-পেগ কফি বেশিই খেয়ে ফেলেছিলেন, যাক বাবা, মাসিক থেকে দ্বিমাসিক, এরপর নিশ্চয় অচিরেই ষান্মাসিক আর তারপরই...হ্যাঁ, ওঃ কী স্বস্তি, তারপরই বাৎসরিক—একেবারে বামুনঠাকুর ডেকে পিণ্ডি টিণ্ডি দিয়ে—মুক্তি, মুক্তি এই অপদেবতার উপদ্রব থেকে।

কিন্তু হায়! কী নির্মম পত্রপাঠ' দু-মাসে নয়; প্রতিমাসেই প্রকাশিত হতে থাকবে, বন্ধুদের নিতান্ত নিরাশ ক'রে। এ ধৃষ্টতা অসহনীয়, এমন প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ক্ষমার অতীত। আসুন আমরা সমবেতভাবে পত্রপাঠ-এর নামে চিৎকার করে ধিক্কার দিই।

—সম্পাদক

যাঁদের পকেটে পয়সা নিতান্তই কামড়াচ্ছে এবং কোন্‌দিন না নিজের কাছা খুলে যায়—এই প্রতীক্ষায় মগ্ন, তাঁরাই; শুধুমাত্র তাঁরাই ১২০ টাকা জলে না ফেলে এই ঠিকানায় পাঠান, আগামী এক বছর তাঁর ঠিকানায় 'পত্রপাঠ' নিয়মিত পৌঁছে যাবে, তাঁকে হাসাতে, এবং কী সর্বনাশ, হয়ত ফাঁসাতেও!!

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে

বিপাশা মণ্ডল

আরে চলতে চলতে যদি সুন্দরী নারীর বসন-স্খলিত বক্ষের দিকে নজর যায়, পা পিছলে তো পড়তেই হবে।

আমি কলা খাই। তবে কিনা খোসা ছাড়ানো অবস্থায় রম্ভাটি হাতে পাই। তারপরে...। সবাই সেটা দেখে, হয়ত বা জানেও। কাজেও হয় এরূপ। আসলে গবা-ই সব করে কিনা। আবে গবা, গবা চিনলে না? আমার চাকরটা আর কি। তবে সবটা অবশ্য ও করে না। কলার খোসাটা ও ছাড়ায়, খোসাটা ফেলেও, তবে কিনা গিন্নি যেমন ভাবে নির্দেশ দেয় ও সেভাবে কাজটি করে। রাস্তায় খোসায় পা পিছলিয়ে কাকে ফ্যালানো যায় ওটা গিন্নি ভালোভাবে জানে। এ ব্যাপারে ও সিদ্ধহস্ত। আর এজন্যই তো ওকে রাখা। সবকিছু হয় অবশ্য আমার পূর্ণ সম্মতিতে। এটাই আমার নীতি।

এ নীতি দীর্ঘ বেকর্ড বছর ধরে ঠিকঠাক চলছে। কলার খোসায় পা পিছলে পড়লে কেউ আর বলতে পারে না—এটা ঠিক নয়। আমার মতো পদমর্যাদার মানুষের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনতে গেলে পর্যাপ্ত প্রমাণ তো দরকার। নইলে ও বেটা নিজেই ফাঁসবে। এমন জেলের ঘানি টানাব, পাড়ায় আমাদের দলীয় কর্মীদের দিয়ে এমন শাস্তি দেব যে ওর নাতির নাতি পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় আমাদের ধ্বজা বয়ে বেড়াবে।

কিন্তু বলছিলাম যে, আপনার বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ কি জনগণের কাছে রাখা হয় তবে?

জনগণ? ওদের জন্যই তো এই নীতি। প্রথমে তো চেষ্টা করব অভিযোগ খারিজ করার।

কিভাবে, কীভাবে?

আরে চলতে চলতে যদি সুন্দরী নারীর বসন-স্খলিত বক্ষের দিকে নজর যায়, পা পিছলে তো পড়তেই হবে।

তা ঠিক, না হলে—

না হলে বলব ওটা গবা ফেলেছে। গবার অন্যায়। আচ্ছা গবাকে আমি বহিষ্কাব কবলাম।

কিন্তু গবা তো আপনার বহুদিনের। আপনার গিন্নির অহোরাত্রের সঙ্গী। বোধহয় হাঁড়ির খবরও সে জানে।

তারপব অসহায় হয়ে সব বলে দেবে, তাই তো? তখন শেষমেশ গিন্নিকে বহিষ্কাব করব। দোষটা তো শুধু শুধু আমি বা আমরা নিতে পারি না। আব এটাই তো আমাদের নীতি। আর গিন্নির ব্যবস্থা? ও একটা হয়ে যাবে। আমাদের তিরস্কৃত গিন্নি ওদেব আপ্যাযিতা। তাই ওর কোনো অসুবিধে হবে না। আমার কথা বলছেন? আমাদের গিন্নিব সংখ্যা বছর বছর বাড়ছে। তবে হেঁসেলের দাযিত্ব ভেবে দেখবখন। আর তিনি একজন তো আছেন আমাব মাথার ওপর। ভাবনাটা ওঁর বেশি। লাগামটা তো হাতেই রয়েছে। ভয় কি?

তাহলে টমটমের ঘটনাটা বোধহয় আপনাদেব নীতিতে চলছে?

আরে মশাই বুঝলেন না? আমাদের একাধিপত্য বিস্তারের জন্যই তো আমাদের আদরের দুলালী হাবা-গবাকে দিযে এ সব করেছে। সুফল লাভ করেছি আমরা। এখন যা হবার তা হচ্ছে। হাবা-গবাকে বহিষ্কার করে চেষ্টা করেছিলাম একটা। কিন্তু ওরাই সব মাটি করে দিল। অগত্যা গিন্নিব উপর দোষ পড়ল। চেষ্টা করছি বিশেষ উপাযে গিন্নিকে বাঁচানোর। তবে শেষ রক্ষা না হলে তারপর....

তারপর কি?

অন্য কেউ।

কেন?

এটাই যে আমাদের নীতি।

কলকাতা সংস্কৃতির এই চণ্ডীমণ্ডপে ভুট্টার খই আইসক্রিম বাদামভাজা ফুচকা ভেলপুরি (অভাবে ঝালমুড়ি) সর্বস্ব প্রেমিক-প্রেমিকারা একসপ্তাহ ধরে মিনি মাগনায় বাউলগান, নানা রঙের রংচটা অত্যাধুনিক গান, অ-রাবীন্দ্রিক রবীন্দ্র Song-গীত এবং Rule-বিহীন নজরুল গীতি বেশ খেয়েছেন।

সংগীত দুঃসংবাদ

শিশির-সদনে গানের ঠ্যালা

মহামান্য রাজ্য সরকার ট্রাফিক জ্যাম, বেড আর ওষুধবিহীন 'হাঁস'-পাতাল, পকেটবোঝাই গোমুখ্যু শিক্ষক ও অধ্যাপক আর জুতোর সুকতলাবিহীন বেকার ঘটিত সমস্যার সমাধানে বহুদিন ধরেই নানা সুর-বেসুরের গাওনা গেয়ে হেদিয়ে পড়েছেন। সেজন্য রাজ্যবাসীকে, থুড়ি, সম্‌স্কৃতি-লেপা কলকাতাবাসীকে একটু সং-গীতের চাটনি পরিবেশন করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছরের মতো এবারেও বেশ ঢং করেই রবীন্দ্রসদন-শিশিরমঞ্চ-নন্দন চত্বরময় গানের মোচ্ছব বসিয়েছেন তাঁরা। এর ফলে কলকাতা সংস্কৃতির এই চণ্ডীমণ্ডপে ভুট্টার খই আইসক্রিম বাদামভাজা ফুচকা ভেলপুরি (অভাবে ঝালমুড়ি) সর্বস্ব প্রেমিক-প্রেমিকারা একসপ্তাহ ধরে মিনি মাগনায় বাউলগান, নানা রঙের রংচটা অত্যাধুনিক গান, অ-রাবীন্দ্রিক রবীন্দ্র Song-গীত Rule বিহীন নজরুল গীতি বেশ খেয়েছেন। প্রায় মাছি তাড়ানো, সেবক-বিহীন স্বেচ্ছাসেবক কার্যালয় থেকে পাওয়া অনুষ্ঠান সূচীতে লেখা আছে, লোকমঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু বিকাল ৫টায়। তথ্যকেন্দ্রের সামনে সন্ধে ৬টা হয়ে গেলেও লোকমঞ্চ লোকবিহীন হয়েই পড়ে থাকছে; একতারা, খঞ্জনি বাউলের দেখা পাওয়া তো দূরের বাৎ। পীযূষকান্তি সরকার মঞ্চের সামনে বসে দর্শকরা শুধু ফাঁকা মঞ্চ আর প্রয়াত পপুলার রবীন্দ্র সিঙ্গারের ড্যাবডেবে চোখজোড়াকেই দেখছেন। অনুষ্ঠান শুরু আর শেষ হচ্ছে তার নিজের মর্জি মাফিক। হতেই হবে। ষষ্ঠ বাংলা সঙ্গীত মেলা বলে কথা। ইয়ার্কি নাকি। বাংলা গানের সংস্কৃতিতে বাঙালির আঠারো মাসে বছর দেখাতে না পারলে কী হল! মোহরদি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের Luck ভালো। বাংলা গানের এই ঝাঁপতালের মধ্যে না আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যে পাশের গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালাতে ফটোগ্রাফ হয়ে সবাইকে দেখা দিলেন—এটাই তাঁর কাছে এখন পরলোকবাসের শান্তি।

রজনীকান্ত-গোষ্ঠগোপাল দাস লালন ফকির-পান্নালাল ভট্টাচার্যকে কীভাবেই না রিমিক্স করেছে ক্যাক্‌টাসের হাড়-সর্বস্ব ছেলেটি! একটি গানেই সকলের পিণ্ডি দেওয়া সার্থক।

কলকাতা বইমেলার স্ট্যাটাস সিম্বল—পলিথিন ব্যাগে ঝোলানো চর্বিযুক্ত গিন্নির মতো মোটকা, ঘর সাজানোর রচনাবলী। গানমেলারও পরম্পরাগত ঐতিহ্য মাঠে মারা যাবে যদি না সঙ্গে থলিভর্তি ক্যাসেট থাকে। ক্যাসেট কোম্পানিগুলো তাই তাঁদের আনাজপাতি সাজিয়ে খদ্দেরদের ডাকতে শুরু করেছেন। এঁদের মধ্যে গাথানি রেকর্ডস অ্যাণ্ড ক্যাসেট্‌স্‌ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সঙ্গীতপ্রেমীদের মনের বুলেটিন বোর্ডে নানা কিসিমের গানকে একেবারে গেঁথে দিতে। সেজন্যই এনারা হরেকেষ্টর অষ্টপ্রহর ছুঁচোর কেত্তনের ক্যাসেটের পাশাপাশি সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি শিখে মানুষ হওয়ার অ্যালবামও বের করেছেন। দু'টো একসঙ্গে কিনলে বোধহয় লেট শ্রীচৈতন্যদেবও বৈকুণ্ঠধামের প্রোপাইটারের নাম আবৃত্তি করে বিস্তর হাততালি পেতে পারতেন। ফিল্মের বাজারটা আবার ঝাড় না খেয়ে যায় সেজন্য গাথানি থেকে নতুন তেলে বাসি আলুর চপ ভাজার মতো 'দেবদাস' ছবির অ্যালবাম বের করা হয়েছে। গাথানির স্টলের গায়ে একগাল হাসি নিয়ে লটকে থাকা 'পার্বতী' অর্পিতা পাল, 'দেবদাস' প্রসেনজিৎ আর 'চন্দ্রমুখী' ইন্দ্রাণী হালদারকে দেখে মনে হয়েছে—শরৎবাবুকে আবার জ্যান্ত করার জন্য গাথানির আর কোনো প্রমথেশ বড়ুয়া-দিলীপ কুমার-শাহরুখ খানের দরকার নেই। টলিউডের চিরহরিৎ হিরো বুম্বাদাই কাফি। তাল অডিও-র কর্মকর্তারা হয়ত মনে করছেন 'মাঝরাতে কোকিল'-এর ক্যাসেটের গান শুনতে গিয়ে অনেক শ্রোতাই

তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারেন। তাঁদের কিছুটা স্বপ্ন দেখালে হয়ত ধাতস্থ হবেন। সেজন্য, সুদেব দে-র গলায় মান্না দে-র গাওয়া গানের রিমেক অ্যালবাম-'স্বপ্ন এল চোখে' বিকোচ্ছেন তাঁরা। কোন তালের স্বপ্ন শ্রোতারা দেখবেন সেটা অবশ্য ক্যাসেটের গায়ে লেখা নেই।

গানমেলাতে টিনএজারদের আধুনিকতা না আনলে সরকারি সংগীত সংস্কৃতিই মাটি। কাঁহাতক আর হেমন্ত রফি দেবব্রত বিশ্বাস সায়গলকে ওপার থেকে হিঁচড়ে টেনে আনা যায়। তাই মেলাতে ব্যাণ্ড সংগীতের শব্দকল্পদ্রুম আনতে ড্রাম গিটার সিন্থেসাইজার নিয়ে নেচে-কুঁদে বেড়িয়েছে ক্যাক্টাস-অভিলাষা-স্ট্রেঞ্জার-কালপুরুষ-এর ফেট্টি বাঁধা যুবকেরা। রবীন্দ্রসদনে ক্যাক্টাসের Song-কৃতি চলার সময়ে অনুরাগী ফ্যানেরা তাদের সিগারেট আর বিড়ি থেকে যে পরিমাণ ধোঁয়া ছড়িয়েছে সেই ধোঁয়াতে একমাত্র ফণিমনসা গাছই বোধহয় টিকে থাকতে পারে। তবে ক্যাক্টাসের "আশায় আশায় বসে আছি" গানটি শুনে চমকে উঠতেই হবে। কানের পর্দা-ফাটানো বাজনা সহযোগে রজনীকান্ত, গোষ্ঠগোপাল দাস, লালন ফকির,পান্নালাল ভট্টাচার্যকে কীভাবেই না রিমিক্স করেছে ক্যাক্টাসের হাড়-সর্বস্ব ছেলেটি। একটি গানেই সকলের পিণ্ডি দেওয়া সার্থক। ক্যাক্টাস তাদের ভক্তদের থেকে বিদায় নিয়েছে 'হলুদ পাখি ফিরবে না কোনোদিন' গানটি গেয়ে। অনুষ্ঠান শেষ হলেও অবশ্য চোখের সামনে হলুদ সর্ষেফুলরা চক্কোর মেরেছে বেশ কিছুক্ষণ। অনেক আগেই চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া, বাংলা গানের নামকরা অ-আ-ক-খ-দের সমকক্ষ নন বলে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন 'চন্দ্রবিন্দু'-র সদস্যরা। অ-আ-ক-খ কেন, গানের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি গুলো যে কোন চুলোয় তাঁরা ফেলে এসেছেন, রাইটার্সে সেটা দেখতে বোধহয় কোনো ফাইল এখনো খোলা হয়নি।

বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন 'চন্দ্রবিন্দু'-র সদস্যরা। অ-আ-ক-খ কেন, গানের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি গুলো যে কোন চুলোয় তাঁরা ফেলে এসেছেন, রাইটার্সে সেটা দেখতে বোধহয় কোনো ফাইল এখনো খোলা হয়নি।

বাংলার জয় ঠেকায় কে! দেশটা বাংলা, ভাষাটা রাংলা, গানমেলাটা বাংলা, উদ্বোধিত গানের ক্যাসেটটি বাংলা, যেটি খেয়ে লেখা হয়েছে এটি সেটিও 'বাংলা'

জয় 'বাংলা'

হোয়াট বেঙ্গল সিংস টুডে ইণ্ডিয়া উইল সিং টুমরো। এ যদি আর না হল তবে বাংলার মান আর কী রইল? সেহেতু বছরকে বছর কোমর বেঁধে সংগীত মেলার হুজুগ। এতে দেখা যাচ্ছে শুধু বাংলা গান নয়, বাংলা ভাষারও বেধড়ক চর্চা হচ্ছে। এমনই চর্চা যে দুদিন বাদে হাসতে হাসতে ইণ্ডিয়া উইল স্পীক অ্যাণ্ড রাইট। বললেই হল। লিখলেই হল। বাংলা লেখা এমন কী আর কঠিন কাজ। সেই নিদর্শন রাখলেন 'তাল অডিও' ১৭ই এপ্রিল, সংগীত মেলার পীযূষকান্তি সরকার মঞ্চে। অবশ্য অনুষ্ঠান শেষে কোনো কোনো দর্শক মন্তব্য করলেন, 'তাল অডিও'-র আগে অদৃশ্যে 'মা' বিরাজ করছিলেন।

বিকেল পাঁচটার অনুষ্ঠানে গাছের নিচে তীর্থের কাকের মতো বিক্ষিপ্ত দর্শক-শ্রোতা আর ওপরে আদি ও অকৃত্রিম কাকবৃন্দ অপেক্ষমান। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ, কোথাও কিছু নেই, এক ছোকরা এসে মঞ্চে রাখা তবলায় খানিক চাঁটিয়ে গেল। তারপর যে-কে সেই। মিনিট পনেরো বাদে একজন উঠে সাউণ্ড সিস্টেমে আধমিনিটটাক প্যাঁ প্যোঁ করে বিদেয় হলেন। ভাবলুম, যাঁর ক্যাসেট উদ্বোধন হবে, তিনি অবশ্যই গাইবেন, এ তারই ভ্যানতাড়া। কোথায় কী। খানিক বাদে এক ব্যক্তি এসে কথার ঝিনুকে দর্শক ও মেলা আয়োজকদের পিঠ আচ্ছাসে চুলকে দিলেন। তারপর বাংলা গানের 'প্রবাদ প্রতিম' গায়িকা শিপ্রা বসু উদ্বোধন করলেন 'মৌসমী গুহ'র বাংলা গানের ক্যাসেট। এই ক্যাসেট শোনার পর 'মৌসুমী'র 'সু' নিয়ে টানাটানি পড়বে বলেই কি আগে থেকেই 'মৌসমী'? জানা গেল না। তবে তাল অডিও-র পোস্টার ঘোষণা করল যে, এই মঞ্চটি 'পিযুস কান্তী সরকার মঞ্চ'। হ্যাঁ, বাংলার জয় ঠেকায় কে। দেশটা বাংলা, ভাষাটা বাংলা, গানমেলাটা বাংলা, উদ্বোধিত গানের ক্যাসেটটি বাংলা, যেটি খেয়ে লেখা হয়েছে এটি সেটিও 'বাংলা'—মন্তব্য এক সুররসিকের (কিংবা সুরারসিক)। 'মৌসমী' গুহ ভাগ্যিস তাঁর 'বাংলা' গান শোনাতে বসেননি—এটুকুই স্বস্তির।

—পরস্ব সংবাদদাতা

বৃন্তচ্যুত

রীতা ভট্টাচার্য্য

।। ১ ।।

দুপুর দুটো নাগাদ সেকেণ্ড ইয়ার অনার্সের ক্লাশটা নিয়ে স্টাফরুমে ঢোকামাত্র বিজন রায় ডাকল। বিজন সদ্য পাশ করে লেকচারার হিসেবে কলেজে ঢুকেছে। আমার থেকে অনেক জুনিয়র। বলল—“নিমাইদা, ঘন্টাখানেক আগে আপনার একটা ফোন এসেছিল। একটা ফিমেল ভয়েস ছিল। নাম বলেনি। ত্রিদিব ঘোষ বলে একজন ভদ্রলোককে আজ হসপিটালে অ্যাড্‌মিট করা হয়েছে। আপনাকে এই নাম্বারে রিং করতে বলেছে।”

বিজন কথাগুলো বলেই নিজের মানিব্যাগটা খুলে একটা চিরকুট বের করল। ওতেই ও টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রেখেছে। কিন্তু ততক্ষণে আমার যা বোঝবার বোঝা হয়ে গেছে। ত্রিদিব ঘোষের ফোন নাম্বার আমার জানা। ঐ মহিলা কণ্ঠটিও কার, তাও আমি অনুমান করে নিতে পারি। সম্ভবত পারুলই ফোন করে থাকবে। কিন্তু পারুল হঠাৎ ওদের বাড়ির ফোন নাম্বারটা বিজনকে দিতে গেল কেন, সেটাই বুঝতে পারলাম না। ত্রিদিব ঘোষের বাড়িতে আমার রেসিডেন্স আর কলেজ দুটোর ফোন নাম্বারই দেওয়া আছে। পারুল আমাকে বাড়িতে না পেয়েই সম্ভবত কলেজে ফোন করেছে। আমি তাড়াতাড়ি ঝোলাটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। তারপর দুটো বই বিজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—“লাইব্রেরিতে বইদুটো রি-ইস্যু করে দিও তো ভাই। আমার একটু তাড়া আছে। আমি যাচ্ছি।”

আমহার্স্ট স্ট্রিটের কলেজ থেকে পাইকপাড়া যেতে যেতে আমি ত্রিদিব ঘোষের কথাই ভাবছিলাম। ত্রিদিব ঘোষের বাড়ি পাইকপাড়া সেকেণ্ড রোতে। ওঁর বয়স এখন প্রায় পঁচাত্তর। একসময় আমার ছোটকাকার ক্লোজড ফ্রেণ্ড ছিলেন। দু'জনেই স্বদেশি আন্দোলন করতেন। ১৯৪৬-এ দাঙ্গার সময় আমার ছোটকাকা মারা যান। কাকা মারা গেলেও, আমাদের বাড়ির সঙ্গে ত্রিদিব ঘোষের সম্পর্ক কিন্তু আগের মতোই আছে। আমি প্রায়ই ত্রিদিব ঘোষের বাড়িতে যাই। উনিও আমাকে খুব স্নেহ করেন।

ত্রিদিব ঘোষ দেশ স্বাধীন হবার পর রেলের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। পরে পাইকপাড়ায় পৈতৃক বাড়িটাকেই রেনোভেইট্ করে নিয়েছিলেন। এখন ওখানেই থাকেন। উনি বিয়ে করেছিলেন একটু বেশি বয়সে। ওঁর একমাত্র মেয়ে রেণু আমাদের ফ্যামিলির সকলের খুব প্রিয়। রেণু অবশ্য তারিফ করবার মতোই মেয়ে। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে ইনঅরগানিক কেমেস্ট্রিতে ডক্টরেট করেছে। রেণু নাসা-র সায়েন্টিস্ট ডঃ দেবজ্যোতি বোসকে বিয়ে করেছে। এখন বরের সঙ্গে আমেরিকাতে সেটেলড্। ওদের একমাত্র মেয়ে মনানীর জন্মও ওখানে। বছরে একবার করে বাবা-মাকে দেখতে রেণু এখানে আসে। ওকে আমি নিজের বোনের মতোই দেখি। প্রত্যেকবারই রেণু আমার বউ-ছেলের জন্য গাদা গাদা জিনিস নিয়ে আসে। আমি বারণ করলেও শোনে না।

ত্রিদিব ঘোষের বাড়িটা দোতলা। একতলাতে রান্নাঘর, ড্রইংরুম। দোতলায় চার-পাঁচটা বেডরুম আর ঠাকুরঘর। পাইকপাড়ায় পৌঁছে পারুলকে দেখলাম। কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজে ও রান্না করছিল। আমাকে দেখে একমুখ হাসল,—“দাদা এসে গেছেন? যাক্ খুব ভালো হয়েছে। মামনি সকাল থেকে কেবল আপনার নাম করছে। আপনি তো দুপুরে কলেজে থাকেন। তাই কলেজেই ফোন করেছিলাম।”

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পারুলকে দেখছিলাম। পারুল আট-দশ বছর হল এ বাড়িতে কাজ করছে। বাংলাদেশ থেকে মা আর তিন বোনের সঙ্গে এসেছিল। পাইকপাড়ার কাছে একটা বস্তিতে থাকত তখন। তারপর ওর মা মেয়েগুলোকে এর ওর বাড়িতে কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এসব কথা অবশ্য পারুলই আমাকে বলেছে। আজকের পারুলের সঙ্গে কিন্তু দশবছর আগের পারুলকে একেবারেই মেলানো যায় না। আগে কেমন বিশ্রী রোগা, কালো চেহারা ছিল। এখন চেহারায় অনেক লাবণ্য এসেছে। গায়ের রঙটাও অনেক পরিষ্কার লাগে। সাজগোজ, কথাবার্তা সবই এখন অনেক বদলে গেছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি দেখে পারুল তাড়া দিল—“দাদা, ওপরে গিয়ে মামনির সঙ্গে দেখা করুন আগে। আমি আপনার চা নিয়ে যাচ্ছি।”

রেণু অনেকবার ওর মা-বাবাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু ত্রিদিব ঘোষের এ ব্যাপারে একদম সায় নেই। তিনি নাকি জামাইয়ের আশ্রয়ে গিয়ে থাকতে পারবেন না। আমি অনেকবার বুঝিয়েও ওঁকে রাজি

করাতে পারিনি। রেণু প্রত্যেকবার যাবার আগে কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে বলে, "নিনুদা, বাবা-মা রইল। তুমি একটু দেখো। আমি আর কি করব বলো? বাবা তো কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যাবেন না।"

আমার চিন্তার সুতোটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। বিশাখা কাকিমাকে দেখে।। বিশাখা কাকিমা দেখলাম খাটের ওপর বসে হাঁ করে সিলিং-এর দিকে চেয়ে আছেন। ডায়াবেটিস আর বাতে উনি এখন প্রায় পঙ্গু। আমাকে দেখে হাউ হাউ করে বাচ্চার মতো কাঁদতে লাগলেন,—"তুমি এসেছ নিমু? তোমার কথাই ভাবছিলাম। শুনেছ, তোমার কাকামনিকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে? আমার এখন কি হবে বাবা? তুমি এক্ষুনি রেণুকে একটা ফোন করে দাও।"

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ওঁর কথা শুনলাম। তারপর দরজার দিকে চোখ যেতেই দেখি, চা আর খাবারের প্লেট ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে পারুল ঘরে ঢুকছে। বিশাখা কাকিমা পারুলকে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—"ভাগ্যিস পারু ছিল, নইলে যে কী হত। ও নিশ্চয়ই আগের জন্মে আমার মেয়ে ছিল নিমু। নইলে কাজের মেয়ের কি এত টান হয় বাবা?"

আমি ভালো করেই জানি, এ বাড়িতে পারুলই এখন সর্বেসর্বা। বাড়ির অন্য চাকর-বাকরেরা সবাই পারুলকে রীতিমতো সমীহ করে চলে। ভাঁড়ার ঘর, ওয়ারড্রোব থেকে শুরু করে আলামারির চাবি পর্যন্ত এখন পারুলের হাতে। বিশাখা কাকিমা চিরদিনই অসুস্থ। বরাবর একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। পারুল আসাতে তাই ওঁদের বেশ সুবিধে হয়েছে। আমি এ বাড়িতে প্রায়ই আসি। তাই এসব আমার চোখে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমার স্ত্রী ডলি পারুলের এই স্বাধীনতা দেখে অবাক হয়ে যায়। আমার কাছে গজ্‌গজ্‌ করে—"কাকিমা কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন। বাড়ির কাজের লোকের হাতে আলমারির চাবি? ভাবাও যায় না। দেখো, একদিন যখন গয়নাগাঁটি, টাকাপয়সা নিয়ে কেটে পড়বে, তখন উনি টের পাবেন।"

ডলি রেণুকেও অনেকবার এ ব্যাপারে বলেছে। রেণু বলে—"আমি কি করি বলো তো বৌদি? আমার নিজের সংসার রয়েছে। তার ওপর মেয়ের লেখাপড়া। আমি একা আর কতদিক সামলাব। পারুল টাকা-পয়সা যা নেয় নিক। বাবা-মাকে তো দেখছে, এটাই আমার কাছে অনেক।"

।। ২ ।।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেও ত্রিদিব ঘোষের শরীরের কিন্তু খুব একটা উন্নতি হল না। ডাক্তারেরা বললেন—"যা বয়স এখন, কমপ্লিট কিওর হওয়া কঠিন। রেসট্রিকশানে রাখুন যতটা পারেন। তারপর দেখুন কি হয়।" আমি প্রায়ই যাতায়াত করি। রেণুও বেশ ক'বার পরপর আমেরিকা থেকে এল। ও খুব ভেঙে পড়েছে দেখলাম। বলল—"নিমুদা, বাবার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে দেখেছ? আমার হাজব্যাণ্ডের এক কলিগের বোন যাদবপুরে থাকে। ওরা এই বাড়িটা কিনতে চাইছে। ভালো দাম দেবে। ভাবছি, বাড়িটা বিক্রি করে দেব। তারপর বাবা-মাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখব। পাশপোর্ট, ভিসার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখি, এখানের আমেরিকান এমব্যাসিতে কথাবার্তা বলে। শিগগির আবার আসছি। বাবাকে একটু দেখো।"

রেণুর ছুটি শেষ। ও নিজেও ওখানকার একটা স্কুলে পড়ায়। তাই না গিয়ে উপায়ও নেই। পারুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেণুর কথা শুনছিল। আমি বাড়ির বাইরে আসতেই ও আমার পেছনে পেছনে এল। পারুল বলল—"দাদা, বাবাসোনা মামনি কি দিদিভাইয়ের কাছে চলে যাবে? এ বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে?"

"দেখা যাক।"

"কিন্তু এখানে কি ওদের ঠিকমতো যত্নআত্তি করা হচ্ছে না? নিজের ঘরবাড়ি বিক্রি করে অন্য দেশে গিয়ে থাকবে? কেউ কখনো যায় এমন?"

ত্রিদিব ঘোষদের চলে যাবার কথাতে পারুলের মুখ একেবারে শুকিয়ে আমসি। ও বোধহয় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছে। আমি চুপ করে রইলাম।

সপ্তাহ তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা আশুবাবুর বাজারের কাছে দেখলাম বেশ ভিড়। এগিয়ে গিয়ে দেখি পারুল একটা লক্কাপায়রা মার্কা ফুচকাওয়ালার সঙ্গে খুব ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে দেখে হাতে যেন চাঁদ পেল—"দেখুন না দাদা, এই লোকটা আমাকে কি সব নোংরা কথা বলছে। আমার হাত মুচড়ে দিয়েছে। আচ্ছা, আমাকে কি ভেবেছ ও? আমি কি রাস্তার মেয়ে নাকি হ্যাঁ? বলুন?"

পারুলকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ফুচকাওয়ালা ছেলেটা চ্যাঁচাতে লাগল—"আপনি এসব কথাতে থাকবেন না কিন্তু বাবু। আমাদের ব্যাপার আমাদের বুঝে নিতে দিন। আরে, বাবুদের বাড়িতে কাজ করে মুখে বুলি ফুটেছে এখন। বাংলাদেশ থেকে আসার পর কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন ওর মাকে কি কম টাকা গুনেছি নাকি? আমাকে এখন বলে কিনা ছোটলোক? একটা খান্‌কি মেয়ে, শ্লা।"

পারুল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আর একটা কি বলতে যাচ্ছিল, আমি ওকে ধমকে থামিয়ে দিলাম। ও মুখ কাঁচুমাচু করে আমার পেছন পেছন এলো। কতগুলো চ্যাংড়া ছেলে রাস্তায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছেলে বলল—"মাল নিয়ে দুই খোদ্দেরে খিচেল করছে মাইরি।"

কথাটা শুনে আমার মুখের মধ্যেটা পর্যন্ত কেমন তেতো হয়ে গেল। আমি হনহন করে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে লাগলাম। পারুল পেছনে আসতে গিয়েও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার সঙ্গে এল না।

এরপর একদিন হঠাৎ খবর পেলাম যে ত্রিদিব ঘোষ হার্টফেল করেছেন। খবরটা পেয়েই পাইকপাড়ায় ছুটলাম। বিশাখা কাকিমা দেখলাম শোকে একদম পাথর। পারুলই একটার পর একটা ফোন করে চারদিকে খবরটা জানাচ্ছে। পারুলের চোখ-মুখও খুব বসে গেছে। আমি রেণুকে আই. এস ডি করলাম। দেবজ্যোতির অফিসের অ্যাড্রেসে একটা ই-মেলও করে দিলাম। রেণুরা না আসা পর্যন্ত 'ডেড বডি' রাখারও ব্যবস্থা করা হল।

হন্তদন্ত হয়ে রেণু আর দেবজ্যোতি এল। এরপর অবশ্য ওরাই সবকিছু করল। পারুলকে দেখলাম রেণু আসাতে কেমন যেন গুটিয়ে গেছে। এমনিতে রেণু পারুলকে খুব একটা পছন্দ করে না। কিন্তু এবার দেখলাম পারুলকে একদমই পাত্তা দিচ্ছে না।

শ্রাদ্ধের দিন ডলি আমার কানে কানে বলল—"পারুলকে দেখেছ, কেমন জব্দ হয়েছে? নিজের মেয়ে-জামাই এসে পড়াতে, কাকিমা তো ওকে আর পাত্তাই দিচ্ছেন না। ঠিক হয়েছে। এবার ওর তেজ ভাঙবে।"

ডলির কথা শুনে খুব অবাক লাগল। পারুলের সঙ্গে ডলির কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, তবু ও পারুলকে জব্দ হতে দেখলে খুশি হয়।

এরপর রেণু বাড়ি বিক্রি করে দিল। বিশাখা কাকিমাও রেণুদের সঙ্গে আমেরিকা চলে গেলেন। যাবার আগে রেণু বলল—"নিমুদা, এবার আর ইণ্ডিয়াতে আসাটা অত ঘনঘন হবে না। তবে যখন আসব, তোমার বাড়িতেই উঠব কিন্তু। একটা ঘর যেন খালি থাকে।" আমি ওদের সঙ্গে এয়ারপোর্ট অবধি গেলাম।

এরপর আর পারুলের কোনো খবর নেবার চেষ্টা করিনি। ভেবেছি, ও হয়ত আবার পাইকপাড়া বস্তিতেই ফিরে গেছে।

।। ৩ ।।

বছর তিনেক পরে, নভেম্বরের শেষে, একদিন বাগমারি বাজার থেকে ফেরার পথে পারুলকে আবার দেখলাম। ফুটপাতে বসে সবজি বিক্রি করছে।

চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে যে চেনাই যায় না। আমাকে দেখে প্রথমে এড়াবার চেষ্টা করলেও পরে হাসল—"ভালো আছেন দাদা?"

"তোমার একি চেহারা হয়েছে পারুল?"

"আর বলবেন না দাদা। পেটে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কদিন ধরে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু যা দাম, কিনতে পারছি না। শরীরের জন্যে আজকাল তো তেমন খাটতেও পারি না। পয়সা কোথায় পাব?"

আমার কাছে যা পয়সা ছিল, তার থেকে বাসভাড়া বাদে বাকিটা বাজার করতে করতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই পারুলকে তখন কিছু দিতে পারলাম না।

পারুল বলল—"মামনি, দিদিভাইয়ের খবর জানেন? ওরা সব ভালো আছে?" পারুলের বলার মধ্যে একটা অদ্ভুত আন্তরিকতা লক্ষ্য করলাম। ওদের খবর যতটুকু জানি পারুলকে জানালাম।

এরপর দেখতে দেখতে নিজের সাংসারিক ঝামেলায় আমি নিজেই একেবারে জেরবার হয়ে গেলাম। তখন পারুলের কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো ইচ্ছে বা সময় কোনোটাই ছিল না আমার। সামনের বছর রিটায়ারমেন্ট অথচ এখনো ছেলে এস্টাবলিশড্ হল না। বিজনেসে পরপর লস্ দিয়েই চলেছে। কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ওদিকে ডলির ইউটেরাসে ম্যালিগন্যান্সি ধরা পড়েছে। ডলিকে নিয়ে সারাদিন ডাক্তারখানা আর হাসপাতালে দৌড়োদৌড়ি করতে হচ্ছে।

পুজো এসে গেল। ছুটির আগে আমার লাস্ট ক্লাস ছিল দুপুর আড়াইটেতে। কলেজে ঢোকার মুখে দেখি দেবদারু গাছের নিচে পারুল দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে খুব অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার কাছেই যে এসেছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই টাকা চায়। আমার আর্থিক অবস্থা এই মুহূর্তে মোটেই ভালো নয়। তাই বিরক্ত হয়ে পকেটে হাত দিলাম। পারুল বলল, "সকাল থেকে আপনার জন্যে বসে আছি। বউদি রাগ করবেন, তাই আপনার বাড়িতে যাইনি। একজনকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতে বলল, দুপুরে আসবেন।"

"কী ব্যাপার? কী চাও?" লক্ষ্য করলাম, পারুলের চেহারার বেশ উন্নতি হয়েছে। বেশ মোটা হয়ে গেছে ও এখন।

"আপনাকে একটা কথা বলব দাদা।"

"কী কথা?"

একটু চুপ করে থেকে পারুল বলল—"আচ্ছা, আপনি দাদাবাবুর দিকে নজর দেন না? দাদাবাবু ওর বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় কোথায় যায়, আপনি জানেন?"

"কে? পিন্টু? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বলতে চাইছ তুমি?"

"দাদাবাবু আজকাল খুব খারাপ জায়গায় যাতায়াত করে। বাজে নেশা করে। আপনি দাদাবাবুকে শোধরান দাদা। আপনার ছেলে এমন হবে?"

"কিন্তু তুমি কী করে জানলে এসব?"

আমি পারুলের দিকে তাকালাম। পারুল উত্তর দিল না। পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। পারুল যে মিথ্যা বলছে না, সেটা আমি জানি। কিন্তু পারুলের সামনে সেটা বলতে আমার বাধল।

"আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি এখন যাও।"

পারুল চলে যাচ্ছিল, আমি ওকে ডাকলাম আবার—"তুমি এই টাকাগুলো রাখো পারুল।"

"না, না। টাকা লাগবে না। আমার আর এখন তেমন অভাব নেই।"

"নাও না। ভাইফোঁটায় কিছু কিনে নিও।"

পারুল অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর একগাল হেসে বলল—"দিন তাহলে।"

কারখানার ভোঁ খুলে গেটে লাগালেন চোঙা। শিল্পের পেছনে শলাকা। নোকরি হয়ে গেল ছোকরি।

ট্যারা চোখে

ত্রিশূল

এ গল্প, সেই জোড়াফ্রন্টের সময় শুরু। আমাদের প্রজন্ম তখন ইস্কুলে বসে মাধ্যাকর্ষণ চিবোচ্ছে। পতাকার তারা ভাগ্যে বসাতে গরুবাছুর তাড়িয়ে দিল মানুষ। গোয়াল ফাঁকা করে গোলাপগাছ লাগিয়ে দিল। গরুর বাঁট ছেড়ে দুধ চলে গেল পলিপ্যাকে। কয়লা হয়ে গেল ঘরের ময়লা। উন্নত পরিষেবা, উন্নত জীবনযাত্রা। ক্রমে উৎপাদনের জায়গায় "উৎপাটন" শুরু হল। মূল্যবোধে ফুটো হয়ে বিশ্বাস বেরিয়ে গেল। আরেক সত্য গেড়ে বসল। খুপরি থাকলে উপরি হয়। আর ঝুপড়ি হয় প্রাসাদ। তারপর এলেন সেই ব্যাণ্ডমাস্টার। কারখানার ভোঁ খুলে গেটে লাগালেন চোঙা। শিল্পের পেছনে শলাকা। নোকরি হয়ে গেল ছোকরি। ক'দিন ঘুরে-বেড়িয়ে নাও। তারপর হঠাৎ একদিন চিঠি লিখে বলবে—আর এসো না। দেখা হবে না। আমরা চলে যাচ্ছি অন্ধ্রে। তোমার মতো খচ্চরকে কোনোদিন ভুলব না। গতিবাবু গতিরোধ করে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ মিটারে লালশালু জড়িয়ে গ্যারেজমুখী হয়ে গেল। জীবন হয়ে গেল যুদ্ধ। এখন যুদ্ধবাবু সেই যুদ্ধকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্বে। দাদা ঘুড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। ইট চাপা লাটাই। ভাই শুধু সুতো ধরে দাঁড়িয়ে। প্যাঁচ মারা চলবে না। দাদা ছাদে ঘুরছেন। নজর রাখছেন। কলবাঁধা বাঙালির ভাগ্য মাঝ-আকাশে ঝুলছে। কাকেরা অবাক। অবাক পৃথিবী। কী ছিল, কী হল। ভাস্কো-ডা-গামা কলকাতা বন্দরের খোঁজ পেলে খিদিরপুরে বাড়ি করে পড়ে থাকত। সেই বন্দরে আজ কটা গামছার জাহাজ পঞ্চাশফুট পলির ওপর রগড়ে রগড়ে চলেছে। মাছেরা অবাক। জল এত ঘোলা হল কী করে। জলের প্রাণী তবু বেঁচে আছে। কিন্তু ডাঙা হয়েছে শ্মশান। ডান হাতের কাজ বাম হাতে কি হয় রে ক্ষ্যাপা? ভাতের পাতে চেরিফল খেয়ে খেয়ে বাঙালি আজ মাকালফল। Home-এও না, Office-এও না। আহা, যেন একদল নিমাই নবদ্বীপের রাস্তা ধরে চিনেবাদাম খেতে খেতে মহাদেবের মিটিং-এ চলেছে। আজকের বিষয়—নেশা বড় না পেশা বড়। প্রভু, কোয়ালিশন কি? প্রভু কমণ্ডলে চুমুক চুমুক মেরে পোষা সাপটার মুখে দুটো কাজু গুঁজে বলবে, জানস্ নাই? কোয়ালিশন হল কল্‌কেমিশন। একটা কলকে ধরিয়ে সংসদে গোল হয়ে বসে সবাই মিলে টানা। মাঝখানে কমন এজেণ্ডার বাণ্ডিল জ্বলবে। কেউ কেউ সে আগুনে বিড়ি ধরাবে। আজকাল তোদের এখানে খুব চল হইসে। মিটিং-এ জয়ধ্বনি হবে—হর হর মহাদেব। কিছু করো বুদ্ধদেব।

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে মহাদেব বলবে, এডা কে রে?—প্রভু, আপনারই অবতার। নাট্য অবতার।—রামকেষ্ট কেডা?—প্রভুর অপনেন্ট। বলে মালের চেয়ে মায়ের নেশা কর, উতরে যাবি।

মহাদেব বললেন, মনে পড়েছে। শালার ডাণ্ডায় ত্রিশূল ঝেড়েছিলাম। মেয়েছেলে দেখলেই 'মা মা' করে হেদিয়ে মরেছিল সারা জীবন। তোরা ও দলে যাবি না। মিটিংয়ে আসবে কে? মিছিলে হাঁটবে কে? জানবি নেশাই বড়, পেশা না। খামার বড়, মানুষ না।

—দিব্যেন্দু দাস

পথঘাটের কিসসা

বীর নারী

কলকাতায় পকেটমার ও ছিনতাইবাজদের বিশেষ কতকগুলো এলাকা আছে। ঠিক যেমন থানা-পুলিশের নির্দ্দিষ্ট এলাকা ভাগ করা থাকে।

একদিন বাসে করে যাচ্ছি এ রকমই এক পকেটমার ও ছিনতাইবাজ অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে। বাসে খুব ভিড় নেই, তবে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ এক ব্যক্তি চিৎকার করে ওঠে—'আমার ব্যাগ ছিনতাই করে নিল।' বাসের লোকেরা তাকিয়ে দেখল এক ষণ্ডামার্কা লোক, হাতে একটা ধারালো ক্ষুর, শাসাচ্ছে, 'কেউ চিৎকার করবে না।' বাস তখন বেশ স্পিডেই চলেছে। আশেপাশের হৃষ্টপুষ্টরা ভয়ে একেবারেই চুপ, আতঙ্কে নড়তে পারছে না।

হঠাৎ দেখলাম লেডিস্ সিট থেকে এক যুবতী, সম্ভবত কোনো কলেজের ছাত্রী, তীব্র গতিতে লোকটার হাত থেকে ঝট্‌কায় তার ক্ষুরটা ফেলে দিযে তার চুলের মুঠি ধরে ফেলেছে। বাসও তখন আস্তে আস্তে থামতে চলেছে। লোকটা ধস্তাধস্তি করতে করতে ব্যাগ ফেলে বাস থেকে নেমে ছুটে পালাল।

মেয়েটি যাত্রীদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে বলল, 'আপনারা সব হাতে চুড়ি আর কানে দুল পরে বসে থাকুন।'

বেঁচে থাক হিজড়ে

কলকাতার, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার অটোরিক্সা চালকেরা ভীষণ শক্তিশালী। একদিন দেখি এক অটোবিক্সাচালক রাস্তার মাঝখানে তার অটোরিক্সা দাঁড় করিয়ে এক প্রাইভেট বাসের ড্রাইভারের সাথে বচসা করছে এবং সেই ড্রাইভাবকে প্রায় মারতে যায় আর কি। ফলে বিশাল যানজট। ঐ প্রাইভেট বাসের ড্রাইভার কাঁচুমাচু, মিউ মিউ করছে। বুঝলাম অটোরিক্সার ক্ষমতা বেশি। কাবণ যান জট্‌কে তারা পরোয়া কবে না। এ হেন অটোরিক্সাকে মিউ মিউ করতে দেখে সেদিন অবাক হযে গেলাম।

সেদিন বিশাল লাইন দিয়ে অতিকষ্টে অটোরিক্সার পিছনের সিটে জায়গা পেযেছি। হঠাৎ দেখি আমাব পাশে দু'জন লম্বা চওড়া নপুংসক এসে বসলেন। যথারীতি অন্যান্য দিনের মতো সে দিনও অটোরিক্সা শেষ স্টপেজের মোড়ের অনেক আগেই গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, এখানেই নামুন, আর যাবে না। রোজই এটা করে, কারুর কিছু বলাব সাহস থাকে না, শুধু মিউ মিউ করে বাকি রাস্তা হেঁটেই যায়, কারণ অটো শক্তিশালী। দুই চড় বসিয়েও দিতে পারে।

কিন্তু আজ হঠাৎ দেখলাম সেই হিজড়ে দু'জন ঐ অটোরিক্সা চালককে চড় উচিযে বললেন—'শালা তোর বাপ যাবে ঐ মোড় পর্যন্ত, লোকেরা এর জন্য টাকা দেয় তোকে।' অটো চালক হয়ে মিউ মিউ করতে করতে ঐ মোড় পর্যন্ত এসে গাড়ি থামাল। এই প্রথম মনে মনে বললাম, বেঁচে থাক হিজড়ে।

কেস মেটানো

ইদানীং পকেটমারেরা পকেট মেরে, যার পকেট মারল তাকেই পকেটমার সাব্যস্ত করে ভালো করে চড়-চাপড় মেরে বাস থেকে নেমে যায়।

একদিন ভিড় বাসে ভাড়া দিতে গিয়ে পকেটে হাত দিযে দেখলাম সেটা আর নেই। বুঝলাম একটু আগেই আমার অন্যমনস্কতার খেসারত স্বরূপ সেটি পকেটমার হয়েছে। বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম এবং অনেকখানি রাস্তা হেঁটে থানায় এলাম অত্যন্ত রাগ এবং দুঃখ নিয়ে; এর একটা বিহিত করার বাসনায়।

বড়, মেজ, সেজবাবুবা কেউ ছিলেন না। ছোটবাবু ছিলেন। তিনি খাতায় রিপোর্ট লিখতে কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। বলছেন, আপনি যেখানে বাস থেকে নেমে পড়েছেন সেটা আমাদের আণ্ডারে নয়। বড়বাবু আসুন তারপব জানবেন। আমাকে উপদেশ দিলেন; কী হবে রিপোর্ট লিখিয়ে? কেস চালাতে পারবেন? অনেক বছর ধরে থানায় আর কোর্টে হাঁটাহাঁটি করতে হবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। আমি রাগ এবং জেদ ধরে থানায বসে রইলাম বড়বাবুর সাথে দেখা করার জন্যে। সন্ধ্যায ওনারা সবাই এলেন। আমাব সব কথা শুনে মেজবাবু হঠাৎ একটা মানিব্যাগ বার করে বললেন,—দেখুন তো এটা আপনার কিনা। চমকে উঠে দেখলাম ব্যাগটা আমার। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার।

—কত টাকা আছে?

—দু'শো টাকা এবং কিছু খুচরো পয়সা।

—কিন্তু আমি দেখছি এতে একশো টাকা আছে। আপনি ভুল বলেছেন। একশো টাকাই ছিল। এটা নিয়ে আপনি চলে যান। বলে ব্যাগটা আমার হাতে দিলেন।

ছোটবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, স্যার আমি কেসটা লিখে ফেলেছি।

মেজবাবু আমায় বললেন, যান, আপনি ছোটবাবুর সাথে কথা বলুন।

ছোটবাবু আমাকে বললেন, আপনি মানিব্যাগ ও টাকা জমা দিয়ে যান, কেস মিটে গেলে আবার পেয়ে যাবেন।

—কেস কতদিনে মিটবে?

—তা বছর দু'য়েক তো লাগবেই।

—ঠিক আছে, তা হলে ব্যাগটা রেখে দিন।

ছোটবাবুর হঠাৎ খুব মায়া হল। বললেন, আচ্ছা এক কাজ করুন, আপনি কেসটা মিটিয়ে দিযে যান।

—কী করে মিটবে?

—পঞ্চাশ টাকা জমা দিন, মিটে যাবে।

—ঠিক আছে, তাই নিন। এই বলে পঞ্চাশ টাকা বার করে তাঁর হাতে দিলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বড়বাবুর আর্দালি হঠাৎ পিছন পিছন এসে বলল, কি সাব। কেস মিটে গেল? কুছ জলপানি হবে না।

বললাম, কত?

—বড়াবাবুরা সব আছেন, সবাই খুস্ হবেন। কম্‌সে কম্ তিশ রুপয়া লাগবে।

তার হাতে ত্রিশ টাকা গুঁজে দিয়ে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসতে লাগলাম। গেটের কাছে এসে হঠাৎ থমকে গেলাম। গোঁফ ওয়ালা বিশাল দেহের গেটের পাহারাদার পথ আড়াল করে বলল, ক্যায়া সাব, কেস মিট্ গিয়া? আমি বললাম, হ্যাঁ মিট গিয়া।

—কুছ্ বকসিস্ দিজিয়ে।

আমার ভয় লাগল, যদি বকসিস্ না দিই তাহলে হয়ত খুব মুশকিল হয়ে যাবে।

একখানা দশ টাকার নোট ওর হাতে দিলাম।

—ব্যস। স্রিফ্ দশ রুপয়া। ইস্‌মে ক্যায়া হোগা? নেহি লাগে গা, আপ রাখ্ দিজিয়ে।

ভয়ে পড়ে আরো দশ টাকা বার করে ওর হাতে দিয়ে হন্ হন্ করে বাড়ির পথ ধরলাম। বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন রাত্রি আটটা। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, কি গো, এত দেরি হল কেন?

বললাম, কেস মিটিয়ে এলাম।

—প্রশান্ত চৌধুরী

ট্যারা চোখে

ফতুর দিদি, চতুর দিদি

তুলনা নেই আমাদের দিদির। এমন দিদি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/ সকল নেতার নাককাটা দুই-নম্বরি বোস্টুমী।

দিদি হলেন ইউনিভার্সাল দিদি। আটেরও দিদি, আশিরও দিদি। ফতুর দিদি, চতুর দিদি। এই বুঝি মনে হল, সিধে পথে হাঁটতে গিয়ে ফতুর হয়ে গেলেন। অমনি দেখলেন, রাজকুমারীর মাথার কাছে রুপোর কাঠি আর পায়ের কাছে সোনার কাঠি। উল্টে দিয়ে চতুর হয়ে গেলেন। দিদির এখন একূল-ওকূল দু'কূল হারানোর দশ চলছে কিনা। সুতরাং আজ যার কাজকম্মো নিয়ে সমালোচনার বান ডাকা হল, কাল তারই জন্যে ঝুলি নিয়ে সাংসদদের ভোট কুড়োতে শতহস্ত। কথায় বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কংগ্রেসের নামে বাপ-বাপান্ত শাপ-শাপান্ত করে শেষে তারই ন্যাজে ভর করে পার হওয়ার চেষ্টা। তারপর বিফলে ন্যাজের বাঁধন কেটে আবার পুরনো ঘাটে। কিন্তু খোয়ানো মন্ত্রীত্ব জোটে কই? একটা ইস্যু পাওয়া গেল—কিন্তু তাঁর হুম্‌কিতে অটলজির টলার কোনো লক্ষণই নেই। উপায়? তবে যুদ্ধের পথ ছাড়ো, ভজনার পথে বাড়ো। কিন্তু এতেও যদি না জোটে মন্ত্রীত্বের বখশিস? দরকার হলে দিদি নিশ্চয় নরেন্দ্র মোদীকে ইয়া একখানা সার্টিফিকেটও দিয়ে দিতে পিছপা হবেন না যে ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে এমন অসাম্প্রদায়িক, এমন উদার, এমন আর্তদরদী, এমন সুশাসক, এমন পরমত সহিষ্ণু ...

দিদি আরো আরো বিশেষণ খুঁজতে থাকুন; আমরা ততক্ষণ দিদির নামে জয়ধ্বনি দিই।

—সুচতুর গুপ্ত

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

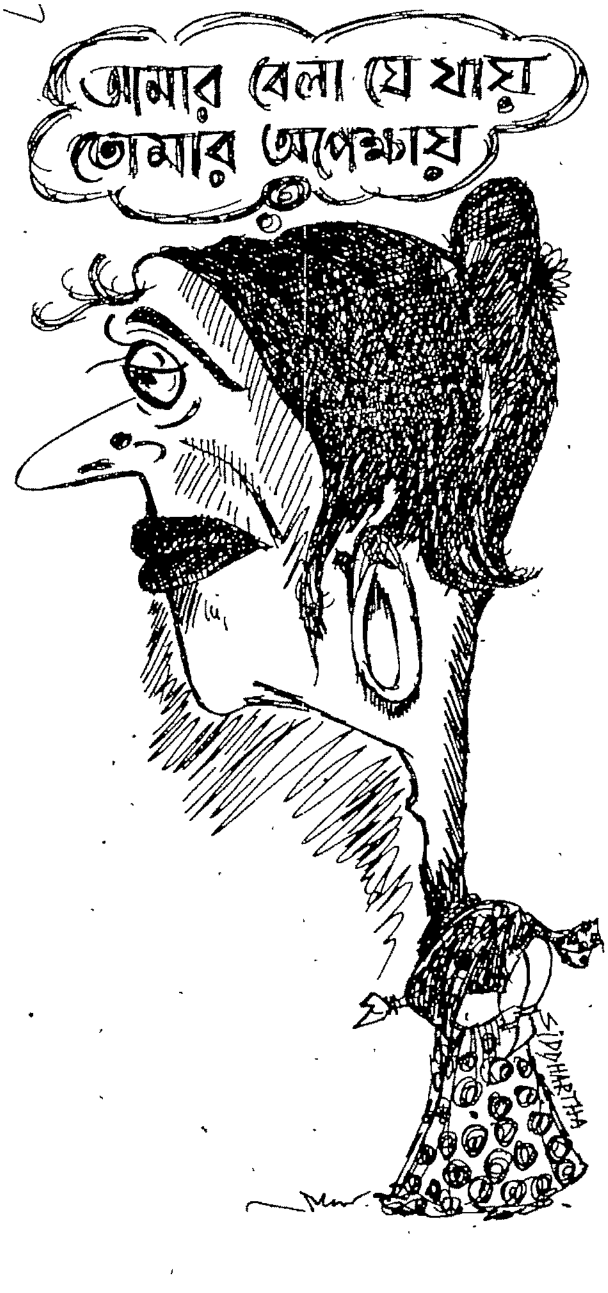

কবিপক্ষের রাগিনী.........

N. C. DAW & Co.

Gun Makers

Since 1835

9, B. B. D. BAG (EAST)
KOLKATA-700 001
220-6643/4317

Postal Regd. No.-Tech/WB/RNP-566/2002
PATRAPATH • May 2002 • Vol-2 Issue-10 • Regd. No.-WBBEN/2000/5855 • Rs. 8.00

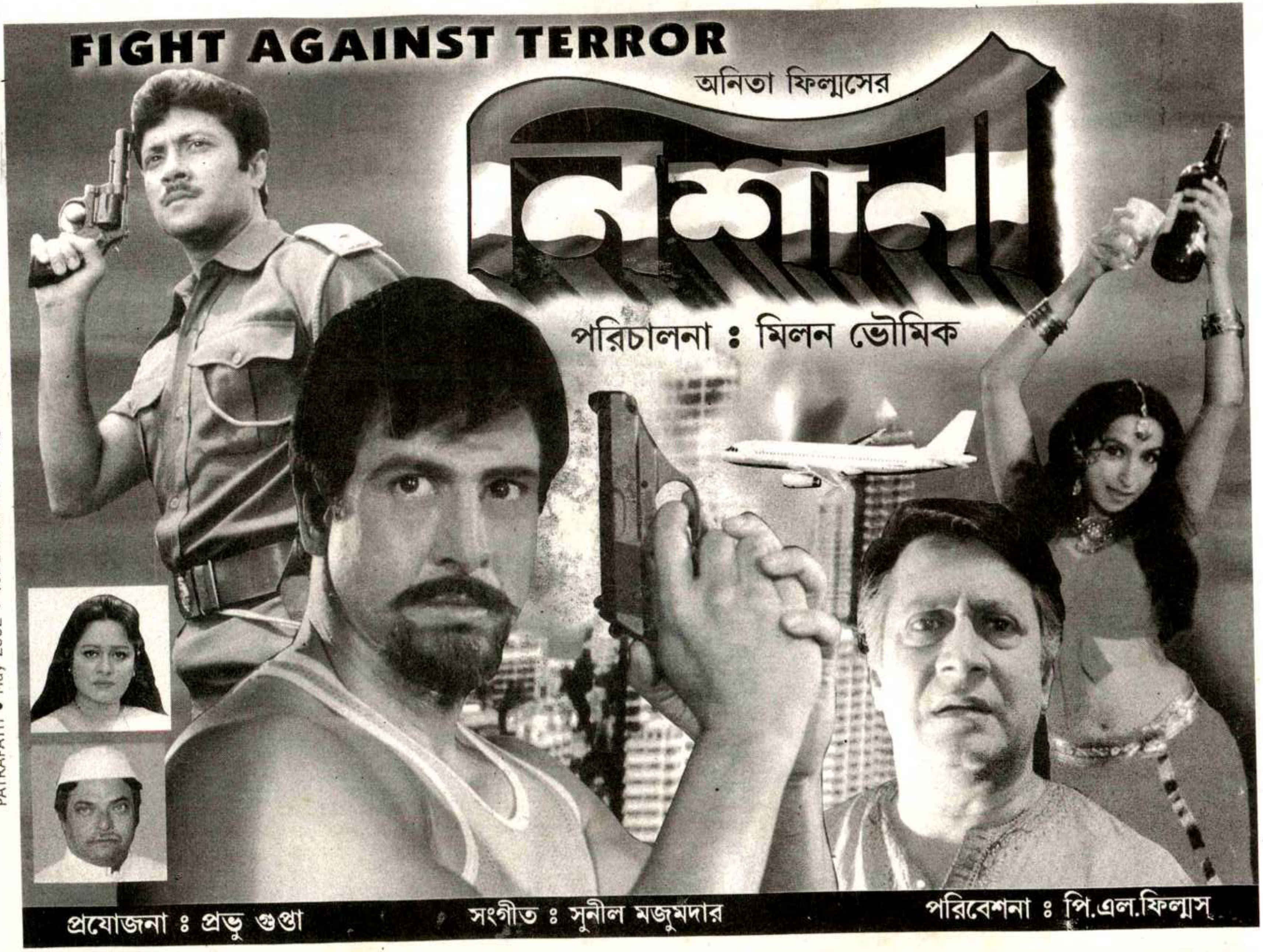

জুন ২০০২
২য় বর্ষ ।। ১১ সংখ্যা
দাম : ৮ টাকা

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

কাউকে হাসানোর কাগজ কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

সরি, এটা বধূ-নির্যাতন নয় আধুনিক দাম্পত্য প্রেম। Strictly Confidential
Siddhartha

পুরুষবাদ

যে যায়, সে যাকে রেখে যায়

বিদ্যুৎপর্ণা গুপ্ত

আবির্ভাব : ২৭শে আগস্ট ১৯৪৫ প্রয়াণ : ২৮ শে.মে ২০০২

যে যায় সে যায়, তাকে যেতে দিতে হয়
এই দিন এই রাত এই পরমায়ু এই তিল তিল অমূল্য সময়
এই সুখ এই স্বপ্ন এই প্রেম-প্রহেলিকা–
যে যায় সে যায় তার নিজের মতন
তাকে যেতে দিতে হয়,
‘যেতে নাহি দিব’ বলে জলের বাঁধন যত দু’পায়ে জড়ায়,
তার জেদ তত বাড়ে, সে যায়, সে তাহার মতন চলে যায়
রেখে যায় মরুভূমি, রেখে যায় অনাবৃষ্টি
বানভাসি ঘর আর শ্মশান-সময়
যে যায় সে যায়, শুধু রেখে যায় স্মৃতিচিহ্ন মমির মতন;
যে যায় সে যাকে ছেড়ে যায়, তার
চারিদিকে জেগে থাকে অপার বিস্ময়,–সেই ফসিল হৃদয়,
সে শুধু জেনেছে, তাকে যেতে দেওয়া বিধির বিধান.....
যে যায় সে যায়, তাকে যেতে দিতে হয়........
অথবা সে জানেনি কিছুই, জানবে না কোনোদিনও
কোনও দিন-কোনও দিন নয়
সে তার মতন থাকে, দুই হাতে ছুঁয়ে থাকে সমিধনিচয়........

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

২য় বর্ষ।। ১১ সংখ্যা।। জুন ২০০২

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি : ডাঃ তুষারকান্তি রায় ● প্রদ্যোত কুমার মিত্র ● বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● অঞ্জনা দত্ত ● ডঃ শুভাশিস নিয়োগী ● শচীন মিত্র

পুরুষকে পুরা বাদ দিতে পারিলেই ভালো হইত। কিন্তু সম্পাদক মশায় গদি ছাড়িতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আর নারীগণ, নারীবাদ লইয়া কলমে যতই স্ফুলিংগ নির্গমন ঘটান না কেন, পুরুষকে ঝাঁটাইয়া বাদ দিতে নিতান্তই বাদ সাধিলেন। এমনকি ঘোরতর উচ্চকিত নারীবাদী কবি **কৃষ্ণা বসু** বরং আত্ম সমালোচনা করিয়া পুরুষকে প্রায় সার্টিফিকেট দিয়া বসিলেন। হায়, পুরুষের কী দুর্দিন! বাদ যাইতে চাহিয়াও পারেন না! তবু মন্দের ভালো, **বন্দনা রায়, বুলু মুখোপাধ্যায়, বিপাশা মণ্ডল** প্রমুখ অনামাগণ পুরুষকে কিঞ্চিৎ তুলোধোনা করিয়া মুখরক্ষা করিয়াছেন।

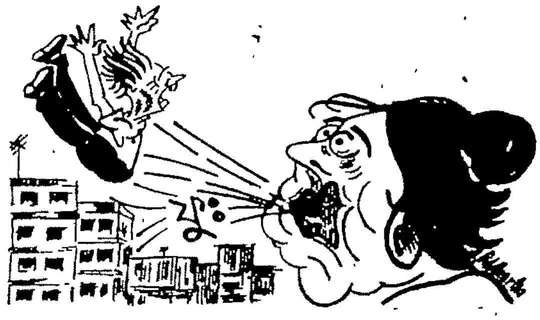

এই সংখ্যায়

বিজয়া মুখোপাধ্যায়,
কণা বসু মিশ্র,
মল্লিকা সেনগুপ্ত,
বীথি চট্টোপাধ্যায়

শত অনুরোধেও পুরুষের মুণ্ডপাত করেন নাই!

সম্পাদকীয় □৩ পত্রপাঠ জবাব □৯ মহিলা মহল □১৩ সমাজ দুঃসংবাদ □১৬ টাকা নিষ্প্রয়োজন □১৯ চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ □২৫ সংস্কৃতি দুঃসংবাদ □৩০ জবর খবর □৩১ সঙ্গীত দুঃসংবাদ □৩৬ রাশি চক্কোর □৩৮ পুস্তক সুসংবাদ □৪১ পরমাণু কবিতা □৪৩ হেঁসেল □৪৭ ট্যারা চোখে □১২, ২৭, ৪১, ৪৬ রসকেলি □১৫, ৩০, ৪৫ কার্টুন □২,৮,৩৩

প্রচ্ছদ কাহিনী · এ তো বড় রঙ্গ যাদু • কৃষ্ণা বসু □৪৪ পুরুষবাদ • বন্দনা রায় □৬ দ্বন্দ্ব না মিলন • বুলু মুখোপাধ্যায় □১৪ পুরুষবাদ ও আমি • বিপাশা মণ্ডল □২২

নিয়মিত : অকপটে • সমরেশ মজুমদার □১১ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □১০ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি □৩৩

পুরনো কাসুন্দি কালিদাস-এর "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" ও "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" থেকে □ ৪

গল্প . টিয়াপাখির ঠোঁট • ওম্‌বিকা গুপ্‌তো □১৭ ভোলা ভবপারে • দিব্যেন্দু দাস □ ২৬ কোথায় পাব তারে • অভিজিৎ রায়চৌধুরী □২৮

রসকাব্য : ডট্ কমে রবিবাবু • বিমান চট্টোপাধ্যায় □২৪ ভাঁড়ু দত্তের বেসাতি • সরল মুখোপাধ্যায় □২৪ একটি দুর্মূল্য আবিষ্কার • ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় □৩৭ রাসযাত্রা • সুনীল বরাট □৪০ ইয়া আল্লা সিয়ারাম • সৌরেন বসু □৪৮

অনুবাদ কাব্য : শব্দ তো অনেক আতেঁ যাতে হ্যায় • প্রসন্ন খড়গপুরী □২৩

কার্টুন কাহিনী : বাংলায় নারী নিগ্রহ • পল্লব চক্রবর্তী □২০,৩৪

এ ছাড়া : তবুও তো • মুসুমুসু গৃহিনী □৩৯ এলবাম • দিব্যেন্দু দাস □৪২

প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ কর্মকার
অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ কর্মকার • অরুণ সেন

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন · ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, সন্ধ্যা ৫-৯টা)
সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ণ রোড, কলি-১৯ , মুদ্রণ দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

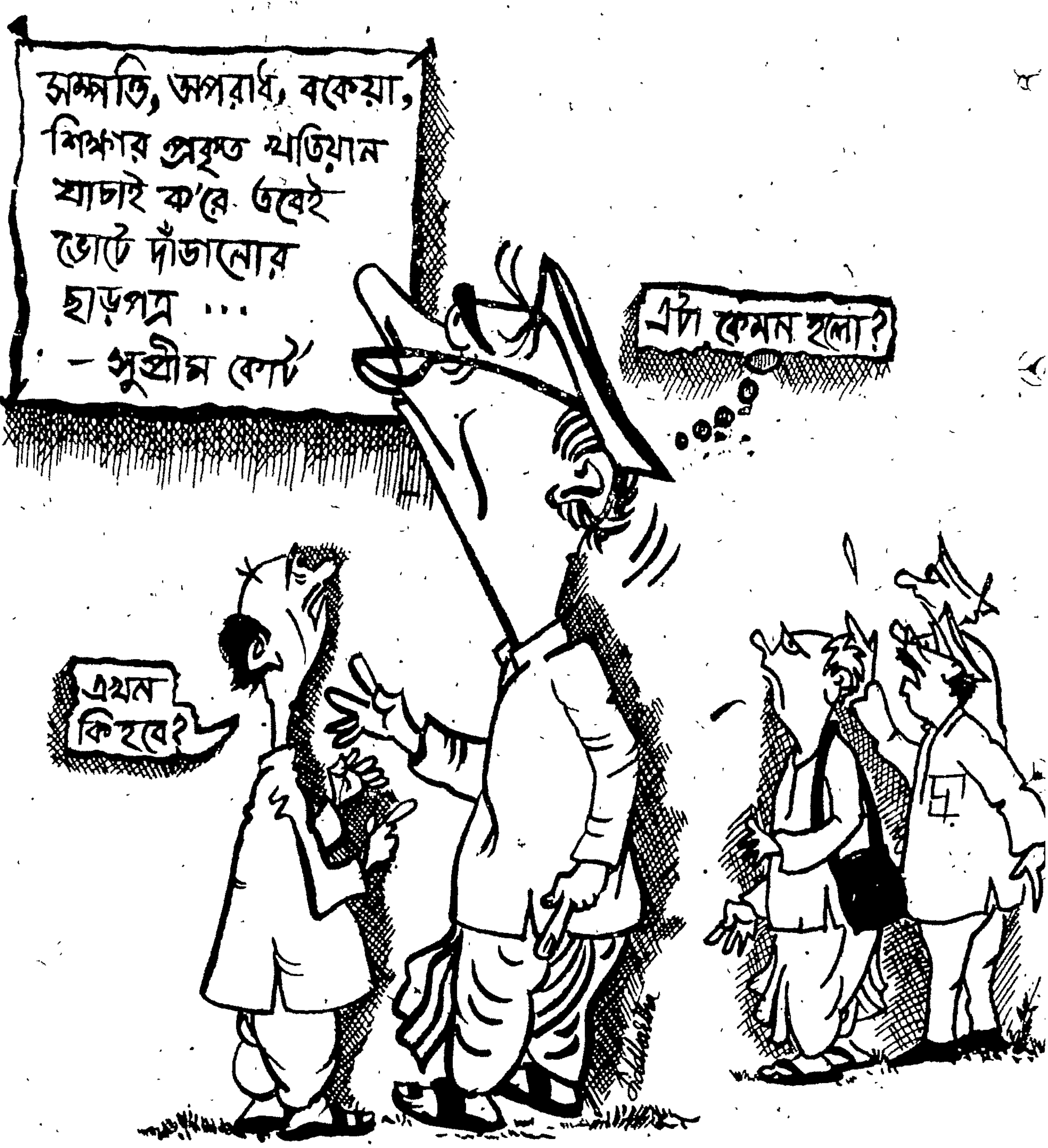
সম্পত্তি, অপরাধ, বকেয়া, শিক্ষার প্রকৃত খতিয়ান যাচাই ক'রে তবেই ভোটে দাঁড়ানোর ছাড়পত্র ...
— সুপ্রীম কোর্ট
এটা কেমন হলো?
এখন কি হবে?

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

সম্পাদকীয়

পহেলা রাতে বিড়ালবধ

মবিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা—এরূপ বাসনা শ্রীরাধা করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব কবির বিশ্বাস। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তীকালে রাধা হইতে চাহেন—এমন অবাস্তব কথা তাঁহাদিগের চূড়ান্ত কল্পনাতেও আসে নাই। কেবল কিষণজিই নহেন, বমণী হইবার মনোহর প্রস্তাবে মাথা মুড়াইবেন—এমন 'পুরুষ' নাই। তথাপি পুরুষ-নারীর কাজিয়া আদিগন্ত কাল চলিতেছে—হর-গৌরীর নিত্য কোন্দলের ন্যায়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষে নির্ভর হওয়াকে যাঁহারা লজ্জা জ্ঞান করেন, তাঁহারাই পুরুষ সমৃদ্ধ গেরস্তালি হইতে মধ্যে মধ্যে বাহির হইয়া পুরুষ-বিবোধী তর্জন গর্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষ বাদ দিয়া নির্ভার হইবার কোনো সাধ তাঁহাদিগেব নাই। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া পুরুষ জাতি যে নিশ্চিন্ত পৌরুষ স্ত্রী-জাতির উপব ফলাইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতিকার কি এভাবেই হইবে? বস্তুত পুরুষও প্রথম প্রণয়কালে (বিবাহোত্তব প্রেমেও) "দেহি পদপল্লব মুদারম্" বলিয়া রমণী-চরণপ্রান্তে এত বেশি লুটাইয়া পড়ে, এত বেশি নারী-নির্ভর হইয়া পড়ে যে, ঘোর কাটিবার পর দ্বিগুণ পৌরুষ দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহে। এমতাবস্থায় আমরা একটি টোটকা আবিষ্কার করিয়াছি। ভবিষ্যতের পুরুষালি রমণীগণ বাসরে অথবা পার্কে, আপনাপন হৃদয় দৌর্বল্য দমন পূর্বক ভুলুণ্ঠিত প্রেমিকের মস্তকে তাঁহাদিগের চম্পক অঙ্গুলি অথবা কোমল পদপদ্ম স্থাপন না কবিয়া দু-চারি ঘা মুগুর বর্ষণ করিলে (মধ্যম মানে সখী, ফাটিয়া না যায়) প্রেমিকেরও চৈতন্য হয, আর আপনিও বেশ উপলব্ধি করেন যে, আপনারও পৌরুষ কম নাই।

এই ক্রিয়ায শাদির রাতেই বিড়াল মরিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পরবর্তীকালে উক্ত সংসারে ভগবান ভিন্ন আর কেহই উঁকি মারিতে সাহস করিবেন না—নিরুপায় তিনি, ডিউটির তাগিদে তাঁহাকে এমন কত ঝুঁকিই যে লইতে হয়!!

পুরনো কাসুন্দি

কবিকঙ্কণ চণ্ডী থেকে

হর-পার্ব্বতীর কোন্দল

রাম রাম স্মরণেতে পোহাল রজনী।
শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিল শূলপাণি।।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপনে।
বসিলেন মহাদেব অজিন আসনে।।
বামদিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর।।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গৌরী করিলা অঞ্জলি।।
কহিছেন শঙ্কর ভোজন-কুতূহলী।
কালি ভিক্ষা কবি দুঃখ পাইনু বহুধামে।
সকালে খাইয়া অদ্য থাকিব আশ্রমে।।
আজি গৌরী রান্ধিয়া দিবেক মনোমত।
নিম শিম বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত।।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুষ্মাণ্ড বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।।
ঘৃতে ভাজি ভাজি শক্রাতে ফেলহ ফুলবড়ি।
চৌয়া চৌয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি।।
রান্ধিবে ছোলার ডাল তাতে দিবে খণ্ড।
আলস্য ত্যজিয়া জ্বাল দিবে দুই খণ্ড।।
রান্ধিবে মসুর সূপ দিয়া লঘু জ্বাল।
সাম্ভালিযা দিবে তথি মরিচেব ঝাল।।
নটিয়া কাঁঠাল বীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃত সম্ববিয়া দিবা জামিবের রস।।
কডই করিযা বান্ধ সরিষাব শাক।
কটু তৈলে বাথুযা কবহ দৃঢ় পাক।।
বান্ধিবে মুগের সূপ দিয়া ডাব জল।
খণ্ডে মিশাইয়া বান্ধ করঞ্জের ফল।।
আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধহ পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌবী না কর বিলম্ব।।
গোটা কাসুন্দিতে দিবা জামিবের রস।
এবেলাব মত রান্ধ এ ব্যঞ্জন দশ।।
রন্ধন উদ্‌যোগ গৌবী কর হবে স্থিব।
ভোজনের শেষে খাব হাঁড়ি দশ ক্ষীর।।
বলিল এতেক বাক্য যদি পশুপতি।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী।
রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোঁসাই।
প্রথমে যা পাত্রে দিব তাহা ঘরে নাই।।
কালিকার ভিক্ষা নাথ, উধার শুধিনু।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিনু।।
আছিল ভিক্ষার শেয পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল জলপান।।
আজিকাব মত যদি বান্ধা দেও শূল।।
তবে সে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল।।
এমত শুনিয়া হর-গৌরীর ভাবতী।
বলেন সক্রোধ হয়ে দেব পশুপতি।।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।

শিবের সংসার-বিরক্তি

আমি ছাড়ি ঘর যাব দেশান্তর
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর তুমি কর ঘর
লয়ে গুহ গজাননে।।
দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।

গৃহিণী দুর্জ্জন গৃহ হল বন
বাস করি তরু-তলে।।
কত ঘরে আনি লেখা নাহি জানি
দেড়ি সম্বল নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুর করে দুড় দুড়
গণার মূষিক পাকে।।
গুহার ময়ূরে খেদাইল মোরে
সাপ ধরি ধরি খায়।
হেন লয় মোর এই পাপ ঘরে
রহিতে নাহি জুয়ায়।।
কটাক্ষ করিয়া বাঘ ফিরে ধায়্যা
দেখিয়া তাহার চাহনি।
বলদ দুর্ব্বল করে টল টল
নাহি খায় ঘাস পানী।।
আন বাঘছাল শিঙ্গা হাড়মাল
বিভূতি ডমরু ঝুলি।
চল চল নন্দী হও মোর সঙ্গী
ঘরে না থাকিবে শূলী।।

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ থেকে

শার্ঙ্গরব।—(রাজন্! মহর্ষি বলিয়াছেন যে) অতি সঙ্গোপনে শপথপূর্ব্বক আমার এই কন্যাকে আপনি যে বিবাহ করিয়াছেন, আপনাদের উভয়ের সেই পরিণয় আমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করিয়াছি। কেন না,—আমরা আপনাকে সম্মানজনক পূজার্হদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। আবার আমার এই শকুন্তলাও যেন শরীরধারিণী সৎক্রিয়া। সুতরাং পূজার্হ ব্যক্তিতে সৎকার সহকারেই অর্চ্চনা করা সর্ব্বপ্রকারে বিধেয়। আপনার ন্যায় গুণবানের সহিত শকুন্তলার ন্যায় গুণবতীকে মিলিত করিয়া প্রজাপতি চিরকালের জন্য প্রশংসনীয় হইলেন। আপনাদের উভয়ের এই মিলন না হইলে বিধাতার ঘোর নিন্দা হইত। অতএব আপনি ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত আপনার এই সহধর্ম্মিণীকে গ্রহণ করুন,—রাজন্! ইনি এখন স-সত্ত্বা।।

গৌতমী।—আর্য্য! আমারও দু'একটা কথা বল্‌বার ছিল, কিন্তু বলতে যেয়ে দেখ্‌ছি,—বলবার আর পথ নাই। কেন না,—এই শকুন্তলা আপনাকে আত্মদান করিবার সময়ে গুরুজনের কোনই অপেক্ষা রাখে নাই এবং আপনিও ইহার স্বজনবর্গকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আপনারা দুইজনই স্ব-ইচ্ছায় যখন এইরূপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আপনাদের একের জন্য অন্যকে কি বল্‌বো—বলুন। এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির কোন কথাই মানায় না বা সাজেও না।।৫০।।

শকুন্তলা।—(মনে মনে) দেখি, আর্য্যপুত্র কি জবাব দেন।।৫১।।

রাজা।—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! যেন একটা উপন্যাস।।৫২।।

শকুন্তলা।—(মনে মনে) উঃ, ইঁহার কথাগুলি যেন জ্বলন্ত অগ্নি।।৫৩।।

শার্ঙ্গরব।—কি! এতদূর! বলি আপনারাই না লৌকিক ব্যবহার-জ্ঞান বিষয়ে পরম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত? আপনি কি জানেন না, যে—সধবা কামিনী যতবড় সতীই হউক না-কেন, সে যদি নিয়ত পিতৃগৃহেই বাস করে, তবে লোকে তার সম্বন্ধে কত অকথা-কু-কথা বলে, এই কারণে, স্বামী ভালো বাসুন আর নাই বাসুন কন্যার পিতামাতা চান্ যে, সে পতিগৃহেই বাস করুক।।৫৪।।

রাজা।—কি বল্লেন? ইনি কি আমার পরিণীতা?।।৫৫।।

শকুন্তলা।—(সবিষাদে মনে মনে) হৃদয়, যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, এতক্ষণে তাহা উপস্থিত হইল।।৫৬।।

শার্ঙ্গরব!—আত্মকৃত কার্য্যের অস্বীকার পূর্ব্বক এই প্রকার ধর্ম্মদ্রোহিতা কি আপনার ন্যায় রাজার কর্ত্তব্য?।।৫৭।।

রাজা।—এইরূপ একটা অলীক প্রশ্নই ত' উঠিতে পারে না।।৫৮।।

শার্ঙ্গরব।—তা বটে! ঐশ্বর্য্যমদান্ধদের এই প্রকার প্রকৃতিবিপর্য্যয়ই ঘটিয়া থাকে।।৫৯।।

রাজা।—আপনাদের এবংবিধ তীব্রবাক্যে আমি বড়ই আহত হচ্ছি।।৬০।।

গৌতমী।—বাছা! নিমিষের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার ঘোমটাটা খুলিয়া দেখাই তা হ'লেই তোমার পতি তোমায় চিনতে পারবেন।

(অবগুণ্ঠন উন্মোচন)।।৬১।।

রাজা।—(শকুন্তলাকে ভালো করিয়া দেখিয়া মনে মনে) আ মরি মরি! কি রূপ! এমন অম্লান সৌন্দর্য্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত, অথচ আমি পূর্ব্বে ইহা আমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি কি না, এই আলোচনায় আকুল হইয়া ইহাকে উপভোগ করিতে পারিতেছি না, বা প্রত্যাখ্যান করিতেও মন সরিতেছে না। তুষারবর্ষিণী রজনীর অবসানে, হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন না পারে ভোগ করিতে, না পারে ছাড়িয়া যাইতে, আজ এই গর্ভিণী মুনিকন্যার সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে। (মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন)।।৬২।।

প্রতীহারী।—আহা! আমাদের কর্ত্তার কি ধর্ম্মভয়! বিনা আয়াসে আসিয়া উপস্থিত, এমন রূপ দেখিয়া আর কেহ হইলে কি আর বিচার-বিতর্ক করে।।৬৩।।

শার্ঙ্গরব।—মহারাজ! চুপ করিয়া রহিলেন যে?

রাজা—তপোধনগণ! বহুচ চিন্তা করিয়াও এই রমণীয় পরিণয়াদির কথা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। এরূপ স্থলে আপনারা বলুন ত', কি করিয়া আমি গর্ভবতী কামিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করি? আপনাদের অবিদিত নহে যে, অন্য সহযোগে যাহার পত্নী গর্ভবতী হয়েন, তাদৃশী ললনার পতিকে ক্ষেত্রী কহে, আমি জানিয়া শুনিয়া কি প্রকারে অত বড় একটা কলঙ্কের ভার মাথায় লই?।।৬৫।।

শকুনতলা।—(অপবার্য্য) তাই ত'! আর্য্যপুত্রের দেখ্‌ছি, পরিণয়ে পর্য্যন্ত ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে! রাজমহিষী হইয়াও কত সুখ-সম্পদের উপভোগে কালাতিপাত করিব,—বলিয়া যে থালাভরা আশা করিয়াছিলাম, তাহাতে দেখ্‌ছি কুলোভরা ছাই পড়িল।।৬৬।।

পুরুষবাদ

বন্দনা রায়

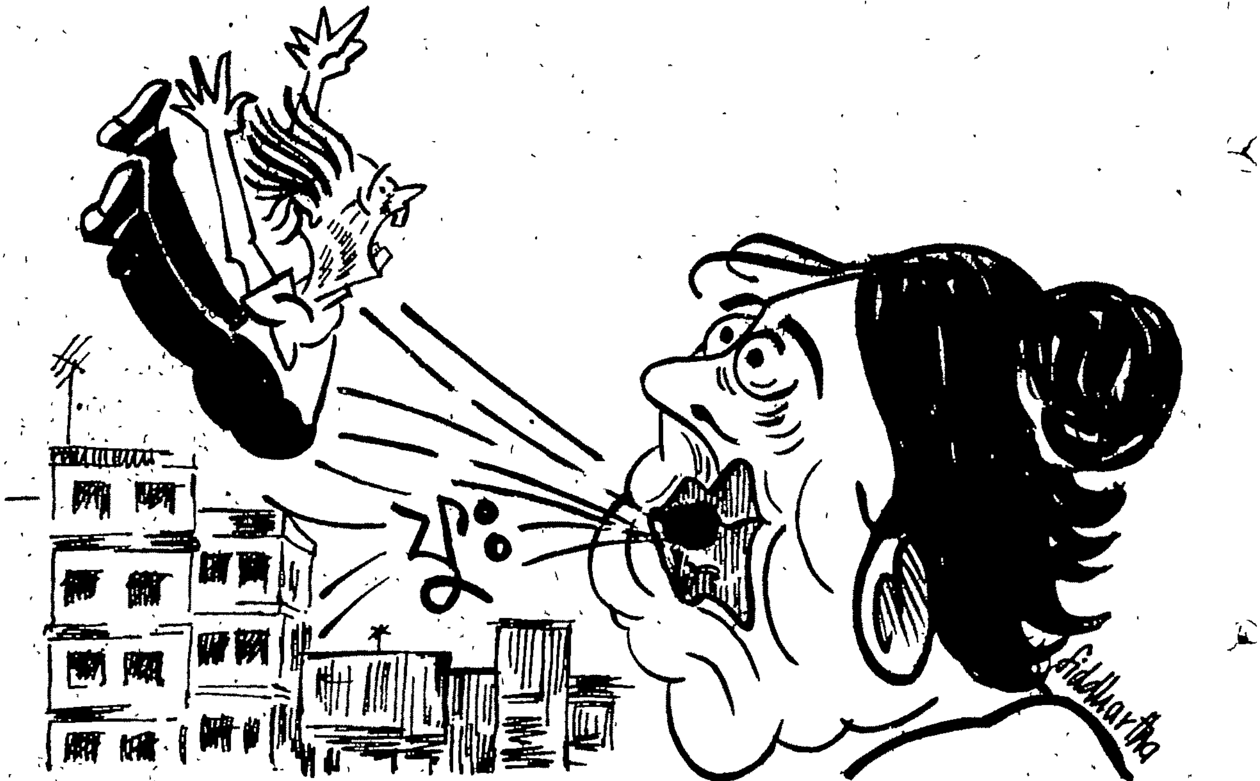

পুরুষবাদ কথাটার চলতি মানে হাড়ে হাড়ে কে না জানে! সবরকম অধিকারে বাদ পড়তে পড়তে নারী যখন নারীবাদ শুরু করল, পুরুষবাদ কথাটা তখনই বাজারে ছাড়া হল, যদিও আবহমান এর রমরমা ঘরে-বাইরে, দেশে-দশে।

কথাটাকে চিরে নিলে দাঁড়ায়, পুরুষ এবং বাদ। অভিধানের প-পা-পি-পী পেরিয়ে পু-য়ে পৌঁছে দু-পা এগোতেই পুরুষের আদ্যক্ষরটির একটি ইংরেজি ব্যঞ্জনা পাওয়া গেল— পুঃ (Pooh)। যার বাংলা অনুবাদ— ফুঃ। নারীগর্ভে জন্ম ও প্রজনন, তবু নারীকেই নিবিড় বঞ্চনা প্রতারণা অত্যাচার করে চলেছে অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর পুরুষ। তাকে ফুঃ-টুকুও কি বলার অধিকার নেই নারীর?

পুরুষবাদ বনাম নারীবাদের নিগূঢ় প্রশ্ন নিঃসন্দেহে এটাই। 'বঙ্গসুন্দরী'তে বিহারীলাল লিখলেন, 'আমরা পুরুষ, পরুষ।' কর্কশ, অবিমৃশ্যকারী পুরুষের এই বোধহয় সর্বশ্রেষ্ঠ স্ব-মূল্যায়ন। অবশ্য কোমর পড়ে-যাওয়া পাড়াতুতো পিসিমাকে প্রায়ই পুরুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাভরে বলতে শুনেছি—"মেয়েছেলের জম্মোই তো পুরীষের সেবার জন্যি...।" আহা, প্রজ্ঞাময়ী পিসিমা, পুরুষ আর পুরীষে প্রভেদ দেখেননি।

'বাদ' কথাটার বাংলা মানে বৈরিতা। সুতরাং পুরুষঘটিত বৈরিতাকেও পুরুষবাদ বলা যেতে পারে। 'বাদ' কথাটার আরেকটা মানে 'বাজ', 'বাদ্য'। তাই পুরুষবাদ মানে 'পুরুষের বাদ্যি' বা 'পুংকীর্তন' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এবারের মানভঞ্জন-পালায় মারকুটে নিষ্কর্মা স্বামী মাধবকে মুরগি রেঁধে খাওয়ানোর জন্যে মাস-মধ্যে একশ টাকা ধার নিল মালতি, "....ঘরের পুরুস্ ঘরে এইচে, এইবেলা মন জুগোতে না পারলি আবার ওই পেত্নিটের কাছে...।" মাত্র দু'দিনের মধ্যেই রীড বসে-যাওযা হারমোনিয়মের মতো চেঁচিয়ে চলল মালতি, যার সারমর্ম মোটামুটি এই—ওর ঘরের পুরুষটি আসলে একটি ভয়ংকর মিথ্যেবাদী ছলনাকরী মনুষ্য, যাকে একটি অতি কুরূপা পুংশ্চলী ডাকিনী গ্রাস করেছে।

গ্রাম্য নেত্র-ঘূর্ণন, অঙ্গুলি মর্দন, ঘন ঘন অভিসম্পাত ও উগ্র হাহাকারের শেষটা এইরকম,—"পুরুস্ না ফুরুস্! অরে বাদ দিয়াই জিবন চইল্‌ব আমার...!"

পুরুষবাদের এই মালতিমাধব বৃত্তান্ত শুনে সন্ধেবেলা সমিতির সেক্রেটারি উচ্চশিক্ষিত সুরুচি-দিদিমা বললেন, "বেশিরভাগ পুরুষই পৌরুষ আর বেতোবল্লকে এক করে ফেলে। যার মধ্যে উদ্যম, উৎসাহ, ঔদার্য, শৌর্য, বীর্য— সেই 'পুরুষ', তার শরীরের জাতিচিহ্ন স্ত্রী বা পুং যাই হোক'না কেন!..."

নারী-অধিকার রক্ষা সমিতির হীরা ঘোষ সাধুভাষার

ধার ধারেন না, উত্তেজিতভাবে বলেই বসলেন, 'হাটবাজার, রান্নাবাড়া, ঘর সামলানো, বাচ্চা মানুষ, ডাক্তার-বদ্যি, টাকা রোজগার থেকে গতর জোগানো—সবই করবে নারী, আর কাছা লট্‌পটিয়ে মোড়লি-গুলতানি মেরে বেড়িয়ে ফিরে ঘরের মধ্যে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে পাণ্ডাগিরি করবে পুরুষ? গলবস্ত্রে দাসী হয়ে থেকে একতরফা পুরুষ-সেবাই নারীর পরম পুরুষার্থ? অমন পায়রা- পুরুষে কাজ কি?...."

সূর্যমুখী বলতে চেষ্টা করছিলেন, "পুরুষসেবা কথাটার মানে কিন্তু অন্য....", হট্টগোলে পাত্তাই পেলেন না।

হীরার কথার ধার নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। 'বিদ্যাসুন্দরে'র কবিরা কত ভাবেই তো বলেছেন, " পুরুষের নাক কাটে শক্তি ধরে হীরা'। নাক কাটা মানে দর্পচূর্ণ করা। পুরুষের নাক কাটা মানে পুরুষের গর্ব গুঁড়িয়ে দেওয়া। 'বিদ্যাসুন্দরে'র হীরা সে ব্যাপারে দক্ষ, "কথায় হীরার ধার"। হীরা দিয়ে কাচ কাটা হয়। তার মানে পুরুষের নাক বা দেমাক কাচের মতো যাকে কঠিন ধারালো মূল্যবান কথার হীরা দিয়ে কেটে দেওয়া যায়? দুঃখের ব্যাপার, আধুনিক নারীরা নাকে কানে গলায় আঙুলে হীরা পরার জন্যে ব্যাকুল, জিভের অপব্যবহার করেন; প্রকৃত শক্তির খবর রাখেন না। 'বিষবৃক্ষে' হীরা প্রেমে প্রতিশোধ নিতে ব্যবহার করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের যন্ত্রণায় নিজেই 'হীরা কেটে (বিষ খেয়ে) মরল।

পুরুষের ওপর ইদানীং প্রায় সকলেরই রোষ। যেমন চঞ্চল প্রাণনাথের প্রতি বনিতার বা ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি জনতার। সংসারের সরকার পুরুষ বলেই কি? কবিকঙ্কণ মুকুন্দ লিখেছিলেন, "সরকার হৈল কাল খিলভূমি লেখে লাল"। সভ্যতার সূচনা থেকেই স্ত্রী খিলভূমির পেটে-পিঠে কিল মেরে, ঘরে খিল দিয়ে বদ্ধ রেখে, কাল-স্বরূপ সরকার-পুরুষ তাকে যুগপৎ রক্তাক্ত ও বস্ত্রহীন করে তুলেছে। সংগঠিত লাল-চোখ দেখিয়ে সরকারি ও সর্দারির চরম যথেচ্ছাচারকে যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। প্রাপ্যের বিন্দুমাত্র না দিয়েই স্ত্রীজাতিকে বেমক্কা ঘানিতে জুতে দিয়ে বহুকাল ধরে তৈলাক্ত হয়ে চলেছে পুরুষ। চোরের মতো অন্ধকারেই শুধু নয়, প্রকাশ্য দিবালোকেই আপাদমস্তক যথেচ্ছ তৈলনিষেক করে পেছল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, তাকে ধরে কার পিতৃপুরুষের সাধ্য। কবিকঙ্কণের সরকার "বিনা উপকারে খায় ধুতি"। আমাদের আলোচ্য আরাধিতমন্য পুরুষও 'ধুতি' তথা ঘুষ খায় শারীরিক ও মানসিক ঘুঁষি বাগিয়ে। বলং বলং বাহু বলং। "বলভোগ্যা বসুন্ধরা'। 'চলছে চলবে'।

'বল' প্রসঙ্গে বহুকাল আগের কথা বলতে হয়। বাইরে প্রকৃতির বদখেয়াল, জঠর ক্ষুধায় নাজেহাল, এই হালতে মানুষের বিনোদন মানে গুহার অন্দরে, ভিড়ে, অনঙ্গ মন্দিরে অবাধ বেঢ়ানৃত্য। 'অবাধ' কারণ সমাজবিধি তখনো তৈরি হয়নি। ফলে ফলপ্রাপ্তি, বংশবৃদ্ধি। শুরুর সেই শুরুতে নারীর হাতেই তখন নাড়া, পুরুষের কাজ নারীর ইচ্ছাপালন। স্ত্রী-পুরুষের এই মিশ্রবৃত্ত ছন্দ কালক্রমে কলাবৃত্তে পরিণত হল, নারী ক্রমশ হয়ে দাঁড়াল পুংহনুর ঝোলো কলার কাঁদি এবং পরবর্তীকালে পুংদলের বলবৃত্ত ছন্দের ছড়া। পুংজাতির হাতে বাইরের জগৎ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনল নিত্য প্রসবিনীরা। পুরুষকে যেই একা শিকারে বেরোতে দেওয়া শুরু হল, শিকার ও বাইরের জগৎ—দুটোই হাতছাড়া হয়ে গেল নারীর। তার পেশীচর্চা শুধুই গুহাভিত্তিক হয়ে পড়ল। 'অবলা' বলে তাকে অবজ্ঞা ও করুণা শুরু হল। এদিকে নিয়মিত শিকার ধরে ধরে পুরুষের পেশীবলের বোলবোলাও হল। সোশ্যাল ইভলিউশনের লেখক গর্ডন চাইল্ড প্রত্নকবরগুলির মধ্যে একটিই মাত্র কবরের খোঁজ পেয়েছিলেন যেখানে এক প্রৌঢ়ার কংকালের সঙ্গে দুই তরুণের কংকাল ছিল, যা নাকি মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সামান্য কয়েকটি প্রাপ্ত নিদর্শনের অন্যতম। কিন্তু হায়, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।" পাশা উল্টে গেছে, উল্টেই আছে। পুরুষের পাশবিকতা বর্বরতা বাড়তে বাড়তে সভ্যতার সমার্থক হয়ে উঠেছে, 'ঝুট কা বোলবোলা সচ্ কা মুহ্ কালা;' হাঁড়ির কালি মেখে নারী-সমার্থক 'পিছড়ে-বর্গ' আছড়ে পড়ে আছে পথের ধূলায়।

জ্যোতিস্নাতা সবকারের পুরুষের ওপর রাগ নেই মানে এই নয় যে বিশ্বপুরুষের নানান বখামির বক্‌রি তিনি কখনোই বনেননি এবং পুরুষবাদের ওপব বলতে হলে কিছুটা অন্তত তিনি বলবেন না। তাঁব মতে, প্রতিটি প্রাণীর একটি নিজস্ব স্বভাব থাকে, যা স্ত্রী-পুং নির্বিশেষে একান্তই বংশগতি ও পরিবেশ নির্ভর। বেদান্তে পুরুষ এক, সাংখ্যে অনেক বা পুরুষ নির্বিকার, প্রকৃতি সৃজন-প্রক্রিয়ার জন্যে তাকে 'এ্যাক্‌টিভেট' করে। এসব নিয়ে গরমাগরম বাদ বিসংবাদে যোগ দিতে জ্যোতিস্নাতার বেশ লাগে। বিজ্ঞানের দু'তিনটে পৃষ্ঠাও তিনি উল্টেছেন, মনোবিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় সংবদ্ধ মন নিয়েও ভেবেছেন। এই বিষয়ে ধারণার একটা সারসংক্ষেপ তিনি মনের মধ্যে করে রেখেছেন, যা কিছুটা এইরকম:

সর্বত্রই যে মূল শক্তি কাজ করছে তার দুটো ভাগ, কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাভিগ। এরা 'পরতা' রেখে চললে পাওয়া যায় বৃত্ত, জীবনবৃত্ত।

ছবিটা এই ।

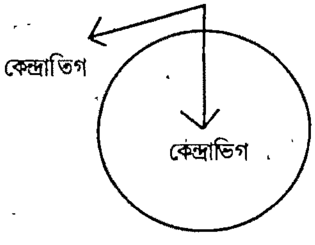

জীবনবৃত্তের প্রতিটি বিন্দুকেই একটা কেন্দ্রাতিগ শক্তি রোজের গোলঘরটা থেকে ছিটকে বের কবে নিয়ে যেতে চায় নতুন কবে শুরুর জন্যে। পারে না, কাবণ সমান আরেকটা কেন্দ্রাভিগ শক্তি জীবনের নিয়মিত সাজানো ঘবটাকে ভাঙতে দিতে চায না, কল্যাণী হয়ে বাউণ্ডুলেটাকে সামলে রাখে। 'জীবনের সেই একই বৃত্তে ঘুরি আমরা প্রত্যেকে । পুরুষেব চালাকি এই যে, ঘরমুখো হবে নারী আর বারমুখো হবে পুরুষ। এই নিয়মটা শাস্ত্র বলে চালু করে ফেলেছে। পুরুষ জল গড়িয়ে খেতে পারে না, কাবণ পৌরুষ খর্ব হতে পারে। অথচ বন্ধুবান্ধব নিয়ে হুল্লোড় করতে গিয়ে অনায়াসে নারীর জন্যে নির্দিষ্ট কাজও করতে পারে। সুবিধেবাদিতার রথের রশি পুরুষেরই হাতে। কিন্তু আসল কথা এই যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই পুরুষ ও নারীর বাস। একজন নিয়ম ভেঙে নতুন কিছু সৃষ্টি চায়, আরেকজন সৃষ্টিকে রক্ষা কবে। পুরুষ দেহধারীও পালয়িতা হতে পারে, নারী দেহধারীরও হতে পারে নব-উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা। শচীন-শ্রীবিলাস দুই বিপরীত শক্তির প্রতীক দামিনীকে কেন্দ্র করে; মহিম-সুরেশ অচলাকে কেন্দ্র করে।

জ্যোতিস্নাতার ভালো লাগে সন্ধকফু ট্রেকিং বা কফি হাউসেব উতরোল আড্ডা সেরে অন্ধকারে হরিপ্রসাদের হংসধ্বনিতে স্নান। ক্ষিতিজের পছন্দ অফিস-ফেরত কাঁধ ঝুঁকিয়ে বাজার করে ঘরে ঢুকে মাংসটা ম্যারিনেট করে, ব্যালকনির কাচা কাপড়গুলো আলনায রেখে, চাযের কাপে নিজস্ব চুমুক দিতে দিতে টিভির চ্যানেলগুলো নিয়ে বিলাসিতা করা। জ্যোতিস্নাতা ও ক্ষিতিজের কেউই যৌনতা বিমুখ নয, পুরুষবাদ বা নারীবাদের শিকার নয়, কেউই কাউকে পরাস্ত করতে চায় না। কিন্তু দুঃখেব বিষয়, কাজে বেরোনোর সময উল্টো দিকের ফ্ল্যাটের সুন্দরী পড়শিনী তির্যক প্রশ্ন করেন—"কী? খাইয়ে দাইয়ে বেরুচ্ছেন তো?" বা বৎসরান্তে যুযুধান ননদ-নন্দাই এসে জ্যোতিস্নাতাকে এক 'নির্লজ্জ অশ্লীল মহিলা' বলে ঘোষণা কবেন, কারণ 'নারীব কর্তব্যগুলি' তাঁদের অভাগা দাদা ক্ষিতিজের ওপর বর্তেছে আর মর্দের মতো গায়ে ফুঁ লাগিযে ঘুরে বেড়াচ্ছে বৌদিদি।

শোনা যায় জগৎ সদাই দ্বিধা বিভক্ত। সাদা- কালো, ভালো-মন্দ, ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি। তেমনই যদি এভাবে ভাবা যায় যে, প্রত্যেক মানুষেরই দুটি মাত্র ঘর, ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম? ধর্ষকামিতার ঘরে সে ঢোকে অন্যকে ধর্ষণের সুখ নিতে,

মর্ষকামিতার ঘরে সে ঢোকে নিজেকে ধর্ষিত হতে দেওয়ার সুখ নিতে? যখন যে ঘরে সে ঢোকে তার মুখের ওপর পরদার রং বদলে যায়। বলা যায়, ঠিক এই ঘরদুটিই নারীবাদ আর পুরুষবাদের আঁতুড় এবং ধর্ষকামী ও মর্ষকামী হচ্ছেন 'পকম্পকের পিঠ চাপড়ানো পার্টি' (PPCP)। সম্পত্তির লোভ, স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ঔরস নিয়ে সন্দেহ-ঈর্ষা পুরুষবাদের বুনিয়াদ। পুরুষস্বার্থ প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যে শাস্ত্র বেঁধে ধর্ষকামিতা। নারীর হীনমন্যতা, যৌন ঈর্ষা, অধিকারলোভ এবং মর্ষকামিতার মুখোশে তির্যক ধর্ষকামিতা পৃষ্ঠপোষকতা করেছে পুরুষবাদের (এবং ইদানীং নানাভাবে নারীবাদেরও)। শাশুড়ি-বউ বৃত্তান্তের এপিঠ-ওপিঠের কারণ এখানেই নিহিত। শুধু তাই নয়, মেনকা নিষ্কর্মা ঘরজামাই বলে শিবকে ব্যঙ্গ করলে গৌরী মায়ের ওপর চটে উঠে বলেন, আমার পিতার দেওয়া ধনে তার জামাই ঘরে বসে খান, তোমারটা খান না। একই চিরন্তন হীনমন্যতাজাত ঈর্ষা 'ফুল্লরার বারমাস্যা'য় চণ্ডীর প্রতি ফুল্লরার। অথচ চন্দ্রাবলীনখলাঞ্ছিত কৃষ্ণকে তাড়িয়ে দিয়েও পাগলের মতো তাকে ফিরিয়ে আনতে দূতী পাঠান শ্রীমতি রাধাই। নারীর এই দুর্বল মধুরতাই পুরুষের পৃষ্ঠবল, পুরুষবাদের শিরদাঁড়া।

এ যাবৎ আলোচনায় যদি এটা দাঁড়ায় যে পুরুষ মানেই ধর্ষকামী, নারী মানেই মর্ষকামী, তবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে হয় যে আলোচনাটা একটা বৃহৎ অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। সবাই ইদানীং জেনে গেছে যে, সুজয়বাবু অফিসে প্রবল ধর্ষকামী, বাড়ি ঢোকার পরেই হয়ে পড়েন নিদারুণ মর্ষকামী। এবং যে অর্চনা প্রকাশ্যে ও প্রচারে অতীব ললিত লবঙ্গলতিকা—অতিদীনা—বিনীতবদনা, তিনিই সুজয়-গিন্নি রূপে সংহারিণী দ্রংষ্ট্রা করালবদনী।

অতএব হে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ, নারীদেহে অধিষ্ঠিত হউন বা পুরুষদেহে, 'তটস্থ' হয়ে থাকুন মশাই! অন্তত থাকার ভান করুন। কর্মযোগে কেউ যদি আপনার পুচ্ছটি উচ্চে তুলে আপনাকে নাচাতে চায়, হয় উদ্যমী পুরুষ সিংহ হয়ে তাকে একেবারে ধসে দিন, অথবা মায়াবন বিহারিণী হরিণী হয়ে তাকে নাচিয়ে মারুন। যাই করুন মশাই, তটস্থ হয়ে জলের সংগেও লেপ্টে থাকুন, স্থলের সংগেও সাপ্টে থাকুন। কেবল খেয়াল রাখুন, কর্তার সংগে কর্মযোগ-ব্যাপারে যোগাযোগটা কীভাবে বাড়িয়ে চলা যায়। পুরুষবাদ করলে যদি সুবিধে হয়, নারীবাদের স্বপক্ষে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে দিতে তলায় তলায় পুরুষবাদই চালিয়ে যান (ভাইসিভার্সা)।

কিন্তু সতর্ক থাকবেন, এন্তেকাল এলে কোনো বাদই যেন আপনার লেজুর টেনে ধরে পত্রপাঠ বিদেয় হওয়ার পথে বাদ না সাধে।

ফের যদি মুখে মুখে তক্কো করো....
Siddhartha

কার্টুন: সিদ্ধার্থ কর্মকার

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● আমি নিয়মিত ছাতা ব্যবহার করি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফুটো হয়ে যায়। কোন ছাতা নিরাপদ?

—নির্মল সেন, কলকাতা-১২

□ দাদার ছাতা। তবে ইদানীং দাদারা নিজেরাই বেতালে ফুটো হয়ে যাচ্ছেন। আপনি 'দাদার দাদা'-র ছত্রছায়ায় ঢুকুন। তারপর দাদার দাদার দাদা। চোখের জ্যোতির মতো নিরাপত্তার গতিরও পাওয়ার বাড়ে কিনা।

● মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় নারীবাদীদের হয়ে সাফাই গাইতে বসলেন কেন?

—বিজন সর্দার, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা

□ সাফ কথা বলে শেষে নিজেই সাফাই হয়ে যাবেন—এমন আশঙ্কা ছিল বোধহয়।

● জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান নেত্রী কোন জাতীয়?

—আলাউদ্দিন খান, পার্কসার্কাস, কলকাতা

□ বিজাতীয়।

● আপনাদের পত্রিকায় খেলার ব্যাপারে কোনো খবর বা মন্তব্য থাকে না। সম্ভবত আপনারা খেলার জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনাদেরকে খেলা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্যে কুইজের ব্যবস্থা করছি। প্রথম দফার প্রশ্ন:

ক) হকি-তে শেষ বিশ্বকাপ কারা পেয়েছে?
খ) গত অলিম্পিকে সর্বাধিক সোনা কোন্ দেশ জিতেছে?
গ) বিগত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কোন্ দেশ জয়ী হয়?
ঘ) ২০০২-এর বিশ্বকাপ ফুটবলে কোন্ দেশের দল ফেবারিট?

—শ্যামল বসু রায়, মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪ পরগণা

□ ক) ভারতবর্ষ খ) ভারতবর্ষ গ) ভারতবর্ষ ঘ) ভারতবর্ষ। কেন না মেরা ভারত মহান!

● ঘোড়ার ওপরে দরদ দেখাতে গিয়ে হাজার হাজার সাপে কাটা রুগিকে মৃত্যুর দরজা পার করানো? মানুষের জীবনের চেয়ে ঘোড়ার জীবন মূল্যবান? এ কখনোই মানা যায় না।

—স্মৃতি চৌধুরী, বর্ধমান

□ যতক্ষণ থাকবেন ঘোড়েল মানেকা, বাপ্ বাপ্ ক'রে মানেগো!

● কাশ্মীর নিয়ে অটলবিহারী খুব গরমাগরম দেশপ্রেম-এর ফানুস দেখাচ্ছেন। গুজরাটের বেলা এ বোধ তাঁর কোথায় ছিল, যখন একদল ভারতীয় সম্প্রদায়ের হিংসায় আর একদল ভারতীয় সম্প্রদায়ের নির্মম নিধন হয়েছে!

—ডাঃ আব্দুল কাদের, জয়নগর, দঃ ২৪ পরগণা

□ আপনি সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট এবং একচোখা। কেন, গুজরাটে কি অটলবিহারী 'দ্বেষ-প্রেমে' অটল ছিলেন না!!!

● পত্রপাঠ-এর বেশ কয়েকটি সংখ্যা আমি পড়েছি। তাতে খুব স্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছে—সাহিত্যিক হতে-চাওয়া এবং সাহিত্যিক হতে-না-পারা শেখর আহমেদ একজন চূড়ান্ত ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নন।

—শাহজাদী রায়চৌধুরী, বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯

□ বুঝে না না বুঝে? এতবড় সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন আমাদের আহাম্মক, থুড়ি সম্পাদককে? সম্ভবত আপনি তার প্রেমে পড়েছেন আর প্রেম অন্ধই হয়। রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধনের মুখ দিয়ে বলেছিলেন—"ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম।" আমাদের গোমুখ্যু সম্পাদক এখনো নার্সারিতেই পড়ে আছেন। দেশ কিংবা তসলিমা কিংবা তিলোত্তমা—শুধু খাঁটি কথাটাই বলে চলেছেন। কবে আর তিনি বৃহৎ হবেন, কবে উঁচু ক্লাসে উঠবেন, ঈর্ষা করতে শিখবেন এই ঈর্ষোনুপযুক্তদের? আমরা হতাশ।

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়

সেদিন সকালবেলা গঙ্গারাম ঘামতে ঘামতে এসে আমার ঘরে বসে তর্জন-গর্জন করতে লাগল। এই গরমে অনেকের মাথা খারাপ হয়ে যায়। গঙ্গারামের সে রকম কিছু হয়েছে বলে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সকালবেলা বাড়ি বয়ে এসে আমাকে গালাগাল করছ কেন?

গঙ্গারাম বলল, আপনাকে তো গালাগালি করছি না।

আমি বললাম —তাহলে কি করছ? এত চ্যাঁচামেচি কেন?

—চ্যাঁচামেচি করছি ঠিকই, কিন্তু সেটা আপনার জন্য নয়।

বলে গঙ্গারাম একটু থামল,—আমি আর একজনের ওপর রাগারাগি করছি।

আমি বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সেই আরেকজন কে?

গঙ্গারাম উত্তেজিত হয়ে বলল. আপনার স্নেহের বৌমা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

গঙ্গারাম আরো উত্তেজিত হয়ে বলল, এতে হাসির কি আছে?

আমি বললাম, হাসির ব্যাপার একটাই। তুমি যার ওপর রাগারাগি করছ, সে এখানে নেই। তুমি তার সামনে গিয়ে রাগারাগি করছ না কেন?

গঙ্গারাম বলল, তার সামনে গিয়ে রাগারাগি করার সাহস আমার নেই।

আমি বললাম, তুমি এত বড় সাহসী মানুষ যে বৌয়ের সামনে রাগারাগি করতে সাহস পাও না? রাগারাগি করলে বৌ কি করবে?

—বৌ যা করে—আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

গঙ্গারাম জানায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বৌ কী করে? খুব চ্যাঁচায়? গঙ্গামণি তো চ্যাঁচানোর মেয়ে নয়।

গঙ্গারাম বলল, আপনার গঙ্গামণি মোটেই চ্যাঁচায় না।

আমি বললাম, তবে?

গঙ্গারাম বলল, মোক্ষম মুহূর্তে হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে মারে।

আমি জানতে চাইলাম, কী ছুঁড়ে মারে?

গঙ্গারাম বলল, হাতের কাছে যা পায়, ছুরি, কাঁচি, বঁটি, গ্লাস, টেবল ল্যাম্প, পেপার ওয়েট.....

আমি তার ফিরিস্তি দেওয়া থামিয়ে বিস্মিত ভাবে বলি, কী সাংঘাতিক!

গঙ্গারাম বলল, একবার ছুঁড়ে শান্তি নেই। যেই আশা ভঙ্গ হয় তার, আবার ছোঁড়ে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, আশা ভঙ্গ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

গঙ্গারাম বলল, বৌ যদি কিছু ছুঁড়ে মারে, আমি সঙ্গে সঙ্গে চকিতে প্রয়োজন মতো কখনো মাথাটা কখনো শরীরটা সরিয়ে নিই, জিনিসটা আমার গায়ে না লেগে ঝন্‌ঝন্ করে কিংবা ঠক্ করে মেঝেতে পড়ে যায়; অথবা দেওয়ালে লাগে। সেই শব্দ শুনে বৌ আরো ক্ষেপে যায়, আবার ছোঁড়ে। আবার চট্ করে নিজেকে সরিয়ে নিই। আবার জিনিসটা পড়ে যাওয়া কিংবা ভেঙে যাওয়ার শব্দ হয়। সেই শব্দ শুনে বৌ আরো ক্ষেপে যায়। আবার ছোঁড়ে।

আমি বলি. গঙ্গামণির হাতের টিপ তো খুব খারাপ।

গঙ্গারাম বলল—হাতের টিপ মোটেই খারাপ নয়। তবে আমি ছোটবেলায় পুকুরের জলে নেমে অন্য ছেলেদের সঙ্গে কাদা ছোঁড়াছুড়ি খেলতাম। সেই থেকে নিজের মাথা. শরীর বাঁচানোর এত দক্ষতা অর্জন করেছি।

আমি আর এ বিষয়ে কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, গঙ্গামণি দুঃখিত হয় না? জিনিসগুলো ভেঙে যায়।

গঙ্গারাম বলল, নিশ্চয় দুঃখিত হয়। দুঃখিত হয়ে আরো ছুঁড়তে থাকে।

অবশেষে একটু থেমে সে বলে, জানেন, এই ক'বছর, বিয়ের পর আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার বৌমার সঙ্গে আমার কোথাও কোনো মিল নেই।

আমি প্রশ্ন করি, একেবারে কোথাও কোনো মিল নেই?

একটু ভেবে নিয়ে গঙ্গারাম স্বীকার করে,—আজ্ঞে, একটা ব্যাপারে মিল আছে।

আমি সাগ্রহে জানতে চাই,—সেটা কি?

গঙ্গারাম বলল, আমাদের দু'জনের বিয়ের তারিখ এক। এ ছাড়া আর কোথাও কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না।

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

বেশ আছি!

গত সপ্তাহে ঢাকায় গিয়েছিলাম হুমায়ুন আহমেদের আমন্ত্রণে। ছিলাম ওরই অট্টালিকায়। রাত্রে খানাপিনায় অনেকে আমন্ত্রিত ছিলেন। গল্পগুজব হচ্ছিল। হঠাৎ বিখ্যাত প্রকাশক আলমগীর সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'সমরেশবাবু, গুজরাতে যা ঘটল তাতে আপনাদের কোনো দায়িত্ব নেই? আপনাদের খারাপ লাগছে না?'

শুরুতে যাই হোক, এখন তামাম দুনিয়া জানে, গুজরাটে মুসলমানদের মারছে হিন্দুরা। প্রশ্নটি শুনে অস্বস্তিতে পড়লাম। জবাব দিতে হল, 'গুজরাটের ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। এই দেখুন, গুজরাটে যা হচ্ছে তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাশের রাজ্যগুলোতেও পড়েনি।'

আলমগীর বললেন, 'বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মানে কি? ওই একটা রাজ্যে দিনের পর দিন কিছু হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবে আর আপনারা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে সেটা চলতে সাহায্য করবেন? গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হয় অক্ষম নয় তিনি এই দাঙ্গায় মদত দিচ্ছেন। তবু ওঁকে সরিয়ে দেওয়ার বা ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো চেষ্টাই আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার করল না। আর আপনারা তা মুখ বুজে মেনে নিলেন।'

আলমগীরের বলা শেষ হতেই হুমায়ুন খেঁকিয়ে উঠল, 'থামেন তো মিঞা। সমরেশদাদা কী করবেন? আপনি কি চান উনি লাঠি বা পিস্তল নিয়া আহমেদাবাদে ছুইটা যাবেন? আমাদের এখানে যখন মন্দির ভাঙছিল তখন আপনি কী করছেন?'

হুমায়ুনের এখন একটি বিশেষ ধরনের মর্যাদা হয়েছে। বাংলায় গল্প উপন্যাস লিখে সে দেশের একজন কেউকেটা। লোকে তাকে খুব মান্য করে। অতএব আলমগীর সাহেব চুপ করলেন।

কিন্তু প্রশ্নটা আমার মাথায় থেকেই গেল।

ভারতবর্ষের গঠন, এই দেশের সংবিধান, এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রিয়াকলাপ আদৌ সমর্থন না করলেও স্বীকার করতে বাধ্য, আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। আমার পাশপোর্টে কথাটা স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। অতএব গুজরাট বা অসম, কেরালা বা পশ্চিমবঙ্গের কোনো তফাৎ আমার কাছে থাকা উচিত নয়। ধর্ম সম্মেলন ফেরৎ কিছু হিন্দুকে যারা ট্রেনের কামরায় পুড়িয়ে মেরেছে তারা জানত বিশ্বের প্রতিটি মানুষ এর প্রতিবাদ করবে এবং হিন্দুরা বদলা নেবে। কার্যত তাই হল এবং দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে।

কলকাতায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাগজে চিঠি ছাপা হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাতে সই করেন। সাধারণত রাজনীতির গন্ধ-মাখা একই শিল্পী, পরিচালক, লেখকদের নাম সেই প্রতিবাদপত্রের নিচে দেখা যায়। খোঁজ নিয়ে দেখেছি কিছু স্বেচ্ছাসেবক উদ্যোগী হয়ে যোগাযোগ করে ওই প্রতিবাদ-পত্রের ব্যবস্থা করেন। ব্যস, চুকে গেল। এবার গুজরাটের ঘটনার প্রতি ধিক্কার দিয়ে বিমান বসুর নেতৃত্বে মিছিল বেরিয়েছিল একটা। কয়েকটা অনুষ্ঠান হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। তার টিকিট বিক্রির টাকা [illegible] খরচ মিটিয়ে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পাঠানো হয়েছে। টাকা কুড়ি পঁচিশ হাজারের বেশি নয়। এইসব ঘটনা ঘটাবার আগে যে কমিটি তৈরি হয়ে থাকে তার অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি বিজ্ঞাপন দেখে। অবশ্য [illegible] কাজই ঢাকঢোল পিটিয়ে কমিটি তৈরি করে করা সম্ভব [illegible]

কিন্তু আমরা যারা মানুষকে নিয়ে [illegible] লেখালেখি [illegible] এতবড় কুৎসিৎ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আদৌ কি সোচ্চার হয়েছি? আমাদের লেখালেখিতে এইসব দাঙ্গার বিরুদ্ধে কোনো বিস্ফোরণ কি [illegible] গেছে? মানুষ যেখানে আক্রান্ত সেখানে কি কোনো লেখক ছুটে গিয়েছেন? যদি যেতে না পারেন তাহলে বিভিন্ন কাগজ পড়ে শরীরে যে [illegible] তার প্রতিফলন কি কোনো লেখায় ফুটে উঠেছে? আমরা এখনও [illegible] রকমের প্রেম, ছোটখাটো সমস্যার গল্প-উপন্যাস লিখতে ব্যস্ত।

গুজরাট দূরের কথা, মেদিনীপুরে যে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী আজ [illegible]

> পাশের বাড়িতে মেসোমশাই মারা গিয়েছেন, অফিস থেকে বাড়ি এসো না, বাইরে দেখা করে রাত্রে রেস্টুরেন্টে খেয়ে ফিরব। নইলে তোমাকে শ্মশানে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত কষ্ট করতে হবে।

করেছে, নিত্য মানুষ মাবা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে আলফা, বোবো, কামতাপুরী মিলেমিশে জঙ্গী আক্রমণের প্রস্তুতি শানাচ্ছে, আমাদের কাব লেখায় এই সমস্যার কথা বলা হযেছে? এখনো মালদা, শিলিগুড়িতে লাদেনেব অনুগামীরা সভা করে, এখনো রামচন্দ্রের ভক্তবা সংবিধান বিরোধী কথাবার্তা বলে মানুষকে উত্তেজিত কবতে চায় কিন্তু আমরা সে সবকে লেখাব বিষয় করি না। এই আমবাব মধ্যে আমিও আছি। এই যে করছি না, তাই যন্ত্রণা পাই। মাঝেমাঝে ভাবি, লেখালেখি বন্ধ করে দেব। না, আমাকে কেউ নিষেধ কবেনি লিখতে। কিন্তু আমাব লেখায যদি মুসলমান চরিত্র থাকে এবং সেই চরিত্রটি বলে—আমি রোজা করছি না, তাহলে যে সংখ্যায় ওই লেখা বেব হবে সেই সংখ্যাটি বাংলাদেশ সবকার বাজেযাপ্ত করবেন—এই ভয়ে শঙ্কিত থাকবেন সম্পাদক। অথচ বাংলাদেশে আমার প্রচুর বন্ধু রোজা করেন না এবং মুখে সেটা বলতেও সংকোচ বোধ কবেন না। ত্রিপুরায় বাঙালিরা অনুপ্রবেশী। ভারত সবকার ত্রিপুবা দখল কবেছিল মহারানীকে ম্যানেজ করে। এই সত্যটি হজম করতে কেউ চাই না। তাই তা নিয়ে লেখা অপরাধ। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার ওপর অন্যতম সেরা লেখা লিখেছিলেন সমরেশ বসু। আদাব। যতদিন বেঁচে ছিলেন, দেশের বাজনীতি কখনো বা কখনো তাঁর লেখায ফুঠে উঠত। তিনিই শেষ। এখন আমরা সেইসব হরিণের পাল, যাবা শত্রু দেখে জঙ্গলে মুখ ঢুকিয়ে ভাবি—বেশ লুকিয়ে আছি, বিপদ হবে না।

গুজরাটের ঘটনার প্রতি ধিক্কার দিয়ে বিমান বসুর নেতৃত্বে মিছিল বেরিয়েছিল একটা। কয়েকটা অনুষ্ঠান হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। তার টিকিট বিক্রির টাকা সব খরচ মিটিয়ে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেটা কুড়ি পঁচিশ হাজারের বেশি নয়।

আচ্ছা, গুজবাটে মানুষ মানুষকে ধর্মেব দোহাই দিয়ে মাবছে। কিন্তু কলকাতায় ফিবদৌসের সঙ্গে প্রেমেব অভিনয করতে নায়িকাদের অসুবিধে হচ্ছে না। সিনেমাব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, খেলোয়াড়রা, লেখকরা, চিত্রশিল্পীরা যে যার কাজে বেশ ব্যস্ত আছেন।

আগে এবকমটা হত না। জালিযানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডেব বিরুদ্ধে কলকাতায় মিছিল বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ফিবিযে দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। রাখী বন্ধনেব মধ্যে সেই প্রতিজ্ঞা করা হবেছিল।

আমি বাবংবাব বলে আসছি, স্বাধীনতার পব থেকে আমাদের যাবতীয মূল্যবোধেব মূষল পর্ব শুরু হযে গিযেছিল। নকশালদেব অভ্যুত্থান ও পতন তার ধ্বংসের শেষ বাঁশি বাজাল। ও পাড়ায় বোম পড়ছে, এ পাড়ায আমাদের কি? ওই ফুটপাতে একজনকে খুন কবে লাশ ফেলে রেখে চলে গিযেছে, তাহলে এই ফুটপাত দিয়ে চলো। পাশের বাড়িতে মেসোমশাই মাবা গিয়েছেন, অফিস থেকে বাড়ি এসো না, বাইবে দেখা করে রাত্রে রেস্টুরেণ্টে খেয়ে ফিবব। নইলে তোমাকে শ্মশানে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত কষ্ট কবতে হবে।

নিজেকে গুটিযে গুটিযে এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমাদের।

কিন্তু কথা বলতে দিন। কথায় আমরা উত্তর মেরুকে দক্ষিণ মেরুতে মিলিযে দিতে পাবি। সেই কবে ভাবতচন্দ্র লিখেছিলেন, নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?

চারপাশে আগুন জ্বলছে, আমবা মাঝখানে বসে কতদিন আব সেই আগুনে দেওয়ালি দেখব?

ট্যারা চোখে

ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ এক হোক!

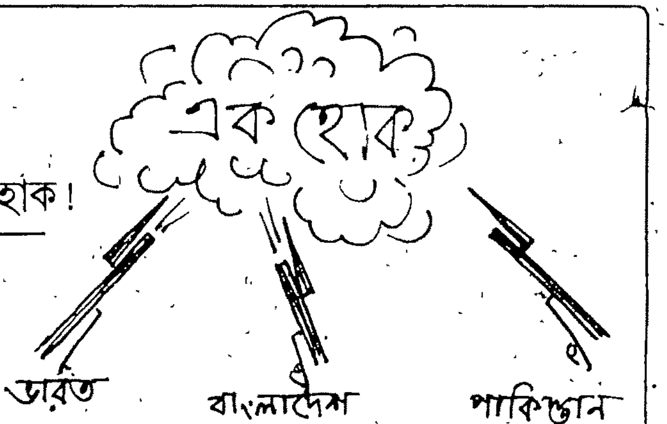

"কাশ্মীব সমস্যা সমাধান কবতে ভাবত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশকে এক কবতে হবে। দুই জার্মানি যদি এক হতে পাবে তবে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ কেন এক হতে পারবে না?"

দাবীটি ভাবত পাকিস্তান মৈত্রী সমিতি নামক এক সংগঠনেব।

ওঁরা বোধহয় ভুলে গেছেন যে জার্মানি দ্বিজাতি তত্ত্বেব ভিত্তিতে ভাগ হয়নি। তাদের ইচ্ছেব বিরুদ্ধে ভাগ করে পূর্ব অংশে কম্যুনিজম চাপিযে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারত ভাগ হয়েছিল ভারতবাসীর কিছু নেতাদের দাবীতেই, যারা চেয়েছিল ক্ষমতাব ভাগ, আপামব ভারতবাসীর কথা ভাবেনি। দেশ ভাগ হলে ছিন্নমূল মানুষগুলোর কী হতে পারে সে কথা ভাবেনি। আবার বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল পাকিস্তান থেকেভাবাব হাত ধবে, সমগ্র বাংলাদেশ ভাবার ভিত্তিতে এক হতে পেবেছিল। কখনো কখনো দুই বাংলা এক হবাব কথাও বলা হয় এবং জার্মানির উদাহরণই দেওযা হয়। কিন্তু সেখানেও মনে বাখা হয না যে ভাবতীয বঙ্গ ভাবতেরই একটা অঙ্গরাজ্য, পৃথক ভাবে বাংলাদেশের সাথে মিলতে পাবে না।

দাবী শুনলে মনে পড়ে যাব সম্রাট আকবরের সভাসদ বীববলেব গল্প। তাঁর একদিন সভায় আসতে দেবির কারণ স্বরূপ জানিয়েছিলেন তাঁব ছেলের বায়নার কথা। বীরবলের ছেলে বাযনা করেছিল একটা আমকে টুকবো কবে দিতে। টুকবো করাব পরবর্তী বায়না ছিল আমটাকে জুড়ে দিতে হবে। এ যেন ঠিক তাই। নেতাবা ইচ্ছে করলেন, বানবের পিঠে ভাগ কবে ফেললেন দেশটাকে, আবার কারুর কারুব ইচ্ছে হচ্ছে দেশগুলোকে জুড়ে এক করে দেওযা হোক। এ যেন আমাদেব ছোটবেলায় যে ম্যাপ সাজানোব খেলা খেলতুম, তাই পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো আলাদা আলাদা কাঠেব টুকরো, পবপর সাজিয়ে দিলেই হয়ে যাবে পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ। তার মাঝে সবগুলো নদী দিযে যে এত জল বয়ে গেল তার হিসেব রাখবে কে? সেই নদীব একগলা জলে দাঁড়িযে এমন স্বপ্ন দেখা অবশ্য চাট্টিখানি কথা নয়। কাজ না থাকলে যা হয।

—কুটিলা কামিনী

মহিলা মহল

ইন্দ্রকাকু, আমার প্রেমিক।

‘ফিস ফিস’ বিভাগ

পরামর্শ দিচ্ছেন : **প্রাণঘাতিনী দেবী**

● আমি আমার কাকুর বন্ধুর প্রেমে পড়ে গেছি। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁকে কথাটা বলতে পারছি না। কী ভাবে বলা যায় বলুন তো?

—তানিয়া পোদ্দার, কলকাতা-৪

□ একটু নজর রাখো ভাই। যেই না দেখবে তিনি এসপ্ল্যানেডের আশপাশ দিযে হাঁটছেন, এক লাফে শহীদ মিনারে চড়ে চিৎকার করে বলবে....

● আমি যাকে ভালোবাসি সে কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। আমি সবরকম হবাব চেষ্টা করেছি—ভালো মেযে, খারাপ মেয়ে, মুখবা, সাত চড়ে বা-টি নেই, হেভি সাজগোজ, নিতান্ত আটপৌবে—কিন্তু সব বৃথা। আচ্ছা, কী হলে একজন পুরুষের মনোরঞ্জন করা যায়?

—অরুন্ধতী মালিয়া, কুচবিহার

□ পাগলী। পাগলী হতে পারলেই সে তোমার সঙ্গে সাবা জীবন কাটিয়ে দেবে। অন্তত পেটরোগা আধুনিক কবি-বাজের প্রেসক্রিপশন এটাই।

● আমি আধুনিক কবিতা লিখি। খাবাপ লাগে, যখন দেখি আপনারা ‘কবি’ জাতিকেও লিঙ্গ ভিত্তিক ভাগ করেন। কবি তো কবিই। মেয়েরা কবিতা লিখলে বলেন ‘মহিলা কবি’। কই, পুরুষ কবিতা লিখলে তাকে তো আলাদা করে ‘পুরুষ কবি’ বলেন না। ভাবখানা এমন, যেন মেয়েরা কবিতা লিখতে পারে না, কিন্তু লিখে ফেলেছে। কবিত্বে কি নারী-পুরুষ ভেদ উচিত?

—শর্মিলা সামন্ত, দমদম

□ নাঃ নারী-পুরুষ কেন, দাড়ি-বুরুশ ভেদও উচিত নয়। মানে দাড়ি কামানোর ক্রিম আর ক্রিম লাগানোর বুরুশ। সেই জন্যেই তো বিশেষ পত্রিকার বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় কবিতা লিখে কমপ্লিমেন্টারি কপির সঙ্গে ক্রিম আর বুরুশ সকলেই নিয়ে যান—তা সে দাড়িবান কিংবা দাড়িহীনা যেই হোন না কেন; কবিরা অন্তত তখন নিজেদের মধ্যে লিঙ্গভেদ করেন না।

● সাংঘাতিক কাণ্ড প্রাণঘাতিনীদি। কাল রাতে স্বপ্নে শাহরুখ আমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমাব। পড়াশুনা, খাওয়া-শোওয়া সব শিকেয় উঠেছে। কী হবে এখন?

—পলি নাগ, নাগের বাজার, দমদম

□ ছাদে উঠে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হবে। তখন রক্ষামন্ত্র—চুলো গয়া সুখ, খালি শাহরুখকে নিয়ে কখ্।।

● বিবাহ প্রথাটা বদলানো দবকার নষ কি প্রাণঘাতিনীদি? অন্তত প্রেম কবে বিযেব বেলা? পুরুষই শুধু নারীকে ঘবে নিয়ে যাবে কেন? কেন সে নারীর হাত ধরে বাধ্য ছেলের মতো তার ঘরের পানে হাঁটবে না?

—অদিতি রায়, চন্দননগব, হুগলী

□ বিয়েটার দুটো পর্যায। প্রাক্ বিবাহ আর উত্তব বিবাহ। প্রাক্ বিবাহ পর্বে ছেলেবা এত বেশি মেয়েদের ঘরে হাঁটে যে তাদের কোটাই শেষ হয়ে যায়। কাজেই উত্তর বিবাহ পর্বে ছেলেদেব ঘরের দিকে হাঁটা ছাড়া মেয়েদের আব উপায় থাকে না।

● মেয়েদেব জন্যে একটা কাগজ করতে বলুন না আপনাদের নারী-বিদ্বেষী সম্পাদককে!

—পাপিয়া বসু, কলকাতা-২৯

□ নারী-বিদ্বেষী? সম্পাদকের প্রেমিকারা কিন্তু অন্য কথা বলেন!

● আমার রাজনৈতিক নেত্রী হওয়ার খুব শখ। চমৎকার বক্তৃতাও করতে পারি। দোষের মধ্যে একটু মোটাসোটা। একদিন মঞ্চে উঠতে গিযে সিঁড়ি ভেঙে গেছিল ব'লে কোনো দলই আর আমাকে মঞ্চের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না। একটা উপায় বাতলাতে পারেন?

—সুচরিতা ভট্টাচার্য, কলকাতা-১৪

□ জয়ললিতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁর মঞ্চের সিঁড়ি যথেষ্ট মজবুত করেই তৈরি করা হয়।

● বিযেতে আমাব আপত্তি নেই। কিন্তু আমি মা হতে চাই না। এমন পাত্র কি পাওযা সম্ভব, যে এ শর্তে রাজি হবে?

—মল্লিকা চক্রবর্তী, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা

□ অসম্ভব নয়। মা হতে না চাও ক্ষতি নেই, বাবা হতে চেয়ো না যেন!

দ্বন্দ্ব না মিলন?

বুলু মুখোপাধ্যায়

পুরুষতন্ত্র কী, কাকে বলে? সে সব কি আর নতুন করে আলোচনা করার আছে? একপক্ষ বলবেন—পুরুষতন্ত্র যুগ-যুগান্ত ধরে নারীদের পীড়ন করেছে, শোষণ করেছে। অপরপক্ষ উত্তরে জানাবেন—নারীদের জাগরণের তুমুল প্রভাবেই সৃষ্টি হয়েছে "পীড়িত পুরুষ পতি পরিষদ"-এর।

সত্তরের দশকে পৃথিবীব্যাপী জোয়ার এসেছিল নারী-স্বাধীনতার। তার আগে পর্যন্ত নারীরা পিঞ্জরে বন্দিনী ছিলেন? তার পরেই কি তাঁরা সবাই মুক্তির মুখ দেখেছেন? নারীবাদ কী জিনিস? লিঙ্গ ভিত্তিক শাস্ত্রচর্চা কাকে বলে? আর 'পুরুষ পতি' কথাটা কেমন যেন কানে লাগে না? এতদিন পর্যন্ত তো জানতাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামীরা পুরুষই হতেন। এতে আর বলার কি আছে?

আর অভিধান খুলে একবার দেখি যদি, কী দেখব? বিবাহিত জীবনে পুরুষের অভিধাগুলি স্বামী, পতি, নাথ, কর্তা—সবগুলিই পুরুষের প্রভুত্বের দ্যোতক। ইংরেজি Husband কথাটিও বোধহয় মালিকানাই বোঝায়। পাণি গ্রহণ করে আগেই পুরুষরা বসলেন প্রভুত্বের তখ্‌তে। একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতিত্ব একেবারেই নয়। এ হল বাবা স্বয়ং অভিধানের সাক্ষ্য।

ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব অর্থনীতি কী বলে? সভ্যতার উষাকালে ভ্রাম্যমান নরসমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আজও বহু আদিবাসী সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। কোনো এক প্রাবৃট প্রভাতে কোনো ললনা ক'টি শস্যের বীজ খেলাচ্ছলে মাটিতে বপন করে। বপন করেছিল পুরুষতন্ত্রের বীজ। কয়েকমাস বাদে শস্যগুলি পক্ক হল, আর মানুষ জানল কৃষিকাজের সুবিধা। কেমন এক জায়গায় বসেই খাদ্য সংগৃহীত হচ্ছে। জমির মালিকানার প্রয়োজন হল তখনই, আর সমাজের একাংশকে যেতে হল গৃহাভ্যন্তরে—কে সামলাবে গৃহকর্ম? মেয়েরা হয়ে গেল পুরুষের সম্পত্তি। বিবাহপ্রথা নারী ও পুরুষকে গ্রন্থিতে বদ্ধ করল, সন্তানের পিতৃত্বের নিশ্চয়তা না থাকলে কেমন করে জমিজমার স্বত্ব স্থির হবে?

বৈদিক যুগে নারী-স্বাধীনতা দেখেছি ভারতবর্ষে। মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী, অপালাদের কথা ভোলার নয়। কিন্তু পুরুষদের একাধিপত্য কামনাতেই বরাহমিহির তাঁর জ্ঞানী পুত্রবধূ খনার জিহ্বা ছেদন করেছিলেন। আমাদের দুটি প্রধান মহাকাব্য বর্ণনা করেছে দুটি প্রধানা নায়িকার অবমাননা—সীতাহরণ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার বনবাস, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। নারী-স্বাধীনতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। মনু বলেছেন "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" ইসলাম-পরবর্তী শাসনকালে নারীকে পর্দার ঘেরাটোপে বন্দী হতে হয়েছে।

মধ্যযুগীয় সেই বর্বরতার অন্ধকার, (একদিক থেকে, আজকের পুরুষরা ভাবেন, আহা, থাকলেই বোধহয় ভালো হত) পুরুষের বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা, ইত্যাদি সবগুলিই প্রাথমিকভাবে ছিল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাকে পরে ধর্মের খোলসে মোড়া হয়। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষার আলোয় ভারতীয় তথা বাঙালি নারীর নবজাগরণের কর্ণধার পুরুষরাই—রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রমুখ। রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা পরবর্তীকালে নারীদের সামাজিক অগ্রগতির পথ মসৃণ করেছেন। নবজাগরণের আলোকে অমানিশার অন্ধকার কিঞ্চিৎ পরিমাণে সরে যেতে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন এসেছে—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার".

সমান্তরাল ভাবে মনে পড়ে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের রচিত সেই পাতলা বইটির কথা—A Room of One's own. শিক্ষা পেল মেয়েরা। কিন্তু কোথায় তার নিজের ঘর?

এখুনি হৈ হৈ শুরু হবে। একা মেয়ের ঘর কী হবে? তার আছে পিতার-

ঘর, স্বামীর ঘর, পুত্রের ঘর। সহনশীলা নারী, সে পুরুষের অর্ধেক অংশ, সে পুরুষকে পাশে বা পিছনে থেকে প্রেরণা দিয়েছে জননী, ভগিনী, পত্নী বা কন্যা রূপে। প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে আছে নারী, যে হাত দোলনায় দোল দেয়, সেই হাতই দুনিয়া শাসন করে। (লোভ সামলাতে পারছি না বলার, কোনো বিখ্যাত অপরাধতত্ত্ববিদ বলেছেন, সব বড় বড় অপরাধগুলির পিছনেও কোনো নারীর অস্তিত্ব আছে।)

কিন্তু নারী নিজে একলা আপন ভাগ্য জয় করে তার স্বাধীন পরিচয়ে কোথায় থাকে? এই প্রশ্ন শুধু মারী উলস্টোনক্রাফ্‌ট, সাইমন দ্যু বেভোয়ার বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফই তোলেননি, এই গভীর সমস্যা অনেক পুরুষ চিন্তাবিদ বা নাট্যকারও ভেবেছেন। যেমন ইবসেন। "ডল্‌স হাউস্‌" নাটকে নোরার সমস্যার কথা ভাবুন।

আসুন, একটি ছোট্ট ব্যাকরণগত কথা ভাবি। বিপরীত শব্দভাণ্ডারে আমরা কী শিখি? সাদার বিপরীত কালো, জন্ম-মৃত্যু, দিন-রাত্রি, হাসি-কান্না, পতন-উত্থান, প্রভাত-সন্ধ্যা, দুঃখ-আনন্দ, পুরুষ-মহিলা কেন? মানবজাতির এই দুটি ডানাই কি এত বিপরীতধর্মী? সংসারে এই দু'জন তো পরস্পরের পরিপূরক হবে—বিপরীত কেন ভাবা হবে এদের?

সাহিত্য কী বলে?—নারী পুরুষদের যাবতীয় সর্বনাশ করেছে, সে-ই নরকের দ্বার। সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে নারীর ছড়িয়ে দেওয়া প্রলোভনের জাল। বেচারা বোকা পুরুষ শুধু জালে ধরাই দিয়েছে। লক্ষ্মী মেয়ে বা লক্ষ্মী বৌ-য়ের সমার্থক নয় লক্ষ্মী ছেলে; দুষ্টু ছেলে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। লোককথা, রূপকথা—সর্বত্রই সৎমায়ের দুষ্কীর্তি কীর্তন। অথচ বাবা একমত না হলে একা সৎমা কী করতেন? শাশুড়ি-ননদের অত্যাচারের তালিকা কী দীর্ঘ; কী সুচারুভাবে মেয়েদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তোলা হয়েছে। ভাবলে পুরুষ শাসিত সমাজতন্ত্রকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাবে যে সাংসারিক প্রভুত্ব মেয়েরা চেয়েছে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাকে তা দেওয়া হয়েছে ঐ দুর্নামের বিনিময়ে। প্রথম এক বাঙালি লেখক সাহস দেখালেন সৎমা-র চরিত্র বিনির্মাণের—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা, যা নাকি সমাজের Safety Value —কী আশ্চর্য লাগে যে পুরুষের পালনীয়, শ্রদ্ধেয়, আদরনীয়া তার কন্যা, মাতা, ভগিনী, পত্নী—সে কেমন করে সেই জাতিকেই বেছে নিয়েছে তার রুদ্ধ বাসনার বহিঃপ্রকাশের জন্য, ভোগ্যপণ্য হিসেবে?

চরমতম ক্রোধের প্রতিশোধ হিসেবে কেন পুরুষ নারীকে জ্বালায় কামনার দহনে? কিন্তু নটী বিনোদিনীকে শ্রীরামকৃষ্ণ মর্যাদা দিয়েছেন, যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, শুধু সে-ই পতিতাকে আঘাত করতে পারবে যে নিজে কোনো পাপ করেনি। আবার স্বামী বিবেকানন্দ পতিতাদের মধ্যে মাতৃরূপ দেখেছেন।

পুরুষরা বলে, "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"। কিন্তু তারা নিজেরা কি কম দুর্ভেদ্য? সে নারীকে দমন করে, পীড়ন করে। তবু সেই নারীর কটাক্ষে পৃথিবী বিস্মৃত হয়, তার পদপ্রান্তে রাজ্যপাট তুলে দেয়, ত্যাগ করে সন্তানবতী সুন্দরী স্ত্রীকে প্রেমিকার জন্য। কন্যা, ভগিনী বা স্ত্রীর সম্মানের জন্য প্রাণ দেয়।

সমাজ রক্ষার্থে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে নারীর মাতৃত্বকে। পিতৃত্ব কথাটির মধ্যে আইনের জটিলতা আছে। বাবাদের কথা ভাবলে কী মনে হয়? পিতা হবার আগেই তো স্ত্রীর মধ্যে নিজের পুনর্জন্ম লাভের আশায় উদ্বেল হয় পুরুষ। সন্তানকে কোলে নিয়ে সে ব্যাকুল হয় স্নেহে। তাকে মানুষ করার জন্যই তার জীবিকা উপার্জন, আর কন্যার পতিগৃহে যাত্রার সময় অশ্রুসজল আঁখিকে পুরুষ অতিকষ্টে গোপন করে।

দ্বন্দ্ব, না মিলন—একবিংশ শতাব্দীতে এসে বোধহয় মানবজাতি কূট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে যে, পুরুষতন্ত্র কী? পৃথিবীতে নারীই বা কোথায় আর কোথায়ই বা পুরুষের স্থান?

কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। দূত গিয়ে কবিকে খবর দিয়েছে,—রাজামশাই আপনাকে ডাকছেন।

কবি ভারতচন্দ্রের জিজ্ঞাসা,—কেন?

দূত বললে,—আপনি নাকি কোথায় কি পায়ের নখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা করেছেন? তাই রাজামশাই আপনার উপর চটে গিয়েছেন। আপনাকে এক্ষুনি গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

ভারতচন্দ্র সব কথা শুনে বললেন,—ওসব চাকর-বাকরদের কথায় কান দিলে চলে? তুমি গিয়ে রাজাকে বলে দাও, আমি এখন যেতে পারব না। আমার সময় হবে না।

দূত গিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে যথাযথ এসব কথা বলেছে। কবির দুঃসাহস দেখে রাজা ভীষণ চটে গেলেন। তিনি এবারে হুকুম করলেন, কোনো কথা শুনবে না, ভারতচন্দ্রকে যে অবস্থায় পাবে, তুলে নিয়ে আসবে।

যে কথা সেই কাজ। দূতেরা গিয়ে কবিকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এল। রাজা কবিকে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন,—এসব কীরকম ব্যবহার? আমাকে যা-তা বলা?

কবি বললেন,—না না, আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি।

রাজা বললেন,—তবে কাকে বলেছ? আমার জিজ্ঞাসা—

কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা?
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা।।

এও কি কাব্য হল? শরৎকালের কতগুলো চাঁদ পায়ের নখে পড়ে আছে? কবিগণ আবহমান কাল চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখের তুলনা করেছেন। আর তুমি তুলনা করলে পায়ের নখের? ছি ছি, কি অন্যায় উপমা।

কবি জবাব দিলেন,—মহারাজ, আপনি ভেবে দেখুন। মালিনী সুন্দরের কাছে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করছে। এ কথাটা মালিনীর। এটা মালিনীর উক্তি। অশিক্ষিত লোক কোনো বিষয়ে বলতে গেলে মাত্রা রক্ষা করতে পারে না। তারা একটু বাড়িয়েই বলে। আমি তাই দূতকে বলেছি,—ওসব ঝি-চাকরের কথা। আপনাকে তো কোনো অন্যায় কথা বলিনি আমি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উত্তর শুনে বুরবাক।

—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সমাজ দুঃসংবাদ

ফজল আলির ফাজলামি

চুকলি বিদ্যার প্রথম পাঠ

দিনকাল আর আগের মতো নেই। সবকিছু বিলকুল পাল্টে যাচ্ছে। এখন জীবনে উন্নতি করতে হলে নতুন নতুন বিদ্যার দ্বারস্থ হতে হবে। চুকলি বিদ্যা এমনি এক বিদ্যা। এ বিদ্যা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারলে সহজেই সমস্ত মুস্কিলের আসান হবে। হিসেব মতো চুকলিবাজি করতে শিখুন, ঠিক ঠিক ডোজ দিন, আপনার উন্নতি অবধারিত।

অফিসে কাজ করেন, শান্তিতে থাকতে চান। সহকর্মীদের একজনের কাছে আর একজনের নামে জম্পেস করে চুকলি কাটুন। আর ধরি মাছ না ছুঁই পানি—এই মন্ত্র জপ করতে করতে মুখে ভোলানাথ মার্কা হাসি ফুটিয়ে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়িয়ে দিন। ওপরওয়ালা, মানে বসকে অবিশ্যি তোয়াজে রাখবেন। দেখবেন দিনগুলো বেশ তরতরিয়ে ছুটে চলেছে। অফিস যাবেন, বাড়ি আসবেন, মাইনে নেবেন। নো প্রবলেম।

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। পার্টি মহলে খাতির আছে এমন মাতব্বর শিক্ষকনেতার বশংবদ হয়ে থাকুন। তারপর সহকর্মীদের বিদ্যাবুদ্ধি পোশাক-আশাক স্বভাব-চরিত্তির দু'নম্বরি কাজকর্ম নিয়ে সমানে চুকলি কাটুন। মনে রাখবেন, নেতা মাত্রেই কানে দেখেন, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। প্রেসার অথবা সুগার কিংবা দুটিতেই জখম হয়ে আছেন। মসনদ রক্ষার জন্যে সদা সতর্ক। তাঁর এই মসনদটিকে ড্যামেজ করতে সহকর্মীদের অনেকেই যে হন্যে হয়ে উঠেছে, সেকথা শিক্ষকনেতার কানের কাছে নিয়ত জপ করে যান। সম্ভব হলে সকাল বিকেল টেলিফোনে সহকর্মীদের নামে কেচ্ছা করুন। কেচ্ছাগুলো রসালো হলে ভালো হয়। জানেনই তো, নিরামিষ কেচ্ছায় স্বাদ থাকে না। চুকলিবাজি যদি ঠিকমতো করতে পারেন, ক্লাশ না নিলেও আপনি আদর্শ শিক্ষক , পরীক্ষার খাতা না দেখলেও আপনি আদর্শ শিক্ষক।

> **চুকলিবিদ্যা অনুশীলন সাপেক্ষ। মুখে চোখে সবসময় ভালো মানুষ ভালো মানুষ ভাব ফুটিয়ে রাখতে হবে। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, নিতান্তই নিরীহ গোবেচারা, এমন একটা মুখশ্রী তৈরি করতে হবে।**

রাজনীতি করেন। চুকলিই আপনার মন্ত্র, চুকলিই আপনার তন্ত্র। নেতা বা নেত্রীর কাছে প্রতিদ্বন্দ্বীর নামে পাঁচবেলা চুকলি কাটুন। চুকলির মেনুতে থাকবে ভেট নেওয়া, পকেট গরম করা, ফ্ল্যাটের মালিকানা আসবাসক্তি, মধুচক্রে গমন, সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা ইত্যাদি। চুকলি আসলে কথার ভেল্কি, এই ভেল্কিতে নেতা বা নেত্রীকে তুষ্ট রাখুন। পারেন তো, নেতা বা নেত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নামেও চুকলিবাজি করুন।

ভোজবাজি যেমন অসাধ্য সাধন করে, চুকলিবাজিও তেমনি অসাধ্য সাধন করে। চুকলিবাজিতে শিলা জলে ভাসে, ন্যাড়া বেলতলায় যায়, মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।

চুকলিবিদ্যা অনুশীলন সাপেক্ষ। মুখে চোখে সবসময় ভালো মানুষ ভালো মানুষ ভাব ফুটিয়ে রাখতে হবে। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, নিতান্তই নিরীহ গোবেচারা, এমন একটা মুখশ্রী তৈরি করতে হবে। যার কাছে চুকলি কাটছেন তার মনের হাল-হদিশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। তার স্পর্শকাতর জায়গাগুলো যদি ঠিক ঠিক খুঁজে বের করতে পারেন, তবে তো কেল্লা ফতে। আর যার সম্বন্ধে চুকলি কাটবেন তার দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতার খবরগুলো থাকবে আপনার নখের ডগায়। মোদ্দা কথা, চুকলিবাজকে মানবচরিত্র বিশারদ হতে হবে। লক্ষ্য স্পষ্ট, যার কাছে চুকলি কাটছেন, তাকে তাতিয়ে দেওয়া চাই। আর যার সম্পর্কে চুকলিবাজি করছেন, তার বারোটা বাজাতে হবে। উদ্দেশ্য, নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া, উঁচুতে ওঠা।

মনে রাখবেন, চুকলিবাজি একটা আর্ট। কথাবার্তায় মোলায়েম হওয়ার চেষ্টা করুন। একটু অভিনয় করতে শিখুন। মঞ্চের অভিনয়ে প্রবেশ-প্রস্থানের যেমন গুরুত্ব আছে, জীবনের রঙ্গমঞ্চেও তেমনি। তাকমাফিক উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করুন। সুযোগ বুঝে প্রস্থান করুন। চুকলিবাজিতে প্রবেশ-প্রস্থানের পালাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর হ্যাঁ, বিবেক-টিবেক ঝেড়ে ফেলুন। বিবেক শব্দটা অভিধানেই থাক, জীবনে ঐ শব্দটির কানাকড়ি দামও নেই। বিবেককে বুড়ো আঙুল দেখান, চুকলিবাজিতে সফল হবেন। অর্থ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা সবকিছুই আপনার আয়ত্তে আসবে। আপনি বহুজন বন্দিত হবেন। নন্দিতও। কী আনন্দ, কী আনন্দ।।

—ফজল আলি

টিয়া পাখির ঠোঁট

ওম্‌বিকা গুপ্‌তো

ফুলশয্যার রাতেই বেড়াল কাটার মতলব ছিল ফটিকচাঁদের। পই পই করে বলে দিয়েছিল খগাদা—বিয়ে করছিস কর। বাপের এক ছেলে হয়ে যখন জন্মেছিস তখন ও অপকম্মটুকু তোকে করতেই হবে। তবে হ্যাঁ, সোহাগরাতে সোহাগ দেখাতে যাসনি ফটকে, পরে আর সামাল দিতে পারবি না। প্রথম রাতেই দা-কুড়ুলের খেল দেখিয়ে দিবি।

খগাদা সাবধান না করে দিলেও ওই চিন্তা বা দুশ্চিন্তাটা ফটিকচাঁদের মাথায় ছিল। মেয়েছেলে যে বেড়ালের জাত সেটা ও নিজের গর্ভধারিনী কুমুদবালার অষ্টপ্রহর সংহার মূর্তিতে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। নরম মাটি পেলেই বেড়ালে আঁচড়ায়। আর ফটিকের বাপ নকুলচাঁদ একেবারেই জলঙ্গীর পলিমাটি। বেড়ালে কেন, কেঁচো-কেন্নোই দিয়েছে মানুষটাকে আঁচড়ে খামচে একশা করে।

বাস্তবিক নকুলচাঁদের জীবনে শুধু বেড়াল কেন, কেঁচো-কেন্নোর উৎপাতও ছিল। কুমুদবালার বিধবা দিদি ক্ষেত্রমণি স্বামীকে খুইয়ে বোনের সংসারে দু'দিনের জন্যে এসে দু'বছরের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি কাটোয়ামুখো হয়নি। হবার অবশ্য কথাও ওঠে না। ওঠে না বলাটা হয়ত ঠিক নয়। উঠতে দেয়নি কুমুদবালা।

—বাগানে তো শাকসব্জি গরু-ছাগলে খেয়ে কূল পাচ্ছে না। আর, এক গন্ডা দুধেল গাইয়ের দুধ বুড়ো মিনসে একা আর কত গিলবি। ফট্‌কে তো বাড়ি ফেরে বাংলা গিলে বুঁদ হবে। দুধ গেলার সময় কোথায় তার! আর আমার বাপু দুধে অরুচি। বাকি রইল দু'বেলা দুমুঠো আলো চাল। তাতে ক' পয়সা খর্চা হয় রে হাভেতে মিনসে?

এ তো গেল কুমুদবালার কথা। ক্ষেত্রমণি আরো এক কাঠি ওপরে। আরো এক পর্দা উঁচুতে বাঁধা ওর গলা।

—তোর হেঁসেল সামলায় ক্যা রে? আজ পাটপাতার বড়া খাব, কাল আলুপোস্তর ছেঁচকি। নোলা তো ওই সদর থানার দারোগার মতো। এই ক্ষেত্রমণি না থাকলে বাপ-ব্যাটায় রোজ বেগুনপোড়ার ঘ্যাঁট গুঁজতিস মুখে। তাই বলি, এত কথা কিসের র‍্যা?

এত কথা কেন, কোনো কথাই নকুলচাঁদ বলেনি কোনোদিন। বললে যে কি হত সে কথা ফটিক ভাবতেও পারে না। মুখে রা নেই। নিরীহ বাপটি ওর সকাল সন্ধে দুই দজ্জাল মেয়েছেলের মুখঝামটা খেয়ে আসছে বিনা কারণে।

বাড়ি বিশেষ থাকে না ফটিক। তবু যেটুকু

থাকে তাতেও নিস্তার নেই। একদিন নেশা করে বাড়ি ফিরে দপ্ করে তেতে উঠল ফটিক। দাওয়ার এক কোণে হুঁকো হাতে বসে আছে নকুলচাঁদ। কল্কেতে আগুন নেই। সারা উঠোন দাপিয়ে কুমুদবালা আর ক্ষেত্রমণি দু'মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে চলেছে। দোষের মধ্যে কল্কেতে একটা টিকে ধরিয়ে দিতে বলেছিল নকুল। কাজটা সাধারণত নিজেই করে। কিন্তু সেদিন সারাটা দিন সদরে জমিজমার কাজে গিয়েছিল। ধকল গেছে খুব। ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে নিজের পরিবারকে বলে টিকে ধরিয়ে দেবার কথাটা। দুই বোনে দাওয়ায় বসে তাস খেলছিল। কুমুদবালা স্বামীর কথাটা কানেই তুলল না। মিনিট দশেক বাদে কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে নকুলচাঁদ—

—ভর সন্ধেবেলা কোন গেরস্থবাড়ির বৌ তাস-পাশা খেলে। তেতেপুড়ে এলাম, এক ছিলিম তামুক খাব—তারও উপায় নেই!

মেয়েছেলে ঘটিত কেস খগা খুব একটা হ্যাণ্ডেল করতে চায় না। শুধু ক্ষেত্রমণির কেসটা ওকে নিতে হয়েছিল ফট্কের জন্যে। দা-কুড়ুলেও কাজ হয়নি ওখানে। শেষ পর্যন্ত পুকুরে বস্ত্রহরণ করেছিল খগা ক্ষেত্রমণির।

ব্যস। সারা পাড়ায় যেন সাইরেন বেজে উঠল।

—না। তাস খেলবে না তো কি নেশাভাং করবে? গর্জে উঠল কুমুদবালা। তবলায় ঠেকো দিলে ক্ষেত্রমণি—

—কেন সারাদিন তো গা এলিয়ে ঘুরে এলে। টিকেটুকুও ধরিয়ে নিতে পারো না? হাড়ভাঙা খাটুনির পর এই দু'দণ্ড দু'বোনে একটু আয়েস করছি, অমনি হুকুমদারি শুরু হয়ে গেল?

ক্ষীণতম প্রতিবাদ করেছিল নকুলচাঁদ—

—আপনাকে তো হুকুম করিনি দিদি। নিজের পরি[illegible]ই টিকেটুকু ধরিয়ে দিতে বলেছিলাম।

এবার খেঁকিয়ে উঠল পরিবার। ফটিক ঠিক সেই সময়েই বাড়ি ঢুকল। ফটিককে দেখে কুমুদবালার ভাষার তীক্ষ্ণতা ও কণ্ঠস্বরের তীব্রতা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। ফটিক তেতে গেলে হিন্দিভাষী হয়ে যায়। মিনিট তিনেক গর্ভধারিণীর ভাষণ শোনার পর চিৎকার করে উঠল ফটিক—

—চুপ্ রহো শালী।

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় আজ মাতৃহত্যায় পিছপা হবে না। কুঠারের বদলে বাপের হাত থেকে হুঁকোটা ছিনিয়ে নিয়ে তেড়ে এল ফটিক কুমুদবালার দিকে। তেড়ে মানে এক পাঁইট বাংলা উদরস্থ করার পর যতটা তেড়ে আসা সম্ভব। ক্ষেত্রম[illegible]ক্ষণে উঠোনের কোণ থেকে চ্যালাকাঠ তুলে এনে বোনপোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক বাড়িতেই ফটিকচাঁদ পপাত চ।

সেদিন থেকেই ফটিক খগাদার পার্ট টাইম থেকে হোল টাইম চ্যালা হয়ে গেছে। পাড়ায় দাদাগিরিতে ও এখন ট্যারা-খগার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। কদমতলায় বটার চায়ের দোকানে আস্তানা ওদের। জমিজমা নিয়ে গাঁয়ে হাঙ্গামা লেগেই থাকে। সদরে গিয়ে মামলা মোকদ্দমা করার সময় বা অবস্থা সবার নেই। উকিল মোক্তার আর আদালতের খরচার চেয়ে খগার রেট অনেক কম। পাঁচ পাঁইট মাল আর হাতখরচার টাকা পেলেই খগার দল বিপক্ষকে টাইট দিতে প্রস্তুত। দরকার হলে দা-কুড়ুলের ব্যবস্থাও আছে। সব কেস অবশ্য অতদূর গড়ায় না। গড়ালে খগারই জিত হয় প্রায় সব সময়।

মেয়েছেলে ঘটিত কেস খগা খুব একটা হ্যাণ্ডেল করতে চায় না। শুধু ক্ষেত্রমণির কেসটা ওকে নিতে হয়েছিল ফট্কের জন্যে। দা-কুড়ুলেও কাজ হয়নি ওখানে। শেষ পর্যন্ত পুকুরে বস্ত্রহরণ করেছিল খগা ক্ষেত্রমণির। পরদিন সকালের ট্রেনে কাটোয়া রওনা হয়ে গিয়েছিল ফটিকের মাসি।

কুমুদবালা রিট্যালিয়েট করেছিল ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। বেগুনপোড়া আর ঠাণ্ডা ভাত। বাগানের লঙ্কা লেবুর গাছগুলো রাতারাতি উপড়ে ফেলেছিল কুমুদবালা। নুনের বস্তা ভাসিয়ে দিয়েছিল পুকুরে। এতে ফটিকের খুব একটা অসুবিধে হয়নি। বটার দোকানেই সেরে নিত ও সকালের খাওয়াটা। আর রাতে বাংলা পেটে পড়ার পর বেগুনপোড়া আর খাসির মাংসের তফাতটা ওর জিভ ঠিক বুঝে উঠতে পারত না।

কিন্তু নকুলচাঁদের জীবনটা যায়-যায় হয়ে উঠল।

—তুই একটা বিয়ে কর ফট্কে। তা না হলে পঞ্চান্ন বিঘে ধেনো জমির মালিক হয়েও আমায় না খেয়ে মরতে হবে।

বাপের প্রতি ফটিকের একটা দুর্বলতা ছিলই। কুমুদবালাকেও কাটোয়া না হলে জাহান্নাম বা ওইরকম কোথাও পাঠানো যায় কিনা, এ বিষয়ে খগাদার সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে। সুরাহা কিছু হয়নি। তার ওপর বংশরক্ষা বলে একটা কথা আছে। নকুলচাঁদই কথাটা ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

—ভবানন্দ দাস মহারাজ কেষ্টচন্দ্রের খাজাঞ্চি ছিলেন। তার বংশধর সাতপুরুষেই খতম হয়ে যাবে ফটিক?

খগাদার সঙ্গে অনেক শলা পরামর্শ করে বিয়ে করতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল ফটিক। শর্ত শুধু একটি। মেয়ে যেন কাটোয়া কালনা লাইনের কোনো গ্রাম-গঞ্জের না হয়। ন'দে শান্তিপুরের নরম মাটির মেয়ে হলেই ফটিক খুশি। বোবা-হাবাতেও বিশেষ আপত্তি নেই। নকুলচাঁদ বামুনপাড়ার বিলাস ঘটকের বাড়িতে ধন্না দিতে শুরু করে দিলে।

নকুলের পছন্দমতো মেয়ে পাওয়া গেল হাঁসখালিতে। টুকটুকে মেয়ে। পাটপাতা ভাজা থেকে মরিচের ঝোল—সব রান্না জানে। মুখে রা নেই। কুমুদবালা বা ক্ষেত্রমণির মতো গতরের বহর নয়। একটু রোগা ছিপছিপে। নকুল বলেছিল ফটিককে মেয়েটিকে দেখে আসতে। ফটিক রাজি হয়নি। বিয়েটা যখন বাপের জন্যেই করছে তখন কনেটিও বাপের পছন্দমতোই হোক। খগাদা মাল টেনে নকুলচাঁদের উঠোনে দা-কুড়ুল ঘুরিয়ে কুমুদবালাকে মুখ খুলতে দেয়নি।

ফুলশয্যার রাতে একেবারে 'ফিট্' হয়ে ঘরে ঢুকল ফটিকচাঁদ দাস। খগাদার নির্দেশ মতো সজোরে দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিল শব্দ করে। সারাটা দিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়ালের পেছনে ছুটেছে খগাদা আর ফটিক। একটাকেও ধরতে পারেনি। খগাদা বলেছিল, ঘাবড়াসনি ফটিক, জানলার ওদিক থেকে আমি 'মিউ' করলেই তুই বিছানা থেকে উঠে দা হাতে দাপাদাপি শুরু করে দিবি।

গলা থেকে ফুলের মালাটা খুলে বিছানার দিকে তাকাল ফটিক। নজরে এল টুকটুকে লাল আলতা দেওয়া গোলাপী চরণ-যুগল। খগার 'মিউ' ডাকটা কানে এল না ফটিকের। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল ফটিকচাঁদ পদ্মফুলের খোলা পাপড়ির মতো প্রস্ফুটিত পদযুগলের দিকে। দৃষ্টিকে যেন পথনির্দেশ দিল ওই পদ্মপাপড়ি। ক্রমে ওর চোখদুটো বিলম্বিত লয়ে ধীরে ধীরে উঠে এল ওপর দিকে।

শুয়ে ছিল টিয়া। কালো টানা ভুরু, আঁখি মুদ্রিত, রাঙা-ঠোঁটে গোলাপকুঁড়ির আধো আধো ফুটে ওঠা ভাব। সম্মোহিত ফটিক দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারল না। মদের নেশা কেটে গিয়ে এক নতুন নেশায় মাতাল হয়ে উঠল ফটিকচাঁদের একুশ বছরের তরতাজা সুঠাম শরীরটা।

'শালার দা কুড়ুলের নিকুচি করেছে'—বলে দু'হাতে টিয়ার মুখটি কোলে টেনে চুম্বনে চুম্বনে ফুটিয়ে তুলল ফটিক আধ-ফোটা গোলাপকুঁড়িটিকে।

জানলার ওধারে খগার আধঘন্টা ধরে 'মিউ মিউ' ডাক তখন ঢিল-খাওয়া কুকুরের 'কেঁউ কেঁউ' ডাকের মতো শোনাচ্ছে।

টীকা নিষ্প্রয়োজন

দিদি নম্বর ওয়ান

কানাঘুষো চলছে ঢোলগোবিন্দ অর্থাৎ হিবো নম্বর ওযানেব পববর্তী ছবি: দিদি নম্বব ওযান। বটনাটি যদি ঘটনা হব তবে ছবিটিব ফ্লপ্ নম্বব ওযান হবাব প্রবল সম্ভাবনা আছে বলে ওয়াকিবহাল মহল একবকম নিশ্চি ত। কাবণ ওরিজিনাল দিদি নম্বর ওয়ানেব সে দাপাদাপি আর নেই। ওদিকে বরং দিদি নম্বর টু মাযাবতী যুক্ত প্রদেশে বেশ গুছিয়ে বসেছেন। দক্ষিণী দিদি নম্বব থ্রিকে আব ঠিক দিদি বলাটা ব্যাকবণ সিদ্ধ হচ্ছে না। গতরে বহবে ওনাকে দাদি বলাটাই ববং সঙ্গত হবে।

মোদ্দা কথা, মমতাকে নিয়ে মাতামাতি আব তেমন নেই। বাজাবি ভাষায মমতাকে পাবলিক আব তেমন খাচ্ছে না। শুধু 'ভাজপা' বলে বলে নয, কাগজে কলমে এমনকি কল্লোলিনী কলকাতাতেও দিদিকে নিয়ে আদিখ্যেতা অনেক কমে এসেছে। তবে ওই আব কি, হেুড়দাকে যদি বাংলাব বাঘ বলে চালানো যায, আঁচ মিইযে যাওযা দিদিকে অগ্নিকন্যা কেন, ভিসুভিযাস বলে ট্যাডা পেটালেই বা দোযের কি?

অথচ এই ক'টা দিন আগেও দিদিগিবিব দাপটে কলকাতার বাস্তাব দাদাগিরি লেজ গুটিযে দৌড দিযেছিল। ডাকাবুকো সব দাদার দল হুঁকোমুখো হ্যাংলার মতো দিদিব দবজায লাইন দিযেছিল। সেইসব দিদির কৃপাধন্য দাদাদের নাম আর নাই বা করলাম। মোট কথা, হরিশ পার্কেব পুব-দক্ষিণ কোনার সদ্য কংগ্রেস নার্সাবি থেকে তুলে আনা তৃণমূল রাতাবাতি মহীরুহব আকাব ধারণ করেছিল। বাজনৈতিক সব দুঁদে দুঁদে দাদারা দিদি বলতে তখন অজ্ঞান। মুখে যতই হম্বিতম্বি ককক, আলিমুদ্দিন স্ট্রিটেব দাদাবাও তখন দিদির নামে তটস্থ।

কেঁচোট। অবশ্য উনি নিজেই গিললেন, নিজেই গুবলেট কবলেন সবকিছু। কংগ্রেসেব সঙ্গে মহাজোট নাকি মহাঘোঁট পাকিয়ে চেন টেনে বেল থেকে লাফ দিয়ে বাইটার্স মুখে ছুটলেন আমাদেব দিদি নম্বব ওযান।

আমেদাবাদ ববরবাদ হতে চলল, মোদী তো কই গদি ছাড়লেন না? আব রাইটার্সমুখো দিদি লালাদিঘি না পৌঁছতেই রেল ভবনেব অমন গদি তেড়েমেড়ে ছেড়ে দিলেন। এদিকে বামজোটের বানে যখন তৃণমূল-তবমুজেব ক্ষেত ভেসে গেল, বাজ পেযী "বিটিযাব" ত্রাণে বিলিফ ট্রেন পাঠালেন না। এমনকি জর্জ ফানান্ডেজও, বছব ঘুবে গেল, দুটো আশার কথা বলতে এলেন না। দিদি যাকে বলে স্ট্রানডেড্। বাইটার্স দূব অস্ত্, বেল ভবন দূব অস্ত্, নিকটস্থ বলতে হাজবা পার্ক, থুড়ি যতীন দাস পার্ক, নিদেন পক্ষে এসপ্লানেড ইস্ট তো আছেই। বেশি চ্যাচামেচি কবলে সবকাব খুবজোব শব্দ দূষণেব মামলা আনতে পাবে!

অধিকন্তু দিদি নম্বর ওয়ানের যখন এতই মন্দা বাজাব, তখন সোনিযা গান্ধীকে দিদিব স্লটে আনা যায না? নাঃ, সে উপায নেই। সে ক্ষেত্রে মাডাম নম্বব ওযান হবেন কে???

—বুনো রামনাথ

কুমারী : বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথম পদক্ষেপ কি?
আইনজ্ঞ : বিবাহ!

বাংলায় নারী নিগ্রহ

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ : পল্লব চক্রবর্তী

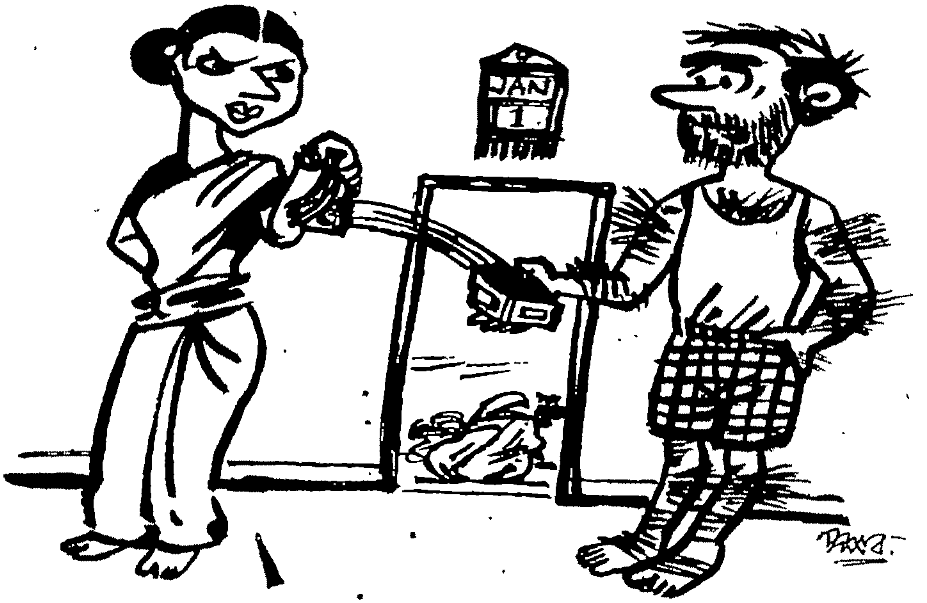

বাড়ির ঝি-কেও তো একটা মাইনে দিতে হয়!

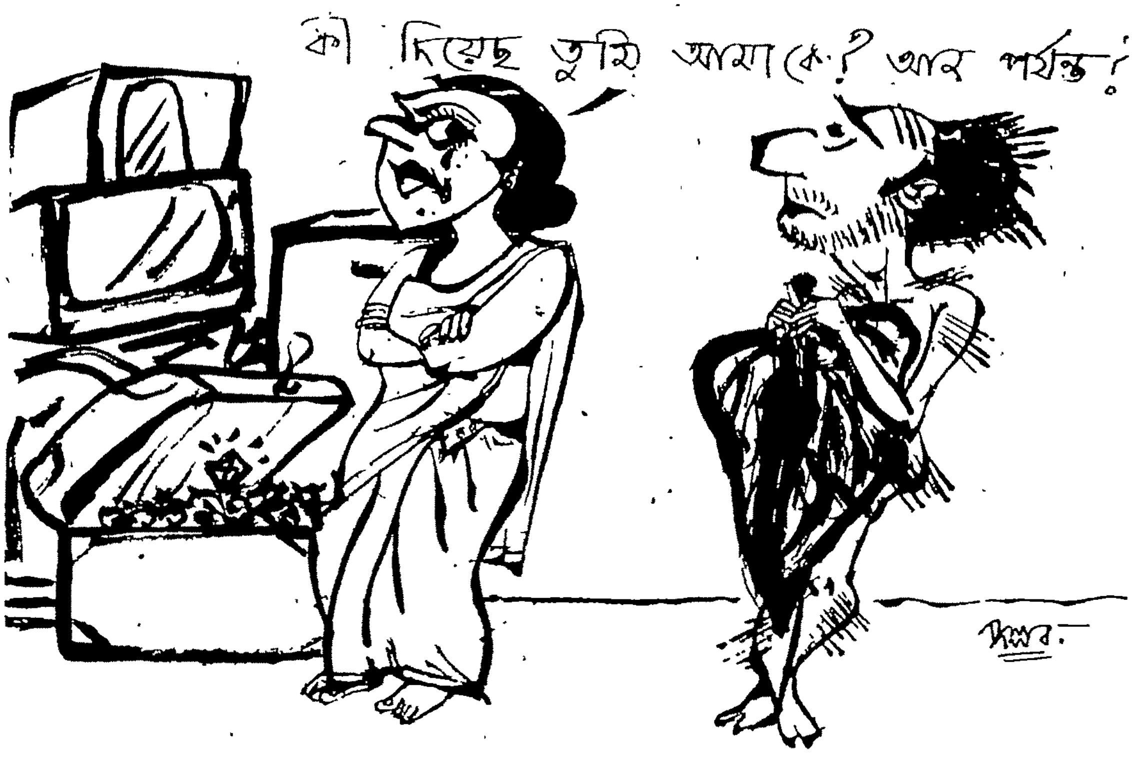
কী দিয়েছ তুমি আমাকে? আর পর্যন্ত!
পল্লব.

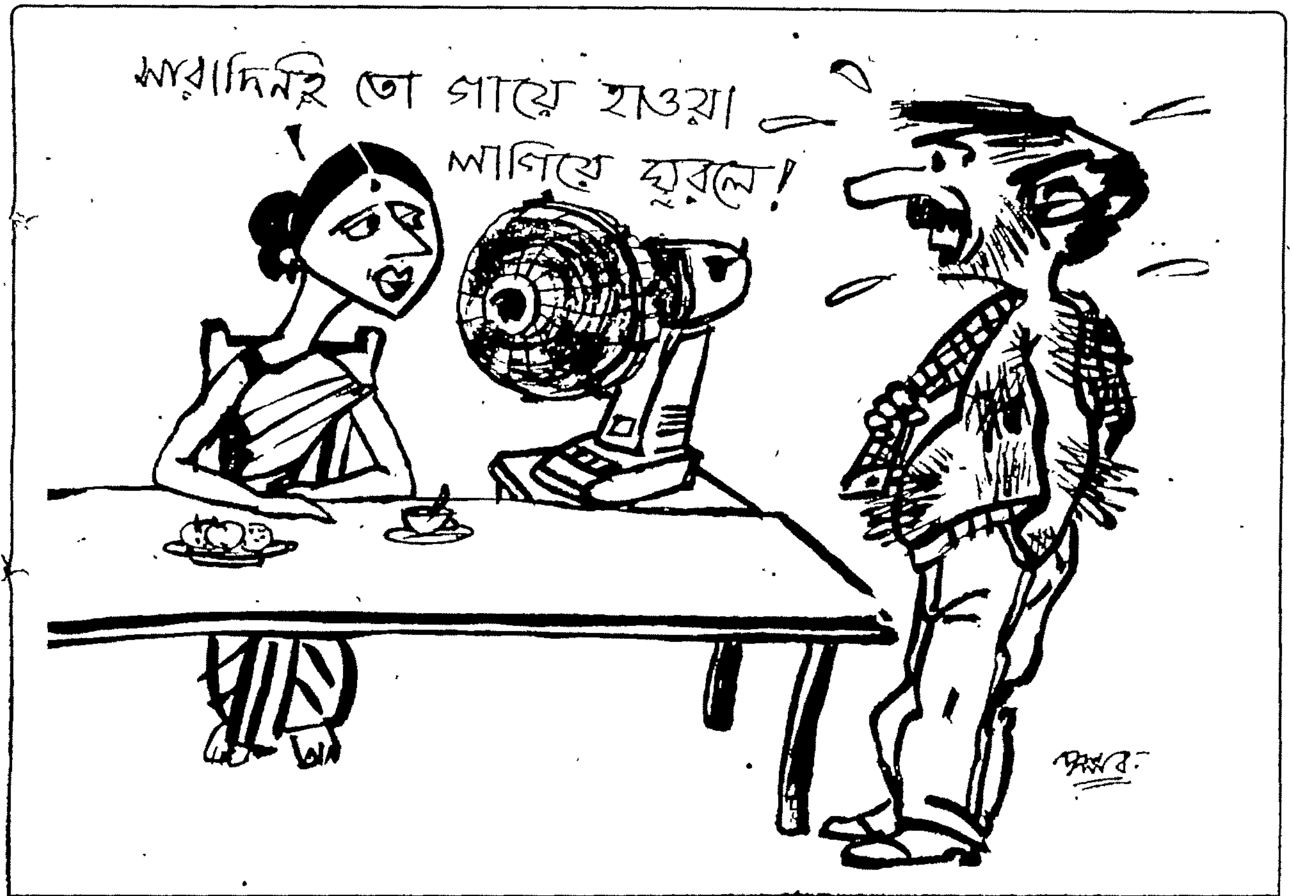
সারাদিনই তো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরলে!

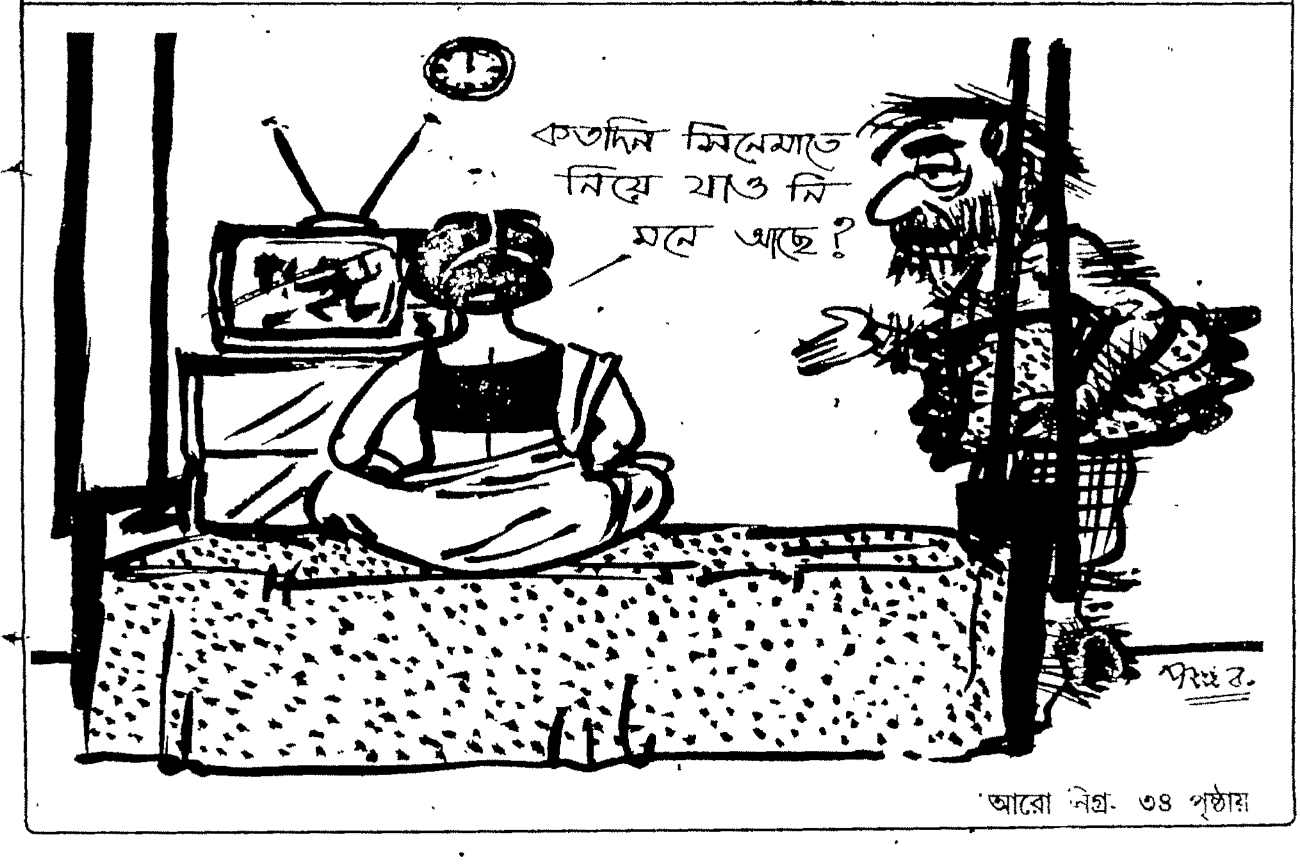
কতদিন সিনেমাতে নিয়ে যাও নি মনে আছে?

আরো নিগ্র- ৩৪ পৃষ্ঠায়

পুরুষবাদ ও আমি

বিপাশা মণ্ডল

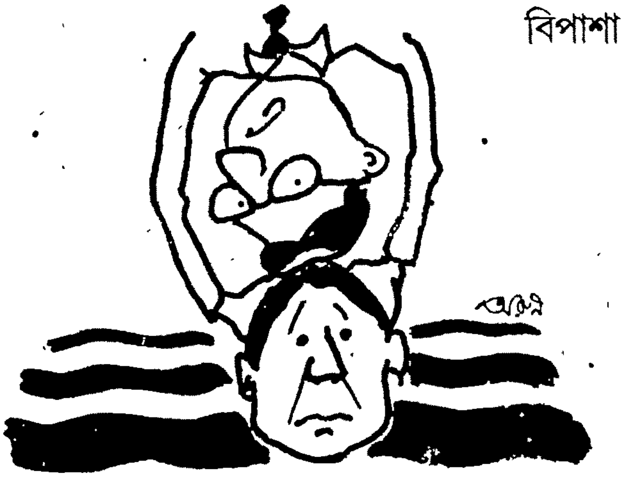

লেডিস বিউটি পার্লার খোলার ইচ্ছা যে প্রবল ছিল না, তা নয়। কিন্তু বরাতজোরে ফসকে গেল। বাজারে এব এখন রমরমা। লোভ কার না হয়? তাই বিপুল আগ্রহে ব্যবসার অনুমতিপত্র লাভের আশায় অমুকবাবু তমুকবাবুর কাছে গিয়ে শুধু শুধু হয়রানই হলাম। শুধু শুধু বোধহয় ভুল বললাম, কারণ কিছু অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি। বোধগম্য হল, আমি অবলম্বনহীন। By Channel-এর কোনো রাজনীতির ছাতার নিচে নই আমি। নই কোনো বিশিষ্টের কেউ। মোট কথা ওদের কর্মপদ্ধতির আওতার বাইরে। আর হয়রানি? হ্যাঁ আমি নারী বলে সরাসরি 'না' বলে আলাপের বাসনা বোধহয় ত্যাগ করতে পারেনি।

একদিন আমাকে ওপথে হাঁটা বন্ধ করতে হল।

বর্তমানে আলুর বাজার খুব ভালো। বেচলে বোধহয় বড় ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে পারতাম। তাই আপাতত কলম হাতে অকাজ করা। আমার পিতৃদেব ইতিমধ্যে অনেক কসুর করছেন তাঁর নিরুপমাকে সুপাত্রে নিবেদন নিমিত্তে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তাঁর প্রচেষ্টার মহাজনি খাতাটিতে শুধুই ক্ষতির হিসাব জমা হচ্ছে। জীবিত কালে তাঁর বকেয়া ক্ষতি পরিশোধ হয়ে লাভের মুখ দেখার ব্যাপারে আমার থেকে পুরুষবাদীব' বোধহয বেশি জেনে থাকবে। অবশ্য কোনো নারীবাদী কিংবা সুহৃদয় যদি আমার পিতৃদেবের ঋণ মকুব করে লাভের মুখ দেখান তবে বোধহয় তিনি নারীবাদীদের পরম প্রাপনীয় আর পুরুষবাদীদের চক্ষুশূল হবেন। তবে এমনটি না হলেও তিনি যে পিতৃদেবের উদ্ধারকর্তা দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন—এটা নিঃসন্দেহে। তেমনটি এ পর্যন্ত ঘটেনি। যা হচ্ছে তা হল, কলেজপড়া বঙ্গসন্তানগণ আপাতত College Girl friend-দের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে (যা সত্যিকারের হয় না, শুধু স্বার্থ মেটানোর জন্য, তা তো সহজেই ভোলা যায়) বাবা-মায়েব সুবোধ সন্তানের মতো কন্যাদায়গ্রস্থ রামসুন্দরের নিকট বরপণ প্রার্থী হয়ে ময়দানে নেমেছে। পুরুষবাদী সমাজ তার কোমরের গামছাটি আঁটোসাঁটো কবে বেঁধে দেওয়াতে এদেব বিক্রমের কাছে রামসুন্দরের দল নিতান্ত অসহায়। ঐসব পুরুষ বন্ধু কর্তৃক বিস্মৃত নারীদেব স্থান কোথায, পুরুষবাদীরা একটু জানার চেষ্টা করলে ভালো হয় না কি? আর তাঁরা যদি না করেন, কেউ যদি এইসব অবহেলিত লাঞ্ছিতদের কথা তুলে ধবেন তবে দোষের কি? কী দরকার আছে তার হেঁসেলে ঢোকাব অভিজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার প্রশ্নে? ছিদ্রান্বেষী না হয়ে তাব ত্রুটিমুক্ত পথ বাতলানো কি সত্যিকারের মানুষের বিধেয নয? পুরুষবাদীরা ধরাকে সরাজ্ঞান করে কয়েকটি বাজারি মেয়ের সঙ্গে (যেটা পুরুষদের মধ্যেও আছে) সতী সাবিত্রীব দেশের নারীজাতিকে একাকার করে পুরুষ সমাজে সাধু সেজে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা করছেন না?

তালিবান জমানায়, কাশ্মীরে মেয়েদেব উপর যে ফতোযা জারি কিংবা হিন্দু সমাজে নাবীদের পালনীয় যে আচরণবিধি, সে বিযয়ে কি পুরুষবাদীদের মস্তিষ্কে ভাবনার উদ্রেক হয়েছে কখনো? শুধু কি মুখে নিন্দাপ্রস্তাব আনাই যথেষ্ট? না কোনো প্রগতিশীল নারীসমাজ যদি এর প্রতিবাদ করে সুষ্ঠ সামাজিক বাবস্থাব প্রতিদান চায, তার অন্ধ বিদ্বেযী না হযে সমালোচনা করে ভুলত্রুটি শোধরানো বিধেয, তা বিজ্ঞজন বিদিত।

নারীবাদী নেত্রীগণ সাধাবণত ডিভোর্সী, বিধবা, বেশী বযসী মহিলারা হন। কারণ কি? রোগের যন্ত্রণা সে জন জানে যে পূর্বে রোগশয্যায় বিনিদ্র রজনী একাকী কাটিযেছে। সামাজিক জীবনে বযস বৃদ্ধির সাথে বিভিন্ন সমস্যাব সম্মুখীন হয় মানুয। বিচিত্র পৃথিবীর দারুণ ও নিদারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে যে সঞ্চযেব ভাণ্ডাবে নিদারুণ অভিজ্ঞতার কযেনগুলি বেশি পরিমাণ লাভ কবে, সে-ই হয়ে ওঠে বিদ্রোহী বা বিদ্রোহিনী। পুরুষবাদীবা একটু খোঁজখবর নিলে অবগত হবেন, এঁরা তাঁবাই। সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের তিক্ত অভিজ্ঞতায এঁদের থলি ভরপুর।

তরুণীরা অনভিজ্ঞ। শিশু যেমন জীবনের প্রথম অনভিজ্ঞ দিনগুলো মায়ের আদরে আর অবলম্বনে অতিক্রম করে তেমনি বাবা-মায়ের আদবে আর স্কুল-কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে নবযৌবন অতিবাহিত হয় তরুণীদেব। সমাজ সম্পর্কে একটু আধটু জানলেও বা পথ চলতে কোনো নিদারুণ অবস্থাব সম্মুখীন হলেও যৌবনেব আবেগে, অনুভূতিতে এগুলো নিতান্তই খাটো হয়ে যায়। পববর্তী জীবনে ভাগ্য সুপ্রসন্নের দরুণ ঝুড়ি ঝুড়ি নিদারুণ অবস্থা তাকে যখন সামলাতে হয, তখন মনে পড়ে তারুণ্যের খাটো হয়ে যাওযা নিদারুণ অভিজ্ঞতাগুলি। পুরুষবাদীরা আগ্রহ জন্মালে এ সম্পর্কেও অবহিত হবেন।

আমার পাড়াবই কাজেব মেয়েকে কলকাতাব বাবুব বাড়িব বাথরুমে আত্মহত্যা করতে বাধ্য কবা হয়েছে বা করেছে বা হত্যা করা হয়েছে কিছুদিন পূর্বে। সে ছিল তরুণী। ভাগ্য খারাপের কারণে সে যদি কোনোরকমে বেঁচে যেত, পুরুষবাদীরা নিশ্চয় জানতে পারতেন পুরুষের ইতিকথা। হযত জানেনও ঐরকম বিচিত্র সংবাদ অজস্র। শুধু স্বীকার করাটা মুখে আটকে যাচ্ছে। আসলে রহস্য হল, দিন বদলেছে। পুরুষ শাসিত সমাজ অভাববোধ করছে নারীর সহজ পাওয়াকে। ভবিষ্যৎ ভাবতে গিযে শঙ্কিত হচ্ছে পুরুষবাদীরা। তাই সমস্যা সমাধান না করে, তাঁরা সমস্যাকেই পাত্তা দিচ্ছেন না। চেষ্টা করছেন ডিভোর্সের মতো আইনি বাধা তুলে দিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে বহু বিবাহের প্রচলন বজায় রাখতে। চাইছেন কী করে নারীজাতিকে অবদমিত করে কত সহজে তাকে ব্যবহার করা যায়। একটা প্রজাপতির একটা ফুলেব মধু আহরণে উদর তৃপ্ত হলেও চিত্ত তো তৃপ্তি লাভ করে না।

মিথিলেশ কুমার সিং। তরুণ হিন্দি কবি। প্রসন্ন খড়গ্‌পুরী নামেও পরিচিত। পাটনার "দৈনিক জাগরণ", হায়দরাবাদের "ইনকিলাব", "দৈনিক হিন্দি মিলাপ" ইত্যাদি কাগজে লিখে ছয়লাপ করার পর "পত্রপাঠ"-কে ছত্রখান করতে হাজির হয়েছেন। এবং 'মাসিমার হিন্দি জ্ঞান' নিয়ে অনুবাদের দায়িত্বে খোদ সম্পাদক শেখর আহমেদ।

শব্দ্ তো অনেক আতে যাতে হ্যায়

প্রসন্ন খড়গ্‌পুরী

জ্ঞানভারতী বিদ্যাপীঠমে ম্যায় হিন্দি পড়া রহা থা
শ্রেণী ছয় থি, পাঠ বিশেষ্য থা
বাস্তব মে হাম উনকে সত্রকা অন্তিম দিনো মে পড়া রহে থে।
ও বিশেষ্য কেয়া, বিরাম চিহ্নকো প্রয়োগোঁ কো ভি প্যহচন রহেঁ থে
প্রস্তুতি করণকে দউরন এক শব্দ্ আয়া—"প্রেমিকা"।
য্যায়সে হি শব্দ্ ব্লাকবোর্ড পর লিখা ছাত্রকি ওর ঘুমা
এক সরদার কা বাচ্চা খাড়া হো গয়া,
বোলা—
স্যার, প্রেমিকাকে বাদ পূর্ণ বিরাম লাগাইয়ে।
ম্যায় চমকা পুছা, কিঁউ? বজাহ্ তো বাতাইয়ে।
সরদারকা বাচ্চা মুস্কুরাকর বোলা—
স্যার। প্রেমিকা-শব্দ জাতি বাচক বিশেষ্য হ্যায়,
পূর্ণ বিরাম নেহি লাগানে সে
অনেক প্রেমিকাঁও কা বোধ হোতা হ্যায়
কেয়া আপকে দিলকি অ্যায়সি মনসা হ্যায়!

য়ে শুনকর ম্যায় খামোশ হো গয়া,
শোচা—
এডুকেশনল সাইকোলজি তো ম্যায়নে পড়হি হ্যায়
এহ্ সরদার কা বাচ্চা মেরি সাইকোলজি পড় রহা হ্যায়
সচমুচ ইসনে মেরে মন কি বাত্ বতাই হ্যায়
লাগতা হ্যায় ইস ইস্কুলকা এডুকেশন হাই হ্যায়।
প্রসন্ন হো কর ম্যায়নে উসে ইসপ্রকার সমঝায়া—
বেটা
বাক্যকে বাদ হাম পূর্ণ বিরাম লাগাতেঁ হেঁ
হামারে জীবন মে শব্দ তো অনেক আতেঁ যাতেঁ হ্যায়...

শব্দের মতো প্রেমিকারা

জ্ঞানভারতী বিদ্যাপীঠে হিন্দি পড়াচ্ছিলুম;
ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের বোঝাতে হবে—বিশেষ্য কি।
আসলে বছরের শেষ দিন ছিল ওটা
বিশেষ্যর সংজ্ঞা, বিরাম চিহ্নের হাবিজাবি—এইসব।
উদাহরণ দিতে দিতে এসে গেল সেই শব্দ—"প্রেমিকা"।
যেই না শব্দটা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে ঘুরে তাকিয়েছি,
উঠে দাঁড়াল এক সর্দারের পো—
"আগে প্রেমিকার শেষে দাঁড়ি মারুন স্যার।"
চমকে বলি, "ক্যান্ রে ব্যাটা ক্যান্?"
"প্রেমিকা জাতি বাচক বিশেষ্য কিনা, দাঁড়ি না মারলে
তারা ভাববে গুষ্টিসুদ্ধু তাদের সক্কলকেই
আপনি চাচ্চেন।"
শুনে তো বাক্যিহারা আমি।
আমি পড়লুম এডুকেশন সাইকোলজি, আর
এ সর্দারের পো কিনা, আমারই সাইকোলজি পড়ছে?
(আহা-হা, ব্যাটা আমার মনের কথাই বলেছে রে!!
মনে হচ্ছে এ ইস্কুলের শিক্ষাদীক্ষা বেশ ভালোই।)
খুশি হয়ে বলি, ব্যাটা, এও বুঝিসনে
বাক্য শেষ হলে তবেই না দাঁড়ি।
শব্দ তো কত যায় আসে, এক 'প্রেমিকা'য় কি,...."

ডট্ কমে রবিবাবু

বিমান চট্টোপাধ্যায়

[*ক্রিং—ক্রিং—।*
রোমা রোঁলা বললেন—ববিবাবু ধরুন তো? মনে হচ্ছে মর্ত্যের এস. টি. ডি কল।
—হ্যালো?]

—হ্যালো-হ্যালো-রবিবাবু, গ্যালাক্সি ডিস্ক?
—ইয়েস। এখানে ফোন—এতবড় বিস্ক।
—দেখেছেন মিডিযাতে মাথাহীন আপনি?
—আমি কই? সে তো সাধু—পরে আছে কোপ্‌নি?
—ডট্ কমে লুটে গেছে আপনাব লংকোট।
—'কপি-মেল'? জানি তা-তো আইনের বং ভোট।
—দূর ছাই! ওটুকু তো আধা-লুট—হাফ কোট?
—'ফুল' তবে কোনটুকু? বলো, হই একজোট।
—মহাব্যোমে কোন জোট? সব কবি কোন পার্টি?
—পরে শুনো, হায় এবে, বাকি 'হাফ' হল মাটি।
—সে 'হাফ' ছুবিতে শুয়ে—সুর তার 'ওটি সং'।
—সুরে ছুরি—একি শুনি। এরপরে 'দাহ-সং'?

[*প্যারালাল লাইনে রোঁলা সব শুনেছেন। বিসিভাব ছাড়তেই গেয়ে উঠলেন—*]

টেগোর সঙ্গে ফুটবে যে রূপ
কস্‌মেটিকের সারজ্রাবিতে
ব্যাঞ্জো তাসা নাচবে ধু-ধুপ্
বক্ত সুবের জার্‌দারিতে।

রূপের আগুন ছুটবে গানে
অশ্রু মোছার আসবে ধুম্
প্রমাণ হবে, সেই সে তানে
এবাব সঠিক আসছে ঘুম।

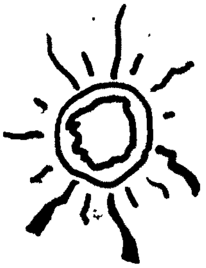

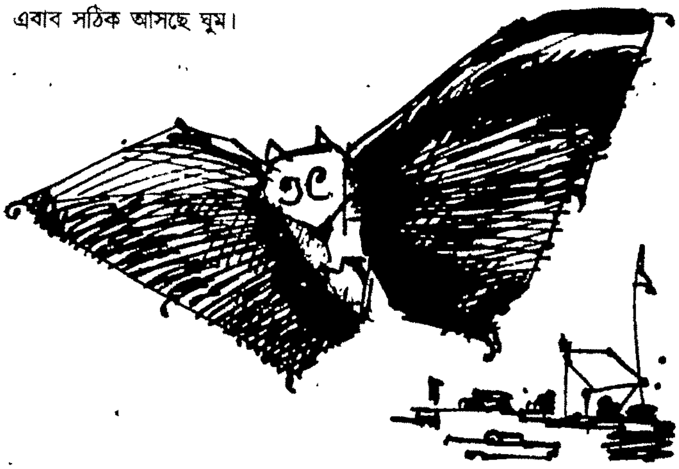

ভাঁড়ু দত্তের বেসাতি

সরল মুখোপাধ্যায়

আলোর দুপুর এসপ্ল্যানেডে
আফ্রিকারই জঙ্গল
ক্যাঁচম্যাচানি হাঁচোড়-পাঁচোড়
বেহেড ভিড় আর দঙ্গল।
কালো কালো ওগুলো কী
আলখাল্লা ঢাকা?
শকুন? নাকি বাদুড়? নাকি
ভ্যাম্পায়াবেব পাখা?
রক্ত শোষে, খামচে ধরে,
খুবলিয়ে খায় মাস
ছিবড়ে সত্ত্ব বেরিয়ে আসে
নির্বিকল্প লাশ !
বন্ধ দু'চোখ, ঝিমোয় কে ঐ
দাঁড়িপাল্লা হাতে?
ভাঁড়ু দত্তের যেমন খুশি
বেসাতি মাঝরাতে
ধন্ধ ধাঁধা ধূর্ত ধোঁয়ায
ধর্ম কোথায় বয়?

স্তম্ভে তোমার ঘুণ ধরেছে
সূর্যে অবক্ষয়।

চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ

ব্যাংক ডাকাতির 'অমিত'-পাঠ

প্রথম প্রথম বেশ কযেকটা ছবিতে 'ফ্লপ' খেয়ে যাওযার পর 'বিজয' নাম নিয়ে লম্বুজি অভিতাভ বচ্চন 'দীওয়ার' ছবিতে অ্যান্টি হিরো, মাফিয়ার ভূমিকায় নেমে পরিচালক প্রকাশ মেহেরার তো বটেই, ভাই পুলিশ অফিসাবের রোল কবা শশী কাপুব আর আম জনতাব পিলে চমকে দিয়েছিলেন। সুতরাং অমিতজিব মনে হযেছিল আর যাই হোক না কেন বিজয় নামটা তাঁর বলিউডি সৌভাগ্য নিয়ে আসার পক্ষে একমাত্র ব্যাঙেব আধুলি। তাই 'অগ্নিপথ' ছবিতে মুম্বইয়ের ডন হাজি মস্তানের নকল হিসেবে তিনি বিজয় দীননাথ চৌহান হযেছেন। 'শাহন্‌শাহ' ছবিতেও পুলিশ অফিসার বিজয হয়ে বদমাযেস অমরীশ পুরীব হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছেন। 'আক্‌স্‌' ছবিতে ঠাণ্ডা মাথার হাসিমুখো খুনি রাঘবন, অর্থাৎ মনোজ বাজপেয়ীব ভূত, ঘাড় থেকে নামতে না নামতেই বিগ বি এবাব 'কড়োবপতি' বানানোর চেয়ার ছেড়ে স্বমহিমায় আবার 'বিজয়' নাম নিয়ে রুপোলি পর্দায অবতীর্ণ হয়েছেন। বিপুল অমৃতলাল শাহের ছবি 'আঁখে'-তে তিনি বিলাস রাও জেফাবসন ব্যাংকের অন্যতম চাঁই বিজয সিং রাজপুত। সামান্য কারণে মাথা গবম কবে ফেলার জন্য ব্যাংক তাঁকে সামনের দরজা দেখিয়ে দিযেছে। তাই বদলা নিতে এই ছবিতে ব্যাংক লুঠ করে নিজেব পূর্বপুরুষদেব পিণ্ডি দিতে চান অমিতাভ।

অবশ্য, ব্যাংকেব চেয়ারে থাকাকালীন বিজয় সিং রাজপুত যে মেজাজ দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁকে দুর্বাসা মুনিব হাই ব্লাড প্রেসার ওয়ালা মেজাজের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা চলে। ১০০ টাকা নিজের পকেটে ঢোকানোর জন্য ব্যাংকের ক্যাশিযারকে অমিতজি এই বুড়ো বয়সে শুধু কাউন্টার থেকে তুলেই ছুঁড়ে ফেলেন নি, তাকে পাগলা কুকুবের মতো ধাওয়া কবে বাজারের মধ্যে নিযে গিয়ে আচ্ছাসে উত্তম মাধ্যম দিযেছেন। কথা বলার সময ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ডেব মোবাইল ফোন বাজা মাত্রই ঘাড়টি ধরে তাকে ব্যাংকের চৌহদ্দির বাইরে বের করে দিযেছেন বিজয়জি। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, বিমল জালান এরকম একজন বিজয় সিং রাজপুত এব চণ্ডাল মার্কা বাগকে পেলে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছাখোলা অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারত। দুর্বাসার মতো লম্বা, সাদা দাড়ি না থাকলেও অমিতাজির সাদা ফ্রেঞ্চকাট তো আছে। কন্বমুণির আশ্রমে শকুন্তলাকে অমিতাভ-দুর্বাসা পাননি। তার জায়গায় অন্ধ বাচ্চাদের ট্রেনার, নেহা শ্রীবাস্তব অর্থাৎ সুস্মিতা সেনকে পেযে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর ওপরই ঝাল ঝেড়েছেন বিগ বি।

ব্যাংকেব হাতে হ্যারিকেন ধরিযে দেওয়াব বাসনাতে সুস্মিতাকেই ট্রেনার হিসেবে রেখেছেন বিজয সিং। নেহা যাতে পালাতে না পাবে সেজন্য তার ছোট ভাইকে আটকে বেখেছেন তিনি। এ ব্যাপারে জম্মু কাশ্মীবের কট্টর পাক জঙ্গি অপহরণকারীদেব কান ধবে কিছু শিখিয়ে দিতে পারেন অমিতাভ। বিজয সিং রাজপুতের ধমক খেয়ে আর ভাইযেব জন্য যথেষ্ট ভেউ ভেউ করে কাঁদতে চেষ্টা করেছেন সুস্মিতা। ক্রন্দনদৃশ্য তো ঠিকমতো হযই নি উল্টে মনে হয়েছে 'স্যাশ্‌' কে এইমাত্র নিমপাতার রসের সঙ্গে খালাসিটেলোর চুল্লু একগেলাস মিশিয়ে খাওযানো হল। তবে হ্যাঁ, ব্যাংকের পকেট ফর্সা করে দেওয়ার জন্য অমিতজি যেভাবে সুস্মিতাকে দিয়ে তিনজন অন্ধকে ট্রেনিং দিয়েছেন তাতে মনে হয় চোর-ডাকাতদের অত্যাধুনিক কোচিং-এর ক্র্যাশ কোর্স আবম্ভ করে তিনি অনাযাসেই তাঁর বাকি থাকা আযকর মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। আইনকে 'অন্ধা' বানানোর জন্য অমিতজি তিন অন্ধ 'ডাকাত' হলেন—স্টেশনে গান গাওয়া ভিখাবি ইলিয়াস ওরফে পরেশ রাওয়াল, পিস্তল হাতে নিযে প্যান্ট প্রায় ভিজিয়ে ফেলা 'গুডবয়' অর্জুন অর্থাৎ অর্জুন রামপাল এবং অবশ্যই বিশ্বাস, অর্থাৎ বলিউডের বিশ্বাসযোগ্য. অক্ষয হি ম্যান অক্ষয কুমার। বাস উল্টে কানা হয়ে যাওযাব আগে অবশ্য অক্ষয়, পাহাড়ে উঠতে উঠতে আব জলের মধ্যে বিপাশা বসুব সঙ্গে একটু আধটু চটকা করেছেন। তার পরেই অবশ্য বাসেব সঙ্গে বিপাশাও অক্ষয়কে অনাথ কবে গঙ্গাযাত্রা কবেছেন। তবে, প্রেমিকাকে হাবিয়ে অক্ষয়ের যষ্ঠ ইন্দ্রিয় বেশ ধারালো হযে উঠেছে। গুলির এক টিপে সুস্মিতাব গড়িয়ে দেওযা গোরুর গাড়িব চাকার মধ্যে বাধা মদের বোতলকে তিনি ফাটিয়ে দিতে পেরেছেন। অমিতজিকে আন্দাজের ওপর নিরিখ করে ফুটবল ছুঁড়ে মেরেছেন। অবশ্য ষাটের কোঠার অমিতাভ যে এত তাড়াতাড়ি মাথা সরিযে নেবেন সেটা ভাবতে পারেননি অক্ষয়। এদিকে ডাকাতির তালিম দিতে গিযে অর্জুনের প্রতি একটু ইয়েও হযে গেছে সুস্মিতাব। কিন্তু দু'জনেরই "বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না। প্রেমের কথা বলি কারে।" হতেই হবে। রাজকুমাবী ডায়ানা তাঁব ঘোড়ায় চড়ানোর টিচাবের বিপরীতে মজেছিলেন, শহরের মাল্টিজিমগুলোতে চর্বিব থাক কমাতে আসা সতীলক্ষ্মী বৌদিরা তাঁদেব ছোকরা ট্রেনারদের সঙ্গে লটবপটর কবছেন। সুস্মিতা আব অর্জুন তো কোন ছার।

মহাভারতের অজ্ঞাতবাসে বিবাট বাজার মেযেকে নাচ শেখানোর (এবং লাইন মারার জন্য) জন্য গাণ্ডীবী অর্জুন বৃহন্নলার বেশ ধরেছিলেন। আঁখের অর্জুনও মহিলার বেশে বোরখা পবে ব্যাংক লুঠতেএসেছেন। ডাকাতি হওযার সময অমিতজি তাঁব তিন স্টুডেন্টকে ঠেকাতে যেবকম সচ্চরিত্র প্রাক্তন ব্যাংককর্মীর ভূমিকা পালন কবেছেন তাতে চার্লস শোভবাজ, হর্ষদ মেহেতা আর বোফর্স খ্যাত ওত্তাভো কোয়াত্রচিব মতো ধাপ্পাবাজরাও বিগ বি-র শ্রীচরণেব ধুলো জিবে ঠেকাবেন। অবশ্য হাওয়ালা মামলায় এক্স প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-ও ফেঁসেছিলেন। বিজয় সিংও ধবা পড়েছেন পুলিশ কমিশনাব ঠাকুর, অর্থাৎ আদিত্য পাঞ্চালীব হাতে। চেঁচামেচি কবেও লাভ হয়নি কিছু। ব্যাংক লুঠের মাল কিন্তু অক্ষয় অর্জুন পেযেছেন, বিজযজিব হাতে টেঁসে যাওয়া ইলিয়াসের হারমোনিয়াম থেকেই।

—কেশোরাম সিনেমাওয়ালা

ভোলা ভবপারে

দিব্যেন্দু দাস

ভবেন মণ্ডল, মানে ভোলা, আমার চারা বেলার বন্ধু। তবে আমার থেকে ওর আগে পাতা গজায়। তাই ওর বিয়ে আগে হয়। দেখেশুনে, না, না দেখেশুনে? না দেখেশুনে। অন্ধের বিয়ে। ভালোবাসায় অন্ধ। লাভ্ ম্যারেজ মানেই তাই। ঘ্যাঁট খাওয়া চোখে হঠাৎ ঘটি কোমর, চটি ঠোঁট দেখে চোখের বারোটা বেজে যাবে। তারপর সিকি-আধুলি ছোঁয়াছুঁয়ি। তোমার রুমালে ওর হাত মোছা। পুজোয় একটা সালোয়ার দেওয়া। বিনিময়ে দশমীর দিন একশো চিনে বাদাম পাওয়া। ভাইপোর খাতা ঝেড়ে দু'চারটে চিঠি লেখা। রাতে কলঘরে চানের স্বপ্ন দেখা। গামছা দিয়ে কী রগড়ানি। খাট থেকে পড়ে পাঁট ব্যথা হওয়া। শেষের দিকে স্যাকরার দোকানে সিগারেট কিনতে যাওয়া। কন্ডাকটরকে রেলের মান্থলি দেখিয়ে নেমে পড়া। হাজরা মোড়ে ক্যালানি খাওয়া। ভালোবাসার আর এক নাম ভোলা। হঠাৎ করেই বিয়ে করবে। আত্মীয়-স্বজন বাবার। আমার শুধু পাড়ার ক'জন। একটা গুদাম ভাড়া করা হয়েছে। গুদাম কেন? ভোলার ব্যাখ্যা— বাঘ বনে শোভা পায়, গেস্ট গুদামে। হাফ ভাড়া। ডেকরেটারের ছেলেরা খাবার দেওয়ার আগে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খাওয়াবে।

লোক খাওয়ানো হল। লোক কেটে পড়ল। গুদাম থেকে মাল কেটেই যায়, চলে যায় না। পড়ে রইলাম শুধু আমি। ভোলার সেই চারা বেলার বন্ধু। ফুলসজ্জায় ভোলা, চটসজ্জায় আমি। ভোলা নিজের খাটটা এনে দু'দিন আগেই একটা ঘরে পেতে রেখেছিল। সেটাকে সাজিয়েই ফুলসজ্জা। আমার বেলা ডেকরেটার বলল, গুদামে বিছানা পাতবে না। অগত্যা চট পাততে হল আমাকে। আমার ভাগ্যটা বরাবরই এরকম। পোল্ট্রির মধ্যে ঢুকলে যেমন চর্তুদিকে মুরগি, আমার তেমনি দুর্ভাগ্য। চারদিকে চরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্য ফেরাতে অনেক কিছু করেছি। শেষে যে জ্যোতিষী আমার হাত দেখেছিলেন তিনি বললেন, স্টোনে হবে না আপনার, স্টোনচিপ্ ধারণ করুন। ঢালাইয়ের কপাল। এক তান্ত্রিককে দেখিয়েছিলাম। আমাকে উদ্ধার করার আগে নিজেই আস্ত্রিকে চলে গেল। আমার মন ভেঙে গেল। যাকে ভালোবেসে ছিলাম সেও চলে গেল। বলল, বাঁশের পরিচয় মাচায়, পুরুষের পরিচয় পাছায়। পাছায় কেন? বলল, বিত্তের গ্যারাজ পাছা। তোমার আগে যত জনের সঙ্গে ঘুরেছি, সবাই ওখান থেকেই বের করেছে। সবাই ওখানেই ঢুকিয়ে রেখেছে। তোমার মতো চশমার খাপে গোটাকতক সিকি নিয়ে কাউকে বেরুতে দেখিনি। উবে যাও। আমার সময় নেই।

ভোলার বিয়েতে আমি চটের উপর শুয়ে গুদামের ইঁদুর দেখেছি। হঠাৎ চরিত্রের চালে আগুন ধরে গেল। দৌড়ে গেলাম ভোলার ঘরের দিকে। দরজায় কান পাতলাম। রোমাঞ্চ সিরিজের আগে গল্পদাদুর আসর হচ্ছে।

ভোলা : ভাবতে কেমন অবাক লাগে। আজ সকালেও আমার জগৎটা কত বড় ছিল। বাবা-মা-পিসি-প্রতিবেশী-মনার চা-লকার সিগারেট আর এবেলা? জগৎটা এইটুকু। শুধু তুমি—আমার তুমি।

বৌ : বেডরুম থেকে বাথরুম হবে গেলে। জানো তো, বাথরুমে মানুষ একাই থাকে। হয়ত আমাকে ভুলে যাবে একদিন।

ভোলা : কী বলছ। এ তোমার ভ্রান্ত বিশ্বাস। এ অসত্য। আমি বাথরুমেও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকব। তুমি দেখো। অ্যাই বুকে এসো না।

বৌ : সত্য আর বিশ্বাসের মধ্যে তফাৎ কি? আগে বলো, তারপর বুকে যাব।

ভোলা : খুব ভালো প্রশ্ন। যদি আমি বলি ভবতারিণী মণ্ডল আমার মা, সেটা একটা সত্য। আর যদি বলি ভবতারিণী মণ্ডল তোমারও মা, তখন সেটা একটা বিশ্বাস। এক্ষেত্রে আর একটা তফাৎ শোনো। সত্যের থেকে বিশ্বাসটা গোলমেলে। যেমন কাজের মাসি। দু'বেলা দেখছ কিন্তু ওবেলা আসবে কিনা জানো না। এবেলা কোপ্তা-কালিয়া ওবেলা জল-ত্রিফলা। অ্যাই, আমার বুকে কান পেতে শোনো। কামদেব ড্রাম বাজাচ্ছে।

বৌ : আসছি। তবে আগে থেকে একটা কথা বলে রাখি। তোমার বাপ-মাব সাথে কিন্তু থাকতে পারব না। আমরা আলাদা থাকব।

ভোলা : ওরা বড্ড ভালো গো। ঘর করলেই বুঝতে পাববে। সব শ্বশুব-শাশুড়ি সমান হয় না। মাটির দুটো ঢেলা—

বৌ : 'রঙ্'। শ্বশুর-শাশুড়ি হল বসন্তের দাগ। মেলাবে না। উই লাগলে উই যাবে। ঘুন লাগলে ঘুন যাবে। কিন্তু ওদুটো যাবে না। শাশুড়ি স্বালের উনুন। আঁচ পড়ে গেলেও গরম থাকবে। শ্বশুর হল দুধ ছাড়া লিকার চা। দরজা খুলে রেখে চান করবে। ডিং ডং বেল। হুলো ইন দ্য ওয়েল।

ভোলা . না না, এ সত্য নয়। এ এক মারাত্মক বিশ্বাস। ওঃ, সংসার সম্পর্কে কত কি জানো তুমি। আচ্ছা বলো তো, আমার বুড়ি পিসিমা আছে। আমাদেব সঙ্গে থাকে। ওঁর সম্পর্কে তোমাব কী মত?

বৌ : নারদও হতে পারে, জটায়ুও হতে পারে। সেটা কদিন গেলে বোঝা যাবে। তবে চান্স পেলেই ঠেলে ফেলে শেষ করে দাও। আগাছা উপড়ে ফ্যালো। ক্লিন ক্যালকাটা।

ভোলা : যা বলেছ। আগাছা বটে। আমাদের ফ্যামিলিতে আর একটা আগাছা ছিল—আমার দাদা। লুকিয়ে বিয়ে করতে গেল। বিয়ের রাতেই উপড়ে গেল। নতুন বৌ ব্রহ্মতালুতে আদ্দেক কাজললতা পুঁতে দিয়ে সব সোনা নিয়ে জানলা দিয়ে সবে পড়ল। হত্যা না আত্মহত্যা—তাই ঠিক করে উঠতে পারল না পুলিশ। তোমার কি মনে হয সোনা?

বৌ : হত্যা—নির্মম হত্যা। এই দ্যাখো দাগ। জানলা টপকানোর সময় ছিটকিনির কোনা লেগে গিয়ে কতটা ছড়ে গিয়েছিল। তোমাব বুকটা এবার বাড়াও।

আমি দরজাব বাইবে বসে বিশ্বরূপ দেখলাম। এক কোটি সূর্য একটা ম্যাটাডরে চেপে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে পিকনিকে গেল। লঙ্জাম্প্, থ্রো বল, হার্ডলস্, ফ্রি স্টাইল, ম্যারাথন—সব একসাথে করে বাড়ি চলে এলাম। ভোলা ভবপাবে।

ট্যারা চোখে

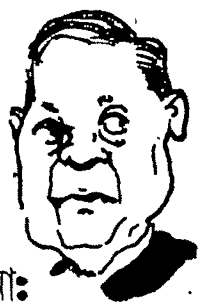

মিষ্টান্নম্ ইতরে জনাঃ

শারিকি বিবাদ বা বিশেষ করে ভাইয়ে ভাইয়ে বা মা-ছেলেতে ঝগড়া থাকলে, এমনকি মুখ দেখাদেখিও বন্ধ থাকলে, অনেক সময় সেই বাড়িতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে দেখা যায় সেই বিবাদ মিটে বেশ মিলমিশ হয়ে যায়। আমাদের চোখের সামনে, মনে হচ্ছে সেইরকমই, একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে। মমতাময়ী মমতাদি এবং রামকৃষ্ণরূপী অজিতদার ঝগড়া আমাদের দৃষ্টিতে যেন দুই ভাইবোনের ঝগড়া রূপেই প্রতিভাত হয। কিন্তু সেই ঝগড়াও সম্ভবত মিটতে পাবে। মাঝখান থেকে গুজরাটেব অনেকগুলো মানুষকে প্রাণ দিতে হল। আর তাব ধাক্কায় বাজপেয়ী সরকারের টালমাটাল অবস্থা। আর তাই দেখে একদিকে মমতাদি, আর অন্যদিকে অজিতদা 'ওবে দাদারে, ওরে বোনরে' বলে বাজপেয়ীর টালমাটাল নৌকার দুটো দিক ধরে সামাল দিতে ছুটেছেন। চারিদিকে সামাল সামাল রব উঠছে। হা চন্দ্রবাবু, হা মায়াবতী; হা অজিত সিং। এমনকি দুই সদস্যের নেতা রামবিলাস পাসোযান পর্যন্ত এখন গুরুত্বপূর্ণ। হাল ধরেছেন বাজপেয়ী, আর সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ ভুলে সব শরিকে এক হয়ে ঝপাঝপ্ একসাথে দাঁড় বেয়ে এই ঝড়-তুফান পার হয়ে যেতে চাইছেন। চন্দ্রবাবু দোনামোনায় থাকলেও সবশুদ্ধ ডুবতে আর কে চায? যদিও ঢেউয়ের ধাক্কায় রামবিলাস ঝাঁপ দিলেন না ডুবলেন, বোঝা গেল না। তবে কাজের কাজ করলেন মমতাদি। আমরা যেমন অনেক সময় অনেক কিছুই আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে করে থাকি, বিরোধিতা গ্রাহ্য হবে না জেনেও তখন নিয়মমাফিক প্রতিবাদ পেশ করে গ্রহণ করে নিই যেমন রেলের বা বাসের ভাড়া-বৃদ্ধি বা বিদ্যুৎতের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেইরকমই মমতাদি গুজরাটে নরেন্দ্র মোদীর অপসারণের প্রস্তাব সহ বাজপেয়ী সরকারের প্রতি আস্থা প্রকাশ কবলেন।

> **এতগুলো আনন্দ সংবাদে যেন শুকনো লাড্ডু বিলি না করে অন্তত্পক্ষে রসগোল্লা বিলানো হয়, কারণ আমরা ইতরজন, মিষ্টান্ন না পাই, রসটা পেলেও খুশি।**

সাপ মরুক বা না মরুক, লাঠিটা তো ভাঙলই না, বরং এক ঢিলে দুটো পাখি মরল। বাজপেয়ী অটল রইলেন এবং মমতাদির মন্ত্রীত্বের সম্ভবনাও আরো উজ্জ্বল হল। সেই সুবাদে অজিতদার সঙ্গে সম্পর্কটা ঝালানো হয়ে গেলেও যেতে পারে। আর সেই সঙ্গে এটাও জানানো দরকার যে এতগুলো আনন্দ সংবাদে যেন শুকনো লাড্ডু বিলি না করে অন্তত্পক্ষে রসগোল্লা বিলানো হয়, কারণ আমরা ইতরজন, মিষ্টান্ন না পাই, রসটা পেলেও খুশি।

—অঞ্জনা দত্ত

কোথায় পাব তারে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

অফিস থেকে ফেরার পথে রোজ সেই একই দৃশ্য ! ভাল্লাগে না। ভাঙা টিউবওয়েলের লাগোয়া, সিমেন্টের কানাউঁচু চাতালে বসে দুটি ছায়ামূর্তি। রাস্তার আলো কে বা কারা কবেই ভেঙে পাট করে দিয়েছে। নিঃসীম অন্ধকার। বেশ খানিকটা জায়গা অন্ধকার, তারপর ফ্ল্যাটবাড়ির আলো। প্রচণ্ড ঝড়ে যেমন হয়, দুটো মাথা এক হয়ে যাচ্ছে--আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। চট্ করে দেখলে ভয় করে। ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার মনে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়,—কাঁচা বয়সের দুটি ছেলেমেয়ে। পাশের বস্তিতে থাকে । এদিকটায় লোকজনের যাতায়াত কম বলে অন্ধকারের সুযোগে চাতালে বসে, থেকে থেকে জড়িয়ে ধরছে, আর চকাস্ চকাস্ করে চুমু খাচ্ছে। দেখে মনে হবে এ দেখাই শেষ দেখা—-একটু পরেই বোধহয় ট্রেন ধরতে হবে।

ভাবী অপরাধী মনে হয় নিজেকে! খুব সাবধানে পা বাঁচিয়ে, গলা খাকারি দিতে দিতেপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাই । অনেকটা বীরাপ্পনের জঙ্গলে তার সাথে দেখা করতে হলে যেভাবে যেতে হয়, সে ভাবেই যাই। ছেলেটাকে চিনি। একটু বদ টাইপের। যদি রেগে যায় সেই ভয়ে, পারলে চোখে রুমাল বেঁধে যাওয়ার মতো ভাব দেখিয়ে ক্রশ করতে হয়। যেন জিজ্ঞেস করলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—, কিছু দেখিনি ভাই!

বাড়িতে ঢুকতেই রমলার প্রশ্নবাণ শুরু হয়ে যায়।

—ছেলে-মেয়ে দুটোকে কিছু বলোনি তো? খবর্দার, লোকাল কমিটির কাছে গলির লাইটের জন্য কোনো তদ্বির করবে না। তোমার তো বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই। ওরা একটু প্রেম-ট্রেম করে। করুক। এ বয়সে এটাই স্বাভাবিক।

চুপ করে থাকি। ক্লান্ত লাগে, উপায় কি? কিন্তু রমলা এমন এক-একটা কথার মোচড় মারে যে উত্তর দিতেই হয়।

—কি হল? বাক্যিহারা হয়ে গেলে যে? কী করে এলে শুনি? উত্তর দিচ্ছ-না কেন?

—আঃ, একটু চুপ করবে? কিচ্ছু বলিনি ওদের। গলি অন্ধকার থাক, উচ্ছন্নে যাক, সব আমার অভ্যেস

হয়ে গেছে। তবে ঐ প্রেম-ট্রেম বোলো না। ইরিটেশন হয়। অত সোজা। ঐ কামড়া-কামড়ি পর্যন্ত ঠিক আছে। যেন কেঁদো বিড়াল। এর মধ্যে আবার প্রেম পেলে কোথায়?

—প্রেম আলবাৎ আছে। দুটিতে বিয়ে করবে শুনেছি।

—হাঃ! ইউ আর এ ফুল! যতক্ষণ শীত করে, ততক্ষণই আগুনে হাত সেঁকা যায়। যেই হাত গরম হয়ে গেল, অমনি আগুনের প্রয়োজন শেষ। আগুনে জল ঢেলে দাও। ওঁ শান্তি ...শান্তি......শান্তি!

—তুমি বললেই মেনে নেব? আমার মতামত নেই?

—একটু বেশি পরিমাণেই আছে। তবে, লতা-সুজয়ের এপিসোড এত সহজে ভুলে গেলে?

এ পাড়ারই একটি ঘটনা। সামনের বাড়ির দত্তবাবুর মেয়ে লতা। একটি মাত্র মেয়ে। দোতলায় ভাড়া থাকে। প্রায় সময়ই দেখতাম, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। নয় তো একবার ঘরে ঢুকছে, একবার বেরোচ্ছে—একটা অস্থির অস্থির ভাব! বছর কুড়ি বাইশ বয়স তখন। নজর রাখলাম। কারণ নিজেই বুঝতে পারলাম। মোড়ের মাথায় যে লাল বাড়িটা আছে, সেটার মালিক ছিলেন তখন সোমবাবু। ওঁর ছেলে সুজয় লাল রঙের মোটর বাইকে চেপে কারণে অকারণে গলি দিয়ে যাতায়াত করত। বুঝলাম ফুল ফুটি ফুটি করছে। প্রথম প্রথম লুকোচুরির কিশোর কুমার অনিতা গুহর স্টাইলে, শেষে জানাজানি।

সোমবাবু ক্রুদ্ধ হলেন। মেয়ের বাবা লোকাল কমিটিকে ইনভলব্ করল। হৈ হৈ কাণ্ড! একটা সমঝোতা হল। বিয়ে হয়ে গেল। সোমবাবু নিমরাজি হয়ে চাঁদ সদাগরের মতো মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে আশীর্বাদ করলেন।

সোমবাবুর স্ত্রী অনেক আগেই গত হয়েছিলেন। সংসারের ভার স্বাভাবিক ভাবেই বৌমার হাতে চলে এল। সোমবাবু পুত্রবধূকে মেনেও নিলেন। যখন সবকিছু একটা হ্যাপি এন্ডিং-এর দিকে এগোচ্ছে, তখনই একদিন জানা গেল, ছেলের স্পার্ম কাউন্টে গণ্ডগোল আছে। বৌমার সন্তান হবে না। ব্যস, প্রেমের ইতি। ফাটাফাটি কাণ্ড! লতা ক্রুদ্ধ হয়ে সবাইকে জানাল যে তার স্বামী নপুংসক। সুজয় রাতারাতি 'হিজড়ে' হয়ে গেল। ভুল ব্যাখ্যা মানুষের কাছে পৌঁছল। শুধু সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা না থাকায় প্রেম উধাও হল। স্বামী বন গয়া ভিলেন। ডির্ভোস হয়ে গেল।

সোমবাবু ভয়ংকর চুপ মেরে গেলেন। একদিন হঠাৎ হৃদস্পন্দন থেমে গেল—টা টা—এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। ছেলে বাড়ি বেচে নিরুদ্দেশ। প্রেমের হাল কে বোঝে শালা!

এখনো বারান্দায় দাঁড়ালে লতাকে কখনো সখনো দেখতে পাই। বয়স গুটি গুটি পায়ে শরীরে থাবা বসিয়েছে; চোখে চশমা। দত্তবাবু সেরিব্রাল অ্যাটাকে শয্যাশায়ী। মেয়ে হাট-বাজার সবই করছে। নিঃসঙ্গ, একাকী। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে ভুগতে দিন গুজরান। শেয়াল-শকুন ওঁৎ পেতে আছে। একবার বাগে পেলেই হয়।

যদি একটা অনাথ শিশুকে দত্তক নিত তবে জীবনটাই কত অন্যরকম হতে পারত—মনে মনে ভাবি। লতা কি ফেলে আসা জীবনের জন্য একবারও আফশোষ করে? জানি না।

রমলা যখন তর্কে হেরে যায়, তখনই ওর বহিঃপ্রকাশ হয় ছেলেকে ঠেঙিয়ে। ছেলের পিঠে দুম্ করে কিল পড়ল। ছেলে অবাক হয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। আমি আর কি করব? হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

রমলা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত অনেক হল। একটা হাত ছেলের গায়ে। আর রাগ নেই বোধহয়। শরীরী আবেদন এখনো তীব্র। এখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আগ্নেয়গিরি নিবে যাওয়ার আগের অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় যতই অ্যাটাকিং মনে হোক, আজও ঘুমন্ত রমলা সমান মোহময়ী। চুম্বকের মতো টানছে। যদিও জানি, গায়ে হাত দিলেই খ্যাঁক করে উঠবে। আমি যেন লোহার কুচি;—সংযম-অসংযম, সময়-অসময়, রাগ-বিতৃষ্ণা সব বোধ যেন লোহার কুচির মতো চুম্বকের পাশে অমোঘ আকর্ষণে জমা হতে, মিশে যেতে চাইছে।

সংসারে লোহার কুচিই বেশি, নিখাদ স্টিল বড় কম!

আমি কি রমলাকে ভালোবাসি? না ওর শরীরটাকে? জানি না, বুঝি না। দিনের পর দিন শরীরটা আবিষ্কার করেছি নানাভাবে, কিন্তু মন জানতে চাইনি, বুঝতে চাইনি। শরীর বাদ দিয়ে মনের গভীরে ডুব দিতে পারলাম কই? সবার মতোই পাঁক মাখছি। রাজহাঁস হতে পারলাম না!

আজ যদি সে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হত, তবে কি 'শাম্ব' হতে পারতাম আমি? অসীম যত্নে ভালোবাসায় তার শরীর-মনের ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারতাম?

নাহ্ . বোধহয় পারতাম না। রমলা মাইনাস শরীর ইক্যুয়াল টু নাথিং বাট্ শরীরী মোহভঙ্গ! আমার উপলব্ধি।

পরস্পরের শ্রদ্ধা না থাকলে ভালোবাসার ফাউণ্ডেশনটাই তৈরি হয় না। শ্রদ্ধা থাকলেই শরীরী চাহিদা কর্পূরের মতো উবে যায়। সৌন্দর্য গৌণ হয়ে যায়। স্থূলতা নির্মেদ হয়ে যায়। ভালোবাসার সূতিকাগৃহে প্রেম জন্ম নেয়। ভালোবাসার তেলে প্রেমের শাশ্বত প্রদীপ জ্বলে ওঠে। শরীর পুড়ে ভালোবাসার আলো জ্বেলে দেয়।

নারী-পুরুষের পরস্পরকে পাবার আকুলতা, হৃদয়ের মধ্য থেকে কান্না হয়ে চোখ বেয়ে নেমে আসে। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন মর্ত্যে।

অধরাকে ধরা যায় না। প্রকৃত প্রেম মরীচিকার মতো দূরে সরে সরে যায়। সেই—কোথায় পাব তারে! নারী-পুরুষ ছুটতেই থাকে, ছুটতেই থাকে। চোর-পুলিশ খেলা। একজন আর একজনকে তাড়া করছে। কিছুতেই ধরতে পারছে না। ধরতে পারলেই তো শরীরের জয়...। পাশবিক উল্লাসে পেড়ে ফেলবে মাটিতে। আর না পারলে কান্না-হাহাকার-ব্যাকুলতা। প্রেমের জয়। প্রেমে খালি দু'হাত ভরে দিয়ে যেতে হবে। যে যেটা চায়। নিরানব্বই ভাগ জিততে চায়, এক ভাগ ব্যতিক্রমী থাকতে চায়—হার মেনেও তারা জেতে।

শরীরের ছায়া থেকে বেরিয়ে মনের আলোয় ঢুকে পড়তে পারলে কেল্লা ফতে! আর নিভবে না। সবচেয়ে ধনী ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাওয়া—লাখে এক-আধটা পাওয়া যায়। যদি বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, তাই অপেক্ষা..... অনন্ত অপেক্ষা।

কবির আক্ষেপ গায়কের কণ্ঠে হাহাকার তোলে—

"একখানা মেঘ ভেসে এল আকাশে,
একঝাঁক বুনো হাঁস পথ হারালো,
একা একা বসে আছি জানালা পাশে,
সে কি আসে, যারে আমি বেসেছি ভালো... "

এই অপেক্ষায় থাকাই বোধহয় ভালোবাসা। হা ঈশ্বর, ... এই উপলব্ধি নিয়ে বাঁচব কেমন করে? পার্থিব থেকে অপার্থিবে যাবার সিঁড়ি কই?

রাত অনেক হল। ধীরে ধীরে ঘুমন্ত রমলার পাশে এসে দাঁড়াই। হয়ত ওর কোনো দোষই নেই। আসলে যে যেভাবে পৃথিবীকে দেখতে চায়। এই ভাবেই চলুক! জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে চালিয়ে নেব। নিতেই হবে। অপেক্ষায় থাকব শরীরের আগুন নিভে যাওয়ার।

শরীরের আগুনের ছাই থেকে মন পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো ডানা মেলবে, এই আশা নিয়ে রমলার পাশে শুয়ে পড়ি। ঘুমন্ত রমলা আমার দিকে পাশ ফেরে। একটা হাত বুকের উপর তুলে দেয়। টের পাই না কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

স্বপ্নে দেখলাম, শুভ্রবসনা এক নারীমূর্তি আমায় ডাকছে। ওড়নায় ঢাকা মুখ। চিনতে পারছি না। তবে, আমার তো বেড়াল প্রবৃত্তি! মাছ দেখলেই নোলা সক্‌সক্ করে। যাব কিনা ভাবছি। বললাম—কে তুমি? নারীমূর্তি হাসছে, ঝরনার মতো। বলল—বাহ্ .. আমাকেই তো চাইছিলে? আসবে না?

উত্তর দিই—হ্যাঁ যাব, কিন্তু....

নারীমূর্তি এক ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আমি তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। খালি খিলখিল করে তার হাসির শব্দ শুনছি। একসময় তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—এই তো, আমি তোমার কাছে, আমায় খোঁজো। খুঁজলেই আমি তোমার।

ধীরে ধীরে তার কণ্ঠস্বর যেন বহু দূরে মিলিয়ে গেল। আমি শত চেষ্টাতেও ধোঁয়ার চক্রব্যূহে ঢোকার রাস্তা খুঁজে পেলাম না।

সংস্কৃতি দুঃসংবাদ

এক সন্ধ্যায় সদলবলে

রেডিও-টিভিতে খুন রাজনীতিব খবব পড়ে অতটা বেশি নামডাক হাঁকানো যাচ্ছে না বোধহয়। অবোধ সংঘ বা মাঝেবপাড়া যুবক বৃন্দের প্রোগামে ঘোষণা করার জন্য মধুমন্তী রায়া ভট্টাচার্যরাই থাকুক, ওতেও ভালো রেস্তো আর নাম কামানো যায না। সুতরাং. ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায ঠিকই করে রেখেছেন—এবাব থেকে তাঁর একমাত্র ব্রতটি হবে আবৃত্তি করে সবাইকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নিদেনপক্ষে জীবনানন্দ বা জয গোস্বামীর ভাবের কাছকাছি পৌছে দেওযা। এইচ এম ভি, সা বে গা মা এবং আবৃত্তি পরিষদেব যুগলবন্দীব কল্যাণে ব্রততী আবাব প্রমাণ কবতে পেরেছেন—তিনিই সেই মেযে যিনি আবৃত্তির ক্যাসেট্ বেব কবাতে কোযার্টাব সেঞ্চুবি করতে পাবেন। ববীন্দ্রসদনে তাঁর ২৫তম আবৃত্তিব ডাবল প্যাক ক্যাসেট 'এক সন্ধ্যায় একা ব্রততী' বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রকাশ কবতে সদলবলে হাজির ছিলেন বর্তমানে কলকাতাব হোটেলের অশোককাননে নির্বাসিতা সীতাব জীবন কাটানো তসলিমা নাসবিন, সঙ্গীতেব কল্যাণ সেন বরাট এবং হেযাব উইভিং করে টাকে চুল গজানো ঘোষক সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রততীব আবৃত্তি শোনার জন্য আসাব কথা ছিল সুভাষ চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণ ঘোষ আর রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের। কাবোর টিকিই অবশ্য দেখা যাযনি।

সতীনাথবাবু না বলে পাবলেন না—মঞ্চের মধ্যমণি হযে, মঞ্চ আলো করে বসে আছেন তসলিমা নাসরিন। কত ভোল্টেব নারীবাদী আলো তসলিমা ববীন্দ্রসদনকেএবং অনির্দিষ্টকালেব জন্য কলকাতাকে সাপ্লাই দিতে চান সেটা অবশ্য জানা যাযনি। সতীনাথবাবু আবো বললেন, নাসবিন—এই পদবীটা শুনলেই নাকি তাঁর কানের কাছে 'ঝিনরিন' করে সুর বাজতে থাকে। এবার থেকে সুব শোনার জন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রেব প্রয়োজন নাও পড়তে পারে। কবিতা বাদিকা তসলিমা দীর্ঘজীবী হোন। তসলিমা সংবাদ মাধ্যমের বিশেষ পেয়াবেব লোক। তাঁবা তাঁকে এতটা না তুললে তাঁর জনপ্রিযতা আবো স্নিম হয়ে যেতে পাবত। সুতবাং ব্যালকনি থেকে আওযাজ খাওয়া সত্বেও ব্রততীকে সঙ্গে নিয়ে ডাবল প্যাক অ্যালবামে লাল ফিতে কেটে প্রকাশ কবাব সময়ে মঞ্চেব সামনে এসে স্ট্যাচু হযে রইলেন। বোধহয় তসলিমা ভাবতে শুরু করেছেন বাম সবকাবের লাল ফিতে তাঁকে আর কতদিন এই শহবেব হোটেলে বেগম আদরে বাস কবতে দেবে। হোটেলের ঘবে যে তসলিমাব বড্ড একা একা লাগছে সেটা তিনি আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা কবেছেন তাঁব 'একা একা লাগে' কবিতাব বই থেকে পড়ে। ব্রততীর সঙ্গে আবৃত্তির কম্পিটিশনে যাওযার চেষ্টা করেনইনি তসলিমা। এর মধ্যে আবার ব্রততীব অ্যালবামকে শব্দযন্ত্রের কাবিগবি মাধ্যমে চক্চকে করে তোলা। এইচ এম. ভি-র এঞ্জিনিযার জযন্ত মৈত্র বলেই ফেললেন তিনি ব্রততীর গান শুনতে এখানে এসেছেন। আসলে ব্রততীর কবিতা মানেই তিন ভুবন ভুলিয়ে দেওযা গান, একথা জানিযে অবস্থাটা সামলে দিলেন সতীনাথ।

'অতীত ও বর্তমানকে মিলচাব বানানোব জন্য কবিগুরুব নিজের কণ্ঠে 'আজি হতে শতবর্য পবে' কবিতাব বাকিটুকু ব্রততী নিজে ইনিযে বিনিয়ে বলেছেন। কবিতাব সঙ্গে নাচগান না থাকলে কেমন যেন শূন্য লাগে। তাই বামাযণের লেখক (এবং সম্ভবত কপিবাইট অধিকারী) বাল্মীকির দস্যু বত্নাকর থেকে ভালোমানুষ হযে ওঠার কিসসা দেখাতে গিযে হাত পায়ের খিল ধবে গেছে অনেক নাচিযে মেযেবই। শ্রীমতী বত্নাকব আবাব বলেছেন পাপ না কবলে পেট ভবানো যায় না। একথা বলাব জন্য আফতাব আনসাবি, চুন্নু মিএল, দাউদ ইব্রাহিম, সবাই রত্নাকব—নিশ্চযই সেলাম ঠুকবে।

—কৌশিক রায়

রসকেলি

—কোথায যাচ্ছেন?

—যাচ্ছি মেযেব জন্যে একটা হারমোনিযাম কিনতে। ভালো কথা, আপনাব সঙ্গে বেডিযোর কারো জানাশোনা আছে?

—কেন কেন?

—ঐ যে বললাম, হাবমোনিযাম কিনতে যাচ্ছি। মেযে 'সাবেগামা' শিখতে আবম্ভ কববে।

—বেডিয়োয জানাশোনা বলছিলেন যে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মেযে গান শিখলে বেডিয়োতে একটা চান্স যাতে পায তাব জন্য খোঁজখবব নিচ্ছি আর কি।

—খুব বেশি তাড়াতাড়ি হল না?

—তাড়াতাড়ি আব কি বলছেন, দেখতে দেখতে সময কেটে যাবে। এই তো দেখুন না, মেযেব বযস আড়াই বছর। এখনই একটা স্কুলে ভর্তি কবে দিতে না পাবলে আব তো স্কুলে ঢোকানোই যাবে না।

—তাই নাকি?

—তবে আর কি বলছি। আপনি দেশ-দুনিয়াব কোনো খবরই রাখেন না দেখছি! প্লেগ্রুপ, লোযার কেজি, আপাব কেজি, প্রিপ্যারেটরি। এই চাবটে বছব কবে তাবপব গিযে ক্লাশ ওয়ান।

—এইবকম ব্যাপাব?

—তবে না তো কি।

—ঠিকই বলেছেন, সময তো দেখতে দেখতে চলে যাবে। আচ্ছা আমি চেষ্টা করব, আপনাব রেডিয়োতে গান গাইবাব যাতে একটা ব্যবস্থা করা যায।

—আমার নয়—

—না না, আপনার মেয়েব জন্যে।

—হ্যাঁ, আমার মেযের জন্য। ভুলবেন না যেন।

—ভুলব না। সবে তো 'সারেগামা' আরম্ভ হবে। ভাববেন না, হয়ে যাবে।

—প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

জবর খবর

হেলমেট-দাওয়াই

কলকাতা পুলিশের প্রধান অস্ত্র—না, ময়লা জমে জ্যাম হয়ে যাওয়া থ্রি নট থ্রি রাইফেল নয়, অথবা কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়া থ্যাবড়ামুখো বেঁটে বন্দুকও নয়, সেই ব্রিটিশ জমানার আশীর্বাদধন্য আদি অকৃত্রিম লাঠি। এই লাঠ্যৌষধের সুমিষ্ট ফল প্রায়ই হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে থাকেন শ্লোগানকারীরা, পুলিশকে 'হপ্তা' দিতে না পারা ফুটপাতের হকার ভাইয়েরা অথবা সিনেমার টিকিটের ব্ল্যাকাররা। তবে, অবাধ্য জনতাকে শাসন করার জন্য শুধু লাঠিকেই সর্বেধন নীলমণি করলে চলবে না বলে মনে করেন ট্রাফিক কনস্টেবল সমীর স্যানাল। তাই তিনি বদমায়েশদের ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়ার জন্য হাতে সুদর্শন চক্র বা খড়্গ নয়, হেলমেট নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

কলকাতার মহাকরণের কাছে টি বোর্ড অফিস আর ব্র্যাবোর্ন রোডের এলাকাটা অফিস টাইমে এমনিতেই জ্যাম-জমাট হয়ে হাঁসফাঁস করে। একেই এইরকম জ্যাম, তারওপর রক্তকে ফুটিয়ে চায়ের ধোঁয়া বানিয়ে-দেওয়া গরমে মাথার আর ঠিক ছিল না ডিউটিরত সমীর স্যান্যালের। তাঁর সামনে দিয়ে হাওড়া-লেকরোড রুটের মিনিবাস চালাচ্ছিলেন ড্রাইভার শংকর দাস। অত জ্যামে পিঁপড়েই নড়তে পারে না, বাস তো কোন ছার। কিন্তু সমীরবাবুকে সে কথা বোঝায় কে? মিনিবাস নিয়ে না-এগিয়ে যাওযার 'অপরাধে' শঙ্করবাবুকে হিড়হিড় করে টেনে নামিয়ে নিজের মাথার হেলমেটটি খুলে তাঁর মাথায় মারলেন কনস্টেবল সমীরবাবু। তার আগে সমীরবাবুর হেলমেটের কল্যাণে মিনিবাসের উইণ্ডশিল্ডের কাচও গঙ্গাযাত্রা করেছে। অবশ্য জনতার হাতে আড়ং ধোলাই খেয়েছেন সমীরবাবু। আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি এবার থেকে লাঠি বা হেলমেটের বদলে অপরাধ দমনে নিজের মোটা মাথাটি না-ব্যবহার করেন। ট্রাফিক কনস্টেবলের 'মাথার দাম' বলে কথা।।

'ব্যা-কারণ' মেমোরিয়াল স্কুল

সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' পুস্তকটিতে অঙ্কশাস্ত্রে বিশারদ, কাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচে নামক কাকপক্ষী এবং রুমাল হইতে পরিবর্তিত শ্রীমান বিড়ালের সতীর্থ হিসাবে ছাগশিশু, ব্যাকরণ শিং-এর নাম উল্লিখিত আছে। লেকটাউন শ্রীভূমি সংলগ্ন 'বৃজধাম' (ব্রজধামের কলিযুগস্থ সংস্করণ) নামক সুরম্য অট্টালিকাতে গজাইয়া উঠা ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল-এর বঙ্গভাষাপ্রিয় কর্তৃপক্ষ সম্ভবত ইংরাজি আই সি এস. ই. এবং আই এস. সি. পাঠ্যক্রমের সদাশয় পথ নির্দেশক হইবার নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা মাননীয় মাড়ওয়াড়ি শিল্পপতি ও তথাকথিত শিক্ষানুরাগীদের স্থূলকায় মানিব্যাগ হইতে নির্গত অর্থরাশির (সাদা এবং কালো) দৌলতেই পণ্ডিত নেহেরু-কন্যার স্মৃতিবিজড়িত বিদ্যালয় দিনের পর দিন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে। সেই হেতু ক্ষীণ শরীর ও অজীর্ণগ্রস্ত 'Bongs' বা বাঙালিদিগের ভাষা চর্চা করিতে কেই বা পাগলামি শুরু করিবে? সেই উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যালয়ে আই. এস সি পাঠ্যক্রমে ভর্তি হইতে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ডায়েরিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিক্ষাকে সযত্নে 'ব্যা-কারণ' শিক্ষা রূপে মুদ্রিত করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। অহো! কি দুর্ভাগ্য! 'বেংলিশ' হইতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদিগের সম্মুখ হইতে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র কবিগুরুর ধন্য বাঙ্গালা ভাষার ব্যা-ব্যা করিয়া ছাগশিশুর ন্যায় পলায়ন করা ব্যতীত আর কোনো পন্থা নাই। কতিপয় অভিভাবক অবশ্য কানাঘুষা করিয়া জানাইয়াছেন, ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলবাড়ির নাম 'বৃজধাম'—অর্থাৎ কিনা লীলাখেলাতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত নীলমাধব শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি। সেই সূত্রেই হয়ত আই এস সি. ডায়েরিটির জ্যাকেট নীলবর্ণ। ব্রজভূমিতে তো শ্রীকৃষ্ণ গাভীদের সহিত ব্যা-ব্যা রব বিশিষ্ট ছাগলও চরাইতেন। সেই সব অবোধ ছাগশিশু, ব্রজের 'লাভার বয়' কেষ্টসোনাকে কতই না শিং দিয়া ঢুঁ মারিয়াছে (এবং আশা করি কৃষ্ণও মারিয়াছেন), সেই জনাই হয়ত আর অ-কারণ ব্যাকরণ না পড়িয়া 'ব্যাকারণ' শিক্ষা দিতে উদ্যোগী ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ। মহা আশঙ্কা হইতেছে, দ্বাপর যুগের বৃন্দাবনের ব্রজভূমিতে 'ব্যাকরণ শিক্ষা' বলিতে তো বংশীবাদক কেষ্ট ঠাকুর আর সতীসাবিত্রী গোপিনীদিগের অশেষ প্রেমক্রীড়াকে বোঝানো হইত। ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলটি তো কো এডুকেশনাল, অর্থাৎ একই শ্রেণীকক্ষে চপল চপলা কিশোর কিশোরী শিক্ষার্থীর ভিড় তাহাদিগকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি দেহ ও মনের নতুন কোনো 'ব্যাকারণ' শিখাইতে চাহেন? তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের আত্মার প্রতি সুযোগ্য পিতৃতর্পণই হইবে।।

এক লাশ দো লায়লি

এক 'সতীতে' রক্ষে নেই, সাধ করে আবার দ্বিতীয় গিন্নিবানিয়েছিলেন গোয়ার পানাজি শহরের বাসিন্দা অ্যাঞ্জেলিকো ফারনান্দেজ। দুই বউ ঘরে থাকা মানেই অষ্টপ্রহর ঝাঁটা জুতো এবং গালমন্দ সহযোগে অভিনব নাম সংকীর্তন। এই দুই সাবিত্রী আর সীতার পাল্লায় পড়ে তাড়াতাড়ি বিবাহ বিচ্ছেদ করে সংসার-বিবাগী সন্নেসি হওয়ার তাল খুঁজছিলেন শ্রীমান ফার্নান্দেজ। তাতে গণ্ডগোল আরো জট পাকালো। তখন দুই বউকে জব্দ করতে বিষ গিলে পটলডাঙার টিকিট কাটলেন ফার্নান্দেজ। অনেকেই ঠোঁট উল্টে বললেন, বাব্বাঃ, ব্রিটিশ আমলে ব্রাহ্মণরা কম করে চার গণ্ডা করে বিয়ে করতেন, মাত্র দুই পরিবার সামলাতে গিয়েই ফার্নান্দেজকে বিষ খেতে হল?

তা, ফার্নান্দেজের বরাতে কি মরেও রেহাই আছে? হাসপাতালেই কর্তার মৃতদেহ কে দাহ করবেন—তার অধিকার পাওয়া নিয়ে তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হল দুই বিধবা স্ত্রী-র মধ্যে। দুই পত্নীর কাজিয়ার চোটে হাসপাতালের রোগী আর কর্তৃপক্ষের তো চোখ উল্টে ভির্মি খাওয়ার দশা। ফার্নান্দেজের মৃতদেহও শ্মশানে নিয়ে যেতে দেননি দুই প্রিয়তমা। দুই ঘণ্টা মড়াকে আটকে রেখে বচসা চালান তাঁরা। ফার্নান্দেজকে কে পোড়াবে, তা ঠিক করা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও শুরু হয়ে যায় আদালতে। অবশেষে ফার্নান্দেজের উইলের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী দুই নম্বর বউকেই মড়া পোড়ানোর অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু ফার্নান্দেজ সাহেবের পয়লা নম্বর বিবি শেষ পর্যন্ত মড়া পোড়ানোর অধিকার আদায়ের জন্য তিন মেয়েকে নিয়ে ফাইট চালিয়ে গেছেন। অবশ্য তিনিই যে ফার্নান্দেজের আসল প্রাণেশ্বরী, কোর্ট সে কথা মেনে নিতে পারেনি।

তোতা না শোনে ধর্মের কাহিনী

যে সব অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের গালাগালি শেখাতে ইচ্ছুক তাঁদের উচিত দূরদর্শনে জাতীয় সংসদের প্রভাতী অধিবেশনের লাইফ টেলিকাস্ট দেখানো। তাহলেই নাকি দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা শিখতে পারবে, কিভাবে তাদের দেশের ও দশের মহামান্য চালকরা গালাগালি দিয়ে দেশেরভূত ভাগিযে দিচ্ছেন। তবে চীনের বাচ্চাকাচ্চারা গালাগালিতে ডক্টরেট ডিগ্রি নেওয়ার জন্য চীনা পার্লামেন্টের দিকে নজর না দিলেও অসুবিধা নেই। তাদেরকে গালমন্দের চোদ্দপুরুষ শেখানোর জন্য আছে তোতাপাখিরাই।

চীনের চেংদু অঞ্চলের পাখিশালাতে রাখা তোতাপাখিদের জ্বালায় নাওয়া খাওয়া ঘুম তো বটেই, নিজেদের বাপ-ঠাকুর্দার নামও বেমালুম ভুলে যাওয়ার দশা সেই পাখিশালার পাহারাদারদের।

তোতাপাখিগুলোর সামনে এলেই হল। অমনি ইয়াং সিকিয়াং আর হোযাং হো নদীর বানের মতো গালাগালি দিয়ে দর্শকদের পিতৃপুরুষের আত্মার পিণ্ডি দিচ্ছে তোতাপাখিগুলো।

চেংদুর বার্ড এডুকেশন ইনস্টিটিউট-এর মাস্টারমশাইরা অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তোতাপাখিগুলোকে একটু সভ্যভব্য করে তুলতে, যাতে তারা আর তেড়েফুঁড়ে গালাগালি না করে। লাভ হয়নি কিছুই, উল্টে তাঁরাই তোতাপাখিদের সৌজন্যে খিস্তির সহজপাঠ শিখে নিযেছেন। পাখিশালার হর্তাকর্তারা তাই আইন করে দিয়েছেন, তোতাপাখিদের যাতে কোনো বিদেশি পর্যটকরা না দেখতে পান। না হলে গোটা চীনের বদনাম। রোজই তোতাপাখিদের কানের কাছে ক্যাসেটে ভালো ভালো কথা রেকর্ড করে শোনানো হচ্ছে। পাখিরা যাতে একটু ভদ্রসভ্য হয়। গালাগালি দেওয়ার জন্য অনেক তোতার খাঁচাও বন্ধ করে দেওয়া হযেছে। কিন্তু তোতা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

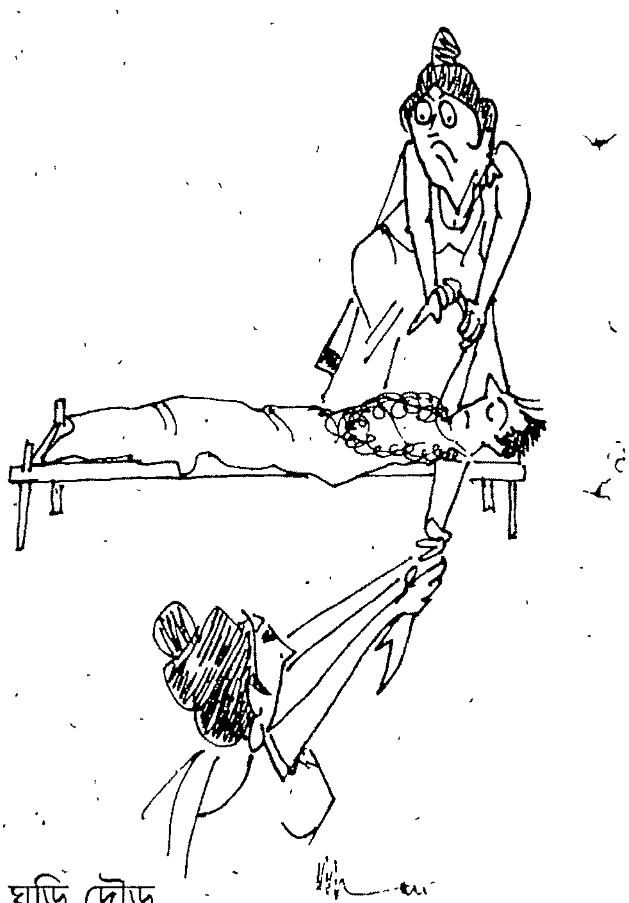

ঘড়ি দৌড়

কার্গিল কাণ্ডে ভারতের হস্তধৃত জুতোর পবিত্র স্পর্শ এখনো মনে হয় পৃষ্ঠদেশ থেকে বিদায় নেযনি। তার ওপর বিন লাদেন ও মোল্লা মহম্মদ ওমর-এর হয়ে ওকালতি করতে গিয়ে বুশদাদার কাছ থেকে বিস্তর ধাতানি সইতে হযেছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রভু জেনারেল পারভেজ মুশারফকে। লাভের মধ্যে এই হয়েছে, সাগরপারের দেশগুলো থেকে দানাপানি আসা আর একটু হলেই বন্ধ হতে বসেছিল। তার ওপর আবার মুশারফ সাহেব বায়না ধরেছেন, কবরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির চেয়ারে বসে থাকবেন এবং ভারতের সঙ্গে দুশমনি করে 'কায়দ-এ-আজম' মহম্মদ আলি জিন্নার স্বপ্নকে সফল করবেন। তা সেজন্য পাকিস্তানিদের কাছে কিছুটা কষ্ট পেতে তো হবে। তাই মুশারফ সাহেব এবার দেশজুড়ে ফতোয়া জারি করেছেন, গরমকালে ঘড়ির কাঁটা এবার থেকে এক ঘণ্টা করে এগোনো থাকবে। অবশ্য এর জন্য দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে গিয়ে কেউই নাকানি চোকানি খাবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিযেছেন জনাব রাষ্ট্রপতি। অনেকেই কানাঘুষো করছেন, পাক ঘড়ির গ্রীষ্মকালীন সময় এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দিযে মুশারফ সাহেব এবার সূর্যের ওপরও খোদকারি করতে চান। ভারত-পাক সীমান্তের কাঁটাতার বেড়ার কোনদিকে কতটা সূর্যের আলো পড়বে সেটাও ঠিক করে দেওয়ার হিম্মৎ রাখেন মুশারফ। আসলে তালিবানি আমলে প্রতিবেশী আফগানিস্তানে মান্ধাতার যুগের ধর্মের শরিয়ত বানিয়ে দেশটাকে শুধু ঘণ্টা কেন, বছরের পর বছর পেছিয়ে একেবারে আদিম যুগে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিলেন মহম্মদ ওমরের দোস্ত-ইয়ালি ভাইয়েরা। তাই মুশারফ সাহেব এবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ির সময় বাড়িযে পাকিস্তানকে একেবারে আধুনিকতার টং-এ পৌঁছে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

—পরস্ব সংবাদদাতা

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

আদমের নিপাতন

সম্পাদক মশাইকে ধন্যবাদ। আমাকে একটি নতুন শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—পুরুষবাদ। নারীবাদ নিয়ে কচকচি তো এখন বলাই যায়, শতাব্দী প্রাচীন, কিন্তু পুরুষবাদ? পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে প্রহার তো অতি পুরাতন ব্যসন। নারীতান্ত্রিক সমাজও যে এখনো, এদেশেই, বহাল আছে এবং সেগুলোও ক্রমশ পুরুষতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকছে ব্যসন বাণিজ্যে তা নিয়ে অনুচ্চকিত থাকাই পছন্দ। তা হোক। তবে পুরুষ একেবারেই বাদ থাক, বাদ থাক নারীরা কী চান? কোনো পুরুষ অবশ্য চায় না নারী বাদ থাক। নারী বাদ দিয়ে জীবন, শিরিষ কাগজ দিয়ে শরীর মার্জনার মতোই অসহ, অকল্পনীয়। এটা অবশ্য পুরুষের কাঙালাপনার জন্যই শুধু।

কিন্তু নারীর তো কোনো কাঙালপনা নেই। নেই বলেই তারা বঞ্চিত নিপীড়িত নিগৃহীত নিত্যব্যথিত জনসংখ্যার গরিষ্ঠতম অংশ। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম চলছে চলবে। দেশভাগের সময় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক গুজরাটে, এক পক্ষকে হটিয়ে আরেক পক্ষ ভাগ্য ফিরিয়েছে। পুরুষদের নিপাত করতে পারলে নারী সম্প্রদায়ও নিশ্চিত সর্বক্ষেত্রে নিজেদের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করতে পারবে।

নারী-পুরুষ সমান সংবিধান স্বীকৃত। তবু কিছু নির্বোধ নারী কন্যাভ্রূণ হত্যা করে। এই বৈষম্য মূলক ঝোঁক তৃণমূল স্তর থেকেই পাল্টে উল্টে দিতে হবে। কোনো নারী আর পুরুষ ভ্রূণ ধারণ করবে না। সমূলে পুরুষ নিপাতনের আগে মূল থেকেই যোজনা চালু করতে হবে।

কাজের ক্ষেত্রে পুরুষ রিটায়ার করলে বা মারা গেলে আর কোনো পুরুষ নিয়োগ করা যাবে না। কেবল নারীর থাকবে চাকরির অধিকার।

সাদা কলার, গ্রীন কলার থেকে শুরু করে ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে নিচে নামার প্যান্টি পরা-ও। পুরুষের পোশাক দীর্ঘদিন ধরে পরে পরে নারী এমন অভ্যস্ত যে ওগুলো আর পুরুষ পোশাক নেই—সব সেক্সলেস। সামান্য যে তফাৎ ছিল পুরুষের নিরাবরণ উর্ধ্বাঙ্গে বিচরণ, দীপ্ত দৃপ্ত মুক্তচিত্ত নারীরা তাও অভ্যাস করে ফেলেছে। ফ্যাশন ও ফিল্মের সেটাই প্যাশন।

এভাবেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে—মানে পুরুষমুক্ত হবে। প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার থেকে হরিপদী কেরানি সবাই নারী। পাইলট, পুলিশ, মিলিটারি— তো আগেই হয়েছে। ক্রমে মাঝি, মুচি, মাছমারা, কসাই, ফাঁসুড়ে সব, স—ব হবে নারী। জগতের ভালো হবে। মারামারি রাগারাগি কমে যাবে। যুদ্ধ বন্ধ হবে। ঘুষ প্রথা উঠে গিয়ে দেশের জাতীয় আয়, সার্বিক সম্পদ কান্নার মতো হু হু করে বাড়বে। একজন জয়ললিতা বা বানু ঘোষ নিতান্তই ব্যতিক্রম বলে মান্য। পঞ্চ ম-কারের প্রথম চারটিই লোপ পাওয়ার কথা, তবে পঞ্চমটির তীব্র প্রাদুর্ভাব না ঘটার জন্য একটা কমিশন বসাতেই হবে।

এভাবে মোটামুটি ৬০/৭০ বছরের মধ্যেই পৃথিবী থেকে পুরুষদের ঝেঁটিয়ে দেওয়া যাবে। যদি কিছু বুড়ো ভাম নাছোড় হয়ে থেকেও যায়, তাদের সাইবেরিয়া বা সাহারা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেই ল্যাঠা নিকেশ।

তার আগে অবশ্য একটা বিশাল কাজ করা জরুরি—প্রতি মহল্লায় স্পার্ম ব্যাঙ্ক বা বীর্যভাণ্ডার স্থাপন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা। শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ নারী প্রজননের জন্যও শুক্রকীটের প্রয়োজন মোচন সম্ভব নয়। আপাতত।

আপাতত—কারণ আশা করতে দোষ কি, নারী বিজ্ঞানীরা গবেষণা—গবেষণা—গবেষণা করে নারী-শরীরেই শুক্রকীটের উৎপাদন আবিষ্কার করবে। কিংবা নারী হবে অতি-অতি-অতি আধুনিক মানুষী অ্যামিবা।

অত বছর অপেক্ষা করা অপছন্দ হলে ঝাঁক বেঁধে পুরুষের লিঙ্গান্তর ঘটানোর সঞ্জয় গান্ধী সুলভ পরিকল্পনা ফলপ্রসূ করার উদ্যোগও নেওয়াই যেতে পারে। তাৎক্ষণিক লাভ— পুরুষের আলাদা টয়লেটের আর দরকার হবে না। স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবসা দ্বিগুণ বাড়বে।

কে আছ যুবতী
হও অগ্রবতী— হাঁপায় ভবিষ্যৎ।

কার্টুন : জয়দীপ দাশগুপ্ত

২১ পাতার নিগ্রহের পর

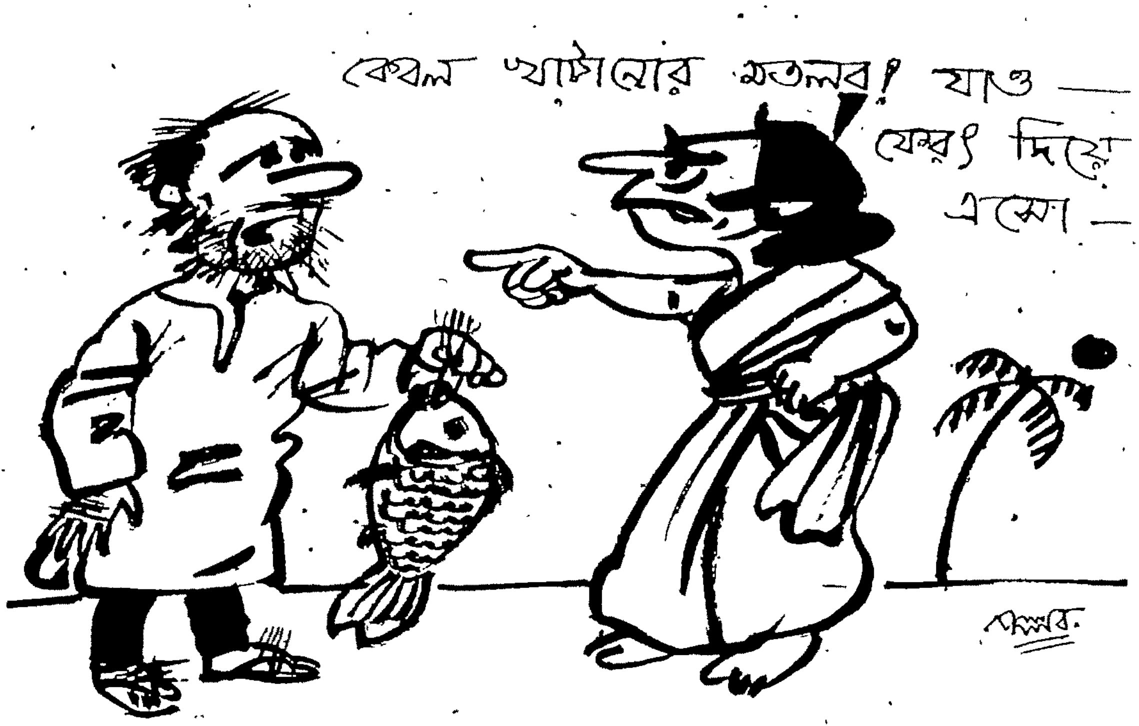
কেবল খাটানোর মতলব! যাও — রেস্তরাঁয় দিয়ে এসো —

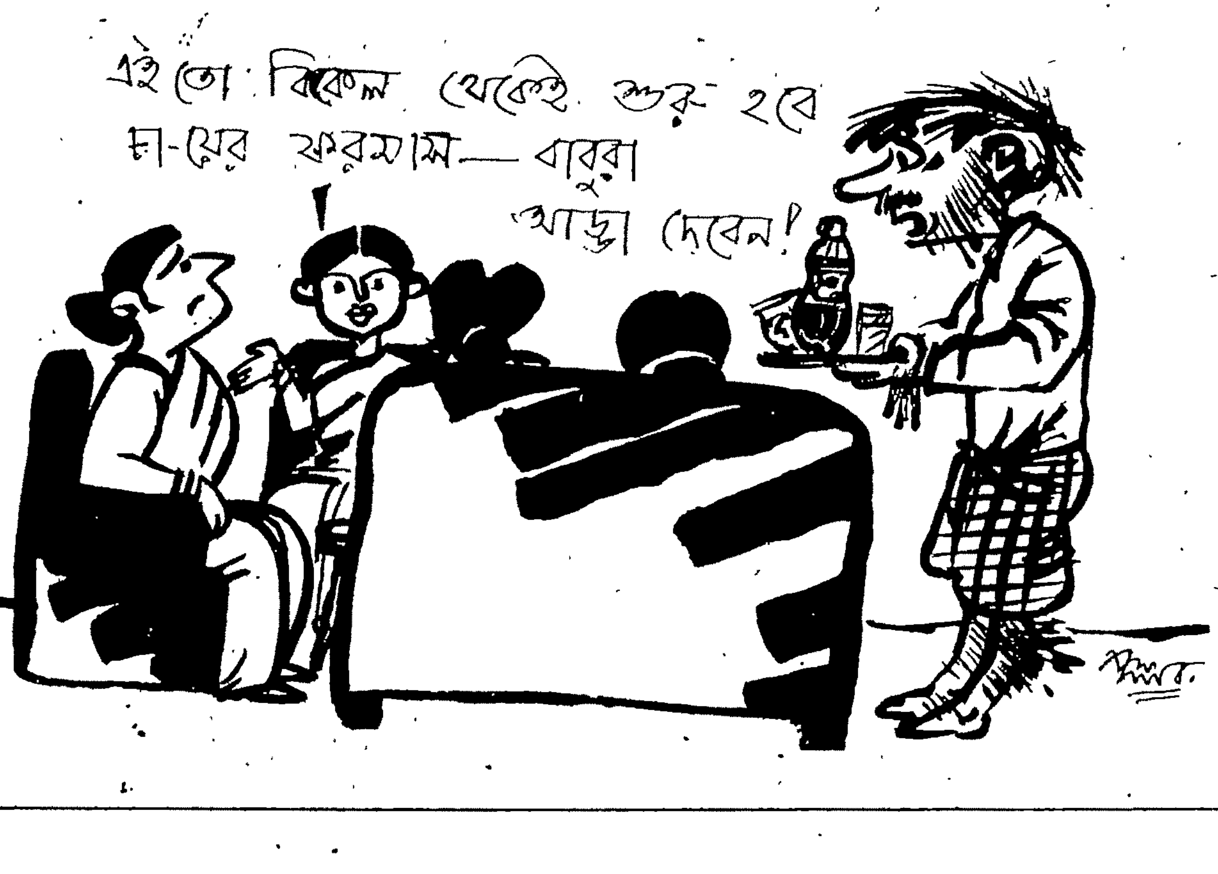
এই তো বিকেল থেকেই শুরু হবে চা-য়ের ফরমাস — বাবুরা আড্ডা দেবেন!

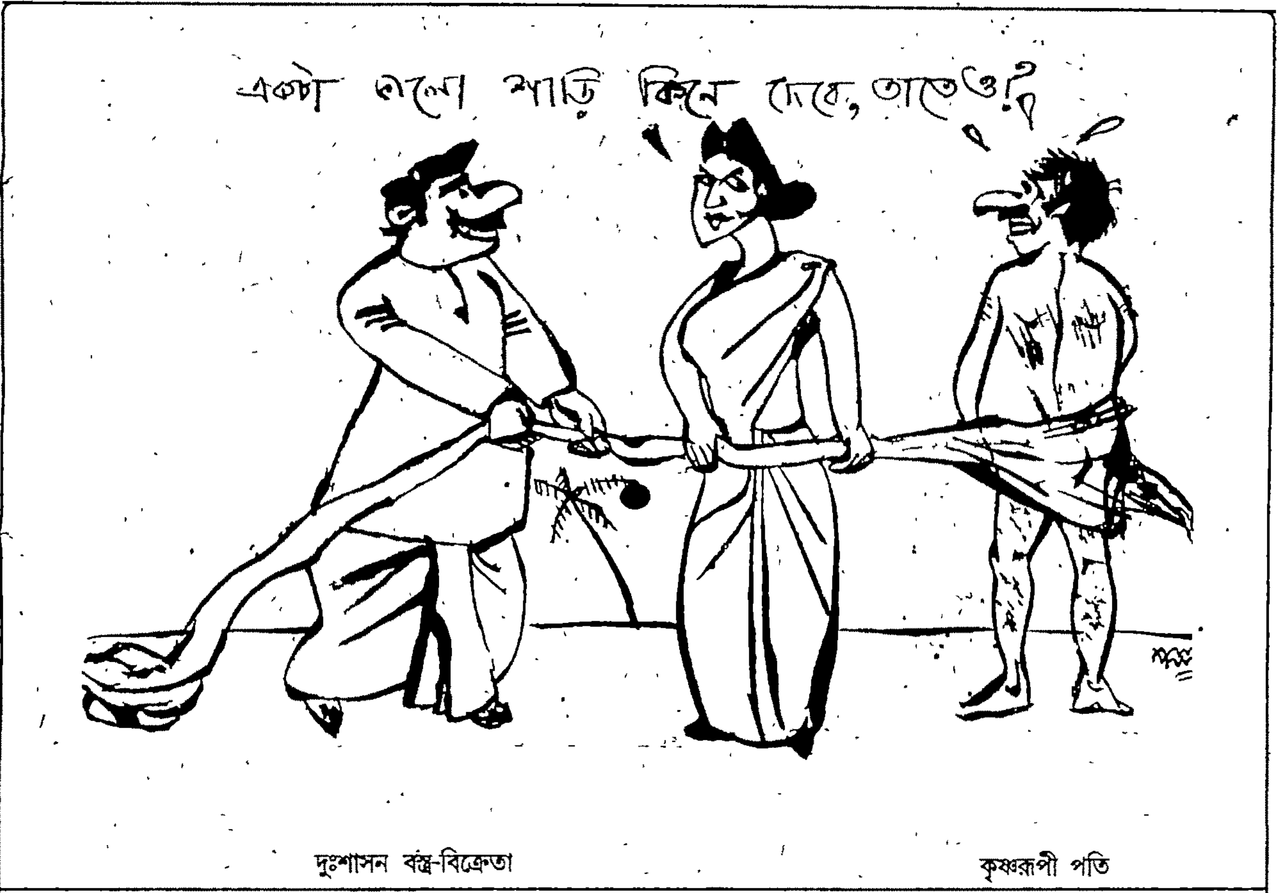
একটা ভালো শাড়ি কিনে দেবে, তাতেও?
দুঃশাসন বস্ত্র-বিক্রেতা
কৃষ্ণরূপী পতি

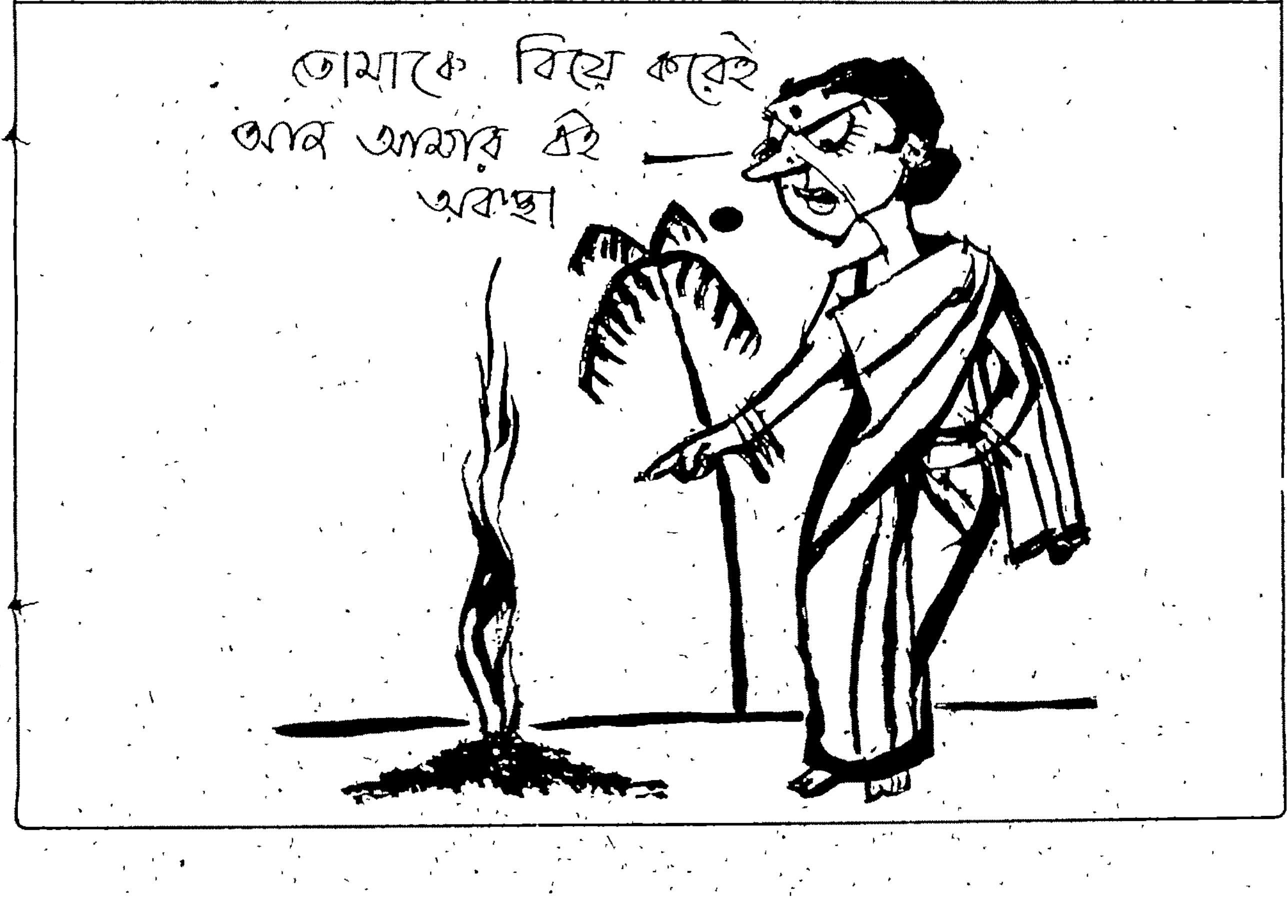
তোমাকে বিয়ে করেই আর আমার এই — অবস্থা

সঙ্গীত দুঃসংবাদ

রবীন্দ্র-আহ্নিক

গত মাসে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ পবিত্র সরকারকে প্রধান করে একটা কমিটি গঠন করেন। তাতে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সঙ্গীতজ্ঞ প্রথিতযশা শিল্পী রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, সুমিত্রা সেন, মায়া সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মৌসুমী কর্মকার, ঋতু গুহ, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত প্রমুখ ছিলেন। ভাষাবিদ পবিত্রবাবুর নেতৃত্বে সবাই ভেবে স্থির করলেন যে কপিরাইট উঠে গেলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে স্বরবিতান মেনে। ধুতি পরতে হবে কোঁচা মেরে। (ভাষাবিদ পবিত্রবাবু সম্ভবত গোটা স্বরবিতান মুখ্যমন্ত্রীকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন—দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া/ নিত্য এটা সেটা কাজে হে।)

কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে পঁচিশে বৈশাখের আগে এবং পরে (অর্থাৎ সারাবছর) রবীন্দ্রসদন ভাড়া নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গাইতে হলে এবার থেকে স্বরবিতান মেনে গাইতে হবে। ভাষাবিদ পবিত্রবাবু হারমোনিয়মের গায়ে 'চলতে পারে' বলে স্ট্যাম্প মেরে দেবেন। তবে চলবে। শুধু রবীন্দ্রসদনে নয়, রবীন্দ্র সরোবরে, রবীন্দ্র সেতুতে (হাওড়া ব্রিজ), রবীন্দ্র সরনিতে (টেরিটি বাজার), যাবতীয় রবীন্দ্র ভবনে, রবীন্দ্রনগরে, রবীন্দ্র পল্লীতে, রবীন্দ্র পাঠাগারে, রবীন্দ্র কলঘরে স্বরলিপি মেনে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে হবে। রবীন্দ্র কলঘর কী? অসংখ্য প্রথম দু-লাইন জানা শিল্পী চান করতে করতে গান করেন। সেই সব রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে শীতকালে হাড় কাঁপার শব্দ, গরমকালে হাড় গলার শব্দ মিশে যায়। তু-তু-তুমি রবে নি-নি-নিরবে । বাবারে।

রবীন্দ্র কলঘর কী? অসংখ্য প্রথম দু-লাইন জানা শিল্পী চান করতে করতে গান করেন। সেই সব রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে শীতকালে হাড় কাঁপার শব্দ, গরমকালে হাড় গলার শব্দ মিশে যায়। তু-তু-তুমি রবে নি-নি-নিরবে-। বাবারে।

লালবাজারে পুলিশের নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। বেসুরো বিভাগ। যেমন ছিনতাই বিভাগ, দাঙ্গা বিভাগ, পুকুরচুরি বিভাগ ইত্যাদি। একজন গীতশ্রীর অধীনে দু'জন সাইকেলধারী ইন্সপেক্টর ও তেরোজন লাঠিধারী সেপাই থাকছে। সাইকেল কেন? বাইক নয় কেন? বাইকের শব্দে রবীন্দ্র সঙ্গীত থেমে যাবে। আধুনিক ধরে ফেলবে। যখন তুমি আমায় পাগল বলো আমি তখন পগার পার .

স্বরলিপি মেনে রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠানগুলোতে গান না গাইলেই গ্রেপ্তার। রবীন্দ্র সরণিতে ছদ্মবেশে পুলিশ থাকবে। ধরা পড়লেই দড়ি দিয়ে কানে ঝুলিয়ে দেবে গীতাঞ্জলি। ঐ অবস্থায় "মন্ত্রী আমায় ক্ষমা করো প্রভু" গাও। অন্যথায় লাঠির গুঁতো খাও। প্রতিজ্ঞা করো, রাস্তায় কোনোদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবে না। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কবি। তাঁকে সম্মান জানাতে শেখো। ভোরে উঠে ঘরে বসে স্বরলিপি ধরে রেওয়াজ করবে রোজ। একদিন চাকরি পাবেই। পুলিশ আড়ি পাতবে কলঘরেও। সমুখে রহিয়াছে তবু দেখি না তোমারে,.. ওখানে কে রে?

রবীন্দ্রভক্ত সুমিত্রা সেন বলেছেন যারা বেসুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে তারা পথভ্রষ্ট। বোলপুর যেতে কানপুর চলে গেছেন। স্বাগতালক্ষ্মী চান না রবীন্দ্র সঙ্গীতকে কেউ আধুনিকীকরণ করুক। গ্যাসবাতির ছবি ইলেকট্রিকের বিলে থাকা উচিত না। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, তিনি চান রবীন্দ্র সদন রবীন্দ্রনাথের গন্ধ বয়ে বেড়াক। (লালু যেমন গায়ে গরু-মোষের গন্ধ বয়ে বেড়ান।)

কলেজ স্ট্রিটে স্বরবিতানের "রেডি ইজি" তৈরি হচ্ছে। 'দ্বেষ' পাব্লিকেশন। বাংলা ব্যান্ডেও রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ হচ্ছে। স্বরলিপির কত দাম। এসো গাই দুমদাম—এসব আর চলবে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরে বসে আছেন; মা বসে আছেন বৃদ্ধাশ্রমে।

—আইভান হো হো

এক দুর্মূল্য আবিষ্কার

ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়

"পত্রপাঠ"-পত্রিকার
শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

কিছুদিন আগে গড়িয়াহাট হইতে হাঁটিতে হাঁটিতে ত্রিকোণ পার্কের কাছাকাছি পৌছিয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে এক ফুচকাওয়ালার পার্শ্ববর্তী জনৈক ভুট্টাওয়ালার নিকট হইতে একটি ভুট্টা কিনিয়া খাইতে থাকি। যে কাগজটি মুড়িয়া সে ভুট্টাটি দিয়াছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িলে কিঞ্চিৎ অবাক হই। দেখি, তাহাতে কবিতার আকারে কিছু লেখা। খোঁজ নিয়া দেখি—একটি পুরা খাতাহে কবিতা লেখা এবং ভুট্টাওয়ালা খাতার এক-একখানি পাতা ছিঁড়িয়া তাহাতে ভুট্টা মুড়িয়া খরিদ্দারকে দিতেছে। আমি কবিতা কিছু বুঝি না। যদি আপনার কোনো কাজে লাগে—এই ভাবিয়া কাগজে লেখা এ কবিতাংশটি আপনার গদিতে পাঠাইলাম।

পাগলী, তোমার সঙ্গে তৃণমূল জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে সিপিএম কাটাব জীবন
পাগলী, তোমাব সঙ্গে ভাজপা-র জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে কংগ্রেস কাটাব জীবন

পাগলী, তোমার সঙ্গে সত্যজিৎ জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে সুখেন্দাস কাটাব জীবন
পাগলী, তোমার সঙ্গে ঋত্বিক জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে স্বপন সাহা কাটাব জীবন

পাগলী, তোমার সঙ্গে সেহনাই জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে সন্তুর কাটাব জীবন
পাগলী, তোমার সঙ্গে একতারা জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে মারাকাস কাটাব জীবন

পাগলী, তোমার সঙ্গে কপিলদেব জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে প্রভাকব কাটার জীবন
পাগলী, তোমাব সঙ্গে তেণ্ডুলকব জীবন কাটাব
পাগলী, তোমাব সঙ্গে গাঙ্গুলী কাটাব জীবন

পাগলী, তোমাব সঙ্গে শক্তিমান জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে জন্মভূমি কাটাব জীবন
পাগলী, তোমাব সঙ্গে এফএম জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে ডেক-ডিকি কাটাব জীবন

পাগলী, তোমার সঙ্গে চুমুমিএগা জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে সান্টা ডন কাটাব জীবন
পাগলী, তোমাব সঙ্গে হেরোইন জীবন কাটাব
পাগলী, তোমার সঙ্গে রেড লাইট কাটাব জীবন ..

***প্রতিবেদকের বক্তব্য :** এত কাটাইবার পর জীবনের আর কিছু অবশিষ্ট রহিল কিনা, কবি তাহা জানান নাই।*

অনেকদিন বাজার মন্দা যাবার পর এ মাসেই একটি
খুনের কনট্রাক্ট পাবেন, তবে সেটা খুন হওয়ার।

রাশি চক্কোর

জ্যোতিষসাস্ত্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

বউঠ্যাঙাড়ে রাশি : সাবধান। আপনার শুক্র বক্র হইয়াছে এবং তৎক্ষেত্রে উল্টা[illegible] যোগ রহিয়াছে। অর্থাৎ উল্টা প্রহার। আপনার গৃহিনীর এ মাসে মহিষমর্দিনী হইবার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। অনাদায়ী পণের টাকার জন্য স্ত্রীর চুলের গোছা ধরিয়া শেষে চ্যালাকাঠ যোগে নিজে খোঁড়া হইতে পারেন। অবশ্য শ্বশুরের পয়সায় হসপাতাল ও ঔষধাদির ব্যয় নির্বাহ হওয়ার মাধ্যমে বকেয়া পণ কিঞ্চিৎ উসুল হইবার সম্ভাবনা।

প্রেম শিকারী রাশি : প্রফেশন্যাল প্রেমিক, অর্থাৎ সকালে রাখি, দুপুরে চুমকি, বিকেলে টিনা ও সন্ধ্যায় মীনা—এভাবে প্রেম সাম্রাজ্য খুলে বসেছেন, ফুলে ফুলে মধু খেয়েই সুখে জীবনটা কাটাবার তালে আছেন, সংসারের জাঁতাকলে বাঁধা পড়তে চান না, নিত্য নব প্রেমিকা সন্ধানে ব্যাকুল—এ মাসে এক নতুন প্রেমিকা যোগ আছে। কিন্তু তিনি যে আদতে দারোগা-কন্যা এবং সেই লকআপে একবার ঢুকলে শ্মশান যাত্রার প্রয়োজন ভিন্ন বেরোনোর পথ খুঁজে পাওয়া যায় না, সেটা যখন বুঝবেন, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

ট্রাফিক সার্জেন্ট রাশি : মাসটি অনুকূল। একের পর এক কেস জোগাড় করতে করতে মেজাজ তুঙ্গে উঠবে আপনার। জ্ঞাতিযোগ প্রবল। একহাতে সিজারলিস্ট, অন্যহাতে ওয়াকিটকি ধারণ করুন। তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ অভীষ্ট ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা। বিনা দোষে গোবেচারা এক ভদ্রলোককে ফাঁসাবার পরদিন জানতে পারবেন যে তিনি আসলে এক বিশেষ কেউকেটা এবং খোদ মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ সুপার আপনাকে তলব করেছেন। তন্মুহূর্তেই পদোন্নতি হবে আপনার—অর্থাৎ মাথা ঘুরে পড়ে পা ওপর দিকে উঠে যাবে।

অধ্যক্ষ রাশি অধ্যক্ষদের জন্যে সুখবর—টিউশনি বন্ধ করে, গরমের ছুটিতে কালঘাম ছুটিয়ে প্রতিদিন অধ্যাপকদের কলেজে আনিয়ে পরীক্ষার গার্ড দেওয়ানোর ফলে অধ্যাপকরা অধ্যক্ষের ওপরে প্রবল প্রীতি পোষণ করবেন। এবং সেই প্রীতি সময়মতো মাইনে না পাওয়ায় অধ্যক্ষের প্রতি এই রূপে বর্ষিত হবে—(ক) টেবিল চাপড়ানো (খ) জলের গ্লাস ও পেপার ওয়েট আছড়ে ভাঙা (গ) অধ্যক্ষের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের পিণ্ড উদ্ধার করণ (ঘ) নিম্নস্বরে অধ্যক্ষের সঙ্গে স্বীয় পত্নীর সহোদরা সম্বন্ধবাচক।— ফলতঃ আহ্লাদিত অধ্যক্ষের আপন হস্তে কেশোৎপাটন পূর্বক রোনাল্ডো ছাঁট প্রাপ্তি এবং সেলুনের খরচ সাশ্রয়। টেকো অধ্যক্ষদের সঞ্চয়বৃদ্ধি যোগ নেই।

ইভটিজার রাশি : মাসটা শুভ। আপনাদের ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করার মতো পুরুষ এ মাসে পাওয়া যাবে না। বরং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতে পারবেন, ইভটিজিংয়ে না ভেগে ভুরুর কামান দেগে গজেন্দ্র গমনে কয়েকটি মেয়ে এগিয়ে আসছে আপনি ধরা দিতে। ওদের হাতে ফুলের মালা নেই দেখে একটু আফশোষ হবে বটে, কিন্তু সে আফশোষ কেটে যেতেও দেরি হবে না, যখন দেখবেন, ওদের হাতে ফুল না হলেও ফু-র মালা আছে বেশ জব্বর জব্বর। মানে—কুংফু। দেখে মোহিত হবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেশিক্ষণ দেখতে পাবেন না, দেখার অবস্থা আর থাকবে না। তখন শুধু অনুভবের পালা।

ফুটবলগুণ্ডা রাশি : এই বিশ্বকাপে ফুটবল গুণ্ডার সাফল্য ষোলো আনা। আপনার তাণ্ডবে কেউ হাত খোয়াবেন, কেউ পা, কেউ মুণ্ডু। কিন্তু আপনার কোনো অঙ্গ হারানোর ভয় নেই, সবই অটুট থাকবে। যাবে শুধু সামান্য একটি জিনিস, যা আদতে অঙ্গই নয়,—সেটি আপনার প্রাণ।

খুনে রাশি : অনেকদিন বাজার মন্দা যাবার পর এ মাসেই একটি খুনের কন্ট্রাক্ট পাবেন, তবে সেটা খুন হওয়ার।

হাইজ্যাকার রাশি : আপনার মঙ্গল ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। অতএব জীবনের সেরা প্লেন-হাইজ্যাকিংয়ের পরিকল্পনা এই মাসের চতুর্থ মঙ্গলবারই করুন। খুবই হাইফাই ব্যাপার হবে। প্লেনে ওঠার আগেই রক্ষীদের সন্দেহে পড়ে যাবেন। সামান্য বাক্য, থুড়ি, গুলি বিনিময় এবং তারপর আপনার প্রাণপাখি হাই, আরো হাইমুখী হয়ে একেবারে মঙ্গলে গিয়ে থামবে।

রাত্তিরে যখন খুব নাক-টাক ডাকে, তো তুলে নিয়ে বারান্দায় লেখার টেবিলের সামনে বসিয়ে দিই। এইভাবেই উৎসাহ দিই। ওর লেখাতেও তো ও লিখেছে যে, লেখালেখি যা করবার ও রাত্তিরেই করে।

তবুও তো!

মুসুমুসু কলমচি গৃহিনী কর্তৃক লিখিত

পত্রপাঠের সম্পাদক মশাইটা যেন কী! আপনাদের মুসুমুসু কলমচি, মানে ও-কে বললে ওই তো কত সুন্দর করে গুছিয়ে লিখে দিতে পারত এই সব। এমনিতেই তো কত কিছু বানিয়ে-বুনিয়ে লিখে দেয় পত্রিকার পাতায়। সে সব যখন পড়ে পড়ে শোনায়, তখন বাপ্ রে, কিসব ভারী ভারী শব্দ আর কথা — এসব ও বানিয়ে বানিয়ে লেখে। ভাবা যায়? আমি তো হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি আর চেয়েই থাকি। এই না হলে সাহিত্য! ও যদি না বলে দিত তবে কি ছাই কোনোদিনই বুঝতুম যে এইসব লেখাটেখা সমস্তটাই হাসির কথা? অমন সব গোবামভারী হাসির কথা, সে কি আমার দ্বারা লেখা হয়? মধ্যিখান থেকে শুধু শুধু ওর নামটাই নষ্ট হবে।

আজ না হয় উনি একটু বুড়ো হয়েছেন। তা আমারও তো বয়স কম হ'ল না। ওকে কি আমি আজ থেকে দেখছি। সেই তেরো বছর বয়স থেকে আলাপ আমাদের। বাবা খবর-কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। যেদিন বিজ্ঞাপন বেরুলো সেদিন বিকেলেই কাগজটা বগলদাবা করে ও আমাদের বাড়ি হাজির। সঙ্গে ওর কাকা — মানে, অধুনা আমার ব্যারাকপুরের খুড়াশ্বশুর। বাবা তখনো ফেরেনি আপিস থেকে। তো আপনাদের কলমচি ঘরে ঢুকেই বললেন- "মেয়ে আমাকে দেখাতে হবে না, বাঙালির মেয়ে কেমন রূপের ধুচুনি তা আমার জানা আছে। কিন্তু এই মেয়েকেই আমি বিবাহ করব। তবে আমার একটা শর্ত আছে।

এক বিজ্ঞাপনেই মেয়ে উৎরে যাবে, এমন কথা মা আমার স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই বললেন, দেখো বাবা, তোমার মতো ফুটফুটে ছেলে আমার জামাই — এই না কত! তুমি মেয়ে দেখতে চাওনি, আমিও তোমার শর্ত শুনতে চাইনে। তবে কিনা মেয়ের বাবা তো এখনো আপিস্ থেকে ফেরেনি। তাহলে তোমরা বরং একটু বসো। মিষ্টি-টিস্টি খাও। শ্বশুর মশাইয়ের সঙ্গেই যা কথাটথা বলার বলে যাও, কেমন?

উনি অবশ্য বসলেন না। তবে আমার ব্যারাকপুরের খুড়াশ্বশুর রইলেন। বাবা আসার পর শর্ত শোনা গেল। ওনার শর্ত ছিল যে, নাবালক কন্যার বিবাহ যেহেতু বেআইনি তাই উনি বিবাহ অনুষ্ঠান তখন করবেন যখন আমার আঠারো পূর্ণ হবে। তবে তার আগে পর্যন্ত আমার সমস্ত খরচাপাতি উনিই চালাবেন।

একদিনে আমার ভাগ্য ফিরে গেল। খাইখরচা ছাড়াও বেশ মোটা হাতখরচ পেতে লাগলুম মাসে মাসে। অনেক সিনেমা দেখতুম। ফি সপ্তাহে কালীঘাটে যেতুম। সিনেমা যে দেখতুম তা অবশ্য উনি তখন জানতেন না। বাংলা বা হিন্দি সিনেমা ওঁর চক্ষুশূল — এই রকমই বলেছিলেন। চোখের কোনো ব্যারাম হবে হয়ত — যা মোটা গ্লাসের চশমা পরেন! মাঝেসাঝে ইংরেজি সিনেমা নাকি দেখতেন, আর ইংরেজি সিনেমা তো আমি বুঝি কচু!

এইভাবে আমাদের দিন গড়িয়ে গেল। আজ তো আমরা বুড়োবুড়ি। বেশ আছি। বড় ভালো আছি। উনি যে কত ভালো মানুষ তা [illegible] বুঝতেই পারতুম না, যদি ঘর না করতুম।

বি. দ্র.— লেখাটি হাতে পাবার পর আমাদের ঘোরতর সন্দেহ ঘটায় একদিন চুপিচুপি আমরা কয়েকজন মুসুমুসুর অবর্তমানে তাঁর বাড়িতে হাজির হই। লেখাটি দেখিয়ে ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তিনি বললেন, অমন-লেখা উনি কস্মিন কালেও লেখেননি, লিখবেনও না। আমাদের সাথে টেপ রেকর্ডার ছিল। কলমচির গিন্নি সেই টেপরেকর্ডারে আমাদের সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ পত্রপাঠের পাঠক পাঠিকাদের জন্য ছাপালাম। বাকিটা রইল মুসুবুড়োর ঘাড়ের রোঁ তুলতে। পরে সেটা কাজে লাগবে।—পত্রপাঠ কর্মীবৃন্দ

সাক্ষাৎকার

পত্রপাঠ : মুসুমুসুর এই ধরনের কাজকে আপনি কী বলবেন?

মুসুবাবুর বৌ : কি আবার বলব! বিট্‌লে বুড়ো এটা কি নতুন কিছু করল নাকি!

পত্রপাঠ : মুসুমুসু মানুষ হিসেবে কেমন?

মুসুবাবুর বৌ : কেমন আবার? হাত আছে, ঠ্যাং আছে, .. মানুষ যেমন হয়—তবে কিনা বড় ত্যাঁদোড়। আব যদি বলেন পুরুষ মানুষ হিসেবে, তবে বলব ও বুড়ো কিস্যু না।।

পত্রপাঠ : না না সে সব জানতে চাইছি না। বলতে চাইছি মুসুবাবুর সাথে ঘর করে কেমন লাগল?

মুসুবাবুর বৌ : কি করে বলব? অন্য কারো সাথে তো করে দেখিনি, যে তুলনা টানব!

পত্রপাঠ : আচ্ছা আচ্ছা! কলমচির লেখালিখির ব্যাপারে আপনার মতামত...

মুসুবাবুর বৌ : এই ক'রে ক'রে বুড়ো বাড়িতে গ্যাসটুকু পর্যন্ত আনল না।

পত্রপাঠ : মানে?

মুসুবাবুর বৌ : মানে আবার কি? বোজই ওই লেখার নাম করে দিস্তে দিস্তে নষ্ট কাগজ আমার সামনে ফেলে বলবে—এই দিয়েই রান্নাটা সেরে ফেলো। গ্যাসে কি হবে?

পত্রপাঠ : গ্যাসটা বোধহয় পত্রপাঠেই দিয়ে থাকেন

মুসুবাবুর বৌ : (হাসি)—তার আমি কি জানি বাবা। তবে তেমন গ্যাস ও এ বাড়িতে দেবার সাহস করে না—এটা বলতে পারি।

পত্রপাঠ : আচ্ছা আপনাকে কোনোদিন লেখালেখির ব্যাপাবে উৎসাহ দেননি উনি?

মুসুবাবুর বৌ : ও আমাকে কী উৎসাহ দেবে শুনি? বরং ওকেই তো আমি উৎসাহ দিয়ে থাকি যা দেবার।

পত্রপাঠ : যেমন, যেমন?

মুসুবাবুর বৌ : এই ধরো না কেন, রাত্তিরে যখন খুব নাক-টাক ডাকে, তো তুলে নিযে বারান্দায় লেখার টেবিলের সামনে বসিয়ে দিই। এইভাবেই উৎসাহ দিই। ওব লেখাতেও তো ও লিখেছে যে, লেখালেখি যা করবার ও রাত্তিরেই করে।

পত্রপাঠ : আপনি নিজে কখনো কিছু লেখেননি? গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ....

মুসুবাবুর বৌ : সে লিখতুম ক্লাশ সেভেন এইটে। স্কুলের রচনা কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলুম। ওই দেখো মেডেলটা কাঁচের আলমারিতে রাখা আছে। পুরস্কার বলতে এ বাড়িতে ওই একটাই। উনি তো বরাবরই পি ডিভিশনে পাশ করে এসেছেন। তার ওপর হায়ার সেকেণ্ডারিতে এক বছর ব্যাক।

পত্রপাঠ : ও—আচ্ছা। তো সে সব লেখাটেখা কিছু আছে নাকি হাতের কাছে?

মুসুবাবুর বৌ : সে কি আছে রে ভাই, না থাকে কারো? মেযেদের জীবন তো বোঝোই বাবা।

পত্রপাঠ : নতুন ক'রে শুরু তো করতে পারেন, পত্রপাঠের জন্যে?

মুসুবাবুর বৌ : শুরু? হুঃ। তা ব'লে পত্রপাঠের জন্যে নয়। উনি যে কাগজে লেখেন সেখানে না লেখাই ভালো।

পত্রপাঠ : মানে।।

মুসুবাবুর বৌ : মানে আবার কি? উনিই তো বলেন, ওঁর লেখা যে কাগজে ছাপে সেটা আবার কাগজ নাকি।।

পত্রপাঠ . ও—ইয়ে, পত্রপাঠেব মানোন্নয়নের জন্য কিছু বলবেন?

মুসুবাবুর বৌ : বলব আবার কি? এবারের সূচীপত্রে বড় করে ছাপিয়ে দেবেন—মুসুমুসুর কেচ্ছা ফাঁস।। বাকি বুড়োকে যা দেখার আমিই দেখে নেব।।।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি — পত্রপাঠের লেখক শ্রীযুক্ত মুসুমুসু কলমচি মহাশয় বিগত দুই সপ্তাহ যাবৎ নিখোঁজ। তাঁহার ছবি কলমচির কলমে দেখিতে পাইবেন। চিহ্নিত করণের সুবিধার জন্য তাঁহার অল্প বয়সের একটি ছবি এ স্থলে মুদ্রিত হইল। সন্ধান পাইলে সত্বর পত্রপাঠ আপিসে যোগাযোগ করুন। জীবিত সন্ধানে বিশেষ পুরস্কার ও মুসুমুসু-গৃহিনীর সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ।

বাসযাত্রা

সুনীল বরাট

"দাদা, একটু সরুন।"
"কোথায় সরবো ভাই?"
"তাহলে মরুন,"
বলে তিনি মারলেন ঘাই।
"এ কী, হচ্ছে কী?"
বললেন পাশের যাত্রী, "পেয়েছেন ইয়ার্কি?"
"সব দেখছি তখন থেকে—"
প্রতিবাদী যাত্রী উঠলেন হেঁকে।
কণ্ডাক্টর বললে এগিযে এসে,
"দাঁড়াবেন না দরজা ঘেঁষে,
দরজা ছাড়ুন
সরে দাঁড়ান; একটু নড়ুন।"
"ওহে কন্‌ডাক্টব জ্ঞান দিয়ো না আর
ঠেসে ঠেসে লোক তুলছ এন্‌তার।"

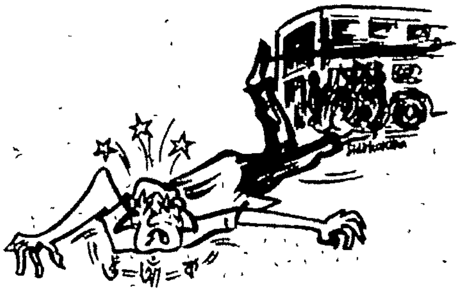

কণ্ডাক্টব হাঁকল আবার—
"ভেতরে যান ভেতরে যান, ভেতরে ফাঁকা,
বাঁ দিকে বাঁদিকে দেদার জায়গা রাখা,
আপনে মশাই দরজা জুড়ে দাঁইড়ে"—
হেসে এক যাত্রী বলল, "তাইরে নাইরে নাইরে,
গাড়ি কেন নড়ে না ভাইরে?
ডেরাইভারের হাতে কি পক্ষাঘাত হল?
একটু জোরসে চালাও ভাই জোরসে চলো।"
অপর যাত্রী বলল, "যত চ্যাচাবেন চালাবে ধীরে,
আচমকা মারবে ব্রেক, গোঁত্তা খাবেন ভিড়ে।
এই তো দেখছি রোজ!
কী কবব; আমাদেরি গরজ।"
"এইটে বুঝুন দাদারা
আমাদের এটা রুটি রুজি,
চাকরি নট্‌, যদি খোলে মালিকের পুঁজি,"
কণ্ডাক্টর বললে ব্যাগ বাজিয়ে
বাজিয়ে টিকিটে ঝালা—
"বেহালা-বেহালা"...

পুস্তক সুসংবাদ

বার্ষিক বইভাগাড়

আরব্য রজনীতে কাশিমবাবার হাভেলিতে চোদ্দপুরুষের জমা হওয়া জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য আবদাল্লাকে তাগাদা দিয়েছিল বাঁদি মর্জিনা। তবে, পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স গিল্ড এবং তেনাদের ধামাধরা বইপাড়ার সামনের সারির বই ছাপাইকাররা ঠিক করেছেন—ফি বছর তাঁদের গোডাউনে উঁই হতে থাকা, ইঁদুর আর উচ্চিংড়ের খাবার হতে থাকা এবং প্রায় ঝুরঝুরে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন হতে থাকা 'সেল' না হওয়া বইগুলোর 'জঞ্জাল' ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার জন্য একটা বই বাজার করতে হবে। বলা বাহুল্য, কলকাতা সংস্কৃতির গয়াক্ষেত্র নন্দন আকাদেমি চত্বরে এবার আবার সেই বইবাজার, থুড়ি, বইভাগাড়-এর তোড়জোড় করা হয়েছিল। এই বইভাগাড়ে ঝাড়ুদার বলতে গেলে ছিলেন প্রায় সকলেই—মিত্র ও ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স, দে'জ পাবলিশিং, প্রমা, মৌসুমী প্রকাশনী, শৈব্যা, আরো অনেকে। যেসব বই-এর শুধুমাত্র 'বই' নামটাই অবশিষ্ট আছে, তাদেরকে গঙ্গাযাত্রা, মানে পাঠক-পাঠিকা যাত্রা করানোর জন্য ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড়ে বইগুলো বিকিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হচ্ছেন প্রকাশকরা। বেঙ্গল পাবলিশিং-এর স্টলে বেশ দেমাক করেই লেখা আছে, প্রকাশনীর ৫০ বর্ষ পূর্তিতে তাঁদের 'বই'তে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য তাঁদের শতবর্ষ পূর্তিতে তাঁরা ১০০ শতাংশ কমিশন দেবেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করেছেন অনেক ক্রেতাই। বইভাগাড়ের কল্যাণে মিত্র ও ঘোষ, নন্দন চত্বরে তারাশঙ্কর নীহাররঞ্জন গুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলীর হরির লুট ছড়িয়ে দিয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস 'সময়ের স্রোতে' ও সেই রচনাবলী স্তূপের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, হয়ত জঞ্জালের স্রোতে গঙ্গাযাত্রা করার জন্য। দে'জ পাবলিশিং বোধহয় মনে করেছেন—রাজ্যের লাল গণতন্ত্রের কাছে ত্রিপুরার গণতন্ত্র পাত্তাই পেতে পারে না। তাই ত্রিপুরার লোকতন্ত্র বইটির একাধিক কপিকে এককোণে ফেলে তার উপরে লিখে রেখেছেন, যা মনে করবেন তাই দেবেন। বিজ্ঞানের মানসম্মানও রাখেননি কিছুই দে'জ পাবলিশিং। এই যা খুশি তাই-এর বোঁচকার মধ্যে প্রাত্যহিক জীবন বিজ্ঞানও রয়েছে।

বইভাগাড়ে হাফ দামে, অর্থাৎ জলের দরে গা-গরম করা যৌনতা বিকোনোর মতো সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেবেন কেন মৌসুমী প্রকাশনী? তা ছাড়া কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়াতে দু মলাটের মধ্যে উর্বশী মেনকা লোলিটা ক্লিওপেট্রা থেকে শুরু করে পাড়ার লুজ ক্যারেক্টার বৌদিদের কীর্তি কাহিনীকে একমাত্র তারাই আনতে সফল হয়েছেন। ৫০ শতাংশ কম দামে 'তুর্কী হারেমের বন্দিনী' আর 'জয় অব সেক্স'-কে বগলদাবা করার সুযোগ বার বার আসে নাকি? 'বাংরেজ' হয়ে যাওয়া, ইংলিশ মিডিয়ামের শিশু-কিশোরদের কাছে 'ভারত' নামক দেশটার দাম বহুৎ কমে আসছে। অন্তত পত্র ভারতীর স্টলে একটাকার বিনিময়েও 'সেল' না হতে পারা 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার স্তূপ দেখে সেটাই মনে হওয়ার কথা। 'ভারত' শব্দটাই এখন টিন এজারদের কাছে অ্যালার্জির মতো। 'ইণ্ডিয়া' বললে তবুও ঠিক ছিল।

ট্যারা চোখে

মুখ্যমন্ত্রীত্বের পাতুরী

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিংহ রাও তাঁর সরকার বাঁচাতে পাঁচজন ঝাড়খণ্ডী সাংসদকে ঘুষ দিয়েছিলেন। তাঁর ঘুষ দেওয়া এবং ঝাড়খণ্ডীদের ঘুষ নেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। একই ভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজি তাঁর বিজেপি সরকার বাঁচানোর দায়ে গুজরাট প্রশ্নে যাতে তাঁদের পক্ষে ভোট দেন, তার জন্য বহুজন সমাজ পার্টির মায়াবতীকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ঘুষ দিলেন। এর জন্যও কি তাঁদের অভিযুক্ত করা উচিত নয়? পি ভি নরসিংহ রাওয়ের তবু একটু আধটু চক্ষুলজ্জা ছিল, তিনি ব্যাপারটা সেরেছিলেন গোপনে। কিন্তু এখন তো সেটুকু চোখের চামড়ার বালাইও কারুর নেই। প্রকাশ্যেই কেনাবেচা চলছে-কতটা মন্ত্রীত্ব পেলে কতটা সমর্থন করা যাবে। এমনকি মায়াবতীর মুখ্যমন্ত্রীত্বটা ঘুষ না ব্ল্যাকমেইল সেটাও যথার্থ বোঝা দুষ্কর। গুজরাটের এইজাতীয় আগুনে জল ঢালার চেষ্টা না করে সেই আগুনে মুখ্যমন্ত্রীত্বের মাছটাকে বেশ ভালোভাবে সেঁকে নিলেন মায়াবতীজি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে গোপাল ভাঁড়ের গল্প। একবার আলুর গুদামে আগুন লেগেছিল। সেখান দিয়ে যেতে যেতে পোড়া আলু খাবার লোভ সামলাতে না পেরে গুদামের মালিকের কাছ থেকেই নুন চেয়ে নিয়ে আলু খেয়ে আবার প্রশ্ন করেছিল সে, "আবার কবে আগুন লাগবে"?

একেই বলে কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। যাই হোক, যদিও মায়াবতীও প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে, যে তাঁকে ক্ষমতা পেতে সাহায্য করবে, তিনি সবসময় তার পক্ষে - তা সত্ত্বেও তাঁকে তারিফ না করে পারা যাচ্ছে না। বলতে ইচ্ছে করছে - মায়া—ওয়া। এখন দেখার, এত সাধের মুখ্যমন্ত্রীত্বের পাতুরীটি খেতে কতটা স্বাদু হয়, অথবা আলুনি লাগার চোটে ক'দিনেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় ও-যা-ক থুঃ ক'রে।

—অঞ্জনা দত্ত

এলবাম

দিব্যেন্দু দাস

আগে যেমন ডাকাতদল ছিল এখন তেমনি বাংলা ব্যান্ড হয়েছে। রেললাইনে বসে গানবাজনা কবে ফেলবে; মেল চলে গেল খেয়াল নেই। সমুদ্রের ধারে বসে করে ফেলবে; জাহাজ তলিয়ে গেল খেয়াল নেই। বাঙালির বাচ্চা ইংরাজি ব্যান্ড বাজিয়ে বাংলা গান করছে। যেন এলবার্ট আইনস্টাইন। আমার ছোট খোকাও এক বাংলা ব্যান্ডের সদস্য। অত্যাধুনিক নাম—'ঠাস্‌ঠাস্'। ছোট খোকা একটা ভযঙ্কর ভায়োলিন বাজায়। বাজায না বলে চালায বলাই ভালো। চার্চের দবজাব মতো চেহারা যন্ত্রটাব। বীণার যেমন রুদ্রবীণা, ওটা তেমনি রুদ্রবেহালা। বাজলে বুক কেঁপে ওঠে। একবার ছড় টানলে সে কী শব্দ। ট্রামলাইনের মতো তাবেব ওপব কম্বল চেপে ধবে থামাতে হবে। একবার বড়দিনে বেলেঘাটা চার্চে প্রোগ্রাম করেছিল ঐ ব্যান্ড। তেলেগু ফাদাব কালা হযে দেশে চলে গেল। যিশুকে জল দেবার লোক নেই। সেই ছোট খোকা কাল এসে বলল, মিস্টাব এন্টিক্, দশ হাজাব ছাড়বে। আমার লাগবে।

শুনেই শুয়ে পড়লাম। বললাম, বাবার ওপর এত জুলুম কেন বাবা?

ও বলল, শিল্পীর কাছে শিল্পই ফাদার, বাকি সব পাতকুয়োর মিস্ত্রি। কিপ্‌টেমি করে করে ওর্যাল্ড ব্যাঙ্কের ব্রান্ড হয়ে গেছ। মাল ছাড়ো। এলবাম হবে। সুর ভাঁজি বলে ভেবো না ক্ষুব ভুলে গেছি। বিউটি এন্ড্ দ্য বিস্ট্। ফর্টি এইট্ আওযার্স রিহার্সাল দিলাম। মাল বেডি রাখবে।

ছোট খোকা চলে গেল। খুন হবার ভয়ে আমার পেট খাবাপ হযে গেল। সেই রাতেই ছুটে গেলাম প্যালার কাছে। প্যালা ব্যাণ্ডের স্ট্যাণ্ডবাই গাযক। বিপদে গায়। এমনি সময ঝুনঝুনি বাজায়, তাল ঠোকে।

প্যালাকে নিজের বিপদের কথা বলতেই বলল, টেন থাউস্যাণ্ড ইস ভেরি নমিন্যাল মেশোমশাই। টোটাল এক্সপেন্‌ডিচার শুনলে আপনার গেঁটেবাত হযে যাবে। ভেবে দেখুন, আজ টেগোর টেগোবের হাত থেকে মুক্তি পেযে আমাদের সমানে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম, দুঃস্থ শিল্পীকে সাহায্য—

আমাকে থামিযে দিযে প্যালা বলল, না না ওসব নয়—শ্রদ্ধা—স্যালুট্। যে লোক ইউরোপ ত্যাগ করে বোলপুরে পড়ে রইল বাংলা ভাষার জন্যে, তার জন্যে কি আমাদের কিছুই করার নেই? আছে। ডিশিশন হযেছে, রবীন্দ্র সঙ্গীতেব ওপর আমরা একটা এলবাম করব।

—বেশ তো, করো না বাবা। আমাব বিযের এলবাম আছে। কত ছবি। তোমাব মাসিমা পিঁড়িতে বসে, আমি পাশে টুলেব ওপর দাঁড়িযে। ব্রাড়িওয়ালা আমাকে সম্প্রদান কবছে। ছাদে ভিখিরি ভোজন হচ্ছে। তোমার মাসিমা আব আমি পাশপাশি বসে আছি, সামনে চিতা জ্বলছে। আমার পঁচিশজন কলিগ তোমাব মাসিমাকে একপিস শবচ্চন্দ উপহাব দিচ্ছে। শুভদৃষ্টি হচ্ছে। পানপাতার জাযগায় কলাপাতা। কিন্তু বাবা ছবির বইতে এত খরচা?

—দাঁড়ান মেসোমশাই, দাঁড়ান। এলবাম মানে ওই মাল নয। দাঁড়ান, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যেমন ধরুন কলা খাওযা। কলা দু'বকম ভাবে খেতে পারেন। এক, যেখানে কিনলেন সেখানে দাঁড়িযেই খোসা ছাড়িয়ে কচ্ কচ্ কবে মেরে দিলেন। সেই আদি ভাব।

—আধুনিক ভাব কি বাবা? নিজেব খোসা ছাড়িয়ে কাঁদি নিয়ে বেলগাছে উঠে বসলাম?

—আ, তা কেন? কথার মাঝখানে ফিসপ্লেট খুলে নিলেন। এই 'যাব' সমাজ না গেলে যুব সমাজের কিস্যু হবে না।

—'যাব সমাজ' কি বাবা?

—'যাব যাব' করে যাবে না। বাদুরে রঙ। যাকগে, এবারে শুনুন আর কি উপাযে কলা খাওয়া যায়। একটা গামলিতে এক কাঁদি কলা ছাড়িয়ে রাখলেন। তাতে এক কেজি চিঁড়ে দিলেন। পাঁচশ মুড়কি দিলেন। পাঁচশ খই দিলেন। এককেজি দই দিলেন। আড়াইশো বাতাসা দিলেন। একশ নকুলদানা দিলেন। দু'চামচ নুন দিলেন, এককাপ সাদা ময়দা দিলেন। দু'লিটার দুধ দিলেন। বেশ করে চটকে দিলেন। কলাব এলবাম হয়ে গেল। বোঝা গেল?

—বেশ বুঝলাম বাবা। সিমেন্টের এলবাম ঢালাই পিঁয়াজের এলবাম পিঁয়াজি, বিশ্বকর্মাব এলবাম দইকর্মা। আরো বলছি—শাগের এলবাম চচ্চড়ি, বেসনেব এলবাম ফুলুবি. আমার আব তোমাব মাসিমার এলবাম ছোটখোকা। উঃ, আমি কি বোকা! আমাদের সময়ে একে বলা হত 'সংগ্রহ' বা 'অমনিবাস'। তোমবা তাব মানে একটা রবীন্দ্র অমনিবাস বের করছ। কিন্তু বাবা প্যালা, আমাব একটা প্রশ্নের উত্তব দাও তো। বাসে ক'জন ভদ্রলোক চড়ে?

—বাসে? মেসোমশাই, আমার ভিউতে বাস হল হসপিটালের বেড প্যান্। পাশ দিযে বাস চলে গেলে আমি পট্ করে মরে যাব। অল আর এনিমেল, টু অর ওয়ান নিরুপায জেন্টলম্যান।

—বেশ বেশ। এবার শোনো অমনিবাস কি। অমনিবাস হল অফিস টাইমের বাস। ভরপেট শুক্ত, ছ্যাঁচড়া খেযে সব চড়ে বসল বাসে। এক একজন যেন ঘামেব উষ্ণ প্রস্যবণ—হট্ স্প্রিং। মৌমাছির চাকে কত মধু। তারপর শুরু হবে বাগবাজারের সিঁদুরখেলা। তুমি আমায মাখাও, আমি তোমায় মাখাই। মাঝে মাঝে দক্ষযজ্ঞ—ধরে দাঁড়াতে কি হয? ঘুরে দাঁড়াতে কি হয়।.... এই কালা বেরাল.... আমি কি করব দাদা। লেডিস নামছে... কে দাদা।.... আমি তোর মাসি.... ন্যাকা। চিড়িংমাছ ছাড়িযে খেতে পারো না। মেযেছেলে দেখলেই মোমের পুতুল। জ্যৈষ্ঠের কুলফি। পাযে চটি থাকলে মিনসেমি ছুটিয়ে দিতাম।... আজ বুট পবে বেরিয়েছি। ....কে বলে দিল—মাসিমা ট্যাক্সিতে যান। ব্যস, সিটি পড়ল।... তোর বাবাকে দেখলাম একটা ট্যাক্সি চালিযে নিমতলা যাচ্ছে। ডিকিতে তোব মায়ের ডেডবডি। .. তুই কোথায় চললি মিনসে?...' এই তোমার অমনিবাস বাবা। কটা ভদ্দর গান থাকবে ওই এলবামে? রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। আমবাও যাব। তোমরাও যাবে। ববং ছবির এলবামই বের করো। রযে যাবে। বাকি সব বযে যাবে।

পরমাণু কবিতা

পরিচালনা : কাব্যিটকেল কবিরাজ

[অনু কবিতাতেও সন্তুষ্ট নহেন অনেকেই। ভারত-পাকিস্তান পরমানু যুদ্ধের কল্পিত আঁচে তাপ পোয়াইতেছে বলিয়া, বিস্তর অনুরোধ আসিয়াছে, যদি পরমানু কবিতা উপহার দেওয়া যায় এই সংখ্যায়। পরম অনুভবের সেই কবিতা, যাহার মধ্যে ভবিষ্যতের পারমানবিক বিস্ফোরণের আঁচ, তাহা বহু যত্নে রচনা করিয়াছেন ***দিব্যেন্দু দাস*** *এবং তাহার মর্মস্পর্শী চিত্রায়ণ করিয়াছেন* ***সিদ্ধার্থ কর্মকার।*** *বলা বাহুল্য, আপন আপন হৃদয়-বিদারী অভিজ্ঞতা হইতেই। পাঠক-পাঠিকা, চাহিলে আপনারা ইহাকে 'মিসাইল কবিতা'ও বলিতে পারেন।*

—ভবদীয় কা. ক.]

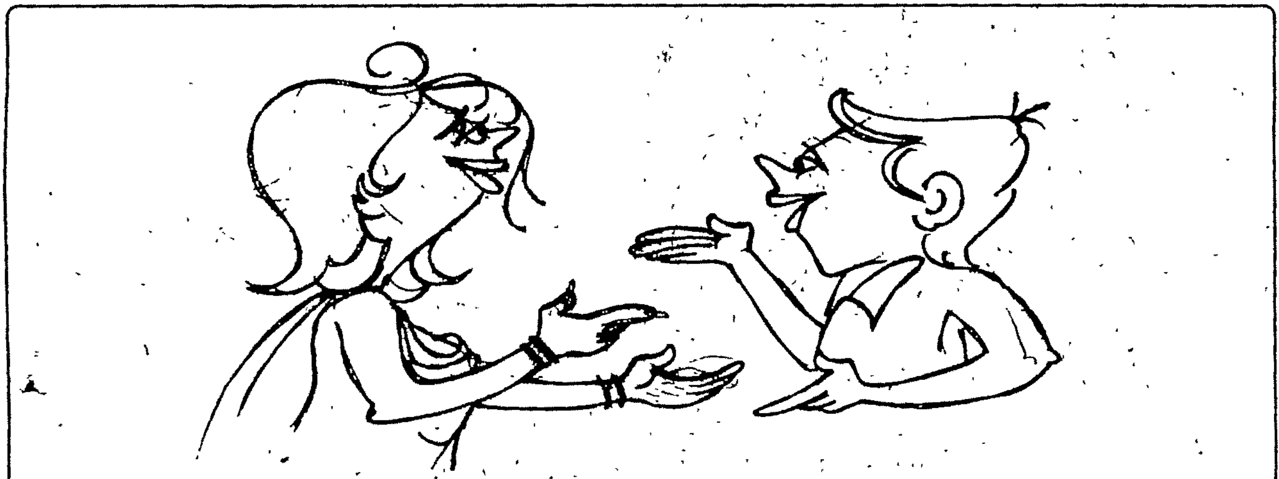

প্রেমিকা : কবে আমাদের বিয়ে হবে? আর কবে আমি তোমার সব দুঃখ ভাগ করে নিতে পারব?

প্রেমিক : আমার তো কোনো দুঃখ নেই!

প্রেমিকা :আমি বিয়ের পরের কথা বলছি!!!

এ তো বড় রঙ্গ যাদু

কৃষ্ণা বসু

এক ছুটির সকাল বেলা, খুব সকাল তখন, ফোন বেজে উঠল। বিছানা ছাড়িনি তখনো, উঠব উঠব করছি, আলস্য জড়িয়ে রয়েছে তখনো সর্বাঙ্গে। ঘুম জড়িতকণ্ঠে রিসিভার তুলি টেলিফোনের —'হ্যালো'—ওপার থেকে ভেসে আসে আমার প্রিয় ও পরিচিত একটি মেয়ের স্বর—'সকাল বেলায় আজ বাড়ি আছেন নিশ্চয়। আমি আজ সকাল সকাল একটু আপনার কাছে যেতে চাইছি, রবিবারের আড্ডা জমে ওঠার আগেই যেতে চাইছি। আমার কিছু একেবারে ব্যক্তিগত কথা আছে আপনার সঙ্গে।' 'হ্যাঁ চলে এসো। কী কথা? টেলিফোনে বলা যায় না?' 'না দিদি, সামনাসামনি বলব। যাচ্ছি তাহলে,'—বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখে সেই মেয়ে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেই মেয়ে পুষ্পিতা এসে হাজির হয় আমার কাছে। চা টায়ে আপ্যায়িত হবার পর পুষ্পিতা বলে, 'শোনো দিদি, আমি এক ভীষণ সমস্যায় পড়েছি। সুতনু আমাকে বিয়ে করতে চাইছে।'

আমি এই সংবাদের জন্য মোটে প্রস্তুত ছিলাম না, সুতনু, পুষ্পিতা, শুভাশিস, অভিজিত, পাপড়ি, প্রজ্ঞিত, জয়ন্ত, মিতা এরা সব আমার নবীন বন্ধুর দল, নবীন কবি লেখকের দল, রবিবার সকালে চিত্তচমৎকারী আড্ডায় আমার বাড়িতে আসে। আড্ডা দেয়, তর্ক করে, নতুন লেখা পড়ে, গম্ভীর ও শুক মন্তব্য করে অন্যের লেখা সম্পর্কে। কখনো কখনো রাজনীতি, দ্রব্যমূল্য, পরচর্চা পরনিন্দার মতো মুখরোচক বিষয়ও উঠে আসে আড্ডায়। সেই আড্ডার নিয়মিত সদস্য পুষ্পিতাকে আরো এক প্রায়-নিয়মিত-সদস্য সুতনু বিয়ে করতে চাইছে। এই খবরে যত না বিস্ময় ছিল তার চেয়ে বেশি বিস্ময় ছিল পুষ্পিতার পরবর্তী মন্তব্যে,—'আচ্ছা কৃষ্ণাদি, সুতনু আমার চাকরি ও টাকা-পয়সার জন্য বিয়ে করতে চাইছে না তো?'

আমি একেবারে চমৎকৃত হয়ে বসে পড়ি সোফায়। বলে কি পুষ্পিতা? চাকরি ও টাকা-পয়সার জন্য বিয়ে করতে চাইছে সুতনু? আমার দিকে সকরুণ তাকিয়ে পুষ্পিতা বলে, 'ও কৃষ্ণাদি, বলো না, আমাকে দেখতে তো তত ভালো নয়, চাকরিটা মোটামুটি ভালোই করি—আর সেই জন্যই—?'

এবার আমি পুষ্পিতাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিই। বলি, 'ভারী মজার ব্যাপার তো। কোনো একজন ছেলে যদি তোমায় পছন্দ করে, বিয়ে করতে চায়,—তাতে দোষটা কোথায়? ছেলেগুলো পছন্দ করলেও দোষ, অপছন্দ করলেও দোষ?'

পুষ্পিতা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'ও হো, তুমি তো সমস্যাটা বুঝতেই চাইছ না,—আমাকে পছন্দ করছে, না আমার চাকরিকে, টাকাকে পছন্দ করছে, তাই তো বুঝতে পারছি না!'

আমি হেসে ফেলি ঐ মেয়ের উদ্বেগের বহর দেখে। ঐ মেয়ে যদি রূপসী হত, তবে সে, কোনো পুরুষের তাকে পাবার আকুতিকে সত্য মনে করত, কেননা এখনো যত যোগ্যতমাই হোক, মেয়েদের রূপটিকেই সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে মনে করা হয়। আর শিক্ষিত উপার্জনক্ষম যোগ্যতমা মেয়েগুলিও তাকেই সবচেয়ে বড় সত্য বলে মনে করে। ভিতরের থেকে সে ভেবে বসে থাকে, তাকে সুন্দরী হতে হবে আর তার বর হবে উপার্জনক্ষম, যোগ্য এবং বিত্তবান।

> আমরা মেয়েরাই অনেক সময় নিজেরাই যোগ্যতাকে, গুণকে স্বীকার করতে চাই না। সৌন্দর্যকে সবচেয়ে বড় গুণ বলেই মনে করে থাকি।

আসলে মজাটা এইখানেই। আমরা মেয়েরাই অনেক সময় নিজেরাই যোগ্যতাকে, গুণকে স্বীকার করতে চাই না। সৌন্দর্যকে সবচেয়ে বড় গুণ বলেই মনে করে থাকি। আমার এক দিদিকে দেখেছি। জামাইবাবুর সঙ্গে তর্ক বিতর্কের সময় খুব উচ্চগ্রামে চলছে কলহ পর্ব। মা বাবা উপস্থিত থাকলে তাঁরাও বিড়ম্বিত বোধ করছেন। এমন সময় উত্তাপে জল ঢেলে দেবার মতো করে রসিক জামাইবাবুটি বলে ফেলতেন তর্কাতর্কির চূড়ান্ত মুহূর্তে—'আঃ রাগলে তোমাকে যা সুন্দর দেখায় না!' সঙ্গে সঙ্গে দিদি হেসে ফেলতেন এবং মুখে উচ্চকিত রাগ দেখালেও ভিতরে ভিতরে খুশি হয়েছেন বোঝা যেত।

'তোমাকে সুন্দর দেখায়, তুমি সুন্দর, তোমার রূপের কাছে আমি নতজানু'—এই ধরনের মনোরঞ্জনী কথা মেয়েরা, রমণী প্রজাতি শুনতে কী ভালোই বাসে। তাই একটি কম সুন্দর মেয়ে যখন অন্যতর যোগ্যতায় উন্নীতা হয়, অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়, তখন তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে মনে করে তার অর্থনৈতিক ক্ষমতার

জন্য বিয়ে করতে চাইছে ছেলেটি, রূপের জন্য নয়। যেন অর্থনৈতিক যোগ্যতাটা শুধু ছেলেদেরই থাকা দরকার। মেয়েটি, আহা যেন পুতুলটি। রূপে রসে পরীটি। —এইরকম ভাবতে ভালোবাসে মেয়েরা আজো নিজেদের। বেচারা মেয়েরা!

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি আমার এক কাকা আর কাকিমার মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল ধুন্ধুমার লেগে যেত, বিপুল বিক্রমে পরস্পরকে তাঁরা নানাবিধ বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকতেন, উত্তরোত্তর ঘরের হাওয়া গরম থেকে গরমতর হয়ে উঠত। খুড়তুতো ভাই-বোনেরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসে সেই উত্তাপের থেকে বাঁচতে আমাদের বা জেঠুদের ঘরে বই-খাতা নিয়ে পড়তে বসে যেত। দু'জনে তর্কাতর্কি করতে করতে কাকা আর কাকিমার জ্ঞানই থাকত না যে ছেলেমেয়েরাও ঘর ছেড়ে জ্যাঠা জেঠিদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ফাঁকা ঘরে খুব খানিকটা চ্যাচামেচির পর কাকিমা কাঁদতে বসতেন, ছেলে-মেয়ে স্বামী দেবতাটি—সবার ওপর রাগটাগ দেখিয়ে কেঁদেকেটে তবে রণে ভঙ্গ দিতেন কাকিমা। রাগটাগ থেমে যাবার পর দুপুরের বিশ্রামের সময় কিম্বা যৌথ পরিবারের বধূকুলের সকলের একসঙ্গে খেতে বসার সময় আমার মা খুব শান্ত ভাবে কাকিমাকে প্রশ্ন করতেন, 'যদি কাঁদবিই, কেঁদেই যদি জিতবি, তো, ঝগড়া করিস কেন?

এর উত্তরে কাকিমা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বা মুহূর্ত পরে জবাব দিতেন, 'আসল কথা কি জানো দিদিভাই, আমি কি ইচ্ছে করে কাঁদি? তোমার দেওরের কাণ্ড-কারখানায় আমার যে কান্না এসে যায়।'

মা তার উত্তরে আরো বলতেন, 'ঐ কেঁদেই তো মনে করলি জিতলি। আসলে কেঁদেই নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলিস। তুই যখন ঝগড়ার শেষে কাঁদিস তখন যদি তোর বরের মুখটির দিকে ঠিকমতো তাকানো যায় তো দেখা যাবে সে মনে মনে মিটিমিটি হাসছে। ওরে বোকা, কাঁদলে, আমরা কাঁদলে ওরা ভাবে আমরা হেরে যাচ্ছি। খবরদার কাঁদবি না।' কাকিমার চিরচেনা জবাব—'না কেঁদে পারি না যে।'

আমার বারবার মনে হয়েছে, আমরা অধিকাংশ সময় আগে থেকেই হেরে বসে থাকি। প্রথম দিকেই যদি পরাজিতার মনোভাব সংগ্রহ করে থাকি, প্রথমেই যদি নিজেকে দুর্বল বলে ভেবে বসি তবে তো হার সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই না?

জ্যাঠামশাই ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। বিপুল তর্জন-গর্জন করতেন বাড়িতে। আর কথায় কথায় জেঠিমাকে বলতেন, 'পরিশ্রম করে রোজগার তো আর করতে হয় না, আরাম করে ঘরে বসে থাকো, উপার্জনের কষ্ট তুমি আর কী বুঝবে?'

পরে বড় হয়ে বুঝেছি, সত্যিই তো জেঠিমা আর জ্যাঠামশাই-এর কষ্ট কী বুঝবে, জেঠিমা সকালে ঘুম থেকে উঠে সারাদিন সংসারের স্বামীর সন্তানদের জন্য কাজ করে যান, কাজ করে যান, কাজ করে যান। উদয়াস্ত নয়, সূর্যোদয়ের আগে থেকে তাঁর কাজ আরম্ভ হয়, সূর্যাস্তের অনেক পর পর্যন্ত তাঁর কাজ চলে, রাত এগারোটার আগে তাঁর বিশ্রাম নেই, তিনি কী করে কলেজে চার বা পাঁচটি ক্লাশ নেবার কঠিন পরিশ্রমের কথা বুঝতে পারবেন? ঠিকই তো। সপ্তাহে দু'দিন বাজারে যেতেন জ্যাঠামশাই। তাতেই কী ভীষণ পরিশ্রম হত তাঁর! বাকি দিন "মাছ-মাসি" মাছ বিক্রি করে যেত বাড়ি বাড়ি। বাসন মাজার পিসি এসে বাসন মেজে দিয়ে যেত, বাকি সব 'সামান্য সাংসারিক কাজ' সারাদিনের, সে তো জেঠিমাই করে ফেলতেন। তাই মাঝে মধ্যেই হুংকার গর্জন শুনতাম, "পরিশ্রম করে রোজগার তো আর করতে হয় না, ...উপার্জনের কষ্ট তুমি আর কী বুঝবে।"

জীবনের দিকে তাকালে কত মজাই যে চোখে পড়ে, সে সব আর বলে শেষ করা যায় না। আমার এক ছোটবেলার বন্ধুর দিদিকে বিয়ের জন্য দেখতে এসেছে বর ও বরের আত্মীয়-আত্মীয়ারা। আমার বন্ধুটির দিদি তখনকার দিনে এম এ পাশ, স্কুল শিক্ষিকা সে মেয়ে। এই নিয়ে এই পাত্রপক্ষ আমার বন্ধুর দিদিকে তৃতীয়বার দেখতে এসেছে। পাত্রের কাকিমা খুব নিরীহ মুখ করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা লেখাপড়া তো শিখেছ, কিন্তু ঘর-সংসারও তো করতেই হবে। বিয়ে যখন করতে যাচ্ছ, বলো তো ছ্যাঁচড়া আর চচ্চড়ির তফাৎ কি? আর চাটনি আর অম্বল-টকের তফাৎ কোথায়?'

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

তার উত্তরে আমার বন্ধুর সেই সাহসিনী দিদি বলেছিলেন, 'আপনাদের ছেলেও তো বিয়ে করতে যাচ্ছেন, উনিই বলুন না ছ্যাঁচড়া আর চচ্চড়ির, চাটনি আর অম্বল-টকের তফাৎটা কোথায়?'

এ কথায় এমনি এক তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তখন, প্রায় বজ্রপাতের মতো চমকে উঠেছিল পাত্র এবং পাত্রীপক্ষেরও লোকেরা যে, কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথাই বলতে পারেনি। তখনকার মতো তারা উঠে গিয়েছিল কিন্তু ঘটনাটির শেষ এইখানেই নয়। ভাবী পত্নীটির দাপট বোধহয় পাত্রটিকে কিঞ্চিৎ মুগ্ধ করে থাকবে। পাত্র তার দু'তিন দিন পর তার ইস্কুলে গিয়ে দেখা করে এবং নিজের সানুরাগ সম্মতি জানায়। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও প্রণয় পর্বের পর তারা পরস্পরকে জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করে এবং পাত্রপক্ষের অভিভাবকরা ঐ দজ্জাল বউকে কোনোদিন পছন্দ করেনি বলেই শুনে এসেছি এতকাল।

সবচেয়ে রঙদার, চটকদার, নাট্যময় ঘটনাটি হল জীবন। এই জীবনের পরতে পরতে এত বৈচিত্র্য যে, বলে লিখে বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না। আমার এক অত্যন্ত প্রগতি বাদিনী আধুনিকা বান্ধবী একবার একটি বিচিত্র পরিস্থিতিতে তাঁর সব আধুনিকতা সচেতনতা আত্মমর্যাদা ভুলে গিয়ে বলে উঠেছিলেন, এই রে, আমার কর্তাটি জানতে পারলে সাংঘাতিক বকবে। খুব বকবে। এত রাগ করবে যে আমার ভয় লাগছে ভাই।

ঘটনাটি ছিল এই রকম আমার সেই বান্ধবীর শখ ছিল খুব উঁচু হিলের জুতো পরা। তার স্বামীদেবতাটি তাকে এই বিষয়ে অনেক বকাবকি করেছে। বারণ করেছে, তাও সে তা শোনেনি। এক সন্ধ্যায় আমরা তিনজন বান্ধবী একটি রাস্তা ধরে আধো আলো আধো অন্ধকারে হেঁটে ফিরছিলাম একজনের বাড়ি থেকে। হঠাৎ সামান্য উঁচুনিচুতে পা পড়ে যায় তার, গোড়ালি সমেত একটি পা তার নিদারুণ ভাবে মচকে যায়। আর সেই মচকে যাবার মুহূর্তে সে আর্তনাদ করে ওঠে এই বলে যে,—'আমার কর্তাটি জানতে পারলে সাংঘাতিক বকবে, খুব বকবে, এত রাগ করবে যে আমার ভয় লাগছে।'

এই অসতর্ক উক্তি থেকে তার অবচেতন এবং অবরুদ্ধ মন এমন ভাবে ধরা দিল যে যতবার ঐ ঘটনাটির কথা আমার মনে পড়েছে ততবারই একেবারে ভিতর থেকে উঠে এসেছে আমার নিজের কাছেই হাসির ফোয়ারা। যে প্রগতিবাদিনী স্বাধীনচিত্ত আধুনিকা বান্ধবীটিকে জানি, তার কর্তাটির প্রতি ভয়মাখা মনোভাব, এই সন্ত্রস্ত মানসিকতা, পায়ে আঘাত লাগামাত্র 'আমার কর্তাটি রাগ করবে খুব বকবে, বলে তার বিলাপের মধ্যে যে অসঙ্গতি, এটি মনে পড়লেই আমার দারুণ হাসি পায়।

আমার চাকুরিরতা এক দিদি মফস্বল শহর থেকে রোজ কলকাতার অফিসপাড়ায় চাকরি করতে আসতেন। আসা-যাওয়ার পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে নিত্যদিন সেই দিদির দেখা হত। দেখা হত কিন্তু কথা হত না। সেই দিদি থাকতেন বান্ধবীদের সঙ্গে আর সেই ভদ্রলোক থাকতেন সঙ্গী বন্ধু পরিবৃত হয়ে হয়ে। দেখা হত কিন্তু কথা হত না। ব্যাপারটা এই রকম; বিখ্যাত গানটিকে পাল্টে নিয়ে বলতে হয়, 'এখনো তার বাঁশি শুনিনি শুধু চোখে দেখেছি।' বেশ কয়েক মাস এই ভাবে চলেছিল দৃষ্টি বিনিময়ের পালা। বাক্যহীন ভালোবাসার ধারাবাহিকতা।

একদিন ট্রেনের গণ্ডগোল, মধ্যবর্তী স্টেশনে সকলেই প্রায় নেমে পড়েছে। অপেক্ষা করছে, কখন ট্রেন ঠিক হয়, চলাচল স্বাভাবিক হয়। চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে সেই ভদ্রলোক আর সেই দিদির প্রথম কথা হয়েছিল। তাতে দিদিটি আবিষ্কার করে যে ভদ্রলোক তোতলা। ভীষণ হাসি পায় দিদির। কিন্তু সে হাসি দমন করে ভদ্রতা করে সরে আসে বন্ধুদের কাছে।

পরের দিন আবার দেখা। সেদিন কিন্তু তোতলামির জন্য লজ্জিত না হয়ে ভদ্রলোক আপন উচ্চারণ রীতিতেই তাঁর ভালোলাগার কথা স্টেশনের এক ফাঁকে দিদিকে বলতে পেরেছিলেন এবং প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে সেই দিদিটিও তাঁর অনুরাগের সম্মতিবাক্যটি বলতে পেরেছিল। পরে তারা সারাজীবন এক ছাদের তলায় বিবাহ বন্ধনে বাঁধা রয়েছে। ভদ্রলোকের তোতলামি কিন্তু যায়নি।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে কত যে জট কত যে জটিলতা, কত যে সংকট রয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। আবার কত যে মজা, কত যে জীবনমুখী রস-রসিকতা, কত যে রঙ্গ রয়েছে—তাও বলে শেষ করবার নয়। সবকিছুর ওপরে জীবনের বহুবর্ণ জয়পতাকা উড়ছে পত্ পত্ করে। উড়ছে, উড়বে, উড়বেই।

ভিক্ষের বিয়ে ও ইনকাম ট্যাক্সো

গ্রামগঞ্জে অনেক সময়ই দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত মায়েরা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি হানা দেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। কন্যা উদ্ধারের জন্যে। কোনো কোনো সদয় গৃহস্থ কিছু দেন। কেউ কেউ কিছু না দিয়েই বিদেয় করেন। উপরি মেলে মুখঝামটা। সেই ভিক্ষের ঝুলি কে ভরে বা সেই মেয়ের বিয়ে কিভাবে হয়, তার খোঁজ আর রাখা হয় না।

কিন্তু ভিক্ষের বিয়েও যে সংবাদপত্রের খবর হতে পারে, সেটাই দেখা গেল। সেই বিয়েও কত জাঁকজমকের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে, সেটাও দেখা গেল। বিহারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং আর জে ডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের দ্বিতীয়া কন্যা রোহিনীর বিয়েতে এরকমই জানা গেল। এই বিয়ের কোনো খরচই নাকি রোহিনীর বাবার পকেট থেকে করতে হচ্ছে না। সবই কেউ না কেউ দান করছেন। অর্থাৎ স্পন্সর করছেন। স্পন্সরেরই যুগ। অতএব লালুপ্রসাদ বিয়ের খরচের প্রতিটি আইটেমের জন্য একজন করে স্পন্সর পেয়ে গেছেন। স্পন্সর তাঁকে খুঁজতেও হয়নি। স্পন্সররা স্বেচ্ছায় মাথা বাড়িয়ে দিয়েছেন। জিপ, লরি, গাড়ি সহযোগে সমস্ত মালপত্র পৌঁছে দিয়েছেন বিবাহের আসরে। লালুপ্রসাদ দান গ্রহণ করে স্পন্সরদের ধন্য করেছেন। স্পন্সরদের তবু একটা স্বার্থ থাকে। তাঁদের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হয়। এক্ষেত্রে তাও নয়। তাঁরা শুধু দিয়েই কৃতার্থ বোধ করেছেন। সেই দেওয়াটা এমন স্রোতের মতো যে, ভেবে ওঠা যাচ্ছে না, কোনটা কোথা দিয়ে খরচ করবেন। বাধ্য হয়েই লালুপ্রসাদকে বড় কন্যা মিসার বিয়ের জৌলুসের রেকর্ড ভাঙতেই হচ্ছে। কী আর করা যাবে। সবাই বড় মুখ করে দিচ্ছেন, ফিরিয়ে দিয়ে তাঁদের তো আর কষ্ট দেওয়া যায় না! মিসার বিয়ের পরই লালুকে ইনকাম ট্যাক্সের গাড্ডায় পড়তে হয়েছিল। দ্বিতীয়ার বিয়েতে তাই বেছে বুছে বেয়াই করেছেন খোদ ইনকামট্যাক্স কমিশনারকেই।

কুটিলা কামিনী

গরমডা এমুনই জব্বর পড়ছে যে মাথার ঘিলুডাও মনে লয় সিদ্ধ হইয়া গ্যাছে গিয়া।
তা সিদ্ধই যখন হইয়া পড়ছি, তখন আর সিদ্ধ ইলিশ খাইতে দোষ কিসের?

হেঁসেল

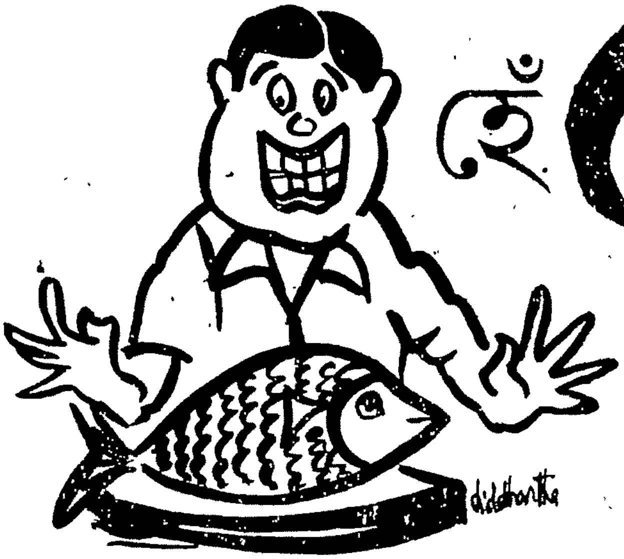

সিদ্ধ ইলিশ

আর কইতে হইব নি। হেই গরমে আপনেগো য্যামন দশা, আমারও ত্যামন। হাড-মাস এক্কেবারে রোদ্দুরের তাপে সিদ্ধ হইয়্যা যাইত্যাছে গিয়্যা। হেইদিকে আবার শম্পাদক্ মশায় তাগাদা দিত্যাছেন 'হেঁসেল' এর জন্যি কয়ডা আম্নার পদ লিইখ্যা রাখতি। লিইখ্যা রাখুম কি! গরমডা এমুনই জব্বর পড়ছে যে মাথার ঘিলুডাও মনে লয় সিদ্ধ হইয়া গ্যাছে গিয়া। তা সিদ্ধই যখন হইয়া পড়ছি, তখন আর সিদ্ধ ইলিশ খাইতে দোষ কিসের? কথায় আছে—বিষে বিষে বিষক্ষয়। হয়ত সিদ্ধ ইলিশ খাইলে আপ্নেরা একটুহান ঠাণ্ডা হইলেও হইতে পারেন।

কি কি লাইগব : এককিলো মতন মাছ, তা সে আপনেগো মানিব্যাগ যতই কান্দুক না ক্যান্। চালকুমড়া বা কচুপাতা সাত আটটা। কুচাইয়া রাখবেন কিন্তু। জিরা তিন চা-চাম্চা। ত্যাজপাতা ছয়-সাতডা, ছোট্ট অ্যালাচ পাঁচডা, শুইক্ন্যালঙ্কা আট থিক্যা দশহান, লবণ আর হলদিগুঁড়া আপ্নেগো আন্দাজমতন। সইরষ্যার ত্যাল একশ গেরাম। মাছের দামের সঙ্গে ব্যালান্স করতি হইব না।

রন্ধন পোনালি : মাছডা ধুইয়্যা লবণ আর হল্দিগুঁড়া আইচ্ছা কইর‍্যা মাখাইয়্যা লন। সমস্ত মশল্লা বাইট্যা রাহেন। মাছের সঙ্গি বাটা মশল্লা, কচু বা চালকুম্ড়া পাতা কুচি আর সইরষ্যার ত্যাল এক লগে মাইখ্যা লন। অবিশ্যি এই সব মাখামাখির কামডা কড়াইতেই করতি অইব। মাখামাখি হইয়্যা গ্যালে উনানে কড়াডা চাপাইয়্যা দ্যান। মাছ সিদ্ধ হওনের মতো জল দিয়া ঢাকা দিয়্যা মাঝারি আঁচে কড়াডা বসাইয়্যা রাহেন। ত্যাজপাতা ও ছোড এ্যালাচ বাইট্যা কড়াইতে দ্যান। ঝোলডা দ্যাখবেন বেশ মাখো মাখো অইব। ওডারে নামাইয়া রাহেন। একটু মিষ্টিমুখ করতি চাইলে চা-চাম্চার অর্ধেক চাম্চা চিনিও দেওন যাইতে পারে। দ্যাখ্বেন, পদ এতই সুস্বাদু অইব যে কড়াইকে উনান থিক্যা নামাইতে না নামাইতেই খাইতে সাধ যাইব। তহন কিন্তু আপনের জিব্বা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা প্রবল।

চিংড়ির অম্বুল

গরমকালে পাতে একডু টক না হইলে খাওনের আসরডা জমে না ভালো। তাইলে এমন এ্যাকডা পদের কথা আপ্নেগো কই, য্যাডা খাইলে মাছ আর টক দুইডারই স্বাদ পাইবেন আপনেরা। অবশ্য বিজ্ঞানীরা নাকি কইয়্যা থাকেন—চিংড়িমাছ নাকি মাছ লয়, এক রকমের পোকা মাত্তর। হইলই বা। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো কইয়্যাই গ্যাছেন, এই পিথিমীতে আমরা হগলেই পোকামাকড়, কিলবিল কইর‍্যা বেড়াইতে আছি। তাইলে হেই চিংড়িপোকার অম্বলই আপনেরা রাইন্ধা দ্যাহেন।

কি কি লাইগব : ছোড ছোড চিংড়িমাছ চারশ গেরামের মতন। কাঁচা তেঁতুল চার-পাঁচডা। দুই চা-চাম্চা চিনি। আপ্নের খুশি মতন সইরষ্যার ত্যাল, লবণ আর হল্দিগুঁড়া তো লাইগবই।

রন্ধন পোনালি : কাঁচা তেঁতুলগুলান্ পেত্থমে সিদ্ধ করেন। ক্বাথটা আলাদা কইর‍্যা রাইখ্যা দ্যান। চিংড়িমাছগুলান বাইছ্যা বুইছ্যা, ভাল কইর‍্যা ধুইয়্যা লন। লবণ আর হল্দিগুঁড়া দিয়া ওগুলানরে মাখাইয়্যা লন। হেইবারডি কড়াতে একটুকুন ত্যাল দিয়্যা তাতে সইরষ্যার ফড়ন আর চিংড়িগুলান তার মদ্দি ছাইড়্যা দ্যান। সামাইন্য একটু চিংড়িগুলান ভাজা হইলে পর কড়ার মদ্দি হেই আলাদা করা তেঁতুলের ক্বাথডা দিয়্যা দ্যান। ঝোলডা হেইবার ফুইট্যা উঠব। তহন আপনের সোয়াদ অনুযায়ী চিনি দিয়্যা ঝোলডারে আরো ফুটাইবেন। হেরপর সইরষ্যা বাটা দিয়্যা নামাইয়্যা লন। তারপর হগলারে পরিবেশন করবেন। আশা করত্যাছি, চিংড়ির অম্বল খাওনের পর আপনেগো কাউরই আর অম্বল অইব না। এক্কেবারে পস্কের, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার।

ছোলার মিঠা ডাল

গরমের চোটে মাথা হগ্গল টাইমেই তাইত্যা থাহে। কি বইলতে গিয়্যা কারে কি কইয়া দিবেন ঠিক নাই। হেই তো সেইদিন বাসের মদ্দি একজন স্কুলছাত্রীকে 'মাসিমা' কইয়্যা ফালাই আছিলাম। হেই লইয়্যা বাসসুদ্ধ লোক আমাকে এই মারে তো সেই মারে। শম্পাদক মশায়রেও না কুন্দিন ভুল কইর‍্যা 'কাকাবাবু' কইয়্যা ফ্যাসাদে পড়েন, হেইজন্যি আপ্নেগো পরামশ্শো দিত্যাছি, এই গরমে ছোলার মিঠা ডাল একবারডি খাইয়্যা দ্যাহেন গিয়্যা। তা হইলে আর মাথা গরম অইব না।

কি কি লাইগব : ছোলার ডাল দুই কাপ, দুই বাটি লয় কিন্তু। জল গুইন্যা গুইন্যা ষোলো কাপ। লবণ ছোড ছয় চা-চামচা, ত্যাজপাতা চারহান, টম্যাইট্টু মাঝারি মাপের দশহান। দুই বড়ো চা চামচা মাখন, ঘি বড চার চামচা, আস্ত জিরা ছোড এক চামচা; তাজা আদাকুচি— তা লাইগব ছোড দুই চামচা। হিং এর গুঁড়া ছোড এক চামচা, তাজা (বাসি লয় কিন্তু), নাইকরল কোরা বড় ছয় চামচা। লাল চিনি বড় চার চামচা। গুড় ছোড চার চামচা। বোঝলেন কিনা, মুখ মিঠা করনের লগে যোগাডযন্তর করতি গিয়্যাই তো জিব্বা বাইর অইয়্যা যাইব গিয়া।

রন্ধন পোনালি : পেত্থমত ডাল ভাল কইর‍্যা বাইছ্যা, ধুইয়া, একডা পাত্তরে সারাডা রাইত ধইর‍্যা ভিজাইয়্যা রাহেন। সক্কাল বেলাতি ডাল থিক্যা জল ঝরাইয়া লন।

দ্বিতীয়ত টম্যাইট্টুগুলান ধুইয়্যা টুকরা কইর‍্যা কাটেন।

হেরপর একডা ভারি (হাল্কা হলি চলব না কিন্তু) সস্প্যানে লবণ মেশানো জল গরম করেন। জল ফুইট্যা উঠনের পর তাতে ডাল ছাড়ি দ্যান। চড়া আঁচে মিনিট পন্চাশেক সিদ্ধ করেন। সস্প্যানডা কাপড় দিয়া আদ্দিক খানেক ঢাইক্যা দিলে ডাল আরো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হইব কিন্তু। ডাল ভালোভাবে সিদ্ধ হইলে আঁচ কমাইয়্যা দ্যান। কিছুক্ষণ ঘুইট্যা টম্যাইট্টুগুলান মাখনের লগে ডালে দ্যান। অ্যাইচটা একডু কমাইয়া রাহেন।

অন্য একডা পাত্তরে ঘি গরম করেন। দ্যাখবেন, খুব গরম না হইয়্যা পড়ে। ঘি-ডা মাঝমাঝি গরম হওনের পর পেথ্থমে ত্যাজপাতা, জিরা, ঘড়ি ধইর‍্যা কয়েক সেকেণ্ড পর আদাকুচি হিং দিয়া ফড়ন দ্যান। ওগুলানের সাথে নাইরকল কোরা মিশান। আধমিনিট খানেক নাড়তি থাকেন। সুগন্ধ ছড়াইব কিন্তু। হেরপর নাইরকল মিশানো ফড়নটি ডালের মদ্দি ঢাইল্যা দ্যান। চিনি আর গুড় মিশাইয়া দ্যান। হেইবার খাওনের টেবিলে লইয়্যা আসেন।

দিব্যি কইর‍্যা কইত্যাছি, ছোলার মিঠা ডাল বানাইতে আপনেগো অনেকেরই হয়ত হাত ধাধা হইয়্যা যাইব, তয় কাউরে যদি ডালডা খাওয়াইতে পারেন, তাইলে তেনার গালমন্দও মিঠা লাগব।

—কাঙ্গাল রায়

ইয়া আল্লা সিয়ারাম

সৌরেন বসু

শিশুর চোখে পানি রে ভাই
শিশুর চোখে জল
ইয়া আল্লা সিয়ারাম
বুঝলি না কেউ, বল।

মায়ের চোখে মণি রে ভাই
কেড়ে নিলি তোর
ইয়া আল্লা সিয়ারাম
চালিয়ে ছুরি-ছোরা।

চালিয়ে ছুরি রক্তঝুরি
খেললি হোলি হাতে
ইয়া আল্লা জয় রাম
মানুষ হয় না জাতে।

মানুষ হইল পশু রে ভাই
জাতে জাতে করি
ইয়া আল্লা সিয়ারাম
মানুষ মেরে মরি।

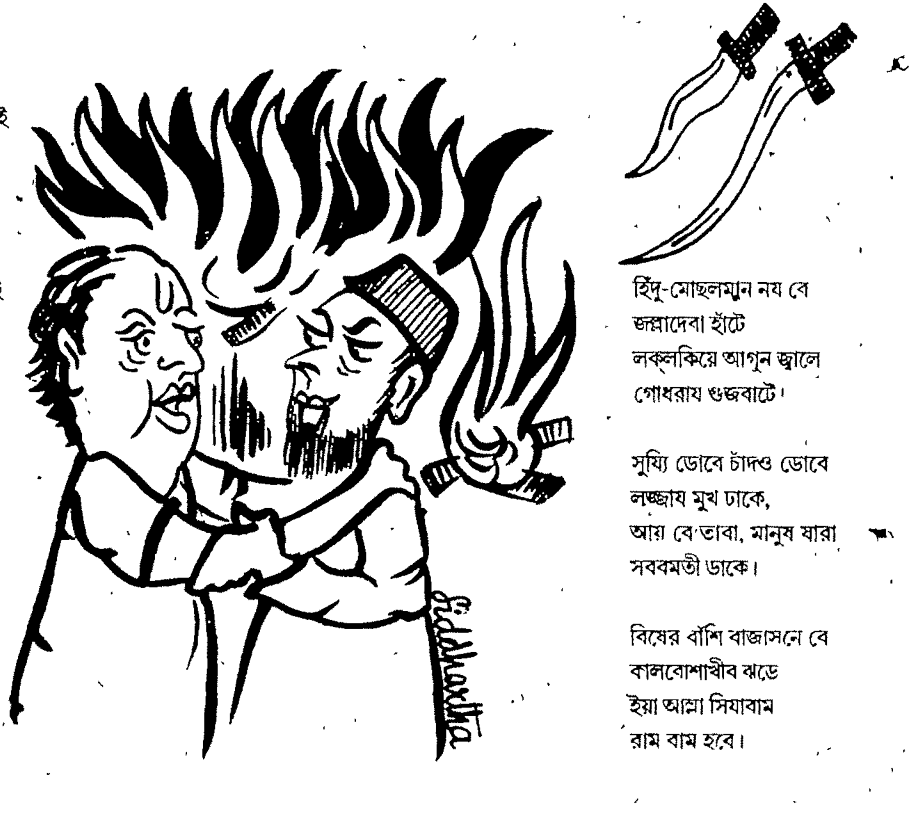

হিঁদু-মোছলমান নয় রে
জল্লাদেরা হাঁটে
লকলকিয়ে আগুন জ্বালে
গোধরায় গুজরাটে।

সুয্যি ডোবে চাঁদও ডোবে
লজ্জায় মুখ ঢাকে,
আয় রে তোরা, মানুষ যারা
সবরমতী ডাকে।

বিষের বাঁশি বাজাসনে রে
কালবোশাখীর ঝড়ে
ইয়া আল্লা সিয়ারাম
রাম বাম হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অধীনে স্বীকৃত মাদ্রাসা সমূহের ছাত্রছাত্রীদের 'কম্পিউটর' শিক্ষার সেবায়

TECHNO POWER (INDIA)

BA 21, DESHBANDHU NAGAR, BAGUIATI
KOLKATA-700059 PHONE : 543-0355/576-5733

আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে
TECHNO POWER-এর বন্ধুত্বে এগিয়ে আসুন।

পত্রপাঠ-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য গাঁটগচ্চা :
বার্ষিক—১০০ টাকা (হাতে হাতে নিলে), ১২০ টাকা (ডাকযোগে ডাকলে)
টাকা পাঠাবার ঠিকানা : পত্রপাঠ, ১০বি, (অথবা ১০জে) ফার্ণ রোড,
কলকাতা-৭০০০১৯, ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল দশটার মধ্যে)

পত্রপাঠ-এর দুটি যাচ্ছেতাই প্রকাশনা—
অকপটে—সমরেশ মজুমদার ৩৫
পত্রপাঠ সহর্ষ গল্প সংগ্রহ—মনোজ বসু, শক্তিপদ রাজগুরু, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেব সেন, দিব্যেন্দু পালিত এবং......৩৫

পরিবেশক : নবজাতক প্রকাশন, এ ৬৪ কলেজস্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭

Postal Regd. No.-Tech/WB/RNP-566/2002
PATRAPATH • June 2002 • Vol-2 Issue-11 • Regd. No.-WBBEN/2000/5855 • Rs. 8.00

*"হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!"*

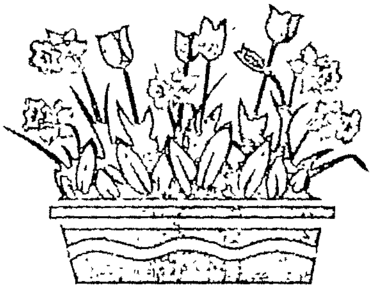

শিক্ষা
প্রগতি
সমাজসেবা
অসাম্প্রদায়িকতা

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি

৩০/৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট (চারতলা)
কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন : ২৪৪-৭৫৬৯

াদাকে সাদা ও কালোকে কালো লার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

দাম : ৮ টাকা

২য় বর্ষপূর্তি সংখ্যা

জুলাই ২০০২

২য় বর্ষ।। ১২ সংখ্যা

কাঁদকে হাসানোর কাগজ কাঁদকে হাসানোর কাগজ

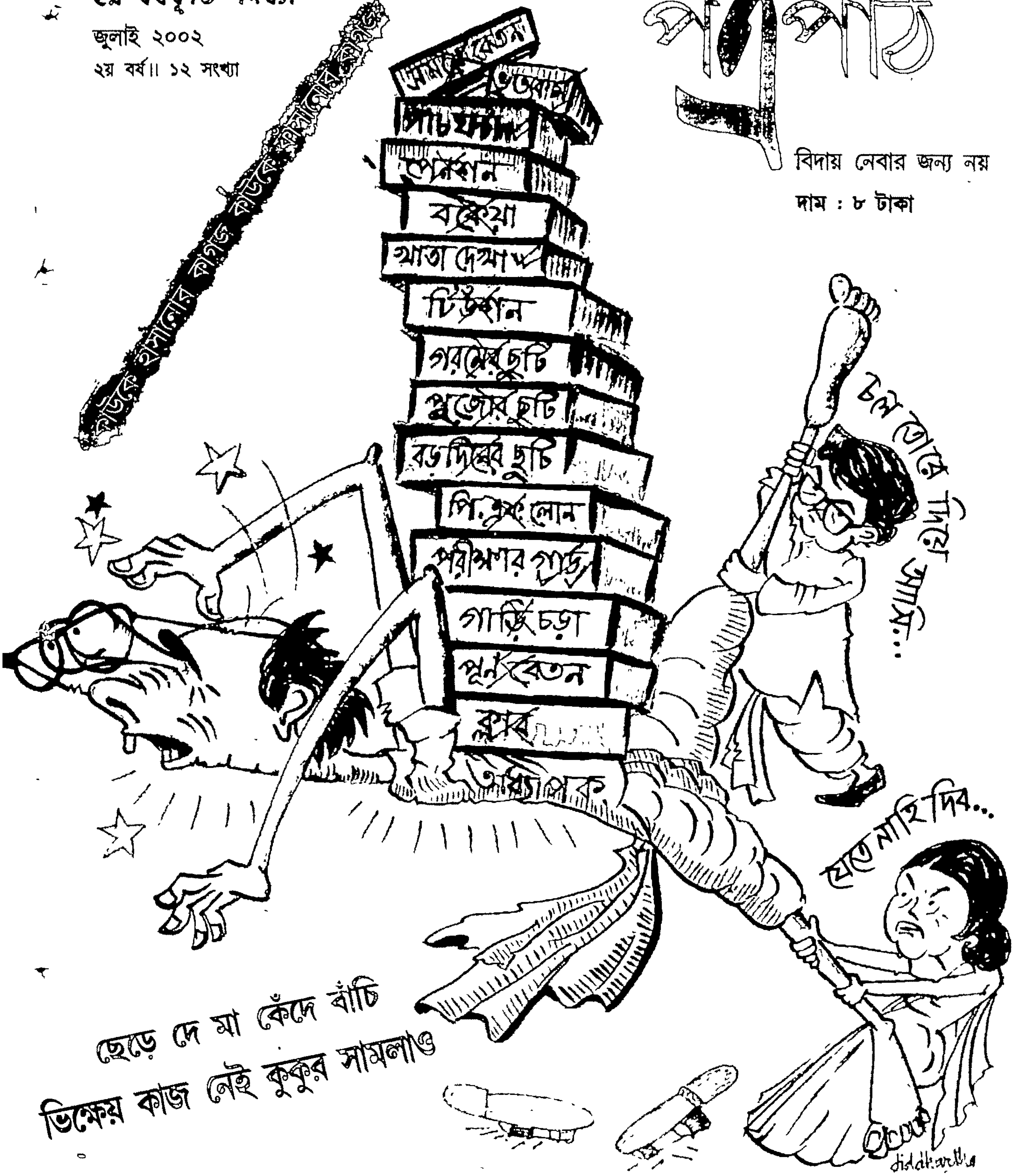

শুধু তোমার বাণী নয় গো............

প্রায়শই চিঠি অথবা ফোন আসে—পত্রপাঠ-এর সব সংখ্যা নিয়মিত আপনাদের হকার জোগান দেয় না। কেন দেয় না? আপনারা তো আর আমাদের মতো মাথামোটা নন, নিশ্চয় বোঝেন, 'পত্রপাঠ'-এর বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যা ঢের ঢের বেশি। যেহেতু 'পত্রপাঠ' কাউকে ছেড়ে কথা কয় না, অতএব পত্রপাঠ-এর শ্রীবৃদ্ধি যাঁরা চান তাঁদের চেয়ে, নিবৃত্তি যাঁরা চান তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। এমন অনেক বন্ধুর বদান্যতায় পত্রপাঠ বিস্তারের পথ বেশ বন্ধুর হয়ে উঠেছে। তাই "শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে......." হ্যাঁ মাঝে মাঝে একটু ক্ষেপে উঠুন। আপনার হকার অথবা স্থানীয় পত্রিকা বিক্রেতাকে বাধ্য করুন পত্রপাঠ রাখতে। কথা না শুনলে সেই সেই পত্রিকা-বিক্রেতার কাছ থেকে যাবতীয় পত্র-পত্রিকা কেনা বন্ধ করে দিন। পত্রপাঠ পাওয়া যায় না—ব'লে ওরা আপনাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করবে। আপনি দাপটের সঙ্গে জানিয়ে দেবেন—একথা ডাহা মিথ্যে। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের দুই ডাকসাইটে পরিবেশক —পাতিরাম বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট চৌমাথা) এবং শ্যামল বুক স্টোর (টেমার লেনের মুখে, 'দিপুর জর্দা'-র পাশে) পত্রপাঠ পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন। কোনো না কোনো পত্রিকার প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে এঁদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব পত্রিকা-বিক্রেতাকেই সংযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। সংকোচের বিহ্বলতা কাটিয়ে হা রে রে রে করে উঠুন; দেবদর্শন না হোক, পত্রপাঠ দর্শন হবেই।

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রপাঠ পেতে হলে গ্রাহক হোন।
"পত্রপাঠ" বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১২০৲ (একশ কুড়ি টাকা, ডাকযোগে)। বছরের যে কোনো মাস থেকে এক বছরের জন্যে গ্রাহক হওয়া যায়।
মানি অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট PATRAPATH নামে পাঠান এই ঠিকানায়—
PATRAPATH, 10J FERN ROAD, (GROUND FLOOR),
KOLKATA - 700 019
সম্পাদকের সঙ্গে ফোনযুদ্ধ করতে চাইলে সকাল ন'টার মধ্যে—
440-3803

সাদাকে সাদা ও কালোকে কালো বলার একমাত্র সহর্ষ মাসিকপত্র

২য় বর্ষ।। ১২ সংখ্যা।। জুলাই ২০০২

দাম : ৮ টাকা

কাউকে হাসানোর কাগজ
কাউকে ফাঁসানোর কাগজ

পত্রপাঠ

বিদায় নেবার জন্য নয়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী • তারাপদ রায় • সমরেশ মজুমদার • শঙ্করলাল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : শেখর আহমেদ

পরিচালন সমিতি ডাঃ তুষারকান্তি রায় • প্রদ্যোত কুমার মিত্র • বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • অঞ্জনা দত্ত • ডঃ শুভাশিস নিয়োগী • শচীন মিত্র

ভিক্ষা অতীব মধুর। মাধুকরী। পরম বৈষ্ণবের পক্ষে তাহা চরম উপাদেয়। শুধু কুকুরটি যদি পশ্চাতে না থাকে। না হইলে তখন তৃণ হতে সহিষ্ণু বৈষ্ণবেরও সহন ক্ষমতা বিলকুল উধাও। তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। ভিক্ষেয় কাজ নেই, কুকুর সামলাও। সেই করাল দন্ত কখনো শিক্ষকের ঘাড়ে, কখনো সংবাদপত্র পাঠকের বুকে, কখনো এমনকি পুলিশের হাতেও ঘ্যাঁক্ করে নেমে আসতে চায়। সেই নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী। ক্রন্দন-কাহিনীও বলতে পারেন।

সম্পাদকীয় □ ৩ পত্রপাঠ জবাব □ ৪ রাশি চক্কোর □ ৭ টাকা নিষ্প্রয়োজন □ ২০ নাট্য সুসংবাদ □ ৩৪ চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ □ ৪২ জবর খবর □ ৪৪ হেঁসেল □ ৪৬ ব্যঙ্গ সমাচার □ ৪৮ ট্যারা চোখে □ ১১, ১৬, ৪৫ কার্টুন □ ২, ১৭, ২৮, ৩৭, ৪০

প্রচ্ছদ কাহিনী বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ • মৈনাক মিত্র □ ১৪ ভিক্ষেয় কাজ নেই • পিনাকী ভাদুড়ী □ ২১ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি • বন্দনা রায় □ ২৭ আপনি মোড়ল • প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫
নিয়মিত . অকপটে • সমরেশ মজুমদার □ ১২ তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম • তারাপদ রায় □ ২৩ চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি □ ২৫
পুরনো কাসুন্দি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "নয়নচাঁদের ব্যবসা" থেকে □ ৫
গল্প · এতদিন কোথায় ছিলেন • ওম্বিকা গুপ্তো □ ১৮ বটকৃষ্ণের বেদনা • রীতা ভট্টাচার্য □ ২৯ মাখন সুন্দরী রোড • মিতা নাগ ভট্টাচার্য □ ৩৯

রসনাট্য · উল্টোপণ • শেখর আহমেদ □ ৮

এ ছাড়া : ফিউচার • দিব্যেন্দু দাস □ ২৪ বাণী • আইভান হো হো □ ২৬ মানবিক না পাশবিক • কৌশিক রায় □ ৩১ কর্পোরেশন প্রশস্তি • দিব্যেন্দু দাস □ ৩৮ ফজল আলির ফাজলামি • ফজল আলি □ ৪১

প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ কর্মকার
অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ কর্মকার • অরুণ সেন • জয়দীপ দাশগুপ্ত
কর্ম সহায়ক : অচিন্ত্য কারক • কৌশিক রায়

শেখর আহমেদ কর্তৃক ১০ জে, ফার্ণ রোড (গ্রাউণ্ড ফ্লোর), কলি-১৯ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৮-১০টা, সন্ধ্যা ৫-৯টা)
সম্পাদকীয় দপ্তর : (সন্ধ্যা ৫-৩০ থেকে ৮-৩০) ১০ বি, ফার্ণ রোড, কলি-১৯, মুদ্রণ দেবী সারদা প্রেস, ৩০এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলি-৯

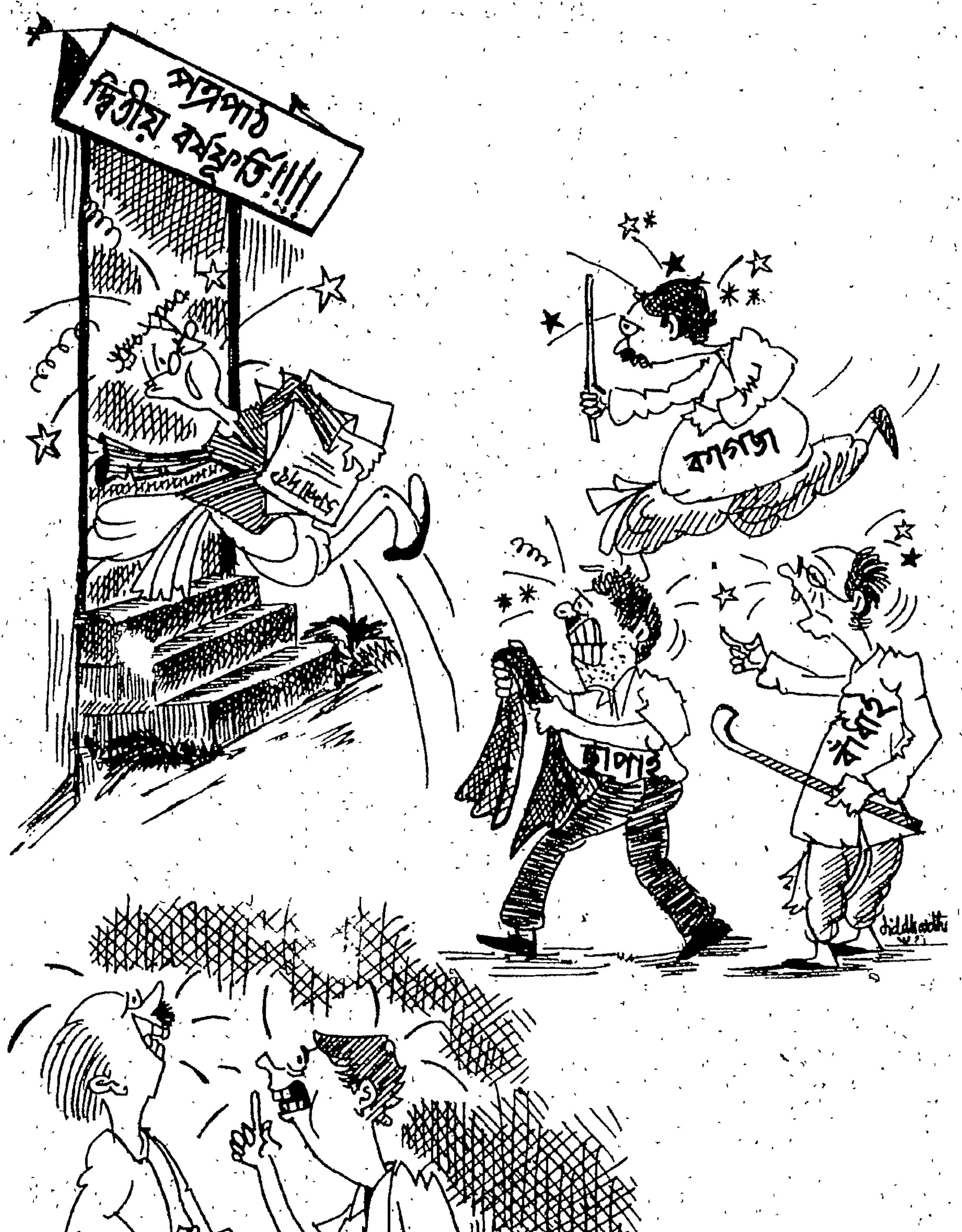

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

সম্পাদকীয়

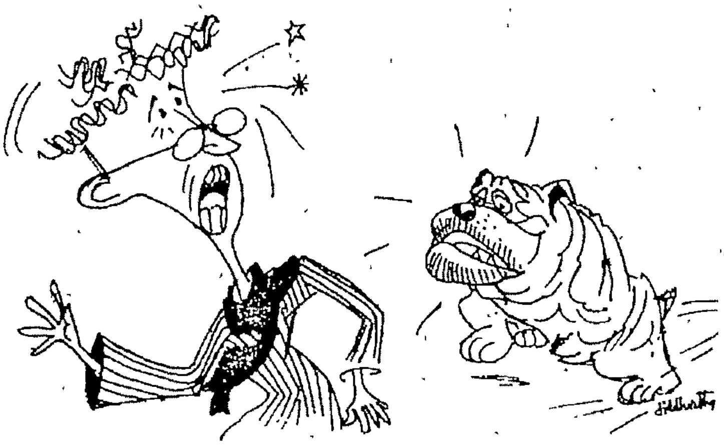

ফূর্তি বিষয়ক

পূর্তি হইলে ফূর্তি কাহার না হয়? দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে ডগমগ হইয়া সবকিছুতেই ফূর্তি দেখিতেছি। তিন বৎসর পুরিতে না পুরিতেই আহ্লাদে আটখান ভারতীয় জনতা পার্টি তাঁহাদিগের সুযোগ্য অনুচরবৃন্দ লইয়া গুজরাটে আনন্দোৎসবে মাতিলেন। আনন্দ প্রকাশের মাত্রা অসাবধানে কিঞ্চিদধিক হওয়ায় যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাবানন্দে দেশবাসীকে নাচাইলেন। সেই আনন্দে আদবানিজি উপ প্রধানমন্ত্রী হইতে চলিয়াছেন, মমতাজির কপালে পুনরায় মন্ত্রীত্বের শিকে ছিঁড়িতেছে।

বামফ্রণ্টের পঁচিশ বৎসর পূর্তি হইল। ফূর্তি করিতে করিতে ক্লান্ত তাঁহারা ইদানীং, শিক্ষক-অধ্যাপকদিগকে যৎপরোনাস্তি রগড়াইতেছেন। তাঁহাদিগের ভাত-কাপড় কাড়িবার হুমকি ছলে-ছুতোয় নিয়মিত দেওয়া প্রায় নিত্যকর্মে পরিণত করিয়াছেন। ইত্যবসরে মমতাদেবী শিক্ষক-অধ্যাপকদিগের মস্তকে কাঁঠাল রাখিয়া নূতন করিয়া হারানো মাটি ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা চালাইতেছেন।

জগৎ আনন্দময়। পত্রপাঠ দুই বৎসর পূর্ণ করিল। আমরা সকলকিছুতেই ফূর্তি দেখিতেছি। এমনকি শত্রুপক্ষের রোষ-কষায়িত চক্ষুতেও। ঈশ্বর যাহা করেন—সবই মঙ্গলের জন্য। সবকিছুর পশ্চাতে গভীর মঙ্গলের হাতছানি দেখিতে পান আস্তিক্যবাদী গণ। আমরা ক্ষীণদৃষ্টি, এসবের পশ্চাতে এবং সম্মুখে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র কিছুই নহে—কেবল গভীর অন্ধকার দেখিতেছি। অন্ধকারে ফূর্তির আনন্দে, অনাগত ভবিষ্যতে কে কাহার স্কন্ধে দাঁত বসাইবে, তাহা শত চেষ্টাতেও মালুম হইতেছে না। বুঝি বা অন্ধকার আরো গাঢ় হওয়া প্রয়োজন। চক্ষুষ্মানে দেহ অন্ধকার।

পত্রপাঠ জবাব

জবাব দিচ্ছেন : দ্বিতীয় সুগ্রীব

● আমরা গো-পালন করে জীবনধারণ করি, বাজারে হঠাৎ গো-খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। কি করি? —*তনয় দত্ত, কলকাতা-১২*

☐ লালুবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। স্টকে এখনো কিছু আছে ব'লে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর।

● আপনাদের পত্রিকায় ডাকমাশুল নেই কেন?

—*সামসুন্নেহার খাতুন, আসানসোল, বর্ধমান*

☐ না ডেকেই যথেষ্ট মাশুল দিতে হচ্ছে ।

● মৌলবাদ কি? —*কৌশিক দাস, চুঁচুড়া, হুগলী*

☐ লণ্ডভণ্ড পুজোর মন্ত্র।

● আপনাদের পত্রিকা কি খেতে পায় না? এত রোগা কেন?

—*অভয় বসু, পুরুলিয়া*

☐ একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছে ভাই। পেটের মধ্যে ইয়া রাঘব-**বোয়াল**দের ন্যাজের ঝাপ্টা সামলাতেই এখন প্রাণ যায়।

● এই সময়ের জনপ্রিয় টিভি-কবি কি সুবোধ সরকার?

—*সতী, গোসাবা, দঃ ২৪ পরগণা*

☐ **টিভি** এবং টিবি নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি না করাই ভালো।

● **হঠাৎ** করে পত্রপাঠের বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ থেকে ১২০ করা **হল কেন?**

—*কণিমা দাস, বি-জেমারী, বর্ধমান*

☐ **কত** করলে খুশি হন? অনেকেই পরামর্শ দিচ্ছেন ৪২০-এর।

● **আপনারা** কি 'অচলপত্র' হতে চান?

—*তৃষ্ণা চৌধুরী, কলকাতা-১৭*

☐ **না,** আমরা সচল থাকতে চাই।

● পত্রপাঠ-এব "গাঁযে মানে না আপনি মোড়ল" সংখ্যাটি পড়লাম। অন্যকে খোঁচা মারার আগে নিজেদের কথা ভাবুন। পত্রপাঠ-এব চেয়ে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" আব কে আছে?

—*বাধপ্রসাদ মোড়ল, মোড়লপাড়া, তাজপুব, দঃ ২৪পরগণা*

☐ কেন, আপনি!!

● "নারীবাদ" সংখ্যায দেখলাম সমরেশ মজুমদাব একটা সস্তা চটক ছেড়েছেন—"মেযেদের প্রকৃতি সব দিয়েছে কিন্তু বাবা হওয়াব ক্ষমতা দেয়নি।" একজন বিদগ্ধ লেখকের কলমে এমন মূর্খজনোচিত উক্তি অকল্পনীয়। আমি সবিনয়ে জানতে চাইতে পারি কি—প্রকৃতি সমরেশ মজুমদারকে মা হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন কি না!!

—*রাণী চ্যাটার্জী, টালিগঞ্জ, কলকাতা-২৬*

☐ অবশ্যই জানতে চাইতে পারেন। সমরেশ মজুমদার একজন ভারিক্কে লেখক কিনা, তাই প্রকৃতি তাঁকে একেবারে ডবল মা হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, মানে—মামা।

● সিগারেটমুখো সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যে আর বিশেষ পত্রপাঠ-মুখো হন না দেখি। কারণ কি?

—*শ্রী মুখার্জি, চন্দননগর, হুগলী*

☐ এমন শ্রী-মুখের আর্জির অভাবে।

● পশ্চিমবঙ্গে বন্য প্রাণীদের জন্যে একটা অভয়ারণ্য-র ব্যবস্থা করা যায় না? অন্তত আপনাদের সম্পাদকের বিহারের জন্যে?

—*অভয় পাল, কলকাতা-৭*

☐ আপনি কলকাতায় বসে থাকলে সেটা আর কী করে সম্ভব? বিহারে গেলেও হবে, শুনেছি সেখানে অরণ্যের রাজত্বই চলে।

পুরনো কাসুন্দি

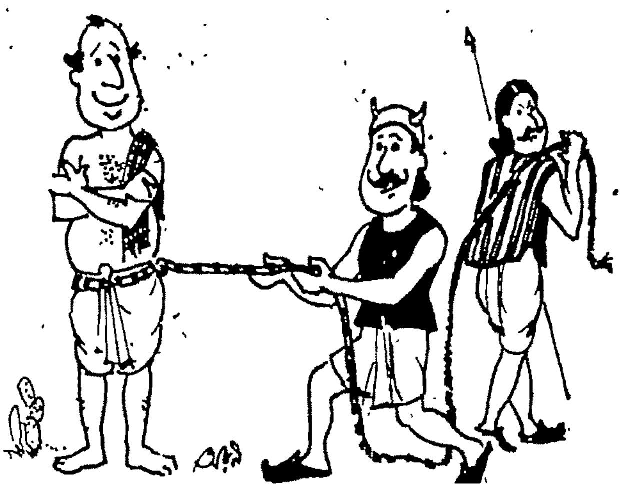

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "নয়নচাঁদের ব্যবসা" থেকে

চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা, পায়ের কোড়ে আঙুলের আগা পর্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্ত্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়। কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনও একটি পুণ্যকর্ম্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপ কর্ম সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিম কালে একটি পুণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটি করিলাম। গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তিরজা, আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। একফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা'র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া-দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল। মর-মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চান্দ্রাযণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক্ বোম্বাই ওলের মত হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ি লইয়া যাইবে, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁফরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা-ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তাপোষের উপর, কখনও তক্তাপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ-কোণে, সে-কোণে যমদূতেদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারি জন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটি মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কি না? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থায় যে শরীরে আমি মিত্তিরজা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরের সানবাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকী তিন জন মাঠে-ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল,—"খুব মজার লোক তো তুমি। এত লোককে আমরা লইয়া যাই,—কিন্তু সমস্ত রাত্রি পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় নাই। আচ্ছা, ভাল, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। টিকি না পাইলে আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে, এই যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাদের দুই গালে দুই থাব্ড়া মারে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?"

যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে কি জন্য? আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিব, সেইজন্য?

আমি উত্তর করিলাম,—"তাও নয়। এই যে তারের খবর আছে, সেই

টুক্-টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তাবেব খবর বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য লোকে মাথায টিকি বাখে।"

যমদূত বলিলেন,—"ওঃ। বটে। সেইজন্যে? এখন বুঝিলাম।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিযা যমদূত বলিলেন,—" তোমাদেব পাড়াব নেই-আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে?"

আমি বলিলাম,—"জানিতাম বই কি, আজ কয় বৎসব তিনি মরিয়া গিযাছেন, শুনিয়াছি, মরিয়া ভূত হইযাছেন।"

যমদূত বলিলেন,—"হাঁ। তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যমযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তিনি বলিযাছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।"

আমি বলিলাম,—"এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুব যে রাঘব গাঙ্গুলিব।"

যমদূত বলিলেন,—"হাঁ, এ পুষ্করিণী বাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন যে, আমার—সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবাব জন্য।"

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম,—"কি হইযাছিল, বলিবেন?"

যমদূত বলিলেন,—"বলিব না কেন, বলিব। তবে তুমি যে মহিরাবণেব বেটা অহিবাবণের মত পেছলা-পিছলি কব। সেজন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাই হউক, শুন।"

নেই -আঁকুড়ে দাদা

যমদূত বলিতেছেন,—নেই-আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকালে বাড়ীব নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলাগাছে দিব্য একখানি আগুট পাতা হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে করিলেন যে, কা'ল এই আগুট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্ম্ম, সেই রাত্রিতে তাঁব মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যইবাব নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবাব একাদশীব দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতবাং আমবাও তাঁহাকে লইতে যাইলাম। বিধবাকে লইযা বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল। সেই ঘবের ভিতর, সেই রাত্রিতে, বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেযে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূত-দিগকে তাড়াইযা দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিযা হিড় হিড় করিযা নিযা লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইযা উপস্থিত কবিলাম। বিধবার মাথায ক্রমাগত ডাঙ্গস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গসের প্রহাবে জব-জর হইযা বিধবা পবিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে,—"হায বে! যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম আমার এরূপ সাজা দিত?" যমের কানে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাগি কি বলিতেছে?" আমরা বলিলাম,—"বিধবা বলিতেছে যে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, যম কি করিয়া আমায় এরূপ সাজা করিত।" যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,—"নিযে আয় তো রে ওর নেই-আঁকুড়ে দাদাকে।" দেখি কি করিয়া সে আপনাব বোন্‌কে বাঁচায?" নেই-আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দ্দশা হইযাছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম—"চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।" তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"আমার কি সময় হইয়াছে?" আমরা বলিলাম,—"না, আপনার এখনও সময হয় নাই, এই শবীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ী যাইতে হইবে। একটা কথার মীমাংসা কবিযা আপনি ফিরিযা আসিবেন।" নেই-আঁকুডে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কথাটা কি? শুনিতে পাই না? যমের বাড়ী গিয়া তাঁহাব ভগিনী কি বলিযাছিলেন, আমরা সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"বটে। আচ্ছা, চল যাই।" পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন,—"দেখ, এই স্থলে আমি একটি দেবালয কবিব মানস করিযাছি।" আবাব খানিক দূর গিয়া,—"এই স্থলে আমি একটি অতিথিশালা কবিব, আমার এই ইচ্ছা।" আবার খানিক দুব গিযা, "সাধাবণে জলপান কবিবে বলিয়া এই জলাশয়টি আমি করিযা দিযাছি।" এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা, ঘাট কবিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইযা বলিতে লাগিলেন। যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম। যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিযা দিলাম। যম বলিলেন," নেই-আঁকুড়ে শোন্, তোব বোন্ ব্রাহ্মণের ঘবের বিধবা। একাদশীর দিন আগুট পাতে ভাত খইবাব মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তাব মাথায ডাঙ্গস মাবিতে হুকুম দিযাছি। সে বলে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমায একপ সাজা দিতে পাবিত না। তার আস্পর্দ্ধাব কথা শুনিযা তোরে আমি এখানে আনিযাছি। কি কবিযা বোন্‌কে বাঁচাইবি, বাঁচা।" নেই-আঁকুডে দাদা বলিলেন,—"আমাব পুণ্যের অর্দ্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমাব ভগিনীকে আপনি খালাস দিন্।" নেই-আঁকুড়ের কি পুণ্য আছে দেখিবার নিমিত্ত যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতাপত্র দেখিযা চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। বাগিযা যম বলিলেন,—"শুনলি তো নেই-আঁকুড়ে, তোব একছটাকও পুণ্য নাই। বোন্‌কে তাব আবার ভাগ দিবি কি?" নেই-আকুঁড়ে উত্তর করিলেন,—"পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন!" যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। আমবা বলিলাম,—"হাঁ মহাশয। পথে আসিতে আসিতে, এখানে দেবালয় কবিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবাব মানস আছে, নেই-আকুঁডে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।" যম আবও রাগিযা উঠিলেন। বলিলেন,—"ভণ্ড। সে সকল কাজ তো তুই করিস্ নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর কবিলেন,—"আমাব ভগিনী আগুট পাতে ভাত খাইয়াছিলেন, না কেবল মানস করিযাছিলেন।" যম বলিলেন,—"মানস করিযাছিল।" নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,—"তবে?" যম বুঝিলেন। যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপেব শাস্তি দিতে হয, তাহা হইলে পুণ্যেব ফল ও দিতে হয। বে-আইনি কবিয়া তিনি যে বিধবার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা আসিযা বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইযা গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিবিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পবে নেই-আঁকুড়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইযা তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

এই যে তারের খবর আছে, সেই টুক্-টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।

রাশি চক্কোর

জ্যোতিষসান্ত্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

পত্রপাঠ সম্পাদকরাশি : সম্পাদকের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার রাশিফল বিশেষভাবে গণনা করা হইয়াছে। এ মাসে সম্পাদকের ভাগ্যে বিশেষ সমাদর যোগ রহিয়াছে। গৃহে বহিষ্কারযোগ অর্থাৎ গৃহিনী কর্তৃক বহিষ্কৃত হইলেও কাগজের দোকান, ছাপাখানা ও দপ্তরীখানায় বিশেষ সমাদর লাভ করিবেন। যতই দূর দিয়া হাঁটুন না কেন, উহাঁরা ঠিক নজর করিবেন এবং সম্পাদক মহাশয় সবিনয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেও তাঁহারা ততোধিক বিনয় সহকারে এবং প্রয়োজনে কণ্ঠদেশে উত্তরীয় (গামছা) স্থাপন পূর্বক অন্দরে লইয়া যাইবেন। ইহার পর যাহা যাহা ঘটিবে, ভাবিবেন না ভাগ্যদমন গণনায় অকৃতকার্য হইতেছেন, নিতান্তই চাকুরিটি খোয়ানোর ভয়ে লিখিতে কলম সরিতেছে না।

পার্টি সদস্য রাশি : শত্রুদলের কোনো বন্ধুর মায়ের শ্রাদ্ধে হাজির থাকার অপরাধে আপনার আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজন হতে পারে। প্রবল রাগে তখন আপনি দলত্যাগের চিন্তা শুরু করবেন। এবং প্রকাশ্যে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করবেন। তবে এ মাসে আপনার গ্রহ সন্নিবেশ ভালো থাকায় দলত্যাগের আর প্রয়োজন হবে না, তার আগেই রাতের অন্ধকারে আপনার গ্রহত্যাগের (পৃথিবী গ্রহ আর কি) ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

প্রেমিক রাশি : অবশেষে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আপনার প্রাণাধিকা আপনার প্রস্তাবে রাজি হবেন। কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশ দিতে গিয়ে কপালে পুলটিশ নিয়ে ফিরতে হতে পারে, যখন আবিষ্কৃত হবে, সেখানকার নবাগত ক্লার্কটিকে আপনার এই প্রাণেশ্বরীই বছর খানেক নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিলেন। বিয়ের উদ্যোগ অবশ্য আপনি কিছুতেই পরিত্যাগ করবেন না। তবে সে উদ্যোগ ওদের চার হাত এক করার—ভবিষ্যতে ওই দুটি করকমল যাতে কোনোভাবেই আপনার দিকে না ধায়—সেই উদ্দেশ্যে।

বাংলা ব্যাঙ রাশি : এ মাসে বাংলা-লাভ যোগ দেখা যায়। গ্রামে অনুষ্ঠান করিতে যাওয়ার পূর্বে মাত্রাধিক বাংলা সেবন বিধেয়। কেন না, গানের নামে অভিনব লম্ফঝম্প দেখিয়া ও কানের পর্দা-ফাটানো বিকট চিৎকার শুনিয়া অনাভিজ্ঞ গ্রামবাসীগণ নিতান্তই বাংলা মতে আপ্যায়ন করিতে পারেন। পূর্ব হইতে বাংলা ব্যাঙ বাংলা-সেবিত থাকিলে বেদনা কম হইবে।

ফ্ল্যাট মালিক রাশি : যাঁরা এই মাসেই নতুন ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁদের কাছে পাড়ার দাদারা যে পরিমাণ চাঁদা দাবী করবেন, তাতে 'ফেল্যাট' হয়ে যাওয়ার অশুভ সম্ভাবনা দেখা যায়। এমতাবস্থায় পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দার কাছেই একমাত্র সহানুভূতি পাবেন। সমবেদনায় বিগলিত হয়ে তিনি জানাবেন— তাঁরও একই দশা হয়েছিল।

মাস্টার রাশি : আপনাদের এখন সময় দারুণ। মাসের সাতাশে কিংবা পরের মাসের সাতাশে বেতনের কারণে টিউশনের ওপর থেকে অশনি সঙ্কেত কেটে যেতে পারে। তবে অত্যুৎসাহী শিক্ষিত বেকারদের হাতে পড়ে প্লাস্টারযোগ অসম্ভব নয়। গ্রহনিবারণার্থে এই যোগ-কে মহাযোগে পরিণত করতে পারলে অবশ্য কর্মসিদ্ধি। কেবলমাত্র প্লাস্টারের কল্যাণেই জমে থাকা চারমাস ছুটি ভোগ করতে করতে চুটিয়ে টিউশন চালিয়ে যেতে পারবেন। ততদিনে আশা করা যায় সরকার হয়ত আর

আপনাদেরকে মাহিনে দেওয়ার অবস্থায় থাকবে না। তাতে বয়েই যাবে আপনার।

কেরানি রাশি . এ মাসে আপনার কর্মে গতিবৃদ্ধি যোগ আছে এবং সর্ব কর্মেই আপনি ফাঁকিবাজ—এ কথাটি শত্রুরা আর রটনা করতে পারবে না। সে গতি দৌড়ে ট্রেন ধরার কালে। গতি আরো বর্ধিত হবে, যখন অফিসে গিয়ে শুনবেন, আপনার বিরুদ্ধে কোনো এক তাবড় নেতার শ্যালক কমপ্লেন করেছে। তৎপরে পুনঃ গতিবৃদ্ধি—অফিসারের কাছে। গতির আরো অগ্রগতি ইউনিয়ন অফিসের দিকে। তৎপরে পার্টিনেতার বাড়ি। চূড়ান্ত গতি— সেটা অবশ্য আপনার নয়, আপনার আত্মীয় স্বজনের—হাসপাতাল অভিমুখে—আপনাকে দেখতে।

পত্রপাঠ নতুন লেখক-লেখিকাদের কাছে লেখা আহ্বান করছে। তবে মনে রাখবেন, লেখা পত্রপাঠ এর সঙ্গে মানানসই হওয়া প্রয়োজন। যাঁরা শুধুই লেখেন, পড়েন না, তাঁরা দয়া করে করুণাভারে পত্রপাঠকে ভারাক্রান্ত করবেন না।

উদীয়মান অঙ্কন-শিল্পীদের আঁকার সুযোগ দেয় পত্রপাঠ। তরুণ শিল্পীরা যোগাযোগ করুন।

আপনার সৌভাগ্য দমন করতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন—

জ্যোতিষসান্ত্রী সৌভাগ্যদমন মহারাজ

প্রতি ইংরাজি মাসের ৩২ তারিখে মহারাজ রাত্রি নবম প্রহরে দপ্তরে হাজির থাকেন।

১৯৮০ সাল নাগাদ আমাদের সম্পাদক মশাই এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতায় এটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৮১ সালে আকাশবাণীর যুববাণী কেন্দ্রে এটি অভিনীত হয়, উক্ত বছরে দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত যুববাণী উৎসবে এটি অভিনীত হয় ও প্রথম স্থান অধিকার করে। ওই বছর ২১ জুন তারিখে আকাশবাণী কলকাতা ক কেন্দ্র থেকে পুনরায় সম্প্রচারিত হয়। কিন্তু সম্পাদক মশাই এটি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সম্ভবত ঘরের কেচ্ছা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই। সম্প্রতি সম্পাদক গৃহিনীর অসীম আনুকূল্যে এটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। এবং এ তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় কালে শুধু পরিচালনা নয়, পাত্র চন্দন-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন খোদ সম্পাদক মশাই। কিন্তু এটিই যে তাঁর ভবিষ্যৎ দর্শন হয়ে উঠবে তা তিনি তখন বুঝে উঠতে পারেননি। ঘরের কেচ্ছা হাটের মাঝে টেনে আনার জন্যে আমরা সম্পাদকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

—পত্রপাঠ-এর কর্মীবৃন্দ

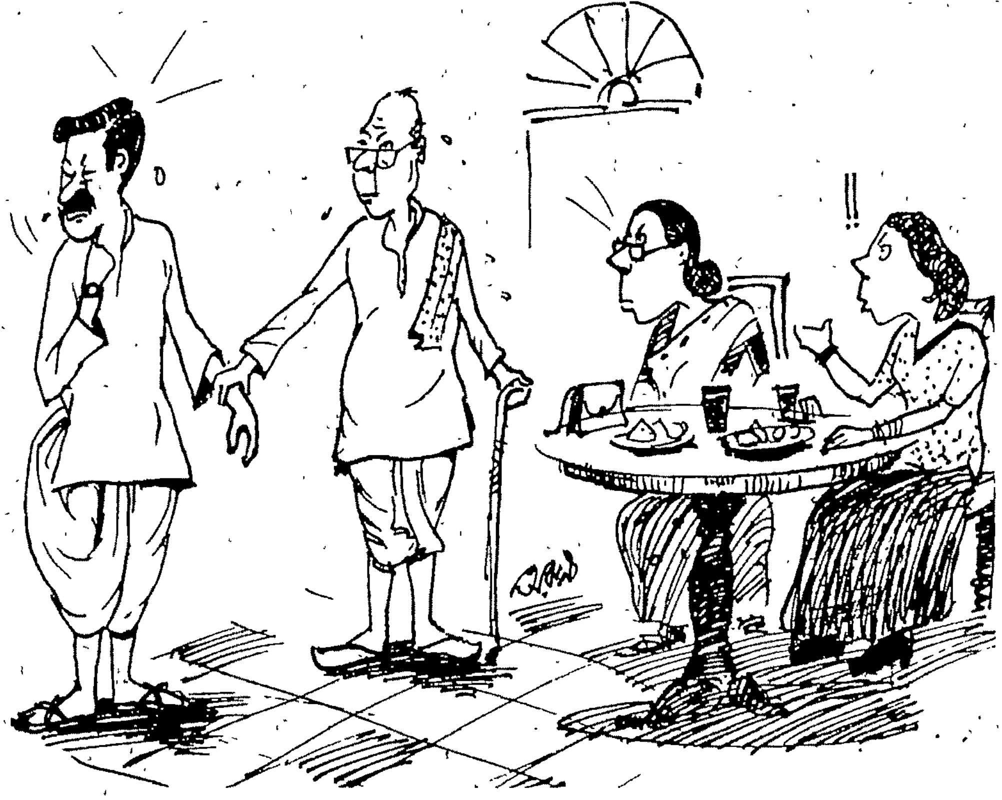

উল্টো পণ

শেখর আহমেদ

[মঞ্চ অন্ধকার। নেপথ্যে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যায়।]

ঘোষক : *একদা এ দেশে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রচলন ছিল। অর্থাৎ কিনা ছেলেরাই শ্বশুরঘর করতে যেত। এই সেদিন অব্দি মেয়ের বাপেরা গুনে গুনে পণের টাকা নিয়ে তবেই জামাতাকে কন্যার গলায় মালা পরানোর অধিকারটি দিয়েছে। এদানিং কি লেখাপড়া, কি খেলাধুলো— ছেলেদের যা দশা। সঙ্গে মেয়েদের মারকাটারি বোলবোলাও। সেই শুভদিন সমাগত প্রায়, যখন আবার মেয়েরা ছেলেদেরকে বিয়ে করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলবে আর পণের টাকার জন্যে পাত্রের বাপের রাতের ঘুম উবে যাবে। মাননীয়া মহিলা দর্শকবৃন্দ, আপনারা এখন থেকেই কোমরে আঁচল জড়াতে পাবেন। এবং হতভাগ্য পুরুষবন্ধুরা, কাছে জলের বোতল রাখবেন, মধ্যে মধ্যে গলা শুকিয়ে ওঠার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।*

[আলো জ্বললে দেখা যায় একটি মাঝারি মানের ড্রয়িং রুম। দুটো খাবারের প্লেট টেবিলে রাখা। প্লেটে সিঙাড়া ও রসগোল্লা। দুটি মেয়ে বসে আছে। প্রথম জনের বয়স তিরিশ ছুঁই ছুঁই। চম্পা। পরনে শাড়ি। চোখে চশমা।

দ্বিতীয় জনের বয়স বাইশ-তেইশ। শম্পা। পরনে মিডি ও স্কার্ট। ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছে দু'জনে।]

চম্পা : এই যাঃ। আবার লোডশেডিং হয়ে গেল। *(পাশ থেকে একটা হাতপাখা তুলে হাওয়া খায়।)*

শম্পা : দ্যাখ্ দিদি, আজকালকাব ছেলেগুলো অনেকটা বশ হযেছে বটে, কিন্তু তেজ এখনো যায় নি। কী, না আমরা চাকরি করি।।

চম্পা . হুঁঃ। চাকরি করি।।

শম্পা : আরে বাবা সেদিন কি আর আছে? তোরা যে এখন তিন নম্বর কেরানি। আর আমরা? বড় বড় অফিসার। খেলাধুলো, গানবাজনা, কোন্‌টায় তোরা পারিস?

চম্পা · আবে ওই দুঃখেই তো বিয়ে করলাম না। সব কটা অকাল কুষ্মাণ্ড। বলি, বিয়ে করে ঘরে আনলেই হল? তাকে নিয়ে ঘব তো করতে হবে। গাধাবোট টেনে মরাব চেয়ে দিব্যি আছি বাবা। চাকরি-বাকরি করি, একা ফ্ল্যাটে থাকি।

শম্পা : *(আদুরে গলায়)* তবে দিদি, আমিও না হয় তোর মতো থাকি! আমার বিয়ের জন্যে কেন তুই—

চম্পা : আরে না না, তা হয় না। তোর কিনা কাঁচা বয়েস....কিন্তু ছেলের বাপটার আক্কেল কি বল্ দেখি? বলি, ছেলে সাজাতে কতক্ষণ লাগে? লোড্‌শেডিংযে সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। বাড়িতে একটা জেনাবেটোবও নেই? একেবারে ভিখিরি। আবার খেতে দিয়েছে দ্যাখ্। সিঙাড়া আর রসগোল্লা। কম্‌প্লিটলি ব্যাকডেটেড্ আর গেঁইয়া। কী কবে যে কলকাতায় থাকার পারমিশান পায় এরা। ছ্যাঃ। আমি ওসব ছুঁয়েও দেখব না।

শম্পা : তার চেয়ে চল্ বেলেঘাটার পাত্রটা দেখি গে।

চম্পা : না না, তা হয না, আমরা কিনা ভদ্রলোক।

[ধুতি পরা লজ্জাবতী লতার মতো পাত্র-কে সঙ্গে নিয়ে পাত্রের পিতার প্রবেশ]

বাবা : এই যে, এসো এসো বাবা চন্দন। আহা ভয কি, এসো, আমি তো আছি। কোনো ভয নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ এখানে বসো। না না আমি যাইনি। আছি—আছি।

[পাত্রের গুটিসুটি উপবেশন]

চম্পা : (গলা ঝেড়ে) আপনি একটু পাশের ঘরে যান।

বাবা : অ্যাঁ—ও, আচ্ছা—

চন্দন : বা—বা!

বাবা : ভয় নেই বাবা ভয় নেই, আমি এই দরজার ওপারেই আছি। *(প্রস্থান)*

শম্পা : (আস্তে) দিদি, এ তো তালপাত্‌র সেপাই।

চম্পা · (আস্তে) গোঁফজোড়াটা দেখেছিস? মুড়ো ঝাঁটা। তোর ঘর ঝাঁটাবাব বড় সুবিধে হবে।

শম্পা : মুখটা যে হুতুম প্যাঁচাকে হার মানায।

চম্পা : দাঁড়া, ইন্টাবভিউটা সেরে নিই।

[চম্পা উঠে শাড়িটা গাছকোমর করে জড়িয়ে নেয়। এক পা এক পা করে শিকারীর ভঙ্গিমায চন্দনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শম্পা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ছোট ডায়েরি বের করে, তারপর পেন নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। চম্পা আচমকা ধমকের ঢঙে চিৎকার করে ওঠে]

চম্পা : নাম কি??

চন্দন : (ঘাবড়ে, পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে) আজ্ঞে, চন্দন।

চম্পা : আ—জ্ঞে—চন্দন।।

শম্পা : (ডাযেরিতে নোট করতে করতে) মবে যাই মরে যাই। চন্দন কাঠেব গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল।

চম্পা : বলি চন্দন কী? চন্দন কাঠ না চন্দন ধূপ?

চন্দন : আজ্ঞে চন্দন কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায।

চম্পা : হ্যাঁ, ঠিকঠাক উত্তর দেবে। হুম্। লেখাপড়া কদ্দূর?

চন্দন : আজ্ঞে বি. এ. পাশ করেছি।

চম্পা · উদ্ধার করেছ। পাশ না অনার্স?

চন্দন : পাশকোর্স।

শম্পা : এঃ, পাশকোর্স।

চম্পা : ডিস্টিংশন ছিল?

চন্দন : না—দু নম্ববের জন্য।

চম্পা . চোওওপ! একদম বেশি কথা বলবে না। যতটুকু জিজ্ঞেস করব, ততটুকুই উত্তর দেবে।

চন্দন : আজ্ঞে ভুল হয়ে গেছে।

চম্পা : আর যেন না হয। ঠিক আছে। দেখি, একবার উঠে দাঁড়াও তো, মাপজোখগুলো করে নিই। শম্পা, টেপ্‌টা দে তো।—অ্যা—ই। সোজা হয়ে দাঁড়াও। হাতদুটো উঁচু করো। *(চন্দন দাঁড়ায়। শম্পার কাছ থেকে দর্জির ফিতে নিয়ে চম্পা চন্দনের ছাতির মাপ নেয়।)*—এ্যা—এ্যা—ছাতি হল গে এই— তেত্তিরিশ।—শম্পা লেখ রে।

শম্পা : বড্ড রোগা—তেত্তিরিশ।

চম্পা : দেখি দেখি, বাইসেপ্‌টা—আঃ! ফুলিও না, ন্যাচাবাল থাকতে দাও। সা—ড়ে সাত। নাঃ নিতান্তই প্যাঁকাটি। আহা—হা—বসলে কেন? দাঁড়াও হাইট্‌টাও মেপে নিই। পাঁচ ফুট—দশ ইঞ্চি। অ্যাঃ, এই একটি দিকেই যা আছ দেখছি। কই নাও, এবার বসো। শম্পা, কাগজটা আমায দে, আর তোর কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তো কর।

[শম্পার কাছ থেকে ডায়েরি ও কলম নিয়ে চম্পা বিড়বিড় করে কী সব হিসেব কষতে থাকে।]

চম্পা : তেত্তিরিশ প্লাস সাড়ে সাত প্লাস পাঁচ দশ। একুনে হল....

[শম্পা বাঁকা চোখে চন্দনের দিকে তাকায়। মুখ দিয়ে তাচ্ছিল্য সূচক শব্দ করে।]

শম্পা : খেলাধুলো করতে পারেন?

চন্দন · হ্যাঁ—অ্যা—

শম্পা : ফুটবল?

চন্দন : না।

শম্পা . ক্রিকেট?

চন্দন . না। লেগে যাবে না?

শম্পা বাহ্ বাহ্, দারুণ বীরপুরুষ। তা, কী খেলতে পাবেন?

চন্দন : আজ্ঞে, ক্যারাম, লুডো, তাস—

শম্পা : সাবাশ, সাবাশ।

[পাত্রের পিতার প্রবেশ]

বাবা . এই যে মা, হয়ে গেছে আপনাদের?

চম্পা : হ্যাঁ হযে গেছে। একেবারে হ—যে গেছে।

বাবা : চন্দন, তুমি একটু ওঘবে যাও। *(পাত্রের প্রস্থান)* তা মা, আপনাদের মতামতটা?

চম্পা : দেখুন, আমরা স্পষ্ট কথা বলতে ভালোবাসি। মেয়ে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, চাকরি করে আটহাজার টাকার। সোজা কথা—চলবে না।

শম্পা . ছেলে তো প্যাঁকাটি!

চম্পা : আব যা গোঁফ? ঝাঁটা!

বাবা : না না, অত নিষ্ঠুর হবেন না। মা-মরা ছেলে। আজ দু'বচ্ছর চেষ্টা করেও ছেলেটাকে পাত্রীস্থ করতে পারলাম না। না হয় মারুতির সঙ্গে পণের টাকাটা ওই তিরিশ হাজারই দেব।

চম্পা : শ-ম্পা।

শম্পা : দি—দি, লট্‌পট্—

চম্পা : দেখুন, সোজা কথা,—মানাচ্ছে না।

বাবা . দোহাই, আমি হাতজোড় করছি। পণের টাকাটা পঞ্চাশ হাজারই করে দেব।

চম্পা : পঞ্চাশ হাজার।

শম্পা : পঞ্চাশ হাজার।

চম্পা : বেশ। কিন্তু কোত্থেকে দেবেন?

বাবা : নাহয় ভদ্রাসন বেচেকিনেই দেব। নাহয় গাছতলায় থাকব। আমি হাতজোড় কবছি। মা-মরা ছেলে।

চম্পা : আচ্ছা। সামনের সপ্তায় একবার রিং করবেন। না না, চলেই যাবেন।

বাবা · তবে আশা দিচ্ছেন?

শম্পা : আঁশা? বেলেঘাটা হাতে আছে এখনো।

চম্পা : কোনো আশা দিচ্ছি না। আর হ্যাঁ, যাওয়ার সময় ছেলেব মেডিকেল রিপোর্টগুলো নিয়ে যাবেন।

বাবা · কেন, মেডিকেল রিপোর্ট কেন?

চম্পা : না, মানে ওই, এইচ আই ভি আছে কিনা একটু জাস্ট দেখে নেব।

বাবা . না না, ছেলে আমার রোগা বটে, তবে স্বাস্থ্য খুব ভালো।

শম্পা : আচ্ছা, চলি তবে। আবার বেলেঘাটার পাত্রটা দেখে যেতে হবে। নমস্কাব।

বাবা : আচ্ছা নমস্কাব। একটু মনে রাখবেন।

চম্পা : হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো রাখবই।

[মঞ্চ অন্ধকার। সানাইয়ের শব্দ। ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যায়—এরপর কোনো এক বৈশাখী পূর্ণিমায় শম্পা দেবী শ্রীমান চন্দনের কণ্ঠে দড়ি, থুড়ি, মালা বেঁধে নিজ নিকেতনে নিয়ে গিয়ে তুললেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বসার ঘর। শালোয়োর কামিজ পরিহিতা শম্পা পায়চারি করছে। ঘড়ি দেখছে। আরো অস্থির।]

শম্পা : *(আপন মনে)* উঃ ...আটটা বাজে, এখনো ফেরার নাম নেই? ওই যে, এতক্ষণে বাবুর আসার হল। আসুক আজ। এমন শিক্ষা দেব না। দাঁড়াও, আমি বুঝতেই দেব না যে আমি দেখতে পেয়েছি। *(চন্দন প্রবেশ কবে পিছন দিয়ে সুট করে কেটে পড়ার চেষ্টা করে)* ওমা, এ যে চুরি করে পেছন দিয়ে ভেতবে পালাচ্ছে। *(জোরে)* এই যে, দাঁড়াও। বলি, কোথায় থাকা হয়েছিল এতক্ষণ?

চন্দন : না—মানে—

শম্পা : কী না মানে? অ্যাঁ, না-মানে মানে কি? বলি বাজে তো আটটা। কটায় অফিস ছুটি হয়? আমি তো ছ'টায় বাড়ি চলে আসি। কোথায় থাকা হযেছিল ছুটির পর? অফিসের বস্-টি নিঘ্‌ঘাত মেযেছেলে, তাই না?

চন্দন : না মানে—

শম্পা : আবার না-মানে।!

চন্দন : বাবার শরীবটা খারাপ, তাই—

শম্পা : অ্যাঁ? বাপের বাড়ি গেছিলে?? আমার অনুমতি না নিয়ে???

চন্দন : কী হয়েছে? রাস্তাযই তো পড়ে।

শম্পা · ঘাড়ের ওপব পড়ুক না। ছাদের ওপব দিযে হাঁটতে হোক না! আমার পারমিশান না নিয়ে কোন সাহসে যাও? বড্ড বাড় বেড়েছ! কবতে হবে না দু'হাজার টাকার চাকরি। তার চেয়ে বাড়ির কাজকামগুলো শেখো, কাজে দেবে। এই যে, শাড়িটা এ কী ইস্তিরি হয়েছে? এখানে মাড়ের দাগ কেন? আর ঠাকুব ব্যাটাচ্ছেলে যা রাঁধে, মুখে তোলা যায না। কাল থেকে রান্নাটা শেখো। এক মাসের মধ্যে রান্না শিখে নিতে হবে। সামনের মাস থেকেই ঠাকুরকে ছাড়িযে দেব।

চন্দন : শোনো শম্পা—

শম্পা . শোনো শম্পা?? বউযেব না[illegible] করছ? এতদূর আস্পদ্দা?— কোনো শোনাশুনি নেই!

চন্দন : আ—আমি রাঁধব?

শম্পা : না-আ—পুজো করবে! বাপের সুপুত্তুব। *(চন্দনের চিবুক ধবে নেড়ে দিতে দিতে)*

চন্দন : পারব না।

শম্পা : কীঈ?

চন্দন . পারব না।

শম্পা : কী পারবে না?

চন্দন : রাঁধতে।

শম্পা : ও। পাববে না?

চন্দন : না।

শম্পা · পা—রবে না?

চন্দন : না—আ—

শম্পা ঠিক আছে, ঠিক আছে। খুব ভালো। তবে তুমি বাপের বাড়িতেই যাও, বাপেব আদবেব দুলাল। ভাবো একবার! বউয়ের অবাধ্য হওযা? আমি কালই ডিভোর্স ফাইল সুট করব।

চন্দন · (প্রায় আর্তনাদ করে) অ্যাঁ—অ্যা—অ্যা?

শম্পা হ্যাঁ—অ্যা—অ্যা!

তৃতীয় দৃশ্য

[পার্ক। তিন নিপীড়িত স্বামী—রমেন, অসিত ও চন্দন অস্থিরভাবে পায়চাবি করছে।]

রমেন : উঃ আর পারা যায় না মাইরি! বউ না তো, এক একজন মহিলা বাবণ। এই বলে চা করে দাও, এই বলে আলনা গুছিয়ে দাও!

অসিত : তবু ভালো। এ তো কিছুই নয। আমাব বউ কাল বললে, কাল থেকে আমার কাপড় তুমি কেচে দেবে।

বমেন : এতেই শেয? আজ সকালে আমাকে দিযে জুতো পালিশ করিয়েছে · ভাই অসিত, আব পাবছি না রে!

অসিত : ওরে রমেন, আমাকে যে বোজ বাত্রে পা-টিপে দিতে হয়। নইলে ওনার ঘুম আসে না। শা-লা—দেব একদিন—

বমেন : দাঁড়া দাঁড়া। শ্রীমান চন্দন যে একেবারে চুপচাপ। কী গুরু, ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট বউ নিযে দিব্যি জমিয়ে আছ?

চন্দন : হ্যাঁ, দিব্যি আছি। মাথার চুল ছিঁড়ছি।

অসিত
রমেন } কেন? কেন?

চন্দন : আত্মহত্যাটুকুই বাকি আছে।

রমেন : সে—কি—রে শুরু?

অসিত : আরে খুলেই বল না ভাই।

চন্দন : সব সহ্য করছিলুম। কিন্তু আর পারা যাচ্ছে না। কাল আদেশ হয়ে গেছে, স—ব ছেড়ে দিয়ে এবার দেবীর বন্ধনকার্যে নিযুক্ত হতে হবে।

রমেন : খবরদার না।

চন্দন নইলে ডিভোর্স। বাপের বাড়ি পাঠিযে দেবে। কিচ্ছু পরোযা করি না জানিস, কিন্তু বাবা যে এ ধাক্কা সইতে পারবে না।

অসিত . সে তো বটেই। সর্বস্ব বেচে-কিনে বিয়ে দিলেন।

চন্দন . এব একটা বিহিত করতেই হবে।

রমেন : দাঁড়া, ভাবতে দে।

অসিত : নিকুচি করেচে তোর ভাবনাব।

রমেন : পেয়েছি।

অসিত
চন্দন } কী? কী?

রমেন : মিছিল কবব, মিটিং করব— হে নির্যাতিত স্বামীগণ—

চন্দন : ঠিক বলেছিস। দারুণ আইডিয়া। আমরা একটা পুরুষ সংবক্ষণ সংস্থা গড়ব। ওদেব বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনকে সফল করতেইহবে। বল্—গিন্নিদের জুলুমবাজি—

রমেন ও অসিত : মানছি না মানব না—

চন্দন . পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য—

রমেন ও অসিত . মানতে হবে—মানতে হবে—

চন্দন : এই প্রতিজ্ঞা করিলাম—

রমেন ও অসিত : রাখব স্বামীকুলেব নাম—

চন্দন . দুনিয়া—ব স্বামী—

বমেন ও অসিত : এ—ক হও।

চন্দন : দেব না পণ— নেব না পণ—

বমেন ও অসিত : শপথ করো তরুণ মন—

চন্দন : দুনিয়ার স্বামী .... কী রে, কী হল?

বমেন : গুরু, তোর বউ আসছে মাইরি—এদিকেই!

চন্দন : এ্যাঁ—?

অসিত : বমেন, তাব পিছনে তোর বউ।

রমেন : (দূরে তাকিয়ে সভয়ে) বা—বা—গো।

চন্দন : অসিত রে, তার পিছনে তোর বউ।

অসিত . আমি বাড়ি যাব।

বমেন : আমিও।

চন্দন : না, না, এভাবে পালিয়ে গেলে আর কোনোদিন মাথা তুলতে পারব না। আয়, শ্লোগান তোল্। এই প্রতিজ্ঞা করিলাম—

অসিত ও রমেন : আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

*[ওরা উইংসের দিকে দৌড়োয়। নেপথ্যে নারীকণ্ঠের কোলাহল —**কই**, কোথায়? রাস্কেলগুলো নাকি একজায়গায় জুটেছে? ইউনিয়ন করার সাধ? সাধ ঘুচিয়ে দিচ্ছি। (চন্দন এক মুহূর্ত বিমূঢ়ের মতো বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঘুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে রমেনদের অনুসরণ্ করে। ছুটতে ছুটতে ফ্রিজ হয়ে যায়। পর্দা নেমে আসে।]*

ট্যারা চোখে

একদিন প্রতিদিন

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। আর কত সহ্য করা যায়। বোজই ভাবছি, কাল থেকে নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে। সম্পাদকের নজরে কি আর পড়ছে না? বিশেষ করে কার্য নির্বাহী সম্পাদক নিয়ম করে জনগণের চিঠির জবাব দেন। সংবাদ প্রতিদিন নামক সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনায় আমরা একদিন নয় প্রতিদিনই আনন্দের বাজাবে হাজির হচ্ছি। সংবাদে যুগান্তরও বলা যায়। প্রাযশই দেখা যায় কোনো খববের মধ্যে কোনো সংখ্যা থাকলে তার অবস্থাটা হয় আশঙ্কাজনক। সংখ্যাগুলোর জায়গায় অবস্থান করে কিছু দুর্বোধ্য যুক্তাক্ষব। কমপিউটারের কী-বোর্ডে Numlock খোলা না থাকলে যে অবস্থা হয আর কি। আবার দেখুন বিশ্বকাপে ইতালিকে হারিয়ে কোরিয়া শেষ আটে গেল বলে দেশের মানুষের আনন্দ প্রকাশের খবর দিতে গিয়ে তাদের সংখ্যাটা একবাব সোয়া কোটি, আবার কিছু পরেই সেটা সোয়া লাখে পরিণত। ভাবলাম বোধহয় সোয়া কোটিটা ভুল ছিল, সেটা সংশোধন করেছে। ও হরি, আবার তিন চাব লাইন পরেই সোয়া লাখটা সোয়া কোটিতে পরিণত হয়েছে। সংবাদদাতা নিজেই বোধহয বিভ্রান্তিতে ছিলেন সঠিক সংখ্যাটা নিয়ে। মজা এই, অন্য সময় সংখ্যার জায়গায় সেই দুর্বোধ্য যুক্তাক্ষরগুলো থাকলে সংখ্যাটা কত বোঝার উপায় থাকত না, কিন্তু এখানে তো সংখ্যায় না লিখে কথায় লেখা হয়েছে। ভাব দেখলে মনে হবে লাখ আর কোটিতে খুব একটা ফারাক নেই। আমাদেব ব্রিগেডে কোনো রাজনৈতিক দল এক লাখ লোক জড়ো করতে পারলে বর্তে যায, আর কোবিয়াতে একটা রাস্তায় জড়ো হচ্ছে পাঁচ লাখ লোক, একটা সিটি হলে লোক ধরছে পাঁচ লাখের ওপর। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম আমাদের সল্টলেক স্টেডিয়ামে এক লাখ লোক খেলা দেখে। সেখানে কোরিযাতে গ্যালারি ছাড়াই জায়ান্টস্ক্রিনে খেলা দেখলেন সাড়ে বারো লাখ লোক। গুল মাবার আর জায়গা পায় নি। এ যে ঘনাদাকেও ছাড়িয়ে গেল।

বিঃ দ্রঃ . ভুল খববের নমুনা—

ইংলণ্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম খেলা ২৯শে জুন। কিন্তু ফাইনাল ১৩ই জুন। আগে ফাইনাল খেলে নিয়ে তারপর প্রথম খেলা? হবেও বা। অচলপত্রের ছোঁয়াচ লেগেছে। প্রথমেই পঞ্চম সংস্করণ। তারপব বেরুতে থাকবে ক্রমশ চতুর্থ, তৃতীয ...... প্রতিদিন তার শেষ সংখ্যাটি দিয়ে কোন্‌দিন শুরু করে বসবে না তো॥

—অঞ্জনা দত্ত

তাহলে এঁরা বাজারি লেখক? লেখক হিসেবে জাতের নয়? প্রশ্ন করলে উন্নাসিকরা চুপ করে থাকবেন। যেন শোকসভায় ঢুকেছেন। চাপ দিলে বলবেন, সুনীল তো বেসিক্যালি কবি। জাত কবি। শীর্ষেন্দু তো আর আগের লেখা লিখেছেন না। বুদ্ধদেব গুহ—!

অকপটে

সমরেশ মজুমদার

বই-ব্যবসা এবং লেখক

টাকা পয়সার সঙ্গে সাহিত্যের ভাসুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্ক, একথা আমাদের এককালে বোঝানো হয়েছিল। যে লেখক টাকার জন্যে বই লেখেন তিনি কখনোই জাতে ওঠেন না। বোধহয় এই কারণে টাকার জন্যে না লিখেও টাকা পাওয়াটাও বেশ অপরাধ-অপরাধ ব্যাপার ছিল। তুমি সাহিত্যিক সৎ সাহিত্য রচনা করবে, টাকা টাকা করবে না কক্ষনো। বই বিক্রি হলে প্রকাশক যদি দয়া করে কিছু দেন, তা-ই হাত পেতে নেবে। ব্যস।

হয়ত এই কারণে শরৎচন্দ্রকে এককালে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবিরা তেমন কল্কে দিতে চাননি। অপরাধ, বাঙালি পাঠক মুড়ি-মুড়কির মতো ওঁর লেখা বই কেনে। যার বই আপামর জনসাধারণ হুমড়ি খেয়ে গেলে, তিনি কিছুতেই উচ্চ মানের সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। কারণ উচ্চ মানের সাহিত্য সাধারণ পাঠকরা বুঝতেই পারে না। মুশকিল করতেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর নায়িকাকে দিয়ে বলালেন, একটা গল্প লেখো শরৎবাবু—। রবীন্দ্রনাথ বাজারি লেখক, একথা বলার সাহস কোন উন্নাসিকের ছিল না। সেই রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুকে এত বড় জায়গা দিলেন? নতুন করে পড়ে দেখতে হয় তার লেখা। এই রকম ভাব।

সময় এগিয়ে চলেছে কিন্তু ভাবনা এগোয়নি। এখনো বেশ কিছু মানুষ একই কথা বলেন। বিশেষ করে যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন করেন তাঁদের ধারণা অনেকটা ওই রকম। যার লেখা বেশি বিক্রি হয় সে-ই বিকৃত লেখক। ওঁরা চিরকাল এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে, সর্বহারা অহংকার নিয়ে উদ্ধত। অনেকেই অবশ্য পরে ভুল বুঝতে পেরেছেন কিন্তু মচকেছেন, ভাঙেননি। কৃত্তিবাসের লেখকরা বলেছিলেন, কখনোই বড় কাগজে লিখবেন না, তাদের দেওয়া পুরস্কার নেবেন না। কিন্তু দেখা গেল বিখ্যাত হওয়ার লোভে সবাই প্রায় সুড়সুড় করে আনন্দবাজার বা যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

গত পঞ্চাশ বছরে যাঁরা লিখে নাম করেছেন তাঁদের সবাই পত্রিকা থেকে টাকা পেয়েছেন। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকরা কিন্তু সবার প্রতি সদয় হননি। তাঁদের বই ছাপা হয়েছে কিন্তু উশখুশ করা সত্ত্বেও প্রকাশকরা পাঁচশো হাজারের বেশি টাকা দেননি। মিত্র ও ঘোষ প্রতি পয়লা বৈশাখে তাঁদের লেখকদের কিছু টাকা দেন। সেটা পেতে অনেকেই সেদিন উপস্থিত হন। টাকার অঙ্কটা অবশ্য কেউ জানাতে চান না।

আবার এদের মধ্যে কয়েকজনকে টাকা দিতে পারলে প্রকাশকরা খুশি হন। কৃত্তিবাসের লেখক-সম্পাদক সুনীল গাঙ্গুলি যদি আজ কোনো প্রকাশকের কাছে টাকা চান তাহলে তিনি কাছা খুলে নাচবেন। বছরের শেষ যে স্টেটমেন্ট আনন্দ পাবলিশার্স দিয়ে থাকেন তাতে সুনীল, শীর্ষেন্দু, বুদ্ধদেব গুহর একবছরের পাওনা টাকা যে কোনো আই এ এস অফিসারের বাৎসরিক মাইনের অনেক বেশি। এছাড়া অন্যান্য প্রকাশক, পত্রিকা, টি ভি সিরিয়াল, যে টাকা দেয় তা কি এঁরা নেবেন না? প্রাপ্য টাকা ফেলে দেবেন?

ছাপা হয়ে গেল, বিজ্ঞাপনে নাম বের হল। বাড়িতে আলমারি ভরল। মারা যাওয়ার পর ছেলেমেয়ে বলবে বাবা কত বই লিখেছেন। তবে হঠাৎ কেউ যদি ফিল্ম বা সিরিয়াল করে বসে তাহলে আর দেখতে হবে না।

নিচ্ছেন, নিজের টাকা নিচ্ছেন বলে যাঁদের চোখ টাটাচ্ছে তাঁরা কারা? অবশ্যই সেই সব মানুষ, যাঁদের জীবনে সাফল্য আসেনি। চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলেই অন্যের অর্থপ্রাপ্তিতে তাঁদের গাত্রদাহ।

কিছুদিন আগে একটা লিটল ম্যাগাজিনে এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ পড়ছিলাম। লেখক লিখেছেন, 'বাজারি লেখকরা আসেন, তুবড়ির মত জ্বলেন আবার ছাই হয়ে যান। যাযাবর এসেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিপাত সুপার ডুপার হিট। বাঙালি, বোকা বাঙালিরা

গিলেছিল তাঁর লাইনগুলো। লেখক দু'হাতে কামিয়েছেন ব্যস। তারপরে মাল ধরা পড়ল। আর কোনো বই বিক্রি হয়নি। অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজ সম্পর্কেও ওই এক কথা বলা যায়। নিমাই ভট্টাচার্য মেমসাহেব লিখলেন। হৈ হৈ কাণ্ড। তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এখন কেউ ফিসফিসও করে না।'

ঘটনাগুলো অসত্য নয়। আমার বক্তব্য আপনি দয়া করে একখানা দৃষ্টিপাত বা মরুতীর্থ হিংলাজ অথবা মেমসাহেব লিখে দেখান তো। এঁরা বলবেন, অত খারাপ লেখা লেখার বাসনা নেই। মুশকিল হল ভালো বলতে এঁরা যা মনে করেন তাব বিক্রি বছরে নব্বই কপি।

শংকর গত পঞ্চাশ বছর ধরে সমানে লিখে চলেছেন এবং এই বাংলায় তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় (অন্তত বই বিক্রির নিরিখে) লেখক। অন্তত গোটা দশেক বই সমান তালে জনপ্রিয় হলে এবং সময় পেরিয়ে গিয়েও থেমে না পড়লে তাঁর সম্পর্ক কি বলা যায়?

সুনীল গাঙ্গুলির প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব পশ্চিম-এর বিক্রি তো থামছে না। বিমল মিত্রকে ঠাট্টা করা হত—কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। বই-এর আয়তন নিয়েই ওই রসিকতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের, বুদ্ধদেব গুহর জনপ্রিয়তম বই-এর পাতার সংখ্যা কড়ি দিয়ে কিনলাম-এর থেকে অনেক বেশি।

তাহলে এঁরা বাজারি লেখক? লেখক হিসেবে জাতের নয়? প্রশ্ন করলে উন্নাসিকরা চুপ করে থাকবেন। যেন শোকসভায় ঢুকেছেন। চাপ দিলে বলবেন, সুনীল তো বেসিক্যালি কবি। জাত কবি। শীর্ষেন্দু তো আর আগের লেখা লিখেছেন না। বুদ্ধদেব গুহ—!

আজ কাগজে একটা লেখা পড়লাম। কোনো একটি বই-এর সমালোচনা। মূল বইটি কেনার ইচ্ছে আছে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীলদার ইতিহাস সম্পর্কিত রেফারেন্স পড়ে অখুশি হয়েছিলেন। সত্য বলে মনে হয়নি তাঁর। অনুজ কিছু লেখককে বলেছিলেন প্রতিবাদ করতে। তাঁদের একজন বলেছিলেন 'প্রতিবাদ তো করেছি। লিটল ম্যাগাজিনে লিখেছি, আপনার চোখে পড়েনি?' অর্থাৎ ওই প্রতিবাদের কোনো মূল্য নেই।

আজ কথাটা স্বীকার করা দরকার। বই যেহেতু একটি ব্যবসার মাধ্যম তাই তার লেখা থেকে বিক্রি পর্যন্ত টাকার অস্তিত্ব থাকবেই। এখনো কলেজ স্ট্রিটে এই ব্যবসা চলছে পুরনো চালে। বেশিরভাগ প্রকাশক নামি লেখকদের বই না পেয়ে সংকলন ছাপছেন। এতে সুবিধে হল মাত্র একশ টাকা দিলেই গল্প লেখকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ।

কিন্তু নিয়মটা এমন হবে কেন? কোনো লেখকের কাছে যখন প্রকাশক বই চাইবেন, তিনি তো কয়েকটা প্রশ্ন করতেই পারেন—

এক, আপনি কত কপি বই ছাপবেন?

দুই, আমি কত টাকা পাব?

তিন, এই টাকা আপনি কি ভাবে দেবেন?

প্রশ্নগুলো বেশিরভাগ লেখকই করেন না। প্রকাশক কত বই ছাপবেন তা জানার কোনো উপায় নেই। তাঁরা যা বলবেন তা-ই মেনে নিতে হবে। শতকরা কুড়ি বা পনেরো করে বই-এর দামের ওপর লেখক পান বলে কলেজ স্ট্রিটের নিয়ম। সেই টাকা কখন লেখকের হাতে আসবে তার ঠিক নেই। ধরা যাক, কোনো লেখকের একশ টাকার বই এক বছরে পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হলো। লেখকের পাওনা পঁচাত্তর হাজার অথবা এক লক্ষ। টাকাটা চাইলেই দু-তিন জনের বাইরের প্রকাশক চোখে অন্ধকার দেখেন। অগ্রিম চাইলে তো কথাই নেই।

তখনই লেখক খারাপ হয়ে গেলেন। অর্থপিশাচ, চামার। একজন তো বলেই ফেললেন, 'আপনার কাছে ঠিক হিসাব দিচ্ছি বলে ভাবছেন খুব লাভ করেছি? এই যে আপনার বই-এর পাশাপাশি আরো নটা বই ছেপেছি তার ছটার তো এক কপি বিক্রি হয় নি। কাগজ ছাপা বিজ্ঞাপন তো সব একই। আপনার থেকে যা পেয়েছি তা দিয়েই তো ওদের ধার শোধ করছি।'

প্রশ্ন করি, 'যখন জানেন বিক্রি হয় না, তখন ওগুলো ছাপেন কেন?'

'চালচিত্র জানেন?'

'সেটা তো প্রতিমার পেছনে থাকে।'

'ঠিক। চালু বই-এর পেছনে যদি ওইসব বই না থাকে তাহলে লোকে কি দেখবে? আমার দোকান ন্যাংটো। কাউণ্টার ভরাতে ওসব বই ছাপতে হয়।'

'তাই বলে লস্ দিয়ে ছাপবেন?'

'পাঁচ দশ বছরে পুশ করতে করতে যদি কিছু যায় তা-ই লাভ।' ব'লে হাসলেন, 'তবে কয়েকজন লেখক আছেন, যাঁদের বই দু'বছরে আট ন-শো কপি বিক্রি হয়। তাঁদের বই পরপর ছাপি।'

'লাভ থাকে?'

> **আজকাল মাস্টার মশাইরাও মাইনে বুঝে নেন, বুনো রামনাথের দিন শেষ। কেরানিরা আন্দোলন করেন। লেখকরা কি অন্য গ্রহের জীব?**

'না আট-ন'শো বিক্রি হলে লস হয় না। চালু বই-এর বিক্রি বাড়ে।'

'ওই সব লোকেদের টাকা দেন?'

'লাভ না হলে কোথা থেকে দেব?' প্রকাশক বললেন, 'দু-পাঁচশো ধরিয়ে দিই।'

'তার পরেও তাঁরা বই দেন?'

'কেন দেবেন না? এইটা ছাপা হয়ে গেল, বিজ্ঞাপনে নাম বের হল। বাড়িতে আলমারি ভরল। মারা যাওয়ার পর ছেলেমেয়ে বলবে বাবা কত বই লিখেছেন। তবে হঠাৎ কেউ যদি ফিল্ম বা সিরিয়াল করে বসে তাহলে আর দেখতে হবে না। আচ্ছা, এক কাজ করুন, আপনি মাসে তিন হাজার করে নিন। ঠিক এক তারিখে পৌঁছে যাবে টাকা।'

'বছরে ছত্রিশ। কবে শোধ হবে? এর পরেও তো বিক্রি হবে।'

'আর একটা নতুন বই দিন। মোটা বই। কথা দিচ্ছি দেওয়া মাত্র পুরনো টাকা শোধ করে দেব।'

এই হল ছবি। এবার ঢাকায় গিয়ে হুমায়ূন আহমেদের বাড়িতে এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। হুমায়ূন বলল, 'আপনি যদি কোনো বই ছাপতে না দেন তাহলে খুব অসুবিধে হবে?'

'মানে? বই বের হবে না?'

'না। বলবেন পাঠক চাইছে বলে আমার বই ছাপতে এসেছেন। তাহলে দশটা এডিশনের দাম ঠিক করে আমার প্রাপ্য টাকা আগাম দিয়ে যান। তার পরে আর দিতে হবে না।'

'দূর! আমাদের ওখানে এসব শুনলে কেউ আসবে না।' হেসে বললাম, 'আমার বই আশি নব্বই এডিসন হলেও ঠিকঠাক টাকা বাদলদা দিয়ে যাচ্ছেন, চল্লিশ পার হলেও ভানুদারা সঠিক টাকা দিচ্ছেন। আমি ওঁদের কাছে ভালো আছি। যাঁদের কথা বললাম তাঁরা অবশ্য সংখ্যায় বেশি, কি করা যাবে।'

হুমায়ূন নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি ব্যবসাদার নন। আজকাল মাস্টার মশাইরাও মাইনে বুঝে নেন, বুনো রামনাথের দিন শেষ। কেরানিরা আন্দোলন করেন। লেখকরা কি অন্য গ্রহের জীব?'

হুমায়ূন একথা বলতেই পারে।

আমাদেরও বলা দরকার।

বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ

মৈনাক মিত্র

যুগান্তকারী বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির সভাপতি, যাঁহার শুভনাম বিমান বসু, তাঁহার বক্ষের বামপার্শ্বে সম্প্রতি খচ্ করিয়া বেদনা চাগাড় দিয়াছে (বিমানবাবু ঘোরতর বামপন্থী, অতএব পাঠক, বক্ষের দক্ষিণাঞ্চলে বেদনাবোধ তাঁহার ক্ষেত্রে অশাস্ত্রীয়)।

বিষয় অতীব গুরুতর। কোনো কোনো অধ্যাপক চতুষ্চক্র চড়িয়া বেড়াইতেছেন, এবং, ভাবিলে তাড়কা রাক্ষসীর ন্যায় দন্তরাজি কিড়মিড় করিতে থাকে যে, কোনো কোনো অধ্যাপক কলিকাতার অভিজাত ক্লাবের পর্যন্ত সদস্য হইয়া বসিয়াছেন। সত্যনাশ হো গয়া। বিমানবাবু মার্কসীয় দর্শন গুলিয়া খাইয়াছেন। আঁতিপাঁতি করিয়া খুঁজিয়াও অধ্যাপককুল সম্পর্কে এরূপ বিধান কোথাও দেখিতে পান নাই। শুধু অধ্যাপক কেন, তামাম শিক্ষককুল তাঁহার এবং তাঁহার জঙ্গী সঙ্গীদিগের রোষানলে পড়িয়া কাতরাইতেছেন।

ব্রিটিশ আমল হইতেই শিক্ষকদিগের চেহারা-চরিত্র সম্পর্কে একটি পাকাপোক্ত ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল—

প্রাথমিক শিক্ষক :

ছেঁড়া ময়লা ধুতি। শতচ্ছিন্ন চাপকান, অথবা খালি গা। চোখের ডাঁটিবিহীন চশমাটি পাটের দড়ি দিয়া মাথা ঘুরাইয়া বাঁধা। পায়ে বাস্তুহারা চটি, তাহারো অবস্থা সঙ্গীন। এই শ্রেণীর প্রাণীরা নিতান্ত ক্ষুন্নিবৃত্তির দায়ে ভজা পচা হাঁসু দাশু প্রমুখ ছাত্রের বাটীর দরজায় কুশল সংবাদ গ্রহণের অছিলায় আবির্ভূত হন এবং লাউ থোড় মোচা ইত্যাদি প্রায় জোর করিয়াই প্রণামী গ্রহণ করিয়া থাকেন। মুদি এই প্রকার জীবকে ধার দেওয়া আর পয়সাকড়ি মা গঙ্গার বক্ষে রাখিয়া আসাকে সমান জ্ঞান করে। নাপিত মুখের উপর না বলিতে সাহস করে না বটে, তবে এই ধারবাবুর গালে ক্ষুরের ধার পরখ করিয়া রক্ত দর্শন করে, যদি ভবিষ্যতে তিনি আর ধারেকাছে না আসেন—এই দুরাশায়। ইহাঁদের বাটীতে কেহ মরণাপন্ন হইলে ডাক্তারবাবু ভুলিয়াও সে পথ মাড়ান না। কাবুলিওয়ালা টাকায় টাকা সুদের হিসাবেও টাকা ধার দিতে অস্বীকার করে। প্রাথমিক শিক্ষকের স্ত্রীর হাতে হাজা, পায়ে কুনখা ও ঠোঁটের কষে ঘা থাকিতে হয়। তাঁহার শাড়িতে খান চারেক গিঁট না থাকিলে মানায় না। এবং তাঁহার হাড়সর্বস্ব শরীরটিকে নিমোনিয়ার সহৃদয়তার উপর নির্ভর করিতে হয়। বিদ্যালয়ের বেতন ও পরীক্ষার ফি-র অভাবে তাঁহার পুত্রের উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। শিক্ষক মহাশয় ছেঁড়া মাদুরে তাঁহার জরাজীর্ণ রোয়াকে বসিয়া একপাল কাচ্চাবাচ্চাকে শতকিয়া কড়াকিয়া মুখস্থ করাইতে থাকেন। চশমার মোটা কাচের ভিতর দিয়া তাঁহার চক্ষু দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে একটিপ নস্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, কেন না ইহাপেক্ষা সস্তার নেশা আবিষ্কৃত হয় নাই।

> যে দেশে মৃত সৈনিকের কফিন কিনিতে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলে, অস্ত্র কিনিতে ঘুষ, পশুখাদ্যে জোচ্চুরি, ওয়াকফে পুকুরচুরি—সে দেশে একমাত্র ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী শিক্ষক-অধ্যাপকগণ। তাঁহাদিগের অপেক্ষা সমাজ বিরোধী আর কেহ নাই।

উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষক :

উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণ অনুরূপই বটে, তবে গায়ে একটি মলিন পাঞ্জাবি থাকে। তালি মারিবার আর জায়গা না থাকিলেও পাদুকাটি হয় চর্মনির্মিত (পলিথিন বস্তুটি তৎকালে ছিল না)। পাড়ায় কোনো সালিশি থাকিলে তাঁহাকে ডাকা হয়, কিন্তু মাতব্বরের কথায় সায় দিবার জন্যই। অন্যথায় তাঁহার সম্মানটি অসম্মানে পর্যবসিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হয় না।

ইহারা সৌভাগ্যবান। একটি তোবড়ানো টিফিনবাক্স হাতে করিয়া বিদ্যালয়ে যান। তাহাতে দুইটি বাসি রুটি ও এক চিমটা তাজা আলু-কুমড়ার ঘ্যাঁট থাকে। ইহাঁরা বড়ই সুখী জীব। এমনকি মধ্যে মধ্যে গরমে দুই-এক দিন শ্বশুরালয়ে আরাম করিতে গেলে গৃহিনীর পিতা-ভ্রাতা মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া কানে তুলা আঁটিয়া বসিয়া থাকে না।

অধ্যাপক :

অধ্যাপকগণ উন্নততর জীব। তাঁহাদিগের উচ্চ শিক্ষার ন্যায় জীবনযাত্রার মানও বেশ উচ্চ। তাঁহারা পুরাতন পাঞ্জাবিটি স্বহস্তে ইস্ত্রি করিয়া পরেন, যদিও কাঁধের নিকট সেটি ফাঁসা এবং স্থানে স্থানে ইস্ত্রির পোড়া দাগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'মণিহারা' গল্পে এক মাস্টার মশাইকে হাজির করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ শরীর, কোটরে বসা চক্ষু, বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া যখন তাঁহার কিঞ্চিৎ জলযোগ করা প্রয়োজন তখন তিনি নদীতীরে শুধুমাত্র হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। অধ্যাপকগণ তেমন দুর্ভাগা নন। বাটী ফিরিয়া তাঁহারা এক পেয়ালা চা নামক গরম সরবত পান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার গৃহিনী কদাচিৎ এক কাচ্চা বনস্পতি লইয়া এক কিলো আটার পরোটাও বানাইয়া থাকেন। এমন শ্রেণীর জীবগণের কেহ কেহ পাড়ার ক্লাবের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিলেও উপযুক্ত অনুদানের অক্ষমতায় অচিরাৎ পদচ্যুত হন। তবে ইহাঁরা দুই-পাঁচ বৎসরে একবার পূজার ছুটিতে বিদেশ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জটার দেউল কিংবা চিড়িয়াখানা কিংবা দক্ষিণেশ্বর গমন করিয়া থাকেন।

পুলিশ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষক প্রজাতিকে বিশেষ সম্মান করে। উচ্চ-নীচ ভেদ করে না। অর্থাৎ কোনো দুরবস্থায় পড়িয়া ইহাঁরা থানায় উপস্থিত হইলে আপন আপন দাঁতখিঁচুনি ও চোর-ডাকাতের সহিত আচরণাদি ঝালাইয়া লয়। কোনো প্রাক্তন ছাত্র বড় চাকুরে হইলে স্বীয় শিক্ষকের প্রথম পদার্পণে এক কাপ চা খাওয়ায়। পরবর্তীকালে মাস্টার মশাইকে প্রতিবারই তাঁহার সাধক ছাত্রের দরজা হইতেই বিদায় লইতে হয়। বেশি জেদাজেদি করিলে উপরি লাভ হয় দ্বার-রক্ষকের অর্ধচন্দ্র।

বিভিন্ন পূজার চাঁদাসুর, বিভিন্ন ম্যাযফিলের দাদাসুর এবং রাজনীতির মাথাসুরদের অতি প্রিয় শিক্ষক প্রজাতি। আপন আপন বীরত্ব প্রকাশের এমন নিরাপদ ক্ষেত্র আর নাই। এই একটিমাত্র অভয়ারণ্য, যেখানে আঘাত করিলে প্রত্যাঘাতের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। নিউটনের তৃতীয় সূত্র এখানে আসিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। এই প্রজাতি ইটের উত্তরে পাটকেল উপহার দিতে পারে না। বুনো ওল গলা টিপিয়া ধরিলে বাঘা তেঁতুল হইয়া উঠিবার স্বপ্নাতীত স্পর্ধা-বিলাস ইহাঁদিগের ঊর্ধ্বতন চৌদ্দপুরুষও দেখাইতে সাহস করেন নাই।

গরু খাইবে কম, দুধ দিবে বেশি—কোন গোপালক তাহা না চাহে? সেজন্যই শিক্ষককুল পড়িবে বেশি কিন্তু মাহিনা পাইবে কম—এরূপ সুবন্দোবস্ত। একজন সাধারণ স্নাতক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করিয়া যখন আমলা হন তখন সেই আমলা কেশতৈলের গন্ধ ও ঝাঁঝে দেশ কম্পিত হয়। কিন্তু একজন উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরের শিক্ষকের অনেক বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হইলেও ওই বেতন কিংবা ক্ষমতা পরিকাঠামোর একশ মাইল নিকটে পৌঁছাইতে পারিবেন না।

নদী দিয়া জল গড়াইতে গড়াতে ১৯৭৩, ১৯৮৬ এবং ১৯৯৬ সালের তিন তিনটি পে কমিশনের গণ্ডি পার হইয়া শিক্ষক-অধ্যাপকগণ কিঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দে বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

শিক্ষক-অধ্যাপক দিগকেও প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়া উঠিয়া আসিতে হইতেছে। এবং তাঁহাদিগের মূল বেতন কাঠামো ডব্লিউ বি সি এস এবং আই এ এস-দিগের অনুরূপ হইয়াছে। যদিচ ভাতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁহারা ব্রাত্যই রহিয়া গিয়াছেন। মূল বেতন একইরূপ হইলে পদমর্যাদা সমান হয়।

সেই সমানের কিঞ্চিৎ নমুনা এইরূপ—

ক। যে স্থলে একজন সরকারি আমলা দুইটি ফাইল গাড়িতে উঠাইতে হইলেও অধস্তন কর্মীকে নির্দেশ দেন, একজন শিক্ষক বা অধ্যাপককে দশ-বিশ কেজি পরীক্ষার খাতা স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া বাটীতে লইয়া যাইতে হয়। দেখিবার পর নিজে ফেরত দিতে যাইতে হয়।

খ। তাঁহাদিগের বেতন সর্বদাই অনিশ্চয়তার নাগরদোলায় দুলিতে থাকে।

গ। বিকাশ ভবন নামক এক তীর্থক্ষেত্রের কেরানিও বকেয়া অথবা পেনশনের তাগাদার সময় তাঁহার করজোড় ভিক্ষুক বেশ না দেখিলে যারপরনাই রুষ্ট হন। এবং শিক্ষক মশায়ের ভবিষ্যৎটি করণিক মশায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

ঘ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কথায় কথায় তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিয়া দিবার হুমকি দিতে পারেন।

ঙ। পরীক্ষার হলে ইহাঁদিগকে পুলিশের ভূমিকা পালন করিতে হয়। এবং সেই পুলিশ অবশ্যই ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার।

চ। আমলাগণ দপ্তরের কর্মীকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠান। শিক্ষকের ক্ষেত্রে কেরানি বা অ্যাকাউন্টেন্টবাবু শিক্ষককেই ডাকিয়া পাঠান।

ছ। একজন করণিকের আলাদা টেবিল থাকিলেও শিক্ষক বা অধ্যাপক মশায়ের আলাদা কক্ষ মাথায় থাকুক, আলাদা চেয়ার-টেবিলের কথা ভাবিলেও বুক ব্যথা করে।

ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারগণও অধ্যাপক হইয়া থাকেন। কিন্তু সেখানে ট্যা-ফু-টি চলিবে না। কেন না চাকরিটি বকরির ন্যায় ময়দানে ছাড়িয়া তাঁহারা যে-কোনো মুহূর্তে নানা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হইতে পারেন।

গো-বেচারা। এই শ্রেণীর প্রতি লোভ সকলেরই। রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন। আপনার বলবীর্য দেখিয়া ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিবে। শত্রুরা আপনার সহিত টক্কর লইতে সাহস করিবে না। পাড়ার দাদা যেরূপ কোনো পুলিশ, সৈনিক কিংবা পার্টির দাদার গাত্রে আঁচড় কাটে না, বাছিয়া লয় তাহাদিগকেই, যাহাদিগের কোমরে বল নাই—তেমনই আজ সরকার এই শিক্ষকজাতিকে বাছিয়াছেন।

কে কবে কোথায় যেন বলিয়াছিলেন, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। বিমানবাবুরাও কিছুদিন পূর্ব অবধি এই বলিয়া ধ্বনি তুলিতেন যে—শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব। সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাবে তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই যে সে শিক্ষা স্কুল-কলেজের নহে, তাহা হইল পার্টিগত শিক্ষা। পার্টিক্লাশের শিক্ষকরা বেতনভোগী নহেন। সেজন্যই আজ সরকারের অর্থভাণ্ডারে টান পড়িলে একমাত্র শিক্ষাদপ্তর হইতেই কাটছাঁট করিতে পারেন, তাহাদিগের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা, গ্র্যাচুইটির টাকা আটকাইতে পারেন। মাহিনা কমাইবার কথা বলিতে পারেন। কেননা এই দপ্তরটি প্রকৃতপক্ষে অপচয়েরই। দুঃসময়ে অপচয় বন্ধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এ পোড়া দেশে হু হু করিয়া টাকার দাম কমে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। তখন মাহিনা কমাইবার কথাটি একমাত্র শিক্ষক-অধ্যাপকদিগকেই তাঁহারা সদম্ভে বলিতে পারেন। যে দেশে মৃত সৈনিকের কফিন কিনিতে লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলে, অস্ত্র কিনিতে ঘুষ, পশুখাদ্যে জোচ্চুরি, ওয়াকফে পুকুরচুরি—সে দেশে একমাত্র ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী শিক্ষক-অধ্যাপকগণ। তাঁহাদিগের অপেক্ষা সমাজ বিরোধী আর কেহ নাই। এ রাজ্যে পুলিশ ঘুষ খায় না, জনগণের অর্থে হওয়া ডাক্তার প্রতিপদে, অর্থোপার্জন নহে, আর্তের সেবাই করিয়া থাকেন, আদালতে, মোটর ভেহিকেলসে—কোথাও কোনো অপরাধ নাই। শুধুমাত্র টিউশনি (তাও এক-চতুর্থাংশ নহে) করার অপরাধেই শিক্ষকগণ চক্ষুশূল।

সকলেই গাড়ি চড়ুক, ক্লাবে গতায়াত করিতে থাকুক—কিন্তু ইহাঁরা নহে। সমাজ-রক্ষকের সর্ববিধ আদর্শের মোট বহিবার জন্য থাকুক শিক্ষক শ্রেণী।

তাঁহাদিগের বগলে ছাতা, চোখে চশমা, মস্তকে টাক, হাঁটুতে গেঁটে বাত, উদরে আমাশা না দেখিলে স্বস্তি বোধ করা অসম্ভব। অতএব পুনর্মূষিক ভব। দাও ফিরে সে অবণ্য লহ এ নগর। এই একটিমাত্র নিরাপদ ক্ষেত্র। নো সাইড এফেক্ট, নো রি-অ্যাকশন।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু শিক্ষক জাতিব মেরুদণ্ড থাকিতে নাই। তাঁহাবা যদি আপন বলে বলীয়ান হন, তবে প্রতি মুহূর্তে দায়ে-বিপদে বিমানবাবুদের পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িবে কে? তবে আর 'মানুষ আমবা নহি তো, মেষ' তাঁহারা কোথায় খুঁজিতে বাহিব হইবেন?

কোনো অসভ্য দেশের মন্ত্রী একথা সদম্ভে ঘোষণা করিতে পারেন না যে—মাসের প্রথমেই শিক্ষকদের মাইনে দিতে হবে, এ কথা কোথাও লেখা আছে?—একথাও বলিতে পারেন না যে, শিক্ষকদের মাইনে দিতে আমরা দাযবদ্ধ নই। কিন্তু বিমানবাবুরা পারেন। কেননা তাঁহারা সুসভ্য রাজ্যের অধীশ্বর।

কাণ্ডাকাণ্ড দেখিযা অমন যে জ্যোতি বসু, তিনিও আগাইয়া আসিয়া বলিতে বাধ্য হন,—এসব হচ্ছেটা কী? কিন্তু তরুণ তুর্কীগণ সে কথায কর্ণপাত করেন নাই।

এমন অবস্থাব সম্মুখীন হইলে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ব্যবসা করিতেন, মেঘনাদ সাহা মাজন বানাইতেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্র বিক্রয করিয়া জীবন ধারণ করিতেন; কিন্তু শিক্ষকতা করিতেন না।

কেহ বলেন, পাছে শিক্ষায় চেতনা আসিয়া যায় এবং সচেতন বাঙালি বামফ্রন্টকে চিনিয়া ফেলে—ইহাই কারণ। এ কথা মানা সহজ নহে। মূর্খেব প্রলাপ। তবে? কারণ কী? কে জানে, হযত বা বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ। বিনাশের সময় আসে তলে তলে, জানান না দিয়া, ভবিষ্যৎ-অন্ধ কংস তখন ধ্বংসের অহঙ্কাবেই মত্ত থাকেন। নিজের ধ্বংসের ভবিষ্য-ধ্বনি কয়জন শুনিতে পায?

> *ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইষা উঠিল। হেডমাস্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাস্টার-পণ্ডিত চারিজন এবং তাহাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে গড়ে দুইজন করিয়া ছাত্র প্রতিবছর মাইনার পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম, বিবরণ পাড়ুইমহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিলেন। ছেলেদের নিকট হইতে যাহা আদায হয়, তাহাতে নীচের দুজন শিক্ষকের কোনোমতে, ও গভর্নমেন্টের সাহায্যে আর-একজনের সঙ্কুলান হয; শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিযা সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাস্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন-চারি মাস কাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিযা প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবার করিয়া হাঁটাহাঁটি করিয়া সাত টাকা চারি আনাব বেশি আদায় করিতে পারেন নাই। কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।*

উপরোক্ত চিত্রটি শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসে তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে অঙ্কিত করিয়াছেন। রমেশ নহে, লেখকই এই চিত্র দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিমান বসু, সত্যসাধন চক্রবর্তী, কান্তি বিশ্বাস, অসীম দাশগুপ্ত প্রমুখ মূর্খের ন্যায স্তম্ভিত হন না। শিক্ষকদিগের কল্যাণ সাধনে তাঁহাদিগের মুখে আহার নাই, চোখে নিদ্রা নাই।

শিক্ষকদিগের সম্মুখে ফিরিয়া আসিবে সেই সুদিন। আইস, সুখ-দুঃখের অন্ন ভাগ করিয়া খাই। বিমানবাবুরা ইদানীং বাবু হইয়া পড়িয়াছেন। তৈরি করিতে হইবে নতুন কমরেড। নতুন করিয়া কমরেডশিপ শিখাইতে হইবে—একমুঠা অন্ন চারজনে ভাগ, একই ভাঙা চালের নিচে বিশজনে রাত্রিযাপন। বিমানবাবুরা তাই শিক্ষকদিগকে বাছিয়া লইযাছেন। শিক্ষকেব শিক্ষক বিমানবাবুরা। তাঁহাবা শিক্ষকদের শিখাইতেছেন, শিক্ষকরা ছাত্রদের শিখাইবেন।

হে নিরীহ শিক্ষকবৃন্দ, বিমানবাবুদিগের বক্ষের বামাঞ্চল নিরাপদ করুন। আপনারা ঘোরতর বামপন্থী হোন। কিন্তু ভুলিয়াও বিমান বসুদিগের প্রতি বাম হইবেন না।

ট্যারা চোখে

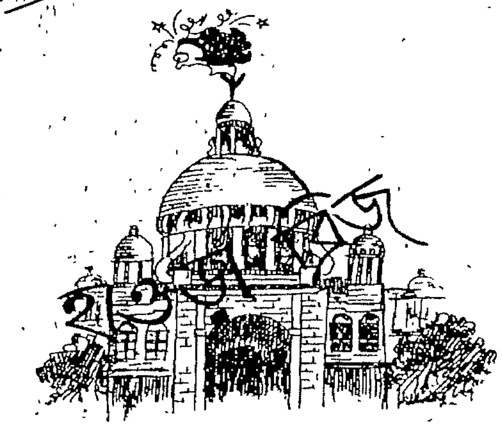

অভিনব বিজ্ঞান নগরী

কলকাতাব সাযেন্স সিটিতে স্পেস থিযেটাব বলে একটা গোলঘব আছে। সেখানে কলকাতাব নানান কিছুর ছবি দেখিযে কলকাতা দর্শন করানো হয। এক-একটি উল্লেখযোগ্য স্থান বা স্থাপত্যের ছবির ওপর ফুটে ওঠে তাব নাম। এখানে বিজ্ঞান কযেক লক্ষ বছর এগিযে। যেমন—নাখোদা মসজিদেব ওপবে লেখা ফুটে উঠল—সেন্ট ক্যাথিড্রাল চার্চ। নাখোদা মসজিদটি তাহলে কোথায মুখ লুকোয়? তাই ভেবে নাখোদা মসজিদকে পাঠানো হল হাওড়া ব্রিজের তলায। কিন্তু এতটা অধঃপতন কি তাঁরা মানবে? সেই ভেবে তাকে তখন তুলে দেওয়া হল দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর।

বেলুড় মঠের ছোট্ট মাঠটির ওপর লেখা জ্বলজ্বল করে উঠল—ক্যালকাটা রেস কোর্স। বেলুড়ের সাধুসন্তবা অতদূর পথ ঠেঙিযে রেস খেলতে আসতে পারেন না, তাই তাঁদের দরজায় রেসকোর্স নিজেই হাজিব।

আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান জোড়াসাঁকো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁব পিতৃ-পিতামহ, ভ্রাতা-ভগিনী, পুত্র-কন্যা সবাই এক-একজন দিকপাল বিজ্ঞানী ছিলেন কিনা, তাই সেটাব নাম হল সাযেন্স সিটি। রবীন্দ্রনাথ কল্পনেত্রে দেখেছিলেন 'আজি হতে শতবর্ষ পবে' তাঁব যাবতীয রচনা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়েছে—সবই উচ্চ মানেব সায়েন্টিফিক থিসিস।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া সম্ভবত হাওড়া ব্রিজটিকে খুবই পছন্দ করতেন এবং অবশ্যই রাজ্যপাট ছেড়ে ইংলণ্ড থেকে স্রেফ দু-মিনিট পাযে হেঁটে সকাল-সন্ধে ওখানে হাওযা থেকে আসতেন। সেজন্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিযালেব গায়ে দেগে দেওয়া হল—হাওড়া ব্রিজ।

নাঃ, শুধু ভারতীয মগজে বিজ্ঞানের এমন অভিনব অগ্রগতির স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়নি, সাহায্য নেওয়া হয়েছে একটি বিদেশি সংস্থারও। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এ কোনো বিজ্ঞান প্রদর্শনী নয়, সজ্ঞানে পরলোকগমনের আযোজন। সম্ভবত কেওড়াতলা মহাশ্মশানও ছিল, কিন্তু কার গায়ে মহাশ্মশান যাত্রা করেছিলেন সেটি আর স্মরণে নেই, সম্ভবত ততক্ষণে প্রতিবেদকেব সাময়িক পবলোক যাত্রা সম্পূর্ণ হযেছিল।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক

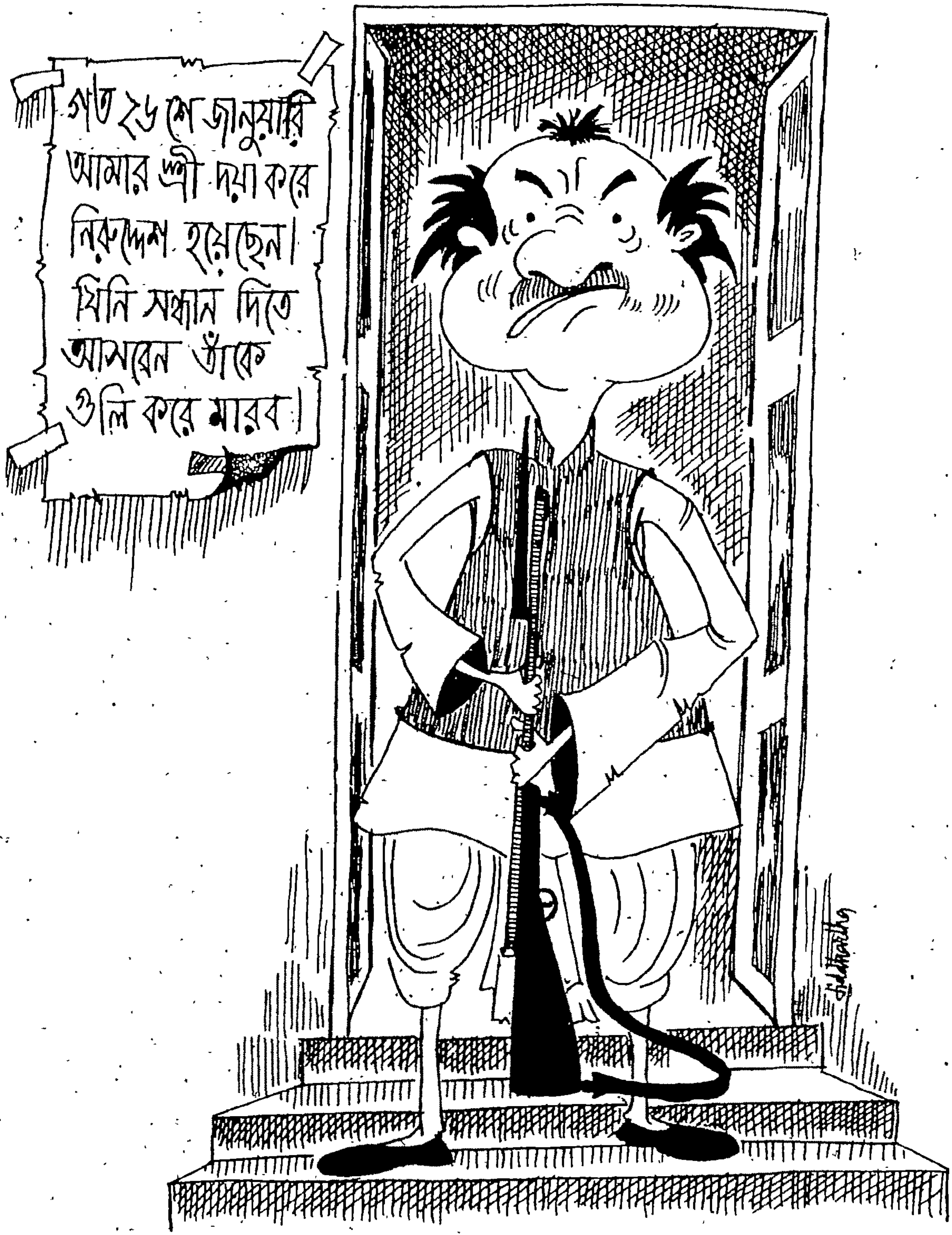

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

এতদিন কোথায় ছিলেন

ওম্‌বিকা গুপ্‌তো

আপনি!

প্রশ্নটা ইন্দ্রকান্তর চোখেমুখে ফুটে উঠলেও কথাটা ঠিক মুখফুটে বেরোয়নি।

ভাগ্যিস!

হলে ব্যাপারটা যে শুধু অশোভন হত তা নয়, হয়ত বেশ অপ্রস্তুত হতে হত ইন্দ্রকান্তকে। অপরিচিতা কোনো মহিলাকে পথেঘাটে পরিচিতি-সূচক সম্বোধন করাটা অভব্যতা। অনেক সময় এ নিয়ে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্ভাবনা থেকেই যায়।

অবশ্য ভুল মানুষের হয়। অনেক সময় চেহারার সাদৃশ্য হেতু একজনকে অন্যকেউ বলে ভুল করাটা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইন্দ্রকান্তর সে রকম কোনো দৃষ্টিভ্রম হয়নি। মুখটা ওর চেনাই, শুধু চেনাই নয়, বেশ মনে রাখার মতো মুখ। এটা ঠিক যে আক্ষরিক অর্থে মহিলাটির সঙ্গে ইন্দ্রকান্তর আনুষ্ঠানিক আলাপটা ঠিক হয়ে ওঠেনি। সে তো জুলিয়া রবার্টসের সঙ্গেও হয়নি। তাই বলে অন্য কাউকে কি ও 'প্রেটি উওম্যান' বলে ভুল করতে পারে, না, সেটা সম্ভব? আসলে ইন্দ্রকান্তর মনের সংগ্রহশালায় গুটিকয়েক মুখের মধ্যে এই মুখটিই কেমন জানি অস্থির করে তুলেছিল ওকে ইদানীং।

বেশ ক' মাস হল, নাকি বছর ঘুরে গেল, প্রায় রোজই ঠিক সকালে নয় প্রত্যুষে ও মুখ ইন্দ্রকান্ত আধো আলোর ফিকে আভায় চোখ তুলে না হলেও চোরা চোখে দেখেছে বহুবার। কয়েক মুহূর্তের দেখা কয়েকবার ঠিক ওই সময়টাতেই। আশ মিটত না ইন্দ্রকান্তর। ভোরের ওই কয়েকটা ঝলকে, ঝলকে আসা মুহূর্তগুলোর জন্যে অপেক্ষা করে থাকত ইন্দ্রকান্ত বাকি দিনটুকু, রাতও। কিরকম যেন একটা মিষ্টি নেশা ধরে গিয়েছিল ওর।

হয়ত মহিলাটিও ওকে দেখেছে। ওরই মতো, আড়চোখেই। অন্তত ইন্দ্রকান্ত সেই আশাই করে।

পার্কটা ইন্দ্রকান্তর শহরতলির নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির একরকম সংলগ্নই বলা চলে। মস্ত বড় বৃত্তাকার পার্ক। পরিধিটা প্রায় পৌনে এক মাইল হবে। লম্বা লম্বা ইউক্যালিপ্টাস গাছে ঘেরা, সঙ্গে আরো নানান বাহারে গাছ সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে।

সবুজ দুব্বোঘাসের গালিচায় আলপনা দেয়ার মতো নানান রঙের মরসুমি ফুল আর গোলাপের কেয়ারি করা বাগিচা। কলোনিটির আধুনিক পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে সবকিছুই বেশ মিলেজুলে আছে। শুধু একটিই ব্যতিক্রম। পার্কটির ঠিক পুবকোণে অতীতের বোঝা মাথায় নিয়ে সমাধিস্থ হয়ে আছে সুপ্রাচীন বটবৃক্ষটি। অনেকেই বলে কোম্পানির আমলের গাছ। স্বয়ং হেস্টিংস সাহেব নাকি বন্য বরাহ শিকারের পর বিশ্রাম নিতেন মহীরুহটির ছত্রছায়ায়। হবেও বা। কলকাতার এদিকে ওদিকে অমন অনেক গাছ ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে বলেই শুনেছি।

ইন্দ্রকান্তর শৈশব কেটেছিল আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের মতো গ্রাম বাংলার খোলা হাওয়ায়।

কিন্তু কৈশোর থেকে তারুণ্যের প্রথম কটা বছর কেটেছে গুলু ওস্তাগর লেনের স্যাঁৎসেতে বদ্ধ ঘরের দমবন্ধ হওয়া পরিবেশের মধ্যে। তাই শিক্ষান্তে ভালো একটা চাকরি পেয়ে অফিসের কল্যাণে এমন একটা খোলামেলা জায়গায় এসে ইন্দ্রকান্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। জলঙ্গীর তীরে সেই গ্রামটির মতো এই খোলা হাওয়ার জায়গাটাও যদি একদিন হারিয়ে যায়—হয়ত এমনিই একটা আশঙ্কায় রোজ ভোরেই ও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত পরিবেশটিকে নিংড়ে নিংড়ে দেহমন দিয়ে উপভোগ করার লোভে।

শুধু ইন্দ্রকান্ত কেন, অনেকেই। এমন কি দূরের কাছের অন্য পাড়া থেকেও অনেকেই আসত গাড়ি করে। পার্কে চক্কোর কেটে আবার ফিরে যেত তারা গাড়ি করে। ইন্দ্রকান্তর চক্কোর কাটা শুরু হত ভোর পাঁচটা নাগাদ, কি শীতে কি গ্রীষ্মে। এক ঘণ্টার মতো হাঁটত ও। প্রথম কটা পাক বেশ দ্রুত গতিতে, শেষের দিকে গতি কিছুটা মন্থর হয়ে আসত। ঠিক দেখব বলে না দেখলেও চোখে পড়ে যেত অনেক মুখ। বেশির ভাগই রোজ দেখা মুখ। কখনো সখনো নতুন মুখও দু'একটা নজরে আসত। শুধু চোখেই পড়া বা নজরে আসা। অন্য পরিবেশে এদের কারুর সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হলে হয়ত চেনা চেনা মনে হতে পারে, কিন্তু ঠিক কোথায় যে দেখেছে সেটা হয়ত মনেও করতে পারবে না ইন্দ্রকান্ত।

মহিলাটির কথা অবশ্য ভিন্ন। অন্য অনেক না-মনেরাখা মুখের মতো মনে রাখার মতো এ মুখটিও ইন্দ্রকান্ত পার্কেই দেখে এসেছে। বেশ ক' মাস ধরেই। কিন্তু এ দেখাটা ঠিক আর কাউকে দেখার মতো নয়। প্রথম দর্শনটি বেশ স্পষ্টই মনে আছে। শরতের বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের পুবের কোণ সবে একটু একটু করে রাঙাতে শুরু করেছে। পুবমুখোই হাঁটছিল মেয়েটি। তাই আলতো একটু ফাগুয়ার ছোঁয়া লেগেছিল ওর মুখে। এক কুচি হীরের নাকছাবিটায় বিচ্ছুরিত হয়ে সেই আলোটা আবার ঠিকরে এসে পড়েছিল বিপরীতমুখো ইন্দ্রকান্তর ঘুম ঘুম চোখে। এক মুহূর্তই হবে। কিন্তু ওরই মধ্যে সচকিত হয়ে চোখ মেলেছিল ইন্দ্রকান্ত। মুহূর্তের দেখা। ভোরের হাল্কা হাওয়ার মতো ইন্দ্রকান্তর পাশ দিয়ে ভেসে গিয়েছিল মেয়েটি।

এটিই সেদিনের শারদ প্রভাতে প্রথম পরিক্রমণ। ইন্দ্রকান্তর। বৃত্তের বিপরীতমুখী গতি ছিল দু'জনের। ছ'বারের পরিক্রমায় মোট বারো বার মিলেছিল ওদের গতিপথ।

সরাসরি না হলেও বারো বারই ইন্দ্রকান্ত চোরা চোখে মেয়েটিকে দেখেছিল। না দেখে পারেনি আর কি।

সেই শুরু। তারপর হাতে গোনা যায় এমন কটা নিস্ফলা দিন বাদ দিলে রোজই ওদের গতিপথ প্রতি চক্রে দু'বার করে মিলেছে। কখনো বারো বার কখনো চোদ্দ বার, আবার কখনো হয়ত দশবার। সংখ্যাটা পুরোপুরিই নির্ভর করেছে মেয়েটির পাক কাটার ওপর। সত্যি কথা বলতে কি বৃষ্টি-বাদলের দিনগুলো বাদ দিলে মেয়েটি খুব একটা অনুপস্থিত হয়নি এই প্রাত্যহিক প্রাতঃভ্রমণে। আশাবাদী ইন্দ্রকান্ত অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও উপেক্ষা করে অনেক সময় ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়েছে। হতাশ হতে হয়েছে ওকে, কিন্তু দৈবাৎ-এও বিশ্বাস হারায়নি। বৃষ্টির কথা কিছু বলা যায় না। হুট্মুট্ করে যেমন আসে, তেমনি থেমেও যায় হঠাৎই। দু'দশ মিনিট দেখে বৃষ্টি থামলে মেয়েটি এসেও যেতে পারে। তখন? না, ইন্দ্রকান্ত কোনো ঝুঁকি নিতে চায়নি। নেয়ওনি।

কিন্তু হঠাৎই এক ফুটফুটে পরিষ্কার প্রভাতে ইন্দ্রকান্ত মেয়েটিকে দেখতে পেল না। এমন অঘটন এর আগেও যে হয়নি তা নয়। হয়েছে, ক্বচিৎ কখনো। খুবই খারাপ লেগেছিল ইন্দ্রকান্তর, যেমন এইরকম পরিস্থিতিতে এর আগেও লেগেছে। সেইজন্যে ব্যাকুল হলেও খুব একটা বিচলিত হয়নি ও। কিন্তু মেয়েটির ওই একদিনের অনুপস্থিতি যখন ক্রমেই দীর্ঘ হতে হতে পক্ষকালে দাঁড়াল, ইন্দ্রকান্ত তখন শুধু বিচলিতই নয় রীতিমতো অস্থির হয়ে উঠল। কিছুই করার ছিল না ওর। হাত-পা বাঁধা অবস্থা। ঠিকানা তো দূরের কথা, মেয়েটির নাম পর্যন্ত ইন্দ্রকান্তর জানা ছিল না।

বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিরাট কলোনি। কয়েক একরের বিপুল বপু, কয়েক হাজার ফ্ল্যাট। লক্ষ না হলেও বেশ কয়েক সহস্র মানুষের বাস এখানে। এর মধ্যে কোথায় খুঁজবে ইন্দ্রকান্ত আলো-আঁধারে দেখা সেই বিধুমুখ।

আর সেই চন্দ্রানন যে এই কলোনিরই মেয়ে তারই বা নিশ্চয়তা কি। আশে পাশে ব্যাঙের ছাতার মতো কলোনি গজিয়ে উঠেছে। সেখান থেকেও অনেকেই আসেন প্রাতঃভ্রমণে। এমনকি লেক গার্ডেন্স, রিজেন্ট পার্ক, যোধপুর পার্ক থেকেও কেউ কেউ গাড়ি চালিয়ে আসেন পার্কে হাওয়া খেতে। মেয়েটিকে অবশ্য গাড়ি থেকে নামতে বা উঠতে কখনো দেখেনি ইন্দ্রকান্ত। এলেও সেটা চোখে পড়েনি।

কিন্তু কোথায় উধাও হয়ে গেল মেয়েটি এক ঝলক ফাগুন হাওয়ার মতো? নাই বা আলাপ থাকুক। শোবার ঘরে মাথার কাছে জানলাটার কোল ঘেঁষে দাঁড়ানো কদমফুলের গাছটার ডালে বসা হলুদ পাখিটার সঙ্গে তো ইন্দ্রকান্তর আলাপ ছিল না। কিন্তু রোজ সকালে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পাখিটাকে দেখলেই মনটা ওর বেশ খুশিতে ভরে উঠত। বৃষ্টি-বাদলে যে দিনই পাখিটাকে ও খুঁজে পেত না ডালটার ওপর, কেমন যেমন মনমরা হয়ে যেত। তবু পাখিহারা ইন্দ্রকান্তর হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা ছিল। সেলিম আলির বইতে ও পাখিটার পরিচিতি পেয়েছিল, নামটাও—ওরিয়োল, বেনেবৌ। কিন্তু এখানে মেয়েটি ওকে সেটুকু স্বস্তিও দেয়নি।

ইচ্ছে, উদ্যম, উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবিকই ইন্দ্রকান্তর কিছু করার ছিল না। ছিল শুধু অস্বস্তিটুকু ভোগ করা। হাত-পা বাঁধা থাকলেও মনটা তো খোলাই ছিল; এবং সক্রিয়। ফলে ভালোবাসার না হলেও ভালোলাগার ধন হারানোর বেদনা ক্রমশই অস্থির করে তুলছিল ইন্দ্রকান্তকে। খোলামেলা মুক্ত হাওয়াতেও প্রাণ ওর হাঁপিয়ে উঠেছিল। এমনটি গুলু ওস্তাগর লেনের বদ্ধ পরিবেশেও হয়নি।

হলুদরাঙা বেনেবৌ পাখিটাকেও আজ কদিন হল কদমফুলের ডালে চোখে পড়েনি ইন্দ্রকান্তর। একটা বাদামি রঙের শালিক বসতে দেখেছে ওই ডালটায়। শালিকটার ঠোঁটটাই শুধু হলুদ। তাও অমন জ্বলজ্বলে নয়। পাখিদের আয়ুষ্কাল কম বলেই জানে ইন্দ্রকান্ত। তবে কি মরেই গেল বেনেবউটা? এলোমেলো নানান চিন্তা মাথায় এসেছিল ইন্দ্রকান্তর। মানুষের আয়ুষ্কাল জীবজন্তুর তুলনায় অনেক বেশি। তবে অল্প বয়সেও অনেকেই মারা যায়। ইন্দ্রকান্তর বাবা-মা তো ওর হাঁটাচলার আগেই চলে যান। আর অপমৃত্যু তো বয়সের হিসেব রাখে না।

একটাই কেনার ইচ্ছে ছিল ইন্দ্রকান্তর। কিন্তু হাতিবাগানের পাখিওলাটা নাছোড়বান্দা। এক জোড়াই গছিয়ে দিলে এই বলে যে বেনেবউ, দোয়েল, ময়না আরো কী কী পাখি যেন জুড়িতে না রাখলে বাঁচে না। সেলিম আলির বইতে এমন কথা পড়েছে বলে মনে না হলেও কেন জানি না পাখিওলার জোড়া বেচার যুক্তিটা ঠিক সেলস্পিচ বলে মনে হয়নি ইন্দ্রকান্তর। কথাটা ওর মনকে ছুঁয়েছিল।

গ্রে স্ট্রিটে গাড়িটা পার্ক করা ছিল। খাচাটা নিয়ে গাড়িতে উঠতেই মোবাইল বেজে উঠল। টেম্পল চেম্বার্স থেকে সেন সাহেবের ফোন। তিনটে নাগাদ একবার দেখা করতে বললেন।

মর্গান কোম্পানির লিগ্যাল অ্যাডভাইসর ইন্দ্রকান্ত। একটা বাঁধা মাসমাইনে আছে, ওদের হয়ে কোর্টে দাঁড়ালে ফিজও পায়। বাড়ি, গাড়ি ওদেরই দৌলতে। এমনিতে নিজের প্র্যাকটিশ আছে। সেন সাহেব চৌধুরী এণ্ড চৌধুরী অ্যাটর্নি অফিসের পার্টনার। গতকাল ব্রিফটা পাঠিয়েছিলেন। ডিভোর্স কেস। সেটেলমেন্টের মামলা। ক্লায়েন্টের সঙ্গে তিনটেতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকাল ইন্দ্রকান্ত। দশটা। আজ মর্গানে যাবার দিন নয়। বিশেষ কাজ না থাকলে উইকে তিনদিন ওখানে যেতে হয়। সোম, বুধ, শুক্র। আজ মঙ্গল। বাড়িমুখো রওনা হল ইন্দ্রকান্ত। ব্রিফটা ওপর ওপর দেখেছিল কাল সন্ধ্যায়। ক্লায়েন্টকে মীট্ করার আগে একটু ভালো করে দেখে নেবে ভাবল। যতদূর মনে পড়ছে জটিল কিছু নয়। মিউচুয়ালি এগ্রীড ডিভোর্স হয়ে গেছে। খোরপোষের দাবী নিয়েই সমস্যা দাঁড়িয়েছে।

লিফ্টের কোলাপ্সিবল দরজাটা যদি ঠিক সেই মুহূর্তেই ইন্দ্রকান্তর নাকের ওপর বন্ধ না হয়ে যেত তাহলে হয়ত 'আপনি' বিস্ময়সূচক শব্দটি অজান্তেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসত। হতভম্ব ইন্দ্রকান্তকে ফেলে ধীর গতিতে খাচাটা ওপরে উঠে গেল। কয়েক মুহূর্তের চোখাচোখি। নাহ্, চিনতে ভুল হয়নি ইন্দ্রকান্তর। ভোর বেলার সদ্য ফোটা জুঁই-এর সেই সতেজ ভাবটা মুখে নেই ঠিকই, একটা শুষ্ক কৃশতা কিছুটা দৈন্যের ছোঁয়া এনেছে শরীরে, কিন্তু চিনতে ভুল হয়নি ইন্দ্রকান্তর। কতকাল কেটে গেছে। যুগ, শতাব্দী, সহস্রাব্দ? অভিমানী মনে সেরকম অভিযোগ উঁকি দিলেও ইন্দ্রকান্তর স্মৃতির রোজনামচায় এমনকি আজকের দিনটিকে নিয়েও হিসেবটা নির্ভুল লেখা ছিল। এক বছর ন'মাস একুশ দিন। আশ্বিনে আশ্বিনে একটা বছর কেটে গেছে। এই বর্ষাটা কেটে গেলেই আবার শরৎ। রোজ সকালেই মনে মনে ক্যালেণ্ডারের পাতাটা উল্টে নেয় ইন্দ্রকান্ত কিসের যে তাগিদে তা সে নিজেও ঠিক জানে না।

অন্যমনস্ক হয়েই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল ইন্দ্রকান্ত। তিনটেই তো তলা। এখনো মিনিট পনেরো সময় আছে হাতে। সেনের চেম্বারে না ঢুকে নিজের চেম্বারেই গিয়ে বসল ইন্দ্রকান্ত ঠিক পাশাপাশি না হলেও কাছাকাছিই চেম্বার দুটো। ব্রিফটা খুলে চোখের ওপর মেলে ধরল, কিন্তু পড়া হল না। কার চেম্বারে গেল মেয়েটি? কী দরকারে এখানে? নানান চিন্তা, কৌতূহল। একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। হাঁপিয়ে উঠল ইন্দ্রকান্ত। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেল সেন সাহেবের চেম্বারের দিকে।

বলরাম পিওন বসেছিল টুলটায়। জানাল, সেন সাহেব এখনো এসে পৌঁছননি, এক ভদ্রমহিলা অপেক্ষা করছেন। টাইম দেওয়া আছে। সুইং ডোর ঠেলে ঢুকতেই আবার সেই চোখাচোখি। এবার ইন্দ্রকান্তর ঠোঁটে আসা কথাটা কেড়ে নিয়ে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন—

আপনি!

হ্যাঁ, মানে, আমি—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিড়বিড় করে বলে গেল ইন্দ্রকান্ত।

ভদ্রমহিলা সপ্রতিভ। কিছু একটা যেন বললেন। ইন্দ্রকান্তর কানে ভেসে এল—এতদিন কোথায় ছিলেন।

টীকা নিষ্প্রয়োজন

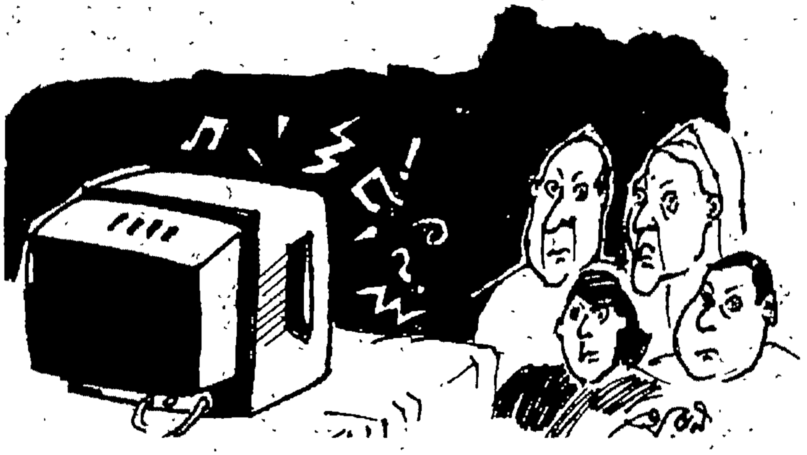

দুর্ভার দূরদর্শন

টিভি-তে যে একেবারেই কোনো অনুষ্ঠান দেখানো হয় না তা কিন্তু নয়। হয়। তবে হ্যাঁ, একটু সজাগ থাকতে হয়। চোখকান খুলে রাখতে হয়। একরাশ বিজ্ঞাপনের একঘেয়ে পুনঃপুনঃ প্রদর্শনের ফাঁকে ফাঁকে, তৎসহ আগামী নানান অনুষ্ঠানের একই ঝলকের অবিরত পুনঃপ্রচারের মধ্যেসধ্যে খাপছাড়া খাপছাড়া কিছু না কিছু ক্রমিক কাহিনী, ছায়াছবি, খবরাখবর, নৃত্যগীত, গালগপ্পো এ-ও-তার টুকরো, টুকরো অংশ খেপে খেপেই দেখানো হয়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এগুলির পর্দাস্থিতি ক্ষণিকের। বিজ্ঞাপন বিরতির বিড়ম্বনায় এক মুহূর্তে "এই তো জীবন" থেকে "লাইফ্ হ্যায তো এ্যাইসি," "দিল্ এক মন্দির" থেকে "দিল্ [illegible]" সাবিনা পার্কের লং সট্ থেকে ল্যাণ্ডটের ক্লোজ আপ্।

তথাপি যাঁরা কেদারায় ননীতাল আলুর মতো 'কাউট্ পটাটো' হয়ে টিভির কুমির তোর জলকে নেমেছি খেলা বা অনুষ্ঠান দেখতে দিব্যি অভ্যস্থ হয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে অর্জুন-তনয় অভিমন্যুর মনোবলই বলুন আর মানসিকতাই বলুন, বেশ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। হাবিজাবি বিজ্ঞাপনের সুরক্ষিত চক্রব্যূহ ভেদ করে অনায়াসে অবলীলাক্রমে এঁরা টিভি অনুষ্ঠানের গর্ভগৃহে পৌঁছে যান। ঠাকুর এঁদেরই বোধহয় বলেছিলেন—যোগী পুরুষ। হাঁসের মতো জল বাদ দিয়ে দুধটুকু চুকচুক করে শুষে নেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এখন তো দুধ বলতে মাদার ডেয়ারির টোণ্ড মিল্ক, বাজারের পাউডার মিল্ক, এদিক ওদিক খাটালের অপরিশ্রুত জোলো দুধ। দু'এক ফোঁটা চোনাও যে তাতে থাকে না তা নয়। থাকাটাই সম্ভব।

টিভির দুধও যে কামধেনু বা সুরভির বাঁট থেকে দুয়ে আনা সেটা আশা করি না। তাই বলে সব বালতিতেই চোনার ফোঁটা। কুশীলব সব বাংলা ক্রমিকে প্রায় একই। উপস্থাপনা একই আঙ্গিকে। কাহিনীও থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়।

শিশিরের শব্দ শোনা যায় কি না যায় জানি না, তবে দেখা যায় না। "এই তো জীবন" "লাইফ্ হ্যায় তো এ্যাইসি"-র বঙ্গানুবাদ? একাকী অরণ্যের একাকীত্বটা কোথায়? এক চিলতে রোদ্দুর যদি এই হয় তবে কাঠফাটা রোদ্দুর হলে কী হবে ঈশ্বর জানেন। যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে চেনা মুখের সারি অচেনা থাকলেই ভালো হত। "জন্মভূমি" চলছে চলবে—চলুক। আমি বাধা দেবার কে? এক আকাশের নীচে থেকেও মুক্তি পাবার কোনো লক্ষণ দেখছি না।

হাবিজাবি বিজ্ঞাপনের সুরক্ষিত চক্রব্যূহ ভেদ করে অনায়াসে অবলীলাক্রমে এঁরা টিভি অনুষ্ঠানের গর্ভগৃহে পৌঁছে যান। ঠাকুর এঁদেরই বোধহয় বলেছিলেন—যোগী পুরুষ।

"বোজগেরে গিন্নি" আর "টাকা না সোনা" বোধকরি একই অনুষ্ঠান দু-দুটো চ্যানেলে দেখানো হয়। বরিশালের বর আর কলিকাতার কন্যা অনুষ্ঠানটি হাস্যরসাত্মক বলে শুনেছি। হবেও বা। অতঃপর গালগপ্পো, যুক্তি তক্কো, রাজায় রাজায়, সাফকথা, জবাব চাই জবাব দাও, কথায় কথায় ও এবং ঋতুপর্ণা—সবগুলোকে একটা করে "এবং বক্বাস্" বললে কেমন হয়?

টিভিতে ছায়াছবি দেখার অন্তরায় আরো বেশি। বিজ্ঞাপনের ঢল নামে সেই সময়টায়। ছবিও সব আদ্যিকালের। যেমন প্রিন্ট তেমনি সাউণ্ড। কাননবালাকে চুনিবালা বলে মনে হয়, দুর্গাদাসকে হরিধন। সায়গলের গলা আর কানাকেষ্টর গলা একই মনে হয়। বারো রিলের ছবিতে বারোবার বিরতি।

বাকি অংশ সংবাদের পর অথবা বিজ্ঞাপন বিরতির ফাঁকে ফাঁকে, না হয় আগামী অনুষ্ঠানসূচীর ঝলক দেখানোর অন্তে।

—বুনো রামনাথ

ভিক্ষেয় কাজ নেই

পিনাকী ভাদুড়ী

> সত্যি কথা বলতে কি, বছরে আমি যে ক'টাদিন সুস্থ থাকি তার সংখ্যা খুবই কম। স্বাধীনতা দিবস, গণতন্ত্র দিবস, দোল এবং বিজয়া। এবং মে দিবস। এসবের পরের দিনগুলোতে কাগজ বেরোয় না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি আমি। ওই ক'দিন নিঃশ্বাস দূষিত হয় না।

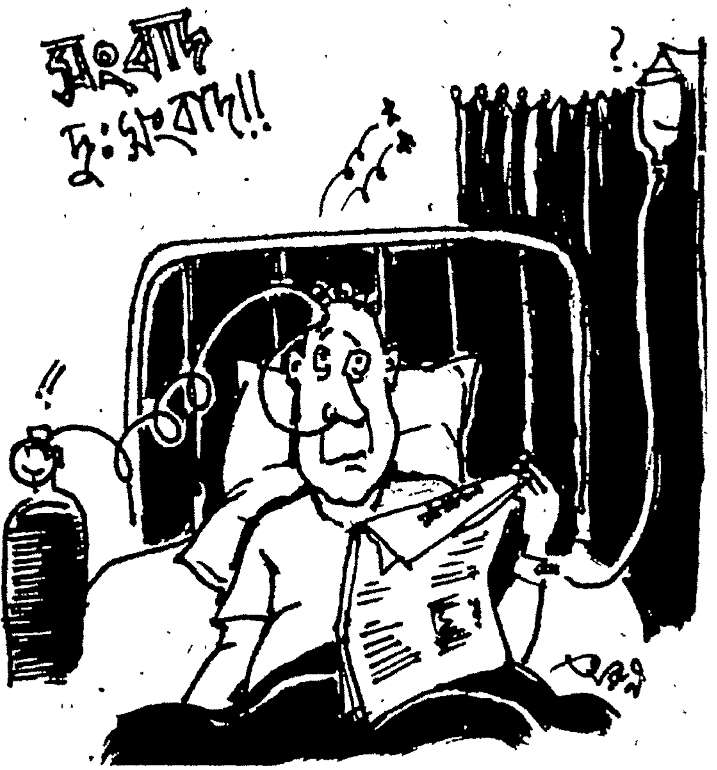

হৃৎপিণ্ডের অসুখে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সেখানেই এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। রোজ ভোর হতে না হতেই যে লোকটি ওয়ার্ডে ঢুকত, সে কাগজের হকার। অনেক রোগী তখনো ঘুমোচ্ছে। সে সবার বিছানায় ফেলে যেত সেদিনের কাগজ। বলেও যেত—'কাগজ'। ওইভাবে দিতে দিতে সে কয়েকবাব সদ্যমৃত কারো বিছানাতেও কাগজ ফেলে দিয়ে গেছে। যে গেছে, সে পরপারে এ পারের সংবাদ নিয়ে যেতে পারে কিনা কে বলবে।

খবরের কাগজের এমন খবর শুনে আপনাদের কী মনে হচ্ছে জানি না, তবে আমার তো হৃৎকম্প হয়েছিল। হার্ট অ্যাটাকের চেয়েও মারাত্মক এই সংবাদপত্রের মিসাইল অ্যাটাক। এখনো আমি বুঝতে পাবিনি, খববের কাগজ পড়ার কী দরকার। যে খবর থাকে ওই কাগজে, সে খবর না জানলে কী হয়? কাগজ পড়লে শুধুই মন খাবাপ হয় তা-ই নয়, অনেক মিথ্যাকেও মিথ্ বলে মনে হতে থাকে। প্রথম পাতায় যুদ্ধের খবর এবং তারপরে পাতার পর পাতায় খবরের যুদ্ধ। যুদ্ধ যখন লাগেনি তখনো। খবরের কাগজে যুদ্ধ লাগিয়ে দেবাব জন্য চলেছে লেখালেখি খেলা। কোন কথার কোন টীকা, অথবা কোন কুকথার কোন টিপ্পনী লিখলে যুদ্ধ লাগতে দেরি হবে না, যে কোনো সংবাদপত্রে চোখ বুলোলেই তা টেব পেতে দেবি হবার কথা নয়। অন্তত এটা টের্ পাবেন যে, এই ছুতোয বাজারে জিনিসের দাম আগুন হযে যাচ্ছে। যুদ্ধের আগুন লাগবার আগেই জীবনে আগুন এমন ছড়াবে যে আলু বেগুন কেনাই দুর্ঘটনা হয়ে উঠবে। সেই দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেবে সংবাদপত্র।

আসলে আমবা উত্তেজনা চাই, এবং উত্তেজনা ছাড়া কিছুই চাই না। নইলে খবরেব কাগজ এত ছাপা হয় কী করে? সেই খবরই খবর—যা মানুষ খাবে। এক সময়ে বলা হত যে কুকুরকে কামড়ালে, সেটা খবর। এখন অবশ্য অনেক পরিবর্তন হযেছে, বিবর্তন হয়েছে মানুষেরও। এখন মানুষই কামড়াচ্ছে মানুষকে। সেটাই হচ্ছে খবর। শুধু দাঁত দিয়ে নয, কামড়াবার অনেক ঘাঁত-ঘোঁত শিখেছে মানুষ। সে সব জানতে হলে আপনাকে খববের কাগজ পড়তে হবে। পড়তে গিয়ে চোখ উল্টে পড়বেন আপনি। অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

সত্যি কথা বলতে কি, বছবে আমি যে ক'টাদিন সুস্থ থাকি তাব সংখ্যা খুবই কম। স্বাধীনতা দিবস, গণতন্ত্র দিবস, দোল এবং বিজযা। এবং মে দিবস। এসবের পরের দিনগুলোতে কাগজ বেরোয় না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি আমি। ওই ক'দিন নিঃশ্বাস দূষিত হয় না। স্বাধীনতা যদিও এখনো প্রতিদিন পরাধীন করে ফেলছে আমাদের, গণতন্ত্র হযে উঠছে তন্ত্রসাধনা, তবু এইটুকু সুখ এরা দিয়েছে আমায়। হোলি তার সবটুকু হুল্লোড় নিয়েও খবরের কাগজের মতো Unholy নয় কিছুতেই। বিজয়ার বিষাদ কোনোমতেই সংবাদ বিজয়ের

মতো অবসাদ নিয়ে আসে না। মে দিবস আমাদের রোজই, কারণ রোজই আমরা শ্রমে ফাঁকি দিই। তবু মে দিবস আলাদা করেই পৃথক, কারণ খবরের কাগজ বন্ধ থাকে তার পরের দিন।

এইজন্যই আমার নিজস্ব একটা দাবী আছে, যাতে এই সুখ আমাদের জীবনে সম্প্রসারিত হতে পারে। সত্যি বলতে কি, তিনমাসে একটা অথবা একমাসে তিনটে বন্‌ধ্ আমাদের নিয়মিত পাওনা হয়ে আসছে। ক'দিন গেলেই একদিন কাজ বন্‌ধ্, সে ডাক যে-ই দিক না কেন, আমরা তাতে সাড়া দেবই। সে ক্ষেত্রে এই বন্ধ হলে খবরের কাগজ কেন বন্ধ হবে না? তাহলে তো আরো কটা দিন মুক্তি পেতে পারি আমরা।

না, খবরের কাগজের খবর আর চাই না আমি, খবর কাগজই চাই না আর। ভিক্ষেয় কাজ নেই, কুকুর ঠ্যাকা। আপনি বলবেন, কাগজ বেরোচ্ছে বেরোক, আমি সেটা না পড়লেই পারি! পড়ার দরকার কী?

সে চেষ্টাও করে দেখেছি। পুরো তিনমাস কাগজ নিইনি আমি। আমায় যে কাগজ দেয়, সংবাদপত্র জগতের ওই একজনের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে— সে খুব অবাক হল, এমনকি এও ভাবল যে আমি বোধহয় হকার পাল্টেছি। সেই তিনমাস আমি সত্যিই ভালো ছিলাম। কিন্তু ভালো থাকা আমার কপালে নেই—ঘরের (স্ত্রী) লোকের চাপে কাগজ নিতে হল আবার। কারণ কাগজে যা বেরোয় সবই উনি বিশ্বাস করেন। জ্যোতিষের পাতায় হুমড়ি খেয়ে যা পড়া যায় তা পড়তে পড়তে কখনো তাঁর দাঁত দেখা যায়, কখনো যায় না। কখনো হাসেন, কখনো হাসতে পারেন না। তবু ওরই মধ্যে খুঁজে বেড়ান যা তিনি জীবনে পাননি এবং পাবেনও না।

শুধু তাই নয়, এই রাশিফলের চেয়েও মারাত্মক হল রবিবারের পাতা। সংবাদপত্রকে দুঃসংবাদপত্র করেই এঁদের আশ মেটেনি, এর মধ্যে সাহিত্যের Raw-চোনাও ছিটিয়ে দিয়ে সবটারই সর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে এঁরা বদ্ধপরিকর। রবিবারের ছুটির দিনটা নষ্ট করার পক্ষে যে কোনো কাগজের রবিবারের পাতা পড়াই যথেষ্ট। এখানে যে গল্প বেরোয় তা সেই গল্পের লেখক ছাড়া আর কেউ পড়তে পারে কিনা আমরা জানি না।

সেইসঙ্গে রাজনীতির জগতের Strange Bedfellows নিয়ে রগরগে Fiction যা ট্রুথ্যের চেয়েও Stranger কিন্তু ট্রুথ্যের মতো Stronger নয় কখনোই। অথচ তাও আমাদের Staple food. সংবাদপত্রের Stable-এ যা তৈরি হয়।

খবর আমাদের এমনই বাই মেলে গ্রাস করেছে যে রাহুর গ্রাসের চেয়েও তা সর্বনেশে। রাহু তবু ছাড়ে, খবর তো ছাড়ে না। যত বেমক্কা, যত বেয়াড়া হবে খবর, ততই তার বাজার। ভালো খবরের দাম নেই। যেখানে খুন, যেখানে খারাপ—সেইসব খুন-খারাপির খবর প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে সযত্নে বেরোয়। যেখানে কোনো সততা, কোনো মূল্যবোধ আজও কোথাও একটু আধটু চোখে পড়ে, তার খবর ভেতরের পাতায় সংক্ষেপে। কোথাও দাঙ্গা হলে কাগজের ফোটোগ্রাফার সেখানে প্রথম পৌঁছায় নিহত নিরীহের পরিবারবর্গের কান্নার ছবি তুলতে—ভালো স্টোরি হবে এতে। যে মরল সে তো গেলই, বাঁচল খবরের কাগজ। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস যখন আসন্ন হয়ে আসছিল তখন সারা দেশ স্তব্ধ, কিন্তু সংবাদপত্র তখনো ব্যস্ত ছিল শোকসংবাদ ছেপে তৈরি রাখার জন্য। শেষ খবর পাবার অনতিকাল পরেই বেরিয়ে গেছে কাগজ, শোক পাবার আগেই প্রকাশিত হয়েছে শোকসংবাদ। নির্মম, নিষ্ঠুর।

খবরের কাগজের হাল ততই ফিরবে যত আমাদের 'দুরাবস্থা' (দুরবস্থা নয়) ফিরে আসবে। হালের ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এখানে সব দেশই খেলে, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। অবশ্য ঘুমোয় না মোটেই—কাজ ফেলে খেলা দেখে সেই সব দেশের, যাদের কাছে খেলাটাই একটা কাজ। ছোট্ট ছোট্ট রাজ্য, সবে জন্মেছে এমন রাষ্ট্র—সবাই এসেছে দেশ দেশ নন্দিত করে, ভারত তবু কই? তথাপি এ খেলার জন্য Sports Supplement বার করেছে সংবাদপত্র—যারা খেলছে তাদের ভুলগুলো দেখিয়ে দিয়েছে এইসব কাগজ! কী করে খেলতে হবে তা এই কাগজগুলো জানে, জানে না যারা খেলছে, তারা। আমাদের কাছে সব খেলাই ধুলোখেলা, সব খেলাতেই ধুলোয় লুটিয়ে পড়ি আমরা—একশো বছরের বেশি ফুটবল খেলছি আমরা, তবু এখনো কাগজে খেলার বেশি এগোতে পারলাম না। আগামী একশো বছরেও যে পারব না সেকথা পরিষ্কার। সব খেলাতেই আমরা Slow কিন্তু Steady নই একেবারে, যদিও Stadium গড়েছি অনেক।

খবরের কাগজের এখন এমন রমরমা যে একবার নয়, দিনে এখন দু'বার কাগজ বেরোয়। সকালে আর বিকেলে। আমার খালি মনে হয়, এত কাগজ মানেই কত গাছ কাটা হচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে পলিউশন। গাছ কেটে যে কাগজ বেরোচ্ছে তাতেও বাড়ছে সংবাদ দূষণ। এই দূষণই তো দোষণীয়। এরই বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সব অনৈতিক সত্য কাজকে যারা ফোকাস করে, খবরের কাগজের সেই মিথ্যাচার আমাদের পাপবোধকেও মিথ্যা করে দিচ্ছে। নরহত্যা এখন আর পাপ বলে মনে হয় না। দুর্নীতির এখন অনেক দূর নীতিভ্রষ্টতা আমাদের লোভী করে তুলছে। টাকার লোভে, ভোগের লোভে মানুষ যেমন ফাটকাবাজি খেলে সর্বস্বান্ত হয়, খবরের লোভে তেমনি সর্বানাশের পথে পা বাড়াচ্ছে সংবাদপত্র। এমন কাগজ উঠে গেলেই ভালো, খবর চাইনে—কাগজ ঠ্যাকা।

টেলিভিশনে এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর। খবর তো নয়, ঘণ্টা। ঘণ্টা বাজছে কার জন্য? আপনার আমার সবার জন্য। For whom the bell tolls.তার জন্য টোলট্যাক্স দিতে হচ্ছে কাগজ কিনে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কাগজ এখনো বেরোয়নি, তবে এবেলা-ওবেলা তো বেরোচ্ছেই। আমরাও তার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে পড়ে মাথা মুড়িয়ে চলেছি।

সংবাদপত্র শুধু সংবাদ ছাপে না, সাহিত্যও ছাপে, একথা আগেই বলেছি। একদিন হয়ত নোটও তারা ছাপবে। এখন তারা শারদীয় সংখ্যাও ছাপে। শরতের অমল মহিমাকে কালো করে দেওয়ার পক্ষে তারা যথেষ্ট। এর বেশিরভাগ লেখাই ছাপার যোগ্য হয় না, পড়ার যোগ্য তো হয়ই না। অবশ্য শরৎসংখ্যা কেউ পড়ে বলে মনে করিনে, ওটা শুধু Status বজায় রাখার Status Quo পদ্ধতি মাত্র।

এতক্ষণ যা বললাম, তাতে সংবাদপত্রের সব খবরই দিয়েছি। দিইনি শুধু সম্পাদকীয়ের খবর। ওটা কেউ পড়ে না বলেই দিইনি। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ওই সম্পাদকীয় পড়লেই বোঝা যাবে যে যিনি লিখেছেন তিনি কেন সম্পাদক হবার অনুপযুক্ত। অবশ্য, অনুপযুক্ত বলেই তো তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। কারণ News Paper মানেই তো No-Use Paper। খবর কাগজ মানেই তো যাতে খবর বলতে খাবারই বোঝায়। সেই খাবার, যা Public খাবে। এমন কাগজ কি ছাপতেই হবে? ছাপলেও, পড়তেই হবে? কাগজ ঠ্যাকাও মা—রক্ষে করো—খবরের ভিক্ষে বা ভিক্ষের খবর চাইনে। একটু জিরোতে দাও। এমনিতেই সারাদিন অনেক ধকল যায়, ভোর থেকে খবরের ধকল আর জুটিও না।

পুনশ্চ : খবর কাগজের একটা Use কিন্তু আছে। মাসান্তে যখন ঐ কাগজ পুরোনো শিশি-বোতলওলার কাছে বেচে দিই তখনই তার দাম। তারই জন্য কাগজ কেনা, যাতে সেটা বেচা যায়। কেনা-বেচার জগতের এইটাই অর্থনীতি।

কাগজ কেউ পুরোটা পড়ে না, পড়া যায় না বলেই পড়ে না। তবু কেনে, নইলে মান থাকে না। মান অবশ্যই কচু, কচুতে গলা চুলকোয় আর এই মান বাঁচাতে গিয়ে সর্বাঙ্গ চুলকোয় দাদের মতো। দাদের মলম হয়, কাগজের হয় কলাম। সেই কলাম কলাপের মতো বিকশিত হয়ে চলে, উল্লাসে কাকে সে যাচে? যাচে এই নিরীহ নির্বোধ পাঠকদের, যাদের ঠকিয়েই তার বাণিজ্যে চলেছে লক্ষ্মী।

তারাপদ রায় ও গঙ্গারাম

তারাপদ রায়

সেই যে শুরু হয়েছে, সেই থেকে মাঝেমধ্যে গঙ্গারাম এসে গঙ্গামণির নামে বলে যায়।

আমি ভাবলাম, সব কথা না বলে প্রকারান্তরে গঙ্গামণির কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। গঙ্গারামের কাছ থেকেও।

রবিবারের সকালে যথারীতি ওদের বাড়ি গেলাম। সাধারণত এই সকালে গঙ্গারাম সাপ্তাহিক বাজার করে। সেই সময় নিরিবিলিতে গঙ্গামণির সঙ্গে কথা বলা যাবে। গঙ্গারামের সাথে দেখা যাতে না হয় সেজন্য একটু দেরি করেই গেছিলাম।

> ব্যাগগুলো মানে—দু'টোই বাজার নিয়ে আসার রেশনব্যাগ নয়। একটা মানিব্যাগ, যা দিয়ে বাজার করা হয়; আরেকটা রেশনব্যাগ, যাতে বাজার নিয়ে আসা হয়।

গঙ্গারাম-গঙ্গামণি যুগলের সঙ্গে একসাথে দেখা হোক এটা আমি চাই না। কী রাগারাগি-মারামারির সম্মুখীন হব কে জানে। অবশ্য গঙ্গারামদের বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম আমার আশঙ্কা অমূলক।

বাইরের দরজা ভেজানো ছিল। সেটা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখি বাইরের ঘরে সোফার উপরে পাশাপাশি দু'জনে দু'জনার কোল ঘেঁষে বসে রয়েছে গঙ্গারাম ও গঙ্গামণি।

একই পেয়ালা থেকে দু'জনে চুক্‌চুক্ করে চা খাচ্ছে। একবার গঙ্গারাম একবার গঙ্গামণি।

সহসা আমার অপ্রত্যাশিত প্রবেশে দু'জনে তাড়াতাড়ি ছিটকিয়ে সরে গেল। গঙ্গামণি বলল, "বাইরের দরজার ছিটকিনিটা লাগানো ছিল না বুঝি।"

গঙ্গারাম সে কথার মধ্যে না গিয়ে বলল, "বাজারের ব্যাগগুলো দাও। বাজারটা সেরে আসি।"

আমি শুনে বললাম, "ব্যাগগুলো? এই আক্রার দিনে কয় ব্যাগ বাজার করবে?"

গঙ্গারাম বলল, "ব্যাগগুলো মানে—দু'টোই বাজার নিয়ে আসার রেশনব্যাগ নয়। একটা মানিব্যাগ, যা দিয়ে বাজার করা হয়; আরেকটা রেশনব্যাগ, যাতে বাজার নিয়ে আসা হয়।"

গঙ্গারাম বাজারে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলে গেল, "আপনি গঙ্গামণির সঙ্গে গল্প করুন। আমি এখনি আসছি। আপনার জন্যে বাজার থেকে স্বস্তিক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গরম জিলিপি নিয়ে আসব। এরকম জিলিপি এ তল্লাটে কোথাও পাবেন না।"

সব পাড়াতেই একটা না একটা দোকানে ভালো জিলিপি হয়। গরম হলে তো অতি ভালো। সব পাড়ার লোকেই ভাবে, অহংকার করে—আমাদের পাড়ার মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মতো জিলিপি.....

গঙ্গারামের জিলিপি বলে নয়, গঙ্গামণির সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলার এই একটা সুযোগ গঙ্গারাম করে দিয়ে গেল তার জন্যে তাকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম। ইতিমধ্যে গঙ্গামণি সুন্দর কাচের পেয়ালায় এক পেয়ালা চা নিয়ে এসেছে। চা-টা আমার হাতে দিয়ে গঙ্গামণি আমার সামনে বসল। বলল, "আপনি কিন্তু দুপুরবেলা এখানে খেয়ে যাবেন।"

পত্রপাঠ কোনো থোড়-বড়ি-খাড়া পত্রিকা নয়। পত্রপাঠ তাবড় তাবড় ভেকধারীদের মুখোশ ধরে টান দেওয়ার কাগজ, "শনিবারের চিঠি" "অচলপত্র"-র অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পত্রপাঠ দায়বদ্ধ। এই প্রতিকূল স্রোতে দাঁড় বাইতে চাওয়ার মতো মূর্খ যদি কেউ থাকেন তবে শুধু লেখা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে হাত মেলান। আপনার এই ত্যাগ কখনোই বিফলে যাবে না। অচিরাৎ ফললাভ করবেন—গালমন্দ, কপাল ভালো হলে উত্তম-মধ্যম কিংবা মামলা-মোকদ্দমাও জুটতে পারে।

—সম্পাদক

ফোন : ৪৪০-৩৮০৩ (সকাল ৯টার মধ্যে)

ফিউচার

দিব্যেন্দু দাস

যোগ আর জলযোগ কি এক? গান্ধী এক। গান্ধীজি আর এক। দক্ষিণ আফ্রিকার দুষ্টু ইংরেজরা গান্ধীজিকে লাথি মেবে বেব কবে দিয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের পুলিশ এক বর্ষীয়ান গান্ধীবাদীকে থানায় জুতোপেটা করে বলেছে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছেড়ে দিয়ে আসবে। তেলেভাজার দোকানে পিঁয়াজ আর পিঁয়াজি এক।

অমাবস্যায় বাত বাড়ে। আবার পৌরুষও বাড়ে। বন্ধুগণ, চলো, আগামী অমাবস্যায ওসিকে শিশি ধরিয়ে ফুলির ঘরে ঢুকে সবাই মিলে চেপে ধবি। পুরুষত্বের পোকা মাথায় উঠে গেছে। রাত্রিবেলায় হারিযে যাবার নেই মানা। তাহলে এ কথাই রইল।

মধ্য আমেরিকায় এক প্রাচীন সভ্যতার আবিষ্কার হযেছিল। এক প্রাচীন জলনিকাশি নালার দেওযালের খাঁজে অনেক ছোট ছোট হাড় পাওয়া গেল। প্রথমটা পশুপাখির হাড় বলে ভুল হল। পরে জানা গেল অধিকাংশই সদ্যোজাত পুরুষ শিশুর অস্থি। আরও মাথা ঘামিয়ে জানা গেল ঐ সভ্যতার কিছু উদ্যোগী মহিলা যারা নিজেদের চামড়ার বাণিজ্য করত তারা সদ্যভূমিষ্ঠ পুরুষ সন্তানকে খালি সিগারেটের প্যাকেটের মতো ঐ নালায় ফেলে যেত। কন্যা সন্তান ভবিষ্যতে বাণিজ্য বিস্তার করবে। অতএব থাক। সন্ধের পর সভ্যতায় কী হত জানা গেল।

ভারতবর্ষ সভ্যতার দেশ। কত নিদর্শন। সতীদাহ, বাঈনাচ, বাবরি মসজিদ, বানতলা, গোধরা, চন্দ্রকান্ত বণিকের বাড়ি। সভ্য বাঙালি সকালে উঠেই গোয়ালে যায়। বংশধরের জন্য এক পোয়া শক্তি আনতে। বিজ্ঞান বলছে, শক্তি অক্ষয়। কেবল রূপান্তর হয় মাত্র। জল বাঁধের তলায় পড়ে বিদ্যুৎ। দুধ বাঁটেব তলায় পড়ে আবার জল। শক্তির গোলকধাঁধা। গোয়াল থেকে বাঙালি যায় বাজারে। চাষীর বৌ উচ্ছে নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। উঃ কি সুন্দর লাউ গো তোমার। আজ ঘরে নিয়ে যাবই যাব। কিসমিস খেযে খেয়ে ঠোঁটে আলসার ধরে গেল গো। চাষীর বৌ গুছিয়ে বসল। আজ মাছ নয। ভাষাদিবস। ঘর ভর্তি আলু আছে। আজ আর আলু নয়। বাবার বাতে মৃত্যু হয়। সেই থেকে শাক নয়। নয় নয় করে এক আঁটি নিমপাতা কিনে বাড়ি ফেরা হল। বাড়িতে ফিরে কৈফিয়ৎ। আজ অর্থমন্ত্রী বাজার করছেন। আমাদের ঢুকতে দিল না গো।

বাঙালির পেট কামানের মতো। অসময়ে দাগলেই আমাশা। সারাদিন তোপখানার চারপাশে প্রদক্ষিণ। সূর্যের চারপাশে শনির চক্কোর। কখন থামবে কেউ জানে না। হালকা আহারই উপযুক্ত এসময়। কাকের পালক।

খবরের কাগজ চালু হয়ে গেছে ইউরোপে। আজ নিম আলু আর আলুভাতে। আগে পিছে আলু। গিন্নি সাবধান করল। দেখো, চরিত্রে আলুর দাগ না লাগে। আজকাল খ্যাংরা পাওয়া যায় না। গোদরেজ কোম্পানি সব খিল খুলে নিয়ে চলে গেছে। পরিতৃপ্তির অভিনয়ে বাঙালির দক্ষতা। যেন আজ আলুর বিরিয়ানি খাওয়া হল। বিদেশে মানুষ বৌকে চুমু খেয়ে কাজে বেরোয়। বাঙালি ঢেঁকুর শুনিয়ে বেরোয়। বাসে উঠে টিকিট কেটে ঘাম-খেলা। বাগবাজারের সিঁদুর খেলার মতো। তুমি আমায় মাখাও। আমি তোমায় মাখাই। এটা সধবাদের খেলা। ওটা হতভাগাদের খেলা। বাঙালির অফিস পাঠশালা। আজকাল, বর্তমান, সত্যকাহিনী, দেশ, বিদেশ, শেয়ারবাজার, রাশিফল, মদনগুপ্ত, কৃত্তিবাস, অমনিবাস। যেন পঞ্চাশ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। ফিরতি বাসে সমালোচনা। কেন্দ্র-রাজ্য, ভারত-পাক। আলু-হিমঘর, পুলিশ-প্রমোটার, পেশেন্ট-পিশাচ। অবশেষে বাড়ি ফিবল ক্লান্ত শহীদ। গুঁড়ো চায়ে গণ্ডারের শক্তি। লিকার খেয়েই চন্মনে। টি ভি, টি ভি, সাতটা বাজে। আমাকে না দেখতে পেলে শুরু করতে পারবে না। ইশ্, কাশ্মীর থেকে রক্ত ছিটকে এসে লাগল। ভোটপুজো উপলক্ষে বলি হচ্ছে বানতলায়। গৃহবধূকে কাটলেট করে খেয়ে ফেলেছে শ্বশুরমশাই। মানবাধিকাব কমিশনেব নতুন চেযাবম্যান স্টোনম্যান। বাদ্যি বাজিয়ে খবর শেষ হল। ঘোষিকা টা টা কবল দর্শকদেব। তোমরা ভালো থাকো। এবাব ডিনার টাইম। রুটি-আলুভাজা। আর কিছু করোনি আজকে? কি করে করব? তোমার মায়ের আত্মা-বান্নাঘরে ঢুকে বসেছিল আজ। বলল একাদশী করতে এসেছি। ডিনারের পব দু'জনে খাটে শুযে একটু ভবিষ্যৎ চিন্তা করা। কি মজা। এ জীবনে আর অশৌচ করতে হবে না আমাদের। ময়দান সাফ। পোস্ট অফিসের টাকাটা যুদ্ধের আগে তুলে নিতে হবে। নইলে গোলা হয়ে পাকিস্তানে চলে যাবে। খোকাকে একটা সাইবার কাফে করে দেব। স্কুল উঠে যাবে, তবু খোকা ক্লাশে উঠবে না। মাথার পেছন দিকে ওর চোখ। তুমি কি বলো?

—খোকা বলছিল বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমের ঠিকানাটা দিতে বোলো। মলির বাড়ি থেকে তাড়া মারছে। ফিউচার ঘরে ফেলে রাখা ঠিক না।

> কলকাতার পুরসভার চেয়ারম্যান সঙ্কোভে উবাচ,—বিনা ঘুষে পুরসভায় কোনো কাজ হয় না। গাঁইগুঁই করে মহানাগরিক অভিযোগ স্বীকার করলেন ঈষৎ পীতাভ সুরে,—কিছু ভালো লোকও আছেন। বছর পনেরো আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর খেদোক্তি মনে পড়ে—কাকে কাজ করতে বলব, চেয়ারকে? দুই লালবাড়ির সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে।

চরণ বৈরাগীর ইকড়ি মিকড়ি

> মন্ত্রীমশাই কি সরকারি বাসগুলোকে পিঁজরা পোলের ঘেয়ো কুকুরের মতো কুৎসিৎ দর্শন কদর্যতা থেকে মুক্ত করতে পারেন? পারবেন কি, সকালে যে-বাস গুমটি থেকে বেরোয় তার সিটে বসলে পোশাক ধূলিধুসরিত না হবার ব্যবস্থা করতে? পারবেন না। কারণ—দল, চাঁদা—দাদা এবং ভোট।

ক্ষ্যামা দিন

কলকাতার মহানাগরিক আব পবিবহন মন্ত্রীর মধ্যে কী কী মিল আছে? না, সঠিক উত্তরের জন্য কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। তবে পাঠক, কতটা সঠিক, মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাবেন।

প্রথম মিল—দু'জনেরই কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত গগনভেদী হুঙ্কাব পাতালেও শোনা যায়। শুনে শুধু ঘোড়া নয়, ছাগলও হাসে।

দ্বিতীয় মিল—দু'জনেই সমান ডিগবাজি বিশাবদ। এ বিষয়ে নোবেল প্রাইজ দিলে দু'জনেই ভাগীদার হবেন।

তৃতীয় মিল—দাদাদের বা দিদির (?) ধমকে প্রায়শই ন্যাজে-গোবরে হয়ে নাজুক অবস্থায় থাকেন।

এ ব্যাপারে অবশ্য মহামহিম মহানাগবিকের করুণ কাহিনী ধোপাব গাধাব চোখেও জল আনে। 'বেদেব মেয়ে জ্যোৎস্না'-র আঁচলের মৃদু বায়ু সেবনেব জন্য হৃদয়-বিদারক আকুলি-বিকুলি অঞ্জন চৌধুরিব চিত্রনাট্যকেও লজ্জা দিয়েছে। ক্ষমতার লালসা মানুষকে মূল্যবোধহীনতার কোন পাঁকে নিমজ্জিত করে, এর চেয়ে আর বড় উদাহবণ কোথায়? জয়তু বিধায়ক। জয়তু মেয়র।।

'অপারেশন সানসাইন' নামে কলকাতার রাস্তা হকার-জঞ্জাল মুক্ত কবাব যে দামামা-বাদ্যি, নর্তন-কুর্দন, 'গট আপ গেম' চলল, তাতে কিছু গবিব নিঃস্ব হল, অনেকের ব্যবসার বিপ্লবের প্রতীক লালবাতি জ্বলল। কিন্তু দুই মহান নেতার খ্যাতির কদর কী পরিমাণ বাহবা পেল! মহানাগরিক তাঁর দলকে কলপ-করা গোঁফের ব্রেডে ফালা ফালা কবে এমন হুঙ্কার দিলেন যে সবাই মনে করল, কলকাতা এবার শুধু তিলোত্তমা নয়, হযত এলিজাবেথ টেলরও হযে উঠবে। কাগজে টিভিতে কী হুড়োহুড়ি, প্রচরারের তুফান—কলকাতা এতদিনে তার বহু প্রতীক্ষিত 'মোজেস'কে পেয়েছে। তারপর অবশ্য বেদিনীব আবির্ভাব। অ্যান্ড মোজেস বিকেম মাউজ। সানসাইন ঢেকে গেল অমা মেঘে। কলকাতার দুইপাশে যথাবীতি হকার আরাধনা অব্যাহত।

কলকাতার পুবসভার চেযাবম্যান সঙ্কোভে উবাচ,—বিনা ঘুষে পুরসভায় কোনো কাজ হয না। গাঁইগুঁই করে মহানাগবিক অভিযোগ স্বীকাব করলেন ঈষৎ পীতাভ সুরে—কিছু ভালো লোকও আছেন। বছব পনেরো আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীব খেদোক্তি মনে পড়ে—কাকে কাজ কবতে বলব, চেযারকে? দুই লালবাড়িব সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে।

স্মরণ ককন অটোবিক্সা সম্পর্কে পরিবহন মন্ত্রীর সদম্ভ ঘোযণা। মিলিযে নিন বাস্তব অভিজ্ঞতা। মন্ত্রীমশাই মানুষকে বোধহয গিনিপিগ মনে করেন। তাই হঠাৎ হঠাৎ গিমিক দিয়ে পাদপ্রদীপেব আলোয উদ্বাহু নৃত্যে মাতেন। যেমন—মধ্যরাতেব বাস, কুল-ক্যাব (কেউ কখনো দেখেছেন?), ট্যাক্সি বিফিউজ্বাল বুথ। সম্প্রতি বানতলা দুর্ঘটনার পর বেসরকাবি বাসের উপর নজরদারির নির্দেশ হয়েছে। ঐ অসহায মানুষগুলো না মরলে সংশ্লিষ্ট কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হত না নিশ্চিত। মন্ত্রীমশাই কি সবকারি বাসগুলোকে পিঁজরাপোলের

ঘেয়ো কুকুরের মতো কুৎসিৎ-দর্শন কদর্যতা থেকে মুক্ত করতে পাবেন? পারবেন কি, সকালে যে-বাস গুমটি থেকে বেরোয় তার সিটে বসলে পোশাক ধুলিধুসরিত না হবার ব্যবস্থা করতে? পারবেন না। কারণ—দল, চাঁদা—দাদা এবং ভোট।

জনগণ? শালা, ফোট্।

মহানাগরিক দ্বিধাহীন ঘোষণা করেছেন, কলকাতার বাস্তা সারাতে পাববেন না। ওটা কে করবেন, তাও বলেননি। তার চেয়ে ঢের সরল সিওল, সিঙ্গাপুর বা অসলো উড়ে যাওয়া। মাঝে মাঝে ফসুফুসে দূষণমুক্ত বিদেশি বাতাস ভরে না নিয়ে এলে হাঁফ ধরবে না? সেজন্যই তিনি স্পষ্ট করে বলতে পারেন, কলকাতার রাস্তায় বৃষ্টি হলে জল জমবে না—এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি মেয়র হননি। হক কথা। বৃষ্টিতে জলই জমার কথা, দুধ নয়। তবে প্রতিশ্রুতি শব্দটা নিয়ে খটকা লাগল।

যেমন, পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে টক্কর দেবে না, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে অটলবিহারী প্রধানমন্ত্রী হননি।

ওয়াকফের টাকা নয়ছয় হবে না, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বুদ্ধদেব মুখ্যমন্ত্রী হননি।

শিক্ষকরা মাসপয়লায় মাইনে পাবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসীমবাবু অর্থমন্ত্রী হননি।

যখন তখন যাব তাব কাছে হারব না, এমন গ্যারান্টি দিয়ে সৌবভ গাঙ্গুলি ভাবতের অধিনায়ক হননি।

পেনশনারদের ভাত কেড়ে নেবেন না, এমন গ্যারান্টি দিয়ে বিমল জালান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হননি।

আরো বলার কি দরকাব আছে?

মহানাগরিক, আমরা জানি আপনি আসলেই জগন্নাথ। কারণ আপনার চেয়ে আপনার চতুর্থ শ্রেণীর বস্তার নেতা ঢের ঢের শক্তিধর। আপনি একা, ওরা অনেক। নেত্রীর দরকার তাদেবকেই।

যেমন হিল্লিদিল্লি করছেন, করুন। কাজ না কবার যে ব্রত নিযেছেন, নিষ্ঠাভরে পালন করুন তা। শুধু গণ প্রতারণা বন্ধ করুন।

জানি, আমরা জনগণ কেউ না। নো বডি। আমাদের শুধু আমাদের মতো বাঁচতে দিন। পদব্রজে চলতে দিন গড়িযাহাটে, শ্যামবাজারে, শিয়ালদায। পা রাখতে দিন বাসেব পাদানিতে।

আপনাদের নিজেদের স্বার্থেই এটুকু করবেন।

আমরা না টিকলে আপনাদের ভোট দেবে কে?

বাণী

আইভান হো ,হো

বাবা বলত, ওরে, জগতে জগন্নাথ হয়ে থাকবি। হাত কাটা হারাধন। হাত থাকলেই ভুল করবি। চাকরি করতে যাবি। কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। বিয়ে করবি। কত গালগাল শিখে যাবি। ছেলে হলে লক্ষ লক্ষ টাকা মাস্টারে মেরে দেবে। ছেলে ছবিঘরে বসে থাকবে। মেযে হলে ভিখিরি হয়ে যাবি। মেয়ে আবার দাহ্য পদার্থ। ভালো দিন দেখে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জ্বালিয়ে দেবে। সতীদাহের কলির ভার্সান। তার চেয়ে রকে বসে কাটিয়ে যা। তুই সবাইকে দেখতে পাবি। সবাই তোকে দেখতে পাবে। এখন কমিউনিকেশনের যুগ। শুধু কথা বলে যাও। পরের যুগে কাজে হাত দেবে। জগন্নাথের বারোমাস পুজো। দশভুজার বছরে একবার। তাও বাঁশের প্যাণ্ডেল। পুরীতে দেখে আয়। বাকিংহাম প্যালেস। কি রগড়ে রগড়ে চান করায়! দু'বেলা জিবেগজা।

বাবার কথা অমান্য করিনি। রকেই রয়ে গেলাম। মাঝে একটা কথা খুব চালু হয়েছিল। বাবারই কথা। রক এ্যাণ্ড রোল। রকে বসে রোল খেয়ে যাও। আর পারলে একটু রাজনীতি করো। রাজারা নিজের হাতে কিছু করে না। বাবরি মসজিদ কে ভাঙল?

ভগবান নাকি মানুষের জোড়াকে কাছাকাছি রাখেন। রকের উল্টো দিকে ঘোষবাড়িতে আমার জোড়া রাখা ছিল। খাওয়া-পরা মঞ্জু। নিঃসন্তান ঘোষ দম্পতি সকালে বেরিয়ে রাতে ফেরে। হাফবেলা ওরা মালিক, হাফবেলা আমি, মঞ্জু। মঞ্জু পাঁচপদের ভাত, তিন পদের রুটি ক'রে দু'বেলা খাওয়ায়। চা, কফি, চানাচুর, বিস্কুট সহযোগে পিরিত। ওদিকে ঘোষেদের অ্যানিমিয়ায় ধরে গেল। অন্যের খবরের কাগজে খবর বেশি থাকে। এও রক অ্যাণ্ড রোলের অঙ্গ। কাগজের অভাবে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে টাইম পাশ করত। কবীর কবিতা আওড়াত। বুদ্ধ মড়া গুনত। ঘোষেদের কাগজে কত খবর। কত বিজ্ঞাপন। লোকসভা লোকে লোকারণ্য। ওপরে গর্ভরোধক গুলি। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিপদ। পাশে প্লাইউড। বীরাপ্পনের ঘন জঙ্গল। নিচে সূতীর জাঙ্গিয়া। বনদপ্তরের বাঘ গণনা। ওপাশে একডজন নিরুদ্দেশ। গণংকাব খুন হওয়ায় রাশিচক্র ছাপা বন্ধ। সম্পাদকের অশৌচ। পাতা উল্টে 'কোথায বেড়াবেন'। বেল মাশুল শুনে উল্টে যাবেন। 'গাড়ি বাজাব'। আবও বেশি চাপা দেবার ক্ষমতা। ইঞ্জিনের ভেতর গাছ বসানো। ইকো ফ্রেণ্ডলি। পরের পাতায 'হোম শপিং'। ফোন করলেই ফ্ল্যাটে দিয়ে যাবে দম বাড়াবার কল। রানার ছুটেছে চর্বির বোঝা কাঁধে। ওদিকে দমকলের ফোন কাটা। কর্মীরা জলের খোঁজে কলসি কাঁখে দূর-দূরান্তে গেছে।

বাবা আর একটা দামি কথা বলত। বসবি যখন, একটা গামছা বা তোয়ালে বিছিয়ে বসবি। কর্মহীনদের ফ্ল্যাগ। বড় অফিসারবেব চেয়ারে বারোমাস তোয়ালে ঝোলে। ভালো কবে হাত মুছে বসে থাকে। আরাফৎ মাথায় গামছা বেঁধে ঘোরে। পাকিস্তান শিখিযে শিখিয়ে মরল। প্রভাকরণের আত্মঘাতী বাহিনী। আত্মহত্যার আবার ট্রেনিং কীসেব? বুকে মশলা বেঁধে বাসে উঠে পড়ো। একশ লোক তোমাকে ফলো করে স্বর্গে চলে গেল। আমি লাল-গামছা বিছিয়ে বসি। সামনে গোটাকতক পয়সা ছড়িয়ে রাখি। পার্টি ফাণ্ডে সাধ্যমতো দিযে যান। পঁচিশ বছরের বিশ্বরেকর্ড করেও এখনো জাতীয় স্তরে যেতে পারিনি। মান থাকলে হনুমানও মানুষ হযে যেত অ্যাদ্দিনে। বাবার অক্ষয় বাণী।

বিশ্বকাপে বাঙালির বরণীয় কর্মপ্রগতির ভূমিকা এবং

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি

বন্দনা রায়

মা বলতে বাঙালি মুখ্যত গোলকিপার দুর্গা এবং স্ট্রাইকার কালীকে বোঝে। মনসা সন্তোষী শীতলা প্রমুখ মায়েরা সকলেই টীমে আছেন এবং নিয়মিত ম্যাচ খেলেন। তবে কোচ লক্ষ্মীকেই মূল মা হিসেবে মনে মনে মেনে এসেছে ফুটবলপ্রেমী বাঙালি।

এই ক্রীড়া বিভাগে সরস্বতী কোনোদিনই ফরোয়ার্ড খেলতেন না। কিন্তু ইদানীং "বিশ্বকাপে বাঙালির বরণীয় কর্মপ্রগতির ভূমিকা" নামক একটি সর্বনাশা নিবন্ধপ্রতিযোগিতায় জেতার আ[illegible] শাশ্বত শাদাজার্সি খুলিয়ে জোর করে লালজার্সি মাথা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে মা-সরস্বতীকে মাঠে নামিয়েছে বাঙালি।

আশ্চর্যের বিষয়, সরস্বতীর পায়ে বল গুঁজে দেওয়ার এই গুপ্তনীতির নেপথ্যে কোচ লক্ষ্মীকে একটু টিপে দিয়েই বাঙালি ভেবেছে, "কেল্লা ফতে।" মানে, শিক্ষাদুর্গ জয় করা গেছে। সামান্য টিপ্‌স্ দিয়ে গরিব বিদ্যাদেবীকে ফুটবলমাঠে সঙ-এর ভূমিকায় নামিয়ে বিনোদন জগতে নতুন একটা হিড়িক (সেনসেশন) আনা যাবে। হাজারো জানা-অজানা ফাউল পেনাল্টি হলুদকার্ডের রেফারি-বাঁশির বাঁশে দেবী বাসন্তীকে বাঁদর নাচিয়ে চোখে হলুদ সর্ষেক্ষেত দেখিয়ে ছাড়া যাবে।

> সওদাগর নেই বলেই কি সরস্বতীর এই হেনস্থা? বীণা-বই-টিউশনি—সমস্ত ছেড়ে রোজ ফুটবল ক্লাবে গিয়ে হাজির খাতায় সই মেরে পাঁচঘণ্টা ফুটবলে পদাঘাতের মহড়া দিতে দিতে দেবী যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

এখন, রেফারি মানে তো কোনো বিশেষ লোক নয়, সর্ষের মধ্যেকার একথোকা ভূত, যাদের কাজই হল ভূতোমি করে সরস্বতীর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের বারোটা বাজানো। চিরকালের শান্তশিষ্ট 'বিশিষ্ট' সরস্বতী। নৈমিত্তিক কাজ বলতে কর্মক্ষেত্রে ঘণ্টা-দুয়েক এবং ধর্মক্ষেত্রে ঘণ্টা-আষ্টেক ব্যবসার ঝাঁপি খুলে রেখে বর্তমান এবং যৎসামান্য ভবিষ্যৎ সঞ্চয় করে নিয়ে আয়েসে আলস্যে-লোভে-লাভে, জ্যোতিষে-সাম্যবাদে, আয়ে-আয়করসমস্যায় দুশ্চিন্তা করতে করতে গড়িমসি করে দিন কাটানো। বছরভর ছাত্র ঠেঙিয়ে, পরীক্ষাপত্রের স্তূপ ডিঙিয়েও বছরে দু'বার উত্তর-দক্ষিণ, মানে কেদারবদ্রী রামেশ্বর অথবা পূর্ব-পশ্চিম; মানে পুরী-গোয়া ঘুরে আসা। এ ছাড়া পার্ট টাইম কাজ হল, যে কোনো সভাসমিতিতে আমন্ত্রিত নেতা অনুপস্থিত থাকলে না থামানো পর্যন্ত যে কোনো বিষয়ের ওপরে অনর্গল অপ্রাসঙ্গিক বক্তৃতা দেওয়া।

এইরকম নিরীহ গোবেচারী বাগ্‌দেবীকে কি অমন কর্মপ্রগতি-নিবন্ধের প্যাঁড়াকলে এবং হট্টগোলের ফুটবলে জড়িয়ে ফেলা ঠিক হয়েছে বাঙালির? বীণাবাদন, সামগান, হংস-পালন, পত্রিকা সম্পাদন ইত্যাদি নির্বিষ বিষয়ে লিপ্ত, শান্তিপ্রতীক শুভ্রবসনা দেবীকে রেড-জার্সি এবং স্পাইক-দেওয়া বুট পরিয়ে ফুটবল মাঠে রোজ পাঁচঘণ্টা করে কুচকাওয়াজ করানো কি ঠিক হচ্ছে? বাঙালি কি ভুলে গেছে, গান লেখার বদলে জমিদারির খাতা লেখায় জুতে দেওয়ায় এক নিরীহ শাক্তকবির লেখনীতে কী ভয়ংকর একটা লাইন বেরিয়ে এসেছিল,— "এবার কালী তোমায় খাব / তুমি খাও কি আমি খাই মা/একটা কিছু করে যাব।"?

পঞ্চাশ বছর আগে যারা পুজোর অঞ্জলির আগেই লুকিয়ে কাঁচা কুল খেয়ে বার্ষিক পরীক্ষার ফলে, পিতৃপুরুষের কুলে এবং কঠিন শ্লেষ্মায় নিরন্তর ভুগত, আজ তারাই

কি প্রতিশোধ স্পৃহায় যমক-শ্লেষে ঠেসে ধরে মাঠে ঠেলে নামিয়ে দৌড় করাচ্ছে সরস্বতী দেবীকে?

কূটনীতিক চাণক্যের বাবা সরস্বতীপুত্র শিক্ষক চণকের ডাকে নন্দ বংশের ফুটবল মাঠে একদিন সমস্ত জনতা বিদ্রোহে নেমে পড়েছিল। সোজা-খেলায় পারেনি বলে নন্দের দল গোপনে গুণ্ডা লাগিয়ে ঠাণ্ডা করে চণককে ছাতু বানিয়ে দিয়েছিল। আজও সেই চণকের ছাতু ঘরে ঘরে নুন-লঙ্কা বা গুড়-কলা দিয়ে রোজ বহু সরস্বতীপুত্রেরা খেয়ে চলেছেন। রেফারির বাঁশি যতই বাজুক, চণকের সেই ছাতু-চাপা আগুন কিন্তু আজও এইসব সরস্বতীপুত্রের জঠরে ধিকিধিকি জ্বলছে। এই আগুন একবার যদি উস্কে দেওয়া যায়, সরস্বতীকে নিবন্ধের গিনিপিগ বানানো বা ফুটবল মাঠে নামানোর জন্যে কি দফা চৌষট্টি হয়ে যাবে না বাঙালির?

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং বিভাগের কর্ণধার করে সৃষ্টি দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে আর বেশি সৃষ্টিশীল না হয় বাঙালি। তাই সওদাগর নেই বলেই কি সরস্বতীর এই হেনস্থা? বীণা-বই-টিউশনি—সমস্ত ছেড়ে রোজ ফুটবল ক্লাবে গিয়ে হাজিরা খাতায় সই মেরে পাঁচঘণ্টা ফুটবলে পদাঘাতের মহড়া দিতে দিতে দেবী যে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত!

শিশুপালেরও একসময় একশো পূর্ণ হয়েছিল; তখন সুদর্শন এসে কচাং করে তার মুণ্ডটা কেটে মাঠের মাঝখানে ফেলতেই কাতারে কাতারে কণ্ঠীধারী ভক্ত-বৈষ্ণবেরা এসে সেই মুণ্ড নিয়ে পরমানন্দে নব্বই মিনিটের গেণ্ডুয়া খেলেছিল। যে সমস্ত মা-কা-বেটারা স্তনিত সরস্বতীর অমৃত পান করেছে, তারা যদি আলস্য ত্যাগ করে একবার তেড়েফুঁড়ে ওঠে, কোনো শ্বশুরপুত্র রেফারি-শিশুপালের কিংবা কোচ গোলকিপার-স্ট্রাইকার প্রমুখের প্রপিতামহেরও বাঙালির ফুটবল-বিলাসকে বাঁচানো সম্ভব নয়। সরস্বতীপুত্র বীর চণকের এই বংশাবতংসেরা সব নিবন্ধ প্রতিযোগিতার নিকুচি করে, ফুটবল ম্যাচের "যুটার ডুম্" ঘটিয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মাঠময় ঘুরে বেড়াবে! তখন সমগ্র বাঙালি জাতি, তাদের পোষা রেফারিরা, পুরো ফুটবল টীম—সকলে মিলে মুখে শান্তিবাণী, হাতে শাদা পতাকা নিয়ে সরস্বতীকে সাধাসাধি করতে থাকবে দয়া করে একটু পরার জন্যে এবং কাতর অনুনয়-বিনয় করতে থাকবে, "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি!"

কিন্তু কবে? হায় নিদ্রিত বরপুত্রেরা, সেদিন কবে? মিডিয়ার ক্রিক্রিকে সম্মোহিত সরস্বতী-সন্তানেরা নিজেদের দাঁত মাজার ছবিও বাজারে ছাড়তে ব্যস্ত। এদিকে ক্লাবের ডিনার-টেবিলে ওঠার আগে হাঁসফাঁস করতে করতে হংসবাহিনী বন্দিনী মা-সরস্বতী যে কাতর স্বরে "কোঁক্কোর-কোঁ" ডেকে চলেছেন!!

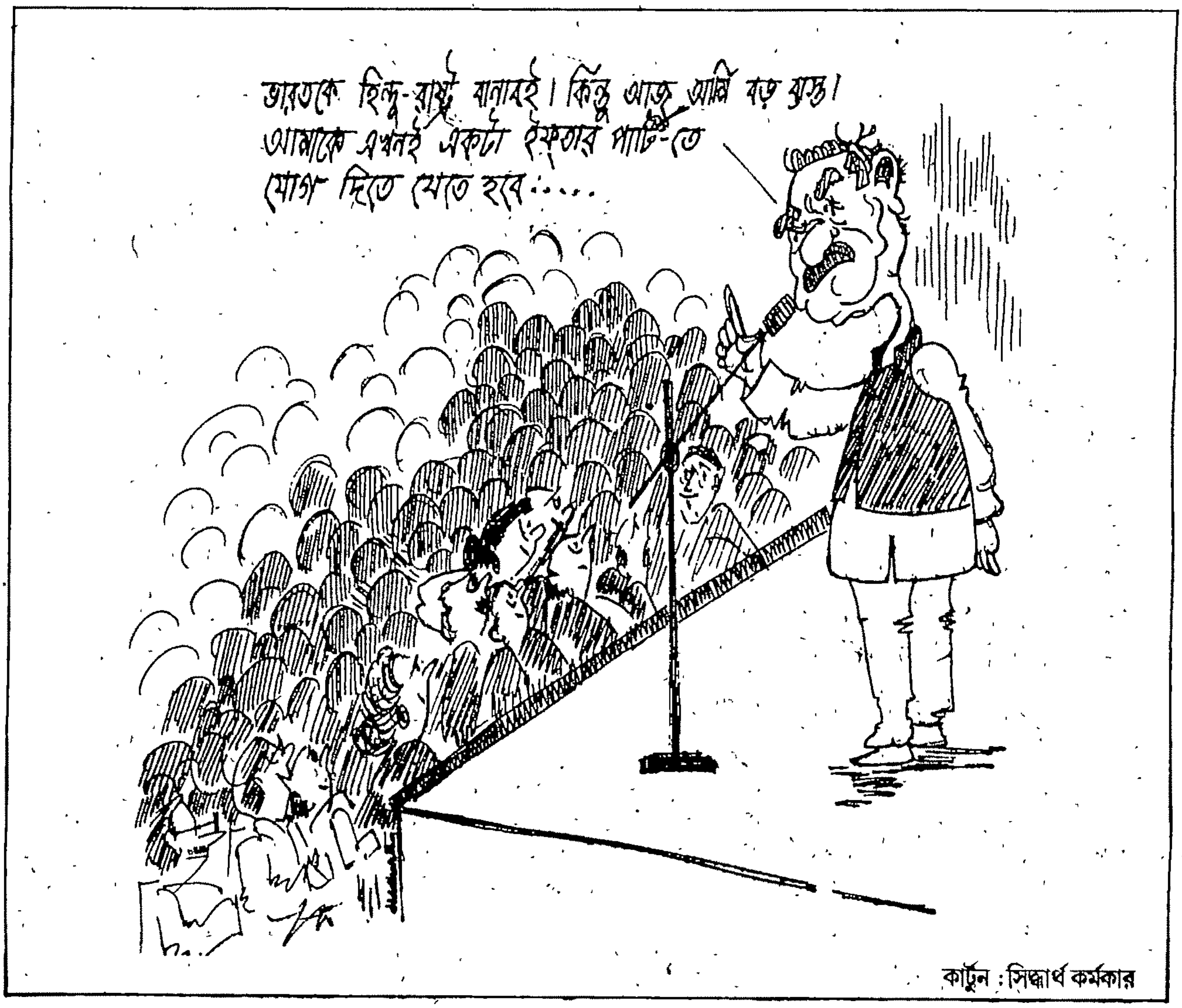
ভারতকে হিন্দু-রাষ্ট্র বানাবই। কিন্তু আজ আমি বড় ব্যস্ত। আমাকে এখনই একটা ইফতার পার্টি-তে যোগ দিতে যেতে হবে:.....

কার্টুন : সিদ্ধার্থ কর্মকার

বটকৃষ্ণের বেদনা

রীতা ভট্টাচার্য্য

বাজারের থলিটা রান্নাঘরে নামিয়ে রাখতেই বটকৃষ্ণ আবার সেই ব্যথাটা টের পেলেন। শিরদাঁড়া বেয়ে একদম হাঁটু অবধি নেমে আসছে। চোখ বন্ধ করে বটকৃষ্ণ 'উহ হু' করে উঠলেন। দু'দিন হল কাজের মেয়ে আসছে না। উমাশশী একা হাতে ফটাফট চায়ের বাসন ধুয়ে রাখছিলেন। বটকৃষ্ণকে লক্ষ্য করতে গিয়ে কাপটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। উমাশশী বিরক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন—আর পারি না বাবা। কোনো কাজ করতে বললেই আহা উহু শুরু হয়ে যাবে। আবার এদিকে ডাক্তারও দেখাবে না। কেপ্পন কোথাকার। আরে বাবা, আমিই বা একা কতদিক সামলাব। আমারও তো বয়স হচ্ছে, নাকি?

কেপ্পন! ওঃ একেই বলে সহধর্মিনী। বটকৃষ্ণের মুখ ভার হয়। চারদিক দিয়ে হু হু করে স্রোতের মতো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা দেখেও দেখেন না। এই বাজারে ফ্যামিলি চালানো কি চাট্টিখানি কথা নাকি?—বটকৃষ্ণ নিজেকে সান্ত্বনা দেন। যখন চাকরি করতেন তখনো দেখতেন মাসের মাঝামাঝি সব টাকা বেমালুম হাওয়া। তারপর এর ওর কাছে টাকা ধার করে কিংবা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সংসার চালাতে হত। এরপর মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে কোম্পানি হঠাৎ একদিন জোর করে চাকরি ছাড়িয়ে দিয়ে হাতে একটা চেক ধরিয়ে দিয়েছে। যাকে বলে মিষ্টি কথায় গলাধাক্কা। ইদানীং অবশ্য এর একটা জুতসই নামও দিয়েছে ওরা—'ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম।' বটকৃষ্ণের চোখে জল এসে যায়।

সাড়ে সাতশ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটা ভাগ্যিস আগেই কেনা হয়েছিল। এটা না থাকলে এখন বোধহয় বস্তিতে গিয়ে ঘর ভাড়া নিতে হত। বটকৃষ্ণ ভাবেন, আজকাল সেলামি আর বাড়ি ভাড়ার যা বেট। বাড়ির সামনে গ্রিল দেওয়া একফালি সরু বারান্দা। বটকৃষ্ণ সেখানে ইজিচেয়ারে বসে দোলেন। উঃ, ব্যথাটা থেকে থেকে বেশ চাগাড় দিয়ে উঠছে। বটকৃষ্ণ আলতো করে শিরদাঁড়ায় হাত বোলান। মনে মনে কল্পনা করেন, গিন্নি নরম হাতে পিঠ টিপে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর কল্পনার ফানুসটা হঠাৎ ফেটে যায়। নাহ্ এসব আর উমাশশীকে দিয়ে হবে না। এসব করতে গেলে অল্প বয়স চাই, যুবতী বয়স। সঙ্গে সঙ্গে ফস্ করে একটা নিঃশ্বাস পড়ে বটকৃষ্ণের। নিজের এখনকার চেহারাটা মনে পড়ে যায়। কোলা ব্যাঙের মতো ফোলা মুখ, চিবুকের নিচে ডাবল চিন্, মাথার সামনেটা বেওয়ারিশ জমির মতো ফাঁকা। কুড়ি বছর আগে কী চেহারা ছিল। ভাবাই যায় না। কত সেন্টেড লাভলেটার আসত। সামনে পেছনে লাল নীল প্রজাপতির দল। কোঁচকানো চুলে কার্তিক ছাঁট। একবার মাথায় হাত চালিয়ে নিয়ে বটকৃষ্ণ চোখ বোঁজেন।

কিছুক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখেন ছাতা দোলাতে দোলাতে দোলগোবিন্দ আসছেন। দোলগোবিন্দ বটকৃষ্ণের ছেলেবেলাকার বন্ধু। দু'জনে যাকে বলে একদম হরিহর আত্মা। এক পাড়াতেই থাকেন। আগে মাঝেমধ্যে দেখা হত। আর এখন তো বটকৃষ্ণর অখণ্ড অবসর। দোলগোবিন্দ একটা স্কুলে পড়ান। এখনো বছর চারেক চাকরি আছে।

দোলগোবিন্দ আসতেই বটকৃষ্ণ বেতের মোড়াটা এগিয়ে দেন। বটকৃষ্ণের মুখ বেশ কুঁচকে গেছে এখন। দোলগোবিন্দ সেটা লক্ষ্য করে বললেন, কি রে, সেই ব্যথাটা আবার বেড়েছে নাকি? হুম্, মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। ডাক্তার দেখা ইমিডিয়েটলি। এভাবে নেগ্‌লেক্ট করছিস কেন বল তো? একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেব?

—কার সঙ্গে?

—কী বলে দেখ! ডাক্তারের সঙ্গে, আবার কার সঙ্গে? আমার চেনাজানা একজন অর্থোপেডিক সার্জন আছেন। ভিজিট পলিক্লিনিকে দু'শ আর রেসিডেন্সে তিনশ।

—দু'শ? তার থেকে তুই আমায় মেরে ফেল দুলু। রিটায়ার্ড মানুষ। দু'শ টাকা দিয়ে ডাক্তার দেখাব? পাগল নাকি?

—কেন? রিটায়ারমেন্টের পর তো ভালো টাকা পেয়েছিস?

—হ্যাঁ, ওটাই তো দুধ দিয়ে এখনো পর্যন্ত রেখেছে। সরি, সুদ দিয়ে। কিন্তু আজকাল তো সুদের পার্সেন্টেজও ক্রমশ কমছে। এভাবে আর কতদিন চলবে? তোর তো বেশ মজা। দিব্যি পেনশন পাবি।

—আর পেনশন! এদিকে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল সব একসঙ্গে ধরেছে। শরীরটা দিনদিন কেমন বিগড়ে যাচ্ছে।

—ওটা যাবেই। কিছুই করার নেই। বুড়ো বয়সে কি আর রাজকন্যাকে বগলদাবা করে পক্ষিরাজ ছোটানো যায় ইয়ার?

—আহা, কী বেদনা!

—নাহ্। মনে নয়, পিঠে।

দোলগোবিন্দ কিছুক্ষণ থম্ মেরে বসে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, তোর ছেলে কোথায়?

—নেই।

—অ্যাঁ?

—নেই। মানে বাড়িতে নেই আরকি। দিনরাত ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে বলি, মোষের কিছুটা দুধও যদি ঘরে আনতে পারতিস মাঝেমধ্যে। তাতেও কিছু উপকার হত। ওটাকে দিয়ে কিস্যু হবে না, বুঝলি?

দোলগোবিন্দ হাসলেন, ওকে আর দোষ দিয়ে কি লাভ বল? আজকাল চাকরি-বাকরির বাজারটা একবার দেখ। ছেলেমেয়েরা আর-কি করবে? সব ফ্রাসট্রেইটেড্।

—নাহ্ ফ্যাসিনেইটেড্। রাতদিন হুজুগ। জনা দশেক ছেলেকে নিয়ে সারাদিন অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে। ইদানীং আবার গান বেঁধেছে। কী গান শুনবি?

—গীতিকবি? বাঃ এটা তো খুব ভালো সাইন। তুই রাগছিস কেন?

—কবি? নাহ্, কপি। কাল গাইছিল—এসো, তোমাতে আমাতে এক শালপাতাতে ফুচকা খাই।

—যাঃ। ইয়ার্কি মারিস না। এমন একটা সিঙ্গার ছেলেকে নিয়ে তোর গর্ব হওয়া উচিত। আমি ওর ক্যাসেট শুনেছি।

—সিঙ্গার নয়। বল, লেডিস ফিঙ্গার। ট্যাডস। ওই ক্যাসেট করাতে আমাকে কত টাকা গুনাগার দিতে হয়েছে জানিস?

দোলগোবিন্দ লক্ষ্য করেন, রাগের চোটে বটকৃষ্ণ ব্যথার কথাও ভুলে গেছেন।

দিন সাতেকের মধ্যে হৈ হৈ করে বটকৃষ্ণের চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল। নধরকান্তি এক অভিজ্ঞ হাড়ের ডাক্তার বটকৃষ্ণকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে, খসখস করে প্যাডে প্রেসক্রিপশন লিখে, ভিজিট বাবদ তিনশ টাকা পকেটে পুরে বিদায় নিলেন। ওদিকে প্রেসক্রিপশানে চোখ রেখে বটকৃষ্ণের তো ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। গোটা পাঁচেক প্যাথলজিক্যাল টেস্ট, গোটা তিনেক এক্সরে—সব মিলিয়ে প্রায় হাজার দেড়েক টাকার ধাক্কা! দোলগোবিন্দ ফোড়ন কাটেন—চিরটাকাল তুই টাকা টাকা করেই গেলি। শরীর না থাকলে আর ভোগ করবি কী করে?

—অশরীরী হবার অনেক লাভ দুলু। খাওয়া দাওয়া, চিকিৎসা, কিছুরই খরচ লাগে না।—বটকৃষ্ণ গম্ভীর মন্তব্য করলেন।

টানা মাস আটেক চিকিৎসায় হাজার পনেরো টাকা হু হু করে বেরিয়ে গেল, কিন্তু বটকৃষ্ণ সারলেন না। উমাশশীর মুখ যেন গনগনে কয়লার উনুন। বললেন, হোমিওপ্যাথিক করাও, বুঝলে? এসব বড়লোকি চালে দু'দিনেই ব্যাঙ্কের সব টাকা উবে যাবে।

অগত্যা হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট শুরু হল। গোটা পাঁচেক নামকরা হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের মধ্যে থেকে দোলগোবিন্দ একজনকে বাছলেন। বটকৃষ্ণও গুটিগুটি বাধ্য ছেলের মতো দোলগোবিন্দর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গেলেন। কিন্তু রোগ সারবার আশা যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁর মন থেকে উবে যাচ্ছে। এমনই কপাল, রোগটাই কেউ ধরতে পারছে না। এক্সরেতেও কিছু ধরা পড়েনি। কী আশ্চর্য। অথচ শিরদাঁড়া বেয়ে সেই যন্ত্রণাটা এখনো পরিষ্কার ফিল্ করেন বটকৃষ্ণ।

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার পুরু লেন্সের ফাঁক দিয়ে ভালো করে বটকৃষ্ণকে লক্ষ্য করলেন। তারপর একঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে চলল নানারকম প্রশ্নের বন্যা। বটকৃষ্ণর হাঁপ ধরে আসছিল। ডাক্তার বললেন, আমরা মশাই রোগের ট্রিটমেন্ট করি না, রোগীর ট্রিটমেন্ট করি।

বটকৃষ্ণ ছেলেবেলায় একবার বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে যাচ্ছিলেন, এখন হঠাৎ আবার সেই স্মৃতি মনে পড়ল। শেষে গোটা কুড়ি পুরিয়া পকেটে পুরে, দোলগোবিন্দের কাঁধে ভর দিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোরকমে ঘরে ফিরলেন। উমাশশী বললেন, সব বাতিক। ম্যানিয়া। এমন রোগ যে, কেউ ধরতেই পারে না? আসলে অসুখ থাকলে তবে তো ধরবে। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। যত্তসব!

দোলগোবিন্দের মেয়ে দিন তিনেক হল হঠাৎ একটা বখাটে ছেলের সঙ্গে কেটে পড়েছে। দোলগোবিন্দ বটকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বটকৃষ্ণ দোলগোবিন্দের হাত ধরে ভোলাতে ভোলাতে জোর করে পার্কে নিয়ে এলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চারদিকে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে ঘরে ফেরবার তাড়া। পার্কের ইউক্যালিপটাস, কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক-প্রেমিকা। বটকৃষ্ণ চারদিকে তাকিয়ে দোলগোবিন্দকে সান্ত্বনা দিলেন—কাঁদিস না। তাকিয়ে দেখ। সব জোড়া জোড়া কপোত-কপোতী। সবসময় ঠোঁটে ঠোঁট। ভাবটা এমন, শুধু তুমি আর আমি আছি। বাকিসব মশা মাছি। দুঃখ করিস না।

বটকৃষ্ণ রুমালটা এগিয়ে দিলেন দোলগোবিন্দের দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে পিঠের শিরদাঁড়া ব্যথায় টনটন করে উঠল। প্রায় নুয়ে গেলেন বটকৃষ্ণ। দোলগোবিন্দ শোক ভুলে হাঁ করে বটকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বটকৃষ্ণের শালা ভজহরি পরামর্শ দিলেন—আরে জামাইবাবু, আজকাল সব পাড়ায় পাড়ায় বডিজিম, আর আপনি কিনা এসব উটকো ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন? ব্যায়াম করুন। আমাদের ইউথ জিম ক্লাবের ছেলে এবার 'বিশ্বশ্রী' হয়েছে, আপনি জানেন?

—বিশ্বশ্রী হব? এই বয়সে? দূর শালা। এই বয়সে ওয়েট লিফটিং? ঘাড় বেঁকে যাবে যে। বটকৃষ্ণ হেসেই উড়িয়ে দেন কথাটা। ভজহরিকে আর কিছু বলবার সুযোগই দেন না।

মাস দুয়েক পরে এক শীতের ভোরে, বটকৃষ্ণের খোঁজে দোলগোবিন্দ পার্কে এসে হাজির। পার্কের মধ্যে ছোট ঝিল। ঝিলের পাশে গোটা দুই কৃষ্ণচূড়া গাছ। দোলগোবিন্দ থমকে দাঁড়ালেন। একটা শব্দ ক্রমশ ভেসে আসছে—এক . দুই. . তিন চার পাঁচ। গাছের ফাঁকে উঁকি মেরে দোলগোবিন্দের চক্ষু স্থির একেবারে। ভোরের ঠান্ডায় একটা বারমুডা আর পাতলা গেঞ্জি গায়ে বটকৃষ্ণ ওঠবোস করছেন। এক থেকে পঁচিশ, পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ থেকে একশ। হাঁপাচ্ছেন, বসছেন, আবার উঠছেন ..।

দোলগোবিন্দ সামনে যেতেই বটকৃষ্ণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, দিন পাঁচেক হল শুরু করেছি ভাই। ভালোই ফল পাচ্ছি।

—কিন্তু এসব কি?

—ওঃ, বুঝতে পারছিস না? আজকাল রোজ ওঠবোস করছি। আর শেষে কুড়ি মিনিটের নীলডাউন।

—নীলডাউন? তার মানে?

—আমাদের ছেলেবেলার সত্যেন মাস্টারকে মনে পড়ে? কেউ অন্যায় করলে ওঠবোস আর নীলডাউন করাতেন? প্রত্যেকবার ওঠবোসের সঙ্গে সঙ্গে বলতে হত—'আর কখনো করব না স্যার। দোষ হয়ে গেছে।' তোর মনে আছে?

—মনে থাকবে না কেন? কিন্তু এসব কথা এখন কেন?

—এমনিই। একজন বলল, পার্কে রোজ এসে ওঠবোস আর নীলডাউন করতে—সব ব্যথা নাকি সেরে যাবে। তাই করছি। ফলও পাচ্ছি হাতে হাতে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেবেলার কথাগুলো কেমন মনে পড়ে যাচ্ছে। আসলে বুড়ো বয়সে শিরদাঁড়াটা সোজা রাখার চেষ্টা করছি ভাই। ওঠবোস করছি আর মনে মনে বলছি.. .

—কি? মনে মনে বলছিস কি?—দোলগোবিন্দের ভ্রু-তে সেকেন্ড ব্র্যাকেট।

বটকৃষ্ণ একটু ইতস্তত করে উপরে আঙুল তুলে আকাশ দেখালেন। তারপর বললেন—স্যারকে, থুড়ি ম্যাডামকে বলছি—দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ।

মানবিক না পাশবিক?

কৌশিক রায়

কেন্দ্রীয় পরিবেশ এবং প্রাণী সংরক্ষণ মন্ত্রকের কাজের সবটাই মুখের বড় বড় বুলির মাধ্যমে প্রকাশিত। সেজন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী। ছাগল ভেড়া থেকে শেয়াল শকুন পর্যন্ত হরেক কিসিমের জানোয়ার নাকি মানেকা পুষেছেন বলে হম্বিতম্বি করছেন তাঁর দপ্তরের কাজের অ-কাজি অফিসাররা। পশুপাখির বিপদ হলেই মানেকাদেবীর টেম্পারেচার পৌঁছে যায় ১১০ ডিগ্রিতে। নাওয়া খাওয়া এমনকি অটলজির দেওয়া নিজের সরকারি কাজটুকু ভুলে মানেকা, কুকুর-বেড়াল-পাখিদের নিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত যে ছেলে বরুণের অত কষ্ট করে লেখা কবিতাগুলো পড়ারও সময় নেই তাঁর। এই কিছুদিন আগেই টি. ভি-তে মানেকা সবাইকে পই পই করে বলেছেন কোর্মা কালিয়া তন্দুরি চিকেন সসেজ ছেড়ে মুলো লাউ পুঁইশাক খেয়ে থাকতে। বলিউডের এক্স গ্ল্যামারকুইন, ডিম্পল কাপাডিয়াকে নিয়ে মানেকা আবার কলকাতায় এসেছিলেন একটি হাসপাতাল বানাতে। মানুষের নয়, ঘোড়ার ভাঙা ঠ্যাং, কুকুরের বিগড়ে যাওয়া হার্ট, খরগোশের ছানিপড়া চোখ ভালো করা হবে এই হাসপাতালে।

শুধু মানেকাদেবী কেন, পশুপাখির ইহকাল পরকালের চিন্তা নিয়ে রাতের ঘুম মাটি করছেন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরাই। এনাদের মধ্যে মহিলাদের পাল্লাটাই ভারি। পুরুষদের দমবন্ধ করে দেওয়া, হলিউডের একদা নায়িকা, ব্রিজিট বার্দো তো কুকুর আর বেড়ালদের গুষ্টি বাঁচাতে উঠেপড়ে লেগেছেন। বলিউডের বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেন তাঁর পোষা গণ্ডার ঝইক্সিনহ্যকে নিয়ে চিন্তায় আছেন। স্বদেশী যুগে বাংলার মা-বোনেরা যেরকম বিলেতের মিহি সুতোর কাপড় পুড়িয়ে দিশি খাদির কাপড় পরতেন, তেমনি মধু সাপ্রে, সিণ্ডি ক্রফোর্ড, নাও মি ক্যাম্পবেল আর কেট মস্-এর মতো সাড়াজাগানো ফ্যাশান সুপার মডেলরা একবাক্যে বলেই দিয়েছেন তাঁরা এবার থেকে কৃত্রিম তন্তুর তৈরি জামাকাপড় পরবেন। চিতাবাঘ, লেপার্ড, হরিণ আর স্যাব্‌লের চামড়া থেকে তৈরি বস্ত্র নৈব নৈব চ। ভালো কথা। এরকম পশুপ্রেমের ঝাণ্ডা উড়িয়ে তাঁরা গণমাধ্যমের নজরও কাড়ছেন ভালোভাবেই।

এই বিশ্বখ্যাত পশুপ্রেমিকারা কি জানেন সুসভ্য শিল্পোন্নত বলে ঢাক পেটানো জাপানিরা জ্যান্ত মাছ আর ঘুরে বেড়ানো টিকটিকিকে কেটে বা না কেটে চিবিয়ে খেতে রীতিমতো গর্ববোধ করেন? অর্ধসভ্য বলে ইন্দোনেশিয়া, জাভা এবং মালয় উপদ্বীপের পুনান, ডায়াক ও অন্যান্য উপজাতিরা বাঁদরের মাংস খায় বলে মাফ করা যেতে পারে। কিন্তু মানেকা-ব্রিজিটরা যদি শোনেন পাঁচতারা বিলাসবহুল মালয়ী ভোজসভাতে অতিথি অভ্যাগতদের জিভকে কৃতার্থ করে দেওয়া হয়

জলজ্যান্ত বাঁদরের মগজটাকে ডিশে সাজিয়ে দিয়ে, তাহলে তাঁরা পশুদরদী গলার আওয়াজ ক' ভল্যুম বাড়াতে পারবেন? আমাদের সম্মানীয় পূর্বপুরুষের এহেন মর্মান্তিক দুর্দশার সাক্ষী মালয়েশিয়া সরকারের একদা অতিথি জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র। মাথার খুলি ভেঙে মগজটা বের করার সময় বাঁদরটা যাতে টুঁ শব্দটিও না করতে পারে সেজন্য মুখে ক্লাপড় বেঁধে, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁদরটার মাথাটাকে টেবিলের একটি ছিদ্রর মধ্য দিয়ে বার করে রাখা ছিল। সুকুমার রায়ের 'খাই খাই'-তে বলাই আছে "ব্যাঙ খায় ফরাসীরা খেতে নয় মন্দ।" শুধু ফরাসীরাই নন, জ্যান্ত নির্বিচারে কেটেকুটে খেয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উভচর প্রাণীর বংশে বাতি দেওয়ার বারোটা বাজাচ্ছেন চীনারাও। বিয়েশাদি বা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে সৌদি আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় দেশগুলোতে টাকার কুমির শেখরা জ্যান্ত উটের পেটে ছুরি চালিয়ে দিয়ে ভোজসভার সেরা পদ রোস্ট বানাতে বেশ সুখী বোধ করেন। নাগাল্যাণ্ডে আঙ্গামি উপজাতির লেখাপড়া জানা অধিবাসীরা তাঁদের ঘরের পোষা কুকুরের মাংস খেতে মোটেই দ্বিধাবোধ করেন না। এইসব মানবিক খ্যাদ্যাভ্যাসগুলো কি পশু অন্ত প্রাণ মর্ত্যের সমাজ সেবিকাদের চোখ এড়িয়ে যায়? নাকি অত উঁচু মগডালে হাত বাড়ালে নিজের খ্যাতি-কেন্দ্রিক লাফঝাঁপটাই ধেড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা?

জৈন ধর্মসহ বেশ কয়েকটি অহিংসা মূলক ধর্মশাস্ত্রে পই পই করে বলে দেওয়া হয়েছে লতা-পাতা, শাক-সব্জির মধ্যেও আমাদের মতো প্রাণ আছে। সুতরাং, ঝিঙেপোস্ত পুঁই-ডাঁটার চচ্চড়ি খাওয়াটাও নেহাৎই অমানবিক, অন্ততঃ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর 'ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্রে গাছপালার বুকের ধুক্‌পুকি ধরতে পাবার ফলে অনেকেই সমস্যাতে পড়েছিলেন। এবার থেকে কি তাহলে শুধু বাতাস খেয়েই থাকতে হবে? কিন্তু বাতাসেও তো ভিড় করে আছে অসংখ্য অদৃশ্য আনুবীক্ষণিক জীবানু! সেগুলোকেও তো আমরা না জেনেই পেটের মধ্যে চালান করে দিচ্ছি। তাহলে? তবে, ব্যাক্টিরিয়রা হোক আর যাই হোক, নেনেৎ নামের একটি উপজাতি ঠিক হনুমানদের মতোই একে অন্যের গা থেকে উকুন বেছে নিয়ে চিবোতে ভালোবাসে। নুয়ের নামে আর একটি উপজাতি এই উকুন ঘটিত ব্যাপারে আরেকটু এগিয়ে আছে। নুয়ের প্রেমিক প্রেমিকাদের একে অপরকে আই লাভ ইউ জানানোর নিশানাই হলো—না, কফি হাউসে গিয়ে স্যাণ্ডউইচ্ আর ডবল ডিমের অমলেট, অথবা অনাদি কেবিন এর 'ইস্পেশাল' মোগলাই পরোটা খাওয়া নয়, একে অন্যের মাথা থেকে তাজা উকুন তুলে নিয়ে ভালোবেসে মুখে তুলে দেওয়া। ভালোবাসা, উকুন বা এঁটুলি পোকার মতোই নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকে বলেই কি এহেন ফাস্টফুড এর চল? আফ্রিকার কিনিয়াতে বাস সবচেয়ে দীর্ঘকায় সৎ ও পরিশ্রমী উপজাতি মাসাইদের মাউমাউ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ বেনিয়াদের আগুনে লাঠি-র সামনে বুক চিতিয়ে লড়েছিলেন এই মাসাইরা। সেইজন্যই হয়ত এঁদের খ্যাদ্যাভ্যাসেও যথেষ্ট বীরত্বের ছোঁয়া আছে, যদিও সেটা মানেকাজি অথবা ব্রজের অবিসংবাদিত রাখাল কৃষ্ণের কাছে মোটেই নৈতিক নয়। মাসাইরা বিয়ে পার্বণে বাছুর কেটে তার রক্ত খেয়ে থাকেন অনেকটা কোল্ড ড্রিংক্সের মতোই। অনেক সময় এই রক্ত মিশিয়ে টাটকা গোরুর দুধও খাওয়ানো হয় অতিথি-অভ্যাগতদের। মালয়েশিয়া আর ফিলিপাইন্সেও ঠাণ্ডা পানীয়ের বদলে বোতলে রুবে বিকোয় জনপ্রিয় পানীয়—বিষাক্ত সাপের ঠাণ্ডা রক্ত।

খাদ্যপ্রেম যে মধুর মতোই মিষ্টি, সেটা বোঝাতে মোটেই কৃপণতা করেন না আফ্রিকার ইথিওপিয়া রাষ্ট্রের মানুষেরা। তাঁরা মৌমাছির জ্যান্ত লার্ভা বা শুককীটসুদ্ধ গোটা মৌচাকটাই খেয়ে আরামের ঢেঁকুর তোলেন। চীনের জিয়ামেন প্রদেশের বাসিন্দাদের কাছে পরম উপাদেয় খাবার হচ্ছে জ্যান্ত ঝিনুক। ডবল ডিমের ওমলেট আর চিলি সস্-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দমবন্ধ করে বা 'অয়স্টার মাসগ্রেভ'-এর মতো গালভরা নাম দিয়ে এই ঝিনুকের সমাধিকে খাবার টেবিলে পরিবেশন করা হয়।

ইথিওপিয়াতে থাকার সময়েই লরেন্স ভ্যান ডার পোস্ট নামক একজন অভিযাত্রী লক্ষ্য করেছিলেন তিগ্রে উপজাতিদের মধ্যে গবাদি পশুর কাঁচা মাংস খাওয়ার এক অদ্ভুত অনুষ্ঠান। একেবারে জীবন্ত পশুর দেহ থেকে রক্তাক্ত কাঁচা মাংসের টুকরো নিয়ে সেগুলো রিলে পদ্ধতিতে দেওয়া হত একজন থেকে আরেকজন অতিথির কাছে। প্রত্যেক অতিথি সেই মাংসের টুকরোকে দাঁতে কামড়ে নিজের চোখের ঠিক সামনে ধরে থাকতেন। এরপর একটি ধারালো ছুরি দিয়ে সেই টুকরোটিকে কাটতেন তিনি। একচুল এদিক ওদিক হলেই কি [illegible] মাংসের টুকরোর সঙ্গে তাঁর নাকের ডগাটিও অন্তিমযাত্রা করতে পারত। খাওয়ার আগে অবশ্য কাঁচা মাংসের টুকরোটিকে আচ্ছা করে লঙ্কার সসে ডুবিয়ে নেওয়া হত, যাতে টুকরোটি খেতে গিয়ে রান্না করা মাংস খাওয়ার মতোই ঝালের দাক্ষিণ্যে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হতে হয়।

বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হলে কর্তা -গিন্নি অনেক সময়েই একে অপরের মাথাটি চিবিয়ে খেতে চান। ব্যাপারটি সত্যি সত্যি না ঘটলেও আফ্রিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অর্ধসভ্য উপজাতির মধ্যেই নরমাংস ভক্ষণের রেওয়াজ আছে। আফ্রিকার কিছু উপজাতি তো আবার তাদের মৃত পূর্বপুরুষের দেহকে পচিয়ে সেগুলোর খুলি থেকে মগজটি বের করে তারিয়ে তারিয়ে খায়। তাদের ধারণা, এর ফলে তাদের মোটা মাথাতে অক্কা পাওয়া বাপ-ঠাকুর্দার মতো বুদ্ধি দেখা দেবে। ফল হয় ঠিক উল্টো। ওই পচা ঘিলুর মধ্যে থাকা অসংখ্য পোকা গিয়ে বাসা বাঁধে ওইসব খাদ্যরসিকের মগজে। এর ফলে তাদের মগজও ফোঁপরা হয়ে যায়। 'কুরু' নামক এক দুরারোগ্য রোগে শুধু হাসতে হাসতেই মারা যায় তারা। বিখ্যাত ভূ-পর্যটক, ক্রিস্তোফার কলম্বাস গুয়াদালোপ দ্বীপপুঞ্জে প্রথম নরখাদক (অ্যান্‌থ্রোফ্যাগি বা কানিবল্‌স)দের দেখা পান। কলম্বাসের জবানীতে এই নরখাদকদের বলা হত 'ক্যারিব' বা 'ক্যানিব' যার থেকে ক্যানিবালিজম্ বা নরভোজন কথাটি এসেছে। সুতরাং কলম্বাসের ওপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বাসী বা ক্যারিবিয়ানদের রেগে যাওয়ার কারণ আছে যথেষ্ট। কেন না, তাঁর কথামতো 'ক্যারিব' কথাটো থেকেই 'ক্যারিবিয়ান' কথাটা এসেছে। এই 'ক্যারিব'রা নাকি আরাওয়াক উপজাতির যুবতীদের জোর করে বিয়ে করত। এই মহিলাদের গর্ভজাত সন্তানদের খেত তারা। সন্তানদের মায়েদেরও একই হাল হত। ক্যারিবরা অবশ্য ছোট ছেলেদের কাঁচা খাওয়ার আগে তাদের যৌনাঙ্গটি বাদ দিয়ে দিত। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস, আরিস্তোতল, স্ট্রাবো, প্লিনি এবং অভিযাত্রী আমেরিগো ভেসপুচ্চির বইতেও উল্লেখ আছে নরখাদকদের। আজটেক ইণ্ডিয়ানরা দাসদের ভালোমন্দ খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলত তাদের সুস্বাদু মাংসে নিজেদের পেটকে শান্তি দেওয়ার জন্যই। ১৫৫০ সালে হান্স স্টাডেন তাঁর বইতে লিখেছিলেন নরখাদক চিচিমেকা এবং টুপিনাম্বা ইণ্ডিয়ান উপজাতির বীভৎসতার কথা। বন্দী মানুষগুলোর পা থেকে চুল পর্যন্ত নাকি হজম করে ফেলত সেইসব উপজাতি। আগুনে পুড়িয়ে মারার আগে হতভাগ্য বন্দীদেরকে বেঁধে রেখে তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত উপজাতি রমণীরা, বাসরঘরে শ্যালিকারা জামাইকে কোণঠাসা অবস্থায় পেয়ে যেভাবে আড্ডা ইয়ার্কি মারে। এরপর উপজাতিদের মোড়ল এসে বন্দীর মাথায় মারত মুগুরের এক ঘা, মাথা ফেটে ঘিলু বের হয়ে যাওয়ার পর মেয়েরা সেই বন্দীর চামড়াটা খুব সাবধানে ছাড়িয়ে নিত। বন্দীর হাঁটুর ওপর থেকে গোটা পা এবং হাতগুলো কেটে নিত পুরুষেরা। সেইসব টুকরোগুলো নিয়ে উন্মত্তের মতো আনন্দে চিৎকার করতে করতে গোটা পাড়া দৌড়ে বেড়াত মেয়েগুলো। বন্দীর নাড়িভুঁড়িগুলো গরম জলে সেদ্ধ করে তৈরি হত উপাদেয় ঝোল বা সুপ। বাচ্চাকাচ্চারা বেশ তারিয়ে তারিয়েই খেত। 'মিন্‌গাউ' নামে সেই সুপ!

মানুষকে এভাবে রোস্ট বানিয়ে খাওয়ার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় দক্ষিণ সাগর বা সাউথ সী-এর অন্তর্গত মেলানেশিয়া দ্বীপপুঞ্জেও। ১৮ শতকে এইসব দ্বীপে মেলানেশিয় মহিলারা, বন্দীদের মাংস খাওয়ার পর তাদের হাড়গুলো ফুটো

করে ছুঁচ বানাত, যা দিয়ে বাতিল হয়ে যাওয়া জাহাজের পাল এবং পশুর চামড়া সেলাই করে জামা কাপড় হিসেবে পরা যায়। ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ কুক প্রথম ইউরোপীয় হিসাবে নিউজিল্যাণ্ড দেশটি আবিষ্কার করেন। এই দেশের আদিম বাসিন্দা, মাওরি উপজাতি আজকে না হয় সভ্যভব্য হয়েছে। এই মাওরিরাই ক্যাপ্টেন কুককে মূকাভিনয় করে দেখিয়েছিল, কিভাবে মানুষের হাড় থেকে দাঁতদিয়ে মাংস ছাড়াতে হয়। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে মানুষ খাওয়ার চল ছিল উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত।

১৭৮৪ সালে উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত রকি পর্বতমালাতে উঠতে গিয়েছিলেন অ্যালফ্রেড প্যাকার নামে একজন পোড় খাওয়া পর্বতারোহী এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। পর্বতজয় অবশ্য তাঁদের হয়ে ওঠেনি খারাপ আবহাওয়ার জন্য। উপরন্তু প্যাকার পর্বতের গায়ে গজিয়ে ওঠা বনজঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। এক সপ্তাহ ধরে পেটে দানাপানি জোটেনি প্যাকারদের। তখন বাধ্য হয়ে প্যাকারকে নরখাদক হতে হয়। তাঁর সঙ্গীরা যখন অকাতর ঘুমোচ্ছিলেন তখন প্যাকার, হাতুড়ি দিয়ে তাঁদের মাথা ফাটিয়ে তাঁদের ঘিলুগুলো গোগ্রাসে খেয়ে ফেলেন। মৃতদেহগুলো খেতেও বাদ রাখেননি প্যাকার। এরপর অবশ্য লোকালয়ে পৌঁছলে ১৮ বছরের হাজতবাস হয় প্যাকারের। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, প্যাকার জেল থেকে খালাস পাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইনিং হল বা খাওয়ার ঘরের নামও রাখা হয় তাঁরই নামে। বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ধরেই নিয়েছিলেন, খাওয়ার ঘরে ঢুকে ছাত্রছাত্রীরা যদি প্যাকারের অতীত কিস্‌সা শোনে, তাহলে তাঁদের পেট ভরানোর ইচ্ছা হয়ত বিলকুল চলে যাবে। সুতরাং খ্যাটের বাজেটটা অনেকটাই কমে যেতে পারে তাঁদের।

১৮৪৭ সালে জনসন নামে একজন আমেরিকাবাসীর স্ত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল রেড ইণ্ডিয়ান দস্যুরা। এই খুনের বদলা হিসেবে জনসন বেছে নেয় ক্রো ইণ্ডিয়ান উপজাতিকে। এই উপজাতির অনেক মানুষেরই কাঁচা যকৃৎ খেয়ে পরলোকগত স্ত্রী-র আত্মার শান্তি কামনা করেছে জনসন। ১৯৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলাওয়াকি রাজ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেফ্রি ডামের নামে এক ব্যক্তিকে। ইনি তাঁর ঘবের ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানীয় বা দুধ, শাকসব্জি না রেখে রেখে দিতেন রোগী এবং সেদ্ধ করা মানুষের দেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ইসে সাগাওয়া নামে আবেকজন কট্টর অপরাধীকে পুলিশ নানা ভাবে জিজ্ঞেস করেছিল—তার বান্ধবীর কি হাল করেছে সে। অবশেষে দেখা গেল, সাগাওয়া তার সেই গার্লফ্রেণ্ডকে বেমালুম হজম করে ফেলেছে। মেয়েটির সঙ্গে সাগাওয়ার বনিবনা হচ্ছিল না মোটেই। সেইজন্যই দু'জনের মধ্যে খাদ্যখাদকের প্রেমটাই ভালো বলে মনে হল। অবশ্য ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা ক্লাসিক 'রবিনসন ক্রুসো'-তে জোর দিয়েই বলা হয়েছে—মানুষের মাংস খাওয়াটা মোটেই নারকীয় অপরাধ নয়। মানুষ যদি খাসির মাংস খেতে পারে, মুরগির ঠ্যাং চিবোতে পারে, তাহলে মানুষের মাংসই বা খাওয়া যাবে না কেন? আসলে মানুষও তো একধরনের উন্নত পশু ছাড়া কিছুই নয়!

ঝিনুক খাওয়াটা অনেক দেশেই প্রাচীনকালে তো বটেই, এখনও রাজকীয় ভোজের পর্যায়ে পড়ে। ভিটামিন 'এ'-র উপাদান সমৃদ্ধ কড আর হ্যালিকাট মাছের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা চলে। ঝিনুকদের বংশকে খাদ্যরসিকদের রসনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রাণী সংরক্ষণবিদরা তাঁদের আন্দোলন কতটা জোরদার করেছেন জানা নেই। তবে, তাঁরা যদি প্রাচীন রোমের রাজপুরুষদের খাবারদাবারের মেনুর কথা শুনতেন তাহলে হয়ত টাইম মেশিনে করে রোমে উড়ে গিয়ে জুলিয়াস সিজার বা ওক্তাভিয়ান আগাস্তাসকে ঘেরাও করে রাখতেন। শুয়োরের গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি, লিভার, পায়ের পাতা, মাদী ছাগলের জরায়ু, জিভ, মগজ, দুধের বাঁট (আডার) অণ্ডকোষ এবং হাড়ের মজ্জা মিশিয়ে ভালো করে মশলা সহযোগে পাক করে তৈরি করা হত একটি জনপ্রিয় এবং উপাদেয় খাদ্য। ১৯শতকের মাঝামাঝিও ইতালির এমিলিয়া আর রোমগ্না-তে ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি, অণ্ডকোষ, ফিলোনি (মেরুদণ্ড) এবং মিস্টি রুটি দিয়ে তৈরি হত এক অতি উপাদেয় খাদ্য। জাপানে মধ্যযুগে যখন সামন্ততান্ত্রিক বাজবংশে মিকাডো ও শোগান-রা ছড়ি ঘোরাতেন তখন কাইসেকি রিয়োরি নামে একটি খাবারের জনপ্রিয়তা খুব ছিল। শোনা যায় এই খাবারে স্বাদ বাড়ানোর জন্য মেশানো থাকত বেশকিছু পাখির বাসা থেকে তুলে আনা কাঁচা ডিম। প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্গত ব্যাবিলন এবং আক্কাদ শহরে খুব সম্ভবত রসুন পেঁয়াজ আর ওলকপির একটা তরকারি বানানো হত। এই তরকারির মধ্যে মিষ্টি ভাব আনতে মেশানো হত নানা জন্তুর তাজা রক্ত।

এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলে একটা কাজের কাজ করেছেন স্পেনীয় ফুটবল দলের প্রশিক্ষক হোসে আন্তনিও কামাচো। আয়োজক দুই দেশ দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপানে কুকুরের মাংস খুবই উপাদেয়। স্পেনীয় ফুটবল দলের সঙ্গে আসা এক ক্যামেরাম্যান একটি রেস্তোরাঁতে খেতে যাওয়ার সময় দেখতে পান, একটি নধর কুকুরের বাচ্চাকে জবাই করে ডিশ বানানোর জন্য রসুইঘরে নিয়ে যাওযা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে সেই ক্যামেরাম্যান এবং কোচ কামাচো বেজায় তক্কাতক্কি করা শুরু করে দিলেন। উদ্ধার করা হল কুকুরের বাচ্চাটিকে। স্পেনীয় দলের সঙ্গে সঙ্গে দলের ম্যাসকট বা প্রতীক হয়ে ছিল এই সারমেয় শাবকটি। দলের তারকা ফুটবলার রাউল গন্‌জালেজ ফেরনান্দো হিয়েরো, ফেরনান্দো মোরিয়েন্তেস, দিয়েগো ত্রিস্তান-এর পাশাপাশি এই কুকুরছানাটিকেও বেশ ভালোভাবেই চিনেছেন স্পেনীয় ফুটবল-ভক্তরা। তবে, স্পেনের, জাতীয় খেলা ষাঁড়ের লড়াই বা বুলফাইটিং-এর ঐতিহ্যগত নিষ্ঠুরতাকে কি তাঁরা বন্ধ করতে চান না? হয়ত ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের বিরুদ্ধে চকমকে পোশাক পরা লাল কাপড় পরা সুপুরুষ লড়িয়ে মাতাদোরকে তাঁদের সাবেকি রোমের অ্যাম্পিথিয়েটারে মরণপণ লড়াই করা 'গ্ল্যাডিয়েটর' ক্রীতদাসদের মতোই পুরুষালি লাগে। কিন্তু তাঁদের বিকৃত, পাশবিক আনন্দ-উত্তেজনার খোরাক হতে গিয়ে অকালে যে অবলা জীবগুলোর প্রাণ ঝরে যাচ্ছে! এরপরও যদি সেইসব নিহত ষাঁড়ের মাংস দিয়ে জিভে জল আনা রেসিপি তৈরি করা হয়; তখন কি একবারও মনে হবে না আমাদের তথাকথিত মনুষ্যত্ব বস্তুটিকে কোন্‌ শিকেয় আমরা তুলে রেখেছি??

পত্রপাঠ যাঁরা ~~প্রৌর্ড়ান~~ পড়েন, তাঁরা প্রত্যেকে অন্তত পাঁচজনকে গ্রাহক করুন যাতে তাঁরাও ~~পুড়তে~~ পড়তে পারেন। বার্ষিক গ্রাহক ~~ছাঁর্দা~~ চাঁদা মাত্র ~~৫২০~~ ১২০ ~~ঢাকযোগে~~ ডাকযোগে। যে কোনো ~~বাঁর্ধ~~ মাস থেকেই শুরু করতে পারেন।

উদ্যান থেকে সরকারের বিশেষ লাভ হয় না। বরং কংক্রিটের জঙ্গল হলে জমিয়ে আমদানি। শিশু হল মানুষের বাচ্চা। শুয়োর বা মুরগির বাচ্চা নয় যে খোলা আকাশের নিচে খেলে বেড়াবে। ছ'মাসে ছ'কেজি ওয়েট হবে।

নাট্য সুসংবাদ

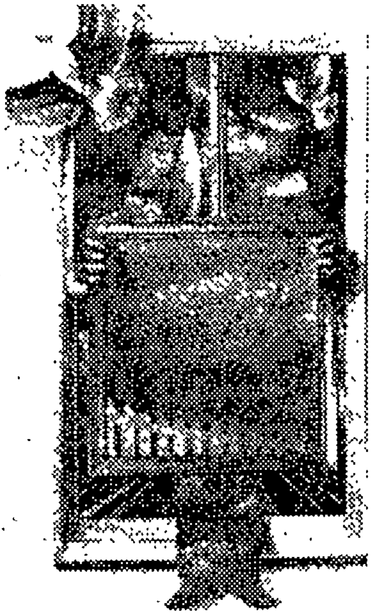

সমীক্ষণ-সমীক্ষা

স্বপ্ন দু'রকমের হয়। অধঃস্তনের সুন্দরী স্ত্রী। এ এক ধরনের স্বপ্ন। আবার শিশুদের জন্যে সুন্দর একটু উদ্যান। এ আর এক ধরনের স্বপ্ন। হয় শয়তানের স্বপ্ন, নয় সাধুর স্বপ্ন। হয় খড়চালার বাঁশ, নয় প্রমোটারের বাঁশ। অসাধু সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে প্রমোটারের অশুভ আঁতাত আর দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন তরঙ্গিনীর দীপ্ত স্বপ্ন। এই দুই পক্ষের সংঘাত আর জয়-পরাজয় নিয়ে নাটক 'স্বপ্ন উড়ান' দেখে এলাম। নিঃসন্দেহে একাডেমির মান বাড়ল। মান বাড়ল বাংলা নাট্য সংস্কৃতির। ক্ষতি হল আবগারি দপ্তরের। বোতল ফেলে শো দেখবে লোকে। ভাগ্যিস আমার সম্পাদক কাজে আটকে আসতে পারেননি। শরতের আকাশে ভাসা ভাসা মেঘের মতো দর্শক নিয়ে দু'ঘণ্টার স্বপ্ন উড়ান হল। হীরের দোকানে হাতেগোনা খদ্দের। স্বপ্ন-কেরানী নিরাপদ ওরফে নির্দেশক পঙ্কজ মুন্সীর মুন্সিয়ানা দেখবার মতো। সমর ও কাশীনাথরূপী সুজিত ও অসিতবাবুর যৌথ অভিনয় বেশ লাগল। পুরু গলার পৌর অধিকর্তার ভূমিকায় শঙ্করীপ্রসাদের সত্যবচন অনবদ্য। তিনি জানালেন উদ্যান থেকে সরকারের বিশেষ লাভ হয় না। বরং কংক্রিটের জঙ্গল হলে জমিয়ে আমদানি। শিশু হল মানুষের বাচ্চা। শুয়োর বা মুরগির বাচ্চা নয় যে খোলা আকাশের নিচে খেলে বেড়াবে। ছ'মাসে ছ'কেজি ওয়েট হবে। হাইব্রিড্ পণ্য। মানুষ উন্নত প্রাণী। এখন আই-টি—যুগ পেরোচ্ছে। অগ্নি গেছে, প্রস্তর গেছে শৈত্য গেছে। মাঝখানে মূল্যবোধ গেছে। এখন আই-টি। আমি আর তুমি। দু'জনের জন্যে চারটে দেওয়ালই যথেষ্ট। তাজমহল কি হবে? আমাদের শিশু শিশিরের কণা। আমাদের চোখের পাতার ওপর টল্‌টল্ করবে। এক্সট্রা রুমের কি দরকার। আর যদি দরকার বুঝি, খেলাধূলা দেওয়া যাবে। ভাতের পাতে লেবুর আচার। আজকাল চার চাকার সাইকেল উঠেছে। আধুনিক বাস্তব উপযোগী। জানলার সামনে পিচের ফালিতে চালাবে। চতুর প্রমোটারের হাতে ফতুর বংশধর বন্দী। পূর্বপুরুষের জমিতে তাই লোকদেখানি মাঠ। ও মাঠে খোকাকে পাঠাবে না। ওখানে প্রমোটারের লোকেরা ছদ্মবেশে ফুটবল খেলে। একটা বল লাগলেই বংশনাশ। সরকারি চাকুরে নিরাপদর চোখে লেগে গেল তরঙ্গিনীর সেই স্বপ্ন। বুকে লেগে গেল ক্যানসার। জানা হয়ে গেল চলে যাবার তারিখ। উদ্যানের স্বপ্ন হয়ে গেল পথের দাবী। চাই চাই করে নিজের চাকরিটা পর্যন্ত ছাড়ল সে। উঁচু মহলের সঙ্গে প্রমোটারের আঁতাত ফাঁস করে স্বপ্নকে এগিয়ে দিল বাস্তবের দুয়ারে। তার শেষ যাত্রার দৃশ্যটা বড়ই মন ছোঁয়া। মাঝমাঠে দোলনায় বসে আছে প্রাণহীন নিরাপদ। নবজীবনের প্রতীক তরঙ্গিনী ঘুরে ঘুরে বুকে ভরে নিচ্ছে মুক্ত বাতাস। অসাধারণ তরঙ্গিনীর মানসী সিন্‌হা। অন্যরা অনন্য। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের এ নাটকে উজ্জ্বল মননের ছাপ ছিল আগাগোড়া।

—দিব্যেন্দু দাস

সেয়ানে সেয়ানে মাসতুতো ভাই। গরিবে গরিবে 'রিব'তুতো, মানে পাঁজরাতুতো ভাই আর কি। গরিবের পাঁজরা দেখা যাবে—এতে এমন কিছু কৃতিত্ব নেই। তবু পত্রপাঠ-এর যা স্বভাব, নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের পিছনে দাঁড়ানো। তাঁদেরও পাঁজরাগোনা দশা কিনা, হুবহু আমাদেরই মতন। আর বিজ্ঞাপনের দর বাড়তে বাড়তে প্রায় বরপণকে ছুঁয়ে ফেলেছে। তাই আমরা ঠিক করেছি, প্রতি সংখ্যায় এক একটা গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যাভিনয়ের মাথায় সমালোচনার গাঁট্টাভিনয় করে যতদূর সম্ভব তাঁদের কেচ্ছা মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। আমরা কমলাকান্তের মতন এই আত্মীয়তার নেমন্তন্ন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি। ফলশ্রুতি, আশা করা যায়, কানমলাকাণ্ড হবে। তা হোক।

পুলিশকে কত রকমের বাটপাড়কেই না সামলাতে হয়। বন্দুকের গুলিও অনেক সময় চুপসে যায় কথার গোলার তোড়ে। যো ডর গয়া ও মর গয়া। আর ফাঁকটুকু যিনি ধরতে পারেন, আসল খেলাটা খেলেন তিনিই। শেষ হাসিটাও তিনিই হাসেন। নিজের চাকরি জীবনের শুরুতেই এমন এক চমকপ্রদ ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন দক্ষ পুলিশ অফিসার — **প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়**

আপনি মোড়ল

তখন সবে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছি সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে। চিৎপুর থানায় পোস্টেড। সেদিন ছিল নাইট ডিউটি।

সবে ডিউটিতে বসেছি, এমন সময় ফোনে খবর এল ওলাইচণ্ডী বস্তিতে জিম্বো নামে এক মস্তান খুব ঝামেলা করছে। পুলিশ ট্রেনিং কলেজ থেকে সদ্য বেরিয়েছি। তাই গণ্ডগোল বা অপরাধের খবর পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অকুস্থলে পৌঁছোতে চাই। থানার জিপ নিয়ে চলে গেলাম ওলাইচণ্ডী বস্তিতে। এখানে একটা মন্দির আছে। বেশ বড় এবং ওই ওলাইচণ্ডী দেবী জাগ্রত বলে পরিচিত। প্রচুর লোক আসে ওখানে পুজো দিতে। এই মন্দিরের পেছনের বস্তিটাই ওলাইচণ্ডী বস্তি নামে পরিচিত।

জীপ চালিয়ে চলেছি। পেছনের সিটে দু'জন কনস্টেবল রয়েছে। ড্রাইভার পাইনি। যার নাইট ডিউটি সে তখনো এসে পৌঁছয়নি তাই নিজেই ধরেছি স্টিয়ারিং। ট্রেনিং কলেজে ড্রাইভিং শেখা বাধ্যতামূলক। বড় রাস্তা মানে টালা পার্ক এভিনিউ থেকে জিপ ঢোকালাম বস্তির সরু রাস্তায়। দেখলাম এদিক ওদিকে সব জটলা চলছে। একটা মুদিখানা দোকানের সামনে কিছু ভিড় দেখে ওখানেই থামলাম। জিপ থেকে নেমেই দেখি দোকানটা তছনছ হয়ে আছে। ডালের বস্তা চালের বস্তা কে যেন ওলোট পালট করে দিয়েছে।

দোকানের মালিক, বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বছর, এগিয়ে এল। বলল, দেখুন স্যার দোকানটার কি অবস্থা করে দিয়েছে। ক্যাশ থেকে, সারাদিনের বিক্রি প্রায় আড়াই হাজার টাকা ছিল, তাও নিয়ে গেছে। তখনই চোখ গেল একটা কাঠের হাতবাক্স উল্টে পড়ে রয়েছে।

আমি বললাম, কে এসব করেছে? তার নাম কি?

আমার কথার উত্তর কেউ দিল না। পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমি দেখলুম ওরা হয়ত আমার অজ্ঞতায় অবাক হয়ে গেছে যে, কে একাজ করতে পারে, থানার অফিসার হয়ে তার নাম আমি জিজ্ঞাসা করছি, এটা ওদের কাছে আশ্চর্য লাগছে। আর তা না হলে ওরা দুষ্কৃতীর নাম বলতে ভয় পাচ্ছে।

—কি হল? বলুন, একাজ কে করেছে?

একেবারে সবাই চুপচাপ। এক বৃদ্ধা মহিলা এগিয়ে এলেন। বললেন, আমি বলছি। জিম্বো, জিম্বো এখানে এসেছিল। বলে কি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও দোকানে আসবে, ওকে নগদ পঞ্চাশ টাকা আর এক পেকেট সিগারেট আর দেশলাই দিতে হবে। ওই দোকানদার গোপাল মুদি বলে সে এসব কিছুই দিতে পারবে না। তাতেই ও রেগে গিয়ে সব তছনছ করে দিয়ে গেছে। ক্যাশ থেকে টাকাও তুলে নিয়ে গেছে।

একটা যুবক এসে বুড়ির হাত ধরে টেনে বলল, তুমি এসব ঝামেলায় কেন থাকছ, চলো বাড়ি চলো।

উনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, কেন র‍্যা, আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, তোদের ওই জাম্বো না জিম্বোকে আমাকে ভয় করে চলতে হবে নাকি?

আমি শুধু জিজ্ঞাসা করলুম, জিম্বো এখন কোথায় আছে?

জনতা যখন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাই উচিত মনে করছিল তখন ওই

বৃদ্ধা বললেন, ওই তো ইয়ার্ডে যাবার রাস্তায় ও বসে আছে।

বাস্। আমার প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেছি। তখনই কনস্টেবলদের ঈশারা করে আমার পেছনে আসতে বলে দ্রুত এগোলাম। চিৎপুর ইয়ার্ডে যাবার একটা সরু গলি, তার শেষে রেলের পাঁচিল্ ভেঙে ঢোকার একটা রাস্তা আছে। একটা সিমেন্টের স্ল্যাবের উপর বসে রয়েছে যে যুবকটি তার নাম জিম্বো। আমার সঙ্গী থানার পুরনো কনস্টেবল সুজিতই ওকে চিনিয়ে দিল। বছর পঁচিশেক বয়স। কিন্তু মুখেচোখে ও শরীরের উপর অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। চোখের কোণে কালি। মদে এখনো চুর হয়ে আছে।

—এই জিম্বো, থানায় চল্। বললাম

—তুমি কে চাঁদ? থানায় নতুন এসোছো বুঝি। জিম্বোকে থানায় নিয়ে যাবার হিম্মত কারুর নেই। ভাগুন এখান থেকে। তা না হলে বিল্লা হয়ে যাবে।'

ওর মুখ দিয়ে ভক ভক করে গন্ধ বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এই ঔদ্ধত্য সহ্য করা যায় না। আবার বললাম, চলো থানায়, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

ও এবার তাকাল আমার দিকে, — কে কমপ্লেন করেছে আমার নামে আপনার কাছে? সেই মায়ের দুধ খাওয়া বাচ্চাকে আমি একবার দেখতে চাই।

আমি এবার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কনস্টেবলদের সহায়তায় ওকে কব্জা করলাম। দু' চার ঘা লাঠিও পড়ল ওর গায়ে। তারপর কনস্টেবলরা ওকে ধরে নিয়ে চলল আমার জিপের দিকে।

বস্তির লোকেরা অবাক হয়ে দেখছিল আমাদের। আমি বুঝলাম এই জিম্বো বহুদিন ধরা পড়েনি। ওকে যখন জিপে তুলছি তখন ও চেঁচিয়ে বলছিল—জ্যোতি বসু। তোমার আমলেও জিম্বোকে পুলিশের জিপে উঠতে হল? জেল কা তালা টুটেগা; জিম্বো জরুর নিকলেগা।

তারপরেই কিন্তু ও জিপে শান্ত হয়ে বসে রইল। একজন কনস্টেবল বলল, স্যার, জিম্বো এই প্রথম চিৎপুর থানায় ধরা পড়ল।

জিম্বো চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমায় ধরার ফল তোমার অফিসার হাড়ে হাড়ে টের পাবে আজ রাতেই।

> উনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, কেন র‍্যা, আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, তোদের ওই জাম্বো না জিম্বোকে আমাকে ভয় করে চলতে হবে নাকি?

আমি জিপ চালাতে চালাতে পেছন ফিরে একবার ওকে দেখে নিলাম। থানায় পৌঁছে আগে ওকে লকআপে ঢোকালাম। তারপর জেনারেল ডায়েরিটা টেনে নিলাম। জিম্বোর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে এ. এস. আই বাবুকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে আমার টেবিলে এসে বসলাম।

একটু পরেই টের পেলাম থানার কনস্টেবলরা ব্যারাক থেকে এসে ওকে লকআপে দেখে যাচ্ছে। কেউ কেউ পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাকেও দেখছে। রাত এগারোটা নাগাদ ডিউটি এ. এস. আই বলল, স্যার, আপনাকে মামাবাবু ফোন করছে।

আমি তো অবাক। আমার তিন মামা। তাঁরা থাকেন শ্রীরামপুরে। এত রাতে তাঁদের কি দরকার পড়ল আমাকে। আর একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। আমার মামারা তো কেউ মামাবাবু বলে কথা বলেন না। তাঁরা বলেন, আমি মেজমামা কথা বলছি বা ছোটমামা বলছি রে—এই ভাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে থানার সেরেস্তা মানে যেখানে ডায়েরি নেওয়া হয় সেখানে গিয়ে ফোনটা ধরলাম—হ্যালো।

—আমি মামাবাবু বলছি।

—মামাবাবু?

—হ্যাঁ।

—আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার নামটা বলুন।

—নাম? তুমি মামাবাবুর নাম জানতে চাইছ? থানায় নতুন এসেছ?

—এক্সাক্টলি। আসলে আজকেই আমার প্রথম নাইট ডিউটি।

—তাই বলো। সেই জন্যেই তুমি মামাবাবুকে চিনতে পারলে না। আস্তে আস্তে চিনে যাবে। হ্যাঁ, যেকথা বলার জন্যে ফোন করেছিলাম। ওই জিম্বোকে কে ধরেছে?

—আমি ধরেছি।

—ওকে ছেড়ে দাও।

—না, ওকে ছাড়া যাবে না। কাল ওকে কোর্টে পাঠানো হবে। ওখানে উকিল দাঁড় করিয়ে ওর জামিনের চেষ্টা করবেন। আমি অবশ্য ওর জামিন আটকানোর জন্য চেষ্টা করব।

—হোয়াট? আমি মামাবাবু বলছি ওকে ছেড়ে দিতে আর তুমি আমাকে কোর্ট দেখাচ্ছ?

—আপনার এসব কথার উত্তর দেবার কিছু নেই। আমি যা বলার বলে দিয়েছি। আমি লাইন ছেড়ে দিচ্ছি।

এই বলে লাইন কেটে দিলাম।

একটু পরে থানার এ. এস. আই আস্তে আস্তে আমার ঘরে ঢুকলেন। স্যার, আপনি মামাবাবুর কথা রিফিউজ করে দিলেন?

—ওর অন্যায় আব্দার আমি মানতে পারি না।

—তবে স্যার, উনি ঝামেলা করতে পারেন। ওঁর স্যার দারুণ ক্ষমতা। অনেক জানাশুনা। আমাদের থানা থেকে কতবার উনি নিজেই ফোন করেছেন চিফ মিনিস্টারকে।

—উনি চিফ মিনিস্টারকে সরাসরি ফোন করেন।

—হ্যাঁ স্যার, আমার সামনে একদিন ফোন করলেন।

—কী ফোন করলেন?

—উনি আমার সম্বন্ধে বললেন—সুবোধ খুব ভালো ছেলে স্যার, ওকে একটু দেখবেন। এর পরে ওকে বড়বাজার থানায় পোস্টিং করে দেবেন। ওর মতো মানুষ হয় না স্যার।

আমি মনে মনে হাসলাম। মামাবাবু থানা থেকে ডাইরেক্টলি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করছেন একজন এ. এস আই-এর পোস্টিং-এর জন্যে? আর এভাবেই সবাইকে বোকা বানিয়ে রেখেছে। মামাবাবু রাতে আর ফোন করলেন না। জিম্বো দু'বার তিনবার লকআপ থেকে চেঁচিয়ে বলল, মামাবাবুর ফোন আসেনি? দাঁড়াও না সকালটা হোক। ওই অফিসারের আমি বারোটা বাজাব। গোসাবা থানায় কালকেই পোস্টিং করে দেব মামাবাবুকে বলে।

তারপর ও ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন সকাল আটটার সময় এক কাপ চা আর খবরের কাগজ টেনে নিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি থানার সেরেস্তায় সাড়া পড়ে গেছে। পর্দার আড়াল থেকে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ঠিক যেমন পদস্থ অফিসার কেউ থানায় এলে যেরকম হয় সে রকম আর কি। একটু পরেই এ. এস. আই বাবু প্রায় হুড়মুড় করে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল, স্যার, শিগ্গির চলুন ওসির ঘরে।

আমি তো অবাক, কেন? ওসির ঘরে যাব কেন, কি হয়েছে?

—স্যার মামাবাবু এসেছেন। আপনাকে ডাকছেন।

—আপনার মামাবাবু ওসির ঘরে কেন বসেছেন, উনি তো এখন নেই?

—উনি কত বড় দরের লোক স্যার, সেইজন্যই তো ওখানে বসিয়েছি। আপনি একবার চলুন স্যার।

—শুনুন, উনি যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান এখানে আসতে বলুন।

আমার গলার স্বরে কি যে ছিল, উনি একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর

বললেন, ঠিক আছে স্যার, তাই বলছি।

একটু পরে বছর পঞ্চাশেক বয়সের মাঝারি হাইটের গোলগাল চেহারা এক ভদ্রলোক এলেন জুতোর মশ্‌মশ্‌ শব্দ করে। গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি। পান খাচ্ছেন। ভারি চেহারা, একটু গজেন্দ্র গমন চালে হাঁটছেন নিজের ওজন বোঝাবার জন্য। এসে আমার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। আমি ইচ্ছে করেই সামনের কাগজের ওপর চোখ রেখেছি। উনি হয়ত আমার ঔদ্ধত্যে রেগে যাচ্ছেন। মিনিট তিনেক পরে কাগজ থেকে মুখ তুলে ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, হ্যাঁ বলুন।

—আমিই মামাবাবু।

—ওটা কোনো পরিচয় হল না। আপনার নাম বলুন।

অবাক হয়ে উনি বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

—আমাকে ওই নামেই সবাই চেনে। আপনার থানার অফিসারও জানে। এখন যা বলছি, তা শুনুন।

আমি চোখ তুলে দেখলাম একবার।

—জিম্বোকে ছেড়ে দিন।

—আপনাকে একথার উত্তর তো গত রাতেই দিয়েছি।

—আপনি তা হলে ওকে থানা থেকে ছাড়বেন না?

আমি কোনো উত্তর দিলুম না। উনিও আশ্চর্য হয়ে দেখছেন আমাকে। থানাতে এরকম ব্যবহার পেতে উনি অভ্যস্ত নন, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন। তারপর আমার টেবিলের ওপরে রাখা টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন। ওসির ঘরের ফোনের সঙ্গে প্যারালাল লাইন আছে এটা। আমি সতর্ক চোখে লক্ষ্য করলাম ওঁর বোতাম টেপা। খুব তাড়াতাড়ি টিপতে লাগলেন। তবে প্রথম নম্বরটি টিপলেন ছয়। আমি আবার আমার কাগজে চোখ রাখলাম।

তুমি কে চাঁদ? থানায় নতুন এসোছো বুঝি। জিম্বোকে থানায় নিয়ে যাবার হিম্মত কারুর নেই। ভাগুন এখান থেকে। তা না হলে বিল্লা হয়ে যাবে।

—চিফ মিনিস্টারকে লাইনটা দিন, বলুন চিৎপুর থেকে মৃত্যুঞ্জয় কথা বলছি।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই উনি বলতে শুরু করলেন—স্যার মৃত্যুন বলছি। হ্যাঁ স্যার শরীর ভালো আছে। আমি যে জন্যে আপনাকে ফোন করছি। এই চিৎপুর থানায় সজল রায় নামে একটা থার্ডক্লাস অফিসারের পোস্টিং হয়েছে। দেখুন স্যার, জিম্বো নামে এক নিরীহ সমাজসেবী যুবককে, কাল সন্ধ্যাবেলা ও যখন নিজের ঘরের বিছানায় শরীর খারাপ বলে শুয়েছিল, তখন তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে লকআপে রেখে দিয়েছে। শুনলুম ওকে নাকি মারধরও করা হয়েছে। একি অত্যাচার স্যার। জিম্বো আমাদের পার্টির ছেলে। এই অফিসারকে এখনিই বদলি করে দিন স্যার। তা না হলে এই ধরনের ঘুষখোর অফিসারের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ টিকতে পারবে না। ঠিক আছে স্যার। নমস্কার স্যার....

আমি নিশ্চিত জানি উনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেননি। উল্টোপাল্টা নম্বর টিপেছেন। এবার বুঝলাম এটাই ওঁর অস্ত্র। এই দিয়েই সকলকে ভয় দেখিয়ে সন্ত্রস্ত করে রাখেন।

—আপনি কি এর পরেও জিম্বোকে ছাড়বেন না? শুনুন একটা কথা। আমি যেমন বদলি করাতে পারি তেমনি আবার পোস্টিং করেও দিতে পারি। ওকে ছেড়ে দিন, আমি আবার চিফ মিনিস্টারকে ফোন করে বদলি না করার কথা বলে দিচ্ছি।

আমি স্থির দৃষ্টিতে ওঁর চোখে চোখ রাখলাম। তারপর বললাম, আপনার সঙ্গে চিফ মিনিস্টারের কথা হয়ে গেছে তো, এবার দেখুন আমি একটু কথা বলি ওঁর সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি উল্টোপাল্টা কয়েকটি নম্বর টিপলাম। তারপর বললাম, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তারপর একটু থেমে বললাম—স্যার, গতকাল সন্ধ্যায় আমি জিম্বো নামে এক কুখ্যাত তোলাবাজকে ধরে নিয়ে এসেছি। একটা দোকান ভাঙচুর করে প্রায় আড়াই হাজার টাকা নিয়ে গেছে। একে ছাড়াবার জন্যে কাল রাত থেকে মামাবাবু ওরফে মৃত্যুঞ্জয় নামে একটি লোক আমাদের ভীষণ ডিসটার্ব করছে। বলছে এখনি লকআপ থেকে ছেড়ে দিতে। আবার বলছে আপনার সঙ্গে নাকি ওঁর দারুণ খাতির আছে, আপনাকে দিয়ে আমার বদলিও করিয়ে দিতে পারে। কী বললেন স্যার? আপনি ওই নামে কাউকে চেনেন না। ওর কথা শোনার দরকার নেই আর ওকে থানা থেকে চলে যেতে বলব? ঠিক আছে, তাই করছি। নমস্কার স্যার।

ফোনটা রেখে ওঁর দিকে তাকালাম। কয়েক সেকেণ্ডে ওঁর মুখের চেহারা বদলে গেছে। ফোলা বেলুন যেন চুপসে গেল।

—এ এস. আই-এর সামনে আর আপনাকে বেইজ্জত করতে চাই না। আপনি সোজা থানা থেকে বেরিয়ে যান। আর কোনোদিন মামাবাবু বলে ফোন করবেন না।

ধীরে ধীরে মৃত্যুঞ্জয়বাবু ওরফে মামাবাবু থানা থেকে বেরিয়ে গেলেন। লকআপ থেকে জিম্বো ওকে দেখেছে। সে চিৎকার করতে লাগল কি হল মামাবাবু! আমাকে না নিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছেন? ও মামাবাবু! আমাকে শুনতে পাচ্ছেন না? ও মামাবাবু....

সেই থেকে মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর কোনোদিন থানায় ফোন করেননি বা আসেননি।

কার্টুন : জয়দীপ দাশগুপ্ত

কর্পোরেশন প্রশস্তি

তিনপায়ে তিলোত্তমা

মেয়র বলেছেন কর্পোবেশনকে আর ‘মা’ ভাবা যাবে না। কোলে নাও, দুধ দাও, টিফিন দাও, বিয়ে দাও, সংসারেব চাবি দাও, তারপর একটা আশ্রম ট্রাশ্রমে গিয়ে আমাদের মুক্তি দাও। ওসব ভুলে যাও। বিনি পয়সার ছিটকিনি। যা নেবে দাম দিতে হবে। ফোঁকটাই পেতে পেতে তোমাদের খুব ন্যাজ হয়েছে। বাড়িব সামনে রাস্তা হচ্ছে, রান্নাঘরে ‘স্ল্যাব্’ ঢেলে নিলে। বালি-পাথব বেঁচে গেল। গিন্নিকে আর হাঁটু ভাঁজ করতে হবে না।

রাস্তায ‘নিয়ন’ বসছে। নোট খইয়ে ‘পোস্ট’ সরালে। বাড়িময থৈ থৈ করছে নিয়ন। খোকা বারান্দায় বসে পড়তে পারবে। রাতে নাইট ল্যাম্প লাগবে না। ঘরে কেউ না থাকলে রাস্তার নিয়ন জ্বলবে। চলো, ঘুরে আসি। রাস্তার নর্দমায় মশা মারা স্প্রে হচ্ছে। ও ভাই, একটু এসো তো। বাবার দুধে দিযে যাও। আমাদের সুখের গলিতে রাবিশের ট্রাক আটকে আছে। তোমাকে শ্রাদ্ধে বলব।

ভাই, ঐ দেখো, ভাড়াটের বাচ্চাটা কাজে বোবোচ্ছে। ওপর থেকে ওব গাযে একবাব ঝাড়ো না ভাই। আমি ‘বৃষ্টি এল’ বলে চেঁচাচ্ছি।

আজকাল গাড়িওলা জমাদার বাড়ি বাড়ি আসছে। পারলে তাকে দিয়ে চারপাশে ভারা খাটিয়ে হোয়াইট ওযাশ্ করিযে নাও। ও বাছা, ঐ যে আনাজের প্যাকেট। ওতে কাঁটা-কানকো-হাড় সব পাবে। ঐখানে টিভির বাক্সো। ওতে দুধের প্লাস্টিক, জলের প্লাস্টিক, চাঁদার বিল, মিষ্টিব বাক্সো, মশলার প্যাকেট, পযলা বৈশাখের ক’টা চিঠি আর মাসকাবারি তুলো আছে। সাবধানে তুলো। কাল একটা কলাগাছ কেটেছিলাম। কোনা থেকে ওটা তুলো। পাশের বাড়ি এত লবাব যে নাবকেল গাছের গোড়া ওদিকে আগা আমার ছাদের ওপরে। আমায় বিশ্বরূপ দেখাচ্ছে। চারটে শুকনো পাতা পড়েছে। একটু নাবিয়ে নাও বাছা। পরের পাতা ছোঁব না। গলিঘুঁজিতে রোলার ঢোকে না।

কর্পোরেশন কংক্রিট করছে। ব্যাগড়া দিলে। এই যে ভাই, এই পর্যন্ত সিমেণ্ট হবে। সেকি। এ তো বাড়ির উঠোন। কর্পোরেশনের কার্তিকদা এখানে বসে দু’বেলা তাস পেটায। সিমেণ্ট না হলে কাল তোমায় পিটবে। সবাই মিলে চ্যাংদোলা করে পুকুরে। সংসার আগে না সিমেণ্ট আগে? বুঝে নাও।

ছ’বছর ট্যাক্স দিলে না। কর্পোরেশন কাউণ্টার খুলে হা-পিত্যেশ করে করে কর্মীদেব ভি. আর. এস দিয়ে দিল। কর্পোরেশন পেনাল্টি গুনছে। তুমি তারা গুনছ। বোটানিক্সের বট! ‘ফেরুল’ উপড়ে জলকষ্ট ঘুচিযে দিলে। এখন কর্পোরেশনের জল তোমার ছাদে উঠে যায়। পাম্প বেচে দিযে ফোযারা কিনলে। হোলির দিন পাড়াসুদ্ধ লোককে চানেব নেমতন্ন করলে। কে একটা হাতি পুষে তোমায় ধরেছিল। জলদাপাড়ার ঐ মালের কত জল লাগে জানো? আবার সাবান মাখলে তো হয়েছে। টালায় তালা, গঙ্গায় গ্যাংওয়ার, পাম্পে ঘুঘু।

এবার আসছে মেয়বের মার। জমি মিউটেশনের সময় সাতপুরুষের ট্যাক্স অগ্রিম ছাড়ো। পেটে থাকতেই পিঠে নাও। বাড়ি হয়ে গেলে বড় ন্যাজ হয়। খাওয়া শোধরাও। খোসা, বোঁটা, দানা, কানা রাস্তায টপকানো চলবে না। হোটেলে দেখনি? ফ্যান পর্যন্ত ফেলে না। দৈ গুলে লস্যি। ধানফুলের সিরাপ।

> ‘ফেরুল’ উপড়ে জলকষ্ট ঘুচিয়ে দিলে। এখন কর্পোরেশনের জল তোমার ছাদে উঠে যায়। পাম্প বেচে দিয়ে ফোয়ারা কিনলে। হোলির দিন পাড়াসুদ্ধ লোককে চানের নেমতন্ন করলে।

শহর পরিষ্কার রাখতে আসছে পেচ্ছাপ-অ্যাকশন-প্ল্যান। নাগবিকাদের জন্যে চিন্তা নেই। ভগবানদত্ত ক্ষমতা। ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ। তুমি পাঁচ মিনিট চেপে দেখ। তলপেটে হুইশল বাজিয়ে ফুটবল ম্যাচ শুরু হয়ে যাবে। ফাউল, ফ্রিকিক্, হ্যাণ্ডবল, হ্যাঁচ্কা, গেল গেল বব, খোল খোল দ্বার। কিন্তু কোথায খুলবে। চাবিদিকে থিক থিক করছে মানুষের বাচ্চা। এদিকে মাঠে ইট পড়ছে। গ্যালাবিতে আগুন। অবশেষে যখন পেলে, তোমাব আগে ছ’জনার লাইন। ছ’টা ছ্যাকবা গাড়ির পেছনে তোমার ট্যাঙ্কার। মৃদু প্যারেড, বাঁধে চিড়, ইলশেগুঁড়ি। তলপেটের তাগিদে সভ্যতায শেকল। মাব শালা ধাক্কা। ছিটকে গেল ছ্যাকবা গাড়ি। থিম্পুব সমুদ্রের মাঝে প্রশান্তিব ঝরণা। কল্লোলিনী হল কলকাতা। এবার আসছে ঐ প্ল্যান। পশুপ্রাণীদের দেখনি? সিভিক সেন্সের জাহাজ এক একটা নেড়ি। তোমার মতো পিত্তি রঙের এক কুঁযো জল ছেড়ে বান ডেকে আনবে না। ওরা করলে কোথায করে গেল কেউ জানতেও পারবে না। গন্ধটুকুও নিজেরা শুঁকে নিযে পরিবেশ পরিষ্কার কবে দিল। মানুষও টায়ারে কবুক। একটু ছেড়ে আবাব পবেব টায়াবে। সঞ্চয়িতা ইনস্টলমেণ্ট। তাই মেযর মোড়ে মোড়ে টায়ার সাজাচ্ছেন। দেওয়ালে দেওযালে ত্যাগী কুকুরেব ছবি। তিনপাযে তিলোত্তমা।

—আইভান হো হো

মাখন সুন্দরি রোড

মিতা নাগ ভট্টাচার্য

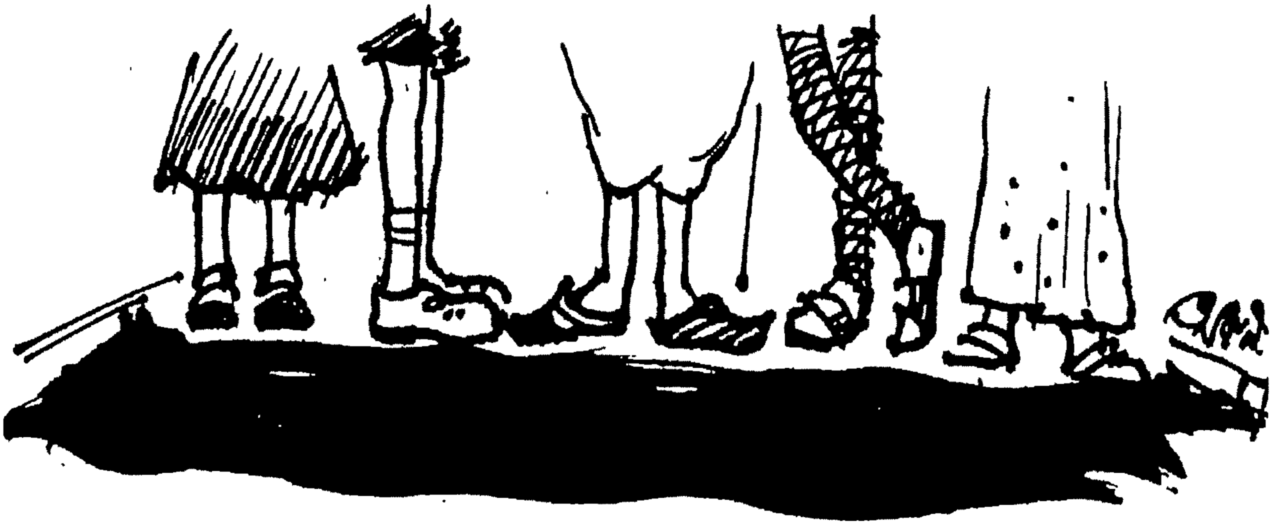

সব যখন হল, একটা নাম দেওয়া দরকার। প্রশ্ন হল—কী নাম? কার নাম? এ নিয়ে মতামত, মতামত থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে যশ কেনার সদিচ্ছা, তা থেকে বিতর্ক, বিতর্ক থেকে বিতণ্ডা।

অখিলের পুরনো স্বভাব বাড়ি ফিরেই এক কাপ চা খাওয়া। বাইরের পোশাক ছাড়া পর্যন্ত হয় না। বাবুর আগে চাই চা। আজও যথারীতি।

—ইমলি আগে এক কাপ গরমা-গরম চা আনো তো।

—আগে বলো, মিটিং-এ কি হল? তোমাদের এত মতভেদ!

—উরি বাব্বা! ও বলতে গেলে ইতিহাস। নইলে ভাবো তো, বেলা তিনটে থেকে সাতটা অবধি চলল মিটিং। নো সমাধান।

—সে কি! এ নিয়ে তো তিন দফা হল আলোচনা!

পাশের ঘর থেকে ছেলের উসখুসুনি টের পায় ইমলি।

—মা একটু অঙ্কটা দেখিয়ে দাও না।

—নিজে চেষ্টা কর। আমি পরে দেখছি।

অখিলের সাত বছরের বিয়ে করা স্ত্রী ইমলি। মজার মেয়ে। খুব কাজ করতে ভালোবাসে। কটু কথা মুখ দিয়ে কমই উচ্চারিত হয়। মাঝে মাঝে ছেলের উপর রেগে যায় বটে। সেও যথেষ্ট ধৈর্য ধরার পর। অখিলের পাড়ার মধ্য দিয়ে একটা পাড়াতুতো রাস্তা গেছে। যার ইম্পর্ট্যান্স নেহাৎ কম নয়। বড় শরিকি রাস্তা নয় বলে সে ফ্যালনা নয়। এই রাস্তা ধরে গেলে স্টেশনে পৌঁছানো যাবে সরাসরি। এই রাস্তা দিয়ে বড় খেলার মাঠের ডানদিকের শিমুল গাছটার পাশে পৌঁছানো যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আবার এই রাস্তারই ডান দিকে মিত্তিরবাবুর বাড়ি। এই রাস্তারই বাম দিকে চতুর্ভুজের বাড়ি। রাস্তারই ঠিক মাথায় বড় পেয়ারা গাছ। গ্রীষ্মে পেয়ারাফুল আর বর্ষায় পেয়ারার ডাঁসা অবস্থা। কাকে না একবার চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য করে। এ হেন রাস্তা এতদিন অবহেলিত ছিল! ইঁট পাতা হয়নি। কাঁচা নর্দমা পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। তাতে মশাদের রাজত্ব। কুকুরের বিশ্রামের জায়গা। না, এতকাল বাদে স্থানীয় মানুষের টনক নড়েছে।

পাড়াতুতো বলে অবহেলা করলে চলবে না। ঠাটবাট উচ্চেনিতে হবে। বর্ষায় জল জমে। মাটি ফ্যালো, তার উপব পাতো ইঁট। তারপর চুন-সুরকি। কী চেহারা ফিরবে। কিন্তু পয়সা? হয়েছে সমাধান। তোলো চাঁদা।

* * *

হ্যাঁ, রাস্তা মশাই এখন বেশ ধোপদুরস্ত। রিকশা কেন, চার চাকার বড় গাড়ি সদর্পে ঢুকছে। আগে ভাবাই যেত না। এখন নর্দমা 'ড্রেন' পদবী নিয়েছে।

তবে হ্যাঁ, আর দেরি নয়। সব যখন হল, একটা নাম দেওয়া দরকার। প্রশ্ন হল—কী নাম? কার নাম? এ নিয়ে মতামত, মতামত থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে যশ কেনাব সদিচ্ছা, তা থেকে বিতর্ক, বিতর্ক থেকে বিতণ্ডা। অখিল পাড়ার মধ্যে সুবিবেচক বলে খ্যাত, ডাকা হয়েছে তাকেও।

—এখন বলো তো ইমলি, কী করা যায়? রাযজেঠু তো ওনার বাবার নাম ছাড়া ভাবতেই পারেন না।

—তাতে আপত্তি কোথায়?

—আবে, চতুর্ভুজদের ফ্যামিলি দুশো ইঁট দান করেছে রাস্তা পাকা করতে। ওদের দাবী,... ... ওদিকেরতনকে চেনো তো, ও বেচারা রাস্তাটার হাল ফেরাতে খুব খেটেছে। তার ইচ্ছা মায়েব নামে—

—ইচ্ছের তো শেষ নেই দেখছি। ভোটাভুটি করো।

—আরে, ভোট তো তখন হবে, যখন কাউকে কেউ সমর্থন করবে। এ তো সকলেই বলে তার নামে হোক রাস্তা।

হেসে ফেলে ইমলি খুব জোরে।

—তবে কাজ নেই নাম দিয়ে।

—তোমার সবেতেই গা-ছাড়া ভাব। আমার সম্মান নিয়ে টানাটানি। সকলের এক কথা—অখিল, তুমি ঠিক করো কী হবে।

—অখিলদা, অখিলদা—

বাইরে কারুব ডাকে স্বামী-স্ত্রীর কথায় বাধা পড়ে। তিন-চারটি ছেলে। অখিল বাইরে যায়। বুঝতে পারে, একই বিষযে আলোচনার ব্যাপার।

রাতেও বেশ গম্ভীর অখিল। পাশাপাশি থাকা, মুখ কালো হবে যার কথা না ভাববে। ইমলি মজার মজার কথা বলতে ওস্তাদ—

—মনে হচ্ছে তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় হচ্ছে না। খেতে বসো দিকি।

—তুমি আর কি বুঝবে। রায়জেঠু বয়স্ক মানুষ। তাঁর কথা ফ্যালা উচিত নয়। অন্যদিকে...

—আমার মাথায ভালো আইডিয়া এসেছে। শুনবে?

চোখ তুলে তাকায় অখিল।

—তার চেয়ে বরং সবার নামের আদ্যক্ষর দিয়ে নাম বানিয়ে ফ্যালো। সকলেই খুশি হবে।

গুমোট ভাব কাটিযে অখিলও হেসে ফেলে।

—বানাও দেখি। প্রথম বাড়ি মিত্তির কাকুদের। তারপর ছানুদের। তাবপর হল গিযে রিতু মাসির। তারপর রণজয়। তার পাশেই ছুটকিদের....

ততক্ষণে ছেলের এসে দাঁড়িয়েছে। বাবা-মায়ের নাম বানানোর খেলায় সেও মজা পেয়ে গেছে। অঙ্ক চুলোয়। একটা করে নাম বলে, পরক্ষণেই খেয়াল হয—

—দূর, ভুল হয়ে গেল। মাখন কাকিমার নাম বাদ গেছে।

দু'জনের মধ্যেও মতের মিল-অমিল ভুল-ত্রুটি এই-সেই করে শেষ পর্যন্ত ইমলিই ইতি টানে—

—এবার যেটা আসছে, সেটাই লাস্ট কিন্তু।

—বলে ফ্যালো।

—মিছরির ছুবি মাখন সুন্দরি চুলকানি ববকানি জ্ঞানদাবাহিনী রোড।

অখিলের মুখে কোনো শব্দ আসে না।

গোলদারের গোলমেলে আবহবার্তা....
সন্ধ্যায় বজ্র গর্ভ মেঘের সঞ্চার এবং প্রবল বেগে.... ঝড় ও বৃষ্টিপাত!!
কোথায় মেঘ? কোথায় বৃষ্টি!!

কার্টুন : অরুণ সেন

সমাজ দুঃসংবাদ

ফজল আলির ফাজলামি

ল্যাং একটা বিদ্যে। বাস্তুঘুঘুর বিদ্যে। শয়তানের টোলে এ বিদ্যের পাঠ নিতে হয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ—সবই এ বিদ্যের অঙ্গ। এ বিদ্যে জানা না থাকলে আপনাকে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে।

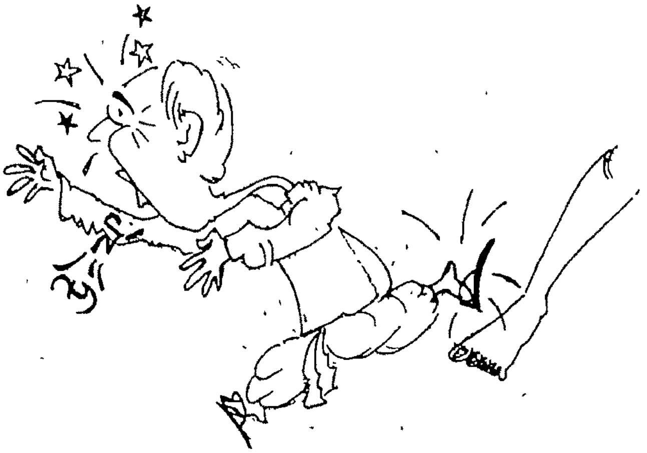

ল্যাং মারা

পা তোলা আর পা ফেলা, এই নিয়েই পথ চলা। ল্যাং খাওয়া আর ল্যাং মারা, এই নিয়েই জীবন। একটু বেসামাল হয়েছেন কি, ল্যাং খেয়েছেন। বুকে জ্বালা, মুখ শুকনো, চোখে জল। অন্যদিকে কায়দা মাফিক যদি বিপক্ষকে ল্যাং মারতে পারেন তাহলে জীবনযুদ্ধে আপনি এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। আপনি বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান এবং সম্মানিত। আপনার প্রতিষ্ঠা অবধারিত। বলিহারি আপনার সাহস, মারকাটারি আপনার প্যাঁচ, অব্যর্থ আপনার লক্ষ্য। আপনাকে সালাম।

পাশের বাড়িটা এই সেদিনও একতলা ছিল। বছর না ফুরোতেই তিনতলা হয়ে গেল। ঝাঁ চক্‌চকে মার্বেল পাথরের প্রাসাদ। লোকে হাঁ করে দ্যাখে। আপনার গিন্নির মুখ ভার। উঠতেবসতে খোঁটা দেন। প্রতিবেশির বড়লোকিয়ানা দেখতে কারই বা ভালো লাগে? গা-পিত্তি জ্বলে ওঠাই তো স্বাভাবিক। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে একখানা চিঠি ঝাড়ুন। তাতে ইনিয়ে বিনিয়ে সাত-সতেরো কথা লিখুন। দেখুন না কী অবস্থা হয়। ল্যাং মারুন, ল্যাং।

সহকর্মীর প্রমোশনটা পেকে এলো বলে। দম্ভে মাটিতে পা পড়ে না। ধরাকে সরা জ্ঞান করে চলেছে। যে কোনো একটা ছলছুতোয় প্রমোশনটা আটকে দিন। উড়ো চিঠি, উড়ো ফোন, হুইস্‌পার ক্যাম্পেন—এসবের সাহায্য নিন। পার্টির প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী নেতাকে কব্জা করুন। বিষিয়ে দিন। দেখুন বাছাধনের কী অবস্থা হয়! ল্যাং মারুন।

আপনি ডাক্তার। নামডাকও যথেষ্ট। কিন্তু হলে কি হয়, দু-একজন জুনিয়র বড্ড তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসছে। ওদের পশার বাড়া মানেই আপনার প্রেসার বাড়া। না, না চোখের সামনে এসব দেখা যায় নাকি! সকাল সকাল সাবধান হোন। বেয়াবি সহ্য করবেন না। ওদের চেম্বারে রোগী সাজিয়ে জনাকতক মস্তানকে পাঠিয়ে দিন। ভাঙচুর চালান। রিমোট কন্ট্রোলে সমস্ত অপারেশানটা নিয়ন্ত্রণ করুন। কাট টু সাইজ, কাট টু সাইজ। ল্যাং মারুন। যতদিন বেঁচেবর্তে থাকবেন, কাকেও ধারেকাছে এগোতে দেবেন না। হিম্মৎ দেখিয়ে দিন।

আপনি প্রমোটার। মাস গেলে দশ-বিশ লাখ টাকা হেসেখেলে পকেটে আসে। রমরমিয়ে চলছে ব্যবসা। সহ্য হচ্ছে না অন্যদের। আপনার এলাকায় নাক গলানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। নাকে ঝামা ঘষে দিন। আপনি যে সব লোকাল গার্জেনকে নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে থাকেন তাদের একটু উসকে দিন। দিশি বিলিতি বোতলের বন্দোবস্ত করুন। শত্রুপক্ষের দু-একটা লাশ ফেলে দিতে বলতেও দ্বিধা করবেন না। জিততে চান তো ল্যাং মারুন।

আপনি অধ্যাপক। আপনার বাক-চাতুর্যে ছাত্র-ছাত্রীরা মুগ্ধ। পরীক্ষা পাশের অন্ধিসন্ধি আপনার খুব ভালো জানা। আপনার কাছে তাই টিউশন পড়তে পেলে ছাত্রছাত্রীরা কৃতার্থ হয়ে যায়। সকাল-বিকেল আপনার বারান্দায় কত যে চটি কত যে জুতো শোভা পায় তা বলার নয়। মাসান্তে দক্ষিণাটাও কম আসে না। সহকর্মীদের মনে আপনাকে নিয়ে তাই ঈর্ষার অন্ত নেই। আভাসে ইঙ্গিতে কিংবা ধ্বনিময় টিপ্পনীতে মাঝে-মধ্যে তা প্রকাশও পায়। ভয় পাবেন না, মা লক্ষ্মীকে অবহেলা করবেন না। ঝাঁপ বন্ধ হতে দেবেন না। বিশ্বস্ত দু-পাঁচটি ছাত্রছাত্রীকে বেছে নিন। সহকর্মীদের পেছনে লেলিয়ে দিন। তাদের নামে কুৎসা রটাতে থাকুন। সম্ভব হলে ছাত্রী ঘটিত স্ক্যান্ডালে জড়িয়ে ফেলুন। মানসিক চাপের মধ্যে রাখুন। দেখবেন সব ট্যাঁ ফুঁ বন্ধ হয়ে যাবে। স্রেফ ল্যাং মারুন।

আপনি নেতা। আপনার চারপাশে চামচা বাহিনী। আপনি শুধু রাজনীতি করেন না, রাজনীতি নিয়ে স্বপ্নও দেখেন। কিন্তু আপনার ডাইনে-বাঁয়ে শত্রু। আপনি ডাইনের শত্রুদের দিয়ে বাঁয়ের শত্রুদের বিষদাঁত ভাঙুন, বাঁয়ের শত্রুদের দিয়ে ডাইনের শত্রুদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলুন। চামচাদেরও বিশ্বাস নেই। কাকেও বেশি প্রমিনেন্ট হতে দেবেন না। প্রমিনেন্ট কেউ হয়ে উঠছে দেখলেই তার সম্পর্কে দলবিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ আনুন। দল থেকে বিতাড়িত করুন। অর্থাৎ ল্যাং মারুন।

ল্যাং একটা বিদ্যে। বাস্তুঘুঘুর বিদ্যে। শয়তানের টোলে এ বিদ্যের পাঠ নিতে হয়। মারণ, উচাটন, বশীকরণ—সবই এ বিদ্যের অঙ্গ। এ বিদ্যে জানা না থাকলে আপনাকে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। শুধু শুধু মার খাবেন কেন? ঘুরে দাঁড়ান। রুখে দাঁড়ান। ল্যাং মারার টেকনোলজি আয়ত্ত করুন। ফজল আলির আদাব রইল। মোনাজাতও!

—ফজল আলি

'দেশ' নাকি দেশপ্রেমের ছবি। দেশপ্রেম বলতে রাজা সেন কী বোঝেন তা জানা গেল না, তবে কী বোঝেন না তা জানা গেছে এই ছবি থেকে।

চলচ্চিত্র দুঃসংবাদ

রাজার পাপে দেশ নষ্ট

সুন্দর অভিনয়ে ঋদ্ধ চলৎ (-শক্তিহীন) চিত্র

বাংলা চলচ্চিত্র দেখার মতো নেই আর, একথা শুনেছি বহু বার। কিছুকাল আগে একটি বাংলা ছবি দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার। ছবিটির নাম 'দামু'। শুনেছিলাম ছোটদের বই। দেখতে গিয়ে বুঝলাম এমন ছবি দেখে ছেলেরাও ভুলবে না। বড়রা ভুলতে পারে, বাপের নাম। হাতি দেখালেই যদি ছবি করা যেত তাহলে লোকে হাতি দেখতে চিড়িয়াখানায় আর যেত না। ছবিতে কোন কোন জায়গায় সত্যজিৎ রায়ের অবিকল ছাপ পড়েছে দেখেই উঠে আসা উচিত ছিল আমার, তবু বসেছিলাম এই ভেবে যে, দেখি পরিচালকের মনের মধ্যে কী আছে। যা দেখলাম সে আর কহতব্য নয়, খালি দুঃখ হল এই ভেবে যে এ ছবিও ফিনান্সিয়ার পায়।

আসলে, সমাজে এখন মিডিওক্রিটির জয়জয়কার। অ্যাভারেজই এখন নর্মাল। রাজা সেনের হালের ছবি 'দেশ' দেখে বাংলা সিনেমার বেহাল অবস্থাটা চোখে পড়বে। এত সাধারণ, এত অর্ডিনারি, এত আন ইমাজিনেটিভ চলচ্চিত্র বহুকাল হয়নি। পরিচালক ছবিটিকে অ্যাকশন-ড্রামা করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য এতে মোটর সাইকেল্ আরোহীকে গুলি করে মারা আছে, আছে টেররিস্ট মার্কা Bomblast, আছে হেলিকপ্টার থেকে চোরাই মাল ফেলা। সবগুলোই হয়েছে হাস্যকর। বাজার থেকে আনা হয় যে সবজি, পাতে দেবার আগে তাঁকে রাঁধতে পারে যে, সে-ই হল রাঁধুনি। গল্প লেখা হয় যে ভাবে, তাকে ছবিতে বাঁধতে পারে যে সে-ই হল রাঁধুনি। রান্নায় নুন কম হলে বা ঝাল বেশি হলে খাবার যেমন বিস্বাদ হয়, ছবিতেও সেই মাত্রাজ্ঞান না থাকলে ছবি হয় জলছবি। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

রাজা সেন জানিয়েছেন, তাঁকে নাকি কেউ ভয় দেখিয়ে বলেছে, ছবি তুলে নিন হাউস থেকে। এই খবরটা ছবিকে হাউসফুল করাবার জন্য একটা ফুলিশ ট্রিক কিনা জানি না, তবে যদি কেউ এ ছবি বন্ধ করতে বলে থাকে, তবে সে চলচ্চিত্রের জন্য আশংকা থেকেই বলেছে এমন কথা। এমন ছবি যে চলতে দেওয়া উচিত নয়, তার কারণ এ ছবি চলচ্চিত্রই হয়নি। অথচ তাকে ওভাররেট করা হচ্ছে—এতে বাংলা ছবির ক্ষতিই হবে। লোকে বুঝবেই না ভালো ছবি কেমন হয়। এমন ছবিকে ভালো বললে লোকে ধাঁধায় পড়বে এবং মুখ ফিরিয়ে নেবে হাউস থেকে। দর্শক চলে গেলে ভালো ছবি তোলার লোক আসবে কেন?

'দেশ' নাকি দেশপ্রেমের ছবি। দেশপ্রেম বলতে রাজা সেন কী বোঝেন তা জানা গেল না, তবে কী বোঝেন না তা জানা গেছে এই ছবি থেকে। শুধু অ্যাকশন থ্রিলার তোলার কায়দায় ছবি তুললে তা শুধু গ্যাংস্টারিজমের কাহিনী হয়, দেশের প্রতি অনুভব জাগিয়ে তোলার আদর্শ হয় না। এই সোজা কথাটা যদি তিনি না বোঝেন তবে দিনের পর দিন এইরকম ছবি-ই তিনি করে যাবেন— এইটাই তাঁর কাছে সহজ। মনে রাখতে হবে, খারাপ ছবি যে কোনো রকমেই তোলা যায়,— ভালো ছবি তোলা সত্যিই শক্ত।

অ্যাকশন সিকোয়েন্সের জন্য হেলিকপ্টার ওড়ানোর কথা বলেছি। দৃশ্যটা দেখে আমার কপ্টারটাকেই উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল, বোমা মেরে। কপ্টারটা কী করবে, কী, করতে চাইছে তা বোঝাই যাচ্ছে না— কেবল এক জার্নালিস্ট তার মোটরবাইকে চেপে ঐ কপ্টারকে ধাওয়া করতে চাইছে। ঐ সময়ে সব্যসাচী চক্রবর্তীর লাফঝাঁপের ছেলেমানুষী দেখে মনে হচ্ছিল ঐ কপ্টার থেকেই গুলি করে কেউ তাকে নিকেশ করে দিক। দর্শকের আসনে বসে তো পর্দায় গুলি চালিয়ে লাভ হবে না। তাহলে তাই করতাম।

এ ছবিতে এমন সর্বাঙ্গ অসুন্দর অভিনয় স্মরণকালে দেখা যায়নি। প্রত্যেকেই নিষ্ঠাভরে খারাপ অভিনয় করেছেন। জয়া বচ্চন থেকে অভিষেক বচ্চন, সব্যসাচী চক্রবর্তী থেকে নয়না দাশ, শুভেন্দু চ্যাটার্জি এবং অন্যান্য সবাই যে অভিনয়ের নমুনা দেখিয়েছেন, এরপরে এঁদের স্ক্রীন-টেস্ট না দিয়ে কাজ পাওয়া অসম্ভব হবে।

কিংবা, এইটাই হয়ত অ্যাভারেজ অভিনয়ের নমুনা। অ্যাভারেজ অর্থে নর্মাল। তাহলে এ ছবির পুরস্কার পাওয়াই বা আটকাচ্ছে কে? সেইটাই তো নর্মাল।

তবে এ ছবি দেখে সবচেয়ে শক্‌ড হবেন কাহিনীকার। তাঁর কাহিনীর এমন বিকৃত রূপে বিক্রীত হওয়া দেখে তিনি কি প্রফুল্ল হতে পারবেন? তাঁর নিজের রায় কী ছিল জানতে ইচ্ছে হয়।

বাংলা চলচ্চিত্রে গুণহীনতার সংকট চলছে। সংকট কাটাবার জন্য বাংলা ছবিতে বোম্বাই মশালা চালু হয়েছে অনেকদিন। তাও জমেনি বলেই পুর'না হয়ে এল। এবারে রাজা সেনের এই ইন্‌সেন প্রচেষ্টা AXN চ্যানেলের অনুকরণে অ্যাকশন ফিল্ম—এর রিয়্যাকশনে কেবল ছবির প্রতি শ্রদ্ধা চলে যাচ্ছে তা-ই নয়, ছবির জগতে শ্রদ্ধাহীন কুশীলবদের ভিড় জমছে। দর্শক পড়ছে ধোঁকায়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এইসব পরিচালক—তিনি যত পুরস্কারই পেয়ে থাকুন না কেন, কোনোদিনই কোনো Adult ছবি করতে পারলেন না। যা পারলেন তা হল Adulterated। 'দামু'র মতো ছবি ছোটদের নিরাশ করেছে, যদি তারাই ছবি তুলত এর চেয়ে অক্ষম হত না সেটা।

তবে এ সব ছবি প্রধান যে সমস্যা তৈরি করছে তা হল ভালো দর্শকের অবলুপ্তি। অশ্বত্থামা থেকে অশ্বতর, প্রত্যেকেই দুধের অভাবে খাচ্ছে পিটুলি গোলা। সেজন্য এদের উপরে পিটুনি কর বসাবে কেউ? ভালো ছবির জন্য ভালো দর্শক চাই। তা সৃষ্টি হয় ক্রমাগত ভালো ছবি তৈরি করে। আবার ক্রমাগত খারাপ ছবি তৈরি হলে দর্শকের রুচিও খারাপ হতে বাধ্য।

এমন অবস্থাকে 'বিপদ' না বলে 'আপদ' বলা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা পরীক্ষা নিয়েছিল একবার এক ইংরেজ রাজপুরুষ। আপড্ এবং বিপডের তফাৎ জানতে চেয়েছিল সে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, নদীতে ঝড় উঠলে নৌকায় যা

হয় তার নাম বিপদ, আর এই যে তাঁকে এক ইংরেজের কাছে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এইটা হল আপদ।

বাংলা চলচ্চিত্রের বিপদ ঘনিযেছে তখনই, যখন এই সব আপদ এসে জুটেছে।

—পিনাকী ভাদুড়ী

দেবদাস

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত বিখ্যাত, সর্বাধিক বিক্রীত এবং সর্বদা বিকৃত কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বসিয়া বসিয়া দেবদাস উপন্যাসটি বচনা করিয়াছিলেন। আমাদের বড় উপকারটি কবিযাছিলেন; না হইলে আজ চতুঃষ্পার্শ্বে যাহাদের দেখিতেছি তাহাদের একটি নামে সম্বোধন করিতে পারিতাম; কী ভাবে?

সেই দেবদাস মুখোপাধ্যাযেব জন্মের পূর্বেই বঙ্গদেশেব এক্কেবারে সর্ব অঙ্গে দেবদাসের ছড়াছড়ি যাইতেছিল। সেই দেবদাসকুল হাঁড়ি হাঁড়ি, বোতল কে বোতল, পিপের পর পিপে মদ নিজেদেব পেটে ঢালিতে ঢালিতে চর বানাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সাধেব জমিদাবিব বাবুগিরি উধাস্ত হইবার পর একালে তাঁহারা ঘটি, বাটি, বংশ ধুইয়া নির্বংশ হইযাও মদ্যপান অব্যাহত রাখিয়াছেন।

বাঙালি মানে তো তাঁহারাই, যাঁহারা শুধু ভাবিবেন এবং অতঃপর ভাবিবেন। ভাবিযা ভাবিয়া কুলকিনারা পাইবেন না, হাঁপাইয়া উঠিবেন। একবার চিৎ হইয়া শুইবেন পরক্ষণে উপুড় হইয়া পড়িবেন অথচ এত ভাবনার হেতু এবং সমাধান কোনোটাই খুঁজিযা পাইবেন না। বক্তৃতায় এবং প্রবন্ধে আদর্শের বান ডাকিয়া আনিবেন অথচ নিজ কর্মক্ষেত্রে আদর্শ বিচ্যুত হইতে সময লইবেন না। শিক্ষা হইতে সমাজ, অর্থনীতি হইতে বিজ্ঞান-গবেষণা, রাজনীতি হইতে দর্শন—সবেতেই তাঁহাবা উচ্চ ভাব পোষণ করিয়া চলিবেন, তা সত্ত্বেও সর্বক্ষেত্রে জাতীয় কি আন্তর্জাতীয় পর্যাযে (স্তবে) পিছাইয়া চলিবেন। ক্রীড়া জগতে নিজ ভূমিতে সাফল্যের বন্যা দেখাইবেন আব বিদেশে সব হাবাইয়া মুখ চুপসাইয়া ফিরিয়া আসিবেন। আহা তাহাদেব আর কি দোষ? উঠানটাই যে বাঁকা ছিল!

ইহারাই তো দুঃখের কল্পনায সুখ তাড়াইয়া ভূত ডাকিয়া আনিবেন। নিজ নিজ পার্বতীদের ঠেলিয়া পালাইয়া দুভার্গ্যের গীতবাদ্য শুনাইবেন। তাঁহারা সর্বদাই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন। ভাবনাই তাঁহাদেব কর্ম; কর্মই ধর্ম নয়।

এই সকল মনিষ্যের উদাহরণ দিতে বসিলে ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। তবে আপনাদের ঠকাইয়া যাইব; নাকের বদলে নরুণ দিব, তাহা কখনোই নহে।। এবার শুনুন।

জ্যোতিবাবুর (মাপ করিবেন 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ (অতীত)' লেখা হয় নাই) বিগলিত জ্যোতি আজন্ম দেখিয়া পুলকিত হইলাম। অথচ গত শতাব্দীর তথা সহস্রাব্দের শেষ লোকসভা নির্বাচনে সারা দেশ যখন তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীব গদিতে উঠাইয়া বসাইতে গেল, তখনই।। ঐ বাঙালি, পার্টির, দলের, সমষ্টির সিদ্ধান্ত মাথা পাতিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি? তিনিও যে বাঙালি। দেবদাস। এর পর বড় আশায় বুক বাঁধিযা দিদিব মুখপানে চাহিয়া রেল-লাইনের ধাবে বসিয়া রহিলাম। তিনি অটলকে পিতৃ সম্বোধনে টলাইয়া বড় সাধের বেল সিংহাসনটিতে আরোহণ কবিয়া ছিলেন। সিংহাসন নহে, দিদির প্রিয ঘাস-ফুল, অতএব সব ত্যাজিযা ফিরিয়া আসিলেন 'শ্রীমতি দেবদাস' সাজিযা। বাঙালি গাযক মুম্বাই পাড়ি দিয়া শানু কুমার সাজিযা জমাইতে শুরু কবিয়াছিলেন—কিন্তু ঐ বাঙালি! নিজস্ত্রীর হাত ছাড়িযা নিজেকে পরস্ত্রীর হাতে সমর্পণ কবিযা দেবদাস হইলেন। সুমন একই ভাবে ঘর, বউ ছাড়িয়া গীটাব হাতে কবীর হইযা গেলেন। সৌবভ এত একদিবসীয় ম্যাচ জিতিলেন আব বিদেশে টেস্ট সিরিজ আসিলেই—মাথা নোয়াইয়া দেবদাস হইলেন। লিয়েণ্ডার কোন দুঃখে এই বঙ্গে জন্মাইতে গেলেন, নচেৎ তাঁহাকে ঐ ভূতে ধরিত না। উফ .... বাবা! কতই না দেবদাস, বাকি যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদেব আপনারা খুঁজিয়া লউন।

যে দেবদাসের নিমিত্তে এত জনের নাম উল্লেখ তিনি আর কেউ নন সঞ্জয় লীলা বানসালির নির্মিত দেবদাস। সঞ্জয় পঞ্চাশ কোটি কালো টাকা ঢালিযা এ ছবি নির্মাণ কবিয়াছেন, আর তাহাতে তাল সোনাপুরের ছোটছেলের ভূমিকায় দেশের সবচাইতে বাণিজ্যিক সফল এবং দামি অভিনেতা। আর তাঁহাকে দেখিযাই আ-সমুদ্র হিমাচলে রে-রে পড়িল। দেশের বাজারে ছবির পর্দা উঠিবার আগেই চন্দ্রমুখী তাঁহার চাঁদমুখ বিদেশী চলচ্চিত্র উৎসবে দেখাইয়া আসিলেন। আব যাইবে কোথায, ছবির দাম দেখো হু হু করিযা আকাশে পৌছাইয়া গিয়াছে। আর এ সময়েই অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। এ বঙ্গে, দেবদাসের বন্ধভূমি, আবেকবার নির্মিত হইল নব দেবদাস। পশ্চিমি বাণিজ্যের ঠেলায পড়িযা ফ্যা ফ্যা করিতে লাগিল প্রসেনজিৎ অভিনীত দেবদাস। তিনি ভাবিতে পারিতেন এ ছবিতে তাঁহাব অবতারণার কী প্রয়োজন ছিল? আমরা তো সকলেই জানিয়াছি উনি তাহাই বটে। তবে দেবদাস দেখিয়া মনে হইতে পারে বুঝি বা সঞ্জযেব ছবিটিরই বাংলা অনুকরণ বা সংস্করণ নির্মিত হইল।

হায়, এখনও ট্র্যাজেডি দেবদাসেব পিছন ছাড়িল না। দেবদাস, আজ তুমি বাঙালির গায়ে লেপ্টিযা যাওয়া চিবস্থায়ী লেবেল। অকৃতকার্য, প্রত্যয়হীন, নিশ্চেষ্ট, ভাগ্যের হাতে সমর্পিত বাঙালিব আজ একটিই সমার্থক শব্দ দে. .ব...দা...স।।

—নরুণ নাক

জবর খবর

ক্যামেরা দারি

খেলাধুলার যে কোনো একটা মোচ্ছব লাগলেই মহাকরণ বা অন্যান্য অফিস-কাছারির বাবুদের কাছে তাঁদের টেবিলে পড়ে থাকা মান্ধাতার আমলের ফাইল-পত্তরগুলোর ধুলোয় জমা পড়ে থাকার দারুণ অজুহাত তৈরি হয়। বিশ্বকাপ ফুটবল কি ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেটই হোক না কেন—বাবুরা তখন ক্যান্টিনরুম ক্লাবঘরের জানলার সামনে, শোরুমের দিকে, নিদেন পক্ষে শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনের টি. ভি সেটের দিকে মুরগির মতো ঘাড় উঁচু করে অগস্ত্য মুনির ইচ্ছাতে স্ট্যাচু-হয়ে থাকা বিন্ধ্যপর্বতের মতো ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বুড়ো প্রাইমারি মাস্টার মশাইয়ের ১০ বছরের পেনশন আটকে থাকল কিনা, হাইওয়ে মেরামতির কাজ শেষ হল কিনা, হাসপাতালে কোনো হতদরিদ্র বেড পেলেন কি পেলেন না—ওসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসের থেকে তখন বাবুদের কাছে বেশি দরকার শচীনের আরো একটা 'সিক্সার', কুম্বলের আর একটা গুগ্লি বল, অথবা জিনেদিন জিদানের একটা থ্রু পাস। স্পোর্টস কালচার-এর কাছে তখন-ওয়ার্ক কালচার-এর সহজপাঠ একদমই ফালতু। তবে এবারের বিশ্বকাপে মাল্টা রাষ্ট্রের রাজধানী ভ্যালেট্টায় পেয়ারের টিম—ক্রিস্তিয়ান ভিয়েরি বা দেল পিয়েরো-র ইতালি এবং আওয়েন বেকহ্যাম-এর ইংল্যান্ডের হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ দেখতে গিয়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজরদারিতে পড়তে চাননি সেখানকার অফিসের বাবুরাই। ক্যামেরা দেখামাত্রই টি ভি-র পর্দাতে যদি ধরা পড়ে, বাবুরা সব অফিস পালিয়ে বিশ্বকাপ দেখছিলেন, তাহলে আর বড় সাহেবের কল্যাণে তাঁদের কারোর ঘরের হাঁড়ি আর চড়বে না।

বে-জন্মার টিকিট

একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি যে আজকাল বাচ্চা জন্মানোর আগেই সেটি মিস্ না মাস্টার—তার পরীক্ষা হয়ে যায়, উপরন্তু সাত-তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে নামি অনামি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য হবু বাবারা রাত জেগে লাইন দিয়ে নানা স্কুল থেকে অ্যাডমিশন ফর্মও তুলে ফেলেন। ভাবখানা তাঁদের এমনই—অষ্টাবক্র ঋষি যেভাবে মা সুজাতার গর্ভে থাকার সময় পিতামহদের বলে যাওয়া সমস্ত শ্লোক একেবারে ঠোঁটস্থ করে ফেলেছিলেন, তাঁদের এইসব বে-জন্মা বাচ্চারাও ডেলিভারি হওয়ার পরই এসে লেখা, ইংরেজিতে কথা বলা, রুল অব্ থ্রি সমাধান লিখে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেবে। তবে এখনও মায়ের পেটে থাকা বাচ্চাকে নিয়ে নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে ফিফা বিশ্বকাপ দেখা, এবং কাজকম্মে ফাঁকি মারা নিরাপত্তা কর্মীদের। বিশ্বকাপে জাপানের সাপ্পোরো স্টেডিয়ামে নামডাক করা সৌদি আরবের গোলরক্ষক, আল দাইয়া-র বগলের তলা দিয়ে আট আটটা গোল দিয়ে দিল জার্মানি। সেই স্টেডিয়ামে আটমাসের বাচ্চাকে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়ে ঢুকতেই পারলেন না এক দম্পতি। হাঁড়ির খবরটি হল এই—স্বামী-স্ত্রী বিশ্বকাপ দেখার জন্য দুটো টিকিট কেটেছিলেন। স্ত্রী-টি বাপের জন্মেও ভাবতে পারেননি যে বিশ্বকাপ শুরুর আট মাস আগেই তিনি মা হবেন। বলা বাহুল্য, সাপ্পোরো স্টেডিয়ামে ঢোকার মুখে তাঁদের কাছে শিশুসন্তানের জন্য টিকিটের টিকিটিও দেখতে পাওয়া যায় নি।

গেছো প্রপিতামহের ছেরাদ্দ

বিবর্তনবাদের নাছোড়বান্দা মাস্টারমশাই, দেড়েল চার্লস ডারউইন সাহেব আজ বেঁচে থাকলে, তাঁকে 'উন্মাদ' আর 'বাঁদর প্রিয়' বলে খ্যাপানো ধর্মবাগীশদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিশ্চয়ই নাচানাচি করতেন। থাইল্যান্ডের লোবপুরী শহরে সা কিউ চিড়িয়াখানার অতি আদরের এবং নিপাট ভদ্রলোক 'গেছোবাবা' ওরাং ওটান, বছর সতেরো-র মাইক-এর শ্রাদ্ধশান্তি বেশ ঘটা করেই করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এলাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা, মাইক-এর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত আত্মার শান্তি কামনাতে যেভাবে প্রার্থনা করেছেন আর মাইক-এর মাথাতে শান্তির জল ছিটিয়েছেন, হিঁদুদের বাপ-ঠাকুর্দা গতায়ু হলেও বোধহয় অতটা তদ্বির-তদারক করে আত্মাকে কেউ ফেয়ার ওয়েল জানানোর দরকার মনে করেন না। মাইক-এর মূর্তিও বসানো হয়েছে চিড়িয়াখানার কাছে। মাইক-এর আদরের বৌ সুসু এবং তাদের খোকা লানিয়াইকে শোক জানানোর কালো কাপড় পরিয়ে ওই সাম্মানীয় প্রপিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে হাজিরও করা হয়েছিল। আমাদের বাঁদুরে পূর্বপুরুষরা যে অন্তত বর্তমানের উচ্ছন্নে যাওয়া দোপেয়ে বংশধরদের থেকে আচার-ব্যবহারে শতগুণে ভালো, সেটাই দেখাতে চেয়েছিলেন ব্যবসায়ী ইয়ং ইউট কিট্ওয়াতানানুসন, মাইক-কে যিনি চিড়িয়াখানাতে নিয়ে এসেছিলেন।

অতিথি-অভ্যাগ্যতদেব ডেকে ১৯৯৬ সালে সুসু-র সাথে মাইক-এর বিয়েও দিযেছিলেন তিনি। জুঁইফুলেব মালা পরিয়ে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওযার নয। তাই মাইক-এর চাবজন দোপেযে দম্পতিরও শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হযেছিল।

ইঁদুর সর্বস্ব

এই ধরাধামের সবচেয়ে বড় বুদ্ধির টেঁকিটার অবিসংবাদিত ড্রাইভার হিসেবে গর্ব করে আসা বিধাতা নামক ভদ্দরলোকেব স 'ষ্ঠ 'সৃষ্টি' মানবজাতির দেমাকে বুক বাজানোব জামানা বোধহয় এবাব ফুরিয়ে যেতে বসেছে। না ফুবোনোর জো আছে কি? মার্কিন মুলুকের জিন আর ক্রোমোজোমের চোদ্দগুষ্টির ঠিকুজি-কুষ্ঠি তৈরি করাব ইশ্কুল, সেলেরা জেনোমিক্স্ এর গবেষক ডাঃ রিচার্ড ম্যুরাল এবং তাঁর সঙ্গী বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, চোখে আঙুল দিযে দেখিয়ে দিয়েছেন—মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ, আগমার্কা, দো-পেযে জিন বা ক্রোমোজোম বিন্দুমাত্র নেই বললেই চলে। শিম্পাঞ্জি বা গরিলার জাতভাইও নাকি নই আমবা। আসলে আমাদের দেহের ৯৮ শতাংশ জিনই ধেড়ে আর নেংটি ইঁদুরের জিনের মতোই একরকম। সংখ্যাটা শিম্পাঞ্জি বা বীর রামভক্ত হনুমানেব দেহেব ক্রোমোজোমের থেকেও বেশি।

মার্কিন বিজ্ঞানীর এই মূষিক-প্রধান গবেষণা, মানুষের আচার-বিচারকে নতুন করে মাপজোক কবতে শেখাবে বলে মাথার দিব্যি দিযেছেন অনেকেই। হাড়ে, হাড়ে এবার মালুম হচ্ছে, বউয়ের হাতে ঝাঁটার আদর এড়াবার জন্য বীরপুরুষ কর্তারা কেন ইঁদুরের মতো খাটের তলায় গিয়ে সেঁধোন। কেনই বা অতিসাহসী রোমিও-মজনুরা ইঁদুরের মতো নর্দমাব পেছনে, লোডশেডিং-এর আবডালে কালভার্টের পিছনে অথবা বাড়ির ফাটা জলের পাইপ-এর পিছনদিকে তাদের প্রেয়সীর সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। ভাগ্যিস, খবরটা আগেভাগে পাওযা গেছে। এবার থেকে রেগে গিযে কোনো মানুষ আর কাউকে কামড়ালে টেট ভ্যাক্ বা অন্য কোনো প্রতিষেধক নেওয়ার দরকার নেই। প্লেগ বোগ ঠেকানোর টিকে নিলেই হবে। গণেশ বাবাজির বাহন আমাদের জাতভাই। তার একটা সম্মান নেই নাকি।

ট্যারা চোখে

আনন্দ সংবাদ

বাংলা দৈনিক জগতে আনন্দবাজাব নিত্যনতুন আনন্দ বিতরণ কবেই চলেছেন। এটাই তাঁদের কাজ কিনা। সম্প্রতি তাঁবা জনৈক পাকিস্তানি পাবভেজ হুদভযকে অকুতোভযে আবিষ্কার করেছেন, যিনি নাকি পবমানুবিজ্ঞানী; অতএব 'প্রকৃত জ্ঞানী', তাই তিনি জানেন, পবমানু যুদ্ধেব কী ভযঙ্কর পবিণাম হতে পারে, আর শুধুমাত্র সেই কারণেই তিনি পরমাণু যুদ্ধের বিরোধী এবং পবমানু যুদ্ধের বিকদ্ধে প্রচাব কবে থাকেন। কী আনন্দের কথা, সারা দুনিয়া টুঁড়ে তেনারা একজনকে অন্তত খুঁজে পেযেছেন, যিনি পবমানু যুদ্ধ বিবোধী।

পরমানু বোমার আঘাতে যে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও সেই অভিশাপ বহন করতে হয, এতদিনে একজন বুঝেছেন, যেহেতু তিনি পরমানু বিজ্ঞানী। ভাগ্যিস। অন্যেবা বিজ্ঞানী নন বলেই হিরোশিমা নাগাসাকি কাণ্ডের অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরেও পরমানু বোমাব ভযংকরতা বুঝতে পারেন নি। এবং পরমানু বিজ্ঞানী নন বলেই পরমানু শক্তিধর দেশগুলির বাষ্ট্রপ্রধান ও সামবিক প্রধানগণ হয়ত বা কথায় কথায পবমানু বোমা মুড়ি মুড়কিব মতো ছুঁড়ে চলেছেন, যে খবর জ্ঞানী হুদভয ও তাঁব আবিষ্কারকবা রাখলে বাখতেও পাবেন। বলা যায় না, এ খবর রাখবাব যোগ্য হতে গেলেও পবমানু বিজ্ঞানী হতে হয।

এর পব কোনদিন এঁরা কোন ডেন্টিস্টকে আবিষ্কার করে ফেলবেন, যিনি প্রকৃত জ্ঞানী বলেই জানেন যে দাঁত না মাজলে মুখে দুর্গন্ধ হয় অথবা কোনো চেস্ট স্পেশালিস্ট যিনিই একমাত্র জানেন—ইচ্ছা মতন ঠাণ্ডা লাগালে নিমোনিয়া হতে পারে কিংবা কোনো কবি, একমাত্র যিনি জানেন, কবিতা শোনাতে গেলে অনেকেই পলাযন করেন ...

সেইসব বিস্ময়কর আবিষ্কারেব প্রতীক্ষায আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম। ততদিনে হুদভয় সাহেব আনন্দমযই বেযে, আশা করা যায অনেকদূর উঠতে পারবেন।

—সুচতুর গুপ্ত

তাই বলে পরমানু বোমা ব্যবহার
কোরো না যেন; সেটা মহাপাপ!

হেঁসেল

ঘোল দিয়া মাছের কারি

আর বলন্যান্ না। এ্যাদ্দিন তো আরাম করে আপনাদের রান্না খায়া ফুইল্যা উঠতেছি। এবার বাঁকুড়া জেলার একটা রান্না আপনাদের জন্য কইর‍্যাছি। ‘ঘোল’ নামটা শুইনা ঘাবড়াব্যান না য্যান্। যদিও একবার শুনছিলাম ‘ঘোল’ কি ভদ্রলোকে খায়? ঘোল খাওয়া অনেক রকমের আছে, যেমন—চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়া ঘোল খাওয়া, মহাজনের সুদের হিসাব মিলাতে গিয়া ঘোল খাওয়া, ট্রাফিক সার্জেন্টের পাল্লায় পড়ে ঘোল খাওয়া। এই ঘোল খাওয়া কিন্তু সেই ঘোল খাওয়া নয়। তাহলে কি আর পত্রপাঠ-এর মতন পত্রিকায় এরে আনা যাইত? তাহলে এখন রান্নাটা শুরু কর‍্যা দেই, কী বলেন?

যা কিছু লাগব্যা : ছুটু করে কাটা মাছ ৭৫০ গেরাম। খোলায় ভাজা লঙ্কাগুঁড়ো আধ চামচ, খোলায় ভাজা ধুনেগুঁড়ো আধ চামচ; খোলায় ভাজা মেথিগুঁড়ো আধ চামচ, হলুদগুঁড়ো পরিমাণ মতন, ছুটু পিঁয়াজ ৫টা, রসুন ১০ কুয়া, আদা ছুটু এক খাদি।

রাঁধার জন্য নারকোল ত্যাল ৪ (মাঝারি) দশন, চাকা করে কাটা পিঁযাজ ২ চামচ, কারিপাতা নুনু আন্দাজ মতন। নারকোল কোরা আধ কাপের কম, দইয়ের ঘোল বেশ মোটা ১ কাপ।

যে ভাবে কইরব্যা : লঙ্কাগুঁড়ো, ধুনেগুঁড়ো মেথিগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো, পিঁয়াজ, রসুন, আদা মশলাগুলি বেটে লিন এবং তার থেকে ইকটুখানি মশলা লিয়ে জলে গুলে মশলা জল বালান। লারকোল ত্যাল গরম করে পিঁযাজ ইকটু লাড়াচাড়া করে লিন এবং বাদামি হযে এলে ওতে বাটা মশলা মেশান। মশলা ভাল ভাজা হযে এলে তাতে আগে থেকে তৈরি করে রাখা মশলার জল মেশান এবং জল শুকিয়ে গেলে আন্দাজ মতন আরও জল মেশান। নুন ও কারিপাতা মিশান। ভাল করে ফুইটতে থাকলে মাছের খাদিগুলি ছেড়ে দিন। এবং ঢিমে আঁচে ফুটাতে থাকুন। কোরা নারকোল কুটে লিয়ে ঘোলের সঙ্গে মিশান এবং ঘোলে ভাল কর‍্যা মিশায়ে দিন। ইকটু পরেই লামিযে লিন। ঘোল মেশানোর পর ঘন ঝোল আর যেন ফোটানো না হয়। এরপব খাবার টেবিলের মাঝখানে রাখেন। উপস্থিত খাদ্যরসিক সকলের চোখ যাওয়া চাই। গপ্ গপ্ খাব্যা।

ভাজা মাছের কারি

যা কিছু লাগব্যা : মাঝারি মাছ ফালা ও খাদি করে কাটা আধ কেজি, লঙ্কার গুঁড়ো ২ চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো আধ চামচের কম, হলুদগুঁড়ো ইকটুখানি, লুন আন্দাজ মতন। ভাজা মাছের ত্যাল আধ চামচ। শুকনো লঙ্কা ৬টা, ধুনে ছুটু চামচের এক চামচ, সর্ষে আধ চামচের কম, মেথি ইকটুখানি। নারকোল কোরা আধ কাপের কম, লম্বা করে কাটা পিঁয়াজ ২ চামচ, লম্বা করে ফাড়া কাঁচা লঙ্কা ৩টা, খাদি করে কাটা বিলাতি এক কাপ, জল পরিমাণ মতন, লম্বা করে কুচানো আদা এক চামচ, রসুন ১০ কুয়া।

যে ভাবে কইরব্যা : লঙ্কার গুঁড়ো, গোল মরিচের গুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো এবং আন্দাজ মতন লুন মাছে মাখায়ে রাখেন। ইকটুখন পরে মাছের খাদিগুলা হালকা ভাবে ত্যাল থেকে ছেকে তুলে লেন। আধ চামচ ত্যাল গরম কবে তাতে শুকনো লঙ্কা, ধুনে, সর্ষে, মেথি হলুদের সঙ্গে বেটে লিন। তাতে লারকোল কোরাও কিন্তু বেটে লিতে হবেক। আধ কাপ ত্যাল গরম করে পিঁয়াজগুলান ভাজতে হবেক। কাঁচা লঙ্কা এবং বিলাতি দিয়ে ভাল করে ভাজতে হবেক। বাটা লারকোল মেশানোও বাদামি করে ভাজতে হবেক। এ্যার পর পরিমাণ মতন জল দিন এবং জল ফুইটলে মাছের খাদিগুলান দিন। আদা, রসুন, ও লুন দিযে আঁচে রান্না করেন। ঘন না হওয়া পর্যন্ত রাঁধেন, লামিয়ে লিয়ে এসিয়ে গেলে সকলে মিলে খাইতে থাকেন। তবে সাবধান, সেই দিন কিন্তু ভাতের চালটা ইকটু বেশি করেই লাগবেক, হঁ।

—মিঠু কারক

লাউ মুসুরি

কাঙ্গাল হইয়াই কইত্যাছি মশায়। আপনেগো ঘটিদের মদ্দি কুনো কিচ্ছু সহ্যি কইরবার ক্ষমতা একদমই নাই । হেই কয়দিন আগেও 'ব্যাজায় গরম পড়ছে' বইল্যা জিহ্বা আর চক্ষু উলটাইয়া পইড়্যা আছিলেন, আর গরমের আছিলায় আপিসে কামাই কইর‍্যা দিব্য ঘরে টি. ভি.-র সামনে থির হইয়্যা বইস্যা বিশ্‌শকাপ দেখিতে আছিলেন। হেইবার যেই বিষ্টি আইস্যা ছিষ্টি ভাসাইয়া দিলো, কলকেতাডারে যথারীতি কলতলা বানাইয়া দিলো, তহন আবার আপনেরা বরুণদেব আর হাওয়া আপিসের বাপান্ত করতি লাইগ্‌লেন। কুন্‌টায় যে আপনেরা খুশি হন, কাঙ্গালের বোঝন দায়। তবুও উপায় নাই। আপনের লগে রন্ধন পোণালী ল্যাখ্‌তে অইব। তাই হেইবার ভয়ে ভয়ে কিছু পোণালী লিইখ্যা দিলাম। গালমন্দ কইরবেন না য্যান্। তয়, বিষ্টির সময় পদগুলান খাতি মন্দ লাগবো নি। পেত্থমেই লাউ-মুসুরি।

কি কি লাইগ্‌বো : অ্যাক্ কাপ মতন মুসুর ডাল, মাঝারি আকারের একটা লাউ, দুইখান আলু, কুচ্যা কইর‍্যা কাটা পিঁয়াজ, পাঁচ কোয়া রসুন, দুই চা-চাম্‌চা আদা বাটা বাইখ্‌বেন, গোডা জিরা খানিকডা, কিছুডা বাটা গরম মশল্লা, ত্যাজপাতা খান কযেক, লবণ, হল্‌দি, সইরষ্যাব ত্যাল আপনেগো ইচ্ছামতন দিবেন।

রন্ধন পোণালী : লাউ আব আলু মাঝামাঝি মাপের কইর‍্যা কাইট্যা রাহেন। ডালডা আচ্ছা কইর‍্যা ধুইয্যা লন। হেইবাব পেশাব কুকারে ত্যাল গবম কইর‍্যা তাতে গবম মশলা, ত্যাজপাতা আর জিবে ফড়ন দ্যান্। পিঁযাজ কুচানোডা দিতি ভুলবেন না য্যান্। হেইবাব বাটা মশল্লায় ডাল, লাউ, আলু দিয়া কষতি থাকেন। লবণ আর হল্‌দি দিয়্যা দ্যান। হেইবাবডি আলু আর জল দিয়া আপনের মুখে, না না, কুকারের মুখে ঢাকনাটা দিয্যা দ্যান। তক্কে তক্কে থাহেন, কখন কুকারে দুইডা সিটি মারবো। সিটি মারলেই নামাইয্যা দ্যান। পীরিতির মতন লাউ মুসুবি বেশ মাখো-মাখো অইব। বাইরে ঝুপঝুপে বিষ্টি দ্যাখ্‌তি দ্যাখ্‌তি গপ্‌গপ্ কইর‍্যা প্যাটেব মদ্দি সেঁধাইয়া দ্যান।

চিংড়ি-ডাল

লাউ-চিংড়ি তো অনেকবারই খাইছেন। হেইবার চিংড়ি-ডালের পদটা বাইন্ধ্যা নিজে খান, হগ্গলকে খাওয়ান। লাউ-চিংড়ি রাইন্ধ্যাও এত সুখ পাইবেন নি কইয়্যা দিলাম, হঃ।

কি কি লাইগব : দুইশ গেরামের মতন মুসুর ডাল, এক বড়ো চা চাম্‌চা মতন হল্‌দি বাটা, ধনিযা বাটা, আর আদা বাটা মাঝারি চাম্‌চা এক চাম্‌চা, কুবানো নইবকল আধ মালা মতন, একটুখান বাইট্যাও লইবেন। পাকা তেঁতুল মাঝারি এক দলা (আগেই গিইল্যা ফ্যালবেন না য্যান্), ছোড আস্ত জিরা এক চাম্‌চা, ত্যাল পইন্‌চাস্ গেরাম, সোযাদ মতন লবণ আর চিনি।

রন্ধন পোণালী : হল্‌দি আর জল, লবণ দিয্যা সিদ্ধ করেন। ড্যাক্‌চিতে ত্যাল গরম কইর‍্যা জিরা আর কারিপাতা ফড়ন দ্যান। হেইবাব ধনিয়া আর আদা বাটা দিয়্যা কষতি থাহেন। সিদ্ধ ডাল ঢাইল্যা দ্যান। সাথে দ্যান্ তেঁতুল, জল, লবণ আর চিনি, ঘড়ি ধইব্যা দশ মিনিট মতন ফুটান। ব্যস্, চিংড়ি-ডাল আপনেগো সামনে হাজির। শুদ্দু খাওনের আগে ডালের ওপর নাইরকল কোরা দিয়্যা সাজাইয্যা দ্যান্। সাবধান, ডাল-চিংড়ি দেইখ্যাই হগ্গলে কিন্তু ঢিড়িং মিড়িং কইর‍্যা দৌড়াইয়া আইব।

পুনঃ হেই যাঃ, চিংড়ির কথাডাই যে বলা হয় নাই। আপনেবা যদি বুদ্ধি খাটাইয়া পেত্থমেই খোসা-ছাড়ানো একশ গেরাম চিংড়ি ভাইজ্যা না রাহেন আব সময় মতন ড্যাকচিতে ছাইড়্যা না দেন—তয় কাঙ্গাল আব কী কবব, খাওয়াতো হইয্যা গ্যাসে গিয়া পরদিন না হয একশ গেরাম চিংড়ি ভাইজ্যা ভাগ কইব্যা হগ্গলে খান। প্যাটেব মদ্যি গিয়া চিংড়ির লগে কি আব মিলব না!

চিংড়ি-ডাল যা হবার তা হইসে। বর্ষাকালে বিকালের সাঁঝবেলাডা আর মাটি করেন ক্যান? বিষ্টির শব্দ শুনতি শুন্‌তি মুচমুইচ্যা ভাজা কিছু খালি কেমন লাগে কন দিহি? হেই জন্যি মাছের কচুরি পদডা লিখতাসি। দ্যাখ্‌বেন, কচুরি বানানো হইলে পর আমার লগে খানকয় বাইখ্যা দিবেন কিন্তু।

মাছের কচুরি

যা কিছু লাইগ্‌ব : পোনা মাছেব পেটি তিনশ গেবামেব মতন, চারশ গেরাম ময়দা, হাফ চাম্‌চা জিরা, গোলমবিচ হাফ চাম্‌চা, শুক্‌না লংকা তিন চাবডা, এক চামুচা মৌরি, গরম মশল্লা, হাফ চাম্‌চা ধনিযা পাতা বাটা, চাব চাম্‌চা পিঁযাজ বাটা, এক চাম্‌চা আদা বাটা, হাফ চাম্‌চা চিনি, ভাজার জন্যি ত্যাল, লবণ, ঘি।

বাননের পোণালী : ময়দায চাব পাঁচ চাম্‌চা ঘি আর লবণ দিয়া আন্দাজ মতন জল মিশাইযা বেশ ঠাইস্যা ঠাইস্যা নবম কইব্যা মাইখ্যা বাহেন। মৌবি, জিবা, লঙ্কা, গোলমবিচ, গবম মশল্লা আব ধনিয়াপাতা বাটা অল্প ভাইজ্যা মিহি কইব্যা গুড়া কইর‍্যা লন। মাছ সিদ্ধ কইব্যা চটকাইয়া লন। গুঁড়া মশল্লাডা দিয়া দ্যান। চিনি, লবণ, আদা বাটা, পিঁযাজ বাটা মিশাইয়্যা আচ্ছা কইর‍্যা সাঁতলাইযা লন। ময়দাব লেচি যতগুলান অইব ততগুলান ভাগে হেই পুবডা ভাগ কইর‍্যা লন। গোল কইর‍্যা পাকাইয্যা, ঠুলি কইব্যা পুরগুলি দিয়্যা লেচিব মধ্যে সেগুলান চাইবধাব বন্ধ কইর‍্যা লন। হাত দিয্যা চ্যাপ্‌টা চ্যাপ্‌টা কইব্যা ময়দাব গুঁড়া দিয়া লুচির মতন হেইগুলানবে গোল কইর‍্যা ব্যাইল্যা লন। ফাইটা যাতে না যায় হেইদিকে নজ্জব দ্যান। তা না হইলে আপনের কপালডাই ফাইট্যা যাইব গিয়্যা। হেরপর কি করতি অইব হেইডা আপনের জিব্বাই কইয়্যা দিব।

—কাঙ্গাল রায়

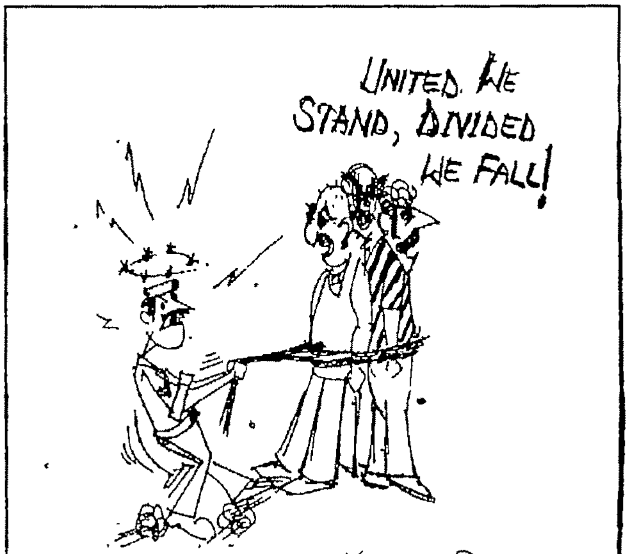

কার্টুন : জয়দীপ দাশগুপ্ত

WB/RNP
Regd N

ব্যঙ্গ সমাচার

সরব নীরবতা

এক নামি ক্লাবে শোকসভা চলছে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী একমিনিট নীববতা। রথী মহারথীদেব সংস্থা। পকেটে পকেটে মোবাইলের প্রোফাইল। এক কর্তাব পকেটে মোবাইল জানান দিল যে সেও নীরবতা পালন করছে—ক্রুবৃর্ ক্রুবৃর্ ক্রুবৃর্ ... .কর্তা তড়িঘড়ি উঠে দরজাব চৌকাঠেব পারে শ্রীচবণ স্থাপন করে নীরব বীণার তারে তরঙ্গ তুললেন —হ্যালাউ? তাবপর ওদিকের কিছু প্রশ্নের উত্তরে জানালেন—আমি? আমি ক্লাবে। এখানে এখন নীরবতা পালন হচ্ছে।

লিট্‌ল ম্যাগ্-এর LARGE লজ্জা

বাংলা আকাদেমির সামনে দুই নবীন লিট্‌ল ম্যাগজিন সম্পাদকের দেখা।

১ম জন : আরে, কী ব্যাপাব? কেমন আছ? তোমার পত্রিকা কেমন চলছে? গত যে সংখ্যাটা দিয়েছিলে, দা-রুণ। দেখবে, তোমাব কাগজ একদিন ফাটিযে দেবে।

২য জন : তোমাব পত্রিকাও দারুণ হচ্ছে। অনেকের কাছেই প্রশংসা শুনি। শোনো, জীবনানন্দ সভাঘরে আজ আমার কবিতাপাঠ আছে। শুনতে এসো কিন্তু।

১ম জন : নিশ্চয। আরে তোমাব কবিতা শোনার জন্যে আমি এক ঘন্টা লাইন লাগাতেও রাজি।

২য় জনের প্রস্থান। ১ম জনের সঙ্গী বললেন, গুরু, তুমি ওই ছাগলটার ছাগলাদ্য পড়েছ?

১ম জন : আরে ধুস্! সে তো পেতে বসে ঝুম্পার সঙ্গে গ্যাঁজালাম।

সঙ্গী : ওই হাফ লেডিসটার কবিতাপাঠ শুনতে যাবে?

১ম জন : কেন, আমাকে কি পাগলা কুকুরে কামড়েছে?

কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান ২য় জন তখন বন্ধুর সঙ্গে চা-পানে মগ্ন। বন্ধু বলছেন,—ওই গাধাটার সঙ্গে ঢলে ঢলে কী অত পিরিত হচ্ছিল? তুমি ওর কাগজ পড়ো নাকি?

২য জন : পাগল। তার চেযে বাজারেব ফর্দ পড়া ভালো।

বন্ধু : মনে হল ওকে তোমাব কবিতা শোনাব নেমন্তন্ন কবে এলে।

২য় জন : কবিতা শোনার নয, প্যাঁক খাওযাব। আমাব অন্তত দশজন অনুবাগী হলে থাকবে। ওকে দেখলেই প্যাঁক মারবে, সেটা ও ভালো করেই জানে। ওকে শোনানোব জন্যে কবিতা পড়ব আ—মি! ছোঃ, এব চেয়ে বড় লজ্জা আর কী হতে পারে?

আধুনিক আলফাবেট্

ববীন্দ্র জন্মদিবসে সকালের ধুন্ধুমারেব পব ববীন্দ্রসদন চত্বরে সন্ধ্যায আর এক কেত্তন। দলে দলে কবি এসে কবিতার আদ্যশ্রাদ্ধ কবেন। ববি ঠাকুরের এটুকুই স্বস্তির যে, সকালেব পিণ্ডগ্রহণেব পর সন্ধ্যায চোঁযা ঢেঁকুর আর বুক জ্বালা নিয়ে সে সব হজম করতে হয না। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতা সম্পর্কে, বিশেযত গদ্য কবিতা সম্পর্কে একটি আশঙ্কাই কবে গেছিলেন যে জমে ওঠা কবিতাব জঞ্জাল সাফাই করার মতো উপযুক্ত ঝাঁটা জুটবে কিনা। তারই সত্যতা প্রমাণে ঝাঁকে ঝাঁকে মঞ্চে হাজির হলেন সেই কবিতা-বিদায়, থুড়ি, রবীন্দ্র-বিদায়, মাফ কববেন, ববীন্দ্রসন্ধ্যায়। নামি কবিকুল বাদ দিলে অন্যরা এসেছেন তস্য তস্য দাদাদের বদান্যতায। এই অসম সমবে সেনাপতি কবি সমবেন্দ্র সেনগুপ্ত।

বর্ষীয়ান কবি ভূমেন্দ্র গুহ দর্শকাসনে বসে এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে আলাপচাবিতায় মগ্ন,—কবিতা পড়ার জন্যে লাইন দিয়ে বসে থাকতে হবে নাকি?

—আপনি তো আমন্ত্রিত। মঞ্চে গিয়ে বসুন।

—মঞ্চে জগন্নাথ হযে বসে থাকব? আবো অসহ্য।

—তবে সমরেন্দ্রদাকে গিয়ে বলুন। আপনার বন্ধু, এক্ষুনি দিযে দেবে।

—বলছেন।

কুর্তা-পাজামা কাঁধে-ঝোলা ভূমেন্দ্র গুহ এগিয়ে গেলেন। এবং গরগর কবতে করতে ফিরে এলেন,—চলুন। আব একমুহূর্ত এখানে নয়। নিকুচি করেছে কবিতা পড়ার।

—কেন, কী হল?

—আব বলবেন না, সমরেন্দ্রটা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। বলে কিনা আলফাবেট অনুযায়ী ডাকা হবে, এখন 'ত' চলছে। আগে 'ভ' আসুক। তারপর ভা ভি ভী ভু—দূব দূব! নীরেন চক্কোত্তিব পর দিব্যেন্দু পালিত, তারপর দেখলুম কৃষ্ণা বসু। স-এ সৈযদ কওসব জামালও উতরে গেল—এখন 'ত'-য়ে তোতলাচ্চে। যত্তোসব।

তরুণ বন্ধু পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন,—ভূমেন্দা, আপনি পুরনো দিনের লোক তো, এসব আধুনিক আলফাবেট বুঝবেন না। চলুন, এখনো দোকান খোলা আছে, একটা নিয়ে বাড়ি ঢুকি, জমিয়ে আপনার কবিতা শোনা যাবে।

—ভূতলেন্দু ভৌমিক